সূচীপত্র

কবিতা—

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রবাসী—মাঘ, ১৩৭৪

সূচীপত্র

াল্গুন

১৩৭৪

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৭৪

সূচীপত্র

একরকম অবাঙালী ভারতীয় আছে
রা মনে করে, বঙ্গের প্রতি বিশেষ
কার অবিচারের কথা বলিলে, তাহার
তিকার চাহিলে প্রতিকার-চেষ্টা করিলে
হা বাঙালীদের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা।
জিনিস বেচিয়া বা বঙ্গে আসিয়া
সকলে ধনী হউক, কিন্তু বাঙালীরা
দরিদ্র হইতে থাকুক, এ অবস্থায়
ঙালীরা অসন্তুষ্ট ও প্রতিকারেচ্ছু হইলে
তাহাদের প্রাদেশিকতা। বঙ্গের
কৃতিতে, বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে, কিছু
কর্ষ আছে বলিতে তাহা বাঙালীদের
দেশিক সঙ্কীর্ণতা ও অহমিকা। তাহাদের
রচনায় বাঙালীরা যে সকল বিষয়ে
ম, ইহা মানিয়া লইলে তবে আমরা
রাচিত্ত বলিয়া গণিত হইবার যোগ্য
য়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চৈত্র, ১৩৭৪

প্রবাসী—চৈত্র ১৩৭৪

সূচীপত্র

রাজকন্যা

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৭৪

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বেতার প্রচার পীড়ন

ইতিহাস যাহারা লিখেন তাঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব বিদ্রোহ, শাসন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন, রাজ্যাধিকারের হাত বদল এবং ঐ জাতীয় সামরিক শক্তি সম্পর্কিত কার্য্যকলাপ লইয়াই অধিক সময় ব্যয় করেন। রাজ্য শাসন পদ্ধতি বর্ণনা করিতে গিয়া খাজনা মাশুল আদায়, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির কথাও কখনও কখনও উঠিয়া পড়ে। কোন নৃপতি যদি সাক্ষাৎ ভাবে সামাজিক রীতিনীতি লইয়া নড়াচড়া করিয়া থাকেন তাহা হইলে মানব সভ্যতার আংশিক বিচারও ইতিহাসের পাতায় আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করে। সেইরূপ না ঘটিলে শাসকমণ্ডলে যাহারা উচ্চ স্থানীয় তাঁহাদিগের দৈনিক কার্য্যসূত্রে তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়া ফেলেন সেই সকল গভীর তথ্যবর্জ্জিত মূল্যহীন কথাই ক্রমাগত ইতিহাসের মূল উৎস নিঃসৃত তথ্যবহুল কথা বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। আজ যাহা সংবাদ বলিয়া সরকারীভাবে ছাপার অক্ষরে ও বেতারে প্রচার করা হয় পরে তাহাই ইতিহাস বলিয়া লিপিবদ্ধ হইবার আশা রাখে ও শাসকমণ্ডলের প্রধানগণ বহিষ্কৃত না হইয়া যাইলে ঐ সকল সংবাদই ইতিহাস হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণে আমরা প্রত্যহ যে মানব-সভ্যতার সহিত সকল সম্পর্ক বর্জ্জিত কথাগুলি রাষ্ট্রীয় মহারথীদের মুখনিঃসৃত হওয়ায় শুনিতে ও পাঠ করিতে বাধ্য হই, সে কথাগুলি মূল্যহীন হইলেও সেইগুলির ধাক্কাতেই আমাদিগের উত্তরাধিকারীদিগের জীবন বিপন্ন হইতে পারে ইহা আমাদিগের বিশেষভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য। সময় থাকিতে আমরা যদি রাষ্ট্রীয় নেতাদিগের বক্তৃতা প্রচার বন্ধ করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদিগের বংশধরদিগের বড়ই বিপদ হইতে পারে। বড় বড় সঙ্গীতের আসর বসিয়া বহুলোককে আনন্দ দিয়া শেষ হয় কিন্তু তাহার কোন প্রকৃষ্ট বর্ণনা আমরা বেতারে শুনিনা। অতি উচ্চস্তরের চিত্র প্রদর্শনীর কথাও বেতারে শুনা যায় না। মহা মহা পুরুষদিগের জন্ম শতবার্ষিকীর কথাও হয় কিছুই প্রচার করা হয় না, অথবা দুই এক কথায় শেষ করিয়া দেওয়া হয়। কোন স্বনামধন্য লেখক নূতন কোন পুস্তক রচনা করিলে সে কথার উল্লেখ বেতারে কখনও হয় না। নূতন কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা কিম্বা জ্ঞানের ক্ষেত্রের কোন নূতন তথ্য লইয়া প্রচারে বেতার যন্ত্রবিদ কখন কোন ব্যগ্রতা দেখান না। কারণ প্রচারের একমাত্র রাষ্ট্রনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য হইল সামাজিক খরচে তথাকথিত "অতি গুরুজনদিগের" অতি সাধারণ কথাবার্ত্তা জোর করিয়া নিরীহ শ্রোতাদিগকে শুনিতে বাধ্য করা। সর্ব্বসাধারণের নিকট যদি প্রত্যহ বহুবার কোন কোন অতি সাধারণ লোকের নাম না করা হয় তাহা হইলে সেই সাধারণ ব্যক্তিগণের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য দেশবাসী জানিবেন কি করিয়া? বাৎসরিক ১৫৲ টাকা মাশুল দিয়া ও অপরাপর খরচ করিয়া বেতার যন্ত্র রাখিয়া যদি শুধু এই জাতীয়

প্রচার শুনিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। মানব সভ্যতা তথা ভারত সভ্যতায় বহু জ্ঞানগর্ভ ও চিত্তবিনোদনকর বিষয় আছে যাহা সাধারণের নিকট প্রচারের কোন সহজ ব্যবস্থা এতদিন কেহ করিতে পারে নাই। বেতার প্রচারে এই কার্য্য উত্তমরূপে হইতে পারে; কিন্তু বেতার দফতর সরকারী আমলাদিগের কবলে এমন করিয়া আবদ্ধ রহিয়াছে যে ভারতীয় বেতার প্রচার কখনও পূর্ণরূপে মানবহিতকর হইবে বলিয়া কেহই আশা করেন না। শ্রীমতী অমুক অথবা শ্রীমান তমুক বিশ্বশান্তি, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ ও আরবদিগের উন্নতি বিষয়ে ত্রিবন্দ্রম, নাসিক অথবা কানপুরে কি কি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা শুনাইয়াই সকলের কর্ণ বধির করিয়া দেওয়া হয় ও যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে সেই সময়ের অধিকাংশই আধুনিক সঙ্গীত, গীটারের আর্ত্তনাদ ও চাষবাস সম্বন্ধে সবিশেষ উপভোগ্য আলোচনায় শেষ হইয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশেই সংবাদ রাষ্ট্রীয় নির্দ্দেশে কোন না কোন মতলব হাসিল করিবার জন্য, সত্য মিথ্যা বজ্জিতভাবে তৈয়ার করা হয়। সংবাদপত্রগুলি সত্য জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যম এই কারণে হইতে পারে না। জগতের মানুষ এই কারণে ভ্রান্ত বিশ্বাসের দাস হইয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িয়া থাকেন।

জাতীয় জীবনে আনন্দের অভাব

পরদাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলে আশা করা স্বাভাবিক যে স্বাধীন অবস্থায় জীবনে সুখ শান্তি বৃদ্ধি লাভ করিবে। আমাদের জীবনে কিন্তু স্বাধীনতার পর হইতেই বিভিন্নভাবে দুঃখকষ্ট বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বলা যাইতে পারে যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রারম্ভেই আমাদিগের জীবন মহাকষ্টের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া যায়, এবং যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা পাইতে হইলে আমাদিগের যে সংখ্যায় মৃত ও আহতের সংকার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইত, অহিংস-নীতি অনুসরণ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে তাহা অপেক্ষা অল্পে আমাদিগের সংগ্রামের অবসান হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লোক মৃত, আহত বাস্তহীন ও সর্ব্বহারা হইয়া অসহায় অবস্থায় দুর্দ্দশার চরমে পঁহুছাইয়া ছিল। সেরূপ অবস্থা কোন মহাযুদ্ধের সংঘাতেও সকল সময় হয় না। ইহার উপর জাতীয়ভাবে আমরা একটা কর্ত্তিত অবস্থায় থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। যুদ্ধের ফলে মানুষ যেরূপ অঙ্গহীন ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, আমরা যুদ্ধ না করিয়াই ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে সেই অঙ্গহীনতা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। এইত হইল স্বাধীনতার গোড়ার কথা। পরে ক্রমশ অবস্থা আরো শোচনীয় হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে মানুষ এই দেশে সংসার প্রতিপালন করিয়া বার্দ্ধক্যকালীন বাস ও গ্রাসাচ্ছাদনেরও ব্যবস্থা করিয়া লইতে সক্ষম হইত। স্বাধীনতার পরে মাসিক তিনশত টাকাতেও সেই আর্থিক নিশ্চয়তা ও স্বাচ্ছন্দ্য কেহ আর লাভ করিতে সক্ষম হইল না। যাহাদিগের ঐশ্বর্য্য আরোও অধিক তাহারাও আর পূর্ব্বের সমতুল্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ভ্রমণ ইত্যাদি উপভোগ করিতে পারিল না। পথে, ঘাটে স্কুলে, কলেজে, খেলার মাঠে আফিসে, দফতরে এক কথায় সর্ব্বত্র একটা এমন অভাববহুল বর্ব্বর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে কোন মানুষই আর আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আনন্দে কোথায় যাতায়াত করিতে পারিল না। কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামা, কোথাও লঘু গুরু ভেদ অস্বীকার করিয়া অসভ্যতার চূড়ান্ত, কোথাও বা ব্যক্তিগত অসম্মান সকল সীমা ছাড়াইয়া মূর্ত্ত ও প্রকট হইয়া উঠিল। পূর্ব্বকালে মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত লোকের সখের খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির একটা উৎকৃষ্টভাব ছিল যাহা স্বাধীনতার পরের যুগে কাহারও অদৃষ্টে আর বিশেষ জুটিত না। উৎকৃষ্ট চাউল, ডাল মৎস্য, মাংস তরকারী এবং সুখাদ্য মিষ্টান্ন দধি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রকোপে আর নিজ নিজ স্বরূপ রক্ষা করিতে পারিল না। ফলে যেরূপ খাদ্য লোকে পূর্ব্বে বিশেষ অভাবে পড়িলেও খাইত না; স্বাধীন যুগে তাহাই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। বস্ত্রও সরেশত্ব হারাইয়া অতি সাধারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃত্রিম রেশম রেয়ন, নাইলন প্রভৃতির উদ্ভাবনার ফলে পুরাতন যুগের উৎকৃষ্ট রেশম ও সূক্ষ্ম তুলার বস্ত্রবয়ন একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। মূল্য বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। গৃহ ও গৃহের আসবাব পূর্ব্বের

তুলনায় এখন দশগুণ মূল্যেও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে যেরূপ গৃহ পঞ্চাশ ষাট টাকায় পাওয়া যাইত, এখন তাহা পাঁচ ছয় শত টাকাতেও পাওয়া যায় না। আসবাবের কথা না বলাই ভাল; কারণ পূর্ব্বের ন্যায় কারিগর ও কাঁচামাল আজকাল কেহ চোখেও দেখিতে পায় না। একটা সময় ছিল যখন মানুষ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আনন্দ আহরণ করিতে না পারিলেও সুরুচির অনুসরণে অল্প ব্যয়েই পূর্ণ আনন্দ অর্জ্জনে সক্ষম হইত। সে সময়ে দেখা যাইত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের আসর, কাব্য ও সাহিত্য চর্চ্চার কেন্দ্র, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের অনুশীলন ও পণ্ডিতজনের আলোচনার বৈঠক। মানুষ তখন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিত। সকল লোকে মিলিত ও উচ্চ কণ্ঠে দুই চারটি অর্থহীন শব্দ সবেগে উচ্চারণ করিয়াই তুষ্টির চরমে পৌঁছাইতে পারিত না। সাজসজ্জায়, ব্যবহারে ও দোষগুণে সকল ব্যক্তির মধ্যে যে অসম্ভব সাদৃশ্য বর্ত্তমানে পরিলক্ষিত হয় তাহা জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাঁহারও কোন বিষয়ে কোন বিশেষ অবদান নাই। সমষ্টিগতভাবেও সকলের চাল চলনে কিম্বা কার্য্য-কলাপে কোন প্রগতিশীলতার চিহ্নমাত্রও দেখা দেয় না। কারণ, রূপরস বর্ণ ও আকৃতিহীন চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল ব্যক্তিকে এক ছাঁচে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা পাঠের, প্রচারের ও দল বাঁধিয়া চলিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। ফলে মানব জীবনে আনন্দের স্থান বা ব্যবস্থা নাই। দলবদ্ধ হইয়া শোক বা বিক্ষোভ প্রদর্শন। দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ পরিচালনা। দলবদ্ধভাবে সমাজের অপরাপর লোকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারে হস্ত-ক্ষেপ চেষ্টা। এই সকল দলের কার্য্যের ভিতর দিয়া সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইবে বলিয়া মনে হয় না। দলের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিতেছে। কলহও বাড়িতেছে। সুতরাং এই মানসিক অনুর্ব্বরতার বিকাশের ফলে যে কোন নিম্নস্তরেরও জাতীয় মহামিলন অনুষ্ঠিত হইবে সে আশাও করা যায় না। লক্ষণ কিছুমাত্র মঙ্গলকর বলিয়া মনে হয় না। ক্রোধ, বিদ্বেষ, বিক্ষোভ, আক্ষেপ, শোক ও সমাজের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেই বৈরভাব সফলভাবে কোন উন্নতির চেষ্টার সমর্থন করিতে পারে না। নিরানন্দ ও বিক্ষুব্ধ প্রাণের গতি সর্ব্বদাই অবনতির দিকে। ইহার কারণ মানব ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার প্রাবল্য। যদি কেহ চিন্তা করে যে সকল গাছের ফলই বিষময় তাহা হইলে তাহাকে যেরূপ গাছে ফল থাকিলেও না খাইয়া কষ্টভোগ করিতে হয়; তেমনি যদি কেহ বিশ্বাস করে যে মানবসভ্যতার ধারা শুধু অনন্তকাল হইতে অন্যায় ও অবিচারের পঙ্কিল-স্রোতে সমাজকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সুন্দর বা জনমঙ্গলকর কিছু কখন ছিল না; তাহা হইলে সেই বিশ্বাস মনুষ্য-জাতির প্রাণের গতি আনন্দ ও আশাহীনতার আবিল আবর্ত্তে পরিচালিত করিয়া সমাজের উন্নতির পথে এক মহা বাধার সৃষ্টি করে। বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্র যে অভিযোগের প্রাবল্য দেখা যায় তাহার মূলে রহিয়াছে অভিযোগকারীর নিজের অক্ষমতা বা দোষ অস্বীকার করিয়া অপরের স্কন্ধে সকল অভাবের দায়িত্ব স্থাপন চেষ্টা। এই কার্য্য শুধু সাধারণ মানুষে করিতেছে না। উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণও গরীব ও মূর্খ দেশবাসীর উপর দোষ চাপাইয়া নিজেদের অক্ষমতার সাফাই গাহিতেছেন। যাঁহারা অল্প বিস্তর কার্য্যক্ষম তাঁহারাও কার্য্য করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ না দেখাইয়া শুধু অপরের সমালোচনায় দিন কাটাইতেছেন। এক কথায় দেশের সকল লোকই পরস্পরের নিন্দা করিয়া সমবেত দুঃখ ও কষ্টের বোঝা ক্রমশঃ আরো বাড়াইয়া চলিতেছেন। সকলে কিছু কিছু মেহনত করিলে প্রথমত পরস্পরের উপর দোষারোপ করিয়া জাতীয় জীবন বিষময় করিয়া তুলিবার সময় লাঘব হইয়া মতামতের আবহাওয়া কিছুটা পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা হয়। দ্বিতীয়ত কার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর জাতীয় উপভোগ্য দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন নির্ভর করে ও সেই কারণে সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কিছু কিছু অধিক পরিমাণে করিবার অভ্যাস করিলে দ্রব্য সম্ভারের সরবরাহ বৃদ্ধি হইয়া সকলের জীবনেই সুখ সুবিধা কিছুটা বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে। সুতরাং চিৎকার ও কথা বন্ধ করিয়া কার্য্যারম্ভের ব্যবস্থা করিলে মনে হয় দেশবাসীর প্রাণে আনন্দ পুনরাবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইতে পারে। উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণের কার্য্যের পরিকল্পনা ও অন্যান্য লোকের অভিযোগ ও সমালোচনা মিলিত হইয়া জাতির উৎপাদন কার্য্য প্রায় পূর্ণরূপে গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শুধু শুনি অতঃপর কি কি ভাবে আমাদের জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে

তাহার প্রতিশ্রুতির ও আয়োজনের ব্যবস্থার কথা। শুধু কথা, কোন বাস্তবকার্য্য নহে। আর শুনি নিষ্কর্ম্মা ভাবে হাত গুটাইয়া ও গলাবাজি করিয়া দিন কাটাইবার কারণগুলির উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

কোন ক্ষমতা বা অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইলে যাহারা ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের মধ্যে মহা আপত্তির আলোড়ন সুরু হয়। ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া যে তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের কার্য্যবিধি ও কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্যে ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য রক্ষার কোনই লক্ষণ যে দেখা যায় না; এই সকল কথার কোন মূল্য তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী নহেন দেখা যায়। এই কথাই তাঁহাদিগের মনে চিরজাগ্রত থাকে যে ভগবানদত্ত কোন গূঢ় কারণে তাঁহারা ক্ষমতা পাইতে সর্ব্বদাই অধিকারী। কারণ তাঁহারা রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে অপর লোকেদের অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছিলেন ও রাষ্ট্রীয় অধিকার একবার হস্তগত হইলেই তাহাতে শাসনকর্ত্তাদিগের সকল অক্ষমতা এবং দেশ শোষণ ও পীড়নের অপরাধ সরাসরি মাফ হইয়া যায়। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কার্য্য এদেশে কোন সময়েই উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় নাই। কেহ বলেন কালো বাজারের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও বিলিব্যবস্থা থাকাতেই নিয়ন্ত্রণকারী আমলাগণ, ও অনেক সময় তাহাদিগের উপরওয়ালাগণও, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন ভাবে করিয়াছিলেন ও এখনও করেন, যাহাতে জনসাধারণের উচ্চমূল্যে কালোবাজারের মাল খরিদ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই কথা কতটা সত্য তাহা বিচার করা সহজ নহে, কারণ ষড়যন্ত্র সকল সময়েই আড়ালে গা ঢাকা দিয়া চলিয়া থাকে ও তাহার প্রমাণ পাওয়া কঠিন বা অসম্ভব হয়। কিন্তু সন্দেহের কারণ সকল সময়ে যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকায় কর্মকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য ছিল সাধারণের মন হইতে সেই সন্দেহ দূর করা। কংগ্রেস সরকার কখনও তাহা করিবার চেষ্টা করেন নাই এবং বর্ত্তমান বামপন্থীদের শাসনকর্ত্তাগণও সে সন্দেহ বজায় রাখিয়াই চলিয়াছেন। উপরন্তু বামপন্থী শাসনপদ্ধতিতে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের আরও অধিক অবনতি হওয়াতে কালোবাজার অধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বামের নেতৃবৃন্দ পূর্ব্বে কংগ্রেস শাসনের নাম দিয়াছিলেন লাইসেন্স-পারমিট-কনট্রাক্ট রাজ। কারণ তৎকালীন রাজ চলিত লাইসেন্স পারমিট কনট্রাক্ট বিতরণের অবৈধ বন্দোবস্তের ব্যবহার বজায় রাখিয়া। এখনকার রাজ্যশাসন পদ্ধতির নাম দেওয়া যাইতে পারে মিছিল-ঘেরাও-হরতাল রাজ; কারণ এখন শাসনকার্য্য সুচালিত রাখিবার কোন ব্যবস্থাই মিছিল, ঘেরাও ও হরতালের সংখ্যাধিক্য হেতু সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে মানুষের বাস করাও কঠিন হইয়াছে কারণ প্রথমত পুলিশ পাহারা নাই বলিলেই চলে; দ্বিতীয়ত কোন কাজকর্ম্ম পরিচালনা অথবা কাজের জন্য যাতায়াত মিছিল ও মিটিং এর ধাক্কায় সফলভাবে হইতে পারে না; তৃতীয়তঃ খাদ্যাভাব ও খাদ্যমূল্য এত অধিক যে অর্দ্ধাহারেও খরচের তুলনায় রোজগারে কুলায় না। ইহার জন্য বামনেতাগণ বলিবেন কংগ্রেস দায়ী; কিন্তু অপরের উপর দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত হইলেও তাহাতেই কাহারও কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে করা হইয়া যায় না। কংগ্রেস এখন রাজকার্য্য এই প্রদেশে চালাইতেছে না। সকল অবস্থা জানিয়া শুনিয়াই বাম নেতাগণ শাসন অধিকার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। শাসন কার্য্য যদি তাঁহারা না চালাইতে পারেন তাহা হইলে পথে ঘাটে শুধু হাল্লা হাঙ্গামা হইতে থাকিলে দেশবাসীর অভাব দূর হইয়া যাইবে না। বিপ্লব না হইতেই সর্ব্বসাধারণের প্রাণ ওষ্ঠাগত; বিপ্লব হইলে ত আর কাহারও রক্ষা থাকিবে না। বাম নেতাগণের কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা রাজশক্তি হাতে পাইয়া যেরূপ কার্য্য সাধনে অক্ষম; রাজ্যে বিপ্লব ঘটাইলে তাঁহাদিগের অক্ষমতা আরো দশগুণ বাড়িয়া গিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ ও মান, ইজ্জত, সম্পদ নষ্ট হইবে। সুতরাং সাধারণ মানুষের তাঁহাদিগের উপর যখন আস্থা নাই তখন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নেতৃত্ব বাসনা দমন করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাওয়া। কংগ্রেস নেতাগণের সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। তাঁহারাও দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল দেশের শাসনকার্য্য প্রকট অক্ষমতার সহিত চালাইয়া আজ দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই প্রায় কোন নির্ভরযোগ্য কর্ম্মক্ষমতা

নাই। কিন্তু নেতৃত্বের মাদকতা তাঁহাদিগকে বিভোর করিয়া এমন একটা মানসিক অবস্থায় আসিয়া বসাইয়াছে যে তাঁহারা এখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ও দেশের মঙ্গল বলি দিয়াও নিজেদের রাজশক্তি বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর। ভারতবর্ষের সকল লোকের যতটা খাদ্য প্রয়োজন তাঁহার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ খাদ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে সরবরাহ করা হয় না। বাকি ২৫ ভাগেরও অর্দ্ধেক অংশ চাউল, গম ও চিনি হইতে পারে, অর্থাৎ শতকরা ১২॥০ ভাগ মাত্র নিয়ন্ত্রিত ভাবে লোকের নিকট পৌঁছায়। এই চাউল ও গম মানুষে যতটা খায় তাহার মাত্র অর্দ্ধেক পরিমাণ সরকারী হিসাবে মানুষে পাইবে বলিয়া ধরা হয়। যথা চাউল ও গম যদি মাথাপিছু সপ্তাহে [illegible]।০ কিলো প্রয়োজন হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে ১.৭ বা ১.৮ কিলো মাত্র তাহারা রেশন বলিয়া পায়। প্রয়োজনের হিসাবে তাহা হইলে ভারতের মোট খাদ্যের শতকরা সওয়া ছয় ভাগ মাত্র রেশন বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এইটুকু মাত্র দিতেই সরকারের শত শত কোটি টাকা ধার হইয়া যায় এবং আরও পঞ্চাশ রকমের দরবার আদালত করিতে হয়। সুতরাং ঐটুকু রেশন না দিলে দেশের জনসাধারণ মরিয়া যাইবেনা এবং দেশের সর্ব্বাপেক্ষা গরীব লোকেরাও ঐ সাহায্য পায়না বলিয়া উহা বন্ধ করিলে একটা সামাজিক অপরাধও হইবে না কাহারও। বন্ধ করিলে আমেরিকার নিকট আর্থিক দাসত্ব কিছুটা রোধ করা যাইবে এবং নানা প্রকারের অন্যায় শোষণের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। বিহারে চাউল খোলা বাজারে ২ টাকা কিলো বিক্রয় হইতেছে রেশন ব্যবস্থা না থাকিতেও; কলিকাতার কালো বাজারে ৪ কিম্বা ততোধিক মূল্যে এক কিলো চাউল পাওয়া যায় রেশনের অভিনয়ের আড়ালে। রেশন তুলিয়া যদি না দেওয়া হয় তাহা হইলে এই অবস্থাই কায়েম থাকিবে বলিয়া সকলে মনে করেন। রেশন বন্ধ করিয়া সমবায় বা অপর কোন ন্যায়সঙ্গত উপায়ে খাদ্য বিক্রয়ের ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল ব্যবস্থা করিলে খাদ্যমূল্য শীঘ্রই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিবে। যে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা খাদ্য নিয়ন্ত্রণে নিয়োগ করা হয় তাহা যদি খাদ্য উৎপাদনে লাগান হয় তাহা হইলে ফল অনেক অধিক জনহিতকর হইবে বলিয়া মনে হয়। ভারত সরকার যে দলের হাতেই যাউক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ উপযুক্তভাবে চালাইবার ক্ষমতা কেহ দেখাইতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিনা। সুতরাং এই নিয়ন্ত্রণের পালা শীঘ্রই শেষ করা আবশ্যক। যতটুকু ক্ষমতা আছে তাহা খাদ্য উৎপাদনেই লাগান প্রয়োজন।

রূপ, রস ও সৌন্দর্য্য অনুভূতির বিশেষত্ব

আধুনিক যুগের মানুষ আধুনিকতার আবেগে সকল বিষয়েই "নূতন কিছু করো" পদ্ধতিতে কাজ, চিন্তা ও অন্তরের অনুভূতি পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। কার্য্য ইচ্ছামত করা সম্ভব; চিন্তাও মানুষের ইচ্ছাধীন, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধ মনোভাব, যাহা রূপ, রস ও সৌন্দর্য্য অনুভূতির অভিব্যক্তির উৎস, তাহা কখন ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় না। এই কারণে শিল্পকলার ক্ষেত্রের নূতনত্ব বা আধুনিকতা অনেক সময় সাক্ষাৎ অনুভূতিজাত না হইয়া কষ্টকল্পিত হয় ও সেই কারণে তাহাতে সত্যকার রূপরস অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় না। সঙ্গীতে এই জাতীয় আধুনিকতা আজকাল খুবই চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই সকল সঙ্গীতের কথা ও ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রস ও অর্থ বর্জ্জিত। যাহারা সরকারী খরচে বেতারে এই সকল কষ্টরচিত অর্থহীন বেখাপ্পা শব্দিক সঙ্গীত প্রচার করাইবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা শুধু যে সুরুচিবোধ হারাইয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা জাতীয় রুচির সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া জনসাধারণের মহা ক্ষতির কারণ হইতেছেন। এই সকল সুরসঙ্গতি হারা জোড়াতাড়া দেওয়া শব্দের স্তূপগুলির সহিত রাগরাগিনীর সম্বন্ধ সেইরূপই যে সম্বন্ধ আমরা ইষ্টকের স্তূপ ও সুনির্ম্মিত অট্টালিকার স্থাপত্যের মধ্যে দেখিতে পাই। সাহিত্যে কথার উপর কথা স্থাপন করিয়া যাওয়াও দেখা যায় যাহার ফলে কথার অরণ্যের মধ্যে অর্থ কিম্বা ভাব খুঁজিয়া পাওয়া একান্তই কঠিন হয়। যদি কখন বিষয় ও ভাব পাওয়া যায় তাহা হইলে আধুনিক সঙ্গীতের স্বর ও সুর বিকারের অনুকরণে কোন অর্থ বা ভাবের লক্ষ্য অধিককাল স্থির থাকিতে পারে না। গল্প দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কোথায় গিয়া পড়ে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কোন পূর্ণ বিকশিত ও সুরচিত পরিসমাপ্তি নূতন আদর্শের গল্প বা

নেতাগণের ভোটাভুটির ব্যবস্থা করিয়া অবশেষে উভয় প্রার্থীকেই উচ্চস্থানে বসাইয়া বিষয়ের একটা মীমাংসা করান। শ্রীমোরারজি শ্রীমতী ইন্দিরার রাজত্বকের দাবি অস্বীকার করিতে না পারিয়া নিজে তাঁহার সহকারী প্রধান মন্ত্রী হইতে রাজী হইলেন ও কিছুদিনের মত কলহ বিবাদ স্থগিত রহিল। কিন্তু অন্যদিকে কংগ্রেসী নেতা মহলে বহু মহামানব ভোটে হারিয়া ও উচ্চাসন হারাইয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টায় নানা প্রকার ষড়যন্ত্র ও দলাদলিতে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে দেখা যাইল বহু মহারথীদিগকে। অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, কামরাজ, পট্টনায়ক প্রভৃতির ইতস্ততঃ গমনাগমনে কংগ্রেসে যে দলাদলি পর্দার অন্তরালে ছিল, তাহা প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। অপরাপর দলগুলি মিলিত ভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া কোন কোন প্রদেশে শাসনভার কংগ্রেসের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের বামপন্থী বলিয়া প্রচার করিল; কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে বাম ও দক্ষিণের পার্থক্য কি তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কংগ্রেস যে ভাবে পূর্ব্বে ও পরে কম্যুনিষ্ট রুশ ও চীনের সহিত সখ্যতার বন্ধনে ভারতকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতে মনে হয় যে কংগ্রেসের সমাজ ও সমষ্টিবাদ অন্ততঃ কিছুটা সত্য মনোভাবপ্রসূত ছিল। কংগ্রেস ট্যাক্স বৃদ্ধি ও জাতীয় সম্পদ বন্ধক রাখিয়া যে ভাবে সমষ্টিগত মূলধন সৃষ্টি করিবার ও সমাজতন্ত্রের মালিকানাগত কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে তাহাতেও মনে হয় কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন না হইলেও ধননীতিতে রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধি করিতে বিশেষ তৎপর। আন্তর্জাতিক সখ্য স্থাপনেও কংগ্রেস যেরূপ উদারভাবে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রুশ দেশের সহিত সমান সমান বন্ধুত্বভাব পোষণ করে, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রেও কংগ্রেস একই সময়ে ধনবাদ ও সমষ্টিবাদ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ কংগ্রেস কোন নীতিতেই পূর্ণ বিশ্বাস করে না ও সকল নীতিবাদেই অল্প অল্প আস্থা রাখে। কারণ এই উদারনীতিতে কংগ্রেস বহু মিত্রলাভ করিতে সক্ষম হয় এবং শত্রুতা কাহারও সহিত হয় না। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এই সুবিধাবাদ অনুসরণ করিয়াই কংগ্রেস চীনের সহিত একটা গভীর শত্রুতায় জড়াইয়া পড়িয়াছে। যদি কংগ্রেস চীনের তিব্বত দখল কালে চীনের বিরুদ্ধতা করিত তাহা হইলে হয় তো আজ চীনের প্রভুত্বের করাল ছায়ায় এশিয়াবাসীকে বাস করিতে হইত না। সুতরাং কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থার মূল্য যাহাই হউক; বামপন্থী অনুসরণে কংগ্রেস বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারে নাই। যদি বলা যায় তাসখন্দ; তাহার উত্তর হইল তাসখন্দে কংগ্রেস ভারতের কোন সুবিধাই করিতে পারে নাই। তাসখন্দে আমরা পাকিস্তানের কাশ্মীর দখল ও চীনকে কাশ্মীরের কিছু অংশ দান একপ্রকার মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমানে শ্রীগুলজারীলাল নন্দা বাংলাদেশে আসিয়া যে কংগ্রেসের পরিচালনার কার্য্যে একটা বিশেষ কার্য নির্ব্বাহক সভার সৃষ্টি করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা কংগ্রেসের কলহবিবাদের একটা অঙ্গ মাত্র। অর্থাৎ শ্রী নন্দা, শ্রী কামরাজ ও শ্রী অতুল্য ঘোষের মিলিত শক্তিনাশের ব্যবস্থা করিয়া বাংলায় তথা ভারতে শ্রীপ্রফুল্ল সেন প্রভৃতি ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রভাব বৃদ্ধি চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে যদিও ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সমর্থকদিগের শক্তির বুনিয়াদ দৃঢ় হইবে তাহা হইলেও কংগ্রেসের ইতিপূর্ব্বের অখ্যাতির জন্য দায়ী নেতাগণ ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিলে কংগ্রেসের অখ্যাতি আরও প্রবলরূপ ধারণ করিবে। এই কারণে শ্রী নন্দার কার্যকলাপ আমরা ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করি না। অতুল্য ঘোষ প্রভৃতি কোন কোন লোক কংগ্রেস নেতৃত্বে না থাকিলে কংগ্রেসের মঙ্গল, স্বীকার করি। কিন্তু অপরাপর মতপন্থী নেতাগণ কংগ্রেসের একছত্র অধিপতি হইয়া অধিষ্ঠিত হইলে সে মঙ্গল স্থায়ী হইবে না। বরঞ্চ কংগ্রেসের অবস্থা আরো বিকল হইবে। জনসাধারণের উচিত কংগ্রেস ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয়দলের শক্তি লাঘব করিবার ব্যবস্থা করা; কারণ সকল দলগুলিই স্বার্থান্বেষী ও ষড়যন্ত্রপ্রিয়। ভেজাল বর্জ্জিত দেশপ্রেম কাহারও নাই মনে হয়।

শোক

-হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-

আশীর্বাদের দিন থেকে বাপের মুখ ভার, মায়ের চোখে জল।

অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক। ছেলে নেই, ওই একটিই মেয়ে। এ মেয়ে যে এক দিন চোখের আড় হবে, চলে যাবে অন্য লোকের বাড়ী, এ কথাটা বাবা আর মা ভাবতেই পারে নি। অথচ মেয়ের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা কথা মেয়ের মা বাপকে ভেবে রাখতে হয়।

তাদের কাজ শুধু মেয়েকে মানুষ করা। লেখাপড়া শিখিয়ে, সৎ শিক্ষা দিয়ে, গৃহকর্মনিপুণা করে পরের হাতে তুলে দেওয়া। এ ছাড়া মেয়েছেলের জীবনে অন্য পথ নেই।

আর যে পথ আছে, সেটা মোটেই বরণীয় নয়। মা বাপের কাম্য তো নয়ই। অনেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হয়। জীবন থেকে পুরুষকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেয়, কিন্তু উত্তরকালে তারা সুখী হয় না।

বিষণ্ন চোখের ছায়ায়, ক্লান্ত মুখের ভাঁজে, অবসন্ন ঠোঁটের ভঙ্গীমায় অতৃপ্তির কাহিনী লেখা।

দীপার মা বাপের তাই মত।

তবু তারা চেয়েছিল দীপাকে আরো কিছু দিন নিজেদের কাছে রাখবে। লেখাপড়া শিখছে এই অজুহাতে। অন্তত বাপের সেই রকম ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু বিধি বাদী।

বানের জল কূল ছাপিয়ে একেবারে উঠানে এসে ঢুকল।

কোথাও কিছু নেই, অপরিচিত এক প্রৌঢ় দরজায় এসে হাজির। দীপার বাবা তখনও অফিস থেকে ফেরে নি, দীপার মাই গিয়ে দাঁড়াল।

কাকে চাই।

প্রিয়তোষবাবু আছেন? প্রিয়তোষ বোস।

দীপার বাপের নাম প্রিয়তোষ। নিজের মাঝারি সাইজের ইলেক্‌ট্রো প্লেটিংয়ের কারখানা। নিজে ইঞ্জিনিয়ার। কাজের মরসুমে ফিরতে দেরী হয়।

দীপার মা সুনীলা সেই কথাই বলল।

তাঁর ফিরতে কি খুব দেরী হবে?

সুনীলা বলল, না, একটু পরেই ফিরবেন।

ঠিক আছে মা, আমি একটু অপেক্ষা করছি।

প্রৌঢ় বসল।

নিরুপায় সুনীলা ওপরে উঠে এল।

দীপা নিজের পড়ার টেবিলে বসে ছিল। বলল, লোকটা কে মা ?

কি জানি বাছা, এ পাড়ার কেউ বলে তো মনে হ'ল না। তোমার বাবার সঙ্গে কি দরকার আছে।

দরকার আর কি। ছেলে কিংবা নাতির চাকরির দরকার। কারখানায় ঢুকিয়ে দিতে হবে।

সুনীলা কোন উত্তর দিল না। এখন উত্তর দেবার সময় নেই। বাড়ীর লোকটা ক্লান্ত হয়ে ফিরবে, তার জন্য ব্যবস্থা আগে করা দরকার।

সুনীলা রান্নাঘরে ঢুকলে কি হবে, তার মন কিন্তু বাইরে পড়ে রইল।

মোটরের শব্দ হতেই সুনীলা নীচে নেমে গেল। নিজেকে আড়ালে রেখে পদার এধারে দাঁড়াল।

প্রৌঢ় উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রিয়তোষের মুখোমুখি।

আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করে রয়েছি।

প্রিয়তোষ লোকটির আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলুন তো ?

কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করে প্রৌঢ় সোজাসুজি বলল।

আপনার একটি মেয়ে আছে দেশবন্ধু কলেজে পড়ে।

প্রিয়তোষ বলল।

আমার ঐ একটিই মেয়ে। দীপালী।

আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন ?

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রিয়তোষ চমকে উঠল।

তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, আপনি কি ঘটক ?

প্রৌঢ় আকর্ণ হেসে বলল, না, পাত্রের বাপ।

এবার প্রিয়তোষ রীতিমত বিস্মিত হ'ল। এদেশে পাত্রের বাপের প্রথমেই পাত্রীর বাড়ীতে এসে ওঠার রেওয়াজ নেই। অতি সাধারণ পাত্র হলেও পাত্রীর অভিভাবককে তার বাড়ীতে ছোটাছুটি করতে হয়।

প্রৌঢ় প্রিয়তোষের বিস্ময়ের কারণ অনুমান করতে পারল।

গম্ভীর গলায় বলল, দেশবন্ধু কলেজের উল্টোদিকের লাল রংয়ের তিনতলা বাড়িটা আমার। একটি মেয়ে, দুটি ছেলে। আমার ছোট ছেলেটি এখনও অবিবাহিত। তার জন্যই আপনার কাছে এসেছিলাম। আপনার মেয়েটিকে আমি কলেজে যেতে-আসতে দেখেছি। আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আমার গিন্নীরও।

প্রিয়তোষের মনে হল কেউ তাকে আচমকা গভীর জলের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। যেখানে খুরধার স্রোতে কুটোটি পর্যন্ত দু খণ্ড হয়ে যায়।

প্রিয়তোষ কোনরকমে ঢোঁক গিলে বলল।

কিন্তু দীপার যে বি, এ পরীক্ষা।

প্রৌঢ়র উত্তর যেন তৈরীই ছিল।

বি, এ পরীক্ষা তো মাস দুয়েক পরেই আরম্ভ হবে। আমার তাড়া নেই। শীতের আগে আমি বিয়ে দিতে চাই না। শুধু কথাটা পেড়ে রেখে গেলাম।

প্রিয়তোষ কি একটা বলার চেষ্টা করল, পারল না। স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমার ছেলেটি জার্মানীফেরত ইঞ্জিনিয়ার। মরিসন এ্যাণ্ড কোম্পানীতে কাজ করে। সব মিলিয়ে প্রায় সতেরো শ টাকা মাইনে পায়। অবশ্য আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না, নিজেরা খোঁজ করে দেখবেন। এই নিন আমার কার্ড। ফোনও আছে। কিছু জানার প্রয়োজন হ'লে নির্বিবাদে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্রৌঢ় আর দাঁড়াল না। নমস্কার করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

সুনীলা যখন ঘরে ঢুকল, দেখল প্রিয়তোষ গালে হাত দিয়ে চুপচাপ চেয়ারে বসে আছে। তার সাড়া নেই, চেতনা নেই।

সুনীলা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

অর্থহীন দৃষ্টি মেলে প্রিয়তোষ আস্তে আস্তে বলল, বিয়ে!

এ বাড়ীতে বিয়ে বললে অবশ্য একজনের বিয়েই বোঝায়। দীপার।

তবু সুনীলা জিজ্ঞাসা করল, কার বিয়ে?

প্রিয়তোষ খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, ভদ্রলোক নিজের ছেলের সঙ্গে দীপার বিয়ের কথা বলতে এসেছিলেন।

ছেলে করে কি?

সুনীলার প্রশ্নে প্রিয়তোষ বিস্মিত হ'ল। সুনীলা এমনভাবে কথা বলছে যেন দীপার বিয়ে মারাত্মক কিছু নয়। বিয়ের পর দীপা এ বাড়ী থেকে চলে যাবে, এটাও বেদনাদায়ক নয়। বরং আনন্দ আর উত্তেজনার খোরাক। সব জিনিষটা সুনীলা চেখে চেখে উপভোগ করতে চায়।

প্রিয়তোষ আর একটি কথাও না বলে ওপরে উঠে এল। সুনীলা পিছন পিছন উঠল।

মুখ হাত ধুয়ে চায়ের টেবিলে সুনীলা কথাটা আবার পাড়ল। মেয়ের কান বাঁচিয়ে।

ভদ্রলোক দীপাকে দেখলেন কোথায়?

চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রিয়তোষ বলল।

দীপার কলেজের উল্টোদিকে বুঝি ভদ্রলোকের বাড়ী। যেতে আসতে দেখেছে।

ছেলেটি কি করে জিজ্ঞাসা করেছ?

কিছুই জিজ্ঞাসা করি নি, ভদ্রলোকটি তো অনর্গল কথা বলে গেলেন। ছেলে জার্মানী ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। কোন এক কোম্পানীতে কাজ করে, নামটা ভুলে গেছি। বেশ মোটা মাইনে পায় বললেন।

তা হ'লে তো ভালই। দেখ না চেষ্টা করে।

কিন্তু দীপার কি আর বয়স। এই বয়সে বিয়ে—

প্রিয়তোষ কথাটা শেষ করতে পারল না।

সুনীলা ধমক দিয়ে উঠল।

এই বয়স মানে? দীপার বয়স কত বলে তোমার ধারণা? বারো না তেরো?

অপ্রস্তুত প্রিয়তোষ মাথা চুলকাতে শুরু করল।

কুড়ি বছর বয়স হ'ল সে খেয়াল আছে? ওরকম বয়সে কবে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। এই তো বিয়ের বয়স। বাঙালী মেয়ের যৌবন আর কতদিনের!

চা শেষ করে প্রিয়তোষ উঠে পড়ল। অন্য খাবার স্পর্শ করল না। মেয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দীপা একমনে ইতিহাসের বই নিয়ে বসেছিল। পিছন দিয়ে প্রিয়তোষ ঢুকতে বুঝতে পারল না।

দীপালী দেবীর কি খবর?

প্রিয়তোষ দীপার পিঠে একটা হাত রাখল।

দীপা মাথাটা বাপের দিকে হেলিয়ে দিয়ে আধো আধো সুরে বলল, তোমার সর্দি হয়েছে বাবা? গলাটা এত ধরা-ধরা মনে হচ্ছে?

গলাটা ধরা-ধরা, প্রিয়তোষ গলাটা ঝেড়ে নিল, না, সর্দি তো হয় নি। তারপর কি পড়া হচ্ছে বল?

মডার্ণ হিষ্ট্রি।

প্রিয়তোষ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দীপার পাশে বসল।

তোমাকে আগে বলেছিলাম দীপা, তুমি সায়েন্স পড়। ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি আর অঙ্ক। তোমাকে ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করে আমার অফিসে ঢুকিয়ে দিতাম। বাপ আর মেয়ে এক সঙ্গে কাজে লেগে যেতাম।

যে কথাটা প্রিয়তোষ মুখ ফুটে বলতে পারল না, মনে মনে মন্ত্রের মতন উচ্চারণ করল, সে কথাটা হচ্ছে, দুজনের ছাড়াছাড়ি হ'ত না। উটকো লোক এসে লোভনীয় সম্বন্ধের জাল পেতে মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলতে পারত না। বললেও সে কথা উপেক্ষা করা যেত এই অজুহাতে যে মেয়ের অনুপস্থিতিতে কারখানার ক্ষতি হবে।

দিন দুই পরেই সুনীলা আবার পিছনে লাগল।

তুমি ভদ্রলোককে একবার ফোন কর।

প্রিয়তোষ বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। ছুটির দিন। কাজে বের হবার তাড়া নেই।

কাকে ফোন করব?

সেই যে সেদিন যে ভদ্রলোক এসেছিলেন দীপার বিয়ের ব্যাপারে।

প্রিয়তোষ সুনীলার আপদমস্তক দেখল। দীপাকে বাড়ী ছাড়াবার ব্যাপারে এ মহিলার এত উৎসাহের কারণ কি? পাঁচটি দশটি নয়, একটি মাত্র সন্তান। তাকে বিদায় করার জন্য এত আগ্রহ কিসের?

ভদ্রলোকের ফোন নম্বর জানি না।

প্রিয়তোষ আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করল।

আমি জানি। এই নাও।

বুকের ওপর কালনাগ ফণা প্রসারিত করে রয়েছে দেখলেও বোধ হয় প্রিয়তোষ এতটা বিস্মিত, এতটা আতঙ্কিত হত না।

সুনীলার প্রসারিত হাতের তালুতে একটা কার্ড।

কপালের কম্পিত ঘাম মুছে প্রিয়তোষ প্রশ্ন করল।

এ কার্ড তুমি কোথায় পেলে?

নিচের বসবার ঘরে। নাও, ওঠ।

প্রিয়তোষ একবার শেষ চেষ্টা করল।

আজ থাক। দীপা রয়েছে ঘরে।

না দীপা নেই। তার এক বান্ধবীর বাড়ী গেছে। রেবাদের বাড়ী। তাই বলছিলাম, এই বেলা ফোন কর।

ফোন করে কি জিজ্ঞাসা করব?

ছেলে কোন কোম্পানীতে কাজ করে সেটা জিজ্ঞাসা করে নাও। নামটা তো তুমি ভুলে গেছ। তারপর কাউকে দিয়ে খোঁজ করলেই চলবে।

এমনভাবে প্রিয়তোষ উঠল যেন সে ফোনের কাছে নয়, অপারেশন থিয়েটারের দিকে চলেছে ষ্ট্রেচারবাহিত হয়ে।

ফোন শেষ হ'ল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক খুবই আগ্রহ দেখাল। অফুরন্ত কথার স্রোতে প্রিয়তোষকে কাহিল করে দিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর যখন ফোন ছাড়ল, তখন প্রিয়তোষের সারা মুখ বেদনাম্লান, পাণ্ডুর। এমনভাব করল যেন দীপার এ বাড়ী ছেড়ে শশুরবাড়ী যাবার আর মোটেই দেরী নেই।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনটি বিধাতার একেবারে খাস মহলের ব্যাপার। মানুষ হাজার চেষ্টা করেও রদ বদল করতে পারে না।

প্রিয়তোষ পারল না। যথারীতি আশীর্বাদ হয়ে গেল। দু পক্ষের।

দীপাহীন বাড়ী প্রিয়তোষের কাছে যে অরণ্যের সামিল হবে সে কথা যতবার মনে পড়ল, ততবার প্রিয়তোষ মর্মবেদনায় প্রায় পাগল হয়ে উঠল।

ব্যাপারটা সুনীলার চোখ এড়াল না।

নিজের চোখে জল, সেই জল আঁচলে মুছে নিয়ে সুনীলা প্রিয়তোষকে বোঝাবার প্রয়াস করল।

কি পাগলামি করছ? মেয়ের বিয়ে দিতে তো হতই একসময়ে। আগে আর পরে। এমন পাত্র কেউ হাত-ছাড়া করবে! কষ্ট আমার হচ্ছে না? দীপা আমার মেয়ে নয়? আমি কি তোমার মতন ও রকম করে বেড়াচ্ছি?

বিষণ্ণ দুটি চোখ তুলে প্রিয়তোষ সুনীলাকে দেখল, তারপর অন্যদিকে চেয়ে বলল, তোমার তোড়জোড় দেখে তো মনে হচ্ছে না দীপা তোমারও মেয়ে। ওকে তাড়াবার জন্য তুমি যেন কোমর বেঁধে লেগেছ।

তা তো বলবেই।

সুনীলা আর কথা বলতে পারল না। ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তে তাড়াতাড়ি প্রিয়তোষের সামনে থেকে সরে গেল।

অল্প সময়ের জন্য।

নিজেকে সংযত করে আবার সুনীলা ফিরে এল।

মেয়েকে চিরকাল আইবুড়ো রেখে নিজের কাছে রাখার সাধ বুঝি তোমার? চিরকুমারী মেয়েদের দিকে পথে ঘাটে চোখ তুলে চেয়ে দেখেছ কোনদিন? ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চেহারা, গোটা জীবনটাই যেন অর্থহীন। আনন্দ নেই, উচ্ছ্বাস নেই নিজের জীবনটা সংসারের পথে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বিষাদের প্রতিমূর্তি।

সুনীলার কথাগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই বুঝি সীমা এসে হাজির হ'ল একেবারে আচমকা।

সুনীলার বোন সীমা।

উত্তর বিহারের স্বল্পখ্যাত এক শহরের মেয়ে-স্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা। অবিবাহিতা। অবশ্য এই উত্তর-তিরিশে বিবাহের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু যখন বয়স ছিল তখন বিবাহিত-জীবনে সীমার দারুণ এক বিতৃষ্ণা। অধ্যয়নসর্বস্ব মন, অন্য কিছুতে আর কোন ব্যাপারে আকর্ষণের বস্তু খুঁজে পায় নি।

বাপ নেই, শুধু মা। তাঁর পরিমিত সাধ্য অনুযায়ী তিনি পাত্রের অনুসন্ধান করেছিলেন। যোগাড়ও করেছিলেন কিন্তু মেয়ে বেঁকে বসেছিল।

তারপর মা চোখ বুজতেই, সীমা দায় থেকে অব্যাহতি পেল। সুনীলা দু একবার চিঠিপত্রে অনুযোগ অনুরোধ করেছিল, প্রিয়তোষ সম্পর্কোচিত পরিহাস, তারপর সীমা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যেতে এ উপদ্রবও থেমে গিয়েছিল।

সীমা বাড়ীতে পা দিয়েই একটু অপ্রস্তুত হল।

একটা বিয়ের আয়োজন চলছে, সেটা বুঝতে পেরে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত।

কি ব্যাপার তোমাদের বাড়ী ?

দীপার বিয়ে।

বোনকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে যেতে সুনীলা বলল।

ছি, ছি, একেবারে বিনা নিমন্ত্রণে এসে হাজির হলাম।

চুপ কর। মাষ্টারনীর মত কথা বলিস নি। সবে তো আশীর্বাদের পালা চুকল। বিয়ে সামনের মাসের আটাশে। এখনও নিমন্ত্রণ শুরুই হয় নি।

আমি কিন্তু মাস দেড়েক থাকব দিদি। এখানে একটা ইনটারভ্যু আছে। ও মাসের মাঝামাঝি। দু মাসের ছুটি নিয়ে এসেছি।

বাঁচালি। আমি একলা যে কি মুস্কিলেই পড়েছি। সব কেনাকাটা একহাতে করতে হচ্ছে। তোর জামাই বাবু তো বিছানা নিয়েছে।

বিছানা নিয়েছে ?

সীমা অবাককণ্ঠে প্রশ্ন করল।

হ্যা মেয়ের শোকে।

সীমা কিছু বলল না। পথশ্রমে বেশ ক্লান্ত। একেবারে স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কথা হল বিকালের দিকে। চায়ের টেবিলে।

প্রিয়তোষ সীমাকে নিরীক্ষণ করে দেখল। যেখানে থাকে জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। অন্তত কলকাতার চেয়েও অথচ সেই অনুপাতে চেহারায় কোন দীপ্তি নেই! চোখের কোলে কালো রেখা। ঠোঁটের পাশে, গালে প্রসাধন সত্ত্বেও হিজিবিজি আঁচড়েয় দাগ ঢাকা পড়ে নি। শরীরের বাঁধনও বেশ শিথিল।

পরে প্রিয়তোষ সুনীলাকে কথাটা বলেছে।

আচ্ছা সীমার চেহারার কোন জৌলুষ নেই কেন বল তো ? কেমন যেন ক্যাকাসে হয়ে গেছে।

সদ্য-কেনা শাড়িগুলো সুনীলা গুছিয়ে রাখছিল, কাজ থামিয়ে বলল জৌলুষ আর থাকবে কি করে ? আমার চেয়ে বার বছরের মোটে ছোট। আমিই তো শাশুড়ী হতে চললাম। বিয়ে হলে শাঁখায় সিঁদুরে মেয়েমানুষের একটা পরিপূর্ণ রূপ থাকে। সংসারই তো করল না। বয়সকালে তো আর ছাত্রীরা দেখাশোনা করবে না। সেই চিন্তাই মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। শরীরকে কাহিল। মানুষের সব কিছুই তো ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করে।

হয়তো ঠিক কিংবা সীমার মনে কোন গোপন বেদনা থাকাও আশ্চর্য নয়। যার জন্য বিয়ের প্রতি সে বিরূপ।

শুধু নিজের বিয়ের ব্যাপারেও নয়, অন্যলোকের বিয়েতেও তার যেন রীতিমত অনীহা।

সেদিন তার কথাবার্তায় প্রিয়তোষের তাই মনে হল।

বারান্দায় দুজনে বসেছিল। সীমা আর প্রিয়তোষ।

মা আর মেয়ে দোকানে বেরিয়েছে। সীমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে শরীর খারাপের অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছে।

আচ্ছা জামাই বাবু, দীপার এত অল্প বয়সে বিয়ে দিচ্ছেন কেন ?

প্রিয়তোষ বলতে গিয়েছিল, তোমার দিদির শখ, কিন্তু কথাটার অযৌক্তিকতা স্মরণ করে সামলে নিয়ে বলল, অল্প বয়স আর কোথায়, দীপার বয়স কুড়ি হ'ল।

কুড়ি আবার একটা বয়স নাকি? এ বয়সে জীবনকে চেনা যায়?

তা যদি বল, প্রিয়তোষ হাসল, আমার এই যে এত বয়স হল, আমিই কি জীবটাকে চিনতে পেরেছি? একটা জীবনে পুরো জীবন চেনা যায় না।

না, না, ওসব হেঁয়ালী রাখুন। মেয়ে বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সঙ্গী চিনে নেবে সেটাই তো ভাল। এ যা হচ্ছে, এতো জুয়া খেলা। ছেলেটি দেখতে মোটামুটি ভাল আর ভাল চাকরি করে, এইটুকু দেখেই একটা জীবন পণ রেখে আশার ছক ফেলছেন?

প্রিয়তোষ ঠিক বুঝতে পারল না। সীমার কথাগুলো কতটা আন্তরিক আর কতটা পরিহাসসিঞ্চিত।

তাই সে বলল, বয়স অল্প থাকতেই মেয়েদের বিয়ে হওয়া ভাল। তা না হলে জীবনের সঙ্গী বাছতে বাছতে একদিন যৌবন চলে যায়। তখন কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

প্রিয়তোষ স্পষ্ট দেখল, তার উত্তর কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সীমা চমকে উঠল। বিষাদের একটা কালো ছায়া এসে পড়ল মুখের ওপর। দুটি চোখে বেদনার আভা। মনে হল দুটি ঠোঁটও যেন ক্ষণেকের জন্য কেঁপে উঠল।

কথাটা পরে প্রিয়তোষ সুনীলাকে বলেছিল। জীবনের সঙ্গী চিনে নিয়ে তবে বিয়ে করার উপদেশ।

সুনীলা একেবারে আমল দেয় নি!

ও পাগলির কথা ছেড়ে দাও। বয়সে বিয়ে না করলে অনেক রোগ হয়।

কিছুদিন পরেই আত্মীয় স্বজনে বাড়ী ভরে গেল। একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে, দিন কাল মন্দ হলেও প্রিয়তোষ অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখে নি। আত্মীয়, আত্মীয়ের আত্মীয় সবাইকে দরাজ আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর পাড়া-পড়শী অফিসের লোক তো ছিলই।

সুনীলা আপত্তি করেছে।

কি, করছ কি তুমি? একেবারে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করলে যে। দিনকাল কি রকম খেয়াল আছে?

আছে কিন্তু আমার একটি মাত্র সন্তান সে খেয়ালও আছে। এ ধরনের কাজ আমাদের জীবনে তো আর দুবার হবে না। আমায় আশ মিটিয়ে সব কিছু করতে দাও।

এ কথার পর আর কিছু বলা চলে না। সুনীলা কিছু বললও না।

পাত্রপক্ষ বলেছিল, তাদের কিছু প্রয়োজন নেই। মেয়েটিকে তারা পছন্দ করে নিয়েছে, শাঁখা সিঁদুর দিয়ে শুধু মেয়েটিকেই ধরে নেবে।

প্রিয়তোষ হাতযোড় করে হেসেছে।

আমার ওই একটি গুঁড়ো সম্বল। আমার তো একটা আকাঙ্খা আছে।

কাজেই আকাঙ্খা মেটাতে যে সব জিনিস এসে জড় হল দেখে আত্মীয় স্বজনের বুকজ্বালা শুরু হল। পড়শীরা বিস্ফারিত চক্ষু।

প্রেসার কুকার, রেডিয়োগ্রাম, ফ্রিজ, ডিনার সেট, সেলাইয়ের মেসিন, ডুসেট ফার্ণিচার, বেতের আর কাঠের বড় বড় আয়না-আঁটা আলমারি ইত্যাদি। এ ছাড়া মামুলি ঘড়ি বোতাম, কলম তো ছিলই।

আশ্চর্যের কথা সবাই যখন ঝুঁকে পড়ে আসবাবপত্র তারিফ করছে, তখন সীমাকে ধারে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

সে বাড়ীতেই নেই। কোথায় বেরিয়েছে।

বিয়ের দিন কিন্তু সীমাই এগিয়ে এল। দীপাকে সাজাতে।

কথা ছিল সামনের বাড়ীর অতসী সাজাবে। আধুনিকা মেয়ে। ছবি আঁকে, আল্পনা দেয়, গীটার বাজায়। এক কথায় শিল্পী। কাজেই নতুন ধরনের সাজসজ্জার সঙ্গে পরিচিত।

সীমা এগিয়ে আসতে অতসী সরে গেল।

দীপাকে নিয়ে সীমা দরজা বন্ধ করল।

বয়সে অনেক বড় এই মাসীর সম্বন্ধে দীপার মনে ভয় ছিল। গম্ভীর প্রকৃতির জাত-শিক্ষিকা। রসিকতার ধার দিয়েও যায় না। তার ওপর আবার ভূগোলের শিক্ষিকা। সীমার ধারণা গোটা পৃথিবীতে শুধু পাহাড় পর্বত নদী উপত্যকা সাগর মরুভূমি আছে। তারাই মুখ্য। মানুষের ভূমিকা অপ্রধান মানুষ চোখে পড়বার মতন মনে রাখবার মতন বস্তু নয়।

কিন্তু সুটকেশ থেকে সীমা যা সব প্রসাধন দ্রব্য বের করল দেখে দীপার চক্ষুস্থির। ম্যাক্সফাক্টরি বক্স, ভাল বিলাতী ক্রীম, তিন চার রকমের তুলি, দামী ভেসলীন। ঠোঁটের নখের গালের নানা শেডের রং।

প্রসাধন শেষ হ'তে দীপার খোঁপা খুলে সীমা নতুন করে বড় কবরী রচনা করল। পাতলা কাগজে মোড়া গোলাপ কিনে এনেছিল সীমা নিজে। রক্তবর্ণ গোলাপ—গোলাপে সেই কবরী সাজাল।

সব শেষ হতে সীমা যখন দরজা খুলে দিল তখন দরজার কাছে ভীড় করে দাঁড়ানো মেয়ের পাল অবাক।

দু একজনের চোখে ব্যঙ্গের ঝিলিক ছিল, ঠোঁটের প্রান্তে বিদ্রূপের বক্ররেখা, তারা ভেবেছিল দেখা যাক মফঃস্বলের মাষ্টারনীর কেরামতি। দীপাকে দেখে তাদের আর চোখের পলক পড়ল না।

দীপাকে সাজানো শেষ হতে সীমা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

সীমা যখন বের হ'ল, তখন তাকে দেখে সবাই হাসাহাসি শুরু করল।

যে ধরণের প্রসাধন তন্বী-তরুণী দীপাকে মানায়, তা যে উত্তরযৌবন প্রায় স্থূলাঙ্গী সীমাকে কুৎসিত দর্শন করে তোলে এটা সীমার বোঝা উচিত ছিল।

তা ছাড়া প্রসাধন শেষ করে বের হবার আগে সীমা কি দর্পণে নিজের প্রতিচ্ছায়ার দিকে একবার চোখ ফেরায় নি? কাজলে রুজে ক্রীমে ভেসলিনে যৌবনকে ফিরিয়ে আনবার এই হাস্যকর ব্যর্থতা দেখে সে তাহলে নিজেই লজ্জিত হত।

এমন অবস্থা যে আড়ালে পেয়ে সুনীলাই একবার বলল, বলে ফেলল, তুই না কনের মাসী, তুই এত সেজেছিস কেন? বলবে কি লোকে?

সীমা দিদির কথায় ভ্রূক্ষেপও করল না। একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েই আবার সহজ হয়ে গেল।

কিন্তু চলতে ফিরতে লোকের টিটকারি তার কানে গেল। যারা তাকে চেনে না, এ বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কের স্বরূপটা জানে না, তারা পরিহাসে মুখর হয়ে উঠল।

পরের দিন সানাইয়ের বিষণ্ণ সুরের সঙ্গে বাড়ীর লোকগুলোরও মনের সুরও মিশে এক হয়ে গেল।

এতদিন সুনীলা বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল, কিন্তু সকাল থেকে বারবার আঁচলে চোখ মুছতে লাগল। ও যেন সামনের কিছু স্পষ্ট নয়, ঝাপসা, ঘোলাটে।

প্রিয়তোষ ছাদে। সেখানে ডেকরেটরের লোকরা সামিয়ানা খুলছে, কাজ দেখার ছুতোয় সেখানে গিয়ে বসে আছে।

দু তলায় অনেক অসুবিধা। চলতে ফিরতে দীপার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবে, তারপর দীপার হাজার জিনিস সারা বাড়ীতে ছড়ানো, তার স্মৃতি অতিক্রম করা অসম্ভব। তার ওপর সবাই মিলে অনুষ্ঠান করে দীপাকে এ বাড়ী থেকে সরিয়ে দেবার যে ষড়যন্ত্র করছে তার নিদর্শন চারদিকে সুস্পষ্ট।

কিন্তু বেশীক্ষণ পালিয়ে থাকা সম্ভব হল না। প্রিয়তোষকে নীচে নামতে হ'ল।

সব চেয়ে নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান তখনও বাকি।

দীপা সব ঋণ শোধ করে দিয়ে চলে যাবে। চাল আর অর্থ দিয়ে সব স্নেহ, সব মায়ামমতার বন্ধন ছিন্ন করে দেবার নির্মম প্রহসন।

কিছুটা উচ্চারণ করে দীপাও আর পারল না। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে আঁচলে মুখ ঢাকল।

তার আগেই প্রিয়তোষ মেঝের ওপর বসে পড়েছে। দু হাতে মুখ ঢেকে। আত্মীয়েরা প্রিয়তোষকে ধরে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল।

একটু দূরেই সীমা দাঁড়িয়েছিল।

তার দৃষ্টি রোরুদ্যমান সুনীলা কিংবা প্রিয়তোষের দিকে নয়। সে নির্নিমেষনেত্রে বর-বধূর দিকে চেয়ে ছিল।

বরের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়। লাজুক, গৌর বর্ণ চেহারার সুশ্রী তরুণ। অবিন্যস্ত চুল। সারা মুখে চন্দনরেখা। ক্লান্তিতে দুটি চোখে যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। হয়তো রাত্রি জাগরণেও।

তার পাশে দীপাকেও নববধূবেশে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সীমা সরে এল। বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

বর বধূ বিদায় হবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে ভেঙে পড়ল। সুনীলা আর প্রিয়তোষ।

প্রিয়তোষ আগেই খাটের ওপর শুয়ে পড়েছিল।

মোটর গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সুনীলা কৌচের ওপর বসে পড়ল।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা সবাই চলে গিয়েছিল। কাছের যারা তারা বাধা দিল না। কাছে এল না। ভাবল, কাঁদুক। কাঁদলে মনের ভার অনেক কমে যাবে। একটি মাত্র সন্তান পর হয়ে গেলে কষ্ট তো হবেই।

প্রথমে সুনীলা উঠে পড়ল। বসে বসে কাঁদলে তার চলবে না। এখনও অনেক কাজ বাকি। কিছু আত্মীয় স্বজন এখনও রয়ে গিয়েছে। তাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রিয়তোষের ঘরের দিকে এগিয়েই সুনীলা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এ ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে কে কাঁদছে।

চৌকাট পার হয়েই দেখল প্রিয়তোষ খাটের ওপর উঠে বসেছে। কান্নার শব্দ তারও কানে গিয়েছে।

সুনীলাকে দেখে প্রিয়তোষ বলল, একি তুমি নও। আমি ভাবলাম তুমি। তা হলে কে কাঁদছে এমন ভাবে?

খুব মৃদু কণ্ঠে সুনীলা বলল, সীমা। সীমা কাঁদছে।

আহা, দীপাকে সীমা খুবই ভালবাসত। নিজের হাতে ওকে সাজিয়ে দিয়েছিল। আমি কাল দেখেছি, বাসর-ঘরে অনেকবার উঁকি দিয়ে দেখছিল দুজনকে। তাছাড়া চিঠিপত্রেও সব সময় দীপার কথা লিখত।

শেষদিকে প্রিয়তোষের গলার স্বর ভারি হয়ে উঠল।

চল সীমার কাছে যাই।

প্রিয়তোষ খাট থেকে নেমে এসে দাঁড়াল।

একেবারে কোণের ঘরে সীমা থাকে।

ঘরে আলো জ্বলছে। খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে সীমা ফুলে ফুলে কাঁদছে। খোপা ভেঙে চুল খুলে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। অবিন্যস্ত বেশবাস। মনে হয় অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে। গলা প্রায় ভেঙে গিয়েছে।

খাটের ওপর একটা ছবি।

প্রিয়তোষ চাপাগলায় সুনীলাকে বলল, ওই দেখ দীপার ছবিটা রয়েছে খাটের ওপর। ছবি দেখছে অ কাঁদছে। আহা! ওই একটি বোনঝি। খুব ভালবাসত। তুমি যাও, বোঝাও ওকে।

প্রিয়তোষ আর দাঁড়াল না দাঁড়াতে পারল না। নিজের গাল বেয়ে নতুন করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তেই এ রকম ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

পা টিপে টিপে সুনীলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সীমার কাছে গিয়ে তার পিঠে একটা হাত রে ছবিটা তুলেই চমকে উঠল।

না, এতো দীপার ছবি নয়। সীমার নিজের ছবি। দীপার মতন যখন বয়স ছিল, তখনকার হাস্যময়ী নারী যৌবনই যখন সৌন্দর্য।

দীপার পিঠ থেকে সুনীলা হাতটা সরিয়ে নিল। এ শোকে সান্ত্বনা দেবার তার শক্তি নেই।
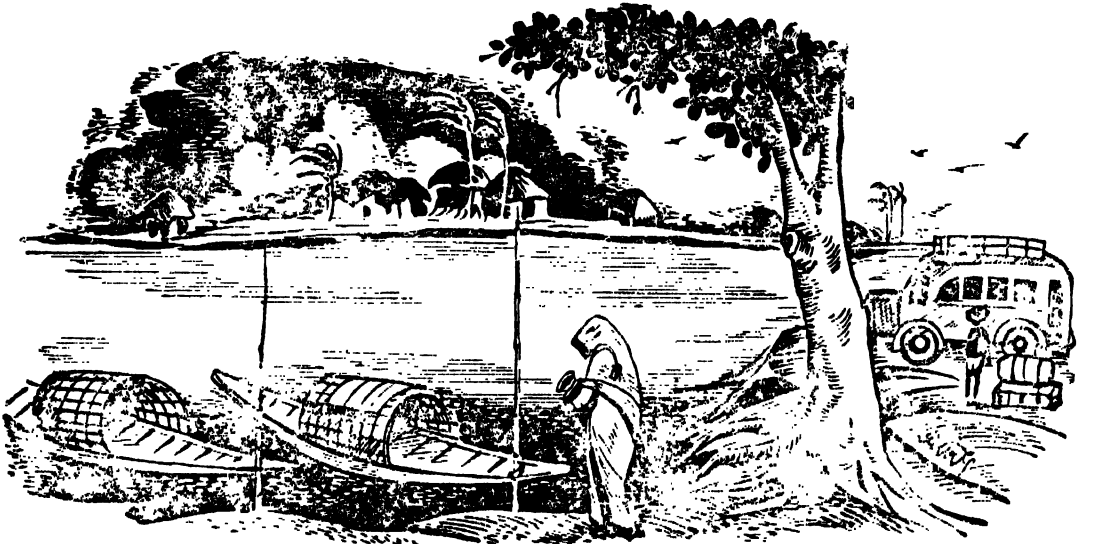
ট্রেনে ঘণ্টাখানেক

-সরোজকুমার রায়চৌধুরী

এই লোকাল ট্রেনটি এ লাইনের শেষ গাড়ী। ছাড়ে রাত্রি আটটায়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছায় রাত্রি একটায়। রাং এটিতে বেশী যাতায়াত করেন তাঁরাই যাঁরা প্রায় দৈনিক যাত্রী বললেই হয়। সুতরাং এই ট্রেনের াদের অনেকেরই অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে এবং অধিকাংশের সঙ্গেই মুখ-চেনাচেনি আছে। গাড়ীতে ভীড় । তবে অন্য ট্রেনগুলির মত নয়। অসময়ের ট্রেনে সাধারণতঃ সেরকম ভীড় হয় সেই রকমই।

সেদিন কিন্তু এর ব্যতিক্রম হল। সেদিন একটা বিবাহের দিন ছিল। বাইরের থেকে বহু বরযাত্রী লকাতায় এসেছিলেন। কোলকাতায় বরযাত্রীদের রাত্রে থাকবার ব্যবস্থা থাকে না। বাইরের থেকে যাঁরা াত্রী অথবা কন্যাযাত্রী হয়ে আসেন এইটেই তাঁদের ফেরবার গাড়ী। সুতরাং গাড়ীটি প্লাটফর্মে আসবামাত্রই ক কামরা ভর্ত্তি হয়ে গেল। যাঁরা আগে ঢুকতে পারলেন, তাঁরা বসবার জায়গা পেলেন। অন্যেরা প্রবেশ-আটকে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ ট্রেনটি দাঁড়িয়ে রইল গরমের চোটে সকলেই ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো। া ছাড়তে একটুখানি বাতাস এলো, সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এতক্ষণ পরে যাত্রীদের কথা বলবার জ এলো। পরস্পরের মুখের দিকে চাইবার সময় হলো। পরিচিতদের মধ্যে একটুখানি হাস্য-বিনিময় হলো।

এমনি একটি রেলের কামরা।

এক কোণে খদ্দরের দোপদুরস্ত পাঞ্জাবী-পরা একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাওয়ার স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে হাতের র কাগজখানি মুখের সামনে তুলে ধরলেন। এমন ভাবে তুলে ধরলেন যে, তা খবর পড়বার জন্যে, না র সৌম্য মুখখানি আড়াল করবার জন্য ঠিক বোঝা গেল না।

ইতিমধ্যে পাশের বেঞ্চে কথাবার্ত্তা শুরু হলো। প্রৌঢ় ভদ্রোলোকটি পাশের বেঞ্চে যে যুবকটি বসেছিল লক্ষ্য করে দূর থেকে অন্য একটি যুবক প্রশ্ন করলে, সরিৎ বাবু যে! বাড়ী?

—হ্যাঁ।

—পৌঁছবেন তো সাড়ে বারোটায়।

—কী আর করা যায়! আগের ট্রেনটা পাঁচ মিনিটের জন্য ফেল করলাম। এখন এইটাই শেষ সম্বল।

সরিৎ হাসলে।

— কিন্তু কাজটা ভালো করলেন না। দেখবেন, ডাকাতের মুখে গিয়ে পড়বেন না যেন!

ডাকাত!

সকলের দৃষ্টি সরিতের দিকে নিবদ্ধ হল। সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, ডাকাত কী মশাই?

যুবকটি সগর্বে বললে, দস্তুরমত ডাকাত মশাই। চুরি-চামারি নয় মশায়। রীতিমত মশাল জ্বালিয়ে বন্দুক-রিভালবার-বোমা নিয়ে ডাকাতি।

শুনে সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বহুকণ্ঠে নানা প্রশ্ন একসঙ্গে ধ্বনিত হল: কবে? কোথায়? কী করে হলো?

সরিতের মেজাজ ভারিক্কী হয়ে উঠলো। ঝেড়ে ঝুড়ে সোজা হয়ে বসে সমবেত সকলের মুখের দিকে গম্ভীর ভাবে চাইলে।

বললে, দিন চারেক আগের ঘটনা।

—কতজন ডাকাত এসেছিল?

— তা জন-বিশেক হবে। গুণে তো আর দেখিনি। আন্দাজে মনে হয়।

— আপনি গিয়েছিলেন?

—যাব না তো, কী মশাই। বলতে গেলে আমার পাশের বাড়ী। আমার বাড়ীর পরে একটা মাঠ, তার ওপারেই সে বাড়ী, সেই বাড়ীতেই ডাকাত পড়লো। আমি তো প্রথমে টের পেলাম। আমার চিৎকারেই তো লোকজন জড় হলো।

সরিৎ আর একবার সগর্বে সকলের মুখের দিকে চাইলে।

—আপনিই প্রথম টের পেলেন? কী করে টের পেলেন?

প্রশ্ন শুনে সরিৎ কেন, অনেকেই হেসে ফেললে।

—শুনছেন ডাকাত। ডাকাত তো আর ছিঁচকে চোরের মত নিঃশব্দে আসে না। রে-রে শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখি আগুন! আগুন কিরে বাবা! ভালো করে চেয়ে দেখি, আগুন নয়, আলো। গোটা পাঁচ ছয় মশালের আলো। সদর দরজায় দমাদম ঘা পড়ছে। বাড়ীর লোকেদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও আর্তনাদ করে উঠলাম। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েও এলাম। দেখতে দেখতে বহু লোক জুটে গেল।

—আর ডাকাতরা?

— তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই। তারা একটার পর একটা দরজা ভাঙছে আর 'রে-রে' চিৎকার করছে। বাইরে একদল ডাকাত লাঠি খেলছে। তাঁদের লাঠির বোঁ-বোঁ, শন-শন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। বাড়ীর ভিতর থেকে ডাকাতদের গর্জন আর বাড়ীর লোকদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

—বাইরে তখন কত লোক জুটে গেছে?

—তা তিন-চারশোর কম হবে না। পাঁচ-ছয়শোও হতে পারে। বলতে গেলে গোটা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিল।

একজন পরিহাস করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের গ্রামে কি মোট পাঁচ-ছয়শো লোক? খুব ছোট গ্রাম তো।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সরিৎ বললে, ছোট হবে কেন মশায়? আমাদের গ্রামের লোক-সংখ্যা চার হাজারের কম নয়।

লোকটি পুনরায় পরিহাস করে বললে, চার হাজার লোকের মধ্যে মাত্র চারশো এসে জুটলো !

সরিৎ আরও রেগে গেল : আর কত জুটবে মশাই ? চার হাজার লোকের মধ্যে স্ত্রীলোক নেই ? শিশু নেই ? বৃদ্ধ নেই ? তারপরে কিছু লোক নিজের বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। নিজের বাড়ী অরক্ষিত ফেলে আসাও তো যায় না।

একটু থেমে সরিৎ বললে, তাছাড়া গাঁয়ের মধ্যে দুটি দল। ওপাড়ার লোকরা আসেই না। তারা নিজের নিজের দ্বারে বসে মজা দেখছিলো।

– তাই বলুন মশাই। গ্রামের মধ্যে দুটি দল আছে।

—সেতো সব গ্রামেই থাকে।

—কিন্তু যে চার-পাঁচশো লোক জুটেছিল, তারা কি করছিলো ?

তারা আর কি করবে মশাই। ভদ্রলোকে ডাকাতের মহড়া নিতে পারে ? তারা ডাকাত-ডাকাত করে চেঁচাচ্ছিল।

—কিন্তু ডাকাত তো বলছেন মোট কুড়ি-পঁচিশ জন ছিলো।

প্রশ্নকর্তা তাঁকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরিৎ বুঝতে পারলে না। বললে, তার বেশী হবে না।

—আশ্চর্য করলেন মশাই। চারশো লোক আর কুড়িজন ডাকাত ! আপনারা ডাকাতদের কিছু করতে পারলেন না ! কারো হাতে বন্দুক ছিলো না ?

সরিৎ বললে একজনের একটা বন্দুক ছিলো। সেটা তিনি নিয়েও এসেছিলেন।

- তারপরে ?

- কিন্তু গুলি ছুড়তে সাহস করলেন না।

—কেন ?

—পুলিশ হাঙ্গামার ভয়ে। সবাই তাঁকে গুলি ছোঁড়বার জন্য চাপও দিয়েছিল। তিনি বললেন, গুলি ছোড়ার অনেক বখেরা। তোমরা তো জান না, আমার গুলিতে ডাকাত মরবে না, মরবো আমি।

কয়েকজন হো-হো করে হেসে উঠলো : তাঁকে কি নিজের দিকে তাক্ করে গুলি ছুঁড়তে বলেছিলো ?

– না, মশাই। অন্ধকারে তাক্ করা কঠিন। গুলি হয়তো ফসকে যাবে। পরদিন সকালে পুলিশ এসে বন্দুকটি নিয়ে যেতো, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেতো বন্দুকের মালিককে। সেই পরদিনের কথা ভেবে তিনি গুলি ছুঁড়তে রাজি হননি।

—বেশ করেছিলেন। ডাকাতরা কিছু পেয়েছিলো ?

—তা মন্দ পায়নি। নগদে-গহনায় হাজার দশেক টাকার জিনিষ লুঠ করে নিয়েছে।

অতঃপর গবেষণা শুরু হলো :

মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাতের কথা। সতেরোজন অশ্বারোহী সৈনিক এসে নবদ্বীপ জয় করে নিলেন। কেউ বাধা দিলেন না। সবাই নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে দেখলে। রাজা লক্ষ্মণ সেন খেতে বসেছিলেন। তিনি আর হাত-মুখ ধোবার সময় পেলেন না। সুরঙ্গ পথে পলায়ন করলেন।

একজন বললেন, মিথ্যে কথা। বৃদ্ধ হলেও লক্ষ্মণ সেন বীর ছিলেন। বিনা যুদ্ধে রাজ্য ছেড়ে তিনি পলায়ন করবেন এ হতেই পারে না।

আর একজন বললেন, ধরে নেওয়া গেল তিনি কাপুরুষ ছিলেন। তার সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। জ্যোতিষিরা তাঁকে ভুল বুঝিয়েছিলেন। কিন্তু রাজধানী নবদ্বীপের বাইরে যে বিরাট বাংলা দেশ তার জনসাধারণ মাত্র সতেরোজন অশ্বারোহীর প্রভুত্ব বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে, এ কি সম্ভব ?

—কখনই না।

– এসব বানান গল্প, ঐতিহাসিকদের কারসাজি।

শান্ত কণ্ঠে অন্য একজন যাত্রী বললেন, খুব সম্ভব। আপনাদের যুক্তি আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু এই ঘটনাটিকে কী বলবেন ? ঐতিহাসিকের কারসাজি ?

—কোন্ ঘটনাটিকে ?

—ওঁদের গ্রামে ডাকাতির যে ঘটনা বললেন, আমি তারই কথা বলছি। একদিকে কুড়ি-পঁচিশজন ডাকাত, তাদের হাতে নানা রকম অস্ত্র। কিন্তু অন্য দিকেও সবিশেস লোক। তাদেরও হাতে লাঠি-বর্শা ছিল। একজনের হাতে একটি বন্দুকও ছিল। অথচ এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডাকাতদের চিৎকার এবং গৃহস্থের আর্তনাদ শুনলে। কিছু করলে না, এও সম্ভব হলো।

সরিৎ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লো। সে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলো, কেন ডাকাতদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রথমতঃ ঘোর অমাবস্যার রাত্রি। দ্বিতীয়তঃ ডাকাতদের ভয়ঙ্কর গর্জন। তাদের লাঠির শনশন শব্দ। তারপরে তারা জনতাকে লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে বোমা ছুঁড়ছে।

—বোমা, না পটকা ?

সরিৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, অন্ধকারে তা তো বোঝা যাচ্ছিল না মশাই। তবে আওয়াজ বোমার মতই।

—কেউ জখম হয়েছিলো ?

—জখম হবে কি করে ? অনেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। বোমার জন্যই লোকেরা এগুতে সাহস করছিলো না।

যে লোকটির প্রশ্নে ডাকাতির প্রসঙ্গ অবতারণা হয়েছিল, এতক্ষণ সে চুপ করে ছিল। কোন পক্ষেই যোগ দেয়নি। এখন বললে আরও একটি কারণ ছিল। আমার মনে হয় সেটাই সবচেয়ে বড় কারণ।

—কী কারণ ?

—কে আগে এগুবে তারই জন্যে সবাই অপেক্ষা করছিলো। আগে এগুনোটাই শক্ত। পৃষ্ঠ-রক্ষার লোকের অভাব হয় না। আমার মনে হয়, ঐ জনতার মধ্যে আগে এগোবার লোকের অভাব ছিল।

—ছিলই তো। আগে এগুনো মানে প্রাণ দেবার জন্য তৈরী হওয়া। তাতে কেউ সহজে রাজি হতে চায় না।

—যা বলেছেন মশাই !

সরিৎ দমক দিয়ে বললে, আস্তুন মশাই। যা জানেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না। আমাদের গ্রামের লোক ভীতু নয়। কয়েকজন বিখ্যাত কুস্তিগীর আছেন। কয়েকজন লাঠি-খেলোয়াড়ও আছেন। কিন্তু হলে হবে কি—

—সেই কথাই তো বলছি সবাই। কিন্তু হলে হবে কী; শেষ পর্যন্ত ডাকাতরা বাড়ী লুঠ করে নির্ব্বিবাদে পালিয়ে গেল।

সরিৎ এবার পাল্টা আক্রমণ করলে : আপনাদের গ্রাম হলে কি করতেন মশাই ?

ট্রেণ ঘস্ করে ষ্টেশনে থামলো।

ব্যাণ্ডেল ! ব্যাণ্ডেল !

—বেশী যাত্রী এইখানে নেমে পড়লো এবং তারা সবাই উঠে দাঁড়ালো। খদ্দরের পোষাক পরা, সৌম্য দর্শন ভদ্রলোকটি খবরের কাগজখানি মুড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসতে হাসতে বললেন, আপনারা যা করেছেন ওঁরাও তাই করতেন। খবরে কাগজে মুখ ঢাকা থাকা কেউ ভদ্রলোককে এতক্ষণ চিনতে পারেননি। সাবাই তাঁর মুখের দিকে চাইলো। অধ্যাপক বসু।

অধ্যাপক বললেন, তোমার গল্পটি চমৎকার উপভোগ করা গেল।

সরিৎ ক্রুদ্ধভাবে বললে, এটাকে আপনি গল্প মনে করলেন স্যার ? বিশ্বাস হলো না ?

অধ্যাপক বললেন, কেন বিশ্বাস হবে না ? গল্প বিশ্বাস করি বলেই তো আমরা পড়ি। কিন্তু আমি সত্যি-মিথ্যের কথা বলছি না। উপভোগ করলাম এইজন্যে যে, এতখানি পথ এলাম, কিন্তু সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টের পেলাম না।

অধ্যাপক নেমে গেলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে। কামরা অনেকটা খালি হয়ে গেল।

ট্রেণ ছাড়তে একজন সনিষ্ঠভাবে সরিতের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে : যেটা বললেন ওটা কী গল্প ?

– গল্প হবে কেন ? সত্যি ঘটনা।

— তবে অধ্যাপক যে বললেন গল্প।

সরিৎ বললে, কেন বললেন উনিই জানেন। অধ্যাপকদের কথা যদি বুঝতে পারবো তবে আর ভাবনা ছিলো কী ?

মেঘালোকে ॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ওরা আবার সেই জায়গাটাতে এসেছে, পুলিন আর শীলা। এর আগের বার এসেছিল দোলের ছুটিতে. লোভ লেগে গেছে জায়গাটার ওপর। সেবারেই ঠিক করে গিয়েছিল বর্ষাতেও একবার আসবে।

প্রস্তাবটা ছিল পুলিনের। ওর সব প্রস্তাবেই শীলার মনের সমর্থন থাকলেও মুখের থাকবে না, একটা যেন নিয়মই দাঁড়িয়ে গেছে। আপত্তি করেছিল—"আবার সেই একই জায়গা ?"

"ভালো কোন জিনিসই একবারে শেষ হয়ে যায় না শীলা।"

—এমনভাবে মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে বলেছিল, বলা স্বভাবও পুলিনের যে, শীলা আর ও নিয়ে কথা বাড়ায় নি। বাড়াতে গেলেই তো একরাশ 'কাব্যি'; জ্বালাতন হয়ে পড়ে শীলা।

তবু বলতে হয়েছিল

"এবার কিন্তু তোমার সেই প্যারিসের গাউন নিয়ে যেতে পারবে না বলছি। তাহলে আমায় পাবে না। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারের এক উদ্ভুটে পোষাক।"

"এবারেও হবে দূরেরই পাল্লা শীলা।"—চোখ তুলে একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল পুলিন। দৃষ্টি যেন কত দূরেই না পাঠিয়ে দিয়ে। বলেছিল—"পোষাক নয়, সাত পাহাড় তের নদী পেরিয়ে যাত্রা।"

"সে আবার কি ?—প্রশ্ন করেছিল শীলা।

উত্তর হয়েছিল– "থাকনা সেদিনের জন্যই, বাসী করে দিয়ে কি হবে ?"

তর্ক তুলেছিল শীলা—"কিন্তু এই তো বলা হোল, ভালো জিনিস বাসী হয় না।"

"তেমনি বাসী জিনিস আবার ভালোও তো হয় না।"—দুষ্টা মর হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিল পুলিন।

ওর ওই প্যাঁচালো তর্কগুলো সহ্য হয় না শীলার। রাগ করে বলেছিল—"না শুনতে চাও তো থাক্।"

তারপর ও বেচারির যা অস্ত্র, মান করে মুখ ঘুরিয়ে থাকা। কিন্তু বড় বড় মানেরই আয়ুর ঠিক থাকে না, এতো তুচ্ছ কথার তুচ্ছ মান, নিত্য হচ্ছে, নিত্যই যাচ্ছে।

কাল এসেছে ওরা। সদল বলেই সেবারের মতো ওরা দু'জন, বাঁকুড়ার পাচক-ঠাকুর সদানন্দ, বেহারী ঝি ঝুমরী, তার স্বামী রামলগন। ঝুমরীকে আনবার ইচ্ছা ছিল না শীলার। মেয়েটার আর সবই ভালো, তবে

কেমন একটা বদ অভ্যাস, বাঙালীদের নকল করবে। বিশেষ করে এরা ছুটিতে যদি একত্র হোল, ও নিশ্চয় আসেপাশে কোথাও থাকেই কিছু একটা কাজ হাতে নিয়ে। বাংলা জানে, আরও যেন কেমন লাগে। বাড়িতে বেশি লোকের মধ্যে সুবিধে করতে পারে না, কিন্তু বাইরে গেলেই ওর মরশুম পড়ে যায়।

সেবারে এখানেই তো হাতে নাতে ধরা পড়ল।

কিন্তু ও না এলে রামলগন আবার একটা কাঠের গুঁড়ি মাত্র। কাজ করবে কি, নিজেই একটা মূর্তিমান অকাজ।

কাল দলবল নিয়ে ভোরের ট্রেনে নামল ওরা। তারপর কিছুক্ষণ বাদেই এক কাণ্ড। বিশ্বাস করতেই চায় না শীলা যে, ওরা আবার সেই জায়গাতেই এসেছে, কাণ্ডই বলতে হয় বৈকি।

সকালে স্নান সেরে বাইরের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে শীলার জন্য অপেক্ষা করছিল পুলিন, ও এলে প্রাতরাশ সেরে কাছাকাছি থেকে একটু বেড়িয়ে আসবে। সামনের দৃশ্যের ওপর দৃষ্টি ফেলে একটু অন্যমনস্কই হয়ে গেছে, হঠাৎ শীলার কণ্ঠেই চকিত হয়ে উঠল—"হ্যাঁগা···শুনচ?"

ফিরে দ্যাখে পেছনে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে সেও শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। প্রশ্ন করল —"কিছু বলবে?···অমন করে দেখছ কি?"

বিহ্বলভাবে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু দেখলই শীলা, বলল —"বলছিলাম - বলছিলাম—এবারে আমরা আবার এ কোন জায়গায় এলাম বলতো?"

"কোন্ জায়গায় আবার আসব!"—কৌতূহল ভরে একটু হেসে উত্তর করল পুলিন। বলল—"দ্যাখো তো কাণ্ড! সেই বাড়িই তো। আর তুমিই না আমায় ঘুম থেকে তুললে ষ্টেশনের নাম পড়ে, বললে, এসে গেছি আমরা?"

"না বাপু, আমার যেন মনে হচ্ছে—স্বপ্ন দেখছি নাতো?"—

—ওর স্বপ্নালু চোখ দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলেই চলল তেমনি ভাবে —"খানিকটা সেই—খানিকটা আবার··· স্বপ্নে যে সব মিলে মিশে কি রকম হয়ে যায়।···"

"তাহলে স্বপ্নই দ্যাখো।"—ওর মুখের দিকে চেয়ে আর একটু হেসে বলল পুলিন। শীলার এ রূপটি বড় ভালো লাগে ওর। হঠাৎ এক এক সময় এই রকম কোনও একটা পরিস্থিতির সামনে এসে যেন ছেলে মানুষ হয়ে যায়, ছেলে মানুষের মতোই অকৃত্রিম বিস্ময়, অকৃত্রিম অবিশ্বাস নিয়ে। ভালো লাগে বলেই স্বপ্ন ভাঙবার চেষ্টা না করে চেয়েছিল মুখের পানে, একটু চোখের কোণে নজর পড়ে যেতে শীলার মুখটা রাঙা হয়ে উঠল, ও-ও তো চেনে স্বামীকে। কিছু একটা বলে জড়িমার ভাবটা সামলে নিতে যাচ্ছিল, পুলিন বলল—"বুঝেছি, এসো, বোস।"

পাশের চেয়ারটা একটু ঠেলে দিল। শীলা এসে একটু জড়সড় হয়ে বসল। নিজের ভুলের জন্য ততটা য়, যতটা স্বীকার দৃষ্টিতে নিজেকে দ্রষ্টব্য করে তোলার জন্য খানিকক্ষণ ধরে।

পুলিন বলল—"সেবার তোমায় বলিনি—ভালো জিনিস একবারেতেই পুরনো হয়ে যায় না? দেখলে তো? 'থচ কিছুই নয়, এই ক'দিনের মধ্যে যে হাল্কা ক'টা বৃষ্টি হয়ে গেল—এদিকে পাহাড় অঞ্চলে হয়তো একটু বেশী···"

রামলগন ট্রেতে করে চা আর খাবার নিয়ে এল। পুলিন বলল—"চলো খেয়ে নিয়ে কাছে-পিঠে থেকে একটু বেড়িয়ে আসিগে।"

সেই ছেলেমানুষী বিমূঢ় ভাবটা অবশ্য গেছে শীলার, তবে দৃষ্টি থেকে স্বপ্নটা যেন নেমে যেতে চাইছে না। গল্প করতে করতে চলেছে ওরা। গল্প এক তরফাই, শীলা এক রকম শুধু নীরব শ্রোত্রী, স্বামী যা বলছে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ঢেউ-খেলানো জমির ওপর দিয়ে চলতে চলতে। সত্যি, এখনো আষাঢ় মাস পড়ল না, জ্যৈষ্ঠ শেষের গোটা দুইবার লঘু বর্ষণেই কত পরিবর্ত্তন, ফাগুনের সেই রুক্ষতার ওপর চারিদিকেই এমন একটা ফিকে সবুজের প্রলেপ পড়ে গেল যে দৃষ্টিবিভ্রম না হয়েই পারে না। সেই কথাই বলছে শীলা "হ্যাঁগা, তা আমারই বা কি দোষ বলো। এই সেদিনের কথাই তো, চোৎ, বোশেখ, জষ্টি—যাওয়া যায় না, একটু যদি রোদ কড়া হয়ে উঠল—চোখ যেন ঠিকরে পড়ে পাহাড় আর কাঁকুরে জমির ওপর থেকে—আর আজ যেন ফেরাইতেই পারা যায় না চোখ—যেদিকেই চাও, সবুজ, সবুজ আর সবুজ। চলছি, সেই মাটিই, অথচ মনে হচ্ছে যেন সবটুকু মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলি, কত তফাৎ যে সেদিনে আর এদিনে…"

"বসন্তকে একেবারে অত নামিয়ে দিও না শীলা। আজ কোথায় সেই রঙের ছড়াছড়ি? যে দিকেই চাও, দূরে, কাছে—হয় পলাশ, না হয় শিমুল, না হয় সোঁদাল। গৌরীনাথ পাহাড়টাকে নীচে থেকে নিয়ে ওপর পর্য্যন্ত যেন জলন্ত আগুনের শিখা করে রাখত যে মিঠে গন্ধ—মহুয়ার, শাল মঞ্জরীর, কত রকম নাম না জানা ফুলের, তাই বা কোথায়? আর সেই রকম একটি রাত,—মনে আছে শীলা? ভরা জ্যোৎস্নায় রুকসা নদীর বালির চড়ায় সেই আমরা আমাদের ফুলশয্যার রাতটাকে না ফিরিয়ে এনে পারলাম না। বসন্ত ছাড়া, বলছি, এখানকার বসন্ত ছাড়া এত বড় একটা দান আর কোন ঋতুটার হাতে থাকতে পারে বলো?"

"সত্যি।"

—যেন আপনিই বেরিয়ে গেল কথাট শীলার মুখ দিয়ে। হয়তো সেই রাত্রিটুকুর স্মৃতিতেই, তবে একটু সামলে নিয়ে বলল—"বলছিলাম—সত্যি, সে সময়ের সে রঙের রাজত্ব—সে এক দেখবার জিনিস বটে—যে দিকে চোখ ফেরানো যায়, আটকে আটকে যায় যেন।"

মাঝে মাঝে নীরবও হয়ে পড়ছে দুজনেই। এমনই অভিভূত; তার ওপর জায়গায় জায়গায় সবারের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠে আরও যেন সজীব করে দিচ্ছে সমস্তটুকু।

"কি জান শীলা?"—আবার আরম্ভ করে পুলিন—"পাহাড় অঞ্চল, বিশেষ করে এই ধরণের পাহাড়—কিছু পাহাড়, কিছু খোলা-মেলা ঢেউ খেলানো মাঠ—বর্ষা আর বসন্ত, দুটো ঋতুতেই এদের বাহার খুব খোলে। বসন্তের কথা তো বললামই, বর্ষাতে সবুজের মায়া তো রয়েছেই, যার জন্যে অমন ধোঁকাতেই পড়ে গিয়েছিলে তুমি—তাছাড় থাকে জলের খেলা। পাহাড়ে নদীর রূপ তো যায়ই খুলে, এর ওপর একটু যদি বৃষ্টি হোল তো এখানে-সেখানে—নাবাল জমি আর খোয়াই বেয়ে কাতারে কাতারে ছোট ছোট নদীর দল ওঠে জেগে। তাদের আয়ু অল্প, কিন্তু যতটুকু থাকে কলকল কুলকুল শব্দে সমস্ত অঞ্চলটা জাগিয়ে তোলে…"

হয়তো এসে পড়েছে এমনি এক খোয়াই-এর সামনে। দাঁড়িয়ে পড়ে আথে একটু ছেলেবেলার কৌতূহল নিয়ে, তারপর পাশ কাটিয়ে এগোয় আবার। আবেশ ভরে আবার আরম্ভ করে পুলিন—'সে কথা যদি বলো তো ছটা ঋতুর মধ্যে বর্ষা আর বসন্ত, এ দুটো হচ্ছেও সব থেকে সেরা, বিশেষ করে কবিদের দৃষ্টিতে, রবীন্দ্রনাথ তাই এ দুটো নিয়ে যত কবিতা লিখেছেন, যত গান লিখেছেন…"

"শরৎ নিয়েও নয়কি?"—যোগ দেয় একটু শীলা।

"হ্যাঁ, শরৎকাল নিয়েও বৈকি।"—স্বীকার করে পুলিন। বলে—"কিন্তু কেন, তা একটু ভেবে দেখেছ? ঐ দুটো ঋতুর খানিকটা করে ছোঁওয়া রয়েছে বলে নয়কি? ফুলের-মেলা বসন্তের পর শরতেই বেশি। আর-মেঘে

রোদে শরতের যা রূপ খোলে সে তো বর্ষারই এক নতুন রূপ। এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে, সেটা আমার মনে হয় কাব্যের দিক দিয়ে না দেখাই ভালো।"

মুখে একটু হাসি ফোটে বলেই শীলা জিজ্ঞেস করে—"কেন ?"

"শীতটা বড্ড খারাপ সময় বাপু, যে যতই প্রশংসা করুক।"—হঠাৎ যেন শীতের স্মৃতিতেই গাটা একটু গুটিয়ে নেয় পুলিন। বলে—"কতটা ওর ভয়েই, গা শিরশির করছে অথচ এখনও পুরোপুরি এসে পড়েনি—এর খুশিতেই শরৎটা লাগে ভালো, তারপর বসন্তের তো কথাই নেই—অমন জবুথবু করা বেরসিক ঋতুটার দাপট এখন গেছে···"

"আমি এবার শীতে বাপের বাড়ি গিয়েই থাকবো বেশ"- কথাটা বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে খিলখিল করে হেসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা।

একটু চকিত হয়ে পুলিনও দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করল—"কি হোল ?" তারপর কথাটার ইংগিতটুকু নিজ হতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে ওর মুখেও আস্তে আস্তে হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতেই বধূর পিঠে হাত দিয়ে বলল—"খালি দুষ্টু বুদ্ধি। চলো এবার ফেরা যাক। আজ একটু রেষ্টও দরকার।"

দিন চারেক কাটল এইভাবে। আষাঢ় শুরু হয়ে গেছে, তবে বর্ষা তেমন করে নামেনি। ছাড়া ছাড়া একটু আধটু যা হচ্ছে তার ফাঁকে ফাঁকে এই রকমভাবে ঘুরে বেড়ালো দু'জনে আবিষ্ট হয়ে। ছোট জায়গা, যা একটু চেঞ্জার্স-কলোনী গোছের আছে, বাড়ি ঘর প্রায় সব বন্ধই। সিজনও নয় এটা, মুক্ত পরিক্রমায় বাধা হয় না। রুকসা নদীর ধার আছে, তার রূপ এখন অন্য, দূরের পাহাড়ে জল নেমেছে। বসে থাকে দু'জনে। গৌরীনাথের পাহাড়ে ওঠে। অনতি-উচ্চ ঐ একটিই পাহাড় এখানে বাসা থেকে বেশি দূরেও নয়। গৌরীনাথের মন্দিরটি ছোট হলেও বেশ পরিপাটি। চারিদিকে সরু চাতাল দিয়ে ঘেরা, সামনে ছোট একটু গোপুর গোছের ঢাকা। হালকা বৃষ্টি হলে একটু আশ্রয় পাওয়া যায়। ওদিকে যেমন শীলার ওপর পুলিনের মনের প্রভাব, এখানে তেমনি অবস্থাটা যায় উল্টে, পুলিনের ওপরই শীলার মন করে আধিপত্য। প্রণাম করে বিগ্রহের চরণামৃত খেয়ে ওরা একটু থমথমে হয়েই থাকে বসে এক অন্য ধরণের মন নিয়ে। সামনে বহু দূরের পাহাড় শ্রেণীর নীল রেখার দিকে দৃষ্টি ফেলে।

তারপর একদিন বেড়ানোর পালা বন্ধ হয়ে গেল। এই দিনটির প্রতিক্ষাতেই ছিল পুলিন।

বিকাল বেলা চা পান করে বেরুবার জন্যেই তোয়ের হচ্ছিল দুজনে, একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ শুনে পূবের বারান্দায় বেরিয়ে এসে ঢাখে, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দিকচক্র ঘিরে গুহু ক'রে মেঘের রাশ ছুটে আসছে। নীচের দিকটা স্লেটের মতো নীল, সামনেটা ধোঁয়াটে। ওরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ধোঁয়ার মতোই কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে মাথার ওপর উঠে এল। অনেক দূর থেকে একটা সাঁ-সাঁ শব্দও আসছে এগিয়ে। পুলিন প্রশ্ন করল—"কি করবে বেরুবে ?'

শীলা বলল—"আজ শালবনীর দিকটায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, ওদিকে নাকি আরও বেশি খোয়াই।"

"ঢাখো, যদি যায় উড়ে মেঘটা—মনে তো হয় না কিন্তু"···বলতে বলতে ভেতরে এসেছে, ছড়ছড় করে হেথায়-হোথায় গোটাকতক বড় বড় ফোঁটায় সংকেতটা দিয়েই একেবারে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। আবার বেরিয়ে আসছিল শীলা, মেঘের গোড়া কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখবার জন্যে, এতটা না হোক, এমন তো ইচ্ছেই হয় মাঝে মাঝে, বৃষ্টির তোড়ে চৌকাঠের বাইরে পা দিতেই পারল না ! "দেখোতো কি শত্রুতা, অমন চমৎকার প্রোগ্রামটি করেছিলাম আজ—যেমন দেখছি, ছাড়বারও আশা নেই—সমস্ত দিন ব'সে, ব'সে, ব'সে···

গর গর করতে করতে ঘরের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমের বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে গিয়ে বসল। এ'দিকটা বৃষ্টির ছাট নেই একেবারে, কলোনীর উল্টা দিকে পড়ে বলে গল্পসল্প করতে বসেও ওখানেই ওরা।

পুলিন ঘরের মধ্যে বাক্স খুলে কি যেন করছিল, বলল—"আমি তো বলব, আজ যেন আর না-ই থাকে শীলা।"

"তা জানি, আমি যা বলব তার উল্টটাই তো বলতে হবে তোমায়।"

পুলিন বলল—"আরও একটা উল্ট কথা বলব, আমার কাছে এসব জিনিস আছে যা দিয়ে এমন শত্রুকে পরম মিত্র করে তুলতে পারি।"—মুখে একটু হাসি নিয়ে চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, শীলা ঘুরে দেখল, হাতে একখানা বই।

"আমার আজ মন্ত্র শোনবারও মেজাজ নেই বাপু। রাখো ওসব আজ।"—মুখ ভার করেই বলল শীলা।

পুলিন এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত দিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় মেতেছে, একটু গলা তুলেই কথা বলতে হচ্ছে ওদের, পুলিন মুখটা একটু নামিয়ে এনে বলল "এ এমনই মন্ত্র শীলা যে, মেজাজকেও বশে নিয়ে আসবে। তাহলেই তো হোল।"

পাশের চেয়ারে বসে বেতের টেবিলটার ওপর বইটা রাখল। ছোট, লম্বাটে গোছের একটা বই, আকার কতকটা পুঁথির মতো। সবুজ রঙের মলাটের আধখানায় মেঘের ছবি, তার আঁকা বাঁকা রেখার সঙ্গে মিলিয়ে একটা মানুষের আবছা চেহারা খানিকটা, মেঘই যেন দু'হাতে কি নিয়ে উড়ে চলেছে। শীলা তুলে নিয়ে নামটা পড়ে প্রশ্ন করল "এই 'মেঘদূত' তোমার?"

রাগের সঙ্গে খুশির ভাব ফোটালে চলেনা, তবু মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেই। বলল—"এবার কিনে আনলে বুঝি? কৈ, আমায় বলনি তো।"

"বললে বাসী হয়ে যেত।"—আড়চোখে চেয়ে একটু হাসল পুলিন। আর এক দিনের প্যাঁচালো তর্ক ওর সেই। একটু হাসি ফুটল শীলার মুখেও। বলল—"টাটকা বাসীর হিসেব নিতেই বাড়ি ভোর। তা পড়বে এখন, না—? আমায় কিন্তু আগে একটু বলে দাও জিনিসটে কি? বাসী হওয়ার ভয়ে তো বলওনি কখনও—নামই শোনা আছে, ঐ পর্যন্তই। আবার সংস্কৃতই তো?"

—বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সেই বিরক্তির ভাবটা কখন আপনিই গেছে চলে, বইটা উল্টে বলল—"বাঃ, এতে তো বাংলাও রয়েছে। পড়াতেই বাঃ!"

বেশ উৎফুল্লই হয়ে উঠেছে। পুলিন বলল—"হাঁ, দুটোই পাশাপাশি রয়েছেও সাজানো। সংস্কৃতটা না বুঝলেও মন্দাক্রান্তা ছন্দে ওর সুরটা খুব মিষ্টি লাগবে, তারপর বোঝাবার জন্যে বাংলা তো রয়েছেই। তাহলে আরও ভালো হবে মেঘদূতের পরিকল্পনাটি তোমায় যদি আগে বলে দিই।"

"হাঁ, দাও তাই।"

গুছিয়ে-সুছিয়ে বলল। "হাঁ তারপর?"—ব'লে শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আবার বলল—"থামো একটু চায়ের কথা ব'লে দিই। ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না একটু?

ডাক দিল—"সদানন্দ!"

এতখানি খুশী হয়ে উঠেছে পুলিন, বলল—"হচ্ছে বৈকি একটু। করুক না চা আর একবার।

ঝি ঝুমরী বেরিয়ে কপাটের কাছে এসে বলল—"সদানন্দ মন্দিরে গেছে বোধ হয়।"

পুলিনই বলল "আমরা বেরিয়েই যাচ্ছিলাম তো।"

"সদানন্দ না থাকে, তোরা দু'জনে মিলে চা ক'রে আন তো একটু তাড়াতাড়ি।"—ঝিকে আদেশ করল শীলা; মুখটা একটু ভারও।

"দু'জনে মিলে মানে? "—মুখটা একটু ভার দেখেই আরও প্রশ্নটা করল পুলিন। ঝি চলে যেতে।

"ও ঠিক দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল লুকিয়ে। তোমায় বলিনি সেবারে— আমরা এক সঙ্গে হলে ও ঠিক কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে দেখবে, সুবিধে হলে শুনবেও। সেবারে আমাদের নকল করতে গিয়ে কি কাণ্ডটা করলে দেখলে না?"

চোখ তুলে, বোধ হয় সেবারের কথাটা মনে পড়ে যেতে একটু হাসল পুলিন, বলল—"যাক, সরিয়ে তো দিয়েছ, এ নিয়ে বকাবকি করতে গেলে খারাপই হবে।"

হাসিটা যেন একটু বেড়ে গেছে মনে হতে শীলা প্রশ্ন করল—"হাসছ যে?"

"ওটা যে সব মেয়েরই রোগ তোমাদের……"

"তা বলে ঝি হয়ে……

"ঝি যদি পুরুষ হয় তো করবে না তো…"

প্যাচাল তর্কটুকু এনে ফেলেই বলল—"নাও, সরে তো গেছে; শোন, ওদিকে মন প'ড়ে থাকলে এদিকটা নষ্ট হবে। গল্পটা বলি তোমায়—

কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য কুবেরের আদেশে যক্ষের রামগিরি পর্বতে নির্বাসন থেকে সুরু ক'রে, আষাঢ়ের প্রথম দিনে মেঘসমাগমে মেঘকে বনের ফুল উপহার দিয়ে প্রিয়ার কাছে দৌত্যে পাঠালো—কত নদী, পাহাড়, জনপদ অতিক্রম করে যক্ষপুরীতে যক্ষবধূর কাছে উপনীত হয়ে তার প্রিয়তমের কুশল বার্ত্তা পৌছে দেওয়া পর্য্যন্ত, কাব্যের একটা সংক্ষিপ্তসার দিয়ে গেল পুলিন। যতটা পারল, ভূমিকাতেই কাব্যের রূপ-রেখা স্পষ্ট ক'রে দিয়ে—কোথায় কোন্ নদীর থেকে পথশ্রমজনিত নিজের ক্ষীয়মান অবয়ব পূর্ণ করে নিয়ে কোন পর্বতের শিখরলগ্ন হয়ে বিশ্রাম করে নেবে—কোথায় জনপদবধূরা উর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে অভিনন্দিত করবে তাকে, কোথায় তাপ দগ্ধ ভূমি থেকে প্রথম বর্ষণের সোঁদা গন্ধ উঠে ছেয়ে যাবে দিক—পল্লীবধূরা শস্য প্রাণসিঞ্চিত হোল ব'লে বিলাস-লাস্যহীন প্রীতির দৃষ্টি দিয়ে চাইবে তার দিকে—কোথায় মানসসরোবরের পথ উদ্দেশ করে বলাকার দল সঙ্গী হবে তার—সন্ধ্যারতির সময় মহাকাল শিবমন্দির-লগ্ন হয়ে গুরুগম্ভীর নিনাদে আরতির সঙ্গে গুরুগম্ভীর ডমরুধ্বনি করবে,—সব চলে গেল। তারপর পূর্ব মেঘ শেষ করে উত্তর মেঘে এসে যক্ষপুরীর বর্ণনা মোটামুটি বিরহক্ষীণা যক্ষবধূর কি ভাবে কাটছে—প্রিয়সন্দেশবাহী মেঘকে দেখে কিভাবে সমাদর করবে যক্ষবধূ—কি কথায় বিরহী প্রিয়তমের কুশল সমাচার দেবে মেঘ, তার একটা সকরুণ বিবরণ।

আবিষ্ট হয়ে পড়েছে বক্তা শ্রোত্রী দু'জনেই। যেন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও দিয়েছে পাড়ি, যতক্ষণ কেটেছে কোথায় রয়েছে ওরা, যেন হুঁস নেই। কখন আকাশের অবস্থাটা অন্য রকম হয়ে গেছে, শুরুতেই সেই যে ঝড়ের বেগ আর গর্জন, সেসব ওদের গল্পের মধ্যেই কখন্ গেছে থেমে। বৃষ্টি সেই রকমই, বোধ হয় বেড়েই থাকবে, তবে এখন শুধু হালকা, একটানা ঝরঝর শব্দে ঋজু গতিতে ধারাপাত।

হুঁস হোল ওদের, যখন বিবরণটা শেষ ক'রে, এইবার বইটা পড়তে আরম্ভ করবে পুলিন। সন্ধ্যা ঠিক হয়নি নিশ্চয়, তবে একটা অকাল সন্ধ্যা নেমে এসেছিল, সেটা আরও গাঢ় হয়ে এসেছে, আলো দরকার। মনটা এদিকে ঘুরে আসতে আরও যে সচল হলো, চা দিয়ে যায়নি এখন পর্যন্ত। একটু বিরক্তিও ধরল, বিশেষ করে শীলার। "মুন্নী!"—বলে একটু কড়া করেই হাঁক দিল। উত্তর নেই। উঠতেই যাচ্ছিল, পুলিন বলল—

মেঘদূতের গুণগান করে সমালোচকেরা তো শেষ করতে পারেন নি···ওর আবেশটা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নি। কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বসে পড়ল শীলা আবার। প্রশ্ন করল—"তাই নাকি?"

আবার আবেগে বলে চলল পুলিন, কেমন ক'রে বিরহীর দুঃখে মেঘ থেকে নিয়ে সমস্ত জড়কে প্রাণবন্ত সংবেদনশীল করে কবি তাঁর কাব্যখানিকে করে তুলেছেন সজীব, আরও মনোজ্ঞ। আরও সব সূক্ষ্ম-সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ করতে করতে আর শুনতে শুনতে এ দিকটা আবার ভুলে গেছে দু'জনেই, সদানন্দ ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। দু'জনেই একটু বিস্মিত হয়ে চাইল। শীলাই প্রশ্ন করল—"আর কি?"

সদানন্দ ট্রেটা রাখতে রাখতে বলল—"উনার শরীরটি খারাপ হইছে বটেক: ঘরে মেয়ে শোওয়া করেছে।"

"শরীর খারাপ—তা বলেনি তো—এই তো দোরের পাশে দাঁড়িয়ে কে কি বলছে না বলছে শুনছিল, বেশ একটু আক্রোশের সঙ্গেই বলল শীলা। প্রশ্ন করল—"আর রামলগন, সে উজবুকটা? চা তুমিই করলে? মন্দিরে গিয়েছিলে না? কখন্ এলে তুমি?"

—একরাশ প্রশ্ন করে বসল একেবারে; ভ্রূ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুলিন উত্তরের জন্য চেয়ে আছে সদানন্দর মুখের দিকে।

সদানন্দ যা বলল তা থেকে জানা গেল, ও গৌরী মায়ের মন্দির থেকে নেমে আসছে, দ্যাখে একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে উঠে আসছে। বৃষ্টির জন্যে আগে বুঝতে পারেনি. কাছে আসতে লোকটা রামলগনই বুঝতে পেরে যখন ঢুকল, সে ছাতাটা ভালো করে আড়াল দিয়ে হনহন করে উঠে গেল। সদানন্দ ভাবল, বিশেষ কারণে বাবু ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। চেঁচিয়ে বললও সে যাচ্ছে বাসায়, রামলগন কিন্তু উঠেই গেল সোজা। ও কিছুই বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি এসে দ্যাখে ঝি উনুন ধরাচ্ছে। ওকে দেখে বলল, তার শরীরটা খারাপ, ওই উনুনটা ধরিয়ে বাবু-বৌমার জন্যে চা ক'রে নিয়ে যাক। রামলগনের কথা বলতে খিঁচিয়ে উঠে বলল —সে পাগল-ছাগল মানুষ: কখন কি করে, কোথায় যায়, জিজ্ঞেস করে নাকি কাউকে? না শোনে কারুর কথা?

দুজনে অবাক হয়ে শুনছিল ওর বিবরণ শেষ হলে শীলা প্রশ্ন করল—"তুমি ঠিক দেখেছ রামলগন?"

"অজ্ঞা, রামলগনটিই ছিল বটেক।" সদানন্দ উত্তর করল। জোর দেওয়ার জন্য বলল—"আর কে'টি হবেক?

"কিন্তু, সে তো বড় একটা যায় না মন্দিরে, তারপর আজ আবার এই দুর্যোগ।" স্বামীর মুখের ওপর বিস্মিত দৃষ্টি তুলে মন্তব্য করল শীলা। সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দর দিকে চেয়ে ও প্রশ্ন করল—"তুমি দেখেছ—বাড়িতে নেই?"

পুলিনের যেন একটা অন্য চিন্তাস্রোত চলেছে মনে মনে, এতক্ষণ কোন প্রশ্নই করেনি, এবার সেই উত্তরটা দিল; বলল—"থাকলে চলবে কি করে?"

"তার মানে?"

স্বামীর কথায় আরও বিস্মিত ভাবে চাইল শীলা। বিস্ময় যেন তাকে ঘিরে ধরেছে চারিদিক থেকে। একটা খুব সূক্ষ্ম হাসিকেও যেন চেপে রাখবার চেষ্টা পুলিনের। বলল "চা'টা ছেঁকে ফেল।······সদানন্দ, আলোটা জেলে দিয়ে যাও তুমি।"

চা শেষ করে শুরু করল পড়তে পুলিন। কিন্তু যেন নেহাৎ টেনে নিয়ে যাওয়া। ও তো হাসিটাকে

লুকুবার জন্য বইটাকে তুলে ধরেছেই মুখের সামনে, শীলাও যেন ভেতরের একটা চিন্তা স্রোতকে ঠেলে রেখে মন বসাতে পারছে না। তারপর যখন খান আষ্টেক শ্লোকও শেষ হয়নি, সংস্কৃত বাংলা মিলিয়ে, শীলা হঠাৎ ব'লে উঠল "হ্যাঁগা, থামোতো। এ যেন মেঘদূতের মতনই মনে হচ্ছে না ওদের কাণ্ডটা? পাহাড়ে ওটাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে···"

একেবারে হো হো করে হেসে উঠল পুলিন। "তাইতো হচ্ছে মনে" ব'লে হাসির চোটে একেবারে উলটে উলটে পড়তে লাগল চেয়ারের পিঠে।

"ঠিক তাই। রাগে বিরক্তিতে মুখটা অন্ধকার হয়ে উঠেছে শীলার। "দাঁড়াও তো দেখি।"—বলে পুলিন বারণ করবার আগেই উঠে পড়ে হনহন করে ভেতরের দিকে চলে গেল! বাড়ি থেকে কয়েক পা গিয়েই একটা আউট-হাউস গোছের। একটু পরেই ঘুরে এসে কাঁদো কাঁদো হয়েই বলল—"ঠিক তাই। আমার সেবার দেওয়া ভালো শাড়িই পরে সেজেগুজে খালি তক্তপোষের ওপরে শুয়ে আছে। ঠাণ্ডায় ঘুমিয়েই পড়েছে, ডাক দিতে ধড়মড় করে উঠে পড়তে যখন জিজ্ঞেস করলাম, সে উজবুকটাকে বৃষ্টিতে গৌরীনাথ পাহাড়ে পাঠিয়ে সেজে গুজে শুয়ে আছ কেন, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ও ঠিক জানলার পাশে দাঁড়িয়ে সবটা শুনে এই কাণ্ডটা করেছে—কে এমন রস ছেড়ে চায়ের জন্যে মাথা ঘামাবে?

দুলে দুলে হেসে উঠছে পুলিন এদিকে।

"হাসছ তুমি, কিন্তু আমার যে কী হচ্ছে মনে! আমি বাড়ি গিয়ে এবার ঠিক ও পোড়ারমুখীকে বিদেয় করব মাকে ব'লে। একা ওকেই, দেখি বিরহ সইতে পারে ও···"

পুলিন হেসে প্রশ্ন করল—"রামলগন থাকবে তাহলে? যে নাকি ওর কথায় এই বৃষ্টি মাথায় করে···

"না থাকে, ও-ও বিদেয় হোক; যক্ষ সাজার সাধ হয়েছে!"

বৃষ্টিটা ধরে আসছে।

ও মন নিয়ে 'মেঘদূত' পড়া যায় না। ধরে আসতে আসতে বৃষ্টিটা থেমে যেতে ওরা কাছাকাছি থেকে যখন খানিকটা ঘুরে এল, তখন পুলিনের সেই কৌতুকের ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। শীলার সেই রাগটাও। খানিকটা সময় পেয়েই, খানিকটা পুলিনের কথাতেও। পুলিন বলেছিল—"ভালোর দিকটাও দেখছ না কেন শীলা?"

"ভালো!"—বিস্মিত হয়েই চেয়েছিল শীলা।

"ভালো বৈকি। ভালোবাসা আর তার আনুষঙ্গিক বিরহ—এসব কি শুধু যক্ষ-গন্ধর্বের জন্যেই শীলা? যেমনই হোক না কেন, ভালোবাসে বলেই না নানারকমে নেড়েচেড়ে দেখতে চায়, পেতে চায় নিজেকেও ওর সঙ্গে?

বেড়াতে বেড়াতে ওকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলেছিল—"তোমাকেও তো একজন খেয়ালী মানুষ নিয়ে চালাতে হয় শীলা, এটুকু না বুঝলে তার দশাই বা কি হবে?

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে ওরা যখন অনকূল মন নিয়ে আবার 'মেঘদূত' খুলে বসেছে, তখন বাদলও যেন সাড়া দিয়েই ঘটা ক'রে আবার জ'মে এসেছে মাথার ওপর।

খ্রীষ্ট

দ্বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের কল্যাণে স্থানের দূরত্ব লোপ পাওয়ার মুখে। দূরত্বের এই বিলুপ্তির ফলে বিচিত্র প্রকৃতির মানুষগুলি খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। এই নৈকট্য ভালোর জন্যও হতে পারে, মন্দের জন্যও। রুচিতে, ভাবে, ধর্ম্ম বিশ্বাসে যারা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র তাদের যদি ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে পারি তবে নৈকট্যের ফল ভালোই হবে। আর মানুষে মানুষে যে একটা রুচিগত বা বিশ্বাসগত অথবা আচরণগত মৌলিক স্বাতন্ত্র্য আছে, সেই স্বাতন্ত্র্যের চিরন্তন পবিত্রতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে না পারলে যারা নানাদিক দিয়ে আমাদের থেকে পৃথক তাদের আমরা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবো আর এই শ্রদ্ধাহীনতার ফল কারও পক্ষেই ভালো হতে পারে না।

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি যেরুশালেমের একটি বিচারকক্ষ। বিচারকের আসনে রোমসম্রাটের প্রতিনিধি পীলাত। আসামীর ভূমিকায় গ্যালিলির এক তরুণ বৈরাগী যিনি নম্রতার এবং ক্ষমাশীলতার প্রতিমূর্ত্তি। রাজদ্রোহের অপরাধ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। কিন্তু পার্থিব কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। হ্যাঁ, তিনি একটা নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই রাজ্য মানুষের মন আর হৃদয় নিয়ে। এমন মন এবং এমন হৃদয় যা চায়, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ শান্তিতে মিলেমিশে বাস করুক, একে অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার করুক যা ন্যায়সঙ্গত, কারও যেন অনিষ্ট না হয়, এমন ভাবে চলুক। **My kingdom is not of this world"**

তবু ক্রুশকাষ্ঠে মরতে হোলো তাঁকে। ঐহিক কোন রাজ্য তিনি কামনা করেন নি, ঐশ্বর্য্যে তাঁর অণুমাত্র আসক্তি ছিল না; পাণ্ডিত্য এবং খ্যাতিকেও তিনি কোন মর্যাদা দেন নি। What alone matters is the salvation of the soul. খ্রীষ্টের কাছে মানুষের আত্মার কল্যাণই ছিল সব। মনি মুক্তা মাণিক্যের ঘটা সে তো শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রধনুচ্ছটা। জীবনের সেই বেদনাময় শেষ মুহূর্ত্তগুলিতেও তাঁর চেতনায় ঈশ্বরই ছিলেন সত্য। ক্রুশের সম্মুখে সেদিন যারা দাঁড়িয়ে ছিল সেই রোমান সিপাহীদের কাছে সত্য ছিল সাম্রাজ্যের ইজ্জৎ,

যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত, দিগ্বিজয়ের উচ্চ আকাঙ্খা, তরবারির আস্ফালন। খ্রীষ্টের কাছে এ সব ছিল উন্মাদের প্রলাপ, একটা মায়া, an illusion যা যে কোন মুহূর্ত্তে শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে। পীলাত্ খ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসা করলেন : What is Truth ? সত্য কি ? একটা মোক্ষম প্রশ্ন। রোম সম্রাটের কাছে, যেরুশালেমের মন্দিরের পেট-মোটা পুরুষ-পাণ্ডাদের কাছে Mammon ছিল সত্য। ম্যামন অর্থে খ্রীষ্ট বুঝতেন বিষয়ের প্রতি আসক্তি, কামকাঞ্চনের বাসনা, ঐহিক জীবন নিয়ে অহঙ্কার যাদের নিষ্ঠুর বন্ধন আত্মাকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু করে দেয়। খ্রীষ্টের কাছে একমাত্র সত্য ছিলেন ঈশ্বর ; সত্য অর্থাৎ যা আছে, That was is and shall be খ্রীষ্ট বললেন, Thou shall love the lord, thy god with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. ঈশ্বরকে নিবেদন করে দাও তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত আত্মা, সমস্ত চিত্ত। হৃদয়ের, আত্মার, চিত্তের সমস্ত ভালোবাসা যেখানে নিবেদিত হয়েছে এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে, অনুক্ষণ ভাবনায় যেখানে তিনি ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে ম্যামনের ঠাঁই কোথায় ? আর যেখানে হৃদয়-আসনের সবখানি জুড়ে আছে ম্যামন সেখানে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাই বা কেমন করে সম্ভব ? তাই খ্রীষ্ট বললেন, Man can not urve both God and Mammon. বললেন, it is easier for a came to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the Kingdom of God ছুঁচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে উট গলে যাওয়া বরং সম্ভব তবু ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীর প্রবেশ সহজ নয়।

খ্রীষ্টের এই ঐতিহাসিক উক্তির মধ্যে কোন মারপাঁচ নেই। সত্যই তো, মনের সমস্তটা ঈশ্বরের ভাবনায় অনুক্ষণ পূর্ণ হয়ে থাকলে সেই মনে ম্যামনের কোন জায়গাই থাকতে পারেনা। আর হৃদয়ের সমস্তটা পার্থিব বিষয়ের চিন্তায় ভরাট হয়ে থাকলে সেই বিষয়াসক্ত চিত্ত ঈশ্বর চিন্তা করবে কখন ? দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণও কি একই কারণে মনকে নারীমায়া, কাঞ্চনের মায়া এবং খ্যাতির মায়া থেকে মুক্ত রাখবার কথা বলেন নি ? খ্রীষ্টের সমস্ত বাণী থেকেই সত্যের এমন একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে যে সেই বাণীগুলি আজ পর্য্যন্ত মানুষের কাছে আত্মার অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মর্ম্মের কাছে তাদের এমন একটা আবেদন আছে যা দুর্ব্বার। সেই বাণীগুলির মধ্যে এমনই একটা অপরূপ সারল্য এবং অমোঘ যুক্তির বাঁধুনি আছে যে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তগুলিতে জানতে পারে, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি রয়েছে তাদের পিছনে।

বস্তুতঃ পীলাত এবং খ্রীষ্ট যখন প্রথম মুখোমুখী হলেন প্রায় দু'হাজার বছর আগের সেই এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত্তে তখন দুটো সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাবের জগৎ সামনা-সাম্নি এসে দাঁড়ালো। খ্রীষ্টের জগৎ চিরন্তন ঈশ্বরের রাজ্য। পীলাতের এবং যেরুশালেমের ধনী পুরুত পাণ্ডাদের জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ম্যামন্ অর্থাৎ জীবন-যৌবন ধন-মান যা কালস্রোতে শূন্যের মধ্যে ভোজবাজীর মতো মিলিয়ে যায়। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। তাই তরবারির শক্তিতে দুর্জ্জয় ছিল যারা সেই ম্যামনের পুজারীরা ক্রুশ-কাষ্ঠে হত্যা করলো তাঁকে যিনি ছিলেন কায়-মনোবাক্যে অনন্ত ঈশ্বরের ভক্ত।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। সেই প্রকৃতির খানিকটা ধূলামাটি, খানিকটা তারকা-খচিত আকাশ। ঐশ্বর্য্যের এবং ক্ষমতার প্রতি আমাদের একটা মজ্জাগত আসক্তি আছে। যা অনন্ত, যা খণ্ড-কালের দ্বারা সীমিত নয় তার প্রতিও কি একটা দুর্ব্বার ক্ষুধা নেই আমাদের আত্মায় ? অর্থাৎ আমরা স্বর্গেও

নেই, নরকেও নেই। স্বর্গের অসংখ্য সূর্য্যতারাখচিত চন্দ্রাতপ এবং নরকের অন্ধকার ঢাকা অতলস্পর্শী গহ্বর-এ দুয়ের ঠিক মাঝামাঝি মানুষের মন অদ্ভুত ছন্দে দোল খাচ্ছে। তবু এমন কথা বলা যেতে পারে যে মানুষে প্রকৃতিতে নারী-মায়া, ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণ, ক্ষমতার মোহ অত্যন্ত প্রবল। যাঁরা বলেন ঐশ্বর্য্যের পথে ঈশ্বর লা সম্ভব নয় এবং ঈশ্বরই সত্য তাঁরা পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী প্রবলের ঘৃণাই কুড়িয়েছেন। ধনী ইহুদীরা ধর্ম্মের না ক'রে যা করছিল তার নাম ম্যামনের পূজা। ঈশ্বরের মন্দিরকে তারা পরিণত করেছিল বলির পশু-পক্ষী বিক্রয়ে একটা কোলাহলময় হট্টমন্দিরে। মন্দিরের পুরুত-পাণ্ডারা খ্রীষ্টের বাণীর এবং আচরণের মধ্যে শুনতে পেলে তাদের আসন্ন সর্ব্বনাশের পদধ্বনি আর কালো ছায়া। হাজার হাজার মানুষ তরুণ বৈরাগীর পিছু পিছু ভী ক'রে চলেছে। তাঁর মুখের বাণী তাদের কাছে যেন স্বর্গের অমৃত। ধনী পুরুত-পাণ্ডাদের ভজনালয় ছেড়ে তার খ্রীষ্টের বাণী শুন্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব। সেই বাণীর মধ্যে তারা কুড়িয়ে পাচ্ছে কী গভীর সান্ত্বনা! তার মধে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের আর আচারের খুঁটি-নাটির উপরে জোর দেওয়ার ব্যাপারটা মোটেই ছিল না! রো সম্রাটের রণ-হুঙ্কার আর ধনী ইহুদীদের ধন-ঝঙ্কার ভেদ ক'রে খ্রীষ্টের কণ্ঠ থেকে একটা নূতনতর বাণী উৎসারি হোলো। এই বাণীতে ছিলো, পরস্পরকে ভালোবাসো, সত্যে অনুরাগী হও, ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করো সহস্র সহস্র মানুষের কাছে দিনের পর দিন খ্রীষ্ট যে-আবেদন পৌঁছে দিতে লাগলেন সে আবেদনে ছিল করুণা সত্যনিষ্ঠা, সততা—এই সব আদর্শের অকুণ্ঠ স্তব-গান।

ধনী পুরুত-পাণ্ডারা প্রমাদ গুণলো। তাদের স্বার্থে লাগলো প্রচণ্ড আঘাত। পুরাতন বিধি-নিষেধের শাসন উন্মূলিত প্রায়। প্রবীণ এবং পরম-পাকাদের জীর্ণ আদর্শগুলির সঙ্গে খ্রীষ্টের আদর্শের কোথাও মিল নেই। খ্রীষ্টের বাণীতে বিপুল জীবনের জয়ধ্বনি। ফরসীরা মহাজীবনের বিরাট খেলা থেকে দূরে রইলো সরে। পুরাতন নিয়মের শৃঙ্খলে মন তাদের বাঁধা। একটা মৃত অতীত পাকে পাকে জড়িয়ে রেখেছে তাদের তমসাচ্ছন্ন নিশ্চল চিত্তকে। যা-কিছু জীর্ণ, যা-কিছু পুরাতন—তাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের দুরন্ত প্লাবন নিয়ে এলো খ্রীষ্টের বিপ্লবাত্মক চিন্তা-ধারা। নবীনের এ বিদ্রোহকে পুরাতন ক্ষমা করতে পারলো না। স্বর্গ রাজ্যের নূতন সুরার অগ্নিরসে পুরাতন বিধি-নিষেধের বোতল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল! প্রবীণেরা, স্বার্থসর্ব্বস্ব পুরুত-পাণ্ডারা ক্ষিপ্ত হয়ে রব তুললো, 'ওকে ক্রুশে দাও।' আর শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে ক্রুশ বিদ্ধ ক'রে হত্যা করাও হোলো।

একথা সত্য যে সেদিন সেই উন্মত্ত জনতা যাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবী ক'রে চীৎকার করেছিল তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবার লোক জগতে আজও বিরল। আজও পৃথিবীতে হিংসার আদর্শেরই জয় জয়কার। আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি ব্যবহার থেকে আরম্ভ ক'রে ভিয়েৎনামের লড়ায়ে রক্তারক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাদেরই পথের অনুসরণ চলেছে যারা একদিন তারস্বরে বলেছিল crucify Him crucify Him. তবু একথা সত্য যে মৃত্যু থেকে প্রাণ আসে। বীজকে মাটির অন্ধকারে মরতে হয় মাঠে মাঠে ফসলের প্রাচুর্য্য আনবার জন্য। খ্রীষ্টের মহামরণের ভিতর দিয়েও একটা নূতন স্বর্গের, একটা নূতন পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। ভাবের একটা নূতনতর জগতের তোরণ-দ্বার আমাদের সম্মুখে তিনি উদ্ঘাটিত ক'রে গেছেন, এতে কি কোন সংশয় আছে? এই নূতনতর রাজ্যে ক্রীতদাসের এবং পতিতার আসন পুরোহিতের এবং রাজার আসনের পুরোভাগে। যাদের কাছে সেই নবতর ভাবরাজ্য ছিলো প্রথম-প্রভাতের অরুণ-আলোয় হিরণ্ময়, সজীবতায় প্রাণময় তারা অন্তরে আস্বাদ পেলো একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের। আর সেই আনন্দের প্রাচুর্য্যে নির্য্যাতন, অপমান, মৃত্যু—কোন কিছুতেই তারা ভ্রূক্ষেপ করেনি!

খ্যাতনামা ফরাসী ঔপন্যাসিক ফ্রাঁসোয়া মোরে ধর্ম্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে একজন রোমান ক্যাথলিক। খ্রীষ্টের জীবনের ও বাণীর গভীর তাৎপর্য্য সম্পর্কে এই নূতন যুগকে অনেক চমকপ্রদ বাণী শুনিয়েছেন। ফ্রাঁসোয়ার

মতে Christ has great need for bold advocates of His cause. খ্রীষ্টের বিপুল প্রয়োজন আছে সেই সব নর-নারীকে যারা বিপদকে উপেক্ষা ক'রে দৃঢ়-পাদক্ষেপে চলবে তাঁর পতাকা উড়িয়ে। ফ্রাঁসোয়া বলছেন, "To live dangerously" is a christian formula. অবতার পুরুষেরা পৃথিবীতে আসেন শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, to open the way for humanity to a higher consciousness, আমাদের চৈতন্যকে একটা উচ্চতর বৃহত্তর অনুভূতির দিকে প্রসারিত করে দিতে। খ্রীস্টও এসেছিলেন আমাদের মনকে ঈশ্বরের দিকে ফেরাতে। তিনি ছিলেন একজন ধর্ম্মগুরু আর ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম ও শেষ কথা তো "সূক্ষ্মতরমনুভব রূপম"। সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম এমন একটা অনুভূতি যা কেবলমাত্র মনের প্রত্যক্ষ। জার্ম্মান দার্শনিক Oswald Spengler-এর ভাষায় It is life in and with the Supersensible অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে এবং অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে-জীবন সেই জীবনই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন। স্বামীজী বলতেন, Religion is experience. ঈশ্বরকে সরাসরি উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি হচ্ছে ধর্ম্মের মূল কথা। আর বাইরের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে এই উপলব্ধি কখনোই সম্ভব নয়। ঈশ্বরতত্ত্ব আসলে এমন একটা তত্ত্ব যা মেধার, তর্কের কিংবা প্রমাণের বিষয়ও নয়। ধর্ম্মের জগৎ non-actual, but true. টমাস্ কেম্পিস্ ঈশ্বরকে বলেছেন, the Eternal and Incomprehensible. অনন্ত এবং বুদ্ধির অতীত তিনি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পত্রাবলীর একটীতে এর প্রতিধ্বনি করে লিখেছেন: It is true that it is impossible for the limited human reason to judge the way or purpose of the Divine, which is the way of the Infinite dealing with the finite. সসীমের সঙ্গে অসীমের আচরণের ন্যায় অন্যায় বিচার করতে যাওয়া মানবীয় বুদ্ধিতে অসম্ভব। কারণ মানুষের বুদ্ধি হচ্ছে সীমিত। তাই তো কেম্পিসের প্রতিধ্বনি শোনা গেলো ঠাকুরের বাণীতে: "অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়?"

খ্রীষ্ট যে স্বর্গ রাজ্যের বাণী বহন ক'রে আনলেন তার সঙ্গে আমাদের এই জগতের সম্পর্ক নেই। তাঁর কাছে আত্মার মুক্তিই হওয়া উচিত একমাত্র সাধনার লক্ষ্য। বললেন, consider the lilies. আরও বললেন, Man can not serve both God and Mammon. যে সংসার করবো আবার ঈশ্বরও পাবো—এ কখনোই সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে যোলো আনা মন তাঁকেই দিতে হবে। গীতার সেই পরম তত্ত্ব: মন্মনা ভব। আমাকে ষোলো আনা মন দাও। তবেই 'মামেবৈষ্যসি', আমার কাছে তুমি আসবে। খ্রীষ্ট বললেন, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. That is the greatest commandmens. ষোলো আনা মন দিয়ে, আত্মা দিয়ে, হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসো। এই তো খ্রীষ্টের কথা। তবে কি পড়শীর জন্য আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার কণা মাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না? খ্রীষ্টের বাণীর নিখুঁত ভাষ্য ফ্রাঁসোয়ার লেখায় খুঁজে পাই। ফরাসী ভাষ্যকার লিখছেন: His wish is to be loved; and what is much more important, His wish to be alone loved, or at any rate, His desire that we should not love anything except for Him and in Him, And this does not desroy human love rather it makes it sublime. ঈশ্বরকে ষোলো আনা চিত্ত দিয়ে ভালোবাসতে হবে—এর এই অর্থ নয় যে মানুষকে ভালোবাসবো না। মানুষকে ভালোবাসবো ঈশ্বরের জন্যই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "যে তাঁকে জেনেছে সে দেখে যে জীবজগৎ সে তিনিই হয়েছেন। ছেলেদের খাওয়াবে যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছো। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে। তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না।" ফ্রাঁসোয়ার ভাষায় দাম্পত্য প্রেম তখন দেহকে অতিক্রম করে sublime হয়ে যায়। ঠাকুরের বাণীর মধ্যে অন্যত্র আছে: "আমি হাজরাকে বলি কারুকে নিন্দা কোরোনা। নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা

করা যায়।" সুতরাং ঈশ্বরকে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসলে মানুষের প্রতি প্রেম কর্পূরের মতো উবে যায়, একথা আদৌ ঠিক নয়। ঈশ্বরের জন্য মানুষকে ভালোবাসলে, ঈশ্বরই সব হয়েছে, এই বোধ জাগ্রত হলে দুষ্ট মানুষকে পর্য্যন্ত বাদ দিবার জো থাকে না, কায়েন মনসা বাচা কাউকে পীড়া দেওয়া যায় না। রামকৃষ্ণ রামলালের মাকে বকতে গিয়ে বকতে পারলেন না। দেখলেন, তাঁরই একটি রূপ।

কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আমরা মূল বক্তব্য বিষয় থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছি। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো, খ্রীষ্টের পথ কোন মতেই আরামপ্রিয় ভীরুর রাস্তা নয়! কারণ ঈশ্বরে যে ষোলো আনা প্রাণ-মন সমর্পণ করেছে সে তো কখনও বিত্তের রাস্তা গ্রহণ করবে না, খ্যাতির রাস্তাও নয়। যা-কিছু ফুরিয়ে যায়, মিলিয়ে যায় জলের বুদ্বুদের মতো—তার মধ্যে আনন্দ সে পেতেই পারেন। Of the Imitation of Christ-এর লেখক কেমপিসের সেই কথা: For thou willnot be able to attend upon me, and at the same time to take delight in things transitory. মন নিয়েই তো সব। আর মনের ষোল আনা ভালোবাসা ঈশ্বরকে দিতে পারলে তবেই না তাঁকে পাওয়া যায়! কিন্তু মনকরীকে তো বশে আনা কঠিন আর রামকৃষ্ণের ভাষায়, "মনকরীকে যে বশ করতে পেরেছে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হয়।" রামকৃষ্ণ বলতেন: "সংসার বুদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপরে ষোল আনা মন হবে তবে তাঁকে পাবে।" বিষয়-রসে সিক্ত মনকে ঠাকুর বলতেন ভিজে দেশলাই। পঞ্চাশটা ঘষলেও কিছু হয় না। কেবল কাঠিগুলো ফেলা যায়। বারম্বার রামকৃষ্ণ বলেছেন, বিষয়রসে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয় না। বলেছেন: অসৎকে ভালোবাসলে—যেমন দেহসুখ, লোকমান, টাকা এই সব ভালবাসলে ঈশ্বর যিনি সৎস্বরূপ তাঁকে জানতে ইচ্ছা হয় না।"

কিন্তু ধন-জন-মানের বেড়া ডিঙিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছানো যে কঠিন! দেহ সুখ, লোকমান্য, টাকা—এদের একটা আকর্ষণ আছে যাকে দুর্ব্বার বলা যেতে পারে। অবশ্য অসীমের জন্যও একটা পরম তৃষ্ণা আছে মানুষের মর্ম্মের গভীরে। তাই দেহ সুখের ক্ষেত্রে সীমিত জান্তব জীবনের মধ্যে আমরা একটা দারুণ ক্লান্তি অনুভব করি। অথচ ধন-জন-মানের আসক্তিকে জয় করাও কঠিন! মানুষের স্বভাবে এই যে শ্রেয় আর প্রেয় একসঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার প্রকৃতির মধ্যে এই যে কিছুটা নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং কিছুটা পৃথিবীর ধুলা-মাটির মিশেল রয়েছে এর ফলে একটা দ্বন্দ্ব চলেছেই তার নিজের সঙ্গে নিজের। এই সংগ্রামের কথাই ব্যক্ত হয়েছে কবি যখন অশ্রুগদ-গদ কণ্ঠে গীতাঞ্জলি'তে গাইলেন:

"তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালবাসি।"

মনের একটা অংশ যখন অসীমের ক্ষুধায় আতুর তখন আর একটা অংশ দেহসুখ, লোকমান্য, টাকা—এ সবের জন্য লালায়িত। এই যে নিজের বিরুদ্ধে নিজের একটা নিদারুণ সংগ্রাম চলেছে, এই সংগ্রামে জয় লাভ ক'রে ষোল আনা মন ঈশ্বরে দিতে পারলেই তো কেল্লা ফতে! "মন্মনা ভব।" ষোলো আনা মন আমাকে দাও। তৈল ধারাবদবিচ্ছিন্নয়া মনোরভ্যাসতত্ত্বং চিন্তয়। অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার মতো তোমার অনুক্ষণ ভাবনায় আমাকে রেখে দাও। তবেই মামেবৈষ্যসি, to me thou shalt come. আমার কাছে তুমি নিশ্চয়, নিশ্চয় আসবে। এই না গীতার সার কথা। তা হলে দাঁড়ালো কি? দাঁড়ালো উইলিয়াম জেমসের ভাষায়, The whole drama is a mental drama. The whole difficulty is a mental difficulty, a difficulty with an object of our thought,

আমাদের সমস্ত নৈতিক জীবনের নাট্যলীলা তো একটা মানসিক নাট্যলীলা। সমস্ত মুস্কিলের গোড়ার কথা মনকরীর অবাধ্যতা। আমরা যে-লক্ষ্যে উপনীত হতে চাই সেই লক্ষ্যবস্তুকে চেতনার ক্ষেত্রে ধরে রাখতে পারলেই সব মুস্কিলের আশান্ হয়ে যায়। আবার জেম্‌সের ভাষায়, To sustain a representation, to think, is in short the only moral act, for the impulsive and the obstructed for save and lunatics alike. একটা চিন্তার দীপশিখাকে চেতনায় জ্বালিয়ে রাখতে পারা, একটা বিষয়ে মনটাকে ডুবিয়ে রাখতে সমর্থ হওয়া—এটাই হোলো নৈতিক জীবনকে উন্নত করবার একমাত্র পথ। জ্ঞানী অজ্ঞান সকলের পক্ষেই একথা সত্য। ধর্ম্ম-জীবনেও আগিয়ে যাওয়ারও এই একটি মাত্র রাস্তা – মনকরীকে বশে আনা। কবির ভাষায় :

"এমনি করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবল মাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ ক'রে রাখা,"—(গীতাঞ্জলি)

অথবা

"দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু না র'বে।" চেতনার ক্ষেত্রে ভগবানের undivided presence. মনের একটা অংশ ম্যামন্‌কে দিলাম এবং আর একটা অংশ ঈশ্বরকে—এই ভাগাভাগি যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে অংশ করা বাতুলতা। তাই রামকৃষ্ণ বললেন, "মনটা পড়েছে ছড়িয়ে,—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়তে হবে। কুড়িয়ে এক জায়গায় করতে হবে। তুমি যদি ষোল আনার কাপড় চাও, তা হলে কাপড়ওয়ালাকে ষোল আনা তো দিতে হবে। একটু বিঘ্ন থাকলে আর যোগ হবার যো নাই। টেলিগ্রামের তারে যদি একটু ফুটো থাকে তাহলে আর খবর যাবে না।" সমস্ত ব্যাপারটাই হোলো মনেরই ব্যাপার। মন নিয়েই সমস্ত মুস্কিল। ধনজন-মানের বাসনাগুলি থেকে মনকে কুড়িয়ে আনা এবং সেই কুড়িয়ে-আনা মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ফেলে রাখা এই হচ্ছে অধ্যাত্ম সাধনার গোড়ার কথা এবং শেষের কথা। নির্জ্জনবাসের উপর রামকৃষ্ণ এত জোর দিয়েছেন—সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করবার জন্য। গোলমালে ধ্যান ঈশ্বর চিন্তা হয় না।

তা হ'লে ঈশ্বর পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে যে, তার কণ্ঠ থেকে নিশিদিন এই প্রার্থনা উৎসারিত হবে :

"একটি নমস্কারে প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন দ্বারে।" (গীতাঞ্জলি)

তাঁর ভবন-দ্বারে মনের আটআনা নয়, বারোআনা নয়, চৌদ্দ আনাও নয়, সমস্ত মনকে ফেলে রাখতে হবে। আবার রামকৃষ্ণের অনুপম ভাষায়: "কোন রকম করে ঈশ্বরেতে মনের যোগ করা। একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়, যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই।" ঈশ্বরের পদপ্রান্তে পৌঁছানোর জন্য মরিয়া হওয়া দরকার আর মরিয়া যে হয়েছে সে রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের সতীশের মতো এই কথাই বলবে, "যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই।" Man cannot Serve both God and Mammon. খ্রীষ্টের এই অমর বাণীর উপর জার্ম্মাণ দার্শনিক স্পেংলার (Oswald Spengler) মন্তব্য করেছেন : It is Shallow, and it is cowardly, to argue away the grand

significance of this demand. তাইতো খ্রীষ্ট গৃহ-হারা বৈরাগী। The foxes have holes, the birds of heaven nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. খ্যাঁকশিয়ালের গর্ত এবং আকাশের পাখীদের বাসা আছে কিন্তু মনুষ্য পুত্রের মাথা গুঁজবার জায়গা নেই। খ্রীষ্ট ছিলেন নিজে অকিঞ্চন পরিব্রাজক। যারা তাঁতে আনুরাগী, তাঁকে ভালোবাসবে তাদের কাছ থেকেও তীব্র বৈরাগ্যই তিনি দাবী করেছিলেন। স্বর্গরাজ্য তো তাদেরই জন্য যারা শিশুর মতোই অনাসক্ত। সেই ধনী যুবকটিকে খ্রীষ্ট কী বলেছিলেন? "ঈশ্বর পাওয়ার জন্য যদি সারা পথ পর্যটন করতে রাজী থাকো তবে তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আমার অনুগামী হও।" ঐশ্বর্য্যও ভোগ করবো আবার অনন্ত জীবনের অধিকারী হবো—এই রকমের একটা half way position খ্রীষ্টের চোখে কানাকড়ির মতোই মূল্যহীন। কতকগুলো নিষিদ্ধ আচরণ থেকে বিরত থাকাটাই খ্রীষ্টধর্ম্মের বড়ো কথা নয়। চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার না করলে অথবা প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলেই খ্রীষ্টের প্রতি প্রেমের পরিচয় দেওয়া হোলো, এমন কথা যাঁরা বলেন তাঁদের খ্রীষ্টপ্রেমে গভীরতার অভাব আছে খ্রীষ্টের প্রয়োজন আছে তাঁর এমন সব দুঃসাহসী পতাকাবাহীতে যারা বলবে,

"নিন্দা পরবো ভূষণ ক'রে
কাঁটার কণ্ঠ হার,
মাথায় করে তুলে লবো
অপমানের ভার।"

তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য বহন ক'রে আনেননি শান্তি-বারি। তিনি বহন ক'রে এনেছিলেন তরবারি। তিনি এসেছিলেন বিচ্ছেদ ঘটাতে। সেই শান্ত নম্র অথচ অনমনীয় ইহুদী সন্ন্যাসী যিনি ঈশ্বরের জন্য দাবী করলেন হৃদয়ের ষোলো আনা আনুগত্য। যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসবে তারা সমস্ত স্নেহ-মোহ-বন্ধন ছিন্ন ক'রে ত্যাগের শূন্যপাত্রটি হাতে নিয়ে পথে এসে দাঁড়াবে! সে পথে দারিদ্র্য, বিদ্রূপ, মৃত্যু!

কিন্তু বিষয়-চিন্তা পরিহার, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ, ধন-জন-মান বর্জন—এ তো ভক্তের ভাগ্যে আছেই। খ্রীষ্টের অনুগামী হবে যারা এ ত্যাগ তাদের জন্য, ত্যাগের কঠিনতম অংশ নিশ্চয়ই নয়। তাদের ভাগ্যে শীঘ্রই ঘনিয়ে আসবে সেই দুর্দ্দিনের শ্রাবণ রাত্রি যখন ক্রসের শয্যায় তারা শয়ন করবে। কারণ খ্রীষ্ট তাদের জন্য এমনই এক শয্যা বিছিয়ে রাখবেন যেখানে কোথায় পা-দুটি থাকবে এবং কোথায় বা হাত-দুটি থাকবে তা আগে থাকতেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

খ্রীষ্ট বললেন, মৃত্যু থেকে আসে জীবন। জয়ী হ'তে চাও তো মৃত্যুকে বরণ করতেই হবে। এই Creative renunciation এর আদর্শই কি খ্রীষ্ট তাঁর অনুগামীদের সম্মুখে রাখলেন না? অবশ্যই জীবনের প্রতি মানুষের একটা মজ্জাগত আকর্ষণ আছে এবং এই জন্যই মৃত্যুভয় মানুষের পক্ষে একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা! খ্রীষ্টের নিজের ইচ্ছা ছিল যাতনাময় মৃত্যুকে এড়ানো। My Father, if it is possible, let this cup pass me by. Yet not as I will but as thou wilt. খ্রীষ্টের মধ্যে যে জন ছিলো রক্তমাংসের মানুষ সে নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল, আগিয়ে যেতে চাইছিল না সামনের দিকে যেখানে মৃত্যু অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এ দুর্ব্বলতা বেশীক্ষণের জন্য নয়। চক্ষের নিমেষে পতনোন্মুখ নিজেকে তিনি ধরে ফেললেন! এই যাতনার, এই মৃত্যুর জন্যই কি তিনি পৃথিবীতে আসেন নি? গেৎসেমানির উদ্যানে সেই রাত্রে এমন একটা দুর্ব্বলতা তিনি অনুভব করেছিলেন যে সান্ত্বনার জন্য মানুষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। ঈশ্বরকে তিনি কোথাও খুঁজে

পাচ্ছিলেন না। ভগবান মানুষ হয়ে জন্মান মানবতাকে দেখিয়ে দিতে কেমন ক'রে ঐশী সত্তায় নিজেকে রূপান্তরিত করতে হয়।

কিন্তু খ্রীষ্টের জীবন ও বাণী সম্পর্কে যে মূল কথাটি বলবার জন্য এই প্রবন্ধ। ঈশ্বর আর ম্যাম্‌ন অর্থাৎ ধন-জন-মান—এ দুইয়ের মধ্যে কম্‌প্রোমাইজের কোন স্থান নেই। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর চোখে জাগতিক সমস্ত উচ্চাকাঙ্খাই ক্ষণস্থায়ী জল-বুদ্‌বুদমাত্র এবং সেই জন্যই দিগ্বিজয়ীর রক্তসিক্ত তরবারি, খ্যাতির জৌলুষ এবং মনিমুক্তামানিক্যের ঘটা তার চক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তার চরম আনুগত্যের স্বীকৃতি ঈশ্বরের কাছে, কোন সীজারের, আলেকজাণ্ডারের বা নেপলিয়নের কাছে নয়। কিন্তু সীজারের সগোত্রদের কাছে রাষ্ট্রের মর্য্যাদা, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, জয় থেকে জয়ের গিরিচূড়ায় অভিযান,—এদের মূল্য আর সমস্ত কিছুর মূল্যকে ছাড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রনেতারা দাবী করবে, নাগরিকের চরম আনুগত্যে অধিকার তাদেরই। কোন স্বাধীনচেতা দার্শনিক পাপ-পুণ্য, সত্যাসত্য—বিচারের নতুন মাপকাঠি যদি সমাজের হাতে তুলে দেন সেই বিচার-বিপ্লবের ব্যাপারটাকে রাষ্ট্রনেতারা কখনও সুনজরে দেখতে পারেন না। চিন্তাবীর সক্রেটিসকে বিষ দিয়ে মারা হয়েছিল। খ্রীষ্টকেও ক্রুশে না ঝুলিয়ে পীলাতের গত্যন্তর ছিল না। সীজারের প্রতি আনুগত্যের বশে খ্রীষ্ট ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে সম্মত ছিলেন না। I cannot lose the Lord my God—মৃত্যুর মুখেও ঈশ্বর-বিশ্বাসীর কণ্ঠ থেকে এই কথাই যুগে যুগে উৎসারিত হয়েছে। তাই জার্ম্মান দার্শনিক Oswald Spengler খ্রীষ্ট সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: No faith yet has altered the world, and no fact can ever rebut a faith. খ্রীস্ট আর পীলাত যখন মুখোমুখি হয়েছিলেন ইতিহাসের সেই এক মুহূর্তের চরম তাৎপর্য্য - ঈশ্বরে বিশ্বাস জগতের চাল চলন এখনও পর্য্যন্ত যেমন বদলাতে পারেনি, চোখ রাঙিয়ে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে কোন রাষ্ট্রনেতা ঈশ্বর থেকে তাঁর ভক্তকে তেমনি বিমুখ করতে পারে নি। একটা জগতে রোমান পীলাত গ্যালিলিয়ান খ্রীষ্টকে শেষ পর্য্যন্ত ক্রুশকাঠে না ঝুলিয়ে পারলো না। আর একটা জগতে ক্রুশের ছায়ায় একটা নূতনতর দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের পতাকা উড়িয়ে খ্রীষ্ট ভক্তেরা রোমে প্রবেশ করল। আনন্দে তারা বিশ্বাসের জন্য দলে দলে প্রাণ দিলো। এর মধ্যে বিশ্বাসীরা দেখেছিল The "Will of God" ঈশ্বরের ইচ্ছা।

খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর ভাষ্য করতে গিয়ে আমি ফরাসী ক্যাথলিক ঔপন্যাসিক ফ্রাঁসোয়া মোরের এবং জার্ম্মাণ দার্শনিক Oswald Spengler-এর চিন্তাধারার ছায়ায় ছায়ায় চলেছি। সত্যের সঙ্গে ধানাই-পানাই করা কোনমতেই ঠিক নয়। নিজের প্রবৃত্তির বা ব্যক্তিগত ভালো লাগা মন্দ লাগার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য মূল গ্রন্থের বিকৃত টীকা টিপ্পনি করা একটা জঘন্যতম অপরাধ। আমাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য যাই হোক, আবাল্যসঞ্চিত সংস্কার যাই হোক—সত্যের বেদীমূলে সমস্ত কিছু বলি দেবার মতো মরিয়া হওয়ার সৎসাহস ঈশ্বর আমাদিগকে দিন।

———

"যুগান্তর" ও বাঙ্গলার

সশস্ত্র বিপ্লব

—কালীচরণ ঘোষ—

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাংলায় যে উগ্র জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার মূলে ছিলেন মুষ্টিমে কয়েকজন নিঃশঙ্কচিত্ত নেতৃবর্গ আর মাত্র কয়েকটি পত্র-পত্রিকা। তার পূর্ব্বে অবশ্য মহারাষ্ট্র পথ দেখিয়ে অত্যাচারীকে নিধন করে এবং সশস্ত্র বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করে। তারপর একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ে দারুণ উত্তেজনার পর দেশ একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, মারামারি একেবারে বন্ধ; প্রকাশ্য আলোচনা স্তব্ধ বাঙলা বিভাগ নিয়ে অবস্থাটা একটু ঘোরালো হয়ে উঠলো; সময়টা ১৯০৫ সালের অক্টোবর। কিন্তু "সন্ধ্যা প্রকাশিত হল ১৯০৪। ঋষি ব্রহ্মবান্ধব বুঝতে পেরেছিলেন হাওয়া কোন্ দিকে বইবে। রাজপুরুষদের সঙ্গে প্রকাঃ সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য, সুতরাং দেশের যুবকদের মন গড়ে তোলা প্রয়োজন। 'সন্ধ্যা'র লেখা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনা বলেছেন এইখানে "প্রথম দেখা গেল বাংলা দেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা পন্থার সূচনা"।

'সন্ধ্যা' মন্ত্রোচ্চারণ করলে "ইটের বদলে পাটকেল, লাঠির বদলে লাঠি" "মারের বদলে মার, ইংরেজি ঘু বনাম দিশি কিল।" যে সংগ্রাম ঘনিয়ে উঠেছে, তাতে শত্রুর সঙ্গে জীবন বিনিময় অপরিহার্য্য হয়ে উঠতে পারে সাহস করে বলা প্রয়োজন; আভাস ইঙ্গিত এখানে ওখানে পাওয়া যায় কিন্তু প্রকাশ্যে নিয়মিত ভাবে এ ভাবধারা প্রচার করবার একটা বাহন দরকার হয়ে পড়ে।

যুগদেবতা কোথা দিয়ে কি ঘটায় সেটা সব হিসাবের বাইরে। এর কার্য্যকারণ সম্বন্ধে খুঁজে বার ক কঠিন। "এই রকমই হয়, তাই মেনে নেওয়াই সহজ পথ ও বুদ্ধিমানের কাজ। যখন যুবকদের বিপ্লবী স ভাষা খুঁজে মাথা খুঁড়ে মরছে, যখন মরণের ডাক ছাড়িয়ে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তখন রূপ নি হঠাৎ বেরিয়ে এল "যুগান্তর"। সমকালীন যত পত্রিকা মারমুখী জাতীয়তা প্রচারে লিপ্ত হয়েছিল, তার মে "যুগান্তর"কে শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিতে হয়। অপর সাধারণের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, যারা ঘর ছে

হাতের মুঠোয় জীবন নিয়ে বেরিয়েছিলেন এবং বড় বড় রাজদ্রোহের মামলার প্রধান আসামী হয়েছিলেন ! তাঁরাও বলেছেন চঞ্চল চিত্তে হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে যে বাণী শোনার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, "যুগান্তর" এসে সেই অভী মন্ত্র শুনিয়েছে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার সময় দেয় নি, অজানার ডাকে কেবল সামনে টেনে নিয়ে গেছে, কোথাও বা অনির্দ্দিষ্ট কারাবাস ঘটিয়েছে, নির্ব্বাসন, নির্য্যাতনের চরম ক্লেশ নীরবে সহ্য করতে শিখিয়েছে আর না হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে পরজন্মে আবার দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য রণাঙ্গনে এনে হাজির করেছে। কানাইলাল দত্ত বলেছে যে আপীল করে বৃথা সময় নষ্ট করে কি হবে? যে কদিন আগে মরতে পারি, সে কদিন আগে আবার মায়ের কোলে ফিরতে সুযোগ পাব, আমার বয়স সে কদিন বেড়ে যাবে।

"যুগান্তর" পত্রিকার আবির্ভাব ১৯০৬ সালের ৩রা মার্চ্চ। পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে শাসকগোষ্ঠির মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মে চেদীরাজের অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়েছিল, নব নব অশুভ লক্ষণ তাঁর রাজ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, ১৯০৬ সালে বাঙ্গলা সরকারের মনে সে অবস্থা হয়ে থাকবে। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে ওঠেনি .'সূচনায়' হুঙ্কার দিয়ে বলেছিল, "ভারতবাসীর একটা নিরঙ্কুশ স্বদেশ চাই। যুগান্তরের ভাষা পাওয়া যাবে না। ইংরেজের গুপ্ততথ্য রক্ষণাগারে যে ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, পর পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা তারস্বরে বলছে 'কোষমুক্ত তরবারি অত্যাচারীর হাতে শক্তিহীন কিন্তু তারাই আবার ন্যায্য অধিকার বা ধর্ম্ম রক্ষায় দুর্দ্দম দুর্ব্বার অপরিমিত শক্তির আধার।" পরেই বলছে, আজ হয় ত নীরবে জীবন দান করতে হবে, কিন্তু কে বলতে পারে যে কাল সেই লোকই ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়ে বিজয়ী হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করবে না?"

"রাজার ভয় কোথায়?" প্রশ্নের উত্তরে প্রবন্ধ বলছে "অত্যাচারজর্জ্জরিত লোক যদি একবার এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে জীবন উৎসর্গ না করলে শত বৎসরের দাসত্ব মোচন হয় না। সেটাই শাসক-গোষ্ঠীর বিপদের লক্ষণ।"

আবার বলছে, "পাঠকের মনে হতে পারে যে তারা অতি দুর্ব্বল অথচ প্রবলপরাক্রান্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বার শক্তি তাদের কোথায়?" উত্তর "মাভৈঃ ইটালী রক্তস্রোতে আপনার মসী রেখা মুছে ফেলেছে...... আজ কি দশ হাজার বাঙ্গলার সন্তান পাওয়া যাবে না, যারা মৃত্যুর আলিঙ্গনে মাতৃভূমির কলঙ্ক মোচন করতে পারে?"

"অর্থের প্রয়োজন?" এসে যাবে লুঠ ও ট্যাক্স আদায় করে মেটাতে পারা যাবে। অস্ত্র সংগ্রহের কথা জজদের রায়ে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ছোট্ট একটি ছাপাখানায় বারীণের সংগৃহীত মাত্র পঞ্চাশটি টাকার ওপর নির্ভর করে পত্রিকা প্রচারের দুঃসাহস জেগেছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও দু-একটি সমচিন্তাশীল সঙ্গীর মাথায় এঁর ছিলেন দেবব্রত বসু অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪১-এ চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনে অফিস অবস্থিত এবং কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্-এ মুদ্রিত হত। বলা বাহুল্য একটা নির্দ্দিষ্ট ছাপাখানা থেকে রূপ নিয়ে বেরুবার সৌভাগ্য তার হয় নি। পুলিশে তাড়া করে বেড়িয়েছে, সুতরাং পলাতক জীবন যাপন করতে হয়েছে।

বড মজার অফিস। পত্রিকা পরিচালনা সংক্রান্ত জন পাঁচ ছয় যুবক ছাড়া আর দুচার জন কখনও আসে কখনও যায়, তাদের নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। কাগজ বেরুচ্ছে, সপ্তাহে মাত্র একদিন। মূল্য এক পয়সা, বাৎসরিক চাঁদা দেড় টাকা মাত্র।

কাগজ বিক্রি থেকে যা আসে আর তার থেকে যা যায়, তার পরিমাণ হিসাব করার প্রয়োজন হত না।

একটা কাঠের বাক্স ছিল কর্ম্মকর্ত্তাদের ব্যাঙ্ক। প্রায়ই ফাজিল জমা থাকত, তখন বাইরে থেকে কিছু সংগ্রহ করার প্রয়োজনই স্বাভাবিক। "যুগান্তর" পরিচালনা সম্পর্কিত বিশেষতঃ তার আর্থিক ব্যাপারটা হাঁদা কমিউনিষ্টকে হার মানিয়ে দেবে। সেখানে নির্দ্দিষ্ট অংশ. অধিকার লাভ বণ্টন কর্ত্তৃত্ব সবই ন্যস্ত ছিল একই সময়ে সবার ওপর। রাজদণ্ড ভোগটা উপরন্তু লাভ।

যুগান্তর পত্রিকা যখন বাইরে আসর গরম করে তুলছে, তার অন্দর মহলের চিত্রটা জানায় আনন্দ আছে। অন্যতম সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ লিখেছেন (নির্ব্বাসিতের আত্মকথা) "যুগান্তর" বাহির হবার পর লোকে কানাকানি করে যে যুগান্তরের আড্‌ডাটা না কি বিপ্লবের কেন্দ্র।......

দুই চারিদিন আনাগোনা করিতে করিতে ক্রমে যুগান্তরের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। দেখিলাম সকলেই জাতকাট ভবঘুরে বটে। দেবব্রত (ভবিষ্যতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) বি এ পাশ করিয়া আইন পড়িতেছিলেন। হঠাৎ ভারত উদ্ধার হয় হয় দেখিয়া, আইন ছাড়িয়া 'যুগান্তরে'র সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দর ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ ভট্টাচার্য্য এই পাগলাদের সংসারে গৃহিনী। বিশেষ যুগান্তরের ম্যানেজারি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর সংসারের অনেক কাজেরই ভার তাহার উপর।

ইংরেজ বিতাড়নে যারা বদ্ধপরিকর, তাদের কারখানা, অস্ত্রাগার, তোপ, কামান বন্দুক, গোলাগুলির বহরের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন: "৩।৪ জন যুবক মিলিয়া এক খানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তাঁহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরেজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশী কিছু বড় নয়, এ বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত।" প্রকৃত পক্ষে এইখান থেকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে তাতেই বিপ্লবের দাবাগ্নি সৃষ্টি হয়ে ভারতকে গ্রাস করেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

সম্পাদকদের মধ্যে প্রথম দিকে দেবব্রত ছিলেন। কিছুদিন বাদে তিনি "নবশক্তি" অফিসে চলে যান। ভূপেন বারীন আর উপেন্দ্রর ওপর সম্পাদনার সমস্ত ভার পড়ে যায়। ছেঁড়া মাদুর আর ভাঙ্গা একটা বাক্স হলো আসবাব। হাতিয়ার হল গোটা দুতিন ভাঙ্গা ষ্টীল পেন। টানা হেঁচড়ার মধ্যে কাগজ বেরোয়, পুলিশ আনাগোনা আরম্ভ করেছে। কিন্তু এর ভেতর অনলবর্ষী লেখা চলেছে। উত্তেজনা বশে মাথামুণ্ডু কি লেখা হল বোঝবার সময় নেই, কিন্তু ছাপার অক্ষরে দেখা গেল "যেন দেশের প্রাণপুরুষ ঐ দু'তিনটি ছ্যামড়ার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।"

বলা বাহুল্য, পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বেশ বোঝা গেল বারুদের গন্ধ বাঙ্গলার ছেলেদের নাকে খুব ভালই লাগছে। যত লোকে পড়ে, তার একটা বড় অংশ যে এর মতবাদ সমর্থন করে, উদ্যোক্তারা সেটা বেশ অনুভব করতে লাগলেন। পাঠক জুটবে কি না, সঙ্গতিরও অভাব, তাই পত্রিকা এক হাজারের মত প্রথমটা ছাপা হল। কিন্তু অসম্ভব চাহিদা। "এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার, দশ হাজার হইতে এক বৎসরে বিশ হাজারে ঠেকিল।" হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেছিলন " the crowds seeking to Purchase it formed an obstrcuction on the street"

গভর্ণমেণ্ট নিজেকে বিব্রত মনে করলো। প্রতি সংখ্যার প্রবন্ধ অনুবাদ করে পাঠালে ওপর মহলে ইতি-কর্ত্তব্য স্থির করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তখন ঠিক হল প্রতি লেখা বিচার করে রাজদ্রোহের

মামলায় জড়িয়ে নাস্তানাবুদ করা। ১৬ জুন (১৯০৭) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো "লাঠ্যৌষধি" ও ২৩ জুন "ভয় ভাঙ্গা।"

"সম্পাদকের নাম" পত্রিকায় থাকতো না তখন পত্রিকা গোপনে ছাপা হতো ৭, শান্তি রাম ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে। গভর্ণমেণ্ট একটু ফাঁপড়ে পড়ে গেল। আমলা ঠিক করে পুলিশ সম্পাদকের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। ৪১ চাঁপাতলা ফার্ষ্ট লেনে অফিসে বেলা ৫টায় উপস্থিত। সেদিন ১ জুলাই (১৯০৭)। ছোট বড় সবাই সম্পাদক সাজতে চায়। অবধারিত জেল জেনেও "এ বলে আমি ও বলে আমিই সম্পাদক"। পুলিশের মহা বিপদ। উপেন্দ্রনাথ বলেন "শেষে ভূপেনই একটু মোটাসোটা ও তাহার বেশ মানানসই দাড়ি আছে বলিয়া তাহাকেই সম্পাদক স্থির করা হইল।' সুতরাং কালবিলম্ব না করেই পুলিশ ভূপেনের নামে মামলা রুজু করে দিলে। ৫ই জুলাই (১৯০৭) ভূপেন কোর্টে হাজির হলে ৫০০০৲ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

পরের তারিখটা ২২ জুলাই ১৯০৭। একটা কথা এখানে বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা শুনতে শুনতে প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছি, বা বিশ্বাস করতে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে, যে ১৯২১ সালের আগে বিদেশী শক্তির সঙ্গে অসহযোগ বিশেষতঃ আদালতে, করার কথাই ওঠেনি, বিদেশীর বিচারালয়কে উপেক্ষা করা ত দূরের কথা। সেটা যে কত বড় মিথ্যা তা এই যুগান্তকারী "যুগান্তর" মামলায় প্রকাশ পায়।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী অবিচলিত কণ্ঠে বললেন্ "আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক এবং মামলার বিষয়ীভূত সমস্ত প্রবন্ধের জন্য আমি একাই দায়ী। আমার সরল বিশ্বাসে দেশের প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য বলে মনে করেছি, তাহাই আমি পালন করেছি। আমি আর দ্বিতীয় জবানবন্দী দেব না এবং বিচারাধীন মামলায় আমি আর কোনো অংশ গ্রহণ করবো না।"

হাকিম সাহেব (২৪শে জুলাই) রায়ের মধ্যে বল্লেন যে "ভয় ভাঙ্গা" প্রবন্ধের সুরুতেই ব্রিটিশ শাসনকে একটা অবাস্তব বড় প্রহসন এবং সামান্য ঠেলা দিলেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে বলে লেখা হয়েছে। দেশের লোকের বোকামির ওপর ইংরেজ সাম্রাজ্য টিকে আছে; তার শক্তিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয় এবং তার পতনের জন্য মাত্র একটি ধাক্কার প্রয়োজন"।

"পরেই 'লাঠ্যৌষধি' প্রবন্ধে লেখকের মনের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে পাঞ্জাবের ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যেই সেখানে জলের ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হল, মাত্র কয়েক দিন বিফল আইনানুগ আন্দোলন চালাবার পর তারা মার আরম্ভ করে দিয়েছিল। লেখক বলেছেন, "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি" অর্থাৎ লগুড় প্রয়োগে সরকারী লোকের মাথা গুড়ো হয়েছে, ঘর বাড়ী জলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকস বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, 'কাবুলি দাওয়াইয়ের' মত সদ্য ফলপ্রসূ হাতিয়ার আর নেই।"

সম্পাদকের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো এবং প্রেস বাজেয়াপ্ত হলো। হাইকোর্ট ৬ আগষ্ট প্রেসকে মুক্তি দেয়। ভূপেন্দ্রনাথের জবানবন্দীর ওপর (১৯০৭) ২২ জুলাই "সংন্ধ্যা" লিখলো "কেউটের ফোঁস" তাতে সরকারকে সতর্ক করা হল যে এ সকল মামলায় দেশে আগুন ছড়িয়ে পড়বে। সাজা শাস্তি দিয়ে আর জাতিকে দমন করা যাবে না। এইবার রাজশক্তি কেউটের ল্যাজে পা দিয়েছে, কিন্তু তার ছোবলের কথা স্মরণে রাখা উচিত'। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা বল্লে "এ মামলায় আত্মিক বল পাশবিক বলকে অত্যন্ত হেয় করে দেখিয়েছে। মামলায় নিজ পক্ষ সমর্থন না করায় আসামী প্রমাণ করেছেন দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য কায়িক ক্লেশ অতি সহজে উপেক্ষা করা চলে।"

সম্পাদক বলে পরিচিত ছিলেন ভূপেন, আর ম্যানেজার ছিলেন অবিনাশচন্দ্র। সুতরাং তার পরে মামলায় অবিনাশকে জড়াবার সুযোগ উপস্থিত হল। মুদ্রাকর ও প্রকাশক হলেন বসন্তকুমার ভাট্টাচার্য্য। সে সময় ৩০ শে জুলাই প্রকাশিত হলো "মিথ্যা ভয়।" আগষ্ট ৫ : "মিথ্যা পূজা" আর আগষ্ট ১২ "সিডিশন ' বিদেশী রাজ।"। এই প্রবন্ধগুলির জন্য অবিনাশ ও বসন্তকে রাজদ্রোহের অপরাধে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটে আদালতে হাজির করা হয়। সেপ্টেম্বর ২ (১৯০৭) অবিনাশ মুক্তি পান আর বসন্তর দু-বৎসর সশ্রম কারাদ' ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়েছিল, হাইকোর্ট সে আদেশ রদ করে।

সরকারী রোষবহ্নি যত জ্বলে উঠছে, "যুগান্তর" সকল উৎপীড়নের জন্য দেশকে তৈরী করে নিয়ে চলেছে ১৪ ডিসেম্বর (১৯০৭) প্রবন্ধ প্রকাশিত হল "হিন্দুবীর্য্য পঞ্চনদে।" সঙ্গে সঙ্গে মামলা আরম্ভ হল বৈকুণ্ঠচ আচার্য্যর বিরুদ্ধে। মামলায় দাখিল হল, পত্রিকার মনোভাব প্রমাণের জন্যে, ১৯ আগষ্ট লেখা "'ইংরাজের স্বরূপ "বসন্তর সাজ।" 'আমাদের আশা" ৩০ নভেম্বর : "আত্ম নির্ভরতা" "বিধির বিধান" (Divine Dispensation আর ডিসেম্বর ৭ তারিখে : "স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম।" এ সবই আদালতে হাকিমের সামনে পেশ করে দেওয়া হলো সুতরাং আসামীর মতিগতি যে রাজভক্তির অতিশয় প্রতিকূল সেটা প্রমাণিত হতে বিলম্ব হলো না। বৈকুণ্ঠ আচার্য মুদ্রাকর হবার জন্য আবেদন করেছিলেন ১৫ সেপ্টেম্বর (১৯০৭) : সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল ৮ অক্টোবর। ৯ জানুয়ারী (১৯০৮) তাঁর আড়াই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হলো।

সাজা দিতেই হবে সুতরাং দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না "বাক্যটি এখানে সপ্রমাণিত হল। ' রায়ে ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে "বেঙ্গলী" পত্রিকা ২৯ জানুয়ারী ১৯০৮ লিখলে যে, আসামী রাজার শিখ সৈন্য ভাঙ্গাবা চেষ্টা করেছে। কিন্তু "যুগান্তর' বাঙ্গলায় লেখা, আর শিখরা এক বর্ণও বাঙ্গলা পড়তে জানে না, সুতরাং এ অজুহাত একান্ত অবান্তব। "তার জন্যে দণ্ডদান বন্ধ থাকতে পারে না অবশ্যই।"

এর পরই ফণীন্দ্রনাথ মিত্রের পালা। তিনি ছিলেন বাঁকিপুরে "মাদার ল্যাণ্ড" (Motherland) পত্রিকা সম্পাদক।

এসে জুটলেন যুগান্তরের আস্তানায়, একাধারে মুদ্রাকর ও প্রকাশক রূপে। কলকাতায় ১৭ই এপ্রিল (১৯০৮) তাঁ বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হলো। একগাদা ব্রিটিশ বিদ্বেষপূর্ণ প্রবন্ধ বেরিয়ে গেছে। ৭ই মার্চ্চ : "আমরা শান্তি চাই না", ৪ এপ্রিল : ইংরেজের যথেচ্ছাচার", ১৮ এপ্রিল : "যুগান্তর-এর নমস্কার (solutation), "বর্ত্তমান সমস্যা" "বিপ্লবের আবাহন"' বা এস বিপ্লব "(welcome unrest), "নূতন রীতি" (New creed) ফণীর নামে সমন জারি হলো, আসামী গরহাজির। তখন অফিস হচ্ছে ৬৮, মানিকতলা ষ্ট্রিটে। ২১ এপ্রিল আসামী আদালতে হাজির হলে প্রত্যেকটি আড়াই হাজার টাকার দুইটি জামীনে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো। ২৬মে রায় দিলেন হাকিম, ২৩ মাসের কারাবাস। ৪ঠা এপ্রিলের প্রবন্ধটী মামলার বিষয়ীভূত করা হয়। ১৫ এপ্রিল (১৯০৮) "সন্ধ্যা" সংবাদ দিলে যে পুলিস "যুগান্তর" প্রেসে পঞ্চমবারের হানা সমাপ্ত করলে।

মে ৯ (১৯০৮) প্রকাশিত প্রবন্ধ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র মামলা রুজু হলো। ইতিমধ্যে ২ মে প্রবন্ধ বেরিয়েছে "কালের ভেরী", যুগান্তর-এর প্রাণের কথা", "বলিই বা কি, লিখিই বা কি", "বর্ত্তমান সমস্যা।" এর প্রত্যেকটি আদালতে দাখিল করা হয়েছিল গভর্ণমেণ্টের প্রতি লেখকের বিদ্বেষ প্রমাণ করবার জন্যে অপরাধের গুরুত্ব দেখে মামলা হাইকোর্ট সেসনে পাঠানো হলো ২৩ জুন। ২২ জুলাই রায়ে তাঁর তিন বর সশ্রম কারাদণ্ডর আদেশ হলো। তাতে বিশেষ করে বলা হলো, পূর্ব্ব দণ্ড ভোগ করবার পর এই সুরু হবে। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে একাদিক্রমে ৫৯ মাস দণ্ড ভোগ করতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যায়, 'যুগান্তর'-এর সম্পাদকীয় লেখকগোষ্ঠী সদলবলে ধরা পড়েন ২রা মে (১৯০৮) মানিকতলা বাগানে। সুতরাং পরের সপ্তাহে, ৯ মে, একেবারে গায়ের সমস্ত জ্বালা মিটিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। তাতে ছিল উত্তিষ্ঠত!" "আমি এসেছি", "বিদ্রোহী কে", "পায়ে পিসে শত্রু হত্যা" (?) আর ছিল নিম্নলিখিত কবিতাটি :

"না হইতে মা গো বোধন তোমার
ভেঙ্গেছে রাক্ষস মঙ্গল ঘট,
জাগো রণচণ্ডি! জাগো মা আমার,—
পূজিব তোমার চরণ তট।
অগুরু চন্দন ধূলায় ধূসর
ভূমিতে লুটায় চামর চাঁচর,
মঙ্গল শিখা গিয়াছে নিভিয়া
হলো না বুঝি মা পূজন তোমার।
ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া,
জবা বিল্বদল গেল শুকাইয়া,
পূজার সময় যায় যে বহিয়া
জাগো মা আমার, সময় নিকট॥
দৈত্য-তেজ নাহি করি পরাভব।
বিজয় শঙ্খ কেন মা নীরব?
হুঙ্কারে বিনাশ প্রচণ্ড দানব
অট্ট অট্ট হাসে হাস মা বিকট।
এস রণচণ্ডি: এস রণ সাজে,
এস মা নাচিয়া সন্তানের মাঝে,
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার,
শিখাও জননি! সমর উৎকট।
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে।
সর্ব্বাঙ্গ তোমার সাজাব কঙ্কালে,
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন,
তুলিয়া আনি স্বাধীনতা ধন।।
জাগো রণচণ্ডি! জাগো মা আমার
পূজিব তোমার চরণ তট।।"

—ক্ষীরোদপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়—

এরপর ২৬ মে (১৯০৮) বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে পত্রিকার ভার নেন।

এবার পুলিশ সন্ধান পেয়েছিল 'যুগান্তর' ছাপা হচ্ছে নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের "সুমতি" প্রেস থেকে। ফণীন্দ্রকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসের মাল পত্র গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অবরুদ্ধ

মাল উদ্ধার করবার জন্য জুন (১৯০৮) মাসে নিখিলেশ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করেন। বহু দিন বাদে যা ফেরত পেয়েছিলেন, তাতে ছাপার কাজ আর চলে না। তখন প্রায় পুরাতন লোহার স্তূপে পরিণত হয়েছে। মামলাও চলছে, মাঝে মাঝে প্রেস আটক হচ্ছে। কাগজ আর নিয়মিত বেরোয় না। যদি কোনো ফাঁকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায়।

হঠাৎ একটা সংখ্যা, ৩০ মে (১৯০৮), সম্পাদকীয় প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হলো, "শক্তি পূজা" (বাঙ্গালীর বোমা)।' পাঠকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ার যত আগ্রহ, পুলিশের ততই তৎপরতা। ধরা পড়লেন, বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—মুদ্রাকর ও প্রকাশক। ৬ জুলাই মামলা আরম্ভ, আর ১৪ আগষ্ট রায়। তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়েছিল।

যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোক পুলিশের সন্দেহভাজন হয়েছে। এই সূত্রে তারা মহেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল। তাঁর সখ হলো, পুলিশকে দিন কয়েক হয়রাণ করা; বেশ গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, ধরা পড়ে গেলেন ২৬ জুলাই ১৯০৮। এ রকম আরও বহুজনের হয়েছে। দিনকতক টানাটানি করে ছেড়ে দিয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথ কারাগার থেকে মেয়াদ শেষে মুক্তি পাবার পর ও পুলিশের হাতে তাঁর নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁকে ৫ অক্টোবর ১৯১০ পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। কিছুদিন আটক রেখে মুক্তি দেওয়া হয়।

'যুগান্তর' মামলার প্রথম ফল, এক দল যুবকের মন থেকে কারাবাসের ভয় সম্পূর্ণ দূর হয়ে গিয়েছিল। তাদের কাছে এ একটা প্রহসন মাত্র। অনেকে নাম লেখাতে চেয়েছেন, তার মধ্যে ছিলেন দুই আবাল্য সুহৃদ, আমাদের ভাগ্যক্রমে আজও জীবিত, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় আর শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন (আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী)। ১৮ জানুয়ারী (১৯০৮) অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে দিয়ে "যুগান্তর" কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করতে গেলেন। হাকিম অতুলের দরখাস্ত নাকচ করে দিলেন; তার বয়স কম।

১৫ ফেব্রুয়ারী (১৯০৮) "যুগান্তর" এক বিজ্ঞাপন মারফত দরখাস্ত আহ্বান করলেন। যথা,—

কর্ম্মখালি! কর্ম্মখালি!!

বিশেষ সুসংবাদ

বয়স বিভ্রাট

'আকসানিয়ান' কায়দায় গোঁফদাড়ি কামানোটাই না কি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। তাহাতে বয়সের দোষ ধরে না। এখন দেখিতেছি সব উল্টো বুঝিলি রাম হইয়া গেল। বিলাতের কিংসফোর্ড সাহেব গোঁফশূন্য যুবককে নাবালক খাতায় রাখিয়া প্রিণ্টারের ডিক্লেরাসন দিতে চান না। কাজেই আমাদেরও বয়স বিভ্রাট ঘটিয়াছে। মুখুজ্যে মহাশয়ের গোঁফদাড়ি নাই কিন্তু বয়স ৪৫ হইলেও তিনি যুগান্তরের প্রকাশক হইতে পারিবেন না। অতএব যাহাদের গোঁফ আছে, দাড়ি আছে, তাঁহারা তাহার পরিমাণ ও নমুনা সহ সত্বর যুগান্তরের প্রিণ্টারের কাজের জন্য আবেদন করুন। কৃত্রিম গোঁফ হইলে চলিবে না। আমাদের মানস প্রিণ্টারেরা, যাঁহারা যুগান্তর অফিসে এ্যাপ্রেণ্টিসি করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও গোঁফ দাড়ি নাই। প্রতি সপ্তাহেই এক একজন প্রিণ্টারের দরকার হইবে। সুতরাং বহু কর্ম্ম খালি আছে। সত্বর আবেদন করুন। apply to A. B. C. D.

C/o কর্ম্মকর্ত্তা, "যুগান্তর",

৭৫, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।"

আলিপুর বোমার মামলায় যুগান্তর নিয়ে বীচ্‌ক্রাফ্‌ট জজসাহেব খুব আলোচনা করেন, হাইকোর্টেও সেই মত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়েছে। জজসাহেবের মতে যুগান্তরের প্রবন্ধগুলি ইংরাজ জাতের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করছে। তার প্রতি ছত্র বিপ্লব ঘোষণা করছে। কেমন করে বিপ্লব সংঘটিত হবে তার পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে। সাধারণ দেশবাসী এবং সহজে উত্তেজিত যুব-মনকে ইংরেজ বিদ্বেষের ভাবধারায় উন্মত্ত করে তুলতে, পত্রিকার কাছে কোনো নিন্দা বা ছলনা পরিত্যাজ্য বা উপেক্ষণীয় নহে। পত্রিকা যখন অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করেছে সেই সময়কার প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করলে দেখা যাবে যে সহস্র সহস্র পাঠকের মধ্যে বিপ্লবের চরম লক্ষ্য পরিস্ফুট করে তুলছে। ১৯০৭, ১২ই আগস্টের প্রবন্ধের ("স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম") ভূমিকায় কি ভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং বোমা তৈরী হতে পারবে, কতটা গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে সে কথার উল্লেখ করে প্রবন্ধকার বলেছেন যে শস্ত্রশক্তি সংগ্রহের আরও একটি উপায় আছে। রুশ বিদ্রোহে দেখা গেছে যে সৈন্যদের মধ্যে নানা দলের লোক আছে এবং বিপ্লব যখন রূপ গ্রহণ করে, তখন এদের মধ্যে অনেকেই নানা রকম অস্ত্র নিয়ে এসে বিপ্লবে যোগদান করে। ফরাসী বিপ্লবে এই পন্থা খুব সুফল প্রসব করেছিল। শাসককুল বিদেশী হলে এ সব বিপ্লব সংঘটনের সুযোগ আরও বেশী, কারণ তখন শাসিতদের ভিতর থেকে সৈন্য নিয়োগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই সকল দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে সতর্কতার সহিত গোপনে বিদ্রোহ সংক্রান্ত গুপ্ত আলোচনা চলতে পারে। যখন শাসকদের সঙ্গে প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয় তখন যে কেবল এই সকল সৈন্যদের সাহায্য পাওয়া যায় তা নয়, উপরন্তু তাদের মনিব কর্ত্তৃক যে সকল অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে, তারও সুযোগ পাওয়া যায়। উপরন্তু এ রকম ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর মনে দারুণ ত্রাস উৎপাদন করা সম্ভব হয়।"

ঐ মাসের ২৬ তারিখে "উন্মাদ যোগী" স্বাক্ষরে সরকারী ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং লেখক উহার মধ্যে গেরিলা-যুদ্ধের আভাস পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। মামলার রায়ে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং প্রত্যেকটিতে বিপ্লব আয়োজন ও জীবনদান ও গ্রহণের নির্দ্দেশ সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত বলে জজ সাহেবরা মন্তব্য করেন। বলা বাহুল্য এ সকল প্রবন্ধ বিপ্লবের দর্শন, বিজ্ঞান, প্রয়োগ-সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদনে উদ্বুদ্ধ করেছে: লক্ষ্য এক—সূচনায় বলা হয়েছে "ভারতবাসীর নিরঙ্কুশ স্বরাজ চাই।"

যুগান্তর বধ যজ্ঞের যে নিদারুণ প্রচেষ্টা হয়েছে, তার কিছুটা পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হয়েছে। ফলে পত্রিকা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি। মাঝে মাঝে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। আবার দুর্দিনে বেরিয়ে বাজার সরগরম করে তুলেছে। ৯ই মে থেকে কয়েকদিন বন্ধ থাকবার পর হঠাৎ ৩০ মে ১৯০৮) সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করলো। পুলিশ ত ছিলই; সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সংবাদপত্র (ইংলিশম্যান প্রমুখ) র চেহারা দেখলে আতঙ্কিত হয়ে উঠতো, গভর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করতো পত্রিকার পরিচালকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য। ১ জুন (১৯০৮) ইংলিশম্যান লিখলো—

"On Saturday last (30. 5. 08) Yugantar reappeared after a lapse of several weeks. It was a half-page sheet priced two pice and from early morning to afternoon sold in the streets like hot cakes, every Bengali being seen with a copy, which he read with much guests while passing along and on returning home handed to his wife and mother and thus helped in spreading revolutionary ideas in the Zenanua."

অর্থাৎ "মাত্র দুপয়সায় আধপাতা কাগজ ৩০ মে বেরিয়েছে এবং অতি আগ্রহে লোক কিনছে। প্রতি বাঙ্গালীর হাতে একখানা দেখতে পাওয়া গেছে; তারা পথ চলতে চলতেই পড়ছে। বাড়ী গিয়ে মহিলাদের কাছে দিচ্ছে এবং এইভাবে অন্দরেও বিপ্লব ভাবধারা ছড়িয়ে দিচ্ছে।"

বলা হয়েছে নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রকাশিত হবার নানা বাধা উপস্থিত হয়েছিল। সে কারণে জুনের (১৯০৮) প্রথম সপ্তাহে শনিবারের বদলে হঠাৎ শুক্রবারে যুগান্তর আবির্ভূত হলো আর পুলিশের টনক নড়ে উঠ্‌লো। এলাহাবাদ পাওনিয়ার পত্রিকা (৮ জুন ১৯০৮)র মতে পত্রিকা হাজারে হাজারে বিক্রী হয়েছে। দিনরাত্রি বিরাম নেই। লোকে দামের বিচার করছে না; প্রতি সংখ্যা এক টাকা বা তারও বেশী দিতে ক্রেতার অনিচ্ছা দেখা যায় না।

এ সময় "যুগান্তর"-এর পরিচালকরা বলেন পত্রিকা জনসাধারণের সমর্থনে চলছে এর অর্থ, লেখক, প্রেস কিছুই অভাব হবে না। কোনো ক্রেতা দামের দিকে লক্ষ্য রাখেন না, তাঁর দেবার শক্তির ওপর সব নির্ভর করে।

তিরোধানের পথে

১৯০৮ সালের ৮ জুন সংবাদপত্র দলনের নূতন আইন পাশ হয়েছিল মুখ্যতঃ "যুগান্তর" বন্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সে চেষ্টা সফল হয়েছিল। "যুগান্তর" পরের নভেম্বর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিরলভাবে মাঝে মাঝে বেরিয়েছে। ৫ নভেম্বর (১৯০৮) ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখেছিল চন্দননগর থেকে "যুগান্তর' প্রকাশিত হয়েছে। এতে শত্রুর রক্তপানেচ্ছু বাঙ্গালীকে প্রতিহিংসা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। নির্ব্বিচারে শত্রুর প্রতি রিভলভার ব্যবহার করতে, রিভলভার অকৃতকার্য্য হলে বোমা সে অভাব দূর করবে।"

হঠাৎ ১৯১০ সালে জুলাই মাসে এক সংখ্যা 'যুগান্তর' প্রকাশিত হলে পুলিশ ১৪ই জুলাই গণেন্দ্র নাথ যাদু ও আর দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনাই "যুগান্তর" সম্পর্কিত সর্ব্বশেষ সংবাদ।

"স্বদেশী যুগ" নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে; সে কালের সাহিত্য,—সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র,—কবিতা অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে নানা ধরনের পুস্তক পুস্তিকাও দেখতে পাওয়া যায়। 'যুগান্তর' সম্বন্ধে সেরূপ কিছু দেখতে পেয়েছি বলে মনে হয় না। তবে আমার পাঠ্য-জগৎ অতি সঙ্কীর্ণ। সুতরাং আমার অজানা প্রবন্ধ পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়ে থাকা অসম্ভব নয়। সে যুগে অনিয়মিত হলেও 'যুগান্তর' পড়বার সৌভাগ্য আমা হয়েছিল, এবং আলিপুর ও অন্যান্য মামলার বহু আসামীর মত আমিও বলতে পারি। যদি বিপ্লবের প দেশ সেবার প্রেরণা কোথাও থেকে পেয়ে থাকি, তা হলে হরিকুমার চক্রবর্ত্তী। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এ এন রায়) ও সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গলাভের সঙ্গে 'যুগান্তর' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার প্রবন্ধ আমার মতিগতি জন্য বহুলাংশে দায়ী। আজ পত্রিকার লেখকবৃন্দের এবং আমার বৈপ্লবিক রাষ্ট্রনীতির গুরুদের স্মৃতির প্র আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবার সুযোগ গ্রহণ করছি মাত্র।

লেপ-চিত্রাঙ্কণ

প্রবাদ আছে যে, "কালি ও কলম ও মন" এই তিন একত্র হইলে পরে লেখা হয়। চতুর্থ একটি পদার্থ তাহা ভূর্জ্জপত্র বা কাগজ বা ঐরূপ অন্য কিছুই হউক, আধাররূপে যে নিতান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চিত্রাঙ্কণেও কল্পনা, লেখনী বা তুলি, তরল বর্ণ (তুলির সাহায্য বিনা শুষ্ক বর্ণদ্বারাও হয়) ও চিত্রাঙ্কণের আধারস্বরূপ কিছু একটা থাকা চাই। আদিম প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের মানব তাহার বাসস্থল বা পর্ব্বত-গুহার গাত্রে প্রথমে স্থায়ী চিত্রাঙ্কণ করে। এখনও সেই গৃহ-চিত্রাঙ্কণ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। ক্রমে চিত্রাঙ্কণ আরও সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠে। তখন যে কোন পদার্থের সমতল ও বর্ণসংযোগ-উপযোগী গাত্র আছে, সে-সকলই আধাররূপে গৃহীত হয়।

ললিতকলার প্রধান উদ্দেশ্য—বোধ হয় কল্পনা-চক্ষুর পরিতৃপ্তি। যদি কেবল মাত্র ইহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে চিত্রাঙ্কণে স্থায়িত্বের কোনই প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, ব্যবসায়ের খাতিরেই হউক বা নিজ কার্য্যের নিদর্শন স্থায়ী করিবার জন্য শিল্পীর ইচ্ছার দরুণই হউক, আধার-ভেদে চিত্রাঙ্কণ (বা অন্য কোন কলা-পদ্ধতির) পদ্ধতি ও উপকরণ-ভেদ হয়। এবং এইরূপ ভেদের উদ্দেশ্য—যাহাতে বর্ণ বা আলেখ্যের বিকৃতি বা ক্ষয় সহজে না হয়।

ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ

মানুষের সংসার ও গৃহস্থালীর আবশ্যকীয় সামগ্রী সকলের মধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদি খুবই প্রচলিত। শয্যাসনরূপ গৃহসজ্জা, সিন্ধুক, পেটিকা ইত্যাদি মানবের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের সামগ্রীতে কাঠের ব্যবহার অতিশয় সাধারণ। অতএব সে সকল সর্ব্বদাই দৃষ্টির মধ্যে পড়ে এবং সেইজন্য, বাসগৃহের প্রাচীর যে-কারণে চিত্রিত করা হয়, সেই কারণে প্রত্যেকেরই, রূপরসের অনুভূতির মাত্রা অনুসারে, সে সকলকে অল্পাধিক কারুকার্য্য বা আলেখ্য দ্বারা শোভিত করার ইচ্ছা হয়।

এই ইচ্ছার ফলে সাধারণ উপায়ে আলেখ্য আলপনা হইতে বিশেষ পদ্ধতিতে ও বিশেষ উপকরণ সাহায্যে লেপ-চিত্রাঙ্কণ পর্য্যন্ত দারুশিল্পের একটি প্রধান বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আরম্ভ সাধারণ উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বর্ণে কাষ্ঠগাত্র রঞ্জন, ও চরম উৎকর্ষ জাপানী শিল্পীর লেপ-চিত্রাঙ্কণ।

এই লেপ-চিত্রাঙ্কণ কি?

বেনারসের কাঠের খেলনা, ব্রহ্মদেশের কাঠের কৌটা ইত্যাদি অনেকেই দেখিয়াছেন। কাঠের উ রঙ্গীন গালা বা অন্য পদার্থের লেপ দ্বারা ঐসকল সামগ্রী চিত্রাঙ্কণ বা আলেখ্য-ভূষিত হইয়া থাকে। ঐ প্রক কারুকার্য্যের নাম লেপ-চিত্রাঙ্কণ (Lacquer work)।

বিভিন্ন দেশে নানা উপায়ে ও নানা প্রথা অনুসারে ঐ প্রকার কারুকার্য্য হয়। তন্মধ্যে চীন ও জাপা লেপ-কারুকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, জটিল ও বিখ্যাত।

যদিও কাঠের স্বাভাবিক শোভা অনেক স্থলে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহা বর্ণ হিসাবে অতি সঙ্কীর্ণ সীম

জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ। প্রসিদ্ধ শিল্পী রিট্‌সুয়ো কৃত।

মধ্যে বদ্ধ এবং কাঠের স্বাভাবিক কয়েকটি দোষের কারণে তাহার উপর সাধারণ উপায়ে চিত্রাঙ্কণও সম্ভব নহে। কারণ অধিকাংশ কাঠেরই সকল অংশ সমান ভাবে বর্ণ গ্রহণ করে না এবং কাঠ স্বভাবতই ক্ষয়-প্রবণ।

ঐসকল দোষের প্রতীকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কাঠের উপর লেপ দ্বারা তাহাকে আবরণ-যুক্ত করা হয়। কাষ্ঠগাত্র আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তাহার ক্ষয়প্রাপ্তি হয় না এবং উপযুক্ত উপকরণের সাহায্যে যথাযথভাবে লেপ-প্রদান করিলে ঐ আবরণ রন্ধ্রশূন্য ও নির্ম্মল এবং নানা বর্ণে ও ছায়ায় চিত্র বা আলেখ্য অঙ্কনের উপযুক্ত হয়।

ইউরোপীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ডেভিড্ গ্যারিকের আলমারীর পাল্লা।

লেপ-কারুকার্য্যের উপকরণ নানা প্রকার। এদেশে প্রধানতঃ লাক্ষা হইতে প্রস্তুত নানা বর্ণের গালার ব্যবহার হইয়া থাকে। চীন ও জাপানে Rhus Vernicifera নামক বৃক্ষের ধূপজাতীয় নির্য্যাস (Gum and Resin) ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় শিল্পীগণ সুরাসারে দ্রবীভূত গালা বা গালার সহিত অন্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চীন ও জাপানের লেপ চিত্রাঙ্কণে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয় তাহার প্রয়োগ অতি কঠিন, কিন্তু তাহার ফলে উৎপন্ন কারুকার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে লেপ-চিত্রাঙ্কণের প্রধান উপায় নানাবর্ণের গালা।

যে-কাঠের দ্রব্যটি চিত্রাঙ্কিত করিতে হইবে, প্রথমে তাহা রেঁদা ও শিরীষ কাগজ, বা খরাদ যন্ত্রের (Lathe) সাহায্যে মসৃণ করা হয়। তাহার পর উপযুক্ত বর্ণের গালা তাহার উপর দ্রুত ঘর্ষণ করা হয়। ঘর্ষণের উত্তাপে গালা (অতি অল্প পরিমাণ) গলিয়া কাঠের উপর লেপভাবে সংলগ্ন হয়। এইরূপে গালা সংযোগের পর তাল বা খেজুর ডালের খণ্ডের দ্বারা গালার লেপ ঘষিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার পালিশ করা হয়। তাহার পর তৈলের প্রলেপ দিয়া ঘর্ষণের দ্বারা সমস্তটি মসৃণ করা হয়। ইহার পর এই উপায়ে ভিন্ন বর্ণের গালার দ্বারা প্রথম লেপের উপর অন্য একটি লেপ দেওয়া হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে চার পাঁচটি বা ততোধিক লেপ দ্বারা কাঠের দ্রব্যটি আচ্ছাদিত করা হয়।

পরে এই লেপ আচ্ছাদনের উপর বুলি (Graver, engraving tool) চালাইয়া আলেখ্য বা চিত্রাঙ্কণ করা হয়। বুলি দ্বারা উপরের আচ্ছাদন কাটিয়া যে যে বর্ণ

ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ

প্রয়োজন সেই বর্ণের লেপ অনাবৃত করা হয়। মনে করুন, প্রথম লেপ সবুজ, দ্বিতীয় লোহিত, তৃতীয় হরিদ্রা, চতুর্থ নীল ও সর্ব্বোপরি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ লেপ দেওয়া হইয়াছে। আলেখ্যের যে-অংশ সবুজ সে-অংশ

জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ। ফুজিয়ারা যুগ
(খৃঃ ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী)

কৃষ্ণ, নীল, হরিদ্রা ও লোহিত বর্ণের লেপ কাটিলেই সবুজ বর্ণ দেখা দিবে, যে-অংশ লোহিত তাহার জন্য কৃষ্ণ, নীল ও হরিদ্রা বর্ণের লেপ কাটিলেই হইবে। আলেখ্যের "জমি" কৃষ্ণ বর্ণই থাকিবে।

কখন কখন "জমি" লেপে রঙীন রাংতা (linfoil) বা অভ্রের খণ্ড বার্ণিশের সাহায্যে যুক্ত করা হয়। মসৃণ কারুকার্য্য শেষ হইলে পরে সর্ব্বোপরি স্বচ্ছ বার্ণিশের মসৃণ প্রলেপ দিয়া লেপ-চিত্রাঙ্কণ শেষ করা হয়।

কোন কোনও প্রদেশে সুরাসার বা অন্য তরল পদার্থে দ্রবীভূত বর্ণযুক্ত গালার দ্বারা এই লেপ দেওয়া হয়। এই প্রথানুসারে লেপ-চিত্রাঙ্কণ সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, কাশ্মীর (কাশ্মীরে কাগজের মণ্ড—papier mache—হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের উপরই উৎকৃষ্ট লেপ-চিত্রাঙ্কণ হয়), যুক্ত-প্রদেশে বেরেলী, বেনারস, মান্দ্রাজে কার্নুল, মান্দ্রাজ, মহীশূর ও সাওয়ান্টবাড়ী, এই সকলস্থানে হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশে এইরূপ লেপচিত্রাঙ্কিত কাষ্ঠদ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত। সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবহারের তৈজসপত্রাদিতেও এই শিল্পের নিদর্শন সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কাঠ, বাঁশ বা বেতের চাঁচরি দ্বারা বোনা (woven) দ্রব্যাদির উপর গালা এবং তেল ও বৃক্ষ-নির্যাস হইতে উৎপন্ন বার্ণিশ দ্বারা লেপ-কারুকার্য্য করা হয়। বহুল প্রচলনের ফলে সে দেশের এই কার্য্যের শিল্পীদিগের উৎসাহ বা ক্রেতার অভাব নাই, সুতরাং সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশের লেপ-চিত্রাঙ্কণের নিদর্শন সকল ভারতবর্ষে প্রস্তুত ঐ প্রকার দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সংস্কৃত (well-finished)। তবে এদেশের কারিগর উৎসাহ পাইলে কি প্রকার কার্য করিতে পারে তাহার পরিচয় দেশী রাজন্যবর্গের প্রাসাদাদির আসবাব-পত্রে পাওয়া যায়।

লেপ-চিত্রাঙ্কিত আবরণী (screen)

এদেশের দুই একটি স্থলে কয়েক ঘর মাত্র শিল্পী এখনও আছে,যাহাদের লেপ-কারুকার্য্য-প্রথা উপরোক্ত পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

রাজপুতানায় শাহপুরা নামক ক্ষুদ্র সহরে কয়েক ঘর শিল্পী আছে (অন্ততঃ পক্ষে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ছিল)। তাহারা প্রধানতঃ উট বা গণ্ডারের চর্ম্মনির্ম্মিত ঢালের বা অস্ত্র-শস্ত্রের খাপের উপর লেপ-কারুকার্য্য করে। তাহাদের ব্যবহৃত উপকরণের সহিত গালা ইত্যাদির বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। ইহারা বৃক্ষ-নির্য্যাস হইতে প্রাপ্ত ধুপ বা "গঁদ" জাতীয় নানা পদার্থের সহিত তৈল মিশ্রণে কয়েক প্রকার বার্ণিস (varnish) প্রস্তুত করে। ঐ বার্ণিস নানা প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহা দ্বারা নানা বর্ণের লেপ দান করা যায়। চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যটি পরিষ্কার ও উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া তাহার উপর ঐরূপ লেপ দান করা হয়। লেপ শুকাইয়া যাইবার পর তাহা অতিশয় যত্নের সহিত "পালিশ" করিয়া মসৃণ ও উজ্জ্বল করা হয়। পরে তাহার উপর ভিন্ন বর্ণের বা একই বর্ণের আরো দুই চারিটি লেপ প্রদান করিয়া প্রত্যেক লেপ শুকাইবার পর মসৃণ করিয়া লইলে পর জমী প্রস্তুত হয়। তাহার পর অপেক্ষাকৃত গাঢ় ও নানা বর্ণে রঞ্জিত বার্ণিস এবং সোণার পাত ইত্যাদি উজ্জ্বল পদার্থের সাহায্যে ঐ জমীর উপর রীতিমত চিত্র অঙ্কিত হয়। চিত্রাঙ্কণের পর

উহার উপর ক্রমে ক্রমে নানবর্ণের ও নানা ছায়ার পঁচিশ-ত্রিশটি লেপ সংযোগ করা হয়। কখন কখন কয়েকটি লেপ প্রদান, পরে চিত্রাঙ্কণ বা আলেখ্য, পুনর্ব্বার লেপ প্রদান ও চিত্রাঙ্কণ, এইরূপে স্তরে স্তরে লেপ ও খণ্ডে খণ্ডে চিত্রাঙ্কণ দ্বারা কারুকার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

মান্দ্রাজ প্রদেশের গাঞ্জাম, কদ্দা ও কার্নুল অঞ্চলে কয়েক ঘর কারিগর আছে, যাহাদের প্রথা অন্য আর এক রূপ। ইহারা প্রথমে হরিণের চর্ম্মখণ্ড জলে দুই তিন দিন ভিজাইয়া পরে তাহা ফুটাইয়া ও ছাঁকিয়া শিরীষ (glue) প্রস্তুত করে। ঐ শিরীষের সহিত শ্বেত ডামার (Dammer এক জাতীয় ধূপ) গুঁড়াইয়া উত্তম রূপে মিশান হয় এবং পরে তাহাতে জল দিয়া উপযুক্ত রূপ "আঠা" প্রস্তুত হয়। এই আঠার সহিত অতিশয় মিহি মৃৎভাণ্ডচূর্ণ ও ঘৃতকুমারী জাতীয় উদ্ভিদের নির্য্যাস (aloes)—তিন ভাগ চূর্ণ ও একভাগ নির্য্যাস—মিশাইয়া গাঢ় "কাই" (paste) প্রস্তুত হয়। যে দ্রব্যের উপর লেপ-চিত্রাঙ্কণ হইবে সেটি প্রথমে উত্তমরূপে মসৃণ করিয়া, তাহার উপর তুলীর ঐ "কাই" দ্বারা চিত্রাঙ্কণ করা হয়। চিত্রের রেখাসকল ক্রমাগত কাই সংযোগে জমী হইতে উৎক্ষিপ্ত (standing out in relief) করা হয়। চিত্রাঙ্কণের পরে সমস্ত দ্রব্যটির উপর এক "পোঁচ" শ্বেত "তেল রং" দেওয়া হয়। তৈল-বর্ণ প্রয়োগের পর সমস্ত জমী রৌপ্যপাতদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অঙ্কিত অংশ নানারূপ তৈলবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করা হয়। জমী ও আলেখ্য মধ্যে গিল্টী ও কাচখণ্ড প্রয়োগ দ্বারা বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধন করা হয়।

চীন ও জাপানের লেপ কারুকার্য্যের অন্যতম উপাদান উরুশি (Rhus Vernicifera) নামক বৃক্ষের নির্য্যাস। এই নির্য্যাস তাহারা ঐ বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা, সকল অংশ হইতেই পায়। তাহা কর্ত্তন-ক্ষত (incision) হইতে নির্গত হয়। ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন সময় ও আহরণ-প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত নির্য্যাসের গুণের যথেষ্ট প্রভেদ হয়।

উরুশি নির্য্যাস সংগ্রহের পরে তাহা নানা প্রক্রিয়া—যথা হীরাকষ, টুংতৈল, সিরকা (Vinegar) ইত্যাদি প্রয়োগ-দ্বারা শোধিত ও গুণযুক্ত করা হয়। ইহা দ্বারা উক্ত নির্য্যাস বিভিন্ন পরিমাণে স্বচ্ছতা, তারল্য ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি গুণ প্রাপ্ত হয়।
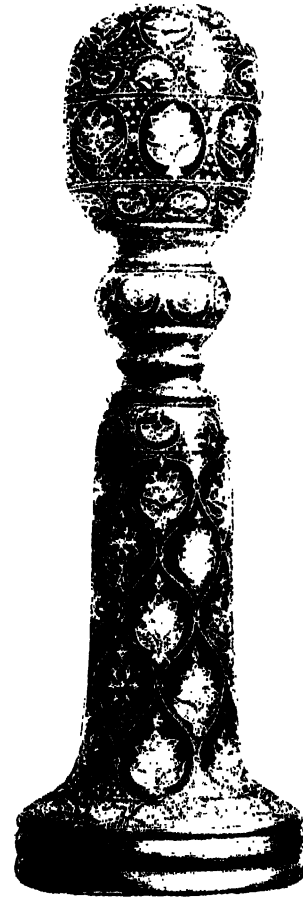
ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। সিন্ধু প্রদেশ

জাপানী শিল্পী প্রথমে অতি যত্নের সহিত কাঠ বাছাই করে। কঠিন, সূক্ষ্মআঁশ, ব্রণহীন, নির্ম্মল কাঠের তক্তা বা খণ্ড প্রথমে অতি যত্নের সহিত কর্ত্তিত ও সংযোজিত হয়। তাহার পর শোধিত উরুশি নির্য্যাসের সাহায্যে ঐ কাষ্ঠপাত্রের সহিত একখণ্ড মিহি ঠাসবুনন ক্ষৌমবস্ত্র (linen) সংলগ্ন করা হয়। তাহার পর সমস্ত দ্রব্যটির উপর (অন্ততঃ তাহার যে অংশে চিত্রাঙ্কণ হইবে তাহাতে) উরুশি নির্য্যাসের সহিত অন্য উপাদানের

মিশ্রণে প্রস্তুত "কাই"য়ের মোটা দুই তিন স্তর লেপ দান করা হয়। ঐ সকল লেপ শুকাইলে পরে তাহা "শান-পাথর" (whetstone) দ্বারা ঘষিয়া উত্তমরূপে মসৃণ করা হয়।

ইহার পর প্রকৃত লেপ-চিত্রাঙ্কণ আরম্ভ হয়। প্রথমে "চ্যাপ্টা" ক্ষুদ্রলোমযুক্ত (মানুষের চুল এ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) তুলির দ্বারা, সূক্ষ্ম ও সমভাবে, শোধিত উরুশি নির্য্যাসের একটি লেপ বিস্তার করা হয়। তাহার পর আর্দ্র অবস্থায় দ্রব্যটি গরম ও স্যাঁৎসেঁতে কুলুঙ্গী বা আলমারীতে শুকাইবার জন্য রাখা হয়।

শোধিত উরুশি নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত বার্ণিশের একটি বিশেষ গুণ আছে। উহা আর্দ্র উষ্ণ বাতাসেই উত্তমরূপে শুষ্ক হয়। একবার শুকাইলে তখন জল, বাতাস, উত্তাপ (৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত) কোন কিছুতেই নষ্ট হয় না।

শুকাইবার পর তাহাকে কাঠকয়লা গুঁড়া দ্বারা হাতে ঘষিয়া সমানভাবে মসৃণ করা হয়। একটি লেপ বিস্তার শুকান ও মসৃণ করিতে এক হইতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে। এইরূপে চিত্র বা আলেখ্যবিহীন সাধারণ লেপযুক্ত দ্রব্যে ত্রিশ হইতে সত্তর বা আশী স্তর লেপ দত্ত হয়।

চিত্র ব আলেখ্য অঙ্কন ইত্যাদির নানারূপ প্রথা জাপান ও চীনে প্রচলিত আছে। স্তরে স্তরে ভিন্ন বর্ণের লেপ দিয়া পরে উপরের স্তরে কর্ত্তন দ্বারা নীচের বর্ণের প্রকাশ; কাষ্ঠগাত্র ক্ষোদিত করিয়া তাহাতে বর্ণযুক্ত লেপ প্রয়োগ, "জমীতে" সোনালী বা রূপালী পাত কিম্বা মুক্তাশুক্তি-যোজন দ্বারা রচনা, উদ্ভিজ্জ বা খনিজ বর্ণমিশ্রিত গাঢ় হইতে অতি তরল নানাপ্রকার উরুশি বার্ণিসের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত (in relief) বা সাধারণ চিত্রাঙ্কণ, চিত্র বা আলেখ্যের মধ্যে উজ্জ্বলবর্ণ ধাতু, খনিজ, মুক্তাশুক্তি ইত্যাদি ঘন পদার্থের (solid) খণ্ড সংযোজন,—এইরূপ বিভিন্ন প্রথায় ভূষিত লেপ কারুকার্য্যের নিদর্শন জাপানে পাওয়া যায়।

ভারতীয় লেপ-চিত্রাঙ্কণ। মাদ্রাজের কার্নুল অঞ্চল

চীনদেশেও নানা প্রকার লেপ কারুকার্য্যের প্রথা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে কোরোমাণ্ডেল Coromandel Lacquer) প্রথায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদিই প্রসিদ্ধ। এই প্রথামতে প্রথমে মসৃণ কাষ্ঠগাত্র শ্বেতাভ মৃত্তিকাজাত বর্ণ ও বার্ণিসের সংমিশ্রণে প্রস্তুত "কাই" দ্বারা (স্তরে স্তরে) আচ্ছাদিত হয়। তাহার উপর কয়েকস্তর কৃষ্ণবর্ণ বার্ণিসের আচ্ছাদন দেওয়া হয়, যাহাতে লেপ আচ্ছাদনের উপরিভাগ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে
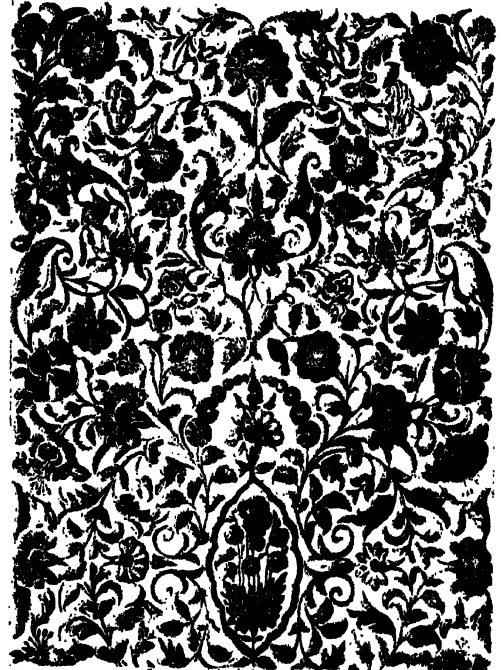
চিত্রাঙ্কণের সময় শিল্পী উপরের কৃষ্ণবর্ণ লেপ লি দ্বারা কাটিয়া নীচের শ্বেতবর্ণ প্রকাশ করে। তাহার পর সেই অনাবৃত অংশ নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া ঙ্কনকার্য্য সমাপ্ত করে। এই প্রকার-লেপ চিত্রাঙ্কণ সৌন্দর্য্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু স্থায়িত্ব হিসাবে জাপানী প্পের কাছেও আসে না।

পাশ্চাত্য দেশসকলে চীন ও জাপানের শিল্পের সমাদর বহুকাল হইতেই আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশে ঐরূপ শিল্পের অনুকরণেরও সূত্রপাত হয়। কিন্তু চীন ও জাপানের শিল্পীর সহিষ্ণুতা, পুরুষানুক্রমগত অভিজ্ঞতা ও উরুশি নির্য্যাস ব্যবহারের গুপ্ত সঙ্কেত তাহারা কোথায় পাইবে? সুতরাং সে দেশের লেপ-শিল্প অনুকরণ হিসাবেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, শিল্প হিসাবে বিশেষ কিছু নয়। সেখানের শিল্পী সুরাসারে দ্রবীভূত নানাবর্ণের ও বর্ণহীন গালা, ও তাহার সঙ্গে কর্পূর, নানা প্রকারের ধূপ ইত্যাদির মিশ্রণ (Mixture) দ্বারা লেপ কার্য্য করে। প্রথমে কাষ্ঠের গাত্র শিরীষ কাগজ ইত্যাদি দ্বারা মসৃণ করা হয়। তাহার পরে এক "পোঁচ" মিশ্রিত লাক্ষাদ্রব্য প্রয়োগ করা হয়। ইহার উপর জিলাটিন, বিশেষভাবে প্রস্তুত "সফেদা" ও জল এই তিনের মিশ্রণে প্রস্তুত আচ্ছাদন-উপাদান (undercoat) বেশ সমভাবে মোটা তুলির সাহায্যে লেপিত হয়। আচ্ছাদনের গাত্র অতিযত্নের সহিত মসৃণ করিয়া তাহার উপর তুলি দ্বারা একস্তর লাক্ষাদ্রব্য লেপন করা হয়। লেপস্তর শুকাইলে তাহা শিরীষ কাগজ ও পামিস পাথরের গুঁড়া (Pumice Powder) দ্বারা মসৃণ করিয়া তাহার উপর আবার আর এক স্তর লাক্ষাদ্রব্য, এইরূপে পাঁচ ছয় স্তর লেপ দান করা হয়। উহার উপর তৈলবর্ণ (Painter's oil colour) ও তুলির দ্বারা সাধারণ তৈলচিত্রাঙ্কণের প্রথায় চিত্র বা আলেখ্য অঙ্কিত এবং তাহা শুকাইলে তাহাকে অতি সন্তর্পণের সহিত মসৃণ করিয়া সর্ব্বোপরি এক স্তর তৈল বার্ণিসের আচ্ছাদন সংযোগ করিলেই পাশ্চাত্য প্রথা মতে লেপ-চিত্রাঙ্কণ সমাপ্ত হয়।

সাধারণ চিত্রাঙ্কণে কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বিস্তার (two dimensions) থাকে। নিপুণ শিল্পী, চিত্রে বর্ণের ছায় ও বিভিন্ন অংশের আয়তন প্রভেদ অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) দ্বারা তৃতীয় দিকে বিস্তারের (third dimension) একটি কৃত্রিম অনুভূতি দান করেন। ভাস্কর্য্যশিল্পে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ও স্থূলতা বা বেধ এই তিন দিকেরই প্রকৃত বিস্তার থাকে। কিন্তু তিনদিকে প্রকৃত রূপে বিস্তার রাখিবার কারণেই ভাস্কর্য্যশিল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্র ও তাহার উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে চিত্রশিল্প হইতে বিভিন্ন। চিত্রশিল্পে প্রতিকৃতি অঙ্কনে (Portraniture) অল্পসংখ্যক প্রতিরূপের সন্নিবেশ ও বিন্যাস হইতে প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রণে (Landscape-painting এ) বহুসংখ্যক প্রতিরূপের সংযোজন পর্য্যন্ত, সমস্তই সম্ভব, ভাস্কর্য্যশিল্পে তাহা নহে। চিত্রশিল্পে বর্ণ আলোক ও ছায়ার প্রভেদে একই পদার্থের বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন সম্ভব, যথা রাত্রির অন্ধকার মধ্যে ক্ষুদ্র শিখায় আলোকিত এবং মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত একই সুন্দরীর দুইটি বিভিন্ন রূপের চিত্র। ভাস্কর্য্যশিল্পে সে প্রকার প্রভেদ প্রদর্শন করা যায় না। আবার ভাস্কর্য্যশিল্পে গুরুত্ব (mass), শক্তি (energy), অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদির প্রতিরূপ যেরূপ বিকশিত হয়, চিত্রশিল্পে তাহা সম্ভব নহে।

জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ। (খৃঃ ১২শ শতাব্দী)
স্বর্ণ-নির্ম্মিত প্রজাপতি ও পুষ্প শোভিত কারুকার্য্য।

উৎক্ষেপ (relief work) প্রথানুযায়ী শিল্প, (দোষ গুণ হিসাবে) চিত্র ও ভাস্কর্য্যশিল্প, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে স্থিত। চিত্রশিল্পের ন্যায় পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা আপেক্ষিক অবস্থানের আভাস দেওয়া, বা ভাস্কর্য্যশিল্পের প্রথায় তিন দিকের বিস্তার (কিয়ৎপরিমাণে) দিয়া প্রতিরূপবিন্যাসে দৃঢ়তা ও রচনায় লালিত্য (Strength in composition and grace in form) প্রদর্শন, এই দুইই উৎক্ষেপ প্রথায় সম্ভবপর হয়।

উৎক্ষেপণ, তক্ষণ বা উৎকীরণ (engraving) এবং বর্ণযোগে চিত্রাঙ্কণ এই তিন প্রথার সমাবেশে যে ললিতকলা-নিদর্শনের সৃষ্টি, তাহাতে একাধারে বর্ণচ্ছায়ার রম্যতা, গঠন ও রচনার লালিত্য ও প্রতিরূপবিন্যাসের সমতা ও দৃঢ়তা সকলই পাওয়া যায়, এবং নিপুণ শিল্পী কর্ত্তৃক যথাযথভাবে ও সামঞ্জস্যের সহিত পরিকল্পিত ও নিষ্পন্ন হইলে তাহা যে বিশেষভাবে নয়নসুখকর হয়, তাহা বলা বাহুল্য।
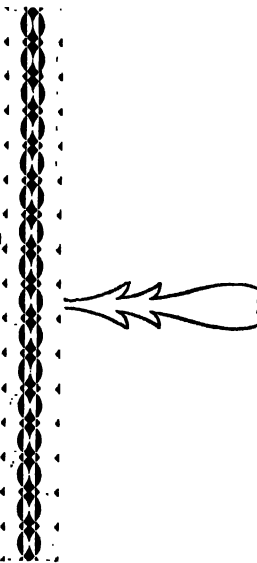
যে সকল শিল্পপ্রথায় এইরূপ সমাবেশ দেখা যায়, তাহার মধ্যে মিনা ও লেপ-চিত্রাঙ্কণ (বিশেষে জাপানী লেপ-চিত্রাঙ্কণ) সর্ব্বোত্তম। তরল ও স্নিগ্ধ বর্ণযুক্ত আভাময় স্বচ্ছ মিনা বা লেপ-রাশি, তাহার আবরণের ভিতরে উজ্জ্বল হইতে নিষ্প্রভ নানাবর্ণে ও ছায়ায় অঙ্কিত চিত্র, চিত্রের বিভিন্ন অঙ্গ যথাযথভাবে উৎক্ষিপ্ত ও উৎকীর্ণ, এবং সেই শিল্পদ্রব্যের সর্ব্বাঙ্গের, আলোকরশ্মির বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে প্রতিফলন কারণে, ঘনীভূত বর্ণ ও দীপ্তিপুঞ্জসদৃশ প্রকাশ,—কলাশিল্পে ইহা অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ কল্পনা করা কঠিন।

অবশ্য এইরূপ কলাশিল্পে ললিতকলার প্রধান প্রধান অঙ্গের ন্যায় অবিমিশ্র ও শুদ্ধ ভাব নাই, সুতরাং ইহা লঘুকলা (Minor arts) নামে খ্যাত। কিন্তু চীনদেশীয় বা জাপানী (বিশেষে জাপানী) লেপচিত্রে শিল্পীর ঋজু দৃঢ় রেখাপাত, বর্ণ সমাবেশে অসাধারণ বর্ণসামঞ্জস্য ও ছায়া-প্রভেদ-জ্ঞানের পরিচয়, বা তাহাদের উজ্জ্বল ও নিষ্প্রভ, শীতল ও উষ্ণ (warm & cold colours and tones) এবং পরস্পর-বিরোধী (contrasting) বর্ণসমুচ্চয়ের স্বভাব-জাত বিশিষ্টতার সহিত সংস্থাপন দেখিলে তাহাদিগকে ললিতকলার সভায় উচ্চাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

(স্বর্গীয় কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা হইতে)

সকাল বেলায় বাজারের থলিটা নামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ খবরের কাগজের বড় বড় হরফগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে।

স্টালিন গ্রাড্ ইউক্রেনের পতন আসন্ন

সিঙ্গাপুর বর্মা রেঙ্গুন জাপান কবলে

বাংলায় বন্যা

ক্রিকেট সিনেমা

দেওয়ালে ক্লক-ঘড়িটায় টং টং করে আটটা বাজলো। ইন্দ্রজিৎ চমকে ওঠে। নটায় অফিস। বেঙ্গল-টাইম-ঘড়ি নয়, ঘোড়া।

ইন্দ্রজিৎ কলে গিয়ে ঢোকে।

মধ্যবিত্ত ঘরের জীবন-আলেখ্য।

জীবন নয়, মেশিন। খাটে, খায়, ঘুমোয়।

কোনোরকমে নাকে মুখে দুটো দিয়ে ইন্দ্রজিৎ অফিসে এলো। ঠিক সময়ে আসতে সে কোনোদিনই পারে না, আজো পারলো না।

বড়বাবু শুধু চেয়ে দেখলেন।

অফিসে ইন্দ্রজিৎকে সবাই ভালবাসে। বড় সাহেব বলে, সুপারম্যান। এর কারণও আছে। ইন্দ্রজিতের চেহারাটা ঠিক পাঠানের মতো। যেমন বলিষ্ঠ গঠন তেমনি রং। এক-একটা লোক আসে যারা জন্ম থেকেই প্রমিনেন্ট। মহাভারতের যুগে যেমন অর্জুন এসেছিল। এরা সব্যসাচী।

প্রকৃতিদত্ত সব উপকরণ পেয়েও কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মানুষ হতে পারলো না। মানুষ হবার চেষ্টা করে সে দেখেছে, শুধু কতকগুলো ঘটনাই তৈরি করেছে, এর বেশি সে কিছুই পারেনি।

বড়বাবু অক্ষয় দত্ত জাত-কেরানি। তিনি বলেন, নিজের ভাবনা ভাবতেই সময় কেটে গেল, পরের ভাবনা ভাববো কখন?

রক্ত যাদের গরম তারা বড় বাবুকে বিদ্রূপ করে। এই কেরানি তৈরিই ইংরেজের বড় সাক্সেস্।

নন্‌কো-অপারেশন করে ছাত্রাবস্থায় ইন্দ্রজিৎ একবার জেলে গিয়েছিল। সেখানেও সে দেখেছিল মানুষের মধ্যে একটা জ্বালা—রাবণের চিতার মতো অহর্নিশ জ্বলছে। যা চায় তারা পায় না, যা পায় তা তারা চায় না।

তারা পেলো না কিছুই, অথচ এই পৃথিবীতে এলো। যে পৃথিবী ফলে ফুলে রাজার ঐশ্বর্যে পূর্ণ। মানুষের প্রতি ভগবানের এত বড় বিদ্রূপ বুঝি আর কিছু নাই!

ওহে ইন্দ্রজিৎ, বড়বাবু গলা বাড়িয়ে বললেন, তোমার তো অনেক মিলের সঙ্গে জানাশোনা—কিছু চাল যোগাড় করে দিতে পারো?

জানাশোনা থাকলেই কি আর ওরা দেবে? আমার নিজের চাল সংগ্রহ করতে আমার স্ত্রীকে যেতে হয় কন্‌ট্রোলের লাইনে।

কনট্রোলের লাইনে! বড়বাবু আঁত্‌কে উঠলেন।

এতে লজ্জিত হবার কিছু নাই অক্ষয়বাবু। একজনকে তো দাঁড়াতেই হবে।

তোমার তাই উচিত ছিল ইন্দ্রজিৎ। অক্ষয়বাবুর স্বর রুক্ষ হয়ে উঠলো।

কিছু না। আমার মর্যাদা নিয়েই আমার স্ত্রীর মর্যাদা।

তবু তিনি ভদ্রঘরের বধূ—

ইন্দ্রজিৎ হেসে বলে আমাদের আবার মান! কোন্‌টা রাখতে পেরেছি বলুন? আর কেই বা-চেনে? চমকে আমরাই পরস্পরে উঠ্‌বো, কিন্তু ধনীরা জানে, আমাদের গর্ব করবার কিছু নাই।

ইন্দ্রজিৎ আর কিছু না বলে তার কাজ করে যেতে লাগলো। অক্ষয়বাবু আপনমনেই খানিকক্ষণ গজ্‌গজ্‌ করে গেলেন: ঘৃণা মানুষ এইজন্যেই করে, আমরা নিজের মর্যাদা রাখতে জানি না। দুদিন পরে মেয়েরা আর স্বামীর ঘর করতে চাইবে না, তখন সবাই মিলে দোষ চাপাবো ঐ মেয়েদেরই ঘাড়ে। মেয়েদের কি দোষ?

বড় সাহেব এসে বললে, তোমাদের এক বাঙালি-মেয়ে টাইপিষ্টের কাজ চায়।

ওসব মেয়েদের নিয়ে কোনো কাজ হবে না সাহেব। বলে অক্ষয়বাবু গর্জে উঠলেন।

সাহেব হেসে চলে গেল।

টাইপিষ্ট বিনয় একটু বাঁকা হেসে বললে, যাক্ আমাদের ডিপার্টমেন্ট তা হলে এবার একটু রসিয়ে উঠলো।

রস না গাঁজিয়ে ওঠে। বলে অক্ষয়বাবু তাঁর মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে চাইলেন।

কিছু হবে না অক্ষয়বাবু! কাজ করতে করতেই ইন্দ্রজিৎ বলে। এই চাকরিটুকু না পেলে পেটের দায়ে ঐ মেয়েটিকে হয়ত দেহ-বিক্রি করতে হতো। আজ মেয়েরা দলে দলে সিভিল সার্ভিসে যোগ দিচ্ছে, কেউ নার্সিং এ যাচ্ছে—খোঁজ নিয়ে দেখবেন, এ ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। আমরা যারা রোজগার করি, আজকের বাজারে তা অতি যৎসামান্য। অর্ধাশনে, অনশনে কত সংসার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তার খবরও সংবাদপত্রে দৈনিক ছাপা হচ্ছে।

তুমি থামো হে, সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ গেল—যা নিয়ে আমাদের গর্ব, আর রইলো কি?

আপনার টাকা আছে, পৈতৃক একখানা বাড়িও আছে, তাই না খাওয়ার জ্বালাটা টের পাচ্ছেন না। কিন্তু যারা সেটা হাড়ে হাড়ে পাচ্ছে, কোনো সংস্কারই তাদের আর বাঁধতে পারছে না।

জাহান্নামে যাবে হে, জাহান্নামে যাবে।

জাহান্নামের খবর তারা জানে না, তাই বোধ হয় বাঁচবার রাস্তা ওরা বেছে নিচ্ছে।

সে-বাঁচার কি কোনো মানে আছে?

বাঁচার সব মানেই এক।

অক্ষয়বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: সবাই তোমার ইয়ের মতো ইয়ে নয়—

বাঁধলো কেন অক্ষয়বাবু? 'ইয়ে' বলে ঢাকতে চাইলেও আমার স্ত্রীর কথা বলছেন এ সবাই বুঝতে পারছে। দৈত্যের গল্প জানেন তো, তালা-চাবির আগল ভেঙেও ওরা যা করবো মনে করে, তা করে।

সবাই করে না।

সবাই করে। আজ যে চাকরি করতে এসেছে, সে কোনোদিন কল্পনাও করেনি, এমন এক অফিসে এসে আপনাদের পাশাপাশি চাকরি করবে। এই বধূই একদিন আপনাদের দেখে ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়িয়েছে। এটাও ঐ সঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করুন।

কেন, দুমুঠো ভাতের যোগাড় আর কি কোনো উপায়ে হতে পারতো না?

হতে পারতো আপনার বাড়িতে দাসীবৃত্তি বা রাঁধুনীবৃত্তি করে। কিন্তু সেও তো চাকরি।

সে চাকরিতে তবু কিছু মর্যাদা ছিল।

যেটাকে মর্যাদা বলে মনে হচ্ছে, সেটা আপনার সংস্কার। নইলে দাসী-বৃত্তি করার কোনো মর্যাদা নাই।

তুমি তো বেশ বলে চলেছো হে। তা হলে তো পেটের দায়ে যারা সিনেমায় নামছে—

পেটের দায়ে কেউ সিনেমায় নেমেছে বলে আমার জানা নেই। কারণ রূপ না থাকলে ছবিতে নামানো চলে না। সিনেমায় তারাই যায় যাদের রূপ আছে। রূপ সেখানকার প্রধান লক্ষ্য এবং সেখানে যারা যায় তারাও জানে ঐ রূপ ভাঙিয়েই তাদের খেতে হবে।

কিন্তু যাই বলো দাদা, বিনয় মুখার্জি বলে, অফিসে যারা আসে তারা ফ্লার্ট করতেই আসে।

হয়ত কেউ কেউ আসে। কিন্তু এ প্রশ্ন তো সর্বত্রই আছে। বিয়ে করা সকল স্ত্রীই যে স্বামীকে ভালবাসে এমন কোন কথা নেই। অনেকে ভাল না-বেসেও বাধ্য হয়ে ঘর করছে। আর ঘর-করা স্ত্রী মাত্রকেই যে সাবিত্রীর আসনে বসাতে হবে—অক্ষয়বাবুর মতে, এমনও আমি মানতে রাজি নই।

মেনো না হে, কিছুই মেনো না: অক্ষয়বাবু গর্জে উঠলেন। আজ বুঝতে পারছো না; পরে বুঝবে কি আদর্শ চলে গেল। ইন্দ্রজিৎ হেসে আবার কাজে মন দিলে।

খগেন বলে একটি ছেলে বড়বাবুর কাছে এসে বললে, আমাকে কদিনের ছুটি দিতে হবে স্যার !

ক'বছর চাকরি হলো ?

আজ্ঞে, এক বছর।

এই এক বছরে কবার ছুটি নিলে মনে আছে ?

বাড়ি না গেলে তো চলে না স্যার।

তোমার আবার বাড়ী কিসের হে ! বৌমা একটি হয়েছেন না কি ?

খগেন লজ্জায় ঘাড় হেঁট করলে।

বলো কি হে ! তোমার বিয়ে হয়েছে ? বয়স কত হলো ? সতের আঠার হবে।

শুনছো ইন্দ্রজিৎ, এই দুধের ছেলে বলে বিয়ে করেছি !

বিয়ে না করে মানুষ পারে না—ওটা একটা ডিজিজ। ব'লে ইন্দ্রজিৎ হাসলো।

এটাতো তুমি বেশ বলেছো হে !—'ডিজিজই বটে। আচ্ছা খগেন, তোমার বৌ-র বয়স কত ?

এগার বছর।

অক্ষয়বাবু চম্‌কে উঠলেন : এগার ! এযে ক্রিমিন্যাল হে ! না, না, তোমার বাড়ি যাওয়া হবে না, বৌমাটিকে আরো চার বছর বাপের বাড়িতে রেখে দাও।

খগেন লজ্জা পেয়ে বলে, আজ্ঞে, তাই দেবো। এবার আমায় ছুটি দেন।

অক্ষয়বাবু হেসে বললেন, মনে থাকে যেন, এই শেষবার।

খগেন চ'লে গেল।

তুমি ঐ কথাটি খুব ভাল বলেছ হে, 'ডিজিজ'। আমি নিজেও দেখেছি আমার জীবনে। আমার বিয়ে হয়েছিল পনের বছর বয়সে। ষোল বছরে ছেলের বাপ হয়েছি, তোমরা শুনলে অবাক হবে।

বলেন কি ! আপনি তো দ্বিতীয় অভিমন্যু, ইন্দ্রজিৎ বলে।

সে যাই বলো। কিন্তু এটা দেখেছি হে, যত অল্প বয়সই থাক, মেয়েরা কিছুতেই পিছ্‌পাও নয়। সবাই ভয় পেল, বাচ্চা মেয়ে প্রসব হতে না মারা যায়। কিছু না খুব সহজভাবেই প্রসব করে গেল।

আপনার বয়স তো তখন ষোল, তবে তাঁর বয়স তখন কত ?

আমার চেয়ে চার বছরের ছোট—তবেই ধর, তাঁর তখন বারো।

ঐ বারো বছর বয়সে যে-মেয়ে ছেলের মা হয়ে নিলে, তার সতীত্ব সম্বন্ধে অতি বড় শত্রুও কোনো কটাক্ষ করতে পারবে না।

মনে হলো অক্ষয়বাবু এই কথা শুনে গর্বিত হলেন। বললেন, মেয়েদের মন বড় ঠুন্‌কো হে, সকাল সকাল মা হয়ে যাওয়াই ভাল।

আপনার ক'টি হলো অক্ষয়বাবু ?

আমার সতেরটি ছেলে।

বলেন কি ! আপনার সতেরটি ছেলে ?

অন্য দেশ হ'লে স্টেট খেতে দিতো হে !

এদেশেও আপনার দান কেউ অস্বীকার করবে না অক্ষয়দা। ভদ্রমহিলার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক্।

কিন্তু সবই না হয় বুঝলাম। বিনয় প্রত্যুত্তরে বলে। অক্ষয়দার রোজগারে যেটা সম্ভব হলো সেটা আমার তোমার হ'লে কি হতো? সতেরটি ছেলে মানুষ করতে হলে যে বৌকেও চাকরির চেষ্টায় বেরুতে হতো!

এই কথাটিই যে অক্ষয়দা বুঝতে চান না। ইন্দ্রজিৎ একটু গরম হয়েই বলে। বাড়িতে দশজন খাইয়ে, রোজগারের বেলায় একজন। মেয়েদের রোজগার করবার যদি কেপাসিটি থাকে তবে কেন তাকে করতে দেওয়া হবে না।

আমার বলায় কি যায় আসে হে! দল বেঁধে মেয়েরা তো নেমে পড়েছে এবার—কেচ্ছাও অনেক শুনছি, আরো কত শুনবো!

প্রথম বাঁধ ভেঙে জল যখন ঢোকে, তখন একটু আধটু উচ্ছৃংখল হয় বই কি। পরে জল থিতিয়ে গেলে আর সেটা থাকে না।

বেশ বেশ! কিন্তু এই প্রথম মোহড়ায় শহিদ হবেন কারা?

সবাই হবেন। প্রথম জেনারেসনটা এইভাবেই চলবে।

ও এক জেনারেসনে হবে না ভায়া। রক্তের দোষ সাত জেনারেশন পর্যন্ত চলে।

বিনয় ইতিমধ্যে সাহেবের নোট নিতে গিয়েছিল। এসে বললে, বড় সাহেবের মেম এসেছে—দেখোগে, কি হাড়গিলের মত চেহারা।

সবারই বৌ যে সুন্দরী হয়ে আসবে তারই বা কি মানে আছে।

অক্ষয়বাবু হেসে বললেন, স্ত্রী-ভাগ্য ওটাও একটা সুকৃতি হে!

বিনয় বললে, অপরাধ নেবেন না—আপনার গিন্নীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে আমি দেখেছি ইন্দ্রজিতের বৌকে। পাঁচজনকে দেখাবার মতো বৌ বটে।

অক্ষয়বাবু এবারেও ইংগিত করতে ছাড়লেন না: সেই জন্যেই তো ভায়া কনট্রোলে ছেড়েছেন।

পোড়া ভাগ্য। লাইনের গুণ আছে, ঠিক মিশে গিয়েছে। আমাদের ঘরে ও আর ক'দিন। মাজাঘসা না করলে ইস্পাতেও মরচে পড়ে। ব'লে ইন্দ্রজিৎ হাসলে।

কেউ দেখো তো হে, খগেন আছে কি না?

বিনয় বলে, আর থাকে! তার তিনটের ট্রেন।

অক্ষয়বাবু ঘড়ির দিকে চাইলেন, পাঁচটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট আছে। এই সময়টা তিনি বার বার ক'রে ঘড়ি দেখেন! সময় যেন আর কাটতে চায় না।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বলে, দাদার সময় আর কাটতে চায় না। বাড়ি যাবার টান দেখি আমাদেরই হলো না।

বাড়ি যাবার টানে নয় হে! ট্রামে আবার উঠতে হবে তো। দেরি করলে আর জায়গা পাবো না।

বিনয় বললে জায়গা করে নিতে হয় দাদা।

অক্ষয়বাবু চাইলেন। বললেন, কি রকম?

আমার জায়গার অভাব হয় না। কোনো রকম ক'রে একবার একটু বসতে পারলে হয়, তারপর দেখবেন পাশের লোকটি সুর সুর ক'রে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

অক্ষয়বাবু আরো বিস্মিত হ'য়ে বললেন, বটে!

আমার পকেটে আইডোফরমের একটা শিশি থাকে—সব সময়েই থাকে, তার তীব্র গন্ধ পাশের লোকটির নাকে পৌছবামাত্র তিনি জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েন। ভাবেন, কোনো খারাপ ব্যারাম-ট্যারাম হবে হয়ত।

সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠলো। অক্ষয়বাবু কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, অতখানি নির্লজ্জ হ'
আমাদের বয়সে বাধবে।

কিন্তু আরামে যেতে পারবেন দাদা! বলেন তো, একটুখানি দি আপনাকে।

রক্ষা করো— কাজ নেই আমার অমন আরামে। বিরাম-বিহীন বাক্যবাণ যখন চতুর্দিক হতে বর্ষিত হবে তখ
কি আর আরামে বসতে পারবো ভায়া।

নাঃ, গাড়িতে যাওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। ইন্দ্রজিৎ বলে। দাঁড়িয়ে বা ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া নতুন ন
কিন্তু এখন যে-ক'রে যেতে হচ্ছে তাকে ভদ্রলোকের যাওয়া বলে না। তার ওপর আজকাল আবার মে
পকেটমার হয়েছে।

অক্ষয়বাবু হেসে বললেন, এটা কিন্তু নতুন আমদানী।

যুগ বদল হচ্ছে দাদা! পৃথিবীর পাতা নতুন করে লেখা হচ্ছে।

কিন্তু চমৎকার আইডিয়া। কেউ সন্দেহ করবে না ওদের, আর করলেও ব্লাউজের মধ্যে থেকে নোটের তাড়
বের করা বড্ড 'রিসকি।' খুব পার্টিকুলার না হয়ে একাজে এগোনো কঠিন।

তাও তো বের করেছে হে, এক আমারই মত বুড়ো। ব'লে অক্ষয়বাবু মৃদু হাসলেন।

বিনয় বললে, বুড়ো বলে রেহাই পেতেন না, যদি না বামাল ধরা পড়তো।

অক্ষয়বাবু পানের ডিবে বের করলেন। বললেন, খাবে না কি হে?

ইন্দ্রজিৎ হেসে ফেললে। দাদা এতক্ষণ ওটি বের করেন নি। এখন যাবার সময় বাসি পান খাইয়ে যাচ্ছেন
কেন, টাটকা পান খেতে যেতেও তো একদিন বলতে পারতেন।

অক্ষয়বাবু হেসে ফেললেন। বললেন, তবে সত্যিকথা বলি ভায়া, তোমাকে নিয়ে যেতে ভয় করে। তোমার ঐ
চেহারা দেখলে কোনো মেয়ের কি আর রক্ষা আছে। জানি না, তুমি পাড়ায় বাস করো কি ক'রে।

বিনয় বলে, সে কি দাদা, আপনার গিন্নীর তো বয়স হয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ হাসে।

তুমি হাসছো কি হে! সাহেব যে তোমাকে 'সুপারম্যান' বলে—সত্যিই তাই। তোমার আরব, বেলুচিস্তানে
জন্মানো উচিত ছিলো।

কই আর জন্মালাম দাদা! এই দেশেই একটা ভাল জায়গা পেলাম না, এমনি ভাগ্য।

দুঃখ করো না বন্ধু, চেহারার কোয়ালিফিকেসন একটা আছেই! দুদিন হয়ত দেরি হচ্ছে, কিন্তু 'দিন আগত ওই'
বলে অক্ষয়বাবু টেনে টেনে হাসতে লাগলেন।

ইন্দ্রজিৎ সত্যিই সুপুরুষ—শুধু সুপুরুষ কেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ। সোমেশ বলেছিল, আমি যদি ছবি আঁকতে জানতাম,
তোমাকে মডেল করে আমার কাছে রেখে দিতাম।

ইন্দ্রজিৎ হেসে উত্তর দিয়েছিল: আমার দুর্ভাগ্য।

সোমেশ ছবি আঁকতে না জানলেও, লিখতে জানে, সাহিত্যিক, গল্প লেখে। বিনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে কথা
সাজায়, আর লোকে তাই দাম দিয়ে কেনে।

মিথ্যা গল্প—যার কোনো কথাই সত্যি নয়, মানুষ তারই দাম দিচ্ছে। কোন্ মেয়ে কাকে ভালবাসলো বা না

বাসলো, তাদেরই মিথ্যা সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে মানুষ নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে হাসে কাঁদে। অর্থাৎ মানুষ নিজেকে তাদের আসনে বসিয়ে তাদেরই উপভোগ্য-বস্তুর রসাস্বাদন ক'রে তৃপ্তি পায়।

ইন্দ্রজিৎ একদিন বলেছিল, কত মিছে কথা তুমি জানো সোমেশ ?

মিথ্যে তো সবই ভাই। কোন্‌টা সত্যি।

তুমি আমি তো সত্যি।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বলেছিলো, চিরকাল তোমার একরকমেই গেল।

সোমেশ বিয়ে করেনি, এও এক আধুনিক জগতের বিস্ময়।

গোলদীঘির ধারে অত্যন্ত আকস্মিক দেখা হ'য়ে গেল সোমেশের সঙ্গে।

সেই সোমেশ। বাল্যবন্ধু সোমেশ।

ইন্দ্রজিৎ বললে, কোথায় আছো ?

কোন ঠিক নাই। কখনো হোটেলেও থাকি, বন্ধু বান্ধবের বাড়িতেও থাকি —সেটা পকেটের ওপর নির্ভর করে।

বললাম, একটা বিয়ে করো —তা তো শুনলে না

বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রত্যেক মানুষেরই একদিন হয়, তুমি কি মনে করো, আমি সব ইচ্ছাকেই জয় করে বসে আছি ?

তবে এমন করেই বা থাকো কেনো ?

ভাল থাক্‌বার ব্যবস্থা তো ভগবান করলেন না

আমার অবস্থাও তো তোমার চাইতে ভাল নয়।

তোমার বুকের ছাতি ছে'চল্লিশ ইঞ্চি—আমি অতটা পারবো কেনো। কিন্তু কি সুখে আছো বন্ধু ? মাঝখান থেকে একটা পিছুটান।

ইন্দ্রজিৎ হাসে। বলে, পিছু নয়, প্রবল টান। যে টানে পৃথিবীকে টেনে রেখেছে ঐ গ্রহগুলো। নইলে কোন্‌দিন ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতাম।

ছিট্‌কে যাবো কোথায় ? ছিট্‌কেই তো এসেছি। আমরা বটা করে আসিওনি, আমাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও নাই। এসে পড়েছি--এখন নিজেদেরই দেখে শুনে জায়গা ক'রে নিতে হবে।

তাই বা ক'রে নিতে পারলাম কই ?

সবাই কি আর পারবে। অত সহজ হবার হলে আমিই তো দখল করতাম তোমাদের ঐ ভূপতি চৌধুরীর বাড়িটা। বলে সোমেশ হাসল।

ভূপতি বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?

আমি তো বড়লোক নই ভাই। সাহিত্যের ওঁরা ধারও মাড়ান না, নইলে নামটার জোরেও হয়ত গিয়ে একদিন অতিথি হতাম। কিন্তু ভূপতিবাবুর খবর তো আমার চাইতে তোমারই বেশী জানবার কথা।

জানি না আবার ! আমাদের বস্তিটাই তো ওঁর বাড়ির তলায়। যেন ওঁর বাড়ির সিংহদরজার নীচে পাপোষের মতো আমরা পড়ে আছি।

সোমেশ গম্ভীর হ'য়ে বললে, একটু আধটু আলাপ রাখতে হয় ইন্দ্রজিৎ। আমাদের অতটা অহংকার ভাল নয়।

অহংকার ! অহংকার আবার কোথায় দেখলে আমার ? আমাদের ওটা করতেও নাই, করলে মানায়ও না।

সত্যি, বাড়িখানা দেখবার মতো। ভদ্রলোক যুদ্ধের বাজারে চোরাই কারবার করে নিশ্চয়।

ঐ তো বললাম, কোনো খবরই আমি রাখি না। উঠতে বসতে বাড়িখানা নজরে পড়ে—আর নজরে পড়ে ওদের চাল-চলনের জৌলুস।

চোখ জ্বালা করে নাকি?

জ্বালা কি না ঠিক জানি না, তবে ভাল লাগে না। একই জগতের মানুষ আমরা, ব্যবস্থা আলাদা কেন তাই ভাবি।

শুধু দেখে যাও বন্ধু, আত্মাকে ক্ষুব্ধ করো না। বলে হেসেই একটা চলতি ট্রামে সোমেশ উঠে পড়লো।

২

একখানা আধুনিক উপন্যাসের কয়েকটি পাতা উল্‌টে ভূপতি চৌধুরী হঠাৎ সিংহের মতো গর্জে উঠলেন: সব খেলা, খেলা, খেলা!

হাতের বইখানা মুড়েমুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন! তারপর আবার নিজের মনেই বকে চললেন: পৃথিবী জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গেল—দেশে অন্ন নাই বস্ত্র নাই, অনাহারে অর্ধাহারে শুকিয়ে লোকগুলো কাঠ হয়ে যাচ্ছে—এখন এলেন খেলা দেখাতে!

দাড়ির ওপর ঘন ঘন হাত চালিয়ে ভূপতি চৌধুরী তাঁর ক্ষুব্ধ বেদনাকে ভুলবার চেষ্টা করেন। সুজাতা মুখ টিপে হাসে।

লাইব্রেরী-ঘরে বসে ভূপতিবাবু সকাল বেলাটায় চা খান। এবং ঐ চা খাওয়ার ফাঁকটুকুতে হাতের কাছের বইগুলো একবার নেড়ে-চেড়ে দেখেন। এ তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন।

এই সময়টুকুতে তোমার পড়া হয় বাবা! সুজাতা চা ঢালতে ঢালতে বললে।

ধৈর্য ধরে পড়তে আমি পারিনে মা, তাই উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছই।

এতে লেখকের প্রতি অবিচার করা হয় বাবা।

কি করবো মা, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

সুজাতা জোরে হেসে উঠলো: লেখক একথা শুনলে নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা না করে পারবে না।

ভূপতিও হাসলেন।

তোমার এই লাইব্রেরী দেখে সোমেশবাবুর একটি লাইন মনে পড়লো বাবা, ধনীর লাইব্রেরী সাজাবার জন্যে, পড়বার জন্যে নয়।' জানি না তিনি তোমাকে দেখেই লিখেছেন কিনা।

সোমেশবাবুটি কে?

তিনি একজন নামকরা লেখক। তাঁর অনেক বই আছে আমাদের লাইব্রেরীতে।

বটে! ইচ্ছা থাকলেও পড়তে পারলাম না। একদিন শুনবো তোর মুখ থেকে কিছু কিছু।

কোনারকের পথে
কিঙ্কর বেইজ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আজকের কাগজ দেখেছো বাবা? রাশিয়া কি ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে।

পিছিয়ে যাবেই। তোমরা তো স্বীকার করবে না—এরপর পিছন থেকে জাপান যদি আক্রমণ করে, সাইবেরিয়ার মরুভূমিতে ওরা না খেয়ে মরবে।

কিন্তু জাপান আক্রমণ করবে না বাবা। তুমি দেখে নিও, অতবড় আদর্শের বিনাশ হবে না।

তোমাদের মতে হিটলারও তো একজন মহাপুরুষ।

ব্যক্তি হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁর ডিক্‌টেটরশিপকে কেউ পছন্দ করে না। কারণ ডিক্‌টেটরশিপ ইম্পিরিয়ালিজমেরই রকম ফের।

ও সব-ইজম-এর ছাপ একই রং-এ। দেশের লোক ধনীদের ঘৃণা করে কিন্তু তাদের টাকাটা খাট্‌ছে চারদিকে। অতবড় লেবার পার্টি—যার নামে তোমরা সম্ভ্রমে মাথা নত করো তা চলে ঐ ধনীর টাকায়।

ইম্পিরিয়ালিষ্টকে বাঁচতে হলে লেবারদের তো হাতে রাখতেই হবে বাবা। পুঁজিপতিদের এতবড় পাকাচাল আর দ্বিতীয় নাই। তোমার চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর এক কাপ দেবো বাবা?

দাও। যদিও চা-টা খুব বেশি খাওয়া হচ্ছে।

এই সময় বেয়ারা এসে একটা স্লিপ দিলে।

বাবুকো বৈঠ্‌নে বলো।

বেয়ারা সেলাম ক'রে চলে গেল।

সেদিন অজিত বলছিলো, যুদ্ধটা দূর থেকে যত ভয়ংকর মনে হচ্ছে, সেখানে তার অতটা মনে হতো না।

ভূপতিবাবুর কথা শুনে সুজাতা একটু হাসলে। বললে, ভয়ংকরকে জানতে হলে ভয়ংকরের মুখোমুখি হতে হয় বাবা। কলকাতায় কয়েকবার বোমা পড়লো বলে রেঙ্গুন-বর্মার অবস্থাটা তার চাইতে বেশি কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে গেলে লোকে আমাদের পাগলই বলবে।

তবু অজিত কতকটা প্রত্যক্ষ করেছে বই কি।

এবং আমরা পা'লিয়ে আসাটা প্রত্যক্ষ করলাম। নাও, চা খেয়ে নাও, নইলে এবারেও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাবা। বলে সুজাতা হাসলে। খবরের কাগজে ছাপা একটা বড় হেডিং এর ওপর ভূপতিবাবুর লক্ষ্য পড়লো: পিপ্‌লস ওয়ার—

কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, এতবড় মিথ্যা এরা লেখে কি করে।

সুজাতা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাইলে।

বৃটেন অবশ্য এই পিপ্‌লস ওয়ার-এর দোহাই দিয়ে রাশিয়াকে দলে টেনেছে। কংগ্রেসকেও এই কথা বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু গণযুদ্ধ তো এ নয়, মিথ্যা চীৎকার করলে চল্‌বে কেন! বলতে বলতে ভূপতিবাবুর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো।

সুজাতা কথার মোড় ফেরাবার জন্যে বললেন, তোমার অপেক্ষায় কে যে বসে আছেন বাবা!

ভূপতিবাবু ডাকলেন: কালীচরণ!

কালীচরণ আসতেই ভূপতিবাবু বললেন, বাইরে যে লোকটি বসে আছেন, তাঁকে বলো গে বাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না।

তুমি কি বেরোবে বাবা?

না, অফিসের কতকগুলো জরুরি চিঠি শেষ করতে হবে মনে পড়ে গেল।

এই লেখালেখির কাজটা তুমিই বা করো কেন? একজন লোক রাখলেই তো পারো।

সকল কাজ থেকেই তো অবসর নিয়েছি, শেষ এটাও যদি ছাড়ি, অকর্মণ্য হয়ে পড়বো।

না, তুমি বরং একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দাও।

তাই হবে। বলে ভূপতিবাবু কি মনে করে আবার ভাল হয়ে বসলেন।

পশু ঘরে ঢুকলো। পশু অর্থাৎ পশুপতি, ভূপতিবাবুর এক ছেলে—সুজাতার ছোট।

তুমি চা খেয়েছ পশু? সুজাতা জিগ্যেস করলে।

হাঁ। মেট্রোয় একখানা ভাল ছবি এসেছে দিদি। The wild beast.

বিষ্ট্ তো ওয়াইল্ডই হয় পশু।

দিদি যেন কি! পশু মাত্রেই ওয়াইল্ড হয়?—আমিও তো পশু।

ভূপতিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

সুজাতা হেসে বললে, তুমি যে মানুষ-পশু।

থাক। তুমি যাবে কি না বলো?

নিশ্চয় যাবো। অত ভাল ছবি যখন—

ভূপতিবাবু বললেন, Beast বানান কি পশু?

আজ ছবি দেখে শিখে নেবো বাবা।

গুড্। সুজাতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে।

আমি কিন্তু মাকে ব'লে আসছি দিদি! বলে পশু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজাতার মার আভিজাত্য একটু বেশি বনেদী। তিনি বাইরে বেরোন না। এই বাইরের মহলের সঙ্গে অন্দর-মহলকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাকেই তিনি বড় আভিজাত্য ব'লে মানেন। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তিনি বাইরের জগৎটাকে দেখবার চেষ্টা করেন—সবটা দেখা যায় না, কিন্তু যেটুকু দেখতে পান তাতে তাঁর গা ঘিন্ ঘিন্ করে। বলেন, এই শালীনতা হারিয়ে ওরা বাস করে কি করে!

একমাত্র কালীচরণ পুরনো চাকর ব'লে অন্দরে প্রবেশাধিকার পায়, নইলে আর সকলে বাইরে বাইরেই থাকে।

সুজাতার মার এই অহংকারকে কেউ প্রীতির চোখে দেখে না। আশ-পাশের বৌগুলো বড়লোকের এই ভেতর-মহলটুকু দেখবার চেষ্টা করে—আর চেষ্টা করেও যখন পারে না, তখন তাদের পর্দার পিছনের রূপটাকে বিকৃত করে। অবশ্য সে-নিন্দা পর্দা ভেদ করে পৌঁছোয় না—পৌঁছুলেও তারা গ্রাহ্য করে না।

ভূপতিবাবুর সঙ্গে অন্দরের যোগাযোগ সামান্য। এজন্যে গৃহিণীর নালিশ নাই। তিনি তাঁর অন্দর নিয়ে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠ। সেখানকার আইন-কানুন বিধি-নিষেধ অবহেলা করবার সাধ্যও কারো নাই। ছেলে-মেয়েদের সহবৎ-শিক্ষা এই অন্দরের পাশপোর্ট নিয়েই বেরিয়ে আসে, তারপর ভূপতিবাবুর হাতে পড়ে আধুনিক-ছাঁটে ঢালাই হয়। যদিও বনেদটা সাবেকি থাকার দরুন আলট্রামডার্ণের সমান তালে পা ফেলতে পারে না।

অজিতের বোন দেবী কিন্তু ঠিক উলটো, আলট্রা মডার্ণ ছাঁচে তৈরী। কারণ ওদের বনেদ বিলিতি পাথরে গাঁথা। ঊর্দ্ধতন কয়েক পুরুষ বিলিতি-খানার সঙ্গে পোক্ত হয়ে বিলিতি কায়দাকেই মানব সভ্যতার চরম এবং পরম আদর্শ বলে মেনে আসছেন! তারপর অজিত নিজে বিলেতফেরৎ হয়ে এসে খাদ্ যেটুকু বা ছিল, গালিয়ে বের করে নিলে।

এই দেবী হচ্ছে সুজাতার ক্লাসফ্রেণ্ড। এবং এই সূত্রেই এবাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির যোগাযোগ। অবশ্য অজিতকে প্রশ্রয় দেওয়ার মূলে ভূপতিবাবুর অন্য স্বার্থও ছিল, যেটা তাঁর মনেরই রচনা।

অজিত ছেলে ভাল। শুধু ভাল ছেলে বললেই সবটুকু বলা হলো না। বিলেতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় তার আসন এত উর্ধ্বে উঠেছে যে ইতিপূর্বে কোনো বাঙালী ছাত্রই সে সম্মান পায় নি।

যুদ্ধ তখনো সুরু হয় নি। অজিত বিলেত গিয়ে দেখলে, এ এক আলাদা জগৎ। মানুষের সঙ্গে মানুষের বহিরঙ্গ -ব্যবহার দূরও দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। চমৎকার এর বাইরের রং। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোথাও আত্মিক সম্পর্ক আছে, এদের দেখলে ভুলে যেতে হয়। ছেলেমেয়ে দাই-এর কাছে মানুষ হচ্ছে, বড় হলে ছিটুকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওদের দেশেও জাত আছে— বড় এবং ছোটোর জাত। বোধহয় এইখান থেকেই ইম্পিরিয়ালিজমের উৎপত্তি। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে অজিত এগুলো আয়ত্ত করলে।

অজিত অনেককিছুই শিখে বাংলার মাটিতে ফিরে এলো। সে আশা করেছিল, দেশের লোক তাকে সংবর্ধনা করবে। কিন্তু তখন মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। বর্মা-রেঙ্গুনের শোচনীয় পরিণামে দেশের পনের আনা লোক এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করছে। অন্নবস্ত্রের দুটো সমস্যাই মানুষকে আর অন্যকিছু ভাববার অবকাশ দিচ্ছে না। যারা পালালো তারা বাইরে গিয়েও বিব্রত হলো। রোগে ভুগে এবং সকল রকমে নিঃস্ব হয়ে তারা অবশেষে কলকাতাতেই বোমার ঘায়ে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ফিরে এলো।

এই সময় সুজাতা একদিন অজিতের বাড়ি এসেছিল বেবীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। এসে দেখলে, ওরা সবাই অজিতকে নিয়েই ব্যস্ত। অজিত যে পৃথিবীর একটি দুর্লভ্য বস্তু এইটিই তারা নানাভাবে পল্লবিত করছে। গল্প, কত কাহিনী ওরা মুখে মুখেই রচনা করে বন্ধুদের শোনায়। সুজাতাকেও কত কি শুনতে হয় সেই সব গল্প।

এক সময় সুজাতা অজিতকে ডেকে বলে, আপনার এসব শুনতে ভাল লাগছে?

অজিত কোনো কিছু না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এই অজিতকে নিয়ে ভূপতি বাবুও মনে মনে অনেক কিছু রচনা করেছেন। ইচ্ছা আছে, অজিতকে তাঁর মিলের ভার দিয়ে তাকে বিলিতি কন্‌ষ্টিটিউশনে গ'ড়ে তোলেন।

সুযোগ বুঝে একদিন সুজাতার কাছে সেই কথা পাড়লেন: মিলের একটা নতুন বন্দোবস্ত করা দরকার, ভাবছি, অজিতকে দিয়ে তার স্ট্রাক্‌চারটা—

বেশ তো বাবা, অজিতবাবুকে বলো।

শুধু বললেই তো হবে না মা। ও কোন্ ইন্‌টারেষ্টে কাজ করবে—মাইনের কথা তো ওকে বলা যাবে না।

সুজাতা পিতার ইঙ্গিত বুঝলো। বললে, মাইনের কথা এখন নাই বা বললে বাবা, তিনি কি সর্তে কাজ করতে রাজি হবেন জেনে নাও।

ভূপতি হাসলেন। বললেন, কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছিস মা। আমাকে তোর মনের কথাও জানতে দে।

সুজাতা মুখ নামিয়ে বলে, এত তাড়াতাড়ি কোনো ব্যবস্থা করা উচিত নয় বাবা।

আচ্ছা মা, তাই হবে। ব'লে ভূপতিবাবু তাঁর জরুরি কাজ শেষ করতেই যেন তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ সেদিন জ্বর নিয়েই অফিস থেকে ফিরলো। ঘরে এসে দেখলে কেউ কোথাও নাই। চৌকিটার ওপ বিছানাটা বিছিয়ে নিয়ে সে শুয়ে পড়লো।' মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, কাউকে ডেকে যে দুটো কথা জিগ্গেস করবে শক্তিও তার নাই। বিড়্ বিড়্ করে খানিকটা বকে সে থেমে গেল।

পাশের ঘরের বৌটা কার সঙ্গে দু পয়সার হিসেব নিয়ে ঝগড়া করছে। কলতলায় কলকলানি তখনো থামেনি রোয়াকে বসে দুলোটা মদ গিলছে। মাঝে মাঝে তারই বীভৎস হাসি কানে আসছে। ইন্দ্রজিতের মনে হলো সে যে শুয়ে শুয়ে যাত্রা শুনছে ঃ সেই ভীমের চীৎকার, দ্রৌপদীর কান্না, দুঃশাসনের উল্লাস। ওরা যেন সবাই মিলে দ্রৌপদী চুলের মুঠি ধরে টেনে এনেছে, দুঃশাসনের তাই এত উল্লাস।

ইন্দ্রজিতের শুক্‌নো ঠোঁটে হাসি এলো। দ্রৌপদীকে নিয়ে এমনি বস্ত্রহরণ আর কতদিন ধরে চল্‌বে? আঃ ঐ দুঃশাসন—ওরও কি মৃত্যু নাই!

কন্ট্রোলের চাল নিয়ে মনোরমা ঘরে এলো। রোজই তাকে এইসময় লাইনে যেতে হয়। প্রথম কদিন তাঃ যেতে পা সরেনি। কিন্তু লজ্জা করলে তো খাওয়া চলবে না। তারপর দেখেছে, এ বেশ সহজ কাজ কে কোথায় তাদের দেখে মুখ টিপে হাসলো—দুটো উড়ন্ত রসিকতা, দুটো অশ্লীল ভাষায় কে কি বললো ওর কোনো দাম নাই। ঘরে বসেও রাস্তার অনেক অশ্রাব্য শুনতে হয়: অত সহজে মেয়েদের জাত গেলে চলবে কেন! যাদের অনেক কিছুই নিজের হাতে করে নিতে হয়: ঝি রাখবার ক্ষমতা নাই—বাসন মাজতে হয়, বাটনা বাটতে হয়। তারপর পাঁচজনের বাড়ি—কতলোক আসছে যাচ্ছে, সরকারি কলতলা, আব্রুও বালাই নাই, যে আসে সেই দেখে। এই গা-সওয়া ইজ্জতের বড়াই আর ক'রে কি হবে?

মনোরমার বয়স বেশি নয়। বস্তির নোংরা আর হাওয়ায় তার রূপের জৌলুস এখনো ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যায় নি। বড় ঘরে থাকলে ঐ রূপেরই কদর হতো!

মনোরমা যখন ঘরে এলো' তখন ইন্দ্রজিৎ একবার চেয়ে দেখলে। চোখ দুটো তার লাল জবাফুলের মতো হয়েছে। একবার চেয়েই সে চোখ বুজলে।

মনোরমা বলে, কখন এলে? আর সন্ধ্যে না হতেই বা শুয়ে পড়লে কেন?

ইন্দ্রজিৎ বিড় বিড় করে কি বলে নিলে।

কি হয়েছে তাই বলো না, অত গজ্গজানি ভাল লাগে না বাপু।

একা জনার্দন কি করবে? লক্ষ লক্ষ দুঃশাসন গজিয়ে উঠেছে।

মনোরমা হাসে। বলে, সে আবার কি?

কাপড়ের দাম কত জানো মনোরমা? তোমার পরনের ওটুকু গেলে আর আমি কিনতে পারবো না।

কাপড়ের কথা আবার কখন বললাম?

তুমি বলোনি। কিন্তু কাপড় নিয়ে ওরা টানাটানিই বা করে কেন? ওরা দুঃশাসনের জাত: তোমার জনার্দন পারবে না। বলে ইন্দ্রজিৎ কিরকম করে হাসে।

তুমি কি নেশা করে এসেছো ?

ইন্দ্রজিতের দিক থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

মনোরমার কেমন যেন ভয় হলো। গায়ে হাত দিয়ে দেখে, পুড়ে যাচ্ছে। দুলোকে ডেকে বলে, কি করা যায় ঠাকুর পো ?

ডাক্তার ডাকতে হলে তো টাকা চাই বৌঠান। যতীন ডাক্তার আবার যে চামার—এক পয়সা ছাড়বে না। তার চেয়ে আমি বলি, আজকের দিনটা থাক্। কাল অবস্থা বুঝে—

অফিসে একটা খবর দিলে হয় না ঠাকুরপো ? যদি কেউ কিছু—

কেউ কিছু করবে না বৌঠান, দেখোই না কি শেষটা হয়।

একটা ভাল-মন্দ হতে কতক্ষণ। মনোরমা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে।

দুলোও কি যেন ভাবে। বলে, আমার কটা টাকা আছে, কাল না হয় মদ খেলাম না, কিন্তু ওতে তো হবে না। ডাক্তারের খাঁই যে তারো বেশি। ওরা ধার দেবে না এক পয়সাও : গরীবের বেলায় ভাল ওষুধও ওরা বের করে না, জল ঢেলে পয়সা নেয়। যতীন ডাক্তারের তো জল-বেচে পয়সা বৌঠান। নফ্‌রার ঠ্যাং খোঁড়া হলো, একটু টিংচার আইডিন চাইতে গেলাম, ব্যাটা যেন মারতে এলো ! আমারও মনে আছে, একদিন মদ খেয়ে শোধ তুলবো।

মনোরমা হাসলে। বললে, আমাদের তো অত রাগ করলে চলে না ঠাকুরপো। পরের অনুগ্রহ না পেলে গরীবের একটি মুহূর্ত চলে না।

তাই বলে এত অহংকার ?

যাদের সাজে তারাই অহংকার করে ঠাকুরপো !

ইন্দ্রজিৎ দু-একবার পাশ ফেরে, কিন্তু কোনো কথা বলে না। বলবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না।

রাত্রে ইন্দ্রজিতের অবস্থা আরো খারাপ হলো। মনোরমা কেঁদে-কেটে অস্থির করলে।

দুলো সেই রাত্রেই যতীন ডাক্তারকে নিয়ে এলো।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে দেখলে। বললে, আমার সঙ্গে এসো—ওষুধ দিচ্ছি।

দুলো বললে, ভাল ভাল ওষুধ দেবে ডাক্তার, এও তোমাকে বলে রাখছি !

যতীন ডাক্তার হাসলে। বললে আজ ক' বোতল হয়েছে ?

কই আর খেলাম ডাক্তার। সেই পয়সাই তো তোমাকে দিয়ে এলাম।

ডাক্তার আর কিছু না বলে দুলোকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দশদিন কেটে গেল, কিন্তু ইন্দ্রজিতের কোনো পরিবর্তনই হলো না। টেম্পারেচার সেই ১০৫' পর্যন্ত ওঠে, নামে দুই।

দুলো একদিন অফিসে গিয়ে খবর দিলে। বড় বাবু এলেন। অবস্থা দেখে তিনিও খুব চিন্তিত হয়ে ফিরলেন। বড় সাহেব বললেন, আমাদের বানার্জিকে খবর দাও।

শেষে বানার্জির ওষুধেই ইন্দ্রজিৎ ভাল হয়ে উঠলো।

কয়েকদিন বিশ্রাম করে ইন্দ্রজিৎ যখন অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো তখন মনোরমা দাঁড়ালো বেঁকে। বললে, আর কয়েকদিন বিশ্রাম না করে তোমার অফিসে যাওয়া চলবে না।

ইন্দ্রজিৎ চেঁচিয়ে উঠলো : চলবে না মানে ? আর কামাই করলে ঘরে ব'সে উপোস করতে হবে তা জানো।

আবার অসুখে পড়লে কি হবে সেটাও ঐ সঙ্গে ভাবো।

অত ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে আমাদের আর বাঁচা চলে না।

তাই ব'লে—

কিছু হবে না, আমরা দম দেওয়া ইঞ্জিন। দম যতক্ষণ আছে, ঠিক চলবো।

কথাটা দুলোর কানে গেল। বললে, ঠিক বলছো ইন্দির ঠাকুর, আমরা তো মেশিন গো। অসুখ হতো ঐ ভূপতি চৌধুরীর, দেখতে কি কাণ্ডটা। তুমি ভাবছো বৌঠান, ও কিছু হবে না—দুদিন জোয়াল কাঁধে নিলেই শরীর সেরে উঠবে।

তাই হলো, ইন্দ্রজিৎ অফিসে জয়েন করলো।

বড়বাবু বললেন, একটু নিয়ম করে চলো ভায়া—শরীরটা তো রাখতে হবে।

বিনয় বলে, একটু দুধ খাবার ব্যবস্থা করো।

ইন্দ্রজিৎ হাসে। বলে, দুধ সারাজীবনে খেলাম না। ও কি আর সইবে।

সারা শহর ককিয়ে উঠেছে : দুটি ভাত দে মা।

রাত্রে শুয়ে শুয়েও ইন্দ্রজিৎ এই ডাক শোনে। ঘুম ভেঙে কতদিন সে বিছানায় উঠে বসেছে। একদিন সত্যই সে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বললে, বেরো এখান থেকে—চেঁচাবার আর জায়গা পাসনি। কেন, ঐ বড় বাড়ির দরজায় গিয়ে মরো না।

মনোরমা আঁৎকে ওঠে। বলে, অমনি ক'রে কি বলে নাকি?

ইন্দ্রজিৎ ঝাঁঝিয়ে ওঠে : খেতে দিতে পারবে? বলো না হয়, পঙ্গপালকে ডেকে দিচ্ছি।

খেতে দিতে পারবো না ব'লে কু-কথাও বলবো না।

ইন্দ্রজিৎ আপন মনেই গজ্‌গজ করে। স্তব্ধ রাত্রির সেই করুণ বিলাপে তার বুকখানা মোচড় দিয়ে উঠেছে। চোখটা মুছে বলে, ওরা অমন ক'রে কাঁদে কেন?

দুটি ভাত দে মা, মা, মাগো!

তখন সবে ভোর হয়েছে। দুলু খন্‌খনিয়ে উঠলো : এত সকালে কে তাদের জন্যে রেঁধে বেড়ে বসে আছে-রে। বেরো, বেরো বলছি—দলের পর দল আসবে, সবারই ভাত যোগাবো কি আমরা? যা ঐ বড় বাড়িতে যা, যার বস্তা বস্তা চাল মজুত আছে। তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বলে, জান ইন্দির ঠাকুর—এরা খায় বেশ। খেয়ে খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে, তবু ওরা চেঁচাবে।

ওদের ক্ষুধা তো আজকের নয় দুলু, ওরা জানে, খেলেই বুঝি বাঁচবে। তাই যে যা পাচ্ছে গলাধঃকরণ করছে।

পরের সংসারের খবর তো বেশ রাখো দেখছি। নিজের ঘরে চাল নেই, সে হুঁস্ আছে? মনোরমা ঝাঁঝিয়ে উঠলো।

মনোরমা যাই বলুক, ইন্দ্রজিৎ ভাল ক'রেই জানে, কোথা দিয়ে কি হচ্ছে। অনেক সময় সে চোখ বুজে কিছু-না-দেখবার চেষ্টা করে। আবার অনেক সময় জেনেও গা ঢাকা দেয়। অফিসের বড়বাবু অনেকগুলো টাকা পাবে, বিনয়টার কাছ থেকেও সেদিন দুটাকা নেওয়া হয়েছে। মনোরমাও এর-ওর কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা ধার ক'রে বসে আছে। আর ধারই বা কে দেবে? তবে বস্তির লোকগুলো ভালো। হয়ত ভদ্রলোক দেখে ওরা একটু অনুকম্পাও করে।

মনোরমা বলে, আর আমি কারো কাছে হাত পাততে পারবো না, এও আমি তোমাকে ব'লে রাখছি।

দুলো বলে, এ মাসটা একটু টানাটানি হবে বই কি। খরচ তো কম হয়নি ওষুধে আর ডাক্তারে।

তাও অফিসের মাইনে আবার পুরো দিলে না। বলে ইন্দ্রজিৎ উদাস-দৃষ্টি মেলে শূন্য আকাশের দিকে একবার চায়

তবে যে শুনি, বড় সাহেব তোমাকে ভালবাসে! অমন ভালবাসার মুখে ছাই ব'লে মনোরমা মুখ বাঁকায়।

ইন্দ্রজিৎ কোন কথার জবাব দেয় না। কারণ জবাব দিতে গেলেই অশান্তি বাড়ে।

ঢুলো উঠে গিয়ে একটা টাকা নিয়ে এসে মনোরমার হাতে দিলো।

ইন্দ্রজিৎ হেসে ফেললে। বললে, সন্ধ্যের ফুর্তি তাহলে আজো বন্ধ?

ঢুলোও হাসে। বলে, আর-একটা টাকা রেখেছি।

সন্ধ্যে হ'লেই এই বস্তির রূপ বদলে যায়। যে যার কাজ-থেকে ফিরে আসে: কেউ নেশা ক'রেই আসে, কেউ এসে নেশা করে। কেউ কেউ আবার মেয়ে পুরুষে খাটে। সন্ধ্যার কলকলানি যেমনি বীভৎস তেমনি উলঙ্গ। বড় বড় কথা সেখানেও হয়—যার অধিকাংশ সত্য নয়। যুদ্ধের বিকৃত গল্প, আজগুবি ঘটনা, তুচ্ছ সংবাদ ফলাও ক'রে গলাবাজি, বড় বড় ঘরের অতি গোপন খবর—যা এইমাত্র তারাই কজন শুনে এলো। তাস পাশারও আড্ডা আছে—যে যা চায়। একটা ঘরে আবার যাত্রার আখড়া বসে, অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার মহলা চলে।

ইন্দ্রজিতের ভালও লাগে, আবার মাঝে মাঝে সে বিরক্তও হয়। কিন্তু এমনি করেই তো তার পাঁচ বছর কেটে গেল। অনেক সময় তার আভিজাত্যে ঘা লেগেছে, কিন্তু তখনি সে বুঝেছে ওটা কিছু নয়, বাঁচবার জন্যে অনেক কলংকের কালি তাদের মাখতে হয়—ওটাকে এড়ানো যায় না। যাদের সাজে তাদের জাত আলাদা। পাকাবাড়ির একখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকবার ব্যবস্থা করেও যখন জাতে ওঠা যাবে না, তখন এই ভাল। পারিপার্শ্বিকতার ছোঁয়ায় নিজেদের অনেকটা নীচে নেমে যেতে হয় সত্যি, কিন্তু তার বিপরীত আচরণেরই বা মূল্য দেবে কে?

পাড়ার এই বস্তিটি অনেকদিনের। ওদের কোলাহল ও বিশৃংখল-রূপ বস্তির স্বভাবধর্ম জেনেই সকলে মেনে নিয়েছে। যাত্রাদলের আখড়া—অনেক ভদ্রগৃহস্থের নিদ্রার ব্যাঘাত করে, তাও তাদের সইতে হয়।

ভূপতি চৌধুরী মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় পায়চারি করেন। ঘুম না হওয়ার যাতনা অনেকখানি—তাও তাঁকে নীরবে সইতে হয়। এক একবার ইচ্ছা করে ওদের ডেকে তিনি শাসিয়ে দেন। কিন্তু তারা সে-শাসন মানবে কেন একথাও ঐসঙ্গে ভাবেন।

সুজাতা বলে, এমন না-ঘুমিয়েই বা বাঁচবে কি করে? তুমি না পারো আমরা বলবো।

ভূপতিবাবু উত্তরে কিছু বলেন না। চুপ ক'রে ঐ বস্তিটার দিকে চেয়ে থাকেন।

তোমার চা এনে দেবো বাবা?

হ্যাঁ, তাই দে মা।

সেদিন অজিত ভূপতিবাবুর বাড়ি এসে বিনাড়ম্বরে ব'লে বসলো, একটা কথা আপনাকে জানাতে এলাম, আমি একটা পার্টি দিচ্ছি—যদিও এটা আমার অনেকদিন আগেই দেওয়া উচিত ছিল। অনেক বড় বড় লোক আসবেন। সুজাতাকে চাই আমার পাশে, অবশ্য যদি আপনার অপত্তি না থাকে।

ভূপতিবাবু চমকে উঠলেন। বললেন, আপত্তি থাক্‌তো না অজিত, কিন্তু কি ব'লে তুমি পরিচয় দেবে, সেটাও তো আমার জানা দরকার।

কেন, বন্ধু। মেয়েরা কি কোনদিনই পুরুষের বন্ধু হতে জানবে না ?

ভূপতিবাবু একটু হেসে বললেন, সুজাতার কি মত ? সেও কি এই কথা বলে ?

সুজাতা চা নিয়ে আসছিল। দরজার পাশেই কথাগুলো তার কানে গেল। বললে, তার পূর্বে জানা দরকার বাবা, পার্টিটা কিসের এবং কে কে আসবেন ?

কেনো, লোক-নির্বাচনের ওপর কি তোমার যাওয়া নির্ভর করছে ? বেশ রুক্ষস্বরেই অজিত জিজ্ঞাসা করলে।

নিশ্চয়। সব মেয়েরাই তো আর যেখানে-সেখানে যেতে পারে না।

আমার ধারণা ছিল, তুমি বেশ ফরওয়ার্ড।

এ ধারণা করাও ভুল আপনার। আমি বিলেতেও যাই নি, বিলিতি শিক্ষাও আমার বেশি নেই। কেবল বড়লোকের মেয়ে—এই যা কোয়ালিফিকেসন।

তাহলে তুমি যাবে না ?

যাবো না এমন কথাও তো বলিনি। আগে বলুন, আপনার পার্টিটা কিসের ? কারা আসবেন ? বসুন না, না হয় দুটো গল্পই করলেন। ব'লে সুজাতা হাসলে।

ভূপতি এইবারে যেন একটু আলো দেখতে পেয়ে বললেন, সুজাতা তো মন্দ বলেনি অজিত। বসো না : একটু আলোচনাই করা যাক্।

আলোচনা করবার এতে কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। ব'লে অজিত একটা চেয়ার টেনে বসলো।

সুজাতা বললে, বলুনই না-হয় কে কে আসবেন ?

আসবেন অনেকেই। বড় বড় মিনিষ্টার রাজা মহারাজা—গবর্ণরকেও আমি ইন্‌ভাইট করবো মনে করেছি।

এবার শুনি পার্টিটা কেন ?

কতকটা নিজের প্রোপাগাণ্ডা—নিজেকে পরিচিত করছি এও ধরে নিতে পারো।

ঠিক বলেছো অজিত। ভূপতিবাবু বললেন। ফিল্ড ক্রিয়েট করতে না পারলে এ-যুগে এক পাও চলতে পারবে না।

কিন্তু আজকের এই দুর্দিনে ঐরকম একটা পার্টি দিয়ে কতটা 'সাক্‌সেসফুল' হবেন আমি জানি না। তবু মনে হয়, এই নিন্দনীয় কাজ বর্তমানে না করাই উচিত।

সুজাতার কথা শেষ হ'তেই অজিত চীৎকার ক'রে উঠলো : তুমি একে নিন্দনীয় বলো কোন্ 'সেন্‌সে ?'

সেন্‌স যাদেরই আছে, তারাই আপনার এ কাজের সমর্থন করবে না। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক আজ অনাহারে—রাস্তায় কুকুর বেড়ালের মতো পড়ছে আর মরছে। এও যে আপনি না জানেন এমন নয়। মানুষের চক্ষুলজ্জা ব'লেও তো একটা কিছু আছে।

তোমার সেন্টিমেণ্টে এমন ক'রে ঘা মারলে কে জানি না, কিন্তু এর কোনো অর্থ নেই।

সকলের অর্থ এক নয় অজিতবাবু! আর আঘাত ? সে তো আমাদের চারিদিক থেকেই পড়ছে। আপনি টের পাচ্ছেন না গায়ের চামড়া পুরু ব'লে।

ভূপতিবাবু অসন্তুষ্ট হলেন : ছি মা, অন্তত তোমার মুখে এ-কথাটা ভাল শোনালো না।

হয়ত ভাল শোনায়নি বাবা। কিন্তু সকল দিক দিয়ে আমরাই মার খাবো এই বা কেমন কথা! দেশের পনের আনা লোক খেতে পাচ্ছে না, সে কি আমাদের দোষ ? না, আমরাই সব মজুত ক'রে রেখে মজা দেখছি ? সম্পদের মধ্যে বাড়ি গাড়ি আর চাকচিক্য বেশভূষা। এতেই বা কেন অপরের চোখ টন্‌টন্ করে ? সবাই মিলে

ছেঁড়া কাপড় পরে রাস্তায় দাঁড়ালেই কি সকল সমস্যা মিটে যাবে? না, ঐ-রকম ডাষ্টবিন থেকে ভাত কুড়িয়ে খেলেই সমতার আনন্দে তাদের পেট ভরবে?

যতসব ন্যুইসেন্স! অজিতের গলাও উঁচু পর্দায় উঠলো। পৃথিবীর সবাই এক-স্টাটাসের লোক নয়—বিদ্যে-বুদ্ধিও সকলের এক নয়। তাছাড়া একটা মানুষ সারাজীবন সাধনা ক'রে এলো, কষ্ট ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন ক'রে এলো, তার কি কোনো দামই থাকবে না?

অজিতবাবু কি এই সুযোগে নিজের কথা ব'লে নিলেন? ব'লে সুজাতা মুখ টিপে হাসলে।

ভূপতিবাবু অনেকক্ষণ চোখ বুজে প'ড়ে ছিলেন। সুজাতার আগের কথার জের টেনে বললেন, সবাই মিলে টাকাওয়ালাদের গাল দিলে এ-সমস্যার কোনো দিনই সমাধান হবে না। আজ দেশের সমস্ত টাকা ছড়িয়ে দিলেও ওরা বাঁচবে না। কারণ টাকার অভাব আজ হয়নি, হয়েছে খাদ্যের। খাবার কই? বহুদিনের ক্ষুধায় ওদের জঠর গিয়েছে মরে—আজ ওদের বাঁচাবে কে? বরং খেতে পেয়েই ওরা মরবে।

কিন্তু তাই ব'লে আমাদের আনন্দ করারও তো কোনো মানে হয় না বাবা। সুজাতা বলে।

আমি তো তা বলিনি মা।

অজিত চুপ ক'রেই ছিল। এবার বললে, পাশের বাড়িতে লোক মরেছে ব'লে অপর বাড়ির বিবাহোৎসব বন্ধ থাকে না।

সুজাতা হাসলে। এরপর বাদানুবাদ করতেও তার প্রবৃত্তি হ'লো না। শুধু ছোট্ট ক'রে বললে, আমি যাবো।

অজিত কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রেই কাটলো। তারপর সুজাতাই একসময় বলে, কথা কি জানো বাবা, অজিতবাবু মনে করেন এর পূর্বে ভূ-ভারতে ওর মতো ব্রিলিয়াণ্ট-ষ্টুডেণ্ট জন্মায় নি এবং বিলেতেও কেউ যায়নি।

ভূপতিবাবু হাসলেন। বললেন, তাই মনে করে না কি ও? অবশ্য অজিত ছেলে ভাল, কিন্তু কেন যে ওর মাথা অমন খারাপ হ'লো বুঝতে পারি না।

ওঁর বাড়ির লোকেরাই দিয়েছে মাথা খারাপ ক'রে। নিয়ত কানের কাছে স্তুতি শুনলে কার না মাথা খারাপ হয়।

কি বলে ওরা? ভূপতিবাবু হাসতে হাসতে বললেন।

কি যে না-বলে তা তো জানি না। আমাদের শুনতে লজ্জা করে। কিন্তু আশ্চর্য, অজিতবাবু সেগুলো দিব্যি পরিপাক করেন।

ঠিক এই সময় ঝড়ের মতো পশু এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, This is my first and this is my last.

কি হয়েছে পশু? ব'লে সুজাতা ভাইকে কাছে টেনে নিলে।

একটা বাজিতে হেরে গেলাম দিদি। অবশ্য হার একে আমি এখনো বলিনা—দেশের সবাই মুখ্যু ব'লে, আমি মুখ্যু নই। আমাদের 'শক্তি' কাগজে একটা প্রশ্ন ছিল, আর্টিষ্ট-হিসাবে শিশির ভাদুড়ী বড়, না অহীন্দ্র চৌধুরী? ভোট গণনায় দেখা গেল, অহীন্দ্র চৌধুরী ষ্ট্যাণ্ড ফাষ্ট´!

ভূপতিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, দেশের লোকই মুখ্যু পশু।

তুমি এক কাজ করো পশু। সুজাতা বললে। এবার লেখো, শ্রেষ্ঠ মূর্খ কে? বাংলা দেশের দর্শক, না প্রোপ্রাইটর? দেখবে তোমার আগের উত্তর বেরিয়ে আসবে।

ঠিক বলেছিস দিদি। এ-বুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি। পশুপতি ঘাড় নাড়ে আর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ফ্রকপরা একটি ছোট্ট মেয়ে ভূপতির কোল ঘেঁসে দাঁড়ালো। বললে, আমাকে একটা এরোপ্লেন কিনে দিও বাবা!

এরোপ্লেন?—কোথায় যাবে মা?

আমি অমনি হুস্ হুস্ ক'রে উড়ে বেড়াবো।

বেশ মা। কিন্তু আবার বাড়ি ফিরে আসতে পারবে তো জুলু?

জুলু অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, বাবা যেন কি! বাড়ি আসবো না তো থাক্‌বো কোথায়?

তা বটে, থাক্‌বার জায়গা তো একটা চাই।

রাস্তার ধারে একটা কোলাহল উঠলো। সুজাতা বারান্দায় এসে দেখলে একটি পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেকে চাপা দিয়ে একখানা মোটর-লরি ছুটছে। পিছনের লোকগুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে চলেছে সেই গাড়িখানা ধরবার জন্যে। সুজাতা চেয়ে দেখলে, ছেলেটার দেহ একেবারে পিষে গিয়েছে—তাকে চিনবার পর্যন্ত উপায় নাই।

ভূপতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে মা?

একটা ছেলে লরী চাপা পড়েছে বাবা। বলতে বলতে সুজাতা এসে ঘরে ঢুক্‌লো।

ভূপতিবাবু বললেন, আহা!

এক মুহূর্তে অতখানি কলোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ: এক বিশ্রী ম্যাটমসফিয়ার।

কিন্তু কি হবে এই ম্যাটমসফিয়ারের মধ্যে ব'সে থেকে। তার চেয়ে চলি দত্তদের বাড়ি—যেখানে পাশেই আছে টেনিস-লন। যাদের বিশ্রামও নাই অবসরও নাই—যারা জীবনের মহোৎসবে পৃথিবীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলেছে। অফুরন্ত নাচ-গানের কল-কোলাহলে যারা নিজেকে রেখেছে মাতিয়ে। যারা হাসতেই জানে, কাঁদতে জানে না: যারা নিত্য ফ্রেশ, সত্য যাদের অভিনয়, রংই যাদের জৌলুস।

টেনিস-গ্রাউণ্ডে বেবী তখন খেলার অবসরে আইসক্রীমে চুমুক দিচ্ছে, সুধীর এক টুক্‌রো বরফ নিয়ে লোফালুফি করছে। আজকের খেলাটা বেশ 'আপ য়্যাণ্ড ডাউন' হয়েছে। কথাটা বলবার জন্যেই সুধীর বেবীর কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

বিজনের মোটর-বাইকটা স্টার্ট নিচ্ছে না দেখে বেবীতো হেসে কুটোকুটি। বললে, ঠেলে দেবো বিজনবাবু?

বিজন অপ্রস্তুত হয়ে বললে, নো, থ্যাংক্‌স।

কিন্তু এখানেও সেই য়্যাটমসফিয়ার। পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে অগণিত নরনারী—যারা শুধু চীৎকার করতেই জানে: ছুটি ভাত দে মা, মা, মাগো!

বোবা পৃথিবী: বধির ভগবান!

বিজন তার বাইক নিয়ে ফট্ ফট্ করে বেরিয়ে যায়।

পার্টির দিন এগিয়ে আসে। টেনিস-লনকে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটি মনোরম মণ্ডপ তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছে। বাগানের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বজায় রেখে সম্পূর্ণ বিলিতি আদব কায়দায় মণ্ডপের গঠনক্রিয়া চলছে। এর প্রবেশ-পথকে সুদৃঢ় করবার জন্যে একটি কোলাপ্‌সেবল গেট বসিয়ে দিয়ে অজিত যেন ভবিষ্যৎ বিপদাশংকাকে ভ্রূকুটি করলে।

বেবী বললে, এতটা না করলেও পারতে দাদা!

অজিত হাসলে। কারণ সুজাতার অনুমানকে সে সত্য বলে বিশ্বাস করে—আর বিশ্বাস করুক, নাই করুক, ঐসব অবাঞ্ছিত সম্ভাবনা থেকে সাবধান হওয়া সুবুদ্ধিরই পরিচয়। এতে সুজাতার কাছে হয়ত পরাজয় হলো, কিন্তু ভবিষ্যতের এক অনভিপ্রেত আশংকা থেকে সে নিশ্চিন্ত হতে পারলো।

বিজন মণ্ডপের এই পারিপাট্য দেখে বিস্মিত হলো। বললে, বিলেত না গেলে সত্যিই রুচি বদলায় না।

কিন্তু আপনার এই অরুচিকর প্রলাপ কতদিন শুনবো বিজনবাবু! বরং তার চাইতে বিলেত গিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে আসুন, আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, আপনারও একটা সদ্‌গতি হয়। বেবী যথাসম্ভব নিজেকে গম্ভীর করে কথা ক'টা বললে।

আপনি ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারছি।

ঠাট্টা করলে বুঝতে পারেন তাহলে?

বেবীর কথায় অজিত হো হো ক'রে হেসে উঠলো। কিন্তু বিজন কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললো, সত্যি, চমৎকার হয়েছে মণ্ডপের পরিকল্পনা। সবচেয়ে বিউটিফুল হয়েছে আপনার এই ঝাউগাছের প্রাচীর: ফোয়ারার পাশে চা-খাবার জায়গাটি।

কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর আছে বিজনবাবু, যেটা আপনার চোখে পড়লো না। বলে বেবী মুখ টিপে হাসলে।

কি?

বিজনের ব্যগ্রতা দেখে বেবী হেসে ফেললে। বললে, বিলেতে যে-বাড়িটায় দাদা থাকতো, তারই 'মিনিয়েচর' আপনার পেছনে। দাদা যখন সভায় এসে দাঁড়াবে তখন ব্যাকগ্রাউণ্ডে থাকবে ঐ ঘরখানি।

চমৎকার পরিকল্পনা! বিজন উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

আরো আছে। বেবী বলে।

এ্যাঁ! আরো? বিজন আর দাঁড়াতে পারলে না, ঐখানেই একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়লো।

বেবী বললে, যারা বিলেত যায় নি, এবং যারা গিয়েছে,—এই উভয় দলের চারিত্রিক ও আবয়বিক পার্থক্য 'মিনিয়েচর' আকারে দেখানো হবে।

বিজন ব্যথিত হলো। বললে, তা হলে তো আমাদের এই সভায় আসা চলে না।

কেন চলবে না বিজনবাবু? বরং আপনার চেহারাখানা পাঁচজনকে দেখতে দিন, সকলের চোখ খুলুক। হাজার হাজার বই পড়ে যা হবে না, এই 'মিনিয়েচরে'র পরিকল্পনায় তার কতকটা সংস্কৃতি আনবে আমাদের দেশে।

তা সত্যি। বিজন যেন এইবারে সবটা বুঝে ফেললে: তা দেখুক, হতভাগা-দেশের জলবায়ুর দোষেই তো আমার ভুঁড়ি বেড়ে গেল।

বেবী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

আপনার ঐ হাসি দেখলেই আমার মনে হয়, সব কথা বুঝি সত্য নয়। তাই এক এক সময় বুঝতে পারি না, আপনি ঠাট্টা করছেন, না সত্যি বলছেন। বলতে বলতে বিজন মুখখানকে গোমড়া করে তুললে।

অজিতের জেঠামশায়—তিনি চোখে ভাল দেখতে পান না কিন্তু কানে শোনেন, মানে বেশি শোনেন। সেজন্তে তিনি ঈশ্বরকে সহস্রবার ধন্যবাদ দেন। অজিতের গুণ-গাথা শুনতে তিনি ভালবাসেন এবং অল্প একটু শোনা কথাকে ফলাও করে বলবার বাগ্মিতা তাঁর অসাধারণ। তিনি এসে বললেন, ওখানে কে আছে—বেবী বুঝি? অবশ্য আমি আর কতটুকু বুঝি মা—তোমরা এ-কালের মেয়ে, আমার চাইতে তোমরাই ভাল বুঝবে: অজিতের একখানা বড় ছবি বেদীর ওপর রাখবার ব্যবস্থা করো।

ছবি আবার কি হবে জেঠামশায়? আসল মানুষটাই তো কাছাকাছি থাকবে।

তুই বুঝবি না রে, বুঝবি না—আমি কি বলতে চাইছি অজিত বুঝেছে।

অজিত ব্যস্ত হয়ে বলে, তাই হবে জেঠামশায়।

বিজন এগিয়ে এসে প্রণাম করলে। বেবী মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগলো।

তোমাকে তো আমি ঠিক চিনতে পারলাম না বাবা !

বেবী ব্যস্ত হয়ে বলে, উনি দাদার বন্ধু জেঠামশায়।

বিলেতের বন্ধু ?

বিজন অপ্রস্তুত হয়ে বলে, আজ্ঞে না, আমি বিলেত যাই নি।

যেও, দেখছো তো বিলেত না গেলে মানুষ হওয়া যায় না। অবশ্য অজিতের মতো মেধা নিয়ে কজন আসে বলো। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, ছোটবেলায়—যখন ওর হাতেখড়িও হয়নি, অনর্গল ইংরিজি বলে যেতো। কুক্ সাহেব দেখে বলেছিলো, মিঃ দত্ত, তোমার এই ছেলে ওয়ার্লড-ফেমাস হবে। অসাধারণ দৃষ্টি ছিল তার। কুক সাহেব আজ বেঁচে থাকলে—একবার বিলেতে খোঁজ নিলে না কেন অজিত ?

অজিত হেসে অন্যত্র চলে গেল। বুড়োর সেটা চোখ এড়ালো না। বললেন, দেখলে আর দাঁড়াবে না—নিজের প্রশংসা ও কোনোদিনই সইতে পারলে না।

আমিও পারি না জেঠামশায়। প্রকৃতি আমাদের দুজনেরই এক কিনা। বলে বিজন একবার বেবীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলে।

বেবী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে, তারপর জেঠামশায়ের দিকে চেয়ে বলে, আমার কিন্তু বড্ড ইচ্ছে জেঠামশায়, দাদার একটা লাইফ-স্কেচ বেশ ছবি-টবি দিয়ে—

খুব ভাল হবে মা, এ-ব্যবস্থা যদি করতে পারো—তোমার নামটি কি বাবা ?

বিজন এগিয়ে এসে বলে, আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবিজনকুমার মিত্র।

মিঃ দত্ত বললেন, তোমরা তাহলে দুজনে এই ভারটা নাও। তবে যেই লেখো, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে লিখো। কারণ তার সম্বন্ধে আমি যতটা জানি, তোমাদের তো তা জানবার কথা নয়।

তারচেয়ে এক কাজ করুন না জেঠামশায়, আপনি বলে যাবেন আমি লিখে যাবো।

বেবীর এ-প্রস্তাবে মিঃ দত্ত খুশি হলেন। বললেন, সেই ভাল মা, কোনো কথা তাহলে বাদ যাবে না।

বেবীও সেকথা খুব ভাল করে জানে, কারণ অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও প্রাধান্য দিয়ে তার মহিমা কীর্তন করতে এমন লোক আর পাওয়া যাবে না।

ওর বাবা যখন মারা যায়—মিঃ দত্তের চোখ যেন বুজে এলো, তখন ও বেশ বড় হয়েছে, শুনলে খুব আশ্চর্য ঠেকবে বিজন, ওর চোখে এক ফোঁটা জল দেখলাম না। ও বললে কি জানো ? এইটিই তো মানুষের স্বাভাবিক পরিণাম, এর জন্যে দুঃখ করবার কি আছে !

মিস বেবী তখন ক'বছরের জেঠামশায় ? বিজন উৎসুক হয়ে জানতে চাইলে।

বেবী হাসি আর চাপতে পারলে না। বললে, বিজনবাবু যেন কি ! বেবী কখন 'মিস' হয় ?

মিঃ দত্তও হেসে ফেললেন। বললেন, চলো একবার ঘুরে তোমাদের ডেকরেটিং কেমন হলো দেখি।

কোলাপ্সেবল গেট দেখে মিঃ দত্ত বললেন, এটার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সবাই আসুক, জানুক—দেশের কত বড় গৌরব : তারাও এসে সংবর্ধনা করুক—

বাধা দিয়ে বেবী বলে, সে অনেক গোলমাল হবে জেঠামশায়—তারা বুঝবেও না, অনর্থক চিৎকার করবে।

তাছাড়া ঐ ফ্যান-খাওয়ার দল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে। ভাববে, হয়ত তাদেরকেই খাওয়াবার জন্যে এই আয়োজন। বলে বিজন বিনিয়ে বিনিয়ে হাসতে লাগলো।

মিঃ দত্ত এই কথা শুনে শিউরে উঠলেন। বললেন, ওরা যে কোথায় ছিল এতকাল, আমি তো ভেবেই পাই না। একটা স্বাভাবিক ধারাও ওদের মধ্যে নেই, এটা লক্ষ্য করেছো? ওরা কিলবিল করে চলে, কিচ্‌কিচ্‌ করে কথা বলে। ওদের লজ্জা নেই, সম্ভ্রম নেই—ওরা না-মানুষ, না-জানোয়ার!

বিজন কি বলতে যাচ্ছিলো, বাধা দিয়ে মিঃ দত্ত বললেন, এই কিছুদিন হলো একবার পার্বতীপুর গিয়েছিলাম। রাণাঘাট ষ্টেশনে এসে গাড়িখানা ডিটেন হলো: সামনের প্লাটফরমে একখানা মিলিটারি গাড়ি অপেক্ষা করছে দেখলাম। তখন বেলা দুপুর, লোকের খাওয়া-দাওয়ায় সময়। শুনলে আশ্চর্য হবে বিজন, প্লাটফরমে একটি ভেণ্ডার নেই! লোকে চিৎকার করেও একটু খাবার সংগ্রহ করতে পারছে না। চেয়ে দেখি, ওরা মিলিটারি-গাড়িগুলোর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক ছড়া কলা নিয়ে গোরাগুলো দশ টাকার নোট ছুড়ে দিচ্ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মগ ভর্তি করে কেউ চা নিচ্ছে, কেউ দুধ নিচ্ছে। দামের প্রশ্নই ওঠে না, নোট ফেলে দিয়ে তারা খানিকটা গলাধঃকরণ করে বাকিটা ভিখিরিদের পাত্রে ঢেলে দিচ্ছে, আর তাদের হ্যাংলাপনার দিকে চেয়ে হো হো করে হাসছে।

ওরা কি গাড়ির আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জেঠামশায়? বেবীর কণ্ঠে কৌতূহলী প্রশ্ন।

শুধু ঘুরে বেড়ানো নয় বেবী, কুকুরের মতো সার বেঁধে ওদের উচ্ছিষ্টের দিকে 'হাঁ' করে চেয়ে আছে। দেখে আমারই লজ্জা হলো, কারণ ওরা ভারতবাসী। মিস মেয়োর মতো ঐ গোরাগুলোর চোখে ওরা ভারতীয়দের স্পেসিমেন হয়ে রইলো।

সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, গভর্ণমেণ্ট এইসব জানোয়ারদের কলকাতার বাইরে রেখে দেবার ব্যবস্থা করছে!

বেবীর কথা শেষ হতেই বিজন বললে, একটা স্কীম আমারও মাথায় আছে।

বেবী হাসি চেপে বলে, কি স্কীম বিজনবাবু?

চিড়িয়াখানায় ওরাংওটাং পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই, কিন্তু তার পরবর্তী ডেভালেপমেণ্ট আমাদের দৃষ্টিপথে নেই। আজকের যুগে যেটা আমরা দেখবার সৌভাগ্য লাভ করলাম, পরবর্তী যুগে—অর্থাৎ আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে এই স্পেসিমেন যত্নপূর্বক রক্ষা করা উচিত।

বেবী যথাসম্ভব নিজেকে গম্ভীর করে বললে, আপনার আইডিয়া চমৎকার। কাগজে এই নিয়ে আপনার একটু আলোচনা করা উচিত।

ঠিক এই সময় সুজাতা গাড়ি থেকে নামলো। বেবী ছুটে গেল: সুজাতাদি এসেছে জেঠামশায়।

আসবেই তো। ওর বরং এ-কদিন এখানেই থাকা উচিত। মিঃ দত্ত বললেন।

সুজাতা হাসলে। বললে, অজিতবাবু কোথায়?

দাদা আশ-পাশেই কোথাও আছে।

কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অজিত যখন ফিরে এলো, তখন বেবী সুজাতাকে নিয়ে ওপরে গেছে।

যথাসময়ে ভূপতি চৌধুরীর কাছে নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে স্বয়ং অজিতই এলো। সুজাতা হেসে বললে, আমার কার্ড কই?

কার্ড অবশ্যই আছে। কিন্তু কার্ডের চাইতে বড় জিনিষ—যেটা জেঠামশায় ছেপেছেন, সেইটিই তোমাকে দেখাতে এনেছি। ছি ছি, আমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

সুজাতা একটিও কথা না বলে হাত বাড়িয়ে বইখানা টেনে নিলে। আর্ট-পেপারের ওপর সোনার জলে বিশেষণ-মণ্ডিত উপাধিকণ্টকিত অজিত দত্তের নাম দেখে সুজাতা আর হাসি চাপতে পারলে না। বললে, এতগুলো উপাধি জুড়ে না দিলে আপনাকে কি চেনা যেতো না? কিন্তু যাক, এ পাঠ করবে কে?

তা তো জানি না।

সুজাতা এক নিশ্বাসে খানিকটা পড়ে নিয়ে বললে, চমৎকার, এ রকম অলৌকিক শক্তি নিয়ে আপনি জন্মেছেন জেনে বিস্মিত হচ্ছি। যে-আলোক ছটার বর্ণনা আপনার জেঠামশায় দিয়েছেন, সেকালের মহাপুরুষের জন্মকথায় আমরা পাই বটে, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা রূপক মাত্র। যাই হোক আপনার জেঠামশায় সেই রূপককে বেশ কাজে লাগিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু জন্মক্ষণের সেই আলো এই পরিণত বয়সে লুপ্ত হলো কেন জানতে পারি কি? না, আমরা দেখবার যোগ্য নই বলে প্রভু আমাদের ছলনা করছেন?

জেঠামশায়ের চোখ নিয়ে দেখলে তুমিও দেখতে পেতে সুজাতা। তোমার সে-দৃষ্টি নেই বলে একজন বৃদ্ধ মানুষকে অবজ্ঞাই বা করো কেন?

আমি আপনার জেঠামশায়কে অবজ্ঞা করেছি একথাই বা আপনার মনে আসে কেন? স্নেহের আতিশয্যে তাঁর বাড়াবাড়িটা কিছু নয়, কিন্তু কাগজে ছেপে পাঁচজনকে এই পাগলামি নাই বা তিনি জানাতেন। কবে আপনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন এবং সেই ভূমিষ্ঠক্ষণে আপনার অলৌকিক নিরীক্ষণ এবং আপনার হাসিকান্নার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ এ না-জানিয়েও অন্য উপায়ে পাবলিসিটি করা যেতো, আর সেইটিই হতো লিপিচাতুর্য্য।

কিন্তু এই কাগজ যাঁরাই দেখেছেন তাঁরা সকলেই শিক্ষিত—আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তাঁরা কেউ একথা বলেন নি।

বটে, তাহলে তো সব গোলই মিটে গেল। আমার ভয় ছিল তাঁদেরকেই নিয়ে। বলে সুজাতা মুখ টিপে হাসলে।

কিন্তু আমি তো দেখছি, ভয় তোমাকে নিয়েই।

সুজাতা এবারেও হাসলে। বললে, বসুন বাবাকে ডেকে দিচ্ছি। না, তাঁকে আর ডাকবার প্রয়োজন নাই, আমার একটু তাড়া আছে। বলে অজিত ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বস্তির সামনে কোলাহল উঠলো। সুজাতা উঠে বারান্দায় এলো। ব্যাপারটা অজিতকে নিয়েই ঘটেছে। কে-একটা ভিখিরীর ছেলে পয়সার লোভে অজিতের পা জাপটে ধরে, অজিত জুতো সমেত ছেলেটার বুকে লাথি মারে। ইন্দ্রজিৎ যাচ্ছিলো অফিস। অজিতের হাতটা চেপে ধরে বলে, আপনার দামি জুতোটা বোধ হয় ছিঁড়ে গেল। ও চেয়েছিল তো এক পয়সা।

তোমার স্পর্দ্ধাও তো কম নয় দেখছি। তুমি আমার হাত ধরবার সাহস করো?

ইতিমধ্যে ড্রাইভারটাও নেমে পড়েছে।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বলে, আপনার সঙ্গীর মধ্যে তো ঐ ড্রাইভার, কিন্তু ওর ক্ষমতায় কুলোবে না।

বস্তির অনেকেই ছুটে এসেছিল : ছিদাম, নকড়ি, দুলো, হারাধন। বলে হুকুম করো ইন্দির ভাই ?

ইন্দ্রজিৎ একবার চেয়ে নেয়। তারপর বলে, না, যেতে দে—ওরা কৃপার পাত্র।

অজিত চেয়ে দেখলে, সুজাতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তারই দিকে চেয়ে আছে। বাড়ি এসেও সে সুজাতাকে ক্ষমা করতে পারলে না। সে যেন সকলরকমে ঐ মেয়েটির কাছে আজ ছোট হয়ে এসেছে।

বিজন এতক্ষণ অজিতেরই প্রতীক্ষা করছিলো। বললে তোমাকে কনগ্রাচুলেট করবার জন্যে এতগুলো লোক বসে আছে—একবার এসো, তাদের সামনে দাঁড়াও।

অজিত ম্লান হেসে বলে, কেন কি করলাম আবার ? তোমার লাইফস্কেচ সকলে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে।

অজিতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে অপমান সে এইমাত্র গায়ে মেখে আসছে, তা যেন ঐ একটি কথায় নিঃশেষে ধুয়ে গেল। বললে, কি বলে ওরা ?

সবাই স্বীকার করলে এ-রকম জীবনী সচরাচর দেখা যায় না।

ব্যস, এর বেশী আমি কিছু চাই না। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি বিজন, অনেকে আমার এই পাবলিসিটিকে দম্ভ বলে মনে করছে।

অহংকার করবার যোগ্যতাই বা কটা লোকের থাকে শুনি ? তুচ্ছ লোকের কথায় তুমি কান দিও না। নিজেকে এবার থেকে একটু রিজার্ভ করো। দেখবে, নাগালের বাইরে গেলে একদিন ওদের কাছেই তুমি বড় হয়ে উঠবে। অনেক বাধা তোমাকে অতিক্রম করতে হবে অজিত, ওদের জ্বালা বড় সোজা নয়।

জ্বালাই বা কিসের তাওতো বুঝি না।

য়ুনিভার্সিটিকে তারাই বেশি গাল দেয়, যারা ও দরজা কোনোদিন মাড়ায় নি। ওটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

বিজনবাবু আবার কি বক্তৃতা করছেন ? বলতে বলতে বেবী ঘরে ঢুকলো।

অজিত বললে, বক্তৃতার কথা নয় বেবী, আমার এই ছাপানো জীবনকাহিনী দেখে অনেকে মুখ টিপে হাসছে।

এ সংবাদ কি বিজনবাবু দিলেন ?

না, বিজন এর ঠিক উল্টোটা বলছে। কিন্তু ওর কথা নয়, আমি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী।

বেবী উত্তেজিত হয়ে বলে, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি দাদা। কোথায় কে সামান্য একটু মুখ-ব্যাদান করেছে—দেখছি এই নিয়ে তুমি সারারাত্রি ঘুমুতে পারবে না। খোঁজ নিয়ে দেখো, তার মুখের 'হা' হয়ত একটু বড়।

বিজন হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে, ঠিক বলেছেন—চমৎকার বলেছেন।

আমি আরো একটি চমৎকার কথা বলবো, যেটি শুনলে আপনার হৃৎকম্প হবে।

বিজন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলো, কি সেটা ?

এই বইখানা সেদিন আপনাকেই পাঠ করতে হবে।

আমি ! ভয়ে বিজনের মুখ শুকিয়ে গেল।

এতে ভয় পাবার কি আছে ? আপনি দাদার বন্ধু, তা ছাড়া আর কে পড়বে বলুন।

বিজন আমতা আমতা করে বললে, সেজন্যে নয়, আমি কি ঠিকমত পারবো ?

বাংলা লেখা পড়তে পারবেন না ? আপনি তো বড় বড় সভায় বক্তৃতা দেন শুনতে পাই।

অজিতও সে কথা সমর্থন করে বললে, তাছাড়া তুই জানিসনে বেবী, বিজন খুব ভাল অভিনয় করে।

তবে তো খুব ভাল হবে। থিয়েটারি ঢং-এ উচ্ছ্বাসের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়ে বেশ হাত-পা নেড়ে বলে যাবেন, আমরা দূরে বসে আপনার তারিফ করবো।

আমি কি পারবো অজিত?

আপনি তো বড় নার্ভাস। এই নিয়ে আপনি থিয়েটার করবেন?

মানে কি জানেন! বিজন আবার আমতা আমতা সুরু করলে: একটু রিহার্সাল দরকার।

বেবী যথাসম্ভব নিজেকে গম্ভীর রেখে বললে, আমার কাছে পাঠ নিতে আপনার আপত্তি আছে?

তার চেয়ে এ-ভারটা আপনি নিলেই তো পারেন? বিজন বললে।

পারতাম, কিন্তু সকলেই বলবে দাদার কথা বোনে বলছে। মানে, দাদার প্রচার-কায বাইরের লোকের দ্বারাই হওয়া উচিত।

অবশেষে বেবীর সুষ্ঠু পরিচালনায় বিজনবাবুর দ্বারাই এই দুষ্কায সাধন করা সাব্যস্ত হলো।

সেদিনের সেই তুচ্ছ ঘটনার পর থেকে ইন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলতে সুরু করেছে। যার কোনোটাই সত্যি নয়। কেউ বলে, কম্যুনিষ্ট আত্মগোপন করে এই বস্তিতে আছে, কেউ বলে, ঘোর স্বদেশী জেলফেরত—আবার কেউ বলে, গুণ্ডার সর্দার।

মিথ্যা-প্রচারও পল্লবিত হয়। একটি সুদর্শন ছেলে মিছি মিছি কখনো বস্তিতে বাস করে না, এই ছিল বিপক্ষ-দলের বড় যুক্তি।

ইন্দ্রজিৎ শুনে হাসে। দুলোকে ডেকে বলে, এবার তোদের সংসর্গ ছাড়তে হলো দেখছি। লোকে সন্দেহ করছে—বলছে, আমি নাকি তোদের দলের পাণ্ডা।

কোন্ শালা বলে একবার দেখিয়ে দাও তো ঠাকুর। বলে, দুলো তার সরু বুকখানা চিতিয়ে দিলে। আর তাই যদি বলে ঠাকুর, তোমারই বা লজ্জা কিসের।

লজ্জার কথা নয় দুলো। মিছিমিছিই বা বলবে কেন?

মিছিমিছি তো নয় ঠাকুর। তোমার কোন্ উপদেশটা আমরা শুনি না বলো। তুমি আছো বলে আমরা একটা মুরুব্বি পেয়েছি। কে করবে বলো তো এমন করে? কার মাইনে বাড়াতে হবে, দিলে দরখাস্ত লিখে, তোমার একটা চিঠিতে আমার ছুটিই মঞ্জুর হয়ে গেল। তবে এও বলে রাখছি ঠাকুর, আমরা ছোটলোক বটে, কিন্তু তোমার গায়ে কাউকে হাত তুলতে দেবো না।

আমার গায়ে হাত তুলবে আবার কে? আমি তো কারো ক্ষতি করিনি।

তবে পাঁচ শালারা বলেই বা কেন?

বলাটা তাদের স্বভাব দুলো। পয়সার জোরে আর মুখের জোরে কত গরীবকে মিছিমিছি ভুগতে হচ্ছে। আমাকে ওরা ইচ্ছে করলে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে দিতেও পারে।

তা যা বলেছ ঠাকুর। আমার ভাইটা চোর ছিল না মিছিমিছি তাকে ধরে জেলে দিলে। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে সত্যিই সে চোর হয়ে গেল। ওরা কি জেলে চোর তৈরি করে ঠাকুর?

ইন্দ্রজিতের চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠলো। বললে, অমনি করে ওরা নিরীহ লোকগুলোকে বিদ্রোহী করে তোলে।

মনোরমা বিরক্ত হয়। বলে লাগতেই বা যাও কেন—যার এক কড়া মুরোদ নাই।

দুর্বলকে মেরে ওদেরই বা কি পৌরুষ।

মনোরমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে : কেবল কথার জাহাজ

ভগবান কিছুই দেননি। ওটুকু না দিলে তো মরে যেতাম।

এ কথাটা তুমি খুব ভাল বলেছ ঠাকুর। দুলো হাসে আর ঘাড় নাড়ে।

হাঁরে! ইন্দ্রজিৎ বলে। কথার জোরেই দুনিয়া চলছে। এতবড় যুদ্ধটা কেবল কথার জোরেই উলটে গেল

কথা কি বলছো ঠাকুর। গোলাগুলি সব গেল কোথায়?

মহাভারতের যুগে তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ হতো। দু-পক্ষই এগিয়ে এলো—হয় মারলো নয় মরলো। গত যুদ্ধেও তারা মুখোমুখি একটা বোঝাপড়া করেছে। কিন্তু এবারের যুদ্ধ ঠিক উলটো। বিজ্ঞানের জোরে আর মুখের জোরে ভাঙছে গড়ছে। যাত্রাদলের সেনাপতিগুলো যেমন যুদ্ধের সময় আস্ফালন করে, ওরাও তেমনি হয়কে নয়, নয়কে হয় করে সকলের মনে একটা সংশয় জাগিয়ে তোলে। এই সংশয় জাগিয়ে তোলার নামই 'ওয়ার প্রোপাগাণ্ডা'। কারণ মুখোমুখি তো কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে না, যুদ্ধের আসল খবর কেউ জানতেও পায় না। এমন কি যারা যুদ্ধ করছে তারাও কিছু জানে না। কাগজে যা ছাপা হয়, তাই তারা পায়। পৃথিবীব্যাপি যুদ্ধ : কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে ঐ কাগজই তা সরবরাহ করছে। এই প্রচার-বিভাগই এ যুদ্ধের বড় ফাংকসন।

বক্তৃতা তো করছো, এদিকে কয়লা নেই। কাল সকালে আপিস নেই তো? মনোরমার স্বর যেন খন্‌খনিয়ে উঠ্‌লো।

ইন্দ্রজিৎ বললে, কয়লা না থাকলেও অফিস থাকবে এবং অফিস যখন আছে তখন একটা ব্যবস্থা হবেই। কিন্তু তোমার কি হলো বলো দেখি? আজকাল তোমার গলার স্বর বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। খন্‌খনে আওয়াজ ওটাও ভাল লক্ষণ নয়। অথচ এই বছর-কয়েক আগেও তোমার গলার স্বর বেশ মিষ্টি ছিল।

নিজের স্বর মিষ্টি ক'রে অপরকে বলতে এসো।

তা বটে। কণ্ঠস্বরের অপলাপ করে আমাদের এই দুর্দশা।

মনোরমা মুখ নেড়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার ফিরে এসে বললে, নিলুর দোকানে কয়লা দিচ্ছে—যাবে তো এই বেলা যাও। আজ পাঁচ-ছ'দিন ধরে গুল্‌ দিয়ে রান্না করছি—কাল কয়লা না পেলে হাড়ি চড়বে না মনে রেখো। আমার কি, যা খাই—ওটুকু না খেলেও চল্‌বে।

যাক্‌, একটা কথা এতদিন পরে জানতে পেরে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, যা কিছু আমার জন্যেই। বলতে বলতে ইন্দ্রজিৎ জোরে হেসে ওঠে।

ও ঘরের ছিদেম চিৎকার করে উঠলো : দুলো কোথায় গেলি?

ওহে ছিদেম দা, শোনো শোনো!

ইন্দ্রজিতের আহ্বানে ছিদেম ঘরে এসে বসলো। বললে, ডাকছিলাম দুলোকে। আজ আবার 'ফুল রিহার্সাল' আছে কিনা। এখন থেকে ডাক-হাঁক না করলে জমতে জমতেই রাত দুপুর বেজে যাবে।

তুমি নাকি ভীম সাজছো ছিদেম দা? ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞাসা করে।

আমি না হলে ও পার্ট আর কে করবে বলো। দু'ঘা খেতেও পারি আবার দু'ঘা দিতেও পারি।।

সত্যিই পিঠে পড়বে না কি ছিদেম দা?

দুলো উত্তর দেয় : তা ভয় করলে চলবে কেন ঠাকুর। তবে শোনো, কি হয়েছিল একবার। মদনমোহন তলায় যাত্রা হচ্ছে, ছিদেম দা সেজেছে দুর্যোধন। ভীম উরুভঙ্গ করবার জন্যে আসরে এসে দাঁড়িয়েছে—ছিদেম দা

বার বার করে বলে এসেছে, তুলোর গদা নিয়ে নামবি। ব্যাটার ভীমের অত খেয়াল নাই, ভুল করে নিয়ে এলো কাঠের গদা। দাদা টের পেলে, যখন দমাস করে পড়লো উরুর ওপর।

ইন্দ্রজিৎ আঁৎকে উঠলো: বলো কি! তারপর?

তারপর আর কি, দাদা ছ'মাস বিছানায়। সেই থেকে নাকে-কানে খৎ দিয়ে দাদা ভীম সাজছে।

মুখে কাপড় দিয়ে মনোরমা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছিদেম বললে, তুমি তো গেলে না ইন্দির ভাই—বড্ড ইচ্ছে ছিল, তোমাকে কেষ্ট সাজাই।

ইন্দ্রজিৎ হাসে। বলে, আমি কেষ্ট সাজলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ নির্বিবাদে হয়ে যাবে—অতবড় কাপড় জোগাবো কোত্থেকে! একখানা শাড়ি কিনতে হলে মাইনের সব টাকা গুণে দিতে হবে।

তাও কি টাকা দিলে পাবে না কি? দুলো বলে। আবার কি নিয়ম করেছে, বছরে দশ গজের বেশি একটা লোক কাপড় পাবে না। দশ গজ কাপড়ে কি হবে বলো দেখি? কাপড় আছে, জামা আছে আবার ফতুয়া আছে। সরকার বাহাদুর এ দেশের লেংটিপরা লোকগুলো দেখেই বোধহয় এই ফতোয়া জারী করেছে।

লেংটি না হয় আমরা পরলাম, কিন্তু মেয়েগুলো?

ছিদেম দাঁত বের করে হাসে।

দুলো রস কেটে বললে, তাও যে ঘরে বন্ধ থাকবে, সরকার সে জোটিও রাখেনি—কন্ট্রোলে যেতে হবে।

তুই ভাল আছিস দুলো, চেয়ে চেয়ে দেখবি। আমাদেরই গায়ে জ্বালা ধরবে। একটা কাজ করো না ইন্দির ভাই, তুমি তো লিখতে পারো, বেশ নরম-গরম করে কাগজে লিখে দাও না। দেখতো কাজ হয় কিনা।

কিছু হবে না ছিদেম দা। ওরা হিসেব খতিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আমাদের দেশের মিলগুলোতে যে-কাপড় তৈরি হয় তার পরিমাণ এত অল্প যে মিলিটারিদের চাহিদা মেটাতেই শেষ হয়ে যায়। সরকার বলেন, ওরা আমাদের জন্যেই যুদ্ধ করছে, তাই তাদেরকে বাঁচাতে আমাদের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। তারা আরো বলে, এদিক দিয়ে যুদ্ধে আমরাও একটা অংশ গ্রহণ করেছি।

সরকারের ভুল হয়েছে ইন্দির ভাই। ওদেরকে বিবস্ত্র করে যুদ্ধে পাঠালে এর চাইতে ভাল কাজ হতো। চাই কি, যুদ্ধ এতদিন শেষ হয়ে যেতো।

ছিদেমের কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ কৌতুক অনুভব করলে। বললে, কি রকম?

ওদের উলংগ দেখলে শত্রুরা লজ্জায় অস্ত্রত্যাগ করতো। কুরুক্ষেত্রে কি হয়েছিল? শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম অস্ত্রই ধরলেন না। নইলে যুদ্ধ শেষ হতো না কি?

কিন্তু তোমাদের যুদ্ধ আজ সারারাত্তি চলবে না কি ছিদেম দা?

কেন যাবে নাকি ইন্দির ভাই?

না, ঘুমটা হবে না তাই ভাবছি।

একটা রাত্তির না ঘুমুলে শরীরের হয় কি হে! সেবার বড়শেতে তিন রাত্তির যাত্রাগান হলো। তুমি বিশ্বাস করবে না ইন্দির ভাই, তিনদিন তিনরাত্তির দুটি চকের পাতা এক করিনি।

কেন, দিনেও কি যাত্রা হতো?

তবে শোনো বলি: বড়লোকের বাড়ি, দুবার যাতায়াত না করলে খুশি থাকবে কেন। পালা যা আমরা করবো সে তো বুঝতেই পারছি—পেটে বোমা মারলে একটা 'ক' বেরুবে না, তাই তো বলি ভায়া, তোমরা এলো চুটিয়ে একবার পেলে করি।

ইন্দ্রজিৎ হাসলে। বললে, দুলো কি সাজবে ছিদেম দা?

ঐ তো দুঃশাসন।

সর্বনাশ! তোমার ঐ আট আঙুল বুকের ওপর বসে ছিদেম দা বক্ষরক্ত পান করবে?

ছিদেমের বুকখানা ফুলে উঠলো। বললে, ইন্দির ভায়ার ভয় হচ্ছে বুঝি? সত্যিই কি আর আমি ওর বুকের ওপর চেপে বসবো। বৈকুণ্ঠ হলে তাই করতো। তবে আর লোকে ভার ফ্যাক্টর খোঁজে কেন। ঐখানেই তো হলো অভিনয়ের কৌশল।

ছিদেমদার অভিনয়-কৌশলের বক্তৃতা যখন সজোরে চলছে, তখন কলকাতায় আর এক কাণ্ড সুরু হয়েছে। নকুলের বৌকে নাকি ছিদেমদার বৌ বলেছে, তুই আর মুখ নেড়ে কথা বলিস নে, তোর কর্তাই তো শকুনি সেজে সকলের মাথা খেলে।

ওলো, তোর কর্তার দেমাক্ আর করিস নে। আমার উনি না থাকলে কোন্‌দিন উড়ে-পুড়ে যেতো।

এই মেয়েটির 'উনি' শ্রীকৃষ্ণ সাজবে। কলতলার সকল কথাই প্রত্যেকের কানে যাচ্ছিলো। ইন্দ্রজিৎ হেসে বললে, কুরুক্ষেত্র না শেষে কলতলায় হয়।

যা বলেছো ইন্দির ভায়া, ওদের জ্বালায় না দলটা ভাঙে।

দুলো হেসে বললে, ভাগ্যিস আমি বিয়ে করিনি। তা হলে কি কাণ্ডটা হতো বলো দেখি? সাজবো তো দুঃশাসন—গায়ের জ্বালায় বৌ-ই একদিন আমার রক্তপান ক'রে বসতো দেখছি।

কলতলার ঝগড়া অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মধ্যপথে থেমে গেল। সকলে বিস্মিত হয়ে গলা বাড়ালে। দেখলে, রণক্ষেত্রে পার্বতী এসে দাঁড়িয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ বললে, ব্যাপার কি হলো? সবাই অমন করে রণে ভঙ্গ দিলে কেন?

ছিদেম বললে, পাবতীর স্বামী যে শিখণ্ডী। ঐ অপরাধে বেচারা পাবতীর ওরা মুখ দেখে না।

সবনাশ! স্বামীর যাত্রা করার রস যে শেষে গাঁজিয়ে উঠলো! বলে ইন্দ্রজিৎ হাসতে লাগলো।

কিন্তু ছিদেমের হাসি তখন মুখ থেকে মিলিয়ে গেছে। বললে, ওদের জ্বালাতেই তো 'শিখণ্ডী' করবার লোক পাওয়া যায় না। হারামজাদিরা বোঝালে বোঝে না যে এটা অভিনয়। দুলো, যা তো, ক্যাবলার মা'টাকে হিড় হিড় ক'রে এখানে টেনে নিয়ে আয়। ঐ তো যত নষ্টের গোড়া।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বলে, ভীমের বৌ কিনা।

শুধু এতেই এতটা হতো না ইন্দির ভায়া! ও জানে কিনা, আমিই এ-দলের পাণ্ডা। বলে, ছিদেম গম্ভীর মুখেই হেসে ফেললে।

ওগো শুনছো! কোন্ মাড়োয়ারী না কি কাপড় দিচ্ছে, একবার যাওনা। বলতে বলতে মনোরমা এসে ঘরে 'ঢুকলো।'

তা কি করতে হবে? ও ব্যাটার কাছে আমি ভিক্ষে চাইতে যেতে পারবো না।

তুমি যেতে পারো না, কিন্তু আমাকে কন্‌ট্রোলে পাঠাতে লজ্জা করে না তোমার? মনোরমার স্বর স[illegible] উঠলো।

দুলো উত্তর দেয়: কেন ঝগড়া করছো বৌঠান! ওনারা কখনো কি এসব করেছে?

আর আমিই বুঝি চিরটা কাল কন্‌ট্রোলে যাচ্ছি?

ছিদেম আস্তে আস্তে ঘর থেকে উঠে গেল। তুলো বললে, বেশ তো, তোমার কাপড়ের দরকার থাকে—আমি এনে দেবো।

মনোরমা কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৫

সকাল থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টির আর বিরাম নাই। ভূপতিবাবুর চাকর কালীচরণ তাই দেখে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে। এমনি এক বৃষ্টিতে তার গাঁয়ে অজয়ের বাঁধ ভেঙেছে। এবার খবর এসেছে নদীর জল গাঁয়ে ঢুকেছে। তাদের আশ-পাশের গাঁগুলো এখনো জলমগ্ন। শুধু তাদেরই গ্রাম উঁচু বলে আজো মাথা জাগিয়ে খাড়া আছে। কিন্তু আবার যদি নদী ফেঁপে ওঠে—

মনে করতেও কালীচরণের বুক ঠেলে কান্না আসে। তাদেরই জ্ঞাতগোষ্ঠী শম্ভু কুণ্ডু বানের জলে কোথায় ভেসে গিয়েছে কেউ জানে না। শোনা যায়, রাধানাথ সপরিবারে রেলপথ ধরে আজো হাঁটছে! কলকাতায় যারা আস্‌ছে এবং আসবে তারা তো ঐ রাধানাথ, শম্ভু কুণ্ডুরই দল। কালীচরণ শিউরে ওঠে। বাড়িতে তারও আছে দুটি ছেলে মেয়ে। মনে পড়ে তার স্ত্রীর কথা। আজো সে ভাল করে পথ চলতে জানে না। দুর্গম পথ। রেল-লাইনের পাশাপাশি চলেছে, পাথর ও কাঁটাতারের বেড়া! দল বেঁধে হয়ত অনেকেই আসছে সেই পথ ধরে! কোলের ছেলেটা দুধ পাবে না, হয়ত কোলেই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। তারপর কলকাতায় তারা আসবে, কোথায় উঠবে কে জানে! ঐ ডাস্ট্‌বিনটার ধারে অগণিত নর-কঙ্কালের মাঝে তারাও হয়ত একদিন মিশে যাবে!

মিশে অনেকেই গিয়েছে। আজ কাউকেই চেনা যায় না। আজ ওদের একই বর্ণ, একই আচার, একই আহার। হয়ত ওদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরের কোনো লজ্জাশীলা বধূ সব হারিয়ে পেটের জ্বালায় কলকাতার নাম শুনে দলের সঙ্গে এসে পড়েছে। আজ সে সকলের সঙ্গে মালসা হাতে করে তাদেরই গলায় গলা মিলিয়ে নির্লজ্জ চিৎকার করছে: দুটি ভাত দেমা, মা মাগো!

বিকেলে কালীচরণ আর স্থির থাক্‌তে পারলো না। রাস্তায় বেরিয়ে সে একদিক ধরে চলতে লাগলো। রাজপথে বুভুক্ষিত আগন্তুক দল আবর্জনার মতো সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাদের মুখের দিকে চাইতে চাইতে কালীচরণ পথ চলে। এ যেন সবই এক মুখ। ঝামার মত পোড়া রং, বিশ্বগ্রাসী 'হাঁ' করে এখানে-ওখানে পড়ে আছে! একটা জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়ালো। ঠিক তার টুনটুনির মত দেখতে। একবার চিৎকার করেই সে তার ভুল [illegible] পারলে। নিশ্বাস ফেলে আবার সে পথ চলতে লাগলো।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল অথচ কালীচরণ বাড়ি ফেরে না, ভূপতিবাবু ডেকে ডেকে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। [illegible]তা বলে, আজকাল কালীচরণের কাজের দিকে মন নেই বাবা!

সে বোধ হয় অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টায় আছে।

সে তো বললেই পারে সেকথা।

সুজাতা কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কাল অজিত বাবুর পার্টিতে কি তুমি যাবে বাবা?

আমি তো যেতে পারবো না মা! আমাদের মিলের লোকগুলো ধর্মঘট করে কাজ বন্ধ করছে—একটা ব্যবস্থা না করলে মিল একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

হঠাৎ ধর্মঘটই বা তারা করতে যাচ্ছে কেন?

সুবিধাবাদীর দল, হয়ত কোনো সুবিধা খুঁজছে। মাড়োয়ারি অংশীদাররা বেঁকে দাঁড়িয়েছে—ওরা এক পয়সাও ছাড়বে না।

না ছেড়েই বা করবে কি? মিল যে বন্ধ হয়ে যাবে।

ভূপতিবাবু হেসে বললেন, ঐ মেড়ো ধনীদের বিশ্বাস—আমরা ওদের সাপোর্ট করছি। কারণ মজুররাও বাঙালী, আমরাও বাঙালী।

এখানেও সেই বাঙালী বিদ্বেষ!

বাঙালী না হলে ওদের চলে না, অথচ এই বাঙালীকেই ওরা অবিশ্বাস করে সব চাইতে বেশী।

অথচ এমনি দুর্ভাগা দেশ, ওদের টাকাই সর্বত্র খাটছে!

সেজন্যেও দায়ী আমরা। আমরাই ওদের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছি। ওদের সকল কাজেই বাঙালী ব্রেন শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। অথচ পারিশ্রমিক হিসেবে পায় তারা খুব সামান্য।

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে কালীচরণ সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে হাউ হাউ শব্দে কেঁদে উঠলো।

ভূপতিবাবু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

আমার বাড়ি ঘরের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ কেউ বলছে, সব ডুবে গিয়েছে।

তা এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?

খবর নিতে গিয়েছিলাম বাবু! তা সব রাস্তাই ঘুরলাম, কোথাও তাদের দেখলাম না।

রাস্তায় রাস্তায় খুঁজলে কি হবে কালীচরণ? সুজাতা বলে।

আজ্ঞে দিদি, সবাই তো এসেছে হুগলী বর্দ্ধমান মেদিনীপুর থেকে। ভাবলাম বুঝি—

ভূপতিবাবু হাসবার ভঙ্গীতে বললেন, দূর পাগল! তোর বৌ কি অমনি করে কলকাতায় আসতে পারে! চিঠি লিখে দে, খবর পাবি।

চিঠি কি যাবে বাবু। কোথায় পোষ্টাপিস, কোথায় লোকজন। বলে কালীচরণ আর একবার কেঁদে ওঠে।

আচ্ছা, আচ্ছা সে ব্যবস্থা আমি করছি। বলে ভূপতিবাবু অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন।

কালীচরণ আরো কি বলতে যাচ্ছিলো। বাধা দিয়ে সুজাতা বললে, আচ্ছা, তুমি এখন যাও কালীচরণ, সে হবে এখন।

ভূপতিবাবু তখন ধর্মঘটের কথা ভাবছেন। তিনি একা হলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু সকলের মত এক নয়। একজন ইউরোপীয়ান আছেন, তিনি চোখ রাঙিয়ে কাজ চান। মেড়ো বন্ধুটি ভীতু, কিন্তু কাজ আদায়ের জন্যে যে কোনো পক্ষ অবলম্বন করতে এবং যে-কোনো নীচ কাজ করতে তিনি ইতঃস্তত করেন না। একজন কংগ্রেসী অংশীদার আছেন, তিনি মুখে অহিংস হলেও পূর্ণ মাত্রায় হিংস্র।

ভূপতিবাবু তিন দিন ধরে একটি খসড়া প্রস্তুত করে সকলের কাছে যাতায়াত করেছেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। মেড়োয়াবাদী একমুখ হেসে বলেছে, ভয় পেলে চলবে কেন বাবু, সাহেবকে ফলো করো। সুতরাং দাঙ্গা অনিবার্য।

একটা নিশ্চিত সম্ভাবনাকে সম্মুখে রেখে ভূপতিবাবু আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। দলের লোকগুলোকেও তাঁর ডাকতে সাহস হয় না। হয়ত অপর পক্ষ তাঁকেও ষড়যন্ত্রকারিদের একজন বলে মনে করছে।

সুজাতা বলে, তুমি কেন এত ভাবছো বাবা? যা হবার হবে। আরো তো অনেকে রয়েছেন।

তা সত্যি, আরো অনেকে আছে। ভূপতিবাবু মুখে এইকথা উচ্চারণ করলেও তিনি জানেন তারা সর্বনাশই করবে—ভাল করবার ইচ্ছা থাকলেও পারবে না।

হলোও তাই। ভাল তারা করতে পারলো না। ফলে কলহের সৃষ্টি হলো। সাহেব বললে, কাম করো, না তো মরো।

তারা মরবার জন্যেই প্রস্তুত হলো।

সুজাতা ভেতরের কথা কিছুই জানতো না। তাই নিশ্চিন্ত মনে অজিতের পার্টিতে যোগদান করেছে। কিন্তু পার্টিতে এসে সে যেন হাঁপিয়ে উঠলো।—এই কি পার্টি? ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে একজনের স্তুতি শুনবার এতটা ধৈর্য মানুষের কি করে থাকতে পারে এ তার ধারণায় ছিল না। অথচ মানুষগুলোর না আছে স্বার্থ, না আছে আত্মতৃপ্তি! বার্ণাড শর মতে এরাই বোধ হয় কুকুরের জাত।

রাস্তায় কোলাপ্‌সেবল গেটের বাইরে ভিড় করে বসেছে আর এক জাতের কুকুর—যারা মারও খায়, হাত পেতে খাবারও নেয়। তাদের চিৎকার অস্ফুট হলেও সভার কাজে ক্ষতি করছিলো। ঠিক এই সময় মিঃ চ্যাটার্জি ভিড় ঠেলে ঝড়ের মতো সভাস্থলে উপস্থিত হলেন। বললেন, আমার বিলম্বের জন্যে সকলের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন, কিছুদিন থেকে ভূপতি চৌধুরীর মিলে একটা গোলমাল চল্‌ছিলো। ধর্মঘটের সূচনা দেখেই এলিস সাহেব আজ সেটা ব্রেক করবার জন্যে অমানুষিকভাবে গুলি চালিয়েছে। ফলে শ্রমিকরা ক্ষেপে উঠে মিলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

সুজাতা চিৎকার করে উঠলো: মিঃ চ্যাটার্জি, আমার বাবার খবর কি বলুন?

ঠিক বলতে পারবো না, তবে খুব সম্ভব তিনি আহত হয়েছেন।

আমি যাবো, আমাকে নিয়ে যেতে পারেন মিঃ চ্যাটার্জি?

আপনি সেখানে গিয়ে বিপদে পড়বেন।

হয়ত। কিন্তু না গেলে তাঁদের বিপদ বাড়বে।

বেশ চলুন।

সভায় তখন অজিতের জীবন-কাহিনী পাঠ হচ্ছে। অসময়ে এই ডিষ্টার্বেনস ক্রিয়েট করার জন্যে মিঃ চ্যাটার্জির ওপর অজিত বিরক্ত হয়ে উঠলো। বললে, তুমি না-ই বা যেতে, আমরা একটা খোঁজ নিচ্ছি।

সুজাতার সমস্ত মুখখানা ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে উঠলো। বললে, তার দরকার নেই অজিতবাবু, আপনি আনন্দ করুন এবং আপনাকে আনন্দ দেবার জন্যে যারা এখানে সংবর্ধিত হচ্ছেন তাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। জগতের কোথায় কি ঘটছে—মহামানবের সেদিকে দৃষ্টি নাই বা পড়লো। আসুন মিঃ চ্যাটার্জি! বলে সুজাতা দৃপ্তার মতো সভাস্থল পরিত্যাগ করলো।

মোটরে উঠে সুজাতা বললে, আর একটু কষ্ট দেবো মিঃ চ্যাটার্জি! আমাদের বাড়ির সামনে একবার গাড়িখানা রাখবেন, একজনকে তুলে নেবো।

কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে সুজাতা যখন বস্তির দিকে এগিয়ে গেল তখন মিঃ চ্যাটার্জি বিস্মিত হলেন। বললেন, এখানে আবার আপনার কি প্রয়োজন?

সুজাতা কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল।

ভুলো রোয়াকে বসে মদ গিলছিলো, হঠাৎ সুজাতাকে দেখে সে মদ খেতে ভুলে গেল।

ভুলো কথা বলবার আগেই সুজাতা প্রশ্ন করলে, এখানে ইন্দ্রজিৎবাবু থাকেন?

নাম শুনে ইন্দ্রজিৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বললে, আপনি কি আমাকে খুঁজছেন?

আপনাকে কিনা জানি না। আমি চাই ইন্দ্রজিৎ বাবুকে।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বললে, আমারই নাম।

আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আমি ঐ সামনের বাড়িতে থাকি, জানেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না, আমি জানি না। কি দরকার বলুন।

ভূপতি চৌধুরীকে জানেন? আমি তাঁরই মেয়ে। তারপর সুজাতা একটি একটি করে মিল-ধর্মঘটের সকল কথাই বললে।

ইন্দ্রজিৎ সমস্তটা ধৈর্যের সঙ্গে শুনলে। বললে, এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি বলুন?

প্রতিবেশী হিসেবে আপনার কাছে আমি সাহায্য নিতে এসেছি।

আমি সামান্য একটা অফিসের কেরানি। অথচ কেন যে আমার কাছে আপনি এসেছেন, এইটেই আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে। বস্তিতে থাকি, কম খরচে হবে বলে। আমাকে যদি শ্রমিকদের নেতা বা ঐ রকম একটা কিছু মনে করে থাকেন, ভুল করেছেন। অবশ্য বস্তির সকলে আমাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আপনাদের মিলের ওরা এ বস্তিতে থাকে না—তারা আমার কথা শুনবে কেন?

কিন্তু আমার মন বলছে, আপনি গেলেই সকল দিক রক্ষা হবে।

ইন্দ্রজিৎ হেসে বললে, আপনার মনের সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। আপনার ভুল আপনি পরে বুঝতে পারবেন কিন্তু ভুল করে যদি আবার আমাকেই টেনে নিয়ে যান, তখন আপনারও অনুশোচনার অন্ত থাকবে না।

দেখুন দেরী হয়ে যাচ্ছে, এরপর হয়ত আমি বাবাকেও হারাবো। কিছু না পারেন, আমার সঙ্গে তো যেতে পারেন।

হাঁ, তা পারি।

তবে আসুন। বলে সুজাতা ইন্দ্রজিতের হাত ধরলে।

মিঃ চাটার্জি বলেছিলেন, শ্রমিকরা মিলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সেকথা ঠিক নয়। এলিস গুলিও চালায়নি। তবে পর পর কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজে শ্রমিকদল ক্ষেপে উঠেছে, বড় বড় পাথর এনে তারা জড়ো করেছে—দরকার হলে মালিকদের একটিকেও ফিরে যেতে দেবে না।

ভূপতি চৌধুরী তাদের শান্ত করবার চেষ্টায় যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এলিস উত্তেজিত হয়ে তার পিস্তলটি হাতে নিয়ে প্লাটফরমে পায়চারি করছে, ঠিক সেই সময় সুজাতার মোটর এসে দাঁড়ালো মিল-প্রাঙ্গণে। শ্রমিকরা মনে করলে বুঝি পুলিশের গাড়ি। অমনি তাদের সমবেত চিৎকার-ধ্বনিতে জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। চতুর্দিক থেকে পাথর বৃষ্টি সুরু হলো।

ইন্দ্রজিৎ গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে এলিসের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিলে। এলিস চেয়ে দেখলে, এক সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক।

বিরক্ত হয়ে সাহেব বললে, লিভ ছাট প্লেস।

ইন্দ্রজিৎ হেসে উত্তর দিলে, দেরী আছে সাহেব, নিজেরা যদি বাঁচতে চাও বাধা দিও না। তারপর সমবেত জনতার দিকে চেয়ে চিৎকার করে বললে, ভাইসব! আমি তোমাদেরই মতো বস্তিতে থাকি, তবে শ্রমিক নই কেরানি। কিন্তু দুঃখ এক। আজ যারা ধনী—যাদের গাড়ি আছে, তাদের কাছে চিৎকার করে কাঁদলে দুঃখই বাড়বে। আমি কেরানী, চুরি করতে পারিনা বলে কেরানি, ভিক্ষা চাইতে জানিনা বলে কেরানি। কল আপনি চলে না, মানুষে চালায় কিন্তু মানুষের চাইতে কলের প্রতাপ বেশী। কিন্তু প্রতাপ বেশী হলেও সে পঙ্গু। আজ তোমরা তাকে অচল করে দিয়েছো। ধনীর কল চালু করতে হলে চাই তোমাদের। রুটি আজ শুধু তোমাদেরই বন্ধ হবে না, ওদেরও হবে। তোমাদের চাহিদা কি জানি না কিন্তু যে-চাহিদাই হোক, ভিক্ষাই বা তোমরা নেবে কেন?

সমবেত জনতা চিৎকার করে উঠলো: না, ভিক্ষা আমরা নেবো না।

ইন্দ্রজিতের বক্তৃতার ফল ফললো। কিন্তু অপরপক্ষ ইন্দ্রজিৎকে সমুচিত প্রতিফল দেবার জন্যে পুলিশ অফিসে ফোন করে দিলেন।

সুজাতা এগিয়ে এসে বলে, বাবা, তোমাদের এলিস সাহেবকে বলো, পুলিশ এনে আর নতুন করে যেন সর্ব্বনাশ না করেন।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের অনধিকার প্রবেশ ভূপতিবাবুকেও অসহিষ্ণু করে তুলেছিলো, তাই কোনো কথা না বলে বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে নিষ্ফল আক্রোশে চেয়ে রইলেন।

একটু পরেই সশস্ত্র পুলিশ গেটে প্রবেশ করলো। সুজাতা একমুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে ইন্দ্রজিতকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেখানে দাঁড়ালো। বললে, তোমরা আমার ভাই। হয়ত আমাকে কেউ তোমরা জানো না, আমি ভূপতিবাবুরই মেয়ে। আমাকে তোমরা শ্রদ্ধা করবে এও যেমন চাই না, আমাকে তোমরা উপেক্ষা করবে এও তেমনি চাই না। আমাদের মোটর আছে সত্যি, বাড়িও আছে যা তোমরা এইমাত্র শুনলে। কিন্তু একটা জিনিষ নাই, তোমরা যা শুনলে না বা জানলে না। নাই শান্তি। আমি জানি, কেউ তোমরা আমাদের প্রীতির চোখে দেখো না। কেন দেখতে পারো না তার কারণও সুস্পষ্ট। তোমরা ভক্তি করো ভয়ে, সেলাম ঠোকো স্বার্থে। নইলে মনে-প্রাণে যে আমাদের ঘৃণা করো তা আমরা জানি। তোমাদেরই মধ্যে থেকে একদল বেরিয়ে এলো, যারা বললে, ভয় আমরা করবো না, অথবা সেলাম আমরা দেবো না: আমরা তাদের পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিলাম। কিন্তু এমনি করে ক্ষমতার অপব্যবহারে যাদেরকে আমরা পিষ্ট কবতে চেয়েছি, তাদের শক্তিও যে কম নয়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। ভয় দেখিয়ে আজকের দিনে যে কাজ করানো যাবে না, এ যারা আজো বুঝলো না তাদের ধিক।

সমবেত চিৎকার হলো, ধিক্ ধিক্।

এলিস সাহেব পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। ভূপতিবাবুকে ডেকে বলে, তোমার মেয়েকে সামলাও চৌধুরী।

কংগ্রেসী অংশীদার এগিয়ে এসে বলে, নইলে আমাদের স্টেপ নিতেই হবে।

জয় মহাত্মা গান্ধীজিকি—একবার বলুন শুনি, আপনার মুখে মানাবে ভাল। বলে ইন্দ্রজিৎ একবার হাসলে। ব্যবসা-ক্ষেত্রে মেড়োর মতো হিংস্র আর নাই আমি জানতাম কিন্তু এখন দেখছি আপনি শুধু হিংস্র নন, ভণ্ড শয়তান। খদ্দরের জামা-কাপড় পরে মিল চালাতে লজ্জা করে না আপনার? অহিংসার দোহাই দিয়ে সাহেবকে গুলি চালাবার পরামর্শও দিচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি—সাবাস!

পুলিশ সাহেব ইন্দ্রজিতের মুখ থেকে কিছু বেরুবার অপেক্ষাতেই ছিল। কারণ যে-লোকটা কিছুই বললো না, তাকে য্যারেষ্ট করা যায় কি করে।

ইন্দ্রজিতকে নিয়ে একদল পুলিশ যখন চলে গেল, তখন জনতা ক্ষেপে উঠলো। সুজাতার সহস্র চিৎকারও আর কেউ কানে তুললো না। পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালাতে লাগলো, ফলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো।

সন্ধ্যার মুখে মিল-মালিকদের কমিটি বসলো। কমিটিতে স্থির হলো, মিলের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না-আসা পর্যন্ত মিল বন্ধ থাকবে।

সুজাতা কিছুতেই তার মনকে শান্ত করতে পারছিল না। তার এই কথাই বার বার করে মনকে আঘাত করছিলো, সেই যেন জোর করে ইন্দ্রজিতকে টেনে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিয়ে এলো।

ভূপতিবাবু কন্যার এই অস্থিরতা লক্ষ্য করলেন। বললেন, তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি মা। ইন্দ্রজিতকে জেল খাটতে দেবো না, তাকে বের করে আনতে যাই কেন না করতে হোক, আমি করবো।

ভূপতিচৌধুরী সত্যই যথাসাধ্য করলেন।

ইন্দ্রজিতকে পরদিনই ওরা ছেড়ে দিলে। কিন্তু এই একটি দিনের আটকে বস্তির লোকগুলো ক্ষেপে গেল। বললে, ঠাকুর, হুকুম দাও।

ইন্দ্রজিৎ হেসে উত্তর দিলে, ছি! ওরাই তো আমার জেল বাঁচিয়েছেন। নইলে কোথায় থাকতাম আমি আজ বল দেখি।

বাঁচাবে না তো কি করবে—অমন করে টেনে নিয়ে যায় কেন? ভুলো রুক্ষস্বরে জবাব দেয়।

সে ভালোর জন্যেই নিয়ে গিয়েছিল। এমনটা হবে সে আশাও করেনি: তার জন্যে সে নিজে কি লজ্জা কম পেয়েছে রে।

যাওয়াই বা হলো কেন? মনোরমা ঝাঁকিয়ে ওঠে। রূপসী মেয়ে দেখে গলে গেলেন। জেল হলে কি হতো শুনি? ওরা আমাকে খেতে দিতো?

ইন্দ্রজিৎ চুপ করে থেকেই কথাগুলো পরিপাক করলে। এই পরিপাক-শক্তি ইন্দ্রজিতের অসাধারণ। কারণ সে জানে কথা মানুষ বলবেই। মিষ্টি-মধুর কথাও একদিন তিক্ত হয়ে ওঠে অভাবের জ্বালায়। নইলে মনোরমাকে তো সে এতটা কাল দেখে এলো। কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে মনোরমা। এমনই হয়। ঠিক এমনি করেই মানুষ হঠাৎ নীচ কাজ করে বসে। অথচ কোনো কিছুই ঠেকাবার শক্তি আজ ইন্দ্রজিতের নাই। একটা দিক ইন্দ্রজিৎ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, অর্থহীন মানুষ ভদ্রসমাজে অচল। তাদের বেঁচে থাকারও যেমন কোনো মানে হয় না, ভদ্র বলে পরিচয় দেওয়াও তেমনি অর্থহীন।

বস্তির এদের সে বালাই নাই। ভদ্রসমাজে এরা মিশতে যায় না, মিশবার আকাঙ্খাও নাই। কিন্তু তারা না পারে ওদের সঙ্গে মিশতে, না পারে এদের সঙ্গে। দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছের বোঝা বয়ে সারাজীবন বেঁচে থাকার কসরৎ—মধ্যবিত্ত ঘরের অভিশাপ।

ছিদেম এসে বললে, ইন্দির ভাই, কি হয়েছিল বলো তো শুনি?

ইন্দ্রজিৎ সমস্ত কথাই আনুপূর্বিক বলে গেল। তারপর বললে, আমরা বেঁচে থেকে কার কি করে যাবো ছিদেমদা। জেলে গেলেও আমার ভাবনা ছিল না, তোমরাই দেখতে। আজ ভূপতি চৌধুরীর মেয়েকেও মাথা নীচু করতে হয়েছে এই বস্তিরই একজনের কাছে।

তা ঠিক। ছিদেম বললে। তবে কি জানো ইন্দির ভাই, তোমার কাছে মাথা নীচু করবে না এমন লোক তো দেখলাম না।

মনোরমা বললে, বাজার যেতে হবে না? তরকারি যে একফোঁটা নেই, গিলবে কি দিয়ে শুনি?

ইন্দ্রজিতের চোখে অন্ধকার নাগলো। মাইনের টাকা অনেকদিনই শেষ হয়েছে। ধার করে কদিন চলেছে, কিন্তু প্রতিদিনের চাহিদা মেটাতে ধারই বা আর লোকে কত দেবে? ইন্দ্রজিৎ থলিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

দুলো বলে, যাই বলো বৌঠান, তুমি লোককে বড় খাটাতে পারো।

খাটবে না তো কি করবে শুনি? বসে বসে থেকে বাতে ধরবে যে।

তা যা বলেছো, বাতে ধরলে ডান হাতের পথও বন্ধ। বলে দুলো হা হা করে হাসতে লাগলো।

মনোরমা তেলের বোতলটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। কেরাসিন ফুরিয়েছে। আবার গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। মেয়ে পুরুষে ঠেলাঠেলি। মনোরমা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলো না। এ-আর-পির একটা লোক একগাল হেসে বললে, কতটা তেল চাই?

দু-বছর আগে ঠিক এই ধরনের কথা শুনলে মনোরমা লজ্জায় মরে যেতো। কিন্তু আজ সে বুঝে নিয়েছে, ওরকম হালকা রসিকতায় তাদের জাত যায় না। মনোরমাও আজকাল ঐসব নীচ রসিকতার জবাব দিতে শিখেছে। দেখেছে, এতে কাজ পাওয়া যায়।

এ-আর-পির যুবকটি মনোরমার হাত থেকে বোতল নিয়ে চলে গেল। লাইনের মেয়েগুলো তাই দেখে মুখ বিকৃত করলে: কেউ বললে, মরণ আর কি, এক বোতল কেরাসিনের জন্যে মুখ পোড়ালি!

একজন বললে, ঐ বস্তিতে থাকে—বামুনের বৌ।

ঝাঁটা মারো বামুনের মুখে।

মনোরমাকে এত শীগ্‌গীর ফিরতে দেখে দুলো বললে, আজ কি ভিড় ছিল না বৌঠান?

ভিড় থাকবে না কেন। সুন্দর মুখ দেখলে সবাই কাজ ক'রে দিয়ে কৃতার্থ হয়।

দুলো বলে, তা যা বলছো বৌঠান। আসছে জন্মে মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাবো।

মনোরমা হেসে বলে, হাঁ সুখ কত, তখন বুঝো!

দুঃখই বা কোথায় তাতো দেখলাম না।

আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি ঐ এ-আর-পির লোকটাকে জানো?

ঐ ভূতোটা? জানি না আবার! আগে তো ঝড়েপুকুরে বিড়ি বাঁধতো।

বিড়ি বাঁধতো! বলো কি ঠাকুরপো! মনোরমা বলে আর হাসে। চালের কন্ট্রোলে যাই, সেখানেও এক ছোঁড়া—

সে আবার কি বলে? দুলোর চোখ পিট্ পিট্ করে।

সে তুমি নাই বা শুনলে।

ঐ দুঃখই মদ খাই বৌঠান। চোখ বড় খারাপ দ্রব্য, ও শালাকে বিশ্বাস নাই। কি জানি, কার বৌ-র দিকে কোন দিন চাইবো, দেবে ছুরা বসিয়ে। তার চেয়ে ঘরে বসে মদ খেলাম, কেউ বলবারও নেই, কইবারও নেই।

প্রতিদিন নতুন নতুন খবর আসছে: বর্ধমান গেল, হুগলী গেল, ওদিকে দামোদরের গর্জনও শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টিরও নাই বিরাম। কালীচরণ আকাশের দিকে ছলছল চোখে চেয়ে থাকে। মেঘ ডাকলেই তার মনে ভয় হয়, ঐ বুঝি সব গেল।

রাত্রে কালীচরণ স্বপ্ন দেখে, তাদের গ্রামে রেল-লাইনের ওপর জল উঠেছে। সমস্ত গ্রাম জলে ভাসছে। তার টুনটুনিকে নিয়ে তার মা কলার ভেলা ধরে ভাসতে ভাসতে কলকাতার মুখে আসছে।

সুজাতাকে সেই স্বপ্ন কথা বলে' কালীচরণ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

ভূপতি আসতেই সুজাতা বললে, বাবা কালীচরণকে ছেড়ে দাও—ও বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসুক।

তা বেশ তো। কিন্তু বাড়ি কি ও যেতে পারবে? ট্রেন চলাচল বোধহয় বন্ধ যতদূর জানি। তার চেয়ে এক কাজ করুক, বেঙ্গল রিলিফ সোসাইটিতে আমি একখানা চিঠি দিচ্ছি—তাদের কাছ থেকে সব খবরই হয়ত পাবে।

কালীচরণ চিঠি নিয়ে চলে গেল। ভূপতিবাবু নিশ্বাস ফেলে বললেন, আহা বেচারা! তারপর একটু থেমে বললেন, মানুষের কী দুর্দিনই এসেছে। ঘর নাই, ভাত নাই, কাপড় নাই: গত যুদ্ধেও আমাদের ইজ্জৎ ছিল কিন্তু এবার তাও নাই। কাল শুনলাম, রমেশের বৌটা লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে।

রমেশদার বৌ? সুজাতা বলে।

ইদানীং ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে কোনোরকমে ওদের চলছিলো। তারপর কাপড়ের দোকান যখন বন্ধ হলো—টাকা দিয়েও যখন মানুষ এক টুকরো সংগ্রহ করতে পারে না, তখন শুনছি রমেশের বৌ ঘরে দোর দিয়ে উলঙ্গ হয়ে থাকতো।

কিন্তু এমন করে মানুষ কদিন কাটাতে পারে? শেষে শুনলাম, লজ্জায় ঘৃণায় বৌটা কাল গলায় দড়ি দিয়েছে।

সুজাতা স্তব্ধ হয়ে কাঠের পুতুলের মতো বসে রইলো। কোনো কথা ভাববার মতোও তার মনের অবস্থা নয়। সে শুধু দেখছে, একটা লোক কাল পর্যন্ত ছিল, আজ নাই। কত সহজে সে নিজের ইজ্জৎ নিয়ে চলে গেল।

ভূপতিবাবু বললেন, sad!

সুজাতা চমকে উঠে বললে হাঁ, sad।

রমেশের কাছে আমাদের একবার যাওয়া উচিত—নয় কি মা?

না বাবা! এ সান্ত্বনার কোনো মানে হয় না। অতবড় প্রয়োজনে তোমার মতো ঘনিষ্ঠের কাছেও যে হাত পাতলে না, তাকে তুমি সহজ মনে করো না বাবা। দেখবে, আমাদের যাওয়াটাই ব্যঙ্গের মতো দেখাবে।

সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে ভূপতিবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এত কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। রমেশের এই উদাসীনতার পিছনে যে সম্মানী লোকটি এতকাল আত্মগোপন করে ছিল, আজ সুজাতা এমন করে দেখিয়ে না দিলে হয়ত কোনদিনই তিনি দেখতে পেতেন না। তাই বটে। আমরা কাপড়ের বাহার দেখাতে যাবো—আমাদের মুখে সান্ত্বনার কোনো কথাই মানাবে না।

তোমার মনে আছে বাবা, বিহার ভূমিকম্পে আমাদের দেশের নেতারা একবার রিলিফ করতে গিয়েছিলেন? তাঁরা যাবেন এই শুনে দেশের লোক আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। গাড়ি রিজার্ভ করে যাবতীয় আরামের ব্যবস্থা করে চার পাঁচটা চাকর এবং তদনুরূপ কুক সঙ্গে নিয়ে তাঁরা আর্তের সেবা করতে ছুটলেন।

ভূপতিবাবু উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অজিতকে দেখে থেমে গেলেন। কি অজিত, তোমাকে কদিন দেখিনি কেন বল তো? বলে ভূপতিবাবু যেন অন্য প্রসঙ্গে আসতে পেরে নিজেকে হালকা মনে করলেন।

অজিত বললে, অনেকগুলো ফাংকসনে আমাকে যোগ দিতে হলো। যাদের সঙ্গে কোনোকালেই পরিচয় ছিল না, তারাও টেনে নিয়ে গিয়ে আসনে বসিয়ে দিলে। বললে বিশ্বাস করবেন না, কদিনের সংবর্ধনায় আমি একেবার হাঁপিয়ে উঠেছি।

কিন্তু এই কদিনে আপনার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেছে তাও দেখছি। বলে সুজাতা হেসে ফেললে।

অজিতও হাসলে। বললে, কি রকম?

আমাদের হিন্দুর দেব-দেবীর মুখের চেহারা বোধ হয় এই কারণেই দীপ্ত। মন প্রফুল্ল থাকলে দেহের কাঠামো বদ্‌লে যায়।

কিন্তু আমি তো তাদের পূজা চাইনি। অজিত রুষ্ট হয়ে বলে।

দেবতারা তো চান না, না চাইতেই পান। তবে মজা এই, একই পূজার মন্ত্র নিয়ত শুনে শুনে বেচারা মানুষে কান বিষিয়ে ওঠে কিন্তু দেবতার প্রফুল্লতা বেড়েই চলে।—দেবতা কিনা!

নিয়ত পূজা পাওয়াও ভাগ্যের কথা।

কিন্তু শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ এই ভাগ্যের বোঝা বইতে না পেরে মাঝে মাঝে পদ্মাপারে পালিয়ে যেতেন।

ওটাও একরকমের নিজের পাবলিসিটি।

তবু সে-পাবলিসিটির দাম আছে।

ভূপতিবাবু সাধারণত ধীর-স্থির প্রকৃতির লোক। তবু যেন এই আলোচনাকে ঠিক পরিপাক করতে পারছিলেন না। তাই একসময় সুজাতাকে তিরস্কারের সুরেই বললেন, তোমার কথায় শুধু জ্বালাই প্রকাশ পাচ্ছে সুজাতা মানুষের বড় হওয়ার চেষ্টা প্রকৃতিগত—সে চেষ্টা করবেই। তাই প্রয়োজন হয় পাবলিসিটির, প্রয়োজন আত্ম-অহংকারের।

অজিত হেসে উত্তর দেয়, আমার কিন্তু অহংকার নেই।

একটু-আধটু অহংকার-বোধ দোষের নয়, ও থাকা ভাল। যার অহংকার নেই, সে মানুষ হিসেবে নগণ্য।

সুজাতা হেসে ফেললে। বললে, ওজন ক'রে অহংকার কজন করতে পারে বাবা!

না-পারা অবস্থাটাই হচ্ছে দম্ভ। সেটা ভাল নয়। ভূপতিবাবু বললেন।

অজিত হেসে বলে, অনেকটা মদ খাওয়ার মতো। মদ খাওয়া ভাল, কিন্তু তার মাত্রাধিক্যটা ভাল নয়।

হঠাৎ বেবী এলো সোমেশকে নিয়ে। বললে, কাকে নিয়ে এসেছি দেখো সুজাতাদি!

সুজাতা এগিয়ে এসে বলে, আমি তো চিনলাম না বেবী।

ব্যক্তিটিকে চেনো না, কিন্তু নাম খুবই পরিচিত। ইনি সোমেশবাবু।

সোমেশবাবু! সুজাতা বিস্মিত হয়ে নমস্কার করলে।

একটা মিটিং-এ গিয়েছিলাম, সেখানে পরিচয় হলো ওঁর সঙ্গে। বললাম, আজ কিছুতেই ছাড়ছিনে আপনাকে। উনি বলছিলেন, আমার কোথাও যেতে ভয় করে।

সুজাতা হেসে ফেললে। বললে, ভয় করে কেন?

উত্তর সোমেশই দিলে, না না, ভয়ের কথা নয়। পরিচয় নাই তাই সংকোচ হয়।

বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আপনি চা খান নিশ্চয়?

খুব খাই। চা না হলে আমাদের একমুহূর্ত চলে না।

ওটা ইন্‌স্‌পিরেসন। যেমন ইন্‌সপিরেসন-এ আমি এতটা পথ অতিক্রম করে এলাম।

কি রকম? সুজাতা বললে।

একটা নতুন উপন্যাস লিখছি। কিছুটা লিখেই মনে হ'লো, যাদের জানি না, তাদের নিয়ে লিখতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল যাকে আমি খুঁজছি।

অর্থাৎ বেবীকে নিতে চান আপনার উপন্যাসে?

কেন, আপত্তি আছে কি?

হাঁ আছে, অন্তত আমার আছে। বলে অজিত সজোরে টেবিলের ওপর ঘুঁসি মারলে।

সোমেশ টেবিলটার দিকে একবার চাইলে। তারপর বললে, যাক্ টেবিলটার পরমায়ু আছে।

সকলে জোরে হেসে উঠলো।

আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন মনে রাখবেন।

বেশ, মনে করিয়ে দিন।

এরপর অজিতের ধৈর্যরক্ষা কঠিন হয়ে উঠলো। চিৎকার ক'রে বললে, বেবী! চলো, আমার সঙ্গে বাড়ি যাবে চলো।

তুমি যাও দাদা, আমি পরে যাচ্ছি।

জেঠামশাই খুব খুশি হবেন না মনে রেখো।

বেবী উত্তরে বলে, এতে খুশি না-হবার কি আছে তাতো বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে অবশ্যই পারছো, কিন্তু আজ আর কোনো কথা মানতে চাইবে না তুমি।

কথাটা স্পষ্ট হ'লো না। কেন মানতে চাইবো না তাই বলো।

শস্তা উপন্যাসের সুলভ নায়িকা হবার প্রলোভনে আজ সবকিছুই ভুলেছো তুমি।

তোমার শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, আজ দেখছি, তুমি অতি সাধারণ মানুষ।

সুজাতা গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভূপতিবাবু অনেকক্ষণ থেকে সোমেশের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন, আপনার পরিচয় আমি এদের কাছ থেকেই পাই—অবশ্য এজন্যে লজ্জা একটা পাচ্ছি। নিজে কিছু পড়িনি, ওদের মুখেই শুনি, আপনি নাকি সাহিত্যে কমিয়্যুনিজম্ প্রচার করছেন।

সোমেশ হেসে বলে, কোনো কিছুই প্রচার করছি না। যেখানকার যেটুকু গলদ্ তাই বলে যাচ্ছি।

অজিত বিদ্রূপের সুরে উত্তর দেয় আপনি বললেই যে লোকে মেনে নেবে এ বিশ্বাস আপনার কোথা থেকে হলো? তাছাড়া, যাকে আপনি গলদ বলছেন, অন্যের চোখে তা নাও হ'তে পারে।

হাঁ, তাও পারে। আমি নিজের কথাই বলে যাচ্ছি।

আপনার মতটাকেই বা আপনি বড় বলে মনে করেন কোন্ স্পর্ধায়।

সোমেশ হাসিমুখেই উত্তর দেয়, প্রত্যেক মানুষই নিজেকে বড় বলে মনে করে।

সে তো পাগলেও করে।

এ আপনার রাগের কথা হলো। আমার বলার মধ্যে সত্য কিছু থাকলে লোকে নেবেই।

বেবী বিরক্ত হয়ে বললে, যারা সাহিত্যের কোন খোঁজই রাখে না, তাদের মুখে তর্কও হাস্যকর দাদা।

বাংলা নভেল পড়বার ধৈর্য আমার নেই।

কিন্তু পড়লে ভাল করতে দাদা। অন্তত আর কিছু না হোক্ গাল দিতে সংকোচ হতো!

ভূপতি চৌধুরী হাসলেন। বললেন, শুনে খুশি হলাম মা! আমার ধারণা ছিল, মেয়েরা শুধু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসই পড়ে।

বেবী হেসে ফেললে। বললে, শুধু মেয়েদের দোষ দেন কেন; অনেক পুরুষেও তাই পড়ে। বাংলাদেশের লাইব্রেরী মানেই তো ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের ষ্টোর-রুম।

তবু তার মধ্যে ব্ল্যাড্‌ভেঞ্চারের স্বাদ পাওয়া যায়। অজিতের কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ।

তারও মানে আছে অজিত। বলে ভূপতিবাবু একবার নড়েচড়ে বসলেন। নিজেদের জীবনে তো কোনো য়্যাড্‌ভেঞ্চারই নেই, তাই আজকের ছেলে-মেয়েরা ঐ সব বই-এর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এও একরকমের পারভার্সিটি।

সাহিত্যের এই অবাঞ্ছিত আলোচনা অজিতের ক্রমশ পীড়াদায়ক হয়ে উঠছিলো। তাই সে উত্তেজিত হয়েই বললে, আমি চললাম বেবী, তোমার প্রয়োজন না থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারো।

তুমি যাও দাদা, আমি পরেই যাচ্ছি।

অজিত ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্তব্ধ ঘরেও বেবী যেন নিজেকে হাল্‌কা বোধ করলে।

কিন্তু চুপ করেই বা কতক্ষণ থাকা চলে। তাই বেবী একসময়ে বললে, সুজাতাদিকে একবার ডাকুন না জেঠামশায়—চা খাবো।

ভূপতিবাবু হেসে বললেন, সুজাতা বোধহয় চায়ের ব্যবস্থাই করতে গেছে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলাম না, অজিত কেন এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলো!

দাদার কথা আমি যতটা জানি, বোধ হয় আর কেউ আপনারা জানেন না। উনি নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথায় কান দেন না এবং নিজেকে ছাড়া আর কাউকে স্বীকারও করেন না।

তাই না কি! কিন্তু লোকে যে পাগল বলবে।

কাকে পাগল বলবে বাবা? বলতে বলতে সুজাতা এসে ঘরে ঢুকলো।

এই অজিতের কথা বলছি মা।

ও! বলে সুজাতা মাথা নীচু ক'রে চা ঢালতে লাগলো। তারপর চা-এর বাটি এগিয়ে দিয়ে সুজাতা বললে, বেবীর চা-খাওয়াটা একটা উল্লেখযোগ্য। এটা কিন্তু আপনার উপন্যাসে যোগ করে দেবেন।

সোমেশ হাসলে।

ভূপতিবাবু চায়ের বাটিতে একবার চুমুক দিয়ে বললেন, কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাইনে সোমেশবাবু, এতবড় যুদ্ধ চলেছে পৃথিবীব্যাপী—আপনাদের মনে তার ছায়া পড়ে না। কতকগুলো তুচ্ছ কথা নিয়ে আপনারা পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন।

যুদ্ধ তো আজ নতুন নয় ভূপতিবাবু। এর পূর্বে বহুবার যুদ্ধ হয়েছে এবং হবেও। যুদ্ধ-প্রবৃত্তি আছে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে—যতই আমরা শান্তির কথা বলি। যুদ্ধ কোনো দিনই আমাদের মঙ্গল করেনি। যুদ্ধ শুধু দেশই ধ্বংস করে না, মানুষের সবকিছু ধ্বংস করে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন কি বলেছিলেন।

"যুদ্ধ সাজে সজ্জিত মহাগাণ্ডিবী কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ভাবী পরিণামকে লক্ষ্য করলেন। মনুষ্যহীন মহা-শ্মশানে মহাকালের মহাজিজ্ঞাসা।

অর্জ্জুন বললেন, এ যুদ্ধের শেষ কোথায়? এক অধর্মকে নাশ করতে সহস্র পাপে পূর্ণ হবে ধরণী। কুল যাবে, কুলধর্ম যাবে, মানুষের সমাজ-বন্ধনে পড়বে প্রচণ্ড আঘাত। মানুষ ভুলে যাবে কোন্‌টা ধর্ম, কোন্‌টা অধর্ম। ভয়হীন, কুণ্ঠাহীন, নির্লজ্জ ব্যভিচারে পারিবারিক জীবন ভেঙে পড়বে। পাপ আর তখন পাপ নয়—জন্ম নেবে নিষ্কলুষ ধরিত্রীর বুকে লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তান। যুদ্ধের পরিণাম যদি এই হয়, তবে কাজ নেই কৃষ্ণ, আমার সে যুদ্ধে।"

কাজেই এই যে আজ দুর্নীতি ব্যভিচার সমাজহীন-মানুষে পৃথিবী ভরে গেল—এ তো আজকের কথা নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও হয়েছে, আজও হচ্ছে। যুদ্ধের পরিণামই এই। আজ মানুষকে দোষ দিলে হবে কি?

চমৎকার বলেছেন সোমেশবাবু! ভূপতিবাবু বললেন।

তাছাড়া আমরা—সাহিত্যিকরা সৈনিকের জাত নই। যুদ্ধকে রেখেছি আমাদের ব্যাকগ্রাউণ্ডে। আমাদের তুচ্ছ ঘটনাগুলোও আজ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। এই যে ইনি এসেছেন, কিছু মনে করবেন না, বলে সোমেশ বেবীর দিকে চাইলে। ইনি এসেছেন, একখানা দামী ঢাকাই পরে—যা কিনতে হয়েছে ওঁকে চড়া দামে অতি সংগোপনে। যাদের অর্থ আছে, তাদের জন্যে চলেছে দেশ জুড়ে এই ব্ল্যাক-মার্কেটিং। কিন্তু বাকি যারা, তারা আজ উলঙ্গ হয়ে ঘরে বসে রয়েছে। কেউ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে, কেউ বাঁচবার জন্যে প্রাণপণে ষ্ট্রাগল করছে। যুদ্ধ যারা করছে তারা তো ভাল আছে, দুই হাত পূর্ণ করে টাকা নিচ্ছে, পেটপুরে খাচ্ছে, আর যা খেতে পারছে না তা মাটির বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হাঁ জেঠামশায়ও এ গল্প করছিলেন। বেবী বললে।

যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যারা মরলো তারা বীরের জাত—তাদের জন্যে আমরা গর্ব করবো। কিন্তু যারা যুদ্ধে গেল না, যারা ঐ বীরের জাতের খাদ্যসম্ভার জোগাতে অনশনে অর্ধাশনে তিলে তিলে প্রাণ দিচ্ছে, যাদের পরণে একটুকরো কাপড় নেই, যাদের সকল পরিচয় আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—যে দেশের মেয়েরা খেতে না পেয়ে দেহ বিক্রয় করছে, তাদের জন্যে আপনারা কি করেছেন ভূপতিবাবু? গ্রেট ট্রাজেডি তো এইখানে : এ তো উপন্যাসের পৃষ্ঠায় নাই—রয়েছে বাংলার এই শ্মশান-ক্ষেত্রে। আপনাদেরই এই পাড়ায়—একটি বাঙালি বধূ যাকে আপনারা বাংলার বধূ বলেন, খোঁজ নিয়েছিলেন ভূপতিবাবু, কাল সে কি করে মলো? না খেতে পেয়ে তিলে তিলে সে শুকিয়ে মরেছে। স্বামীর রোজগার কম, যা রান্না করতো তাতে দুজনের কুলোতো না। স্বামীকে খাইয়ে নিজে উপোস যেতো—ভদ্রঘরের বৌ হাত পাততে পারে না, তাই তাকে মরতে হলো।

ভূপতিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, কার কথা বলছেন সোমেশ বাবু? একি আমাদের মনোরঞ্জনের স্ত্রী?

হাঁ।

এক মুহূর্তে ঘরখানি স্তব্ধ হয়ে গেল।

অফিসের ভিড়। গাড়ি বাঁচিয়ে এঁকে-বেঁকে ইন্দ্রজিৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে অফিস চলেছে। পয়সা অভাবে অনেকদিনই তাকে হেঁটে যেতে হয়। আজ পয়সা ছিল, কিন্তু সকাল-বেলার উত্তেজনার উত্তাপ তাকে বেগবান করেছে। গাড়ির গতিও তার কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে।

কলেজ ষ্ট্রীটে এসে তাকে থামতে হলো। ধাক্কা খেয়ে একখানা গাড়ি বিশেষরকম জখম হয়েছে। লোকে লোকারণ্য, ড্রাইভারটি আহত।

গাড়ির কাছে এগিয়ে আসতেই, একটি মহিলা গাড়ি থেকে নামলো। বললে, ইন্দ্রজিতবাবু, একটু সাহায্য করুন।

বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় কুয়াশা ঠেলে সুজাতা বেরিয়ে এলো—যাকে চিনতে ইন্দ্রজিতের বেশ একটু সময় লাগলো।

আহত ড্রাইভারকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এই প্রথম ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্য করলে সুজাতার কপালে রক্তের দাগ। বললে, কি সর্বনাশ! আপনারও যে ব্যাণ্ডেজ করা দরকার।

কিছু করতে হবে না চলুন।

ফোন করে গাড়ির একটা ব্যবস্থা করে সুজাতাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বারোটা বেজে গেল। সুতরাং ইন্দ্রজিতের অফিস আর যাওয়া হলো না।

সুজাতা অপ্রতিভ হয়ে বলে, আপনার অফিস কামাই হলো—নয়?

তা হলো বই কি।

এর উত্তরে আর কি-ই বা বলা চলে। আচ্ছা একটু বসুন। আমি কাপড়টা বদলে আসি।

ইন্দ্রজিৎ এই প্রথম ভূপতি চৌধুরীর বাড়ি এলো। ঘরখানির দিকে চেয়ে ইন্দ্রজিৎ দেখলে, গৃহস্বামীর রুচি আছে। এর অতিরিক্ত আসবাব ঘরে রাখাও চলে না, কম করলেও বে-মানান হয়। পাশের দরজা দিয়ে লাইব্রেরী-ঘরটা বেশ চোখে পড়ে। ভূপতি চৌধুরী সম্বন্ধে ইন্দ্রজিতের ধারণা বেশ একটু বদলে গেল। সামনের বারান্দায় কয়েকটি ফুলের টব চমৎকার করে সাজানো। টেবিলের ওপর একখানা খোলা উপন্যাস পড়ে রয়েছে, ইন্দ্রজিৎ টেনে নিয়ে দেখলে 'মধু নিশা'। বই পড়বার নেশা ইন্দ্রজিতের নাই, তবু উল্টে-পাল্টে কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ে বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সুজাতা ঘরে ঢুকে দেখে এই কাণ্ড! বলে, বইখানা কি দোষ করলে।

ইন্দ্রজিৎ হেসে উত্তর দিলে, ঠিক ভদ্রোচিত কাজটা হয়নি বুঝতে পারছি।

মোটেই হয়নি। বইটা ছিঁড়ে যেতো বলে নয়, ওতে লেখকের প্রতি অসম্মান করা হয়।

সবই না হয় বুঝলাম, কিন্তু লেখকই বা এমন অবাস্তব কাহিনী লেখেন কেন?

অবাস্তব?

নয়? অমন ঘটনা হয় নাকি? ট্রামে উঠতে গিয়ে হাতে হাত ঠেকলো, দুজনে ফিক্ করে হাসলো—ব্যস প্রেম!

আপনার জীবনে এরকম ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি বলে যে পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটবে না—এই বা আপনি বিশ্বাস করেন কি করে?

এটা আপনার যুক্তি নয়, আমাকে রাগাবার কথা।

আপনাকে রাগিয়ে আমার লাভ কি বলুন?

হয়ত কিছু আছে। কিন্তু একি! বাড়ি এসেও আপনার কপালের ঐ ক্ষতটার কিছু করলেন না?

কপালে যা থাকে, মানুষে কি কিছু করতে পারে? মনে হচ্ছে যেন ঐ ক্ষত চিহ্নটিকে আপনি সযত্নে রক্ষা করতেই চান।

সুজাতা হাসে। তাই বা মন্দ কি! যাক্ আপনি নিশ্চয় চা খান না?

নিশ্চয় না। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

নিশ্চয় পাড়ার লোকের কাছে জানতে যাইনি।

তবে?

থাক না। সব কথা যে খুঁটিয়ে জানতেই হবে এমনই বা কি মানে আছে।

কৌতূহল মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

কিন্তু আপনার ধর্ম তার বিপরীত।

বাঃ, আমার চরিত্রের এতবড় দিকটা আমার নিজেরই জানা ছিল না তো!

আপনি জানেন না বলেই তো আমরা জেনে নিচ্ছি।

সদর দরজায় ভূপতিবাবুর গাড়ি এলো। ইন্দ্রজিৎ বললে, আপনার বাবা এলেন বোধ হয়?

উত্তর দেবার আগেই ভূপতিবাবু ঘরে ঢুকলেন। ইন্দ্রজিৎকে দেখে সহাস্যে বললেন, তুমি ইন্দ্রজিৎ—নয়?

আজ্ঞে হাঁ।

বসো, বসো। আলাপ করবার ইচ্ছা থাকলেও পারি না, আর তুমিও কোথাও যাও না। শুনেছি, পাড়ার কারু সঙ্গে তুমি মেশোও না। অবশ্য একদিক দিয়ে খুবই ভাল, কিন্তু বড় অসামাজিক হয়ে থাকতে হয়।

ইন্দ্রজিৎ হাসলে। বললে, সামাজিক বলতে আপনারা কি বোঝেন আমি জানি না, কিন্তু আমাদেরও একটা সমাজ আছে বই কি। আর মেলা-মেশার কথা বলছেন? সেটা হয়ত আমারই যোগ্যতার অভাব।

ভূপতিবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, কৌশলে তুমি আসল কথা এড়িয়ে গেলেও আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তবু বলবো, ঐ সংসর্গে নৈতিক পতন একটু হয় বই কি।

মানুষের মধ্যে বাস করতে হলে নৈতিক-ক্ষতি যে-কোনো দিক থেকেই আসতে পারে, ওটা কিছু নয়। তবে আমাদের কি হয়েছে জানেন, দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছের মতন। না পারি বড়লোকের সঙ্গে মিশতে, না পারি বস্তির সঙ্গে এক হয়ে যেতে। এই ত্রিশঙ্কুর অবস্থা নিয়ে মধ্যবিত্ত জাতটা আর টিকবে না। এই যুদ্ধেই সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

খুব শক্ত নয় ভূপতিবাবু! কারণ বলশিভিজমকে ধ্বংস করাই এ-যুদ্ধের আসল কথা।

কিন্তু অতবড় আদর্শ কি কোনোদিন ধ্বংস হতে পারে?

পৃথিবীতে অনেক আদর্শই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

সুজাতা অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিলো। বললে, বাবা, চা দেবো?

হাঁ, হলে ভাল হয়। তারপর ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে ভূপতিবাবু বললেন, তুমি বোধহয় এসব কিছু খাও না?

না। যে-জিনিস নিজে বারো মাস জোটাতে পারবো না, সে অভ্যাস না করাই ভাল। আমি না খেলেও, আপনার লজ্জা পাবার কিছু নেই।

সুজাতা হেসে চা আনতে গেলো।

দেখো, আমার কতকগুলো বদঅভ্যাস যে না হয়েছে এমন নয়, সেগুলো ইচ্ছে করলে ত্যাগও হয়ত করতে পারি। কিন্তু কথা কি জানো, ওতে যেন খানিকটা এনার্জি এনে দেয়।

আপনি খাবেন না কেন? আমি অনেককিছুই পারি না অভাবে, নইলে ওগুলো নীতি-হিসেবে বর্জন করিনি জানবেন।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো বেবী। সিঁড়িতেই তার দ্রুত পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো।

আলোচনার মধ্যপথে ছেদ পড়লো। সেই স্বল্প স্তব্ধতাটুকুর ফাঁকে বেবীর আগমন যেন জিজ্ঞাসাবাদের মতো দেখালো।

কৈফিয়ৎ বেবীই দিলে, আমি দিনকতক আপনার কাছে থাকবো জেঠামশায়!

ভূপতিবাবু খুশি হয়ে বললেন, বেশ তো মা, আমি এক্ষুনি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। কি হয়েছে, ঝগড়া করে এসোনি তো?

না জেঠামশায়! ও-বাড়ির হ্যাটমসকিয়ার আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

কিন্তু ঐ বাড়িতেই তো থাকতে হবে তোমাকে।

তা জানি। কিন্তু এই বা কি কথা। বাড়িশুদ্ধ লোক একজনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে—যেন একজনই সব। তারই সুখ-দুঃখের প্রতিটি স্পন্দনে বাকি কজনের গতি নিয়ন্ত্রিত হবে: সে হাসলে হাসতে হবে, কাঁদলে কাঁদতে হবে তার ক্ষুধা তৃষ্ণার সঙ্গে অপরের অনুভূতি জড়িত থাকবে—তার ইচ্ছায় বাড়ির আলো জ্বলবে, নইলে অন্ধকার থাকবে। তাকে খুশি রাখতে পারো, থাকো, নইলে পথ দেখো।

ভূপতিবাবু জোরে হাসতে গিয়েও থেমে গেলেন। কারণ অজিতকে নিয়ে ওরা যেরূপ উপদ্রব আরম্ভ করেছে তার অনেক খবরই তাঁর কানে এসেছে। অজিত এখন বাহবার উচ্চশিখরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—ওপরে দাঁড়িয়ে হাততালির শব্দই সে পাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না তাদের মুখের প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু। অবশ্য সকল মানুষই এমনি করে অন্ধ হয়। সে নিজেও হয়ত অনেক বিষয়ে অন্ধ। হঠাৎ ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আমি তোমার চোখে কেমন মানুষ বলতে পারো ইন্দ্রজিৎ?

বেবী বিস্মিত হয়ে ইন্দ্রজিতকে দেখলে। বললে, আপনি ইন্দ্রজিৎ বাবু! আপনার নাম আমি অনেকবার শুনেছি।

আমার নাম কোথায় কি ভাবে শুনেছেন জানি না কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি অতি সামান্য লোক। দৈবক্রমে আজ এখানে এসে পড়েছি নইলে—

নইলে? বেবী উৎসুক হয়ে জানতে চাইলে।

না। ভেবে দেখলাম আমার ওকথা বলা ঠিক হয়নি। তার চেয়ে বরং এই কথাই বলা ভাল, আমি আপনাদের ডিসটার্ব করলাম।

ডিসটার্ব মোটেই করেন নি। বরং আপনাকে দেখে আমি খুশিই হয়েছি। কারণ যে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে আমি থাকি, আজ মনে হচ্ছে, আমি এক নতুন মানুষ দেখলাম।

ঠিক এই মুহূর্তে আপনি চিড়িয়াখানায় গেলে সমান আনন্দ পেতেন। কথাটা কি জানেন, অপরের দম্ভ আপনাকে পীড়া দিয়েছে কিন্তু নিজের সজ্জায় এতটুকু ত্রুটি হয়নি।

বেবীর মুখখানায় কে যেন কালি লেপে দিলে। বললে, আমাকে এমন করে আক্রমণ করবেন জানলে, আমিও কথা বলতাম না। কিন্তু বিশ্বাস করুন—

আমাকেও আপনি ক্ষমা করবেন, অযথা আপনাকে ব্যথা দিলাম। বলে ইন্দ্রজিৎ মুখের দিকে চাইলে।

সুজাতা চা নিয়ে এলো। ওমা, বেবী যে!

হ্যাঁ, বেবী এখানে থাকবে বলে এসেছে সুজাতা। বলে ভূপতিবাবু চা-এর বাটিটা টেনে নিলেন।

সুজাতা বলে, বেশ তো। কিন্তু অজিতবাবু না শেষে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যান।

উত্তরে বেবী শুধু হাসলে। ভূপতিবাবু নিঃশব্দে চা টুকুর গলাধঃকরণ করে বললেন, কই, আমার কথার তো কোনো জবাব পেলাম না ইন্দ্রজিৎ?

ইন্দ্রজিৎ জবাব দেয়: ও কথার কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। প্রথম কথা, মানুষ চিনতে সময় লাগে। মানুষের বাইরের রূপটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এথেকে কিছু কল্পনা করতে যাওয়ার মতো পাগলামি আর নাই। বাইরে থেকে আমরা দেখি, এই যুদ্ধ বাজারের সুযোগ নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বঞ্চিত করে আপনি চাল মজুত করেছেন এবং সেই চাল চড়া দামে বিক্রি করে ব্যাংকের অংক বাড়িয়েছেন। আবার এও যখন শুনি, হাজার হাজার লোককে আপনি অন্ন যোগাচ্ছেন তখন নিজেরই কানকে বিশ্বাস করতে পারি না।

সর্বনাশ! এমন কথা ভূপতি চৌধুরীর মুখের ওপর বলে, এ ব্যক্তি কে গো! বোধহয় এই মনে করেই সুজাতা ও বেবী একসঙ্গে চমকে উঠলো।

ভূপতিবাবু বললেন, কিন্তু একথা তো সত্যি, আমার ব্যাংক ব্যালেন্স প্রচুর। সুতরাং ফাঁকিই বলো, অপরকে বঞ্চিত করাই বলো মূলে একটা কিছু আছেই।

প্রত্যেক মানুষই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অপরকে কিছু না কিছু বঞ্চিত করেই। আমিও করেছি আমার স্ত্রীকে কোনো কোনো অংশ থেকে বঞ্চিত। বাড়ির মনিব যা খায়, বাড়ির চাকর তা খায় না। সুতরাং নিজের সুখ সুবিধের

জন্যে মানুষ অপরকে বঞ্চিত করেই। লোভ মানুষের স্বভাব-ধর্ম। আপনার হয়ত বেশি আছে, আমার কম। কিন্তু কম বেশি নিয়ে তো কথা নয়—অপরাধ যদি হয়, আপনারও যেমন হবে, আমারও তেমনি হবে। আর অপরাধ? অপরাধ কিছুতে হয় না। ও পুঁথির কথা, গল্প ক'রে ভয় দেখাবার কথা। পাপ যদি হ'তো, মাড়োয়ারীদের পাপে পৃথিবী ছাই হ'য়ে যেতো। ওরা টাকার জন্যে কি না করছে? চিনিতে কাঁচের গুঁড়ো, ময়দায় পাথরের গুঁড়ো—আর ঘি? তার কথা না বলাই ভাল। এক কথায় মানুষের খাদ্যে ওরা বিষ মেশাচ্ছে। টাকার জন্যে ওরা কিনা করছে।

সুজাতা মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্রজিতের মুখের দিকে চেয়ে ছিলো। সে কথা শুনছিলো কি ইন্দ্রজিৎকে দেখছিলো, তার মুখ দেখে বলা কঠিন। কথা থেমে যেতেই সে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে বলে উঠলো চমৎকার!

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠলো।

চমকে অনেকেই উঠেছিলেন। বেবী তো সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে ফেললে!

ভূপতিবাবু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে বললেন তোমার কথা আমাকে বিস্মিত করেছে সত্যি, কিন্তু সকল রিপুকে জয় করাও তো এই মানুষেরই কাজ।

শিক্ষার গুণে মানুষ তাকে মার্জিত করে। সম্পূর্ণ জয় করবার জন্যে ভগবান মানুষকে নিশ্চয়ই সংসারে পাঠান নি। তা হলে সংসার অচল হতো।

তবে ধনীকে নিয়েই বা আপনার এমন কটাক্ষ কেন? বেবীর কণ্ঠে শ্লেষের ঝাঁজ।

কটাক্ষ তো আমি করিনি। টাকাকে বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা সকলেই করবে— অবশ্য সবাই পারে না। কিন্তু না পারার দলকে ঘৃণা যারা করে, আমি তাদেরকেই কটাক্ষ করেছি।

ঘৃণা তো কেউ করে না। বেবী রুক্ষস্বরে জবাব দেয়।

ইন্দ্রজিৎ হাসে। বক্তৃতা করে এ জিনিস হয়ত বোঝানো যাবে না। একটা উদাহরণ দি: এই যে আমি এখানে বসে আছি, ইতিমধ্যেই আপনার মনে আমার ক্লাস নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। ট্রেনের থার্ড ক্লাসের যাত্রী আমরা। কোনদিন থার্ড ক্লাসে এসে আপনারা বসতেও পারবেন না, আমরাও আপনাদের-ক্লাশে ঢুকতে গেলে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেবেন।

ভূপতি চৌধুরী জোরে হেসে উঠলেন। বললেন এটা তুমি বেশ বলেছো।

বেবীও হেসে জবাব দেয়: মজা মন্দ নয়। দাদার অহংকারকে সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলাম কিন্তু এখানে এসে দেখছি বড়লোক না হওয়ার অহংকারও আপনার কিছুমাত্র কম নয়। আসলে দুটো মানুষই এক।

ইন্দ্রজিতের চমক্ লাগলো।

সুজাতা সেই রক্তিম মুখের দিকে চেয়ে বেবীকে বললে, গুড শট্।

(৭)

অনেকদিন পরে অজিত সুজাতার সঙ্গে দেখা করলে। দেখা যেখানে ইচ্ছা করলেই করা যায়, সেখানে এই অহেতুক অনুপস্থিতি একটু বিস্ময় উদ্রেক করে বই কি। তাই সুজাতা প্রথমটা এমনিই ভান করলে যে চিনতে পারেনি। বললে, কেমন আছেন অজিতবাবু? দেখছেন, নামটা এখনো ভুলিনি?

অজিত এই প্রথম সম্ভাষণের ধাক্কাটা নীরবে সয়ে নিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিলে। বললে, অন্তত বসতে বলাও উচিত ছিল। দেখছি বস্তির হাওয়ায় স্বাভাবিক ভদ্র-রীতিগুলোও তোমার দূষিত হয়ে উঠেছে।

এ শ্লেষের জন্য সুজাতা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু উত্তর না দিয়ে সুজাতা চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে নয়। বললে, আবার ইন্দ্রজিৎবাবু বলেছেন এই ঘরেই তাদের যাত্রাদলের আখড়া বসাবেন।—দৌরাত্ম্যটা একবার বুঝুন।

অজিত যোগ্য উত্তর না পেয়ে শুধু বললে, হুঁ।

সেদিন খবরের কাগজে আপনার নাম দেখলাম। কোন্ ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। সুজাতা বাঁকা চোখে একবার চাইলে।

তুমি কি বলতে চাও, ঐ নামটুকু ছাপাবার জন্যেই আমি ভোজসভায় গিয়েছিলাম?

সুজাতা হেসে ফেললে। হাঁ, ভাল কথা। কোন্ সাহিত্যসভায় নাকি এর মধ্যে সভাপতিত্ব করেছেন—বেবী বলছিলো?

অজিত কোনো কথারই জবাব দিলে না।

আপনার অভিভাষণটি পড়লাম—যা আপনি পাঠিয়েছিলেন। ভাল অবশ্যই লেগেছে। তবে বাংলা সাহিত্যের সভা, সেখানে ইংরেজি অভিভাষণ কি ক'রে সচল হ'লো আমি আজো বুঝতে পারিনি। অবশ্য একটা কথা আমার মনে হয়েছে, সভা সাহিত্যেরও নয়, সাহিত্যিকদেরও নয়: আপনারই কৃত অনুষ্ঠান। এই ঘরেই—সোমেশবাবুর কাছে পরাজিত হ'য়ে, তারই একটা নোবল-প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছেন। এ বুঝতে কষ্ট হয় না।

অজিতের মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। সে ভাবতেও পারেনি, তার এতবড় একটা আয়োজন তুচ্ছ একটি মেয়ের কাছে মিথ্যা হ'য়ে যাবে। বললে, তোমাদের সোমেশবাবুকে ব'লো এর একটা উত্তর দিতে।

সুজাতা জবাবে বলে, সোমেশবাবু কি করবেন জানি না, কিন্তু আমি হ'লে ও-প্রলাপের কোনো প্রমিনেন্সিই দিতাম না।

বটে! দেখছি, এদের দুজনকে তুমি খুব উঁচু আসনে বসিয়ে রেখেছো!

সেজন্য তাঁদের কোনো আয়োজন করতে হয়নি, এটাও ঐ সঙ্গে জেনে রাখুন।

কিন্তু তোমার উঁচু-আসনের অপর ব্যক্তি সম্বন্ধে যে কথা শুনে এলাম তাতে তুমিও চমকে উঠবে আশা করি।

অপর ব্যক্তিটি কে ইন্দ্রজিৎবাবু?

অজিত ফিক্ ক'রে একটু হেসে একটি সিগারেট ধরালে। পুলিশ-অফিসার রমেন রুদ্রকে চেনো আশা করি তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তার মুখেই শুনলাম, ইন্দ্রজিৎ আগষ্ট-বিপ্লবের একজন ফেরারী আসামী। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নাকি এতদিন পরে তার সন্ধান পেয়েছে।

এই আনন্দ-সংবাদটি দেবার জন্যেই কি আপনি এতদিন পরে আমার কাছে ছুটে এসেছেন? একজনের সর্বনাশ করতে যে আপনি এতটা নীচে নামতে পারেন, এ ধারণা আমার ছিল না।

তুমি কি বলতে চাও, এটা আমার চক্রান্ত?

হাঁ। এবং ইন্দ্রজিৎবাবু যে তা নন, সে প্রমাণ আমি আপনার সামনেই করব।

চেঁচামেচি শুনে ভূপতিবাবু ঘরে এলেন। বললেন, কি ব্যাপার?

সুজাতা একটি একটি ক'রে সব কথাই তার বাবাকে বললে।

উত্তরে ভূপতিবাবু বললেন, এতে অজিতকে সন্দেহ করবার কি আছে? সত্যও তো হ'তে পারে।

সুজাতা তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করলে: এ কখনোই হতে পারে না বাবা!

একটা অপ্রিয় পরিস্থিতি। এক সময় অজিতই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। দেখছি, সংবাদটা দিয়ে আমিই আপরাধী হয়ে গেলাম। তবে এটুকু বিশ্বাস করবেন. ইন্দ্রজিৎবাবুর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আচ্ছা, নমস্কার!

সুজাতা চুপ ক'রে বসে রইলো। যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো একই সঙ্গে বিকল হয়ে গিয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে ভূপতিবাবুই কথা কইলেন, ইন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অনেক কারণই বর্তমান।

যেহেতু তাঁর বাড়ি আর গাড়ি নেই ব'লে? সুজাতার গলার স্বর ভারী হ'য়ে গেল।

ভূপতি চৌধুরীর চমক্ ভাঙলো। সুজাতার মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন পড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুজাতা এতই অস্পষ্ট যে কিছুই বোঝা গেল না।

এর পরের ঘটনা সামান্য। ইন্দ্রজিৎ ধরা পড়লো।

বিচারের প্রহসনও শেষ হ'লো। ইন্দ্রজিতের হলো ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

পৃথিবীর বিবর্তনে মানুষের রথচক্র যথানিয়মে চলে। সুজাতারও দিন কাটে, বস্তিরও দিন কাটে। একদিন ঐ বস্তির উলঙ্গরূপ দেখে সুজাতার সহজ রুচি-বোধে ঘা লেগেছিল, আজ ঐ বস্তিই দিয়েছে মায়ার কাজল পরিয়ে। আজ ঐ বস্তির দিকে চাইলে মনে হয়, কি যেন ছিল ওখানে, যার সৌরভ এখনো আছে সমস্তটা ঘিরে!

সুজাতা অবসর পেলেই বারান্দাটায় এসে বসে, যেখানে বসে সে দেখতে পায় ইন্দ্রজিতের ঘরে উঠবার সিঁড়ি।

ভূপতিবাবুও লক্ষ্য করছেন, সুজাতার এই ক্রম-পরিবর্তন! তাই ইচ্ছা থাকলেও সাহস ক'রে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু একটা জিনিস তিনি দেখছেন, তাঁর সম্বন্ধে সুজাতা আগের মতোই সজাগ: চা-এর টেবিলে চা পরিবেশন, স্নান-খাওয়ার যথারীতি তাগিদ, নিয়মিত বই প'ড়ে শোনানো—

নাই শুধু স্বাচ্ছন্দ্য গতি, আনন্দমুখর কলহাস, বালিকাসুলভ আব্দার।

সন্ধ্যে থেকেই সেদিন গরম পড়েছিল। সুজাতা বললে, আজ আর তুমি চা খেও না বাবা! তার চাইতে এক পেয়ালা কোকো তৈরি ক'রে দি।

কন্যার ব্যবস্থায় ভূপতিবাবু কোনোদিন প্রতিবাদ করেন নি। আজো করলেন না।

একটা কথা বলবো বাবা?

ভূপতিবাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কোনো কিছু সে বলুক, তাকে আদেশ করুক—এমনি একটা কিছুর প্রত্যাশায় যে ভূপতি চৌধুরী দিন গুণছিলেন। আগ্রহের সঙ্গে বললেন, কি মা?

ঘরে ইন্দ্রজিৎবাবুর স্ত্রী আছে। ওদের কি ক'রে চলছে, একবার খোঁজ নিলে হয় না?

বেশ মা, আমি নিজে যাচ্ছি।

না বাবা, তুমি গেলে অভিমানিনী হয়ত কোনো সাহায্যই নেবে না। তার চেয়ে আমি যাই না কেন।

যাও মা। বরং দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

না বাবা ওখানে যেতে হ'লে আমাকে একলাই যেতে হবে, ধনদম্ভ ওখানে সইবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকারেই সুজাতা এলো ইন্দ্রজিতের ঘরে। বললে, দিদি, তোমাকে নিতে এলাম—যাবে আমার সঙ্গে?

মনোরমা স্পষ্ট জবাব দিলে, না।

অন্য সময় হ'লে সুজাতার মনেও ঘা লাগ্‌তো। কিন্তু আজ সে সমস্ত বিসর্জন দিয়ে এসেছে, তা না হলে এমন করে কি সে আসতে পারতো? বললে, তা তো শুনবো না দিদি, মত না-দেওয়া পর্যন্ত তোমার এই প ধরে পড়ে রইলাম, দেখি কি ক'রে তুমি ফিরিয়ে দাও। ব'লে সুজাতা মনোরমার দুটি পা জড়িয়ে ধরলো।

মনোরমাও মানুষ। সুজাতাকে উঠিয়ে সে বুকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, এ-ঘর ছেড়ে তো যাব না ভাই, আমার সকল ভার যে তিনি এদের হাতেই দিয়ে গেছেন।

বোনের সাহায্যও কি কিছু নেবে না দিদি?

না নিয়ে ফিরিয়ে দেবার পথ তো আর রাখলে না বোন, বেশ তাই হবে।

একটা কথা বলবো দিদি?

বলো।

স'ত্যিই কি তিনি কিছু করেছিলেন যাতে পুলিশের সন্দেহ হ'তে পারে?

সে সব তো আমি কিছুই জানি না ভাই! পথের মানুষ—ঘরে আর কতটুকু সময় থাকতেন।

দেখতে গিয়েছিলে কোনোদিন?

কোথায়?—জেলে? সে-সাহস আমার নেই ভাই!

আমি যাবো। যাবে আমার সঙ্গে?

না ভাই, তুমিই যাও। তোমার মুখ থেকেই খবর শুনবো।

ঘরে এলাম, কিছু খেতে দেবে না বোনকে।

মনোরমা চমকে উঠলো। বড়লোকের মেয়ে—তাকে সংবর্ধনা করবার মতো কি আহার্য তার সামনে ধরতে পারে সে! ম্লান হেসে বললে, ঘরে কিছুই নেই।

কিছু নেই বলতে আছে না কি! মনে করছো, আমি খুব বড়লোকের মেয়ে—না গো না, আমার বাবাও একদিন মার্চেন্ট-অফিসে চাকরি করতেন। তোমার নিজের খাবার ভাতও কি নেই দিদি?

মনোরমা ভাতের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, ও-বেলার রান্না ভাত, এ মুখে দিয়ে আমাকে কেন লজ্জায় ফেলবে ভাই!

না, আজ দুই বোনে আমরা এক সঙ্গে খাবো—লজ্জা পাও, কাল না হয় আবার গরম ভাত খাইয়ে দিও।

মনোরমা হাসে। দুলো মদ গিলে এসে দাওয়ায় বসলো। বললে, জানো বৌঠান, আজ সব খবর নিয়ে এলাম। ঐ যে বড় বাড়িটা—যে বাড়ির ছেলে সেদিন বিলেত থেকে এলো, তেনারই সব কাণ্ড। ইন্দির ভাই কি করেছিল জানি না—ঐ বিলিতি কুকুরটা পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিলে।

চুপ চুপ। ভয়ার্তস্বরে মনোরমা কি যেন ইংগিত করে। সুজাতা হেসে বলে, ও ঠিকই বলেছে দিদি!

মনোরমা শিউরে ওঠে কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

তোমার নামটা কি ভাই? সুজাতা দুলোর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

আমার নাম দুলাল। সবাই দুলো ব'লে ডাকে।

সুজাতা হাসে। বলে, দুলালের চাইতে দুলোই ভাল।

অপনি বলছেন? ডুলো যেন আহ্লাদে গলে পড়লো।

আমি কেন, সবাই বলবে। কিন্তু একটা কথা আমাকে সত্যি বলবে, এখবর তুমি কোথায় পেলে?

যে জমাদারটা পুলিশ সাহেবের সঙ্গে এসেছিল না, সে আমার দোস্ত। সেই বললে, ঐ দত্ত সাহেব বড় পাজী আছে।

সুজাতার চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠলো। বললে, একবার আমাকে জেলখানায় নিয়ে যেতে পারো!

কেন পারবো না,—

মনোরমা জিজ্ঞাসা করে, দত্তসাহেব কে ভাই?

ওর নাম অজিত দত্ত। শিক্ষিত ধনীর সন্তান, কিন্তু মানুষ যে এত ছোট হ'তে পারে এই প্রথম দেখলাম।

সবই যেন বুঝলাম, কিন্তু এঁর ওপরে কিসের রাগ?

রাগ নয় দিদি, ঈর্ষা। একটা মানুষ যখন আর একটা মানুষকে সহ্য করতে পারে না, তখনই চলে অপচেষ্টা। সে চায় তার বিলুপ্তি—প্রতিষ্ঠার বিলুপ্তি, প্রয়োজন হ'লে ব্যক্তিরও বিলুপ্তি।

মনোরমা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

ছিদাম দাঁড়ায়। কি রে কিছু খবর পেলি?

ডুলো কানে কানে বলে কি-সব কথা। ছিদেম লাফিয়ে ওঠে: ঠিক হ্যায় বেটা, জিতা রও।

সুজাতা বুঝতে পারে, কিসের ষড়যন্ত্র করেছে এরা। ভয় তারও হয়। নির্বোধ এরা, শেষে নিজেদেরই বনাশ ক'রে বসবে। ডুলোকে ডেকে বলে আমার কাছে লুকিও না, কি আয়োজন করেছো বলো?

ডুলো বলতে পারে না, ছিদেমের মুখের দিকে চায়।

ডুলু!

এস্বরে দুজনেই চমকে উঠলো। এ যেন আদেশের সুর, প্রতিবাদ চলে না: মাথা হেঁট হয়ে আসে।

আমি তোমার দিদি। আমার কাছে সত্যি বলো?

ডুলো বলে সব কথা। কি ক'রে অজিতকে গুণ্ডা দিয়ে জখম করা হবে, তার পোনটাও সাজু গুণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

সুজাতা শিউরে ওঠে। বলিস কি ডুলু! তুই এ সব পারবি? আমি যে তোকে এর চাইতে বড় মনে করি ভাই!

ডুলু এমন স্নেহের সুর কোনোদিনই শোনে নি। তার পাথরের মতো বুকখানা যেন আজ গলে গেল। বলে, তুমি কি নিষেধ করো দিদি?

হঁা করি। নীচ কাজ সে করেছে ব'লে আমরাও করবো?

বস্তির লোক আবার কবে ভাল কাজ করে গো! বড়লোক হতাম, ভাল ভাল কথা বলতাম, ভাল কাজ করতাম। আমরা মানবো না তোমার কথা। বলে, ছিদেম ডুলোর হাত ধরলে।

ডুলো একবার সুজাতার দিকে চায়। সুজাতা অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ডুলো কি ভাবে, তারপর বলে, না, দিদির কথাই শুন্‌বো।

এমন ক'রে ধনীদের জব্দ করা যাবে না দুলাল। ওরা জব্দ হবে উপেক্ষায়। সকল রকমে ওদের দম্ভকে উপেক্ষা করতে হবে। তোমরা তো পরমুখাপেক্ষী নও, পরিশ্রম ক'রে টাকা রোজগার করো। তোমরা দল বেঁধে ওদের বর্জন করো। দেখবে, ওরা কত পঙ্গু। পারবে না দল বাঁধতে?

ছিদেম তন্ময় হয়ে শুনছিল। বললো, খুব পারবো দিদি, তুই যদি আমাদের মাথা হ'য়ে থাকিস।

সুজাতার চোখ জ্বলে উঠলো: অজিত দত্তের জুতো ব্রাশ করবার জন্যে যেন একটি লোকও না থাকে।

মনোরমার চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে জল ঝরে পড়লো। বললে, ঠাকুরপো, অনেক রাত হ'য়ে গেল তোমার দিদিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো ভাই।

সুজাতা আর কোনো কথা না ব'লে দুলুর অনুসরণ করলে।

সারারাত্রি সুজাতা ঘুমুতে পারলে না। একটা আনন্দময় রোমাঞ্চ। আশঙ্কা ও উত্তেজনায় দুলছে তার মন ধনীর বিরুদ্ধে অভিযান। হয়ত ভূপতি চৌধুরীও দেবেন বাধা। পিতার বিরুদ্ধে কন্যার আক্রমণ। হাসিও আসে, অভিমানও হয়।

একদিন সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলে সুজাতা চলে এলো সোমেশের কাছে। তার কাজ অনেক চাই লোকবল, চাই অর্থবল। কিন্তু সোমেশ তার কি জানে।

সে খবর সুজাতাও জানে। তবু এসেছে, পথের সন্ধান পাবে ব'লে।

সব কথা শুনে, সোমেশ বললে, আপনি তো এসেছেন টাকা তুলতে। কিন্তু ধনীর টাকায় ধনীকে মারবার আন্দোলন চালাবেন, এ বুদ্ধিই বা আপনাকে কে দিলে? আমার তো মনে হয় এতে আত্মসম্মানে ঘা লাগা উচিত। ঠিক এমনি ক'রেই কর্ণের কবচ কুণ্ডল ইন্দ্র প্রার্থনা করেছিলেন। কর্ণ অবশ্য দিয়েছিলেন নিজের মৃত্যু জেনেও। কিন্তু নির্লজ্জ ইন্দ্রের সে-কুণ্ডল গ্রহণ করতে কোনো সংকোচই হয়নি।—লোক তৈরি করুন, তবেই হবে সত্যিকার কাজ। তারা না-খেয়েও কাজ করবে, যদি তারা অপমানের জ্বালা বুঝতে পারে।

এ বোধশক্তি কি তাদের আছে? নিরক্ষর বলে নয়, তাদের লোভ দুর্নিবার। এদের ব'লে-কয়ে দলে টানা যাবে না, তাই চাই এদেরকে হাতে রাখতে প্রচুর অর্থ।

এই প্রচুর অর্থের প্রতিযোগিতায় ধনীর কাছে আমাদের হার চিরদিনই হয়ে আসছে। তাই জননায়ক বলতেও ওরাই, আর প্রভু বলতেও তাই। একটি বড়লোকের কথা জানি, চাকরটাকে জুতো মেরে দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে বললে; ঠিক্‌সে কাম্ করো।

চাকরটা অমনি সেলাম ক'রে বললে, জী হুজুর!

কিন্তু একথাও তো মিথ্যে নয়, ঐ 'জী হুজুরের' দলই আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ব'লে সুজাতা সোমেশের মুখের দিকে চাইলে।

সোমেশ হেসে বলে, এ আপনার কাগজে পড়া অভিজ্ঞতা। সত্যি পরিচয় যদি কোনোদিন হয়, তখন বুঝবেন, ওরাই বড়লোক তৈরি করে।

কিন্তু আমি যদি দল গঠন করতে পারি?

একটা দল গড়বেন। কিন্তু সবাই যে ঐ দলে নাম লেখাবে এ বিশ্বাসই বা আপনার আসে কি ক'রে?

ছোট আন্দোলনই একদিন বড় আকার ধারণ করে।

আপনার আন্দোলন সার্থক হোক। কিন্তু আপনার বাবার মত নিয়েছেন?

সুজাতা রুক্ষস্বরে জবাব দিলে, আপনি কি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন?

সোমেশ হাতযোড় করে ক্ষমা চাইলে। আপনার জ্বালা কতটা পরীক্ষা করছিলাম। বুঝতে পারছি, এমনি করেই সর্বত্র সুরু হয়েছে ভাঙন। এর প্রতিক্রিয়া আছেই—আজ না হয় কাল।

ও সাহিত্যের কথা। কোনোদিনই কি আপনারা সাহিত্য থেকে নামতে পারবেন না?

সাহিত্যই তো জনমত গঠন করে।

কিন্তু একথাও তো মিথ্যে নয়, জনমতের ভিত্তির ওপর বড় সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে। যাক্ শুনতে পাই—অবশ্য আপনিই বলেছেন, ইন্দ্রজিৎবাবু আপনার বন্ধু। বন্ধুর জন্যে কিছু কাজ করবেন কি?

কি করতে হবে বলুন?

আমার সঙ্গে একবার আসতে পারবেন?

কোথায়?

না শুনলে কি আপনি যাবেন না?

যদি বলি 'না'—তাহলে কি আপনি ফিরে যাবেন?

নিশ্চয়। কারু সাহায্য পাবো না জেনেই আমি কাজে নেমেছি।

এইবারে আপনি আমার প্রথম অভিবাদন গ্রহণ করুন। পরের সাহায্যে যারা দাঁড়াতে চায়, তারা কোনদিনই দাঁড়াতে পারে না। আপনি নিজে দাঁড়ান, কেউ আমরা আপনার সাহায্য করবো না। তারপর প্রয়োজন বুঝি, আমরা নিজের গরজেই যাবো।

সুজাতা নমস্কার ক'রে চলে গেল।

জেলখানায় সুজাতা অনেক কথাই ইন্দ্রজিতকে বলবে মনে করে এসেছিল, কিন্তু সময় যখন উপস্থিত হ'লো খন একটি কথাও সে বলতে পারলে না। সুজাতা যে এমন ক'রে কাঁদতে পারে এ ধারণাই বা কে করেছিল? সুজাতা ন আজ অশ্রুমতী নদী!

ইন্দ্রজিৎ সান্ত্বনা দেয়। দুঃখ পাবেন জানি। কিন্তু এই চোখের জলে যে-রাস্তা আজ তৈরি হ'য়ে গেল সেও তো মান্য নয়।

সুজাতা কাঁদতে কাঁদতেই ইন্দ্রজিতকে প্রণাম ক'রে চলে এলো।

বাইরে সবাই অপেক্ষা ক'রে ছিল—দুলো, ছিদেম, নকড়ি, শ্রীকান্ত—

সবাই প্রশ্ন করে—সবাই জানতে চায় ইন্দ্রজিৎ কেমন আছে, কি বললে।

সুজাতা টুক্‌রো টুক্‌রো উত্তর দেয়। কোনো কথাই স্পষ্ট করে বলে না।

সারাদিন রোদে ঘুরে ওদের মেজাজও ভাল ছিল না। তাই রুক্ষস্বরেই ছিদেম বলেল, খবর যদি না-ই আনতে বে তবে গেলেই বা কেন? বড় বড় কথা বলবার বেলায় তোমাদের জুড়ি নেই—তোমার কথায় কাজে নেমে মরাই ইজ্জৎটা দিলাম দেখছি।

ছোটলোকের আবার ইজ্জৎ! সুজাতা শ্লেষ ক'রে বলে।

ছিদেম চীৎকার ক'রে ওঠে: খবরদার বলছি।

সুজাতার চোখ-মুখও লাল হয়ে ওঠে। বলে, ছোটলোক ন'স তোরা? আজ সকালে যারা কাজ বন্ধ র'ছল, এই ক'ঘন্টা যেতে না যেতেই কোন্ প্রলোভনে তারা আবার অজিত দত্তের পদলেহন করছে!

সোমরা কাজে গিয়েছে। ছিদেম গর্জন করে ওঠে।

শুধু সোমরা কেন, বেলওয়ার গিয়েছে, শম্ভু গিয়েছে, ছোট 'বর'টা গিয়েছে।

ছিদেম মাথায় হাত দিয়ে বললো।

অমন করে হবে না ছিদেম। এই তিনশো টাকা নাও—মোটা মোটা টাকা দিয়ে ওদের ঘরে বসিয়ে রাখো। প্রয়োজন হয়, ওদের পাহারার জন্যে লোক নিযুক্ত করো।

মনোরমা এক-একটা কথা শোনে আর কেঁপে ওঠে! বলে, তোরও কি জেল খাটতে ইচ্ছে হয়েছে না কি?

জগতের সেরা-তীর্থে না গেলে তো মানুষ হওয়া যায় না দিদি।

মনোরমা সব কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু ভাল লাগে শুনতে। ইন্দ্রজিৎকে সে এক রকম করে দেখে আসছে আজ দশ বছর ধরে, কিন্তু আজ যারা তাকে নতুন করে দেখলো, সে যেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যেন রঞ্জনরশ্মি পড়ে ইন্দ্রজিতের মানস লোক এইমাত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

বললে, ঠাকুরপো যে মদ খেতেও ভুলে গেলে!

ওলো জিভ কেটে বলে, আর নয় বৌঠান। ইন্দির ঠাকুর আমাকে জাতে তুলে দিয়ে গেল।

সুজাতাও বাড়ি এসে দেখে, সর্বত্রই এর প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। নতুন চাকরটা পালিয়েছে, দারোয়ানও আর কাজ করবে না বলে জবাব দিয়ে গিয়েছে। ভূপতিবাবু তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে নিষ্ক্রিয় ভাবে পড়ে আছেন।

সুজাতা বললে, তুমি কি রাগ করেছো বাবা?

ভূপতি চৌধুরী চমকে উঠলেন। বললেন, না তো।

কিন্তু রাগ হওয়াই তো উচিত বাবা!

ভূপতিবাবু হাসলেন। বললেন, এই কিছুক্ষণ আগে অজিত এসেছিল। সে জানিয়ে গেল, সুজাতার কৃত-কর্মের ফলের জন্যে তাকে যেন অপরাধী করা না হয়। অর্থাৎ বোঝা গেল, অজিৎ একটা প্রতিহিংসা নেবে।

তুমি কি বললে? সুজাতা শোনবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

আমি তো তোমার বিষয় কিছু জানি না মা!

কিছুই কি জানো না বাবা?

জানি না সত্যি। তবে অনুমান করতে পারি।

কিন্তু আমি তো আর ফিরতে পারি না বাবা!

প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। তুমি তো আমার চোখ দিয়ে দেখবে না মা! আদেশ করেই বা তোমাকে ছোট করবো কেন! ভুল যদি করে থাকো নিজেই বুঝতে পারবে। তার জন্যে অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

আজ চাকর-বাকর কেউ নেই। তোমার তো অসুবিধে হবে বাবা।

তা একটু হবে বই কি। অনেক দিনের অভ্যাসে পরনির্ভর, আবার দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

সুজাতার চোখ ছলছল করে উঠলো। বললে, আমাকে হুকুম করো বাবা, আমি তোমার সব কাজ করে দেবো।

ভূপতিবাবু হাসলেন। বললেন, দরকার হলেই ডাক দেবো মা!

সুজাতা নিজের ঘরে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো। হাতদুটোকে কিছুতেই সে সংযত করতে পারছিলো না। সে যেন তার হাতদুটো দিয়ে এই মুহূর্তে সবকিছু দলে-চটকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

সুজাতা আজ ভেবেও পেলে না তার মধ্যে এই বন্য-প্রকৃতি কোথা থেকে এলো?

সুজাতা বিছানায় শুয়ে-শুয়েও সেকথা ভাবে। সবকথা তার ধারণায় না এলেও একথা সে বুঝতে পারে, তার ঠাকুরদা ছিলেন শাক্ত। সেই আদিম প্রবৃত্তি তার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে তার মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। কিন্তু এতো তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এ হ'তেই পারে না। একখানা বই টেনে নিয়ে মনটাকে সে সংযত করবার চেষ্টা করে।

দু-একপাতা পড়েই বইখানা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো! অমার্জ্জনীয় অপরাধ—স্বামীর হাতে স্ত্রী লাঞ্ছিত হচ্ছে, অতি তুচ্ছ আদেশ-পালনের অক্ষমতায়। হুকুম, শুধু হুকুম। সর্ব্বত্রই প্রভুত্ব করবার মনোবৃত্তি। সুজাতা বইখানা পায়ে করে মাড়িয়ে চটকে পা দিয়েই ঠেলে ফেলে দিলে।

সকাল হতেই পশু এসে খবর দিলে, বাইরের ঘরে সোমেশবাবু এসেছেন।

সুজাতা বাথরুমে ঢুকে মুখহাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলে। তারপর নিজের হাতে ষ্টোভ জেলে চায়ের কেট্‌লি বসিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরে এলো। বললে, একটু দেরী হ'লো— বসুন, একেবারে চা করে নিয়ে এসে বসছি।

সোমেশ আশ্চর্য হয়ে বলে, কি ব্যাপার? নিজের হাতে চা করতে হচ্ছে:—কেউ কি নেই নাকি?

সুজাতা হেসে উত্তর দেয়, স্বাবলম্বী হচ্ছি।

ক'ঘণ্টার জন্যে?

বড়লোক বলে ঘণ্টার প্রশ্নই আপনার মনে এলো। কিন্তু 'বড়' আর কেউ থাকবে না সোমেশবাবু?

আপনার কথা শুনে ভরসা পাচ্ছি। রাস্তা দিয়ে যখন চলি, তখন কেবলই মনে হয় বড় বড় বাড়িগুলো যেন কট্‌মট্‌ করে চেয়ে রয়েছে। দুধারের মোটর শুধু গায়ে কাদা ছিটিয়ে চলে যায়। পথ-চলার পাসপোর্ট যেন আমাদের কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এমনি অবজ্ঞেয়, অস্পৃশ্য আমরা।

সুজাতা তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দেয়: তবুতো বিদ্রোহ করতে জানেন না আপনারা। চিরটাকাল মার খেয়েই কাটালেন। যাক্ ও আলোচনা এখন থাক। কি জন্যে এত সকালে এলেন তাই বলুন।

আমি এসেছিলাম আপনারই কাছে।

সুজাতা হেসে ফেললে। তা জানি। আপনি যে বাবার কাছে আসেননি, তা বুঝবার মতো আমার বয়স হয়েছে।

সোমেশ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, অজিতবাবুর হয়ে আমি আপনার কাছে ওকালতি করতে এসেছি।

কি রকম?

তাঁর বাড়ীতে একটি বেয়ারা পর্য্যন্ত নেই। আমি বলতে চাই, বড় লোককে জব্দ করবার ও-পথ নয়।

হয়ত নয়। কিন্তু আপনাকে পাঠালে কে শুনি?

ধরুন, অজিতবাবুই পাঠিয়েছেন।

আপনি কি আজকাল তাঁর মোসাহেবী করছেন?

আপনি যে এইরকম একটা উত্তর দেবেন, সে আমি জানি।

আপনি বুদ্ধিমান। কিন্তু এখন আমাকে কি করতে বলেন?

চাকরবাকর আবার যথানিয়মে কাজে যায়, অজিতবাবুকে নিজের হাতে আর কিছু করতে হয় না, আমার এতদিনের পরিশ্রম এবং চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে আপনার সঙ্গে সমান তালে তাঁর স্তাবকতা করি—কেমন এই না? ছি ছি আপনারা আবার মানুষ বলে নিজেকে পরিচয় দেন?

আপনি উত্তেজিত হয়েছেন, তাই আমার সম্বন্ধে এমন অনেক কথাই বলে গেলেন যা সত্য নয়। অজিতবাবুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই—আর অজিতবাবুও বোধহয় সে রকম প্রকৃতির লোক নন যে দুঃখে পড়ে আমার মতো এক দুঃস্থের কাছে সাহায্য নেবেন। আপনার ফলিত-ক্রিয়ার জালাটা উপভোগ করবো বলেই এসেছিলাম।

সুজাতা স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর বললে, আপনার নিষ্ঠুর অভিব্যক্তিও বড় কম উপভোগ্য নয়।

আমার উপন্যাসের প্রয়োজনেই আপনাকে কষ্ট দিলাম। মনে কিছু করবেন না।

আপনার উপন্যাস?

যা এখনো শেষ করতে পারিনি, তারই মাল-মশলা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু যেখানে আমার কাজ—যাদের নিয়ে কাজ, তাদের আপনি কতটুকু জানেন ?

ছবি যখন আঁকবো', দেখবেন কিছুই মিথ্যা হয়নি।

সুজাতা অনেকক্ষণ ধরে সোমেশের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর গভীর নিশ্বাস ফেলে বললে, সত্যিই যেন হয়।

৮

অনেক সুপারিশ ক'রে সুজাতা আবার জেলে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেলে।

প্রহরিবেষ্টিত ইন্দ্রজিৎ গরাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো, সুজাতা এবারে আর কাঁদলো না—তার চোখ দুটো জলে উঠলো।

ইন্দ্রজিৎ হাসে। দুঃখ কি, এ ক'টা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

শুধু আমার জন্যেই আপনাকে এই দুঃখ ভোগ করতে হলো। বলে সুজাতা একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে।

উপলক্ষ্য একটা থাকেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, জেলে এসে এবারে আমার এক নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় হলো। এখানে না এলে, মানুষের সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না! দেখলাম এখানে সব মানুষই এক। সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই, ছোট বড়র প্রশ্ন নাই—সমাজ-গণ্ডির বাইরে পরস্পরকে চিনবার এতবড় সুযোগ আর কোথাও নাই। আমারই পাশে থাকে এক মুসলমান ভাই। সে চুরি করে জেলে এসেছে। ঘরে তার দুটি ছোট ভাই-বোন আছে। তারা দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পেতো না, তাদেরই খাবার সংস্থান সে করে এলো। এ জন্যে তার দুঃখ নাই—বলে, দুদিন খেয়ে বাঁচুক। একজন দার্শনিক পণ্ডিত আছে—স্ত্রীকে খুন করে এসেছে। মাথা খারাপ মনে করে এরা ফাঁসী দেয় নি। খুন করারও একটা ফিলজফি আছে তার।

সুজাতা চমকে ওঠে। খুন করার ফিলজফি!

ইন্দ্রজিৎ হাসে। পরে বলবো একদিন তার গল্প।

আচ্ছা, আগস্ট-আন্দোলনের সঙ্গে সত্যিই কি আপনার কোনো সম্পর্ক আছে ?

ওরা তাই বলে নাকি ?

হাঁ! কেন আপনি জানেন না ?

না তো।

কিন্তু আমি জানি অজিতবাবুর কোথায় জালা! আর এও আপনাকে বলে রাখছি, একদিন ঐ অজিতবাবুকেই আপনার কাছে মাথা হেঁট করতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ হাসে।

আপনি জানেন, 'লেবার' বলে যারা এতদিন অপাংক্তেয় ছিল, তারা আজ সংঘবদ্ধ হয়েছে। এই কদিনে—কদিনের কথা থাক, আপনি গেলে দেখতে পাবেন, অজিতবাবুর ঘরে দানা-পানি করবার জন্যে আজ একটি প্রাণীও নেই! তাকে নিজের হাতে সাবান কাচতে হচ্ছে—

সর্বনাশ! এসব কি করেছেন আপনি! ইন্দ্রজিৎ শিউরে ওঠে। সে বুঝতে পারছে, গরীব ছোট-লোকের দল এই লড়ায়ে পুঁটি মাছের মতো মরবে। সে তো জানে ঐ দুলো-ছিদামকে—বড় লোকের প্রসাদ-ভিক্ষু যারা। আজ একটা উত্তেজনার বশে হয়ত মেতে উঠেছে—যেটা সাময়িক, যার কোন মূল্যই নাই!

অত ভাবছেন কি? না হয় হারবো। মানুষ কি একদিনেই গড়ে ওঠে!

ইন্দ্রজিৎ হাসলে। আপনার বাবা কি বলেন?

বাবা আমার কাজে বাধা দেন নি।

আপনি অনর্থক নিজেকে বিব্রত করবেন না, এই অনুরোধ।

মনে করছেন, একি আপনার জন্যেই করছি?—আমার ইচ্ছা। আপনার জন্যে করতে আমার বয়ে গেছে। বলতে বলতে সুজাতার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো।

আমি জানি সুজাতা। একমাত্র তুমিই পারবে। যে-কাজে দরদ নেই, সে-কাজই বার বার ব্যর্থ হয়। তোমার অন্তর আজ কেঁদে উঠেছে—আমাকে উপলক্ষ্য করেই যাদের মুক্তি তুমি চাইছো, এ মুক্তি তাদের আসন্ন।

সুজাতা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

জেল-নিয়মের সময় উত্তীর্ণ হলো ইন্দ্রজিৎ যাবার সময় বলে গেল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার তপস্যা যেন সফল হয়।

বাড়ি ফিরতেই পশু জানিয়ে দিলে লাইব্রেরী-ঘরে সোমেশবাবু বসে আছেন। সুজাতা কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে চলে এলো। তার মন আজ ভরে উঠেছে। এইমাত্র যাকে সে দেখে এলো, সে যেন তার সমস্ত অন্তর জুড়ে আছে—যার পূত-সৌরভ সে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অনুভব করছে। এই দুর্লভ ক্ষণ-অবসরকে সে অন্তত কিছুকালের জন্য আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সে চায়, নিরবলম্বন বাধাহীন একাকীত্ব। ঘরে এসে সে খাটে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

অনেকক্ষণ কাটলো। সুজাতা পড়েই রইলো।

সে কি কাঁদছে? সে নিজেও জানে না, কখন তারই অলক্ষ্যে দুই চোখে ধারা বয়ে গেল!

সে ধরমর করে উঠে পড়ে ঘড়ির দিকে চাইলে। একি! সে একটি ঘণ্টারও ওপর এমনি করে বিছানায় পড়ে আছে! সোমেশের কথা তার মনেও নেই—এক বিস্মৃতিময় অপূর্ব রোমাঞ্চ!

ভূপতিবাবু এসে বললেন, তোমার শরীর কি ভাল নেই মা?

ভাল আছে বাবা। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই।

যে পরিশ্রম করছো! নিষেধ আমি করবো না, তবে শরীরটাও দেখা দরকার।

সুজাতা চুপ করে থেকে কি মনে করে হঠাৎ ভূপতিবাবুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো।

ভূপতিবাবুর চোখে বিস্ময়। বললেন, হঠাৎ প্রণাম কেন মা?

তোমাকে প্রণাম করার আবার সময়-অসময় আছে নাকি বাবা? বলে সুজাতা হেসে ফেললে।

ভূপতিবাবুও হাসবার চেষ্টা করে বললেন, সোমেশবাবু অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন—পশু কি বলেনি তোমাকে?

সুজাতা চমকে উঠলো। বললে, মনে হচ্ছে যেন বলেছিল কিন্তু তাঁর কথা আমার মোটেই মনে ছিল না।

ভূপতিবাবু আবার দ্বিতীয়বার বিস্মিত হলেন।

সুজাতা ব্যস্ত হয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে।

দীর্ঘ প্রতিক্ষায় সোমেশ যখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এবং এইবারে নিঃশব্দে ফিরে যাবে কিনা ভাবছে, তখন সুজাতা এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, কিছু মনে করবেন না, বড় ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

দেহ যখন লোহার নয়, তখন অনুযোগ করা চলে না। আপনি তবু পরিশ্রম করে ক্লান্ত, আমি বসে বসেই ক্লান্ত।

সুজাতা লজ্জিত হয়ে বললে, সত্যি, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাকে।

যাক্, ওসব বিনয়ের কথা পরে হবে। ইন্দ্রজিতকে কেমন দেখলেন বলুন? আমি সেই জন্যই বসে আছি।

নইলে কি থাকতেন না?

এ প্রশ্নটা অনাবশ্যক। দিনের চার ঘণ্টা তো আমার এখানেই কাটে।

সুজাতা হাসলো তারপর বললে, জানেন সোমেশবাবু, ইন্দ্রজিৎবাবু আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। আপনি দেখবেন আমি জয়ী হবো।

সোমেশের ইচ্ছা ছিল, সমস্ত কথাগুলোই শোনে। কিন্তু সুজাতা সেদিক দিয়ে গেল না। টুক্‌রো টুক্‌রো কথা—যার মানে হলেও, লোকটাকে জানা যায় না।

এর পরেই সুজাতা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে, সোমেশবাবু এবারে নতুন করে সাহিত্য লিখতে পারেন? যা দেশের ও দশের। প্রেমের গল্প অনেক লিখেছেন—এবারে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলুন! তাদের জানতে দিন, তারাও মানুষ।

একথা কি সাহিত্য কোনোদিনই বলেনি?

না, বলেনি। নইলে এমন করে মেরুদণ্ড তার ভাঙতো না। বৈষ্ণব-সাহিত্যের লিরিক—যা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে, তাই ভাঙিয়ে চলেছে আপনাদের আধুনিক সাহিত্য—আপনারা সেই সাহিত্যের আবার গর্ব করেন?

সোমেশ বিস্মিত হয়ে বলে, আজ আপনার হ'লো কি?

এ উত্তেজনার কথা নয় সোমেশবাবু! যে-সাহিত্য আমাদের ক্ষতি করে, সে-সাহিত্যের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি স্বীকার করি না।

সাহিত্য দেশের ও দশের ক্ষতি করে সত্যি। কিন্তু আমাদের সাহিত্য কি দেশের কিছুই করেনি? স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ থেকে আজো পর্যন্ত যে-জাগরণ—সে তো সাহিত্যই এনেছে। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম আজ মানুষকে আত্ম-প্রতিষ্ঠ করেছে। রবীন্দ্রনাথের বাণীর মূর্তপ্রতীক আজকের গান্ধীজি। দুশো বছরের পরাধীন জাতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাবেন তার সাহিত্যের ক্রমান্বিত ধারা—কি ভাবে ধাপে ধাপে পরিবর্তনের রূপ নিয়েছে।

হয়ত আপনার কথা সত্যি। তবু মনে হয়, আরো যেন কি চাই, এ যেন সম্পূর্ণ নয়।

তা তো হবেই। সমাজের রূপও আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নয়। সমাজের রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাহিত্যের রূপও বদলে যাবে। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের এমনি আঁতের সম্পর্ক। কিন্তু আর নয়, অজিতবাবুকে কথা দিয়েছি সন্ধ্যের আগেই দেখা করবো। সুতরাং বিদায়—

অজিতবাবু! সুজাতা চম্‌কে উঠ্‌লো। যতদূর মনে পড়ে, আপনি একদিন বলেছিলেন—

সোমেশ হেসে বলে, কষ্ট ক'রে আপনার মনে করবার দরকার নেই, আমিই বলছি। আপনার এখানে নিয়মিত যাতায়াত করছি—কি ক'রে জানি না, অজিতবাবু আবিষ্কার করেছেন। আজ অকস্মাৎ পথে ধ'রে ফেললেন। বললেন, অনেকদিন থেকে প্রতীক্ষা করছি—আসুন, ভেতরে আসুন।

ভয় পেয়ে গেলাম। এ কি অযাচিত আহ্বান! একটি একটি ক'রে সবই শুনলাম, শেষটায় বললেন, এ-পাগলামী করতে সুজাতাকে নিষেধ করুন।

সুজাতা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। বললে, তারপর?

তারপরের সুর ক্রম-নিম্ন। ইন্দ্রজিতের ওপর আমার কোনো আতক্রোধ নেই—একথা সুজাতাকে বলবেন। শুনেছি, আপনার কথা সে শোনে,—তাকে আরো বলবেন, এইভাবে লোক ক্ষেপিয়ে 'সোশ্যালিজম্ প্রীচ্' করা হয় না। বরং আমি সাহায্য করতে পারি, যদি সে চায়।

বটে! তারপর? সুজাতার মুখে-চোখে উল্লাস ফেটে পড়ছিলো।

তারপরের উত্তর তো আপনার কাছে। রাজী থাকেন তো বলুন।

আমার উত্তরের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

হয়ত নাই। তবু শুনি আপনার উত্তর।

তবে এই কথাই তাঁকে জানিয়ে দেবেন, আমার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করবার তাঁর অধিকার নেই।

সোমেশ উত্তর নিয়ে চলে গেল।

একটা আকস্মিক বিপদের সম্ভাবনায় সুজাতা চম্‌কে উঠ্‌লো। ভূপতি চৌধুরীর ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে, সেখানে তাঁর মনেও অন্ধকার নেমেছে। সুজাতা ডাক্‌লে বাবা!

ভূপতিবাবু মুখ তুললেন।

সুজাতা জিগ্‌গেস করে, সোশ্যালিজমের বড় কথা কি বাবা?

এর উত্তর একদিন তোমাকেই বের ক'রে নিতে হবে মা!

কাজে নেমে যে-কর্ম্মপন্থা তৈরি হবে সেই-হলো আসল পথ। রাশিয়ার সাম্যবাদ আমাদের উপযোগী নাও হতে পারে।

কিন্তু মূল সুর তো এক বাবা!

তা এক। তবে কথা কি জানো মা, কোনো পরিবর্তনই স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া গ'ড়ে উঠতে পারে না। তাই বলে আন্দোলনের কোনো ফল নাই একথা বলবো না। মহাত্মার অহিংস-আন্দোলনের দিকে চেয়ে দেখো! অনেকখানি কাজ হয়েছে। কিছু না পারো, মানুষের মনে তোমার মন্ত্র সংক্রামিত করে দাও, তাদেরকে জানতে দাও—তারাও মানুষ। একটা জাতকে গড়ে তোলাই বড় কাজ।

কিন্তু কংগ্রেস তো এই সাম্যবাদের কথা কোনোদিনই বলেনি। সোশ্যালিজমকে বাদ দিয়ে যে-রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, সে তো এতোদিনের পচা ইম্পিরিয়ালিজম্-এর আর-এক ধাপ। আমাদের দুঃখ সেই সমানই রয়ে গেল—একজন বড়মানুষী করবে, আর একজন তার গোলামী করবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সুখ-সুবিধা কি শুধু বড়লোক-দের জন্যই? অথচ দেশের জন্য, দশের জন্য গরীবরাই এ পর্যন্ত দুঃখ সয়ে এসেছে, জেলে যেতে তারাই গিয়েছে, স্বাধীনতা যদি কোনোদিন আসে, তাদের জন্যেই আসবে। বলতে বলতে সুজাতার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো।

ভূপতিবাবু চোখ বুজে সুজাতার কথা শুনছিলেন। বললেন, বর্তমান-কংগ্রেস সোশ্যালিজম্‌কে স্বীকার করেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এ-নীতি তাদের বর্জন করতে হবে।

জওহরলালের কথাতেও আমরা সেই সুর দেখতে পাই। তিনি নিজেই বলেছেন, আজ আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি যেখানে মানুষে মানুষে প্রকাণ্ড ব্যবধান—একদিকে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য আর একদিকে দারিদ্র্যের হাহাকার। কিছু লোক কোনো কাজ না করে বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবন-যাপন করছে, আর বাকি সকলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও জীবন-ধারণের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করতে পারছে না! এ কখনই ঠিক ব্যবস্থা হতে পারে না। যে-ব্যবস্থায় মানুষের দ্বারা মানুষের এই শোষণ চলে তার উচ্ছেদ সাধনের দায়িত্ব আমাদের।

এ তাঁর ব্যক্তিগত কথা। গান্ধীজিও হরিজন-আন্দোলন করেছিলেন কিন্তু নীতি হিসাবে এই সোশ্যালিজিম্‌কে তাঁরা কংগ্রেসে কোনোদিনই নিতে পারলেন না, এও দেখতে পাই।

ভূপতিবাবু হাসলেন। বললেন, হরিজন-আন্দোলনের সঙ্গে সোশ্যালিজম্‌-এর কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে ওটা অনুকম্পা—

অনুকম্পা! তুমি বলো কি বাবা!

গান্ধীজি দয়া করে ওদের জল-চল করেছেন। নইলে রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সোশ্যালিজমের যথার্থরূপ কার্লমার্কস-এর মধ্যে পাবে। লেনিন চেয়েছিলেন যে-সোশ্যালিজম্‌।

আজো তো সেই নীতি চলছে বাবা!

তার অনেকখানি রূপ বদল হয়েছে। যে-আন্তর্জাতিক সমিতি রাশিয়ার প্রাণ ছিল, সে-প্রাণশক্তি আজ নেই। স্ট্যালিন করেছেন তার উচ্ছেদ। অথচ একদিন এই আন্তর্জাতিক সমিতিই পৃথিবীর যোগসূত্র ছিল—এই ভুলে স্ট্যালিনের নীতি ব্যর্থ হবে।

বিশ্বাস করা কঠিন বাবা!

ভূপতিবাবু হাসলেন। বললেন, রাশিয়া যে আজ একঘরে হয়ে রয়েছে মা! যারা তার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো সে-সূত্র যে তিনি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলেছেন। যুদ্ধ আজ শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি তো বলি একটা বিরাট যুদ্ধ ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সেদিন দেখবে রাশিয়ার ঘর সামলানো দায় হবে। সারা পৃথিবী একদিকে, রাশিয়া অপরদিকে। বলতে বলতে ভূপতিবাবু নিজেই শিউরে উঠলেন।

সুজাতা সারারাত্রি ভাল করে ঘুমুতে পারলে না। এই যদি হয়, পরাধীন ভারতের মুক্তি হয়ত একদিন হবে, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির মুক্তি কোথায়?

সকালে উঠেই সুজাতা বস্তিতে গেল। মনোরমাকে ডেকে বললে, দিদি তুমি ঠিকই বলেছিলে, এ আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ—সত্যিকার কাজ এমন করে হবে না। লেনিন-এর মতো ক'রে আমরা এক আন্তর্জাতিক সমিতি গড়ে তুলবো। প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধির মধ্যে আমরা যদি আমাদের নীতি সংক্রামিত করে দিতে পারি, তবেই হবে সত্যিকার কাজ। প্রত্যেক দেশে এই প্রচার আজ অবশ্য করণীয় হয়ে উঠেছে!

ছিদাম ও দুলু কতক বুঝলে, কতক বুঝলে না। তবু তাদের উৎসাহের অন্ত নাই। দুলো বললে, ঠাকুর আসুক, দেখো আমরা কি করে আগুন জ্বালিয়ে দেই।

ইন্দ্রজিতের মুক্তির দিন আসন্ন। দুলোর কথায় সুজাতার চেতনা ফিরে এলো। বললে, ইন্দ্রজিতবাবুকে সেদিন গলায় মালা দিয়ে বিরাট মিছিল করে ঘরে নিয়ে আসতে হবে—পারবি তোরা ?

দুলোর মনে এ-কল্পনা ছিল না। সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে, কেন পারবো না।

অন্তত দুশো লোক সেদিন সংগ্রহ করা চাই।

ছিদাম বললে, দুশো কেন দিদি, তোমার আদেশ পেলে আমরা চারশো লোক এনে হাজির করবো।

ইন্দ্রজিতবাবুর মুক্তির তারিখ তোমার মনে আছে দুলো ?

আছে দিদি ! এমনি এক রবিবারে আমাদের ঠাকুর আসবে। আর তিন হপ্তা।

সুজাতার বুক দুরু দুরু করে উঠে। আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় তার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। মনের এই চঞ্চলতাকে কিছুতেই সে দমন করতে পারছিলো না। চোখের ওপর সেই আসন্ন রবিবার প্রভাতের আলোর মতো ফুটে উঠলো। বললে, এই বস্তির প্রত্যেক দরজায় দিতে হবে মঙ্গল-কলস আর আম্রশাখা।

মনোরমার ক্লিষ্ট-মুখেও দীপ্তির আভাস। কিন্তু সে কথা সাজাতে জানে না, তবু তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠেছে। স্বামীর মুখ সে আজ ছমাস দেখেনি। এই ছ'টি মাস সে প্রহর-গুণেছে। নির্বিকার ঔদাসীন্যে নির্বাক।

দুলো চেঁচিয়ে লাফিয়ে বাড়ি মাৎ করলে। বললে, অজিতবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে আমরা সেই মিছিল নিয়ে আসবো।

মনোরমা এবারে আঁৎকে উঠলো। বললে, একটা কথা বলবো সুজাতা।

একটা কেন, অজস্র কথা বলো দিদি ! আজ যা বলবে, শুন্‌বো।

ঠিক তো ?

ঠিক।

এ মিছিল তোমরা করো না।

সেকি !

যাঁর জন্যে এই মিছিল করতে যাচ্ছো, তিনি নিজেই এমন করে আসতে চাইবেন না। উদ্যোগ-আয়োজন করে শেষে নিজেরাই ব্যথা পাবে বোন।

সুজাতা অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে। বললে, তুমি ঠিকই বলেছো দিদি ! একথা আমারও মনে হওয়া উচিত ছিলো, তাঁকে আমিও তো কম জানি না দিদি !

মনোরমা হাসলে। বললে, কম কেন, আমার চাইতে বেশি জানো।

সুজাতার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

ঠিক এই সময় পণ্ড এসে খবর দিলে, বাবা ডাকছে দিদি !

কেন রে ?

তার আমি কি জানি।

মনোরমা বললে, চলো সুজাতা, বাবাকে আমিও একটা প্রণাম ক'রে আসি।

ভূপতিবাবু নীচের ঘরেই ছিলেন। মনোরমা এসে প্রণাম করতেই সুজাতা পরিচয় দিলে, দিদি—ইন্দ্রজিৎ বাবুর স্ত্রী।

এসো মা। যদিও প্রণাম নিতে বাধে—বয়সের দিক দিয়ে অবশ্য—

কেন বাবা? ব্রাহ্মণ বলে? বাবার কি জাত আছে? বলে মনোরমা হাসে।

ঠিক বলেছো মা। বাবা চিরকালই বাবা। বসো। যে জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি—তোমারও শোনা দরকার। মিলের সমস্ত অংশই আমি কিনে নিলাম মা! ঠিক করেছি, মিল যারা চালাবে—সেই শ্রমিকরাই এর উপসত্ব ভোগ করবে। যা তৈরি হবে, তার লভ্যাংশ সকলের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হবে। আমিও খাটবো অফিসের কাজে, সুতরাং আমারও একটা অংশ থাকবে।

কিন্তু ভাগ তো সমান হতে পারে না বাবা! এই ভুল একদিন রাশিয়াও করেছিল। টেকনিশিয়ানরা যেদিন ফাঁকি দিতে সুরু করলে, সেইদিনই এই ভুল ধরা পড়লো। যাদের ব্রেন নিয়ে কল চলবে—তাদের সঙ্গে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কিছু পার্থক্য রাখতেই হবে, যা রাশিয়াও শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছে।

তুমি ঠিকই বলেছো মা! এই পার্সেন্টেজ একটা কষে ঠিক করতে হবে।

খুব ভাল হবে বাবা! আমি কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এবারে যেন আমার কর্মপন্থা সহজ হয়ে এলো।

মনোরমা হেসে বলে, খুব ভাল কাজ দিলেন বাবা! যাও-বা ও একটু-আধটু সংসারের কাজে ছিল, এবার তাও গেল।

সুজাতাও হাসলে। বললে, সংসার কি তোমাকেই করতে দেবো না কি! এতকাল তো গৃহকাজ করে এলে, এবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াও। ঘর আমি আর কাউকেই করতে দেবো না দিদি, এও সময় থাকতে জানিয়ে রাখছি।

তাইতো দেখছি। নইলে বুড়ো বয়সে তুমি বাবার এই হাল করো!

ভূপতিবাবু ও সুজাতা একসঙ্গে হেসে ফেললেন।

আমি কি মিথ্যে বলেছি বাবা? বুড়ো বয়সে কোথায় সুখভোগ করবেন—একটা মিলের আয়, যা আপনার সর্বস্ব, তাও ঐ পোড়ামুখির জন্যে সাধারণের হাতে তুলে দিলেন! বলতে বলতে মনোরমার গলার স্বর ভারী হয়ে গেল।

ভূপতিবাবুর স্নেহার্দ্র কণ্ঠ এই মেয়েটির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠলো। বললেন, অনেক ভোগ করেছি মা! এবার দেখি না একটু চেষ্টা করে। কতজনে কত করছে—মুক্তি-সংগ্রামে কত জীবন বলি হলো, তার কি কোনো মূল্যই নাই? এই যে সেদিন গুলির মুখে ছেলের দল ঝাঁপিয়ে পড়লো, এর দামও যেমন আছে, প্রতিক্রিয়াও তেমনি আছে। আজ এমন দিন এসেছে, সকলকেই কিছু কিছু দুঃখ ভাগ করে নিতে হবে।

মনোরমা আর একবার ভূপতিবাবুকে প্রণাম করলে। বললে, আর আমার কোনো দুঃখ নেই বাবা!

ভূপতিবাবু হেসে বললেন, চলো মা, ওপরে চলো। আজ আমার বাড়িতে এসেছো, কিছু না খাইয়ে তো ছাড়বো না মা!

মনোরমা ও সুজাতাকে সঙ্গে করে ভূপতি চৌধুরী ওপরে এলেন।

বারান্দায় যে গোলাপের গাছটা ছিল, সুজাতা আজ প্রথম লক্ষ্য করলে, সেটা শুকিয়ে গিয়েছে। তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। চোরের মতো মুখ লুকিয়ে সে চোখের জল মুছে ফেললে। তারই অপরাধে—শুধু তারই অপরাধে ঐ গোলাপ গাছটির আজ অপমৃত্যু হলো।

ভূপতিবাবু মনোরমার দিকে চেয়ে বললেন, একদিন গর্ব করে এই বাড়িখানা তৈরি করেছিলাম, আজ লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছি! তুমি যেন আমার এই ঐশ্বর্যকে ক্ষমা করো মা! বলতে বলতে তিনি তাঁর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মনোরমা গিয়ে বসলো লাইব্রেরী-ঘরে। অত বই দেখে মনোরমা বলে, তুই কি সব বই পড়ে ফেলেছিস?

সুজাতা খিল্ খিল্ করে হেসে বলে, দিদি যেন কি!

তারপর একটি একটি করে মনোরমা সব ঘরগুলোই দেখলে। সুজাতার মার সঙ্গেও পরিচয় হলো। তাঁকে দেখে সে খুশি হতে পারলো না। তাঁর মৌখিক সৌজন্যের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তিনি যে আর সকলের চাইতে পৃথক, এ তাঁর প্রতি চালচলনেই প্রকাশ পাচ্ছিলো! সুজাতাকে ডেকে বলে দিলেন, ওকে যেন তার ঘরেতেই বসানো হয়।

মনোরমা আহত হলো। ঘরে এসে বসতেই সুজাতা মনোরমার হাত চেপে ধরলে। বললে, কিছু মনে করো না দিদি! বড় লোকের এই হলো আসল রূপ।

মনোরমা হাসবার চেষ্টা করে বলে, এর মধ্যে থেকে তুমি কি করে বেরিয়ে এলে সুজাতা, আমি তাই ভাবছি।

এই রকম পারিপার্শ্বিকতাই তো মানুষকে বিদ্রোহী করে তোলে দিদি!

তাই তো দেখছি।

একদিন ইন্দ্রজিৎবাবু বলেছিলেন, ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী এরা—এরা থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জারকে কৃপার চোখে দেখে। ওখানে প্রবেশ করাও চলে না—প্রবেশ করতে গেলে ওরাই গলা ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেবে।

মনোরমা হেসে ফেললে: তাই বুঝি আমাকে নেমে আসতে হলো এই থার্ডক্লাসে?

সুজাতাও হেসে উত্তর দেয়: ঠিক তাই। আমার এই ছোট্ট ঘরটিকে ওদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়েছি।

মনোরমা অতশত বোঝে না। সে জন্মাবধি দেখছে পৃথিবীতে দুটি জাত—এক গরীব, অপর ধনী। একজন খেতে পায় না, আর একজন ভালভাবে খেয়েও খাবার শেষ করতে পারে না। একজন বড় বাড়িতে থাকে আর একজনের মাথা গুঁজবার জায়গাও জোটে না। এ তো হবেই—যার যেমন কর্মফল। সুজাতা যাই করুক, এই কর্মফলকে সে কি করে অস্বীকার করবে!

কি ভাবছো দিদি? সুজাতা বলে।

মনোরমা চমকে উঠে বলে, কর্মফলের কথা ভাবছিলাম। পূর্বজন্মে যেমন কাজ করে এসেছি, এবারে তার ফল ভোগ করছি। চেষ্টা করে এ-নিয়ম তো বদলানো যায় না বোন!

দিদি যেন কি! আমি বোধ হয় খুব ভাল কাজ করে এসেছি, তাই আজ বড় লোকের মেয়ে হয়ে জন্মেছি? বলতে বলতে সুজাতা হেসে ফেললে।

পশু এসে বললে, একটা কথা শোনো দিদি!

কি কথা ভাই?

তুমি এসোই না। পশু সুজাতার হাত ধরে।

প্রাইভেট? আচ্ছা, কানে কানে বলো।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পশু যা গোপন রাখতে চেয়েছিলো তা আর গোপন থাকলো না।

সুজাতা হেসে বললে, ও, এই কথা? এই নতুন মানুষটি আমাদের 'দিদি' হয় ভাই।

মনোরমা পশুকে কাছে টেনে নিলে। পশু লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

৯

নতুন ব্যবস্থায় মিলকে চালু করতে ভূপতিবাবুর আরো কয়েকদিন সময় গেল। সুজাতাও নিয়মিত মিলে আসতে আরম্ভ করলে। বললে, এই পথ দিয়েই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করা সহজ হবে।

দুলো, ছিদাম—বস্তির আরো যারা সবাই, মিলে এসে কাজ করতে লাগলো।

কথাটা পল্লবিত হয়ে অজিতের কানে গেল। একটা ব্যঙ্গের হাসি তার ওষ্ঠ-প্রান্তে প্রচ্ছন্ন ছিল। বিজনও বিদ্রূপ করলে: দেশ স্বাধীন হচ্ছে হে!

এর উত্তরে একটি পরিচ্ছন্ন হাসি বেবীর মুখেও খেলে গেল। বললে, সব সহ্য হয় দাদা, সুজাতাদির অহংকার অসহ্য।

অজিত সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে চলেছে।

তারপর অত্যন্ত আকস্মিক চেয়ার ছেড়ে উঠে অজিত বললে, দেখো, তোমাদের কাছে বলতে বাধা নেই—আমি এই দলটিকে জব্দ করতে চাই। পুলিশ-কমিশনারকে নিমন্ত্রণ করেছি চা খাবার। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় স্থির করবো। ওরা পরে বুঝবে, অজিত দত্ত তাদের কি সর্বনাশ করে গেল।

গেল বলছো কেন দাদা, তুমি কি কোথাও যাবে? বেবী জিজ্ঞেস করে।

যুদ্ধ থেমে গেল। আর যখন কোনো বাধাই নেই, আর একবার বিলেত যাবো মনে করছি।

তাই যাও দাদা, এ-দেশের জল-বায়ু তোমার সইবে না। বলে বেবী হাসলে।

তুই হাসছিস, কিন্তু সত্যিই এদেশ আমার ভাল লাগে না—না আছে কালচার, না আছে কারো 'ডিসেনসি' জ্ঞান! তবু এরাই চায় দেশ স্বাধীন করতে।

বিজন মুখে অব্যক্ত একটি শব্দ করে নড়ে চড়ে বসলো।

বেবী সেদিকে চেয়ে কটাক্ষ করলে।

যে-দেশে পনেরটা জাতি আর আঠারটা ভাষা, সে দেশ কোনোদিন স্বাধীন হতে পারে না।

সমগ্র ইউরোপেও তো এক ভাষা এক জাতি নয় দাদা!

নয় বলেই খণ্ডিত রাজ্য। ভারতকে অমনি টুকরো টুকরো করে নিলে অবশ্য কোনো কথা নেই। কিন্তু অখণ্ড ভারতকে সংঘবদ্ধ করা ইম্‌পসিবল!

আমারও তাই মনে হয় দাদা, সুজাতাদির এই সংঘগঠন ঠিক এই কারণেই ফেলিওর হবে।

আজ যারা আশু কিছু পাবার প্রত্যাশায় মেতে উঠেছে, একদিন নিরাশ-নয়নে চেয়ে দেখবে তারা ঠিক একই জায়গায় আছে!

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো?

সেই রাত্রিতেই বস্তিতে লাগলো আগুন। সাপের ফণার মতো লক্ লক্ করছে লাল আগুনের শিখা।

ছিদাম, নকড়ি, দুলো—এদের প্রাণপণ চিৎকারে সবাই ছুটে এলো। ছুটে এলো সুজাতা, ছুটে এলেন ভূপতি চৌধুরী। আগুন তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মনোরমা, মনোরমা—

কিন্তু কোথায় তখন মনোরমা—সীমাহীন অগ্নি-কল্লোল, ক্রুদ্ধা নাগিণীর উষ্ণ নিশ্বাসের মতো গর্জে গর্জে উঠছে।

ছুলো ছুটে গেল মনোরমার খোঁজে। কিন্তু সেও আর বেরুতে পারলে না। লেলিহান অগ্নিশিখার তাণ্ডব-নর্তন—রাত্রির বুক চিরে ছুটে এলো দমকল, থেমে গেল অসহায় নর-নারীর মরণ-চিৎকার যা এই কিছুক্ষণ আগেও ছিল।

সুজাতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভূপতি চৌধুরী বার বার ছুটোছুটি করেও কোনকিছুর নাগাল পাচ্ছেন না।

সুজাতা বলে, বাবা, চলো ফিরে যাই। এ আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারছি না।

ও রক্ত মাংসের দেহে সত্যই দাঁড়িয়ে দেখা কঠিন। ছোট ছোট শিশু—তাদেরকে বুকে-করে মাতৃপ্রাণ উন্মাদের মতো ছুটাছুটি করেছে, প্রাণপণে চিৎকার করেছে, কেঁদেছে, ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডেকেছে, কিন্তু বধির ভগবান, নিষ্ঠুর ভগবান—হয়ত মিথ্যা ভগবান!

একটি ঘণ্টার চেষ্টায় দমকলের জলে আগুন নিভলো। টেনেটেনে বের করা হলো, অগ্নিদগ্ধ বিকৃত দেহগুলি। দেহ নয়, দেহাবশেষ! কেঁদে উঠলো ছিদাম, নকড়ি, মানিক, শঙ্কর: কেঁদে উঠলো পাড়া-প্রতিবেশী। কিন্তু কাঁদে না সুজাতা, কাঁদে না ভগবান!

রবিবার। আজ সেই রবিবার, ইন্দ্রজিতের মুক্তির দিন। ভূপতিবাবু মোটর নিয়ে গিয়েছেন তাঁকে এগিয়ে আনতে।

জেল-দরজার বাইরে এসে ইন্দ্রজিৎ ভূপতিবাবুকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি এসে প্রণাম করলে, বললে। খবর সব ভালো?

ভূপতিবাবুর চোখের কোণে জল এলো। বললেন, হাঁ, খুব ভালো। এই ভালো দেখবার জন্যেই বুড়োকে আজো বেঁচে থাকতে হয়েছে। এসো বাবা, গাড়িতে এসো।

গাড়িতে বসে ইন্দ্রজিৎ সকল কথাই শুনলে। এতবড় নিদারুণ দুঃসংবাদ একটা প্রচণ্ড শেলের মতো তার বুকে এসে লাগলো। মৃত্যুকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, কিন্তু একি শোচনীয় মৃত্যু! গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, তারপর?

কোন্ তারপরের কথা বলছো বাবা? আমি যে তোমার মুখের দিকে ভালো করে চাইতে পারছি না। সোমেশ, সুজাতা ওরা কেউ আসতে পারলে না, কিন্তু আমাকে আসতে হলো।

বস্তির সামনে এসে গাড়ি থামলো। সেই দিকে চেয়ে ইন্দ্রজিৎ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

ভূপতিবাবু ডাকলেন। ইন্দ্রজিৎ যন্ত্র-চালিতের মতো তাঁর অনুসরণ করলে।

ওপরে উঠে আসতেই সুজাতা ইন্দ্রজিতের পায়ের ওপর মুখে গুঁজে পড়লো।

ইন্দ্রজিৎ বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। সম্মুখেই অগ্নিদগ্ধ বস্তির কালিমা—পৃথিবীর কলংকের মতো পড়ে আছে। কতদিনের কত তুচ্ছ স্মৃতি ইন্দ্রজিতের একটি একটি করে মনে পড়ে। চোখে জল আসে। লোকে বলে, এরাই নাকি

ছোটলোক। এই ছোটলোক গুলো—মাতাল গুলো, মনোরমাকে বাঁচাতে প্রাণ দিলে। এর কথা কেউ হয়ত লিখবে না, কিন্তু বিধাতার কালের ফলকে ও-নাম অক্ষয় হয়ে রইলো।

ছিদেম উন্মাদের মতো এসে ঘরে ঢুকলো। বললে, শুনেছো ঠাকুর, এসব কীর্তি অজিতবাবুর।

সুজাতা চিৎকার করে পথে বেরিয়ে পড়লো।

ইন্দ্রজিতের চোখে অন্ধকার নামলো। একি সর্বনাশ করতে চলছে সুজাতা।

ইন্দ্রজিৎ ছুটে এসে নামলো রাস্তায়। সুজাতা বেশিদূর যেতে পারে নি। পথরোধ করে ইন্দ্রজিৎ তার হাত চেপে ধরলে।

সুজাতা চিৎকার করে উঠলো: হাত ছাড়ুন! তারপর প্রাণপণ শক্তিতে সুজাতা হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ইন্দ্রজিতের হাতের ওপরেই ঢলে পড়লো।

জ্ঞান হয়ে সবকথা সুজাতা মনে করবার চেষ্টা করে! তার বেশ মনে পড়ে, অজিত দত্তের বুকে সে ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলো—তাজা রক্তে সাদা মার্বেল পাথরের মেঝে লাল হয়ে উঠেছিলো, কিন্তু তারপর কি হলো? মৃতদেহ কি নড়ে উঠেছিলো? সে এখানেই বা কি করে এলো? ইন্দ্রজিতই বা এখানে কেন? জেলের গরাদ ধরে ইন্দ্রজিৎ—সেই তো বেশ ছিল।

ইন্দ্রজিৎ বলে, একটু জল খাবে?

জল? জল তো কোথাও নাই—সব রক্ত।

কিন্তু রক্তই তো তুমি চেয়েছিলে সুজাতা?

সুজাতা কি ভাববার চেষ্টা করে। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম কি জানো? সব মানুষগুলোই রাতারাতি মজদুর হয়ে গিয়েছে। ওরা একি সর্বনাশ করলে দেশের।

এ তোমার স্বপ্ন নয় সুজাতা। তোমারই অজ্ঞাতসারে তোমার ইন্‌টেলেক্‌ট কথা কয়ে উঠেছে। রাশিয়া অমনি করেই আজকের মানুষ গড়ে তুলছে। কিন্তু এই কি মানুষের সংজ্ঞা? পেটের ক্ষুধা ছাড়াও মানুষের মনের ক্ষুধা আছে, এ ওরা মানতে চায় না। এমনি করেই একদিন হিরণ্যকশিপু শিশু-প্রহ্লাদের ইন্‌টেলেক্‌টকে জবাই করেছিলো।

সুজাতা শিউরে ওঠে। বলে, আমাকে জল দাও।

ইন্দ্রজিৎ জল দেয়। সুজাতা এক নিশ্বাসে জলটুকু খেয়ে বলে, এটুকু জলে আমার কি হবে? অনন্ত তৃষ্ণা আমার সাগর শুকিয়ে যাবে।

মি: দত্তেরও ছিলো এই তৃষ্ণা—এই তৃষ্ণাতেই তাঁর সাগর শুকালো! কাল রাত্রে তিনি আত্মহত্যা করেছেন সুজাতা! উপায়বিহীন এই আত্মলোপ। মৃত্যু তাঁর অনেকদিনই হয়েছিল—কাছে থেকেও অজিতবাবু টের পান নি। আজ অজিতবাবুকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শুনলাম বাড়িখানাও কোন ইংরেজ কোম্পানীর কাছে বাঁধা।

সুজাতার মুখে এক পৈশাচিক অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো।

ইন্দ্রজিৎ তার হাতের ওপর হাত রেখে বলে: ছি:, দুঃখকে ভাগ করে নিতে শেখো। Blood for Blood সে আমাদের কথা নয়। তোমার মনে আছে সুজাতা, সেই দার্শনিকের কথা?

সুজাতা চোখ বড় বড় করে বলে, হাঁ আছে।

সে হতভাগ্য সারা দর্শনশাস্ত্র ঘেঁটে হিন্দু সিভিলেজেশন কোথায় এসে শেষ হয়েছে খুঁজে পেলে না। মডার্ণ সিভিলেজেশন কি করে মানুষ মারছে তারই ধাঁধা লাগলো ওর চোখে!

কিন্তু বিজ্ঞান কি মানুষের কোনো কল্যাণই করেনি? ধ্বংসাত্মকের বিপরীত ধর্ম্মই যে কল্যাণ। বিশ্বত্রাসী আনবিক বোমা—তাকে কল্যাণের কাজে মানুষ ব্যবহার করলে না। যার পরিণাম হিরোসিমা, নাগাসিকা! হিন্দু-সভ্যতাও ঠিক এইখানে উঠে একদিন প্রশ্ন করেছিলো: ততঃ কিম? এই কি সব? তারা আনন্দ পেলো না। তখনই তাদের ফিরে আসতে হলো ইন্‌টেলেক্‌টে। মডার্ণ সিভিলেজেসনকেও একদিন এই প্রশ্ন করতে হবে—আর সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।

সুজাতা উঠে ইন্দ্রজিতকে প্রণাম করলে।

রাত্রি প্রভাত হলো। অন্ধকারের বুক চিরে এলো এই অরুণ আলো। যে-আলো প্রকাশের আলো, জ্ঞানের আলো, জীবনের আলো।

ইন্দ্রজিৎ যুক্তকরে উঠে দাঁড়ালো। তার কণ্ঠে সেই বাণী: তমসো জ্যোতির্গময়:......

সুজাতাও সেই কণ্ঠে মিলিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উচ্চারণ করে: তমসো মাম জ্যোতির্গময়:।

সুজাতা যেন কতকালের ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। নতুন আলো, নতুন অনুভূতি, নতুন আনন্দ। ভূপতিবাবু এসে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। স্তব্ধ হলো তাঁর জ্ঞান, বিজ্ঞান, মডার্ণ সিভিলেজেশন। জোর করে কথা বলতেও তাঁর ইচ্ছে হলো না। এ যেন তাঁর অনধিকার প্রবেশ। অথচ নিঃশব্দে ফিরে যেতেও আর পারলেন না তিনি। তাঁর মনে হলো, এক অনাগত ভবিষ্যতের মূর্তপ্রতীকরূপে যেন ওরা এইমাত্র নেমে এলো সূর্য-লোক থেকে। যাদের পদতলে শব হয়ে পড়ে আছে পুরাতন পৃথিবী।

সমাপ্ত

হিন্দুকলেজের আদিপর্ব

যোগেশচন্দ্র বাগল

১

সম্প্রতি হিন্দু স্কুল নামক কলিকাতাস্থ একটি পুরনো বিদ্যায়তনের দেড়শত বৎসর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্কুলের মত এত পুরনো ইংরেজি বিদ্যায়তন শুধু বাংলায় কেন সমগ্র ভারতবর্ষেও বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নাই। আজকালকার পাঠকের নিকট স্বতঃই প্রশ্ন জাগিবে স্কুলটির এই নাম হইল কেন, আর ইহার এত গৌরব করিবারই বা কি আছে। এই কারণেই এই বিদ্যায়তনের পূর্ব ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। বাঙালির সমাজ-চেতনায় ইহার কৃতিত্ব যে কত বিপুল সে সম্বন্ধেও আমরা আঁচ্ করিতে পারিব। বাঙ্‌লার, শুধু বাঙলারই বা কেন সমগ্র ভারতবর্ষের গত শতাব্দীর মানুষের মধ্যে যে নবজাগরণ দেখা দেয় তাহারও মূলে ইহার কৃতিত্ব অনেকখানি।

হিন্দু স্কুল নামটি কিন্তু আগে ছিল না। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন একটি পুরাতন বিদ্যালয়ের অংশ বিশেষ এই নামে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে আখ্যাত হইতে শুরু হয়। ঐ সময় তৎকালীন সরকার পুরাতন হিন্দু কলেজকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া সিনিয়র ডিপার্টমেন্টকে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং জুনিয়র ডিপার্টমেন্টকে হিন্দু স্কুলে পরিণত করেন। পুরাতন কলেজের নামের মূল অংশ এই হিন্দু স্কুলের মধ্যেই বিধৃত রহিয়াছে।

হিন্দু কলেজের দান যেমন বিপুল, ইহার ইতিহাসও তেমনি বিচিত্র। আমি বিভিন্ন স্থানে পুস্তকে ও প্রবন্ধে হিন্দু কলেজের কথা, প্রতিষ্ঠাবধি দ্বিধাবিভক্ত হওয়া পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পুনরুক্তি না করিয়া মূল বিষয়গুলির প্রতি মাত্র এখানে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। হিন্দু কলেজের 'আদিকল্পক' প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার। প্রতিষ্ঠার পূর্বে জল্পনা কল্পনার সময় হইতেই রামমোহন রায় ইহার বিষয় অবগত ছিলেন। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।* কলেজ প্রতিষ্ঠায় উচ্চমনা য়ুরোপীয়দের সহায়তা লাভ করিলেও মুখ্যত সে যুগের হিন্দু প্রধানেরাই ইহার জন্য অগ্রণী হন এবং সব রকম উদ্যোগ আয়োজন করিতে শুরু করেন। ১৮১৬, মে মাস হইতে ১৮১৭ জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সময় কী কর্ম-তৎপরতার দিন! এই উদ্দেশ্যে গণ্যমান্য হিন্দুগণ লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া একটি অর্থভাণ্ডার গঠন করেন। নিয়ম-কানুনও যথারীতি প্রস্তুত হইল। চাঁদাদাতা সভ্যেরা অধ্যক্ষ সভা মনোনীত করিলেন।

---

* দ্রঃ রাজা রামমোহন রায় ও ইংরেজি শিক্ষা—প্রবাসী, পৌষ ১৩৬০, "ডেভিড হেয়ার" উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ২য় সং

বড়লাটের অনুমতি পাওয়া গেলে লেঃ ফ্রানসিস্ আরভিন য়ুরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানে বলিয়া রাখি, য়ুরোপীয়েরা কিন্তু প্রশাসনিক কারণে কার্যত কলেজ পরিচালনা হইতে দূরেই থাকিয়া যান। কলেজের দেশীয় সম্পাদক হন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি এই ব্যাপারে বড় উৎসাহী ছিলেন। এই সময়কার রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার সভ্য এবং পরবর্তীকালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ ছিলেন তিনি। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণকেও নিযুক্ত করিলেন। প্রধান শিক্ষক পদে বৃত হন চন্দননগর নিবাসী জেমস্ আইজাক ডি'আনসেল্স্।

প্রারম্ভিক আয়োজন সম্পন্ন হইলে হিন্দু কলেজ গরাণহাটাস্থ গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হইল। এইদিন নামজাদা য়ুরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রবৃন্দ উপস্থিত হইয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন: একটি সামান্য বীজের মধ্যে মহামহীরুহ বটবৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে। হিন্দু কলেজ রূপ যে বীজ এখানে উপ্ত হইল তাহাও একদা বৃহদাকার হইয়া জনমানবকে শান্তি দান করিবে।

[২]

হিন্দু কলেজ প্রথমে অবশ্য সামান্য আকারেই স্থাপিত হয় এবং স্কুল মাফিক পাঠ্যক্রম অনুসৃত হইতে থাকে। তবে এই বিদ্যালয়েই বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুষ্ঠুরূপে ইংরেজি শিক্ষাদানের আয়োজন হইল হিন্দু সন্তানদের মধ্যে। এখানে একথাটিও বলা প্রয়োজন যে, হিন্দু কলেজে শুধু হিন্দু ছেলেরাই পড়িবার অধিকারী হয়। কলেজের প্রথম সাত বৎসরে ইহা একটি স্কুল মাত্রই যে ছিল এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। তবে ইহা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে সুষ্ঠুরূপে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার। এই কাজটি কিন্তু বরাবরই খুবই আন্তরিকভাবে সাধিত হইতে থাকে। ইহার ফলস্বরূপ আমরা দেখি প্রতিষ্ঠার চার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কয়েকজন ছাত্র ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন হইয়া বিষয়-কর্মে লিপ্ত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রসন্নকুমার ঠাকুর তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও শিবচন্দ্র ঠাকুরের নাম উল্লেখ করিতে পারি। তারাচাঁদ ডাঃ হোরেস হেম্যান উইলসন কর্তৃক পুরাণসমূহের ইংরেজি অনুবাদকার্যে বিশেষ সহায়তা করিতেছিলেন।

এখানে কিঞ্চিৎ পরের কথা বলিলাম। প্রথম সাত বৎসর (১৮১৭ হইতে ১৮২৩) কলেজ কর্তৃপক্ষ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে এক কপর্দকও সাহায্য পান নাই, সম্পূর্ণরূপে নিজেদের উপর নির্ভর করিতে হয়। এ কারণ নূতন নূতন আয়ের পন্থাও তাহাদিগকে খুঁজিতে হইল। যে সব সভ্য পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দেন তাঁহারা প্রত্যেকেই একজন করিয়া ছাত্রকে কলেজে অবেতনে পড়াইবার জন্য মনোনীত করিতে পারিতেন। এই সব ছাত্রের মধ্যে নিজেদের আত্মীয় ছাড়া অপর ছেলেরাও অনেক সময় থাকিত। কলেজের তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্ত দ্বিতীয় বৎসরে অধ্যক্ষ সভা স্থির করিলেন যে, বাহির হইতে 'বৈতনিক' ছেলে লওয়া হইবে না। চাঁদা-দাতাদের মনোনীত বা নির্বাচিত ছেলেরাই এখানে পড়িতে পাইবে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু অর্থভাণ্ডার বাড়ানো। ১৮১৯ সনের মে মাসে সংগৃহীত অর্থভাণ্ডার হইতে একটি মোটা অংশ জেমস্ ব্যারেটো কোম্পানিতে নির্দিষ্ট সুদে গচ্ছিত রাখা হইল। পরিচালকগণ এই সুদ দ্বারা কলেজের ব্যয় আংশিক নির্বাহের সুযোগ করিয়া লন। এই বৎসর হইতে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি তাঁহাদের মনোনীত উৎকৃষ্ট

ছাত্রগণকে কলেজে পাঠাইতে আরম্ভ করেন। এই সংখ্যা প্রথমে বিশ ও পরে ত্রিশ জন হয়। প্রত্যেকের মাথাপিছু বেতন পাঁচ টাকা হিসাবে সোসাইটি কলেজে মাসমাস প্রদান করিতেন। কলেজের আয় সীমাবদ্ধ, ছাত্র সংখ্যাও প্রায় সীমিত। ইহারই মধ্যে কর্তৃপক্ষ কলেজের উন্নতির বিষয়ে যথাসাধ্য তৎপর হইয়াছিলেন।

আমরা দেখি দ্বিতীয় বৎসর হইতে রাধাকান্ত দেব অধ্যক্ষ সভার সদস্য হইয়াছেন। তিনি কলেজের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু নিয়মিতভাবে কাজকর্ম তদারক ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন শীঘ্রই অনুভূত হইল। ১৮২১ সনের মাঝামাঝি অধ্যক্ষগণের অনুরোধে সুবিদ্বান রামকমল সেন এই ভার লইতে স্বীকৃত হন। য়ুরোপীয় সম্পাদক লেঃ ফ্রানসিস্ আরভিন সামরিক প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া যান। তাঁহার স্থলে অপর একজন এইপদে স্থিত হন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন য়ুরোপীয় পাদ্রী, যেমন উইলিয়ম ইয়েটস্ ছেলেদের পাঠ দেখাশুনা করার জন্য নিয়োজিত হন। অধ্যক্ষসভা ইহাদের নাম দিতেন ভিজিটর।

মাঝে মাঝে সরকারী অনুকম্পা যাচ্ঞা করিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ এতদিন সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করেন নাই। এক বিশেষ কারণে ১৮২৩ সনের মাঝামাঝি তাঁহাদিগকে এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইল। হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি জন হারবার্ট হ্যারিংটন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যান। সেখানে তিনি একটি হিতব্রতী শিক্ষা-সোসাইটির নিকট হইতে বহুতর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেন এবং তদুপযোগী বইপত্র এই সঙ্গে পান। হিন্দু কলেজে যাহাতে নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞান চর্চা সুরু হইতে পারে তাহারই জন্য হ্যারিংটনের এই উদ্যোগ। ১৮২৩ সনের প্রথমে এই সকল কলিকাতা পৌঁছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহা রাখিবেনই বা কোথায় আর ইহার সার্থক ব্যবহারের আয়োজনই বা করিবেন কিরূপে? তাঁহারা এই জন্য অগত্যা সরকারে দ্বারস্থ হন।

এই সময় হ্যারিংটন এ দেশে ফিরিয়াছেন। এ ব্যাপারেও তাঁহার সহায়তা কিরূপে পাওয়া গেল তাহাই একটু বলি। সরকার ১৮২৩ সনের ৩১শে জুলাই একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করিয়া শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান ও পরিচালনার ভার ইহার উপর অর্পণ করেন। এই সভার নাম হইল জেনারাল কমিটি অব পাবলিক ইনস্‌ট্রাকশান। হ্যারিংটন হইলেন এই সভার সভাপতি এবং সুপণ্ডিত ডাঃ উইলসন ইহার সম্পাদক। কলেজ কর্তৃপক্ষের আবেদন সরাসরি সরকারের নিকট হইতে কমিটির সম্মুখে আসিল। কাজেই এ বিষয়ে সত্বর যে একটা সুরাহা হইবে সে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া গেল। সরকার সাব্যস্ত করিয়াছেন ১৮২৪, ১লা জানুয়ারি হইতে বৌবাজারে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিবেন। একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে কলেজ খোলা হইল। কমিটি ইহার সন্নিকটে আর একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে হিন্দু কলেজের স্থান করিয়া দিলেন। পাশাপাশি দুইটি বাড়ি থাকায় উভয় কলেজের ছাত্রদের সুবিধা হইবে এই জন্যে ওরূপ করা হইয়া থাকিবে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বইপত্র শেষোক্ত বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইল। সরকার পক্ষে কমিটি ডি. রস নামে কলেজের জন্য একজন বিজ্ঞান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বাড়ির ভাড়া এবং এই শিক্ষকের বেতনের ভার দুইই কমিটি গ্রহণ করিল। তবে যে প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের কিছু ব্যয় হয় তাহাতে তাঁহার পক্ষে প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। কমিটির সম্পাদক অধ্যক্ষ সভায় সরকারী প্রতিনিধি প্রেরিত হন। তাহার নাম হইল "ভিজিটর"। ইহা ১৮২৪ সনের কথা। এই সনেই সংস্কৃত কলেজের নূতন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। স্থির হয় যে, ইহার দুই পার্শ্বে হিন্দু কলেজের জন্যও সরকারী খরচে ভবন নির্মিত হইবে। হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চারও সুবিধা হইল এইরূপে।

[৩]

ইতিমধ্যে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে কলেজের আর্থিক বিপর্যয় উপস্থিত হইল। মেয়াদ শেষ হইবার দুই মাস পূর্বে ১৮২৫ ফেব্রুয়ারি মাসে জেমস্ ব্যারেটো কোম্পানির পতন হয়। কলেজের একটি বড় আয়ের পথ এইভাবে রুদ্ধ হইয়া গেল, সঞ্চিত টাকাও আর ফিরিয়া পাইবার আশা ছিল খুবই কম। এই অবস্থায় পুনরায় সরকারের নিকট হাত পাতা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। উইলসন কতকটা স্বেচ্ছায় এবং কতকটা সরকারী নির্দেশে কলেজের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। দেখি এই সনে ডেভিড হেয়ার সর্ব-প্রথম অধ্যক্ষ সভার সদস্যরূপে গৃহীত হন। পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কলেজ সরকারী আওতায় আসিয়া পড়ে কিরূপে বলিতেছি।

আয়ের পথ অবশ্য কিছু বাড়ান হইল। কলেজ আর 'অবৈতনিক' রহিল না। বাহির হইতেও নির্দিষ্ট মাসিক ৫ টাকা বেতনে ছাত্র ভর্তি করা হইতে লাগিল। ইহাতে আয় কিঞ্চিৎ বাড়িল বটে, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা কঠিন হইল। অধ্যক্ষ সভা কমিটির দ্বারস্থ হইলে তাহারা সাহায্যদানে সম্মত হইলেন। কিন্তু যে ধরনের শর্ত আরোপ করিলেন তাহাতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। তথাপি কলেজ রক্ষার খাতিরে তাহারা শেষ পর্যন্ত একটা রফায় আসিয়া পৌছিলেন। ডাঃ উইলসন হইলেন অধ্যক্ষ সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট বা সহকারী সভাপতি। জেনারাল কমিটির পক্ষে কলেজের যাবতীয় কার্য তত্ত্বাবধানের ক্ষমতাও তিনি লাভ করেন। উইলসনের সদিচ্ছায় অধ্যক্ষগণের খুবই আস্থা ছিল। তাহারাও কলেজের পুনর্গঠন কাজে উইলসনের পুরাপুরি সহায় হন। কলেজের দুঃসময়ে কয়েকজন হিন্দু প্রধান ইহার সাহায্যে আগাইয়া আসেন। হিন্দু কলেজের নিমিত্ত তাঁহারা গভর্ণমেন্টের হাতে লক্ষ টাকা দান করেন। কমিটির উপর সরকার এই অর্থ যথোপযুক্ত উপায়ে ব্যয়ের নির্দেশ দিলেন। কমিটি কলেজের দৈনন্দিন খরচ-খরচার এক মোটা অংশ বহন করিতেছিলেন। কাজেই এই টাকার আয় হইতে তাহারা সর্বশেষ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ছাত্রদের অধিকতর বিদ্যাচর্চার নিমিত্ত অনধিক দুই বৎসরের জন্য ষোল টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

উইলসন অতঃপর কলেজের সংস্কার সাধনে মন দিলেন। এখানকার শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল। তিনি শ্রেণী বাড়াইয়া দশটির পরিবর্তে তেরটি করিলেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে এগুলি ভাগ করিয়া লইলেন। এরূপ একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকায় পরবর্তীকালে বড়লাট ডালহৌসী ইহাকে 'বুড়ির পাঠশালা' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই। পাঠ্যক্রম যথাযথরূপে স্থিরীকৃত হইল। ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণেরও তিনি ব্যবস্থা করিলেন। নূতন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হইলেও অন্যান্য বিষয়ও এখানে শিখান হইত। সংস্কৃত, ফার্সী, বাংলা, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পণ্ডিত মৌলবী ও অন্যান্য শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত বিষয় অর্থাৎ গণিত শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল শুধু প্রাথমিক স্তরে। ১৮২৮, মার্চ মাস হইতে বিখ্যাত গণিতবিদ্ ও প্রাচ্য সাহিত্যানুরাগী ডাঃ আর. টাইলারের উপর উচ্চতর গণিত শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। কলেজের পুনর্বিন্যাসকালে কোন কোন ছাত্র ইংরেজি ভাষা সাহিত্যে আশাতীত পারদর্শিতা লাভ করেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কাব্যগ্রন্থ Shair and other Poems লিখিয়া

পরে খুবই খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই তিনি গদ্য পদ্য লিখিতে পারঙ্গম ছিলেন। সুবিখ্যাত "হিন্দু ইনটেলিজেনসার" সাপ্তাহিকের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

হিন্দু কলেজ নূতন বাড়িতে সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে উঠিয়া আসে ১লা মে ১৮২৬ দিবসে। কলেজের নবরূপায়ন প্রকৃতপক্ষে সুরু হয় নূতন বাড়িতে আসিবার পর হইতে। এই সময় নূতন নূতন শিক্ষকের সঙ্গে ডিরোজিও চতুর্থ শিক্ষকের পদে ব্রতী হন। তিনি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াইতেন। তাঁহার পড়াইবার বিষয় ছিল ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্য। ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসিয়া কিশোর ছেলেরা এক অভিনব জীবনের সন্ধান পাইল।

[৪]

ডিরোজিও পাঁচ বৎসরকাল হিন্দুকলেজে শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন (মে ১৮২৬—এপ্রিল ১৮৩১)। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি ছেলেদের মনে এক নূতন প্রেরণা সঞ্চার করে। তাঁহার নিকট একবার যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পাঠনারীতি কখন ভুলিতে পারেন নাই। শুধু চতুর্থ শ্রেণী নয় উচ্চতর শ্রেণীর ছেলেরাও নিজ নিজ বিষয়ের আলোচনার জন্য কলেজের অবসর সময়ে এবং ছুটির পরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন। ডিরোজিও কবি হইলেও দর্শন ছিল তাঁহার অতি প্রিয় বিষয়। তিনি ছিলেন হিউম দ্বারা খুবই প্রভাবিত। কাজেই সব বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার একান্ত পক্ষপাতি। পাঠ্য এবং পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের আলোচনার সময় ছেলেদের মনে যাহাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তির উন্মেষ হয় সে দিকে তিনি বারবার নজর রাখিতেন। ডিরোজিওর সত্যপ্রিয়তা দেখিয়াও তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া যান। ছেলের দল এই বিষয়েও ডিরোজিওর দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়। তাঁহাদের উপর শিক্ষক ডিরোজিওর প্রভাব এতই পড়ে যে তাঁহাদের মনে ক্রমশঃ সত্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতি এবং মিথ্যার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হইতে বিলম্ব হইল না। এই সময় তাহাদের আচরণ দেখিয়া 'সত্য' এবং 'কলেজের ছেলে' এ দুইটি কথা সাধারণের নিকট সমার্থবাচক প্রতীতি হইয়াছিল।

ছেলের দল কলেজ গৃহেই ডিরোজিওর সঙ্গলাভে নিরস্ত হইলেন না, তাহাদের কেহ কেহ তাঁহার বাড়ি গিয়াও বিবিধ বিষয়ে উপদেশ লইতে লাগিলেন। সাহিত্যাদি বিষয়ের আলোচনায়ই তাহারা নিবদ্ধ থাকিতেন না, সাহিত্য ব্যতিরিক্ত জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েরও আলাপনে রত হইতেন। এইরূপে সে যুগের বিখ্যাত 'একাডেমিক এসোশিয়েশনের' উৎপত্তি। এই সভার মধ্যমণি ছিলেন ডিরোজিও। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ছেলের দল ভিড় জমাইতে লাগিলেন। বাড়িতে স্থান সংকুলান হওয়া ভার। অবশেষে কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলাস্থ বাগান-বাড়িতে সভার অধিবেশন হইতে আরম্ভ হয়। ডিরোজিও ছিলেন সভাপতি এবং কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্র উমাচরণ বসু সম্পাদক। এসোশিয়েশনের সভায় ডেভিড হেয়ার প্রমুখ নানা গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ছেলেদের উৎসাহ দিতেন। কখন কখন তাঁহারা আলোচনায়ও যোগ দিতেন। সমাজ ধর্ম সাহিত্য দর্শন রাজনীতি নানা বিষয়েই আলোচনা চলিত। যুক্তিবাদী সংস্কারপন্থী স্বদেশপ্রেমিক ডিরোজিওর নেতৃত্বে ছেলের দলও ঐ সকল বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে তৎপর করিলেন।

এই বিখ্যাত বিতর্ক সভা স্থাপিত হয়, যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি ১৮২৮ সনের প্রথম কি মধ্য ভাগে। বৎসর দুয়েকের মধ্যে ছেলেদের কার্যকলাপে ইহার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হইল। তাঁহাদের মনে চিন্তাশক্তিও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। লেখায় ও বক্তৃতায় ইহা সম্যক বুঝা গেল। সমাজের কলুষ, কদাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহারা দাঁড়ায়। আর ইহাতে সমাজ মধ্যে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত হয়! এ বিষয়ে বলিবার পূর্বে একটি কথা বলি। ডিরোজিওর পরামর্শে ছেলেরা ১৮৩০ সনের প্রথমেই 'পার্থেনন' নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক বাহির করেন। প্রথম সংখ্যায় যে সব লেখা বাহির হয় তাহাতে অনেকেই আতঙ্কিত হইলেন এবং অধ্যক্ষ সভার পক্ষে উইলসন দ্বিতীয় সংখ্যা আর বাহির হইতে দিলেন না। ছেলেরা এই সময়ে সংবাদ পত্রেও সাময়িক পত্রে ও রচনা পরিবেশন করিতে থাকেন। কলেজের বাহিরের ছেলেরাও নানা ভাবে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসিতে লাগিল। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন সভাসমিতি স্থাপন করিয়া ডিরোজিওকে সভ্য করিয়া লয় এবং সাহিত্য রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় লিপ্ত হয়। আর ইহা ছাড়া ডিরোজিও হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলে দর্শন সম্বন্ধে যে এক প্রস্থ বক্তৃতা দেন। তাহাতেও কলেজের অভ্যন্তরের ও বাহিরের ছেলেরা আসিয়া যোগদান করে। দর্শনের মূল সূত্রগুলি তাহারা জানিয়া লয়। এবং যুক্তিভিত্তিক স্বাধীন চিন্তায় যেমন একদিকে অভ্যস্ত হইতে থাকে, অন্যদিকে তাহাদের মনে প্রখর নীতিবোধও জাগ্রত হয়। ডিরোজিও এইরূপে কলিকাতার ছাত্র সমাজে আদর্শ শিক্ষক হইয়া উঠেন। ছাত্রেরা তাঁহার আদর্শে নিজেদের জীবনগঠনও সুরু করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছেলেরা ইহার ভিতর ছিল এবং ইহাদের দ্বারাই সমাজের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয়। এইখানেই ডিরোজিও-শিক্ষার সার্থকতা'

কিন্তু কিশোর ছেলেরা অনেকে সমাজ সংস্কারের নামে এই সময় কতকটা 'উচ্ছৃঙ্খল' হইয়া পড়িল। প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে কলুষ ও গলদ তাহাদের চোখে বেশি করিয়া ধরা দিল। তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে লড়িতে আরম্ভ করেন। ফল হইল ভীষণ! অভিভাবকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। কলেজ হইতে অনেকে ছেলেদের নাম কাটাইয়া লন। আবার অনেকে কলেজে ছেলে পাঠাইতে বিরত হইলেন। ছাত্রসংখ্যা দ্রুত কমিয়া গেল। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে শহরে অনেক অবিশ্বাস্য গুজব রটিয়া গেল। কলেজে কর্তৃপক্ষ এই সব গুজব প্রমাণ করিতে না পারিয়া কলেজ রক্ষার অছিলায় ডিরোজিওকে অপসারণের নিমিত্ত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। উইলসনের পরামর্শে ডিরোজিও ২৫শে এপ্রিল ১৮৩১ তারিখে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন! বলা বাহুল্য ইহার তখন তখনই গৃহীত হইল। এইরূপে কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু নব্য যুব সমাজের চিত্তে তিনি যে স্বাধীন চিন্তার বীজ ছড়াইয়া দেন তাহা কালে সমাজের পক্ষে বিশেষ হিতকর হয়। তাঁহার ছাত্র শিষ্যদের মধ্যে যাহারা জীবনে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাহাদের কথাই মাত্র আমরা জানি। কিন্তু এমনও বিস্তর ছিলেন যাহারা সাধারণের অগোচরে স্বদেশবাসীর কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন বিবিধ উপায়ে। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে শিক্ষাব্রতী সাহিত্য সাধক সংবাদপত্র সেবী শিল্প-ব্যবসায়ী দায়িত্বপূর্ণ পদে স্থিত উচ্চতম কর্মচারী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহারা নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সত্যপ্রীতি সেবাপরায়ণতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোরতা দুর্নীতি মোচন প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এক কথায় বঙ্গের তথা ভারতের নবজাগরণের সূচনা হয় ডিরোজিও শিষ্যদের দ্বারাই। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে যাহারা পরে বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতিলাভ করেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দ চন্দ্র বসাক, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি।

[৫]

হিন্দু কলেজে প্রদত্ত ইংরেজি শিক্ষার সাফল্যে অনেকেরই এমন কি কৃতবিদ্য ইংরেজদেরও তাক লাগিয়া যায়। ১৮৩০ সনে সমাচার দর্পণ এই মর্মে লিখিলেন যে, বিগত ৫০ বৎসরে যাহা না হইয়াছে, গত ১০ বছরের মধ্যে তাহাই সম্ভব হইল। অর্থাৎ এ দেশীয়েরা ইংরেজি শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং পুস্তক প্রবন্ধাদি রচনায় লিপি-কৌশল বিশেষভাবে দর্শাইতেছে। হিন্দু কলেজের শিক্ষা একদিকে যেমন আমাদের মধ্যে নব-জাগরণের সূচনা করে সেইরূপ কর্তৃস্থানীয় ইংরেজদের মনেও ইহার দরুণ একটি আলোড়ন উপস্থিত হয়। সরকারী শিক্ষানীতি অনুসারে জেনারাল কমিটি সংস্কৃত ও আরবীকেই শিক্ষার বাহন ধরিয়া লইয়া পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান মূলক পুস্তকাদি ঐ দুই ভাষায় অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসার মুষ্টিমেয় ছাত্রদের বাহিরে এই সকল পুস্তক পড়ার লোক বড় একটা মিলিত না। বইপত্র গাদা হইয়া পড়িয়া রহিত। সরকারী অর্থ বরবাদে যাইবার উপক্রম হইল। ইংরেজি শিক্ষার এতাদৃশ উন্নতি দেখিয়া জেনারাল কমিটির একদল সদস্যের মনে এই প্রশ্ন জাগে, প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার বদলে ইংরেজির মাধ্যমেই তো অল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে অধিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রশ্নটি ১৮৩১ সন হইতে জেনারাল কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিশেষ বিতর্ক উপস্থিত করে এবং এক পক্ষ সংস্কৃত আরবীর এবং অপর পক্ষ ইংরেজির অনুকূলে দৃঢ়ভাবে মত ব্যক্ত করিতে থাকেন। তাঁহাদের এই মতানৈক্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়ও আত্মপ্রকাশ করিল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে টমাস 'বেবিংটন্ মেকলে বড়লাট বেণ্টিঙ্কের প্রথম আইন-সচিব হইয়া এদেশে আগমন করেন। মেকলে হইলেন জেনারাল কমিটির সভাপতি। উভয় পক্ষের বাদবিতণ্ডার সমাধান করিতে চেষ্টা না করিয়া মেকলে সরাসরি বড়-লাটকে একখানি মন্তব্য লিপি পাঠাইলেন (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫)। ইহাতে তিনি ইংরেজির সপক্ষে যুক্তি দেখান; সংস্কৃত ও আরবীর বিরুদ্ধে কটুকাটব্যও করিতে দ্বিধা করেন নাই। বড় লাট বেণ্টিঙ্ক মেকলের প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ইংরেজিকে বাহন করার সপক্ষে ১৮৩৫, ৭ই মার্চ একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই অনুসারে যাবতীয় সরকারী বিদ্যালয়ে, অবশ্য সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা মাদ্রাসা বাদে ইংরেজি শিক্ষার বাহন বলিয়া গণ্য হইল।

হিন্দু কলেজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকেও দৃক্‌পাত করা যাক। ডিরোজিওর চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই জুনমাসে প্রধান শিক্ষক ডি' আনসেলস পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন জি. টি. এফ. স্পীড (জুলাই, ১৮৩১)। হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ রাধাকান্ত দেব স্পীড মহোদয়কে একখানি পত্রে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেন যে, হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে যাহাতে কোন কিছু প্রশ্রয় না পায় তাহার দিকে যেন তিনি অবহিত হন। ডাঃ উইলসন ১৮৩২, ডিসেম্বর মাসে কর্ম হইতে অবসর লইয়া স্বদেশ যাত্রার মানস করেন। তাঁহার স্থলে ঐ মাসেই বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ কলিকাতা টাকশালের অ্যাসে মাষ্টার জেমস্ প্রিনসেপকে কলেজের ভিজিটর করা হইল। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে উইলসনকে ২ জানুয়ারি ১৮৩৩ সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের ছেলেরা পৃথক ভাবে মানপত্র ও উপহারাদি প্রদান করেন। হিন্দু কলেজের ছেলেরা উপহার স্বরূপ একটি গাড়ুও দিয়াছিলেন।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই অধ্যক্ষ সভারও কিছু রদ-বদল হয়। এই সনের মার্চ মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুর উত্তরাধিকার সূত্রে কলেজের গবর্ণর হইলেন। অবশ্য তিনি ইহার আগেও অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। এই সময় লাডলি মোহন ঠাকুরের মৃত্যুতে অধ্যক্ষসভার যে স্থান শূন্য হয় তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর অধ্যক্ষ হইলেন। কিশোরী

চাঁদ মিত্র পরবর্তী কালে লিখিয়াছেন যে, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় ও পুনর্গঠন ব্যাপারে দ্বারকানাথ যুক্ত ছিলেন। কলেজের কার্যবিবরণ এবং আনুষঙ্গিক নথীপত্র হইতে ইহার যাথার্থ্য খুঁজিয়া পাই নাই। কোন কোন লেখক মিত্রজার উক্তি অনুসরণ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার পদত্যাগের পরেও যাঁহারা কলেজে পাঠরত ছিলেন তাঁহারা একে একে পাঠ সাঙ্গ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। অন্যতম প্রধান শিষ্য রামতনু লাহিড়ী ১৮৩৩ সনে হিন্দু কলেজেই জুনিয়ার বিভাগেই শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে নাম করা ছাত্রদের মধ্যে দেখি দেবেন্দ্র নাথঠাকুর (মহর্ষি), রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিকে। দেবেন্দ্রনাথ ও রমাপ্রসাদ বাংলা ভাষার চর্চার নিমিত্ত 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা স্থাপন করিয়াছিলেন।

[৬]

ডিরোজিও যুগের পর এইবার আমরা আর একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগে আসিয়া পৌঁছিতেছি। বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হিন্দু কলেজের প্রধান ইংরেজি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। জেনারাল কমিটির সভাপতি মেকলের নিকট তিনি প্রথমে এই পদের প্রার্থী হন। কিন্তু মেকলে তাঁহাকে বলেন যে, নিয়োগ করার অধিকারী কলেজের অধ্যক্ষ সভা। তিনি তাঁহাদের নিকট তাঁহার নাম সুপারিশ করিতে পারেন। মেকলের সুপারিশক্রমে যোগ্য প্রার্থী বিবেচনায় অধ্যক্ষসভা রিচার্ডসনকেই উক্তপদে নিযুক্ত করিলেন। কলেজের পরিচালনা ক্ষমতা এ যাবৎ পুরাপুরি তাঁহাদেরই হাতে ছিল। যদিও সরকারের পক্ষে জেনারাল কমিটি ইহার আর্থিক দায়দায়িত্ব ক্রমেই বেশি করিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। তবে ১৮৩৫, জুলাই হইতে একটি নূতন ব্যবস্থায় অধ্যক্ষ সভার উপরে কমিটির হস্তক্ষেপ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর এই সময় হইতে হিন্দুকলেজ অনেকটা সরকারেরই আওতায় আসিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ উইলিয়ম এডামের এডুকেশন রিপোর্টের কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। এডাম রিপোর্টে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের (যেমন, শ্রীরামপুর কলেজ প্রভৃতি) বিবরণ দেন। কিন্তু মনে হয় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দানপর বলিয়া হিন্দু কলেজের বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই সময় কলেজের ভিজিটর পদ তুলিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরিবর্তে জেনারাল কমিটির কয়েকজন সদস্য কার্যকলাপ তদারকির জন্য অধ্যক্ষ সভায় প্রেরিত হন। সরকার নিয়ম করিলেন অধ্যক্ষ সভার সকল সদস্যই অতঃপর জেনারাল কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন। কিন্তু কাজ চালাইবার জন্য এককালে মাত্র দুই জনই কমিটির সদস্য হইবেন।

রিচার্ডসন ১৮৩৯ সনে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৮৪৩ সনে বিলাত যাত্রার প্রাক্কাল পর্যন্ত। ডিরোজিও যুগের মত রিচার্ডসনের সময়ে বহু ছাত্র ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। রিচার্ডসন তাঁহার ছাত্রদের মনে আশ্চর্য সাহিত্য প্রীতি জন্মাইতে সফলকাম হন। এই সকল ছাত্রদের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার, কবিবর মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ জীবনে বিভিন্ন

বিভাগ ও কর্মে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রাজনারায়ণ এবং ভোলানাথ তাঁহার পাঠনারীতির উল্লেখ করিয়া ভক্তিভরে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আবৃত্তির দ্বারা পঠন-পাঠনে যে কীরূপ অল্প সময়ে সাফল্য লাভ করা যায় রিচার্ডসন তাহার জীবন্ত উদাহরণ। মেকলে পর্যন্ত তাঁহার শেকস্‌পীয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তিনি ভারতের সব কিছু ভুলিলেও তাঁহার আবৃত্তির কথা ভুলিতে পারিবেন না।

রিচার্ডসনের এ দেশে অবস্থান কালে কলেজ পরিচালনায় অনেকটা রকমফের হইল। শিক্ষা বিভাগ ১৮৪০-৪১ সন নাগাদ পুনর্গঠিত হয়। ইহার অনুরূপ আর একটি কমিটি স্থাপিত হইল আগ্রা দিল্লীতে। স্থানীয় কমিটি Council of Education বা শিক্ষা সভা নামে অতঃপর পরিচিত হইতে থাকে। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভাকে এই কাউনসিলেরই একটি সাব কমিটি করা হইল। কলেজে পূর্বে যে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল তাহারও রদবদল হয় এই সময়ে। এখানকার গচ্ছিত সমুদয় তহবিল দ্বারা কয়েকটি সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে। সিনিয়র বৃত্তির পরিমাণ ৩০৲ টাকা ও ৪০৲ টাকা। প্যারীচরণ সরকার ১৮৪১-৪২ সনে সর্বপ্রথম ৪০৲ সিনিয়র বৃত্তি পান। রাজনারায়ণ বসু পান ৩০৲ টাকা। এই বৃত্তি লাভের পর কয়েক বৎসরকাল ছেলেরা কলেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে গণ্য হইতেন এবং তাঁহারা বিদ্যার চর্চায় লিপ্ত থাকিতে পারিতেন। তখন ছাত্রদের লাইব্রেরি মেডাল বা গ্রন্থাগার-পদক দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কি বিষয়ে প্রশ্ন থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিবিধ বিষয়ের পুস্তকাদির উপরে প্রশ্ন থাকিবার কথা। ঐ পদক পাইবার জন্য ছেলেদের খুবই পরিশ্রম, তথাপি উৎসাহের অন্ত নাই। রাজনারায়ণ বিদ্যাবত্তার সম্যক পরিচয় দিয়া পদক লাভ করিয়াছিলেন। কলেজ পরিচালনায় দ্বৈতকর্তৃত্ব ক্রমে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যদের মধ্যে বিরোধ টানিয়া আনিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে এক একটি কারণ উপস্থিত হইলে এই বিরোধ বড় পাকিয়া উঠিত। কলেজের পরবর্তী ইতিহাস অনেকটা এই বিরোধেরই কাহিনী।

[৭]

কিন্তু ইহার কথা বলিবার পূর্বে আর দুই একটি বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেন্টিঙ্কের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ইংরেজি স্কুল ও ইংরেজি পড়ার ধুম পড়িয়া যায়। ইহার প্রতি আরও লোকে ঝুঁকিল যখন তাহারা জানিতে পারে ইংরেজি শিখিলেই রাজসরকারে চাকুরি পাওয়া যাইবে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি মৃত। হিন্দু কলেজে বাংলা শিক্ষার আয়োজন থাকিলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মাতৃভাষা বাংলা চর্চার সুবিধা কি রূপে করা যায় সে বিষয়ে ভাবিতে লাগিলেন। ইহার ফলশ্রুতি বাংলা পাঠশালা বা হিন্দু কলেজ পাঠশালা। বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের হাতার মধ্যে এই পাঠশালার জন্য একটি ভবন নির্মিত হয়। ইহার শিলান্যাস করেন ডেভিড হেয়ার। ১৮৪০, ১৮ জানুয়ারি পাঠশালার কার্য আরম্ভ হইল। এই দিন অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলে আমাদের যে কত উপকার সে বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। এখানে ইংরেজি পড়াইবার রীতি ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য বই সমুদয়ই বাংলায় রচিত হইতে লাগিল। সরকার ১৮৪৪ সনের শেষ দিকে বঙ্গ দেশে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে ১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন তাহার মূলে হিন্দু কলেজ পাঠশালাই যে প্রেরণা

জোগাইয়াছিল তাহা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের চত্বরটি কলেজ কর্তৃপক্ষ পাদ্‌রিদের নিকট হইতে কিনিয়া লন। তাঁহারা উহাদিগকে ইহার পরিবর্তে হেদুয়ার পশ্চিম দিকে গীর্জা স্থাপনের নিমিত্ত একখণ্ড ভূমি জোগাড় করিয়া দেন। কেন তাহারা এইরূপ করিলেন তাহা এক বিচিত্র কাহিনী: এখানে বলিবার অবকাশ।

হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে আর একটি ইংরেজী বিদ্যায়তনের কথাও এখানে বলা আবশ্যক। স্কুল সোসাইটি উঠিয়া গেলে পটলডাঙ্গা স্কুল ডেভিড হেয়ারের কর্তৃত্বাধীনে আসে। এটি ছিল অবৈতনিক বিদ্যালয়। হেয়ার সাহেব ইহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতেন। বিদ্যালয়টি ক্রমে হিন্দু কলেজের "Feeder" স্কুলে পরিণত হয়। অর্থাৎ এখানকার পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা প্রায় সকলেই কলেজের সিনিয়র বিভাগে ভর্তি হইত। হেয়ারের মৃত্যুর (১লা জুন ১৮৪২) পর সরকার পক্ষে শিক্ষা-সভা ইহার ভার পুরাপুরি গ্রহণ করেন। এই স্কুল এ সময়ে হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল বা শুধু ব্রাঞ্চ স্কুল নামে আখ্যাত হইতে থাকে। পরে ইহার নাম হয় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। ১৮৬৭ সনে এই স্কুলটি হেয়ার স্কুল নাম পরিগ্রহ করে। বর্তমানে ইহা প্রেসিডেন্সি কলেজেরই অঙ্গীভূত।

যে কথা বলিতেছিলাম। দ্বৈত কর্তৃত্ব হেতু কলেজের অধ্যক্ষ সভা ও শিক্ষা-সভার মধ্যে খিটিমিটি লাগিয়াই থাকিত। এই দশকের শেষ দিকে ইহা বড়ই বাড়িয়া যায়। ১৮৪৮ সনে কলেজের অষ্টম শিক্ষক কৈলাশচন্দ্র বসু খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এই বিষয়টি লইয়া অধ্যক্ষ সভায় য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে খুবই বিতর্ক উপস্থিত হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর য়ুরোপীয়দের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের বাসনা করিলেন, পর বৎসর আর একটি বিষয় লইয়া আবার গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। ১৮৪৯ সনে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র গুরুচরণ সিংহ খ্রীষ্টান হইয়া যায়। হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন ছাত্রদের এখানে রাখা নিষিদ্ধ, এই মৌল নীতির নিরিখে হিন্দু অধ্যক্ষগণ আপত্তি তুলিলেন। গুরুচরণকে কলেজ ছাড়িতে হইল। কিন্তু এই ব্যাপারটি লইয়া কলেজের অধ্যক্ষগণ এবং শিক্ষাসভার তৎকালীন সভাপতি বেথুন সাহেবের মধ্যে ঘোরতর বাদানুবাদ শুরু হয়। রাধাকান্ত দেব ও বেথুনের মধ্যে বিতণ্ডা এত উগ্র হইয়া উঠিল যে রাধাকান্ত নিজেই ১৮৫০, জুন মাসে কলেজের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন। প্রতিষ্ঠাবধি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর তিনি এই কলেজ পরিচালনায় ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিয়া ইহার উন্নতি বিধানে কতই না যত্ন লইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় লইয়াও ১৮৪৯ সনে হিন্দু সমাজের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপটেন রীচার্ডসনকে লইয়া এই চাঞ্চল্য। বেথুন সাহেব তাঁহার কতকগুলি আচরণের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। রীচার্ডসন এগুলি ব্যক্তিগতবিধায় জবাবদীহি করা সমীচীন বোধ না করিয়া একেবারে অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিলেন। ছেলেরা রীচার্ডসনের খুবই অনুরক্ত। তাহারা ইহাতে যারপর নাই বিক্ষুব্ধ হইল এবং প্রকাশ্য সভা করিয়া রীচার্ডসনের প্রতি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সমাজ নেতৃবর্গও সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া তাঁহার গুণপনার বিশেষ প্রশংসা করেন। বেথুন পরবর্তী হিন্দু কলেজের পুরস্কার-বিতরণী উৎসবের সময় ছাত্রগণকে এ কারণ ভৎর্সনা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। এই ব্যাপারে যেমন অভিভাবক তেমনি ছাত্রদের মধ্যেও বেথুন তথা শিক্ষাসভার প্রতি বিরাগ বৃদ্ধি পাইল।

হিন্দু কলেজ অতি দ্রুত সরকারী আওতায় আসিয়া পড়িতেছিল। সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। হিন্দু অধ্যক্ষেরা তো প্রতিদিনই খুব ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে লাগিলেন। ১৮৫৩ সনের প্রথম দিকে হীরাবুলবুল নাম্নী জনৈকা পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে বিনা দ্বিধায় কলেজে ভর্তি করা হইল। এই ব্যাপারটি লইয়া হিন্দু সমাজে ভয়ানক সোরগোল উপস্থিত হয়। নেতৃবর্গ শিক্ষা সভার কার্যের প্রতিবাদে ১৮৫৩, ২মে হিন্দু মেট্রোপলিটান

কলেজ স্থাপন করেন। পরিচালক সভার সভাপতি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। কলেজের অধ্যক্ষ সভার হিন্দু সদস্যগণ, যেমন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আশুতোষ দেব, এই সভায়ও যোগ দিলেন। শিক্ষা সভার শীঘ্রই টনক নড়ে। উক্ত ছেলেটিকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। সরকার তথা শিক্ষাসভার অভিপ্রায় এই সময় খুবই প্রকট হইয়া পড়িল। তাঁহারা হিন্দু কলেজটিকে সর্বজনগণ্য বিদ্যায়তনে পরিণত করিতে চান। অধ্যক্ষগণের পক্ষে ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তাঁহারা অতঃপর আর সরকারী ইচ্ছায় বাদ সাধিলেন না। ১৮৫৪ ১১ মে অধ্যক্ষগণের শেষ সভা হইল। এখানে গৃহীত একটি প্রস্তাবে অধ্যক্ষ সভা রহিত হইয়া গেল। কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সম্পাদক রসময় দত্তের নিকট হইতে কার্যভার গ্রহণ করেন।

সরকারী কর্তৃপক্ষ কলেজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। সিনিয়র ভাগ হইল প্রেসিডেন্সি কলেজ, জুনিয়ার বিভাগের নাম দেওয়া হয় হিন্দু স্কুল। বিলাতের ডিরেকটরসভার অনুমোদন সাপেক্ষে ১৮৫৪, ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ বিভক্ত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। নূতন কলেজে একশত এক জন ছাত্র ভর্তি হয়। তাহার মধ্যে ২জন ছিল মুসলমান। ডিরেকটর সভার অনুমোদন আসিয়া পৌঁছিলে ১৮৫৫, ১৫ জুন কলেজের দ্বার আনুষ্ঠানিক ভাবে সবসাধারণের নিকট উন্মোচিত হইল। হিন্দু স্কুল হিন্দু কলেজের মৌল নীতি সমূহ অনুসরণ করিবার অধিকার পাইল। দুইটিই কিন্তু এই সময় হইতে শিক্ষা সভার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে আসে। বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ হিন্দু কলেজ আজ ইতিহাসের বস্তু।

বন মর্মর

কুমারলাল দাশগুপ্ত

সূর্য উঠেছে মাথার উপর। মিতু হাটে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। ছোট্ট একখানা টিনের আয়না হাতে নিয়ে কাঁধ পর্যন্ত পড়া বড় বড় চুলগুলো যত্ন করে আঁচড়ে নেয়, তাতেই তার প্রসাধন, সাজসজ্জা সব কিছু শেষ হয়ে যায়। পরনে ছোট্ট একটু কাপড়, উঠেছে হাঁটুর উপরে। সারা গায় আর কোথাও বসন বা ভূষণের বালাই নাই। সাঁওতালের ছেলে মিতু, বয়স বিশ কি বাইশ, কুচকুচে কালো রং, দীর্ঘ সবল দেহখানিতে যৌবনের শ্রী. মুখে একটা অপূর্ব কমনীয়তা।

পাহাড়ের মাথায় একটা মস্ত অর্জুন গাছ, তার নীচে একখানা মাত্র খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট ঘর, সামনে পরিচ্ছন্ন একটু আঙিনা, আশে পাশে দুচারটে বনশিউলির গাছ। মিতুর যে পূব পুরুষ এইখানে ঘর বেঁধেছিল সে নিশ্চয় কবি ছিল। ঘরের আঙিনায় দাঁড়ালেই চোখে পড়ে এক আশ্চর্য দৃশ্য. চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল অরণ্যঢাকা পাহাড় আর পাহাড়। একটা নদী এঁকেবেঁকে পাহাড়তলি দিয়ে দূরের দিকে চলে গেছে, কোথাও বালুময় একটা বাঁক, কোথাও খানিক জল রোদে ঝলমল করে। মানুষের আর বাস নাই, এ কেবল পশুপাখীর দেশ।

একসময় এখানে একটা সাঁওতাল পল্লী ছিল। সে অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা। সাঁওতাল ছিল তখন অরণ্যের সন্তান, পশুপাখীর ছিল তারা সহচর। অরণ্যই দিতো তাদের অন্ন, অরণ্যই দিতো বস্ত্র, অরণ্যই দিতো হাসি, দিতো গান, দিতো ভালবাসা। তারপরে ধীরে ধীরে সভ্য জগতের সঙ্গে ঘটতে থাকে তাদের পরিচয়। সে জগত তাদের মত নয়, সেখানকার মানুষ যেন অন্যরকম। একখানি কুঁড়েঘর, একটু পশুপাখীর মাংস আর একগোছা বনের ফুলে তারা খুশী হয় না। তারা অনেক চায়, তৃপ্তি নাই কিছুতেই। বসনে ভূষণে তারা দেবতার মতই ঝলমল করে। একটি একটি করে মন্ত্রমুগ্ধ সাঁওতাল-পরিবার সভ্যসমাজের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছোয়, কয়লা খাদের অথবা কারখানার হয় কুলী। পাহাড়ী ঝরণার স্বচ্ছ জলধারা শহরের আবর্জনায় কলুষিত হয়ে ওঠে।

সবাই পাহাড় ছেড়ে চলে যায়, যায় না কেবল মিতুর বাপ। সে ভালবাসে পাহাড় আর বনকে, সে ভালবাসে তার চিরপরিচিত পশু আর পাখীকে, পূর্বপুরুষের ভিটে আঁকড়ে সে পড়ে থাকে। মিতু যখন শিশু তখন তার মা মরে যায়। বাপ তাকে মানুষ করে তোলে। ধীরে ধীরে সে বড় হয়ে ওঠে, একটা তরুণ শালগাছের মতই শক্ত আর সরল হয় তার দেহ, অব্যর্থ হয় তার তীরে লক্ষ্য। বাপের মতই সে হয় ওস্তাদ শিকারী।

গতবছর বাপ যখন মারা যায় তখন মিতু জীবনে প্রথম অসহায়বোধ করে। এতদিন সে একা বোধ করেনি, হঠাৎ তার অত্যন্ত একা বোধ হয়। সামলে উঠতে বেশীদিন লাগেনি। শৈশব থেকে যে বন তার খেলাঘর, যে পশুপাখী তার সঙ্গী, তাদেরই সে আপনার বলে গ্রহণ করে। সারাদিন বনে বনে বেড়ায়, পাখীর গান শোনে, শিকার করে : সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে উনুনে হাঁড়ি চাপায়। রাত ঘনিয়ে এলে ঘরের দরজায় বসে বাঁশী বাজায়। আনন্দে কেটে যায় দিন।

মিতুর ঘর থেকে সাত মাইল দক্ষিণে পাহাড় আর বন যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কয়েকবছর থেকে একটা কয়লার খাদে কাজ চলছে। সেখানে বহু লোকের বসতি, দোকান পাট অনেক, ছোট একটা শহর বলা চলে। সপ্তাহে একদিন করে হাট বসে সেখানে। আশপাশের গাঁয়ের লোক হাটে যায় কেনা-বেচা করতে। মিতুও মাঝে মাঝে কিছু না কিছু বনের বেসাতি বেচতে হাটে যায়। যা পায় তা দিয়ে চাল, নুন তামাক, হয়ত একটা ম্যাচবাক্স কিনে তার অরণ্যলোকে ফিরে আসে।

সেদিনও সে হাটে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। প্রসাধন শেষ করে ঘর থেকে একটা বাঁশের খাঁচা বের করে আনে, তাতে রয়েছে দুটো তিতির। ঘরের দরজায় ঝাঁপ লাগিয়ে এক হাতে ধনুক আর এক হাতে তিতির সমেত খাঁচা নিয়ে সে পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসে। পাহাড়ের নীচেই নদী, অতি ক্ষীণ একটি জলধারা একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে, আর সব বালুচর। এই নদীই মিতুর পথ

দুপাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে নদী চলেছে ঘুরে ঘুরে। পাহাড়ের গায় গাঢ় জঙ্গল। ফাল্গুন মাস, রুক্ষ পাহাড়ের চেহারা বদলে গেছে, তার গায় লেগেছে সবুজ ও লালের ছোপ। শালের ডালে গজিয়েছে সবুজ কচি পাতা। মাঝে মাঝে লাল ফুলে ঢাকা পলাশ গাছ। পাখীর ডাকাডাকির অন্ত নাই। টিয়ার ঝাঁক উড়ে যায় এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে। মিতু চলে দক্ষিণমুখো। বাঁকের পর বাঁক ঘুরে সে চলে। দুপুর পার হয়ে যায়. মিতু একবারও থামে না, শক্ত পা দুটো তার ক্লান্ত হয় না। সামনের বাঁকে আর একটা নদী এসে মিশেছে পূব থেকে। বড় একটা দ পড়েছে সেখানে, অনেকখানি জল রোদে ঝকমক করছে। কয়েক আঁজলা জল খেয়ে একটা পাথরের উপর বসে মিতু। খানিক পরে উঠে নদী ছেড়ে বনের পথ ধরে। মাইলখানেক পথ গেলেই দেখা যায় কয়লাখাদের কলকারখানা আর ঘর বাড়ী। পথ এখানে নির্জন নয়, হাটের দিকে দলে দলে চলেছে গাঁয়ের লোক। সামনেই বাজার, পাশে একটা আমবাগানে বসেছে হাট। গাছের ছায়ায় দোকানী বসেছে দোকান সাজিয়ে। চাল, ডাল, নুন তেল কাপড়, মনিহারী, সব জিনিষেরই চলছে বেচা-কেনা। মেয়ে পুরুষের ঠেলাঠেলি ভিড়, কলরবও সেই পরিমাণ।

হাটে এসে তিতির দুটো বেচে দিয়ে মিতু মুদির দোকানের দিকে এগোয়। সেরখানেক নুন আর এক পাতা খৈনি তামাক কিনতে হবে তার। তামাক পাতার দোকানে এসে কড়া দেখে একপাতা তামাক সে বাছে। এমন সময় পাশথেকে কে যেন বলে" মিতু নাকি রে?" ঘুরে দাঁড়িয়ে মিতু দেখে বড়কু মাঝি। হেসে জবাব দেয় মিতু "আমাকে চিনেছো বড়কু মাঝি?"

"চিনবো না কেন" বলে বড়কু মাঝি "গতবছর তোকে হাটেই দেখেছিলাম তোর বাপের সঙ্গে। আমাদের আগেই সে চলে গেল রে!"

বাপের বন্ধু বড়কুমাঝি একসময়ে জঙ্গলে তাদের পল্লীতেই বাস করতো। সে প্রায় বার বছর আগেকার কথা। বড়কু তার ছেলে আর ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে চলে আসে কয়লার খাদে। এখন তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে, পুরো ধুতি পরে, জামা গায় দেয়, জুতোও দেয় পায়।

বড়কু বলে "এইবার জঙ্গল ছেড়ে চলে আয় মিতু। একা একা ওখানে আর কেন রয়েছিস।"

"ভাল লাগে বলেই রয়েছি" হেসে বলে মিতু।

মাথা নেড়ে বড়কু বলে" তোর বাবাও ঐ কথা বলতো। পরনে কাপড় নাই, গায় বস্ত্র নাই, তীর ধনুক নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানো, ঐ কি মানুষের মত থাকা রে? নিজের চেহারাখানা তুই যদি দেখতে পেতি তা হলে বুঝতি"।

কথাটা শুনে পাশথেকে কে যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে। আশ্চর্য হয়ে মিতু দেখে ষোল সতর বছরের একটি মেয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। দেখেই মিতু বোঝে, সে সাঁওতালের মেয়ে, কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ মোটেই সাঁওতালের নয়। মাথার চুল খোঁপা করে বাঁধা, গায় লালরংএর কুর্তা, পরনে চওড়াপাড় শাড়ী, গলায় রূপোর হাঁসুলি, হাতে কাঙনা।

হাসামুখর মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বড়কু বলে "থাম ময়না, চল, চাট করা এখনও বাঁকি।" জুতো মস মস করে বড়কু চলে যায়, পিছনে যায় ময়না।

তামাক পাতা কিনে হাটে আর একটা পাক দিচ্ছে মিতু এমন সময় এসে সামনে দাঁড়ায়। পাশ কাটিয়ে যেতে চায় মিতু। ময়না পথ ছাড়ে না, বলে "একটু দাঁড়া, একটা কথা বলবো তোকে।"

মিতু বলে "কি কথা?"

ময়না বলে "আমি হেসেছি বলে তুই রাগ করলি নাকি?" একটু চুপ করে থেকে মিতু বলে "না রাগ করি নি। আমি জংলী, আমাকে দেখে তুই হাসবিই তো"।

মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর করে ময়না বলে 'তুই রাগ করেছিস। আমার হাসাই রোগ, যখন তখন হাসি। তুই রাগ করিস নে।'

শুনে হেসে ফেলে মিতু, বলে 'তুই বুঝি বড়কু মাঝির মেয়ে?"

মাথা নেড়ে ময়না বলে "হুঁ।"

"তোরা যখন বনছেড়ে চলে আসিস্ তখন তুই ছোট্ট ছিলি। তোর কথা আমার বেশ মনে পড়ে" বলে মিতু।

"আমারও তোর কথা মনে পড়ে, গাছ থেকে টিয়াপাখীর ছানা পেড়ে দিতি, হেসে বলে ময়না।

"বড়কু মাঝির সঙ্গে না দেখলে আর তোর নাম না শুনলে তোকে চিনতেই পারতাম না। কত বড় হয়েছিস তুই, আর"...কথাটা শেষ করে না মিতু।

"আর কি?" মিতুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে ময়না। একটু থেমে মিতু বলে "আর কত সুন্দর"।

খিল খিল করে হেসে ওঠে ময়না, বলে "তুইও কত বড় হয়েছিস্, কত লম্বা হয়েছিস, জোয়ান হয়েছিস্"।

"কিন্তু জামা আর জুতো পরা শিখিনি" বলে মিতু হাসে। ময়নাও হাসে।

মিতু বলে "আমি আর দাঁড়াবো না, বেলা পড়ে আসছে। সাত মাইল পথ যেতে হবে।"

পথ ছেড়ে দেয় ময়না, বলে "যা। সামনের হাটে আসিস। আসবি তো ?"

"আসবো" বলে মিতু।

—ভুলে যাসনা কিন্তু।

—না ভুলবো না।

মিতু এগোয়। একবার পিছন ফিরে দেখে, ময়না সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই ঘরে এসে পৌঁছোয় মিতু।

আগামী হাটের দিনের প্রতীক্ষায় সপ্তাহের সাতটা দিন তার বড় তাড়াতাড়ি কেটে যায়। সকাল বেলা নদীথেকে কাপড় কেচে নেয়ে আসে, আয়না সামনে ধরে যত্নকরে চুল আঁচড়ায়। দুপুর হবার আগেই সে বেরিয়ে পড়ে হাটের পথে। ফাঁদ পেতে ধরা দুটো খরগোশ ঝুড়িতে করে সঙ্গে নেয়।

চলতে চলতে নদীর এক বাঁক থেকে ফুলেভরা পলাশের একটা ডাল ভেঙ্গে ঝুড়িতে রাখে।

হাটে এসে মিতু ভিড় ঠেলে বড়কু আর ময়নাকে খুঁজে বেড়ায়। লাল কুর্তা পরা মেয়ের অন্ত নাই, বারে বারে সে ভুল করে। শেষে হাল ছেড়ে দাঁড়ায় একটা গাছের নীচে। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার হাতখানা ধরে টানে। চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে মিতু দেখে সে ময়না।

মিতু বলে "সেই থেকে হাটময় তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"তুই খুঁজছিস আমাকে, আমি খুঁজছি তোকে" হেসে বলে ময়না। আজ ময়নার পোশাকের পারিপাট্য একটু যেন বেশী। খোঁপায় একটা লাল ফিতে বাঁধা। কপালে রূপোলী টিপ।

ময়না বলে "কেনা-কাটি শেষ করেছিস ?"

মিতু বলে "দুটো খরগোশ বেচেছি। কেনার কিছু নাই আজ।"

ময়না বলে "তাহলে চল হাটের বাইরে ঐ আমগাছটার নীচে বসে গল্প করি। হাটের ঠেলাঠেলি আর হৈচৈ আমার ভাল লাগে না। দুজনে আমগাছের তলায় গিয়ে বসে। মিতুর ঝুড়িতে পলাশের ডালটা দেখে ময়না বলে "কি সুন্দর পলাশ ফুল। কার জন্যে এনেছিস মিতু।

মিতু হেসে বলে "তোর জন্যে।" ডালটা তুলে দেয় ময়নার হাতে। ময়না ফুলগুলো যত্নকরে খোঁপায় গোঁজে। মিতু ময়নার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ময়না বলে "কি দেখছিস ?"

মিতু বলে "কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে।"

ময়না মুখ ঘুরিয়ে বলে "যাঃ, মিছে কথা।"

গল্প আর হাসিতে কেটে যায় সময়। পাতার ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত বেলার রোদ এসে মুখে পড়তেই উঠে দাঁড়ায় মিতু, বলে "যাবার সময় হোল।" ময়নাও উঠে দাঁড়ায়, বলে "চল, তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

চলতে চলতে ময়না বলে "অনেকখানি পথ, যেতে তোর কষ্ট হয়।"

মাথা নেড়ে মিতু বলে "না। পা দুটো আমার বেশ শক্ত। মোটে তো সাত মাইল পথ।"

একটু কাছে সরে এসে ময়না বলে "তুই কেমন করে একা একা থাকিস আমি তাই ভাবি।"

একা একা ! একা তো থাকিনে, আমার কত সাথী-সঙ্গী, কত পাড়া-পড়শী" বলে মিতু ।

অবাক হয়ে ময়না বলে "কারা আবার তোর পাড়াপড়শী ?"

মিতু বলে "শুনবি তাদের নাম ? তিলকী, টুশী, কুশী, নান্দা, রিমির, মারাং ।"

এতগুলো নামশুনে হেসে ফেলে ময়না, বলে "তিলকী আবার কে, টুশী কুশী আবার কে ?"

মিতু বলে "তিলকী আমার বঁধু, এক পাহাড়েই থাকি দুজনে। ছোটবেলা ওর মা মরে যায়, আমি ময়ূর মেরে, তিতির মেরে খাইয়ে ওকে বাঁচাই। সেই থেকে আমাদের ভাব। কি সুন্দর দেখতে। খুব ভালবাসে আমাকে।"

ভুরু কুঁচকে ময়না বলে "তোকে ভালবাসে সে আবার কে ?"

মিতু বলে "সে একটা চিতেবাঘিনী।"

শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠে ময়না। মিতু বলে "টুশী আর কুশী দুটি টিয়াপাখী। তারা থাকে আমার আঙিনার অর্জুন গাছে। ডাকলে কাঁধে এসে বসে হাত থেকে খাবার খায়।

"আর নান্দা" প্রশ্ন করে ময়না।

"সে আমার পড়শী, থাকে পাহাড়ের নীচে" বলে মিতু। "আমার মত তারও জন্ম এই পাহাড়ে। আমি আর সে সমবয়সী। ছোট বেলা থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। জঙ্গলের দেশেই দুজনে বড় হয়ে উঠেছি। সে এখন আমার চেয়েও জোয়ান, আমার চেয়েও মাথায় অনেক উঁচু।

অবাক হয়ে ময়না বলে "সে আবার কে ?"

মিতু বলে "বলছি শোন। সময় পেলেই আমি তার কাছে গিয়ে বসি। এখন সে খুব বড় লোক হয়েছে। ফাল্গুন মাসে তার মস্ত আঙিনা ফসলে ভরে যায়। বড় দাতা সে, যে চায় তাকেই সে আঁচল ভরে দেয়। পশুপাখী কেউ বাদ যায় না।"

একটা ঠেলা দিয়ে ময়না বলে "কে সে বলনা।"

মিতু বলে "সে একটা মহুয়া গাছ।"

শুনে হেসে লুটিয়ে পড়ে ময়না। হাসি থামলে বলে "আমার বড় দেখতে ইচ্ছে হয় পাহাড় আর বন আর তোর ঘর। ছোট বেলার কথা একটু একটু মনে পড়ে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, প্রায় স্বপ্নের মত সব।"

চলতে চলতে মিতু থেমে যায়, বলে "একদিন যাবি আমার সঙ্গে আমার ঘরে ?"

"যাব" বলে ময়না।

যেখানে সড়ক থেকে বেরিয়ে গেছে জঙ্গলমুখো পায়েচ-লার পথ, সেখানে এসে মিতু বলে "এবার তুই ফিরে যা ময়না।" ময়না বলে "আর একটু যাই।"

মিতু বলে "না, সামনে জঙ্গলের পথ, তোর ফিরতে কষ্ট হবে।"

ময়না সেইখানে দাঁড়ায়। মিতু এগিয়ে যায় বনের দিকে।

ফাল্গুন শেষ হয়ে চৈত্র পড়েছে। আজকাল বনে বনে ফুল খুঁজে বেড়ায় মিতু। তীর ধনুকের চেয়ে বাঁশীর প্রতি টান হয়েছে বেশী। প্রত্যেক সপ্তাহেই হাটে যায় সে।

একদিন প্রতিবেশী উতুম মাঝি বড়কুমাঝিকে বলে "তোর মেয়ের বুঝি বিয়ে ?" বড়কু বলে "হ্যাঁ বিয়ের কথা হয়েছে। মতির সঙ্গে বিয়ে দেব। আড়াইশ টাকা পণ দেবে বলেছে।"

বড়কুর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি উতুম বলে" বর পালটে গেছে দোস্ত।" হেসে বড়কু বলে "কি যে বলো ভাই।"

উতুম বলে "যা বলি তা ঠিক বলি। তোর মেয়ে নিজেই বর পছন্দ করেছে।"

আশ্চর্য হয়ে বড়কু বলে "সে আবার কে ?"

উতুম বলে "মিতু মাঝি।"

রাত্রে বড়কু ময়নাকে প্রশ্ন করে "যা শুনছি তা কি ঠিক ?" অনেকক্ষণ জবাব দেয় না ময়না, শেষে, বলে হঁ্যা।" মিতু বলে ঐ ছোঁড়াটাকে তুই বিয়ে করবি ? জঙ্গলে থাকে, শিকার করে খায়, ওটা কি মানুষ ! না, তা হবে না। আমি মতির সঙ্গে তোর বিয়ে ঠিক করেছি। খুব ভাল ছেলে। একটু মদ খায়, তা খাক, মদ আজকাল সবাই খায়।"

মাথা নীচু করে বসে থাকে ময়না, কথা বলে না।

বড়কু বলে "মতিকে আমি পাকা কথা দিয়েছি।"

এতক্ষণে ময়না কথা কয়, বলে "মতিকে আমি বিয়ে করবো না।

রেগে বড়কু বলে "কেন ?

ময়না বলে "তুই মিতুর বাপকে কথা দিয়েছিলি মিতুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিবি।"

হো হো করে হেসে উঠে বড়কু বলে "সেই কথা ! তখন আমরা জঙ্গলে থাকতাম, তোর বয়স ছিল চার কি পাঁচ আর ঐ ছোঁড়ার বয়স ছিল সাত আট। কথাটা তামাশা করে বলেছিলাম। আজ সে কথার কোন দামই নাই।

ময়না জবাব দেয় না, চুপকরে বসে থাকে। বড়কু গলা চড়িয়ে বলে "মতিকে আমি পাকা কথা দিয়েছি, সে কথার নড়চড় হবে না। ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে তুই আর দেখা করবি নে। হাটের দিন ছোঁড়া এদিকে এলে আমি আচ্ছা করে ধমকে দেবো।"

সারা হাট খুঁজে খুঁজে মিতু যখন ময়নাকে দেখতে পায় না তখন কেন যেন একটা ভয় তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে আসে। আমগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে কি করবে ভাবছে এমন সময় বড়কু মাঝি আর মতি এসে তার সামনে দাঁড়ায়। তাদের ভাব দেখে মিতু বোঝে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই বড়কু রুক্ষ ভাবে বলে "তুই ময়নার পেছনে পেছনে ঘুরিস কেনরে ? ভেবেছিলাম তুই বড় সাদাসিধে, তা নয় দেখছি। এই মতির সঙ্গে ময়নার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কালই ওদের বিয়ে হবে। ফের যদি তুই ময়নার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবি তাহলে বিপদে পড়বি।" যেমন দাপটের সঙ্গে আসে বড়কু মাঝি, তেমনি দাপটের সঙ্গে সে চলে যায়। মতিও যায় তার পিছনে পিছনে।

ঘরে ফেরার পথ আজ মিতুর কাছে বড় দীর্ঘ মনে হয়। পাদুটো যেন চলে না। অবসাদে দেহ-মন যেন অবশ হয়ে আসে। অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে সে অন্ধকার আঙিনায় বসে পড়ে।

পরদিন ঘর ছেড়ে বেরোয়না মিতু। শিকারে যাবার ইচ্ছাও তার নাই। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে, দূরে ময়ূরের ডাক থেমে যায়। বনস্থলী নীরব হয়ে আসে, মিতু তখন ঘরের আঙিনায় চুপকরে বসে থাকে। পাহাড়তলির ঘন অন্ধকারের মত তার মনও অন্ধকার। রাত বাড়ে। অনেক দূরে একটা ভয়ার্ত পশু একবার মাত্র ডেকে থেমে যায়। দমকা বাতাস অর্জুনগাছের পাতায় নিঃশ্বাস ফেলে। খানিক পরে পাহাড়ের আড়াল দিয়ে খণ্ড চাঁদ উঁকি মারে।

হঠাৎ যেন জেগে ওঠে মিতু। এখন বুঝি বড়কু মাঝির ঘরে ভিড় জমেছে, সেজেগুজে মতির পাশে দাঁড়িয়েছে ময়না, মাদল আর বাঁশী বাজছে, মেয়েরা নাচছে আঙিনায়। না, এসব কথা ভাবতে চায় না মিতু, এ সব ভুলে যেতে চায়। একটা অসহ্য ব্যথায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

ধীরে ধীরে চাঁদ আরো উপরে ওঠে। পাহাড়ের কোলে, গাছের মাথায় মাথায়, পাহাড়তলির আঁকা বাঁকা বালুময় নদীটির বুকে জ্যোৎস্না ঢেলে পড়ে। হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসে। মিতু শোনে, ভাবে এ কোন জানোয়ারের আওয়াজ? এত কাল সে বনে কাটিয়েছে, বনের প্রত্যেক পশুপাখীর আওয়াজ সে চেনে। এতো সে রকম নয়! কান পেতে থাকে মিতু। অনেকক্ষণ কেটে যায়। আবার আসে সেই আওয়াজ। এবার মিতু বোঝে এ মানুষের গলা। হয়তো কোন পথিক বাঘ ভালুকের হাতে পড়েছে। লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে কুড়ুলখানা নিয়ে পাহাড় থেকে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসে মিতু। নদীতে নেমে সে আবার কানপেতে শোনে। আর কোন আওয়াজ সে শুনতে পায় না। তবু সে নদীর পথধরে এগোয়। একটা বাঁক ঘুরে যেতেই সে আবার শোনে আওয়াজ, এবার অনেক কাছে, স্পষ্ট মানুষের গলা। তাড়াতাড়ি চলে মিতু, হাঁক দিয়ে বলে "কে তুই। ভয় নাই, আমি আসছি।"

ফুট ফুটে জ্যোৎস্না, দূরের জিনিষ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। সামনে নজর রেখে আর এক বাঁক ঘুরে যায় মিতু। হঠাৎ তার চোখে পড়ে নদীর মাঝখান দিয়ে কে যেন ছুটে আসছে। মিতু দাঁড়ায়, চেঁচিয়ে বলে "কে, কে তুই?"

জবাব আসে "মিতু, আমি ময়না, আমি যে আর চলতে পারছি নে।

হুড়মুড় করে ছুটে যায় মিতু। দুখানি কম্পিত বাহু তাকে জড়িয়ে ধরে।

মুখের দিকে তাকিয়েও বিশ্বাস হয় না মিতুর, বার বার বলে "সত্যিই তুই ময়না, বল, সত্যিই তুই ময়না?"

ময়নার দুই চোখে জল, সে হাসতে হাসতে বলে "সত্যিই আমি ময়না। মিতু আমি যে তোর, আমাকে কেমন করে ধরে রাখবে ওরা। আমি এসেছি।"

সমস্ত দেহমন দিয়ে মিতু অনুভব করে ময়না এসেছে। আকাশের মাঝখানে চাঁদ ঝলমল করে।
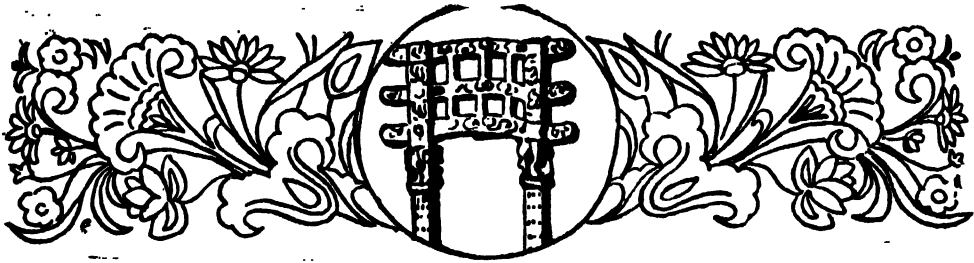
হৈমন্তী

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বর্ষা হয়েছে শেষ।
মেঘ নাই ধূসর আকাশে:
এসেছে আশ্বিন।
ঘাসে ঘাসে শিশিরের ভীরু পদক্ষেপ।
নিরস দিনের গান
শ্রান্ত ডানা মেলি উড়ে যায় একে একে।
আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ—
দুপাশে সবুজ ধান
এলায়িত কুন্তল-কান্তারে সীমান্তের মতো
ক্ষুধাতুর সরীসৃপ যেন,
ক্ষীণ পথরেখা, নিঃশব্দে ঝিমায়!
জনহীন!
রাখাল ফিরেছে ঘরে,
গোধূলির গৈরিক ধূলায়
আবীরের রঙ!
উদয়াস্ত দুটি তটে রক্তিমের সীমারেখা;
মৃত্যু ওষ্ঠ শিহরিয়া
হতাশ নিঃশ্বাসে।
প্রাণ নাই।
তবু যেন প্রাণে প্রাণে জীবনের জাগে উন্মাদনা!
অনাগত দিনের আশায়,
নব নব কল্পনা কুসুম
ফুটে ওঠে রাত্রিদিন।

বেদুঈন বিহঙ্গেরা করে কলরব:
না-না-না, মৃত্যু নাই,
আমরা অমর!
অনশন দুঃখ ক্লেশ সর্ব দৈন্য সহি,
মৃত্যুর বিদারি বক্ষ,
আনিব নূতন আশা—নবতম জীবন প্রভাত।
উঠিবে সোনালি সূর্য হেমন্তের মাঠে,
ধান কাটা হবে সুরু;
বালিকা কৃষকবধূ বক্ষোবাস লুটায়ে মাটিতে,
দ্বারপ্রান্তে দেবে আলপনা।
আঁধারের বুকে
জ্বলন্ত উল্কার মতো ছুটে যায় মন,
ধরিত্রীর বক্ষতলে ফলভার-আনত ছায়ায়
নবতম আশ্রয় সন্ধানে,
লভিতে অমৃতস্বাদ—নব জীবনের;
মুষ্টিভিক্ষা নত করতলে
বিরিঞ্চির শাণিত পিনাকে
ঝলকিয়া ওঠে অগ্নিরাশি!
আগে চলো,
হতাশার হোক অবসান,
অফুরন্ত প্রাণমন্ত্রে জ্বলুক মশাল
ছায়াম্লান আকাশের বক্ষ উদ্ভাসিয়া।
হেমন্ত প্রভাতে হোক
অভিষেক নবজীবনের।

সে আলো জ্বালাবো আমি

শান্তশীল দাশ

সে-মানুষ দেখবো না? সে-মানুষ হব না আমরা?
এই আকাশ তলে যার বাস আর একই আলো জল
বাতাস ফুলের ঘ্রাণ—সব নিয়ে খুসি খুসি মন,
এক পৃথিবীর বুকে ঘুরে ফেরা নিঃশঙ্ক নির্বাধ!

জীবন অনেক বড়ো। সে-জীবন খণ্ড খণ্ড করে
অর্থহীন কোলাহল, হিংসা দ্বেষ আর হানাহানি;
কত রক্ত, কত কান্না—ঘরে ঘরে রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস:
কেন এ জীবন নিয়ে মর্মান্তিক এই বিলাসিতা!

জীবন অনেক বড়ো; সে-জীবন আনন্দে প্রকাশ।
আকাশের আলো আর মাটির আলোর সাথে মিশে
অখণ্ড জীবন লীলা; সেই লীলা চিরানন্দময়—
মৃত্যু সেও আনন্দের জীবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেলে।

এ জীবন আসবে না? এ জীবন পাব না আমরা?
নৈরাশ্যের ঘন মেঘ চারিধারে: প্রত্যয়ের দীপ
জ্বলবে না? কে জ্বালাবে? জ্বালাতেই হবে সেই আলো।
সে-আলো জ্বালাবো আমি, সেই আলো তুমিও জ্বালাবে।

সরিষা-ফুল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

অজস্র সরিষা-ফুলে ভরিল প্রান্তর;
নিরন্তর বৃন্ত 'পরে দোলে লীলা-ভরে,
মনে হয় শ্যাম-কান্ত প্রান্তর-সাগরে
নাচে সুখে অফুরন্ত হলুদ লহর।
শীর্ষে শীর্ষে পড়ি' তার স্বর্ণ সূর্য্যকর
পীত-বর্ণ-কান্তি আরও সমুজ্জ্বল করে;
বসে সেথা ভৃঙ্গবৃন্দ সোহাগে—আদরে
নাহি ঝরে যতক্ষণ পুষ্পেরা সুন্দর।

এ মর্ত্ত্য-প্রান্তরে ফোটে মানব-কুসুম;
খেলে - দোলে—ঢোলে-ভোলে সমান লীলায়।
যতক্ষণ নাহি নামে ফুল-ঝরা ঘুম
জীবনের মরসুমে মাতিয়া মাতায়;
রেখে যায় বিশ্ব-ক্ষেত্রে প্রীতি-ফুল্ল চুম।
নব নব-পুষ্পে ফিরে ক্ষেত্র ভরে যায়।

যে আলো মোহে না

দিলীপ দাশগুপ্ত

সেই স্বর্গ বহুবার চরণের তলে
ঐশ্বর্য্যের উপহারে—অনুরাগে—বহু অশ্রুজলে
আমাকে তপস্যা ক'রে গেছে স্তব্ধ হয়ে !

দম্ভের তিলক পরে' সর্ব শোক স'য়ে
প্রজ্ঞালোকদীপ্ত তেজে আমি সর্বক্ষণ
নিজে স্রষ্টা হ'য়ে তাই করেছি বপন
আপন সৃষ্টির বীজ—নব স্বর্গধামে :
শুনেছি সে জয়ধ্বনি আমারই সে নামে।

কটুগন্ধী কুসুমের মালা কণ্ঠে পারিনিতো নিজে—
তবুতো কামনা কীট সুন্দরকে ব্যথা দিয়ে কী যে
বিস্মরণ তীর থেকে ভুলে থাকা অতীতের ব্যথা
জীবন-জোয়ারে এনে অশান্তের দীর্ঘ আকুলতা
ভোলাতে চেয়েছে হায় !

চেয়ে দেখি বসন্তের কান্না ভেঙে যায়
আমার অলসঘন হাসির আকাশে।
আর চারপাশে
সুধাপাত্র শূন্য করে' প্রত্যাখ্যাতা কোন সর্বনাশী
নাগিনীর বিষ ঢেলে হাসে এক মোহময়ী হাসি !
তবুতো অটল আমি। স্বর্গ আর ঈশ্বরের বুকে
সুকঠিন বজ্রাঘাত হেনে যাই বিপুল-কৌতুকে।
লজ্জাগুলো ছুঁড়ে দেই আর দেই তীব্র অপমান—
তাই নিয়ে পাষণ্ডেরা গেয়ে ওঠে প্রেমজয়গান !!

হঠাৎ জানালা খুলে যায়

মনোরমা সিংহরায়

হঠাৎ জানালা খুলে যায়। কে যেন বাইরে থেকে
ডাক দেয় শৈশবের পরিচিত সুরে
"ওরে আয়, চলে আয়, আকাশ কেমন দেখো
নীল হয়ে আছে। শষ্পিত সুন্দর মাঠ
কৃষ্ণচূড়া থরে থরে যেন ছবি হয়ে
আঁকা আছে। চলে আয়, ছলোছলো
নদীর কিনারে। কান পেতে শোন্ কী সঙ্গীত
ধ্বনিত সেখানে। এ জগতে এই তো জীবন।"

মাটির গভীরে কখনো ছিলাম বুঝি! শিকড়ে মজ্জায়
থরো থরো যে কাঁপুনি শুনি
আমার এ হৃদয় স্পন্দনে
ধ্বনিত সঙ্গীত সেই উতলা যে করে কতোদিন।
মনে হয় যেন সব ফেলে চলে যাই
সে গভীর ডাকে।
আবার কখন যেন সেই ডাক
শুনেও শুনি না।
ঘুম আসে ঘুম আসে আর
ব্যাকুল যন্ত্রণা যতো মুছে যায় শান্ত শুশ্রূষায়॥

গভীর ঘুমের মাঝে স্বপ্ন কোনো
স্মরণ করায়
হারিয়েছি কিছু বুঝি আছে বিস্মরণে

বেলাশেষে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

জগৎজোড়া অন্ধকারে কী হবে ফল আঁধারকে শাপ দিয়ে ?
একটিও দীপ যদি থাকে—চলব আমি জ্বালিয়ে সেটি নিয়ে।
করতে পারি যেটুকু কাজ করব আজই, সে-ই তো আরাধনা
অপরে কী করছে ভেবে কান্নাকাটি—মিথ্যে বিড়ম্বনা।

ক্লান্তি যদি ছায় প্রাণে নাথ, করব বরণ তাকেও তোমার পরম
শান্তির দেবদূতী ব'লে—যেমন ফোটে আমার বুকেই নরম
চাঁদনি রাতের আভাস। শ্রান্ত চিত্তাকাশেও জাগিয়ে রাখি যেন
অতীতের আনন্দতারার কান্তি যত। প্রশ্ন করি কেন—
এমন কেন হয়—না অমন হ'য়ে ? হবেই প্রেমের চারণ হ'তে :
যতই বাধা দিক না হানা, এগিয়ে দেবেই—যদি তীর্থপথে
কাঁটায়ও চাই ফুল ফোটাতে—কান পাতলেই তোমার আবাহনে
বাজবে নব আগমনীর নূপুর প্রতি বিদায়-বিসর্জনে।

দুঃখসুখের আলোছায়ায় জোয়ার ভাঁটায় চলে জীবননদী
অশ্রুহাসির ওঠাপড়ায় ঢেউয়ের তালে তালে নিরবধি।
ক্ষোভে যখন ভজন ছেড়ে অভিমানের বেসুর আলাপ সাধি
অবিশ্বাসের দুর্লগনে—অকৃতজ্ঞ অনুযোগে কাঁদি—
ঝাপসা হয়ে আসে তখন স্মৃতি—তোমার দান পেয়েছি কত
দিনে দিনে, শুনিয়েছে রোজ তোমার কোকিল প্রেমের কূজন যত !
উষায় যত গান গেয়েছি, তান ঝরিয়ে, মান কুড়িয়ে হেসে—
পারি না তো রাখতে মনে—তাই বুঝি ছায় ফাল্গুনের স্বদেশে
অকালে হিম—ছন্দপতন হয় ? দিও বর—না যেন যাই ভুলে :
"তোমার বৃন্দাবনের বাঁশি, বন্ধু, বাজে ব্যথারই অকূলে।"

প্রার্থনা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চৈতন্যের পরিব্যাপ্তি দিগন্তসীমায় !
আত্মা প্রকাশিত তার নিজ মহিমায় !
সবার মাঝারে হেরি আপন সত্তারে !
বিচিত্র সুরের ধ্বনি প্রাণের সেতারে !
নীড়ের বন্ধন গেল ! ঈগলের ছানা
অনন্ত গগনে তার প্রসারিল ডানা !
নির্মল অসীম নীলে পথের বিস্তার !
আলোর সমুদ্র ! শুধু ইথারে সাঁতার !
বিচূর্ণ স্বার্থের দুর্গ-প্রাচীর ধূলিতে !
বৃহতের আকর্ষণে পেরেছি ভুলিতে
আপনারে ! এই আত্ম-প্রসারণই প্রাণ !
অহং-এর এই অবলুপ্তিই নির্বাণ !
নির্বাণ পরমা শান্তি ! আমার প্রার্থনা !
সমগ্রের মাঝে ব্যাপ্ত থাকুক চেতনা !

কেন অভিমান ?

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মিছে ভাবো। কেন আর মায়ার বন্ধনে
সবারে জড়াতে চাও ? কারে বাঁধা যায় ?
তুমি চাও, সবে থা'ক্ এ গৃহ-ছায়ায়,
তা'রা মুক্তি-অভিলাষী, কি ফল ক্রন্দনে ?
তোমার ইচ্ছার সাথে তাদের ইচ্ছায়
না-ই যদি মিল হয়, কেন রেষারেষি ?
অন্তরে কে কারে কবে ভালোবাসে বেশী,
তর্কে কি মীমাংসা হয় ? বৃথা হাহাকার।
যে স্নেহ স্বর্গের আলো পেয়েছ হৃদয়ে,
অম্লান জ্বালিয়ে রাখো, করো আশীর্বাদ।
মনে মনে যদি কভু ঘনায় বিষাদ,
হাসিটুকু ওষ্ঠে রাখো, নিজে দুঃখ সয়ে।
কি পেলেনা, তাই নিয়ে কেন অভিমান ?
নদী কি সংবরে জল হেরিয়া পাষাণ ?

নব-মহামারী

জগদানন্দ বাজপেয়ী

কবির কণ্ঠে একদা এ বাণী
উঠেছিল উৎসরি :
"মন্বন্তরে মরিনি আমরা
মারী নিয়ে ঘর করি।"
হায় কবি, হায়! তাদের চেহারা
দেখনি তো কভু চোখে.
হয়তো পড়েছ পুঁথিতে কিম্বা
বলেছ ভাবের ঝোঁকে।
তাহারি সুধাবে তারা যদি তব
হেন পরমাত্মীয়
ভেবে দেখো তবে আমাদের হবে
কত আপনার প্রিয়!

'ছিয়াত্তরের' চত্বরে মোরা
বাঁধিয়াছি চির বাসা
'পদচিহ্নের' পথে প্রতিদিন
আমাদের যাওয়া আসা।
কত মহেন্দ্র কল্যাণী কত
গৃহ পরিবেশ ছাড়ি
বাহির হতেছে নিরুদ্দেশের
পথে জমাইতে পাড়ি।

তাদের সমুখে আশ্রয় তবু
ছিল আনন্দমঠ,
আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া আছে
ক্রূর বঞ্চক শঠ
ক্ষীয়মান প্রাণশক্তির শেষ
রেশটুকু নিতে হরি
খাদ্যে পানীয়ে ভেষজে ভেজাল
বিষ মিশ্রিত করি।
মন্বন্তর ও মারীরে আমরা
মানায়ে লয়েছি পোষ
ভয় নাহি করি তাদের ভ্রূকুটি
তাদের অসন্তোষ,

হায় কবি, ওগো হায়,
নব মারী এক জন্ম নিয়েছে
আমাদের আঙিনায়
নহে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা নহে
নহে মারী গুটিকা সে,
দেশবৈরিতা দূষিত বীজাণু
বাহিত হইয়া আসে
বাহির হইতে ষড়যন্ত্রের
সুড়ঙ্গ পথ দিয়া,
কেমন করিয়া ঘর করি বল
সে মহামারীরে নিয়া!'

বাঁচিতে চাহেনি তারা সুন্দর ভুবনে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।"
একথা বলেনি নারী—কভু কোনো দিন
যুগ যুগান্তরে তার ভ্রমণের পথে
আলোকের তিমিরের রথে।

সেকি কভু পৃথিবীর আনন্দের সুধা করে নাই পান—
দেখে নাই রূপ তার শোনে নাই চরাচরভরা আনন্দের অব্যক্ত আহ্বান
শোনে নাই পাখী নদী সাগরের গান?
হে কবি তোমার মত দেখেনি দেখেনি ছবি মেলিয়া নয়ন
রূপবতী ধরণীরে আর অপার উৎসবময়
ওই গগন-প্রাঙ্গণ!

হে বিশ্ব ভুবন নাথ,
ধরাতলে আসিবার কালে তারেও তো দিয়েছিলে ভরি দুই হাত
বিস্ময়-আনন্দ-প্রেম-মোহে সিক্ত করি পাঁচটি প্রদীপ,—
নিতে তারে পঞ্চেন্দ্রিয়ে জ্বেলে।
হেরিবারে এ ভুবন করিতে আরতি মুগ্ধ নেত্র মেলে।
জ্বলিল না দীপ তার? আঁখি সেকি মেলে নাই কভু?

জন্মক্ষণ হতে সে কেন বলিয়া যায় চিরদিন
জগতেরে,—আপনারে ধীরে ধীরে
ক্লান্ত নতশিরে—'হে প্রভু
চাহিনা চাহিনা আমি বাঁচিতে ভুবনে।—
নিরানন্দ প্রাণ মোর মুক্তি মাগে দেহের বন্ধন হতে
নিরর্থক অসার্থক আমি এ জীবনে।'

বড় দাদামশায়ের কথা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

গগনকে মানায় রাজার পার্টে—এই কথা বলতেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই তো রাজা আছেন—গগনেন্দ্রনাথ তাই সাজতেন। যখন রাজার পার্ট পাওয়া যেত না অথচ গগনেন্দ্রনাথকে নামাতে হবে, তখনই হত মুস্কিল। যেমন একবার হয়েছিল শারদোৎসব নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের দলবল নিয়ে জোড়াসাঁকোয় এসেছেন শারদোৎসব অভিনয় করতে। সেটা ১৩২৯ সাল। এসে মনে পড়েছে ভাইপোদের কথা। গগনকে শারদোৎসবের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। শারদোৎসবে একজন রাজচক্রবর্তী আছেন বটে কিন্তু তিনি তো ছদ্মবেশে আছেন সন্ন্যাসী সেজে। ওতে গগনেন্দ্রনাথকে মানাবেনা। কাজেই লিখতে হল এক আসল রাজার পার্ট। বড়দাদামশায় গগনেন্দ্রনাথ সাজলেন রাজা, মেজদাদামশায় সমরেন্দ্রনাথ সাজলেন মন্ত্রী।

ষ্টেজে নেমে বড়দাদামশায় সত্যিকারের রাজা হয়ে যেতেন। সাজে পোষাকে, চেহারায়, গলার স্বরে, দেহবিক্ষেপে, বাহুভঙ্গিতে কী যে হয়ে যেতেন আমরা আর চিনতে পারতুম না। অভিনয় ছিল সংযত স্বাভাবিক। মনেই হত না অভিনয় করছেন। হাত-পা ছুঁড়ে গলা কাঁপিয়ে দর্শকদের মর্ম্ম স্পর্শ করে কত বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীই তো অভিনয় করে যান দেখি, কিন্তু সেই ছেলেবেলায় দেখা বড়দাদামশায়ের রাজার পার্ট যেমন মনের মধ্যে এখনও গেঁথে আছে এমন তো কোনোটি হল না। এ কি বড়দাদামশায়কে ভালবাসতুম বলে, না রাজার পার্ট বড়দাদামশায়কে অমন মানাতো বলে? জানি না।

কিন্তু তার চেয়েও মনের মধ্যে জাগ্রত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বড়দাদার পিশেমশায়ের পার্ট। ডাকঘরের পিসেমশায়। বিচিত্রা হল-এ ডাকঘরের ষ্টেজ সাজিয়েছিলেন বড়দাদামশায় আর দাদামশায়। নন্দ দাও ছিলেন। তিনি তখন ছেলেমানুষ। তাঁর তখন এই দুই মহাশিল্পীর কাছে ষ্টেজ সাজানোর হাতেখড়ি হচ্ছে। অমন করে এর আগে কেউ ষ্টেজ সাজায়নি। অনাড়ম্বরতার চূড়ান্ত। সামনের দিকটায় খড়ের চাল। সত্যিকারের খড়—

ক্যাম্বিশের উপর আঁকা নয়। পিছনে যতদূর মনে পড়ে শুধু নীল। শেষ দৃশ্যে বোধহয় সেই নীলে কিছু তারা ফুটে ছিল। ষ্টেজের সামনে সাজানো ছিল রজনীগন্ধার গাছ। রজনীগন্ধা সেই বোধহয় প্রথম জাতে উঠল— আজকাল যা প্রতি সভামঞ্চে মিটিংয়ে কনফারেন্সে দেখা যায়। তখনকার দিনে ডাকঘরের সেই প্রথম অভিনয় দ্রষ্টাদের মনে কী গভীর রেখাপাত করেছিল তা তো সবাই জানেন।

আর আমাদের মনে জেগেছিল পিসেমশায় আর অমল। পিসেমশায় বলতে আমরা বুঝতুম বড়দাদামশায় আর অমল বলতে আশামুকুল। সারা দুনিয়ার পিসেমশায় আর সারা জগতের অমল হয়ে এঁরা দু'জনে আমাদের অন্তরে চিরদিন জেগে রইলেন। এরপর যত ভালো ভালো ডাকঘরের অভিনয়ই দেখে থাকিনা কেন, কই অমনটি তো আর কখনও দেখলুম না। ডাকঘরের অভিনয় শেষ হয়ে গেলে বাড়ী ফিরে গিয়ে আমাদের চোখ জলে ভরে যেত। আমরা জানতুম বড়দাদামশায়ের অমন আশ্চর্য্য অভিনয়-সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর এক গভীর শোক। ডাকঘর অভিনয়ের কিছুদিন আগেই তিনি এক মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার মধ্যে হারিয়েছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে— অমলেরই বয়সী।

আমরা যখন খুব ছোট তখন 'বাল্মীকি প্রতিভা' হয়। বিবিদিদি কত্তাবাবা এঁরা সেজেছিলেন দেখেছি কি দেখিনি তা-ও মনে পড়ে না। তবে বাল্মীকি প্রতিভা দেখে বড় দাদা এক পুতুলের বাল্মীকি প্রতিভা করেছিলেন সেটা আমাদের দেখা এবং আমাদের চোখে তা এমনই অপূর্ব্ব লেগেছিল যে আজও ভুলিনি। বেশ বড় সড় একখানি স্টেজ বানিয়েছিলেন। তাতে সাজানো—কোথা থেকে সে সব পুতুল সংগ্রহ করেছিলেন জানি না—কিন্তু অবিকল বনদেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ডাকাতের দল, সব ছিল। সেই পুতুলের স্টেজ সামনে রেখে আমরা যখন বাল্মীকি প্রতিভার গান শুনতুম, তখন পুতুলগুলোকে জীবন্তই মনে হত। বাল্মীকি প্রতিভার পুরোপুরি অভিনয় দেখা হয়ে যেত।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জন্মেছিলেন বড়দাদামশায় বাড়ির পশ্চিম কোনার দোতলার লম্বা এক ফালি আঁতুড় ঘরে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস। সমরেন্দ্র এবং অবনীন্দ্রকে কিন্তু শেষ বয়সে জোড়াসাঁকো বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছিল। সমরেন্দ্র শেষ জীবন কাটান দক্ষিণ কলকাতায়, অবনীন্দ্র বরানগরের গুপ্তনিবাসে। এই তিনভাই যখন জোড়াসাঁকোর পাঁচ নম্বর বাড়ি আলো করে থাকতেন, যখন সেখানে নানা জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, লেখক দেশ বিদেশ থেকে সমাগত হতেন, ছাত্র এবং ভক্তেরা হাতের কাজ দেখতে মৌচাকের পাশে মৌমাছির মত ভীড় করে আসতেন, তখন এঁরা যেখানে বসে সারাদিন কাটাতেন সেটা ছিল আমাদের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দা। এই টানা বারান্দার পূব দিকটায় তিন ভাই—প্রথমে বড়দাদামশায় তাঁর ছবির সরঞ্জাম নিয়ে, তারপর দাদামশায় তাঁর ছবি আঁকার এবং অন্যান্য হাতের কাজের, যেমন হাতুড়ি ছেনি ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে এবং পূর্ব্বতন অংশে মেজদাদামশায় তাঁর পড়ার বই আর কাছারিখানার খাতাপত্র নিয়ে বসতেন।

শোনা যায় অবনীন্দ্রনাথ যখন ইয়োরোপীয় শিক্ষকের কাছে ছবি লেখার প্রথম পাঠ নিচ্ছিলেন তখন এক উত্তরের ঘরে তুলি রং বোর্ড সাজিয়ে ইয়োরোপীয় প্রথানুযায়ী 'নর্থ লাইটে' ছবি লেখার চর্চা শুরু করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন এ দেশে ও সব নিরর্থক। চওড়া চৌকিতে পা গুটিয়ে বসলেন দক্ষিণের বারান্দায়। কোথায় গেল নর্থ লাইট। ফুরফুরে দক্ষিণের হাওয়া খেতে খেতে চললো ছবি আঁকা আর সেই সঙ্গে আলোচনা গল্প হাসি। মুখ বুজে কাজ করতেন না কেউ, দাদামশায়ও নন, বড় দাদামশায়ও নন।

দক্ষিণের বারান্দার সামনে ছিল বাগান। বাগানের সীমানায় এক সারি নারকেল গাছ। সারা বছর, বারো মাসই কাটতো তাঁদের এই দক্ষিণের বারান্দায়। শীতকালে দেখেছি জোব্বা পরে রোদে পা দিয়ে বসতে; গ্রীষ্মকালে ভাত খাবার পর একটুখানি ঘুমিয়েই বেলা তিনটে নাগাদ যখন বারান্দায় গন্‌গনে গরমের হাওয়া বইছে, আর সকলে দরজা বন্ধ করে ঝিমোচ্ছে, গগনেন্দ্র এবং অবনীন্দ্র চলে আসতেন দক্ষিণের বারান্দায় নিজ নিজ স্থানে বসে মনের আনন্দে ছবি আঁকতে। বর্ষায় দেখেছি নারকেল গাছের পিছনে আকাশ কালো করে মেঘ করে আসছে—দু-ভাই ছবি এঁকে চলেছেন। ঘন বৃষ্টির ছাঁটে বারান্দা যেত ভিজে, পায়ে এসে ছাঁট লাগত, তবু উঠতেন না। বসন্তের শরতের সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না এসে বাগানের গাছপালাকে মুড়ে দিত—তিন ভাই বসে গল্প করতেন বারান্দার আলো নিভিয়ে। দেয়ালির দিনে ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়েই দীপাবলি আলো দেখতেন আর দেখতেন রাজেন্দ্রমল্লিকের বাড়ি থেকে হাউই-বাজি ছাড়া হচ্ছে।

জোড়াসাঁকো বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা তখনকার দিনের শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। যাঁরা সে বারান্দা আর তার দুই শিল্পীকে দেখেছেন, তাঁদের মনে এখনও হয়তো তার স্মৃতি জেগে আছে, যদিও সে বাড়ী সে বারান্দা দুই শিল্পীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে ধূলায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

দাদামশায় ছবি আঁকার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন দু জন বিদেশী শিক্ষকের কাছে। বড় দাদামশায় ছবি আঁকা শিখতে শুরু করেন সেণ্ট জেভিয়ার স্কুলে। তেলের রং-এ ছবি আঁকা ছিল তাঁর প্রথম পাঠ। এ ছাড়া খুব ভালো ফোটোগ্রাফার ছিলেন। দক্ষিণের বারান্দায় বসে সহজ পথে নিজের খেয়ালে নিজের পন্থায় জল-রংয়ে ছবি আঁকা যখন শুরু করেছেন, তার আগেই বিলিতি প্রথায় তেল রংয়ে ছবি আঁকা এবং ফোটোগ্রাফি দুই-ই ত্যাগ করেছেন। যে যুগকে চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্র যুগ বলা যায়, যে সময় দিনে দিনে অবনীন্দ্র প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছে, ওঁরই দক্ষ ছাত্রেরা ওঁরই হাতে-জ্বালা দীপ নিয়ে ভারতের দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন, সে সময় গগনেন্দ্রনাথও ছবি এঁকে চলেছেন অবনীন্দ্রনাথের পাশে বসে প্রায় গা ঘেঁসে, অথচ অবনীন্দ্রনাথের কোনো ছোঁয়াই গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে লাগে নি। গগনেন্দ্রনাথ গোড়া থেকে শেষ নিজস্ব ভাতিতে দীপ্ত। আমরা ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি বড় দাদামশার ছবি আঁকার হাত এবং ধরণ অতি সহজ অতি স্বচ্ছন্দ; চোখ মেলে বার বার দেখতে ইচ্ছে করত ওঁর রেখার খেলা, রং এর খেলা, চীনে কালিতে ডোবানো চ্যাপ্টা আর গোল তুলির খেলা। এত কম তুলির টানে এত কথা ফুটে উঠত তাঁর ছবিতে যে আমরা তাঁর হাতের কাজ দেখতে দেখতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতুম। বার বার ভিতর বাড়ি থেকে তাগিদ আসত, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তবু আমাদের চৈতন্য হত না। শেষে বড় দাদামশায় বলতেন,—এখন যা তোরা খা গিয়ে। ও-বেলা তোদের জন্যে পোষ্ট কার্ড এঁকে দেব। এমনি করে বড় দাদামশায়ের কাছ থেকে ছবি আঁকা পোষ্ট কার্ড আমরা প্রায়ই পেতুম।

বড় দাদা একই ছবি আঁকতেন বার বার। কোন চিত্র অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় যদি পছন্দ না হত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। ছবির অংশবিশেষকে সংশোধন করবার ধৈর্য্য ছিল না অথচ সেই ছবিকে আবার এবং বার বার আঁকবার ধৈর্য্য ছিল। অথচ দাদামশার দেখেছিলুম অন্য রকম। ছবির কোনো জায়গা পছন্দ না হলে রং দিয়ে ঢেকে দিতেন, নতুন ড্রয়িং করতেন কিংবা ঘসে ঘসে তুলে দিতেন। একবার আরব্য উপন্যাসের সেই খলিফার ছবি থেকে তিন তিনটি দস্যুর মূর্ত্তি পছন্দ না হওয়ায় বেমালুম ঘসে তুলে দিয়েছিলেন। বড়দাদা কত সময় যখন নিজের কাজে বিরক্ত হয়ে ছবি ছিঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছেন, আমরা ছুটে গিয়ে বাঁচিয়েছি। বলেছি—ফেলে দিতে হয় দাও বড়দাদা, গোটাটাই ফেলে দাও না, ছিঁড়চো কেন? তারপর বড় দাদামশায় হেসে সেটাকে আবর্জনার

ঝুড়িতে ফেলে দিলেই আমরা টপ্ করে কুড়িয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে এসেছি। আমাদের চোখে বড় দাদামশায়ের সব ছবিই ভাল লাগত। কেন যে ছিঁড়ে ফেলে দিতে চাইতেন বুঝতে পারতুম না। কত সময় তাঁর আবর্জনার ঝুড়ি থেকে ছেঁড়া ছবির টুকরোগুলো উদ্ধার করে কেটে নিয়ে ছোট ছোট চমৎকার সব ছবি বানিয়েছি তার ঠিক নেই।

ভারতীয়দের মধ্যে ব্যঙ্গ চিত্র বোধ করি বড়দাদাই প্রথম এঁকেছিলেন। বড়দাদার এইসব ব্যঙ্গ চিত্র যখন প্রকাশ হতে শুরু করে তখন বাইরেও এই নিয়ে যেমন উত্তেজনা, আলোড়ন, আলোচনার ঝড়, আমাদের জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দাতেও তেমনই কর্ম চঞ্চলতা। বড়দাদা তখন রোজ একটা করে ছবি আঁকছেন। সবাই দেখছেন, মন্তব্য করছেন। দক্ষিণের বারান্দা জম-জমাট। ছবির কোনো কোনো অংশ কাটা কাগজে ঢেকে তারের জালের মধ্যে দিয়ে রং স্প্রে করা হত। সেই কাজে আমরা সাহায্য করতুম, মাস্টার মশায়ও বাদ যেতেন না। শেষে ছবিগুলিকে একসঙ্গে ছাপিয়ে বই বার করবার কথা যখন উঠল, বড়দাদামশায় একটা লিথো প্রেস কিনে ফেললেন। বাগানের ধারে এক অন্ধকার ঘরে সেই প্রেস বসল, তারপর দাদামশার তদারকে ছাপা হতে লাগল সেই সব ব্যঙ্গ চিত্র যা প্রথমে 'বিরূপ বজ্র' ও 'অদ্ভুত লোক' এবং শেষ 'নব হুল্লোড়' নামে তিনখানি চিত্রপুস্তক রূপে প্রকাশিত হয়। এতে ছিল গান্ধীর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের, জগদীশ চন্দ্র বসুর ও শামসুল হুদার ব্যঙ্গ চিত্র। তখনকার দিনের আলোচ্য বিষয় বস্তু নিয়ে শত শত চিত্র এঁকেছিলেন। যেমন বঙ্গ ভঙ্গ, জগদীশ চন্দ্রের উদ্ভিদের প্রাণের স্পন্দন আবিষ্কার, রেল গাড়িতে ইয়োরোপীয় থার্ড ক্লাশ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের যে ব্যঙ্গচিত্রটি এঁকেছিলেন সেটি শারদোৎসব হয়ে যাবার পর। ব্যঙ্গচিত্রতে রবীন্দ্রনাথ এক আরাম কেদারায় বসে আকাশে উড্ডীন হয়ে চলেছেন—তাঁর সঙ্গে পাখা মেলে উড়ে আসছে তাঁর কাব্য গ্রন্থাদি। এই ছবিটি শেষ করে বড়দাদা কোলে নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় রবীন্দ্রনাথের সরকার মশায় গোপালবাবু কি কাজে আমাদের দক্ষিণের বারান্দায় এসেছিলেন। বড়দাদা ছবিটি দেখিয়ে গোপালবাবুকে বললেন—দেখ তো গোপাল, ছবিটা ভাল লাগে?

গোপালবাবু ছবি দেখে গদ গদ হয়ে বললেন—আজ্ঞে বেশ হয়েছে।

বড়দাদা বললেন—কার ছবি চিনতে পারছ?

গোপালবাবু জবাব দিলেন—আজ্ঞে।

বড়দাদা বললেন—কার?

গোপালবাবু বললেন—আজ্ঞে, বাবুমশায়ের।

বড়দাদা বললেন—বাবুমশায় কি করছেন?

গোপালবাবু আর কথা বলেন না, কেবলই হাত কচলান।

বড়দাদা বললেন—বলেই ফেল গোপাল, বাবুমশাই কি করছেন?

গোপালবাবু ঘাড় নীচু করে বললেন—আজ্ঞে বাবুমশায় উড়ছেন।

এই শুনে বারান্দায় আমরা যে যেখানে ছিলুম হো হো করে হেসে উঠেছিলুম। দাদামশায়রা সুদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে বড়দাদার ষোলো সতের খানি অপূর্ব ছবি আছে। এগুলি প্রদর্শনী এবং ছাপার মারফৎ সর্বসাধারণের গোচর হলে বড়দাদা যে সব সপ্রশংস চিঠি পেতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণবভাবাপন্নদের কাছ থেকে, তা সংগ্রহ করে রাখলে একখানা বই হয়ে যেত। মূল ছবিগুলি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কলকাতার রবীন্দ্রভারতীতে রক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি পুস্তকের জন্যে বড়দাদা যে ছবিগুলি এঁকে দিয়েছিলেন সগুলি শান্তিনিকেতন কলাভবনে আছে। কলকাতার রবীন্দ্রভারতীতে বড়দাদার প্রাকৃতিক দৃশ্য, পর্ব্বত দৃশ্য,

কলকাতার দৃশ্য, পোর্ট্রেট প্রভৃতি অনেক ছবিই যত্নে রাখা আছে। আরও কিছু কিছু ছবি ছড়িয়ে আছে এর ওর কাছে। কিন্তু হারিয়ে গেছে অনেক। কত লোককে দিয়ে দিয়েছেন। বড়দাদা তো কম ছবি আঁকেন নি। এক কিউবিজমেরই তো কত ছবি এঁকেছিলেন। সেগুলি গেল কোথায়? বড়দাদার সেই দুর্গাপূজোর ভাসানের ছবি—ছেলেবেলায় দেখে দেখে চোখ যেন তৃপ্ত হত না। কতবার তাকে নকল করতে গিয়ে বিফল হয়ে আবার মূল ছবির সামনে গিয়ে মুগ্ধনেত্রে চুপটি করে বসে পড়েছি। সেই ছবিটি এবং ওই রকম আরও কিছু কিছু ছবি, যা মনের মধ্যে এখনও জীবন্ত হয়ে রয়েছে, যদি এক ঝলকও দেখতে পাই আর একবার তাহলে জীবন সার্থক হয়ে যাবে।

হাসি মাসী বড়দাদার ছোট মেয়ে। তাঁকে দিয়েছিলেন স্নেহের উপহার অনেকগুলি ছবি। যাঁরা হাসি-মাসীর পার্ক সার্কাসের বাড়িতে গিয়েছেন তাঁরাই দেখেছিলেন সেই বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে কত ছবি টাঙানো থাকত।

সোনার কাগজের উপর আঁকা তিন অংশে ভাগ করা মস্ত লম্বা গঙ্গার এক দৃশ্য। ঘাটের কাছে নৌকো বাঁধা মাঝি পাটাতনের উপর উবু হয়ে নমাজ পড়ছে। ও-পারে দেখা যায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। সে ছবি যে দেখেছে সে আর ভুলবে না। চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাই আর একটি ছবি—কদম্ব গাছের নীচে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। তারপর কালো-শাদায় আঁকা দার্জিলিংয়ের তিনটি দৃশ্য—একটি ক্যালকাটা রোড, অপরটি দার্জিলিংয়ের কুয়াশা, তৃতীয়টি দার্জিলিংয়ের রিক্সওয়ালা। প্রত্যেক ছবিই এক একটি রত্ন। তারপর সেই প্রকাণ্ড বড় বর্ষার ছবিটি। আকাশে মেঘের ঘটা। বৃষ্টি নেমে আসছে। এক ধার দিয়ে উড়ে চলেছে নরম শাদা পাখা মেলে দু-তিনটি বলাকা। এই ছবিটি কোন্ এক প্রদর্শনীতে'দেখে এক মেম-সাহেবের বড় পছন্দ হয়েছিল। বড়দাদামশায় হাসিমাসীকে বললেন সে কথা। বললেন—অনেক টাকা দিয়ে কিনে নিতে চায় ওটা। বিক্রী করবি নাকি? হাসিমাসীর সেটা বড় প্রিয় ছবি। তিনি বললেন—না। এই অপূর্ব ছবি আর নেই। তারপর অর্জুনের লক্ষ্যভেদ এবং অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা। মস্ত ছবি এ দুটি। চিত্রাঙ্গদার গলায় শাদা গোড়ের মালা, মাথায় কিসের যেন মুকুট—ঠিক যেন কনে-বৌটি। সাত ভাই চম্পার একটি ছবি ছিল। শাহাজাদপুরের ছবিগুলি ছিল। তারপর ছিল রাঁচির হাটের সেই অতুলনীয় ছবিটি—মেয়েরা চলেছে পসরা বোঝাই নিয়ে হাটের পথে। আরও কত ছবি ছিল সব মনেও পড়েনা। কিন্তু এখনও চোখের সামনে ভাসছে সেই অনবদ্য ছবিখানি যার নাম দিয়েছিলেন—**The boy in dreamland.** ছোট নাতি খেঁদুর জন্যে যে গল্পখানি রচনা করেছিলেন, যা পরে সিগনেট প্রেস থেকে ভোঁদড় বাহাদুর নামে বেরিয়েছে—সেই গল্পের চিত্র। খেঁদু মুখে আঙুল পুরে অবাক হয়ে দেখছে, তার চোখের সামনে রূপ নিচ্ছে স্বপ্নের দেশের ভোঁদড়, কালো-বেড়াল, টিকটিকি, বেজী, টিয়ে, টুনটুনি, আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো, জোটেবুড়ি, সিঙ্গির মামা ভোম্বল দাস আর দু-মুখো রাক্ষস। এ ছাড়া টাঙানো থাকত ব্যঙ্গচিত্রগুলি প্রায় সব। কত-দিন হাসিমাসীর বাড়ি গিয়ে এই ছবিগুলির সামনে বসে সারা বেলা কাটিয়ে দিয়েছি। এই অপূর্ব চিত্র-শালা আজ আর নেই, ১৯৪৭ এর সেই ভয়ানক দাঙ্গার সময় হাসিমাসীর বাড়ি আক্রান্ত হয়ে বড়দাদার সমস্ত ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। এই সেদিন শুনলুম, সেই ধ্বংসলীলার মধ্যে থেকেও নাকি দু-একটি ছবি কোনো রকমে বেঁচে গিয়েছিল। তার মধ্যে সেই অতুলনীয় ছবিখানি যার নাম দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র, সেটি উদ্ধার হয়েছে। আমাদের এবং বাংলা দেশের পরম সৌভাগ্য।

বড়দাদামশায়ের কিউবিষ্টিক্ ছবি নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। ইয়োরোপীয় কিউবিষ্ট স্কুলের পরিপ্রেক্ষিতে বড়দাদার ছবির স্থান কোথায় এবং বড়দাদার ছবিগুলির মূল আবেদন কী এইসব নিয়ে

তথ্যবহুল তর্ক দেখেছি ও শুনেছি। বোধকরি এ দেশে কিউবিষ্ট ছবির প্রথম চিত্রকর বড়দাদামশায়। কিন্তু এই ধরনের ছবি আঁকার জগতে বড়দাদা কি ভাবে প্রবেশ করেছিলেন তার ইতিহাস হয়তো অনেকেরই জানা নেই। বড়দাদার শখ ছিল বাজারে ঘুরে দেখা নতুন ধরনের কি খেলনা উঠল, আর তাই কেনা। তখনকার দিনে বিলিতি খেলনা আসার তো কোনো বাধা ছিল না। তাই মাঝে মাঝে বড়দাদা নানারকম খেলনা নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। একবার মুখোশ নিয়ে ফিরেছিলেন। সেই মুখোশ দেখে গীতার কি ভয়! একবার স্কুটার নিয়ে এসেছিলেন অনেকগুলো। সেই কলকাতার বাজারে প্রথম স্কুটার উঠল। আর একবার নিয়ে এলেন অণুবীক্ষণের মত একটা যন্ত্র। চোখ লাগিয়ে দেখতে হয়। কাঁচ কিংবা স্বচ্ছ পাথরের টুকরো বসিয়ে আলো ফেলে চোঙার মধ্যে দিয়ে দেখলে দেখা যায় অদ্ভুত সব রংয়ের ছটা। স্বচ্ছ টুকরোটি একটু নড়ালেই লাল, নীল, হলদে, বেগুনী, সবুজ নানারকম বর্ণরেখার জাল দিকে-বিদিকে বিচ্ছুরিত হয়। জিনিসটা বৈজ্ঞানিক কোনো যন্ত্র, হয়তো ক্রিষ্টালের গঠন পরীক্ষা করার বিশেষ কোনো অনুবীক্ষণ, অথবা সত্যিই কোনো খেলনা, সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। কিন্তু বড়দাদা সেটাকে খেলনার মতই ব্যবহার করতেন। আমাদেরও দেখাতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নলের মুখে চোখ দিয়ে বসে থাকতেন আর নীচেকার কাঁচ বা পাথরের টুকরোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রং দেখতেন। তারপর শুরু করলেন আঁকতে। ওই রংয়ের ছবি। ওইগুলিই হল বড়দাদার কিউবিষ্টিক ছবি। দুই পরীর নৃত্য নামে বড়দাদামশায়ের যে ছবিটি আছে সেটি ঠিক ঐ রকমই চোঙার মধ্যে দিয়ে দেখেছিলেন।

ছবি এঁকেছেন, অভিনয়-সাফল্য দেখিয়েছেন আর সাহিত্য-রচনা? তা-ও আছে। লেখা বড়দাদামশায়ের অবশ্য একটিই—ভোঁদড় বাহাদুর। কিন্তু ঐ একটিতেই জানা গিয়েছিল কত বড় কুশলী এবং কল্পনাধর রচয়িতা ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। আমাদের একটি হাতের লেখা পত্রিকা ছিল—দেয়ালা। তারই তাগিদে লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন—দাদাভায়ের দেয়ালা। ছোট্ট নাতি খেঁদু গিয়েছিল বাপ-মায়ের সঙ্গে রাঁচিতে বেড়াতে। তাকে লিখতে বসলেন এক মজার চিঠি কল্পনার রস মিশিয়ে। প্রথমে হল ছোট একটি চিঠি। কাটলেন কুটলেন বাড়ালেন। ক্রমে সেটা নিল রূপকথার আকার। পড়ে শোনালেন আমাদের। বললেন, তোদের দেয়ালার জন্যে নিস্ তো এটাই দেব—দাদাভায়ের এই দেয়ালা। বড়দাদার ছবির বেলা যেমন, বারবার আঁকতেন, এই গল্পও তেমনি বার বার নতুন করে লিখে দাঁড় করালেন এক অপূর্ব রূপকথায়। বড়দাদা গত হবার অনেক পরে ঐটিই সিগনেট প্রেস ভোঁদড় বাহাদুর নামে বই করে বার করেন। অবশ্য নাতিদের উদ্দেশে লেখা তাঁর যে সব মজার চিঠি আছে সেগুলিও ছাপানোর উপযুক্ত।

সদাহাস্যময়, রাগদ্বেষহীন, প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ বিচ্ছুরিত-স্নেহ শিল্পীর জীবনেও দুঃখ আসে। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ব্যাধির ঝটকায় ডান হাত গেল বিকল হয়ে। কথাও গেল বন্ধ হয়ে। আর ছবি আঁকবেন কি করে? রং তুলি কাগজ সব সাজানো, দক্ষিণের বারান্দায় এসে নিজের আসনে বসছেন, কিন্তু হাত চলে না, ছবি হয় না। সৃষ্টিতে বাধা-প্রাপ্ত হওয়া যে শিল্পীর জীবনে কত বড় দুঃখ বড়দাদার মুখ দেখে আমরা বুঝতুম। বুঝতুম যে কী যেন একটা তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে ছটফট করছে অথচ পারছে না। কিন্তু তারপর জোড়াসাঁকোর বসত বাড়ি ত্যাগ করে যাওয়ার যে পরম দুঃখ তাঁর ছোট দুই ভাইকে ভুগতে হয়েছিল বড়দাদামশায় বেঁচে গিয়েছিলেন তার হাত থেকে। জোড়াসাঁকো বাড়ি আর তার দক্ষিণের বারান্দার উপর কালো মেঘ ঘনিয়ে আসার আগেই ভগবান তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন।

(গগনেন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী সভায় পঠিত)
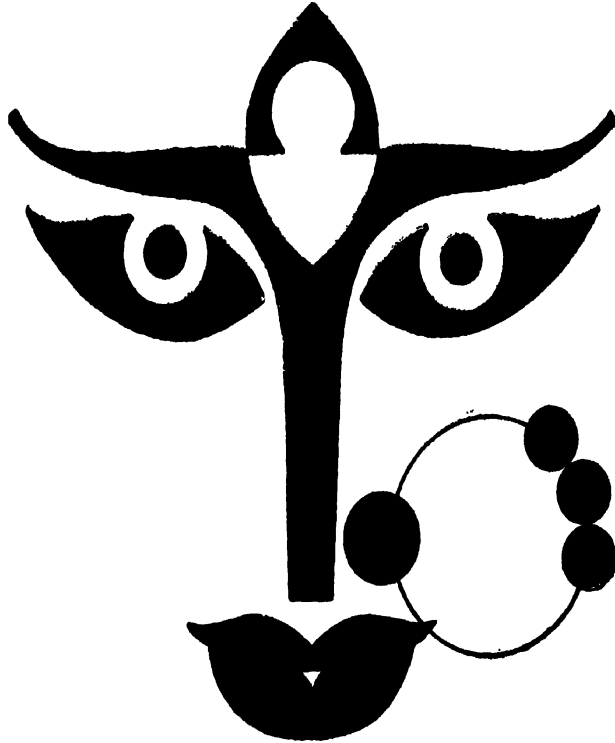
ভাগাড়ে

বিভূতিভূষণ গুপ্ত-

আমি গল্প লেখক নই অথচ গল্প লিখতে বসেছি। হয়তো বলবেন এটা আমার অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমাদের আধুনিক অভিধানে এ শব্দটি খুঁজে পাবেন না। পেলে দেশের চেহারা বদলে যেতো। আমিও কলম ধরতাম না আর আপনারাও সমালোচনা-মুখর হয়ে উঠতেন না।

বিশ্বাস করুন কোন ব্যক্তি বিশেষকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তি যেখানে সংখ্যাতীত সেখানে এ পণ্ডশ্রম করে লাভ কি। আমি কাজ ভালবাসি। কাজের মধ্যেই বাঁচার আনন্দের সন্ধান করছি। কিন্তু, কিছু করবার উপায় নেই। চতুর্দ্দিকের বক্তৃতা আর হিতোপদেশ শুনতে শুনতে হাত আপনি থেমে যায়।

যা বলছিলাম, সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য আজ আমি কলম ধরিনি। সত্যিকারের সাহিত্য আজ জাতিচ্যুত হয়ে লজ্জায় আত্মগোপন করেছে, আমি শুধু আমার একটি বিচিত্র অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করেই বিরত হবো।

রোড কন্ট্রাকটরের অধীনস্থ একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী আমি। আমিই ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক, ক্যাসিয়ার এমন কি ইঞ্জিনিয়ারও।

প্রয়োজনে মদের বোতল এগিয়ে দেই! মুরগীর কালিয়া আর ফ্রায়েড-রাইস যোগান দি। তাতে না হলে টাকার থলে। খুব উঁচু দরের হলে—চিত্ত-বিনোদনের জন্য···নোংরা আর ঘৃণ্য কাজ। মন বিদ্রোহ করতে চায়। কিন্তু পারি না ক্ষুধা চিত্তবৃত্তিকে কোন পথে টেনে নিয়ে চলেছে বুঝতে চাই না। বোঝার চেষ্টা করলে কাজের মূল্য পাওয়া যাবে না। অকর্ম্মণ্যতার অপবাদ নিয়ে সরে পড়তে হবে।

প্রতি সপ্তাহে সহর থেকে টাকা আসে। মজুরদের সাপ্তাহিক মজুরী মিটিয়ে দেবার জন্য। কিছু আসে অন্য খাতে ব্যয়ের জন্য। ওটা মিসিলিনিয়াস এবং এনটারটেইনমেন্ট বাবদ ব্যয় হয়ে থাকে। ওর কোন হিসেব থাকে না। এ টাকাটা বিলের সঙ্গে যোগ হয়। এ নিয়ে কোনদিন প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়নি। হবেও না। কায়দা করে খাইয়ে দিতে পারলে এই ছাড়টুকু সবসময় পাওয়া যায়।

আমরা পাই খাটুনির পয়সা। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না, বাঁয়ে আনতে ডাইনে। তাতেও খুসী যদি সময়মত সেটা হাতে পাই।

উঁচু দরের ফলাহার-ভোজীরা ঠিক সময়মত আসে। দিন এবং সময় ওদের ঘড়িতে লেখা থাকে। সময় মত আবির্ভাবের ব্যতিক্রম ঘটে না।

নতুন অবস্থায় একদিন মালিক-পক্ষকে বলেছিলাম, যাদের দিয়ে কাজ করাতে হয় আগে তাদের প্রাপ্যটা মিটিয়ে দিয়ে তারপর……

তারপর যা হয়েছিল তা আর না বলাই ভাল। কথাটা দুঃখের আর লজ্জার। আরও একটু তলিয়ে দেখলে অনায়াসে একে দেশদ্রোহিতা বলা যেতে পারে। তবুও মুখ খুলবার উপায় নেই। আমাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে যা কিছু নোংরা কাজ আমাদের দিয়েই করান হয়।

বিবেকের দংশন অনুক্ষণ অনুভব করি। নিজের কথা বাদ দিলেও আর যারা আমার মুখের পানে চেয়ে থাকে তাদের ক্ষুধার্ত চোখগুলির কথা মনে হতেই পিছিয়ে যাই। দেখেও তাই দেখতে পাই না। বুঝেও না বোঝার ভান করি।

এক এক সময় মনে হয় ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। কাজ করেও কাজের আনন্দ পাই না।

মালিককে বললাম, যে মাল-মসলা দিয়ে রাস্তা হচ্ছে দুটো বর্ষাও যে টিকবে না। অত্যন্ত বিলো-ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাজ হচ্ছে কিন্তু।

জবাব পেয়েছিলেম, এইটিই নাকি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাজ। নইলে ব্যবসা চলে না। তুমি এতদিন এ লাইনে থেকেও যে এমন অবুঝের মত প্রশ্ন করবে এ আমি আন্দাজ করতে পারিনি। ভুলে যেও না ব্যবসা সবসময়ই ব্যবসা……

কথাটা অস্বীকার করব না। সেই জন্যেই আমি চাকরী করছি। আর ওঁরা করছেন ব্যবসা।

আজ শনিবার। বিকেল চারটে। এখনও টাকা এসে পৌঁছাল না। দুটোর মধ্যেই প্রতি সপ্তাহে আসে। বিলম্বের কারণ জানি না। মজুরদের কি জবাব দেব জানি না। ওরা লাইন দিয়ে বসে আছে। চোখে মুখে অধীর আগ্রহ নিয়ে। ওদের মনের কথা আমি জানি, আমি নিজেও ওদেরই একজন। সপ্তাহের পারিশ্রমিক না পাওয়ার একটা অর্থই হয়। উপবাস।

মনটা হঠাৎ বিদ্রোহ করতে উদ্যত হলো। শিব বাবু আসছেন। প্রতি শনিবারেই আসেন। বেশী কিছু ওঁর দাবী নেই। একটি বোতলেই তুষ্ট। কথাটা আমার নয়। শিব বাবুর। বলেন, শুধু একটি বেলপাতায়ই তুষ্ট। নাম-মাহাত্ম্য বুঝলে ভায়া।

বুঝি বইকি। ঐ একটি বিলিতি বোতল মানেই বড় একখানি নোট। না বুঝবার কি আছে।

আশ্চর্য্য, ঠিক পিছনে পিছনেই দেখা দিয়েছেন বৃন্দাবন বাবু। ওঁর জন্যে আসে ফারপো থেকে রোষ্ট মুরগী চাওয়া থেকে ফ্রায়েড-রাইস আর চিংড়ি কাটলেট আর কিছু শক্তি। বড় একটা টিফিন-কেরিয়ারে ভরতি হয়ে আসে।

এই দিনটি বাড়ীর দেওয়াল-পঞ্জীতে ওরা নাকি দাগ দিয়ে রাখেন। খানাপিনা আমোদ-আহ্লাদ মানেই প্রকৃত জীবন।……

খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখনও কেউ এসে পৌঁছল না। অথচ একটু পরেই আসবেন ঘোষাল সাহেব। আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ইনি কথা বলেন কম। খানাপিনা আমোদ আহ্লাদ পছন্দ করেন না। ঘড়ি ধরে আসেন—ঘড়ি ধরে চলে যান। সময়ের অনেক মূল্য তাঁর কাছে। আমাদের মালিক ওর বন্ধুলোক বলেই নিজে আসেন। নইলে…নইলে আমাকেই ছুটতে হতো তাঁর কাছে। কথাটা ঠিক। তাই উনি আসা মাত্র

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে বাঁ হাতে খামটা ধরিয়ে দিয়ে ডান হাতে কলম গুঁজে দিয়ে কাগজপত্র এগিয়ে দিই। ওঁর সই মানেই আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাজের সারটিফিকেট হস্তগত হওয়া।

মোটর-বাইকের ফট ফট আওয়াজ কানে এল। শিব বাবু আর বৃন্দাবন বাবু আড়ালে সরে গেলেন। বড় সাহেবের একেবারে সামনা সামনি পড়তে রাজী নন ওঁরা। কিন্তু আমি ত লুকিয়ে থেকেও পার পাব না। ঘোষাল সাহেবের খাম প্রস্তুত আছে। ভিতরের বস্তুই এখনও এসে পৌঁছায়নি। এতক্ষণে আমি সপ্তরথী বেষ্টিত হলাম।

সকলেই অপেক্ষা করছে, আর তীব্র অস্বস্তিতে আমি ছটফট করছি।

মোটর গাড়ীর হেড লাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল। অপেক্ষমান মজুরদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। হেড লাইট আবার নিভে গেল। বার কয়েক জ্বলে নিভে একসময় সত্যসত্যই একটা গাড়ী এসে আমার তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়াল। মজুমদার মশাইয়ের গাড়ীই বটে।

মজুররা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। ঘোষাল সাহেবেরও হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। আদেশ করলেন, তাঁর খামটা সর্ব্বপ্রথম রেডি করতে। অনেকটা মূল্যবান সময় ইতিমধ্যেই তাঁর নষ্ট হয়েছে।

অগ্রাধিকার ঘোষাল সাহেবকে দিতেই হলো। বাঁহাতে খামখানি পকেটে পুরে ডান হাতে একটা সই করে তিনি চলে গেলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাটি ফুঁড়ে আমার দু পাশে এসে দাড়ালেন শিব বাবু আর বৃন্দাবন বাবু। তাঁদেরও অভিযোগ আছে। এক জনের নেশা জমবে না, আর একজনের ক্ষিদে মরে গেছে। সুতরাং এবার তাঁদের পালা। দিতে হলো।

শিব বাবু বোতল বগলে করে হেলে-দুলে মাঠের পথ ধরলেন। বৃন্দাবন বাবুও টিফিন-কেরিয়ার হাতে তাঁর পিছু নিলেন।

চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। মজুররাও উঠে দাড়িয়েছে। জমাট অন্ধকারের মত চতুর্দিক থেকে আমায় ছেঁকে ধরেছে। ওদেরও সময়ের একটা দাম আছে বইকি। এ বলে, আমায় আগে ও বলে আমায় আগে। কেউ বলে অনেক দূরে যেতে হবে। কেউ বলে চাল নিয়ে গেলে তবে রান্না হবে। চতুর্দিকে অশান্ত গুঞ্জন।

শুনছি……দেখছি…দেখতে দেখতে একে একে সব মুছে গেল। ঘোষাল সাহেব, শিবনাথ, বৃন্দাবন বাবু এমন কি মজুর দলও। মজুমদার মশাইর গাড়ীটাও অদৃশ্য হয়েছে।

আমি নিঃশব্দে বসে আছি দমদম অঞ্চলের একটি বাগান-বাড়ীর একেবারে শেষ প্রান্তে, ছায়া-ঘেরা আম বাগানের একটি কাঠের বেঞ্চের উপর। বাগান পার্টিতে গেছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। একদল খাওয়া দাওয়ার তদারকে ব্যস্ত, আর একদল বসেছে তাস খেলতে। নিরামিষ খেলা নয়। আমার ভাল লাগেনি। আমি গরীবের ছেলে। মাথার ঘাম পায় ফেলে পরিবার প্রতিপালন করতে হয়। পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তাই হয়ত আমার ভাল লাগেনি। সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়েছি।

বসে আছি। একেবারে একলা। চেয়ে আছি সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে। কাছাকাছি গোটা-কয়েক কুকুর চুপ চাপ বসে আছে। মনে হয় সাগ্রহে কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে। আরও কিছু দূরে লাইন দিয়ে বসে আছে কয়েক ঝাঁক শকুন। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল কুকুরগুলো। শকুনগুলিও মাথা তুলে কিছু লক্ষ্য করল।

কারণটা অল্প পরেই বোধগম্য হ'ল। জনা-আটেক লোক একটা মরা গরু বয়ে নিয়ে আসছে।

দুজন লোক হঠাৎ ছুরি হাতে যেন মাটি ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করল। আশ্চর্য্য এতক্ষণ কাউকে চোখে পড়েনি। সম্ভবত ওরাও কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছিল। গরুটিকে মাঠের মাঝে ফেলে দিয়ে লোকগুলি পিছন

ফিরতেই ওদের হাতের ছুরি ঝলসে উঠল সূর্য্যের আলোয়। লোক দুটি কথা বলছে কিন্তু হাত দ্রুত চলছে। আমার চোখের সামনে অতবড় জন্তুটার দেহ থেকে চামড়া খসিয়ে ফেলল। তারপর অতি দ্রুত চামড়াখানি একটি বাঁশে বেঁধে নিয়ে দুজনে কাঁধে তুলে নিয়ে প্রস্থান করল।

এগিয়ে এল অপেক্ষমান কুকুরগুলি। ধারাল দাঁতে ছিঁড়ে খেতে লাগল গোমাংস, নরম আর থল থলে অংশগুলি থেকে।

…এগিয়ে এল শকুনের ঝাঁক। ভাল লাগল না কুকুরগুলির। দাঁত বার করে মুখ ভেংচাল। বারকয়েক ডেকে উঠে প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু দলবদ্ধ শকুনের পাখার তাড়নায় আর ধারাল ঠোঁটের প্রচণ্ড আঘাতে শেষ পর্য্যন্ত পালাতে বাধ্য হল। যেটুকু পেয়েছে তাতে ওরা খুশী নয়, তৃপ্ত নয়। চলে যেতে যেতেও মুখভঙ্গী দ্বারা এটা জানিয়ে গেল কুকুরগুলি।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস খাচ্ছে শকুনের দল। মহানন্দে নেচে নেচে কখনও এগিয়ে আসছে, কখনও যাচ্ছে পিছিয়ে। কখনও নিজেদের মধ্যে কমড়া-কামড়ি করছে—পাখার ঝাপটা মারছে আবার একসঙ্গে খুবলে খুবলে মাংস তুলে নিচ্ছে।

দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। বীভৎস কিন্তু সত্য, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সারা দেহটা কেমন যেন গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছে। অথচ দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলাম না। অনুভব করছিলাম জীবনের জীবন্ত রূপ। সত্য কিন্তু সুন্দর নয়। প্রয়োজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর লোভের…

চমকে উঠলাম—মাংসের লেষ মাত্র অবশিষ্ট নেই। চোখের সম্মুখে পড়ে আছে শুধু একটি হাড়ের খাঁচা।

বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশে প্রচুর কাল মেঘ। বাতাসের লেশমাত্র নেই। অসহ্য গরম হয়তো এখুনি বৃষ্টি আসবে।

অনেকক্ষণ চলে গেছেন শিবনাথবাবু। ঘোষাল সাহেবের কথা আলাদা। তিনি সর্ব্বদাই দ্রুত আসেন দ্রুত চলে যান।

মজুররাও তাদের পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নিয়েছে। এখনও চলে যায় নি। সময় হলে যাবে। আগামী কালের ভাবনা ঘুচেছে তাইতেই খুশী।

কেউ কেউ এগিয়ে এল। জানতে চায় রাতে আমি কি খাব।••সব ঠিক আছে বলে বিদায় দিলাম। তবুও সকলে চলে যেতে পারেনি।

মজুমদার মশাই সইকরা কাগজপত্র হাতে পেয়েই চলে গেছেন। যাবার আগে নতুন করে কিছু সদুপদেশ দিয়ে যেতে ভোলেন নি।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই সঙ্গে মেঘের গর্জ্জন। মজুরদের মধ্যে তখনও যারা যায়নি তাদের ধমকালাম। টাকা পেয়েছিস ত এখন চলে যা। ওদের নিজেদের মধ্যে ফিসফাস কি কথা হল। তারপর দুজন বাদ আর সকলে চলে গেল। ওরা আর কি চায়!

কিছুই ভাল লাগছিল না।

মজুমদার মশাই, ঘোষাল সাহেব, শিবনাথবাবু অথবা বৃন্দাবনবাবু কাউকেই এই মুহূর্ত্তে ভাল চোখে দেখতে পারছি না। এরা সকলেই সগোত্রীয়। আমি শুধু ভাবছিলাম তাদের কথা যাদের অন্য কোন পথ নেই—প্রসাদ খুঁটে খেয়েই জীবন ধারণ করতে হয়। আমার অনুকম্পা সহজাত। আমি নিজেও যে এদেরই একজন।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা তারপরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়া শুরু হল। আমার রাত্রের আহারের একটা ব্যবস্থা করে দিতে যারা তখনও চলে যেতে পারেনি এতক্ষণে আচ্ছাদনের নীচে এসে দাঁড়াল।

তিরস্কার করতে গিয়েও পারলাম না। কেন যে এতক্ষণ চলে যেতে পারেনি, কোথায় যে ওদের আটকাচ্ছে তা অনুভব করলাম। ক্ষুধার মর্ম্ম ওরা বোঝে, উপবাসের জ্বালাটাও ওদের জানা।

বৃষ্টির বেগ আরও বৃদ্ধি পেল। এতগুলি লোকের সারাদিনের পরিশ্রম হয়ত বৃথা যাবে। মাটি চাপা দিয়ে যে অন্যায়কে ঢাকা দিয়েছিলাম কাল সকালে, হয়ত সেই অন্যায়গুলিই আত্মপ্রকাশ করে মুখ ভেংচাবে। নতুন করে মাটি চাপা দিয়ে আমাদের অপকর্ম্ম ঢাকা দিতে হবে। যেমন করে চাপা দিয়ে চলেছি দিনের পর দিন।

•

পরদিন সকাল বেলা ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গল। খবর পেলাম গত রাত্রের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে রাস্তার সমস্ত মাটি ধুইয়ে নিয়েছে। তাছাড়া প্রায় একশ গজ রাস্তা থেকে কে বা কারা সবকখানি ইট তুলে নিয়ে গেছে।

অকস্মাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল, অবস্থাটা ভাল করে বুঝে উঠবার আগেই দমদম বাগান বাড়ীতে দেখা মরা গরুর পরিত্যক্ত হাড়ের খাঁচাটা চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কারা যেন ভাঙ্গছে হাড়গুলি। ওগুলিও নিশ্চয় কাজে লাগবে।···

বাবু···ডাকলে মজুর সর্দ্দার।

বর্ত্তমানে ফিরে এলাম।

মজুর সর্দ্দার বলছিল, কি হবে বাবু?

মনে হল ভয় পেয়েছে। কিন্তু আমার ভয় পেলে ত চলবে না। আমি মজুমদার মশাইর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, আমি ম্যানেজার, সুপারভাইজার এবং ইঞ্জিনিয়ার। পথ একটা আমাকে বার করতেই হবে। নইলে অনুপযুক্ত বলে ধিক্কার দেবে। রুজি-রোজগারে হাত পড়বে।

সুতরাং—বুদ্ধি আমাকে পথ দেখাল।

বললাম, আর নতুন করে ইট নয় সর্দ্দার, এবারে শুধু রাবিশ আর মাটি—ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। মজুর সর্দ্দার সেলাম করে চলে গেল।

তবুও মজুমদার মশাই বলেন, আমি নাকি ব্যবসা বুঝিনা।

রামপদ মুখোপাধ্যায়

মডার্ণ জুটমিল সঙ্ঘ থেকে আমরা এসেছিলাম ভোলাবাবুর কাছে—ওঁর পরামর্শ গ্রহণ করতে। সম্প্রতি দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে সঙ্ঘ মাগ্‌গীভাতা সংস্কারের দাবি জানিয়েছিল—মালিকপক্ষ কর্ণপাত করেনি। ওরা বলেছিল, কিছুদিন আগে একদফা মহার্ঘভাতা বাড়ানো হয়েছে, আর বাড়ানো সম্ভব নয়। ঘন ঘন দফায় দফায় এই কাজটি হলে মিলেরও দফা নিকেশ হওয়ার সম্ভাবনা। অতএব……

আমরা জানিয়েছিলাম—এই দাবি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার দিনের বাজার দর নামিয়ে আন—আমরা পুরো ভাতাটাই বরবাদ দিতে রাজী আছি।

কোন যুক্তি দিয়ে ওদের নরম করা যায়নি। তাই ভোলাবাবুর কাছে এসেছিলাম অতঃপর কি ভাবে অগ্রসর হব সেই পরামর্শ নিতে।

এই অঞ্চলের সবাই জানে ওঁর মত কৌশলী আইন জানা সঙ্ঘ-হিতৈষী মানুষ খুব কমই আছে। উনি কিন্তু কোন সঙ্ঘের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে যুক্ত নন। ওঁর নামে কিছু দুর্নাম আছে। বুদ্ধিমান মানুষদের সম্বন্ধে এসব রটনা থাকেই।

একটা সদাগরী আপিসে কাজ করেন। কাজ করতেন মানে আপিসের কাজ নয়, এ সেকশন সে সেকশন ঘুরে ঘুরে বিক্ষুব্ধ মানুষের মত এবং মনগুলিকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতেন, উর্দ্ধতন কর্তাদের বিরুদ্ধে টিপ্পনী কাটতেন, বুদ্ধির প্যাঁচ কষে ওদের বে-কায়দায় ফেলে আনন্দ উপভোগ করতেন। কখনো পোষ্টার সাঁটতেন দেওয়ালে, ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মার্চ করার ভঙ্গিটা বাতলে দিতেন, মুখে ইন্‌কিলাব ধ্বনি দিতেন সজোরে এবং বেঞ্চি বা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে 'ভাই সব' বলে গরম বক্তৃতার গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজতেন। আইনকানুনও মোটা-মুটি জানতেন আর প্রতিপক্ষকে জব্দ করার মুষ্টিযোগ যা দিতেন—তা অব্যর্থ ফলপ্রদ। অথচ কোন সঙ্ঘে নাম লিখিয়ে সভ্য হননি, কোন একটি পার্টির হয়ে পুরোপুরি কাজও করেননি। তবু ওঁর কাজের গুণাগুণ বিচার করে আমরা মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম—উনি বামাচারী। কোন কিছু গড়ার চেয়ে ভাঙ্গার দিকেই ওঁর প্রবণতা—ওতেই ওঁর আনন্দ যেন বেশী। আর সেই কর্ম্মে ওঁর বুদ্ধির ধারটা শান-দেওয়া ছুরির মত ঝক ঝক করে।

কিন্তু এত করেও উপরওয়ালাদের সঙ্গে পেরে ওঠেননি।......তৃতীয় শ্রেণীর করনিক হয়েই বেশ কিছুদিন কেটেছিল আপিসে—তারপর একদিন অকালে অবসৃত হয়েছিলেন চাকরি থেকে। কাজটা নিখুঁত ভাবে করেছিল উপরওয়ালারা, আইনের ফাঁক ছিল না।

চাকরি গেলেও উনি বেকার হননি। এখনকারদিনে বেকার হওয়া সহজ নাকি। এখন যত আপিস তত শ্রমিকসঙ্ঘ। অভাব যত -বিক্ষোভ তত। এক নদীতে অসংখ্য ঢেউ। তার বাহার ও বৈচিত্র্যের তুলনা নাই। জয় মা কালী বলে সেই নদীতে ডুব দিতে পারলে মণি মুক্তা কিছু না কিছু হাতে উঠবেই।

উঠছিলও কিছু কিছু।

যেমন: খবর এলো—এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়াবে কোম্পানী। কর্ম্মীরা এসে বলল, দাদা—এর একটা বিহিত করতে হয়।

ভেরি গুড। খুব বড় বড় কতকগুলো ঝাণ্ডা তৈরী কর—জনকয়েক জোর-আওয়াজদার ছেলে যোগাড় কর—আর কিছু চাঁদা—দেখিয়ে দিচ্ছি মামীমার খেল। ইন্‌কিলাব—

: দাদা রোজ রোজ ট্রেণ-লেটের জালায় হয়রান হয়ে গেলাম। ক্যাজুয়াল লিভগুলো এমনি এমনি গচ্চা যাচ্ছে।

বটে—দিচ্ছি দাওয়াই। কে কে পিছনে আসবে হাত তোল। ইন্‌কিলাব

শতকরা শতজনই পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ফলে গার্ড ও ইঞ্জিন-চালক প্রভৃত হয়ে হাসপাতালে চালান, ট্রেণ-কামরা ও ষ্টেশনের আসবাবপত্র তছনছ, আপ ডাউন দুই লাইনে রাত বারোটা পর্য্যন্ত অচল অবস্থার সৃষ্টি। তারপর ট্রেণ চলাচল নিয়মিত হোক, নাই হোক মনের ভাব খানিকটা নেমে গেল তো।

: দাদা, শুনছি হরতালের দিন সরকারী বাস বার হবে।

: বটে! কয়েক টিন পেট্রোল যোগাড় রাখবে কিছু বাখারি আর এক বাণ্ডিল ন্যাকড়া! আর রাস্তার ধারে আধলা ইঁট। ইন্‌কিলাব—

সেইদিন বেলা আটটার পর রাস্তায় বাসের টিকিটি দেখা যায়নি।

: দাদা, ও রাস্তাটায় নাকি একশো চুয়াল্লিশ ধারা রয়েছে—ভুখা মিছিল নিয়ে যাওয়া চলবে?

কুছ্‌পরোয়া নেই—কতকগুলো উদ্বাস্তু দুঃখী মেয়ে যোগাড় কর। কোলে তাদের বাচ্চা থাকবে। নিজের নিজের বাচ্চা না হলেও ক্ষতি নাই—সব জিনিসই ভাড়ায় মিলবে। ওরা থাকবে সব আগে। ইন্‌কিলাব—

এমনি বিবিধ ধরণের অভিযোগে বিচিত্র সব ব্যবস্থাপত্র দিতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন ভোলাবাবু। ওঁর কাছে এসেছিলাম এই ভরসায়—একটা সুরাহা হবেই হবে।

দুয়োরের কড়াটি সবে নেড়েছি—পাশের বাড়ি থেকে নন্তুদা বেরিয়ে এলেন। হাত উঠিয়ে বললেন, চুপ-চুপ—

বললাম, আমরা ইউনিয়ন থেকে আসছি—

জানি। সেই জন্যেই থামতে বলছি। গলা খাটো করে বললেন, ইউনিয়ন, মজদুর-সভা ইন্‌কিলাব এইসব কথা শুনলেই ভোলাদা অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

আমরা আকাশ থেকে পড়লাম। এইসব কথা শুনলে অসুস্থ হবেন ভোলাদা! বরং না শুনলেই—

আরও এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললেন নন্তুদা, এখানে গোল করো না- ওই চায়ের দোকানটায় বসিগে চল—আলোচনা ওইখানেই হবে। ভয় নেই দু'কাপের বেশি চা দাবী করব না—যতক্ষণ গল্প চলবে ততক্ষণই বিড়ি—তার বেশি একটিও নয়। তবে চায়ের সঙ্গে দু'চার খানা লেড়ো ছাড়লে গল্পটা রংদার হবে।

আমরা মাথা নাড়লাম। কিন্তু কিসের গল্প? আমরা গল্প শুনতে আসিনি—

হাসলেন নন্তুদা, জানি গল্প বানাতে এসেছ। এইসব ব্যাপারে গল্প তৈরি করা সহজ—স্বাভাবিক। সেই রকম একটা গল্পই শোনাবো যা আপ্‌সে তৈরী হয়েছে।

শুনলে বুঝতে পারবি কেন ভোলাদা আজ ইনকিলাব মার্কা শ্লোগানগুলো সহ্য করতে পারে না?

আমরা তো অবাক। নন্তুদা বলে কি!

নন্তুদা হেসে বললেন, শোন তবে। তার আগে ভোলাদার একটা বিখ্যাত বচন তোরা মনে রাখবি। উনি বলেন, সব জিনিষের একটা সোজা লাইন আছে যা ধরতে পারলে কাজগুলো খুব সহজ হয়।

তা সোজা লাইনটা কি? আমি শুধোলাম।

নন্তুদা সোজাসুজি জবাব দিলেন না। মুচকি হেসে বললেন, এক একটা বিষয়ের এক একটা মেড ইজি আর কি!

মেড ইজি ছাড়া গতি কি! আমাদের আয়ু অল্প, বিঘ্ন বহু - আবার সমস্যা-শাস্ত্রেরও কূলকিনারা নাই। আচ্ছা ধর, যে ছটা রিপু আমাদের দেহে রয়েছে এরা সবাই মানুষকে ঘায়েল করে তো? আচ্ছা এর মধ্যে সব চেয়ে প্রবল কোনটি?

এবার মেড ইজির পাঠগুলি গোলমাল হয়ে গেল। আমরা এক একজন এক একরকম জবাব দিলাম।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,……

নন্তুদা গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে চলেছেন। আমরা বিরক্ত হয়ে বললাম, গল্পের মধ্যে তত্ত্বকথা এনে ফেলছেন, গল্পের জাত মারা যাচ্ছে।

হো হো করে হেসে উঠলেন উনি। এই যুগে খাঁটি কোন জিনিষটা? জাতের পাঁতিই বা মানছে কে! দূর দূর—তোরা টাাডস। কোন কর্ম্মের নয়। ওরে বোকারাম—যা বললি, ওর কোনটাই নয়—যেটা বাদ দিয়েছিস সেইটে প্রধান। এর নাম মাৎসর্য্য। আমার উন্নতির কথা শুনলে তোর বুক চিন চিন করার জ্বালা বুঝতে পারিস? এটা তোর আমার কথা নয়—চিন্তা নয়, সব মানুষের মনের ফল্গুধারা। এটি হল মনের অগ্নিতত্ত্ব। যে জানে সেই মাস্টার। এরই কৃপায় ট্রাম বাস রেল কামরা পোষ্টাপিস পোড়ে—ষ্টেশন ব্যাঙ্ক ট্রেজারি লুটপাট হয়—সঙ্ঘ সমিতি জোরদার হয়, আবার বরবাদও হয় অনেক কিছু। এই অগ্নি-তত্ত্ব আয়ত্ত ছিল ভোলাদার, আর তারই সূত্র ধরে আত্মতত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। তাই যখন চাকরি গেল ভেঙ্গে পড়েননি। ছেলেদেরও ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন সরকারী আধা-সরকারী দপ্তরখানায়।

আমি বললাম, জানি। ওঁর বড় ছেলে অধরবাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পুলিশ বিভাগে ঢুকে গেল, মেজ অসীম ঢুকলেন রেল আপিসে, সেজ অমল ষ্টেটবাসে। আর কে কি করছেন অবশ্য জানি না।

নন্তুদা বললেন, আর মাত্র একটি অনিল। সব চেয়ে ছোট ছেলে। সবে কলেজের আওতা থেকে বেরিয়ে বাপের কাছে ট্রেনিং নিচ্ছিল। ছেলেটি একটু জেদি—চেষ্টা-চরিত্র করেও কোন কাজে ওকে ঢোকাতে পারেন নি। কলেজে থাকতেই ইউনিয়ন ঘেঁষা হয়েছিল—কলেজ ছেড়েও সেই অনুরাগ কাটেনি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে শক্তি-চালনার মহড়া ভাঁজছিল। ভোলাদা আমাদের কাছে গলা ফুলিয়ে প্রায়ই বলতো, জানিস নন্তু, এই ছেলেই আমার যোগ্য উত্তরাধিকারী। ওর তিন দাদা কাজ করছে, ওর তো অন্নচিন্তা চমৎকারা অবস্থা নয়—করুক না জনসেবা। আমার বয়স বাড়ছে,'সব জায়গাতে তালিম দিতে পারিনে—ওকেই পাঠাই প্রতিনিধি করে। তা বলতে নেই—চমৎকার কাজ করে অনিল। এরই মধ্যে নাম করেছে ভাল কর্ম্মী বলে।

একবার যেন বলেছিলাম, আচ্ছা ভোলা দা—ওর এই কর্ম্মটি অন্য ভায়েদের সঙ্গে ক্লাশ করে না? মানে—ওরা সবাইতো সরকারী-আধা সরকারী, কর্ম্মচারী—

আজান
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

াসী প্রেস, কলিকাতা

ভোলা দা বলেছিলেন, তাতে কি—সাধ করে কি ওদের সরকারী আপিসে কাজ নিইয়েছি ? ও সব ডিপার্টমেন্টের যাতে উন্নতি হয়—সাধারণ যাতে উপকৃত হয়—সেইজন্য মানে…

মানেটা সেদিন যা বুঝেছিলাম—আজও তার অন্য অর্থ খুঁজে পাইনি। তা সে যাক,—অত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যাও তোদের ভাল লাগবে না—মোটামুটি গল্পটাই শোন।

বেঞ্চির উপর পা তুলে বসলেন নন্তুদা। আর একটা বিড়ি ধরিয়ে কসে টান দিলেন এবং নাক মুখ দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ধার করে একটি আরামের শব্দ তুলে বললেন, আচ্ছা—বল দেখি এক মাসের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটেছিল—যা আজও আমরা ভুলতে পারি নি।

প্রশ্নটা অদ্ভুতই মনে হল। এক মাসের মধ্যে তো অনেকগুলি ঘটনাই ঘটেছে, প্রতিদিনই ঘটছে—যা ঘটার পরক্ষণেই ভুলে যাচ্ছি আমরা। মন হল নদীর জল—বয়েই চলেছে—

বিস্মৃতির সমুদ্রের পানে তার কটা ঢেউ, কটা ঘূর্ণা কতটুকু উচ্ছ্বাস কে মনে রাখতে পারে। ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললাম, আবার পরীক্ষা শুরু করলেন দাদা। আমরা কিন্তু সামনের কঠিন পরীক্ষার কথাই ভাবছি।

হাসলেন নন্তুদা, তা বটে—আত্মচিন্তাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ চিন্তা—তোদের আর দোষ কি। কিন্তু হাওড়া স্টেশনের সামনে সেই জলজ্যান্ত ঘটনা—যা একমাসও পেরোয় নি—ভুললি কি করে !

ওহো, সেই ট্রাম বাস পোড়ানো ইট ছোড়াছুড়ি—অর্থাৎ খণ্ডযুদ্ধ।

হিয়ার ইউ আর। চীৎকার করে উঠলেন নন্তুদা। মনে পড়ছে ? কিন্তু কেমন করে ঘটলো তার সূত্রটুকু ! মনে পড়ছে না ?

বললাম পড়ছে বইকি। পাবলিকের সঙ্গে পুলিশের লড়াই।

নন্তুদা বললেন, বারে ওস্তাদ—পাবলিক ভার্সেস পুলিশ। ভাল ভাল! পাবলিক কাকে বলে—বল দিকিনি ?

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। মনে হল উনি আমাদের ব্যঙ্গ করতে এখানে ডেকে এনেছেন। নীরস কণ্ঠে বললাম জানি না।

নন্তুদা আমার ক্রুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করেও মেজাজ হারালেন না। স্থির কণ্ঠে বললেন, ঠিক বলেছিস আমিও জানি না। ও দুটো জিনিসের তফাৎ এত সূক্ষ্ম যে বোধ-বিচার আনা কঠিন। উর্দি মানে আপিসের খোলস গায়ে থাকলেই পুলিশ—না থাকলেই পাবলিক। এই তোদের কথাই ধর না—এখন তো তোরা দিব্যি পাবলিক—আবার সরকারী দপ্তরে বসলেই সরকারের দল। তেমনি লড়াই জমেছিল হাওড়া স্টেশনে—দুটো আলাদা আলাদা দল—যদি মেজাজ বেশ থাকে আনন্দের, কিন্তু একই পরিবারের সন্তান। এমনি হয়েছিল তখন যারা বাস চালাচ্ছিল। পথে শান্তিরক্ষা করছিল, তারা হল সরকার পক্ষ। একদল চলেছিল চাকরি করতে, একদল বজায় রাখছিল চাকরি। পাবলিক আর পুলিশ। অর্থাৎ যারা আপিস যাবে বলে বাস ধরতে ছুটছিল তারা হল অপর পক্ষ, পাবলিক। এখন দল দুটো কেমন করে তৈরী হল শোন।

বেবী ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীর কারখানায় ধর্মঘট চলছিল বাইশ দিন। ওরা একটা মিছিল নিয়ে এগোচ্ছিল হাওড়া পুলের দিকে—হঠাৎ উল্টোদিক থেকে একখানা বাস এসে ধাক্কা মারলো মিছিলের গায়ে। বাসটার ব্রেক নাকি বিকল ছিল।

ইস! তারপর ?

মিছিল তো ছত্রভঙ্গ। কিন্তু তার আগেই সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মিছিলের আগে আসে পতাকা ধরে দুটি ছেলে। এগিয়ে আসছিল. তাদের একজনের ঘাড়ে এসে পড়লো বাস—আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি—

ইস ! গুরুতর জখম ! আমরা চমকে উঠলাম ।

জখম ! একেবারেই খতম । তারপরে জ্বলে উঠলো আগুন । দুটি দলে ভাগ হয়ে গেল জনতা । লাঠি-সোটা ইট পাটকেল সোডার বোতল পেট্রোল দেশলাই সব মিলিয়ে হৈ হৈ কাণ্ড । তারপর এলো আর্মাড পুলিশ, কাঁদানে গ্যাস, দমকল । তখন অনেকগুলো বাস দাউ দাউ করে জ্বলছে—বিস্তর মানুষ স্ট্রেচারে, মরেছেও একটি ।

এইসব যখন চলছে তখন ভোলাদার কাছে খবর এলো, অমল মানে মেজ ছেলে যে স্টেট বাসে চাকরি করে, গুরুতর রূপে আহত হয়ে হাওড়া হাসপাতালে । উনি তো ছুটলেন । গিয়ে দেখেন মন্দের ভাল—আঘাত গুরুতর হলেও সামলে উঠবে ছেলে । তবে চিরজীবনের মত ইনভ্যালিড হয়ে থাকবে । একটা পেনসন অবশ্য পাবে তাতে আর সান্ত্বনা কি ! সেইখানে থাকতেই, হাওড়া স্টেশন থেকে আর একটা ফোন এলো । বড় ছেলে অধীর ফোন করছে, বাবা শীগগির চলে আসুন । ওঁর বুক ধড়ফড় করে উঠলো । ও কি জখম হয়েছে ? রুদ্ধশ্বাসে ফোনেই বললেন, তুই ভাল আছিস তো ? আছি । সামান্য দু'চারটে ঢিল গায়ে লেগেছে—ব্যথা মরতে দু'চার দিন নেবে । তার চেয়েও সীরিয়াস ব্যাপার—চলে আসুন ।

শুনে ছুটলেন হাওড়া স্টেশনে ।

হাঁ, ছুটেই গেলেন—মানে ট্যাক্সী করে । গিয়ে কি দেখলেন ? যা দেখলেন সহ্য করতে পারলেন না, চীৎকার করে উঠলেন—আগুন আগুন । তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়লেন ।

আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম, কি ব্যাপার ?

দু'কাপ চা শেষ হয়ে গিয়েছিল—শেষ বিড়িটাও নিবু নিবু । তাতেই একটা শেষ টান দিয়ে নিঃশ্বাসটা জোরে ফেললেন নন্তুদা । গিয়ে দেখলেন, সেই বাস-চাপা পড়া ছেলেটিকে ওরা শুইয়ে রেখেছে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের প্ল্যাটফরমে । গলায় ফুলের মালা, একরাশ ফুলের নরম বিছানায় শুয়ে পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে ছেলেটি ।

শেষটুকু শুনবার প্রতীক্ষায় আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে রয়েছি । নন্তুদাও এক মুহূর্ত থেমে অপার গাম্ভীর্যে যেন থমথম করতে লাগলেন ।

আমাদের দারুণ উৎকণ্ঠা—শুধু বলতে পারছি না, তারপর ?

বেশ কিছুক্ষণ এমনি অস্বস্তিতে কাটার পর নন্তুদা রহস্যগ্রন্থি উন্মোচন করলেন । খুব আস্তে আস্তে বললেন, ছেলেটি আর কেউ নয়—অনিল । ওঁর সংগ্রামী মনোবৃত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ।

আমরা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম । তারপর কোন কথা না বলে উঠলাম ।

নন্তুদা আমাদের পাশে পাশে খানিকটা এলেন । আমরা ভিন্নমুখী হবার আগে নীচু গলায় বললেন, তক্ষণি ভোলাদাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল । অনেকক্ষণ পরে ওঁর জ্ঞান হয় । জ্ঞান হবামাত্র চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—আগুন আগুন । হাসপাতালে ছিলেন তিন দিন—তিন দিনই ঘোরের মধ্যে ছিলেন, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতেন, আগুন আগুন ।

এখন সেই ভাবটা আর নেই কিন্তু সমিতি মজদুর ইউনিয়ন শব্দগুলো কানে গেলেই কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েন । দু' কানে হাত চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বলেন, আগুন আগুন ।

সম্পাদকীয় মন্তব্যে বীরবলী ভাষ্য

রণজিৎকুমার সেন

সাময়িকপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল প্রধানতঃ তিন কালের তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রের সম্পাদক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। অথবা কথাটা এভাবে ঘুরিয়ে বলা যায় যে, প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় ব্যক্তিপুরুষের সম্পাদনার ফলে বাংলার তিনকালের তিনটি মাসিকপত্র সাময়িকপত্র-জগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। যদিও এদের কোনোটিরই আয়ু শৈশব অতিক্রম করে বাল্যে বা কৈশোরে গিয়ে পৌঁছায়নি, তবু সেই অল্প-কালের মধ্যেই এই পত্রিকাসমূহ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বাংলা সাময়িকপত্র-জগতে একটা বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। এই পত্রিকা তিনটি হচ্ছে—'সবুজপত্র' 'অলকা' এবং 'রূপ ও রীতি'।

এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী নিজেই লিখেছেন :…"সাহিত্য বলো, শিক্ষা বলো, ধর্ম বলো, অর্থাৎ যেসব ব্যাপারকে আমরা spiritual বলি, সবই দাঁড়িয়ে আছে একটা economic ভিত্তির উপর। সবুজপত্র যে বেশিদিন টেকেনি, তার কারণ সবুজপত্রের economic ভিত্তি ছিল কাঁচা। এর বহুদিন পরে আমি কিছুদিন 'অলকা' নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদক হই। সে পত্র আজও টিকে আছে। কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।—আমি একজন পুরণো লেখক। সবুজপত্রের যুগে বৃদ্ধেরা আমার লেখার আদর করতেন না; আর এ যুগে আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এখন বোধ হয় যুবকেরা আমার লেখায় রস পান না। তা হলেও যুবকেরা তাঁদের সম্পাদিত নব নব পত্রিকায় আমাকে লিখতে অনুরোধ করেন। এর কারণ, নূতন লেখক ও পুরণো লেখকের প্রভেদটা আসলে কুষ্ঠির হিসেব নয়। কোনও কোনও নূতন লেখক পুরণো লেখক হন; আবার অনেকেই তা হন না। এ দুয়ের রচনায় স্পষ্ট প্রভেদ আয়ুর প্রভেদ।—সবুজপত্র বন্ধ হবার পর বহু ক্ষুদ্র পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে, ও দুদিন পরেই তাদের তিরোভাব ঘটেছে। 'রূপ ও রীতি' নামক নব পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ লিখতে আমি সম্প্রতি অনুরুদ্ধ হয়েছি।" …(রূপ ও রীতি : কার্তিক, ১৩৪৭)।

এর খুব কাছাকাছি সময়ে আমি 'রূপ ও রীতি'র সংস্পর্শে আসি এবং কর্মসূত্রে বীরবল শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনাকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন ক্রমে ভারতবর্ষের

দিকে এগিয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ তখনও ইহলোক ত্যাগ করেননি বটে, কিন্তু রোগগ্রস্ত। তাঁর তিরোধান দিবস ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮। তখনও আমি বীরবলের সঙ্গে একই ভাবে যুক্ত। সে কথা আমার সম্পাদিত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের নিবেদনে বলেছি। এখানে আমি প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকীয় রচনার দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখছি এবং পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁর সম্পাদকীয় রচনার ভাষাও যে প্রচলিত বীরবলী ঢংয়ের সাধারণ চলতি ভাষারই অনুরূপ, একথার সত্যতা তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আমি তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিনি। আমি বিভিন্ন সময়ের সেইসব 'প্রমথ' বা 'বীরবলী ভাষ্য'ই সংগ্রহ করেছি—যা তাঁর বিচিত্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে গ্রহণীয় উদ্ধৃতির বিষয় হিসেবে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রধানতঃ 'রূপ ও রীতি' পত্র থেকেই আমি এই উদ্ধৃতি গ্রহণ করেছি। তাঁর এই মন্তব্য সমূহের মধ্যে আমরা যে-বিষয়গুলি পাই, তা হচ্ছে—সাহিত্য, স্বাধীনতা, যুদ্ধ, ডিমোক্রেসী, স্বাধিকার বোধ, ভাষা ও ষ্টাইল, ব্যক্তি-ব্যক্তিত্ব ও মহাপুরুষতত্ত্ব, বার্গসঁর দর্শন, ইকোনমিক শাস্ত্র, হাস্য ও রসিকতা এবং সর্বশেষ বীরবলী ভাষ্যে ব্যঙ্গার্থে আত্মসমালোচনা ও সমাজবিচারে প্রমথ চৌধুরী। শেষোক্ত বিষয়টি যে বিশেষ ইঙ্গিতাত্মক, তা বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন। সহজতম ভাষার মধ্যেও wit and humour প্রমথ চৌধুরীর (বীরবলের) রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানেও সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতো। আমি এবারে বীরবলের সম্পাদকীয় উদ্ধৃতি সমূহ নিম্নে পর পর সাজিয়ে দিচ্ছি :

আজকাল সাহিত্যবস্তু কি, তা নিয়ে নানারূপ তর্ক উঠেছে। সে তর্কের আমি প্রশ্রয় দেব না। কারণ এ তর্কের শেষও নেই, আর কোনো ফলও নেই। যাকে লোকে সাহিত্য বলে, তা তর্কের বহির্ভূত। তর্কের জন্য চাই analysis, আর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চাই নানা মনোভাবের synthesis, এ synthesis-এর কৌশল কেউ কাউকে শেখাতে পারে না, অন্ততঃ তর্ক বিতর্ক দ্বারা নয়। মনের এ জাতীয় স্ফূর্তি আসে মনের অজ্ঞাত দেশ থেকে।

স্বাধীনতার যে অর্থই যথার্থ অর্থ হোক না কেন, আমরা কি আমাদের অধীনতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান, অভ্যাস বড় বালাই। আমরা অধীনতায় অভ্যস্ত বলে অধীনতাকেই অধর্ব স্বাধীনতা মনে করি। বিশেষতঃ আমরা ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছে ইংরাজী শিক্ষা আর ইংরাজী শাসনের ফলে। আমাদের বিশ্বাস আমাদের conslilution অল্পস্বল্প বদ্‌লালেই আমাদের আরও উন্নতি হবে। আমরা ভুলে যাই যে, প্রতি দেশের conslitulion জাতির নানা ক্ষমতা ও অক্ষমতার ফল। constilution জাতি গড়ে না, জাতিই conslitulion গড়ে। (১৩৪৭)

*

'জন্মগত অধিকার' নিয়ে মানুষ জন্মায় না। মানবজাতি বহু আয়াস ও বহুকষ্টে যেসব অধিকার অর্জন করে, তারই নাম বোধ হয় জন্মগত অধিকার।

স্বাধীন জাতের কি বিরাট কর্তব্যের ভার বহন করতে হয়, তা তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।—আজকের দিনে ইংলণ্ডের দিকে একবার চেয়ে দেখুন, কি ভয়ঙ্কর কর্তব্যের ভার সে জাতির ঘাড়ে পড়েছে! স্বাধীনতা রক্ষা করাও এক বিষম ব্যাপার। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সব সময়ে জাতীয় স্বাধীনতার সহায় নয় বলেই তো democracy-র সম্বন্ধে সকলে নিশ্চিন্ত নন।

যে লেখার অন্তরে চিন্তার বালাই নেই, সে লেখাকে কি সুলিখিত বলা চলে? চিন্তা মনের একটি ধর্ম। এ ধর্ম-বঞ্চিত লেখাকে কি কখনও সুলেখা বলা যায়? কেবলমাত্র শব্দের সঙ্গে শব্দের যোজনাকে লেখা বলে না। 'ভাব আছে, সঙ্গে নেই ভাষা'—এও যেমন আক্ষেপের বিষয়, 'ভাষা আছে, সঙ্গে নেই ভাব'—তাও তেমনি আক্ষেপের বিষয়।

Hero হতে হলে বহু লোকের সাহায্য চাই; Martyr একাই হওয়া যায়।

*

পদের পর পদ বসালে ভাষা হয় না, হয় শুধু হযবরল···। পদে পদে chemical compound না হলে বাক্য হয় না,—বলবার ভাষায়ও নয়, লেখবার ভাষায়ও নয়। নানা পদকে বাঁধে ক্রিয়াপদ।—পদ বাদ দিয়ে অবশ্য ভাষা হয় না। তাই আমাদের ভাষায় আরবী ফারসী ইত্যাদি শব্দ বর্জন করবার সমস্যা অনেকদিন থেকে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষা তাই আমাদের সম্পদ না হয়ে বিপদ হয়েছে। কত বাঙলা কথা বাদ দিয়ে তার স্থানে সংস্কৃত শব্দ আনা যায়, এই হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা বহুকাল পূর্বে উঠেছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' নামক পুস্তিকায় দেখতে পাই যে, বহু ফারসী ও আরবী শব্দের একটি লম্বা ফর্দ আছে, যাদের পরিবর্তে নাকি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা যায়। এই একশো বৎসরের মধ্যে এ সমস্যার কোনো চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। এর থেকে অনুমান করি যে, কোনোকালে এর মীমাংসা হবে না।

জীবন্ত ভাষা মাত্রেই পাঁচ মিশেলী ভাষা, সে ভাষার অন্তরে নানা বিদেশী ভাষার শব্দ থাকে, আর তার ফলেই এর সমৃদ্ধি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইংরাজী ভাষা। জীবন নিজের ঝোঁকে চলে, তর্কের ধার ধারে না। বঙ্গসাহিত্য অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আত্মসাৎ করেছে রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্যেই তার পরিচয় পাবেন। ক্রিয়াপদের ও সর্বনাম শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ রাজশেখর বাবুর কাছে গ্রাহ্য হয়েছে। আর কোথায় নিত্যব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ কোথায় ফারসী শব্দ ব্যবহার করা হবে, তার বিচারক স্বয়ং লেখক, পাঠক নন। আমার বক্তব্য এই যে, তর্কক্ষেত্রে অনেকেই Style-এর সঙ্গে ভাষা ঘুলিয়ে ফেলেন। একই ভাষাতে নানা Style-এ লেখা যায়। ইংরাজী, ফারসী, এমন কি বাঙলাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। Style লেখকের নিজস্ব বস্তু। সভাসমিতি করে সকলের Style একই ছাঁচে ঢালতে হবে, এ হেন প্রস্তাব নিরর্থক। কেন না Style-এর পিছনে আছে লেখকের মন।

ফরাসী দেশের মহামনীষী Pascal বলে গিয়েছেন যে—এ বিশ্ব পরিধি মাত্র, তার কোনও কেন্দ্র নেই—রবীন্দ্রনাথ এই কেন্দ্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন নিজের অন্তরে। আমাদের দেশে ধ্যানধারণা যোগ ইত্যাদির লক্ষ্য হচ্ছে এই কেন্দ্র আবিষ্কার করা। রবীন্দ্রনাথের মন চিরকালই এই কেন্দ্রাভিমুখী ছিল। তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর একখানি পত্রে। এ চিঠিখানি তিনি লিখেছিলেন বহুদিন পূর্বে—বিলাত থেকে ফেরবার পথে জাহাজ থেকে। সেই চিঠিখানির ক'টি ছত্র আমি নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। -

'দিনের পর দিন, ঘটনার পর ঘটনা যখন বাইরে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে আসে, তখন বুঝতে পারি, আপনার সত্যকে পাইনি। তখনই এই বাইরের আঘাতগুলো ক্রোধ, লোভ, মোহের তুফান তোলে। অন্তরের মধ্যে এই সমস্ত বহির্ব্যাপারের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেলে তখন এ নিখিলের মহান ঐক্য নিজের ভিতর একান্তভাবে বুঝতে পারি। তাকেই বলে মুক্তি। প্রতিদিনের প্রতি জিনিষের প্রতি ঘটনার খাপছাড়া বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি। এই মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে আছি।' (পথে ও পথের প্রান্তে: ২৬ নভেম্বর, ১৯২৬। জাহাজ)

এই কেন্দ্রের সাক্ষাৎ পেলে মানুষ বুঝতে পারে যে—উদার চরিতানামন্তু বসুধৈব কুটুম্বকম। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের বাণী। রবীন্দ্রনাথও এ সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য থেকে মুক্তিলাভ করলেই আমাদের এ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। কেউ বলতে পারেন যে, এ আদর্শ উপলব্ধি করা ব্যক্তিগত সাধনার ফল। কিন্তু এ ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ব নয়—প্রশস্ত ব্যক্তিত্ব। এ আদর্শ ব্যক্তি-বিশেষের হলেও সার্বভৌম। মহাপুরুষ হচ্ছেন মনোজগতে বিরাট পুরুষ।

•

আজ ৮ই জানুয়ারী ১৯৪ খৃষ্টাব্দে Bergson এর মৃত্যু সংবাদ পেলুম। দুদিন আগে শুনেছিলুম যে, ফ্রান্সের নূতন শাসনকর্তারা ইহুদিদের নির্বাসন দিতে বাধ্য হয়েছেন; একমাত্র Bergson-কেই অব্যাহতি দিয়েছেন। কিন্তু Bergson সে অনুগ্রহ নিতে রাজী হননি। বর্তমান ইউরোপে সর্বাগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক Einstein সর্বাগ্রগণ্য দার্শনিক Bergson ও সর্বাগ্রগণ্য মনস্তত্ত্ববিদ Freud—এঁরা তিনজনই ইহুদি এবং এঁদের দুজনকে Hitler ইতিপূর্বেই নির্বাসিত করেছেন। আর Bergson নিজেই ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন।—Einstein এর কৃতিত্ব আমার অবোধ্য, কারণ আমি আমি বৈজ্ঞানিক নই। কিন্তু Bergson-এর আমি মহাভক্ত। যে সব গুণের জন্য ফরাসী লেখকরা জগৎপ্রসিদ্ধ, তাঁর লেখায় সে সব গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছে। আজ Bergson-এর দর্শনের পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি শুধু তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা বলবো।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে, আমার শ্রদ্ধেয় জাপানী বন্ধু Okakura ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরবার পথে কলকাতায় উপস্থিত হন; আর তাঁর মুখেই আমি এই নব দার্শনিকের কথা শুনি। তিনি বলেন যে, বার্গসনের বক্তৃতা শুনতে প্যারিসে অসংখ্য নরনারী উপস্থিত হয়—কারণ সে বক্তৃতা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি চমৎকার। এবং সেই সঙ্গে তিনি Bergson-এর তিনখানি বই আমাকে উপহার দেন। আমি Bergson-এর প্রথম বইখানি পড়ে চমৎকৃত হয়ে যাই। এ বই সোনার জলে লেখা,—যেমন উজ্জ্বল তেমনি সুবিন্যস্ত। পরে আমি তাঁর সব লেখাই পড়েছি; কোনোটি মূল ফরাসীতে, কোনোটি ইংরাজী অনুবাদে। জড়পদার্থকে বিশ্বের একমাত্র উপাদান ধরে নিলে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। অপরপক্ষে প্রাণশক্তিকে জগতের মূল শক্তি ধরে নিলে, এ বিশ্বের গঠন ও চালচালের অর্থ বোঝা যায়। এ বিশ্ব প্রাণেরই স্ফূর্তি, আর জড়পদার্থ সে স্ফূর্তির বাধা। এই বাধা অতিক্রম করবার শক্তিই elan vital। এ শক্তি কোনরূপ জড়-জগতের শক্তি নয়। একে ভগবৎশক্তি বলা যায়, উদ্দেশ্য—মানুষের মনকে ঊর্ধ্বলোকে তোলা।

আমি পূর্বে বলেছি যে Bergson-এর বাণী প্রাঞ্জল। কিন্তু তাই বলে তাঁর দর্শন জলবৎ তরল নয়। এর কারণ, তাঁর ভাষা উজ্জ্বল ও মনোহর হলেও তার বিষয়বস্তু কঠিন। সুতরাং তাঁর মতে কাল (time) কি, ও elan vital কি সে আলোচনা আজ করবো না। এক কথায় তিনি দর্শনে আমাদের নূতন পথ দেখিয়েছেন, আর সে পথ হচ্ছে মুক্তির পথ। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের মনের যে গণ্ডি দেখিয়েছেন, তার থেকে মুক্তি। বাঙলায় যাঁরা দর্শনশাস্ত্র চর্চা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এ যুগের এই মহাদার্শনিকের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন, এবং Bergson-এর দর্শনের ব্যাখ্যা করবেন। বিলাতের একজন গণ্যমান্য দার্শনিক বলেছেন যে, 'Physics and death have a long start over psychology and life' Bergson-এর কারবার এই psychology and life নিয়ে—এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব।

•

আমরা যাকে economic শাস্ত্র বলি, সে শাস্ত্রের হালচাল সব সমাজের শান্তির অবস্থা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এবং শান্তিই সমাজের চিরস্থায়ী অবস্থা ধরে নিয়ে শাস্ত্রীরা তার হ্রাসবৃদ্ধির হিসেব করেছেন। —যুদ্ধ

ঘটায় শান্তির বিপর্যয়। সুতরাং শান্তির হিসেব এই বিপর্যস্ত অবস্থার হিসেব নয়। তাই এ অবস্থায় পূর্বাবস্থার কথা সব বাজে কথা হয়ে গিয়েছে। ইকনমিক শাস্ত্রীরা এখন সব হতভম্ব হয়ে গেছেন: যুদ্ধের অনিবার্য ফল দারিদ্র্য থেকে মানবজাতিকে কি করে উদ্ধার করা যাবে, তা কেউ বলতে পারে না। ইকনমিক কারণেই এ যুদ্ধ ঘটেছে—কিন্তু যা ঘটেছে, তার চিকিৎসা ইকনমিষ্টরা জানেন না।—যাঁরা আমার লেখার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই জানেন যে, আমি প্রথম বয়সে 'তেল-নুন-লকড়ি' নামে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখি, আর সেটি যথেষ্ট লোকপ্রিয় হয়। লোকপ্রিয় যে হয় তার প্রমাণ, উক্ত প্রবন্ধ কোনও ব্যক্তি পুস্তিকারূপে প্রকাশ করেন। আজ আবার শেষ বয়সে, সেই 'তেল-নুন-লকড়ি'র ভাবনা আমার প্রধান ভাবনা হয়েছে।

* * * *

বাঙালী হাসতে ভুলে গেলেও cause of wit in others হতে পারে। জাত যখন ঘোর গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে, তখনই তার গায়ে রসিকতার injection দেওয়া আবশ্যক। তবে বাঙালী যদি হাস্যবিস্মৃত জাত হয়ে থাকে, তাহলে আত্মবিস্মৃত জাতও হয়েছে। অন্ততঃ বাঙলা সাহিত্য তো হাসিছুট নয়। কাঠকঙ্কন চণ্ডীর ভিতর যথেষ্ট humour আছে। ভারতচন্দ্রও অরসিক নন। রামমোহন রায়ের লেখাও ভোঁতা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রও এ-রসের চর্চা করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের মতো witty লেখকও বাঙলা সাহিত্যে আর কেউ নেই। একটু পিছিয়ে গেলে দেখতে পাই 'হুতোম পেঁচার নক্সা' আদ্যোপান্ত রসিকতা। 'আলালের ঘরের দুলাল'ও এ রসে বঞ্চিত নয়। এর থেকে অনুমান করছি যে, বাঙালী জাতির সাহিত্যিকরা এ রসের চিরকাল চর্চা করেছেন।—অতএব বীরবলের লেখা বাঙলা সাহিত্যে অ-পাঙ্‌ক্তেয় নয়, যদি বীরবলের লেখার সত্যি সত্যি এজাতীয় বাক্-চাতুরী থাকে।

এখন রসিকতার দোষ কি বলছি। যো আপসে আতা উসকো আনে দেও—এই হিসাবে রসিকতা করা উচিত। চেষ্টা করে রসিকতা চেষ্টা করে কবিতা লেখার মতই অসহ্য। সমাজে মধ্যে মধ্যে এমন লোক দেখা যায়, যাঁরা রসিক বলে প্রসিদ্ধ। এই পেশাদার রসিকদের মতো বিরক্তিকর লোক আর নেই। দ্বিতীয়তঃ, রসিকতামাত্রেরই হুল থাকে, সে হুল যাঁদের গায়ে বেঁধে, তাঁরা অস্থির হন, বিশেষতঃ অপরে হাসলে। তারপর কোন্ কথাটি রসিকতা আর কোন্ কথাটি serious, তা সকলে সব সময়ে ধরতে পারেন না। হুতোম পেঁচার নক্সা নিন্দনীয়, কেননা তার রসিকতা বেপরোয়া, ভারতচন্দ্রও যে অপাঠ্য, তার জন্য অশ্লীলতা ততটা দায়ী নয়, যতটা বাক্‌চাতুরী। এর প্রমাণ বিলেতেও পাওয়া যায়। Bergson-এর Rire একখানি দার্শনিক গ্রন্থ। কিন্তু বিলেতের রসিকশিরোমণি Bertrand Russell এর বই পড়ে ক্ষেপে উঠেছিলেন। রসিকতার আর একটি মহাদোষ এই যে, ও-পদার্থ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।

*

বীরবল বলেছেন যে, প্রবন্ধের কোনো মূল্য নেই, কেননা প্রবন্ধ টেকসই নয়। গ্রীক ও ল্যাটিন আমি জানিনে, কিন্তু বহু গ্রীকগ্রন্থ ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তরজমা করা হয়েছে এবং সে অনূদিত গ্রন্থ আমি কিছু কিছু পড়েছি। গ্রীক ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্য নেই, যদি না Plato-র বাক্যকে প্রবন্ধ বলা যায়। তাঁর দর্শনকে একাঙ্ক নাটিকা বলা যেতে পারে। সে যাই হোক, Plato'র লেখাকে দর্শন বলাই শ্রেয়।—ল্যাটিন বই আমি অনুবাদেও পড়িনি, কিন্তু না পড়েও জানি—সে ভাষায় প্রবন্ধ সাহিত্য ছিল না।

বীরবল ঠিক বলেছেন, প্রাচীন সাহিত্যে যা টিকে আছে, তা কথা ও কবিতা। হোমরের কাব্য দু'খানি যুগপৎ গল্প ও কবিতা। যেমন আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত। মধ্যযুগে হয়তো ইউরোপে অনেক প্রবন্ধ লেখা

হয়েছিল, কিন্তু সে সবই এযুগে উপেক্ষিত। একমাত্র ফরাসী লেংক মন্‌টেনের প্রবন্ধই টিকে আছে। তাঁর লেখা হচ্ছে একরকম বকুনি। —বীরবল•আমাকে আদেশ করেছেন, হয় কবিতা নয় গল্প লিখতে। কবিতা আমি লিখতে পারিনে, অমিত্রাক্ষরেও নয়, মুক্ত ছন্দেও নয়। আর গল্প লেখা অতি কঠিন। প্রথমতঃ মনে মনে গল্প রচনা করাও যেমন কঠিন, সেই মনোকল্পিত গল্পকে ভাষায় রূপ দেওয়াও তেমনি কঠিন। বীরবল অবশ্য বলেছেন যে, আমি এক্ষেত্রে পরের ধনে পোদ্দারী করি। অর্থাৎ কথাবস্তু অন্যের কাছ থেকে ধার নিই আর ভাষা আমি নিজেই দিই।

গল্প আমাকে জোগান দিতেন ঘোষাল, নীললোহিত ও সারদা দাদা। কিন্তু আজকের দিনে তাঁদের গল্প চলবে না। নীললোহিতের সব গল্পই বীররসের গল্প। আর বীররসের গল্প পৃথিবীর শান্তিপর্ব্বেই বানানো যায়,— যুদ্ধপর্ব্বে নয়। নীললোহিত হয়তো বলে বসবেন যে, তিনি Parachute-এ শূন্যে উঠে গিয়ে বিমানে চড়েছিলেন এবং সেখানে বিদ্যুৎকে বজ্র করে জার্ম্মানদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করেছেন। এসব ফক্কুড়ি এখন চলে না। তারপর ঘোষাল এখন রোমান্টিক হয়ে পড়েছেন, অথচ এখন realism-এর যুগ। একমাত্র সারদা দাদার গল্প লিখতে পারি, কেননা তাঁর গল্পের সঙ্গে দর্শন-বিজ্ঞানের মুখদেখাদেখি নেই। আর তিনি যা দেখেছেন, তাই বলতে পারেন। যদিচ আমার গুরুজনদের মতে তাঁর সব কথাই মিথ্যে কথা। মিথ্যেকথা এই যুদ্ধের প্রসাদে তারে-বেতারে অনন্তার বলা হচ্ছে, আর দৈনিক সংবাদপত্রে ছাপা হচ্ছে। অমৃতবাণী এখন নেহাৎ বাজারে হয়ে পড়েছে।

অতএব এখন প্রবন্ধ লেখাও যেমন বাজে, গল্প লেখাও তেমনি বাজে। যদি কিছু লিখতে হয়তো 'বকুনি'। বকুনির মহাগুণ এই যে, তার উদ্দেশ্য কাউকেও কিছু শিক্ষা দেওয়া নয়, শুধু নিজের মনের এলোমেলো কথা বলা। বকুনিতে যদি কিছু প্রকাশ করা হয়, তা ব্যক্তি বিশেষের খাপছাড়া মনের কথা। আর একের মনের কথা অনেক সময়ে অপরের মনে স্থান পায়। —আমাদের মনে নানা ভাবের নিত্য উদয় হয় আর বিলয় হয়। একটা ভাবের খেই হারিয়ে গেলে আর একটি ভাব এসে উপস্থিত হয়। অধিকাংশ ভাবই বাহ্যবস্তুর অধীন। বাহ্যবাস্ত ইন্দ্রিয়ের দুয়োর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে ভাবে রূপান্তরিত হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কি করে যে এই রূপান্তর ঘটে, তা কেউ জানেন না। তাই কোনও কোনও দার্শনিক বলেন যে, বাহ্যবস্তু বিকাশের নাম মন, আর কেউ বলেন, মনই আছে, বাহ্যবস্তু নেই, অর্থাৎ—মনের ভ্রান্তির নাম বাহ্যবস্তু। এ নিয়ে দার্শনিকরা তর্ক করুন। যাকে matter বলে, তারও অদ্বৈতবাদ আছে; আর mind-এর অদ্বৈতবাদ তো আছেই। ভগবান হয়তো এ দুই পদার্থের সৃষ্টি করেছিলেন দার্শনিকদের বাক্‌বিতণ্ডা করবার জন্য। সে যাই হোক, বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের মনোভাব বিভিন্ন হয়······আমার মতে পৃথিবীতে শুধু দুই জাতীয় দর্শন আছে,-এর আধিভৌতিক অদ্বৈত-বাদ, আর এক আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ। এ দুয়ের একটি না একটির যিনি প্রচারক, তিনিই দার্শনিক। আর আমরা যারা এর কোনোটিরই বশবর্ত্তী নই আমরাই সাহিত্যিক। আমরা অবশ্য কখনও জড়ের দিকে ঝুঁকি, কখনও আত্মার দিকে। এই দুয়ের ভিতর ইতস্ততঃ করাই সাহিত্যের সহজ ধর্ম্ম।······যে শিক্ষা ইংরাজরা আমাদের দিয়েছেন, তাতে আমাদের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। ধনবল তো আমাদের নেইই, বাহুবলও নেই। আমরা দরিদ্র, উপরন্তু আমাদের হাত পা নেই,—আছে শুধু পেট, আর আমরা আধপেটা খেয়ে বাঁচি।···মনে রাখবেন, আমরা যদি সভ্য হয়ে থাকি তো আমাদের সভ্যতা European Civilisation নয়। বিলেতি শিক্ষা আমাদের মনে শুধু বিলেতি পোষাক পরিয়েছে। মূলে আমাদের স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে হলে সে পোষাক আমাদের ছাড়তে হবে। (১৫ই জুন, ১৯৪১)।

কল্পনার পরি কোথায় ?

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতত্রাতা মহাত্মার উত্তরাধিকারী স্বগত শ্রীনেহরু আমাদের তথাকথিত স্বাধীন ভারতের (মাইনাস্ বর্ত্তমান পাকিস্তান) প্রথম প্রধান মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিয়াই তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের অনুকরণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা করেন শ্রীমান্ অশোক মেঠাকে তাঁহার প্রধান সহচর এবং সহকারীরূপে বরণ করিয়া।

তিনটি পরিকল্পনা শেষ হইয়াছে, এখন একবার দেখিতে দোষ কি—এই পরিকল্পনার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক, নৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—বিশেষ করিয়া খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা বিষয়ে। শ্রীনেহরু একাধারে ছিলেন—সর্ব্বশাস্ত্রে এবং বিদ্যায় পরম পণ্ডিত এবং এই দিক হইতে তাহার পারিবারিক 'পণ্ডিত' উপাধি সত্যই পরম সার্থক প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণ তিনি নিজে যতটা দিতে সক্ষম হন নাই, তাহার অপেক্ষা অন্তত শতগুণ বেশী হয়েছেন তাঁহার কংগ্রেসী ভক্তবৃন্দ, এবং এই ভক্তবৃন্দের মধ্যেও প্রায় শতকরা আশীজনই পণ্ডিত নেহরু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম পণ্ডিত এবং সেই পণ্ডিতের দলই এখনো, সকল রাজ্যগুলিতে না হইলেও, কেন্দ্রমণি হইয়া আমাদের সুখদুঃখের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

পরিকল্পনা-কারবার সুরু হইল, বিদেশের ঋণের টাকার উপর ভর করিয়া এবং ইহাই হইল নব-ভারতের স্ব-নির্ভরতার প্রথম ভিত্তি স্বরূপ। দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন যে-সব সমস্যা সমাধান করা, পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার মানসপুত্র শ্রীঅশোক মেঠা প্রথমে সে-দিকে দৃষ্টি দিবার কিংবা প্রথম সমস্যা প্রথমেই সমাধানের প্রয়াসে না গিয়া, অর্থাৎ বর্ত্তমানকে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের বিরাট সৌধ নির্ম্মাণে পরম যত্নবান হইলেন এবং ধার-করা টাকা জলে ফেলিয়া—বিরাট বিরাট ড্যাম এবং ইস্পাত কারখানা নির্ম্মাণের দিকে সকল প্রয়াস নিয়োজিত করিলেন। পণ্ডিতজীর মনে আশা ছিল, তিনিও নিশ্চয় জার্ম্মানীর Kurpp ইস্পাত কারখানার সমতুল্য কারখানা ভারতে অনায়াসেই গঠনে সক্ষম হইবেন। নেহরু ভাবিয়া দেখেন নাই, জার্ম্মানীর যে বিশ্ববিখ্যাত ইস্পাত কারখানা তাহা এক পুরুষের চেষ্টায় হয় নাই, এবং বিদেশীদের নিকট হইতে ভিক্ষালব্ধ কিংবা দান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করিয়াও নহে। জার্ম্মানীর ক্রুপ-ষ্টিল ওয়ার্কস্ একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে—এবং ইহাও হইয়াছে মালিকের বদান্যতায়।

নেহরু 'পরিকল্পিত' যে সকল বিরাট বাঁধ বা ড্যামগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও মার্কিণ রাষ্ট্রের টি.ভি.সি'র ব্যর্থ অনুকরণে। আমাদের দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের—প্রথম পরিকল্পক হিসাবে স্বর্গত ডঃ মেঘনাদ সাহার নাম করা অবশ্যই কর্ত্তব্য—যদিও পণ্ডিত নেহরু ভুলিয়াও তাঁহার নাম কখনও মুখে আনেন নাই। এমন কি

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডঃ সাহা যখন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন, সেই সময় এক বিতর্ককালে পণ্ডিত নেহরু বলেন—তিনি মেঘনাদ সাহাকে বৈজ্ঞানিক বলিয়াই মনে করেন না। অথচ এই কথা বলিবার মাত্র দুই তিন মাস পূর্ব্বেই ভারত সরকার (নেহরু সরকার বলাই ঠিক হইবে) ডঃ মেঘনাদ সাহাকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে ভারতের বৈজ্ঞানিক' প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন!

পশ্চিম বঙ্গে দামোদর এবং অন্যান্য নদ ও নদীগুলির উপর কোটি কোটি টাকা ঢালিয়া যে সকল বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহাতে এরাজ্যের চাষ এবং চাষীর কতটুকু উন্নতি বা লাভ হইয়াছে, তাহা দেশের প্রায়-দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কৃষক এবং কৃষিকাজে যে অত্যাবশ্যক জল যোগান দিবার জন্য বাঁধ নির্ম্মিত হইল, এখন দেখা যাইতেছে সে-উদ্দেশ্য একেবারে না হইলেও শতকরা ৯৯ই ভাগই হইয়াছে ব্যর্থ। দামোদরের বাঁধবদ্ধ জল চাষীরা সময় মত পায় না, পায় সেই সময় যখন জলাধারে আর জল রাখা সম্ভব নয়। ফলে হাজার হাজার বিঘা জমির প্রায়-পাকা ফসল নষ্ট হইয়া যায়। মাত্র বছর তিন আগে বর্দ্ধমানে প্রায় ৪০ বর্গ মাইল জমির ফসল এই ভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

দামোদর-ভ্যালী পরিকল্পনার ব্যয় বাবদ শতকরা প্রায় ৬০ টাকা দিতে হয় বাঙ্গলাকে, কেন্দ্র সরকার দিয়া থাকেন শতকরা ২০ টাকার মত, বাকিটা আসে বিহার হইতে, কিন্তু এই পরিকল্পনাতে চাকুরীর ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া উচ্চ পদগুলিতে বাঙ্গালী-বিহারী কয়জন? এখানে গত প্রায় দশ বারো বৎসর যাবত দক্ষিণ ভারতীয়দের রাজত্ব—এবারেও তাহাই ঘটিয়াছে! দক্ষিণ ভারতীয় চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য প্রায় সম পর্য্যায় কর্ম্মকর্ত্তাগণ—নিজ রাজ্য হইতে লোক আমদানী করিয়া তাহাদের কর্ম্মসংস্থান করিতে, কেবল অতি নহে, সদাতৎপর!

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যে সকল ড্যাম বা বাঁধ কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে, সেগুলিরও কার্য্যকারিতা বিষয়ে এখন অনেকের মনে গভীর সন্দেহের ছায়াপাত করিয়াছে। এমন কথাও শুনা যাইতেছে যে, কোন কোন ড্যামের নীচে ফাটলের সঙ্গে ক্ষয়ও দেখা যাইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে—এই প্রকার গলদের মেরামতি চলে না, অর্থাৎ মেরামতের বদলে পুরান ড্যাম ভাঙ্গিয়া আবার নতুন করিয়া 'নতুন' ড্যাম প্রয়োজন দু-দশ বৎসরের মধ্যেই ঘটিতে পারে! বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—তাহাও এক প্রকার অসম্ভব। ড্যামের অবস্থা ত এই।

এবার ইস্পাত কারখানাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যাইবে? পাবলিক সেকটারের অর্থাৎ সরকারী পাঁচটি ইস্পাত কারখানাতে বছরে অন্তত পাঁচশত কোটি টাকার মত লোকসান যাইতেছে এবং এই লোকসানের বোঝা দেশের দরিদ্র করদাতাদেরই বহন করিতে হইতেছে বছরের পর বছর, আরো কতকাল বহন করিতে হইবে কেহই বলিতে পারেন না। এই কারখানাগুলির এত ভীষণ লোকসানের মূল কারণ বোধহয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অনুগ্রহভাজন অযোগ্য ব্যক্তিদের উপর কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ। টেকনিকেল কাজের দায়িত্ব অ-টেকনিক্যাল পণ্ডিতদের উপর দিলে সর্ব্ব বিষয়েই এই বিপর্য্যয় ঘটিতে বাধ্য। আই-এ-এস কিংবা সমজাতীয় অফিসার হয়ত অফিস চালাইতে পারেন ভাল এবং তাঁহাদের কলমের সহিত কপালের জোরও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কলকারখানার কাজ নির্ব্বাহ কতটা হয়—সমান্য বুদ্ধিতে তাহা বুঝা যায় না!

অন্য দেশে পাবলিক সেকটারে অর্থাৎ দেশের সরকার যে সকল কলকারখানা চালাইবার দায়িত্ব লয়েন, সেই সব কারখানা হইতে লাভের টাকা যায় সাধারণ রাজস্বখাতে এবং তাহার ফলে দেশের লোকের কারবার লাঘব হয়। কিন্তু আমাদের দেশের এমনই ব্যবস্থা যে সরকারের কারবারে বেকুফীর জন্য মূল্য দিতে হইতেছে সাধারণ করদাতাকেই। প্রাইভেট মালিকানার কোন কারখানায় এমন ব্যাপার ঘটিলে—কারখানার দরজা বন্ধ করিতে বিলম্ব হইত না।

পাবলিক সেক্টারের কলকারখানাগুলি চালাইবার টাকার জন্যও কাহারও 'মাথার' দরকার হয় না—গৌরী সেন মহাশয়ের কোষাগারে করদাতাদের এবং তাহার সঙ্গে বিদেশ হইতে ধার-করা কোটি কোটি টাকা জমা থাকে, তাহা যেমন ইচ্ছা অপব্যয় করিতে কোন বাধা নাই, বাধা দিবারও কেহ নাই। অতএব যেমন ইচ্ছা বেপরোয়া খরচ করিয়া যাও, অর্থের অভাব যখনই হইবে, ট্যাক্সের বোঝা বাড়াইতে কর্ত্তাদের কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ হয় না, হইবে না। কারণ বিশেষ বিশেষ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এক একজন মন্ত্রী, কোন প্রকার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা কিংবা জ্ঞান না থাকিলেও ভারপ্রাপ্ত দপ্তরের সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, করিতেছেনও। ইস্পাত এবং ইস্পাত কারখানা বিষয়ে কখন জ্ঞান না থাকিলেও নবনিযুক্ত মন্ত্রী মহাশয়, দপ্তরে যে দিন প্রথম পায়ের ধুলা দেন, সেইদিন হইতেই তিনি এই বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ এক্সপার্ট বলিয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তক হইতে বিচিত্র নির্দ্দেশ দিতে থাকেন অবিরত।

সরকারী পরিকল্পনায় গৃহীত যে-সকল প্রকল্প গত ১৫ বৎসরে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, প্রায় সব কয়টিই দেখা যাইতেছে মুনাফাহীন এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি না করিয়া—সাধারণ মানুষের জীবন আর্থিক দিক হইতে বিপর্যস্ত করিয়াছে। অঢেল টাকা খরচের ফলে দেশে যে ইনফ্লেশন দেখা দিয়াছে বাজারে, তাহার ফলে পণ্য-মূল্য আজ আকাশ সীমাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

প্রাইভেট সেক্টারের বড় বড় যে কয়টি ইস্পাত কারখানা আছে—নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে এবং ক্রমাগত বর্দ্ধমান করভারে তাহাদের জীবন নাসিকাগ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিবিধ প্রকার চাপে প্রাইভেট সেকটারের কলকারখানাগুলিকেও, বলিতে গেলে, পরিবার পরিকল্পনায় গৃহীত 'লুপের' দ্বারা তাহাদের স্বাভাবিক উৎপাদকতা হইতে বিরত রাখার প্রচেষ্টা কম হয় নাই। কোন কোন রাজ্য সরকারের শ্রমনীতি এখন যে পথে চলিতেছে, যাহার ফলে শ্রমিক সাধারণ ছাড়া অন্য কেহ আর বেশী দিন কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে, কিংবা করিতে কোন উৎসাহ বোধ করিবে কি না সন্দেহ। কোন কোন শ্রম মন্ত্রীর (রাজ্য) মতে শ্রমিকই হইল রাজ্য সরকারের আত্মীয় এবং পোষ্য এবং মালিকপক্ষ অত্যাচারী এবং bad employer—এবং ইহাদের সায়েস্তা করিতে পি.ডি. অ্যাক্ট প্রয়োগ করিবার উদ্যোগ পর্ব্ব সমাপ্ত প্রায়। এই শ্রেণীর শ্রম মন্ত্রীদের মতে bad employee অর্থাৎ অসদাচারী কর্ম্মী বলিয়া কিছু নাই এবং তাহাদের সর্ব্ববিধ ট্রেড ইউনিয়ন তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম্ম সরকারী ভাবে সদা সমর্থন যোগ্য। এই উৎকৃষ্ট শ্রমনীতির বিকট ফল ইতিমধ্যে প্রকট হইতে দেখা যাইতেছে। প্রায়ই কলকারখানা জোর করিয়া বন্ধ করা হইতেছে, যাহার ফলে প্রোডাকশন অর্থাৎ উৎপাদন বহু বড় বড় কারখানাতে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে কেবল কারখানা অর্থাৎ মালিকপক্ষেরই ক্ষতি হইতেছে না, করবাবদ সরকারের প্রাপ্য কমিতেছে, বিদেশে রফতানীও বিঘ্নিত হইয়াছে। কোন কোন ইস্পাত কারখানার বিদেশের অর্ডার মত যে ইস্পাত, ইস্পাতের তৈরী মাল, পিগ আবরণ প্রভৃতি রফতানী করিবার কথা ছিল, তাহা যথাকালে শ্রমিকদের হৈ-হল্লার ফলে পাঠানো সম্ভব হয় নাই। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা (অদ্য বহু আকাঙ্খিত বস্তু) অর্জ্জনে বাধা পড়িল এবং আরো পড়িবে। কলকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত তথাকথিত পলিটিক্সের মিশ্রণের ফল দেশকেই ভুগিতে হইতেছে। এই সব ব্যাপারে কংগ্রেস, অকংগ্রেস, সংযুক্ত, অসংযুক্ত—সকল রাজনৈতিক পার্টি বা দলগুলি এক গোত্র। এই বিষাক্ত রাজনীতির পাপচক্রে পড়িয়া ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটিতে হয়ত বিশেষ বিলম্ব হইবে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে চতুর্থ পরিকল্পনার কল্পনা ঠিকই হয়ত আছে, কিন্তু ভারতীয় মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের, বিষম খরা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বিচিত্র আবর্ত্তের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনা, একবৎসর পার হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও এখনও সূতিকাগারের চৌকাঠ পার হইতে পারে নাই, যদি কোনক্রমে পার হইতে পারে, তাহা হইলেও একটি রিকেট পরিকল্পনা-সন্তান হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে!

এইবার মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং প্রত্যহ যাহা না হইলে চলে না, দেশের খাদ্যাবস্থার দিকে একটু দেখিতে দোষ নাই। পর পর দুইবৎসর অজন্মার ফলে, আজ দেশের খাদ্যাবস্থা কেবল শোচনীয় নহে, মানুষের পক্ষে অসহনীয়। আমরা ভাবিতে পারি না, যে মূল্যে পূর্ব্বে এক মণ চাউল লোকে পাইত, আজ এক সের চাউলের মূল্য তাহার প্রায় আড়াইগুণ। আজ (২৪-৮-৬৭) চাউলের মূল্য কেজি (এক সের এক ছটাকের মত) প্রতি ৫.৫০ হইতে ৫টাকা!

যখন সময় ছিল, সেচ, সার এবং কৃষির প্রতি শাসক এবং দেশনেতাদের দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই— বহু জনের বহু সতর্কবাণী সত্বেও। কর্তৃপক্ষ বড় বড় সেচ-পরিকল্পনার স্বপ্নে বিভোর, কাজেই ছোট ছোট পরিকল্পনার দ্বারা যে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে সামান্য জল এবং একটু সারের সাহায্যে সোনা ফলাইতে পারা যাইত—সে কথা কাহারো ভাবিয়া দেখিবার সময় হয় নাই। বিরাট-পুরুষ পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে কোন সামান্য বিষয়ের প্রতি মন বা চক্ষু দিবার সময় হইত না, কারণ ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে তিনি বিরাটের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। নিখিল বিশ্বের সকল জটিল সমস্যা সমাধানের চিন্তা যাহার মাথায় সদা কিল্‌বিল্ করিত এবং যে-পুরুষপ্রবর নিজেকে বিশ্বের শান্তিরক্ষক বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার পক্ষে সামান্য চাষী, চাষ, চাষের জমি, সার, সেচ প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিবার সময়ও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না! অথচ তাহার নির্দেশ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কাজ, বিশেষ করিয়া পরিকল্পনা বিষয়ক, কাহারো পক্ষে নিজের দায়িত্বে করা সম্ভব ছিল না, একথা জানা আছে।

গত কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র ভারতের খাদ্যাবস্থা এমন মারাত্মক সঙ্গীন হয় নাই। যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিল, তাহার সূচনা বহু পূর্ব্বেই হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিকল্পকদের তাহার মোকাবিলা করার দায়িত্ব গোড়ার দিকে ছিল না। তাহারা সকলেই একবাক্যে ইহাকে 'ভগবানের মার' বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন বলা হয়ত ঠিক হইবে না, কারণ মার্কিণ রাষ্ট্রের নিকট গম এবং চাউলের ভিক্ষাপাত্র লইয়া কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা হাজির হইতে কসুর করিলেন না। মার্কিণ রাষ্ট্র হয়ত আরো বেশী ভিক্ষা দিত কিন্তু ভিখারীর মুখে বড় বড় নীতিকথা এবং অনাবশ্যক মার্কিণ নিন্দাবাদ করায় আমাদের ভিক্ষাপাত্র এখনও পূর্ণ হয় নাই। মার্কিণ সিনেটে বিতর্ককালে কয়েকজন সদস্য এমন কথাও বলিয়াছেন যে—যে দেশকে গম এবং চাউল ভিক্ষা দিয়া সেই দেশের মানুষকে অনাহারে মৃত্যু হইতে আমরা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি, সেই ভিক্ষুক-দেশের নেতৃবর্গের মার্কিণ-নীতির শ্রাদ্ধ করার প্রয়াস ক্ষমা করা উচিত নহে!—আজ মার্কিণ সিনেটের বহু সদস্যই ভারতকে খাদ্য সাহায্য করার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন! আমাদের দেশের যে-সকল নেতা মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে বিষম রাগ এবং অভিমান ভরে ঘোষণা করেন "আমরা অনাহারে মরিব, তবুও মার্কিণ গম খাইব না!" তাহারা অনাহারে মরেন নাই এবং মরিবেন না, কিন্তু লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে অনাহারে প্রায় মৃত্যুর সিংহদরজার সামনে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এসব কথা কেবল নিন্দা করিবার জন্য বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে গভীর দুঃখে এবং নিরাশায়। এবার বর্ষা ভাল হইয়াছে সত্য—কিন্তু চাষের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সবকারগুলি কৃষকদের সাহায্যের জন্য—কেবল 'জয় কিষাণ' বলা ছাড়া আর বেশী কি করিতেছেন জানি না। যথেষ্ট ফসল ফলাইবার জন্য দরিদ্র কৃষকই তাহার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেছে।

কর্ত্তামহল দেশের এই বিষম সঙ্কটকালেও টেলিভিসন, ভাষা সূত্র এবং সংযোগকারী ভাষা কি ভাবে অর্দ্ধপক হিন্দীকে করা যায়, এই সকল খাদ্য অপেক্ষাও জরুরী বিষয় লইয়া মহা-আলোচনায় অতি ব্যস্ত রহিয়াছেন! দেশের মাটি এবং দেশের লোকের সহিত যাহাদের আত্মিক যোগ নাই, তাহারা দেশের প্রশাসন ভার গ্রহণ করিলে বা পাইলে ইহা অপেক্ষা ভাল আর কি আমরা আশা করিতে পারি।

জনগণের শিক্ষার বিষয় বহু মূল্যবান কথা শুনিতে পাই কিন্তু যে পরিমাণ শিক্ষার প্রচার গত তিনটি পরিকল্পনায় হওয়ার কথা ছিল তাহার চারভাগের একভাগও হয় নাই। 'পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী এই ভারত"—বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি।

কিন্তু এই অগুণ গণতন্ত্রে এখনো শতকরা অন্তত ৭০ জন লোকই নিরক্ষর, দরিদ্র-সমাজের কয়জন পুত্র-কন্যা বিদ্যালয়ে যায় বা যাইবার সুযোগ পায়—সে বিষয় কিছু না বলাই ভাল!

শিক্ষাকে লইয়া গত কয়েক বৎসর ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলিতেছে—এক কথায় যাহাকে বলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা লইয়া ছেলেখেলাই চলিতেছে। ইহার ফলে যতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা বা অবকাশ ছিল তাহাও প্রায় লোপ পাইবার পথে। কি ভাবে, কোন ভাষায় শিক্ষাদান কার্য্য চলিবে—তাহাই হইয়াছে আজ মুখ্য বিষয়। অশিক্ষক এবং অপণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া আজ বিদ্যাদেবী শিক্ষায়তন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর স্বাস্থ্য—? চারিদিকের মানুষের শীর্ণ বর্ণহীন মলিন মূর্ত্তিগুলি দেখিলেই দেশের স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে। চিকিৎসা ব্যবস্থার, একেবারে যে কোন প্রসার বা উন্নতি হয় নাই, এমন কথা বলিব না, কিন্তু অনাহারে জীর্ণ মানুষকে কেবল ডাক্তার দেখাইয়া আর ঔষধ খাওয়াইয়া (যদি পাওয়া যায়) কত দিন ধরাধামে রাখা সম্ভব হইবে?

আমাদের প্রশাসকের দল যদি মানুষ বলিয়া নিজেদের মনে করেন, এবং এখনো যদি তাঁহাদের লজ্জা সরম বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে বৃহৎ অবস্থা "পরিকল্পনার" দ্বারা দেশ উদ্ধার আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া দেশের কোটি কোটি মানুষ যাহাতে দিনে অন্তত একবার পেট ভরিয়া খাইতে পারে এবং সেই সঙ্গে বছরে দেড়খানা বস্ত্র আর একটা গামছা পায়, সেই বাস্তব পরিকল্পনা সার্থক করিবার সফল প্রয়াস করুন। দেশকে পরিকল্পনার পাঁকে প্রায় ভিক্ষারি করা হইয়াছে—এখন একটু বিশ্রাম দিলে ক্ষতি কি?

গত পনেরো বৎসরের পরিকল্পনায় আমাদের নীট লাভ হইয়াছে—

১। ভারত বিশ্বের বাজারে দেউলিয়া।

২। সামান্য কিছু লোকের সম্পদ অসম্ভব স্ফীত হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের অবস্থা নিম্নতম স্তরে অবতরণ করিয়াছে।

৩। ব্যবসা-বাণিজ্য আজ নূতন বহুবিধ সমস্যা কণ্টকিত। বিশেষ করিয়া মুদ্রা মূল্য হ্রাসের দাপট এখন প্রকট হইয়াছে।

৪। পরিকল্পনা মত নির্মিত বড় বড় বাঁধ এবং সারের কারখানা কৃষক এবং কৃষির পক্ষে প্রায় বেকার এবং অসার।

৫। পরিকল্পনার ফলে বেকারী দূর হওয়া দূরের কথা, প্রত্যহ বেকারের সংখ্যা ক্রম বর্দ্ধমান

৬। টাকার মূল্য বর্ত্তমানে ৭৩ পয়সা মাত্র। ইহার বেশী আর কিছু বলার কোন প্রয়োজন আছে কি?
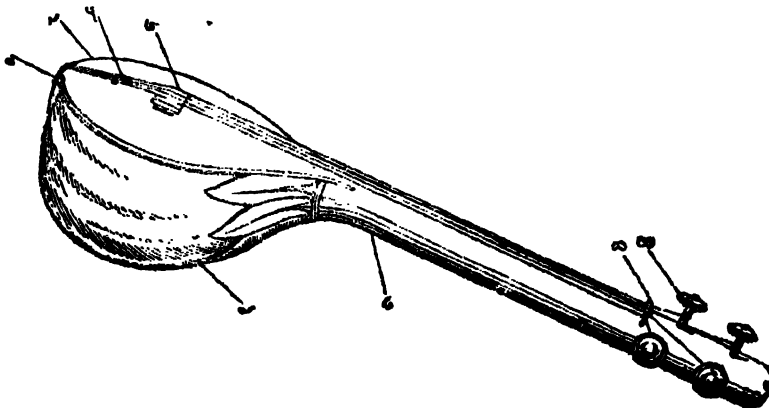
পূর্ব রেলওয়ের প্রথম যাত্রীবাহী এঞ্জিন "এক্সপ্রেস"

প্রথম যুগে বার্ন কোম্পানির প্রধান কারবার ছিল গৃহ-নির্মাণ এবং আসবাবপত্র তৈরি। ১৮২৯ সালে জন গ্রে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার পর থেকেই এঞ্জিনীয়ারিং, লোহাঢালাই, ঠিকাদারি ইত্যাদি নানা শাখায় প্রসারিত হয়ে বার্ন কোম্পানির কারবার বেশ ফলাও হয়ে ওঠে। জন গ্রে-ই ভারতের প্রথম রেলওয়ে ঠিকাদার। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির জন্য গ্রে একশো মাইল রেলপথ স্থাপন করেন। গ্রে-র এই কৃতিত্বে বার্ন কোম্পানির প্রচুর সুখ্যাতি এবং আর্থিক লাভ হয়। এই লভ্যাংশ দিয়েই হাওড়ায় একখণ্ড জমি কিনে একটি ঢালাই কারখানা স্থাপিত হয়। হাওড়ায় বার্ন কোম্পানির বর্তমান বিরাট কারখানার এই হল গোড়াপত্তন।

মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বার্ন কোম্পানির হাওড়ার এই কারখানায় তৈরী নানা জিনিসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় রেলওয়ের জন্য নির্মিত বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং সরঞ্জাম। ১৯০৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বার্ন কোম্পানি থেকে ৫৮০০০-এরও বেশী শতাধিক বিভিন্ন ধরনের মালগাড়ি এবং ১,১২০০০-এরও বেশী ক্রসিং ও সুইচ্ দ্রুত প্রসারমান ভারতীয় রেলওয়েকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, বড় বড় নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রিজ তৈরি করার জন্য হাজার হাজার টন ইস্পাতের কাঠামো বার্ন কোম্পানির স্ট্রাকচারাল বিভাগ সরবরাহ করেছে।

শাখা: নয়া দিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

MBGC-16A BEN

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

দুধ-ধান্দা করা বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান হরি। শ্রীহরির মানসা করে পাওয়া—তাই এই নাম।

আদর-উদ্বেগ গৌরবিনী তার ছেলেকে কাছছাড়া করে না। ও পাড়ার জমিদার বাড়ীর ভাল চাকুরী ছেড়ে কাছেই এক গেরস্তবাড়ী বাসন মাজা জল তুলা ইত্যাদি নিয়েছে। বাড়া ভাত এক ফাঁকে রেখে যায়—ছেলেটা খায়, মার জন্যও পড়ে থাকে। প্রায় দিনই পেট ভরে না, তা ছাড়া কুকুর বিড়াল লেগেই আছে। তবু ছেলেটা যা হোক এক মুঠো পায় তাতেই শান্তি। গ্রামের পাঠশালায় হরি পড়ছিল; পণ্ডিতের স্নেহ অনুগ্রহ ছিল, ছেলেটারও বেশ উৎসাহ। কিন্তু ইস্কুলের সময় ভাত জুটত না, রাস্তাঘাটেও গরু-ঘোড়ার উৎপাত, এইসব জন্য মা আর যেতে দেয় না। পড়ায় পূর্ণ ছেদ।

গলা মিষ্টি—গাঁয়ের মেয়ে-মহলে বেশ খাতির। বর্ষিয়সীরা বার দেবার বিশেষ তিথিতে তার ভক্তিমূলক গান শুনে উপোস ভাঙে। ফলটা-দুধটা ছাড়াও পুরাতন বস্ত্র ও জামার কাপড়ের টুকরা আমদানি হয়। হাটের বুড়ো দরজি—তার পিতৃবন্ধু বিনা মজুরিতে পাঁচ রঙা টুকরার বিচিত্র পিরাণ বানিয়ে দেয়। গ্রাম জুড়ে হরে নিজস্ব স্থান দখল করে আছে। মায়ের জাতকে বিশেষ সম্মান করে।

গৌরবিনীর একমাত্র সম্পদ চরিত্রবান গায়ক-পুত্র। তাকে রেখে যাবার আগে হাতে ধরে বলে "তুলসীতলায় হরিলুটের দশের পায়ের ধুলো তোর মাথায় দিয়ে ষষ্ঠী পূজা করেছিলাম—দশের পাতেই তোকে দিয়ে গেলাম। মায়ের মুখ রাখিস।

পেশা—অবৈতনিক গায়ক, জীবিকা—ভিক্ষা। এই আমাদের হ'রেদা। বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম হলে সবাই তাকে ডাকে। অতিথি-অভ্যাগতদের গান শুনায়। সকলের খানাপিনা অন্তে তাকে খাওয়ান হয়। বেশীটাই পাঁচ পাতের উচ্ছিষ্ট—তার অগোচরে নয়। সব সময় ভোজনে পরম তৃপ্তি—এক টুকরাও নাই নহে, আর কি চাই শুধালেই বলে "ক্ষীর আছে"। থাকলে পায়, না থাকলে বিকার-বিরক্তি নাই, নজর উঁচু।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুবক-শ্রেণীর মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা-অভিযান। করিমপুর থানার পাশে বিরাট সভা। তিন মাইল দূর থেকে হরে দা ও অন্যান্য সকলে উপস্থিত। সরকারি বেসরকারি নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় হাততালি অনেক পড়ল কিন্তু নাম লেখাতে কেহই এগোয় নি। শেষে থানাবাসীর মুখ রেখে হরে দা উঠে দাঁড়াল। কি সে উত্তেজনা অভ্যর্থনা—পুলকে গরবে তার ত্রিশ ইঞ্চি বুক ষাট ইঞ্চি হয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ বাদেই হরে দাকে গাঁয়ে দেখা—মেসোপটেমিয়া যাওয়া হয় নি। ডাক্তারি-পরীক্ষার ফলে বোধ হয়—ঠিক খুলে বলে না। পায়ে এক জোড়া মিলিটারি বুট। সেন-বাহিনীতে গোরা ডাক্তার তাকে বলেছে "সৈনিক সব সময়েই সৈনিক—বিপন্ন মানুষের পাশে সাহস নিয়ে দাঁড়াতে হবে—নিজের নিরাপত্তা উপেক্ষা করেও।"

হরে দা এখন বাউল বেশে দেশপ্রেমের গান গেয়ে বেড়ায়—ভোজনং যত্রতত্র। বুটজোড়া পা ছাড়া থাকে না।

সেদিন হাটবার। সন্ধ্যা পর্যান্ত স্বদেশী-সভায় গান গেয়ে ফিরছে। ভাঙ্গা চালা ঢাকতে হবে—সামনে বর্ষা। তাই হাতে খাবার ক্যানেস্তারার খালি টিন—কোন্ আড়ৎদার ভালবেসে দিয়েছে। পথচলতি জানা-অজানা অনেক লোক। অন্ধকারে পাশের জঙ্গলঢাকা মাঠ থেকে রমণীর করুণ আর্ত্তনাদ। কারও যেতে সাহস নাই। ঝন্ ঝন্ করে মাথার টিন ফেলে হরে দা তীর-বেগে কাতর কণ্ঠ অনুসরণ করে ছুটল। অসংলগ্ন বস্ত্র অসহায় অষ্টাদশীকে টানাটানি করছে একাধিক দুর্বৃত্ত। হরে দার উপস্থিতি ও তার বুটপুষ্ট পদাঘাত ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দিল। তার উদাত্ত আহ্বানে দ্বিধামুক্ত পথচারীরাও এগিয়ে এসেছে। হরে দার তলপেটে ছোরার গভীর আঘাত। অবিরাম রক্তক্ষয়। এক হাতে গাছে হেলান দিয়ে অন্য হাতে ঘা চেপে শুধায় "মা তোমার নাম কি, কোথায় যাচ্ছিলে"? যুবতী দুই হাতে ক্ষতস্থানে অঞ্চল চাপা দিয়ে বলে "বাবা, আমি বালবিধবা বৈষ্ণবী ভিখারিণী, হরিনাম নিয়ে গাঁয়ে-গাঁয়ে ভিক্ করে খাই। আজ হাটে তোমার গান শুনতে বেলা বয়ে গেল, তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম। বুঝতে পারি নি ওরা আমার পিছু নিয়েছে। আমাকে সবাই গৈরবী বলে ডাকে।"

দূর আকাশে ঝুলে-পড়া মেঘের চালের ঠিক উপরে এক ফালি চাঁদ।

থানার দারোগা মৃত্যুকালীন এজাহার নিতে এসেছেন।

গৈরবীর কোলে মাথা হরে দার।

শেষ উক্তি "মা তোমার মাথা হেঁট হয় নি ত?"

জুতো-জোড়া তখনও মিলিটারি-ডাক্তারের বিদায়-বাণী রিলে দিচ্ছে।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে

বিমলাংশুপ্রকাশ রায়

(ঐতিহাসিক)

দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্ব তখন বাংলা দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বরিশালের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন শিবানন্দ রায় অপর নাম রাজা পরমানন্দ রায়। ইঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদানন্দ রাজা হলেন এবং চন্দ্রদ্বীপের রাজ-নিয়মানুসারে দ্বিতীয় পুত্র রঘুনন্দন অপর নাম মাধবানন্দ যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

কিন্তু কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় রঘুনন্দন যুবরাজ পদ থেকে বিচ্যুত হন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের এই ঘটনা। যুবরাজ পদ থেকে চ্যুত হয়ে রঘুনন্দন সটান চলে গেলেন দিল্লীতে একেবারে আকবর বাদশাহের কাছে। তখনকার দিনে দিল্লী চলে যাওয়া ও আসা কিছু সহজ ব্যাপার ছিল না। বলাবাহুল্য না ছিল মোটর, না ছিল ট্রেণ, না ছিল প্লেন। ঐ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে মন্থর গতিতে দীর্ঘ যাত্রা। কখনো পদব্রজে, কখনো অশ্বপৃষ্ঠে কখনো গোযানে, আবার কখনো বা উটের পিঠে। নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে বা উত্তুঙ্গ পর্বতের পাদদেশ ঘেঁষে বা মরু-প্রান্তরের দিশাহারা বিসর্পিত সে সকল পথ। ভুজঙ্গসংকুলও বটে। বন্য হিংস্র প্রাণীর ও ঠগ-দস্যুর আক্রমণ এড়িয়ে সে যাত্রাপথ।

আর্তজনের আশ্রয়দাতা বলে আকবরের খ্যাতি ছিল। তাঁর কাছ থেকে রঘুনন্দন পদ্মানদীর পূর্বপারে বলুর পরগণার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামে একটি গ্রামে নিষ্কর সর্তে প্রাপ্ত হন এবং নিশ্চিন্তমনে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু রঘুনন্দনের বংশধরগণের পক্ষে নিশ্চিন্তভাবে বেশী দিন থাকা চলে নাই। কীর্তিনাশা পদ্মানদী নিশ্চিন্তপুরের বিশেষ কোন কীর্তিকলাপ গড়ে না ওঠাতেও তাকে গ্রাস করে নিল। তখন রঘুনন্দনের বংশধরগণ আরও পূবের দিকে এগিয়ে গিয়ে মানিকগঞ্জের অন্তর্গত মালুচী এবং আটিয়ার অন্তর্গত কেদারপুর এই দুইটি গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। মালুচী গ্রামখানি এক সঙ্গে একই সময়ে পত্তন হয়েছিল বলে সুন্দর শৃংখলায় গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিল। লাইন করে পাশাপাশি সাজানো জ্ঞাতিদের বাড়ীগুলি অনেকখানি করে জমি নিয়ে। সব বাড়ীরই সামনে দিয়ে সদর রাস্তা আর পিছন দিয়ে রয়েছে কাটাখাল যা পদ্মা ও ইছামতী নদীকে সংযোগ করেছে। তাই ডাঙ্গাপথ এবং জলপথ উভয়ই প্রত্যেক বাড়ীরই দোরগোড়া থেকেই রয়েছে। বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্গত হওয়াতে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন বটে—তথাপি এখনও বেশ কয়েক ঘর জ্ঞাতি সেখানেই রয়ে গেছেন।

রঘুনন্দনের পুত্র গোপীনারায়ণ তস্য পুত্র রাজীবলোচন, তস্য পুত্র প্রাণনাথ তস্য পুত্র শ্যামসুন্দর, তস্য পুত্র কালীচরণ, তস্য পুত্র শ্রীধর, তস্য পুত্র রামদয়াল। শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্রদেরই নাম করা হলো।

এই রামদয়াল বসু রায় ছিলেন মহারাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আইন-মন্ত্রী এবং অনেক বিষয়ে দক্ষিণহস্ত। ইহার নিজস্ব বাটি ছিল ৬ নং জরিক লেন (বীডন্ ষ্ট্রীটের পাশে)। এই বাড়ীর বৈঠকখানায় বহুলোক সমাগম হতো। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এক শালওয়ালা। তিনি শীতকালের প্রারম্ভে আসতেন শাল নিয়ে এবং শীতের অবসান কালে শালের বদলে টাকা নিয়ে দেশে ফিরতেন।

একদিন শালওয়ালা গল্প ফাঁদলে, "জানেন রায় মশাই! রংপুর তাজহাটের রাজা সেদিন মারা গেলেন কোনো ওয়ারিশ না রেখে। এখন তাই রাজত্বটা আর থাকবে না, সব সরকারের খাস হয়ে যাবে।" এই পর্যন্ত বলে শালওয়ালা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু মুচকে হেসে আবার বলতে লাগল 'দূর সম্পর্কে রাজা আমার মামা হতেন।" রামদয়াল তখন বলে উঠলেন "বটে! তবে ত তুমিই রয়েছ ওয়ারিশ। রাজা তুমিই হবে!"

শালওয়ালা কাষ্ঠহাসি হেসে বল্লে "সে কথা আর শুনছে কে এখন।"

রামদয়াল বললেন "আলবৎ শুনবে। সব কাগজপত্র, চিঠি, সাক্ষী যোগাড় করে দেও ত আমায়, তোমাকে দিয়ে দরখাস্ত করাবো।

রামদয়ালের ছোট ভাই কৃষ্ণদয়ালও ছিলেন আইনজ্ঞ এবং ঐ ঠাকুর-ষ্টেটেরই উকিল ছিলেন। এই দুই ভাইএর পরামর্শে ও উৎসাহে শালওয়ালা যাথারীতি আর্জি পেশ করে দিলে। কিন্তু কিছুই ফল হলো না। তখন আদালতে মামলা রুজু হলো। দেওয়ানী আদালতে তাও বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু মামলার নেশায় পেয়েছে তখন রামদয়াল ও কৃষ্ণদয়াল দু ভাইকে। আর শালওয়ালার তখন 'নক্ষত্র রায়ের" মতো—

'দুই কানে যেন বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখী।

এক বুলি জানে শুধু রাজা হবে, রাজা হবে।"

তাই হাইকোর্টে আপিল করা হলো দস্তুরমত। জজ সাহেব বিস্তর কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে, পক্ষের এবং বিপক্ষের বিস্তর যুক্তিতর্ক শুনতে শুনতে বহুকালক্ষেপণের পর নিম্ন আদালতের রায়টাই বাহাল রাখলেন। সম্পত্তি খাস হয়ে যাবার রায়।

শালওয়ালা এসে তখন অনুযোগ ও হতাশার সুরে বললে, "হলো ত রায় মশাই?" রামদয়াল বললেন, 'তাই ত! আমরা কিন্তু তোমার দাবী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। এখানকার দুটো আদালতই ভুল বিচার করেছে। এইবার এক কাজ কর, বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল পাঠিয়ে দেও। সেখানে ন্যায্য বিচার হবেই হবে'।

শালওয়ালা তখন করজোড়ে বল্লে "দোহাই রায় মশাই, আউর নেহি, রাজা হোবার সৌখ আউর নেহি। শাল সওদা করে যা কুছ পুঁজি করেছি সোব গেছে মামলার খপ্পরে। এখন কি ধার করবো?

রামদয়াল বললেন, "করলেই বা ধার। রাজা একবার হয়ে গেলে ও ধার একবার কেন, এক শ বার শুধতে পারবে।

"না না রায় মশাই, আর নেহি। মাফ্ করুন এবার। এই কথা শুনে রায় মশাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তারপর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তোমার আর এখন আর খরচ করতে হবে না। প্রিভি কাউন্সিলের ভার আমরাই নিতে পারি কি না দেখি। কিন্তু আপিল তোমাকে পাঠাতেই হবে।'

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন ছিলেন বিলেতে। সবে ব্যারিষ্টারি পাশ করেছেন। পরে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং মেম বিয়ে করেন বলে প্রসন্নকুমার তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। যাই হোক সে পরের কথা, এবং এ স্থলে তা অবান্তর। রামদয়াল জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উপর এই মামলার সব ভার সমর্পণ করে দিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ছিলেন উদার পরোপকারী পুরুষ। তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গেই মামলাটি নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। বিলেতের অনেক ব্যবহারজীবীর সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় ছিল। এবং নিজেরও হাতে টাকাও যথেষ্ট ছিল। কতকটা খাতিরে কতকটা টাকার জোরে মামলা চালাতে লাগলেন তিনি। নিজেরও প্রিভি কাউন্সিলের বিচার পর্য্যবেক্ষণের কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হতে লাগলো।

ফলে প্রিভিকাউন্সিল শেষটায় শালওয়ালাকেই রাজা বলে সাব্যস্ত করে দিলেন। এ খবর কলিকাতায় পৌছতেই ৬ নং জরিফ লেনের বাড়ীতেই শালওয়ালার প্রথম রাজ্যাভিষেক উৎসবের ধুম পড়ে গেল। এই শালওয়ালা রাজার বংশধরগণ পর পর তাজহাটের রাজত্ব এখনও করে আসছেন। মালুচীর বসু রায় বংশের বিস্তর লোক তাজহাটে কাজকর্ম্ম সব রাজারা সেই থেকে দিয়ে এসেছেন।

থিয়েটার অভ্ দি এ্যাবসার্ড

অশোক সেন

এ্যাবসার্ড নাটকের রচয়িতাদের—যথা, বেকেট, ইওনেস্কো, এডামভ্, এর্‌রাবেল, এলবি, পিণ্টার প্রভৃতির বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ হচ্ছে, এঁরা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাটক লিখেছেন। এডামভ অবশ্য এখন ব্রেখটের মন্ত্রশিষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং এ্যাবসার্ড পদ্ধতিতে লেখা পরিত্যাগ করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার অভিমত হল, উপরিউক্ত নাট্যকারেরা মানব-জীবনের উপর ভিত্তি করেই অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য পরিবেশন করছেন নিজেদের নাটকে—কিন্তু তাঁদের রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত ভাবমূলক, ঘনীভূত এবং বিমূর্ত। সেই কারণেই এঁরা আধিবিদ্যক (মেটাফিজিক্যাল) নাট্যকার—এঁরা মানব-জগৎ এবং বস্তু-জগতের অন্তঃসারকে আবিষ্কার করেন নিজেদের রচনায়। এ্যাবসার্ড বলতে এমন একটা অবস্থাকে বোঝায় যখন মানুষ তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমন্বয় হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় পড়লে জীবনের ভিত্তিতে কোন রকমের যুক্তি আছে বলে মনেই হয় না।

ইওনেস্কোর মতে এ্যাবসার্ড বলতে বোঝায় man cut off from his reiigious, metaphysical and transcendental roots.

এ্যাবসার্ড প্লে-রাইটসরা মনে করেন, জগতের ঘটনাবলীর মূলে কোন যুক্তিবাদ নেই—সাধারণ লোক জগৎকে ঠিক এর উল্টোভাবেই দেখে—সুতরাং তারা যাকে অত্যন্ত পরিচিত পৃথিবী বলে মনে করে, আসলে তা হচ্ছে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এ্যাবসার্ড থিয়েটারকে অনেকে এণ্টি থিয়েটারও বলে থাকেন—কারণ সাধারণ থিয়েটারের সর্ব বিষয়ে গতানুগতিকতার একঘেয়েমীর প্রতিক্রিয়া স্বরূপরই এর আবির্ভাব।

এ্যাবসার্ড নাটকের উপর অলক্ষিত প্রভাব

জেম্‌স জয়েসের স্ট্রীম অভ্ কনসাস্‌নেস, সুররিয়ালিজম, কাফ্‌কার রচনা (বিশেষতঃ কাফকার মেটামরফসিস গল্পটি পাশাপাশি রেখে ইওনেস্কোর 'রাইনোসেরস' নাটকটি পড়লেই একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে), অধুনালুপ্ত মিউজিক হল্‌সের কমেডিয়ান এবং স্টুজ—চার্লি চ্যাপলিন, বাস্টার কীটন প্রভৃতি, যাঁরা একসময় মিউজিক-হল্ আর্টিস্টস ছিলেন। প্রসঙ্গত 'লাইম লাইট' ছবিতে চ্যাপলিনের সেই মিউজিক হলের দৃশ্যটিও স্মরণে আসে—প্রভৃতির বিশেষ প্রভাব আছে এ্যাবসার্ড নাটকের উপর।

তুলনামূলক সমালোচনা

ভাল নাটক :	এ্যাবসার্ড নাটক :
(১) সুগঠিত কাহিনী	( ) কাহিনী এবং প্লটের অভাব
(২) চরিত্রচিত্রণে সূক্ষ্মতা	(২) চরিত্র বলতে কিছু নেই—যান্ত্রিক পুতুলের সমাবেশ
(৩) বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত থিম	(৩) আদি অথবা অন্তের অভাব
(৪) প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত	(৪) স্বপ্ন এবং ভয়াবহ নিশাস্বপ্ন প্রতিবিম্বিত
(৫) সহজ সুন্দর বোধগম্য যুক্তিপূর্ণ সংলাপ	(৫) অর্থহীন প্রলাপ

এ্যাবসার্ড নাটক লেখা শুরু হয় নাইন্টিন ফিফটিজে। বিশ্বের পটভূমিকায় প্রত্যেক মানুষই একটা বিপদজনক পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে—এই হচ্ছে এই শ্রেণীর নাট্যকারদের আন্তরিক বিশ্বাস। তবে এঁদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভূতির ভেতর প্রভেদ দেখা যায়।

নাইন্টিন সিক্সটি টু থেকে এই আন্দোলনে যেন ভাটার টান দেখা দিয়েছে। প্রত্যেক এ্যাবসার্ড ড্রামাটিষ্টই নিজস্ব বিশেষভঙ্গীতে পৃথিবীকে দেখেন—এই জন্যই তাঁদের রচিত নাটকগুলো অত্যন্ত বেশী সাব্জেকটিভ হয়ে পড়ে। অন্যেরা যখন ভাষ্য করেন, ভাষ্যে ভাষ্যে মিল হয় না।

এ্যালবেয়ার কামু

কামু বলেছেন—যে-জগৎকে যুক্তির অবতারণা করে ব্যাখ্যা করা যায়, তা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক তবু সে আমাদের পরিচিত জগৎ। কিন্তু যে-বিশ্ব হঠাৎ মায়ামোহবর্জিত এবং সম্পূর্ণ আলোক-রেখা শূন্যভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে সেখানে মানুষ নিজেকে অন্য কোনও জগতের লোক বলে মনে করতে থাকে—এখানে সবই যেন তার কাছে অপরিচিত বলে মনে হয়। নিজেকে সে আশাহীন, উদ্দেশ্যহীন, প্রতিকারহীন প্রবাসীর মত, নির্বাসিতের মত দেখতে থাকে। দেশভূমি, জন্মভূমির সব স্মৃতি তার মানসপট থেকে মুছে যায়, ভবিষ্যতের আকাঙ্খিত আশ্রয়ভূমির আশাও তার মন থেকে লুপ্ত হয়। মানুষ এবং তার জীবন, অভিনেতা ও তার সেটিং-এর ভেতর এই যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় তাই থেকেই সৃষ্ট হয় এ্যাবসারডিটির অনুভূতি।"

এবার কয়েকজন এ্যাবসার্ড প্লে রাইটের কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনা করবো।

স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬)

ইনি জাতে আইরিশ—জন্ম হয় ডাবলিনে। বর্তমানে সমস্ত রচনা প্রথমে ফরাসী ভাষাতেই করেন—তারপর নিজেই তার অনুবাদ করেন ইংরাজীতে। ১৯২৮-২৯ সালে জেম্স জয়েস এবং তাঁর বন্ধুচক্রের সঙ্গে আলাপ হবার পর বেকেটের ঘনিষ্ঠতা হয়। এইজন্যই বোধহয় বেকেটের রচনায় জয়েসের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ১৯৩৭ সাল থেকে বেকেট স্থায়ীভাবে প্যারিসে বসবাস করছেন। বেকেটের সবথেকে নামকরা নাটক হচ্ছে 'ওয়েটিং ফর গোডো।' এতে আছে দুটি ভবঘুরে একটি গ্রাম্য রাস্তার ধারে গোডোর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছে। কাছে একটি মাত্র গাছ, ধারেপাশে আর কিছু নেই। গোডো নাটকে কোন কাহিনী নেই। নাটকের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে—সব কিছুই স্থাণু হয়ে রয়েছে। কোন কিছুই ঘটছে না—না কেউ আসছে, না কেউ যাচ্ছে। সমস্ত পরিবেশটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ভবঘুরে দু'টি ছাড়া

আছে পোজো এবং লাকি—প্রভু এবং ভৃত্য। আর আছে একটি বালক। পোজো হচ্ছে নিৎসের সুপারম্যানের ক্যারিকেচার—লাকি চিরন্তন দাসমনোভাবাপন্ন। এ নাটকে essential absurdity of man's situation-কেই দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এ নাটকের আমারই কৃত বাংলা অনুবাদ, আমার পরিচালনায় ১৯৫৭ সাল থেকে অভিনীত হচ্ছে। বেকেট তাঁর এণ্ড গেম নাটকটি লেখেন ১৯৫৭ সালে। এতেও রয়েছে প্রভু এবং ভৃত্য—প্রভুটি আবার অন্ধ। আর আছেন এই প্রভু হ্যামের মা, বাবা—এঁরা দুটি ডাষ্টবিনের ভেতর থাকেন। ক্লোভ হচ্ছে হ্যামের ভৃত্য বা জারজ সন্তান। এঁরা সবাই একটি টাওয়ারে থাকেন—বাইরের জগতের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। আর বাইরের জগতেও এখন কোন জীবিত প্রাণী নেই। কারণ কি এক মহা দুর্যোগে এরা বাদে পৃথিবীর আর সব প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেছে।

ক্লোভ বারবারই হ্যামকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে চায়—কিন্তু পারে না। হ্যাম এবং ক্লোভের সঙ্গে পোজো এবং লাকির সাদৃশ্য আছে।

হ্যাম স্বার্থপর। ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক। ক্লোভ অন্তর থেকে হ্যামকে ঘৃণা করে, তাকে ছেড়ে চলে যেতে চায়, কিন্তু হ্যামের প্রভুত্ব অস্বীকার করবার শক্তি তার নেই—এ যেন তার ভবিতব্য। ক্লোভের কি এতোটা মনের শক্তি আসবে যে সে হ্যামকে ত্যাগ করে যেতে পারবে? এ নাটকের ড্রামাটিক টেন্‌সেন তারই উপর নির্ভর করছে।

হ্যামের ভেতর একটা বেশ ছেলেমানষীর ভাবও আছে—একটা তিন পা-ওয়ালা খেলনা-কুকুর নিয়ে সে খেলা করে। সব সময় তার মনটা আত্ম-অনুকম্পায় ভরা। সে অন্ধ ক্লোভ, তার চোখের কাজ করে। বারবার ঘরের দুটি ছোট জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে দেখে হ্যামের কাছে কি দেখল তাই বলে। শেষবার যখন ক্লোভ টেলিস্‌কোপের সাহায্যে বাইরেটা পরীক্ষা করে তখন যেন তার দৃষ্টিপথে পড়ে ছোট একটি বালকের মূর্তি। কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না এর দ্বারা continuing life এর সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে কিনা। এরপর প্রশ্ন ওঠে 'এণ্ড গেম' নাটকটি কি মনোড্রামা? হয়তো তাই—একটি লোকেরই নানাদিককে অদ্ভুতভাবে দেখানোর জন্যই বোধ হয় বেকেট নাটকটি লিখেছেন। ডাষ্টবিন দুটিতে যে বাবা মা বসে থাকেন তারা হয়তো হ্যামের অতীত-জীবনের ভুলভ্রান্তির স্মৃতি বা হেরিডিটি। ক্লোভ হচ্ছে ইন্টালেকচুয়াল দিকটা—আর হ্যাম হচ্ছে সেই একই লোকের ইমোশ্যানল সেল্‌ফ। তাই একজন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন—Is clove then the intellect bound to serve the emotions, instincts, and appetites, and trying to free himself from such disorderly and tyrannical masters, yet doomed to die when its connection with the animal side of the personality is severed? Is the death of the outside world the general receding of the links to reality that takes place in the process of ageing and dying? Is Endgame a monodrama depicting the dissolution of a personality in the hour of death?

"ক্রাপস লাষ্ট টেইপ" নাটকটিতে বেকেট মানুষের জীবনের পরিবর্তনশীলতার দিকটা দেখিয়েছেন। ক্রাপ বার্দ্ধক্যের দ্বারা জরাজীর্ণ—যৌবনে তার অভ্যাস ছিল প্রতি বছর সে তার আগের বছরের জীবনের ঘটনাগুলো টেইপ করে রাখতো। তিরিশ বছর আগেকার এই জাতীয় একটি টেইপ শুনতে গিয়ে সে নিজের কণ্ঠস্বর এবং চিন্তাধারাকে চিনতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে এ যেন কোন অপরিচিত লোক কথা বলছে। Through the brilliant device of the autobiographical library of annual recorded statements, Beckett has found a graphic expression for the problem of the ever-changing identity of the self.

আর্থার এ্যাডমভ্ (১৯০৮)

জাতে রাশিয়ান—বসবাস করেন ফ্রান্সে এবং লেখেন ফ্রেঞ্চ ভাষায়। প্যারিসেই তাঁর লেখক-জীবনের শুরু ১৯২০ সাল থেকে। প্রথমে সুরু—রিয়ালিস্ট কবি হিসাবে। ১৯৪৫ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'লা প্যারডী' রচিত হয়। তাঁর বিখ্যাত এ্যাবসার্ড নাটক 'প্রফেসর টারানে' হচ্ছে তাঁর নিজস্ব একটি দুঃস্বপ্নের সাহিত্যিক রূপায়ণ—১৯৫৫ সালে তিনি এ্যাবসার্ড রচনারীতি পরিত্যাগ করে বেখ্টিয়ান এপিক থিয়েটারের অনুসরণে নাট্যরচনা করতে সুরু করেন।

প্রফেসর তারানে একজন নামডাকওলা পণ্ডিত লোক—তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হল এই কারণে যে লোকজনের চোখের সামনেই সমুদ্রতীরে উলঙ্গ হয়ে তিনি স্নান করবার উদ্যোগ করছিলেন। পুলিশ-অফিসারদের সামনে প্রফেসর যতই প্রতিবাদ জানান, নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চান, ততই তিনি যেন নিজের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। ঠিকভাবে নিজের বক্তব্য বোঝাতে পারেন না বলেই উপস্থিত সবার কাছে তিনি যেন নিজেকে আরও বেশী দোষী বলে প্রতিপন্ন করে ফেলেন। নাটকের শেষে দেখা যায় সবাই চলে গেছে এবং হতাশায় অধ্যাপক তারানে ভেঙে পড়েছেন—এবার তিনি দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে ষ্টেজের ভেতরের দিকে এগিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তারপর ধীরে ধীরে কাপড়-চোপড় খুলতে শুরু করেন।

একথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠেনা যে নাটকটির আসল বক্তব্য কি? এখানে কি একজন সত্যিকার জুয়াচোরের মুখোস উন্মোচন করে তার আসল চেহারাটা দেখানো হল—অথবা একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি কিভাবে ঘটনাচক্রের ধাক্কায় সম্পূর্ণভাবে নিজের সর্বনাশ রোধ করতে অসমর্থ হলেন তাই তুলে ধরলেন নাট্যকার দর্শকদের কাছে? এইসব এ্যাবসার্ড নাটকের ভঙ্গী দেখে মনে হয় এ যেন এক ধরনের ইন্টালেকচুয়াল শটহ্যাণ্ড।

ফার্ণান্দো আররাবেল (১৯৩২)

জাতে স্প্যানিয়াড—ম্যাড্রিডে আইন অধ্যয়ন শেষ করবার পর ১৯৫৪ সাল থেকে এসে ফ্রান্সে বসবাস করছেন। এঁর রচিত চরিত্রগুলো খুবই শিশুজনোচিত—শিশুদের মতই তারা সময়ে সময়ে অতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে—কারণ জীবনের সাধারণ নৈতিক নিয়মগুলো বোঝবার মত মানসিক পরিপূর্তি তাদের নেই। আবার শিশুদের মতই তারা পৃথিবীর কাছ থেকে অর্থহীন দুর্ভোগ এবং নিষ্ঠুরতা লাভ করে।

আররাবেলের 'দি এক্সি কিউসনার্স' নাটকটি এ্যাবসার্ড প্লে হিসাবে যথেষ্ট পরিচিতিলাভ করেছে। চিরাচরিত নৈতিক নিয়মাবলীকে এ নাটকে তিনি পরস্পরবিরোধী বলে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করেছেন।

একজন মহিলা—নাম ফ্রাঁসোয়া, তাঁর দুই ছেলে বেনোয়া এবং মরিস সহ এসে হাজির হলেন দুজন এক্সি-কিউসনার্সের কাছে এবং স্বামীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ জানালেন। নাটকে অবশ্য এই অভিযোগটি কি সে কথা বলা হয় নি। স্বামীর প্রতি ফ্রাঁসোয়ার ছিল আন্তরিক ঘৃণা। এ্যাক্সিকিউসনার্সরা যখন স্বামীকে ধরে নিয়ে এসে পাশের ঘরে অমানুষিক অত্যাচার সুরু করে দিল, ফ্রাঁসোয়া এ ঘরে বসে স্বামীর যন্ত্রণার কাতরোক্তি অন্তর থেকে উপভোগ করতে লাগলেন। এমন কি একবার পাশের ঘরে গিয়ে স্বামীর ক্ষতগুলোতে নুন এবং ভিনিগার লেপন করে দিয়ে এলেন তার যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিতে। বেনোয়া হচ্ছে মায়ের অনুরক্ত—মায়ের এইসব ব্যবহারে সে কোন দোষ দেখেনা। কিন্তু মরিস বিপরীত প্রকৃতির—সে বাপকে ভালবাসে। মায়ের আচরণের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করে, সুতরাং সে মায়ের কু-সন্তান—মাতৃভক্ত নয়। শেষ পর্যন্ত অত্যাচারে বাপটি মারা গেল - মরিস বাবার মৃত্যুর জন্য মাকেই দায়ী করল। কিন্তু পরে তাকে শান্ত করা হল এবং সে কর্তব্যের ও ন্যায়ের পথে ফিরে এল—মায়ের কাছে অবাধ্যতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করল এবং কার্টেন পড়বার সময় দেখা গেল দুই ছেলে এবং মা

আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকগুলো নৈতিক নিয়ম-কানুন, যথা—মায়ের প্রতি ভালবাসা এবং ভক্তি, বাবার প্রতি শ্রদ্ধা এবং কর্তব্য, অত্যাচারিত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি এবং সমবেদনা, এই নাটকে পরস্পর-বিরোধী অবস্থায় তুলে ধরা হয়েছে। Clearly the situation in which several moral laws are in contradiction exposes the absurdity of the system ot values that accommodates them all.

ইউজিন ইউনেস্কো (১৯১২)

ইনি জাতে রুমানিয়ান, লেখেন ফরাসী ভাষায়। এ্যাবসার্ড নাট্যকারদলের মধ্যমণি। এঁর শৈশব কাটে প্যারিসে, কারণ তাঁর মা ছিলেন জাতে ফরাসী। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যান রুমানিয়াতে। সেখানে গিয়ে লিখতে শুরু করেন এবং ফরাসী ভাষার শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্সে ফিরে আসেন, ইচ্ছা ছিল থিসিস লিখবেন একটি জোরদার ধরণের। সেটা আর কাজে পরিণত হয় না।

এরপর নাটক রচনায় হাত দেন, ১২।১৪ বছর আগে ইওনেস্কোর নাটকগুলো প্যারিসের লেফ্‌ট ব্যাঙ্ক থিয়েটারগুলোতে মঞ্চস্থ হতে শুরু হয়—বেশী দর্শক হোত না। আজ তাঁকে আভাণ্ট-গার্ড দলের প্রায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়। সারা পৃথিবীব্যাপী তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁর রচনা বহু ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। ইওনেস্কোর 'রাইনোসেরস' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ১৯৬০ সালে লণ্ডনের রয়েল কোর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল—নায়কের ভূমিকায় নেমেছিলেন স্যার লরেন্স অলিভিয়ার। এর আগে ঐ থিয়েটারেই ১৯৫৭ সালে তাঁর 'দি চেয়ার্স' অভিনীত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে লণ্ডন আর্টস থিয়েটার ক্লাব 'দি লেসন' নাটকটি প্রডিয়ুস করেন। শ্রীযুক্ত সোমেন নন্দী 'রাইনোসেরসের' বাংলা অনুবাদ করে ('গণ্ডার' নামে) কলকাতায় অভিনয় করিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। এবার ইউনেস্কোর লেখা কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনা করছি।

'দি লেসন' (১৯৫১) নাটকে ইউনেস্কো বোঝাতে চেয়েছেন একজনের মনের ভাব অন্যের কাছে ভাষার সাহায্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা প্রায় দুঃসাধ্য। ভাষা আবার একদিক দিয়ে শক্তির হাতিয়ার, একথাও বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। যিনি জীবনে ছাত্র বা ছাত্রীর ভূমিকায় থাকেন তাঁর স্বাভাবিক শক্তি এবং পৌরুষ ক্রমে ক্রমে কমে আসে—আর যিনি শিক্ষা দেবেন বলে আসেন তিনি প্রথমটায় নার্ভাস এবং দুর্ব্বলচিত্ত থাকলেও ক্রমশঃ শিক্ষকের কাজে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর তিনি ছাত্রের উপর এমন একটা মানসিক আধিপত্য বিস্তার করতে চান যার ফলে সে অস্থির হয়ে ওঠে এবং পরিত্রাণ পেতে চায়। শিক্ষক তখন তার ব্যক্তিত্বকে হত্যা করেন।

এর সাঙ্কেতিক অর্থ হচ্ছে—ডিক্টেটররা যখন অনুভব করতে থাকেন যে জনসাধারণের উপর তাঁদের ব্যক্তিত্ব আর প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না, তখন তারা সাধারণের ভেতর যারা মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতে চায় তাদের ধ্বংস করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন। এর ফল হয় উল্টো—তাঁদের নিজেদের শক্তিই কমে আসে।

'দি ফিউচার ইজ ইন্ এগ্‌স'-এ দেখানো হয়েছে যে কোন বিশেষ একজন মানুষ পৃথিবীর বিরাটত্ব, রাশি রাশি বস্তুপিণ্ড এবং ক্রমবর্দ্ধমান মানুষের সংখ্যা দেখে ভয়ে শিউরে ওঠে—আসলে প্রত্যেক মানুষই ভেতরে ভেতরে একা—বহুজনসমাবেশ বা বিরাট পৃথিবীর মাঝে সে কিছুতেই নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে পারে না।

'দি চেয়ার্স' নাটকে এক ৯৫ বছরের বৃদ্ধ এবং তাঁর ৯৪ বছরের স্ত্রীকে দেখতে পাওয়া যায়—তাঁরা একটি গোলাকৃতি ঘরে চেয়ারের সারি সাজিয়ে রেখেছেন—এখানে অদৃশ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসে বসছেন।

বৃদ্ধটি একটি বক্তৃতা দেবার জন্যই এই আয়োজন করেছেন। বক্তৃতাটি যখন শোনানো হোল তখন দেখা গেল তা অর্থহীন প্রলাপের মত—জীবনের শূন্যতা এবং অর্থহীনতা মানুষকে কি ভাবে পিষে মারে তারই একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত এই বক্তৃতায় পাওয়া যায়।

এ নাটকে লেখকের নিজের নাট্যিক-জীবনের ব্যর্থতার একটা আভাসও পাওয়া যায়। শূন্যচেয়ারগুলো দেখে মনে হয় ইওনেস্কোর নাটকগুলো যখন লেফ্ট ব্যাঙ্ক অফ সেইনের ছোট্ট থিয়েটারগৃহগুলিতে অভিনীত হত প্রেক্ষাগৃহের চেয়ারগুলো ঠিক এই রকম খালি থাকতো—কারণ এ্যাবসার্ড থিয়েটার দেখতে জনসমাগম হত না।

'এমিডি' (১৯৫৩)—এটি তিন অঙ্কের একটি চমকপ্রদ নাটক। মধ্যবয়স্ক এক দম্পতিকে কথাবার্তা বলতে দেখা যায় একটি ঘরে—পেছনের আর একটি ঘরে বহু বছর ধরে একটি শবদেহ পড়ে রয়েছে—এর আকৃতি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বোধহয় এই দম্পতির ব্যর্থ বিবাহিত-জীবনের প্রতীক হিসাবেই দেখানো হয়েছে শবদেহটিকে। The Corpse might evoke the growing power of past mistakes or past guilb. perhaps the waning of love or the death of affection - Some evil in any case that festers or grows worse with time 'রাইনোসেরস্' (১৯৫৮)—ইওনেস্কোর সবথেকে বেশী জনপ্রিয় নাটক এইটি। এ নাটকে নাট্যকার ১৯৩৮ সালে রুমানিয়া ছাড়বার সময়ে তাঁর মনে যে ভাবানুভূতি হয়েছিল তারই রূপায়ণ করেছেন। সেই সময় তার পরিচিত সাথীর দল সবাই প্রায় ফ্যাসিষ্ট মুভমেন্টের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সমসাময়িক প্রচলিত হুজুগে লোকে কি ভাবে প্রভাবিত হয়, কি ভাবে সম্মোহিতের মত আচরণ করতে থাকে, নাৎসি এবং ফ্যাসিষ্ট মতবাদ কি ভাবে তৎকালীন জনগণকে সংক্রামক রোগের মত ব্যাধিগ্রস্ত করে তুলছিল তারই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে এই নাটকে। ইওনেস্কো বলেছেন—At Such moments we witness a veritable mental mutation When people no longer share your opinions., when you can no longer make yourself understood by them, one has the impression of being confronted with monsters - rhinos, for example.

এডওয়ার্ড এল বি (১৯.৮)

আমেরিকাতে এ্যাবসার্ড নাটক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে যে ব্যর্থতা এবং হতাশার ভাব জেগে উঠেছে তারই প্রত্যক্ষ ফল এ্যাবসার্ড নাটক। আমেরিকাতে জীবন সম্বন্ধে কোন ফ্রাসটেশন দেখা দেয়নি—ওদের কাছে জীবনের উদ্দেশ এবং অর্থ দুইই আছে। আমেরিকান নাট্যকারদের ভেতর এক এলবিই বোধহয় এ্যাবসার্ড ড্রামা নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ খেলা খেলার ভাব করেছেন—তাঁর দুটি নাটক 'দি জুস্টোরি, (১৯৫৮) এবং 'দি আমেরিকান ড্রিম' (১৯৬১) এই পর্যায়ে পড়ে। প্রথম নাটকটিতে এই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে জগতে কিছু এমন মানুষ আছে যারা সত্যিকারের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সবাই তাদের আউটসাইডার হিসাবে মনে করে—সাধারণ মানুষ কিছুতেই তাদের আপন করে নিতে পারে না।

হ্যারল্ড পিন্টার (১৯৩০)

ইংরেজ এক্টর এবং নাট্যকার—ইনি 'দি ডাম্ব ওয়েটার' নাটকটি লেখেন ১৯৫৭ সালে। একটি ঘর—দুজন লোক কথাবার্তা বলছে—এরা হচ্ছে ভাড়াটে খুনে—একটি রহস্যজনক সংঘের দ্বারা এরা নিযুক্ত। একজন কারোকে হত্যা করবার দায় এদের উপর পড়ল—তাকে খুন করেই এরা খালাস- পরে কি ঘটল সে খবর এরা রাখেনা।

এদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যাচ্ছে দুজনে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে—বেন এবং গাস—দুজন হত্যাকারী। শেষ পর্যন্ত বেনের কাছে সংগঠনের নির্দেশ আসে এরপর তাকে গাস্‌কেই হত্যা করতে হবে। The play brillianlly fulfils the complete fusion of tragedy with hilasious farce,

এ্যাবসার্ড নাটকের প্রয়োজনীয়তা

তথ্য এবং তত্ত্বের দিক দিয়ে হয়তো মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ জন এসব নাটক পড়ে বা দেখে কিছু সূক্ষ্ম ধরণের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু সাধারণ লোকেরা এই শ্রেণীর নাটকের একঘেয়েমি সহ্য করার থেকে ষ্ট্রেইট প্লেজ দেখেই সময় কাটাতে পছন্দ করেন। তাছাড়া যে তথ্য বা তত্ত্ব এসব নাটকে পাওয়া যায় তা আরও সহজ এবং সুন্দরভাবে পরিবেশিত হয় প্রচলিত ভাল নাটকের মাধ্যমে। তবে এ ধরণের প্লে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল কেন? আমার মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে থেকেই যখন চিরাচরিত রীতিতে রচিত নাটকগুলো অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এ্যাবসার্ড নাট্যকারদের অভ্যুত্থান। তবে এদের লেখা দু'চারটি নাটক—যেমন বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো', ইওনেস্কো রাইনোসেরস এবং 'এমিডি' এবং এডামভের 'প্রফেসর টারান' ঠিক অগ্রাহ্য করবার মত নাটক নয়।

বাংলায় নাকি শ্রীবাদল সরকার এ্যাবসার্ড প্লে লিখছেন—এ নিয়ে অনেকের আপত্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ আপত্তির কোন যথার্থ হেতু আমি খুঁজে পাই না। ইওরোপের অনুকরণে অনেক কিছুই তো আমরা করে থাকি। ইংরাজরা ক্রিকেট খেলে—সুতরাং আমরাও খেলি—কি রকম খেলি তা নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলবে কেন? স্যার লরেন্স অলিভিয়ার ইডিপাস সাজেন, শ্রীশম্ভু মিত্রও তাই করেন, জেনেট এ চার্চ নোরা করতেন। শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রও বস্তিবাসিনীর ভূমিকা ছেড়ে নোরার অভিনয় শুরু করলেন। আর সে অভিনয় দেখে এবং শুনে আমাদের সেই নারীর মত কোমল, পেলব ইতিহাসের অধ্যাপকটি মন্তব্য করলেন এমন অভিনয় সারা দুনিয়াতে কখনও দেখিনি। এ কি শিশির ভাদুড়ী, প্রভার নেটিভ রোলস্ রাম সীতার ভূমিকায় অভিনয়—এ হচ্ছে গ্রীক ট্র্যাজেডী, ইবসেনী প্রব্লেম প্লের মঞ্চ রূপায়ণ চাট্টিখানি কথা।

সুতরাং শ্রীযুক্ত বাদল সরকার যত ইচ্ছে এ্যাবসার্ড নাটক লিখুন এবং শ্রীশম্ভু মিত্র এবং শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র তাতে অভিনয় করুন—আমাদের তাতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না। ইওরোপের অনুকরণেই আমাদের পিকচার ফ্রেম ষ্টেজের উৎপত্তি। ইওরোপের অনুকরণেই আমরা গণ্ডার, গরু, ভেড়া সাজব। মন্দ লোকে তো চিরকাল মন্দ কথা বলবেই—তাতে কি এসে যায়?

পূজার ছুটি

পূজাবকাশ হেতু আগামী ১০ই অক্টোবর (২৩শে আশ্বিন, ১৩৭৪) হইতে ২৪শে অক্টোবর (৬ই কার্ত্তিক, ১৩৭৪) পর্য্যন্ত প্রবাসী অফিস বন্ধ থাকিবে। চিঠি-পত্রাদির যোগাযোগ ছুটির পর করা হইবে। সকলের অবগতির জন্য ইহা জানানো হইল।

কর্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
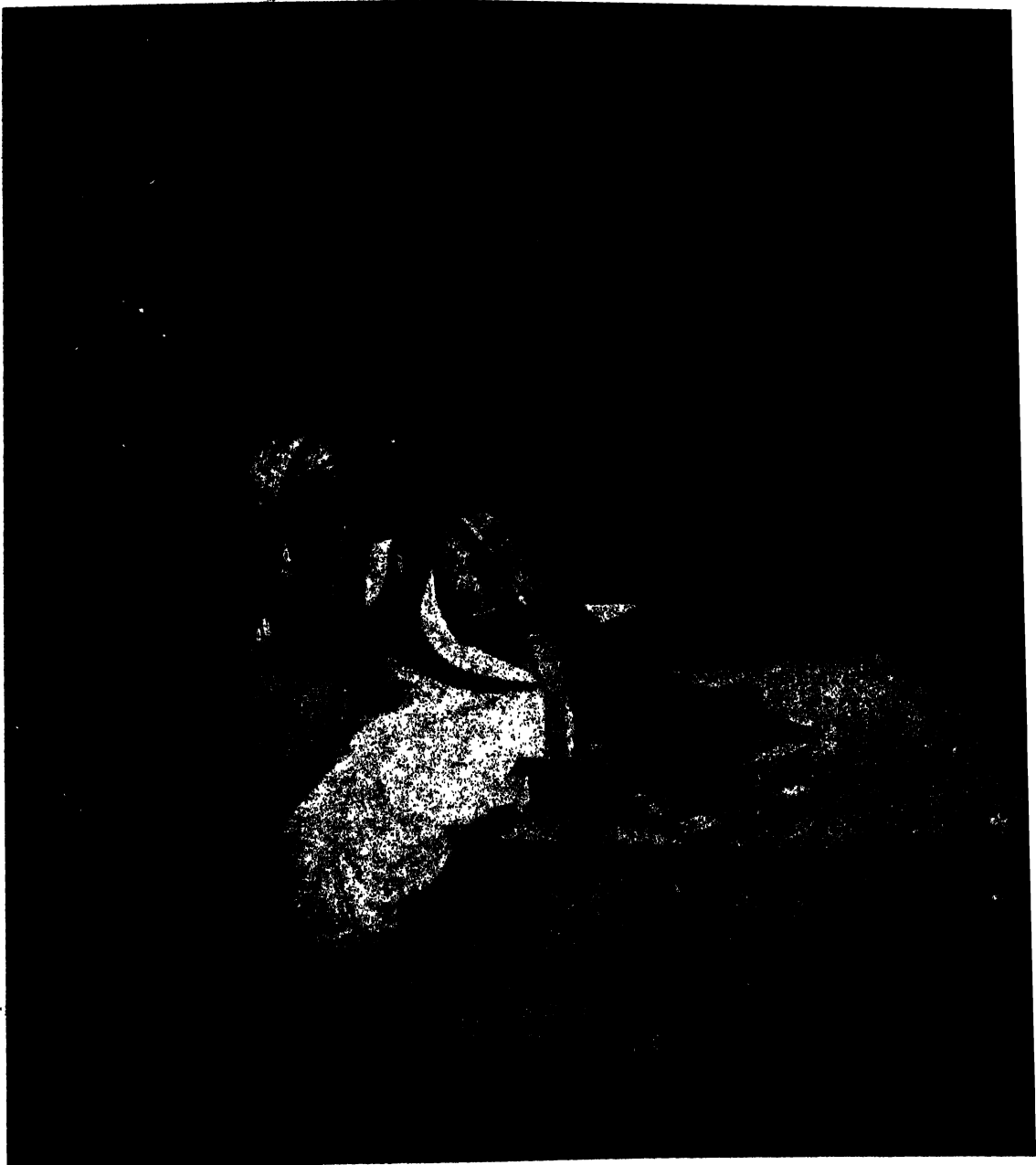
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সুরের নেশা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪	২য় সংখ্যা

বাংলার জাতীয়তাবোধ

বাংলাদেশে আজকাল যে সকল লোক সভা সমিতি জলুশ মিছিল প্রভৃতি করিয়া নিজেদের মতবাদ বলিয়া অপরের নির্দ্দেশ জোর গলায় উদ্দাম ও উদ্ধতভাবে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট বাংলার জনসাধারণের এই কথা বলিবার অধিকার আছে, যে বাঙ্গালী মূর্খের জাতি নহে ও বাঙ্গালীর সকল কথা বিচার করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং কোন "ইজম" দেখাইয়া যদি বাঙ্গালীকে জোর করিয়া কোন মতের সমর্থন করাইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে সেই চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত কখনও সফল হইবে না। বর্ত্তমানে যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয় ব্যক্তিদিগের আদেশে মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে বাজারের অভদ্র ভাষায় "দালাল" বলা হয়। এইভাবে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত উচ্চ কণ্ঠস্বর ও অসভ্য ব্যবহার বিক্রেতা "দালালগণ" শুনা যায় আমেরিকান, চীনা, রুশিয়ান প্রভৃতি বিদেশী জাতিদিগের সহায়তায় নিজেদের ভাড়াটিয়া প্রচারকের কার্য্য চালাইয়া থাকেন। এ কথার সত্যতা বিচার করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ পরের অর্থ লইয়া নিজ জাতির ক্ষতিকর কার্য্য যাঁহারা করেন, তাঁহারা সেই সকল গোপন সম্বন্ধ গোপন রাখিয়াই চলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত বিদেশীদিগের ঐরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা তাহার প্রমাণ পাওয়া কঠিন। কিন্তু যদি কোন দেশে বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া ক্রমাগত বিদেশীদিগের গুণ-ব্যাখ্যায় মাতিয়া উঠিতে থাকে ও পরস্পরের নিন্দায় মুখর হইয়া জনসাধারণের শান্ত সুচিন্তিত মতামত প্রকাশে বাধা দেয় তাহা হইলে সেইরূপ অন্যায় আচরণের কোন একটা কারণ থাকিতে বাধ্য একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এবং সেই কারণটি বিদেশীর অর্থে পুষ্ট হইয়া ভারতের উপর বিদেশীর প্রভুত্ব অথবা প্রভাব বিস্তার চেষ্টা হইতেও পারে। অন্তত কেহ যে নিছক অকারণ পুলকে হঠাৎ চীনের অথবা আমেরিকার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে একথা সাধারণে বিশ্বাস না করিতেও পারেন। সেকথা যাহাই হউক, পয়সা লইয়া অথবা বিনাপয়সায় যদি কাহারও

অপর দেশের প্রভুত্ব মানিয়া চলিবার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সেইরূপ দাস-মনোভাবের চিকিৎসা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমরা সে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিয়া নিরপেক্ষ থাকিতে পারি। কিন্তু যদি অপরের ভৃত্য আসিয়া আমাদিগকে জোর করিয়া পরদাসত্বের মহিমা মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হইতে পারে না। অর্থাৎ আমরা বাঙালীরা স্বাধীনতাকে সকল রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। ইহার পশ্চাতে আমাদিগের বহু দীর্ঘকালের একটা ঐতিহ্য রহিয়াছে ও আমরা রুশ, আমেরিকা অথবা চীন মহাপ্রগতির কেন্দ্র হইলেও ঐ সকল জাতির নিকট মাথা নিচু করিয়া থাকিতে ও তাহাদিগকে গুরু বা প্রভু বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। চীনের নিকটে বিশেষ করিয়া অবনত মস্তকে শিষ্যত্ব বা দাসত্ব করিতে আমরা কিছুতেই পারি না, কারণ চীন তিব্বতের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে ও যেভাবে ভারত আক্রমণ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছে ও এখন অবধি করিয়া থাকে তাহাতে চীনের প্রভুত্ব দূরের কথা, তাহার সখ্যও আমরা আকাঙ্খা করিনা। চীনের বিরুদ্ধে কথা বলিবার ও চীনের বন্ধুত্ব বা প্রভুত্ব প্রার্থী বাঙালী-দিগের সমালোচনা করিবার অধিকার সকল বাঙালীর আছে। তথাকথিত কম্যুনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী যাঁহারা, তাঁহাদিগের সহিত মতের অনৈক্য থাকিলেও আমরা তাঁহাদিগকে কখনও বলিতে চাহি না যে তাঁহাদিগের নিজ মতের অধিকার নাই। কিন্তু তাঁহারা যদি নিজ মত অপরের উপর জোর জুলুম করিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন অথবা বিদেশীদিগের সাহায্যে আমাদিগের দেশের উপর নিজ দলের প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমাদিগকে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ বাধ্য হইয়াই করিতে হইবে। কারণ জোর জুলুমের বিরুদ্ধে জোর জুলুমই একমাত্র পথ। স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে যদি কেহ বাধা দেয় তাহা হইলে তাহাকে তখন তাহার অন্যায় ব্যবহার হইতে জোর করিয়াই নিরস্ত করিতে হয়।

এই সকল পরমুখাপেক্ষী দাসমনোভাবাক্রান্ত বাঙালী নরনারীকে আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে এক সময় ইংরেজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যও কোন কোন বাঙালী ঐ ভাবেই দেশবাসীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন ও বিহার ও উত্তর প্রদেশের পুলিশ দেশভক্তদিগের উপর লাঠি চালনা করিয়াছিল। কিন্তু দেশপ্রেমের প্রবল আবেগের বন্যায় সেইসকল ক্ষুদ্রমনা দেশদ্রোহীগণ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল তাহার কোন চিহ্নও সে সময় কোথাও দেখা যাইত না। আজ যে বাংলাদেশে ভারতের অপরাপর জাতির অথবা বিদেশের অনুগ্রহ ভিক্ষা করা একটা পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলে মনেও হয় না যে একদিন বাঙালীই ভারতকে স্বাধীনতা ও মুক্তির পথ দেখাইয়াছিল।

১৯০৫ খৃঃঅব্দের ৭ই জুলাই যখন বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয় তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "বেঙ্গলী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে "আমরা এমন একটা আন্দোলনের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি যাহার কোন তুলনা এই দেশে পূর্ব্বে কখনও পাওয়া যায় নাই। ১৯১১ খৃঃঅব্দে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে পাওয়া যায়, "ডিসেম্বর ১৯০৩ হইতে অক্টোবর ১৯০৫ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থলে বাংলা বিভাগ কল্পনার বিরুদ্ধে ২০০০ হাজারের অধিক সাধারণ সভা হইয়াছে ও সেইগুলিতে লোক সংখ্যা ৫০০ হইতে ৫০০০০ অবধি হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই সকল সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ......৭০০০০ লোকের স্বাক্ষর করা আপত্তিজ্ঞাপক পত্র সেক্রেটারি অফ স্টেটকে দেওয়া হইয়াছিল...বাঙালী-দিগের দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকার সংখ্যা হইয়াছিল বহু সহস্র। অনুভূতির প্রবলতা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হয় যে কতশত জননেতাগণ এই বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল নেতাদিগের মধ্যে ছিলেন বাংলার সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ। বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া এমন করা হইয়াছিল যে বাঙালী নিজ

দেশেই সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল ও তাহার কোন রাষ্ট্রীয় নিজস্ব আর রহিল না। লর্ড কার্জ্জন তখন হইতেই ঢাকায় নবাব সালিমুল্লাকে অল্প সুদে ১৪ লক্ষ টাকা দিয়া ও অন্যান্য প্রকারের লোভ দেখাইয়া মুসলমান বাঙ্গালীদিগকে ইংরেজের দিকে টানিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। সেই হইল মানসিক ভাবে বাংলা তথা ভারত বিভাগের সূত্রপাত। কিন্তু বাঙ্গালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তি ও অর্থবলকে অগ্রাহ্য করিয়া তখন নিজ অধিকার বজায় রাখিবার জন্য বিপুল আন্দোলন করিয়াছিল। আজ বাঙ্গালীর সেই মনের জোর কোথায়? স্বদেশী আন্দোলনের মূল মন্ত্র ছিল বিদেশীদ্রব্য বর্জ্জন ও বিদেশীদিগের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। সেই যুগে যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া শোকপ্রকাশ ও আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন স্কুলের ছেলেরা নগ্নপদে স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিল। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া বাংলার তরুণ সন্তানগণ বৃটিশের হস্তে বহু নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিয়া সেই যুগে দেশভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রথমেই ২৭৫ জন ছাত্রকে স্কুল হইতে নগ্ন পদে আগমনের জন্য বহিষ্কৃত করা হয়। পরে বেত্রাঘাত ও পুলিশের লাঠির আক্রমণ। ছাত্রগণ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা করিত। শীঘ্রই ধোবাগণ বিদেশী বস্ত্র ধোয়া বন্ধ করিল। চাকরবাকর বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারকারী মনিবের চাকুরি ত্যাগ আরম্ভ করিল। মুচীগণ বিদেশীদিগের জুতা মেরামত করিতে চাহিল না। পুরোহিত বিবাহে বিদেশী-দ্রব্যসম্ভার দেখিলে আপত্তি তুলিলেন ও ছাত্রগণ বিদেশী কাগজে মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিতে রাজী হইল না। রাজশক্তি যায় যায় ও ব্যবসা বাণিজ্য গতপ্রায় দেখিয়া বিদেশী-শাসকগণ চরম অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। স্বদেশী-সঙ্গীত স্বদেশী-কাব্য ও স্বদেশী-সাহিত্য বাংলাদেশ ছাইয়া ফেলিল। শিক্ষায়, কর্ম্মে, ব্যবসায়ে স্বদেশী প্রবল আকার ধারণ করিল। সভায় সভায় সহস্র সহস্র লোক বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে দিকবিদিক কাঁপাইয়া তুলিল। সেই বৎসর পূজার সময় যে বিরাট জনতা কালীঘাটের মহাপূজায় উপস্থিত হইয়াছিল তাহার তুলনা হয় না। দলে দলে প্রায় পঞ্চাশ সহস্রাধিক ব্যক্তি পূজার মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন ও সেইখানে বিদেশী বর্জ্জনের প্রতিজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ পূজারীগণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, দেশভক্তির দেশ সেবার ও দেশের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার আদর্শের। সেইবার ভ্রাতৃত্বের ও জাতীয় একতার নিদর্শন হিসাবে রাখী-বন্ধন আরম্ভ হইল। ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধন দিবসে যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে কখনও কেহ দেখে নাই। শুদ্ধ মাত লক্ষ লক্ষ লোক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পরস্পরকে আরও নিকটে টানিয়া লইতে অগ্রসর হইলেন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চরাচর কম্পিত। দেশমাতৃকার সন্তান সকলে এক হইয়া বিদেশীর হস্তে মায়ের অপমানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনবান, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান, সকলে একত্র হইয়া দেশের উন্নতি ও সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহরে, গ্রামে, পথেঘাটে, স্কুলে কলেজে, অফিসে দফতরে সর্ব্বত্রই এই নূতন জাগরণ প্রকট হইয়া উঠিল। বিদেশী রাজশক্তি ব্যস্ত, সচকিত ও আশঙ্কিত হইয়া ন্যায় অন্যায় জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া উৎপীড়ন ও দমনের পথে হারান অধিকার পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ করিলে অথবা বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন কর বলিলে লাঠির আঘাতে মাথা ভাঙ্গা আরম্ভ হইল। স্কুলের ছেলেদের বেত্রাঘাত ও লাগুড়াঘাতে বৃটিশ ভক্তির পথে ফিরাইয়া আনার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের রচিত গানের আদর্শে বাঙ্গালী চলিতে লাগিল

> "আমার যায় যেন জীবন চলে
> জগৎমাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।
> আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমি কি মা'র সেই ছেলে,
> দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি কে পালাবে মা ফেলে?

যখন মুদে নয়ন করব শয়ন শমনের সেই
শেষ জেলে
তখন সবই আমার হবে আঁধার স্থান দিও মা
ঐ কোলে ॥

শত শত বাঙ্গালী রক্তাক্ত কলেবরে বাংলা মায়ের রক্ষার্থে বিদেশী অত্যাচারীর সঙ্গে যুদ্ধে নামিয়া পড়িলেন ও সেই যুদ্ধে বহু নরনারী প্রাণ দিলেন ও সর্বস্ব হারাইলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বর্ষাধিক কাল স্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে কোন বাঙ্গালী কখন এক বিদেশী জাতিকে ছাড়িয়া কোন অপর বিদেশী জাতির আশ্রয় প্রার্থনা করিবে এরূপ হীন আকাঙ্খা কদাপি মনে পোষণ করে নাই। আজ আমরা যখন দেখিতেছি যে 'সেই বাংলার সন্তানই বিদেশীর আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ বুকুনির আস্ফালন করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছে, তখন আমাদিগের সত্য সত্যই মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইতেছে। কারণ আমরা বাঙ্গালীরা কখনও দেশাত্মবোধের, মানবতার আদর্শের ও ব্যক্তিগত স্বাধীন আগ্রহের ক্ষেত্রে অপরের শিখান বুলি আওড়াইয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতে অভ্যস্ত হই নাই। ভারতের অপরাপর জাতির লোকেরা সেই স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে অপারগ ছিল না। লাঠি তাহারাই চালাইত, বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিয়া বিক্রয় চেষ্টাও তাহারাই করিত। এমন কি বাঙ্গালীর স্বদেশী ক্রয় আগ্রহ দেখিয়া তাহারা উচ্চমূল্যে সস্তার মাল বাংলা দেশে বিক্রয় ব্যবস্থা করিত। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব বাংলার সহিত হাত মিলাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান চেষ্টাতে আসিয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের অনেক-গুলিতেই সেই জাগরণ আসিতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল। আজও নিজ নিজ সুখসুবিধা খুঁজিয়া যাহারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে সেই সকল লোকের মধ্যে দেশভক্তি বা দেশাত্মবোধের অভাব পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও কোন কোন বাঙ্গালী তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদেরই অনুকরণে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে ব্যস্ত। এই সকল বাঙ্গালী ও যাহারা বিদেশীর আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করে না, উভয় দলের বাঙ্গালীই বাংলার জাতীয়তা ও আত্মসম্মানবোধের সর্বনাশের কারণ। বাঙ্গালী যদি এখনও না বুঝিয়া থাকে যে তাহার জাতীয়তা নষ্ট করিয়াই আজ ইংরেজ, মুসলিম-লীগ ও কংগ্রেস ভারতবিভাগ করিয়া ভারতমাতাকে অঙ্গহীনা করিয়াছে, ও বর্তমানের পরমুখাপেক্ষী রাষ্ট্রীয় দল বিশেষের ভারতে আবির্ভাবও ইংরেজ প্ররোচিত ও ইংরেজের অর্থ দিয়া সমর্থিত ; তাহা হইলে বাঙ্গালীর বুদ্ধির অহঙ্কারের কি মূল্য থাকে? বাঙ্গালী যদি নিজ হারান জেলাগুলিকে ফিরাইয়া বাংলায় পুনঃ সংযুক্ত করাইতে না পারে তাহা হইলে বাংলার নিজত্ব ও আত্মগৌরবই বা কোথায় থাকে? বাঙ্গালী যদি শুধু বিশ্বরাষ্ট্র ও বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সকল সমস্যা লইয়া নিজ দেশে বিভেদ ও কলহের সৃষ্টি করিয়া সময় নষ্ট করে তাহা হইলে সেই সকল বাঙ্গালীকে দেশদ্রোহী বিবেচনা করা ভুল হয় না। আর যে সকল বাঙ্গালী ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের বাজারে অপরের মত ও মতলব বিক্রয় করিয়া রাষ্ট্রীয় ফেরিওয়ালার কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদিগকেও বা আমরা বাংলার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বলিয়া কি করিয়া বিবেচনা করিতে পারি? বাংলাদেশে যদি বাঙ্গালীরই স্থান ইংরেজ, রুশিয়ান আমেরিকান বা চীনার পদতলে হয় তাহা হইলে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালীর অস্তিত্ব থাকে না। আর বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যদি অধিকাংশ পাকিস্থানে যুক্ত হয় ও কিছু অংশ যায় বিহার প্রদেশে তাহা হইলেই বা আমাদিগের দেশ ও জাতির প্রতিষ্ঠা কোথায় থাকে?

সঙ্গীত ও ভাব

কোন কোন ধরণের গান বাজনা ভাব অনুভূতিকে জাগ্রত না করিয়া এমন একটা জড়তাচ্ছন্ন করিয়া দে[illegible] যে তাহা শ্রবণ করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। একথ সর্বজন স্বীকৃত যে সঙ্গীত ভাব প্রকাশের এক অপরূ[illegible] উপায়, যে উপায় কণ্ঠ বা যন্ত্রের স্বর ও শব্দ, গদ্যের ভাষা

কাব্যের ভাষা ও ছন্দ এবং নৃত্যের চঞ্চল অভিব্যক্তিকে ছাড়াইয়া একাধারে প্রকাশের উর্দ্ধতম ও ভাবের গভীরতম দেশে শ্রোতাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ বঙ্গাব্দে সঙ্গীত ও ভাব লইয়া যাহা বলিয়াছিলেন ও পরে, প্রায় আরও চল্লিশ বৎসরকাল বিগত হইলে ঐ বিষয়ে যাহা বলেন, সেই সকল কথা বিচার করিলে দেখা যায় যে মহাকবি শাস্ত্রগত রাগ-রাগিনীর কঠিন বন্ধন পূর্ণ রূপে রক্ষা করিলে সঙ্গীতের যথাযথ ভাব অভিব্যক্তিতে বাধা পড়ে, প্রথমে এই কথা ভাবিয়াই পুরাতন নিয়ম কোথাও কোথাও লঙ্ঘন করিয়া সঙ্গতি রচনা করিবার পক্ষপাতি ছিলেন। পরে এই মত তিনি কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেন। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে তিনি বলেন, "রাগ-রাগিনীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগ-রাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে রাগ-রাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগ-রাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন।" কিন্তু যাঁহারা অতি পুরাকালে রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাঁহারা ভাবকেই ধরিয়া সুরমাধুর্য্যের অনুসরণে সেই সৃজনকার্য্য করিয়াছিলেন।"...প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে অতি ক্রমশঃ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে অতি ক্রমশঃ নয়ন নিমীলিত করে।...তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কী বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশঃ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোঁতে ও পুরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে এই জন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্ত্তিমান।

"আমাদের সঙ্গীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সঙ্গীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগ-রাগিণী রচনা করা হইত যখন আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগ-রাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না?"

প্রাচীন সঙ্গীতের নিয়মপ্রবল কঠোর পদ্ধতির বন্ধনে আবদ্ধ সুর বিন্যাস আলোচনা করিলে মনে হয়, যেমন চিত্রজগতে বিষয় ব্যক্তিত্ব বা অর্থবর্জিত রেখা ও বর্ণের নক্সা দিয়া চিত্রপট পূর্ণ করিয়া দেওয়া যায় ও তাহা দেখিয়া দর্শক বিস্ময়াপ্লুত হইয়া থাকেন তেমনি সুরের রচনা ক্ষেত্রেও স্বর বিন্যাস করিয়া সুকৌশলী গায়ক বা বাদ্যকর শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু চিত্র অঙ্কনের যথার্থ উদ্দেশ্য হইল বর্ণ ও রেখার ব্যবহারে কোন বিষয় বা ভাব ব্যক্ত করা, শুধু অঙ্কন-কৌশল দেখানই নহে। এবং সুর ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তেমনি আসল কথা হইল ভাব ব্যক্ত করা। সুর বিন্যাস করিয়া মহা কৌশলে স্বরের নক্সা কাটা সঙ্গীতের উদ্দেশ্য নহে।

মহাকবি আবার ১৩১৯ বঙ্গাব্দে নিজের যৌবন-কালের মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন:

"গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানের বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্য্যেই বড়ো, বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেই-খানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। হিন্দুস্থানি গানের কথা সাধারণতঃ এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপ রাগিণী যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ।" তাহা হইলেও গানে কথা ও কাব্যের

প্রভাব সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে; এবং সঙ্গীতের মাধুর্য্য বাক্য ও সুর উভয়ের মিলিত মাধুর্য্য। তথাকথিত আধুনিক সঙ্গীতে দেখা যায় একাধারে কথা, কাব্য ও সুরের দারিদ্র্য। এই কারণে জনসাধারণকে যে জোর করিয়া বেতারে আধুনিক সঙ্গীত শুনিতে বাধ্য করা হয়, সেই অকারণ উৎপীড়ন বন্ধ করা আবশ্যক। যদি মানিতেই হয় যে ঐ আধুনিক সঙ্গীত পাশ্চাত্য দেশের রস অভিব্যক্তির তর্জ্জমা করা চেহারা মাত্র, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মহত্তর আদর্শের বিকাশ যে সকল রচনার ভিতরে দেখা গিয়াছে সেইগুলিকে অবহেলা করিয়া যখন ভারতীয় সঙ্গীত এতকাল নিজত্ব বাঁচাইয়া বাঁচিয়া আছে, তখন পাশ্চাত্যকৃষ্টির শেষ বয়সের প্রলাপের তর্জ্জমা না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

১৯৩৫ খৃঃ অব্দে মহাকবি আবার ঐ সঙ্গীতের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও রূপদান চেষ্টার আলোচনায় বলেন:

"বাঙালী স্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে। হৃদয়োচ্ছ্বাসকে ছাড়া দিতে গিয়ে কাজের ক্ষতি করতেও বাঙালী প্রস্তুত। আমি জাপানে থাকতে একজন জাপানী আমাকে বলেছিল, রাষ্ট্র বিপ্লবের আর্ট তোমাদের নয়। ওটাকে তোমরা হৃদয়ের উপভোগ্য করে তুলেছ; সিদ্ধিলাভের জন্য যে তেজকে, যে সংকল্পকে গোপনে আত্মসাৎ করে রাখতে হয়, গোড়া থেকেই তাকে ভাবাবেগের তাড়নায় বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করে দেও।...উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা......

"বাংলাদেশে সম্প্রতি সংগীত চর্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সংগীত রচনাতেও আমার মত অনেকেই প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ ধ্রুব পদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্ব্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। কিন্তু এ অনুশীলনের জন্যে, অনুকরণের জন্যে নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়।......

"প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে। আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। 'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে'—এতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা কল্পনার রূপলীলা। ভাব প্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপ প্রকাশ অহেতুক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্নাহাসির সম্পর্ক দেখিনে, তাতে দেখি গীতরূপের গম্ভীরতা। যে বিলাসীরা টপ্পা ঠুংরি বা মনোহরসাঞী কীর্ত্তনের অশ্রু আর্দ্র অতি মিষ্টতায় চিত্ত বিগলিত করতে চায় এ গান তাদের জন্য নয়। আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ, তা ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ হর্ষশোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সংগীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে, তোড়িতে, কল্যাণে, কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চ শিখরে উঠতে পারুক বা না পারুক, সেই দিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন।"

সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ভাব, সুর ও রূপসৃষ্টির সম্রাট ছিলেন। "সংগীত রচনাতে" তাঁর "মত অনেকেই প্রবৃত্ত" একথা তিনি সরল চিত্তেই বলিয়াছিলেন। অনেকেই, প্রায় সকলেই, সংগীত রচনাতে প্রবৃত্ত না হইলে দেশের কৃষ্টি ও রুচির জাতি রক্ষা হইত। সময় থাকিতে যদি অধিক সংখ্যক সংগীত রচনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণ অপর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া মনে হয়। অন্তরে যার ভাবদারিদ্র্য, ভাষা যাহার পঙ্গু, হৃদয়ে যাহার নূতনত্বের হিতাহিত জ্ঞানহারা আগ্রহ রূপরস বোধকে বিসর্জন দিয়া যথেচ্ছাচারে নিমগ্ন বিশ্বের কৃষ্টির দরবারের ভিতরে পৌঁছাইতে না পারিয়া যে বাহির হইতেই কুড়াইয়া আনা আবর্জ্জনাকে বাহিরের জগতের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে করে, সেই জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতার রচনা

স্বদেশ বা বিদেশ, কোন দেশেরই কৃষ্টিরই কোন উন্নতি করিতে বা সত্য পরিচয় দিতে অক্ষম। অনুকরণ করিলে শ্রেষ্ঠের অনুকরণই বাঞ্ছনীয়। বিদেশীয় জঘন্য রুচিকে ডাকিয়া আনিয়া নিজ দেশে আসন দিবার কোন আবশ্যকতা আমরা দেখি না। সুনির্ব্বাচনের পথে বিশ্বের রস অভিব্যক্তির সারবস্তুগুলিকে লইয়া আসিয়া নিজ দেশের কৃষ্টির ভিতরে সেইগুলিকে উপযুক্তভাবে বসাইয়া দেওয়া যাহার তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অনধিকার চর্চ্চা স্বদেশ ও বিদেশ উভয়ের সভ্যতারই ক্ষতিকর।

ব্যক্তি ও জাতি

ভারতবর্ষের বিগত দুইশত বৎসরের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে যদিও ভারতের জনসাধারণ বৃটিশের নিষ্পেষণে জর্জ্জরিতভাবে মহা দারিদ্র্যে,অজ্ঞানতায় ও নিরাশায় এই সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, তথাপি সেই নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যেই বহু মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের দেহ আত্মা ও মনের মুক্তির পথ খুলিয়া রাখিতে ও ক্রমে ক্রমে জাতিকে উন্নতির দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল মহান দেশসেবকদিগের মধ্যে একটা জিনিষ সকলের মধ্যেই দেখা গিয়াছে তাহা হইল জাতীয়তাবোধ ও বিদেশীয় প্রভাব ও প্রভুত্ব প্রতিরোধ চেষ্টা। যিনি যখন, যে ভাবেই হউক না কেন, বিদেশীয় প্রভুত্ব হইতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার স্মৃতি ভারতীয় মানবের মনে চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত জাগ্রত থাকা উচিত। এবং ভারতীয় মানব এই ক্ষেত্রে স্বভাবতই জাগ্রত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া থাকেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ যখন বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন তখন তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকের প্রাণ যায়। তাঁহারাও দেশের জন্যই প্রাণ দিয়াছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জাতিগত স্বার্থ সকল সময়েই জড়িত ভাবে একত্র বর্ত্তমান থাকে। বহু ব্যক্তির গৃহে যদি ডাকাইতি হয় বা একজন মানুষকে যদি কেহ হত্যা করে তাহা হইলে ব্যক্তিগত ক্ষতির কথার উপরে উঠে দেশের ও জাতির সম্পদ ও জীবন রক্ষার ব্যবস্থার কথা। বৃটিশ কর্ম্মচারীরা যদি নানাস্থলে দশ বিশ কিম্বা কয়েক শত ব্যক্তিকে গুলি করিয়া মারিয়া থাকে তাহা হইলে সে হত্যাকাণ্ডগুলি শুধু ব্যক্তিগত ছিল না, জাতিগতও ছিল। জাতি ও দেশের পরিস্থিতি পরদাসত্ব অভিভূত ছিল বলিয়াই জালিওয়ানওয়ালাবাগে বহু নিরস্ত্র ভারতবাসীকে বৃটিশ গুলি করিয়া মারিয়াছিল। সেই সকল লোকের মৃত্যু শুধু ব্যক্তিদিগের মৃত্যু বা হত্যা বলিলে বিষয়টার যথার্থ বর্ণনা করা হয় না। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের পরদেশের উপর অন্যায় প্রভুত্ব ও সেই প্রভুত্বের দুর্ব্বিনীত ব্যবহারজাত ·লোকধর্ষণ চেষ্টার ফলেই ঐরূপ একটা নির্ম্মম ও চরম অত্যাচার ও অরাজকতার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে যাঁহারা বৃটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে বহু সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলেন অনেক অল্পবিত্ত ব্যক্তি। বহু পণ্ডিতের সাহচর্য্য করিয়াছিলেন বহু সাধারণবুদ্ধি ব্যক্তি। পরিণত বয়স্কের সহিত হাত মিলাইয়া সংগ্রামে নামিয়াছিলেন বহু যুবক ও তরুণ। অর্থাৎ বৃটিশের সহিত ভারতের যে সংঘাত তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল ও তাহার ভিতরে বহু উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ ঘটনাও ঘটিয়াছিল। ইতিহাসের সকল ঘটনার যে সহজ অর্থ নির্ণয় আজকাল প্রচলিত হইতেছে, সেই শ্রেণী সংগ্রাম বা সেই ধনিক-বণিক ষড়যন্ত্রের কথা আওড়াইয়া সাম্রাজ্যবাদের সকল অত্যাচার অবিচার লুণ্ঠন ও উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে জননিপীড়নের সম্যক বিচার সম্পূর্ণ হইতে পারে না। বৃটিশ ভারতের কর্ম্মীদিগের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন ও রাজা মহা রাজাদিগের শিরশ্ছেদন একই মতলবে একাধারে করিয়াছে এবং বৃটিশের বিরুদ্ধেও ভারতীয় জনগণ সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা নির্ব্বিচারে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সংগ্রামে শত শত লোক প্রাণ দিয়াছেন। এই সংগ্রামে ভিন্ন ভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে উপায়ে ও

অস্ত্র ব্যবহারে লড়িয়াছিলেন। কেহ বন্দুক বা বোমা, কেহ বা শুধু জনমত গঠন কার্য্যে অথবা সঙ্গীত রচনা করিয়া। জাতির অঙ্গে অঙ্গে বৃটিশ বিরুদ্ধতা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল ও সেই বিরুদ্ধতা বিচিত্র ও বহুরূপ ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল বৃটিশ যেরূপ বহুমুখী ভারত নিগ্রহ ব্যবস্থা করিয়াছিল, ভারতও সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণের মিলিত প্রত্যাক্রমণে বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করে। এই যে সংগ্রাম ইহা সমগ্র জাতির সংগ্রাম, আত্মরক্ষা, আত্ম-সম্মানরক্ষা ও দেশমাতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বহু দেশ নেতা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, বিভিন্ন অস্ত্র ধারণ করিয়া। সকলেরই সৈন্য, সামন্ত, শিষ্য, সহচর, সহায়ক ও সুহৃদ বহু সংখ্যায় ছিল। এই মহাজাগরণের ইতিহাসে যাঁহাদের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদিগকে কোন একটা সহজ কল্পনার পর্য্যায়ে বসাইয়া দিয়া যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অপরিণত চিন্তার সমাপ্তি করিবার চেষ্টা হয় তাহা হইলে সেই চেষ্টার বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না। মানবজাতিকে ও বিশ্ব মানবের সকল আর্থিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোন একটা স্বয়ংকৃত কার্য্য সহজ করিবার ছাচে ফেলিয়া জোর করিয়া সকল কিছুর স্বভাব স্বরূপ ও জাতি নির্ণয় করিয়া লওয়া দার্শনিক জটিলতার একটা কষ্টকল্পিত সমাপ্তি সৃষ্টি করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে বাস্তব সমস্যার কোন সত্যকার সমাধান হয় না। মানুষ পৃথিবী চতুষ্কোণ ভাবিলে পৃথিবী তাহার আকার বদলাইবে না। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র ভাবিলেও তাহা সত্য হইবে না। শ্রেণী বিভাগ, জাতি ভেদ, সাদাকালো বিচার বা ধর্ম্মে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ভেদ, সবই মানব কল্পনার খেলা। পৃথিবীতে বহু দেশ ও জাতি আছে ও তৎসম্পর্কিত বহু সমস্যাও আছে। যে কোন সমাজে সেই সমাজের নিজস্ব বিভিন্ন সমস্যা আছে ও বহু সমাজের সকল সমস্যা এক ছাঁচে কখন ঢালা চলে না। শ্রেণী বিভাগ করিলেও তাহা বহুসংখ্যক হইবে এবং কোন শ্রেণীই চিরস্থায়ীভাবে নিজ আকার ও প্রকৃতি এক রাখিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং সহজ ও সরল মনে জটিলতাকে অকঠিন ও অনায়াসবোধ্য ভাবিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের পক্ষে উচিত হয় না। দেশের গৌরবের অঙ্গ যাহা ও যাহারা, সেই সকল প্রতিষ্ঠান, ঘটনা ও ব্যক্তিকে ছোট করিয়া দেশের লোকের নিকটে উপস্থিত করার চেষ্টা মহাপাপ। এই কার্য্য যাহারা করে তাহাদের প্রথমে কর্ত্তব্য নিজেদের চরিত্র শুদ্ধি করা। কারণ, দেখা যায় নেতৃত্বের লোভ বা আকাঙ্ক্ষা অর্থ বা সম্পদের লালসা হইতে অল্প দোষের কথা নহে। ধনিক, বণিক, নেতা ও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারী সকলেই শোষক হইতে পারে ও সচরাচর হইয়া থাকে। সকলের কর্ত্তব্য এই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া।

প্রভুত্ব ও দাসত্ব

মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ তাহার স্বরূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া নব নব আকার ধারণ করে। পুরাকালে যে সকল সম্বন্ধ সোজা সরলভাবে ব্যক্ত হইত, পরে তাহা নানাভাবে আত্মগোপন করিয়া ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকিয়া ও মানুষকে ভুল বুঝাইয়া সন্তুষ্টির সৃষ্টি চেষ্টা করিত পূর্ব্বে বাজারে দাস বিক্রয় হইত। ক্রীতদাসের কোন অধিকারই প্রায় গ্রাহ্য ছিল না ও তাহাকে লইয়া ক্রেতা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিত। পরে ক্রমশঃ এই প্রথা পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিল ও ক্রীতদাসের মুক্তি লাভের নানা পন্থা নির্দ্ধারণ চেষ্টা হইতে লাগিল। এক সময়ে বাজারে মানুষ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়া বেতনভোগী ভৃত্যের আবির্ভাব হইল। বেতন সম্বন্ধেও ইতিহাসে বহু বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখা যায় খোরপোষ ও পয়সার হিসাব লইয়া, মতবাদ সৃষ্টি হইয়া ও শেষ পর্য্যন্ত শুধু পয়সার সম্বন্ধই রহিল। অর্থাৎ ভৃত্য এত সময় বা পরিমাণ কার্য্য করিলে এত বেতন পাইবে ইহাই প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের মূল কথা হইল। প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধেও ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। মনিব মজু

(শেষাংশ ৩০৫ পৃষ্ঠায়)

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে। দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায় জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে গগনেন্দ্রনাথ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুরু অবনীন্দ্রনাথ দুইটি আড়ম্বরহীন আসনে বসে ছবি আঁকতেন। রূপ-সন্ধানে দুই ভাইয়ের একচিত্ততা দেখে বিস্মিত হতাম।

লোকে বলে, 'কাজ নেই তো খোলা ভাজার' মতই ছবি আঁকা নিষ্কর্মার পেশা, শিল্পীর কাছে একলা বসে খেলা। কিন্তু এ কেমনতর খেলা। ধড়পাকড়ের ধস্তা-ধস্তিতে শিল্পীর প্রাণান্ত অবস্থা। কল্পনার রূপ হাতের নাগালে এসেও ধরা দিতে চায় না, শিল্পী চাওয়ার জিনিস পাওয়ার চেষ্টায় হিমশিম্ খেয়ে যাচ্ছে, তথাপি রসের ডাকে রূপের সাড়া নেই। শিল্পী যা চাচ্ছেন তা পাচ্ছেন না। অনাহূত শিল্পীকে বিব্রত করে তুলেছে।

গগনেন্দ্রনাথকে সেদিন সংগ্রামের মাঝে দেখেছিলাম। একটি রঙীন ছবির খসড়া আরম্ভ করলেন—জল রঙের ছবি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাগজের ফাঁকা জায়গা ভরাট হয়ে উঠ্‌ল। চোখের সামনে দেখতে লাগলাম নতুন রঙে প্রাচীন মন্দিরের আবির্ভাব। মন্দিরের সামনে মানুষের ভীড়, নানা পরিচ্ছদে নানা রঙের আনাগোনা। ছবির পরিবেশে উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছে। ছবির রং তখন সানাইয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। ধূপ-ধূনার গন্ধে আবেষ্টনী শুচিতার প্রভাবে ভরে উঠেছে। মন প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। কল্পনার রূপকে বাস্তবে পেয়ে তারই মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলাম, ভাল লাগছিল। হঠাৎ রূপস্রষ্টা ধ্বংসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, ছবি শতছিন্ন হয়ে বাতিলের স্তূপে আশ্রয় নিল।

শিল্পী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকালেন। দৃষ্টি তাঁহার স্থির ও আকাশ-স্পর্শী। সামনের ত্রিতল বাড়ীর আড়াল অগ্রাহ্য করে আরো দূরে চলে গিয়েছে, যেন দিগন্তহীন শূন্যের মাঝে শিল্পী নিজেকেই খুঁজছেন। দিশাহারা হয়ে গিয়েছেন। ব্যর্থতা তাঁহার মনকে অবসাদ-গ্রস্ত করে দিয়েছে। এই ভাবে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। খানসামা আমিরী চালের ফরসি অনেক আগেই পাশে রেখে গিয়েছিল, প্রভুর অভ্যাসমত মৌজের সেবার জন্য। কিন্তু সংগ্রামের আলোড়নে মৌজের কথা শিল্পী ভুলেছিলেন, এতক্ষণে ক্লান্তিলাঘবের প্রয়োজন বোধ করায় রূপায় বাঁধান নলের ডগা মুখে লাগালেন। ধূমের পরিবর্তে ফরসির তলায় জলাধার থেকে বুদ্‌বুদের আওয়াজ উঠ্‌ল। মুখ বিকৃত করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। কিন্তু অন্তরে তীব্র বেদনার তাড়না কি শান্তভাবে সহ্য করার উপায় আছে? আসন্নপ্রসবার মতই সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত যেমন গর্ভধারিণীকে অতিষ্ঠ হয়ে থাকতে হয়, ক্ষণিকের অবসাদ যেমন শান্তির সান্ত্বনা দিতে পারে না সেইরূপ রূপস্রষ্টা শিল্পীরও একই অবস্থা। নেশার মৌজ লাগিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অবসাদ সংনীয় করার চেষ্টায় ছিলেন—কিন্তু এদিকেও বিঘ্ন আসায়—পুনরায় অদৃষ্টের রূপ বাহিরে আত্মপ্রকাশের জন্য শিল্পীকে অস্থির করে তুলল। গগনেন্দ্রনাথ নতুন কাগজে খসড়া সুরু করলেন—নক্‌সা আবার কাগজকে ঘিরতে আরম্ভ করল। নতুন রূপের আগমন প্রতীক্ষায় আমার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে তথাপি কেন বল্‌তে পারি না আগতপ্রায়ের আকর্ষণ কাটিয়ে শিল্পীর মুখের দিকে তাকালাম। ভেবেছিলাম নতুনের আগমন-বার্তায় শিল্পীর মুখশ্রী আনন্দো-জ্জ্বল হয়ে উঠবে, কিন্তু দেখলাম বিষাদের ছায়া তাঁকে

ঘিরে ফেলেছে, যেন অতি প্রিয়জনের সহিত চির-বিচ্ছেদের আয়োজন চলেছে। পরম বাঞ্ছিতকে পাওয়ার আগেই পরিত্যাগের জন্য শিল্পী প্রস্তুত হচ্ছেন। অকস্মাৎ শিল্পী হত্যার বিলাসে মেতে উঠলেন। ব্যর্থতার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য ছবির মানুষের উপর তরোয়াল চালানর মত পেন্সিলের কোপ পড়তে লাগল—ধারাল রেখার টানে কল্পনার রূপ চাক্ষুষ হবার আগেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে, পরিত্রাণের উপায় নেই কারণ শিল্পীর বিচারই শেষ কথা। যিনি জন্মদাতা তিনিই যদি ঘাতকের কর্তব্যে ভাগ বসান তাহলে করুণার কথা কওয়া যায় কার কাছে? রূপ জন্মাবার আগেই ভ্রূণহত্যার দৃশ্য দেখে মনে হলো শিল্পী নিজের সন্তান স্বহস্তে বধ করায় যাকে পেয়েছিলেন তাকেই হারিয়ে হাহাকারেরর মধ্যে ডুবে গিয়েছেন।

ভাবতে লাগলাম জনসাধারণের বিভ্রান্ত ধারণার কথা। সাধারণের বিশ্বাস শিল্পীর বাঁচার ধারায় বাস্তবের কোন যোগ নেই। নির্লিপ্ততার আশ্রয়ে সে সব সময়ে আত্মভোলা, অতএব আনন্দ যার ঘরে বাঁধা—তার কাছে বেকার বসে থাকাই মস্ত বড় কাজ। ছেলে খেলাই তার প্রাপ্ত বয়সের প্রমোদ। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলাম তাতে শিল্পীর জাত-শত্রু বিটকেল বেরসিকও বলবে না, কেবল আনন্দকে আগলে থাকাই শিল্পীর ধর্ম। কঠোর পরিশ্রমের প্রতিদানে ব্যর্থতা সেখানে ওৎ পেতে থাকে। হতাশার সঙ্গে আঘাতের পর আঘাতের অভিজ্ঞতায় শিল্পী যখন জর্জরিত হয়ে পড়ে তখন তার অন্তরের বেদনার প্রতি সহানুভূতি থাকলে বোঝা যায় শিল্পীর জীবন সদাই আনন্দময় নয়—দ্বন্দ্বের বোঝা বহনে সে ভারাক্রান্ত পথিক—দুর্গম পথে এগিয়ে চলাই তার ধর্ম।

কঠোর বাস্তবের কথায় ফিরে আসি। দুঃখ ভরা জীবন-সংগ্রামের মাঝে ক্ষণিকের আনন্দ কতটা প্রাণ-শক্তি দিতে পারে তারই সন্ধানে, রূপস্রষ্টা শিল্পীর পরিবেশ থেকে জানার চেষ্টা। দেখি বাস্তবের সঙ্গে শিল্পীর কতটা বোঝাপড়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে কতটা সে যোগ রাখতে পেরেছে, কতটাই বা স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য্যকে পাশ কাটিয়ে দরদীর মন দৈন্যের ঘরে প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং ছবির ভাষায় কি ভাবে তাদের অভাব ও দুঃখের কথা প্রকাশ করতে পেরেছে।

শিল্পী যে পরিস্থিতিতেই মানুষ হন তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও দরদপূর্ণ অনুভূতি যে ঘরোয়া। আবেষ্টনীতেই আটক থাকে না তারই প্রমাণ আর একটি ছবিতে দেখাতে নাই। দৃশ্যটি শব-বাহীর মিছিল। মানুষের ভিড় চলেছে মৃতকে চিতানলে অর্ঘ্য দেবার জন্য। আবর্জনায় পূর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ। পথের দুই ধারে গারদখানার মত উঁচু পাচিল—কোন যান্ত্রিক কারখানা আগলিয়ে আছে। শ্রমিকরা জীবিকা উপার্জনের জন্য ঐ গারদখানার ভিতরে নিজেদের বন্দী করে রাখে। আজ যে বন্দীশালা থেকে ছাড়ান পেয়েছে সে চলেছে সহধর্মীদের কাঁধে চড়ে মহা-প্রস্থানের পথে। দুই ধারে পাঁচিলের মাঝে বিরাট উন্মুক্তদ্বার রাক্ষসের মত মুখব্যাদান করে আছে, মনে হয় এখনি গ্রাস করে ফেলবে, অথবা যন্ত্রের গহ্বরে চালান করে দেবে, জীবন্ত অবস্থায় মানুষকে পিষে ফেলার জন্য। রাস্তায় ল্যাম্প-পোষ্ট থাকলেও বণিক প্রভুর আদেশ না পেলে জ্বালান হয় না। আদেশ আসে ব্যবসায় লাভের দিকে হিসাব খতিয়ে। তাই বোধহয় লোকেরা মশাল জ্বালিয়েছে—আবর্জনার স্তূপে ঠোকর খাওয়া থেকে বেঁচে যাবার জন্য।

ছবির মধ্যে কেবল মশাল জ্বলে ওঠেনি, অগ্নি তপ্ত রঙের ফুলকি মৃতের মুখের উপর এসে পড়ায় আলো ও ছায়ার অবর্ণনীয় যোগাযোগে বাস্তব এমনই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মৃতের চর্ম ও অস্থিসার মুখ দেখলে মনে হয় মৃত্যু আকস্মিক নয়। অনাহার অথবা দীর্ঘকাল রোগ ভুগে চিকিৎসার অভাবে লোকটা মরেছে এবং জানিয়ে গেছে, অভাবের তাড়নায় মানুষ যন্ত্র হয়ে গেলে আমার অবস্থাকেই মেনে নিতে হয়। দক্ষ শিল্পী প্রকাশ-ভঙ্গী রং ও রেখার দ্বারা একটি পাতায় যা লিখে গিয়েছিলেন তাকেই ছবির মত গুছিয়ে বলতে হলে কথা-শিল্পীকে একটা গোটা বই লিখে ফেলতে হতো কারণ ছবি তো কেবল একটি ঘটনার দৃশ্য দেখায় না। ঘটনার সূত্রও শেষ ছবিকে জড়িয়ে থাকে। সূত্রকে বলতে পারি উচ্ছ্বাসজাত প্রেরণা এবং শেষ বলে দেয় ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে।

প্রত্যেকটি তুলির ছোঁয়ায় রঙের সংমিশ্রণ এমনই বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে যে মনে হয় শিল্পী, মনঃপূত তুলির ছোঁয়ায় মৃতের ছবিতেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতক্ষণে

শিল্পীর মুখের দিকে তাকাবার অবকাশ পেলাম। মনে হোলো কিছু সান্ত্বনা পেয়েছেন, কিন্তু সান্ত্বনার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই, অকস্মাৎ চিত্ত-চাঞ্চল্য কি ঘটিয়ে দেবে কিছুই বলা যায় না। যাই হোক সেদিনকার মত শিল্পী ছবি আঁকা থামালেন। আশা এল—ছবি এবার ফ্রেমের আশ্রয় পাবে।

প্রকাশ-ভঙ্গীর তারতম্যে ছবি যেমন অসাড় জড় হতে পারে তেমনি প্রতিভার সংস্পর্শে এসে সজীব হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়।

ছবিতে প্রাণ-শক্তি আসা তখনই সম্ভব যখন রূপ-সৃষ্টির প্রকরণে, শৃঙ্খলা সংযম ও পরিশ্রমে অকাতরতা শিল্পীর আত্মবিশ্বাসকে সজাগ রাখে। এই কয়টি গুণে শিল্পীর দাবি না থাকলে ছবিতে নক্সা চলতে পারে কিন্তু সে নক্সা রসিকের মনকে নাড়া দেয় না।

ছবির জীবন-মৃত্যুর কথায় বেরসিক হাসে। ছবি বলতে সে বোঝে কতকগুলি রেখা এবং কিছু রঙের জড়ামড়ি, জড় পদার্থের সমাবেশ। জড়ের মরা-বাঁচা নিয়ে মাথা ঘামান কেন? ছবি যে জড় নয় তারই সঠিক খবর পাবার জন্যই তো রূপ সৃষ্টির কলকারখানায় এসেছি। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে মহাশিল্পী কি ভাবে রেখায় বাঁধা রঙীন রূপকে সজীব করে তোলেন তাই স্বচক্ষে দেখার লোভ সামলাতে পারি নি। ছবি বোঝানর চেষ্টায় অনেক পেশাদার সমালোচকের পুঁথিগত বাঁধা বুলি শুনেছি। এক ছবির গুণাগুণ অপর ছবির উপর চাপিয়ে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ের" দৃষ্টান্ত দেখেছি কিন্তু তাতে যা পেয়েছি তা কেবল রসহীন পাণ্ডিত্যের আস্ফালন, পড়ুয়ার আত্মস্তুতি। এই জাতীয় দম্ভের প্রচার নিরীহকে প্রবঞ্চিত করে মাত্র—কতকটা ভোজন-বিলাসীকে নিমন্ত্রণ করে ভক্ষণীয়ের পরিবর্তে রন্ধনের ব্যাখ্যা শোনানর মত। পাকপ্রণালীর ব্যাখ্যায় মসলার হিসাব নির্ভুল হলেও হিসাবের বচন দ্বারা রসনায় তৃপ্তি সম্ভব নয়।

রসগ্রাহীর কাছে শুনেছি ছবি তখনই নিজের কথাকে প্রাণস্পর্শী করতে পারে যখন রূপপরিকল্পনায় শিল্পীর আন্তরিক উচ্ছ্বাস থাকে এবং প্রকাশ-কৌশলে তুলি চলে শিল্পীর আদেশ মেনে। দ্বিধাযুক্ত তুলির টানে নিস্তেজ রূপ কোন প্রকারে নাগালে এলেও তার বলার কিছু থাকে না, এই দৃষ্টান্ত গগনেন্দ্রনাথের মত শিল্পীও দেখিয়ে দিয়েছেন। ছবি দেখার প্রতিক্রিয়ায় মনে হয়েছে ভালমন্দের বিচারে নিজের সম্বন্ধে কঠোর হতেও তাঁর বাধে না। ব্যর্থতার স্বীকৃতিও যে এগিয়ে চলার পথে একটি মস্তবড় সহায় তা গগনেন্দ্রনাথের মত শিল্পীই দেখাতে পারেন।

ইতিমধ্যে গগনেন্দ্রনাথের কলা কৌশল কিছু দেখেছি। উৎসবের আবেষ্টনীতে ছবির রং মনে রং লাগিয়েছে। খাঁচার ছন্দে মানুষ কি ভাবে স্বেচ্ছায় কারাগারে শ্রম দান করে, দেখেছি। অন্নদাতা প্রভুর কৃপার জন্য মানুষ কি ভাবে যন্ত্র হয়ে যেতে পারে তাও দেখেছি। শিল্পীর দরদপূর্ণ অনুভূতি, রসিকের কাছে সহজবোধ্য হতে পেরেছিল কারণ ছবির পরিবেশের সহিত বাস্তবের যোগ ছিল। ছবির প্রকাশ্য বক্তব্যে যে উদ্দেশ্য তাও দরদের প্রকাশ অর্থাৎ ছবির পরিবেশে শিল্পী কেবল বাস্তবের বাহ্যিক রূপ প্রকাশ করে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, চাক্ষুষ ঘটনার সূত্রে যে উচ্ছ্বাস অনুভূতিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল সেই অনুভূতির প্রকাশ হয়েছিল ছবির অন্তর্নিহিত সত্যে। এই সত্য উদ্ঘাটনের অধিকার যাহার আছে তিনিই ছবির মধ্যে প্রাণের সাড়া পান, ছবি জড়ত্বের আবরণ সরিয়ে সবাক হয়ে ওঠে রসগ্রাহীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য।

সাধারণত পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রভাব মানুষের শিক্ষা রুচি, চিন্তাধারা ইত্যাদি গড়ে তোলে। বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতের সার কথায় দেখা যায় অনুসরণ বা অনুকরণের প্রভাব বৈশিষ্ট্যের দাবীকে বেদখল করেছে। কিন্তু চলতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। ঘরোয়ানা আভিজাত্যকে স্বাচ্ছন্দের প্রাচুর্যে ঘিরে থাকলেও গগনেন্দ্রনাথের শিল্পী-মন তাঁকে ঘরছাড়া করিয়েছিল। খোলা মাঠে, কালবৈশাখীর ঝড়ে তাঁকে দেখেছি। মুষল ধারায় বৃষ্টির মাঝে, দুর্যোগকে অগ্রাহ্য করে শিল্পী চলে গিয়েছেন সহর ছেড়ে বাংলার দূর গ্রামে যেখানে আকাশ ও মাটির মিলন ঘটে। আকাশচুম্বি নারিকেল গাছগুলোকে ঝোড়ো হাওয়া উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলেও গাছগুলোর শিকড় মাটি আঁকড়ে থাকে। আশে-পাশে গ্রাম, বাঁশ ঝাড়, আম কাঁঠাল কলা ও জামরুল গাছের ভিড়—ঝড়ের মাঝে খড়ের

ছাউনি-ঘেরা ছোট্ট কুটিরগুলিকে দুর্যোগের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্যই যেন ওদের জন্ম হয়েছিল। গ্রামের ভিন্ন ছবিতে দেখি শিল্পী ঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদির দুর্যোগ কাটিয়ে গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন কুটীর প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন। এইখানে, তুলসী তলায় দেখেছিলাম, সলজ্জ পল্লী-বধূকে কয়েকটি ফুল দিয়ে ভক্তির নিবেদন জানাচ্ছে। একটি মাত্র পট্টবস্ত্রে যে আবরুর ঘের ছিল তা সহুরে সাজগোজের নগ্নতায় দেখা যায় না। আরো অনেক গ্রামের ছবিতে দেখেছি শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ গ্রাম্য মাটির ডাকে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। সমতল ভূমি ছেড়ে দুর্গম পাহাড়ী পথেও ঘুরতে দেখেছি; বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার মাঝে কুহেলিকা-পরিবেষ্টিত হয়ে শিল্পী দাঁড়িয়েছেন কোন প্রস্তর-চূড়ায়। প্রকাশভঙ্গীর ইন্দ্রজাল যেন গোটা পাহাড়কে তুলে এনে ছবির মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। সব কয়টি ছবিতেই দেখলাম আঁকার সাহায্যে বলার দক্ষতা এমনই সংযত যে কোন ছবিতে অবান্তর অথবা বাহুল্যের বালাই নেই। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু প্রকাশ করেই শিল্পী থেমেছেন। এই ভাবে যথাসময় থামতে জানা অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক।

গগনেন্দ্রনাথের অবদান কালজয়ী হবে না, এমন ভবিষ্যৎ বাণীর সাহস আর যারই থাক আমার নেই। পঞ্চাশ বৎসর আগে যে ছবি দেখে আনন্দ পেয়েছিলাম আজও সেই রূপ ম্লান হয় নি, বরং সুন্দর, রহস্যপূর্ণ হয়ে ছবির গভীরতম অর্থ বোঝানর জন্য কৌতূহলকে উত্তেজিত করে তোলে। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথের মতই ছবির রূপ-দর্শনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছিলেন। সুন্দরের রূপকে যে কোন বিশেষ ছকের ভিতর আটক রাখা যায় না, অথবা স্বদেশ প্রীতির দোহাই পেড়ে কেবল গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিলেই রূপসৃষ্টির চরম সার্থকতা হয় না, তা দুই ভাই-ই নিজেদের কাজে দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।

রূপ, রেখা ও রঙের বিন্যাসে অবনীন্দ্রনাথ ছবির মধ্যে যে পরিবেশ সৃষ্টি করতেন তাতে বিদেশী প্রভাব থাকলেও মারমুখি হয়ে মাথা খাড়া করতে পারে নি। Wash ও stippling কিংবা opaqe ও transparent ইত্যাদি বিরুদ্ধাচারী অঙ্কন রীতিকে একত্রে জড় করে যে ভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিকে সরস মেলামেশা করিয়েছেন তাতে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খাওয়ানর মতই দুর্দান্ত প্রতাপশালীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সংক্ষেপে বহুপ্রকারের প্রকাশ-কৌশল আত্মসাৎ করে নিজের কথা বলাই ছিল অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

গগনেন্দ্রনাথ নতুনকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েই থাকতেন। জ্যামিতির ফরমায় ফেলা কিউবিজমকে চেপে ধরে এমন ভাবেই সায়েস্তা করেছিলেন যে বিদেশী হেঁয়ালীতে ভরা অবোধ্য নক্‌সা সহজ হবার পন্থ কোনঠাঁসা হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছিল। জটিলকে সহজ করার সাহস ও শক্তি তাদেরই থাকে যারা জানে কি করে বাড়তি কথা বাদ দিতে হয়।

কিউবিজম্‌-এর জাতোন্নতিতে নূতন ধরনের আঁকা ছবি দেখলাম, রহস্যপূর্ণ পরিবেশ। স্বপন-পুরীর অভ্যন্তরে দাঁড়িয়েছেন যৌবন-ভারাক্রান্তা রাজকন্যা, মাথার মুকুট সাত রাজার ধন মণিমানিক্যে ঝল্‌মল করছে। সুন্দরী আপন রূপের ছটায় পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে। পরিচ্ছদে চড়া ও মিহি রঙের সমাবেশ, একের গায়ে অপরে ঢলে পড়েছে, রসের কথা চলেছে, মেলামেশায় গোপনীয়র এমন বাহ্যিক প্রকাশ কমই দেখা যায়।

স্বপন-পুরীর স্থাপত্যও বিস্ময়কর। খিলান ও স্তম্ভের যোগ বা বিচ্ছেদ কোথায়, বোঝার উপায় নেই, তথাপি ভরা আছে। চতুর্দিক থেকে আলোর আবির্ভাব দেখছি কিন্তু ছায়াতে অন্ধকারের অস্তিত্ব নেই। সব কিছুই জানার কাছে এসে অজানার আড়ালে মিশে যাচ্ছে। রাজকন্যা দাঁড়িয়েছিলেন সোপানের শেষপ্রান্তে, অতি উর্দ্ধে নাগালের বাইরে। ও-রূপের সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে কল্পনা ও বাস্তবের মাঝে দূরত্ব না রেখে উপায় নেই। অধিকার অপেক্ষা অধিক জানার চেষ্টা করলেই জ্যামিতিক গঠনের হেঁয়ালী ভেড়ে উঠে বলবে—বেশী কাছে যেও না, স্বপন-পুরীর রূপসী চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবে, বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত ধাঁধাই তোমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়বে।

উপযুক্ত দূরত্বের প্রশ্নে স্বপনপুরীর বাইরেও কথাটা যে সত্য সে বিষয় আমার মত অনেকেই জানেন না। কিংবদন্তী আছে, কালজয়ী সাধক-শিল্পী Rambrandt তাঁর

ষ্টুডিওতে কোন দর্শককে বলেছিলেন, বড় ছবির অত কাছে যেও না, কাঁচা তেল রঙে সুঘ্রাণ থাকে না। তাছাড়া বেপরোয়া তুলির টানে যে মোটা রং পড়েছে তা দেখলে রঙের অপব্যবহারের কথাই আগে মনে আসবে। কোন্ ছবিকে কত দূর থেকে দেখতে হয়, না জানলে—দেখার উদ্দেশ্যই পণ্ড হবে, সুন্দরকে নাগালে পাবে না।

গগনেন্দ্রনাথ কিউবিজম্ এর আওতায় যে সব ছবি এঁকেছিলেন তার প্রকাশ-ভঙ্গীর ব্যবহার হয়েছিল বড় ছবির রীতি মেনে। আয়তন ছোট হলেও, ছবির মধ্যে যা দৃশ্য তার সম্পূর্ণতা বুঝতে হলে, দৃশ্য ও দর্শকের মাঝে উপযুক্ত ব্যবধান মানা একান্ত প্রয়োজন ছিল। এরই বিপরীত দৃষ্টান্ত অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত সম্রাট আওরংজেবের প্রতিলিপি। অলেখ্যকে রেখা-চিত্রই বলতে হয়, Miniature এর প্রথায় রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আয়তনে ছবিটি বেশ বড়। এই ছবিতে এত সূক্ষ্ম কাজের যোগ ঘটেছে যে খুব কাছে না এলে—ভাবোদ্দীপক মুখশ্রীর বৈশিষ্ট্য দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং সব দিক থেকে রস-ভোগ করতে হলে শ্রেণী বা জাত হিসাবেও ছবির দাবিকে মানতে হয়। এ বিষয় প্রাচীন পাশ্চাত্য ছবি বা মূর্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারলে আমার বক্তব্য হয়তো আরো পরিষ্কার হতে পারত কিন্তু শ্রোতার ধৈর্য সমর্থন করবে না জেনে বহুমুখী প্রতিভাশালী গগনেন্দ্রনাথের ভিন্ন কাজের কথা বলি।

শাস্ত্রসম্মত রূপ-দর্শনের রীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল, তবে এবার যেখানে এসে উপস্থিত হলাম সেখানেও রসের কারবার চলেছে। কিন্তু এ রসে কেবল মধু-মন্থন নেই, মধুর সঙ্গে হুলের খোঁচাও আছে যথেষ্ট, যার অনুভূতি কাঁকড়া বিছের কথা মনে করিয়ে দেয়। এসে পড়েছিলাম ব্যঙ্গ-চিত্রের এলাকায়। বিদেশী চালে আঁকা হলেও ঘরোয়া কথা বলার জন্যই ছবিগুলির আবির্ভাব। সমাজে কুসংস্কারের আবর্জনা চোখের সামনে স্তূপীকৃত হয়ে থাকলেও অভ্যস্ত দৃষ্টি যা দেখেও দেখে না, তাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানর জন্য শিল্পী তুলিকে বল্লমের মত ব্যবহার করেছিলেন। শড়কি ছোঁড়ায় তাগ মারা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। ধারাল অস্ত্রের খোঁচা যথাস্থানে কেবল আঁচড় কাটেনি, ক্ষতকে গভীর করে জানিয়ে দিয়েছে —আরো মার আছে। যাঁরা মার খাওয়ায় অভ্যস্ত নন অথচ বিপদ-সঙ্কুল কেন্দ্রের বাইরে থেকে মারের মজা ভোগ করতে চান তাঁদের গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কার্টুনচিত্র সংগ্রহ করতে বলি। ছবিগুলি লিথোয় ছাপা—বইয়ের আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই জাতীয় চিত্রাঙ্কনে শিল্পীর পীড়ন-বিলাস ছিল না, কুসংস্কারজড়িত অনাচার তাঁকে পীড়ন করেছিল বলেই, অসহনীয় অভিজ্ঞতা বে-দরদীকে জানতে চেয়েছিলেন।

অনেকের ধারণা Cartoon বা ব্যঙ্গ চিত্রে বিষয়বস্তুই মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রকাশ-কৌশল গৌণ, যেমন তেমন করে তুলি চালালেই হোলো। এই ধারণা ভিত্তিহীন—প্রামাণস্বরূপ বলতে পারি সার্কাসে যে Clown-এর খেলায় নামে, সে-ই ওস্তাদ খেলোয়াড়। Cartoon চিত্রের প্রকাশ-ভঙ্গীর নিজস্ব সত্তা আছে যা হিজি-বিজির নামান্তর নয়।

গগনেন্দ্রনাথ কোন খ্যাত বা অখ্যাত শিল্প-বিদ্যাপীঠের ছাপমারা ছাত্র ছিলেন না অর্থাৎ পরীক্ষার সর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট পাশ নম্বর পাবার পর শিল্পীর পেশায় দাবি পেশ করেন নি। সুতরাং অঙ্কনরীতির যাবতীয় শুদ্ধাচার মেনে চলা স্বয়ংসিদ্ধ মহামানবের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি ছবি এঁকেছেন অন্তরের তাগিদে, অদমনীয় উচ্ছ্বাসকে শান্ত করার জন্য। আশ্চর্যের বিষয় এই—যে-রীতির বিরুদ্ধাচরণ ভিন্ন ক্ষেত্রে অ-ক্ষমণীয় বলে প্রতিপন্ন হবার কথা সেই অনাচার গগনেন্দ্রনাথের ছবির পরিবেশে এমন ভাবেই প্রবেশাধিকার করে নিয়েছে এবং স্থিতির ব্যবস্থাও এমন কায়েমী ভাবে হয়েছে যে গলদকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করলে ছবিই জখম হয়ে যেতে পারে। শুনেছি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র-অনুসারে সুস্থ মানুষকে সম্পূর্ণ ক্লেদ-বর্জিত হতে হলে জীবনকেও বর্জন করতে হয়। সুতরাং যে ছবির জন্ম চলতি হিসাবের বাইরে তাতে সামান্য ত্রুটি এসে পড়লে অবর্জনীয় বলেই মানতে হয়। ছবির সম্পূর্ণ রূপ উপেক্ষা করে যাঁরা ছোটকে বড় করে ধরার জন্য ছবির আনাচে-কানাচেতেও খানাতল্লাসী চালান, তাঁদের আচরণকে জুলুম ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। জুলুমের সাহায্যে লুট-পাট হতে পারে, কিন্তু রসগ্রহণের প্রয়োজনে প্রেমের আদান-প্রদান চলে না।

মানুষ গগনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার বলার অধিকার আছে, কারণ তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু অধিকার থাকলেই তা সব সময় কাজে লাগান যায় না। উপস্থিত, সময়ের অভাব বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই মহাশিল্পী, আভিজাত্যের প্রতীক গগনেন্দ্রনাথের শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ দিয়ে এইখানে আমার বক্তব্য শেষ করি।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ষোল

মুখটা শুকিয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ভাল করে, এই রকম শরীরের অবস্থা নিয়ে নির্ম্মলা বাড়ী ফিরল।

এত বেশী ভয় পেয়েছিল সে, যে, সেই রাতটা এবং পরের দিনেরও বেশীর ভাগটা না কাটা পর্য্যন্ত সুস্থ বোধ করতে পারল না।

বিকাশ যদি তাকে দেখে থাকে, আর তার পিছু নিয়ে থাকে তাহলে ত মহা বিপদ্। পুলিশ নিশ্চয় বিকাশের উপর কড়া নজর রেখেছে, সে কোথায় যায়, কি করে তা দেখছে। বিকাশ যদি তার সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে, তাহলে ত সেই সূত্র ধরেই পুলিশ এসে আবিষ্কার করবে তাদের খুনী আসামীটিকে। তারপর সর্ব্বনাশ! বিকাশও বিপদে পড়বে, কারণ নির্ম্মলা শুনেছে, খুনী আসামীকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করাটাও একটা অপরাধ।

পরের দিনটা কাটলে সে হাঁপ ছেড়ে ভাবল, যাক, বাবা তাহলে চিনতে পারেনি আমাকে। সেই সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর কোনোদিন বাড়ী ছেড়ে সে বেরুবে না। যাদের কাছে যেতে সে পারবে না, যাবার সাধ্য নেই, সে সাহস নেই, চুরি করে তাদের দেখবার লোভ সে সংবরণ করবে।

বিকাশ তার কথা রাখল। বিজ্ঞাপন দিল কাগজে কাগজে অনেকদিন ধরে, তবে তার একটিও নির্ম্মলার চোখে পড়ল না। কি করে পড়বে? বস্তিপাড়ায় খবরের কাগজ রাখে কি কেউ? যাদের খবর কেউ রাখে না, তারাই বা অন্যদের খবর কেন রাখবে? তাও আবার পয়সা খরচ করে।

চাঁপা-বৌ একদিন বলল, "আজও একটা গাড়ী ট্রাই হচ্ছে, ছেলেরা বলছিল। মিস্ত্রিদিকে বলে চল না দিদি একটু ঘুরে আসি?"

নির্ম্মলা বলল, "না ভাই, কাজ নেই। কার গাড়ী, সে কি রকমের লোক জানিনে ত? যদি দেখে ফেলে আর বলে, কেন তোমরা আমার গাড়ীতে চড়েছিলে, কার হুকুমে, তাহলে লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না।"

জগন্নাথও সাধাসাধি করেছে দু-একবার, তাকেও এই একই কথা বলেছে নির্ম্মলা।

জগন্নাথ বলেছে, "বেড়াতে যেতে চাও, ত ট্রাইয়ের গাড়ীতেই যেতে হবে তার কি মানে আছে? একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে যাই চল।"

নির্ম্মলা বলেছে, "টাকা ওড়াবার এসব ফন্দি রেখে স্পেলিং বুকটা নিয়ে এসে বস দেখি। কতদিন বইয়ের সঙ্গে দেখা নেই?"

কিন্তু বাইরে যাব না, বাইরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না, নিজের ঘরটিতে নিজেকে নিয়ে আলাদা থাকব বললেই কি বাইরেটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় মানুষে? বাইরেটা অনেক সময় মহা সোরগোল ক'রে দরজায় এসে ধাক্কা দিতে থাকে।

সেদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটা ইংরেজী গ্রামারের বই হাতে করে নির্ম্মলা শুয়েছিল একটু। Participles, Gerunds, Infinilives কি পদার্থ বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘুমটা আসি আসি করেও আসছে না, এমন সময়

দরজায় দুমদাম করাঘাতের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে সরু মোটা কয়েকটি গলায়, মাসী, মাসী, মাসী!

"কি হল রে, কি হল," বলতে বলতে নির্ম্মলা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। দরজা খুলে সামনেই দিলীপকে দেখে বলল, "কি ব্যাপার?"

না, হালদারবাবু।

"সে আবার কে?"

দিলীপ বলল, "খদ্দের। ঐ ত বসে আছেন।"

তাদের উঠোনে ঢুকবার পথের কাছে গলিতে একটা ছোট গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইলে দুহাতের ভর রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে দেখছে, দাড়ি-গোঁপ কামানো, সাহেবী পোশাক পরা অল্প বয়সী একটি লোক।

নির্ম্মলা বলল, "কি চান উনি?"

দিলীপ বলল, "ওঁর ঐ কিয়াট গাড়ীটা আমরা সারিয়েছিলুম। পাঁচ-ছদিন গাড়ীটা চালাবার পর আজ এসে উনি বলছেন, কিছু সারানো হয়নি, ষ্টিয়ারিংএর কলুস্‌টা নাকি যেমনকার তেমনিই আছে। জগন্নাথদা ভবানীপুরে একটা লেদের দোকানে গিয়েছে, একটা ফোর্ড গাড়ীর ব্যাক-গিয়ারের পিনিয়নে মাল ধরাতে। তার আসতে দেরি হতে পারে। এখন আমরা কি করি?"

নির্ম্মলা বলল, "এর মধ্যে মুশকিলটা কোন্‌খানে? ওঁকে বল, মিস্ত্রি ফিরে এলে ওঁর কাছে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

ছেলেদের দেরি দেখে হালদারবাবু, মানে সুধাকান্ত হালদার, গাড়ী থেকে নেমে এসে নির্ম্মলাদের উঠোনে ঢুকে মুদীর গুদোমটার কাছ-বরাবর এসে দাঁড়াল। তার দিকে একবারটি দেখে নির্ম্মলা সরে গেল দরজার আড়ালে।

লোকটি বেশ অনেকটাই জগন্নাথের মত দেখতে, ছিপছিপে আঁটসাঁট গড়ন, মাজা রঙ, মাথায় জগন্নাথ যতটা উঁচু এও তাই, কেবল মুখটা একেবারেই অন্য ধরণের। জগন্নাথের মুখে তার চিবুকটা প্রথমেই চোখে পড়ে, এ-লোকটির মুখে সে জিনিষটা লক্ষ্য করবার মত নয়। তাছাড়া নাক চোখ সবই আলাদা ধরণের। কোনোটার সম্বন্ধেই বলবার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

দিলীপ কাছে এলে সুধাকান্ত বলল, "এ ছুঁড়ীটা কে রে?"

"জগন্নাথদার মাসী।"

"জগন্নাথের মাসী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাই বুঝি বলেছে তোদের?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা বেশ, মাসীই যেন হ'ল, কি বলছে ও?"

"বলছেন, জগন্নাথদা ফিরে এলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন! আমি কি সারাদিন বাড়ী বসে থাকব নাকি ঐ ছুঁচোটার জন্যে? আমার কাজকর্ম্ম নেই?"

গলাটা বেশ একটু উঁচু করেই বলেছিল কথাগুলো, আশা করেছিল, নির্ম্মলা নিজেই বেরিয়ে এসে জবাবে কিছু বলবে। কিন্তু নির্ম্মলা এল না। তখন নিজেই আবার বলল, "এই ছোঁড়া, শোন্‌। জগন্নাথ বাঁদরটা ফিরে এলে বলবি, আমি ঘণ্টা-দুই পরে ঘুরে আসছি, আমি না আসা পর্য্যন্ত যেন যায় না কোথাও।"

গাড়ীটায় ষ্টার্ট দিয়ে সেটার মুখ ঘুরিয়ে বেরিয়ে গিয়ে মিনিট-দশেক পরেই ঘুরে এল সুধাকান্ত। ঘুরে ত সে আসবেই: মাথাটা একেবারেই যে ঘুরে গিয়েছে তার।

কি দেখল সে? ঠিক দেখেছে, না ধাঁধা লাগা চোখের ভুল? আর একবার ভাল করে দেখতে হচ্ছে।

মুদীর গুদোমঘরটার দিকে বারান্দাটা মুদী বা অন্য কেউ ব্যবহার করত না, দু-আঙুল পুরু হয়ে সেখানে ধুলো জমেছে। রুমাল দিয়ে খানিকটা জায়গার ধুলো ঝেড়ে পা ঝুলিয়ে বসল সুধাকান্ত। ছেলেদের কেউ কেউ এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, সুধাকান্ত বলল, "একটু বসেই যাই।...এই ছোঁড়া, বদমাস, চলে যাচ্ছিস কেন? শোন্‌।

কাছেভিতে চায়ের দোকান আছে জান? চা খাওয়াতে পারিস?"

এলুমিনিয়মের একটা বড় কেট্‌লি আছে এদের, ছ'সাত পেয়ালা চা ধরে। সেইটেতে করে চা এনে মাটির খুরিতে ঢেলে এরা খায়। সুধাকান্তকে বলল সে কথা।

সুধাকান্ত বলল, "আরে, বারোভূতের ঠোঁট লাগা পেয়ালার চেয়ে আগুনে পোড়া মাটির খুরি ত অনেক ভাল রে। কেবল সেগুলোকে কুমোররা আর একটু বড় করে কেন গড়ে না সেইটে বুঝি নে। যা, খুরি নিয়ে আয় গুটি-দশ, আর কেট্‌লি ভরতি করে চা। এইনে টাকা। গোটা দশেক করে বেশ বড় বড় সন্দেশ আর রাজভোগ আনবি, আর নিমকি, বা কচুরি, বা সিঙ্গাড়া আনবি গোটা-কুড়ি। আমি খাব, তোরাও খাবি, বুঝলি? সবচেয়ে বড় কথা হল, একটুও দেরি করবি নে। সেই ভোর সাতটায় বেরিয়েছি, খিদের পেটটা চোঁ চোঁ করছে।"

ইনসিওরেন্সের দালালের কাজ, অর্থাৎ দেয়াল ঘেরা অফিসে নয়, অফিসের বাইরে যত্রতত্র পলিসি বিক্রি করে বেড়ায় সুধাকান্ত। খুব সকালেই তাকে বেরুতে হয়, প্রসপেক্টরা অর্থাৎ যাদের পলিসি গছানো যেতে পারে তারা কাজে বেরিয়ে পড়বার আগে তাদের বাড়ীতে গিয়ে ধরবার জন্যে। তারপর বাড়ী থেকে কত দূরে গিয়ে যে সে পড়ে তার হিসেব থাকে না অনেক সময়। তাই দুপুরের খাওয়াটা এই রকম পথে ঘাটেই বেশীরভাগ দিন সারতে হয়। অনেকদিন হয়ই না।

বাড়ীতে তার এমন কেউ নেই যে রাত থাকতে উঠে রান্নাবান্না ক'রে সকালে সে বেরিয়ে যাবার আগে তাকে খাওয়ায়, বা কয়েকটা স্যাণ্ডুইচ তৈরি ক'রে—টিফিনের বাক্সে ভ'রে তার সঙ্গে দেয়। একমাত্র বোন উর্মিমালা, সেও থাকে লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের হষ্টেলে। ছুটিছাটায় তাকে মাঝে মাঝে বাড়ী নিয়ে আসে সুধাকান্ত। এনে তাকে ত বলতে পারে না, তুমি রাঁধো? রাঁধতে জানেও না উর্মি। সেদিনগুলো ঘুরে ঘুরে হোটেলে রেস্তরাঁয় খেয়ে বেড়িয়ে তাদের কাটে।

টাকা আর এলুমিনিয়মের কেট্‌লি নিয়ে দুটো ছেলে চলে যাবার পর সুধাকান্ত দিলীপকে কাছে ডাকল, বলল, "এরা কতদিন এখানে আছে রে?"

দিলীপ বলল, "জানি না। আমি মাস ছয়েক হ'ল এসেছি।"

সুধাকান্ত বলল, "মেয়েটা কি জগন্নাথের সত্যিকারের মাসী? দেখে ত মনে হয় ভদ্র ঘরের মেয়ে।"

দিলীপ বলল, "জানি না। আপনি জগন্নাথদাকে জিজ্ঞেস করবেন।"

"ওকে আবার কি জিজ্ঞেস করব? ও ব্যাটা কি সত্যি কথাটা বলবে? এই ছোটলোকের মেলায় অমন একটা মেয়ে এল কি করে আর রয়েছেই বা কি করে জানি না।"

"জেনেই বা আপনার হবে কি বলুন?"

"ডেঁপোমি করিসনে, মারব এক থাপ্পড়।"

সুধাকান্ত এমন মুখের ভাব করে গাল দেয় আর এমন সুরে মারবে বলে শাসায়, যে, ওটাকেই রসিকতা বলে মনে হয় মানুষের। দিলীপ তার এলোমেলো ময়লা দাঁতগুলো বের করে হেসে চলে গেল পোড়ো জমিতে রাখা ফোর্ড গাড়ীটার কাছে তার নিজের কাজে। ফিরে এল, যখন খাবারগুলো এল।

খাবার যা এল তা এই ক'জনের পক্ষে পর্য্যাপ্তের চেয়েও বেশী। একটা খুরিতে গোটাদুই রাজভোগ আর একটাতে একটা নিমকি ও একটা বড় সন্দেশ বাবলু বলে একটা ছেলের হাতে দিয়ে সুধাকান্ত বলল, "যা, জগন্নাথের মাসীকে দিয়ে আয়। ও প্রায় তোদেরই মত ছেলেমানুষ, তোরা সবাই খাবি ও খাবে না, তা হতে পারে না।"

বাবলুর খাবারটা আলাদা করে রেখে অন্যরা খাচ্ছে। পাশের একটা নারকেল গাছের ডালগুলোর ছায়া বেঁটে দিচ্ছে নির্ম্মলাদের উঠোনের এই দিকটাকে।

ছেলেদের মধ্যে দিলীপ ছাড়া অন্য সবাই বারান্দায় উবু হয়ে বসে খাচ্ছে। দিলীপ খাচ্ছে নারকেল গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে। নিজের ভাগের খাবারটা শেষ হতেই বলল, "এই, তোরা মুখ ধুসনে। বাবলুর খাবারটা এবারে খাবি তোরা।"

বলতে বলতেই বাবলু এল। তাকে জিজ্ঞেস করতে হল না, নিজে থেকেই সে বলল, "আমার খাবারটা তোরা খেয়ে নে ভাই আমার পেটে আর জায়গা নেই।"

সুধাকান্ত বলল, "কেন, কি হয়েছে?"

বাবলু বলল, "বললুম ত, পেটে আর জায়গা নেই। মাসী বারান্দায় আসন পেতে জল গড়িয়ে দিয়ে পুরির খাবারগুলো আমাকে খাইয়েছে, তার উপর বাড়ীতে তার নিজের তৈরি চন্দ্রপুলি আর সুজির পায়েস ছিল, তাও খাইয়ে দিয়েছে।"

সুধাকান্ত [illegible] হাতের পুরিটাকে সামনের দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে মেরে বলল, "আরে তুই হতভাগা হারামজাদা [illegible]?"

"কি করব।"

"[illegible] ফিরিয়ে দিয়ে এলিনে কেন খাবারগুলো [illegible]?"

[illegible] বলল, "[illegible] আপনি খাবার পাঠিয়েছেন, সেটা [illegible] উনি [illegible]—"

[illegible]

[illegible] অনেকক্ষণ [illegible] বসে থাকার পরেও যখন জগন্নাথ এল না তখন সুধাকান্ত চলে গেল রোজকার মত। খুব আশা ছিল নির্মলাকে আর একবারটি দেখতে পাবে, কিন্তু [illegible]।

[illegible] সুধাকান্ত যে [illegible] সেইটে নির্মলাকে বোঝাবার জন্যে গলা [illegible] করে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, "ঐ [illegible] ফিরে এলে বলিস তাকে, আমি এসেছিলুম, আবার কাল সকালে আসব। আমি আসবার আগে সে যেন কোথাও না বেরোয়।"

একটু পরেই জগন্নাথ এল। সব শুনে বলল, "এত পয়সা উনি ছড়ান দুহাতে যে ওঁর ঐ গালাগালগুলো গায়ে মাখি না। আসলে লোক খুব ভাল, মুখটাই ঐ রকম।"

নির্মলা বলল, "লোক যতই ভাল হোক, মুখটা যার এত নোংরা তাকে এ বাড়ীতে আসতে বারণ করে দিও তুমি।"

জগন্নাথ মাথা চুলকে বলল, "অনেক দিনের পুরনো খদ্দের যে মাসী। আর বড্ডই যে ভাল খদ্দের।"

নির্মলা বলল, "খদ্দের তিনি থাকুন না? তোমার সব খদ্দেররাই কি বাড়ীতে এসে চড়াও হয়?"

জগন্নাথ বলল, "তা অবিশ্যি আসে না, কিন্তু মাসী—"

"শোন জগন্নাথ! কথাটা শক্ত শোনাবে তবু বলছি। এ কারবারের আমিও ত একজন মালিক? কথাটা ওঁকে বলতে তুমি যদি অসুবিধা বোধ কর ত আমিই বলব।"

"কে বলবে মাসী? তুমি কি বলে আসতে বারণ করবে ওঁকে? গালাগাল আমাকে দিয়েছেন, তোমাকে ত দেননি?"

"এই কারবারের আমরা দুজন শরিক। তুমি আর আমি সেখানে আলাদা নয়। তোমাকে গাল দিলে সেটা আমারও গায়ে এসে লাগে।"

জগন্নাথকে কেউ গাল দিলে সেটা নির্মলার গায়ে এসে লাগে, না হয় কারবারটার শরিক বলেই লাগে, কিন্তু লাগে যে, এই চিন্তা জগন্নাথের কাছে সুখকর মনে হ'ল।

কিন্তু সুধাকান্তকে কিছু বলা হবে কি না, যদি হয় ত কে সেটা বলবে, সে আলোচনাটা তখনকার মত মুলতুবি রইল। জগন্নাথ ভেবে দেখবার জন্যে সময় চাইল একটু।

পরদিন সকাল বেলা চা খাওয়ার পর জগন্নাথ তার তেলকালি মাখা বয়লার স্যুট পরে কাজে লাগবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময় সুধাকান্ত এল। উঠোনে তাদের বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে। জগন্নাথের বাল-খিল্যের দল তখনো এসে পৌঁছয়নি তাই বিনা খবরেই সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এসেছে। বলল, "এই দীনু! আমার ইস্যারিস্ট. নাহয় পরে সারাস্. এই চিঠিটা নিয়ে এখুনি চলে যা বেহালায়। এরা আমার চেনা লোক, ট্রান্সপোর্টের কার-বার করে। আমার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, তোকে কাজ দেবে এরা।"

নির্মলা কলতলায় যাবে বলে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল, তাকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে চিঠিটা জগন্নাথের হাতে দিয়ে চলে গেল সুধাকান্ত।

জগন্নাথ বলল, "দেখলে ত মাসী?"

নির্মলা বলল, "কি আবার দেখলাম?"

"কিরকম ভাল লোক?"

"লোক কিরকম সে-বিষয়ে ত আমি কিছু বলিনি?"

এরপর মাঝেমাঝে আসে সুধাকান্ত। নিজের কাজে বেরুবার মুখে ভোরের দিকে আসে, কিছু না কিছু একটা কাজের কথা বলবার জন্তে জগন্নাথকে ডেকে নিয়ে যায়। নির্ম্মলার সঙ্গে প্রায়ই চোখোচোখি হয় তার। কিন্তু একটু অবাক্ হয়ে নির্ম্মলাকে সে দেখে, এ ছাড়া তার চোখের দৃষ্টিতে আপত্তিজনক বা লক্ষ্য করবার মত আর কিছু নির্ম্মলার চোখে পড়ে না।

কি এত দেখে সুধাকান্ত?

তার সম্বন্ধে একটুখানি কৌতূহল ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে নির্ম্মলার মনে। লোকটাকে তার ভাল লাগে না, কিন্তু নিজের কাছে এটা তাকে মানতে হয় যে, সে তার বিস্মৃতপ্রায় আগের জগৎটার একটা মানুষ, যখন আসে সেই জগতের গন্ধ জড়ানো হাওয়া খানিকটা গায়ে মেখে নিয়ে আসে। সে কি বলে শোনবার জন্তে, কি রকম পোশাক পরে আসে দেখবার জন্তে একটুখানি প্রতীক্ষাও যেন জেগে থাকে নির্ম্মলার মনে!

এখানে যাদের মধ্যে সে রয়েছে তারা মানুষ ভাল। তাদের শালীনতা অনেক ভদ্রপল্লীর মানুষদেরও হার মানায়। তাদের পরিচ্ছন্ন দারিদ্র্য মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু এক হয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না নির্ম্মলা, চেষ্টা করে সে দেখেছে, কোথায় কিসে যেন বাধে। সুধাকান্তকে যদিও সে শ্রদ্ধা করে না, তবু একটা জায়গায় সে এদের চেয়ে নির্ম্মলার বেশী কাছের মানুষ। পরস্পরকে বুঝবার প্রয়োজন হলে অনেক বেশী সহজে বুঝতে পারবে তারা।

একদিন শেষ বেলায় পোড়ো জমিটাতে নিজের ফিয়াট গাড়ীটার মেরামত্তির তদারক করছে সুধাকান্ত এমন সময় ধুলোর ঝড় উঠল, একটু পরেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। ছোকরার দল হৈ হৈ করে ছুটতে ছুটতে এসে আশ্রয় নিল মুদীর গুদোমঘরটার পিছনের বারান্দায়। সুধাকান্ত তখন নিজের অচল গাড়ীটাতে দরজা বন্ধ করে জানালার কাঁচ উঠিয়ে বসে থাকতে পারত, কিন্তু তা না করে সেও জগন্নাথের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে উঠল তার ঘরের বারান্দায়।

নির্ম্মলা তখন বারান্দার ওপাশের ঘের দেওয়া জায়গটার রান্না নিয়ে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর মুখ বাড়িয়ে আকাশটাকে দেখে যখন মনে হল যে, খুব চট করে বৃষ্টিটা থামবে না তখন সুধাকান্ত বলল, "তোমাদের ত বড়ই অসুবিধেয় ফেললাম আমি। নাহয় চলেই যাই;—একটু ভিজব তার বেশী ত কিছু নয়? কি বল?"

জগন্নাথ নির্ম্মলার দিকে দেখল একবার। সে যে কিছু অসুবিধা বোধে করছে তা মনে হল না, তাই বলল, "তা কি হয়? একেবারে চুপচুপে হয়ে ভিজে যাবেন যে। একটুক্ষণ দেখুন আরও।"

"তাহলে একটু আরাম করেই বসি," ব'লে দেয়ালে হেলান দিয়ে বারান্দার মেঝেতে লেপটে বসল সুধাকান্ত।

ওদিকে গুদোমঘরের পিছনের বারান্দায় বড্ড বেশী ধুলো ব'লেই বোধ হয় দিলীপ চেঁচিয়ে গান ধরেছে:

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল।

এত্তা বড়া বাড়ী ইস্ মে এত্তা জঞ্জাল।

এ পর্য্যন্ত গাওয়া হতেই অন্ত ছেলেগুলো সুরে বেসুরে, বেশীর ভাগই বেসুরে, তার সঙ্গে গাইতে শুরু করল, ফলে গানটার পরের কথাগুলি বুঝতে পারা গেল না। আরো খানিক পরে, গান-টান আর নয়, সোজাসুজি তাদের গলা-ফাটানো চিৎকার কানে আসতে লাগল।

কড়ায় তরকারিতে কিছু ঘি আর গরম মসলা বাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে নির্ম্মলা রান্না নামাল। ধারা বর্ষণের পর্দা ঘেরা ঐটুকু জায়গায় সুগন্ধটা ঘন হয়ে রয়েছে, ক্রমশঃ আরও ঘন হচ্ছে, কারণ, বেরিয়ে যাওয়ার পথ পাচ্ছে না।

সেদিন দুপুরে সুধাকান্তর খাওয়া হয়নি ভাল ক'রে। গাড়িটাকে না সারিয়ে বেশী দূরে নিয়ে যেতে ভরসা হয়নি ব'লে পাড়ারই একটা চায়ের দোকানে ঢুকে দুটুকরো রুটি, একটা অমলেট আর দু-পেয়ালা চা খেয়েছিল সে। গাড়ী সারাতে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী লাগছে।

বার-দুই একটু উসখুস ক'রে সুধাকান্ত বলল, "মাংস বুঝি?"

জগন্নাথ বলল, "না, না। মোচার ঘণ্ট।"

সুধাকান্ত যেন নিজের মনেই বলল, "অনেক দিন মোচার ঘণ্ট খাইনি।"

নির্ম্মলা তখন আর একটা রান্নার জোগাড় নিয়ে ব্যস্ত। তার কাছে গিয়ে, দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে খুব নীচু গলায় জগন্নাথ বলল, "দেবে নাকি ওঁকে একটু মোচার ঘণ্ট?"

দেব না ত বলতে পারে না? একটা প্লেটে করে একটা বেগুন ভাজা, দুটো পটল ভাজা ও বেশ খানিকটা মোচার ঘণ্ট আর চ স্লাইস পাউরুটি নিজেই সুধাকান্তর সামনে এনে রেখে সে গেলাসে ক'রে জল এনে দিল।

ডান হাতের আস্তিন গুটোতে গুটোতে সুধাকান্ত বলল, "আরে না, না, ঐ দেখ, ছি ছি, এতগুলো কেন? তোমাদের ঠিক কম প'ড়ে যাবে।"

জগন্নাথ হেসে বলল, "না, না, কম পড়বে না, আপনি খান দেখি! ভাতটা ত হয়নি এখনো, এগুলো পাঁউরুটি দিয়েই খেতে হবে।"

"তা হোক," ব'লে আর বাক্যব্যয় না ক'রে সুধাকান্ত আহারে প্রবৃত্ত হল। খেতে খেতে বলল, "মোচার ঘণ্ট বরাবরই আমার ভাল লাগে, কিন্তু রান্নার গুণে সেটা যে এত ভাল খেতে হতে পারে তা জানতাম না। কোথায় লাগে মাংস।"

যখন হাত ধুতে উঠল, দেখল বৃষ্টি থেমে গেছে। উঠোনের পাশের নীচু দেয়ালটার উপর দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পোড়ো জমিটার এখানে ওখানে জল জমেছে।

সুধাকান্ত বলল, "সবে ত বৈশাখের শুরু, তুই আর বড় জোর একমাস এই মাঠটায় কাজ করতে পারবি, তারপর তিন মাস ওখানে এক-একবার করে জল জমবে, সেটা সরতে না সরতে আবার জমবে। সে সময়টা সেই আগের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খুচরো মেরামতির কাজ করতে হবে তোকে।"

নির্ম্মলাও এসে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়, ভাত চড়িয়ে দিয়ে। সেও শুনছিল সুধাকান্তর কথা।

জগন্নাথ বলল, "কি আর করব? তিনটে মাস রোজগার একটু কম হবে।"

সুধাকান্ত বলল, "ও রে গর্দ্দভ, শুধু কি তাই? যেসব ভাল ভাল খদ্দের তুই এতদিন ধরে নিজে জুটিয়েছিস বা আমি তোকে জুটিয়ে দিয়েছি, তারা কি ততদিন বসে থাকবে, তোর জন্যে, তোর মাঠের জল নামবার অপেক্ষায়? অন্য কারখানায় তাদের যেতে হবে আর তাদের বেশীর ভাগই তারপর তোর কাছে আর আসবে না। এমনিতেই ত এই ছোটলোকের পাড়ায় গাড়ী নিয়ে কেউ আসতে চায় না সহজে।"

জগন্নাথ মাথা নীচু করে ভাবছে। নির্ম্মলা অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে বলল, "ওরকম কিছু ঘটতে দিতে আমরা চাই না। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, বর্ষা শুরু হবার আগে কোথাও খানিকটা ভাল জমি জোগাড় করবার। বীজ যদি পাই ভাল, নয়ত কিনতে হলে কিনব। তবে বড়লোকের পাড়ায় যেতে চাই না, তাতে টাকা বেশী লাগবে, অন্য অসুবিধাও কতগুলি আছে।"

সুধাকান্ত বলল, "সেরকম জমি আমি কি খুঁজব?"

নির্ম্মলা বলল, "যদি নজরে পড়ে ত জগন্নাথকে বলবেন।"

কারবারটাকে ভালভাবে চালু রাখতে হলে একটা ভাল জায়গা যে দরকার জগন্নাথ সেটা বেশ ভালই বোঝে তবু নির্ম্মলার মুখে কথাটা শুনে কেন তার মনটা ভার হয়ে আছে কে জানে?

সতেরো

সুধাকান্তর মত একজন উপকারী বন্ধু, ওরকম করে সিকি পেটা খেয়ে গেল সেদিন, এটা জগন্নাথেরও ভাল লাগেনি, নির্ম্মলারও না। যে কোনো মানুষই হোক, ভাল হোক মন্দ হোক, যদি তাকে খাওয়াতেই হয় ত ভরপেট খাওয়ানোই উচিত।

সুধাকান্ত সেদিন সকালের দিকে এল, জগন্নাথকে এক বীমা-কোম্পানীর ম্যানেজারের বাড়ীতে নিয়ে যাবে

বলে। দুর্ঘটনা-বীমাকারীদের ভাঙ্গা গাড়ী মেরামত করা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে। যাবার আগে জগন্নাথ নির্ম্মলাকে আড়ালে ডেকে বলল, "মুদীর দোকানের তিনু ছোঁড়াটা সব জিনিষের বাজারদর বেশ ভাল জানে, ওকে পাঠিয়ে বাজারটা করিয়ে নাও। এত সকালে এসেছেন ভদ্রলোক, আর আমারই কাজে চলেছেন, ওঁকে আজ না খাইয়ে ছাড়তে পারব না। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি রকম হলে ভাল হবে, সে তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী বুঝবে।"

এখন তাদের পয়সা কিছু হয়েছে, ঠিকে ঝি রেখেছে একটা, কাঁসার থালা গেলাস ও অন্যান্য বাসনকোসন কিছু কিনেছে। একজন ভদ্রলোক খেতে আসছেন শুনে বারান্দার একটা দিক্‌ ভাল করে নিকিয়ে শতরঞ্চির আসন পেতে দিল দুখ্‌নী ঝি, কাঁসার গেলাসে জল দিয়ে তার উপর কাঁসার থালা উল্টে চাপা দিল।

খাবার জায়গা একজনের জন্যেই করা হল। জগন্নাথকে যেরকম তুই-তোকারি করে আর কথায় কথায় ছোটলোক বলে গাল দেয়, তাতে তার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে সুধাকান্ত খাবে কি না তা কি করে জানবে নির্ম্মলা?

জগন্নাথকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল সে, "আচ্ছা ঐ লোকটি তোমাকে তুই-তোকারি করে কেন?"

জগন্নাথ বলেছিল, "আমি যে ইংরিজি জানি না মাসী।"

নির্ম্মলার মনে হয়েছিল, কথাটা সত্যি। উঁচু জাত নীচু জাতের বিচার এখন আর নেই ততটা। ইংরেজী জানা জাত একটা হয়েছে, তাদের আচার আচরণ অন্যদের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। অন্যদের বেশ একটু অবজ্ঞার চোখেই তারা দেখে।

জগন্নাথ বলল, "ইংরিজি শিখলে কি হয় তা জানিনে মাসী, কিন্তু কিছু একটা হয়, খানিকটা শিখেই আমি তা বুঝতে পারছি। মানুষ একটু অন্য রকম হয়ে যায়। ইংরিজি আমি খুব ভাল ক'রে শিখব মাসী।"

নির্ম্মলা খুশী হয়ে বলেছিল, "বেশ ত। শেখ না। কে তোমাকে বারণ করছে?"

সুধাকান্ত একলা বসেই খেল। জগন্নাথকেও যে বসে পড়তে বলা যেতে পারে, এটা তার মাথায়ই এল না। অবিশ্যি নির্ম্মলা সেটা আশা করেনি, জগন্নাথ ত করেইনি।

সুধাকান্ত খাবে বলে নয়, কিন্তু বাইরের একজন লোক খাবে, তাই নির্ম্মলা আজ খুব যত্ন করে রেঁধেছে। শিউলি পাতা দিয়ে ডালের সুক্ত, কাঁকরোল ভাজা, কুঁদরি ভাজা, পোস্তর বড়া, মোচার ঘণ্ট, চিতল মাছের গাদা দিয়ে কোপ্তা করে তার কালিয়া, আর মাছের ডিমের অম্বল।

খেয়ে সুধাকান্ত এত বেশী প্রশংসা করল যে নির্ম্মলা তার সামনে গম্ভীর হয়ে থাকবে স্থির করেও না হেসে থাকতে পারল না আর সুধাকান্তর সম্বন্ধে তার মনের ভাবটা অনেকটাই গেল বদ্‌লে।

এরপর আরো দুদিন অবস্থার ফেরে প'ড়ে এদের বাড়ীতে খেয়ে গেছে সুধাকান্ত।

নির্ম্মলাকে যত দেখছে, সুধাকান্তর ততই জেদ চাপছে যে করেই হোক এই মেয়েটিকে এইসব ছোট্‌লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তার আর তর সইছে না।

নির্ম্মলার বিগত জীবনের একটা মনগড়া ইতিহাসও সে খাড়া করেছে। নির্ম্মলা বিধবা, সে জন্যে মাছ মাংস খায় না। বাপের বাড়ীতে তার কেউ নেই এবং শ্বশুর-বাড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে পারেনি বলে পালিয়ে এসে এই ছেলেটার সঙ্গে রয়েছে। জগন্নাথের সঙ্গে নির্ম্মলার সম্পর্কের মধ্যে কুৎসিত কিছু আছে, সুধাকান্তর তা মনে হয় না, কিন্তু নির্ম্মলার মত একটা মেয়ে কেন থাকবে ঐ ছোটলোক মিস্ত্রিটার সঙ্গে।

ইন্‌সিওরেন্সের দালালি করে সুধাকান্ত। তড়িঘড়ি কাজের কথায় চলে আসতে অভ্যস্ত। এক দিন জগন্নাথকে বাইরের একটা কাজের সন্ধান দিতে এসে শুনল সে ভবানীপুরে গেছে গাড়ীর জন্যে মালপত্র কিনতে, শীগ্‌গিরই ফিরে আসবে বলে গেছে। পা ঝুলিয়ে বারান্দায় বসে বলল, "একটু বসে যাই?"

নির্মলা উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে একটা বই কোলে নিয়ে মোড়ায় বসে ছিল, বলল, "একটা মোড়া এনে দেব ?"

সুধাকান্ত বলল, "না না, তার কিছু দরকার নেই।" তারপর কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলল, "আচ্ছা, তোমরা শরিকানা কারবার করছ সেটাতে দোষ কিছু নেই, কিন্তু, সেইসঙ্গে শরিকানা ঘর-সংসার করাটাও কি দরকার ?"

কথাটার উত্তর দেবে কি দেবে না, একটুক্ষণ ভাবল নির্মলা, তারপর বলল, "ঘর-সংসারটাকে আমাদের কারবারেরই একটা দিক্ বলে ধরুন না ? কোনোটাতেই ত লোকসান কিছু হচ্ছে না ?"

সুধাকান্ত বলল, "হচ্ছে। এই ঘর-সংসারের ব্যাপারটাতে খুব বেশী লোকসানই তোমার হচ্ছে। এত বুদ্ধি নিয়েও তুমি কেন যে সেটা বুঝতে পারছ না তা জানিনে। লোকের ধারণা, তুমি জগন্নাথের সত্যিকারের মাসী নও। তোমার চেহারা, তোমার চলন-বলন সব কিছু থেকেই খুব সহজে বোঝা যায়, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে। আর জগন্নাথ যদিও ছেলে ভাল, ছোটজাতের লোক ত ?"

নির্মলা নভেলের বইটা বন্ধ ক'রে বলল, "আমি যেমন কারুর কথায় থাকি না আমি চাই না অন্য কেউ আমার কথায় থাকুক।"

সুধাকান্ত বলল, "তা বললে, কি হয় ? নিজেকে নিয়ে নিজের মনে তুমি একলা থাকবে, পৃথিবীটা সেরকম জায়গাই নয়। তাও যদি বা সত্যিই একলা থাকতে। রয়েছ ত একটা গোভূতের সঙ্গে।"

"কি আমাকে করতে হবে ? আমি যে ওর সত্যিকারের মাসী সেইটে প্রমাণ করতে হবে ?"

"প্রিভি কাউন্সিলের ছাপমারা দলিল নিয়ে এসে দেখালেও কেউ বিশ্বাস করবে না সেটা। কাজেই সে-চেষ্টা ক'রে লাভ নেই।"

"তাহলে আর কি করতে পারি আমি ? কি আপনি আমাকে করতে বলছেন ?"

"বলছি, দুজনে পার্ট্‌নারশিপে বিজ্‌নেস করছ কর, কিন্তু সেটা আলাদা থেকে কর।"

"আলাদা থাকা কি আমার পক্ষে সম্ভব ? অবিশ্যি তর্কের খাতিরে বলছি কথাটা।"

"কেন সম্ভব হবে না ? ভদ্রপাড়ায় ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকবে, বেশ বিশ্বস্ত চেনা-জানা ঝি-চাকর জোগাড় ক'রে দেব, অসুবিধে কি ?"

"ভদ্রপাড়াটাই একটা অসুবিধে।"

"তা যদি বল, তবে আর কি করতে পারি ? কিন্তু ওরকম একটা কথা তোমার মুখে শুনব তা ভাবিনি।"

দুপুরে খেতে বসে নির্মলার কাছে কথাটা শুনল জগন্নাথ, বলল, "উনি যা বলছেন তা যদি তুমি কর, ত একমাত্র ভদ্রপাড়ায় যাওয়া ছাড়া আর তফাৎটা কোথায় হচ্ছে ? এখানেও ত, বলতে গেলে, তুমি একজন চাকর নিয়েই রয়েছ। তবে তিনি যদি বলেন, আমার চেয়ে বেশী চেনাজানা, আমার চেয়েও বেশী বিশ্বাসী চাকর তোমাকে জুটিয়ে দেবেন, ত সে তুমি বোঝ।"

নির্মলা জগন্নাথের থালায় আরও দুহাতা ভাত দিয়ে বলল, "আমি যা বুঝি তা হ'ল এই যে, এখানে তুমি চাকর হয়ে নেই, আর এখানে আমি যেভাবে রয়েছি, তার চেয়ে ভাল কোনো ব্যবস্থা নিজের জন্যে আমার দরকার নেই।"

জগন্নাথ বলল, "ভদ্রপাড়ায় যাবে মাসী ?"

নির্মলা বলল, "যে পাড়ায় রয়েছি সেটা আমার পক্ষে যথেষ্ট ভদ্রপাড়া।"

জগন্নাথের মুখে ঝকঝক ক'রে উঠল হাসি। তাতে তার নিজেরই মুখটা যে কেবল উজ্জ্বল হ'ল তা নয়, চারপাশটাও উজ্জ্বল হল। বলল, "মাসী, আর দুটি ভাত। এ চচ্চড়ির ডালনা অনেকটা রয়ে গেল যে।"

সেই রাত থেকেই বর্ষা নামল।

কলকাতা শহরটা যে এই বিরাট্ বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই একটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, সেটা বোঝা যায় একবার যখন গ্রীষ্মকালে পুরনো রাস্তাগুলোর ধারে ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি লালে লাল হয়ে যায় ফুলে, আর একবার যখন আকাশ ভেঙে বর্ষা নামে। তখন কাজকর্ম কিছু না থাকলে বাড়ীতে বসে কবিতা লেখা যায়, কিন্তু একমাত্র খিচুড়ির জন্যে ঘি কেনা ছাড়া আর কোন কারণে বেরুবার দরকার হলেই মনটা বিদ্রোহ করতে

থাকে। বর্ষা ঋতুটা কলকাতায় যে বেশ ভাল ক'রে জানান দিয়ে আসে শহরের পথচারীদের অন্ততঃ সেটা বলে দিতে হবে না।

ক'দিন যেতেই বোঝা গেল যে, এখন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্যে পোড়ো জমিটাকে গাড়ী মেরামতের কাজে লাগানো চলবে না।

সুধাকান্ত একদিন এসে বলল, "যদ্দিন তোমাদের পছন্দ মত জমি না পাও, আমার বাড়ীর পাশে যে জমিটা আছে আমার, সেইখানে বাঁশ আর টিন দিয়ে কাজ চালানো গোছ একটা শেড তৈরি ক'রে দিচ্ছি তোমাদের।"

জগন্নাথ ভেবেছিল, সুধাকান্তর বাড়ীতে কারখানা করাতে নির্ম্মলার আপত্তি হবে। কিন্তু হ'ল না। নির্ম্মলা রাজী হয়ে গেল। মাঠটায় জল জমে থাকাতে দৈনিক দশ-বারো টাকা ক'রে লোকসান হয়ে চলেছে তাদের। নির্ম্মলা কেবল বলল, "শেডটার জন্যে ভাড়া দেব আমরা, সেটা তাঁকে নিতে হবে।"

সুধাকান্ত শুনে বলল, "তোর কাছ থেকে ভাড়া নেব কি রে মর্কট? তাহলেই ত তুই থাপন জুড়ে জেঁকে বসবি। আইন-আদালত না ক'রে তোকে তুলতে পারব না। ওসব ভুলে যা। বিনি ভাড়ায় থাকবি, যতদিন ইচ্ছে রাখব, যখন ইচ্ছে হবে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। বুঝলি?"

জগন্নাথ চুপ করে আছে দেখে একটু পরে আবার বলল, "ওরে আহম্মক, দেবার ইচ্ছে যদি থাকে ত নানা রকম ক'রে দেওয়া যায়। এ নিয়ে তুই ভাবছিস কেন? ভাববার কিছুই আর থাকে না যদি আমাকেও তোদের কারবারের একজন শরিক করে নিস।"

এ-সব কথাই নির্ম্মলাকে বলল জগন্নাথ। শুনে নির্ম্মলা বলল, "শরিক আর বাড়াব না আমরা। ভাড়া নিতে উনি যদি রাজী না হন ত তুমি এই ক'মাস বাড়ী বাড়ী ঘুরেই গাড়ী মেরামত করবে। আর কোথাও জমি পাও কি না তাও দেখবে সঙ্গে সঙ্গে।"

ইতিমধ্যে শেড তৈরি হয়ে গেছে চেতলা রোডের উপরে সুধাকান্তর বাড়ীর পাশে। বেশ বড় শেড, পাঁচ-ছ'খানা গাড়ী রেখে কাজ করা যাবে। একপাশে ছোট একটি অফিস-ঘর তৈরি হচ্ছে, অবশ্য বাখারির বেড়া দিয়ে; কিন্তু সুধাকান্ত বলছে তাতে স্প্রিং দেওয়া এক-জোড়া হাফ-সাইজের কপাট বসবে। জগন্নাথ মানস নেত্রে দেখছে কপাট দুটোর একটার গায়ে লেখা আছে "প্রবেশ," অন্যটার গায়ে "নিষেধ।" অফিসই বল আর কারখানাই বল, কোনো একটা জায়গায় "প্রবেশ নিষেধ" কথাটা না থাকলে কেমন যেন জুৎ হয় না, সব ব্যাপার-টাই যেন একটু জোলো হয়ে যায়। তাছাড়া হতে ত পারে তার মামী এসে এই ঘরটাতে বসবে, হিসেব দেখবে, বিল তৈরি করবে, চিঠি লিখবে। যার যখন খুশি সেই ঘরটার দরজা ঠেলে ঢুকবে, সে ত হতে পারে না।

সুধাকান্ত বলেছিল, "আচ্ছা, নাহয় ভাড়াই দিবি। পরে সে-বিষয়ে কথা হবে। এখন চলে ত আয়। কারবারটা দাঁড়াক তোদের। এই সামান্য একটা কথা নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত হবার আছে কি? এই কারখানা করার ব্যাপারে আমার স্বার্থ কিছু যে নেই তা ত নয়? ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর কাজ, বীমা কোম্পানীর কাজ, আরও যে-সব কাজ তোকে আমি জুটিয়ে দিচ্ছি, তার থেকে যা পাবি, তার ওপর আমার কমিশন বলে আমাকে কিছু দিবি ত তোরা?"

জগন্নাথ তার সুন্দর হাসিটি হেসে বলেছিল, "তা আর দেব না? বা রে!"

সুরু হ'ল পুরোদস্তুর কারখানার কাজ। নির্ম্মলা অবশ্য বলেই দিল, যে, হিসেব রাখা, বিল করা এসব কাজ বাড়ী বসেই সে করবে; যত বড় বড় করেই "প্রবেশ নিষেধ" লেখা হোক অফিস ঘরের দরজায়।

সাইন বোর্ড আঁকতে দেওয়া হ'ল। সুধাকান্তই ঠিক ক'রে দিল, নাম হবে "অটোমোবিল রিপেয়ারিং ওয়ার্কস্"। জগন্নাথের খুব ইচ্ছে ছিল, নামের শেষে "লিমিটেড" কথাটা থাকে। ওটা না থাকলে, বিশেষ কিছু যে একটা হচ্ছে তা যেন মনেই হয় না। কিন্তু কোনো কারণে ঐ কথাটা ব্যবহার করা যাবে না শুনে সে দমে গেল একটু। সে জানত না, কাজের দিক

থেকে তার বেশী সুবিধে হত যদি "জগন্নাথ মিস্ত্রির কারখানা", এই নামের সাইনবোর্ড হ'ত। বাজারে তার তখন এতটাই সুনাম।

কিছুদিন যেতেই শেডটাকে বাড়াতে হল খানিকটা। তখন ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি, লক মিস্ত্রি, ইঞ্জিন মিস্ত্রি, বডি মিস্ত্রি, রঙের মিস্ত্রি আর জোগানদার ছেলেছোকরাদের নিয়ে দশ বারো জন লোক কাজ করছে কারখানায়। রঙ স্প্রে করবার পাম্প, যেসব যন্ত্রপাতি আগে ছিল আরও দু-এক সেট করে সেগুলো কেনা হয়েছে। বেশীর ভাগ দিন জগন্নাথ দুপুরে খেতে আসতে পারে না বাড়ীতে। না খেয়ে যে থাকে তা নয়। খদ্দেররা, বিশেষ করে পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওয়ালারা, যারা কাজ করিয়ে নিয়ে যাবে বলে বসে থাকে কারখানায়, তারা বাজার থেকে রাঢ়া রগগুস ইত্যাদি মেথি-পাতা সহযোগে রান্না মাংস আর পরাঠা কিনে এনে তাকে খাওয়ায়।

জগন্নাথের মুখে রোচে না সে সব খাবার। মাসীর রান্না ছাড়া আর কিছুই তার মুখে রোচে না।

এদিকে সুধাকান্তর রাত্তিরে ঘুম হয় না। তার একমাত্র ভাবনা, ভদ্রঘরের ঐ মেয়েটাকে কি করে এই ছোটলোকদের সংসর্গ থেকে সরিয়ে আনা যায়। তার দৃঢ় ধারণা, নির্ম্মলাও মনেমনে তাই চায়, মুখে সে যাই বলুক।

সেদিন ভোর হবার একটু পরেই প্রাতরাশ সেরে জগন্নাথ যখন তার তেলকালি মাখা বয়লার সুট পরে কাজে যাবার জন্যে বের হচ্ছে তখন সুধাকান্ত এল একটা বাজারের থলি হাতে করে। বড় গোছের থলিটিতে ঠাসাঠাসি করে অনেক কিছুই এনেছে সে, সেগুলিকে বারান্দায় ঢেলে দিয়ে বলল, "আজ তোদের এখানেই খেতে ইচ্ছে গেল রে!"

জিনিষগুলি দেখে জগন্নাথ হাঁ হাঁ করে উঠল, নির্ম্মলাই বা চুপ করে থাকে কি করে? বলল, 'আপনি খাবেন সেজন্যে কি আপনার কাছ থেকে আমরা পয়সা নেব?"

সুধাকান্ত বলল, "পয়সা নিচ্ছ মানে?"

নির্ম্মলা বলল, "পয়সাই ত। আর এদিকে বাজার যা করেছেন সে আর বলে কাজ নেই। কোন্ জিনিষের সঙ্গে কোন্ জিনিষ যায় বা যায় না তার কিছুই আপনি জানেন না। গুচ্ছের পয়সা খরচ করেছেন।"

এইভাবে সুধাকান্তর সঙ্গে নির্ম্মলার আর দশজনের থেকে একটু আলাদা রকমের করে বাক্যালাপের শুরু।

এরপর বার দুই জগন্নাথের খাওয়ার সময় বিনা খবরে এসে হাজির হয়েছে সুধাকান্ত। নির্ম্মলা নিজের ভাগের খাবারটা তাকে খাইয়ে ভাতে-ভাত চড়িয়েছে। তিনুকে ডেকে দই মিষ্টি আনিয়েছে সুধাকান্ত। ধীরে ধীরে একটা অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে উঠছে মানুষগুলির মধ্যে, যদিও জগন্নাথ আগে যেমন ছোটলোক ছিল সুধাকান্তর চোখে, এখনও তাই থেকে গেল।

ইন্‌সিওরেন্সের কাজ যারা শেখে তাদের বলা হয়, যা বল আর যা কর, যে ফুটকি দেওয়া জায়গাটিতে সই নেবে সেই জায়গাটাকে মনের একাগ্র দৃষ্টির সামনে ধরে থাকবে সারাক্ষণ। এই জাতীয় একটা একাগ্রতা সুধাকান্তর খুবই রপ্ত হয়ে গিয়েছে। নির্ম্মলাকে জগন্নাথের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে সে কৃতসঙ্কল্প।

জগন্নাথ এ সময়টা বাড়ী থাকে না জেনেও প্রথম যেদিন ভাঁটি বেলার দিকে সে এল, গলির মোড়ে বড় রাস্তার উপরে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে তার দিকে না তাকিয়ে যেন নিজের মনেই বলল, "জগন্নাথ মিস্ত্রি বাড়ী নেই।"

সুধাকান্ত জানত ছেলেটির কথা। শুনেছিল দিলীপের কাছে। বলল, "তুমি কি করে জানলে?"

ছেলেটি বলল, "দেখলাম বেরিয়ে যেতে।"

সুধাকান্ত গলির দিকে পা বাড়িয়ে বলল, "তবু একবার দেখেই যাই।"

ছেলেটি এবার বেশ একটু জোর দিয়ে বলল, "যাবেন না। জগন্নাথ মিস্ত্রি বাড়ী নেই।"

সুধাকান্ত ভাবছে, এ ত আচ্ছা এক উপদ্রব। কোন্‌দিন হয়ত লোকজন জড় করে একটা কেলেঙ্কারি করবে। একে থামিয়ে দিতে হচ্ছে। বলল, "তোমার নাম কি?"

'নীতীশ।"

"ঐ বাড়ীটার দুতলার জানালায় বাইনোকুলার লাগিয়ে কে বসে থাকে? তুমি?"

নীতীশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখছে।

সুধাকান্ত বলল, "বাইনোকুলার লাগিয়ে জগন্নাথ মিস্ত্রির মাসীকে তুমি দেখ। কথা হচ্ছে, কেন দেখ। মৎলবখানা কি তোমার? সেটা যদি আমি যা ভাবছি সেরকম কিছু হয় আর এরা যদি সেটা বুঝতে পারে তাহলে কি করবে জানো ত?" নীতীশের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু একটা বলল সুধাকান্ত।

"না, না, না, এসব কি বিচ্ছিরি কথা বলছেন আপনি," বলতে বলতে নীতীশের দুচোখ ছলছল করে এল।

সুধাকান্ত বলল, "অবিশ্যি ওরকম কিছু করতে আমি তাদের বারণই করব। আমি বলব, তোমাকে জগন্নাথ মিস্ত্রির মাসীর কাছে নিয়ে গিয়ে কান ধরে ওঠ্‌বস্‌ করাতে।"

নীতীশ প্রায় ছুটে চলে গেল সেখান থেকে।

বাঁদরটার মনে নিশ্চয় শখ আছে অনেক রকম, উঠতি বয়সের ছেলেদের যেরকম থাকে। কিন্তু দুপা হেঁটে গিয়ে নির্মলার সঙ্গে আলাপ করবার সাহসটুকু নেই। নিজের বাড়ীর জানালার ধারে বসে যতটা হয়। একেবারে বীরপুরুষ যাকে বলে। মনে মনে একটু হেসে সুধাকান্ত নির্মলার রান্নার জায়গাটার পাশে বারান্দার ধারে এসে দাঁড়াল। বলল, "কি রাঁধছ দেখব?"

নির্মলা বলল, "অবাধে।"

সুধাকান্ত উঠে এল বারান্দায়। কলাপাতার উপরে সরষেবাটা মাখা ইলিশ মাছের কোলের চার পাঁচটি টুকরো রয়েছে দেখে বলল, "ইলিশ মাছ ভাতে হবে বুঝি?"

নির্মলা বলল "হ্যাঁ।"

সুধাকান্ত বলল, "ওটা হচ্ছে জানবার পর একটুখানি না খেয়ে যাই যদি ত আমার বাঙালিত্বের অবমাননা হবে। কাজেই বসে যাব একটুক্ষণ।"

নির্মলা বলে কি ক'রে, না আপনি বসবেন না, চলে যান?

চাঁপা বৌ এসেছিল দুটো আলু ধার করতে, দেখল বারান্দায় একটা মোড়া নিয়ে সুধাকান্ত বসে আছে। সেখান থেকে সরে গেল জিভ কেটে।

এরপর সুধাকান্ত আরও কয়েকবার এসেছে, নির্মলা যখন একলা থাকে সেই সময়গুলি বেছে বেছে। কোনোদিন বড়ি ভাজা, কোনোদিন বা আধখানা করে কাটা কাঁঠাল-বীচি ভাজা, কিংবা দুটো পটোলের দোলমা খেয়ে চলে যায়। গুছিয়ে খায়, আশপাশটার সম্বন্ধে নাক সিঁটকায় আর রোজ সুট আর টাই বদলে পরে, এছাড়া এমন আর কিছু করে না, বা বলে না যাতে মানুষের আপত্তি হতে পারে।

তাই সুধাকান্ত যে আসে মাঝে মাঝে সে কথাটা জগন্নাথকে বলার সত্যই কোনো প্রয়োজন আছে কি না ভাববার অবকাশ পাচ্ছে নির্মলা। মাসীকে আগে সারাটা দিনই দেখতে পেত, এখন প্রায় দেখতে পায়ই না বলে এমনিতেই মনমরা হয়ে থাকে জগন্নাথ। কি জানি, বললে যদি ভুল বুঝে কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে? তার চেয়ে না বলাই বোধহয় ভাল এখন।

কিন্তু বলল চাঁপাবৌ। জগন্নাথকে হাতছানি দিয়ে ডাকল সে কলতলায়। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, কেউ যে তাদের দেখতে পাবে তার সম্ভাবনা কম। বলল, "মিস্ত্রি সাহেব, গাড়ীর কারখানাই খালি দেখছেন, বাড়ীর কারখানাটাও এবার একটু দেখুন।"

জগন্নাথ বলল, "মানে?"

চাঁপাবৌ বলল, "বাবুটি যে আজকাল বড় ঘন ঘন আসছেন।"

জগন্নাথ বলল. "বাবু? বাবু কে?"

চাঁপাবৌ বলল, "যিনি নিজের বাড়ীতে কারখানা করে দিয়ে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এখান থেকে।"

জগন্নাথ বলল, "খালি আমাকে সরিয়ে নিতে তিনি ত চাননি। মাসীর জন্যে সুন্দর একটা অফিস ঘর রয়েছে কারখানায়, মাসীই ত কিছুতে যেতে রাজী হল না সেখানে।"

অন্ধকার এমন গভীর নয় যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি মানুষ পরস্পরকে দেখতে পায় না ভাল ক'রে। মাথার ঘোমটাটাকে সরিয়ে চোখদুটোকে নাচিয়ে, খুব মিষ্টি করে হেসে বলল চাঁপা বৌ, "জানতাম মিস্ত্রিদের বুদ্ধি ড্রাইভারদের

চেয়ে একটু বেশী হয়। এই কি তার নমুনা? বলি, ওখানে যেতে আপনার মাসী রাজী হতে পারে কখনো? এই যা চলছে এখানে, তা কি সেখানে চলতে পারত?"

জগন্নাথের মনে সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। বুঝতে ঠিক পারল না বলেই বলল, "বুঝতে পারছি না।"

জগন্নাথের বাঁহাতে লাল রঙের কাঁচের চুড়ি পরা নিজের নিটোল নরম ডান হাতটিকে একটু ঠেকিয়ে চাঁপা বৌ বলল, "বুঝবেন আর একটু বয়স হলে। আর যদি তার আগেই বুঝতে চান, ত চলুন আমার ঘরে, বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

কলতলার ঠিক পাশেই চাঁপা বৌএর ঘর। তার স্বামীর সঙ্গে আজ সকালেই জগন্নাথের কথা হয়েছে, জগন্নাথ জানে, সে রাণাঘাট গিয়েছে বিকেলে, তিনচার দিনের জন্তে। চাঁপা বৌএর ডাগর ডাগর চোখ দুটো কেবল যে নাচছে তা নয়, আদর করছে জগন্নাথকে, হুকুম করছে জগন্নাথকে।

জগন্নাথের গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। ধুকপুক করছে তার বুক। সে নীরবে মাথা নাড়ল। না।

চাঁপা বৌ বলল, "আচ্ছা, একদিন ডেকে এনে দেখিয়ে দেব। তারপর দেখব মিস্তিরি কি বলেন।"

এর পরের রবিবারে তার বোন ঊর্ম্মিমালাকে সঙ্গে করে বিকেলের দিকে এল সুধাকান্ত। রবিবারগুলোতে জগন্নাথ পারতপক্ষে কাজে বেরোয় না, আজ বাড়ীতেই ছিল।

ঊর্ম্মিমালা নির্ম্মলার কাছে রান্না করা শিখবে।

নির্ম্মলা বলল, "আপনার বোনকে নিয়ে এসেছেন এই বস্তিপাড়ায় রান্না শেখাতে?"

সুধাকান্ত বলল, "তাতে আর কি হয়েছে? তুমি যদি এখানে সংসার পেতে থাকতে পার ত ঊর্ম্মি এসে এখানে রবিবারগুলোর দুতিন ঘণ্টাও কাটিয়ে যেতে পারবে না?"

যে দিনগুলোয় ওরা আসে, ঊর্ম্মি রান্না শেখে, আর ভাইবোনে ওখানেই সেদিন দুপুর বেলাটায় খায়।

ঊর্ম্মিমালা প্রথম যেদিন এল ভাইয়ের সঙ্গে, মনে হল ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই এই ধরণের একটা মানুষ সে। কোনো অভদ্রতা করল না কারও সঙ্গে, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন জগতের মানুষ তাও ভুলতে দিল না কাকেও।

নির্ম্মলা তাকে একটা মোড়া এনে দিয়ে বলল, "বস।"

ঊর্ম্মি বসল না, বলল, "দাঁড়িয়ে ভাল দেখতে পাব।"

নির্ম্মলা বলছে, এই কড়া চাপালাম উনুনে। একটু গরম হোক কড়াটা।......এবার এই খানিকটা তেল দিলাম কড়াতে।......কেমন ফেনা বেরুচ্ছে দেখ। এই ফেনাটা মজে যাবে আস্তে আস্তে আর ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে......

ঊর্ম্মি হুঁ হ্যাঁ না ছাড়া বলে না, দুই চোখে একটা দূরের দৃষ্টি, যদিও কিছুই যে তার চোখ এড়াচ্ছে না সেটাও বেশ বোঝা যায়।

মাঝে এক রবিবার সুধাকান্ত ও জগন্নাথ বাজার করতে বেরিয়ে গেলে নির্ম্মলা ঊর্ম্মিকে বলল, "আজ তোমার চুল বেঁধে দেব আমি, তারপর রান্না বাড়া। এস ত ভাই, বস এইখানে। এত সুন্দর মুখখানি, কিন্তু তাকালেই চোখ চলে যায় ঐ এলোমেলো চুলগুলির দিকে আর সেখানেই জড়িয়ে গিয়ে আটকে থাকে। তুমি যে কি সুন্দর তা তুমি জানো না, না ভাই?"

আর আছে কোথায়? ঊর্ম্মির সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল। তারপর চুল বাঁধা শেষ করে ঊর্ম্মির মুখটিকে একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে ঘুরিয়ে দেখে নির্ম্মলা যখন তার চিবুকটিকে নাড়া দিয়ে নিজের আঙুলগুলোকে ঠোঁটে ঠেকাল তখন ঊর্ম্মি ত একেবারে জল। বলল, "আমার চুল সকালে এই রকম দেখছ। বিকেলে রোজই ত আঁচড়াই, বিনুনি করি। তখন অন্য রকম। কিন্তু তুমি ত মনে হয় অনেক দিন চুলে হাতও দাওনি। মুখটি তোমারই কি কম সুন্দর?"

এরপর কোনো ছুটিই বাদ যায় না, ঊর্ম্মি আসে রান্না শিখতে আর সঙ্গে অবশ্য সুধাকান্তও আসে। প্রায় সারাদিনটাই ভাই বোন কাটিয়ে যায় নির্ম্মলাদের সঙ্গে। ঊর্ম্মি এখন অনেক গল্প করে। তার কলেজের আর হষ্টেলের মেয়েদের গল্প শুনে শুনে নির্ম্মলার আশ মেটে না।

এর মধ্যে একদিন যখন নির্ম্মলাকে একলা পেল সুধাকান্ত,

ঝিঙে পোস্তর চচ্চড়ি খানিকটা একটা পিরিচে করে নিয়ে খেতে খেতে বলল, "আচ্ছা, নির্ম্মলা, জগন্নাথকে তুমি বিয়ে কর না কেন? তুমি বিধবা বলে?"

নির্ম্মলা বলল, "ওটা কি রকমের কথা হল? ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তা কি আপনি জানেন না? আর বিধবা আমি কোন্ দুঃখে হতে যাব?"

সুধাকান্ত বলল, "আমি কি জানি বা জানি না, সেটা কোনো কথাই নয়। তোমাদের দুজনকে নিয়ে নানা রকমের কানাঘুষো হচ্ছে চারদিকে।"

নির্ম্মলা বলল, "চারদিক্ বলতে আপনি কি বুঝছেন জানি না, আমি নিশ্চয় জানি, এই বস্তিতে আমি যাদের মধ্যে রয়েছি তাদের কেউ এই কানাঘুষোর ব্যাপারে নেই।"

সুধাকান্ত বলল, "ওদের কথা ছাড়। ওরা যদি দেখে তুমি জগন্নাথের সঙ্গে এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছ তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামাবে না। ওরা কি মানুষ? শোন নির্ম্মলা। তোমার ভালর জন্যে বলছি। জগন্নাথের সঙ্গে একলা একবাড়ীতে যে রকম করে তুমি রয়েছ তা থেকো না। ওটা এদেশে চলে না, চলবে না।"

নির্ম্মলা বলল, "দেখতে ত পাচ্ছি যে, চলছে। যখন বুঝব চলছে না, তখন অন্য রকম ব্যবস্থার কথা ভাবা যাবে।"

নির্ম্মলাদের যে ঠিকে ঝি দুখ্নী, সে চাঁপাদের ওখানে কাজ করত, এখনো করে। চাঁপা বৌএর বাজার ক'রে এনে দেওয়া, বাটনা বাটা, বাসন মাজা ছাড়াও একটা বড় কাজের ভার নিয়ে সে আছে, সেটা হল রসের জোগান দেওয়া। বয়স চাঁপারই মত। ক্রমাগত পান-দোক্তা খায় আর কতরকমের কত গল্পই যে এসে করে। রসে টসটসে সব গল্প, ওপাড়ার, সে পাড়ার, সবগুলিই অবশ্য ভদ্রপাড়া। সম্প্রতি চাঁপা বৌএর সে-সব গল্পে অরুচি ধরেছে, সে এখন নিজের পাড়ার একটি মানুষের ঝকঝকে হাসিটি নিয়েই মশগুল। দুখনীর তাতে অসুবিধা কিছু নেই, নির্ম্মলা ও জগন্নাথকে নিয়েই সে এখন গল্প জমায়। অবশ্য বেশীর ভাগ গল্পগুলোই বানানো। তা, না বানালে গল্পের রস জমে কখনো?

দুখ্নী জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার ভাতারটি ত ভাই বেশ তাগড়া, মানে আর কি যাকে বলে বেশ। তালে—"

চাঁপা বৌ বলেছিল, "তাও তোকে বলতে হবে? তবে শোন্। ওর গায়ে এমন দুর্গন্ধ না? রাত্রে এক-একদিন উঠে বমি করতে হয়।"

নির্ম্মলার সঙ্গে জগন্নাথের সম্পর্ক নিয়ে বস্তির লোকেরা বলাবলি কিছু করে না, এটা নির্ম্মলার ভুল। বলাবলি করে কেউ কেউ, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। দুটি লোক কেবল মাথাও ঘামায়, এক চাঁপা বৌ, দুই দুখ্নী।

দুখ্নীকে বলল চাঁপাবৌ, "আচ্ছা, আজ ত বাবুটি চলে গেলেন। কালই হয়ত আবার আসবেন। তুই যদি তখন থাকিস আমাদের বাড়ীতে, বা মুদীর বাড়ীতে, বা মিস্ত্রির বাড়ীতে ত পারবি না একটা রিক্শ করে গিয়ে মিস্ত্রিকে ডেকে নিয়ে আসতে?"

"কি বলব? তোমার ঘরে আগুন লেগেছে গো?"

"না, তাহলে হয়ত সে আসবে না। বলবি, তোমার মাসীর ভীষণ অসুখ করেছে, চল শীগ্‌গির।"

দুখ্নী বলল, "মিস্ত্রি সেদিন বলছেল নির্ম্মলাকে, কারখানাতে টেলিফোন হয়েছে। তুমি ভাই রিশকাভাড়াটা আমায় দিও, আমি ঐ নীতু ছেলেটা, যে আর কি চোখে দূরবীণ লাগিয়ে তোমাদের দেখে, তাকে দিয়ে মিস্ত্রিকে টেলিফোন করাব।"

সুধাকান্ত এরপর ক'দিন নির্ম্মলাদের বস্তির বাড়ীতে এল না। মাঝে একদিন সে জগন্নাথকে নিয়ে পড়ল। একটা মরিস গাড়ীর ইঞ্জিন নামানো হয়েছে, এখন সেটার হেড্‌টা খুলে ইঞ্জিন মিস্ত্রি কি সব কাজ করছে। জোগানদার ছেলেগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কারখানার পিছনে অফিস-ঘরে বসে তখন চা খাচ্ছিল জগন্নাথ। সুধাকান্ত স্প্রিংএর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই বলল, "খালি পেটে কতগুলি চা গিলছিস কেন? এই হতভাগারা। ওরে দিলীপ, বাবলু, নিমাই, তোরা একজন এসে এই টাকা দুটো নিয়ে যা ত দেখি, গিয়ে তোদেরই পছন্দমত কিছু খাবার নিয়ে আয়।"

ওরা চলে গেলে জগন্নাথকে বলল, "হ্যা রে জগন্নাথ, তুই নির্ম্মলাকে বিয়ে করিস নে কেন রে?"

জগন্নাথ জিভ কেটে বলল, "আপনি কি পাগল, না আপনার মাথা খারাপ? মাসী যে!"

সুধাকান্ত বলল, "তোর কোন্ দিদিমা ওকে বিইয়েছিল রে?"

"ওরকম করে বলবেন না।"

"তবে কিরকম করে বলব?"

"আমাকে যত খুশি গাল দিন, কিন্তু আমার মাসীর নামে কিছু বললে আমি সেটা সহ্য করব না।"

"ওরে গাধা, আমি ত তোর মাসীকে কিছু বলিনি, বলছে অন্য লোকে, আর বলবার সুবিধেটা ত তাদের তুই-ই করে দিয়েছিস।"

"কেন কি করেছি আমি?"

"কি করিসনি? ভদ্রঘরের উঠতি বয়সের একটা মেয়েকে নিয়ে এসে একলা তোর সঙ্গে এক বাড়ীতে রেখেছিস, লোকে এটাকে ভাল চোখে দেখতে পারে কখনো?"

"মাসী নিজের ইচ্ছের আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে রয়েছে, আমি তার দেখাশোনা করি, এতে লোকে যা খুশি ভাবুক, আমার তাতে যায় আসে না কিছু।"

"তোর যায় আসে না তা ত জানি রে, তুইও কি একটা মানুষ? কিন্তু ওর যায় আসে। ধর্, আজ যদি ওর বিয়ে করতে ইচ্ছে যায়।"

"বিয়ে করবে?"

"ওটা ত নিজেনিজে করা যায় না, আর একটা লোকের দরকার হয়। সেই লোকটা যখন শুনবে, মেয়েটি একটা বস্তি বাড়ীতে একটা মিস্ত্রি ছেলের সঙ্গে একত্রে ঘর করছে, তখন আর বিয়ে করতে রাজী হবে তাকে?"

জগন্নাথ বলল "আমাদের সম্পর্কটা—"

সুধাকান্ত বলল, "বাজে বকিসনি, কেউ বিশ্বাস করে না যে ও তোর সত্যিকারের মাসী।"

জগন্নাথ চুপ করে আছে দেখে সুধাকান্ত আবার বলল, "যদি সত্যিই ওর ভাল চাস ত ওকে ছেড়ে দে। তুই নিজেও একটা বিয়ে কর্, ওকেও তার নিজের সমাজে বিয়ে করে সংসার করতে দে। কারবারটা ত তোদের থাকলই, তোরা দুজনে মিলেই সেটা চালাবি। যখনই ইচ্ছে হবে, ওকে দেখতেও পাবি তুই।"

"মাসী কিছু বলেছে?"

"স্পষ্ট করে কিছু কি বলেছে? তবে ভদ্র পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট নেওয়ার কথা তোলাতে একদিন বলেছিল, তোকে নিয়ে ওরকম কোনো জায়গায় গিয়ে থাকা নাকি চলতেই পারে না।"

"তার মানে কি এই যে, আমি না গেলে সে যাবে?"

"হতেও ত পারে?"

"আচ্ছা, দেখি ভেবে। ততক্ষণ খাবারটা ত খাই" বলে হাত ধুতে চলে গেল জগন্নাথ।

রাত্তিরে খেতে বসে বলল, "আচ্ছা মাসী, তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে আর থাকতে চাও না?"

নির্মলা বলল, "সুধাকান্ত বলেছেন?"

জগন্নাথ বলল "হ্যাঁ।"

নির্মলা বলল, "এই একটা উড়ো আপদ্ যখন আমরা জুটিয়েছি তখন তার উপদ্রব সইতেই হবে। আমার সম্বন্ধে ওর কোনো কথা বিশ্বাস করো না ত তুমি।"

এর পরের রবিবারে নির্মলাদের বাড়ী থেকে ফিরবার পথে গাড়ীতে সুধাকান্ত উর্মিকে বলল, "এই মেয়েটিকেই আমি বিয়ে করব উর্মি।"

উর্মি প্রায় চমকে উঠল বলল, "কোন্ মেয়েটিকে?"

"নির্মলাকে, আবার কোন্ মেয়েটিকে?"

"ওকে বিয়ে করবে তুমি?"

ওকে এবং তুমি, এই দুটো কথার উপর জোর দিল উর্মিলা।

"কেন করব না?"

"তুমিই ত বল ওর জাতজন্মের ঠিক নেই।"

"জানো শাস্ত্রে কি বলেছে?"

"কি?"

"স্ত্রীরত্নম্ দুষ্কুলাদপি।"

"তা নির্মলা মেয়ে ত ভালই, কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না।"

এবার 'তোমার' কথাটাতে জোর।

"দেখ ঊর্মি, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বীমার দালালি করি। যদিও ম্যানেজারের মাইনের চেয়ে আমার রোজগার বেশী, জমি বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, তবু বাংলাদেশের বিয়ের বাজারে পাত্র হিসাবে আমার দাম সামান্যই। তুমি যেরকম সদ্বংশজাতা, সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণান্বিতা সুন্দরী যুবতী কন্যার কথা ভাবছ, তারা কেউ বীমার দালালকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। তাছাড়া তোমরা দেখো, ওকে একটু শিখিয়ে তৈরি করে নিলে ও কোনোদিকে কারুর চেয়ে কম যাবে না। জাতজন্ম নিয়ে কি ধুয়ে খাব?"

কি করে মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে হয় সেবিষয়ে নাম-করা একটা ইংরেজী বই পড়ছে সুধাকান্ত। তাতে লিখেছে, যার মন পেতে চাও তার মনটা পেয়েই গিয়েছ এইরকম ভাব নিয়ে এগোতে হবে। সে বিষয়ে সন্দেহ আছে এমন আভাস দিয়েছ কি গেছ। নির্ম্মলার বেলাতে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করবে ঠিক করে সেদিন সন্ধ্যার মুখে সে গেল তাদের বাড়ী।

হাতের কাজটা শেষ করে নির্ম্মলা প্রথমেই বলল, "কি সব যা তা আপনি বলেন জগন্নাথকে, তার সঙ্গে কি আমার ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিতেচান?"

সুধাকান্ত হেসে বলল, "চাইই ত।"

নির্ম্মলা বলল, "কেন? মৎলবটা আসলে কি আপনার?"

সুধাকান্ত বলল, "সাধু মৎলব। তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু তার আগে জাতে তোলবার জন্যে তোমার একটা শুদ্ধির দরকার।"

"আমার জাতে ওঠার দরকার আছে আর তার জন্যে শুদ্ধি চাই যে-লোক মনে করে, তাকে বিয়ে করার প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকলেও বিয়ে আমি করতাম না। সরুন, আমি একটু চাঁপা বৌ-এর কাছে যাব।"

সুধাকান্ত তার পথ আগলে বলল, "যেও একটু পরে। আগে তোমার শুদ্ধিটা হয়ে যাক।" বলে দু'হাতে তাকে বুকে চেপে ধ'রে তার ঠোঁটদুটোতে ঠোঁট রাখবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে এমন সময় জগন্নাথ এল।

আঠারো

নির্ম্মলার কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে ওঠ্‌বস্‌ করানো হবে এই ভয় যেদিন সুধাকান্ত তার মনে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেদিন থেকে নীতীশ আর দিনের আলোয় জানালায় বাইনোকুলার নিয়ে বসে না। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ একটু ঘন হয়ে এলে দুতলার ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে আলো নিবিয়ে দেয়, তারপর অন্ধকারে জানালার কাছে ঘাপ্‌টি মেরে বসে বাইনোকুলার হাতে নিয়ে। গোল কাঁচদুটোতে আলো পড়ে চক্‌মক্‌ করে না উঠলে কেউ বুঝতে পারে না ওখানে কেউ আছে, আর কাঁচের গায়ে আলো যাতে না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকে নীতীশের।

তার মা একদিন বললেন, "সন্ধ্যে হতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে কি করিস রে—নীতু?" যদি ঐখানেই থেমে যান ত একটু মুশকিলে পড়তে হয় নীতীশকে। কিন্তু ছেলের সব চালাকিই তিনি ধরে ফেলতে পারেন, এই রকম একটা ভাব নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, "জানি ঘুমোস্‌।"

নীতীশ বলল, "হ্যাঁ।"

মা বললেন, "তা বেশ। পড়াশুনো করে দরকার নেই, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিও।"

নীতীশ যেখানটায় বসে সেখান থেকে জগন্নাথদের বারান্দাটা পরিষ্কার দেখা যায়। তাকে কেউ দেখছে না, নির্ম্মলাও না, কিন্তু সে দু-চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছে নির্ম্মলাকে, এত কাছে দেখছে যেন ইচ্ছে করলেই তার কপালটাকে সে রাখতে পারে নির্ম্মলার বুকের উপর। এই লুকিয়ে পাওয়া আনন্দের যে উত্তেজনা, খুব কাছাকাছি বসে দেখে তা পাওয়া সম্ভবই নয়। যে একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে সে নির্ম্মলাকে দেখে, তাও মাঝে মাঝে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে এই উত্তেজনায়।

সম্প্রতি উত্তেজনার আরও একটা কারণ তার জুটেছে। কদিন ধরে সে লক্ষ্য করছে, সন্ধ্যা পার করে সুধাকান্ত আসছে এবং এমন সময় আসছে যখন জগন্নাথ বাড়ী থাকে না। এটা যে ভদ্ররীতি নয় তা নীতীশ জানে, তাই তার ধারণা সুধাকান্তর উদ্দেশ্য ভাল নয়। অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার অনেক সুবিধা রয়েছে ঐ বাড়ীটাতে। নীতীশ তা জানে, কারণ তার কল্পনা প্রখর হয়ে ঘোরে প্রায় প্রতিদিনই ঐ বাড়ীটার সর্ব্বত্র। লম্বা ব্যারাকের মত বাড়ীটার এদিকটায় মানুষ-জন বলতে আছে টায়ার মিস্ত্রির অন্ধ ও কালা বুড়ী মা, আর একেবারে রাস্তার দিকটায় আছে ড্রাইভার আর

তার বৌটি। ড্রাইভার প্রায়ই কলকাতায় থাকে না, যখন থাকে তখনও বেশ রাত করে বাড়ী ফেরে। আর বৌটি তার কাজকর্ম নিয়েই থাকে বেশীর ভাগ সময়, নীতীশ জানে, কারণ বাইনোকুলারটা সেদিকেও সে ফেরায় মাঝে মাঝে। বৌটি অবশ্য যদি টের পায় একটা বাইনোকুলার উদ্যত হয়ে আছে বাড়ীটার দিকে ত সেটার দৃষ্টি নিজের দিকে টানবার জন্যে সেও চেষ্টা কিছু কম করে না।

আজ সুধাকান্ত গাড়ী নিয়েও আসেনি। কেমন যেন চোরের মত এদিক্ ওদিক্ তাকাতে তাকাতে এসে ঢুকেছে এদের বাড়ীতে। লোকটার হাবভাব আজ একেবারেই ভাল ঠেকছে না নীতীশের।

এমন সময় দুখ্নী এল। দুখ্নীকে এ বাড়ীর লোকরা চেনে সকলেই। ঝি-চাকরদের কেউ অসুখে পড়লে বা ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেলে তার কতগুলি কাজ অন্তত: করে দিয়ে যাবার জন্যে দুখনীর ডাক পড়ে। নীতীশকে নীচে ডেকে এনে দুখ্নী বলল, "কিছু মনে করোনি দাদাবাবু, তোমায় কষ্ট দিলুম। কিন্তু কি করব? জগন্নাথ মিস্ত্রির মাসীর যে ভীষণ অসুখ, একেবারে এখন-তখন। তুমি ফোন করে ওনাকে বল, সব কাজকর্ম ফেলে রেখে একটা টেস্‌কি গাড়ী নিয়ে চলে আসতে।"

টেলিফোন তাকে কে করেছিল জানল না জগন্নাথ, জানতে চায়ওনি,কারণ মাসীর ওরকম অসুখ শুনে রিসিভার-টাকে দুম করে নামিয়ে রেখে ছুটেছিল ট্যাক্সির সন্ধানে। তারপর সুধাকান্তর নিবিড় বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করছে তার মাসী, এইটুকু দেখেই ফিরে যাচ্ছিল। কলতলার পাশে অন্ধকারটা বেশ হালকা থাকে, যখন চাঁপা বৌদের ঘরে বা বারান্দায় আলো জ্বলে। আজ তাদের সব কটা আলো নেবানো। জগন্নাথ বেরিয়ে যাচ্ছিল কলতলার পাশ দিয়ে, চাঁপা বৌ তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে চোখ নাচিয়ে হেসে বলল, "কি মিস্তিরি সাহেব, বিশ্বাস হল এবারে?"

ঠাস্ করে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিল জগন্নাথ বৌটির তুলতুলে নিটোল একটা গালে।

গালে হাত বুলোতে বুলোতে চাঁপা বৌ বলল, "ও মা? আমি কি দোষ করেছি? রাগটা আমার উপরে কেন?"

বলে যে হাতে চড় মেরেছিল জগন্নাথ, খপ্ করে ধরল তার সেই হাতটা।

চড় খেয়ে চেপে যাবার মানুষ চাঁপা বৌ নয়। অপ-মানের শোধ সে আজ তুলবেই।

কলতলা থেকে দুপা গেলেই তাদের ঘর, সেইদিকে জগন্নাথের অনিচ্ছুক দেহটাকে টেনে নিয়ে গেল সে। চড় মেরে সত্যিই খুব অনুতপ্ত হয়েছিল জগন্নাথ, তাই বাধা দিল না।

রাতটা যেন এক বিপ্লব বয়ে নিয়ে এল এই অভি-ভাবকহীন, নির্ব্বান্ধব, সংসারানভিজ্ঞ দুটি তরুণ মানুষের জীবনে। নির্ম্মলা না খেয়ে দেয়ে দরজায় খিল দিল। দেহে মনে নিজেকে আজ তার অত্যন্ত অশুচি মনে হচ্ছে, সারারাত জেগে চোখের জলে এ অশুচিতাকে সে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু জগন্নাথের মাথায় যে আগুন জলছে দাউদাউ ক'রে, চোখের জলে তাকে নেবানো সম্ভব নয়। এ রাগের অনেকটাই আবার তার নিজের উপরে। নিজেকে নিয়ে কি যে সে করবে বুঝতে পারছে না। তার খাবার আলাদা করে ঢেকে রাখা ছিল। সেও খুলল না খাবারের ঢাকনাটা। কাঁদল সেও অনেকক্ষণ ধ'রে।

পরদিন থেকে আবার বাঁধা নিয়মে জীবনযাত্রা শুরু হ'ল, কিন্তু জগন্নাথ হঠাৎ যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। নির্ম্মলার সঙ্গে খুবই কম কথা বলে, দুবেলার ভাত বাসি করে খায়, তাও খায় না সব দিন, আর যেন ইচ্ছে ক'রেই এক একদিন বাড়ী ফিরতে অনেক রাত করে।

জগন্নাথ ছাড়া নির্ম্মলার আপনার জন আর ত কেউ এখন নেই? তাই তার এইরকম ব্যবহারে নির্ম্মলা যেন একেবারে দিশাহারা হয়ে গেল। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে বলল, "আচ্ছা, জগন্নাথ, তোমার কি হয়েছে বল ত? এমন মুখ করে ঘুরছ আর এমন ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে, যেন আমি খুব বড় রকমের অপরাধ একটা কিছু করেছি।"

জগন্নাথ যেন এইটুকুরই অপেক্ষায় ছিল। সহ্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছিল তারও।

অন্ধকার উঠোনটাতে নীরবে পায়চারি করছিল জগন্নাথ, সিঁড়ির কাছে একটা মোড়াতে বসে ছিল নির্মলা। সিঁড়ির একটা ধাপের উপর বসে প'ড়ে জগন্নাথ বলল, "তুমি অপরাধ করেছ, আর আমি তাই ভাবছি মামী ?" বলতে গিয়ে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার। বারান্দার কানায় সে মাথা রাখল।

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মাথাটা সেই অবস্থাতে রেখেই বলল, "অপরাধ যে কে করেছে আর তার শাস্তি যে কি হওয়া উচিত তা আমি জানি, কিন্তু কিছুই যে আমি করতে পারিনি, পারছি না, তাই ত তোমাকেও এই মুখটা দেখাতে আমার লজ্জা করছে মামী।"

বাস্তবিক কি যে হয়েছিল সেদিন জগন্নাথের। একটি মুহূর্তের‌ও জন্যে তার কি মনে হয়েছিল, তার মামী স্বেচ্ছায় সুধাকান্তের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছে ? না কি একটা ভয়ানক কেলেঙ্কারি হবে, তার মামী তাতে জড়িয়ে যাবে, এইটে সে চায়নি ?

নির্মলা বলল, "ওর সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক আর আমরা রাখব না, তাহলেই হবে। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

জগন্নাথ মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল, বলল, "এ বাড়ীটাতেও আর আমরা থাকব না মামী। চলে যাব অনেক দূরে আর কোনো পাড়ায়। নয়ত আর কোনো শহরে।"

নির্মলা বলল, "আমি ত বলেছি, এত-কিছু করবার দরকার হবে না।"

"আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরেই কাজ করতে হবে মামী।"

"যতদিন সুবিধেমত একটু জমি খুঁজে না পাব আমরা, ততদিন তাই তুমি করবে।"

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জগন্নাথ বলল, "কারখানাটা তুলেই দিতে হবে। কি করব ? উপায় নেই।"

এত আশা নিয়ে, দিনের পর দিন এত স্বপ্ন দেখে, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, বুকের রক্ত জল ক'রে গ'ড়ে তোলা তার এই কারখানা, "অটোমোবিল রিপেয়ারিং ওয়ার্কস্," তুলে দেব বললেই কি হ'ল ? কতদিকে কতরকম বন্ধন তৈরি হয় এ ধরণের কাজের সূত্রে, সেগুলিকে ছিঁড়তে গেলে বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। কারখানায় যাওয়া-আসা করছে আগেরই মতন, কিন্তু কাজে মন বসছে না তার। মন বসবে কি করে ? কারখানার পাশে সুধাকান্তর একতলা বাড়ীটার দিকে তাকালেই চোখে সে অন্ধকার দেখতে থাকে, এত বেশী রাগ হয় তার।

রাগটা জগন্নাথের উপর সুধাকান্তরও কিছু কম নয়। প্রথমত: সেদিন একটি সুন্দর রোমাঞ্চকর পরিণতির মুখে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিল ও ব্যাটা ভূত। কেন বলেছিল, রাত ন'টার আগে বাড়ী ফিরতে পারবে না ? আর এমন ঠিক সময়টি হিসেব ক'রে এলই বা কি ক'রে, ব্যাটা শয়তান ?

এইসব ছোটলোকদের কোনো কথাতে বিশ্বাস করেছ কি মরেছ।

সেদিন জগন্নাথকে বাড়ীর উঠোনে সুধাকান্তই প্রথম দেখেছিল, আর দেখবামাত্রই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে চলে এসেছিল, যেমন চলে এসেছিল জগন্নাথ। নির্মলা আসলে কি ভাবে নিল ব্যাপারটাকে সুধাকান্ত জানে না। নিজেকে যে নির্মলা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল, ওটা এমন কিছু বড় কথা নয়; প্রথম প্রথম সব মেয়েরাই ওটা করে। কিন্তু নির্মলা কি করল তারপর, কি ভাবল, বলল কি না কাউকে কিছু এ বিষয়ে, কিছুই জানে না সুধাকান্ত, জানতে এখনই চায়ও না। কয়েকটা দিন যাক। সব কাজে তাড়াহুড়ো করা চলে না সব সময়। অনেক প্রাথমিক 'না' কে 'হাঁ'-তে রূপান্তরিত করেছে সে এ-জীবনে, কেবলমাত্র ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে।

এইসব ভাবছে এমন সময় জগন্নাথ একদিন এল তার অফিস ঘরে। বলল, "আপনাকে বলতে এলুম, কারখানাটা আমি আর চালাব না। এই মাস-কাবারেই তুলে দেব ঠিক করেছি।"

এরকম কিছু শুনবে ব'লে সুধাকান্ত প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছিল, অশান্তি একটু হয়ে মিটে যাবে। কারখানা এখান থেকে উঠে গেলে ত সব গেল, নির্মলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই ত তাহলে দুরূহ হবে। বলল, "কেন ? কি হ'ল ?"

জগন্নাথ বলল, "কি হয়েছে আপনি জানেন না, না? কেন ন্যাকা সাজছেন?"

যতটা সম্ভব মেজাজটাকে আজ ঠাণ্ডা রাখতে চাইছে সুধাকান্ত। বলল, "ন্যাকা সাজছি মানে? কারখানাটা কি দোষ করল জানতে চাইছি। ওটাকে তুলে দেবার কথা কেন উঠছে?"

জগন্নাথও মেজাজ হাতে রেখে আজ কথা কইবে স্থির ক'রে এসেছে, বলল, "আমার শরীরে বড্ড বেশী রাগ কিনা? এখানে থাকলে দুবেলা আপনাকে দেখতে হবে, সেটা বিশেষ সুবিধের হয়ত হবে না।"

সুধাকান্ত বলল, "সুবিধে আমাকে দিয়ে যা হবার তা অবিশ্যি হয়ে গেছে তোমাদের।"

জগন্নাথ বলল, "আমি আপনার সুবিধের কথা ভাবছিলুম।"

সুধাকান্ত প্রথমে ইচ্ছে ক'রেই জগন্নাথের কথাটার আসল মানে ধ'রে কথা বলেনি, যাতে ঝগড়া না বেধে যায়। এবারেও যতটা সম্ভব সেদিকটা বাঁচিয়েই বলল, "খুব যে কথা বলছিস? টাকার গরমটা একটু বেশী হয়েছে, না? টাকাটা হয়েছে কার দৌলতে, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দুদিন সেটা একটু ভেবে নিগে যা। তারপর এসে কথা বলিস।"

"বলাবলির আর কিছু নেই," ব'লে জগন্নাথ চ'লে গেল।

সুধাকান্ত বুঝতে পারল, কোথাও ঠিকে ভুল হয়েছে। বেশ বড় রকমের ভুল। কিন্তু এ অবস্থায় কি যে তার করা কর্তব্য তা সে স্থির করতে পারছে না। নির্মলাকে এখনই কিছু বলতে গিয়ে লাভ নেই, জগন্নাথ কিছু আর তার একলার বুদ্ধিতে কারখানা তুলে দেবে ঠিক করেনি। কি বললে কাজ হতে পারে সেটা খুব ভাল ক'রে ভেবে ঠিক করতে হবে। মাস-কাবারের এখনো কুড়ি দিন বাকী, হয়ত তার মধ্যে এদের রাগটা পড়েও যেতে পারে।

মাস-কাবারটা পড়ল এক রবিবারে।

অনেকদিন ধ'রে নিয়মিতভাবে এই রবিবারগুলি ঊর্মিকে নিয়ে নির্মলাদের বাড়ী যেত সুধাকান্ত, খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজবে দিনগুলির বেশীর ভাগটাই কাটাত সেখানে। সে পাট ত এখন উঠেই গেছে। আজ ঊর্মিকে নিয়ে কোথাও যে একটু ঘুরতে বেরুবে তারও উপায় নেই। জগন্নাথ আজ কারখানার হিসাব মিটিয়ে সকলের সব পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিতে আসছে। যদি তা দিয়ে দেয় আর টাকা নিয়ে চ'লে যায় লোকগুলো, তবে ত হয়েই গেল। তাই সুধাকান্ত আজ বাড়ীতেই রয়েছে। জগন্নাথকে নিবৃত্ত করা যায় কি না শেষ চেষ্টা একটা ক'রে দেখবে।

নটা বাজতেই মিস্ত্রিরা, মজুররা, জোগানদার ছেলেরা এক-এক ক'রে আসতে লাগল। মিস্ত্রিদের মধ্যে বেশীর ভাগরাই বাঁধা মাইনেতে কাজ করে, যদিও যে দুজন ঠিকে কাজ করে, তারা রোজগার করে ঢের বেশী। ঠিকেদারদের নিয়ে ঝামেলা কম ব'লে তাদের কাজের অভাব কোনোদিন হয় না। যারা মাইনে নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে যাদের হাত পাকা তারা অন্যত্র কাজের জোগাড় ক'রেই রেখেছে, কাল থেকে গিয়ে লাগবে। যারা একটু আনাড়ি আছে এখনো তারাও ব'সে থাকবে না বেশীদিন। সম্ভবতঃ এই কারণেই এদের মধ্যে এমন একজনও নেই, কারখানাটা উঠে যাচ্ছে বলে যে খুব দুঃখিত হয়েছে।

ওরা জানে, নতুন গরু দুধ ওদের ঠিকই দেবে। যে গরুটাকে সকলে মিলে এতদিন ধরে দোহন করেছে, তার প্রতি সত্যিকারের কোনো দরদ ছিল না এদের। দুধ দেয় বলে গো মাতা, কিন্তু দুধের চেয়ে ঢের বেশী পুষ্টি যার কাছ থেকে আহরণ করেছে এতদিন, সে এদের কেউ নয়।

দশটার মুখে মুখে জগন্নাথ এল।

এত সব যন্ত্রপাতি ঘরে নিয়ে রাখবার জায়গা নেই, তাই মামুলি কয়েকটা জিনিষ, যেমন ছোটবড় কয়েকটা রেঞ্চ, প্লায়ার্স, স্ক্রু ড্রাইভার নিজের জন্যে রেখে বাকী সবই বেচে দিয়েছে সে। যারা কিনেছে তারাও আজ আসবে সেগুলি নিয়ে যেতে। রং স্প্রে করার মেশিন, এসিটিলিন গ্যাস তৈরির সব সরঞ্জাম ভাল ক'রে প্যাক করে রাখা আছে একপাশে। চাপা হাওয়ার ভাঁড়া

করা সিসিগুলো দুটো আজ টায়ার মিস্ত্রির কাছে নিয়ে রাখবে, কাল তাদের অফিস খুললে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সাইন বোর্ডটা সে রাখবে। সুধীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে, তার নিজের সাইনবোর্ডটার পিছনে উল্টো ক'রে সেটাকে ঢুকিয়ে রাখবে সে। হলদে জমিতে নীল হরফে লেখা অটোমোবিল রিপেয়ারিং ওয়ার্ক্‌স্‌—জগন্নাথ কারখানায় ঢুকবার সময় একবার ও বেরিয়ে যাবার সময় একবার দেখত, চোখদুটো জুড়িয়ে যেত তার। এটাকে ঐ টিন-টুকুর দামে বেচে দেওয়া যায় কখনো?

একটা টিনের কৌটায় কারখানার একটু মাটি তুলে রেখেছে জগন্নাথ তার টেবিলের দেরাজে। বাড়ী যাবার সময় নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। রেখে দেবে তার শোবার ঘরের একটা কুলুঙ্গিতে। মাসীকে বলা হবে না কথাটা, কারণ মাসী শুনলে হাসবে।

যে লোকগুলোর সঙ্গে সে কাজ করত তাদেরই কি সে ভালবাসত কম? আশ্চর্য্য যে তারা সেটা জানে না। এই বারো তেরো বছর বয়সের জোগানদার ছেলেগুলো, বস্তি-পাড়ার পোড়ো জমিটাতে যখন কাজ হত তখন থেকে যাদের অনেকে তার সঙ্গে আছে; কোঁকড়া চুলওয়ালা দিলীপ, যার বারো মাসই গলা ভেঙে থাকে; ট্যারা-চোখো রঘু, যার খালিখালি খিদে পায়; থলথলে মোটা নারাণ, যে ফাঁক পেলেই যেখানে সেখানে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয় তাল-পাতার সেপাই তিরিক্ষি মেজাজের পিন্টু, অন্য ছেলেগুলোর সঙ্গে যার কথায় কথায় ঝগড়া মারামারি বেধে যায়; এদের কাল থেকে সে আর দেখতে পাবে না ভেবে তার চোখে জল আসছে। অন্য মিস্ত্রিদের সঙ্গেও এই তার শেষ দেখা ভাবতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। বডির মিস্ত্রি, ইঞ্জিনের মিস্ত্রি, ক্লাচ ষ্টিয়ারিং ব্রেকের মিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, ঝালাই মিস্ত্রি, লকের মিস্ত্রি, রঙের মিস্ত্রি এরা সবাই যে জগন্নাথের কথায় খুব বাধ্য ছিল তা নয়, এক-একজন তর্ক করত খুব, কিন্তু অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করে করে এরাও তার আত্মীয়ের মত হয়ে গিয়েছিল।

সকলকেই সে অবশ্য বলে রেখেছে ভাল কাজ যদি কোথাও পাও, নিয়ে নাও। কিন্তু আমি ডাকলে ফিরে এসো। তারাও বলেছে আসবে। কেন বলবে না? আসতে হতেও ত পারে? আবার না-ও পারে। কোথায় কিরকম কাজ জোটে তার উপর সেটা নির্ভর করছে। তুমি ডাকছ বলেই তোমার কাছে কেন আসবে তারা? তুমি কে? জগন্নাথ মিস্ত্রি? তা এই গোপাল মিস্ত্রি, দুলাল মিস্ত্রি, যুগল মিস্ত্রি এরা তোমার চেয়ে কম কিসে? তবে হ্যাঁ, এরা যা দিচ্ছে তার থেকে দুটো টাকাও যদি তুমি বেশী দিতে পার ত সে আলাদা কথা।

জগন্নাথের বুকের ভিতরটায় এই কদিন ধরেই একটা টনটনে ব্যথা। ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারলে হয়ত ভাল বোধ করত; সেটা পারে না বলে ব্যথাটা ক্রমশঃ বাড়ছে। তার উপর চারদিক্ থেকে খদ্দেরদের, দোকানদারদের, অন্য কারখানার মিস্ত্রিদের প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, কি হল, কি হয়েছে, অমন একটা চালু কারখানা উঠিয়ে দিচ্ছ কেন? নির্ম্মলা সংক্রান্ত ব্যাপার কিছু একটা আছে এর মধ্যে এটাও আঁচ করেছে কেউ কেউ, আর সেইটেই সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছে তার।

এই যে তার এত দুর্ভোগ এর মূলে আছে একটা মানুষ, সুধাকান্ত। শুয়ারকা বাচ্চা। গালটা ওকে শুনিয়ে দিতে পারলে ভাল হত।

ক্রমশঃ

বাঙালীর স্বাধীনতা উৎসবে "ধনঞ্জয় পর্ব্ব"

কালীচরণ ঘোষ

ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আলোচনা ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছিল, বলা যায়, কংগ্রেসেরও আগে থেকে, তবে সবই মোলায়েম, খুব হিসেব করে কথাবার্তা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহারাষ্ট্র যে কেবল গরম বুলি আউড়েছে তা নয়, অত্যাচারীকে বধ করে বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় দিয়েছে।

বাঙলা বেশ সজাগ হয়ে উঠেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মুখে যাইই বলা যাক্, ১৯০২ সালে যা নৈতিক সংস্থা গঠনের জন্য অরবিন্দর বরোদা থেকে আগমন এবং সতীশ বসু ও পি মিত্রের অনুশীলন সমিতি গঠন পরবর্ত্তী "ধনঞ্জয়" পর্ব্বর আভাস দিয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ বার্ত্তা এর কিছু পরের কাহিনী। তাতেই বাঙলা বেশ গরম হয়ে উঠলো। এতেও ততটা হয় নি, যতটা হলো (১৪ এপ্রিল ১৯০৬) বরিশাল কন্‌ফারেন্সের পর। তখন 'ফিরিয়ে মারা'র কর্ম্মসূচী প্রকাশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং "সন্ধ্যা" 'যুগান্তর' "নব শক্তি" ত বটেই, মাঝে মাঝে "ভারতী" "হিত বাদী" প্রভৃতি পত্রিকা এ নীতি প্রকাশ্যে সমর্থন করতে আরম্ভ করেছিল।

এরেরও আগে, এমন কি বঙ্গ বিভাগ পাকাপোক্ত ভাবে গৃহীত হবারও আগে, একটি প্রায় অবজ্ঞাত, অজ্ঞাত ত বটেই, পত্রিকা নতুন সুরে গান ধরেছিল. তার নামটিও বেশ "প্রতিজ্ঞা"। যাঁরা পত্র পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের অনেককে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে তাঁরাও এর সংবাদ পান নি।

বঙ্গভঙ্গর চার মাস আগে ১৯০৫ এর ২৭ জুলাই 'প্রতিজ্ঞা' এক কবিতা প্রকাশ করে। সূচীভেদ্য তামসী রজনী, সমস্ত নভোমণ্ডল গভীর মেঘাচ্ছন্ন, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ গুরু রামদাস স্বামী আর শিষ্য শিবাজী মহারাজ পরস্পরের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

"জাতির ও ব্যক্তির কল্যাণ কি উপায়ে সম্ভব?" জিজ্ঞাসা করলেন শিবাজী। গুরুর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শিষ্য ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখালেন, খরতরবাল হস্তে ভারত-মাতা দণ্ডায়মানা, আস্যে মৃদু হাস্য। ইঙ্গিতে অসি দেখিয়ে বলছেন "জগতের মাঝে এই এক বস্তু সনাতন সত্য।"

শিবাজী শুনলেন বহু দেববালার কণ্ঠে সমবেত সঙ্গীত। তার ভাষায় রয়েছে তরবারির অজস্র গুণগান। "সকল অত্যাচার হতে মুক্তি সাধনে, দেশের শান্তি রক্ষায়, শ্রীসম্পদ বৃদ্ধির সহায়তায়, মানুষের সকল কামনা বাসনা পূর্ণ করতে এই তরবারিই একমাত্র আশ্রয়স্থল।"

বুঝতে কষ্ট হয় না, ঘনতমসাবৃত রাত্রি দ্বারা ইংরেজ শাসনকে উদ্দেশ করা হয়েছে, বাকীটা স্বাধীনতা লাভের পথ নির্দ্দেশ করছে।

হয়ত এ কবিতার মর্ম্ম নিয়ে মতদ্বৈধ হতে পারে, কিন্তু ৩০ আগষ্ট (১৯০৫) একই সঙ্গে একটি কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কবিতা বলছে "কেবল প্রার্থনা দ্বারা ও অপরের দাক্ষিণ্যে দেশের দুর্দ্দশা দূর হবে না। শক্তির আরাধনাই স্বাধীনতার এক মাত্র পথ। অতএব অস্ত্র ধারণ কর এবং দেশমাতৃকার ঋণ পরিশোধে কৃতসঙ্কল্প হও। অনাহারে ধীরে ধীরে যখন মৃত্যু অভিমুখে যাত্রা সুরু হয়েছে, তখন রণভূমে তরবারি হস্তে মরণে আর ভয় কেন? এ মৃত্যু স্বর্গে তোমায় অমৃতত্ব দান করবে। বিদেশী শত্রুর রক্তপাতে প্রতিহিংসা গ্রহণ কর, যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হও, প্রচণ্ড নিনাদে যুদ্ধ ঘোষণা করে ত্বরিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হও।"

ঐ সংখ্যাতেই প্রকাশিত প্রবন্ধে বক্তব্য অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হয়েছে। বলা হচ্ছে "যখন অপর সকল প্রক্রিয়া বিফল হয়, তখন এক প্রহারেই বাঞ্ছিত ফল

প্রদানে সমর্থ। অন্ত কোনো ব্যবস্থাই ইহার সমকক্ষ নয়।" উদাহরণের সঙ্গে একটা প্রয়োগ ক্ষেত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র পাল এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, সাধারণ পোষাকে উপস্থিত পুলিশ সে বক্তৃতার নোট নিচ্ছে। তখন "প্রতিজ্ঞা" যুবকদের উদ্দেশ করে বলছে যে পুলিশ যখন সাধারণ নাগরিক পরিচ্ছদে এসেছে, তখন তাদের উত্তম মধ্যম কয়েক ঘা দেওয়া উচিত ছিল।"

সে যুগে এ সকল কথা সাহস করে বলবার বা পত্র পত্রিকায় লেখার সাহস বিশেষ কারও ছিল না। পরে উগ্রজাতীয়তার গন্ধ পাওয়া গেছে। "প্রতিজ্ঞা"কে সে হিসাবে "ধনঞ্জয়" ভাবধারার অগ্রদূত বলা যেতে পারে। "সন্ধ্যা" অবশ্য এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে, ২৬ নভেম্বর ১৯০৪; কিন্তু তার ভাষণ উগ্র হয়েছে ১৯০৬ এর এপ্রিল থেকে। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে অনাদৃত পত্রিকার অবদান স্মরণ করছি। পরিচালক ও প্রবন্ধ লেখকদের দেশপ্রেম প্রাণখোলা ভাষায় প্রকাশের সৎসাহস আজও মনকে উদ্বেল করে তোলে। কেবল মনে প্রশ্ন ওঠে "এঁরা কারা?"

পত্রিকা না হলেও অজ্ঞাত পরিচয় কে বা কাহারা ঐ একই সময় এক খানি ক্ষুদ্র ইস্তাহার প্রকাশ করে। উত্তরকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার জন্ত এখানে তার উল্লেখ করলাম। দৈনিক "হিতবাদী" ৫ আগষ্ট (১৯০৫) ইহা মুদ্রিত করে। ৩ আগষ্ট ষ্টার থিয়েটার হলে বিপিনচন্দ্র পাল একটি বক্তৃতা দেন। লোক সমাগমের সুযোগ নিয়ে অজ্ঞাত যুবকরা ইহা বিতরণ করে।

তার প্রথমেই বলা হয়েছে প্রকৃতির নিয়মে স্বাধীনতাই সর্ব্ব জীবের চরম লক্ষ্য এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর স্বাধীনতাহীন মানুষ জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করতে স্ব-নিয়ন্ত্রণ, স্ব-রাজ, অবশ্য প্রয়োজন।

যাঁরা এই রক্তাক্তিত পথে নিজেরা চলেছেন, অপরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টার সুরু আলোচনা করলে বিস্ময়ান্বিত হতে হয় যে এই ক্ষীণ ধারা পরে কি বিশালতা লাভ করেছিল, যাতে শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে।

বনেদী ঢাকী

গল্প

অমল হালদার

টা-কি-টি-টি-নে···।

কাঠি দু'টোর নাচে বোল উঠছে। দ্রুত লয়ে ঢাক বাজাচ্ছে ভুষণমালী। মহিষাসুর বধ হবে। তাই বলির বাজনা বাজছে। লোম চামড়া জড়ানো দু'হাত বজ্র-কঠিন হয়ে উঠেছে থেকে থেকে। বেগলাভুরুর নীচের দু'চোখ চক্কর দিয়ে আসছে চতুর্দিকে। মেলার দোকান পসরার ক্রেতা থেকে সুরু করে নাগরদোলা ঘোড়-দৌড়ের শিশু-আরোহীরা অবধি এসে জুটছে। পূজোর দিন জমছে ভালো। সমবয়সীর দর্শকরা রাস্তা ফুটপাথ জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। তন্ময় হয়ে দেখছে চরম মুহূর্ত, আগমনের প্রতীক্ষা।

যুদ্ধ চলছে। ভুষণ মালীর ন-দশ বছরের নাতি দুটি ত্রিশূল খড়্গ নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে। ওদের জোড়া পায়ের ঘুঙুর মুখর হয়ে উঠছে ঢাকের কাঠির তালে তালে। ভুষণমালীর বাঁ পাশে বিছানো লাল গামছাটা খুচরো পয়সায় ভরে উঠছে। নাচ দেখে পথিকদের খুশির ইনাম ওগুলো। মাঝে মাঝে ওদিকেও চোখ রাখছে ভুষণমালী, ও থেকে কেউ না সরায় কিছু। দু একজন—উদারমনা অতি উল্লাসী দর্শক আবার পয়সার গাদায় সিকি ছুঁড়ে ফেলছে। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকে হাসছে ভুষণমালী। জলজল করে উঠছে দু'চোখ, মাথা নীচু করে ধন্যবাদ অভিবাদন জানাচ্ছে।

মহিষাসুরকে বধ করতে দুর্গাবেশী নাতিটি ত্রিশূল উঁচিয়েছে—সবে, সহসা বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। নাচের ছন্দপতন ঘটল। দুর্গা মহিষাসুরের নাতি দু'জন হতবাক্ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। সত্রাস দৃষ্টি ফেরালো দাদুর দিকে। কোথায় কিছু ভুল হল নাকি।

বিরক্তিতে মুখখানা ছেয়ে গেছে ভুষণমালীর। উৎকর্ণ হয়ে শুনছে উত্তরদিকের ভেসে-আসা বাজনা। ঢাকের বাজনা ঢং—ঢানা-ঢানা ঢাকি ঢিম-ঢম।

বাজনা যতো কানে আসছে, অস্থির হয়ে পড়ছে ততো ভুষণমালী। নিজের মনে মনেই মুণ্ডপাত করছে বাজিয়ের দন্তবিহীন মাড়িতে মাড়ি চেপে···।

বেকুব কোথাকার। এইদিনে এই বাজনা বাজায় কেউ। দর্শকদের অনেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে শেষের মুখোমুখি থেমে যাওয়ায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ছোকরা ব্যঙ্গ মন্তব্য ছুঁড়ে মারতেও কসুর করল না। কিহে কর্তা, হাঁপিয়ে পড়লে নাকি?

পাড়ায়-পাড়ায় রাস্তায়-রাস্তায় মেলা-পার্ব্বণে অভিনয়-নৃত্য দেখিয়ে পয়সা রোজগারের ফন্দিটা মাথায় আসে ভুষণমালীর গত বছরের নির্ম্মম হেনস্তার পর থেকে। বর্ত্তমান জীবন-যাপন অধ্যায়ের যোগাযোগটা ঘটেছিল তখন যেন আকস্মিক ভাবেই—বিধির বিধানে।

আগে চৌমাথার মোড়ে ফুটপাথে ঢাক নিয়ে বসতো ভুষণমালী দুর্গাপূজোর সময়।

আসতো অনেকে তার কাছে। তাকে দিয়ে ঢাক বাজিয়ে পরখ্ করে, শেষে বলতো বিরাট মণ্ডপে ঢকঢকে বুড়োকে মানাবে না মোটে। সকলের নাচের সঙ্গে পাল্লা দিতে ও পারবে না। তার চেয়ে মাইকের বাজনা রাখাই ভালো। কেউ কেউ এমন দক্ষিণা দিতে চাইতো···।

বিনি পয়সার বাজানোরই সামিল। এসব তো আজকাল অচলই—তবে সাহায্য না করলে, না খেতে পেয়ে মারা যাবে তাই…।

ভূষণমালীর ওস্তাদী-বনেদি ঘরানার মর্ম না বোঝায় বাজনার মূল্যাধার্য্যের বহর দেখে, সে ব্যথিত হত। তার চেয়ে এমনি বাজিয়ে আসবোখন। পয়সা লাগবে না।

বাবুর দল চটে গিয়ে মারমুখী হত। আমাদের ভিখারি ভাবা! ক্ষমা চাইয়ে কলহের মীমাংসা করে দিতো। নিত্যকার এসব ঘটনা গা-সওয়া হয়ে আসছিল, এমন সময় একদিন একটি ধনী বিধবার গাড়ী এসে দাঁড়াল ফুটপাথের ধারে। ড্রাইভারের ইংগিতে গাড়ীর সামনে এলো ভূষণমালী। পূজোর চারদিন বাজাবার জন্মে টাকা রফা হয়ে গেল। পাওনাগণ্ডার সংখ্যা আশানুরূপ না হলেও, মালীর দিনে দর চড়িয়ে বসে থাকলে সংসার চলেবে না।

মাথা চুলকে, অনেকক্ষণ চিন্তা করে মোটর ছাড়বার মুখে বিধবা গিন্নীর কথায়ই রাজী হল-ভূষণমালী—বুকের দোষের জন্মে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেল ছেলেটা, না হলে দু-পয়সার জন্মে এতো হীনতা স্বীকার করতে হত না কারো কাছ থেকে।

নবমীর সন্ধ্যা-আরতি হচ্ছে নাটমন্দিরে। আঙিনায় ঢাক বাজাচ্ছে ভূষণমালী। আরতির বাজনা চোখ বুজে মনের চোখে ধ্যান করছে, মা যেন হাসছেন, হাত বাড়িয়ে অভয় জানাচ্ছেন সকলকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাজনার সঙ্গে নাচছে ভূষণমালী। হঠাৎ বজ্রপাত হল মাথায়। একি শুনছে সে? এতোখানি বয়সে—আজ পর্য্যন্ত কেউ তো একথা বলেনি তাকে।

চোখ চেয়ে দেখলে। বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল। বাজনার কাঠি স্তব্ধ। ধনী বিধবা গিন্নী সামনে দাঁড়িয়ে। রক্তচক্ষু, অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে মুখ দিয়ে। ভূষণমালীর সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। নেশার ঝোঁকে নাচতে নাচতে ঢাকের পালকটা গায়ে ছুঁইয়ে দিলি একেবারে?

……ছোট জাত হয়ে ছুঁলি কোন্ আক্কেলে। ঘেন্না ঘেন্না। কি পোড়াভাগ্য। মায়ের আরতি দেখতে এসেও দেখা হলো না। ভরসন্ধ্যায় গঙ্গাচান করে শুদ্ধ হতে হবে এখনি।

বাপঠাকুরদার মুখে শুনে এসেছে ভূষণমালী, তারা ইন্দ্রের দেবসভার নর্ত্তক-নট ছিল পুরাণের মতে।

তারা গন্ধর্ব্ব, তারা ভরদ্বাজ ঋষির শিষ্য। তবু ঘৃণা! বাজনা-বাজাবে না আর কিছুতেই ভূষণমালী এখানে। প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবন থাকতে কখনো কোনো দেবী-পূজোয়ও না। নাকে কানে খৎ দিয়ে স্থান ত্যাগ করেছিল সেই মুহূর্ত্তে কোনো পারিশ্রমিক না নিয়েই।

এই আভিজাত্য আত্মসম্মানের গর্ব্বই ভূষণমালীর যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের পথে প্রবল বাধা হয়ে দেখা দিল। অভাব দশবাহু বাড়িয়ে দিল তার দিকে। পিষে মারতে লাগল। শেষে উপায়ান্তর না দেখে, ধার দেনা করে সংসার চালাবার জন্মে—দেশের জানাশোনা লোকদের দ্বারে দ্বারে ধরণা দিতে হল। একজন বিশিষ্ট বন্ধু পরামর্শ দিল যাত্রাপার্টিতে ঢাক বাজাতে। যাত্রাপার্টি 'ফুল্লরা' বই অভিনয় করছে। দেবীর আবির্ভাব অভিনয়ের সময় ঢাক বাজাতে হবে।

একাজে নিযুক্ত হতে একটু ইতঃস্তত করলে প্রথমে ভূষণমালী। একদিন তাদের পূর্ব্বপুরুষরা দেবী পূজোয়ই বাজনা বাজাতো। গ্রামের দেশের লোকের ধন্যি-ধন্যি করতো বাজনা শুনে। বলতো সকলে, বাজনা যেন স্বর্গের দেবীকে মর্ত্তের মানবের কাছে টেনে নিয়ে আসে। স্বর্গমর্ত্ত্যের মিলন ঘটায়। মাটির প্রতিমা জ্যান্ত হয়ে ওঠে। সে যুগও নেই, মানুষের মনের সে চোখও নেই।

ভূষণ মালীকে চুপ করে থাকতে দেখে, উপদেষ্টা বললে, ভাবছো যা বুঝেছি। দ্বিধা করছো কেন? এও তো দেবী-মাহাত্ম্য প্রচারের বই। এতে অভিনয়ের সঙ্গে বাজনা—একরকম দেবীরই আরাধনা করা—গুণগান করা।

মনে মেনে না নিলেও, "সুন্দরা" বইয়ে বাজনা বাজাতে রাজী হল ভূষণ মালী। দুটি ছেলে দুর্গা মহিষাসুর সেজে নাচতো তার বাজনার তালে তালে। নাট্যামোদিরা মুহুর্মুহু হাততালি দিয়ে হর্ষ প্রকাশ করতো। যাত্রা পার্টিতে থাকতে থাকতে স্বতন্ত্র ব্যবসা করবার চিন্তা পেয়ে বসল ভূষণ মালীকে। নাতিদের শেখানো হল দুর্গা-অসুরের অভিনয়-যুদ্ধনৃত্য। তারপর রাস্তাঘাটে সর্বত্রই চলল সেই নৃত্য-দৃশ্যের অবতারণা। প্রতিদিনের আয়ে সংসারের সচ্ছল অবস্থা ফিরে এলো না বটে, কিন্তু দৈন্য ঘুচল কিছু ভূষণ মালীর।

দ্বিতীয় বারেও মহিষাসুরবধ-নৃত্য শেষ করা হল না ভূষণ মালীর। নাতিদের নাচের মাঝ পথে আবার বাজনা থমকালো। দর্শকদের কতক কটূক্তি করতে করতে চলে গেল—খালি পয়সা লুটবার চেষ্টা—দেখাবার কিছু নেই, ধূর্ত বুড়োর চালাকি কেবল—শেষের মুখে থেমে গিয়ে লোক টানা।

দর্শক-মহলের এই সমস্ত চোখাচোখা বাক্যবাণের একটাও প্রবেশ করল না ভূষণ মালীর কানে।

সেখানে আগের সেই উত্তরের ঢাকের বাজনা এসে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে আবার। এতো জোরে যে কানের পর্দা ছেঁড়বার উপক্রম হচ্ছে যেন! নিজের অগোচরে দুকানে হাত চেপে ধরল ভূষণ মালী।

জনতার অনেকেই ভেবে নিলে, এও বুঝি অভিনয়ের নতুন একটা ভঙ্গী। নাতিরা হতভম্ব—এতদিন নাচের আসরে দাদুকে দেখছে। এরকম অবস্থা তো দেখিনি বড়। বিব্রত হয়ে পড়েছে ভূষণ মালী। এক নতুন অনুভূতি, নতুন অভিজ্ঞতা বুকে মাথায় দাপাদাপি করছে। আত্মদর্শন হচ্ছে যেন ভূষণ মালীর। এর আগে কখনো এমনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে নি। এখন আশ্চর্য ভাবে পারছে—তার বংশ পূর্বপুরুষ রক্ত মজ্জা হৃৎপিণ্ড প্রাণ সব কিছুই এই ঢাকের বাজনা। দেবী পুজো আর নির্ভুল বাজনা যুগ-যুগান্তর অভিন্ন সম্বন্ধ। মনে পড়ে গেল ভূষণ মালীর পুজোর ক্ষণ চলার সময় এটা। এক্ষণে বাজনা না বাজিয়ে কখনো জলগ্রহণ করেনি সে। মহাক্ষণ হারাবার আশঙ্কায় হাহাকারে ভরে উঠল মন। এসময় মা আসবেন—আসবেন ঢাকের আবাহন বাজনায়।

সর্বনাশ ডেকে আনছে উত্তরের ঢাকী, বিসর্জনের বোল বাজিয়ে। অস্ফুট কথা ক'টি বেরিয়ে এলো ভূষণ মালীর মুখ থেকে। চোখের নিমিষে পালক-লাগানো ঢাকের দড়িটা কাঁধে গলিয়ে নিলে ভূষণ মালী। সংগে আসতে ইশারা করলে নাতিদের।

উত্তরমুখো চলছে ভূষণ মালী। দাদু!···পয়সা পড়ে রইল, নাতিদের কচি গলার আওয়াজ ডুবে যাচ্ছে ভূষণ মালীর ঢাকের বাজনায়। আবাহনের বাজনা বাজছে—টিন—নাকি—নাকি—টিন—টাকি টিনে—টিটি টিনে টিন······।

চণ্ডীদাস নানুরের কথা

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র চট্টরাজ

চণ্ডীদাস শব্দ শ্রবণ করিলেই আজও মনে পড়িয়া যায় তাঁর সেই অমর বাণী।

কহে চণ্ডীদাস—

শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপর নাই,

এই অমূল্য বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের গণতন্ত্র, ভারতীয় সংবিধানের মূল কথাই ওই বাণী।

চণ্ডীদাসের তিরোধানের পর কয়েকশত বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বুকের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতন চলিয়াছে, কিন্তু শত অত্যাচার লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সত্ত্বেও মানুষ চণ্ডীদাসের এই বাণী বিস্মৃত হন নাই, তাই আজও জনচিত্তে চণ্ডীদাস অমর।

এই চণ্ডীদাসের লীলাভূমি নান্নুর। নান্নুর বীরভূম জেলার সদর সিউরি মহকুমার অন্তর্গত পল্লীগ্রাম। গ্রামটির বর্তমান নাম—চণ্ডীদাস নান্নুর।

এই নান্নুর ইষ্টার্ণ রেলপথের বোলপুর ষ্টেশন হইতে বারো মাইল পূর্বে এবং আহম্মদপুর কাটোয়া রেল-পথের কীর্ণাহার ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে। বর্তমানে বোলপুর হইতে কীর্ণাহার ভায়া নানুর বাস-সার্ভিস চালু আছে এবং বোলপুর এবং কীর্ণাহার রেল ষ্টেশনে নামিয়া অনায়াসে বাসে এখানে আসা যায়। পূর্বে এই রাস্তা দুর্গম ছিল, বাস তো দূরের কথা, গোরুর গাড়ী চলাও সহজ ছিল না। বর্তমানে এই গ্রামকে কেহই নান্নুর বলে না। চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত এই গ্রাম চণ্ডীদাস নানুর নামে পরিচিত।

শুধু গ্রামের ক্ষেত্রেই নহে, চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত এই তীর্থক্ষেত্র নানুরের সহিত চণ্ডীদাস ও রামীর নাম যুক্ত করিয়া তাহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য এখানকার পোষ্ট-অফিসটি নানুরে স্থাপিত হইয়াছে এবং চণ্ডীদাসের নামে উক্ত পোষ্ট-অফিসটির নাম—চণ্ডীদাস নানুর পোষ্টঅফিস রাখা হইয়াছে। পূর্বে উক্ত পোষ্ট-অফিসটি নানুরের পশ্চিমে সাকুলিপুর গ্রামে ছিল।

নানুর গ্রামনিবাসী ৺অনাদিকিংকর রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্য্যায়ে উন্নতী হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টির সংগেও চণ্ডীদাসের নাম যোগ করিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাস স্মৃতি হিসাবে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামকরণ করা হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টির সংগে রামী অর্থাৎ রামমণির নাম যুক্ত করিয়া রামী স্মৃতি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় রাখা হইয়াছে। ৺অনাদিকিংকর রায় মহাশয় নানুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন নান্নুরে দুইটি তোরণ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

একটির নাম চণ্ডীদাস স্মৃতি তোরণ। এই তোরণটি নানুর থানার নিকট ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তা হইতে যে রাস্তাটি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত গ্রাম্য রাস্তার উপর তাহা নির্মিত।

অপর তোরণটির নাম—রামী স্মৃতি তোরণ কীর্ণাহার হইতে নানুর আসিতে প্রথম গ্রাম্য রাস্তা যাহা উক্ত রায় মহাশয়দের বাড়ির ধার দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, উক্ত রাস্তার ওপর এই রামী স্মৃতি তোরণটি নির্মিত।

শোনা যায়, স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় যখন বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি সাকুলিপুর গ্রাম হইতে থানা নানুরে লইয়া আসেন এবং নানুর থানা নামকরণ করেন।

চণ্ডীদাস ও রামীর স্মৃতিবিজড়িত এই তীর্থস্থানে প্রতি বৎসর অসংখ্য দর্শক আসেন।

বর্তমানে দর্শনযোগ্য যা কিছু আছে, তাহার মধ্যে প্রথম হইল বিশালাক্ষী মূর্তি। এই বিশালাক্ষী দেবীর পূজক হইয়াই চণ্ডীদাস নান্নুরে আসেন।

এই মূর্তি চতুর্ভুজ শীলা মূর্তি।

এই বিশালাক্ষী মন্দিরের পূর্ব পশ্চিম এবং দক্ষিণে কয়েকটি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে নির্মিত শিব মন্দির এবং ইহার দক্ষিণে এক উঁচু বিরাট ঢিবি আছে।

কথিত আছে এই ঢিবির নীচে পূর্বের বিশালাক্ষী মন্দির নাটমন্দির এবং চণ্ডীদাসের বাসভূমি ছিল, পূর্বে নাকি এই ঢিবি আরও উঁচু ছিল এবং ঢিবির উপর জংগল ছিল। এখন অবশ্য জংগল নাই। জনশ্রুতি সন্ধ্যাবেলায় এই ঢিবির উপর প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে বর্ধমান জেলার মংগল কোট হইতে ইহার আলোর শিখা দেখা যাইত। ইহা সত্য না হইলেও, এই কথা হইতে ঢিবি যে অনেক উঁচু ছিল তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

বিশালাক্ষী মন্দির শিব মন্দির সমূহ এই ঢিবি সরকার কর্তৃক প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ আইন অনুসারে কাঁটাতারের বেষ্টনী দ্বারা সংরক্ষিত আছে।

বিশালাক্ষী মূর্তি এবং ওই ঢিবি প্রধান দর্শনীয় জিনিষের পর্য্যায়ে পড়ে।

দ্বিতীয় দর্শনযোগ্য বস্তু হইল—একখানি পাটা। কিংবদন্তী রামী এই পাটায় কাপড় কাচিতেন। এই পাটা কয়েকশত বৎসর ধরিয়া নান্নুর থানার পার্শ্বে দাঁতার (অন্য নাম দ্যাঁওতা) পুষ্করিণীর পাড়ে পড়িয়া ছিল।

পাছে এই ভাবে পড়িয়া থাকায় পাটাখানি হারাইয়া যায় অথবা চুরি যায় ওইজন্য এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ে একটি ছোট থাম নির্মাণ করাইয়া ওই থামের সংগে পাটাটিকে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছে। ওই পাটাটির বিশেষত্ব আছে। ইহা দেখিতে কাঠের পাটার মত কিন্তু আঘাত করিলে পাথরে ঘা দিলে যেমন শব্দ হয় সেই রকম শব্দ পাওয়া যায়।

এই পুষ্করিণী সম্বন্ধেও কিংবদন্তী আছে।

জনশ্রুতি এই দ্যাঁওতা মজিয়া যাওয়া অজয়ের অংশ। এককালে অজয় নদী নান্নুর গ্রামের এক ধারে ছিল।

এই অঞ্চল দিয়া অজয় নদী প্রবাহিত হইত কিনা অথবা কতদূরে ছিল তাহা আজকের দিনে বলা কঠিন। নান্নুর হইতে মাইল চারেক দূরে বন্দর নামে একটি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামের ধার দিয়া একটি বড় কাঁদর প্রবাহিত। জনসাধারণের মুখে শোনা যায়—এই কাঁদরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খোঁড়ার সময় নৌকার অংশবিশেষ নাকি পাওয়া গিয়াছিল। আবার বন্দর নাম হইতেই বোঝা যায় এই স্থান কোন নাব্য নদীর বন্দর ছিল। কালে গ্রামে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে নান্নুর হইতে অজয় নদীর দূরত্ব আনুমানিক বারো মাইল।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ বীরভূম এবং বর্ধমান জেলায় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক স্মৃতিবিজড়িত স্থান সমূহ পর্যবেক্ষণ এবং খনন করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন।

বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত রাজার ঢিবি খননের ফলে জানা গিয়াছে, খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে এই অজয় উপত্যকায় সুরুচিসম্পন্ন সুসভ্য মানুষের বাস ছিল।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালাইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, বেলহাটি ও কীর্ণাহারে যেসব নিদর্শন দেখা যায় তাহা হইতে বোঝা যায় এই এলাকাতেও বহু পূর্বে সুসভ্য মানুষ বসবাস করিত এবং তাঁহারা শিক্ষিত রুচিবান ও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। এই বেলহাটি গ্রাম বোলপুর কীর্ণাহার রাস্তার উপর অবস্থিত।

এই বেলহাটি গ্রাম সম্বন্ধেও কিংবদন্তী আছে। জনশ্রুতি, এই বেলহাটিতেই নাকি কালিদাস সরস্বতীর আরাধনা করিয়া বাণীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস হইয়াছিলেন।

এখানে যে কিংবদন্তী চলিত আছে তাহা হইল—যখন উজ্জয়িনীর রাজকন্যার সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলী এই পথ দিয়া ফিরিতেছিলেন তখন মূর্খ কালিদাস একটি গাছের ডাল কাটিতেছিলেন। কালিদাস যে ডালটি কাটিতেছিলেন তাহারই শেষ প্রান্তে তিনি বসিয়াছিলেন।

ডালটি কাটিলেই নীচে পড়িয়া যাইবেন এ টুকু সাধারণ জ্ঞানও তাঁহার ছিলনা। পণ্ডিতমণ্ডলী এই মূর্খের কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। উজ্জয়িনীর রাজকুমারীর অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কলে-কৌশলে এই মূর্খের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ ঘটাইয়া দিলেন।

বিবাহের রাত্রে বাসর-ঘরে কালিদাসের বিদ্যার কথা জানিতে পারিয়া রাজকুমারী শয়ন-কক্ষ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দেন।

জনশ্রুতি, কালিদাস এই বেলহাটি ফিরিয়া আসিয়া মা সরস্বতীর আরাধনা করেন এবং মায়ের কৃপায় বাণীর বরপুত্র হন।

জনশ্রুতি অনুসারে বোলপুর নানুর রাস্তার ওপর আরও একটি পবিত্র স্থান আছে।

বোলপুর হইতে কীর্ণাহার আসিতে চার মাইলের মধ্যে সিয়ান নামে একখানি গ্রাম আছে।

এই সিয়ানে 'মুনিতলা' নামে একটি ঢিবি আছে। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে মেলা বসে।

এটি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই—রাজা দশরথ যখন অপুত্রক ছিলেন তখন এই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিই দশরথের সন্তান কামনায় অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এই সব কিংবদন্তীর মূলে কতখানি সত্য আছে অথবা আদৌ সত্য আছে কিনা তাহা বলা কঠিন।

কিন্তু এই সব জনশ্রুতি অথবা কিংবদন্তীর বিষয়ে একটি মিল রহিয়াছে।

অজয় উপত্যকার এই সব অঞ্চলের সংগে মিথিলা অযোধ্যা ও উজ্জয়িনীর সংগে যে একটা যোগসূত্র ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

বেলহাটির কবি কালিদাসের সংগে উজ্জয়িনীর রাজ-কন্যার বিবাহের কিংবদন্তী আছে, সিয়ানের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সংগে অযোধ্যার রাজা দশরথের যোগ রহিয়াছে এবং চণ্ডীদাসের সংগে মিথিলার রাজা শিব সিংহের রাজকবি বিদ্যাপতির যোগ রহিয়াছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সংগে সাক্ষাৎ করিবার জন্য নানুর আসিতেছিলেন, চণ্ডীদাস রচিত পদ হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি।

কিংবদন্তী সত্য হউক অথবা মিথ্যা হউক, এই অজয় উপত্যকা অঞ্চলের সহিত ভারতবর্ষের মিথিলা মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের মানুষের চিন্তাধারা রুচি এবং সংস্কৃতিতে একটা মিল ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

এইবার বিশালাক্ষী মূর্তি এবং মন্দির সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

বিশালাক্ষী মূর্তি বহুকাল পূর্বের।

বর্তমানে যেখানে নানুর গ্রাম তাহার পশ্চিম দিকে মাঠ।

বহুকাল পূর্বে ওই মাঠের মধ্যে কোন এক রাজা বাস করিতেন। ঐ রাজা বিশালাক্ষী মন্দির নির্মান করাইয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ওই রাজার প্রাসাদ বহুপূর্বে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং বর্তমানে তাহার কোন চিহ্নই নাই।

অনুমান করা যায় বর্তমানে যে ঢিবি অথবা ভগ্নস্তূপ দেখা যায় তাহা বিশালাক্ষীর মন্দিরের ভগ্নস্তূপ।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই ঢিবিটির উপর খনন কার্য চালাইয়াছিলেন। তাহার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ওই সময় নরকংকাল এবং গুপ্ত যুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

ওই ঢিবির অন্তরালেই যে নানুরের পূর্ব ইতিহাস এবং চণ্ডীদাস রহস্য নিহিত আছে ঢিবি দেখিলেই অনুমান করা যায়।

চণ্ডীদাস নানুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও জনশ্রুতি সম্বন্ধে যাহা জানা ছিল তাহা বলিলাম।

এইবার চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলার বিদগ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ে বহু আলোচনা ও সমালোচনা করিয়াছেন, কাজেই সে সম্বন্ধে আমার আর নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই।

নানুরের চণ্ডীদাস কোন্ চণ্ডীদাস, মহাপ্রভু কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন, বিদ্যাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কোন্ চণ্ডীদাসের ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। নানুরের অধিবাসীরা বলেন, এখানকার চণ্ডীদাস দ্বিজ চণ্ডীদাস, যাঁহার পদাবলী বাংলা সাহিত্যের জগতে ভক্তের অন্তরে যুগ যুগ ধরিয়া চির নূতন থাকিবে।

বিদ্রোহী ইঞ্জিনিয়ার মোহম্মদ আলী খাঁ

অনাথবন্ধু দত্ত

ইহা একটি মিউটিনির গল্প। মিউটিনি নহে, ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম। আর এটি গল্পও নহে, সত্য ঘটনা। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক বিভাগের সার্জেণ্ট ফরবেস্-মিচেল তাঁহার জীবনস্মৃতিতে।

১৮৫৮ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষে উনাওর ইংরেজ-শিবিরে গুপ্তচরের কার্য্যাপরাধে একজন খুব সুপুরুষ, সুন্দর ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত এক তরুণ যুবকের ফাঁসী হয়। যুবকের নাম মোহম্মদ আলী খাঁ,—রুড়কীর টমসন্ কলেজের উপাধিপ্রাপ্ত। তিনি ছিলেন কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র এবং শেষ ডিগ্রী পরীক্ষার সহপাঠী ইংরেজ ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক বেশী নম্বর পাইয়া প্রথম হন। কিছুকাল তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামরিক ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরী করেন। যদিও তিনি যোগ্যতার কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তবু ভারতীয় বলিয়া যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অপমান সহ্য করিতে হইত তজ্জন্য তাঁহাকে চাকুরীতে ইস্তফা দিতে হইয়াছিল। এরূপ যোগ্য ব্যক্তি কি নিদারুণ অবস্থায় একজন ঘৃণিত গুপ্তচর বলিয়া ফাঁসীতে ঝুলিল তাহার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন সার্জেণ্ট ফরবেস্-মিচেল।

কানপুর পুনরুদ্ধারের পর ইংরেজবাহিনীর সমস্যা দেখা দিল, কিরূপে লখ্‌নউ বিদ্রোহীর হাত হইতে মুক্ত করা যায়। কানপুর এবং আলমবাগের (লখনউ) মধ্যে নানা স্থানে বৃটিশ সৈন্যের ছাউনি ফেলা হইল। উনাও-তে এক বৃটিশ ঘাঁটি পড়িল যাহার পরিচালনা করিতে-ছিলেন জেনারেল সার এডওয়ার্ড্ লুগাড এবং ব্রিগেডিয়ার এড্রিয়ান হোপ। সার্জেণ্ট ফরবেস্-মিচেল ছিলেন এই দলে।

একদিন এই ক্যাম্পে একজন ফিরিওয়ালা ইংরেজিতে হাঁকিতেছিল "প্লামকেক্, খুব ভালো প্লামকেক্, খেয়ে দাম দেবেন," ফরবেস-মিচেল লক্ষ্য করিলেন ক্যাম্পে যে সকল লোক আছেন, এই ব্যক্তি সাধারণ ফেরিওয়ালা হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। কি চেহারায়, কি চালচলনে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে পরিচয় দিল তাহার নাম জেমি গ্রীণ আর তাহার সঙ্গীর নাম মিকি। ফরবেস-মিচেলের এই ব্যক্তির সামরিক ক্যাম্পে প্রবেশের লাইসেন্স বা ছাড়পত্র আছে কিনা সন্দেহ হইয়াছিল কিন্তু লোকটি ব্রিগেডিয়ার এড্রিয়ান হোপের নিজ হাতের লেখা ছাড়পত্র দেখাইতে সন্দেহ দূর হইয়াছিল।

সৈন্যবল, লখ্‌নউ-এর আক্রমণের আয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে জেমি গ্রীণের সহজ অথচ বিশুদ্ধ ইংরেজী কথা-বার্ত্তায় ফরবেস-মিচেল খুশী হইলেন। তাঁহার টেবিলের একখানি সংবাদপত্রের প্রতি জেমি গ্রীণ বেশ আগ্রহ দেখাইল এবং বলিল ইংরেজী কাগজে মিউটিনি সম্বন্ধে কি বলে তাহা জানিতে তাহার খুব ইচ্ছা হয়। জেমিগ্রীণ এরূপ সুন্দর ইংরেজী কিরূপে শিখিল ইহা জানিতে চাহিলে সে বলিল যে তাহার বাবা এক ইংরেজ রেজিমেণ্টে খানসামার কাজ করিত এবং ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে ইংরেজী বলিতে শেখান হয়। এই সকল কথাবার্ত্তার পর ফরবেস মিচেলের আর কোন সন্দেহই রহিল না।

পরের দিন সন্ধ্যায় ফরবেস-মিচেল খবর পাইলেন, জেমিগ্রীণ নামে লখ্‌নউ-এর এক প্লামকেক্‌ওয়ালা গুপ্তচর ধরা পড়িয়াছে এবং বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে! রাত্রিতেই ফাঁসী না দিয়া তাহাকে পেছনের শিবিরের (Rear-guard) হেপাজতের জন্য পাঠান হইল—এই শিবিরে কার্য্যরত ছিলেন তখন ফরবেস মিচেল। তাঁহার এই লোকটীর জন্য দুঃখ হইল কারণ একদিন আগেই লোকটীর সম্বন্ধে তাঁহার খুব উচ্চ ধারণা হইয়া-ছিল। সন্ধ্যার একটু পরেই জেমিগ্রীণ ও তাহার সঙ্গীকে

রাত্রিকালে নিরাপদে রাখিবার জন্য ফরবেস-মিচেলের হাতে দেওয়া হইল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহাদের উভয়ের ফাঁসী।

বন্দীরা ফরবেস্-মিচেলের হাতে আসিবার পরেই তাঁহার দলের কয়েকজন সৈনিক প্রস্তাব করিল যে বাজার হইতে শূয়রের মাংস আনিয়া উহাদের ধর্ম্মনষ্ট করা হউক—মিউটিনির সময়ে এইরূপে ইংরেজ সৈনিক দ্বারা মুসলমান বন্দীদের ফাঁসী দিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মনষ্ট করিবার রেওয়াজ ছিল। ফরবেস-মিচেল ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন এবং সাবধান করিয়া দিলেন যে কেহ বন্দীদের উপর এরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে তিনি আদেশ অমান্যের জন্য গ্রেপ্তার করাইবেন। তিনি ইহাও বলিলেন, এরূপ গর্হিত কার্য্য বৃটিশ সৈনিকের অযোগ্য। ফরবেস-মিচেল লিখিতেছেন "আমার এই আদেশ শুনিয়া হতভাগ্য সেই লোকটার (যে নিজেকে জেমিগ্রীণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল) চোখে যে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আমি জীবনে ভুলিব না। বন্দী লোকটা বলিয়া উঠিয়াছিল এ দয়া সে প্রত্যাশা করে নাই, সে এজন্য খুবই কৃতজ্ঞ। সে পূর্ণ বিশ্বাসে প্রার্থনা করিয়া বলিল যে, এই দয়ার জন্য আল্লা এবং পয়গম্বর হজরৎ মোহম্মদ নিশ্চয়ই তাহার উপকারীকে এই যুদ্ধের বাকী সময় সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিবেন। ফরবেস-মিচেল যদিচ্ছা ও আল্লার নিকট প্রার্থনার জন্য তাহাদের ধন্যবাদ জানাইলেন এবং তাহার হাতকড়া খুলিয়া দিয়া তাহাকে নামাজ পড়িবার ও অন্যান্য স্বাধীনতা দিলেন।

বন্দীর পলাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ফরবেস-মিচেল সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া বন্দীকে জীবনের শেষ রাত্রিতে সবরকম সুবিধা দিতে ইচ্ছা করিলেন। নামাজের পরে উভয়কে খুব ভাল করিয়া নৈশ ভোজন করান হইল। জেমিগ্রীণকে হুকোয় ধূমপান করিতে দেওয়া হইল এবং একখানি ভাল কম্বল দেওয়া হইল যাহাতে তাহার আরাম হয়। জেমিগ্রীণ আল্লার নাম করিয়া আবার কৃতজ্ঞতা জানাইল।

সমস্ত রাত ফরবেস্ মিচেল ও বন্দীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—বন্দীকে সার্জেন্ট প্রায় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। যখন বন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে সত্যই কি সে গুপ্তচর? সে বলিল গুপ্তচর বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সে নয়। সে অযোধ্যার বেগমের সৈন্য-বিভাগের কর্ম্মচারী—লখ্নউ হইতে আসিয়াছিল আক্রমণকারী সৈন্যদের লোকবল ও অন্যান্য তথ্যাদি জানিবার জন্য। আমি লখ্নউ সৈন্যবাহিনীর চীফ ইঞ্জিনীয়ার, পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আমার লখ্নউ ফিরিবার কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ। সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমি লখ্নউ পৌছিতাম, আমার তথ্যাদি সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু লখ্নউ এর সোজাপথে উনাও পড়ায় আর একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল আক্রমণকারী সৈন্যেরা ও তাহাদের রণসম্ভার লখ্নউ-এর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে কিনা। খুবই দুর্ভাগ্য, ঠিক এই সময়ই একজন নিজের গলা বাঁচাইবার জন্য তাহাকে গুপ্তচর বলিয়া ধরাইয়া দিল।'

এই হতভাগ্য বন্দীর জীবনের কাহিনী ফরবেস্ মিচেলের আরও জানিতে আগ্রহ হইল তাঁহার স্কটল্যাণ্ডের বন্ধুদের লিখিয়া জানাইবার জন্য। খুব আগ্রহের সহিত জেমিগ্রীণ তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল কারণ যে দয়া ও সহানুভূতি ফরবেস্ মিচেল তাহার প্রতি দেখাইয়াছিলেন এইরূপে উহার কিঞ্চিৎ পরিশোধ করাই ছিল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

জেমি গ্রীণের নিজের বিবৃতিটা এই—

"আপনি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছেন এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথা আপনার ইংলণ্ডের—ইংলণ্ড বলিতে আমি অবশ্য স্কটল্যাণ্ডকেও উহার সামিল মনে করি, বন্ধুগণকে লিখিয়া জানাইবেন বলিতেছেন ইহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই। সে দেশের লোকেরা আমার কথা জানিয়া আল্লার এই বান্দার প্রতি সহানুভূতিশীল হইবে। লণ্ডন ও এডিনবার্গে আমার বন্ধুরা আছে কারণ আমি দুইবার এই সকল স্থানে গিয়াছি।

"আমার নাম মোহম্মদ আলী খাঁ। রোহিলখণ্ডের এক শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। বেরিলি কলেজে আমি প্রথমে পড়ি ও ইংরেজিতে ও সমস্ত বিষয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া পরীক্ষায় পাশ হই। ইহার পরে আমি রুড়কী গবর্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কোম্পানীর চাকুরীর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি এবং শেষ পরীক্ষায় সিভিল ও

মিলিটারি ছাত্রদের মধ্যে এমনকি ইউরোপীয় ছাত্রদের অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হই। ফল কি হইল? আমাকে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারদের অধীনে "জমাদারের পদের জন্য মানোনীত করা হইল। আমাকে দূরে এক পার্ব্বত্যদেশে রাস্তা নির্ম্মাণের কাজে এক দেশীয় (নেটিভ) কমিশন দেওয়া হইল বটে কিন্তু কার্য্যতঃ উহা এক ইউরোপীয় সার্জ্জেন্টের অধীনে কাজ। সে ব্যক্তি পাশবিক শক্তি ছাড়া অন্যান্য যোগ্যতায় আমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল এবং শিক্ষা তাহার একেবারেই ছিলনা। তাহার নিজের দেশে সে সামান্য মিস্ত্রির কাজের যোগ্য ছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় অফিসারের মতই এই লোকটা ছিল স্বার্থপর এবং অপরের প্রতি তাহার ব্যবহার ছিল রূঢ় এবং অপমানজনক। আপনি আমার দেশের ভাষা না জানিলে এবং শিক্ষিত লোকের সহিত না মিশিলে বুঝিতে পারিবেন না যে এইরূপ লোকেদের কার্য্যদ্বারা আপনার দেশের সুনামের কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে। যতই আপনারা নিজেদের উদারতা ও এদেশের লোকের প্রতি সহানুভূতির বড়াই করুন আমরা এই উদাহরণ দ্বারাই এই সকল উক্তির ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা ও ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের ঔদ্ধত্য সকলের নিকট প্রকট হইয়া পড়ে।

আমি টাকার লোভে চাকুরী গ্রহণ করি নাই। সম্মানের জন্য চাকুরীতে গিয়াছিলাম। আর লাভ করিলাম ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য, আর চাকুরী করিতে হইয়াছিল এরূপ একজনের অধীনে যাহাকে ঘৃণা করি বলিলে যথেষ্ট হয় না উহা অপেক্ষাও বেশী কিছু করি। আমার পিতা বুঝিলেন যে এরূপ অবস্থায়, যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজত্ব করিয়াছে, তাহাদের গোলামী করা সম্ভব নহে। পিতার অনুমতি লইয়া আমি কাজে ইস্তাফা দিলাম।

ইহার পরে আমি পরলোকগত হিজ্ ম্যাজেষ্টি অযোধ্যায় রাজা নসীরুদ্দিনের অধীনে চাকুরী করিবার সঙ্কল্প করিয়া যখন লখ্নউ উপস্থিত হইলাম তখন খবর পাইলাম নেপালের হিজ হাইনেস জং বাহাদুর রাণা একদল গুর্খা-সৈন্য লইয়া লখ্নউ-এর লুণ্ঠনে সাহায্য করিতে গোরখপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জং বাহাদুর ইংলণ্ডে যাইবেন। তিনি একজন খুব ভাল ইংরেজী জানা সেক্রেটারী খুঁজিতে-ছিলেন। দেশী রাজ-রাজার এবং ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের সুপারিশ আমার ছিল। ইহার বলে উক্ত পদের জন্য আমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। মহারাজার দলের সঙ্গে আমি প্রথম বিলাতে গেলাম এবং নানা স্থানের মধ্যে এডিনবরাতে গিয়েছিলাম—সেখানে আপনার রেজিমেণ্ট-৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স অভ্যর্থনায় হিজ হাইনেসকে গার্ড-অব-অনার দিয়াছিল। সেই প্রথম স্কটিশ হাইল্যাণ্ডারের পোষাকে রেজিমেণ্ট দেখিলাম, তখন কে জানিত যে এই সৈন্য দলের হাতেই আমি একদিন হিন্দুস্থানে বন্দী হইব। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস?

"যাহা হউক আমি ভারতে ফিরিয়া বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়াছিলাম। ইহার পর আমি আজিমুল্লা খাঁর (যাহার নাম আপনার বর্ত্তমান মিউটিনি ও বিদ্রোহের সম্পর্কে বিশেষ জানা আছে) সহিত আর একবার ইংলণ্ডে যাই। (১) আজিমুল্লা খাঁও আমার মতই কানপুরে গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার গঙ্গাদীনের নিকট ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

আজিমুল্লাখাঁর বিশ্বাস ছিল যে ইংলণ্ডে গিয়া তিনি নানা সাহেবের প্রতি লর্ড ড্যালহৌসীর অন্যায় আদেশের প্রতিকার করিতে পারিবেন। (২) নানা সাহেব ইংলণ্ডে শ্রেষ্ঠ উকীল নিযুক্ত করিবার জন্য এবং কোম্পানীর উচ্চ কর্ম্মচারীগণকে উৎকোচ দিবার জন্য আজিমুল্লার সঙ্গে প্রভূত অর্থ দিয়াছিলেন। এই মিশনের কি ফলাফল হইয়াছিল আপনার তাহা জানা আছে আমার বলিবার প্রয়োজন নাই। লণ্ডনের সামরিক বৈঠকখানায় অবশ্য এই দৌত্যের সফলতা হইয়াছিল, কিন্তু আমরা যে আশায় গিয়াছিলাম, তাহা ফলিলনা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল, উপরন্তু ৫০,০০০ পাউণ্ডের উপর অপব্যয় করিয়া আমরা কনষ্টাণ্টিনোপলের পথে ১৮৫৫ সালে ভারতে ফিরিলাম। কনষ্টাণ্টিনোপল, হইতে ক্রিমিয়া গিয়াছিলাম, যেখানে ইংরেজ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় আমরা দেখিয়া-ছিলাম ১৮ই জুন। সিবাষ্টপুলে উভয় সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

"আমরা সেখান হইতে কনষ্টান্টিনোপলে ফিরিয়া কয়েকজন খাঁটি বা ভূয়া রুশীয় প্রতিনিধির সহিত কথা বলিয়াছিলাম, তাহারা আজিমুল্লকে ভারতে বিদ্রোহ হইলে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। ইহার পরেই আজিমুল্লা ও আমি কোম্পানী সরকারকে ধ্বংশ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলাম। আমরা ইহাতে সফল হইয়াছি কারণ আপনি যে আমাকে খবরের কাগজ পড়িতে দিয়াছিলেন তাহাতে দেখিলাম যে কোম্পানীর রাজত্ব আর নাই। তাহাদের লুঠ এবং বাজেয়াপ্ত করিবার অধিকারের সনদ বা চার্টার আর অনুমোদিত হইবেনা। ইংরেজের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার চেষ্টা সফল না হইলেও আমাদের জীবন-দান একেবারে বিফল হয় নাই কারণ আমার বিশ্বাস কোম্পানীর রাজত্ব অপেক্ষা খাস ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্টের শাসন অনেকটা ন্যায়সম্মত হইবে। যদিও আমি বাঁচিয়া থাকিব না কিন্তু আমার অত্যাচারিত ও পদদলিত দেশের ভবিষ্যৎ আছে ইহাই আমার সান্ত্বনা।

"সাহেব, তোমার নিকট হইতে আরও সুবিধা আদায় করিবার জন্য তোমাকে তোষামোদ করিতেছি না। তোমার দেওয়া অনেক সুবিধা আমি পাইয়াছি আর কিছু দেওয়া তোমার সাধ্যের বাহিরে। কারণ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তুমি দয়া দেখাইতে পার না। আমার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু তোমার অযাচিত করুণায় আমার প্রাণ খুলিয়া গিয়াছে। আমি হৃদয়ে ঘৃণা এবং মুখে অভিশাপ লইয়া এই শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলাম কিন্তু আমার মত হতভাগ্যের প্রতি তোমার করুণা দেখিয়া লখ্‌নউ ত্যাগ করিবার পর এই দ্বিতীয়বার আমি এই বিদ্রোহে যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা করা হইয়াছে তাহার জন্য লজ্জিত হইলাম। প্রথম ঘটনাটি হয় কিছুদিন পূর্ব্বে কানপুরে যখন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার কর্ণেল নেপিয়ার গঙ্গাতীরের এক হিন্দুমন্দির কামান দ্বারা উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। একদল হিন্দুপুরোহিত কর্ণেলের নিকট মন্দির ধ্বংশ না করার আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কর্ণেল নেপিয়ার তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনারা আমার কথা শুনুন এবং জবাব দিন। যখন আমাদের মহিলা এবং শিশুগণকে হত্যা করা হয় তখন আপনারা এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ইহাও বুঝিতেছেন যে আমরা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এই মন্দির ধ্বংশ করিতেছিনা, সামরিক প্রয়োজনে নৌ-সেতুর নিরাপত্তার জন্যই ইহা করিতে হইতেছে। যদি আপনাদের মধ্যে একজনও ইহা প্রমাণ করিতে পারেন যে তিনি কোন একজন খ্রীষ্টান পুরুষ, স্ত্রীলোক বা শিশুর প্রতি দয়া দেখাইয়াছেন, এমনকি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে ইহাদের কাহারও প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তিনি তাহার হইয়া একটি বাক্যও উচ্চারণ করিয়াছেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তাহা হইলে আপনাদের এই পূজার মন্দির ধ্বংশ হইতে বিরত থাকিব।" আমি তখন কর্ণেল নেপিয়ারের নিকটেই লোকের ভীড়ের মধ্যে ছিলাম। তাঁহার উক্তি বীরোচিত হইয়াছিল। ইহার কোন জবাব আসিলনা। ধীরে ধীরে ভীরু ব্রাহ্মণেরা সরিয়া পড়িল। কর্ণেল ইঙ্গিত করিতেই ভগ্ন মন্দিরের ধূলিতে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। নেপিয়ারের উক্তিতে ন্যায্য কথাই ছিল। আমি লজ্জিত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে সে কানপুর ছিল কিনা ইহা ফরবেস-মিচেল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "ভগবানকে ধন্যবাদ আমি তখন আমার বাড়ীতে রোহিলখণ্ডে ছিলাম। যুদ্ধে যাহারা মরিয়াছে তাহাদের রক্ত ব্যতিত অপর কোন রক্তে আমার হস্ত কলঙ্কিত হয় নাই। আমি জানিতাম বিপ্লবের ঝড় আসিতেছে, আমি আমার স্ত্রীপুত্রকে নিরাপদে রাখিবার জন্য দেশে গিয়াছিলাম এবং সেখানে বসিয়াই মিরাট ও বেরিলিতে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে খবর পাই। অবিলম্বে আমি রওনা হইয়া বেরিলিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলাম এবং তাহাদের সঙ্গে দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইলাম। আমাকে সেই বাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হইল এবং কোম্পানীর যে-সকল লোক রুড়কী হইতে মিরাটে যাওয়ার সময় বিদ্রোহী-দলে যোগ দিয়াছিল তাহাদের সাহায্যে প্রতিরক্ষার কার্য্য দৃঢ় করিলাম। সেপ্টেম্বরে ইংরেজ যখন দিল্লী দখল করে সেই পর্য্যন্ত আমি ওখানে ছিলাম। অতঃপর আমি যতদূর

পারিলাম বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের সংগ্রহ করিয়া 'লখনও'র দিকে যাই। প্রথমে মথুরার দিকে মার্চ্চ করিলাম এবং যমুনার উপর একটা নৌ-সেতু তৈরি করিয়া সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করাইলাম। তখনও আমাদের প্রিন্স ফিরোজ সাহ এবং জেনারেল বখ্‌ত খাঁর পরিচালনায় ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। লখনউ পৌছিতেই আমাকে সমগ্র বাহিনীর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করা হইল। যখন নভেম্বরে ইংরেজ-সৈন্য রেসিডেন্সি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তখন আমি লখনউতে। সেকেন্দরবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড আমি দেখিয়াছি। আক্রমণের একরাত্রি পূর্ব্বে প্রতিরক্ষার কাজ আমার উপর ন্যস্ত হয়। এবং আমি সা-নাজাফ হইতে উহা পরিচালন করিতেছিলাম। সেকেন্দরবাগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বলিয়া সেখানে আমি লখনউ-এর বাছাই বাছাই তিন হাজার সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম, উহার একজনও রক্ষা পায় নাই। এক রাত্রি পূর্ব্বে আমি যে সবুজ পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম, যখন দেখিলাম তাহা অপসারিত হইল এবং সে স্থানে ইংরেজের পতাকা উড়ল তখন আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম এবার সব শেষ, তখন সা-নাজাফ হইতে সেকেন্দরবাগের উপর কামান দাগিতে হুকুম দিলাম। ইহার পর লখনউর চারিদিকে সমস্ত প্রতিরক্ষার পরিকল্পনাও ব্যবস্থা করিলাম। এই সকল আপনি লখনউ গেলে দেখিতে পাইবেন। সিপাহি এবং গোলন্দাজেরা আমার প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় পশ্চাতে শক্ত হইয়া লড়িলে বহু ইংরেজ-সৈন্যের প্রাণ বলি দিতে হইবে এবং ইহার পরেই লখনউ পুনরুদ্ধার সম্ভব।"

মোহম্মদ আলী খাঁ বিদ্রোহের সম্পর্কে ফরবেস—মিচেলের আরও নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন এবং কোন দুর্ব্বলতা দেখান নাই। কেবল স্ত্রী এবং দুই পুত্রের দুঃখের সময় যাহারা দেশে রোহিলখণ্ডের বাড়ীতে ছিল, একটু দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছিলেন। মুহুর্ত্তের মধ্যে নিজকে সামলাইয়া লইয়া বলিয়াছিলেন আমি ইংরেজ ও ফরাসীর ইতিহাস পড়িয়াছি, আমার দুর্ব্বলতা শোভা পায় না।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছিল। ফরবেস-মিচেল তাঁহাকে হাতমুখ ধুইয়া নমাজ পড়িতে স্বাধীনতা দিলেন।

সকলের শেষে মোহম্মদ আলী খাঁ তাহার চুলের মধ্যে লুকানো একটি সোনার আঙটি বাহির করিয়া ফরবেস-মিচেলকে নিজের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, ইহার মূল্য দশ টাকাও নহে। তাঁহার সঙ্গের অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি গ্রেপ্তারের সময় কাড়িয়া লইয়াছে, তাঁহার আর কিছু দিবার নাই। এই বলিয়া বন্দী ফরবেস-মিচেলের অঙ্গুলিতে আঙটী পরাইয়া দিলেন আর বলিলেন কনষ্টান্টিনোপলে এক সাধুব্যক্তি ইহা তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহার অদ্ভুত গুণ, যে ব্যবহার করিবে তাহার কোন বিপদ হইবে না।" লখনউ দুর্গের সম্মুখে যখন সার্জ্জেণ্ট উপস্থিত হইবেন তখন যেন তিনি এই অঙ্গুরির দিকে তাকান এবং তাহাকে স্মরণ করেন, কোন বিপদ হইবে না।

এই কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতেই প্রোভোষ্ট-মার্সেলের প্রেরিত এক প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অসাধারণ বন্দীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অন্তরের সহানুভূতি ও বেদনায় কাতর ফরবেস-মিচেল তাহাকে প্রহরীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

হুকুম আসিয়াছিল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্য-বাহিনী লখনউ যাত্রা করিবে। রিয়ারগার্ড হইয়া ফরবেস-মিচেলকে এই দলের সঙ্গে চলিতে হইবে। ক্যাম্প ভাঙ্গিয়া যাত্রা করিতে সূর্য্যোদয় হইল এবং কানপুর-লখনউ রোড দিয়া চলিবার সময় ফরবেস-মিচেল এক বৃক্ষ শাখায় গত রাত্রের বন্দী ও তাহার সঙ্গীর ফাঁসী দেওয়া মৃত এবং নিস্পন্দ দেহগুলি ঝুলিতে দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না।

ফরবেস-মিচেল লিখিতেছেন "বেগমকুঠী যখন আক্রান্ত হয় তখন আমি মোহম্মদ আলীখাঁকে স্মরণ করি ও অঙ্গুরীর দিকে তাকাই। অবশ্য আমি বিপদ দেখিয়া ভয় পাই নাই, কিন্তু এই যুদ্ধে আমার একটি আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নাই।

ফরবেস-মিচেল আরও লিখিয়াছেন—ইহার পরেও আমি অঙ্গুরীটি রাখিয়া দিয়াছি—এই বিদ্রোহে ইহাই আমার একমাত্র লুঠের জিনিষ—যাহা আমি পাইয়াছি। এই অঙ্গুরি এবং মোহম্মদ আলি খাঁর জীবনের ইতিহাস আমি আমার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাইব।

---

(১) আজিমুল্লা খাঁ নানা সাহেবের একান্ত সচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন এবং নানা সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে বোর্ড অব ডাইরেক্টরের নিকট তাঁহার প্রতি অবিচারের জন্য আসিল কারণ তাহা লইয়া প্রভুর পক্ষে তদ্বির করিতে ইংলণ্ডে যান, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ফেরেন। অনেকের মতে সিপাহী বিদ্রোহের পরিকল্পনায় আজিমুল্লা খাঁ নানা সাহেবের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন।

(২) গবর্ণর জেনারেল ড্যালহৌসী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওএর পোষ্যপুত্র নানা সাহেবকে পেশোয়ার উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং তাহাকে পৈত্রিক উপাধি এবং সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। নানা সাহেব পিতার কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র পাইয়াছিলেন।

হীনযান

উপন্যাস

সুবোধ বসু

চৌদ্দ

মোহিনী নামের সঙ্গে চেহারা বা মেজাজ কোনওটাই না মিলিলেও তার রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা আছে এই বাড়ীর সুপরিচালনায়। বাসন-মাজা এবং মশলা-পেষার একচ্ছত্র কর্ত্রী সে। ঘষিতে ঘষিতে বুদ্ধি উজ্জ্বল এবং মেজাজ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে মোহিনী ঝিয়ের। রোগা, কালো মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক। মুখে বিরক্তি এবং গালাগালি লাগিয়াই আছে। চাকর-বাকরদের কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বাধাইতে না পারিলে সে একা একাই নিজ ভাগ্যকে তিরস্কার করিয়া থাকে।

'এখনও বাড়ী যাস নি মোহিনী? কি হলো তুর?

বাবুর্চ্চী সারা দিনের কাজ সমাপ্ত করিয়া পরিষ্কার সাজ করিয়াছে। গায়ে চেকের বুস শার্ট, পরণে সাদা ফর্সা পায়জামা। বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স বাবুর্চ্চির। কোঁকড়ানো চুলে টেরী কাটা। গোঁফের দুপ্রান্ত ছুঁচলো। বাড়ীর সে সবচেয়ে বেশি মাহিনার ভৃত্য। তার কায়দা-কানুন ইহার উপযুক্ত।

'হলো আমার পোড়া কপালের পোড়া ভোগ, আর কি!' চাকরদের কোয়াটারের বারান্দায় ইলেকট্রিক বাতিটার তলায় কলাই-করা গোটা তিনেক কাঁসারি সেখানে নামাইয়া রাখিয়া মোহিনী মন্তব্য করিল। 'আধ ঘণ্টার ওপর কাজ মিটিয়ে বসে আছি। ভাবছি ছোকরা এই এলো এই এলো। মেমসাহেবের কাজ নিয়ে বেরিয়েছে সন্ধ্যের পরেই। ফিরতে কখনও এত দেরি হতে পারে বলো? বাড়ী থেকে ছাড়া পেয়ে এই সুযোগে হারামজাদা তামাসা দেখে বেড়াচ্ছে। ইদিকে আমি বাড়ী যাব, চান করব, নকুলীর আসন দোব, কর্ত্তাকে খাওয়ায় দেব, তবে নিজের খাওয়া খাব। কম করে দুঘণ্টার কাজ। ক'টা বেজেচে বলতে পার বাবুর্চ্চী সায়েব?…'

বাবুর্চ্চীর হাতে সব সময়েই হাতঘড়ি বাঁধা থাকে, আলোতে ঘড়ির কাঁটা দেখিয়ে সে কহিল, 'সাড়ে দশটার চেয়েও আগিয়ে গিছে…'

'তবেই দ্যাকো, কি বাঁদরের বাঁদর! বজ্জাতের হাঁড়ি। মেমসায়েবের মন যুগিয়ে চলে, তাঁর কাছে এর কতা লাগায়, ওর কতা লাগায়। আর গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। এর চাইতে ফ্যালা-ছোকরা অনেক ভাল ছিল। কক্ষণো তার জন্যে অপিক্ষে করতে হয় নি। কাজ শেষ হয়েছে, আর অমনি সে নিজে এসে বলেছে, চলো, মোহিনীদি, এগিয়ে দিয়ে আসি…'

রাতের কাজ শেষ হইলে মোহিনীকে বাড়ী পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিতে হয়। পাঁচ-সাত মিনিটের পথ বস্তিটা। সেখানে মোহিনীর ঘর আছে। রাতে এ পথটুকু একলা যাইতে ভয়। গুণ্ডা বদমাসের ভয়। গুণ্ডা বা বদমাস কিসের আকর্ষণে তাহাকে আক্রমণ করিবে, তাহা সে বিচার করিতে বসে নাই কোনও দিন। আর সত্যিই যদি কেহ আক্রমণ করে, তবে তাহা প্রতিরোধ করিবার মত যথেষ্ট শাণিত অস্ত্র যে তার কণ্ঠে আছে, সে সম্বন্ধেও সে সচেতন ছিল না।

'ঢের ভাল ছিল সেই ফ্যালারাম।' মোহিনী আপন মনে বকিয়া চলিল: 'আমার সঙ্গে লড়তে এলি। রূপোর গেলাস হারিয়েচে কি তোর বাপের

সম্পত্তি খোয়া গ্যাচে? মেমসাহেবের কাছে লাগাচ্ছিল, মোহিনী সে গেলাস মেজেছে আর ফেরৎ দেয় নি। আর তার মজাও টের পেলি। সে গেলাস বের হলো তোর নিজেরই প্যাঁটরায়…'মোহিনী বিজয়ী বীরের ভঙ্গিতে সাক্রোশে কহিল।

'আরে ছেড়ে দে সে সব কোতা।' বাবুর্চি ঘড়িতে সময় লক্ষ্য করিয়া অন্যমনস্ক কণ্ঠে মন্তব্য করিল।

'চুরি! চুরি! চুরি। বলো তো এ কি বাতিক।' মোহিনী না দমিয়া কহিল। 'এ খাওয়ার চুরি করছে, এ বাসন সরাচ্ছে, এ জুতো সরাচ্ছে, জামা লোপাট হচ্ছে। যেন আমরা সবাই খেটে খেতে আসিনি, চুরি করতে এইচি! ভাঙা চীনে মাটির বাসন সরিয়ে ফেলা চুরি হলো? ইচ্ছে করে কেউ বাসন ভাঙে? তা' বলে হাত থেকে কি কখনও ফসকে পড়তে পারে না? তখন ভাঙা টুকরো না লুকিয়ে উপায় কি? পানের থেকে চুণ খসলেই তো মাইনে কাটা যাবে বলে শাসাচ্ছ।… কারণে অকারণে সন্দেহ করছ। যা খোয়া যায় নি, তারও জন্যে দায়িক করছ। এমন হলে কখনও কাজ করা যায়? আমার সঙ্গে ব্যাপারটাই দ্যাকো না। কবার সে বাবুর্চিখানায় আসছে, ক'মিনিট তোমার'সঙ্গে কথা বলেছে, সব খবর রাখা চাই। এতো কি রে তোদের বাপু? আমা কি তোদের নিজের মেয়ে? আর নিজের মেয়েদেরকেই কি সামলাতে পারছিস? সারাক্ষণ এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছে, ওর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে…'

'ছেড়ে দে মোহিনী এসুব কোতা।' বাবুর্চি বিব্রত হইয়া কহিল। 'বাড়ী যাবি তো চল। আমিই আগিয়ে দিস্‌ছি। সারা দিনের মেহনতের পর শুয়ে না এলে মাতা দোরে যায়…এই যে হরিশ। সুতে এছেচ? সায়েব কি ফিরে এছচেন?…'

হরিশ বেহারা এতক্ষণ সাহেবের ফিরিবার অপেক্ষায় বাহিরে গেটের ধারে বসিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই সে সাহেবের নিজস্ব আলাদা শোওয়ার ঘরে বিছানা পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া, রাত-কাপড় যথাস্থানে গুছাইয়া, জলের গেলাস টিপয়ের উপর ঢাকা দিয়া এবং জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া তার কর্ত্তব্য সারিয়া রাখিয়াছিল। সাহেব খুব বেশি দেরি না করিলে সে অপেক্ষা করে এবং তাহাকে জামাকাপড় খুলিতে ও রাতের পোশাক পরিতে সহায়তা করিয়া তবে নিজেদের ঘরে শুইতে যায়। প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এই মাত্র সে আমাকে বলিয়া আসিয়াছে, সাহেব ফিরিলে সে যেন দরজা খুলিয়া দেয় এবং অন্য কিছু কাজ থাকিলে করে।

'না, এখনও ফেরেন নি। বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে। আমাকে বলে এসেছি।'

'সুয়ে পড়ো গিয়ে। রাত কিছু কোম হয় নি। আসছি মোহিনীকে আগায়ে দিয়ে। ছোক্‌রা একোনো ফিরে আইসেনি।…ওর খাওয়া বাবুর্চিকানায় ঢাকা আছে…চল, মোহিনী। ভুর খুব দেরি হয়া গিচে…

নিতাই ফিরিল সাড়ে এগারোটারও পরে। উড ষ্ট্রীটে গুপ্ত সাহেবের বাড়ী। এখান হইতে এক মাইলের বেশী দূর নয়। কিন্তু হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছে, হাঁটিয়া ফিরিয়াছে। মেমসাহেব যখন বলিলেন, 'গুপ্তসাহেব তাঁর কোলিওব্যাগ ফেলে গেছেন, ওটা তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ওতে জরুরী কাগজপত্র আছে', তখন রাত দশটারও বেশি। সারা সন্ধ্যাটাই গুপ্তসাহেব এখানে ছিলেন। মেমসাহেবের সঙ্গে নানা কাগজপত্র লইয়া কি সব আলোচনা করিয়াছেন। গুপ্ত সাহেব ও মেমসাহেব দুজনেই কোনও সমিতির পরিচালক। প্রায়ই তাদের একসঙ্গে কাজ করিতে হয়।

গুপ্তসাহেব কি কাজ করেন নিতাই জানে না। দুপুরবেলা গেলেও নিমাই তাঁকে বাড়ীতে পায়। কিন্তু তিনি যে প্রকাণ্ড বড়লোক তাতে সন্দেহমাত্র নাই। প্রকাণ্ড বাড়ী। ফটকে দারোয়ান। বাড়ীর ভিতরে বিস্তীর্ণ সবুজ লন, লনের একপ্রান্তে টেনিস খেলার মাঠ রাতে আলো জ্বালাইয়া দিন বানাইয়া এখানে টেনিস

খেলা হয়। মেমসাহেব ও সাহেব এই খেলায় মাঝে মাঝে যোগ দিতে আসেন। আরও অনেকে আসে—মায় খোদ বিলাতী সাহেব মেমসাহেব পর্য্যন্ত। গুপ্ত সাহেব যে খুব একজন প্রতিষ্ঠাশালী লোক ইহার পর নিমাইয়ের তাতে সন্দেহ থাকে নাই।

মেমসাহেবের চিঠি লইয়া প্রায়ই তাকে গুপ্ত সাহেবের কাছে আসিতে হয়। কখনও কখনও মেম-সাহেব নির্দ্দেশ দেন, কোনও বিশেষ চিঠি একমাত্র গুপ্ত সাহেবের নিজের হাতে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া চলিবে না—এমন কি গুপ্ত মেমসাহেবকেও নয়। আগে ইহাতে নিমাইয়ের কিছু বিস্ময় হইত। কিন্তু মেমসাহেব নিজেই একদিন ইহার অর্থ ব্যক্ত করেন। সমিতি-সংক্রান্ত অনেক খবর সমিতির সেক্রেটারী ও প্রেসিডেণ্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা দরকার। গুপ্ত-মেম সাহেবকে নিমাইয়ের ভয় করে। কালো মোটা, বিরক্ত মুখ, বিরক্ত চোখের দৃষ্টি। নিমাইদের মেমসাহেব ইহার তুলনায় দেবী। কাজেই গুপ্ত-মেমসাহেবকে এড়াইয়া চলিতে পারিলেই নিমাই খুশি হয়।

আজ চিঠি নয়। চামড়ার একটা কোলিওব্যাগ পৌছাইয়া দিতে হইয়াছে। গুপ্ত মেমসাহেবের হাতে না দিবার কোনও নির্দ্দেশ ছিল না, তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া খোদ সাহেবের নিজের হাতেই দিয়া আসিয়াছে ব্যাগটা। গুপ্ত সাহেব একবার মাত্র ব্যাগের তালাটা বুড়ো আঙুল দিয়া টানিয়া খুলিবার চেষ্টা করিয়া অকৃত-কার্য্য হইলেন তারপর নিমাই তখনও দাঁড়াইয়া আছে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'ঠিক আছে।'

যাহা নিমাইকে কিঞ্চিৎ বিস্মিত করিয়াছিল, তাহা এই। ব্যাগটা পাঠাইবার আগে ছোট্ট একটা চাবি দিয়া তাহার গা-তালা খুলিয়া তাহার ভিতরে একটি লেপাফা ঢুকাইয়া মেমসাহেব আবার তালা বন্ধ করিয়া টানিয়া পরীক্ষা করিয়া দেন। ইহা নিমাই পর্দার ফাঁক দিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল। এদিকে গুপ্তসাহেব ব্যাগের তালা বন্ধ আছে দেখিয়াও কোনও আপত্তি করিলেন না। কাগজপত্রগুলি যদি এতই জরুরী হয়, তবে তাহা বাহির করিতে না পারিলে অসুবিধা হইবে নাকি?

ফিরিতে ফিরিতে একাধিকবার সে ব্যাপারটা ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ক্ষিধা পাইয়াছে প্রচণ্ড, ঘুম পাইয়াছে তার চেয়েও বেশি। যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া সে বাড়ী ফিরিয়াছে। রাস্তা হইতেই গ্যারাজে গাড়ী নজরে পড়িয়াছে। সাহেব তবে বাড়ী ফিরিয়াছেন।

ডান দিকের গেট দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া সবুজ ঘাসে ঢাকা ডিম্বাকৃতি একটা ছোট লন্ বাঁ পাশে রাখিয়া গাড়ী দালানের সিঁড়ির কাছে আগাইয়া যাইতে পারে এবং সেখান হইতে লন্ বাঁয়ে রাখিয়া বাঁ দিকের ফটক দিয়া রাস্তায় নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে। এই ফটকের কাছে আর একপথে ও পাশের পাঁচীলের কাছাকাছি গ্যারাজে পৌছান যায়। ডানদিকের গেটের কাছাকাছি পৌছিয়াই নিমাই গ্যারাজে গাড়ী লক্ষ্য করিল। আর ইহাও লক্ষ্য করিল, একতলার দক্ষিণ-পূব-কোণার ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার। ওটা সাহেবের নিজস্ব বেড্‌রুম। মেম সাহেব ও দিদিমণিদের শয়ন-কামরা দোতলায়। নিমাই বুঝিল, সাহেব ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন।

আধো অন্ধকারে সুন্দর লাগে বাড়ীটাকে দেখিতে। যেন ফুলের বাগানের মধ্যে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতায় নিদ্রা যাইতেছে।

সহসা একটা সুউচ্চ কণ্ঠের তিরস্কার যেন নৈঃশব্দকে ছুরিকাঘাত করিল। চমকাইয়া উঠিয়া সজাগ হইল নিমাই। নিঃসন্দেহে মেমসাহেবের কণ্ঠস্বর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন বাড়ীর সম্মুখের দরজার কাছ হইতে তিন লাফে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া বাগান অতিক্রম করিয়া ও পাশের গেটের দিকে ছুটিয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ড ভ্যাবাচাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর নিমাই চোরের দিকে অবলীলাক্রমে ছুটিয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যেই চোর পগাড় পার। নিমাই যে তাকে সত্যই ধরিতে

চেষ্টা করিত তা নয়। কিন্তু তার সুযোগও মিলিল না। দূর হইতে উহাকে যেন বাবুর্চ্চীর মত মনে হইয়াছে।

নিমাই ওদিকের গেট দিয়াই বাড়ী ঢুকিল। মেমসাহেবের গর্জ্জন তখনও থামে নাই। কাছে আসায় তাঁহার কথাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া পৌঁছাইতে লাগিল নিমাইয়ের কানে।

'লজ্জা করেনা বজ্জাত মেয়েমানুষ! বাড়ীর সদর দরজা খুলে প্রেম করছ দুপুর রাত্তিরে। এরপর একদিন সুযোগ বুঝে বাড়ীর জিনিষপত্র সরিয়ে নিজেরা হাওয়া হবে। বুড়ো ব্যাটার সঙ্গে এত তোর আসনাই কিসের পোড়ারমুখী! কাল সকালেই বিদেয় করব তোকে আর তোর ঐ বদমাস বোর্চ্চীটাকে......

সঙ্গে বোধহয় দুচারটা জোর চড়-চাপড়ও পড়িয়াছিল, আয়ার চাপা কান্নার বোবা আওয়াজ ভাসিয়া আসিল।

'আঃ, দুপুর রাতে এসব কি করছ। ছেড়ে দাও। কাল দূর করে দিও আপদ। কিন্তু এখন একটু শান্তিতে ঘুমোতে দাও...'

- সাহেবের গলা চিনিতে নিমাইয়ের মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।

'ঘুমোতে দাও! শান্তিতে ঘুমোতে দাও! ওঃ!' ঝড়ের আগের প্রশান্তির মতো দু তিন সেকেণ্ড নিস্তব্ধ থাকিবার পর মেমসাহেবের কণ্ঠস্বর তপ্ত গর্জ্জন করিয়া উঠিল। 'রাত দুপুর পর্য্যন্ত হুল্লোড় করে' মাতাল হয়ে ফিরে এখন পরম শান্তিবাদী হয়ে উঠেছেন!' শান্তিতে ঘুমোতে চান। তোমার জন্তই বাড়ীর চাকর-বাকরেরা এমন আস্কারা পেয়েছে। বাড়ীর কর্ত্তারই যখন চরিত্রের ঠিক নেই, তখন চাকর-ঝি কখনও ভালো হতে পারে? সাহেব যখন রাতে বিহার করে' বেড়ান...।

'মদ খাই, বিহার ক'রে বেড়াই, বেশ করি। তোমার পয়সায় করি?'...

'জানি আমি কতটা তুমি নির্লজ্জ! বেশ ভালো করেই জানি। কিন্তু এ আমি সহ্য করব না। নিজের বাড়ীর ভেতর এ আমি সহ্য করব না। মিসেস রায়কে নিয়ে বাইরে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারে, কিন্তু বাড়ীটাকে দুর্নীতির জায়গা করা চলবে না। আয়া কোথা থেকে এতটা আস্কারা পায় ভেবে অবাক হই...'

'চুপ কর বলছি। নিজে যে হাজার লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াও তার...জংলী মেয়েমানুষ, আমি যদি নিজে লাগাই?'

প্রথমে একটা গুম করিয়া কিলের শব্দ। তার পর চড়ের আওয়াজ। মারামারি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি সুস্পষ্টর ইঙ্গিত। ইহার সঙ্গে মেমসাহেবের সুতীক্ষ্ণ কটুক্তি ও গর্জ্জন।

নিমাই ভয় পাইয়া প্রায় পা টিপিয়া টিপিয়া পালাইয়া গেল। যে বাড়ীটাকে কিছুক্ষণ আগে মাত্র এত সুন্দর মনে হইয়াছিল, তাহা সহসা যেন ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে।

পনেরো

ইহার পর দিন সাতেক পার হইয়াছে। দুপুরের খাওয়া সারিয়া ঘরে আসিতে নিমাইয়ের প্রায় আড়াইটা বাজিয়াছে। ঘণ্টা দেড়েকের বেশি বিশ্রামের সময় পাওয়া যায় না। চারটার সময় উঠিতেই হইবে—তা দুপুরের ছুটি তিনটায়ই হোক আর সাড়ে তিনটায়ই হোক।

দুপুরে নিমাই প্রায়ই ঘুমায় না। তবু তক্তপোষে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় পিঠটা বিশ্রাম পায়। সারা শরীরটাই যেন আবার চাঙ্গা হইয়া ওঠে। এই আরামে দু একদিন সে ঘুমাইয়াও পড়ে। কিন্তু সময় অতিক্রম করিবার উপায় নাই। হরিশ বেয়ারার জরুরী হাঁকে আঁৎকাইয়া জাগিয়া উঠিয়া সে মনিব-মহলের দিকে ছুট লাগায় চোখ কচলাইতে কচলাইতে।

'কোথা যাচ্ছ, বাবুর্চ্চীদা?'

পাশের অপেক্ষাকৃত বড় খুপরীটা বাবুর্চ্চী এবং হরিশ উভয়েরই আস্তানা। হরিশ ইতিপূর্ব্বেই শুইয়া পড়িয়াছে। বারান্দা দিয়া আসিতে আসিতে নিমাই

তার নাকের ডাক পর্যন্ত শুনিয়া আসিয়াছে। মেম সাহেবের খানা বাহিরে। বড় দুই দিদিমণিও খাওয়া সারিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। দুজনেই বলিয়া গেছেন, মা আগে ফিরিলে তাঁকে যেন বলা হয় তারা নিউ মার্কেটে গিয়াছে। বাড়ীতে আছে শুধু ছোট 'বাবা' আয়ার হেপাজতে।

'টেরাংকের তালার কল বিগড়ে গিচে। ম্যারামত করাতে যাচ্ছি।' বাবুর্চী হাতের ষ্টিলের ফুলের নকসা-আঁকা ছোট ট্রাঙ্কটার দিকে নিরুপায় দুঃখিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল। 'কোতপয়সা গচ্চা দিতে হবে বগমান জানেন।'

বেড়াতে বাহির হইতে হইলেই বাবুর্চী ফিটফাট হইয়া বাহির হয়। আজও ফর্সা ডোরা-কাটা পাজামা আর পাটভাঙ্গা সবুজ রঙের শার্ট পরণে। কেয়ারি-তোলা টেরীতে তেল চকচক করিতেছে। শার্টের পকেটে গোলাপী রেশমী রুমাল।

নিমাইয়ের বাক্স-ট্রাঙ্কের বালাই নাই। সুতরাং তাদের লইয়া সমস্যাও নাই। সে বাবুর্চীর ট্রাঙ্কের বিষয়ে আর মাথা না ঘামাইয়া চোখ বুজিয়া বিশ্রাম-লাভের চেষ্টা করিল।

বোধহয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। এমন সময় অসাড় কর্ণে একটা হাঁক আসিয়া পৌঁছাইল। অভ্যাস-বশে সে ধড়মড়িয়া তক্তপোষে উঠিয়া বসিল। একাধিক-বার ডাকিতে হইলে হরিশদা বকুনি লাগায়। ডাকা-মাত্র তাড়াতাড়ি উঠিতে হয়।

'এই নিমাই, শুনছিস। ছোট 'বাবা' ডাকছেন তোকে। শীগ্রি যা।'

নিমাইয়ের নিদ্রাতুর চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবার পর সে লক্ষ্য করিল, আজকের আহ্বায়ক হরিশ নহে। তক্তপোষের সামনে আয়া দাঁড়াইয়া।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ, আয়াদি?'

'আ মরণ, আমি আবার কোথায় যাব। 'ছোট বাবার কাছেই তো এতক্ষণ বসেছিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পার্ট অ্যাক্‌টিং করছে আঁর আমি বসে দেখছি। বাবা বললেন, তুমি কিছু ইংরেজি জানো না আয়া। যাও, শীগ্রি নিমাইকে ডেকে নিয়ে এসো। ওটা ইংরেজি জানে।'

নিমাই একটু গর্ব্বিতই বোধ করিল। ছোট 'বাবা' অমিতাদের স্কুলে থিয়েটার হইবে পূজার ছুটীর আগের দিন। 'স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড সেভেন ডোয়ার্ফস্।' নায়িকার ভূমিকায় নামিবে এইট্‌থ্ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ছাত্রী অমিতা চৌধুরী। গত মাসাধিক কাল হইল নাটকের মহড়া চলিতেছে। মহড়ার বাড়ীর অংশে মা ও দুই দিদি যথোচিত উপদেশ দিয়া, মোশন দেখাইয়া এবং প্রম্পট্ করিয়া সহায়তা করিতেছেন। দিদিরা দু'এক সময় প্রিন্স সাজিয়া পর্য্যন্ত সহ অভিনয় করে। নির্ব্বাক দর্শক হিসাবে আয়াকেও এই মহড়া সভায় উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছে নিমাই। কিন্তু তাহার ডাক এই প্রথম।

'ইংরেজি পড়তে পারিস তো? নে, এখান থেকে বলে যা।'

ছোট 'বাবা' মিতার দরবারে হাজির হইবার পর দ্রুত আদেশ আসিল এবং টাইপ-করা কাগজের গোছা আসিল হাতে।

'কি পড়ব?' নিমাই কাগজের উপর বোকার মত একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কিন্তু প্রায় কিছু তার বোধগম্য হইল না।

'যা লেখা আছে তাই পড়বি। কোথাকার গাধারে তুই।' অমিতা দেবী নিমাইয়ের হাতের কাগজের উপর ঝুঁকিয়া তার অপর প্রান্ত আঙুলে তুলিয়া ধরিয়া কহিল। 'এই দেখছিস না, ক্যাপিটেল অক্ষরে লেখা, এগুলি হলো যারা বলবে তাদের নাম। বাকিটা তাদের পার্ট। প্রিন্সের কথাগুলি তুই বেশ অ্যাকটিং করে বলবি। আর স্নো হোয়াইটের কথাগুলি আমার জন্য। সেগুলি আমি বলব—তোর প্রম্পটিং শুনে। প্রম্পটিং মানে আস্তে আস্তে বলে আমায় সাহায্য করা, যাতে পার্ট ভুলে বোকা না বনে যাই। বুঝলি তো। নে, এবার শুরু কর…'

বছর সত্তেরো আঠারোর চটপটে মেয়ে অমিতা। এখনও খুকী-ভাব অনেকটাই অবশিষ্ট আছে। সাহেব এবং মেম সাহেব দুজনেই তাকে ছোট্ট মেয়ে মনে করেন, এবং সেইরূপ ব্যবহার করেন। এখনও সে দিদিদের রকম-সকম পায় নাই।

জীবনে নিমাই অ্যাকটিং করে নাই। অনভ্যস্ত ইংরেজি পাঠ গড় গড় করিয়া পড়িয়া যাওয়াও তার পক্ষে সহজ নয়। সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজি কঠিন নয়। শব্দ-গুলি প্রায় সবই তার জানা। নিজের পৌরুষ সম্মান রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টায় সে যথাসাধ্য সহজেই পাঠ পড়িয়া গেল। দু চারবার ভুল করিল না এমন নয়। অতি কষ্টে ছোট বাবার চাঁটি এড়াইল। কিন্তু তার নিন্দা এড়াইতে পারিল না।

'দুর মুখ্খু, ও রকম করে কেউ কথা বলে। কোনও জন্মে থিয়েটার দেখিস নি? হাত-পা নাড়া, চোখ-মুখে একটু ভাব আনবার চেষ্টা কর। বলবার সময় সামনের ঐ বড়ো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখবি। যা বলছিস, মুখে-চোখে সেই রকম ভাব ফোটা চাই…'

'আমি পারছি না।' লজ্জিত বিপন্ন কণ্ঠে নিমাই কহিল। মাথার উপর বন্‌বন্ করিয়া পাখা চলা সত্ত্বেও বেচারি ঘামাইয়া উঠিয়াছে।

'পারছিস না কিরে?' মিতা উৎসাহ দিয়া কহিল। 'চেষ্টা করলেই পারবি। দু'দিন পরে আমাকে স্টেজে দাঁড়াতে হবে। ঠিকমত তৈরি না হয়ে তা কেউ পারে? তৈরি থাকলেও ঘাবড়ে যায়। অথচ কেউ বাড়ী নেই যে, সঙ্গে রিহার্সাল দিয়ে একটু সাহায্য করবে! নে, বল, এর পর কি? কি আছে, দেখি। ও, হ্যাঁ, প্রিন্স বলছেন; 'Oh, what a beautiful maiden!' বেশ মুগ্ধ হওয়ার সুরে বল…

নিমাইয়ের কণ্ঠ হইতে যে সুর বাহির হইল, তাহা রীতিমত করুণ!

'দূর, ও রকম করে' নয়।' হাঁটু মুড়ে দাঁড়াতে হবে। হাবিবদা বড়দির সামনে কখনও কখনও কি রকম হাঁটু মুড়ে দাঁড়িয়ে তার হাতের আঙুলগুলি কেমন আলতো করে ধরে দেখিস নি? সারাক্ষণ তো পর্দা ফাঁক করে ভেতরে উঁকি মারিস। ঠিক সেই রকম করা চাই। বাঁ পা'টা কিছুটা পেছনে সরিয়ে হাঁটুর কাছে আদ্দেক মুড়ে ফেলবি। ডান পাটা এগিয়ে আনবি শরীরের সামনে—প্রায় আমার কাছে—আর সেটাও মুড়ে দাঁড়াবি। তখন ডান হাত আর বাঁ হাত দুটো হাত দিয়েই আলতো করে আমার ডান হাতটা ধরে বলবি: "How I adore you, fair maiden!' বলিয়া নিজে পুরাকালের নাইটের পদ্ধতিতে ঝুঁকিয়া নিমাইকে বক্তব্য বুঝাইয়া দিল।

বুঝাইল তো বটে, কিন্তু হুকুম পালন করে কে? নিমাই বেচারী লজ্জায় সংকোচে আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। একে মনিব, তার উপর মেয়ে মানুষ! নিমাইয়ের চেয়ে এমন খুব ছোটও নয়। কি ভয়ংকর প্রস্তাব তার! সারা বাড়ীর এ অঞ্চলে তারা দুজন ছাড়া অন্য লোক নাই। সামান্য কিছুক্ষণ আগে ছোট বাবা বার কয়েক হাঁক দিয়াও আমার সাড়া পায় নাই।

'এ আমার হবে না, দিদিমণি। আমি আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি', বলিয়া নিমাই অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বিপদের ছুট লাগাইল।

'গাধা কোথাকার! তোর কাউকে পাঠাতে হবে না।' ছোট বাবার ক্রুদ্ধ উক্তি ক্ষীণ হইয়া কানে পৌঁছিল নিমাইয়ের।

চারটের কিছু পরেই মিসেস চৌধুরী বাড়ী ফিরিলেন। দুপুরের নিমন্ত্রণের পর নিশ্চয়ই বহুক্ষণ কেনাকাটায় কাটাইয়াছেন। গাড়ীর তূর্যধ্বনি শুনিয়া হরিশ বেয়ারা এবং নিমাই দুজনেই ছুটিয়া গেল। বহু জিনিষপত্র সওদা হইয়া আসিয়াছে। মেমসাহেব গাড়ী হইতে নামিবার পর উভয়ে সেগুলি নামাইতে লাগিল। কেক্-পেস্ট্রির বাক্স, বড় লোফ, টমাটো-গাজর-কড়াইশুঁটি পার্বলি পাতা, বেকিং পাউডার, মাষ্টার্ড ও জেলি পাউডারের কৌটো। তা ছাড়া একটা নতুন হোল্ড্, অল্, জলের

ক্লাব, দর্জির দোকানের প্যাকেট এবং আরও অনেক কিছু।

'আয়া, আয়া।' সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই মেম সাহেব হাঁক ছাড়িলেন। 'প্যাকেটগুলি ক্লাব আর হোল্ডঅল্ আমার ঘরে তুলে রাখ। আর ছোট 'বাবা'কে খবর দে—ওর জিনিষপত্তর সব এসে গেছে। বাবা, বাবা, এই বোকাগুলিকে নিয়ে আমি কি করব! অ্যাঃই ছোকরা, ক্রেপ কাগজগুলিকে দুমড়ে শেষ করছিস কেন? আলতো করে ধরে ছোটবাবার ঘরে পৌঁছে দে। ও দিয়ে রাজকন্তের মুকুট তৈরি হবে।···কোথায় গেল আয়া বাঁদরীটা। মেমসাহেবের কানে আওয়াজই পৌঁচুচ্ছেনা···'

আয়া "মেমসাহেবের" কানে সত্যই আর আওয়াজ পৌঁছাইল না!

বেয়ারা খুঁজিল, ছোকরা খুঁজিল, মোহিনী ঝি খুঁজিল। সারা বাড়ী খুঁজিয়া ও চেঁচাইয়াও তাকে পাওয়া গেলনা। তখন মেমসাহেব নিজেই আবিষ্কার করিলেন, যথাস্থানে আয়ার টিনের ট্রাঙ্কটি নাই। কোথাও তার কাপড় চোপড়, আয়না-চিরুণী তৃণখণ্ডটুকু পড়িয়া নাই।

বোচি! ছুটে গিয়ে বাবুর্চীর খোঁজ করো।' উত্তেজিত হুকুম করিলেন মেমসাহেব।

'বাবুর্চীদা দুপুরেই ট্রাঙ্ক মেরামত করতে বেরিয়ে গিয়েছে, এখনও ফিরে আসে নি।' নিমাই সবিনয়ে জানাইল।

'ট্রাঙ্ক নিয়ে বেরিয়ে গেছে; ওরে হতভাগা, সে কথা কাউকে জানাসনি কেন?' বজ্র ভাঙিয়া পড়িল নিমাইয়ের মাথার উপর।' এই বেকুব চাকর বাকর নিয়ে আমি কি করি বলো? ধরে চাবকাতে ইচ্ছে করে!··· পালিয়েছে। দুটোই পালিয়েছে। একগাদা গো মুখ্যু বসিয়ে যেই বাড়ীর বার হয়েছি, অমনি বদ্মাস মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে হারামজাদা বোর্চী সটকে পড়েছে!··· এখুনি আমি পুলিসে ফোন করছি। মজা টের পাওয়াচ্ছি। হারামজাদী অকৃতজ্ঞ মেয়েমানুষ···'

মিসেস চৌধুরী ছুটিয়া গিয়া অফিসে স্বামীকে টেলিফোন করিলেন। ফোন ধরিল তাঁর সেক্রেটারী সহদেব সরকার। তিনি সবিনয়ে জানাইলেন, সাহেব অফিসে নাই। লাঞ্চের সময়ই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, এখনও ফেরেন নাই। কোথায় গিয়াছেন বলিয়া যান নাই।

টেলিফোনের মুখে একটা বিরক্ত তিরস্কার চাপিয়া ফেলিয়া মিসেস চৌধুরী তাকে বিপদের কথা জানাইলেন এবং অবিলম্বে পুলিসে টেলিফোন করিতে বলিলেন।

'কিছু জিনিষপত্র নিয়ে গেছে কি?'

'ওদের নিজেদের জিনিষ সব নিয়ে পালিয়েছে! আমাদের কিছু কি আর নেয় নি···'

'আগে সেগুলির একটা লিষ্টি করে তবে পুলিশকে খবর দিলে ভালো হয় নাকি, মেমসাহেব?···'

দুম্ করিয়া সক্রোধে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিলেন মিসেস চৌধুরী। রাগে শরীরটা রী রী করিতেছে। আয়ার উপর, বাবুর্চীর উপর, বেয়ারার উপর, বোকা ছোকরার উপর, সহদেব সরকারের উপর, এবং সব চেয়ে বেশি নিজের স্বামীর উপর। সংসারের কোনও ঝামেলায় সে থাকিবে না। ক্লাব করিয়া, মদ খাইয়া, ফুর্তি করিয়া বেড়াইবে। যত হাঙ্গামা তার একলার। এই বিপদের সময়ও টেলিফোন করিয়া স্বামীকে পাওয়ার উপায় নাই!

'এত বছর ঘর করেছি, একদিনের তরেও শান্তি পাই নি। হাড় মাসে জ্বলে একশেষ হয়েছি।' দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিজের কাছে আক্ষেপ জানাইলেন চৌধুরী মেমসাহেব।

যথারীতি নিমাই যখন মোহিনীকে বাড়ী আগাইয়া দিতে গেল; তখন রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। পাশের রাস্তায় রামলীলা হইবে আগেই খবর পাইয়াছিল; নিমাইয়ের মনটা পড়িয়াছিল সেখানে।

কিন্তু রাতে মোহিনী একা কিছুতেই বাড়ী ফিরিবে না। তাকে না আগাইয়া দিয়া উপায় নাই।

বাঁ হাতের তেলোর উপর এলুমিনিয়মের থালা খবরের কাগজ দিয়া ঢাকা দেওয়া। অন্য হাত সামনে পিছনে দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের চেয়ে অনেক দ্রুত যাতায়াত করিতেছে। গতিটাও ইহার মানানসই। সঙ্গ রাখিতে নিমাইকে প্রায় দৌড়াইতে হইতেছে।

'খারাপ মেয়েমানুষ! নষ্ট মেয়েমানুষ! নইলে বাবুর্চ্চী ডাকলে, আর তুই লজ্জাসরম বেসজ্জন দিয়ে তার সঙ্গে বেইরে গেলি! বাবুর্চ্চী আমাদেরই কি কম ফুসলেছে! পেরেছে একচুলও টলাতে! ছি ছি! কি ঘেন্নার কথা। কোথায় যাব!'

মোহিনীর এই প্রতিক্রিয়ার সাথে তাল রাখিতে গিয়া নিমাইকে আরও দ্রুত ধাপ ফেলিতে হইল।

'বিবির মত সাজগোজ করে', চুলে রেশমী ফিতে বেঁধে, হাতে রুপোর চুড়ি বাজিয়ে ধরাকে সরা মনে করত! দেমাকে সাহেব মেমসাহেব ছাড়া কেউ চোখেই পড়ত না। আমিই বা যেচে কথা বলতে যাব কেন? আমি তেমন পাত্তর নই। তুই নাক সিঁটকোলে আমিই কি ছেড়ে দেবো! এইবার তো নিজের স্বরূপ দেখিয়ে গেলি! কি দরের মেয়েমানুষ তুই বুঝতে কারুর আর বাকি রইল না...'

নিমাই তেমনি নীরবে চলিতে লাগিল। রামলীলায় তার প্রাণ পড়িয়া আছে। অবশ্য মেমসাহেব যদি টের পান মোহিনীকে বাড়ী আগাইয়া দিয়া সে সরাসরি বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই, তবে তার কপালে বকুনি আছে। কিন্তু ধরা পড়িবার সম্ভাবনা খুবই কম। সাহেব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়াছেন এবং খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দশটার আগেই শুইয়া পড়িয়াছেন। অন্যেরাও ততক্ষণে ঘুমাইয়া গেছে। সুতরাং ঘণ্টা দেড়েক নিশ্চিন্তে রামলীলা দেখিয়া আসা যায়। শুধু দেরি করিয়া দিতেছে মোহিনীদি।

'তবে এও বলি', মোহিনী থালাটা হাত বদল করিয়া অনেকটা উত্তেজনা কমাইল, সবই যে ওরই দোষ তাও বলব না। দেখছিস তো মেমসাহেবের ব্যাভার, দিদিমণিগুলির ব্যাভার! চাকর ঝি যেন মানুষই নয়। রাস্তার কুকুরের অধম! আয়াকে নাই দিয়ে নষ্ট করেছে কে? মেমসাহেব নয়? আমি ওর দু' বছর আগে থেকে কাম করচি। কিন্তু যত আদর সোহাগ সব আয়ার! এখানে নিয়ে যাচ্ছে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে। খাস কামরার তদারক করাচ্ছে। জামা দিচ্ছে, শাড়ী দিচ্ছে। জুতো কিনে দিচ্ছে। লোককে দেখাবে, আমার কেমন সাজানো ঝি! সাজানো ঝি হলে তার এ রোগ থাকবেই। চাকর-বাকরে ফুসলোবে তার আর বিচিত্র কি! কিন্তু যেইমাত্র নিজের স্বার্থে ঘা পড়ল, অমনি অন্য মূর্ত্তি! কম হেনেস্তা হয়েছে মেয়েটার কাজ ছেড়ে দেবো বলায়। আট মাসের মাইনে আটকে রেখেচে। চড় চাপড় মায় নাতি পর্য্যন্ত খেতে হয়েছে মেমসাহেবের। পালাবার তো পথই খুঁজছিল। কেলেঙ্কারী করে বেরুল, এই যা ঘেন্নার কতা...ঘুম পাচ্চে নাকি রে ছোকরা? এক দম চুপ মেরে গিইচিস?

'না মোহিনী দি। তোমার কথা শুনছি।' নিমাই হুঁসিয়ার হইয়া কহিল।

'হাঁ শুনে রাখ। অনেক দেকিচি, শুনিছি, তবে বলছি। অনেক দামি কতা। যদি মনে রাখিস, আখেরে কাজ লাগবে।' মোহিনী খুশি হইয়া কহিল। 'মালিক জাতকে কখনও বিশ্বেস করিস নি। ওরা কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী। শুধু আদায় করার সম্পক। যতক্ষণ খুশি করছিস, হকের বেশি খাটছিস, নিজের ভালোমন্দ দেখচিস না, ততক্ষণ পিঠ-চাপড়ানি, মিষ্টি কথা, আদরের ডাক! হোক দুদিন অসুখ, কাজাবন্ধ কর, অমনি মালিকের মেজাজ আগুন! মানষের শরীরে ভালো আছে, মন্দ আছে, কে তার বিচার করে? ফাঁকি দিচ্ছে ব্যাটা, অসুকের ভড়ং কচ্চে, বসে বসে খাওয়ার খাচ্চে.দুর

করে দে হারামজাদাকে! বুঝেচিস, এই হলো মালিকের আসত রূপ। আমরাই বা তবে মায়া দেখাতে যাবো কেন? তুই বড্ড ছেলেমানুষ। নতুন কাজ আরম্ভ করেচিস। কিছু জানিস নে। যখনই সুযোগ পাবি কিছু করে নিবি। হাতে বাজারের পয়সা পেলে টাকায় যদি দুআনা রাখতে না পারিস, তবে আহাম্মুকীর জন্তে আখেরে পস্তাতে হবে। মেমসাহেব তোকে সাবধান করছিল, আশেপাশের বাড়ীর কেউ ফুসলোতে চাইলে যেন তাতে কান না দিস, এসে বলে দিস মেমসাহেবকে। আড়ি পেতে সব আমি শুনিচি। এ পরামর্শো কখনও শুনিসনি যেন। এটা তো মালিকের কত্তা। তার নিজের সুবিধের ব্যবস্থা। আমরা শুনতে গেলুম কেন সে কতা। যেখানে দুচার টাকা বেশি পাব, চলে যাবো। তবে, হাঁ, কায়দা করে যেতে হবে। নইলে মাইনে আটকে দেবে হারামজাদারা···এসে পড়েছি। অনেক রাতও হয়ে গেছে। আজ আর নয়। কর্ত্তা এসে বসে আচে নিচ্চয়ই! আর একদিন বলে দেব'খন কি করে ছুতো করে পালাতে হয়। নিজের পুরো প্রাপ্য হাতে নিয়ে সরে পড়তে হয়। নে, এবার যেতে পারিস···'

মোহিনী থালা হাতে সবেগে বস্তির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বিরাট একটা বোঝা নামিয়া গেল নিমাইয়ের কাঁধ হইতে।

রামলীলা হইতে ফিরিতে নিমাইয়ের রাত একটা হইল। তখনও রামলীলা শেষ হয় নাই। তবে বেশি রাত করিয়া শুইলে সকালে উঠিতে দেরি হইবে। বকুনি খাইতে হইবে।

রাতের রাস্তা নির্জ্জন। এই রাস্তায় হাঁটিতে বড় ভাল লাগে নিমাইয়ের। নিজেকে বিশেষ মনে হয়। সে আর ভিড়ের নগণ্য একজন নয়। সবগুলি বাড়ীর জানালা, সবগুলি নিঃশব্দ গাছ এবং গ্যাসের আলো যেন মিটমিট করিয়া তাকাইয়া নিমাইকে লক্ষ্য করিতেছে।

উডবার্ণ পার্ক হইতে সামান্ত আগাইলেই বড় রাস্তা। সেখান হইতে বাঁয়ে মোড় লইয়া একটু পরেই আবার ডাহিনে মোড় লইতে হইবে। আর পাঁচ মিনিটেরও পথ নয়।

দূর হইতেই নিজেদের বাড়ীটা নজরে পড়িল নিমাইয়ের। নৃসিংহগড়ের রাজার বাড়ীর গ্যারাজের সামনে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। এখনও ভেতরে রাখা হয় নাই। ওখান হইতে ছুটো বাড়ী পরেই নিমাইদের বাড়ীর ফটক। নিমাই হাঁটিতে হাঁটিতে শুদ্ধ গাড়ীটার কাছাকাছি বিপরীত দিকে হাজির হইল।

গাড়ীটা রাজবাড়ীর নয়। রাজবাড়ীর সব গাড়ীই তার চেনা। অথচ এ গাড়ীটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হইল নিমাইয়ের। কার গাড়ী এটা? কোথায় দেখিয়াছে এটাকে?

'গুপ্তসাহেবের গাড়ী।' আবিষ্কারের আনন্দে সে প্রায় সশব্দে কহিল এবং দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। এ রাত্রে কি চান গুপ্তসাহেব? যদি কাউকে ডাকিতে হয়, নিমাই ডাকিয়া দিতে পারে। হয়তো নিমাইকে দেখিলে তিনি নিজেই কোনও কাজ দিবেন।

সহসা নিমাইয়ের সাগ্রহ যাত্রা বাধা পাইল। ভূত দেখিলেও এতটা ভয় পাইত না নিমাই; এর অর্দ্ধেকও চমকাইয়া উঠিত না। ওপারের ফুটপাথ ধরিয়া গাড়ীর কাছে হাজির হইয়াছেন তাহাদেরই মেমসাহেব! নিমাই অবলীলাক্রমে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল মোটর গাড়ীর আড়ালে।

'কই, জিনিসপত্র কোথায়? ছোকরাটাকে দেখছি নে তো? 'তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

চালকের আসনে বসিয়াছিলেন গুপ্তসাহেব; দ্রুত কাছের দরজা খুলিয়া দিলেন।

'আমি যাচ্ছি নে।'

'সে কি। কি হলো!' সবিস্ময়ে চাপা গলায় কহিলেন গুপ্তসাহেব। 'তামাশা করো না। এসো, এদিকে দিয়ে ঘুরে এসো। পেছনটা তোমার জিনিষপত্র রাখবার জন্ত খালি রেখেছি। আমার সব লগেজে-বুটে আছে···'

'আমার যাওয়া হলো না।' চৌধুরী মেমসাহেব সিদ্ধান্তের কণ্ঠে কহিলেন।

'কি ব্যাপার!" প্রায় রুদ্ধ গলায় কহিলেন গুপ্ত সাহেব।

'ফিরে এসে দেখি আয়া হারামজাদী বাবুর্চির সঙ্গে সরে পড়েছে।'

'তাতে আটকাচ্ছে কোথায়? চলে এসো।'

'আটকাচ্ছে কোথায়?' মিসেস চৌধুরী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন। 'আভিজাত্য বলে কি কিছু নেই? শেষে আমারই আয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হবে আমাকে। সে আমি পারব না। যে প্রমিস করেছিলাম, সে প্রমিস সর্বস্ব ত্যাগ করেও রক্ষা করতাম। কিন্তু তা বলে আয়া এলোপ করার পর তার মনিব কখনও এলোপ করতে পারে? আত্মসম্মান বলে কি কিছু নেই?...'

'একি ছেলেমানুষি নলিনী। কাছে এসে বসো। কি হয়েছে ভাল করে শোনা যাক। প্লিজ। ভেতরে এসো বসো। পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে।' গুপ্ত কাতর কণ্ঠে কহিলেন।

মিসেস চৌধুরী এক সেকেণ্ডকাল নীরব রহিলেন। তারপর গাড়ীর সামনে দিয়া ঘুরিয়া অপর দিকের দরজার দিকে আগাইয়া আসিলেন। অত তাড়াতাড়ি নিমাইয়ের ব্যাপারটা বোধগম্য হয় নাই। এইবার সে প্রমাদ গণিল। পালাইবার আর কোনও উপায়ই নাই।

'কে এটা! কি করছিস তুই এখানে।' নলিনী চৌধুরীও যেন চমকাইয়া গেছেন। 'বেয়াদপ ছোকরা, এত রাত্তিরে এখানে কেন তুই? আড়ি পাতছিলি? সাহেবের হয়ে স্পাইং করছ। দাঁড়া হতভাগা, তোর মজা দেখাচ্ছি। চাব কিয়ে তোকে লাল করব। এত বড় তোর সাহস! এত বড় তোর বেয়াদপী। এক্ষুনি তুই বিদায় হবি। এত বদমাসের জায়গা নেই আমার বাড়ীতে' এই মুহূর্তে চলে যেতে হবে...'

হিংস্র বাঘিনীর মত ফুলিয়া উঠিলেন নলিনী চৌধুরী। নিমাই স্বপক্ষে কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিল। এই ঝঞ্ঝার মুখে তার ক্ষীণকণ্ঠের অস্পষ্ট প্রতিবাদ একেবারে দূরে উড়িয়া গেল। মার খাওয়া কুকুরের মত লেজ গুটাইয়া সে বাড়ীর ফটকের দিকে নিতান্ত অপরাধীর মতো অগ্রসর হইল।

'কাপড়-জামা যা কিছু আছে তোর সব নিয়ে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যা।' প্রায় হুঙ্কার করিয়া কহিলেন চৌধুরী মেমসাহেব। 'আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সমুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবি...দশটা টাকা দাও তো। দিয়ে আপদ বিদেয় করি...'শেষোক্ত লাইন দুটি গুপ্তের প্রতি।

ষোল

'চিনিস ছোক্‌রাকে?'

'হাঁ হুজুর।'

'কি করে' জানিস? রাস্তায় চেনা?'

'উহ্ তো মিঠাই দুকানে থাকে। বোবাজার ইস্‌টিরিট...'

বস্তুতঃ রাস্তায় চেনা রামভরোসাকে ভরসা করিয়াই নিমাই ডিকসন লেনের এই অচেনা প্রকাণ্ড বাড়ীটার দোতলায় উঠিয়া আসিয়াছে। বহুবাজারে বাসকালেই রামভরোসার সঙ্গে চেনা হয়। তার চেয়ে বয়সে কিছু বড়। বাড়ী ছাপরা জেলা। বেশ একটু চটপটে ছেলে। দুবেলাই রিকসা টানে। বহুদিন ধরিয়াই টানিতেছে বলিয়া মালিক খাতির করিয়া দৈনিক দুই টাকা ভাড়া লইয়া রিকসা দেন। সারা দিন যাত্রী বহন করিয়া ইহার উপর যতটা বেশি কামায় ততটাই তার লাভ। তবে একেবারে নীটু লাভ নয়। পুলিশের কৃপা এড়াইবার জন্য প্রায়ই কিছু টেঁক হইতে খসাইতে হয়। ইহা সত্ত্বেও দিনে থোক্ না আড়াই টাকা তিন টাকা হাতে থাকে। স্বাধীন জীবন। নিজের ইচ্ছামত এখানে যাও, ওখানে দাঁড়াও। কাহারও হুকুমের গোলাম নহে। তবে খাটুনি আছে।

এই স্বাধীনতার কথাটাই নিমাইকে আকৃষ্ট করিয়াছে। অবশ্য ভাল মন্দ বিচারের অবস্থা তার নয়। তিন মাসে দুই বাড়ীর 'চাকরী'তে ইস্তাফা দিয়া গত দশ দিন সে ক্যা ক্যা করিয়া ঘুরিতেছে। দুদিন বনমালীর কাছে খাইয়াছে। ভারি লজ্জা করে তার অন্নেরটা খাইতে। বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া দু' চার পয়সার যাহা কিছু কিনিয়া খায়। শুইতে অবশ্য বনমালীদার কাছ ছাড়া জায়গা নাই। বনমালী খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে নানা অজুহাত দেখায়।

এই অবস্থায় রামভরোসাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নিমাই পুরাতন বন্ধুত্বটা সানাইয়া লয়। রিক্সাটা আয়ের একটা প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু কোথায় রিক্সা পাওয়া যায়, কেইবা ভরসা করিয়া অপরিচিত চালকের হাতে রিক্সা ছাড়িতে রাজি হইবে এই সব সমস্যার কোন সমাধান করিতে না পারিয়া এদিকে অতীতে সে নজর দেয় নাই। অনন্যোপায় হইয়া এবার সে রামভরোসার শরণ লইল সেই। তাকে ডিকসন লেনে রিক্সা মালিকের বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে।

'কোনও দিন রিক্সা টেনেছিস ?'

'না বাবু! তবে আমি পারব। পরিশ্রম করতে ভয় পাই না।'

'নাম ঠিকানা বল ?'

নিমাই নাম ও বনমালীদার ঠিকানা দিল।

'বেলা এখন পৌনে চারটে।' মালিক হাতঘড়ি দেখিয়া কহিলেন। 'ধর, চারটেই। রাত দশটায় ফেরৎ দিয়ে যেতে হবে। ভাড়া—যা তুই নতুন টানছিস—এক টাকাই দিস এক বেলার জন্য…কিন্তু আগাম দিতে হবে…'

নিমাই রাজি হইয়া ট্যাঁক হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া দিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে রামভরোসা চুপে চুপে কহিল, মালিকেরা এই রূপই বজ্জাত হয়। পুরা ভাড়া আগাম আদায় করিয়া ভাব দেখাইল যেন বেশ দয়া দেখাইয়াছে। তা ছাড়া যে রিক্সাটা নিমাইয়ের জন্য ধার্য্য হইয়াছে তাতে একটা নম্বর থাকিলেও তাহা ভুয়া নম্বর। ওটা মোটে লাইসেন্সকরা রিক্সা নয়। তবে কোনও ভয়ও নাই। ইহা কেহই ধরিতে পারে না। বাড়ীতে ইন্‌স্পেক্টর আসিলে মালিকের লোক এই সব লাইসেন্সহীন রিক্সা বাড়ী হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। তখন আর পাকড়াইবার জো থাকে না।

অনভ্যস্ত হাতে রিক্সার সামনের ডাণ্ডা ধরিয়া মাত্র দু' পাঁচ পা আগাইয়াছে। এরই মধ্যে সোয়ারির আহ্বান আসিল। রামভরোসাও একই সঙ্গে নিজের রিকসা লইয়া বাহির হইয়াছে। সেই নিমাইকে আগাইয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। কহিল, লে, বৌনি করলে। তেরা ভাগ্য আচ্ছা হ্যায় মালুম হোতা হ্যায়। বহুত পয়সা মিলে গা!

নিমাই একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বন্ধু রামভরোসার দিকে চাহিয়া প্রথম সওয়ারির উদ্দেশে আগাইয়া গেল।

ঠাকুমা, নাতনী ও ছোট কাকা এই তিনজন সওয়ারি। ঠাকুমা বৃদ্ধা ও শীর্ণকায়; নাতনী বছর তিনেকের আর ছোট কাকা চৌদ্দপনেরোর। বোঝা ভারি নয়। রিক্সার চাকা সামান্য টানেই গড়গড়াইয়া চলে। তবে হাতের মাংসপেশীতে চাপ পড়ে। গামছা দিয়া ডাণ্ডা ধরিবার কায়দা রামভরোসাই শিখাইয়া দিয়াছে। আরও দু'পাঁচটা উপদেশ দিয়াছে। কিন্তু একক সদর রাস্তায় পড়িয়া নিমাইয়ের ভারি অসহায় বোধ হইতে লাগিল। অনেক দায়িত্ব তার। অতএব ট্রাম বাস মোটরের ভিড়ের মধ্য দিয়া যাত্রীকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে চালককে।

'মাকে আজ নিশ্চয় কিন্তু নিয়ে আসব ঠাকমা।'

'দূর, তা কি হয়। অসুখ সেরে গেলে তবে আসবে। নইলে ডাক্তারেরা ছাড়বে কেন ?

'ভারি দুষ্টু ছোট ভাইটা না? সেই তো মাকে অসুখ দিয়েছে। আমি একটুকুও ওকে ভালো বাসবো না। ওকে বাড়ী এনে কাজ নেই। না ছোট কাকা?'

'এরই মধ্যে হিংসে শুরু করেছিস শয়তান! ছোট কাকা ভ্রাতুষ্পুত্রীর কোঁকড়ানো চুল মৃদু টানিয়া কহিল। 'ভাইকে বাড়ী না আনলে কে দিদি ডাকবে তোকে?'···

'সাবধানে রাস্তা পার হবে, রিক্সাঅলা।' ঠাকুমা সাবধানতা হিসাবে কহিলেন। 'হাসপাতালের বড় গেট দিয়ে ঢুকে সরাসরি এগিয়ে যাবে······,

নিমাই সত্যই একটু অসাবধান হইয়াছিল। যাত্রী বহনের চেয়ে যাত্রীর কথাবার্ত্তার দিকেই তার নজর গিয়াছিল। গন্তব্যস্থল যে বড় রাস্তার হাসপাতাল তা সে আগেই শুনিয়াছে। কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল, খুকুর একটি নতুন ভাই হইয়াছে। মায়ের অনুপস্থিতিতে এবং নবজাতকের আবির্ভাবে খুকু অসন্তুষ্ট। চারটায় হাসপাতালের ভিসিটিং আওয়ার শুরু হয়, নিমাই জানে। খুকুর মার খোঁজ করিবার জন্য চলিয়াছে সবাই।

ট্রামের টিং টিং টিং নিমাইয়ের কানে পৌঁছায় নাই। অন্যমনস্কভাবেই হয়তো সে রাস্তা পার হইত। এমন সময় খুকুর ঠাকুমার সাবধান বাণী তাঁকে হুঁসিয়ার করিল। মনে মনে নিজেকে ধমকাইল নিমাই। যাত্রীর কথাবার্ত্তায় কান দেওয়া রিক্সাঅলার চলিবে না। রাস্তার বিপদ অনেক!

বৌনিটা বোধহয় ভালই হইয়াছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিমাই এক টাকা তুলিয়া ফেলিল। আর যাই হোক, গাঁটের পয়সা গচ্চা দিতে হইবে না!

'এই রিক্সা!'

ডান দিকে শিয়ালদ স্টেশন—নিমাইয়ের কলিকাতার প্রথম আবাসস্থল। বাঁ দিকে শিয়ালদ বাজার। বাজারের দিকের ফুটপাথ হইতেই ডাক আসিয়াছে। নিমাই স্টেশনের দিক হইতে স্মৃতি মন্থনোদ্ভত দৃষ্টি তাড়াতাড়ি সেদিকে ফিরাইয়া সম্ভাব্য যাত্রীকে দেখিয়া লইল। কিন্তু মুস্কিল করিয়াছে ঠেলা, মোটর ও রিক্সার ভিড়। ফুটপাথের কাছে ঘেঁষিবার জো নাই। যাত্রীর ইঙ্গিতে সে সামনের দিকে আগাইয়া গেল রিক্সা ভিড়াইবার মতো জায়গা জোগাড়ের চেষ্টায়।

কিন্তু তার দরকার হইল না। রাস্তার মাঝখানেই যাত্রীমশায়ের মুটে দুটো বিরাট চ্যাঙাড়ি রিকসার পা রাখিবার জায়গায় চাপাইয়া দিবার পর যাত্রী স্বয়ং সার্কাসের শিল্পীর দক্ষতার সঙ্গে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া রিক্সার আসনে আসীন হইলেন, এবং মুটের ভাড়া প্রায় ছুঁড়িয়া দিয়া আদেশ করিলেন, কলেজ ষ্ট্রীট বাজার······'

মালের ওজন টের পাইবার আগেই নিমাই মালের পরিচয় জানিতে পারিল। একগাদা আঁসটে গন্ধ নিমাইয়ের অসতর্ক নাকের দুই ছ্যাঁদা দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। অবলীলাক্রমে 'ওয়াক' করিয়া উঠিল নিমাই।

পায়ের কাছে ভারি ওজনের জিনিষ রিকসার ওজন অনেক পরিমাণ বেশি বাড়াইয়া দেয়, নিমাই তাহা সহজেই বুঝিতে পারিল। তবুও ইহা এমন কিছু নয় যে টানা যায় না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়া কলেজ ষ্ট্রীট বাজারের দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে দুই চ্যাঙাড়ি মাছের মিলিত গন্ধে তার নাড়ী উল্টাইবার উপক্রম হইল। বৌবাজারের বাজারের কাছে বহুবার সে জেলেদের রিক্সায় চড়াইয়া মাছের চ্যাঙাড়ি আনিতে লইতে দেখিয়াছে। মাছ ও জেলের প্রতিই তখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হইত। রিক্সা চালককে পরিশ্রমের উপরেও যে এতটা সহ্য করিতে হয়, তা কখনও ভাবে নাই। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে পরের কষ্ট কেউই সবটা বুঝিতে পারে না।

'নে ধর', গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া হাঁক ডাক করিয়া রিক্সা থামাইয়া ফুটপাথে অবতরণ করিবার পর হাতের সমাপ্তপ্রায় বিড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যাত্রী নতুন আদেশ করিলেন, 'চ্যাঙাড়ি দুটো ভেতরে পৌঁছে দিতে হবে। চটপট করে নে···'

'তা আমি পারব না। আপনি মুটে ডাকুন।'

'ওরে বাবা! একেবারে লাটসাহেব দেখছি। মৎস্য-ব্যবসায়ী মহাশয় বিরক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সব্যঙ্গে কহিলেন।

'এ জন্যই তো বাঙালীর ভাত গেল। রিক্সা টানছেন, ইদিকে মানের নাড়ী টনটনে।...এই মুটিয়া, আয়! বলিয়া ফুটপাথে অপেক্ষমান ঝাঁকা মুটেদের দিকে হাঁক ছাড়িলেন।

অনেকটা দূরের পথ আসিয়াছে। ছয় আনায় এতদূর কেহই আসিত না। কিন্তু একে তো নিমাই আগে হইতে ভাড়া ঠিক করিয়া লইবার সুযোগ পায় নাই, তার উপর মাছের চ্যাঙাড়ি ভিতরে বহন করিতে অস্বীকার করিয়া যাত্রী মশায়ের বিরক্তি উদ্রেক করিয়াছে। সে আর ভাড়ার পরিমাণ লইয়া তর্ক করিল না। বুঝিল, রাগের ভাব দেখাইয়া লোকটা মুটে ভাড়া নিমাইয়ের প্রাপ্য হইতেই কাটিয়া লইয়াছে! ব্যবসা-বুদ্ধি আছে।

'রিক্সা!'

কলেজ স্ট্রীটের মোড় হইতে বাঁ দিকে মোড় লইয়া নিমাই তাহার স্বল্পকাল পূর্ব্বে অতিক্রান্ত পথেই শিয়ালদর দিকে ফিরিতেছিল। কলিকাতার অধিকাংশ অঞ্চল জানা থাকিলেও শিয়ালদ বৌবাজারের দিকটাই তার সুপরিচিত। ওদিকে কাজ করিতেই সে পছন্দ করিবে। এমন সময় একটা জলুসদার হোটেলের কার্পেট-মোড়া সিঁড়ির শেষ ধাপ হইতে হাঁক আসিল। অনেকক্ষণ হয় সন্ধ্যা হইয়াছে। চারদিকে আলোর ঝলমলানি। হোটেলের ঝলমলানি আরও বেশি। এই আলোর মধ্য হইতে প্যাণ্টকোর্ট টাই পরা এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া নিমাইয়ের রিক্সায় আসীন হইলেন।

'কোথায় যাব বাবু?' দু তিন সেকেণ্ড সওয়ারির আদেশের অপেক্ষায় থাকিবার পর নিমাই প্রশ্ন করিল।

'বাবু নয়, সাহেব।' জবাব আসিল গম্ভীর গলায়।

'আজ্ঞে?' না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল নিমাই।

ব্যাখ্যা আসিল না, কিন্তু এবার আদেশ আসিল গম্ভীর গলায়।

'প্রথমে বাঁয়ে, তারপর ডাইনে, তারপর বাঁয়ে তারপর ডাইনে। আরও আছে...হিক...'

নিমাই আদেশ অনুযায়ী বাঁ দিকের গলিতে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর ডাইনে ঘুরিল। বাঁয়ে মোড় লইল। আবার ডাইনে গেল, আবার বাঁয়ে গেল। এমন বহুবার হইল। তবুও গন্তব্য জায়গা আসিল না।

'এবার কোন্ দিক?'

'ডাইনে।'

'এখন?'

'বাঁ।'

গত আধঘণ্টা যাবত নিমাই রিক্সাতে এই দুইমনী আরোহী লইয়া অসংখ্য গলিতে এ মোড় ও মোড় কেবলই মোড় লইয়া ঘুরিতেছে। এত গলি শহরে আছে সে জানিতই না। যেন গোলকধাঁধার মধ্যে পড়িয়াছে। দিক জ্ঞান, ভূগোল জ্ঞান সব তালগোল পাকাইয়া গেছে তার।

'নামুন বাবু। আর আমি যাব না।'

'যাবি না কিরে বদমাস। আলবাৎ যাবি। যেতেই হবে।' হুঙ্কার করিয়া উঠিল সওয়ারি। 'মেরে পাট বানিয়ে দেব। আমি মুখার্জ্জি সাহেব—হিক্!

লোকটা মাতাল এমন সন্দেহ নিমাইয়ের কিছুক্ষণ ধরিয়াই হইয়াছিল। কিন্তু রিক্সা হইতে নামায় কি করিয়া? ভারিক্কী চেহারা, তিরিক্ষি মেজাজ। আরব্যো-পন্যাসে সিন্দুবাদ নাবিকের কাঁধে এক বেপরোয়া বুড়া কায়েম হইয়া বসিয়াছিল। তাহার কাঁধেও কি তেমন আরেকটা বুড়া কায়েম হইয়া বসিল, নিমাই সভয়ে ভাবিল। কিন্তু একে নামানো যায় কি উপায়ে? এক রিক্সা রাখিয়া ছুটিয়া পালাইতে পারে। কিন্তু তারপর রিক্সার কি হইবে? মালিককে রাত দশটার মধ্যে গাড়ী ফেরৎ দিতে হইবে। এখন রাত কোন্ না পৌনে ন'টা। পালাইয়া গিয়া সে কি মালিকের সম্পত্তি নষ্ট করিবে? রামভরোসার বন্ধুত্বের এই প্রতিদান দিবে সে?

'এবার ডাইনে, তারপর বাঁয়ে, তারপর ডাইনে।'

বিপন্ন সিন্দুবাদের মত নিমাই কাঁধের সওয়ারির হুকুম তামিল করিয়া চলিল। এই নিষ্ঠার পুরস্কার মিলিল কিন্তু চাঞ্চল্যকর। একবার চমকাইয়া নিমাই দেখিল, তারা ঠিক সেই হোটেলের সামনে উপস্থিত, যেখান হইতে

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আগে এই বিচিত্র সওয়ারি লইয়া সে ডান-বামের গোলকধাঁধায় ঘুরিতে বাহির হইয়াছিল।

'থামা। আর দু গেলাশ টেনে নিই। পেট্রোল না হলে মোটর চলে না। তারপর আবার ডাইনে, আবার বাঁয়ে।...খবরদার, পালাস নি যেন।' বলিয়া সাহেব শ্লথগতি রিক্সা হইতে ফুটপাথে পদার্পণ করিলেন। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়া দুটো টাকা বাহির করিয়া নিমাইয়ের মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিয়া স্খলিতপদে উপর তলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইলেন।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল নিমাইয়ের। পারিশ্রমিক না পাইলেও সে আফশোষ করিত না। রেহাই পাইয়াছে ইহাই যথেষ্ট মনে করিত। টাকা দুটো সে ট্যাঁকে গুঁজিল। কিন্তু আর মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিল না। কদমে চলা ঘোড়ার মত ছুট লাগাইল রিক্সা পিছনে লইয়া।

'এই ছোকরা, থাম। ছুটছিস কেনো?

নিমাই প্রমাদ গণিল। পুলিশ!

কনেষ্টবল সাহেব দ্রুত পা চালাইয়া দাঁড়াইয়া-পড়া নিমাইয়ের রিক্সার কাছে হাজির হইলেন।

'টি পি-র হাত দেখতে পাস নি শূয়ার? চৌরাস্তার মোড়ে না খাড়া হোয়ে বরাবর চলে এলি?...

'আজ্ঞে না কনেষ্টবল সাহেব, মোড়েতে তো কোনও পুলিশ ছিল না। আমি ভালো করে' দেখে পার হয়েছি, তোতলাইয়া কহিল নিমাই। মহা ফ্যাঁকরায় পড়িল তো সে! সত্যই সে ভাল করিয়া দেখিয়া মোড় পার হইয়াছে, কোনও ট্রাফিক পুলিশই সেখানে ছিল না।

'চুপ রও উল্লু। চল্, থানা চল্।'

একে পুলিশেই কথা নাই, তার উপর থানা! নিমাই চোখে অন্ধকার দেখিল। রামভরোসা ভরসা দিয়াছিল, বৌনি শুভ হইয়াছে। ইহাতে আর সন্দেহ কি? আশ্বাস দিবার পরিবর্ত্তে পুলিশের বিপদ সম্বন্ধে যদি তাকে সতর্ক করিত, তবে অনেক ভালো করিত।

কনেষ্টবল সাহেবের ডিউটি ছিল রাত সাড়ে আটটা অবধি। সওয়া আটটা অবধি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। তারপর আধঘণ্টা মোড়ের পান বিড়িলেমনেডের দোকানের আতিথ্য মুক্ত গ্রহণ করিয়া দিনের বাড়তি উপার্জ্জন দোকানের মালিকের হাত হইতে বুঝিয়া গণিয়া লইয়াছেন। এখন রাত ন'টা। মুক্ত বিবেকে এবার তিনি বাড়ী ফিরিতে পারেন। এমন সময় নিমাইয়ের দৌড়াইয়া-চলা রিক্সা তাঁর দৃষ্টিগোচর হইল। অভ্যাস বশতঃ তিনি হাঁক ছাড়িয়া রিক্সা থামাইলেন।

'লে, থানায় নিয়ে চল।' নিমাইয়ের রিক্সাতে আসীন হইয়া আদেশ করিলেন আইনরক্ষক।

উপায় নাই, চলিতেই হইবে। রিক্সা এইবার বিনা পয়সার সওয়ারি লইয়া চলিল। সামান্য এক বেলার অভিজ্ঞতায় বিচিত্র মানুষ দেখিয়াছে নিমাই। তার শেষ পরিণাম যে এতটা ভয়ংকর হইবে নিমাই কল্পনাও করে নাই। হাঁটু দুটো মুড়িয়া আসিবার উপক্রম হইল। কাঁধের মাংসপেশীর ব্যথা এবার তীব্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। গামছার গদি ভেদ করিয়া রিক্সার ডাণ্ডার কাঠ হাতে ফোস্কা ফেলিতে শুরু করিল। ফাঁসির কয়েদীকে নিজের ফাঁসিকাঠের দড়ি তৈরি করিতে বাধ্য করা হইলে তার মুখের ভাবখানাও বোধহয় নিমাইয়ের মুখের মত এত করুণ হইত না।

রামভরোসা বলিয়াছিল, এ রিক্সার লাইসেন্স নাই, এটা চোরা-রিক্সা। নিজের এবং মালিকের উভয়ের বিপদই টানিয়া আনিবে নিমাই। আর কোনও উপায় নাই।

'জমাদারসাহেব, আমি নতুন। আজই প্রথম রিক্সা টানছি। আজ মাফ করে দেন। আমি রিফুজী!' নিমাই নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড আঁকড়াইবার মত অসহায় কণ্ঠে কহিল। ক্ষিধের জ্বালায় রিক্সা টানতে গিয়েছিলাম। নইলে আমি লেখাপড়া জানা লোক।...

'জরিমানা দিতে পারবি?'

'কত জরিমানা!' নিমাই অকূলে কূল পাইয়া কহিল 'কত কামিয়েছিস?'

'তিন টাকা দশ আনা। তার মধ্যে এক টাকা মালিককে দিতে হবে...'

'দিতে হবে' কথাটা নিমাই বেশ ডিপ্লোমেসির সঙ্গে বলিল। ইতিমধ্যেই দিয়া আসিয়াছে বলিলে তার সব টাকা ধরিয়াই হয়তো টান পড়িবে। মালিক তার প্রাপ্য ছাড়িবে না জানিলে কনেষ্টবল সাহেব হয়তো বা দয়া দেখাইতে পারেন।

'খাড়া হো জা। কোতোয়াল সাহেবকে পুছে লিই।

বৌবাজার আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশের কাছে সাইডকার সংযুক্ত মোটর সাইকেলে চড়া জনৈক পুলিশ-সার্জেন্ট আগেই নিমাইয়ের নজরে পড়িয়াছিল। কনেষ্টবল রিক্সা থামাইয়া তাহার কাছে হাজির হইয়া বড় একটা সেলাম করিয়া আবার নিমাইয়ের কাছে ফিরিয়া আসিল।

'সাড়ে তিন রুপয়া জরমানা হোয়েছে।...লে, ঐ পানওয়ালার দুকানে জমা করে দে...'

নির্দেশ অনুযায়ী পানওয়ালার হস্তে পুরা টাকা জমা দিয়া রিক্সার কাছে ফিরিয়া নিমাই কনেষ্টবল সাহেবকে আর দেখিতে পাইল না। সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, না খাইয়া মরিলেও আর কোনও দিন রিক্সা টানিবে না।

ক্রমশঃ

ব্রিটেনের দুইজন রাষ্ট্রনেতা ডিজরেলী ও গ্ল্যাডষ্টোন

জুলফিকার

ব্রিটেনের রাজনীতির ক্ষেত্রে ডিজরেলী ও গ্ল্যাডষ্টোন দুটি অবিস্মরণীয় নাম, ওঁরা দুজনেই সমসাময়িক। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির দিক থেকে কেউ কারো চেয়ে কম ছিলেন না। ডিজরেলী ছিলেন কট্টর রক্ষণশীল আর গ্ল্যাডষ্টোন উদারপন্থী লিবারেল নেতা। বয়সে গ্ল্যাডষ্টোন ছিলেন বড়। ওঁরা দুজনেই ইংল্যাণ্ডের প্রাইম মিনিষ্টার হয়েছিলেন।

ডিজরেলী পরে প্রিমিয়ার হন,—উপাধি পান Lord Beaconsfield. ডিজরেলিকে সবাই ডাকত ডিজ্জি (Dizzy) বলে। ফিটফাট, সৌখিন লোক, তবে মুখে তার কিছু দাড়ি গোঁফ ছিল, সেকালে দাড়ি রাখাটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নামকরা লোকেরা প্রায়ই দাড়ি রাখতেন,—কি যুবা, কি বৃদ্ধ।

ডিজরেলীর সামনের দিকে চুল অনেকখানি উঠে গেছল। গ্ল্যাডষ্টোনেরও মাথায় বেশ খানিকটা জুড়ে ছিল মসৃণ টাক। তিনি দাড়ি গোঁফ পরিপাটি করে কামাতেন, তবে কানের নীচে, চিবুকের দুপাশে সে যুগের রেওয়াজ অনুযায়ী হুইস্কার রাখতেন।

সাজগোজে ডিজরেলী ছিলেন ফুলবাবুটি কিন্তু গ্ল্যাডষ্টোনের পোষাক-আষাকে তেমন কিছু পারিপাট্য বা আড়ম্বর ছিল না। নজরে পড়বার যা ছিল তার কোণ ভাঙা কড়া ইস্ত্রির কলার, যা গলার দু'পাশে খাড়া, উঁচু হয়ে থাকত। সে-কালে PUNCH প্রভৃতি ব্যঙ্গ পত্রিকায় তাঁর যেসব কার্টুন ছাপা হত, তাতে তাঁর এই কলারেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

গ্ল্যাডষ্টোন বহুদিন যাবত পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। শেষ দিকটায় তিনি কানে কম শুনতেন, তবে তাঁর বক্তৃতার তেজ ও আবেগ বয়সের জন্য কিছুমাত্র মন্দীভূত হয় নি। সবাই তাঁকে বলত GOM—অর্থাৎ Grand Old Man. গ্ল্যাডষ্টোন ছিলেন স্পষ্টভাষী—ঢেকে ছেকে কিছু বলবার অভ্যেস তাঁর ছিল না। তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধেও কারো মনে কোনদিন সংশয় জাগে নি। অকপটতা ও স্পষ্ট ভাষণেই তাঁর বক্তৃতাকে জোরালো করে তুলত। His power lay in his unreservedness.

বক্তৃতা দিতে উঠে প্রায়ই আত্মহারা হয়ে পড়তেন, কথায় ঝরত তার আগুনের হল্কা। কথার তোড়ে তাঁর বটন-হোলের ফুলটিও যেন ত্রাস্ত হয়ে ম্লান হয়ে উঠত, আর শেষ পর্যন্ত হয়ত গলার বো টাইটা ঘুরে চলে যেত পিঠের দিকে।...

গ্ল্যাডষ্টোনের মধ্যে বেশ কিছুটা ছেলেমানষী ও শিশু-সুলভ সারল্য ছিল। কথায় কথায় একদিন তিনি আপশোস করে বল্লেন,—

Why is it that when we get a good thing we do not stick to it ?

শ্রোতারা ভাবল এ কথাটার ওপর ভিত্তি করে, উনি হয়ত কোন বড় একটা রাজনৈতিক প্রশ্নে চলে যাবেন,—সাম্রাজ্যে ঐক্যবিধান বা সাবজনীন ভোটাধিকার, এই ধরণের কোন একটা বিষয়ে। গ্ল্যাডষ্টোন কিন্তু কোন বড় কথার ধার দিয়েও গেলেন না! বল্লেন যখন ছোট ছিলেন, তখন এই লণ্ডনের বাজারে এক ধরণের কলের নিগ্রো পুতুল পাওয়া যেত, দম দিলে যেটা রকমারী অঙ্গ-ভঙ্গী করে নাচত। এই নাচ দেখে তাঁর আশ যেন কিছুতেই মিটতে চাইত না। এখন বাজারে অনেক খোঁজ করেছেন, কিন্তু সেরকম পুতুল-মেলে না। বৃদ্ধ রাষ্ট্রনেতা সখেদে বল্লেন,—'I have asked at the shops in the strand and elsewhere, and they show me, other things but not the funnynigger I recollect...

পোপদের পারিপাট্যের দিকে বিশেষ নজর ছিল ডিজরেলীর। ডিজরেলী লর্ড বিকন্সফিল্ড হবার পর, শেষ যেদিন হাউস অব কমন্সের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সেদিন সারারাত ধরে সভার কাজ চলেছিল। আইরীশদের স্মারক

শাসন ব্যাপার নিয়ে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা চলছে। ভোর হবার পরও অনেক আইরীশ মিম্বার (member-কে আইরীশরা উচ্চারণ করে mimber বলে) একটানা ভাষণ দিয়ে চলেছেন সভ্যেরা রাত্রি জাগরণে সবাই ক্লান্ত।

সভাকক্ষ অপরিচ্ছন্ন, ধূলিমলিন হয়ে উঠেছে। সভ্যদের কারোই প্রায় মুখ হাতে জল দেবার বা বেশবাস পরিবর্তনের কোন অবসর বা সুযোগ মেলে নি। কিন্তু এরই মধ্যে কখন ডিজরেলী গত রাতের বাসী জামা কাপড় ছেড়ে, প্রসাধন সেরে দিব্যি বাবুটি সেজে ফিরে এসে বসেছেন, নিজের জায়গায়। গ্যালারীতে বসে মনোক্ল চোখে লাগিয়ে চারধারে দৃষ্টিপাত করছেন। কিছুটা দূরে বসে ছিলেন PUNCH কাগজের কার্টুনিষ্ট হ্যারি ফার্নিস। তিনি প্যাডে ডিজরেলীর এই সময়কার একখানা ছবি এঁকে ফেল্লেন। বাঁ হাতে মনোক্লটা চোখের কাছে ধরে আছেন, ডান হাতে টপ হ্যাট, পিছনে বিশ্বস্ত সহচর মণ্টি কোরি (পরে লর্ড রাউটন) ওঁর দিকে ঝুঁকে আছেন। ছবিখানি সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছিল। ACADEMY কাগজে ছবিটার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল—

In humour Mr. Harry Furniss generally excels, but his potrait of Lord Beaconsfield on his last appearance in the House of commons is something else than amusing,—it is pathetic, almost tragic and will be historical'.

ডিজরেলী যখন হাউস অব কমন্সের সদস্য ছিলেন, তখন বিপক্ষ দলের নেতা গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বাগ-বিতণ্ডা ও তর্কযুদ্ধ চলত। পার্লামেণ্টের অন্যান্য সভ্য এবং দর্শকেরা এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের বাকযুদ্ধ কৌতুহলের সঙ্গে উপভোগ করতেন।

গ্ল্যাডস্টোন ও ডিজরেলীর আক্রমণ-পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতায় থাকত সব সময়েই একটা উদ্ধত চ্যালেঞ্জ বা যুদ্ধং দেহি ভাব। তাঁর বাক্য ছিল তীক্ষ্ণ ও শাণিত। তিনি শত্রু পক্ষের মর্মভেদ করতে চাইতেন বাক্যবাণে। ডিজরেলী ওঁর বক্তৃতার সময় চুপটি করে বসে রইতেন। গ্ল্যাডস্টোনের নিদারুণ কটুক্তিতেও তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যেত না। চোখ বুজে হাতদুটো দুপাশে এলিয়ে দিয়ে যেন ঘুমুচ্ছেন,—এই ভাব। অথচ, প্রতিপক্ষের বক্তৃতার প্রতিটি কথা তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছেন, একটি শব্দও তাঁর শ্রুতি এড়িয়ে যাচ্ছে না।

ডিজরেলীর ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে থাকত একটা চশমার কাঁচ (monocle)। আক্রমণটা যখন খুব তীব্র হয়ে উঠত, তখন একটু সোজা হয়ে বসে, পকেট থেকে কাঁচখানা বার করে, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে ধরে তার ভিতর দিয়ে চারধারটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিতেন। দেখে নিতেন, সদস্যদের কার মুখের ভাব কেমন। পাকা ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা ব্যাটিং করবার আগে, মাঠের চার পাশটা যেমন একবার দেখে নেয়,—কে কোথায় কি ভাবে দাঁড়িয়েছে—ঠিক সেই রকম।...তারপর আস্তে মনোক্লটা পকেটে রেখে আবার যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন।

কিন্তু যেই গ্ল্যাডস্টোন বক্তৃতা শেষ করে আসন গ্রহণ করতেন, অমনি ঝট্‌ করে উঠে দাঁড়াতেন ডিজরেলী। এক চোখের আধখানা খুলে রেখে উনি সবই লক্ষ্য করতেন, ঘুমের ভাবটা লোক-দেখানো।

সামনে বাক্সের ওপর একখানা হাত রেখে অপর হাতখানা কোটের পিছনকার লম্বা অংশের নীচে (সে যুগে সামনে কোমর অবধি ও পেছনে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের tail coat-ই ছিল দরবারী পোষাক) ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে বক্তৃতা সুরু করতেন। মার্জিত ভাষা স্থির নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর, অথচ কথার আড়ালে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। গ্ল্যাডস্টোন তাঁর আবেগভরা ভাষণে যে যে ব্যাপারে Tory-দের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেছেন, তার দফাওয়ারী যথারীতি প্রত্যুত্তর দিতেন ডিজরেলী, প্রতিপক্ষ বক্তার যুক্তিকে খণ্ডন করে। তাঁর আসল বক্তব্যটা উপস্থাপিত করতেন বক্তৃতা শেষ হবার মুখে।

আর কি মুন্সিয়ানার সঙ্গেই না তিনি তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা সম্বন্ধে শ্রোতাদের নিসন্দিহান করে তুলতে পারতেন। এ বিষয়ে একজন সাংবাদিকের উক্তি উদ্ধৃত করছি:

'With masterly tact he had reserved the principal point in his reply to the end and

then, bringing his full force to bear upon it, the conclusion of his speech was told with redoubled effect.'

ডিজরেলী ও গ্লাডষ্টোনকে নিয়ে চমৎকার একটা কাহিনী প্রচলিত আছে।

একবার ডিজরেলী পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেবার সময়, কোন একটা সভায় প্রদত্ত গ্ল্যাডষ্টোনের সাম্প্রতিক একটা ভাষণের কিছুটা উদ্ধৃতি করেন।

হঠাৎ গ্ল্যাডষ্টোন উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন,—

'I never said that in my life.'

ডিজরেলী নির্বাক।

কোটের লেজের আড়ালে হাত দুখানা ঢেকে, সামনের বাক্সটার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক সেকেণ্ড পার হয়ে যায়। ডিজরেলী নিশ্চুপ, নিশ্চল।

হাউস অব কমন্সে সেদিন ঘর-ভরা লোক।

অনেকেই ভাবলেন, বোধ হয় গ্ল্যাডষ্টোন ওঁর কাছে মার্জনা চাইবেন, তারই অপেক্ষায় আছেন উনি।

গ্ল্যাডষ্টোনের দিক থেকে কিন্তু কোন সাড়াই নেই।

তিনি পাশের মেম্বারের সঙ্গে দিব্যি গল্প করে চলেছেন, পুরো এক মিনিট পার হয়ে গেল।...দেড় মিনিট...দু মিনিট!

ডিজরেলী তবুও নিস্পন্দ!

দু' মিনিটের পর সভ্যদের মধ্যে কৌতূহল ও চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাইত, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন নাকি DIZZY। ওঁর এই অস্বস্তিকর মৌনতার কারণ কি?

কয়েকজন সভ্য উঠে ওঁর দিকে এগিয়ে আসতেই উনি হাত নেড়ে বারণ করলেন তাঁদের। তাঁরা ফিরে গিয়ে নিজেদের আসনে বসলেন।

দেওয়ালের বড় ঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটাটা তিনপাক ঘুরে এল। স্মরণীয় কালের মধ্যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্যদের, এর পূর্বে কখনও তিনমিনিটব্যাপী নিস্তব্ধতার সম্মুখীন হতে হয় নি।

তিন মিনিট পার হতেই হঠাৎ টোরী নেতা ডিজরেলী কথা বলে ওঠেন,—

'Mr chairman and gentlemen!'

তারপর তিনি গ্লাডষ্টোনের পুরো বক্তৃতাটা আনুপূর্বিক, বলে গেলেন। এর আগে বক্তৃতার যে অংশটুকুর উল্লেখ করেছিলেন, সেখানটায় এসে একটু থেমে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে সোজা তাকালেন।

গ্ল্যাডষ্টোন এই চ্যালেঞ্জকে অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি মস্তক অবনত করলেন।

টুপী মাথায় থাকলে হয়ত সেটা খুলে ধরতেন। ইংরেজীতে যাকে বলে 'Hats off to you'!'—অর্থাৎ তোমার প্রতিভা স্বীকার না করে উপায় নেই, আমার অভিবাদন গ্রহণ করো!'

Harry Furris তাঁর CONFESSION OF A CARICATURIST নামক বইয়ে এ সম্বন্ধে লিখেছেন:

'He would have raised his hat did he wear one in the House, which, in the phraseology of the ring was equivalent 'throwing up the sponge'.

পরে কথায় কথায় ডিজরেলী তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, তিনি যে তিন মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময় গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতাটা আগাগোড়া স্মরণ করে নিচ্ছিলেন।

'Beginning at the disputed question, recovered the context which led up to it, and so step by step, the entire oration. Then I was able to repeat it from the outset, exactly as I had read it'.

কী অসাধারণ মনঃসংযোগ, কী অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি! এই ধরণের অলৌকিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী আমাদের দেশেও দু'চারজন ছিলেন। এই রকম photographic tape-record memory ছিল জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের। ত্রিবেণীর ঘাটে দুজন সাহেবের বচসা শুনে, আদালতে সাক্ষ্য দিতে উঠে, তাদের বিতণ্ডা আদ্যোপান্ত বিবৃতি করেছিলেন। ইংরেজীতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়েও, শুধু কানে শুনেই তিনি কথাগুলো আগাগোড়া মনে রেখেছিলেন, নির্ভুলভাবে। তর্কপঞ্চানন মশায় ধরতে গেলে ডিজরেলীর চেয়েও প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন।

স্মৃতির টুক্‌রো

সাতকড়িপতি রায়

মেদিনীপুর শহর খুব পুরাতন হলেও খুব বসতিপূর্ণ ছিল না যখন আমি সেখানে ভূমিষ্ঠ হই—সেটা ১২৮৭ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ইং ১৮৮০ সালের ২৪শে মে, সোমবার রাত্রি ১১টা। আমার বাবা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় ঐ জেলায় জাড়া নামে গ্রামের প্রসিদ্ধ রায় বংশের পুরুষ। মেদিনীপুরে চিড়িখারসাই-এ ৺রামগোবিন্দ নন্দীর বাড়ীর এক অংশ ভাড়া নিয়ে ঐখানের জজকোর্টে তিনি ওকালতি করতেন। আমার জন্মবৃত্তান্ত আমার জ্ঞানের স্মৃতির টুকরো নয়। জ্ঞানের সঞ্চার হলে যেটা শুনেছিলাম—সেই স্মৃতির টুকরো।

সে সময় মেদিনীপুরে উৎকল সংস্কৃতিই প্রধান ছিল। কারণ উহা উড়িষ্যা ও বাংলার সীমান্তেই অবস্থিত। যাঁরা তখন মেদিনীপুরে ওকালতি করতেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পাঁচ টাকা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এনরোল (enroll) হয়ে মেদিনীপুরে ওকালতি করতে আসেন। তাঁর দেশ হাওড়া জেলা। আরও বিশিষ্ট উকিল ছিলেন—বিপিনবিহারী দত্ত, গিরিশচন্দ্র মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণলাল মজুমদার প্রভৃতি। এঁরা সকলেই হাওড়া ও হুগলী জেলা থেকে মেদিনীপুরে আসেন। ওখানকার অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার উকিলদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রঘুনাথ দাস, রাধানাথ পতি, প্রভৃতি। তাঁরা উৎকল শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

আমার বাবা উকিল হোয়ে ওকালতি করতেন চুঁচুড়াতে। ১৮৭২ সালে চন্দ্রকোণা পরগণা, বরদা পরগণা ও চেতুয়া পরগণা হুগলী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেদিনীপুর জেলাভুক্ত হওয়ায় এবং জাড়া রায় বংশের জমিদারী এই সকল পরগণাতে বিস্তৃত থাকায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতিক্রমে বাবা চুঁচুড়া থেকে মেদিনীপুরে ওকালতি করতে আসেন। জাড়া গ্রামটি চন্দ্রকোণা পরগণার মধ্যে।

আমার জন্মাবার সময় মেদিনীপুর শহরের প্রধান ডাক্তার ছিলেন ভুবনেশ্বর মিত্র। তিনি হাওড়া জেলার অধিবাসী ছিলেন।

এই সকল বিভিন্ন জেলাবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মেদিনীপুর সহরে বসবাস সুরু করলেও (তাঁরা তখন মেদিনীপুরের সংস্কৃতি বা ভাষা গ্রহণ করেন নি)। তাঁদের সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ ও আদান-প্রদান হাওড়া, হুগলী ও কলিকাতার সঙ্গেই চলিত ছিল।

আমার জন্মের দু-তিন বৎসরের মধ্যে আমার মাতা ঠাকুরাণীর বিশেষ জেদে আমার বাবা মিরবাজার, কর্ণেলগোলা ও আলিগঞ্জ মহল্লার ত্রিসীমানায় বসতবাটী ক্রয় কোরে সেখানে উঠে আসেন। সেই বসত স্থানে নূতন করে পাকাবাড়ী তৈরী করান।

তখনকার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও কিরূপ হিন্দু আচার ও সংস্কার মেনে চলতেন তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। মায়ের কাছে শুনা—আমি যখন পাঁচ দিনের এবং মা তখনও সূতিকাগারে, রাত্রি ১২টার সময় বাবা বাড়ীতে ফিরে এসে মাকে বললেন যে ডাক্তার ভুবনেশ্বর বাবুর স্ত্রী যমজ কন্যা প্রসব করে মারা গেছেন। যমজ কন্যা দুটীই জীবিত ছিল। ভুবনবাবু আবার বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু, সে স্ত্রীও বেশীদিন বাঁচলেন না। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হোল। ভুবনবাবু বয়সে বাবার থেকে কিছু বড় হলেও তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মা গল্প করতেন—দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর ভুবনবাবু প্রায়ই বাবার কাছে দুঃখ করতেন তাঁর পুত্র সন্তান হয়নি বলে। তখনকার দিনে বংশ রক্ষা প্রত্যেক হিন্দুর বিশেষ কাম্য ছিল। তখনকারদিনে যাঁর কোষ্ঠীতে স্ত্রী-হানি যোগ থাকতো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা বিধান দিতেন—প্রথম একটী পুষ্প বৃক্ষের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তারপর

দারপরিগ্রহ করতে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভুবনবাবুরও একটী পুষ্পবৃক্ষের সঙ্গে তৃতীয়বার বিবাহ দেওয়া হয়। তারপর তিনি আবার দারপরিগ্রহ করেন এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে চার-পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়। তিনি শেষ জীবনে তাতে খুবই আনন্দ ও সুখ লাভ করেন।

বাবার জীবনের ইতিহাস যতটুকু মায়ের কাছে শুনেছি তাই স্মরণ-পথ থেকে উদ্ধার করে লিখছি। বাবার বাল্য-জীবন মায়ের জ্ঞাত ছিল না। হুগলীতে লেখাপড়া করতে করতেই এণ্ট্রান্স পাশ করার পরই বাবার বিবাহ হয়। মাতাঠাকুরাণীর নাম জগন্মোহিনী দেবী। তখনকার বিধান অনুযায়ী মেয়েদের এগার-বারো বৎসরেই বিবাহ হোত,—মায়েরও তাই হয়। মা অজ-পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হোলেও বাংলা লিখতে পড়তে পারতেন। জমিদার-বংশের বধূ,—মাসে মাসে হাত খরচের টাকা পেতেন। বাবা ছুটির সময় বাড়ী এসে কৌশলে উহা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে যেতেন। কারণ, তিনি গরীব সহপাঠীদের সাহায্য করতেন। উকিল হয়ে হুগলীতে যতদিন প্র্যাক্‌টিস করেছিলেন ততদিন মাকে সেখানে নিয়ে যাননি। মেদিনীপুরে প্র্যাক্‌টিস করতে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি নিয়ে মাকে মেদিনীপুরে নিয়ে আসেন। তারপর বাড়ী খরিদ করবার পরে আমার সেজ জ্যাঠামহাশয়ের দুই পুত্র—সুরপতি ও কমলাপতিদাদা এবং চতুর্থ জ্যাঠামহাশয়ের পুত্র—শচীপতি ও জানকীপতিদাদা মেদিনীপুরে বাবার কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন। এ-ছাড়া দেশের দুঃস্থ কিশোর ও যুবকগণও আমাদের বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করতেন। বাবা আরও কয়েকটি যুবককে অর্থ সাহায্য করে লেখাপড় করাতেন। বাবার অন্নদানেরও একটা বিশিষ্ট ধারা ছিল। জাড়া ও তার আসেপাশের গ্রামের যে কোনও ব্যক্তি কার্য্যবশতঃ মেদিনীপুরে এসে আহার করতে চাইলে আহার্য্য পেতেন। কাহারও অনুমতি প্রয়োজন হোত না। মা বলতেন—রান্নাঘরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় কে খাচ্ছে তা জানবার উপায় ছিল না। কারণ জিজ্ঞাসা করা নিষেধ ছিল। বাবার মহুরী কালীপদ ঘোষ মশায় কেবল জানতেন কে খাচ্ছে!

আমার জ্ঞান হতে দেখেছি—মেদিনীপুরে কারও ঘরে আগুন লাগলে বাবা তখুনি তা নিবোতে ছুটতেন। তখন মেদিনীপুরে জলের বড়ই অভাব ছিল। গ্রীষ্মের সময় কূপগুলি প্রায় শুকিয়ে যেত। যে কয়েকটি পুষ্করিণী শহরে ছিল তাতে জল খুব কম থাকতো। ঘরে আগুন লেগেছে শুনলেই বাবা তাঁর বাগানের মালী ধর্ম্মদাসকে (মুসলমান), দিয়ে ভিস্তি, বড় রবারের নল ও পিচকারী নিয়ে সেখানে চলে যেতেন।

বাবা ওকালতি করার সঙ্গে বিনা পারিশ্রমিকে কয়েকটি ষ্টেটের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন। তার মধ্যে একটি মুসলমান সংসারের কর্ত্রী—ওয়াসেন্নেসা-বিবিকে আমি দেখেছি। হিন্দু বিধবার মত সাদা ধুতি পরা, টক্‌টকে রং ওয়াসেন্নেসা-বিবি,—জিয়াউদ্দিনের মাতাকে দেখেছি। তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মাঝে মাঝে। মাকে 'ভাবী' (ভায়ের স্ত্রী) বলতেন। মা মাদুর বিছিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করতেন। তিনি চলে গেলে মা মাদুরটি কাচতেন,—স্নানও করতেন। আমাদের বাড়ীতে গোলাপগাছের বড় বাগান ছিল। মেদিনীপুরের বড় বড় সাহেবদের (জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট) মেম-সাহেবরা ফুলের জন্যে আসতেন। মেয়েমানুষ,—সুতরাং বাবা মায়ের কাছে তাঁদের আনতেন। তাঁরা মায়ের সঙ্গে চেয়ারে বসে গল্প করতেন। মা ইংরাজী জানেন না,—বাবা দোভাষী হতেন। হাতে-হাত দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ডও করতেন। তাঁরা চলে গেলেই মা স্নান করতেন। মা বলতেন,—'যাঁরা ম্লেচ্ছভাবে থাকে, ম্লেচ্ছভাবে আহার করে তাঁদের স্পর্শ করে স্নান না করলে পূজা ইত্যাদি করতে পারি না।

বাবা নিরামিষাশী ছিলেন। সকালে আদা-নূন ও বাতাসা আর ভাতের সঙ্গে ঘৃত ও দুধ তাঁর নিত্য আহার্য্য ছিল। বৈকালে কোর্ট থেকে এসে কিছুই খেতেন না। ঠিক সন্ধ্যার সময় লুচি, তরকারি ও দুধ খেতেন। কিন্তু তাঁর শরীরে অতিশয় শক্তি ছিল।

১৮৭২ সাল থেকে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত তিনি মেদিনীপুরে ওকালতি করেছিলেন। ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'মাতাজীর' (এক সন্ন্যাসিনী) কাছে মন্ত্র গ্রহণ করে যোগাভ্যাস করা কালীন নিমোনিয়া রোগে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৭ বৎসর। ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেসের

জন্ম থেকে তিনি তার সভ্য ছিলেন ও প্রতিবৎসর ডেলিগেট রূপে যোগ দিতেন।

আমার বাল্যাবস্থার কথা যতটুকু মনে পড়েঃ ছয় বৎসর বয়সে আমাদের বাড়ীর পাশে হার্ডিঞ্জ স্কুলে (ছাত্রবৃত্তি স্কুল) ভর্ত্তি হই। ১২ বৎসর বয়সে বাবার মৃত্যুর ৬ মাস পরেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হই। আমার জ্যেষ্ঠ কিশোরীপতি রায় মেদিনীপুর কলেজ থেকে First Arts পাশ করে কলিকাতায় B. A. পড়তে গেলেন। মেদিনীপুরে তখন B. A. class ছিল না। মা আমাদের নিয়ে জাড়া চলে গেলেন। সেখানে জাড়া স্কুলে fifth class থেকে Second class পর্য্যন্ত পড়েছিলাম। এই কয় বৎসর কিশোর-জীবনে জাড়ার গ্রাম্য-জীবন উপভোগ করেছি। গ্রাম হলেও আমি জমিদার বাড়ীর ছেলে। আমরা গ্রামের অন্য গৃহস্থের কিশোরদের সঙ্গে খুব মিশতে পেতাম না। স্কুল আমাদের কর্তাদের দ্বারা পরিচালিত; গ্রামের গরীবদের ছেলেরা বিনা বেতনে পড়ত। তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ও জলচলশূদ্র বংশীয়। জল সচল বংশীয়রা—যেমন, মাঝি, বাগ্‌দি, হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতি অধিবাসীদের ছেলেরা তখন লেখাপড়া কোরত না। কেউ কেউ পাঠশালায় সামান্য পড়ে স্ব-স্ব জাতব্যবসায়ে নিযুক্ত হোত। হৃদয় ডোম আমাদের ফরাস ছিল। 'ফরাস' পূজার সময় চণ্ডীমণ্ডপে কলি দিয়া পরিষ্কার করতো। ঝাড়-লণ্ঠন (বেলোয়ারী) টাঙ্গাতো। সন্ধ্যার সময় বাতি দিয়ে আলো জ্বালতো। সে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত চাকরিতে ছিল। তার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র জানত না সে second class পর্য্যন্ত পড়েছিল। সে সানাই ও ভাল বাঁশী বাজাতে পারত।

আমাদের বাড়াতে দুর্গাপূজা খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে হোত। দুর্গাপূজায় ৮দিন কৃষ্ণযাত্রা আর কালীপূজায় চারদিন শখের যাত্রা হোত। দুর্গাপূজায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ীতে সিদা দেওয়া হোত। দুর্গাপূজা বৈষ্ণবী মতে হোত, আজও হয়। কোনও বলি হয় না কালীপূজায় বলি হয়। দুর্গাপূজার তিনদিন গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ নিমন্ত্রণ খেত। সাদাসিদে খাওয়া। ভাত, কলাই ডাল, তিন-চারটি তরকারী, মাছ, দই ও বুঁদিয়া (মিষ্টি)। হৃদয় ডোমের খাওয়া বেশ মনে আছে।—প্রায় আধসের চালের ভাত খেয়েছে—আবার প্রায় সম-পরিমাণ ভাত নিয়েছে। পাতে কোনও তরকারী নেই। আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম—"হৃদয়কাকা, কি চাই?" হৃদয় বললে—"বাবু, একটু ডাল হলেই এই ভাতকটা সেরে ফেলি।"—ইহাই গ্রাম্য-জীবনের একটি দিক্।—সকলেই পেটভরে খেতো। খাদ্য-মানের উন্নতি করতে গিয়ে প্রত্যেক মানুষকে মাছ-মাংস, দুধ-ঘি, সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে হবে,—এ আকাঙ্খা ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। পেটপুরে ভাত-ডাল খেতো আর তাতেই পরমতৃপ্তি ছিল। শরীরে যথেষ্ট শক্তিও ছিল, নীরোগও ছিল।

আমাদের যে সব পশ্চিমা দরওয়ান ছিল,—তারা প্রায় চৌবে, দোবে বা শুকুল এইরূপ উপাধিধারী ছিল। তারা ভাল তলোয়ার খেল্‌তো। যে সব দেশী পাইক-বরকন্দাজ ছিল তারা বাগদী ও হাড়ি জাতীয় ছিল। অতি চমৎকার লাঠি খেলতে পারত তারা। জাড়া থেকে খাজনার এক হাজার টাকার তোড়া (কাগজের নয়—রূপার টাকা) মাথায় নিয়ে ৩৪ মাইল বর্দ্ধমান এবং ২৮ মাইল দূরে মেদিনীপুরে যেতে হোত। ভোরে বেরিয়ে বারোটা-একটায় টাকা দাখিল করে রাত আটটায়-নটায় জাড়া ফিরে আসতো। যেদিন ঘাঁটাল-চন্দ্রকোনা থানায় ম্যালেরিয়া বীজ প্রবেশ করলো, সেইদিন থেকে তিল-তিল করে এইসব স্বাস্থ্যবান-বংশ বলহীন হয়ে গেল। এখন তাদেরই বংশের যুবকরা কোন রকমে মাঠের কাজ করে। সে-শক্তি এখন রূপকথায় দাড়িয়েছে। সে লাঠিখেলাও এখন উপকথায় পর্য্যবসিত হোয়েছে। এখন আর সে অল্পে-সন্তুষ্ট হৃদয় ডোমকে খুঁজে পাওয়া যাবে না…

আমরাও কিশোর বয়সে বাগদী-হাড়ীদের কাছে লাঠি চালনা শিখেছিলাম। চৌবে-শুকুলদের কাছে তলওয়ার খেলায় পারদর্শী হোয়ে ছিলাম। গাদা বন্দুক বাড়িতে থাকতো,—তাই নিয়ে বন্দুকের শিক্ষাও হয়েছিল। ভবিষ্যতে সাঁওতালদের কাছে তীর ছুঁড়তে শিখেছি। হায়, আজকাল পল্লীগ্রামে কিশোর ও যুবকদের দেখি—ফুটবল খেলে,—গল্প করে। বড়জোর স্কুলের ছেলেরা একটু ড্রিল করে।

এদের স্বাস্থ্য দেখলে মনে কষ্ট হয়। ম্যালেরিয়া দূর হয়েছে এখন দেশ থেকে। কিন্তু খাদ্যে ভেজাল তার স্থান নিয়েছে। কিশোর ও যুবকরা ব্যায়াম ছেড়েছে—স্বাস্থ্যের অবনতি চরমে পৌঁচেছে। ভবিষ্যতে হবে কি ?

তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৮৮৫।৮৬ সালে ছাত্রবৃত্তি স্কুলে আমাদের ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, বাংলা সাহিত্য, পাটিগণিত, শুভঙ্করী, জ্যামিতি ইত্যাদি শিখতে হত। ঐ কয়টি বিষয়ে যে মান ছিল তা তখনকার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার মানের কাছাকাছি। তবে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া আর সমস্ত বিষয় ইংরাজীতে পড়তে হত। বাংলা স্কুলে পড়বার সময় আমি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরামী মহাভারত দুইবার পড়েছিলাম। ইহাছাড়া রমেশ দত্তর চারটি উপন্যাস—বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা ও মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত চুরি করিয়া পড়িয়াছিলাম। জাড়াতে ইংরাজী হাইস্কুলে পড়িবার সময় বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ পড়ি। এই সব বই পড়িয়া মনে একটা বিশেষ সাড়া লাগে। হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষ বিদেশী মুসলমানের কবলকবলিত হইয়া সমাজের যে বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল তাহাতে মনে গভীর বিষাদের উদ্রেক হয়।

তারপর মুসলমান ও মহারাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরাজ দেশ জয় করিয়া বসিয়াছে। হিন্দুর জীবন পরিবর্তিত হয়েছে। রামায়ণের ঋষিদের ভারত, মহাভারতের ভারত আর নাই,—সে কথা কে যেন কানে কানে বলিত। তার উপর আমার মাতৃদেবী প্রায়ই বলিতেন—ওই রাক্ষসরা আমাদের দেশটা উৎসন্নে দিল। তখন ১৫ বৎসর বয়স। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম এখনও ভারতের যেখানে হিন্দুর রাজত্ব আছে সেখানে চলিয়া যাইব। ইংরাজের রাজত্বের মধ্যে থাকিব না। বর্ষাকাল, শুক্লপক্ষের রাত্রি। বংশের সহপাঠী যাহারা আমার সঙ্গে একত্র পড়িত, তাহারা রাত্রে আহার করিয়া শুইতে গেলে আমি আহার করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া জাড়া হইতে যে পথে বর্দ্ধমান যাওয়া যায় সেই পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। পরনে কাপড় ও জামা। মাটির রাস্তা কর্দ্দমে পূর্ণ। মাথায় চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিয়াছে। সাত-আট মাইল যাইবার পর একটা সেতুর উপর বসিলাম। মায়ের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিব কি করিয়া ? দশ-পনের মিনিট বসিয়া থাকিলাম। তারপর মন মায়ের জন্য এত ব্যাকুল হইল যে বাড়ীমুখে ছুটিতে লাগিলাম এবং রাত্রি তিনটার সময় বাড়ী পৌঁছিয়া বাহিরের ঘরে শুইয়া পড়িলাম। প্রাতে মাকে সব বলিলাম। তিনি বলিলেন—'পাঠ্যাবস্থায় জন্য চিন্তা করিও না। পাঠ সমাপনান্তে দেশ-উদ্ধারের চিন্তা করিও, চেষ্টা করিও। তাহাতে যদি জীবনপণ কর তাহা হইলেও আমার আশীর্ব্বাদ পাইবে।' মায়ের কথা শিরোধার্য্য করিয়া পড়ায় মন দিলাম।—

জাড়ার স্কুলে কোনও ব্যায়াম-শিক্ষার বিধান তখন ছিল না। আমাদের বংশের এবং পুরোহিত-বংশের ১৪.১৫ বৎসরের কিশোর মিলিয়া,—যারা আমার অনুগত ছিল, আমরা একটা যুদ্ধের খেলা খেলতাম। একটি বাড়ীকে উপলক্ষ করে একদল রক্ষা কর্ত্ত এবং আর একদল আক্রমণ করত। এ খেলায় খুব আনন্দ পেতাম। আর কেন জানি না কারুর কিছু সেবা কত্তে পাল্লেও আনন্দ পেতাম। যখন ১৪ বৎসর বয়স তখন যোগেশকাকা মারা গেলেন। দেখলাম বাড়ীতে উনান জ্বলিল না। শুনিলাম শবদেহতে যতক্ষণ না অগ্নিসংযোগ হচ্ছে ততক্ষণ উনান জ্বলবে না,—ইহাই হিন্দুর প্রথা। তখন হইতে ধারণা হইল, যাদের আত্মীয় স্বজন কম তাঁদের বাড়ীতে মৃতদেহ বাহির করিতে এবং দাহ হইতে বিলম্ব হবেই, তাহলে তাদের বাড়ীতে উনান জ্বলবে না, ছেলেপুলে খেতে পাবে না। সুতরাং মৃতদেহ যাতে তাড়াতাড়ি সৎকার হয় তাতে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এসব ধারণা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনে বেশী করে বদ্ধমূল হচ্ছিল।

পূর্ব্বে বলেছি, জাড়া স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম। দাদা কলিকাতায় বি, এ, পড়তে গেছলেন। তিনি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হবার পরে ফিরে এলেন। এবার বাবার আইন-ব্যবসা তিনি কর্বেন। সুতরাং আইন তাঁকে পড়তে হবে। মেদিনীপুর কলেজে বি, এ, পড়ার

ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু আইন পড়ার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং দাদা মেদিনীপুরে আইন অর্থাৎ বি, এল, পড়তে আসবেন। তাই স্থির হল আমরাও অর্থাৎ আমি ও আমার ছোট ভাই সুধীর মেদিনীপুরে পড়ব। আমি এণ্ট্রান্স-ক্লাসে পড়ছি এবং সুধীর সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছে। আমাদের সঙ্গে আরও পড়তে এল আমার চতুর্থ জ্যেঠামশায়ের পুত্র ভবপতি, ছোটকাকার দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চানন এবং বিনোদ-দিদির পুত্র রাধিকা। সেটা ১৮৯৭ সালের জুলাই মাস। সকলেই মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলাম।

(৫)

বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে আমাদের খেলার সাথী ছিল—মেদিনীপুরের ডাক্তার গোকুলবাবুর পুত্র পদ্মলোচন ও নগেন্দ্র, আর উকিল রামদীনবাবুর পুত্র সুরেন্দ্র ও ভাগ্নে অচিন্ত্য। এবার মেদিনীপুরে এসে প্রধান সঙ্গী হোল বীরেন দে।—কারণ, সে তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ে। আমাদের পাড়ার সঙ্গী সেই পচু, নগা, সুরেন, অচিন্ত্য ছিল। পাড়ায় পাড়ায় তখন মেদিনীপুরে হোলী-খেলার খুব ধুম ছিল। দোলের সময় সমস্তদিন পাড়ার ছেলেরা মিলে দোল-খেলা হোত। তারপরদিন গোলাপ জল দিয়ে রং গুলে পাড়ার সব ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়ে বাড়ীর কর্ত্তার গায়ে সেই রং দেওয়া হোত। আর টাকা আদায় করে একদিন খুব খাওয়া-দাওয়া হোত। মেদিনীপুরে আর একটি খুব বড় ধুমধাম হোত মুসলমানদের মহরমে। পাড়ায় পাড়ায় মুসলমানরা মিলে লাঠি-খেলার মিছিল বার করত। তলওয়ার ও লাঠি খেলা হোত। হিন্দুরাও খেলতো। তারপর শেষদিন গাঁওরা তাজিয়া প্রস্তুত করে তাই নিয়ে মিছিল হ'ত। অনেক সময় দুই পাড়ার মিছিলে দাঙ্গাও হ'ত। হিন্দু-মুসলমানে কোনও বিবাদ হতে দেখিনি।

মেদিনীপুরে ফিরে এসে আর একটী কিশোরের সঙ্গে আলাপ হয় তার নাম নৃসিংহ বসু। তার ভগ্নীপতি মেদিনীপুরে ওকালতী করতেন। তিনি ছিলেন theosophist। নৃসিংহ-ও ঐ বিষয়ের বই নাড়াচাড়া কোরত। আমি তার সঙ্গে তার ভগ্নীপতির বাড়ীতে যেতাম। তাঁর দুইটী উপদেশ আমার পুজীবনে বড় উপকার করেছিল। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন একটী ডায়েরী খাতা করে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শোবার পূর্ব্বে সমস্তদিনে যতগুলি মিথ্যাকথা বলেছি তাহা নোট করতে এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করতে যাতে পরদিন মিথ্যাকথা না বলি। তিনি বলেছিলেন এইভাবে অভ্যাস করলে মিথ্যাকথা বলা বন্ধ হয়ে সত্যবাক্ হতে পারা যায়। তিনি আর-একটি উপদেশ দিয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের একটী সুন্দর ছবিতে চিত্ত আরোপ করে কিছুক্ষণ থাকার চেষ্টা করা। প্রত্যূষে উঠে এই অভ্যাস করলে concentration (একাগ্রতা) বাড়বে এই দুইটি অভ্যাস করে নিজের জীবনে আশ্চর্য্য ফললাভ করেছিলাম। এই উভয় অভ্যাসে কৈশোরের শেষ ও যৌবনের প্রারম্ভে আমার আশ্চর্য্য রকম একাগ্রতা বেড়েছিল এবং সত্যকথা বলা অভ্যাস হয়েছিল। নৃসিংহ অর্থাৎ নসু আমার জীবনের নৈতিক উন্নতিতে অশেষ সাহায্য করেছিল।

লেখাপড়াতেও মেদিনীপুরে আমার সাহায্য হল। ঝাড়া স্কুলে আমি fifth class থেকে second class পর্য্যন্ত বরাবর প্রথম হয়ে প্রমোশান পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাতে এবং পরবর্ত্তী সহপাঠীতে অনেক প্রভেদ ছিল। সুতরাং কোনও competition ছিল না। কিন্তু মেদিনীপুরে কলিজিয়েট স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে অনেক ভাল ভাল ছাত্র ছিল। এই স্কুলে তিনটি competitive পরীক্ষা প্রতি বৎসর হ'ত। থার্ড, সেকেণ্ড ও ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্ররা তাতে যোগ দিত। গণিত, ইতিহাস ও ইংরাজী competition এর পরীক্ষা হ'ত। বীরেন দে থার্ড ক্লাসে ও সেকেণ্ড ক্লাসে ঐ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে মেডেল পেয়েছে। আমি যখন এলাম সে তখন ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্র। সূর্য্য মজুমদার, ভাগবৎ দাস প্রভৃতি আরও কয়েকটি ভাল ছাত্র ঐ ক্লাসে ছিল। সুতরাং একটা বড় রকমের competition-এর মধ্যে এসে পড়েছিলাম। তাইতে পড়াশোনার উৎসাহ বেড়ে গেল। ঐ conpetitive পরীক্ষা সেপ্টেম্বর মাসে হত। আমি জুলাই মাসে ভর্ত্তি হয়েই গণিতে ও ইতিহাসে পরীক্ষা দিয়াছিলাম। গণিতে

বীরেনই প্রথম হয়, আমি দ্বিতীয় হই। কিন্তু ইতিহাসে আমি প্রথম হই। বীরেনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে যে সৌহার্দ্দ হয়েছিল আজও তাহা অটুট আছে।

মেদিনীপুর স্কুলে ব্যায়ামের খুব উৎসাহ ছিল। শ্রীরামচরণ সেন জিমনাষ্টিক মাষ্টার ছিলেন। তিনি ছেলেদের বড় ভালবাসতেন এবং খুব উৎসাহ দিতেন। শীতকালে কলিকাতায় প্রত্যেক বৎসর সারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার যুবকদের competition game হ'ত। যে বৎসর এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি সে-বৎসর আমি এই প্রতিযোগিতায় একশত গজ দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করি। রামচরণ সেনের ভালবাসা আজও ভুলতে পারি নি।

মেদিনীপুরে আর্ একটি লোকের সাহায্য পেয়েছিলাম। তিনি "মেদিনীবান্ধব" সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক—দেবদাস করণ। তিনি অতিশয় তেজস্বী, স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তাঁর সাহায্যে মেদিনীপুরে মড়া-পুড়াবার একটি দল করতে পেরেছিলাম। সে দলটি কিছুদিন, প্রায় ছয়-সাত বৎসর অটুট ছিল। আমি মাঝখানে চার বৎসর—১৯০০ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় পড়তে আসি কিন্তু তবু ঐ দল নষ্ট হয় নি। ১৯০৪ সালে মেদিনীপুরে ফিরে গিয়ে আবার ঐ দলে যোগ দিই। ঐ সময় কয় বৎসরে আমি খুব কমপক্ষেও এক হাজার মৃতদেহ কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়েছি। ঐ কাজে কেবল একটা আনন্দ ও উৎসাহ পেতাম। এমন হয়েছে, সকলে একটি মড়া পুড়িয়ে বাড়ী এসে স্নান করে খেতে বসেছি অমনি সংবাদ এল অমুকের স্ত্রী মরেছেন,—যেতে হবে। খেয়ে উঠে চলে গেলাম। কোনও জাতিভেদ মানি নি, কি ব্যারামে মরেচে তাও বাছ-বিচার করি নি। এ বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর কাছে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি। তিনি বলতেন 'পরের উপকার করিস—ভগবান তোদের দেখবেন।' মনে পড়ে রাঁচীতে তখন আমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সেটেল্‌মেণ্টে চাকরি করি। চট্টগ্রামের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি সস্ত্রীক রাঁচীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর ঐটি তৃতীয় পক্ষ। শুধু তাই নয়, বিধির বিধানে তিনি তাঁর স্ত্রীরও তৃতীয় পক্ষ। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। নাম ভুলে গেছি। কি চক্রবর্ত্তী বোধ হয়। রাঁচীতে শ্মশান সুবর্ণরেখার ধারে, প্রায় চার মাইল দূরে ছিল। লাশ খুব ভারী, অথচ আমি একা। সেখানে ত আমার দল ছিল না। সংবাদ পেয়ে আমি গেলাম। লোক সংগ্রহ করা গেল না। একটি পুস্‌পুস্ গাড়ী ভাড়া করে তাইতে মড়া নিয়ে গেলাম। গরুর গাড়ীতে কাঠ চল্‌ল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেতে রাজী হলেন না। আমিই মুখাগ্নি কল্লাম।

মেদিনীপুরে এখন পোড়াবার স্থান হোয়েছে। কিন্তু, তখন কাঁসাই নদীর তীরে আমবাগানে মড়া-পোড়াতে যেতে হ'ত। রসিক চণ্ডাল ছিল কাঠের যোগানদার। আমাকে বলত'—'বাবু তুমি দিনদিন এত মড়া পাও কোথা?' সে মড়া পোড়াবার কৌশল জানত' এবং প্রায় বাতলে দিত।

(৬)

আমাদের খাবার রুচিই কত পাল্‌টে গেছে। বাবা তখন বেঁচে। আমি ও আমার ছোটভাই বাড়ীর পাশেই হার্ডিঞ্জ স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পড়ি। বৈকালে বাড়ী এসে মার পাতে ভাত খাওয়া অভ্যাস ছিল। মাও পাতের ভাত আমাদের জন্যে রাখতেন। যেদিন ছুটি থাকত, সেদিন বিকেলে মা লুচি করে দিতেন। দাদা-রা অর্থাৎ আমার নিজের দাদা আর সুরপতি, কমলাপতি, শচীপতি, জানকীপতি প্রভৃতি দাদারা সবাই বৈকালে লুচি খেতেন। মা ভেজে দিতেন। খাঁটি মহিষা-ঘির লুচি। মার পাতের ভাত খাবার পর আমরা দু চারখানা লুচি খেতাম। রাত্রে আমরা দু-ভাই ও আমাদের ছোটবোনেরা শুধু দুধ খেয়ে শুতাম। ছোটদের রাত্রে ভাত খাওয়া অভ্যাস ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর মা আমাদের নিয়ে একবৎসর মেদিনীপুরে ছিলেন। তখনও তাঁর পাতের ভাত স্কুল থেকে এসে খেতাম। কিন্তু মাছ থাকত না। প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা করায় মা এড়িয়ে যেতেন। তারপর একদিন বল্লেন-"আমায় মাছ খেতে নেই।" আমরা দুই-ভাই জেদ ধরলাম—আমরাও মাছ খাব না। মা বাধা দিলেন না। তাই, সেই থেকে আমরা দু-ভাই নিরামিষ খেতে সুরু করি,—আজীবন তাই খেয়ে এলাম। তখন বাজার থেকে খাবার কিনে এনে খাওয়ার খুব রেওয়াজ ছিল না।

খাঁটি মহিষা ঘি—১।১০/ সের। সরিষার তেল ৶৴৹ আনা সের। চাউল, ভাল শীতাশাল চাউল ১।১॥. প্রতি মণ। তারপরও আমরা যখন মেদিনীপুরে পড়েছি তখনও সকালে দুই পয়সায় দুটি লেডিকেনি এবং বৈকালে দুই পয়সায় ৬ খানা লুচি ও দুই পয়সায় দুটি লেডিকেনী। মেদিনীপুরে যে তিন বৎসর পড়লাম—বাসার কর্তা ছিলেন পাড়ার অধিবাসী গোবিন্দমঙ্গল মহাশয়। তিনি মেদিনীপুরের টাউনস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন। দিনে ও রাত্রে ভাত, কলাই-এর ডাল ও একটু মাছ, আর দুধ—এই ছিল দুইবেলা খাওয়া। আমরা দু-ভাই মাছ খেতাম না। ঐ ডাল ও দুধ দিয়েই ভাত খেতাম। বড়জোর রবিবার কলাই-এর ডালের বদল ছোলার ডাল আজকাল রুচি বদ্‌লেছে খাওয়াও বদলেছে। সকালে পাঁউরুটি ও চা ছাড়া কারুর রুচি হয় না। কেউ কেউ চা-এর বদল দুধ খান। সে বড় লোকেরা। যারা খুব গরীব তারাও পাঁউরুটি ও চা খায়। কেবলি চিৎকার শুনি মাছ পাওয়া গেল না। হৃদয় ডোমের কথা মনে পড়ে "বাবু, একটু কলাই-এর ডাল হলেই ভাতকটা খেয়ে ফেলি।" আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চা খাবার কথা শুনলে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। আর এখন পেট থেকে পড়েই চা খেতে ধরছে। আশ্চর্য্য! এটা কি আর তোমার আদর্শের দেশ আছে?

(৭)

আমাদের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য টেষ্ট হয়ে গেছে। টেষ্টে বীরেন প্রথম ও আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকায় করি। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রী আর, এল, মৈত্র মহাশয় বলেছিলেন—যে প্রথম হবে তাকে ১০৲ টাকা উপহার দিবেন। বীরেন দে সেই উপহার পেয়েছিল। ফি দাখিল করতে হবে। প্রথমদিন আমি আর বীরেন ফি দিলাম। আর কোনও সহপাঠী যারা allow হোয়েছে ফি দিলে না।—হেড্‌মাষ্টার-মশায় শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সকলকে ডেকে বলেন—"ফি দিচ্ছ না কেন?" ভাগবত দাস বল্লে—সেদিন মঘা নক্ষত্র,—সেদিন ফি দিয়ে তারা "ক'ঘা সহ্য করবে"? হেড্‌মাষ্টার মশায় একটি বেশ সুন্দর উপদেশ দিলেন। তিনি বল্লেন,—"আমরা সকলে হিন্দু। আমরা বিশ্বাস করি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল আমরা এ-জন্মে ভোগ করি। সুতরাং তোমাদের পাশ করা বা ফেল করা—সেই কর্ম্মফল অনুযায়ী হবে। 'মঘা নক্ষত্রে' ফি দিলে ফেল্ হবে আর তা না দিলে পাশ হবে কি ক'রে? কর্ম্মফল কি এড়াতে পারবে?" আমি জীবনের প্রথম থেকেই মনে-প্রাণে ঐ কথাই বিশ্বাস ক'রে এসেছি। আমার ধারণা কর্ম্মফল এড়ান যায় না। পুরুষকার দ্বারা হয়ত' কিছু modyfy করা যায়। সে কথা যাক্।—ফি দিলাম, কিন্তু form fill up করার সময় আমার গণ্ডগোল বাধল'। তখন সরকারের নিয়ম ছিল যে যদি কোনও ছাত্র পরীক্ষার তারিখের দশমাসের মধ্যে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হয়—তবে Divisional Inspector of Schools এর permission নিয়ে না গেলে যদি সে Scholarship পাবার অধিকারীও হয় তথাপি তাহা পাবে না,—তার নীচের ছাত্র পাবে। প্রিন্সিপ্যাল মৈত্র মশায় আমাকে বল্লেন—"তুমি ১৮৯৭ সালের জুলাই মাসে জাড়া থেকে transfer নিয়ে এখানে এসেছ। ১৮৯৮ সালের মার্চ্চে তোমাদের পরীক্ষা। সুতরাং দশমাসের মধ্যে পড়বে। কিন্তু তোমার transferএর জন্যে ত' permission নাওনি।" আমি বল্লাম—"স্যার, আমরা ত' এ নিয়ম জানতাম না।" যাই হোক, তিনি তখনি আমাকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে নিজে হুগলীতে Divisional Inspector of School এর নিকট গিয়ে Sanction করালেন। ওটা যদিও formal matter, কিন্তু sanction না থাকলে Scholarship দেবে না।—

মার্চ্চ মাসে পরীক্ষা দিয়ে জাড়া চ'লে গেলাম। সে বৎসর কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়েছে। Bubonic plague। দলে দলে লোক কোলকাতা ছেড়ে পালাল'। পরীক্ষার ফলাফল গেজেটে ছাপা আর হোল' না। যে যার স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলাফলের তালিকা পাঠিয়ে দিলে। জাড়া স্কুলের ফল সেখানে গেল'। যারা সে বৎসর সেখান থেকে পাশ ক'রেছিল সেটা জানা গেল। মায়ের মনটা বড় বিষণ্ণ হ'য়ে গেল। বল্লেন,—"সাতু, তুই কি পাশ করতে পারলি না?" আমি বল্লাম..."মা, আমার ফল এখানে কেন আসবে?" তারপর, দাদা মেদিনীপুরে লোক পাঠিয়ে জানলেন আমি প্রথম বিভাগে

পাশ ক'রেছি। বীরেন ২০ টাকা scholarship পেয়েছে গেজেট হোল। আমার নামে কোনও scholarship গেজেট হ'ল না। বীরেন কলকাতায় প্রেসিডেন্সীতে পড়তে গেল। স্কলারশিপ পেলে মাইনে লাগে না অথচ টাকাটা মাসে মাসে পাওয়া যায়। আমার ত' কিছু হ'ল না। বোধহয় 'মঘা' আমাকে ঘায়েল ক'রেছে। যাক্ গে—মেদিনীপুর কলেজেই first arts এ ভর্ত্তি হ'লাম। দশ পনেরদিন বাদে একদিন প্রিন্সিপ্যাল মৈত্র সাহেব লাইব্রেরীতে আমাকে ডেকে পাঠালেন। মেদিনীপুরে compeiative মেডেলের কথা বলেছি। আরও দুটী স্কলারশিপ আছে। যারা গভর্ণমেণ্ট স্কলারশিপ পায়, ঠিক তাদের নীচের দুটী ছাত্র একটি মাসিক ৫ টাকা আর একটি মাসিক ২॥ টাকা, 'ক ঐক্লপ. স্কলারশিপ পায়। সেজন্যে ঐ কলেজিয়েট স্কুলে যে সকল ছাত্র পাশ করে তাদের পরীক্ষার নম্বর ঐ স্কুলে আসে। প্রিন্সিপ্যাল বল্লেন,—"সাতকড়ি তুমি ভাগবতের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়েছ। এই স্কুলে পাশকরা ছাত্রের মধ্যে বীরেন প্রথম ও তুমি দ্বিতীয় হ'য়েছ, ভাগবতের স্কলারশিপ হল অথচ তোমার নামে স্কলারশিপ • গেজেট হ'ল না। যাই হোক্, আমি হুগলী যাচ্ছি।' হুগলী থেকে ফিরে এসে বল্লেন—'তোমার যে ট্রান্সফার Sanctioned হয়েছিল সেটা হুগলী থেকে ডিরেকটার অফিসে পাঠাতে ভুলে গিয়েছিল। এখন পাঠিয়ে এলাম। তুমি স্কলারশিপ পাবে।" তারপর আমার নামে ১৫ টাকা স্কলারশিপ গেজেট হোল। 'মঘা' কি সত্যই বাধা দিয়েছিল বীরেনের বেলায় দেয়নি ?

৮)

পূর্ব্বেই বলেছি আমার একাগ্রতা বেড়েছিল। পড়াশুনা ভাল করতাম। মৈত্র সাহেব আমাদের খুব সাহায্য করতেন First Arts এর টেষ্ট পরীক্ষায় আমি সব বিষয়েই প্রথম হলাম। মৈত্র সাহেব খুব খুসী হলেন। পাশও করলাম খুব ভাল করে এবং স্কলারশিপ ও সোনার মেডেল পেলাম। এই ভাবে বার বার স্কলারশিপ ও মেডেল পাওয়ায় মার আনন্দ দেখেছি। সেটা স্বর্গীয় বলে মনে হোয়েছে। বি, এ পড়তে কলকাতায় যাব'। জাড়া থেকে ঘাঁটাল হয়ে ষ্টীমার চড়ে কলকাতা। দেড়দিন লাগে। মা পূজার অর্ঘ্য নিয়ে পূজার ঘরে বসে আছেন। খেয়ে দেয়ে তাঁকে প্রণাম করতে তিনি সেই অর্ঘ্য মাথায় ছুঁইয়ে পকেটে দিয়ে দিলেন। ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছি—চৌকাঠে হুঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলাম। উঠে মার মুখের দিকে চাইলাম। তিনি একটুও বিচলিত হলেন না। বল্লেন—"সঙ্কল্প করে বেরিয়ে যাচ্ছ, যাও। কোনও চিন্তা নাই,—ভগবান তোদের সাহায্য করবেন। মনে রেখো—পড়াশুনা শেষ করে দেশের কাজ করতে হবে। পড়াশুনায় অবহেলা কর না।' প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হলাম। বীরেন দেখে অবাক হলাম। বীরেনও স্কলারশিপ পেয়েছে। দুজনেরই সমান মূল্যের স্কলারশিপ। সে হিন্দু হোষ্টেল ছেড়ে Dogla Boarding এ এল। আমাদের বাসা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

প্রথমদিন গণিতের ক্লাসে গিয়েছি। প্রফেসার বিপিন বিহারী গুপ্ত third year class এ গণিত পড়াতেন। পাটের চাপকানের উপর চোগা,—চোখে সোনার চশমা। ক্লাসে ঢুকে একবার চারিদিকে ছাত্রদের দেখে নিলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বল্লেন,—"তোমরা সকলেই প্রায় বাঙ্গালী যুবক বাঙ্গালীর পোষাক—ধুতি চাদর। যারা ইউরোপীয় পোষাক পরবে, তাদের বলছি না। যারা বাঙ্গালী হোয়ে বাঙ্গালী পোষাক পরবে তাদের বলছি। তাদের সকলের গায়ে যেন চাদর কাল থেকে দেখি।" পরেরদিন থেকে সকলেই চাদর নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই যে চাদর ব্যবহার করতে শিখলুম, আজও জীবনের শেষপ্রান্তে চাদর ছাড়া চলতে পারি না। তারপর Roll call করতে করতে আমার নাম ডাকতে আমি—"present sir" বলার পরেই থেমে গেলেন। একটু থেমে বল্লেন—"সাতকড়িপতি রায় কে ?"—আমি দাড়িয়ে বল্লাম— "আমি স্যার।"—বল্লেন—"তুমি কি মেদিনীপুর কলেজ থেকে এসেছ ?" আমি বল্লাম—"হ্যাঁ, স্যার।' তখন বল্লেন—তুমি টিফিনের সময় লাইব্রেরীতে আমার সঙ্গে দেখা কোরবে।" মফস্বলের ছাত্র, কলকাতায় প্রথম এসেছি পড়তে। কিছু দোষ করলাম নাকি ? বীরেনের পাশেই বসে-

ছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বল্লে—"না, কিছু নয়। উনি আমাদের first ও second year-এ পড়িয়েছেন। খুব গম্ভীর হলেও খুব অমায়িক।" টিফিনের সময় লাইব্রেরীতে যেতে, তিনি বল্লেন "তোমার গণিতের কাগজ আমি দেখেছি। মফস্বলে পড়ে তুমি ভাল লিখেছ। বীরেন গণিতে প্রথম হয়েছে। সে আমার ছাত্র। কিন্তু তুমিও খুব ভাল করেছ। যখন তোমার কোনও অসুবিধা হবে আমার বাড়ীতে আসবে। দ্বিধা কোরো না।" কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার ছাত্রদের এত ভালবাসেন দেখে খুব খুসী হয়েছিলাম। তাঁর বাড়ীতেও গেছি। খুব যত্ন করে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কলকাতায় এসে আমার আর একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমরা যখন জাড়া থেকে মেদিনীপুরে পড়তে আসি তখন ডাক্তার ভুবনেশ্বরবাবু মেদিনীপুর থেকে অবসর নিয়ে তাঁর জামাতা ডাঃ শচীন সর্ব্বাধিকারীকে তাঁর প্র্যাক্টিসে বসিয়ে দিয়ে কলকাতায় বাড়ী করে সেখানে চলে আসেন। কলকাতায় পড়তে এসে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে গেলাম। যেই তাঁর সামনে "জ্যাঠামশাই" বলে হাজির হয়েছি সেই তিনি উঠে এসে আমাকে প্রণাম করলেন। আমিও একেবারে "থ্" হয়ে গেলাম। যখন মুখ দিয়ে কথা বেরুল তখন বল্লাম একি কল্লেন জ্যাঠামশাই?" তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন "জাত সাপের ছোট বড় নেই।" তুমি উপনয়ন সংস্কারে দ্বিজ হয়েছ। তুমি কায়স্থর প্রণম্য। সেদিন সরে গেছে। এখন সুবর্ণ বণিকের বংশজ যুবক ব্রাহ্মণ সংসারের ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে তার চিত্ত জয় করে বিবাহ করছে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা খারাপ তা জানি না। যা দেখেছি তাই লিখলাম।

(৯)

কলকাতায় পড়তে এসে আমার জীবনের আর একটা দিক খুলে গেল। পূর্ব্বে লিখেছি,—হিন্দুধর্ম্মে আমার একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হিন্দুর আচারে ব্যবহারে এমন অনেক জিনিষ পল্লীগ্রামে দেখেছি যাতে প্রাণে আঘাত লাগত। আমি তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। সংবাদপত্রে দেখলাম আনি বেসাণ্ট কলকাতা আসছেন। তিনি বক্তৃতা দেবেন ষ্টার থিয়েটারে, টিকিট করে। পয়সা দিয়ে টিকিট নয়, invitation এর টিকিট। থিওসফিক্যাল সোসাইটির কথা মেদিনীপুরে জেনেছিলাম। আনি বেসাণ্ট খুব ভাল বক্তৃতা করেন শুনেছিলাম। তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য প্রাণে বড় আকাঙ্ক্ষা হল। তখন আমাদের বাসাবাড়ী ঝামাপুকুর লেনে। বাংলার থিওসফিক্যাল সোসাইটির হেড অফিসও ঐ রাস্তায়। সেখানে খোঁজ নিয়ে জানলাম বাংলার সম্পাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট পাওয়া যাবে। তিনিও ঝামাপুকুর লেনেই থাকতেন। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে পাই না। শুনলাম ভোরে গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে। একদিন রাত্রি সাড়ে চারটা থেকে তাঁর বাড়ীর সামনে ধন্না দিয়ে বসে থাকলাম। সাড়ে পাঁচটায় উঠে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"কি চাই ভাই?" আমি অপরিচিত যুবক। তাঁকে প্রণাম করেছি। একেবারে পরমাত্মীয়ের মত বুকে জড়িয়ে ধরবেন এটাত আশা করিনি। বল্লাম—"বেসাণ্টের বক্তৃতা শুনব', টিকিট চাই। জিজ্ঞাসা করলেন কি করি। বল্লাম বি, এ, fourth year-এ পড়ি।—সেটা ১৯০১ সালের ডিসেম্বর, কি ১৯০২ সালের জানুয়ারী। বল্লেন—"আমার কাছে টিকিট আছে কে বল্লে?" বল্লাম যে, অফিস থেকে খবর পেয়েছি। আমার সঙ্গে মেদিনীপুরের এক বন্ধু বরেন দেব ছিল। সে General Assembly-তে fourth year-এ পড়ত। তখনি ফিরে গিয়ে দুখানা টিকিট দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"আর কাউকে বোল না ভাই—আমার কাছে টিকিট আছে।" অপরিচিত যুবকের প্রতি মানুষ যে এরূপ অমায়িক ব্যবহার করতে পারে সেটা আমার অভিজ্ঞতা ছিল না। বেসাণ্টের বক্তৃতা শুনলাম। হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার উপর এরূপ প্রাঞ্জল সমালোচনা তার পূর্ব্বে শুনি নাই। মুগ্ধ হলাম। রাজেনবাবুর সঙ্গে দু-একদিন বাদে, বেসাণ্ট চলে যাবার পর, সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম একজন দিল-খোলা, প্রাণ-খোলা লোক, যার আপন-পর নাই।—সকলেই আপন। জিজ্ঞাসা করলাম—"থিওসফি কি কেবল হিন্দুধর্ম্ম নিয়ে?—বললেন, না। সকল ধর্ম্মের ভিত্তি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। সেই আধ্যাত্মি-

কতার exposition করে theosophy। তবে এর মূলে হিন্দুধর্ম্মের বা সনাতন ধর্ম্মেরই প্রাধান্ত বেশী। যে সকল মাষ্টারগণ এই সোসাইটির পশ্চাতে থেকে চালান তাঁরা সব নৈমিষারণ্যে থাকেন। তাঁরা বিদেহী পুরুষ। যদি বেশী জানতে চাও প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অফিসে এস। সেখানে আলোচনা হয়।" দু-তিন শনিবার সন্ধ্যায় অফিসে গেলাম। দেখলাম বহু বিদ্বান ব্যক্তি সেখানে আসেন। তারমধ্যে আলাপ হল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে। তাঁর হিন্দু-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হলাম। তিনি হাইকোর্টের অ্যাটর্নি। রাজেন্দ্রবাবু ছিলেন philosophyতে M.A,B.L, এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের Law officer। ডাক্তার হেমেন্দ্র সেন তখন কলকাতার একজন নামকরা চিকিৎসক এবং campbell Medical College-এর professor। এইরূপ কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হোল। রাজেনবাবু ঠিক ছোট ভায়ের মত গ্রহণ করেছিলেন আমাকে। তাঁর কথায় ঐ সোসাইটিতে যোগও দিয়েছিলাম।

রাজেন্দ্রবাবু তাঁর জীবনের ইতিহাস বলেছিলেন। এম, এ, এবং বি, এল পাশ করার পর মাতাল হয়ে গেছলেন। দেনার দায়ে বসতবাড়ী বিক্রী করে দিয়ে ঝামাপুকুরের বাসায় উঠে আসেন। তখন চৈতন্ত হয়। থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিলেন! কিন্তু তখনও মদ খাওয়ার অভ্যাস একেবারে ছাড়তে পারেন নি। শোবার সময় পরিমিত মদ খেয়ে শুয়ে পড়তেন। অ্যানিবেসেণ্ট তখন ঐ সোসাইটির inner section-র (esoteric section) অর্থাৎ যারা যোগমার্গের কার্য্য গ্রহণ করতে পারেন তাদের জন্যে যে বিভাগ আছে তার কর্ত্রী। রাজেনবাবু সেই বিভাগে যোগ দেবার জন্যে বেসেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেন। বেসেণ্ট সেটা নামঞ্জুর করেন। তখন রাজেনবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—কেন তাঁর দরখাস্ত নামঞ্জুর হল। বেসেণ্ট বলেছিলেন,—তুমি যে এখনও রাত্রে শোবার সময় মদ খাও, নেশা ছাড়তে পারনি। সুতরাং তুমি কি করে যোগ-বিভাগে আসবে?" রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন কে তাঁকে ঐ কথা জানিয়েছে। তাতে বেসেণ্ট বলেছিলেন, এই সামান্ত বিষয় জানবার শক্তি যদি আমার না হয়ে থাকে তবে আমাকে এই বিভাগের কর্ত্তা করেছে কি জন্যে?" রাজেন্দ্র বাবু মরমে মরে গেলেন। বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা করলেন সেই দিনই মদ খাওয়া ছেড়ে দেবেন।

"শোবার সময় মদ ছুঁলাম না সেদিন। ঘুমুতে পারলাম না। উঠে পায়চারি করতে করতে রাত তিনটা বাজল। যে স্ত্রী বরাবর আমার মদ খাওয়ায় বাধা দিয়েছে সে নিজে গ্লাসে মদ ঢেলে এনে আমাকে মিনতি করে বললে—আজ এটা খেয়ে শুয়ে পড়। আমি তার হাতে এমন ধাক্কা দিলাম যে গ্লাস শুদ্ধ নিয়ে সে পড়ে গেল। বললাম, আমার কাছে এস না। ভোর হতে গঙ্গা-স্নান করে বেসেণ্টের কাছে যাওয়া মাত্র তিনি হেসে বল্লেন ব্রত উদ্‌যাপন করেছ। তোমায় inner section এ আজ ভর্ত্তি করে নিচ্ছি।" রাজেনবাবুর কাছে এ গল্প শুনলাম। বিশ্বাসও করলাম। তারপর রাজেনবাবুর যে অলৌকিক শক্তি দেখেছি তাতে চমৎকৃত হয়েছি। সেটা আর একদিন বলব।

(১০)

১৯০১ সালের ডিসেম্বর। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। বিডনস্কোয়ারে প্রকাণ্ড প্যাণ্ডেল বেঁধে অধিবেশন। বম্বের মেটা সাহেব সভাপতি নির্ব্বাচিত। আমি fourth year এ পড়ি। টেষ্ট হয়ে গেছে। দর্শকের টিকিট কিনে আমরা দেখতে গেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন-গণ মন অধিনায়ক সেই প্রথম কংগ্রেসে গাইলেন। যেমন সুন্দর গান তেমনি গলা। খুব ভাল লাগল। তারপর সভাপতির বক্তৃতা। মাথায় পাগড়ী বাঁধা একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোককে দেখলাম। সুরেন বাড়ুজ্যে মশায় ডায়াসের উপর তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় দিলেন—"ইনি মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের নেতা। কংগ্রেসে যোগ দিতে এসেছেন।' পরদিন কংগ্রেসে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হল এবং প্রচার করা হল ঐ সব প্রস্তাব Viceroy, Secretary of state for India এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে পাঠানো হবে। ঐ সব প্রস্তাবের উপর বড় বড় বক্তৃতা হচ্ছিল একসময় বাইরে এসে একটি বেঞ্চে বসলাম। আর একটি আমাদের বয়সী যুবকও সেই বেঞ্চিতে বসে। জিজ্ঞাস

করলাম 'কেমন দেখছেন'? তিনি একটু হাসলেন। বললেন, "বড়লোকের বিলাসিতা ছাড়া আর কি?" প্রশ্ন করলুম "এইভাবে দেশের স্বাধীনতা আসবে? তিনি বললেন-"এরা কি স্বাধীনতা চান না কি? ?" এইভাবে গল্প জমে উঠল। আলাপ করে জানলাম তাঁর নাম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত,—তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা। আমারও মনে হত এঁরা বছর বছর পয়সা খরচ করে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে একবার করে মিলিত হয়ে এই বক্তৃতা করে আর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সেগুলি ইংরাজ সরকারের গোচরীভূত করে কি করতে চান? এঁদের পশ্চাতে কি বল আছে? ইংরেজ সরকার এদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সেটা গ্রহণ করাবার শক্তি আছে? আমাদের মনে হয়েছে ইংরেজ বণিক আমাদের বস্ত্র-শিল্প ধ্বংশ করে তাদের দেশের কলের কাপড় আমাদের দেশে বিক্রী করে প্রতি বৎসরে বহু কোটি টাকা নিয়ে যায়। যদি এরা তার প্রতিকার করতে পারতেন তবে এর থেকে বেশী কাজ হত।

তখন বোম্বাই এ কয়েকটি কাপড়ের কল হয়েছে। আমি তখন B A তে Mathematics ও Science ও double honours পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে M, A class এ ভর্তি হোয়েছি। কে, বি, সেন বলে কলকাতায় একজন ব্যবসাদার সেই কল থেকে মোটা মোটা কাপড় কলকাতায় আমদানি করলেন। আমরা খুসী হোয়ে সেই মোটা কাপড় নিজেরা পরলাম এবং অবসর সময়ে সেই কাপড় নিয়ে ঘরে ঘরে ফেরী করতাম। বেশ মনে আছে কে, বি, সেনের বাড়ী ছিল ঝামাপুকুরে—বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীটে। যত দিন না M A পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছলাম ততদিন এই কাপড় ফেরী করেচি।

আমরা Student Union করেছিলাম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের সেই ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। সেই ইউনিয়ন থেকেই কাপড় ফেরী করা হত। কলকাতার অধিবাসীদের ইংরাজ এই ব্যবসায়ে আমাদের যে কতটাকা নিয়ে যাচ্ছে সেটাও সেই সঙ্গে বলতাম। বোঝাতাম আমাদের কাজের ফল খুব মন্দ হয়নি। কে, বি সেনমশায় আমাদের ইউনিয়নকে বিশ্বাস করে কাপড় ছেড়ে দিতেন। আমরা বিক্রী করে টাকা দিয়ে আসতাম।

(১১)

বি, এ থার্ড ইয়ারের শেষ,—ফোর্থ ইয়ারের আরম্ভের পূর্ব্বেই আমার বিয়ে হোয়ে গেল—১৯০১ সালের মে মাসে। আমার বিয়ের একটা গল্প আছে। আমার শ্বশুর শ্রী হরিচরণ রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) মশায় মেদিনীপুর কলেজে প্রথম বিজ্ঞানের প্রফেসর এবং পরে প্রিন্সিপ্যাল হন। দাদা তাঁর ছাত্র। বাবা তাঁর জীবিতকালে বন্ধু ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রামের কলেজে বদলি হয়ে যান। ১৯০১ সালে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আসেন। তিনি দাদাকে জানায় পত্র লিখেন যে আমার বাবা তাঁর সেই মেয়ের জন্মসময়ে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর কোনও পুত্রের সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ দিবেন। এখন আমার দাদা যদি সেই প্রতিশ্রুতির কথা মনে করে আমার সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ দেন তবে ভাল হয়। দাদা জানালেন—"বাবার যদি সত্যই প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে তবে তা রাখতে হবে।" দাদা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন। মা কিছুই জানেন না। তখন আমার শ্বশুর লেখেন কি ভাবে ঐ প্রতিশ্রুতির উদ্ভব হয়। তিনি তার ঐ কন্যার জন্মসময়ের এক ঘটনা লিখে জানান। শাশুড়ী ঠাকরুণ সাতদিন প্রসব বেদনার পরও প্রসব হতে পারেননি। বাবা একটা ঔষধ জানতেন—একটা গাছের শিকড়। সেটা চুলে বেঁধে দিলে শীঘ্র প্রসব হয়। বাবা তাঁর স্ত্রীর ঐ ব্যাপার শুনে কোর্ট থেকে ফিরে এসে সেই শিকড় নিয়ে যান এবং চুলে বেঁধে দিতে বলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসব হলে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন "কি সন্তান হল হরিচরণ?" তিনি বলেছিলেন "মেয়ে"। বাবা তখন বলেছিলেন-"তোমার এই মেয়ের সঙ্গে আমার এক ছেলের বিয়ে দোব।" দুই বন্ধুর এই কথা। দাদা জেনে মাকে বলেন, বাবা যদি বলে থাকেন তবে সে কথা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ওঁরা মত স্থির করে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বলেছিলাম "B, A, পরীক্ষা হয়ে যাক্"।

ক্রমশঃ

জালিয়ানওয়ালাবাগ

শ্রীসুধীর নন্দী

ইতিহাসের অর্গলাবদ্ধ
লক্ষ লক্ষ খুপরি,
তার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলেম
সেই আদিম পশুটা
আজো তেমনি আস্ফালন করছে।
সেই তৈমুর, সেই চেঙ্গিস
সেই বর্বর ওডায়ার
অট্টহাস্য করছে বীভৎস ভঙ্গীতে,
অনেক রক্ত, অনেক অশ্রু,
নারী শিশুর নির্বিচার হত্যাকাণ্ড!
মানুষ রুখে দাঁড়াল,
খ্রীষ্টেরও জন্মাবার অনেক অনেক আগে
যেমনটি রুখে দাঁড়িয়েছিল
ডেভিড গালিয়াথের সামনে
সন্নত ভঙ্গীতে;
যেমন ক'রে রোম্যান এমপিথিয়েটারে
মানুষ উন্মত্ত পশুর মুখোমুখি হ'ত।
আত্মার নির্ভয় ঐশ্বর্য
আলেকজান্দারকে বলেছিল,
"আমি অ-মৃত্যু,
তোমার কোপদিগ্ধ ইস্পাতের
স্পর্শাতীত আমি—"
এ সেই আমি,
সেই বৃহৎ আমিটা যে সত্য হতে চেয়েছিল
মৈত্রেয়ীর সাধনায়,
তাকে আবার প্রত্যক্ষ করলেম
পঞ্চনদীর তীরে,
একটা স্বল্পখ্যাত বাগিচায়;
মৃত্যুর তাণ্ডবে
সে অমৃত-বাণী শোনালো;
জয় হল তারই;
আজো সেই জয়ের নিশানা দিগ্‌দিকে;
মানুষ-পশুর হুহংকার ডুবিয়ে দিয়ে
তার অভয়মন্ত্র কম্বুকণ্ঠে নিনাদিত।
তার জয় হোক;
জয় হোক এই নবজাতকের,
জয় হোক্ এই চির জীবিতের।

অভিসারিকা

সুনীতি দেবী

কত সখ করে পরেছে নতুন শাড়ী,
কপালেতে টিপ, খোঁপায় একটি ফুল,
ভিড়ের বাসেতে একাই দিয়েছে পাড়ি,
অন্ধকারেও রাস্তা হয়নি ভুল।

লেকের ধারেতে থাকবে সে বসে একা,
বলেছে সে—এসো, পড়লে একটু বেলা
সেখানে কদিন হয়েছে তাদের দেখা,
সেখানেই শুরু প্রথম প্রেমের খেলা।

কতদিন ধরে বিকেলে না খেয়ে মুড়ি,
এ কটা পয়সা জমিয়েছে 'বাস' ভাড়া
নাইবা কিনেছে ঠুনকো কাঁচের চুড়ি,
চায়না সে কিছু বঁধুর সঙ্গ ছাড়া

'ষ্টপে' নেমে তবু বুক দুরদুর করে,
কি জানি আজকে নাই যদি এসে থাকে,
'ওভার টাইমে' আটকা আপিস ঘরে—
তারই কি ভাগ্য জড়ায় দুর্বিপাকে ?

আরও মনে ভয় কেউ দেখে ফেলে পাছে,
বাড়ীতে একথা শুনলে বল কি হবে ?
আধুনিকা রাধা কি করে তাহলে বাঁচে—
লেকের জলেতে মরবে কি ডুবে তবে ?

উপেক্ষিতা

সুনীতি দেবী

একদিন ট্রামে বসেছিল পাশে, বলেছিল মুখে চেয়ে,
"নিখিলেশ বলে ক্লাসের মধ্যে আপনিই সেরা মেয়ে,
আপনার কাছে 'নোট' নেব এই মনেতে রেখেছি আশা"
ঘাড় নেড়ে শুধু বলেছিলে "বেশ", আর ত ফোটেনি ভাষা।

এতদিন ধরে নয়নে নয়নে বলেছ কতই কথা,
ভাবো সে এখনও বোঝে নি তোমার মনের গোপন ব্যথা?
'অফ পিরিয়ডে' 'নোট' নিয়ে হাতে গিয়েছিলে তার কাছে,
দেখলে নিভৃতে মালিনীর সাথে গল্পে মগ্ন আছে।
দেখেই তোমাকে "কাজ আছে" বলে উঠে চলে গেল ত্বরা,
মালিনীর ঠোঁটে দেখনি সেদিন হাসিটি ব্যঙ্গভরা?

তবুও ত তুমি চিঠি লিখে গেছ পড়া জানিবার ছলে,
জবাব পাওনি, লজ্জা পেয়েছ, দুচোখ ভরেছে জলে।
এখন ত তার 'নোট' নেওয়া শেষ, আর সে চায় না দান,
প্রতিদানে শুধু নিক্ষেপ করে উপেক্ষাভরা বাণ।

ক্লাসে গিয়ে যদি দেখ কোন দিন আসে নাই সেই জন,
বই নিয়ে নাড়াচাড়া কর, পড়ায় বসে না মন।
"মালিনীও আজ 'এবসেন্ট' দেখি", হেসে বলে নিখিলেশ,
শেলসম বুকে বেঁধে সে কথাটা, ব্যথার কি নেই শেষ?

তার কাছ থেকে এল শেষে চিঠি, হলুদে লালেতে মেশা,
মালিনীর সাথে বিয়ে হবে তার।—ছুটেছে এখন নেশা?
উপেক্ষিতা গো, মর্ম্ম বেদনা হৃদয়ে গোপন রাখো,
জানবে না কেউ। উদাসীনতার বর্ম্মে নিজেকে ঢাকো।

বুড়ী ও চড়ুই

কল্যাণী দত্ত

এক যে ছিল বুড়ী।
কানা গলির মোড়ে—
তার অসলী সোনা চাঁদির দুকান।
বুড়ো মরে গেছে কবে
তবু খানিক ঠাট-বজায় আছে।
শো-:কেসে কতকগুলো সাবেকী গহনা,
নীচের তাকে কিছু বাসন,
পুতুল, পরী, গোঁফওয়ালা বেড়াল,
একপাশে নেহাই, হাতুড়ী, টুকিটাকি,
দেওয়ালে বন্ধ ঘড়ি।

পড়শীরা বলে নানীকে
'বেচে দে তোর তেজারতী গয়না মোহর
ঘরটা ভাড়া দে
পেট ভরে খা।'
বুড়ী খেপে যায়।
ইদানীং ওর জেবরের খোঁজ পেয়ে
যদি কোন রঙ্গীন লোক আসে

তখন ও আরও খেঁকী হয়ে ওঠে।
বড় দরজাটা আদ্ধেক বন্ধ করে
ময়লা ঝাড়ন দিয়ে
কাচের ডালা মুছে চলে
ঘরের কোণে থুতু ফেলে
আর বিড় বিড় করে বকে।

একদিন হয়েচে কী
আলমারীর পাল্লা খোলা পেয়ে
একটা চড়ুই পাখী—
তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে।
আর থেকে থেকে ঠুকরে দেখচে—
টুকটুকে লাল লালু আঁটা তাবিজ না অনম
ভারী ভারী চিক আর হাঁসুলী—
বেগনি কাগজে মোড়া
মুড়কি মাদুলিগুলো।

'বাঃ দিব্যি মজা পেয়েচ দেখচি
রোসো, দিচ্চি কপাট বন্ধ করে'
বলতে বলতে—
সুতোর গুলি আর বোনার কাঁটা হাতে
বুড়ী এল ওকে তাড়াতে।
কিন্তু খোপের মধ্যে চড়ুইটা
নাচতে লাগল ফুড়ুৎ ফুড়ৎ করে
সেই অবরবন্ত নারীর—
বলতে গেলে নাকের ডগায়।
কিছুতেই ভয় পাওয়ানো গেল না ওকে।
এদিকে ছুটোছুটি করে—
বুড়ী বেশ ঘেমে গেল।
একটু বসে
সবে যেই দোক্তা ঠেলেচে গালে
অমনি কী করে জানি সেই বন্ধ ঘরে—
কদ্দিনকার—সব কথা
কোন্ ফাঁকে তার মনে পড়ে গেল।

যখন গাঁয়ের কুয়োতলায়
মিছিমিছি হেসে
ও কেমন গলে গলে পড়ত,
আঁচলের নীচে ঝলমলিয়ে উঠত—
ওর পাথরে গড়া শরীর।
যখন সব গয়না
শুধু ওকেই মানাত।
কী বিশ্বাসঘাতক, আর ভয়ঙ্কর সেই বয়েসটা;
ধুত্তোর;
সে সব দিনরাত্তিরের কাঁথায় আগুন।

কিন্তু চিল নয় শকুন নয়,—
হাঁস নয় ময়ূর নয়,
শেষে চড়ুই—
ছোট্ট একফোঁটা চড়ুই—
ওকে ঈর্ষ্যায় বিষিয়ে দিলে!

গ্রামসেবক মাখনলাল দে

দেবেন্দ্রকৃষ্ণ দে

যে বংশে নির্মল চরিত্র দেশসেবক মাখনলাল দে মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন তাহা অতি পূর্ব্বকালে নীলপুরের দেববংশ বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বংশের দুই সহোদর গন্ধর্ব্ব খাঁ বাহাদুর দেব নিয়োগী আর পুরন্দর খাঁ বাহাদুর দেব নিয়োগী জন্মগ্রহণ করেন। পুরন্দর খাঁ শোভাবাজারের রাজবাটীর দেব বংশের আদি পুরুষ এবং গন্ধর্ব্ব খাঁ জাড়গ্রাম নিবাসী দেব নিয়োগীদের পূর্ব্ব পুরুষ।

প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে সাহজাহান অথবা আরংজীবের রাজত্বকালে গন্ধর্ব্ব খাঁর বংশে গোপাল চন্দ্র দেব নিয়োগীর দুইপুত্র শ্যামাচরণ আর হরিচরণ বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত ইন্দাস থানার অন্তর্গত রোঁয়াই গ্রাম হইতে জাড়গ্রামে আসিয়া পত্তনিদার হইলেন এবং যে দুর্গ সে সময়ে তথায় ছিল তাহা রাজাদেশে দখল করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দুর্গটিকে গড়বাড়ী বলা হইত। ইহা প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু রাজত্বকালে জাড়গ্রামের পশ্চিমে নির্ম্মিত হইয়াছিল। জাড়গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত। ঐ কায়স্থ বংশে যেসব কৃতি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের কিছুকিছু পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্যামাচরণের পুত্র লক্ষীনারায়ণ গড়বাড়ীর দেওয়ান ছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের স্থান সমূহের কর আদায় করিয়া রাজ-সরকারে প্রেরণ করিতেন।

লক্ষীনারায়ণের পৌত্র রত্নেশ্বর মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দির রাজত্বকালে হাবেলী এবং ছটিপুর এই দুই পরগণার শিকদার অর্থাৎ কালেক্টর হইয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং সম্পদশালী হন। তিনি জাড়গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ার কুলিন ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ কালীকান্ত তর্ক পঞ্চানন এবং ঘোষেদের পূর্ব্বপুরুষ নিত্যানন্দ ঘোষ ও চৈতন্য ঘোষকে নগাঁ মন্না হইতে আনাইয়া এবং জমিজায়গা দান করিয়া জাড়গ্রামে বসতি করান। তাঁহারই অর্থবলে দেবালয়, দোলমন্দির, নূতন রাস্তাঘাট, 'শানপুকুর' নামে পুষ্করিণী নির্ম্মিত হয়।

গোবিন্দরাম দেব নিয়োগী (রত্নেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র) জল-সেচনের জন্য একটি খাল নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, ইহা হোদল গ্রামের উত্তরে অবস্থিত এবং ইহা 'গোবিন্দ খালী' বলিয়া পরিচিত।

মাখনলাল দে রত্নেশ্বর দেব নিয়োগীর চতুর্থ পুত্র পিতাম্বরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মকর্ম্ম ও গ্রামের উপকার সাধনের জন্য কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। গ্রামের পুস্তকালয় তাঁহারই চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। 'বিহারীলাল দীপাধার' নামক একটি আলোকস্তম্ভ এবং 'সৌদামিনী পানীয়াধার' নামে একটি ইন্দারাও তাঁহার কীর্ত্তি। পুস্তকালয়টি 'মাখনলাল পাঠাগার' নামে পরিচিত। বিহারীলাল মাখনলালের পিতা এবং সৌদামিনী তাঁহার মাতা।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে হরিচরণ দেব নিয়োগীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধ্যপ্রদেশে বিচারক judge ছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি এখন নাগপুরে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে পাঠাগার ও পোষ্ট-অফিস ভবন অর্দ্ধনির্ম্মিত হইয়া পড়িয়া আছে।

মাখনলাল দের মধ্যমা কন্যা সরোজিনীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রী অনিলকুমার সরকার পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি উপাধি পাইয়া সিংহলে কলম্বো বিশ্ব-

বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি দুই বৎসরের জন্ত সস্ত্রীক শিক্ষা-সংক্রান্ত-বিলাতে প্রেরিত হইয়াছেন।

মাখনলাল দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণলাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দে হুগলী কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল।

মাখনলাল এত প্রতিভাসম্পন্ন ও গুণশালী ছিলেন যে সুযোগ সুবিধা পাইলে এবং উচ্চাভিলাষী ও যশোলিপ্সা থাকিলে তিনি যে কোন কর্ম্মক্ষেত্রে অনায়াসে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন। হৃদয় জয় করিবারও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খ যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন নীরব-কর্ম্মী ও স্বদেশ-হিতৈষী। ভাগ্যচক্র তাঁহাকে জাড়গ্রাম হইতে অবশেষে মুর্শিদাবাদে জেলা স্কুলে প্রধান-শিক্ষক রূপে উপস্থিত করে।

'গ্রামে ফিরিয়া যাও, এই উপদেশ বাণী প্রথম প্রচার করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ; কিন্তু তাঁহার বহুপূবে যেসব মনীষিগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া নিজ নিজ গ্রামের সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে মাখলাল অন্যতম।

মাখনলালের মতে গ্রামের দুর্গতির প্রধান কারণ, শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোন না কোন প্রকারে ইংরাজ-দিগকে শোষণ কার্যে সহায়তা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বিদেশভূমে বসবাস করিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা স্বদেশে, স্বগ্রামে রহিয়া গেলেন, তাঁহারা অধিকতর দুঃখী ও নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে গ্রামরক্ষার আবশ্যকতা অনুভূত হইবে। এই কারণে তিনি যতদিন বিদেশে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, ততদিন গ্রীষ্মাবকাশে অন্তত্র না গিয়া নিজগ্রামে ফিরিয়া আসিতেন ও পল্লী উন্নয়নে মনযোগ দিতেন।

তিনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জাড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে গ্রামে কেহ ইংরাজি জানিত না। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা সাহিত্য ও শুভঙ্করী বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গ্রামে টোল ছিল। প্রয়োজন হইলে মাখনলালের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত পড়াইতেন। আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাঁহারা নায়েব গোমস্তা প্রভৃতির কর্ম্মগ্রহণ করেন। মাখনলালের পূর্ব্বপুরুষগণ যে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাহা কতক দান করাতে এবং কতক গ্রামের এবং সংসারের অভাব পূরণ করাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার জ্যাঠামশায় ক্ষেত্রনাথ নায়েবের কর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ও মাখনলালের পিতা পালাক্রমে জগদ্বল্লভপুরে গমন করিতেন। তখন গ্রামের মধ্যবিত্ত সংসারের আয় সাধারণ লোকের আয়ের দ্বিগুণের অধিক ছিল না। সকলের আহার, পোষাক একপ্রকার ছিল। প্রভেদ ছিল কেবল শিক্ষায়, কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে।

সেকালে ভদ্র পিতার পক্ষে পুত্রকে কোলে করা বা চুম্বন করা অন্যায় মনে করা হইত। শিশুকালে পিতৃস্নেহ বড় কেহ পাইত না। মাতার নিকট লালিত-পালিত হইয়া মাখনলাল ঈশ্বরে ভক্তি, সরলতা, পরিশ্রম ও অল্পে সন্তুষ্টি প্রভৃতি গুণে বিভূষিত হইতে লাগিলেন।

মাখনলালের জন্মের কয়েক বৎসর পরে সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে কয়েকজন গোরা-সৈন্য দেশী-সৈন্য লইয়া গ্রাম ঘেরাও করিল। যাহারা গোপনে পলাইতে চেষ্টা করিল, তাহারা ইংরেজের গুলিতে প্রাণ হারাইল। পরে তাহারা গ্রামে প্রবেশ করিয়া বহু বলিষ্ঠ বাগ্দীকে বিনাকারণে সর্ব্বসমক্ষে ফাঁসী দেয়। ইহাতে গ্রামে অত্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হয়; বোধহয় এই কারণেই মাখনলাল বাল্যকালে একটু ভীরু প্রকৃতির ছিলেন। শুনা যায় সিপাহী বিদ্রোহের পর ঐরূপ নৃশংস অত্যাচার গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গ্রাম্য-পাঠশালায় প্রবেশের পর কিছুদিনের মধ্যে মাখনলাল শান্ত ও মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় গুরু মহাশয় এবং সহপাঠিগণ সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। সেই ভালবাসা তাঁহাকে উন্নত করিল এবং পরবর্তীকালে ভালবাসা তাঁহার জীবনের চিরসাথী হইয়া রহিল। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যখন চকদীঘিতে পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত ছাত্রসমূহ মাখনলালকে আদর্শ ছাত্র বলিয়া গণ্য করিল। চেহারায়, হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে সমভাবে সুন্দর বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি সেই অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। বাল্যকালেই মাখনলাল অসাধারণ ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় দেন। ক্রমে তিনি বিদ্যানুরাগী হইয়া উঠেন। ১৫ বৎসর বয়সে চকদিঘী স্কুল হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় চকদিঘীর স্বদেশহিতৈষী জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহরায় মহাশয় তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দেন। ইহা ছাড়াও শিক্ষাবিভাগ তাঁহাকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি প্রদান করে। এই অর্থেই তিনি হুগলীর আই, এ, পড়ার খরচ চালাইয়া লইলেন। আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর অর্থের অসচ্ছলতা তাঁহার উচ্চশিক্ষার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও মেধার পরিচয় পাইয়া তিরোলের জমিদার তাঁহাকে জামাতা করিয়া লইতে ইচ্ছুক হন এবং তাঁহার উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হইবে এই আশায় কেবল পিতার আদেশে তিনি বিবাহে সম্মতি দেন।

সুখে লালিত-পালিত পরমাসুন্দরী জমিদার-কন্যা জাড়গ্রামে মাখনলালের গৃহিণীর আসন অধিকার করিলেন। তখন তিনি সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া কাঁকালে করিয়া নদী হইতে জল আনিতে, মুড়ি ভাজিতে রন্ধন করিতে এবং সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিতে শিখিলেন। কাজ করিতে করিতে তাঁহার মুখাকৃতি চন্দ্রের মত আভাযুক্ত হইয়া উঠিত। সেজন্য তাঁহার স্বামী মাখনলাল তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া শশীমুখী রাখিলেন। শশীমুখীর আর এক কাজ ছিল শিশু দেবর কৃষ্ণলাল দেকে মানুষ করা এবং শ্বশুর মহাশয়ের পরিচর্য্যা করা।

বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সংসারের অসচ্ছলতা দূর করিবার জন্য পিতার আদেশে জগদ্বল্লভপুরে ২৫৲ মাসিক বেতনে তিনি শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেই অর্থে সংসারের যাবতীয় খরচ ভাল ভাবেই চলিয়া যাইত। পরে অধিকতর বেতনে হাওড়া, চাইবাসা, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানে শিক্ষকতা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে ইংরাজী ও সংস্কৃত পুস্তক ক্রয় করিয়া নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে থাকেন। সেই জ্ঞানপিপাসা তাঁহার আজীবন ছিল। তিনি প্রত্যহ দৈনিক পত্রিকা পাঠ না করিয়া শান্তি পাইতেন না। বৃদ্ধ বয়সে গীতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। সকল ধর্ম্মেই তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর।

হাওড়ার এক স্কুলের ধনী স্বত্বাধিকারী মাখনলালকে তাঁহার গৃহে সমাদরে স্থান দিলেন। তিনি সেই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। সেই ধনী প্রভু তাঁহার সুন্দরী কন্যার সহিত মাখনলালের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার পিতাকে জাড়গ্রামে পত্র দেন। মাখনলাল তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন এই প্রলোভন দেখাইয়া মাখনলালকে তিনি বিবাহ করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকবার জানাইলেন, তিনি বিবাহিত এবং পুনরায় বিবাহ করিবেন না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বাড়ী আসিয়া পিতার পরামর্শে চাকুরীতে ইস্তাফা দেন। মাখনলালকে বেশী দিন উপায়বিহীন হইয়া থাকিতে হয় নাই। চাঁইবাসায় অধিকতর বেতনে শিক্ষকতার কার্য্য পাইয়া তথায় চলিয়া যান।

তাঁহার জীবনে আরও দুটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যখন রাণাঘাটে মাসিক ৭৫ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতেছিলেন তখন তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার সুরেন্দ্রমোহন পালচৌধুরী মাখনলালের গুণে মুগ্ধ হইয়া

একশত টাকা বেতনে এবং বিনা খরচায় তাঁহার বাটীতে থাকিয়া গৃহ-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ধনী ব্যক্তির গৃহে বাস করিবার তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি পূর্ব্বেই হাওড়ায় পাইয়াছিলেন, সেই স্মৃতি তীব্র হইয়া উঠিল, প্রলোভন তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না; তিনি সেই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় জমিদার বিস্মিত হইয়া যান।

প্রলোভন দমন করিবার পুরস্কার তিনি পুনরায় প্রাপ্ত হন। স্কুল ইন্সপেক্টর ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাখনলালের শিক্ষা-পদ্ধতিতে এতই সন্তুষ্ট হন যে, সেই পদ্ধতি প্রত্যেক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে বলিয়া স্থির করেন। তিনি ১০০ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতায় ঐ কার্য্য করিতে লাগিলেন। কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার আবার বেতন বৃদ্ধি হয় এবং তিনি জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন। ইহার পর আরও কয়েক বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত জলপাইগুড়ি এবং মুর্শিদাবাদে ঐ কার্য্য করাতে তাঁহার বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তিনি কাহাকেও 'তুই তুকারি' করিতেন না। মুর্খ বা বোকা বলিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামবাসী কোন স্কুল কলেজের ছাত্র কোন কিছু বুঝিয়া লইতে তাঁহার নিকট আসিলে তৎক্ষণাৎ হাতের কাজ ফেলিয়া তাহাকে অতি চমৎকার ভাবে বুঝাইয়া দিতেন।

পড়া ছাড়া তিনি বালকদিগকে নানা বিষয়ে বিভিন্ন দেশের গল্প বলিতেন, তাহাতে ছাত্রেরা অনেক কিছু শিখিত; তাহাদের চরিত্র গঠন হইত এবং তাহাদের জ্ঞানের স্পৃহা বাড়িয়া যাইত। যাহারা পড়া করিত না তাহারাও আগ্রহের সহিত গল্প শুনিত এবং ধীরে ধীরে শুধরাইয়া যাইত।

বাজে কথা বলা মাখন লালের স্বভাব বা নীতি-বিরুদ্ধ ছিল। এমন কি 'মুখপোড়া' 'হতভাগা' ইত্যাদি ভৎর্সনা বাক্য তাঁহার মুখে শুনা যাইত না। অকৃত্রিম ভালবাসা, নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য, ঈশ্বরে ভক্তি, অনাড়ম্বর ভাব, সরলতা ও সততা তাঁহাকে সত্যই দেবতুল্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার এমনই মধুর স্বভাব ছিল যে আত্মীয় স্বজন, অধীনস্থ শিক্ষকগণ, ছাত্ররা এবং গ্রামবাসিগণ সকলেই তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া পারিত না। এমন কি মুর্শিদাবাদের নবাব, নসীপুরের রাজা, কাসিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আর পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসী যেই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাঁহারা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি যতটা পারিতেন ধনী সম্প্রদায়কে এড়াইয়া চলিতেন।

শিক্ষকতার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে আর ৪।৫ বৎসর বাকি আছে, সে সময়ে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মতিলাল দে স্বর্গারোহণ করেন এবং তাঁহার নাবালক পুত্রগণ ও কন্যা জাড়গ্রামে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দেন এবং তাহাদের যথাসাধ্য দেখাশুনা করেন। তখন তাঁহার পুত্রের বয়স মাত্র ৬ বৎসর, তিনি ও তাঁহার গৃহিণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কিরূপে এতবড় সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এবং নিজ দুটি কন্যার বিবাহ দিয়া বার্দ্ধক্যে ভরণ-পোষণ এবং পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান করিবেন। তাহা সত্বেও দেশের কাজে অর্থব্যয় করিতে তাঁহার কার্পণ্য দেখা যায় নাই।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে মাখনলাল জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকতার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বেতন ২৫০ টাকা ছিল এবং তিনি মুর্শিদাবাদে ছিলেন। গ্রাম হইতে আর কোথাও যাইতে হইবে না মনে করিয়া তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে আসিয়া উহার সেবা এবং পুত্রকে শিক্ষিত করিবার কার্য্যে উদ্যোগী হইলেন। পুত্রটি প্রায় সব সময়ে তাঁহার নিকটে থাকিয়া কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিত। তাহার ফলে ১১ বৎসর বয়সে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার পড়া শেষ করিয়া পিতার নিকট উচ্চ শিক্ষা পাইতেছিল। সেই একমাত্র

গুণধর পুত্র গুণীন্দ্রের বজ্রাঘাতে মৃত্যুতে বিচলিত না হইয়া শোকাতুরা সহধর্ম্মিণীকে বলিয়াছিলেন "দেহত্যাগ, সকলেরই ঘটিয়া থাকে।" পরে তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তায়, পাঠে, বাগান ও গ্রামের কার্য্যে অধিকতর সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিলে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার পরামর্শে এবং মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহাকে কখনও দুঃখ প্রকাশ করিতে অথবা শোক করিতে দেখা যায় নাই। অসাধারণ ছিল তাঁহার সহ্য শক্তি, সকল অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন।

আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিলেও মাখনলাল আসবাবপত্রে, পোষাকে, আহারে, ব্যবহারে, আড়ম্বরবিহীন ছিলেন। সকলের দৃষ্টিভঙ্গী একরূপ নয়, তাই সাধারণ লোকে তাঁহার সকল কার্য্য ও কথা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিত না একবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "খরচের কোন মাপকাঠি নেই, প্রায় সকলেই দেখি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করে। পড়পড়তায় মাসিক আয় অপেক্ষা বেশী অর্থ সংসার-খরচে ব্যয় করা উচিত নয়, আর অবশিষ্ট অর্থ শিক্ষা, চিকিৎসা, উৎসব, গৃহ নির্ম্মাণ, বার্দ্ধক্যে ভরণপোষণ ও দেশের মঙ্গলসাধন ইত্যাদি কার্য্য সাধনের জন্ম সঞ্চয় করা উচিত। কোনরূপ বাহুল্য তাঁহার ছিল না। তিনি চা ও ধূমপান করিতেন না। এমন কি খাইবার পর পানও খাইতেন না।

তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন খাগড়ার এক দেবতুল্য পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। তিনি বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী হন। তাঁহার সহিত মাখনলালের পত্রের আদানপ্রদান হইত। তিনি মাখনলালকে কাশীবাস করিতে বারংবার অনুরোধ করেন; কিন্তু মাখনলাল স্বদেশকে কাশী অপেক্ষাও পবিত্র স্থান মনে করিতেন। তিনি গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে কোন মতে ইচ্ছুক হইলেন না। নিজের মোক্ষ-লাভের জন্ম স্বদেশ পরিত্যাগ করা অকৃতজ্ঞতা বলিয়া মনে করিতেন। সেই কারণে জাড়গ্রামে উপর্যুপরি অসুস্থ হওয়া সত্বেও রাঁচি হইতে তাঁহার মধ্যমা কন্যা সরোজিনীর বিশেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে বা অন্যত্র স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে অসম্মত হইতেন। তিনি বলিতেন, এক না এক সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ সকলেরই হয়। যে যেখানে থাকে সে সেখানকার জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্ম বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বিরক্ত হইয়া বলিতেন,— "দেশের হাড় দেশেই থাকবে।"

মাখনলালের মতে বিজ্ঞানসম্মত জনহিতকর অনুষ্ঠানসমূহ একতার দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ঘরে ঘরে প্রত্যেকের দৈনিক ঈশ্বরাধনা, গোপালন এবং রামায়ণ গীতা ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠের প্রচলন করিতে হইবে, যাহাতে পরোপকার, পরিচ্ছন্নতা, সৎসাহস প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়, বলিষ্ঠ দেহের গঠন হয় ও দেশ রক্ষা হয়। বড় বড় জনহিতকর অনুষ্ঠানগুলি গড়িয়া তুলিতে এবং দেশ রক্ষা করিতে একতার বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু সকলক্ষেত্রে একতা মঙ্গলজনক নয়। তাই ভাবিয়া দেখা উচিত জোট পাকাইয়া খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ন্যায় আরাধনা করার এবং চাঁদা তুলিয়া বারোয়ারি পূজা করার আবশ্যকতা আছে কিনা?

তিনি সময়ের মূল্য বুঝিতেন, প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল কার্য্য করিতেন। মাঠে যাওয়া, মুখ হাত ধোয়া, পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া স্নান করা প্রভৃতি কার্য্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই শেষ করিতেন। স্নানের পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের স্মরণ করিতেও ভুলিতেন না। ঈশ্বরের আরাধনার আর এক সময় ছিল সন্ধ্যাকাল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একাকী অন্ধকারে বসিয়া তাহা করিতেন। একবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "একাকী অন্ধকারে থাকি, আমি সে কথা ভাবি না। মন চালনা করিলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ঈশ্বর আরাধনা না থাকিলে মাখনলাল প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে এবং মধুর দৃষ্টি পাইতে সমর্থ হইতেন না।

মাখনলাল সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চিত্ত তিনি পাইয়াছিলেন। আকৃতি, বর্ণ, মন, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র তাঁহার সকলেই সুন্দর ছিল। অপরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতেন না। বাড়ীর আশে পাশে বাগানের পরিচ্ছন্নতা তিনি নিজে রক্ষা করিতেন, গ্রামের পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। বকুলতলা বা অন্যত্র শুকনা পাতার রাশি জমিয়া থাকিলে তাহা পোড়াইয়া দিতেন। তাহার ফলে পাতা পড়িয়া সেইসব স্থান জঞ্জলাকীর্ণ বা অস্বাস্থ্যকর হইত না। বৃষ্টির জল নিকাশের পথও সুগম থাকিত। রাস্তার ধারে আগাছা জন্মাইলে অথবা গাছের ডাল আসিয়া পড়িলে তাহা কাটাইয়া দিতেন। তাঁহারই আদর্শে প্রণোদিত হইয়া জানকীপ্রসাদ দে, বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, জগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি গ্রাম-বাসীগণ গ্রামের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদের সমবেত--বিশেষত বরদা এবং তারাপদর চেষ্টায় চকদীঘি রেলওয়ে ষ্টেশান হইতে জাড়গ্রামের পাশ দিয়া জামদাড়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা, পোষ্টাপিস, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা ব্যতীত নাট্য-সমিতি, ব্যায়াম সমিতি, ফুটবল খেলা, এ্যান্টিমেমোরিয়াল সোসাইটি প্রভৃতির কার্য্যও হইতে লাগিল, গ্রাম পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল।

যাঁহারা বিদেশে বাস করেন, তাঁহাদের ভাগের বাড়ী পুকুর বাগান সমস্ত বন হইয়াছে, আর যাঁহারা দেশে বাস করেন তাঁহারা সেই সকল অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার কুফল ভোগ করিতেন। ইহার প্রতিকারকল্পে যাঁহারা বিদেশে বাস করেন, তাঁহাদের সেই সব সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। গ্রামরক্ষার জন্য যদি ঐ বিষয়ে আইন সঙ্কলন করার প্রয়োজন তাহাও করা উচিত।

অভ্যাস অনুযায়ী দৈনিক কার্য্য করিতে থাকিলেও মাখনলালের সংসারের বন্ধন ছিন্ন হইতেছিল। পূর্বের প্রাণশক্তি হারাইলেন। সেই সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণলালের মৃত্যু সংবাদ আসিল। তাঁহার বিধবা পত্নী, পুত্র, কন্যা লইয়া দশঘড়ায় তাঁহার মাতার নিকট আশ্রয় লইলেন, তখন কৃষ্ণলালের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ইহার পাঁচ ছয় বৎসর পরে মাখনলালের সহধর্ম্মিণী দেহত্যাগ করিলেন। ক্রমান্বয়ে রোগ ভোগ করিয়া মাখনলালের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনিও শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যে প্রকৃতিদেবী তাঁহার দেহগঠন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহারই ক্রোড়ে ৭০ বৎসর বয়সে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন এবং তাঁহার চিতাভস্ম জাড়গ্রামের জলে মিশ্রিত হইয়া রহিল, তিনি গ্রামের ডাকে যথার্থই সাড়া দিয়াছিলেন আর দেহত্যাগে তাঁহার পবিত্র আত্মা গ্রাম-বাসিদের প্রাণে উদ্দীপনা দিয়া সেই কাজ চালু রাখিয়াছে।

অযোধ্যার নবাব

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

(১)

কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি কখনো যাঁকে কাছ ছাড়া করিনি এখন তাঁর সঙ্গ থেকে আমায় দূরে থাকতে হচ্চে। কি দুর্ভাগ্য আমার।

ওঃ খোদা, আমাদের বিচ্ছেদের রাত্রি যেন প্রভাত হয়। তাঁরা যেন আমায় আলিঙ্গন দিতে পারেন।

এই জেলখানায় এসব কোন দুর্ভোগ নেই যা আমি ভোগ করিনি আর এই বিরহের কয়েদখানা এত উঁচু যে আমি সব কিছু ভুলে গেছি।

এ ত কুঠুরি নয়, এ হল বিরহের দহ। এ যেন অপার সাগর আর এই দুঃখে কেউ বাঁচতে পারে না। তরুণ যায় বুড়ো হয়ে। এই দুঃখে আমার অন্তর জল হয়ে যায় আর একটা পাহাড় যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে। রুদ্ধ করে দিয়েছে আমার মনের কুঁড়িটিকে।

ভোরাই হাওয়াও আমার কাছে প্রিয়াদের কোন খবর এনে দেয়না। দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি আমি। এ বিরহ-রাতের কোন সকাল নেই—আমার পিয়ারীদের কোন সংবাদ আমি পাই না।

কোন দিকে কোন আশা নেই। আর আমি, আমার বন্ধুরা আর চাকররা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি।

একদিন আমার মাথায় মুকুট ছিল। আমি ছিলেম অযোধ্যার রাজা। আমার হুকুমে ছিল হাজারো চাকর আর সেপাই। ১৭০০ নবীশ, প্রায় ৫০০ হেকিম আর ১৫০০ চোপ্‌দার। আমার প্রজাদের বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই। আমার বিবিদের যদি গুণতে শুরু করি ৬০ থেকে ৭০ জন হবেন। তাঁদের মধ্যে ৬,৭ জনকে আমি এনেছি কলকাতায়।

বিনা দোষে আমায় কয়েদখানায় থাকতে হচ্ছে। কয়েদীদের সারিতে পড়েছি আমি। কিন্তু আমি একজন রাজা।

এই জেলখানায় মেয়ে পুরুষ নিয়ে ১৮ জন রয়েছে। কিন্তু আমি একা। দিনরাত এই কুঠুরির মধ্যে আমার দিল্ জ্বলছে। প্রত্যেকে তিত-বিরক্ত হয়ে গেছে এই জীবনে। এমন কি ঝাড়ুদার আর পানিপাঁড়ে পর্য্যন্ত কড়া পাহারার জন্যে গণ্ডগোলে পড়েছে। ঝাড়ুদার যখন মেঝে সাফ করতে আসে, তাকে অভিযোগ করে ইংরেজ সেপাই।

এমন কি যে তেলওয়ালা বাতি জ্বালবার জন্যে তেল আনে, তাকেও নজরে রাখা হয়। মিষ্টার হার্বাট বলে একজন প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় হাজিরা দেন আমার কামরায়। তিনি মেজর, আর কর্ণেলের সহকারী, নিজের সব বন্দোবস্ত তদারক করেন। রোজ রাতে তিনি গুনে দেখেন বন্দীদের। দারোগার নাম কলিং সাহাব। আর কোন লোকজনের অসুখ করলে ডাক্তার আসেন। আমার ভবিষ্যৎ খারাপ হলে হেকিম আসেন তাঁর বর্ণনা আগে করেছি। তিনি চলে গেছেন জেলখানা থেকে। আমার চিকিৎসার জন্যে তিনি আসেন।

এই কোঠিটা যদিও খুব বড়, কিন্তু কোন কাজে আসে না আমার। কারণ প্রত্যেক দরজা বন্ধ থাকে আর কি দারুণ গরম। আর যে দরজা ক'টা খোলা হয় সেদিক থেকে আসে রোদ। তাই সেগুলো

অকেজো। আমি মাঝের তলে একটা ঘরে আছি। ওপরে কিংবা নীচে নয়।

গভর্ণর জেনারেলকে আমি অনেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু কোন চিঠিরই জবাব দেননি তিনি। যখনই আমার মুন্‌শীকে ডেকে পাঠাই, কর্ণেল সাহাবের সঙ্গে তিনি হাজির হন।

তার পরবর্তী পরিচ্ছেদে নবাব তাঁর সব পুত্র-কন্যাদের বর্ণনা করেছেন, জীবিত ও মৃত সকলের। বিশেষ মীর্জ্জা মহম্মদ হায়দার আলী বাহাদুরের মৃত্যু।—

সাকিনামা। ও সাকি, লাল সুরা আমায় দাও, যাতে আমি সব দুঃখ ভুলতে পারি। আমাকে একটি প্রিয়া এনে দাও, যে বসে থাকতে পারে আমার চোখের সামনে।

ফুল যেন ফোটে, বাতাস যেন বয়, গাছে যেন ফল ধরে আর কোকিল যেন গান গায়। যাদের কোন সন্তান নেই তারা যেন সার্ব্ব* গাছের মতন। ফল ছাড়া ফুলও কিছু কাযের নয় আর যে মানুষের সন্তান নেই সে যেন কাঁটাগাছ।

একথা আমার বলবার কারণ, আমার খুব আশা হচ্ছে যে খোদা বোধহয় শীঘ্রই আমার সন্তানদের সঙ্গে আমায় মেলাবেন আর আমাকে এই বন্দীদশা থেকে মুক্ত করবেন।

আমার ছেলেমেয়ে ১৩টি। তন্মধ্যে ৮টি ছেলে আর ৫টি মেয়ে।

বড় ছেলে নৌশের খাঁ কাদির, তার বয়স হয়েছিল ২২ বছর।

আল্লার হুকুমে সে ছিল হাবা আর পাগল। যা হোক সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সে মাসে আমি তার শাদী দিই। তার বিবির নাম শাহ্‌রিয়ার, সে অত্যন্ত স্বামীকে ভালবাসত। ঈদের মাসে লক্ষ্ণৌতে মারা গেল নৌশের খাঁ।

দ্বিতীয় পুত্র মীর্জ্জা কেমা কাদির আলি। যুবরাজ প্রায় ২০ বছর বয়সী। সে লেখাপড়া শিখেছে। তার বিবি হয়েছে আমার বোনের মেয়ে, নাম বহু বাদ্‌শাহ। মীর্জ্জা কাদির এখন লণ্ডনে আর বহু বাদ্‌শাহ আছে লক্ষ্ণৌতে। আমি তাকে আনাব।

এরা দুজন হল আমার প্রথম পত্নীর ছেলে।

তৃতীয় পুত্র মীর্জ্জা মহম্মদ হাসবর আলি আমার সঙ্গে এখানে আছে। তার বয়স ১৭ বছর আর আলি তকিখাঁর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। তার নাম ফখ্‌রুর বহু। এই ছেলের মা হলেন মাল্‌কা-ই-মুল্‌ক তিনি মুচিখোলায় আছেন। এই কয়েদ হওয়ার জন্যে তাঁর মন খুব খারাপ।

তার পরের ছেলে বির্জিস কাদর। বয়স ১৪ বছর। তার জননী—হজরৎ মহল। তিনি বিদ্রোহের নেত্রী আর এখন রাণী।

তারপর মীর্জ্জা কম্‌র কাদর মহম্মদ আবিদ আলী ৭ বছরের। সে লক্ষ্ণৌতে আছে আর তার মায়ের নাম কক্‌র মহল।

তার পরের ছেলে আস্‌মা জাহ কাদ্‌র আমার সঙ্গে আছে। তার মা নেই। তাঁর নাম ছিল রশ্‌ক মহল। ছেলেকে ছেড়ে তিনি চলে গেছেন। আমিও তাঁকে ডাকিনি। আর তিনিও ফিরে আসেননি। আমার প্রিয় বিবি ছেলেটির যত্ন নেয়। খোদাও তার ওপর সদয়। তার বয়স ৫ বছর। সে মুচিখোলায় আছে।

তারপর করা হোসেন মীর্জ্জা। তার মা মেহ্‌দি কোম। সে থাকে লক্ষ্ণৌতে। তার ৪ বছর বয়স।

ছোট ছেলের নাম ছোটে মীর্জ্জা। তার মা আখ্‌তার মহল। তারা কলকাতায়। তার বয়স ১ বছর।

প্রার্থনা করি আমি যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পাই আর মিলতে পারি তাদের সঙ্গে।

রাজপুত্রদের কথা শেষ হল। এখন লিখি রাজ-কন্যাদের বিষয়ে।

---

*এই গাছ খাড়া, এতে ফুল ফল হয় না, শুধু পাতা।

নবাব কুব্‌রা বেগম, আস্‌মৎ উদ্‌দৌলার বিবি। সে মেয়েদের সবার বড়, এখন লক্ষ্ণৌতে আছে। তার বয়স ১৮ বছর আর তার মায়ের নাম সুলেমান মহল।

দ্বিতীয় রাজকন্যার নাম জয়নাব বেগম, তার জননী খাকান্ মহল। তার ৪ বছর বয়স। মায়ের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে থাকে।

তারপরের রাজকন্যার নাম শাহেরবানু বেগম, নবাব বেগমের মেয়ে। তিন বছর বয়সে লক্ষ্ণৌতে সে মারা যায়। তার মায়ের সঙ্গে ওখানে থাকত সে।

চতুর্থী রুকাইয়া বানু, নবাব সইদা বেগমের মেয়ে, ৩ বছর বয়সে মারা পড়ে।

তারপর দায়হাম্ আগা, মুলগণ বেগম সাহেবার মেয়ে। লক্ষ্ণৌতে সুলতান বেগম আড়াই বছরের মেয়েকে রেখে মারা গেলেন। মেয়েকে দেখাশোনা করেন তার মাসী নওরোজা বেগম।

ওঃ খোদা, আমার সঙ্গে আবার মিলিয়ে দিন।

আমি কয়েদখানায় রয়েছি অথচ আমার কোন অপরাধ নেই। জেলে আমি কত লোকসান সয়েছি।

এখানে কেউ আমার সঙ্গী নেই! কারণ ছেলে-মেয়েরা কেউ লণ্ডনে, কেউ লক্ষ্ণৌতে আর কেউ মুচি-খোলায়। কখনো কখনো আমি সন্তানদের কথা ভাবি, কখনো রাজত্বের কথা, কখনো দারিদ্র্যের কথা। চারিদিকে অশান্তি। আমার দু'চোখ যেন অন্ধ হয়ে পড়েছে। দৃষ্টিশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

তারপর নবাব লিখেছেন লক্ষ্ণৌর দারোগা দেউড়ির বরখাস্তের কথা আর তাঁর কুঠুরির অন্যান্য বিষয়। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেও যথারীতি সাকিনামা এবং ফুল ও সুরার উল্লেখ।

আমি নেহাৎ একজন দরিদ্র কবি। জ্ঞান আমার সামান্য। কবির শ্রেণীতে আমার কোন মর্যাদার স্থান নেই।

এবার বলি, একদিন কর্নেল সাহাব আমার হাতে দিলেন লক্ষ্ণৌর একখানি চিঠি। চিঠিখানি ছিল একটি লেফাফার মধ্যে এবং সেটি খোলা হয়নি।

লক্ষ্ণৌতে একজন দারোগা ছিল, তার নাম ওয়াজেদ আলী। দুপুরে আমি সেই চিঠিটি পাই। তাতে এমনি একটা আর্জি ছিল:—'আপনি শান্তিতে থাকুন। যখন থেকে ইংরেজরা রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করলেন, বিদ্রোহীদের সাহস চলে গেল। ইংরেজদের অনেক নারী ও শিশুদের প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি আর তাঁরা আমার এই সাহায্য করার জন্যে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং আপনার বেগমদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন আমাকে। তাই আমি আপনাকে সাহস করে জানাচ্ছি যে, নবীনা বেগম একটি পুণ্য কাজ এই করেছেন যে, চীফ্ কমিশনারের বিবি ও ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আমি অন্যান্য মহলদের কথা এখানে জানাচ্ছি। সব চেয়ে ছোট মহল এগিয়ে এসেছেন সবার আগে। তিনি অনেককে বাঁচিয়েছেন। তারপর সুলতান জাঁহা। তারপর শাহেন্‌শা মহল। তারপর আমীর মহল। ফকর্ মহল তাঁর ছেলেকে নিয়ে বেঁচে আছেন। সঠী ছাতার মহল বহাল তবিয়তে আছেন। তারপর ওমরাও মহল, তারপর সইদা মহল—তিনিও আর আর বেগমদের সঙ্গে ছিলেন।

আমি তাঁদের সংখ্যা গুণে দেখেছি ৮ জন। তাঁদের প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা এখানে থাকতে পারেন।

প্রত্যেক নবাবজাদীই কষ্টে আছেন। তাঁদের পোষাকআষাক নেই, খানাপিনা নেই, শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। ফৌজের ঢেউয়ে তাঁরা ভেসে গেছেন। শহরের কমিশনারকে আপনি লিখুন, তারপর আমি চেষ্টা করব তাঁদের এক জায়গায় আনতে। খুব তাড়াতাড়ি করুন! কারণ অনাহারে রয়েছেন

তাঁরা। আপনি লিখুন যে তারা সবাই নির্দোষী। তাঁদের মাথা পিছু ৫০ টাকা করে' দিন যাতে তাঁদের দুর্দশার কিছু লাঘব হয়।

আটজন মহলেরই সব মালপত্র কোতোয়ালিতে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমি সেসবের ওপর শিলমোহর করে দিয়েছি আর আমাদের জানানো হয়েছে যে, শীঘ্রই ফেরৎ দেওয়া হবে সমস্ত জিনিষপত্র। বড় সাহেব খুব দয়ালু। আমি কর্ণেলকে বলেছি যে আমি গভর্ণর জেনারেলকে লিখব আর তিনি বলেছেন যে আমি তা পারি। চিঠিখানি আমি তাঁকে দিয়েছি। খোদা, দোয়া করুন। গভর্ণর জেনারেলকে আমি সমস্ত ব্যাপারটা লিখেছি।

আমার স্বদেশ থেকে একবছর পরে এই পত্র পেলেম। এটা ১২৭৪, সাওয়াল মাস। আমি গভর্ণর জেনারেলকে অবস্থা জানিয়ে লিখলেম আর উত্তর এল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

আমার বিষয়ে, কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেছেন যে দু লক্ষ টাকা আমার ব্যয়ের জন্যে দেওয়া হবে।

দারোগা ওয়াজিদ আলীকে আমি যে নির্দেশ পাঠাই এই তার প্রতিলিপি:—'আমি গভর্ণর জেনারেলকে লিখেছি যে আমার পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত যেন করা হয়। আপনিও আমার বিষয় সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমার পরিবারের সবাইকার বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার কথা সরলভাবে লিখবেন আর তাঁরা প্রাসাদে ফিরে এলে তাঁদের নাম পাঠিয়ে দেবেন।'

গভর্ণর জেনারেল আমায় খুব শ্রদ্ধা করেন আর আমার ওপর তাঁর বড় দয়া। আমি তাঁর দয়ার কিছু বর্ণনা এখানে করি। যখন আমি রাজা ছিলেম তখনকারই মতন ভাল সম্পর্ক তিনি বজায় রেখেছেন আমার সঙ্গে। তিনি একবার মাত্র আমা'কে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এই গারদে, পরে আর কোন পত্র আসেনি। আমি বুঝতে পারিনা কেন ওরা আমায় কয়েদ করেছে। তবু এখনো আমি গভর্ণর ধন্যবাদপূর্ণ আছি জেনারেলের প্রতি। একদিন আমার বরাত ফিরে যেতে পারে আর যাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে তাদের সঙ্গে আবার মিলন ঘটতে পারে।

তারপরের অধ্যায়ে নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর অন্যতমা বেগম সুলতান নবাব খুর্শিদা মহল সাহেবা কারবালাইয়ের বিষয়ে লিখেছেন:—

ও সাকি, আমায় সুরা দাও, আলিঙ্গন দাও, আমার চোখের ওপর তোমার চোখ রাখো, আমার ঠোঁটের ওপর তোমার ঠোঁট এমনিভাবে চলুক। আমি তোমার কাছে নত হই আমার অনুগতি জানাবার জন্যে। তুমি আহ্বান জানাও যাতে এখান ছেড়ে চলে যেতে পারি, কারণ পানের এখন সময় হয়েছে। আমাদের ওপর কোন সন্দেহ ভাব দেখিও না, কোন তারতম্য নয়।

কোথায় সে সারঙ্গীরা, শ্রোতৃবৃন্দ যে উপভোগ করবে? কোথায় সেই সরদ-নেওয়াজ? ডাকো তাদের। কোথায় সেই সাজিন্দারা? তাদের সাজ নিয়ে আসতে বলো। কোথায় সে তম্বুরা? কোথায় সে ঢাকারা? কোথায় সেই দোহারা আর পাখোয়াজ? কোথায় সেই সুর-আয়না আর সুর-শৃঙ্গার? মঞ্জিরা কোথায়? ডফ্ কোথায়? কোথায় চঙ্? মোচঙ্ কোথায়? জলতরঙ্গ কোথায়? কোথায় তবলা বাঁয়া? খঞ্জরি আর সেতার কোথায়? কোথায় সেই সারি বেঁধে দাঁড়ানো সুন্দরীরা? ঝাঁঝ, তম্বুর, ঘুঙ্গুর কোথায়? বাঁশি আর হরাব? তম্বুরিন্ আর সাজ? কোথায় মাকুয়োত্তি আর সরুজিৎ? মাদল কোথায়? কোথায় সেই কানুতোল্ তাসা? কোথায় দোহদাল আর তামাসা? বেলাহ্ আর বেয়ানা কোথায়? অর্গান, শাহ্নাই আর নাকাড়া কোথায়?

মেহেরবাণি করে' আমায় নাচ দেখাও, এই সব যন্ত্রের মিষ্টি সুর শোনাও। গায়কদের ঠোঁট যন্ত্রের সুরের সঙ্গে নড়ে। খরজের কি মাহাত্ম্য। সুরের

খোঁচগুলো আমার বুকে যেন তীরের মতন এসে বেঁধে। আমি যেন শুনতে পাই গিট্‌কিরি আর জহ্‌রির। আর শিল্পীদের গুণের কদরে বখ্‌শিষ্‌ দিতে পারি চাঁদকে। শোনাও সেসব অব্‌চিন্‌ আর পাল্‌টি। সেই সাতের তানের বাহার দেখাও। রেখব্‌ সুর শোনাও, যাতে গান্ধারের দাপট কম্‌তি হয় আর মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত লাগে—আর তারিফ্‌ করে ওঠে আশ্‌মানও। অন্য রাগ যেন হাত কচ্‌লাতে থাকে। আমাকে শুনতে দাও সেই কলা, পাতার্‌ আর ভজিন্‌। ২২ শ্রুতি থাকবে আর ১৬ কলা, তারপর আমি সেই সুরেলা সঙ্গীত শুন্‌ব। ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী আমি শুণেছি আমার আঙুলে। কলাবন্ত, কাওয়াল আর ধাড়িদের ডাকো। ধ্রুপদের স্বাদও কিছু পেতে দাও আমায়। কলাবন্ত আলাদা। কাওয়াল আলাদা। কিছু টপ্পাবাজ আর খেয়ালীদের আনো। আসুক গজল আর ঠুম্‌রি গাইয়েরা। ছুক্‌টা আর দাদরা গাইয়েরাও। একটা একতালা আর রূপক হবে। কোন কোন গায়ক দেখাবেন চৌতালা, আড়া-চৌতালা আর ঝাম্‌পা। তেতালার কিছু স্বাদও যেন আমি পেতে পারি। একটা চতুরস আর কলা যেন হয়। প্রত্যেক তালের নিপাদ আমায় দেখাও। লছমী আর সওয়ারী যেন হতে পারে আর এইসব তালের সঙ্গে যেন নাচে সুন্দরী মেয়েরা। পটতাল আর টিমাও হোক।

আমায় এনে দাও সুখ বিলাস। ও সাকি, আমায় সুরা এনে দাও। এই বর্ষা ঋতুর রাত যে ফাঁকা কেটে যাচ্ছে তা যেন উপভোগ করতে পারি। খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করি যেন নাচ অরা গানের গন্ধ পাই আর তার মধ্যে সব সময় দেখায় তার ভদ্র আচরণ।

কয়েক মাস হয়ে গেল আমার প্রিয়াদের বিচ্ছেদ আমি ভোগ করছি। তাঁদের চোখ আমায় দেখাও। আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারি আমি। তোমাদের প্রেমিক পড়ে আছে কয়েদখানায়।

এই কুঠুরির মধ্যে আমি একা। শুধু তোমাদের স্মৃতি আমার মনে ভরা রয়েছে।

এক প্রেমিক পড়েছে বিপদে। কেউ তাকে দেখবার নেই! আল্লা জানেন, কে তাকে দেবে সুখ।

ইংরেজদের এই গারদের কথা বলো। এই জেলখানায় একেবারে হাওয়া নেই। বিনাদোষে আমায় কয়েদ করা হয়েছে। কিন্তু সেজন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই, কারণ আমি আলীর নকর, যিনি আমার তদারক করেন আর বাঁচিয়েছেন সল্‌মান্‌কে। তিনি আমার মুরুব্বি। জেলখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে নেবেন।

শোনো এই করুণ কাহিনী। আমার যা কিছু ঘটেছে সব তোমায় বলি। আমি কারুর প্রেম বিশ্বাসী দেখিনি। একশ' বছর ধরে যদি কেউ আর একজনের জন্যে জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে চলে তবু বিশ্বাসঘাতক হতে তার কিছুই সময় লাগেনা।]

১২৭৪ সালে (হিঃ) আমার বিবি খুজিস্তা মহল মুচিখোলা থেকে যাত্রা করেন। তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। আমার কয়েদ হওয়ার জন্যে তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। তিনি আমার পোষাক চেয়ে পাঠালেন। তারপর আমায় উপহার দিলেন তাঁর দোপাট্টা। আমার মনে হল, তাঁর মনে আমার জন্যে মুহব্বৎ বেড়েছে। কিন্তু দুদিন পরে ফিরিয়ে পাঠালেন আমার পোষাক। তখন আমিও ফেরৎ দিলেম তাঁর দোপাট্টা।

তারপর তিনি জাফ্‌রি কোমের বাড়ি চলে গেলেন। শুনেছি তিনি লক্ষ্ণৌ যাবেন আর সেখান থেকে তীর্থ করতে কারবালায়।

শেষ পর্যন্ত তিনি কারবালার পথে যাত্রা করেছিলেন। আমি তাঁকে ৫০০ টাকা দিই এবং তা খরচ করেন তিনি। ১০০ টাকা হিসাবে তিনি হাত খরচ পাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার রাজত্বের সময় আমি তাঁকে মাসে ২৫০০ টাকা করে' দিয়েছি। আমি

অনুরোধ জানিয়েছি, ভালবেসেছি, মান্য করেছি। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ কিংবা ইচ্ছা বুঝতে পারলেন না। আর এই জগতের নিয়ম যে হতাশার সময়ে কিংবা দুঃখের দিনে পাওয়া যায়না কাউকে।

পতঙ্গ যখন কামনার আগুনে নিজেকে জালিয়ে ফেলে, সেই আগুন কেন বিসর্জন দেয়না নিজের অস্তিত্ব? তারও শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। ওই প্রেমিকের জন্যে বাতির নিশ্চয় গরজ আছে, কারণ সে তার রূপকে জালিয়ে দেয়। জলন্ত শিখার জন্যে তার মনে প্রেমের আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু ত নেই আর সে সেই শিখার গভীরেই যেতে যেতে চেয়েছিল। এ সেই প্রেম যা' মুর্দেগানদের জন্যে ব্যবস্থা করে কফিনের। এ সেই প্রেম যা বাগিচায় পড়লে সারা বাগিচা জলে যায়। আর যদি শরীরের ওপর পড়ে তাহলে খাঁটি মদের মতন জালিয়ে দেয় দেহকে। এ সেই প্রেম যা ফুলের সঙ্গে এলে ফুলের মুখ পুড়িয়ে দেয়।

এ সেই প্রেম যা কফিনের মধ্যে থাকলে সে কফিন থাকতে পারেনা মুর্দার ওপরে। এ সেই প্রেম যা হামেশা আছে কোয়েল আর ফুলের মধ্যে আর এই দুয়েরই অন্তর জ্বালিয়ে দেয়। আর সে সিংহাসনের রাজা।

ওঃ আখ্‌তার, শান্ত হও, খেয়াল রাখো। কি আশ্চর্য কথাই তুমি শোনালে। খোদার কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন শীঘ্র তোমায় কারামুক্ত করেন। আমি এই বিপদে পড়েছি শুধু আমার রাজত্বের জন্যে। না হলে আমার নাম আর এই বন্দীদশার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

ওঃ আল্লা, আমাকে এই কয়েদখানা থেকে উদ্ধার করো। শোকে আমার কথা কইবার আর শক্তি নেই। ওঃ খোদা, এই বেচারা আখতারকে মুক্ত করে দাও।…

(পরবর্তী অধ্যায়)

ও লক্ষ্ণৌর কোয়েল, তুমি গাও। ও আমার কলম —বন্ধুদের প্রশংসা করা তোমার এক গুণ আর তুমি ফুলের মতন—প্রিয়ার রূপ তুমি উন্মুক্ত করো আর চিন্তার পাখির কাবাব বানাও। প্রিয়া বিরহের শোকের যন্ত্র তুমি বাজাও। নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করো সুর-শৃঙ্গারে।

ও আমার পিয়ারীর কেশগুচ্ছ, তুমি তার মুখের ওপর নেমে এসো। কেঁদে ওঠে আমার হৃদয়।

আমি এক অভিশপ্ত মানুষ।

ও কোয়েল, ফুলের সঙ্গে বিবাদ কোরো না। ও কুঁড়ি, তুমি ফুটে ওঠো ফুল হয়ে।

সব কিছু বর্ণনা করবার চেষ্টা করো সচেতনভাবে আর প্রিয়ার মুখের প্রতি পুরো শ্রদ্ধা জানিও।

ও মালী, কোথায় এই সব গাছ—আর্ ধোঁয়া, সুম্বুল, নস্‌রিন্, নস্‌তরঙ্গ্, রাইহান্, গুলে আস্‌রফি, নীলা, পীলা, সাবো, জুই, চামেলি, নার্গিস আর দোপ্দি?……

এই ইংরেজ তরুণীরা চমৎকার, কিন্তু তারা মনের অবস্থা বোঝেনা আর ভালবাসাকে মনে করে বদ্ খোয়াবি।

ও শ্রোতার দল, মন দিয়ে শুনুন আর যে রাজা এই অইখায় এসে পৌঁছেচেন তাঁকে আপনাদের সম্মান জানান।

আমি খোদার নামে কসম খেয়ে বল্‌ছি যে আমার এই জগতের সম্বন্ধে কোন দুঃখ নেই। আমি এখন আপনাদের জানাই কয়েকজন জেনানার অবিশ্বাসের কাজ, রূঢ়তা আর অহঙ্কার। এঁরা—আখ্‌তার মহল, জাফ্‌রি আর কাইসার—আমার বেগম ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আর আখতার মহল আমায় খুবই ভালবাসেন। তাঁর বিচ্ছেদ আমার পক্ষে বড় কষ্টকর। আর এই জেলখানায় আমার কিছু ভাল লাগেনা।

জাফ্‌রি আমার সঙ্গে ৭ বছর ছিলেন আর কাইসার ১৩ বছর এবং আমার মনে আরো কামনা

কিছু নেই। আখতার আমার সঙ্গে আছেন ৯ বছর আর এই বেগম আমার প্রেমে আছেন গত ১৮ বছর।

যখন আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায় তখন আমি চেয়ে নিই কাইসারের (ছল্লা, পায়ের আঙ্গুলের আঙ্‌টি) আর এক প্রিয়ার মিসি, আখতার মহলের কেশ, জাফ্‌রির চর্বিত তাম্বুল।

জাফ্‌রি একই জিনিষ আগে পাঠিয়েছিলেন আর আমি তার স্বাদও নিয়েছি। আমি তাঁকে এবার পাঠাবার জন্যে বলি একটি আঙ্‌টি, একটি কম্বল, একটি দোপাট্টা, হলুদে পাউডার।

জাফ্‌রি উত্তর দিলেন—এইসব জিনিষ আপনি তাঁর কাছে চান, যাঁকে আপনি ১০০০ টাকা দিয়েছেন আর যাঁর প্রেম আপনার হৃদয়ে রয়েছে। আমি আপনাকে দেবনা।

দুঃখ ছাড়া তিনি আর কিছুই দেননি আমায়।

আর রাণী জানালেন—জগতে আমার নাম প্রিয়া। আপনি সেইসব জেনানার নখ্‌ চান যাঁরা আপনাকে ভালবাসেন আর তাঁরা আপনাকে পাঠাবেন যাঁরা আপনার গোপন কথা জানেন। আপনি নখ্‌ চেয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি নাপিতানী নই আর আমি নাপিতগিরি করতে শিখিনি।

দিল্‌দারও আমায় মিসি পাঠালেন না। তিনি লিখেছেন যে তিনি খুব অসুস্থ, সেজন্যে তা পাঠাবার কোন উপায় করতে পারেন নি।

কাইসার লিখেছেন—আমাকে আপনার পিয়ারীদের তালিকায় রাখবেন না! আমার কোন পায়ের আঙ্‌টি নেই।

আঙ্‌টি হারাবার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত আছি। কেউ আমার প্রতি দয়া করলেন না আর কেউ তাঁদের প্রেম পাঠালেন না এই গারদ ঘরে।

কিন্তু একজন বেগম আছেন—আখতার মহল আর তিনি আমার এই বন্দীজীবনে বন্ধু হয়েছেন। তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কেশগুচ্ছ আর আমি রেখে দিয়েছি আমার বুকের কাছে। তিনি আমার জন্যে খানা পাঠিয়েছেন আর এই তো কারুর বন্ধুত্ব আর ভালবাসা জানাবার সময়। আমার এই রাণী রোজ খানা পাঠান আর ৫ খিলি করে পান পাঠাতেন। জাফরের একটা আঙ্‌টি আমার কাছে আছে, আগে যা চেয়েছিলেম। উবাট্‌নার একটা মোড়ক আমার কাছে আছে আর সেজন্যে কিছু ভাবিনা। আর যে দোপাট্টা আর কম্বল কয়েদখানায় পাঠানো হয়েছিল সে কথা বলি। বাকর আলীকে যখন জবাব দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেও দুটি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যায়। খোদা তাকে নাশ করেন। আমার জিনিষ চুরি করেছে সে।

তারপরের পরিচ্ছেদে নবাব বন্দীশালায় তাঁর খরচ-পত্রের কথা বর্ণনা করেছেন—

ও আমার মন, থামাও এই বর্ণনা আর বলো যে বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটেছে তোমার হৃদয়ে।

এই জেলখানায় আমি যা খরচ করেছি, তার ফিরিস্তি দিচ্ছি। আজ ২৬শে জিলকদ, ১২৭৪, শুক্রবার।...

অযোধ্যার রাজা আখ্‌তার, যিনি এই গারদে রয়েছেন আর যাঁর এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই, তাঁর কিছুই অর্থ নেই। আর যা আমি আজ পর্যন্ত করেছি, আমি লিখেছি হিসাবপত্রের মধ্যে। এটা বখ্‌শিশ নয়, দয়াও নয়। এ নিতান্তই গরীবের খানা আর এই টাকায় আমার পুরোপুরি হয় না। মুনশী সফ্‌দারকে আমি ৫০০০ টাকা দিয়েছি ব্যয় করবার জন্যে। ৪৫,৪০০ টাকা লণ্ডনে। আবার ৭৯,৩০০ টাকা লণ্ডনে পাঠিয়েছি। আমার রানীকে দিয়েছি ৪৫,৪০০ টাকা, মুজাহেদকে ১১,০০০ টাকা, পিয়ারী দিলদারকে ২৫,৪০০ টাকা, জাফরি বেগমকে ৬৩০০ টাকা। জুল-ফিকারকে ৫০০০ টাকা, কারবালাইকে ১০০০ টাকা, মহম্মদ রেজাকে ১০০০ টাকা, ফগউদ্দৌলাকে ৫০০ টাকা, মীর্জা জাফরকে ৫০০ টাকা। ও আখ্‌তার মহল, আমি দয়া দেখিয়েছি যে তাঁকে দিয়েছি ৩০,০০০ টাকা মালকা ই-জুল্‌ফকে ৩০,০০০ টাকা, কাইসারকে ১১,০০০

টাকা, খুজিস্তা মহলকে ১০০০ টাকা। আমি জেলখানায় ৪০০০ টাকা খরচ করেছি। খয়রাতের বাবদ ৬৩০ টাকা। চাকরদের মাস মাহিনা ১০,০০০ টাকা আমার হাতে একলক্ষ টাকার সোনা আছে আর আশা করি সেটাও খরচ করব।...

ওঃ খোদা, আমায় সুখ দাও আর রাগ দিওনা আমার বন্ধুদের। ওঃ খোদা, আমাকে এই কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে দাও আর আমায় শক্তি দাও বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াবার। আমার চিন্তার মুক্তায় আলো দাও আর এইসব মুক্তো যেন একটি সুতোয় থাকে। লোকে যেন ফিরদৌসির কবিতার স্বাদ ভুলে যায় আমার কবিতা পড়ে। আমি যেন নষ্ট করে দিতে পারি খাকানির (বিখ্যাত ইরাণী কবি) বাগিচা। আমি যেন জামালিকে ধ্বংস করে দিয়ে ওস্তাদি বনতে পারি। (আমার কবিতা পড়ে) আর কেউ পড়বেনা জালালি, হেজালী, জামি, সাদি, ফৈজী, নিজামী, আন্ওয়ারী, জহুরী, শম্‌স, তবরিজ, হাফেজ, হাজী (ফার্সী কবিরা); লক্ষ্ণৌর নাসিখ্‌ আতীশ।

এসব কি নির্বোধের মতন বকছ। এঁরা উচ্চস্তরের কবি আর আমি নীচু দরের। তাঁরা হলেন মুকুট আর আমি তাঁদের পায়ের ধূলো। তাঁরা ওস্তাদ, আমি চাকর।

যে একটিমাত্র জিনিষ আল্লার কাছে আমার চাইবার আছে তা হল এই গারদ থেকে মুক্তি।

শেষ পরিচ্ছেদে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে নবাব লিখেছেন—

ও খোদা, আমার বন্ধু পরিচিতেরা যেন আমার সঙ্গে মিলতে পারে। আমাকে সেই পরীদের দেখতে দাও। আমায় দয়া করো, আমার প্রার্থনা পূরণ করো তোমার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তুমি আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে দেবে। তুমি এ জগতের সৃষ্টিকর্তা, তুমি দখবে এই জীবদের দুঃখ বেদনা। প্রত্যেকে তোমার সাহায্যের জন্যে আশা করে। রঙ দিয়েছ পৃথিবীকে, খাবার দিয়েছ পাখীদের। তুমি দয়া আর করুণা ছাড়া কিছু নও। তুমি আমাদের দীর্ঘজীবন দিতে পারো। তুমি ভিখারীদের বসাতে পারো সিংহাসনে। ফকিরকে প্রাচুর্য্য দিতে পারো। রাজাকে করতে পারো ফকীর। ভিখারীকে ধনী করে দিতে পারো। তোমার হুকুমে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। সব হজরৎ, ইমাম এবং নবী তোমার তাঁবেদার।

অপদার্থ আখতারের এই আর্জি নাকচ করে দিও না। সে বিনা কসুরে কয়েদখানায় পড়ে আছে আর কাঁদছে দিনরাত। তার কোন অপরাধ নেই। সে চোরও নয়। খুনে, ঠগ্‌ কি গরীবের ওপর অত্যাচারী কিছুই নয়। সে পকেট মার, কি গুণ্ডা, কি মেয়েমানুষ চুরিকরা, কি মাতাল, কি জুয়াড়ি এসব কিছুও নয়।

আমার বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ নেই। তুমি এ সমস্তই জানো। কারণ তুমি সর্ব্বজ্ঞ। ও খোদা, আমার ওপর সদয় হও। মহম্মদ, আলী, ফতিমা, হাসান, হুসেনের নামে, সৈয়দ উস্‌ সাজেদাইনের জন্যে, বাকর, জাফর, ইমাম, রেজার খাতিরে; মুসা কাজিম, মহম্মদ তকী, আলী তকী, আসকরি আর মেহেদীর দোহাই—আখতারকে ছাড়া পাইয়ে দাও।

আমায় মুক্ত করো পূর্ণ মর্যাদা আর সম্মানের সঙ্গে—তোমার জীবদের প্রতি তোমার অনেক দয়া।

ও আখতার, এই কাহিনী এবার শেষ করো।

ও খোদা, হিন্দুস্থানের সবাই যেন সুখে থাকে আর কম বয়সীদের যেন উন্নতি ঘটে।

এই কথা বলে আমি এই মসনবি সমাপ্ত করি—তোমাদের শান্তি হোক। তোমাদের শান্তি হোক।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে "ঘেরাও" অবসান হইবে কি?

শ্রমিক কল্যাণব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ পশ্চিম বঙ্গের নূতন জোড়াতালি সরকারের ক্ষীণ-দেহ কিন্তু সবল-প্রাণ নূতন শ্রমমন্ত্রী তাঁহার বিষম 'ঘেরাও' টেকনিক প্রয়োগে শ্রমিক-মহলকে উৎসাহিত উদ্দীপিত করিয়া শিল্প-ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্ববিধ সংস্থায় যে বিষম অনাচার এবং অরাজকতার সৃষ্টি করেন, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে আপাতত তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিলেও 'ঘেরাও' নবরূপ ধারণ করিয়া তাহার কালোছায়ার দ্বারা এ-রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে আবার একটা বিপর্যয় এবং অনর্থ সৃষ্টি করিবে কি না, এখনও বলা যায় না।

মহামান্য হাইকোর্ট ঘেরাও সম্পর্কে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে 'ঘেরাও' যে বে-আইনী এবং ঘেরাওকারীদের আইনের আওতায় আনিয়া যথাযথ দণ্ড বিধান করা যায়, তাহাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। এই সঙ্গে রাজ্য পুলিসকেও ঘেরাও সম্পর্কে কোন মন্ত্রীর আদেশ নির্দ্দেশের পরোয়া না করিয়া আইন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন মহামান্য হাইকোর্ট!

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা অসমীচিন হইবে না যে গত কয়েক মাস ধরিয়া ঘেরাও সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করি এবং ঘেরাও যে বে-আইনী এবং ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের বিশেষ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করে, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে তাহার পূর্ণ সমর্থন প্রতিফলিত হইয়াছে।

'ঘেরাও' সম্পর্কে মামলা দায়ের হইবার পূর্ব্বে শ্রমমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট তথা দেশের জুডিসিয়ারীকে অবমাননা করার জন্য, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জীকে হাইকোর্টে গিয়া বিচারপতিদের সামনে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় (করজোড়ে কিনা জানা নাই)। সোজা কথায় 'ফাইন' না বলিয়া তাঁহাকে পাচ টাকা দণ্ড দিতেও বাধ্য করা হয়। আমরা আশা করিয়াছিলাম এই 'এপিসোড়ের' পর মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মানে মানে পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু না! তাহা তিনি করেন নাই! অবশ্য একথা জানি যে সাধারণ শিক্ষিত ভদ্র এবং সজ্জন ব্যক্তিদের মত উচ্চ মার্গস্থিত, বিশেষ করিয়া পলিটিক্যাল পার্টির লিডারদের, মান-সম্মান-জ্ঞান বিশেষ ধর্ম্মাবৃত, চট করিয়া বা সহজে তাহাতে আঘাত লাগে না! শ্রমিক নেতা কালী মুখার্জ্জি প্রকাশ্য সভায় সুবোধবাবুকে পদত্যাগের আহ্বান জানাইয়া ভবোদের কার্য্য করিয়াছেন! মুখুজ্জ্যে মহাশয় স্বয়ং ট্রেড ইউনিয়ন লিডার, তিনি নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে বহু ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন লীডার (মন্ত্রী হইলেও) সাধারণ ভদ্র মানুষের নীতি, নির্দ্দেশ সর্ব্বক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া সেই মত কায্য করিতে পারেন না। ইহা করিলে নেতার নেতৃত্ব এবং পেশার 'পেশাত্ব' অবসান হইতে বিলম্ব ঘটে না। আমাদের ক্ষীণদেহী কিন্তু সাংঘাতিক সবলমনা শ্রমমন্ত্রী—নানাদিক চিন্তা করিয়া—অপূর্ব্ব বিপর্য্যয়ের মধ্যেও গদি ছাড়িলেন না, যদিও মহামান্য হাইকোর্টের বিচারের রায়ে তাঁহার হস্তের মালিক-মার গদাটি খসিয়া গেল অন্ততঃ আপাত ।

আমাদের প্রশাসক মন্ত্রী মহাশয়গণ বোধ হয় সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রের প্রধানতম তিনটি কর্ত্তব্য হইতেছে: আইন প্রণয়ন, আইন মাফিক প্রশাসন কার্য্য চালান এবং ন্যায় বিচার। আইন সভার কর্ম্মাদি যখন সাময়িক ভাবে বন্ধ (নিষ্ক্রিয়) হয়, দলাদলির পাপচক্রে প্রশাসন যখন দুর্ব্বল (কিংবা নাই বলিলেও চলে) এবং বিমূঢ়, এমন অবস্থাতে ন্যায়াধিকরণকেই রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হইল। পরম এই সঙ্কটকালে, প্রায় অরাজক অবস্থায় মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টকেই ম্রিয়মান সংবিধানের পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রপাঠ করিতে হইল।

সংবিধানের মৃত্যুবাণ রচিত হইয়াছিল, বিগত ২৭এ মার্চ্চ এবং ১২ই জুনের দুইটি সরকারী ফতোয়ার দ্বারা, যে ফতোয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে হুকুম দিল যে শ্রম সম্পর্কিত ব্যাপারে—শত হস্ত দূরে থাকিয়া সকল প্রকার অনাচার এবং বেপরোয়া অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দেখিতে হইবে—ব্যস্ আর কিছুই করিবার নাই। যাহার ফলে সরকারী পুলিস হইল একেবারে বেকার। এ বিষয়ে পত্রিকান্তরের মন্তব্য অতি যথাযথ মনে করি। পত্রিকাটি বলেন:

> অথচ ব্যাপারটা নিছক শ্রমনীতির নহে, এমন কী শুধু আইন-শৃঙ্খলারও না—ওই ফতোয়া সভ্য সুশৃঙ্খল সমাজে বসবাসের যে কয়েকটি মূল শর্ত থাকে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকেই উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে। পুলিসকে অথর্ব নপুংসক বানাইয়া আমরা দলাদলি সর্বস্ব গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়াছি। ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট শ্রমিকবৃন্দকে অনেক অধিকার দিয়াছে ঠিক। কিন্তু বিচারপতি বলিয়াছেন, এই অধিকারও নিরঙ্কুশ নয়, একের অধিকার অন্যের চলাফেরার স্বাধীনতার হানি ঘটাইতে পারে না। রাষ্ট্র যখন শিল্পোদ্যোগের অনুমতি দিয়াছে তখন তাহাকেই দেখিতে হইবে শ্রমিক-নিয়োগ হইতে পুঁজিবিনিয়োগের যে নিয়ম ও অনুশাসন আছে, তাহা লঙ্ঘিত হইতেছে কিনা। শৃঙ্খলা বহুদিনের যত্নে ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে, ঐতিহ্য বহু দশকের অভ্যাসে-আচরণে তৈয়ারী হয়, তাহাকে রক্ষা করে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, হঠাৎ একটা ফতোয়ায় পাশার দানের মত তাহাকে উল্টাইয়া দিলে চলে না।

ন্যায়াধীশ বিস্মৃত কয়েকটি স্বয়ংসিদ্ধ নীতি ও রীতিকে আবার উচ্চারণ করিয়াছেন। স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে আইন যাহা যেভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, কোন প্রশাসনিক কর্তার এখতিয়ার নাই যে, হুকুকনামা জারী করিয়া ইচ্ছামত তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান। আইন রবারের ফিতা নহে যে যেমন-খুশী তাহাকে টানিয়া লম্বা বা ছাড়িয়া দিয়া ছোট করা চলিবে। একবার প্রণীত হইলে ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ–সব নিরূপিত। হেরফের ঘটাইতে পারেন না কোনও রাজ্যপাল, পারেন না কোনও মন্ত্রিসভা, আর এই গহীন গাঙে অন্যান্য সফরীদের ফড়ফড়ানি তো একেবারেই অসম্ভব।

ভাষায় এক না হইলেও, আমরাও শ্রম, শ্রমিক, মালিক-এবং সরকারের সাধারণ ভাবে যাহা করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয় গত ৬।৭ মাস ধরিয়া সেই আলোচনাই করিয়া আসিতেছি: ইহাও আমরা বলি যে—দেশের আইন-কানুনে শ্রমিকদের যেমন রক্ষা কবচ আছে, সেই মত রক্ষাকবচ মালিকপক্ষের আছে। কিন্তু বর্ত্তমান (বি) যুক্ত সরকার—প্রথম হইতেই কেবল শ্রমিক স্বার্থই দেখিতে এবং শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার বে-আইনী কার্য্য কলাপ, কেবল সমর্থনই নহে, নানা ভাবে তাহাতে উৎসাহ দান করিতেও পরম তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। এমন কি, পুলিস-মন্ত্রীর দপ্তরে শ্রম-মন্ত্রীর আদেশ নির্দেশও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়া লইলেন!

বিচারাধিকরণের ভূমিকা কী? রায় এক বাক্যে যাহা বলিয়া দিয়াছে, কবির ভাষায় তাহাকে রূপান্তরিত করিলে বলা যায় "নিত্য জাগরণ।" বিচারালয়গুলি কেবল বিধিভুক্ত কয়েকটি "কোড" আর স্ট্যাটিউটের অছি নহে, জাতির জাগ্রত বিবেকও বটে। জনচিত্তে ধর্ম্মাধিকরণের এমনই অধিকার যে, তাহার আহ্বান, আবেদন বা বাণীর প্রভাব না পড়িয়া পারে না। সাময়িক বিক্ষোভ বা অবস্থিতির মুহূর্তে তথাকথিত জনপ্রিয়তার হানিও যদি ঘটে, সেই ঝুঁকি লইবার সাহস বিচারাধিকরণেই আছে

নবাব কুব্রা বেগম, আসমৎ উদ্দৌলার বিবি। সে মেয়েদের সবার বড়, এখন লক্ষ্ণৌতে আছে। তার বয়স ১৮ বছর আর তার মায়ের নাম সুলেমান মহল।

দ্বিতীয় রাজকন্যার নাম জয়নাব বেগম, তার জননী খাকান্ মহল। তার ৪ বছর বয়স। মায়ের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে থাকে।

তারপরের রাজকন্যার নাম শাহেরবানু বেগম, নবাব বেগমের মেয়ে। তিন বছর বয়সে লক্ষ্ণৌতে সে মারা যায়। তার মায়ের সঙ্গে ওখানে থাকত সে।

চতুর্থী রুকাইয়া বানু, নবাব সইদা বেগমের মেয়ে, ৩ বছর বয়সে মারা পড়ে।

তারপর দায়হাম্ আগা, মুলগণ বেগম সাহেবার মেয়ে। লক্ষ্ণৌতে সুলতান বেগম আড়াই বছরের মেয়েকে রেখে মারা গেলেন। মেয়েকে দেখাশোনা করেন তার মাসী নওরোজা বেগম।

ওঃ খোদা, আমার সঙ্গে আবার মিলিয়ে দিন।

আমি কয়েদখানায় রয়েছি অথচ আমার কোন অপরাধ নেই। জেলে আমি কত লোকসান সয়েছি।

এখানে কেউ আমার সঙ্গী নেই। কারণ ছেলে-মেয়েরা কেউ লণ্ডনে, কেউ লক্ষ্ণৌতে আর কেউ মুচি-খোলায়। কখনো কখনো আমি সন্তানদের কথা ভাবি, কখনো রাজত্বের কথা, কখনো দারিদ্র্যের কথা। চারিদিকে অশান্তি। আমার দু'চোখ যেন অন্ধ হয়ে পড়েছে। দৃষ্টিশক্তি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

তারপর নবাব লিখেছেন লক্ষ্ণৌর দারোগা দেউড়ির দরখাস্তের কথা আর তাঁর কুঠুরির অন্যান্য বিষয়। এই পরিচ্ছেদের প্রথমেও যথারীতি সাকিনামা এবং ফুল ও সুরার উল্লেখ।

আমি নেহাৎ একজন দরিদ্র কবি। জ্ঞান আমার সামান্য। কবির শ্রেণীতে আমার কোন মর্যাদার স্থান নেই;

এবার বলি, একদিন কর্ণেল সাহাব আমার হাতে দিলেন লক্ষ্ণৌর একখানি চিঠি। চিঠিখানি ছিল একটি লেফাফার মধ্যে এবং সেটি খোলা হয়নি।

লক্ষ্ণৌতে একজন দারোগা ছিল, তার নাম ওয়াজেদ আলী। দুপুরে আমি সেই চিঠিটি পাই। তাতে এমনি একটা আর্জি ছিল :—'আপনি শান্তিতে থাকুন। যখন থেকে ইংরেজরা রাজ্য শাসন করতে আরম্ভ করলেন, বিদ্রোহীদের সাহস চলে গেল। ইংরেজদের অনেক নারী ও শিশুদের প্রাণ আমি বাঁচিয়েছি আর তাঁরা আমার এই সাহায্য করার জন্যে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং আপনার বেগমদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন আমাকে। তাই আমি আপনাকে সাহস করে জানাচ্ছি যে, নবীনা বেগম একটি পুণ্য কাজ এই করেছেন যে, চীফ্ কমিশনারের বিবি ও ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করার ফলে তাঁদের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আমি অন্যান্য মহলদের কথা এখানে জানাচ্ছি। সব চেয়ে ছোট মহল এগিয়ে এসেছেন সবার আগে। তিনি অনেককে বাঁচিয়েছেন। তারপর সুলতান জাঁহা। তারপর শাহেন্শা মহল। তারপর আমীর মহল। ফক্র মহল তাঁর ছেলেকে নিয়ে বেঁচে আছেন। সখী ছাতার মহল বহাল তবিয়তে আছেন। তারপর ওমরাও মহল। তারপর সইদা মহল—তিনিও আর আর বেগমদের সঙ্গে ছিলেন।

আমি তাঁদের সংখ্যা গুণে দেখেছি ৮ জন। তাঁদের প্রাণের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা এখানে থাকতে পারেন।

প্রত্যেক নবাবজাদীই কষ্টে আছেন। তাঁদের পোষাকআষাক নেই, খানাপিনা নেই, শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁরা। ফৌজের ঢেউয়ে তাঁরা ভেসে গেছেন। শহরের কমিশনারকে আপনি লিখুন, তারপর আমি চেষ্টা করব তাঁদের এক জায়গায় আনতে। খুব তাড়াতাড়ি করুন! কারণ অনাহারে রয়েছেন

তাঁরা। আপনি লিখুন যে তারা সবাই নির্দোষী। তাঁদের মাথা পিছু ৫০ টাকা করে' দিন যাতে তাঁদের দুর্দশার কিছু লাঘব হয়।

আটজন মহলেরই সব মালপত্র কোতোয়ালিতে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমি সেসবের ওপর শিলমোহর করে দিয়েছি আর আমাদের জানানো হয়েছে যে, শীঘ্রই ফেরৎ দেওয়া হবে সমস্ত জিনিষপত্র। বড় সাহেব খুব দয়ালু। আমি কর্ণেলকে বলেছি যে আমি গভর্ণর জেনারেলকে লিখব আর তিনি বলেছেন যে আমি তা পারি। চিঠিখানি আমি তাঁকে দিয়েছি। খোদা, দোয়া করুন। গভর্ণর জেনারেলকে আমি সমস্ত ব্যাপারটা লিখেছি।

আমার স্বদেশ থেকে একবছর পরে এই পত্র পেলেম। এটা ১২৭৪, সাওয়াল মাস। আমি গভর্ণর জেনারেলকে অবস্থা জানিয়ে লিখলেম আর উত্তর এল, 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা ব্যবস্থা নেব।'

আমার বিষয়ে, কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করেছেন যে দু লক্ষ টাকা আমার ব্যয়ের জন্যে দেওয়া হবে।

দারোগা ওয়াজিদ আলীকে আমি যে নির্দেশ পাঠাই এই তার প্রতিলিপি:—'আমি গভর্ণর জেনারেলকে লিখেছি যে আমার পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত যেন করা হয়। আপনিও আমার বিষয় সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আমার পরিবারের সবাইকার বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার কথা সরলভাবে লিখবেন আর তাঁরা প্রাসাদে ফিরে এলে তাঁদের নাম পাঠিয়ে দেবেন।'

গভর্ণর জেনারেল আমায় খুব শ্রদ্ধা করেন আর আমার ওপর তাঁর বড় দয়া। আমি তাঁর দয়ার কিছু বর্ণনা এখানে করি। যখন আমি রাজা ছিলেম তখনকারই মতন ভাল সম্পর্ক তিনি বজায় রেখেছেন আমার সঙ্গে। তিনি একবার মাত্র আম'কে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এই গারদে, পরে আর কোন পত্র আসেনি। আমি বুঝতে পারিনা কেন ওরা আমায় কয়েদ করেছে। তবু এখনো আমি গভর্ণর ধন্যবাদপূর্ণ আছি জেনারেলের প্রতি। একদিন আমার বরাত ফিরে যেতে পারে আর যাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে তাদের সঙ্গে আবার মিলন ঘটতে পারে।

তারপরের অধ্যায়ে নবাব ওয়াজিদ আলী তাঁর অন্যতমা বেগম সুলতান নবাব খুর্শিদা মহল সাহেবা কারবালাইয়ের বিষয়ে লিখেছেন।—

ও সাকি, আমায় সুরা দাও, আলিঙ্গন দাও, আমার চোখের ওপর তোমার চোখ রাখো, আমার ঠোঁটের ওপর তোমার ঠোঁট এমনিভাবে চলুক। আমি তোমার কাছে নত হই আমার অনুগতি জানাবার জন্যে। তুমি আহ্বান জানাও যাতে এখান ছেড়ে চলে যেতে পারি, কারণ পানের এখন সময় হয়েছে। আমাদের ওপর কোন সন্দেহ ভাব দেখিও না, কোন তারতম্য নয়।

কোথায় সে সারঙ্গীরা, শ্রোতৃবৃন্দ যে উপভোগ করবে? কোথায় সেই সরদ-নেওয়াজ? ডাকো তাদের। কোথায় সেই সাজিন্দারা? তাদের সাজ নিয়ে আসতে বলো। কোথায় সে তম্বুরা? কোথায় সে চাকারা? কোথায় সেই দোহারা আর পাখোয়াজ? কোথায় সেই সুর-আয়না আর সুর-শৃঙ্গার? মঞ্জিরা কোথায়? ডফ্ কোথায়? কোথায় চঙ্? মোচঙ্ কোথায়? জলতরঙ্গ কোথায়? কোথায় তবলা বাঁয়া? খঞ্জরি আর সেতার কোথায়? কোথায় সেই সারি বেঁধে দাঁড়ানো সুন্দরীরা? ঝাঁঝ, তম্বুর, ঘুঙ্ঘুর কোথায়? বাঁশি আর হরাব? তম্বুরিন্ আর সাজ? কোথায় মাক্‌রোতি আর সরজিৎ? মাদল কোথায়? কোথায় সেই কান্‌তোল্ তাসা? কোথায় দোহদাল আর তামাসা? বেলাহ্ আর বেয়ানা কোথায়? অর্গান, শাহ্‌নাই আর নাকাড়া কোথায়?

মেহেরবাণি করে' আমায় নাচ দেখাও, এই সব যন্ত্রের মিষ্টি সুর শোনাও। গায়কদের ঠোঁট যন্ত্রের সুরের সঙ্গে নড়ে। খরজের কি মাহাত্ম। সুরের

খোঁচগুলো আমার বুকে যেন তীরের মতন এসে বেঁধে। আমি যেন শুনতে পাই গিট্‌কিরি আর জহ্‌রির। আর শিল্পীদের গুণের কদরে বখ্‌শিস্‌ দিতে পারি চাঁদকে। শোনাও সেসব অব্‌চিন্‌ আর পাল্‌টি। সেই সাতের তানের বাহার দেখাও। রেখব্‌ সুর শোনাও, যাতে গান্ধারের দাপট কম্‌তি হয় আর মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত লাগে—আর তারিফ্‌ করে ওঠে আশ্‌মানও। অন্য রাগ যেন হাত কচ্‌লাতে থাকে। আমাকে শুনতে দাও সেই কলা, পাতার্‌ আর ভর্জিন্‌। ২২ শ্রুতি থাকবে আর ১৬ কলা, তারপর আমি সেই সুরেলা সঙ্গীত শুনব। ৬ রাগ, ৩৬ রাগিণী আমি গুণেছি আমার আঙুলে। কলাবন্ত, কাওয়াল আর ধাড়িদের ডাকো। ধ্রুপদের স্বাদও কিছু পেতে দাও আমায়। কলাবন্ত আলাদা। কাওয়াল আলাদা। কিছু টপ্পাবাজ আর খেয়ালীদের আনো। আসুক গজল আর ঠুম্‌রি গাইয়েরা। ছুকটা আর দাদরা গাইয়েরাও। একটা একতালা আর রূপক হবে। কোন কোন গায়ক দেখাবেন চৌতালা, আড়া-চৌতালা আর ঝাম্‌পা। তেতালার কিছু স্বাদও যেন আমি পেতে পারি। একটা চতুরস আর কলা যেন হয়। প্রত্যেক তালের নিপাদ আমায় দেখাও। লছমী আর সওয়ারী যেন হতে পারে আর এইসব তালের সঙ্গে যেন নাচে সুন্দরী মেয়েরা। পটতাল আর টিমাও হোক।

আমায় এনে দাও সুখ বিলাস। ও সাকি, আমায় সুরা এনে দাও। এই বর্ষা ঋতুর রাত যে ফাঁকা কেটে যাচ্ছে তা যেন উপভোগ করতে পারি। খোদাতালার কাছে প্রার্থনা করি যেন নাচ অরা গানের মজা পাই আর তার মধ্যে সব সময় দেখায় তার ভদ্র আচরণ।

কয়েক মাস হয়ে গেল আমার প্রিয়াদের বিচ্ছেদ আমি ভোগ করছি। তাঁদের চোখ আমায় দেখাও। আর কতদিন অপেক্ষা করতে পারি আমি। তোমাদের প্রেমিক পড়ে আছে কয়েদখানায়।

এই কুঠুরির মধ্যে আমি একা। শুধু তোমাদের স্মৃতি আমার মনে ভরা রয়েছে।

এক প্রেমিক পড়েছে বিপদে। কেউ তাকে দেখবার নেই! আল্লা জানেন, কে তাকে দেবে সুখ!

ইংরেজদের এই গারদের কথা বলো। এই জেলখানায় একেবারে হাওয়া নেই। বিনাদোষে আমায় কয়েদ করা হয়েছে। কিন্তু সেজন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই, কারণ আমি আলীর নফর, যিনি আমার তদারক করেন আর বাঁচিয়েছেন সলমান্‌কে। তিনি আমার মুরুব্বি। জেলখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে নেবেন।

শোনো এই করুণ কাহিনী। আমার যা কিছু ঘটেছে সব তোমায় বলি। আমি কারুর প্রেম বিশ্বাসী দেখিনি। একশ' বছর ধরে যদি কেউ আর একজনের জন্যে জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে চলে তবু বিশ্বাসঘাতক হতে তার কিছুই সময় লাগেনা।]

১২৭৪ সালে (হিঃ) আমার বিবি খুজিস্তা মহল মুচিখোলা থেকে যাত্রা করেন। তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর। আমার কয়েদ হওয়ার জন্যে তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। তিনি আমার পোষাক চেয়ে পাঠালেন। তারপর আমায় উপহার দিলেন তাঁর দোপাট্টা। আমার মনে হল, তাঁর মনে আমার জন্যে মুহব্বৎ বেড়েছে। কিন্তু দুদিন পরে ফিরিয়ে পাঠালেন আমার পোষাক। তখন আমিও ফেরৎ দিলেম তাঁর দোপাট্টা।

তারপর তিনি জাফ্‌রি কোমের বাড়ি চলে গেলেন। শুনেছি তিনি লক্ষ্ণৌ যাবেন আর সেখান থেকে তীর্থ করতে কারবালায়।

শেষ পর্যন্ত তিনি কারবালার পথে যাত্রা করেছিলেন। আমি তাঁকে ৫০০ টাকা দিই এবং তা খরচ করেন তিনি। ১০০ টাকা হিসাবে তিনি হাত খরচ পাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার রাজত্বের সময় আমি তাঁকে মাসে ২৫০০ টাকা করে' দিয়েছি। আমি

অনুরোধ জানিয়েছি, ভালবেসেছি, মান্য করেছি। কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ কিংবা ইচ্ছা বুঝতে পারলেন না। আর এই জগতের নিয়ম যে হতাশার সময়ে কিংবা দুঃখের দিনে পাওয়া যায়না কাউকে।

পতঙ্গ যখন কামনার আগুনে নিজেকে জালিয়ে ফেলে, সেই আগুন কেন বিসর্জন দেয়না নিজের অস্তিত্ব? তারও শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। ওই প্রেমিকের জন্যে বাতির নিশ্চয় গরজ আছে, কারণ সে তার রূপকে জালিয়ে দেয়। জলন্ত শিখার জন্যে তার মনে প্রেমের আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু ত নেই আর সে সেই শিখার গভীরেই যেতে যেতে চেয়েছিল। এ সেই প্রেম যা' মুর্দেগানদের জন্যে ব্যবস্থা করে কফিনের। এ সেই প্রেম যা বাগিচায় পড়লে সারা বাগিচা জলে যায়। আর যদি শরীরের ওপর পড়ে তাহলে খাঁটি মদের মতন জালিয়ে দেয় দেহকে। এ সেই প্রেম যা ফুলের সঙ্গে এলে ফুলের মুখ পুড়িয়ে দেয়।

এ সেই প্রেম যা কফিনের মধ্যে থাকলে সে কফিন থাকতে পারেনা মুর্দার ওপরে। এ সেই প্রেম যা হামেশা আছে কোয়েল আর ফুলের মধ্যে আর এই দুয়েরই অন্তর জ্বালিয়ে দেয়। আর সে সিংহাসনের রাজা।

ওঃ আখ্‌তার, শান্ত হও, খেয়াল রাখো। কি আশ্চর্য কথাই তুমি শোনালে। খোদার কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন শীঘ্র তোমায় কারামুক্ত করেন। আমি এই বিপদে পড়েছি শুধু আমার রাজত্বের জন্যে। না হলে আমার নাম আর এই বন্দীদশার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।

ওঃ আল্লা, আমাকে এই কয়েদখানা থেকে উদ্ধার করো। শোকে আমার কথা কইবার আর শক্তি নেই। ওঃ খোদা, এই বেচারা আখতারকে মুক্ত করে দাও।...

(পরবর্তী অধ্যায়)

ও লক্ষ্ণৌর কোয়েল, তুমি গাও। ও আমার কলম —বন্ধুদের প্রশংসা করা তোমার এক গুণ আর তুমি ফুলের মতন—প্রিয়ার রূপ তুমি উন্মুক্ত করো আর চিন্তার পাখির কাবাব বানাও। প্রিয়া বিরহের শোকের যন্ত্র তুমি বাজাও। নতুন সঙ্গীত সৃষ্টি করো সুর-শৃঙ্গারে।

ও আমার পিয়ারীর কেশগুচ্ছ, তুমি তার মুখের ওপর নেমে এসো। কেঁদে ওঠে আমার হৃদয়।

আমি এক অভিশপ্ত মানুষ।

ও কোয়েল, ফুলের সঙ্গে বিবাদ কোরো না। ও কুঁড়ি, তুমি ফুটে ওঠো ফুল হয়ে।

সব কিছু বর্ণনা করবার চেষ্টা করো সচেতনভাবে আর প্রিয়ার মুখের প্রতি পুরো শ্রদ্ধা জানিও।

ও মালী, কোথায় এই সব গাছ—আরু ধোঁয়া, মুমুল, নস্‌রিন্, নস্‌তরঙ্, রাইহান্, গুলে আস্‌রফি, নীলা, পীলা, সাব্বো, জুই, চামেলি, নার্গিস আর দোন্দি?......

এই ইংরেজ তরুণীরা চমৎকার, কিন্তু তারা মনের অবস্থা বোঝেনা আর ভালবাসাকে মনে করে বদ্ খোয়াবি।

ও শ্রোতার দল, মন দিয়ে শুনুন আর যে রাজা এই অইস্থায় এসে পৌঁছেচেন তাঁকে আপনাদের সম্মান জানান।

আমি খোদার নামে কসম খেয়ে বল্‌ছি যে আমার এই জগতের সম্বন্ধে কোন দুঃখ নেই। আমি এখন আপনাদের জানাই কয়েকজন জেনানার অবিশ্বাসের কাজ, ক্রূরতা আর অহঙ্কার। এঁরা—আখ্‌তার মহল, জাফ্‌রি আর কাইসার—আমার বেগম ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আর আখতার মহল আমায় খুবই ভালবাসেন। তাঁর বিচ্ছেদ আমার পক্ষে বড় কষ্টকর; আর এই জেলখানায় আমার কিছু ভাল লাগেনা।

জাফ্‌রি আমার সঙ্গে ৭ বছর ছিলেন আর কাইসার ১৩ বছর এবং আমার মনে আরো কামনা

কিছু নেই। আখতার আমার সঙ্গে আছেন ৯ বছর আর এই বেগম আমার প্রেমে আছেন গত ১৮ বছর।

যখন আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায় তখন আমি চেয়ে নিই কাইসারের (ছল্লা, পায়ের আঙুলের আঙটি) আর এক প্রিয়ার মিসি, আখতার মহলের কেশ, জাফ্রির চর্বিত তাম্বুল।

জাফ্রি একই জিনিষ আগে পাঠিয়েছিলেন আর আমি তার স্বাদও নিয়েছি। আমি তাঁকে এবার পাঠাবার জন্যে বলি একটি আঙটি, একটি কম্বল, একটি দোপাট্টা, হলুদে পাউডার।

জাফ্রি উত্তর দিলেন—এইসব জিনিষ আপনি তাঁর কাছে চান, যাঁকে আপনি ১০০০ টাকা দিয়েছেন আর যাঁর প্রেম আপনার হৃদয়ে রয়েছে। আমি আপনাকে দেবনা।

দুঃখ ছাড়া তিনি আর কিছুই দেননি আমায়।

আর রাণী জানালেন—জগতে আমার নাম প্রিয়া। আপনি সেইসব জেনানার নখ্ চান যাঁরা আপনাকে ভালবাসেন আর তাঁরা আপনাকে পাঠাবেন যাঁরা আপনার গোপন কথা জানেন। আপনি নখ্ চেয়ে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি নাপিতানী নই আর আমি নাপিতগিরি করতে শিখিনি।

দিল্দারও আমায় মিসি পাঠালেন না। তিনি লিখেছেন যে তিনি খুব অসুস্থ, সেজন্যে তা পাঠাবার কোন উপায় করতে পারেন নি।

কাইসার লিখেছেন—আমাকে আপনার পিয়ারীদের তালিকায় রাখবেন না! আমার কোন পায়ের আঙটি নেই।

আঙটি হারাবার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত আছি। কেউ আমার প্রতি দয়া করলেন না আর কেউ তাঁদের প্রেম পাঠালেন না এই গারদ ঘরে।

কিন্তু একজন বেগম আছেন—আখতার মহল আর তিনি আমার এই বন্দীজীবনে বন্ধু হয়েছেন। তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর কেশগুচ্ছ আর আমি রেখে দিয়েছি আমার বুকের কাছে। তিনি আমার জন্যে খানা পাঠিয়েছেন আর এই তো কারুর বন্ধুত্ব আর ভালবাসা জানাবার সময়। আমার এই রাণী রোজ খানা পাঠান আর ৫ খিলি করে পান পাঠাতেন। জাফরের একটা আঙটি আমার কাছে আছে, আগে যা চেয়েছিলেম। উবাটুনার একটা মোড়ক আমার কাছে আছে আর সেজন্যে কিছু ভাবিনা। আর যে দোপাট্টা আর কম্বল কয়েদখানায় পাঠানো হয়েছিল সে কথা বলি। বাকর আলীকে যখন জবাব দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেও দুটি জিনিষ সঙ্গে নিয়ে যায়। খোদা তাকে নাশ করেন। আমার জিনিষ চুরি করেছে সে।

তারপরের পরিচ্ছেদে নবাব বন্দীশালায় তাঁর খরচ-পত্রের কথা বর্ণনা করেছেন—

ও আমার মন, থামাও এই বর্ণনা আর বলো যে বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটেছে তোমার হৃদয়ে।

এই জেলখানায় আমি যা খরচ করেছি, তার ফিরিস্তি দিচ্ছি। আজ ২৬শে জিল্‌কদ, ১২৭৪, শুক্রবার।...

অযোধ্যার রাজা আখ্তার, যিনি এই গারদে রয়েছেন আর যাঁর এখান থেকে উদ্ধার পাবার কোন আশা নেই, তাঁর কিছুই অর্থ নেই। আর যা আমি আজ পর্যন্ত করেছি, আমি লিখেছি হিসাবপত্রের মধ্যে। এটা বখ্শিষ নয়, দয়াও নয়। এ নিতান্তই গরীবের খানা আর এই টাকায় আমার পুরোপুরি হয় না। মুনসী সফ্দারকে আমি ৫০০০ টাকা দিয়েছি ব্যয় করবার জন্যে। ৪৫,৪০০ টাকা লণ্ডনে। আবার ৭৯,৩০০ টাকা লণ্ডনে পাঠিয়েছি। আমার রানীকে দিয়েছি ৪৫,৪০০ টাকা, মুজাহেদকে ১১,০০০ টাকা, পিয়ারী দিল্দারকে ২৫,৪০০ টাকা, জাফরি বেগমকে ৬৩০০ টাকা। জুল-ফিকারকে ৫০০০ টাকা, কারবালাইকে ১০০০ টাকা, মহম্মদ রেজাকে ১০০০ টাকা, ফগউদ্দৌলাকে ৫০০ টাকা, মীর্জা জাফরকে ৫০০ টাকা। ও আখ্তার মহল, আমি দয়া দেখিয়েছি যে তাঁকে দিয়েছি ৩০,০০০ টাকা মালকা ই-জুল্ফকে ৩০,০০০ টাকা, কাইসারকে ১১,০০০

টাকা, খুজিস্তা মহলকে ১০০০ টাকা। আমি জেলখানায় ৪০০০ টাকা খরচ করেছি। খয়রাতের বাবদ ৬৩০ টাকা। চাকরদের মাস মাহিনা ১০,০০০ টাকা আমার হাতে একলক্ষ টাকার সোনা আছে আর আশা করি সেটাও খরচ করব।...

ওঃ খোদা, আমায় সুখ দাও আর রাগ দিওনা আমার বন্ধুদের। ওঃ খোদা, আমাকে এই কয়েদখানা থেকে মুক্ত করে দাও আর আমায় শক্তি দাও বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াবার। আমার চিন্তার মুক্তায় আলো দাও আর এইসব মুক্তো যেন একটি সুতোয় থাকে। লোকে যেন ফির্দৌসির কবিতার স্বাদ ভুলে যায় আমার কবিতা পড়ে। আমি যেন নষ্ট করে দিতে পারি খাকানির (বিখ্যাত ইরাণী কবি) বাগিচা। আমি যেন জামালিকে ধ্বংস করে দিয়ে ওস্তাদি বনতে পারি। (আমার কবিতা পড়ে) আর কেউ পড়বেনা জালালি, হেজ্জালী, জামি, সাদি, ফৈজী, নিজামী, আন্ওয়ারী, জহুরী, শম্স, তবরিজ, হাফেজ, হাজী (ফার্সী কবিরা); লক্ষ্ণৌর নাসিখ্, আতীশ।

এসব কি নির্ব্বোধের মতন বকছ। এঁরা উচ্চস্তরের কবি আর আমি নীচু দরের। তাঁরা হলেন মুকুট আর আমি তাঁদের পায়ের ধুলো। তাঁরা ওস্তাদ, আমি চাকর।

যে একটিমাত্র জিনিষ আল্লার কাছে আমার চাইবার আছে তা হল এই গারদ থেকে মুক্তি।

শেষ পরিচ্ছেদে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে নবাব লিখেছেন—

ও খোদা, আমার বন্ধু পরিচিতেরা যেন আমার সঙ্গে মিলতে পারে। আমাকে সেই পরীদের দেখতে দাও। আমায় দয়া করো, আমার প্রার্থনা পূরণ করো তোমার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তুমি আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে দেবে। তুমি এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি দেখবে এই জীবদের দুঃখ বেদনা। প্রত্যেকে তোমার সাহায্যের জন্যে আশা করে। রঙ দিয়েছ পৃথিবীকে, খাবার দিয়েছ পাখীদের। তুমি দয়া আর করুণা ছাড়া কিছু নও। তুমি আমাদের দীর্ঘজীবন দিতে পারো। তুমি ভিখারীদের বসাতে পারো সিংহাসনে। ফকিরকে প্রাচুর্য্য দিতে পারো। রাজাকে করতে পারো ফকীর। ভিখারীকে ধনী করে দিতে পারো। তোমার হুকুমে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। সব হজরৎ, ইমাম এবং নবী তোমার তাঁবেদার।

অপদার্থ আখতারের এই আর্জি নাকচ করে দিও না। সে বিনা কসুরে কয়েদখানায় পড়ে আছে আর কাঁদছে দিনরাত। তার কোন অপরাধ নেই। সে চোরও নয়। খুনে, ঠগ্, কি গরীবের ওপর অত্যাচারী কিছুই নয়। সে পকেট মার, কি গুণ্ডা, কি মেয়েমানুষ চুরিকরা, কি মাতাল, কি জুয়াড়ি এসব কিছুও নয়।

আমার বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ নেই তুমি এ সমস্তই জানো। কারণ তুমি সর্ব্বজ্ঞ। ও খোদা আমার ওপর সদয় হও। মহম্মদ, আলী, ফতিমা, হাসান হুসেনের নামে, সৈয়দ উস্ সাজেদাইনের জন্যে, বাকর জাফর, ইমাম, রেজার খাতিরে; মুসা কাজিম, মহম্মদ তকী, আলী তকী, আসকরি আর মেহেদীর দোহাই —আখতারকে ছাড়া পাইয়ে দাও।

আমায় মুক্ত করো পূর্ণ মর্যাদা আর সম্মানের সঙ্গে তোমার জীবদের প্রতি তোমার অনেক দয়া।

ও আখতার, এই কাহিনী এবার শেষ করো।

ও খোদা, হিন্দুস্থানের সবাই যেন সুখে থাকে আর কম বয়সীদের যেন উন্নতি ঘটে।

এই কথা বলে আমি এই মসনবি সমাপ্ত করি। তোমাদের শান্তি হোক। তোমাদের শান্তি হোক।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে "ঘেরাও" অবসান হইবে কি ?

শ্রমিক কল্যাণব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ পশ্চিম বঙ্গের নূতন জোড়াতালি সরকারের ক্ষীণ-দেহ কিন্তু সবল-প্রাণ নূতন শ্রমমন্ত্রী তাঁহার বিষম 'ঘেরাও' টেকনিক প্রয়োগে শ্রমিক-মহলকে উৎসাহিত উদ্দীপিত করিয়া শিল্প-ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্ববিধ সংস্থায় যে বিষম অনাচার এবং অরাজকতার সৃষ্টি করেন, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে আপাতত তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিলেও 'ঘেরাও' নবরূপ ধারণ করিয়া তাহার কালোছায়ার দ্বারা এ-রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে আবার একটা বিপর্য্যয় এবং অনর্থ সৃষ্টি করিবে কি না, এখনও বলা যায় না।

মহামান্য হইকোর্ট ঘেরাও সম্পর্কে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে 'ঘেরাও' যে বে-আইনী এবং ঘেরাওকারীদের আইনের আওতায় আনিয়া যথাযথ দণ্ড বিধান করা যায়, তাহাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। এই সঙ্গে রাজ্য পুলিসকেও ঘেরাও সম্পর্কে কোন মন্ত্রীর আদেশ নির্দ্দেশের পরোয়া না করিয়া আইন মাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন মহামান্য হাইকোর্ট !

প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ করা অসমীচিন হইবে না যে গত কয়েক মাস ধরিয়া ঘেরাও সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করি এবং ঘেরাও যে বে-আইনী এবং ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের বিশেষ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করে, মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে তাহার পূর্ণ সমর্থন প্রতিফলিত হইয়াছে।

'ঘেরাও' সম্পর্কে মামলা দায়ের হইবার পূর্ব্বে শ্রমমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট তথা দেশের জুডিসিয়ারীকে অবমাননা করার জন্য, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জীকে হাইকোর্টে গিয়া বিচার-পতিদের সামনে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় (করজোড়ে কিনা জানা নাই)। সোজা কথায় 'ফাইন' না বলিয়া তাঁহাকে পাচ টাকা দণ্ড দিতেও বাধ্য করা হয়। আমরা আশা করিয়াছিলাম এই 'এপিসোডের' পর মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মানে মানে পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু না! তাহা তিনি করেন নাই! অবশ্য একথা জানি যে সাধারণ শিক্ষিত ভদ্র এবং সজ্জন ব্যক্তিদের মত উচ্চ মার্গস্থিত, বিশেষ করিয়া পলিটিক্যাল পার্টির লিডারদের, মান-সম্মান-জ্ঞান বিশেষ ধর্ম্মাবৃত, চট করিয়া বা সহজে তাহাতে আঘাত লাগে না! শ্রমিক নেতা কালী মুখার্জ্জি প্রকাশ্য সভায় সুবোধবাবুকে পদত্যাগের আহ্বান জানাইয়া অবোধের কার্য্য করিয়াছেন! মুখুজ্জ্যে মহাশয় স্বয়ং ট্রেড ইউনিয়ন লিডার, তিনি নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে বহু ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন লীডার (মন্ত্রী হইলেও) সাধারণ ভদ্র মানুষের নীতি, নির্দ্দেশ সর্ব্বক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া সেই মত কার্য্য করিতে পারেন না। ইহা করিলে নেতার নেতৃত্ব এবং পেশার 'পেশাত্ব' অবসান হইতে বিলম্ব ঘটে না। আমাদের ক্ষীণদেহী কিন্তু সাংঘাতিক সবলমনা শ্রমমন্ত্রী—নানাদিক চিন্তা করিয়া—অপূর্ব্ব বিপর্য্যয়ের মধ্যেও গদি ছাড়িলেন না, যদিও মহামান্য হাইকোর্টের বিচারের রায়ে তাঁহার হস্তের মালিক-মার গদাটি খসিয়া গেল অন্ততঃ আপাত ।

আমাদের প্রশাসক মন্ত্রী মহাশয়গণ বোধ হয় সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রের প্রধানতম তিনটি কর্ত্তব্য হইতেছে: আইন প্রণয়ন, আইন মাফিক প্রশাসন কার্য্য চালান এবং ন্যায় বিচার। আইন সভার কর্ম্মাদি যখন সাময়িক ভাবে বন্ধ (নিষ্ক্রিয়) হয়, দলাদলির পাপচক্রে প্রশাসন যখন দুর্ব্বল (কিংবা নাই বলিলেও চলে) এবং বিমূঢ়, এমন অবস্থাতে ন্যায়াধিকরণকেই রাজ্য এবং রাজ্যবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হইল। পরম এই সঙ্কট-কালে, প্রায় অরাজক অবস্থায় মহামান্য কলিকাতা হাই-কোর্টকেই ম্রিয়মান সংবিধানের পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রপাঠ করিতে হইল।

সংবিধানের মৃত্যুবাণ রচিত হইয়াছিল, বিগত ২৭এ মার্চ্চ এবং ১২ই জুনের দুইটি সরকারী ফতোয়ার দ্বারা, যে ফতোয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে হুকুম দিল যে শ্রম সম্পর্কিত ব্যাপারে—শত হস্ত দূরে থাকিয়া সকল প্রকার অনাচার এবং বেপরোয়া অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দেখিতে হইবে—ব্যস্‌ আর কিছুই করিবার নাই। যাহার ফলে সরকারী পুলিস হইল একেবারে বেকার। এ বিষয়ে পত্রিকান্তরের মন্তব্য অতি যথাযথ মনে করি। পত্রিকাটি বলেন:

> অথচ ব্যাপারটা নিছক শ্রমনীতির নহে, এমন কী শুধু আইন-শৃঙ্খলারও না—ওই ফতোয়া সভ্য সুশৃঙ্খল সমাজে বসবাসের যে কয়েকটি মূল শর্ত থাকে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাকেই উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে। পুলিসকে অথর্ব নপুংসক বানাইয়া আমরা দলাদলি সর্বস্ব গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়াছি। ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট শ্রমিকবৃন্দকে অনেক অধিকার দিয়াছে ঠিক। কিন্তু বিচারপতি বলিয়াছেন, এই অধিকারও নিরঙ্কুশ নয়, একের অধিকার অন্যের চলাফেরার স্বাধীনতার হানি ঘটাইতে পারে না। রাষ্ট্র যখন শিল্পোদ্যোগের অনুমতি দিয়াছে তখন তাহাকেই দেখিতে হইবে শ্রমিক-নিয়োগ হইতে পুঁজিবিনিয়োগের যে নিয়ম ও অনুশাসন আছে, তাহা লঙ্ঘিত হইতেছে কিনা। শৃঙ্খলা বহুদিনের যত্নে ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে, ঐতিহ্য বহু দশকের অভ্যাসে-আচরণে তৈয়ারী হয়, তাহাকে রক্ষা করে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী, হঠাৎ একটা ফতোয়ায় পাশার দানের মত তাহাকে উল্টাইয়া দিলে চলে না।
>
> ন্যায়াধীশ বিস্মৃত কয়েকটি স্বয়ংসিদ্ধ নীতি ও রীতিকে আবার উচ্চারণ করিয়াছেন। স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে আইন যাহা যেভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, কোন প্রশাসনিক কর্তার এখতিয়ার নাই যে, হুকুকনামা জারী করিয়া ইচ্ছামত তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান। আইন রবারের ফিতা নহে যে যেমন-খুশী তাহাকে টানিয়া লম্বা বা ছাড়িয়া দিয়া ছোট করা চলিবে। একবার প্রণীত হইলে ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ—সব নিরূপিত। হেরফের ঘটাইতে পারেন না কোনও রাজ্যপাল, পারেন না কোনও মন্ত্রিসভা, আর এই গহীন গাঙে অন্যান্য সফরীদের ফড়ফড়ানি তো একেবারেই অসম্ভব।

ভাষায় এক না হইলেও, আমরাও শ্রম, শ্রমিক, মালিক-এবং সরকারের সাধারণ ভাবে যাহা করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয় গত ৬।৭ মাস ধরিয়া সেই আলোচনাই করিয়া আসিতেছি। ইহাও আমরা বলি যে—দেশের আইন-কানুনে শ্রমিকদের যেমন রক্ষা কবচ আছে, সেই মত রক্ষাকবচ মালিকপক্ষের আছে। কিন্তু বর্ত্তমান (বি) যুক্ত সরকার—প্রথম হইতেই কেবল শ্রমিক স্বার্থই দেখিতে এবং শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার বে-আইনী কার্য্য কলাপ, কেবল সমর্থনই নহে, নানা ভাবে তাহাতে উৎসাহ দান করিতেও পরম তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। এমন কি, পুলিস-মন্ত্রীর দপ্তরে শ্রম-মন্ত্রীর আদেশ নির্দ্দেশও পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়া লইলেন!

বিচারাধিকরণের ভূমিকা কী? রায় এক বাক্যে যাহা বলিয়া দিয়াছে, কবির ভাষায় তাহাকে রূপান্তরিত করিলে বলা যায় "নিত্য জাগরণ।" বিচারালয়গুলি কেবল বিধিভুক্ত কয়েকটি "কোড" আর স্ট্যাটিউটের অছি নহে, জাতির জাগ্রত বিবেকও বটে। জনচিত্তে ধর্মাধিকরণের এমনই অধিকার যে, তাহার আহ্বান, আবেদন বা বাণীর প্রভাব না পড়িয়া পারে না। সাময়িক বিক্ষোভ বা অবস্থিতির মুহূর্তে তথাকথিত জনপ্রিয়তার হানিও যদি ঘটে, সেই ঝুঁকি লইবার সাহস বিচারাধিকরণেই আছে

ইলিয়া এরেনবুর্গ

অশোক সেন

[দীর্ঘদিন রোগে ভোগবার পর ছিয়াত্তর বছর বয়সে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৭, বিখ্যাত রাশিয়ান সাহিত্যিক এরেন বুর্গের মৃত্যু হয়েছে।

১৯০৬ সালে তিনি বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন। ১৯০৫-১৯০৭ সালে যে প্রথম রাশিয়ান বিপ্লব হয়েছিল তাতেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৮ এ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি পরে পালিয়ে প্যারিসে চলে যান। ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ সাল অবধি সেখানে থাকেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি প্যারিসে রাশিয়ান প্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন। বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে ফিরে যান; আবার প্যারিসে আসেন ১৯২১ সালে ফ্রান্সে ইজভেস্তিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে। থারটিজের শুরুতে পুনরায় সোভিয়েট ইউনিয়নে চলে যান।

স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারের সময় (১৯৩৬-৩৭) এরেন বুর্গ স্পেনে ছিলেন রাশিয়ান করেসপনডেন্ট হয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন প্যারিসে। এই যুদ্ধের সময়টায় তিনি সোভিয়েট কাগজগুলোর প্রতিনিধি হিসাবে যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি ওয়ার্লড পিস্ কাউনসিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তাঁকে ইন্টারন্যাশনাল লেনিন পিস্ প্রাইজ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তাছাড়া দু'বার তিনি ইউ-এস-এস আর ষ্টেট্ প্রাইজও পেয়েছিলেন।

এরেনবুর্গের আত্মজীবনী মস্কোতে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে একটা বিরাট সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

আত্মজীবনীর থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে অনুবাদ করে তুলে দিলাম :—]

'বিগত পঞ্চাশ বছরের ভেতর মানুষ এবং নানা ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণা বহুবার পাল্টেছে। আমাদের অজান্তেই আমাদের ভেতরকার আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি আমাদের মনে বিস্মৃতির সৃষ্টি করে—কারণ অতীতের স্মৃতিকে জাগ্রত রাখলে মানুষের এগিয়ে চলবার পক্ষে বাধা হয়। আমার ছেলেবেলায় একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল—যারা সব কিছু স্মরণ করে রাখে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই এক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে পড়ে।' পরে আমি নিজেও চিন্তা করে দেখেছি যে আমাদের যুগে স্মৃতির বোঝা সঙ্গে করে এগিয়ে চলা যে কোন লোকের পক্ষেই একটা নির্যাতনের মত ব্যাপার ছিল। সে সব ঘটনায় বিভিন্ন নেশনরা পর্যন্ত বিরাটভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল, যেমন ধরুন দুটি বিশ্বযুদ্ধ—তারাও গিয়ে আশ্রয় পেল ইতিহাসের পাতায়। আজকের দিনের বিভিন্ন দেশের প্রকাশকেরা বলতে শুরু করেছেন: যুদ্ধের বই আর বিক্রি হয়না।' অতীতকে কিছু লোক ভুলে গেছেন, বাকী লোকেরা অতীত সম্বন্ধে কিছু জানতে চান না। প্রত্যেকেরই দৃষ্টি সামনের দিকে—সেটা একপক্ষে ভাল।

প্রত্যক্ষ সাক্ষীরা যখন নির্বাক হয়ে থাকেন, তখনই লোককাহিনীর সৃষ্টি হয়। আমরা সময় সময় প্রচণ্ড বেগে "বাস্তিল আক্রমণের" কথা বলে থাকি যদিও প্রকৃতপক্ষে কোন লোকই প্রচণ্ড ভাবে বাস্তিল আক্রমণ করেনি— ১৪ই জুলাই ১৭৮৯ দিনটা ছিল ফরাসী-বিপ্লবের অন্যান্য ঘটনার মত একটি ঘটনা। প্যারিসের লোকেরা কারাগারে ঢুকতে কোন বিশেষ বাধা পায়নি—ভেতরে গিয়ে তারা

অবশ্য খুব কম সংখ্যক কয়েদীকেই দেখতে পেয়েছিল। তবুও বাস্তিল অধিকারের দিনটা বিপ্লবীদের জাতীয় দিবসে পরিগণিত হয়েছিল।

লেখকদের চেহারা পরবর্তীকালের লোকেদের কাছে তৈরী করে তুলে ধরা হয়—সময় সময় এই গঠিত রূপটি আসল সত্যিকার রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ষ্টেন্ধলকে তাঁর পাঠকেরা জানতেন "আত্মবাদী" হিসাবে অর্থাৎ ষ্টেন্ধল যেন নিজের সমস্ত অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা নিয়েই মগ্ন হয়ে থাকতে ভালবাসতেন। অথচ আসলে ষ্টেন্ধল ছিলেন সমাজপ্রিয় মিশুকজাতের লোক—স্বার্থপরতাকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। [ষ্টেন্ধল—১৭৮৩-১৮৪২, বিখ্যাত ফরাসী প্রবন্ধকার এবং ঔপন্যাসিক। বালজাক, মেরিমি, টেইন ও রেনা তাঁর শিষ্যস্থানীয়—ডষ্টয়ভস্কি এবং দার্শনিক নিৎসেও তাঁর লেখার দ্বারা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর লেখাতেই প্রথম চরিত্রের মনঃসমীক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় টুর্গেনেভ ফ্রান্সকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন—কেননা, তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ ঐ দেশেই কেটেছিল, তাছাড়া তিনি ছিলেন ফ্লবেয়ারের বন্ধু, কিন্তু আসলে ফ্রেঞ্চদের তিনি ঠিকমতন বুঝতেন না, তাই মনে মনে তাদের অপছন্দই করতেন। (টুর্গেনেভ') ১৮১৮-৮৩, প্রখ্যাত রাশিয়ান ঔপন্যাসিক)। কেউ কেউ মনে করেন 'নানা'র লেখক জোলা নিশ্চয় জীবনের নানা ধরণের প্রলোভনকে কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, আবার অন্যদের ধারণা—অর্থাৎ ড্রেফুজ কেসে জোলার ভূমিকা যাঁদের স্মরণে আছে—তিনি জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং লোকনেতা শ্রেণীর। কিন্তু আসলে জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি সমাজের ঝড় ঝাপটার থেকে দূরে থাকতেন। (জোলা: ১৮৪০-১৯০২ : বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাসিক) গোর্কী ষ্ট্রীট দিয়ে চলতে গেলেই একটি ব্রোঞ্জের পুরুষমূর্ত্তি আমার চোখে পড়ে—মূর্ত্তিটির দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা ভয়ানক রকম ঔদ্ধত্যের ভাব—প্রত্যেকবারই এই মূর্ত্তিটি দেখে আমি মনে মনে অত্যন্ত বিস্মিত হই—কারণ মূর্ত্তিটি হচ্ছে মায়াকোভিস্কির (সোভিয়েট রাশিয়ার সব চেয়ে বড় কবি।) —মানুষ হিসাবে যে মায়াকোভিস্কিকে আমি জানতাম তার সঙ্গে এ মূর্ত্তিটির কত প্রভেদ।

একথা আমাদের অজানা নয় যে যখন স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীরা এসে বিবরণ দেন। তাঁদের বর্ণনার ভেতর কোন মিল থাকে না। স্মৃতিচারণের লেখকেরা যদিও দাবী করেন যে, যেসব ঘটনার কথা তাঁরা লিখছেন তার নিছক সত্যিকার বিবরণই তাঁরা দিচ্ছেন, আসলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় —যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা ঘটনাগুলোকে দেখেছেন, তারই রূপায়ন—। মেরিমি (১৮০৩-৭০, ফরাসী প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক) ছিলেন ষ্টেন্ধলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—কিন্তু যে ভাবে তিনি ষ্টেন্ধলের পরিচয় দিয়ে গেছেন, অর্থাৎ তাঁর মতে ষ্টেন্ধল ছিলেন বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন উপহাসপ্রিয় এবং আত্মকেন্দ্রিক—তা পড়ে আমরা ধারণাও করতে পারতাম না এই জাতীয় লোক কি করে মানুষের মহৎ এবং প্রচণ্ড আবেগ এবং ভাবোচ্ছ্বাসের বর্ণনা করতে পারলেন। আমাদের ভাগ্যবশতঃ ষ্টেন্ধল তাঁর ডায়েরী-গুলো রেখে গেছেন উত্তরকালের পাঠকদের জন্য। ১৫ই মে ১৮৪৮-এ প্যারিসে যে প্রচণ্ড রাজনীতিক ঝড় উঠেছিল তার বর্ণনা করে গেছেন ভিক্টর হিউগো, হারজেন এবং টুর্গেনেভ, এই সব লেখা পড়ে আমার মনে এইভাব আসে যেন এঁরা তিনজন, বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা করছেন। সময় সময় অনুভূতি এবং চিন্তার তারতম্যের থেকেই বর্ণনার ভেতর বৈষম্য দেখা দেয়। আবার সাধারণ বিস্মৃতির ফলেও এটা ঘটতে পারে। চেখভের মৃত্যুর দশবছর বাদেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের ভেতর তর্ক লেগে যেত তাঁর চোখের রং নিয়ে—কেউ বলতো "বাদামী" কেউ কেউ মত দিতেন "ধূসর", আবার এক একজন বলতেন—"না নীল"।

আমাদের স্মৃতি কিছু কিছু জিনিসকে রেখে দেয় এবং বাকীগুলোকে ত্যাগ করে। আমার শৈশবের এবং কৈশোরের কোন কোন ঘটনার ছবিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার স্মরণে আছে—এগুলো যে আমার জীবনের পরম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। তা কিন্তু নয়, কিছু কিছু লোককে আমি চিনতে পারি—আবার অন্যদের একবারেই

ভুলে যাই। আমাদের স্মৃতিশক্তিটা হচ্ছে রাত্রে চলমান গাড়ীর ফুটলাইটের মত। কখনও তার আলো গিয়ে পড়ে একটা গাছের উপর, কখনও কোন কুড়েঘরের উপর, আবার কখনও একজন মানুষের গায়ে। জীবনস্মৃতি লিখতে গিয়ে লেখকেরা সত্যের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে ফেলেন। ইচ্ছে করে যে করেন তা নয়—যেসব জায়গায় স্মৃতিশক্তি অকার্যকরী হয় লেখকের অজান্তে কল্পনাশক্তিই সেসব ফাঁকগুলো ভরে দেয়।

(২)

১৮৯১ সালের ১৪ই জানুয়ারী কিয়েভে আমার জন্ম হয়। এই সালটি রাশিয়ান জনসাধারণ এবং ফরাসী মদ্যনির্মাতাদের চিরকাল মনে থাকবে। এই বছর রাশিয়াতে দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা; উনত্রিশটি প্রদেশে শস্যের ফলন হয়নি। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন টলস্টয়, চেখভ ও কোরোলেঙ্কো—তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন বন্যার্তদের পক্ষে অর্থসংগ্রহ করবার জন্য, সুপ্ কিচেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বুভুক্ষুদের ক্ষুধা মেটবার উপায় হিসাবে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা যেন সমুদ্রে এক ফোঁটা জল ফেলবার মতই দেখাচ্ছিল—পরে বহু বৎসর অবধি ১৮৯১ সালটিকে বলা হোত 'বুভুক্ষার বছর'। ফরাসী মদ্যনির্মাতারা সে বছর প্রচুর অর্থ উপার্জন করল। অনাবৃষ্টিতে শস্য শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এতে ভালজাতের আঙুরের ফলন হয়। অর্থাৎ ভল্গা এলাকার চাষীদের ভাগ্যাকাশে যখন কাল মেঘের আবির্ভাব হয়, তখন বারগাণ্ডি এবং গ্যাসকনির মদ-নির্মাতাদের আসে সুখের দিন। নাইন্টিন টোয়েন্টিয়েথ মদ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা ১৮৯১ সালের তৈরী মদ খুঁজে বেড়াতেন—এ থেকেই বোঝা যাবে ১৮৯১-এর তৈরী মদ কতোটা সেরাজাতের বলে বিবেচিত হত।

১৮৯১……আজ মনে হয় এটা কত কাল আগেকার কথা! রাশিয়ার শাসনকর্তা তখন এ্যালেকজাণ্ডার দি থার্ড। বৃটিশ রাজসিংহাসনে তখন বসেছেন রাণী ভিক্টোরিয়া—তাঁর মন জুড়ে আছে এই সব চিন্তা—সেবাস্তপোলের অবরোধ এবং আক্রমণ, গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতাবলী, ভারতবর্ষকে কি ভাবে সম্পূর্ণরূপে অবনমিত করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর নাটক এবং প্রহসনের নায়কেরা তখন পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন—বিসমার্ক, জেনারেল গ্যালিফেট্, আবিষ্ট রাশিয়ার বিখ্যাত রাজনীতিক ইগ্নাটায়েভ, মার্শাল ম্যাকমোহন, ভগ্ট্ (যাঁকে আমাদের ছাত্ররা জেনেছে কার্ল মার্কসের প্রচার-পুস্তিকা থেকে)। ইন্‌গ্লস্‌ও তখন বেঁচে আছেন। পাস্তুর, মেচেনভ্, মপাঁসা, চায়কোভিস্কি এবং ভারডি, হুইটম্যান ও লুইসি মাইকেল তখনও কাজ করে চলেছেন। গন্চারভ ১৮৯১ সালে মারা গেলেন।

উপর উপর দেখলে ১৮৯১-এর পর আজকের পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্যারিসে তখন নিওন লাইট বা মোটরগাড়ী ছিল না। মস্কোকে বলা হোত একটা বড় গ্রাম।

জোলিও কুরি, ফার্মি, মায়াকোভস্কি, এলুয়ার্ড এঁদের কারোরই তখনও জন্ম হয়নি। হিটলার মাত্র দু'বছরের বালক। বাইরে থেকে পৃথিবীকে দেখে মনে হত চারদিকে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছে। কোথাও যুদ্ধের নামগন্ধও নেই। ইটালী শুধু প্রাথমিক-ভাবে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে ইথিওপিয়ার উপর। ফ্রান্স ভেতরে ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত করছিল ম্যাডাগাস্কারকে আয়ত্তাধীনে আনবার জন্যে।

এই সময়টায় রাশিয়া সম্পূর্ণ অচঞ্চল এবং স্থির হয়ে ছিল। ন্যারোদ্‌নায়া ভলিয়াকে ('পিপল্‌স্ উইল,' রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহাত্মক সংগঠন—১৮৭৯-১৮৮৭) সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবার পর এ্যালেকজাণ্ডার দি থার্ডও শান্তমূর্তি ধারণ করেছিলেন। সত্যি বটে, মে ডে'তে পিটার্সবার্গে একটি ছোটখাট ডেমন্সট্রেশন করা হয়েছিল। একথাও সত্যি সামারাতে এই সময় লেনিন নিবিষ্ট মনে মার্কসিজম অধ্যয়ন করছিলেন। কিন্তু এ

সব কারণে সর্বশক্তিমান আর বিব্রত বোধ করবেন কেন?

না, ১৮৯১ সালটা এমন কিছু দীর্ঘ অতীত নয়। যেসব মানুষ ১৮৯১ সালে জন্মেছেন অর্থাৎ যে বছরটায় রাশিয়াতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং ফ্রান্সে সবসেরা মব তৈরী হচ্ছিল—তাঁদের সুযোগ হয়েছে বহু বিদ্রোহ এবং নানা যুদ্ধবিগ্রহ দেখবার, তাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে স্পুটনিক. ভার্দুন, ষ্টালিনগ্রাড, অস্কউইট্‌জ, হিরোশিমা, আইনষ্টাইন, পিকাশো, চ্যাপ্‌লিন প্রভৃতির খোঁজখবর এবং পরিচয় পেতে। ১৮৯১ সালের ১৯ই জানুয়ারী—অর্থাৎ যেদিন থাড়া ইন্স্‌টিটুট্‌স্কায়া ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে আমি প্রথম চোখ মেলে পৃথিবীর আলো দেখলাম, ঠিক সেইদিনই পিটার্সবার্গে চেখভ তাঁর বোনকে চিঠি লিখছিলেন: আমার চারদিক ঘিরে রয়েছে ঘন দুরভিসন্ধির পরিবেশ—এ ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং আমার পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। আমার সম্মানে এরা আমাকে নৈশ আহারের নেমন্তন্ন করে—আমার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে—আমি অবশ্য এ প্রশংসার কোন স্বাদ গ্রহণ করতে পারিনা। কারণ আমি জানি এই একই সময়ে জীবন্ত আমাকে গিলে খেয়ে ফেলবার জন্যও এরা প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু কেন? এর উত্তর একমাত্র শয়তানই দিতে পারে। আমি যদি নিজেকে গুলি করতাম, তাহলে আমার বেশীর ভাগ বন্ধুবান্ধব এবং আমার ভক্তের দল গভীর আনন্দ উপভোগ করতেন। কত ক্ষুদ্রভাবে এঁরা এঁদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনোভাবের কথা প্রকাশ করে থাকেন। একটি প্রবন্ধে বুরেনিন আমাকে আক্রমণ করেছেন—যদিও এ নিয়ম কোথাও প্রচলিত নয় যে, যে-কাগজে আমি সব সময় লিখি, সেই কাগজেই কেউ আমার বিরুদ্ধে লিখবে।' চেখভ সম্বন্ধে বুরেনিন কি বলে-ছিলেন? "এই জাতের মাঝামাঝি ক্ষমতার অধিকারী লেখকেরা তাদের চারপাশের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তাদের পা তাদের যেদিকে টেনে নিয়ে যায় সেদিকেই পালিয়ে বেড়ায়।" ১৮৯১ সালে চেখভ তাঁর বড় গল্প 'দি ডুয়েল' লিখতে শুরু করেন। চেখভের পড়া গল্পগুলোকে আমি অনেক সময়েই আবার নূতন করে পড়ি। সম্প্রতি 'দি ডুয়েল' গল্পটি আবার পড়লাম। অবশ্য যে সময়ে লেখা সে সময়ের ছাপ গল্পটিতে আছে। নায়ক লায়েভ্‌স্কি প্রাদেশিক জীবনে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছিলেন এবং স্বপ্ন দেখছিলেন পিটার্সবার্গে ফিরে যাবার। "যাত্রীরা ট্রেনে ব্যবসা বিষয়ে, গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে এবং ফ্র্যাঙ্কো-রাশিয়ান আঁতাত সম্বন্ধে আলোচনা করে, চারপাশেই অনুভব করা যায় একটা প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, শিক্ষিত, উদ্দাম জীবনীশক্তি......' কিন্তু ফ্র্যাঙ্কো-রাশিয়ান প্রীতির সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার কথা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির ইতিহাস জানবার জন্য আমার 'দি ডুয়েল' গল্পটি পড়বার দরকার হয় না। এ গল্পটি যখনই পড়ি অন্য আর একটি বিষয়ের চিন্তা আমার মনে দেখা দেয়—সে হচ্ছে আমার নিজের জীবনের কথা।

ঐ গল্পটির শেষে লায়েভ্‌স্কি এবং সেইসঙ্গে চেখভও ঝড়ের দ্বারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে দেখতে দেখতে ভাবতে থাকেন "ধাক্কা খেয়ে নৌকোটা ফিরে আসে, দু'পা এগিয়ে যায় তো এক পা পেছিয়ে আসতে থাকে, কিন্তু দাঁড়ীদের মনে অদম্য তেজ, তারা অক্লান্তভাবে দাঁড় টেনে চলেছে—বড় বড় ঢেউ দেখে তারা মোটেই ঘাবড়ে যাবার মত নয়। নৌকোটা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, এরপর ওটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর আধ ঘন্টার ভেতর দাঁড়ীরা জাহাজের আলো দেখতে পাবে এবং এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের পাশে ঝোলানো মইয়ের গায়ে গিয়ে লাগবে। মানুষের জীবনেও এমনটাই ঘটে......সত্যের সন্ধানে দু'পা এগিয়ে গেলে এক পা পেছিয়ে পড়ে। দুঃখ-যন্ত্রণা, ভুল ভ্রান্তি এবং জীবনের একঘেয়েমী তাদের পেছিয়ে আনে। কিন্তু সত্যের জন্য ব্যাকুলতা এবং অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি আবার তাদের সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে দেয়। কে বলতে পারে যে নৌকোর তারা আরোহী সেই নৌকোই হয়তো তাদের আসল সত্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে।

আগেই বলেছি চেখভ 'দি ডুয়েল' লিখতে শুরু করেন ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে। আমার জীবনের পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই আমার চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্খা, সংশয় প্রভৃতির সঙ্গে চেখভের তখনকার মনোভাবের বেশ একটা সাদৃশ্য আছে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ধারে বসে নৌকো দেখতে দেখতে লায়েভ্স্কির মনে যেসব চিন্তা ভাবনা দেখা দিয়েছিল আমারও মনে সে সব ভাবনা আসে--তারই মত আমিও ভুলভ্রান্তির ফলে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, তারই মত অনমনীয় দাঁড়ীদের সমুদ্রের বিরাট ঢেউগুলোর সঙ্গে সংগ্রামের দৃশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আজকের দিনে বড় বড় মহাদেশগুলো পর্যন্ত শহরতলিতে এসে পর্যবসিত হয়েছে—এমন কি চাঁদটাও যেন কিছুটা কাছে এসে গেছে। তা সত্বেও অতীত কিন্তু তার শক্তি হারিয়ে ফেলেনি। এক জীবনে মানুষ তার উপরের আস্তরণটা হয়তো অনেকবারই বদলাচ্ছে—যেমন পরিধানের পোসাকপত্র সে বদলিয়ে থাকে—কিন্তু তার অন্তরটা কখনও বদলায় না—সে দিকটা সব সময়েই এক রকম থাকে।

(৩)

প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, আপেল ফল যখন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তখন গাছটির কাছাকাছি জায়গাতেই আশ্রয় নেয়। কোন কোনও সময় তাই হয়, আবার কোন কোনও সময় তার উল্টোটাই ঘটে। খবরের কাগজে পড়েছি 'ছেলে বাপের কাজের জন্য দায়ী নয়, কিন্তু সময় সময় ছেলেকে তার ঠাকুর্দার কাজের জন্যও দায়ী হতে দেখেছি।

ঠাকুর্দাকে তাঁর নাতি-নাতিনীদের দিয়ে বিচার করলে ঠিক সুবিচার হয় না। কয়েক বছর আগে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম তাতে টলষ্টয়ের নাতি-নাতিনী এবং তাঁদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল—এঁদের সংখ্যা প্রায় আশি, পৃথিবীর সর্বত্র এঁরা ছড়িয়ে আছেন—এঁদের একজন হচ্ছেন আমেরিকান আর্মি অফিসার, অপর একজন ইটালীয়ন টেনর (অর্থাৎ চড়া সুরের গাইয়ে) তৃতীয় একজন ফরাসী এয়ারলাইনে কাজ করেন।

কবি ফেট আফানেসী—আফানেসীভিচ সেনসিন ভাল পদ্য রচনা করতেন—কাটকোভের জার্ণালে তাঁর যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত সেগুলো অবশ্য তত ভাল নয়। তাঁর রচনায় প্রচণ্ড আক্রমণ থাকতো নিহিলিষ্ট এবং জুদের বিরুদ্ধে—তাঁর মতে এরাই হচ্ছে যত কিছু নষ্টের গোড়া। ফেটের ভাগ্নে এম পি পুজিন একবার আমাকে বলেছিলেন যে মারা যাবার অল্প কয়েকদিন আগে একটি চিঠি থেকে ফেট জানতে পারেন—এটিকে তাঁর মায়ের শেষইচ্ছাপত্রও বলা যেতে পারে—যে তাঁর বাবা ছিলেন জাতে জু এবং তিনি হামবুর্গ থেকে এসেছিলেন! ফেট একথা কারোকে জানান নি এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে যান যেন এই পত্রটিকে তাঁর সঙ্গে কবরস্থ করা হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি পরবর্তীকালের লোকেদের কাছ থেকে লুকোতে চেয়েছিলেন কোন্ আপেল বৃক্ষ থেকে তিনি উদ্ভূত। বিপ্লবোত্তর যুগে কে একজন তাঁর কবর খুলে ঐ পত্রের সন্ধান পেয়েছিল।

টুর্গেনেভ বলেছেন: যে-পরিবেশে আমি জন্মেছিলাম এবং সেখানে বর্দ্ধিত হই সেখানে কিল, চড়, লাথি, মারামারি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এই পরিবেশের কোন প্রভাবই আমার ওপর পড়েনি—ঘুষোঘুষি মারামারি ব্যাপারটা আমার রুচির সঙ্গে কখনই খাপ খায়নি; আমি জীবনে কারোর গায়ে হাত তুলিনি। টুর্গেনেভ তাঁর রাশিয়ান দুহিতা পেলাগেয়াকে ফরাসী পলিনে রূপান্তরিত করে তার বিয়ে দেন এম গ্যাস্টো ব্রুয়ের-এর সঙ্গে—ইনি ছিলেন গ্লাস ফ্যাক্টরীর মালিক। এরপর টুর্গেনেভ একটি চিঠিতে আনেকভকে লিখেছিলেন: "অনেক রকম হাঙ্গামা ভোগের পর আমি শেষ পর্যন্ত সত্যিকার প্রতিদান পেয়েছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মেয়ে সুখী হবে।' (তারপর টুর্গেনেভ 'স্মোক' লিখতে শুরু করেন এবং এই লেখাটিতেই একজন বিবাহিত মহিলার দুর্ভোগের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।)

আমার নিজের বাবা-মার কথা যখনই স্মরণ হয় আমার মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে গেলেই আমি বুঝতে পারি আমি-রূপ-আপেলটি মূল গাছ থেকে (অর্থাৎ আমার বাবা-মার প্রকৃতি) কতদূর গড়িয়ে সরে এসেছে।

আমার পাঁচ বছর বয়সের সময় আমরা কিয়েভ থেকে মস্কোয় চলে এলাম। 'দি খামোভ্‌নিকি ব্রুয়ারিটি' (যেখানে মদ চোলাই হয়) নামে ছিল শেয়ার হোল্ডারদের কম্পানি—আসলে এর মালিক ছিলেন কিয়েভের বিখ্যাত ধনী ব্রড্‌স্কি, আমার বাবা এসেছিলেন ব্রুয়ারির ম্যানেজার হয়ে।

আমার ছেলেবেলায় মস্কোতে জু'দের প্রতি কোন বিরূপতা বা বিদ্বেষ চোখে পড়েনি। হয়তো কোন কোন শিক্ষক বা ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের বাপ-মার ভেতর জাতি-বর্ণ সম্পর্কে এ ধরণের কুসংস্কার ছিল—কিন্তু তাঁরাও কখনও নিজেদের মনোভাব বাইরে প্রকাশ করতেন না। সেই সময়ে সমাজের বুদ্ধিশালী সম্প্রদায় 'জু বিদ্বেষকে' একটা ঘৃণ্য রোগের মত বিবেচনা করতেন।

বাড়ীর জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগতো। অভ্যাগত যাঁরা আসতেন তাঁরা কৃষ্ট্‌ম্যান ভগ্নাদের অদ্ভুত কলোরাটুরা (সোপ্রানো) কণ্ঠস্বরে কথা বলতেন। বলতেন-ড্রুফুজের ডিফেন্সে আইনজ্ঞ লাবোরী কি মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা করেছেন। তাঁদের কথাবার্তা থেকেই জানতে পারতাম মস্কোতে একটি নতুন রেস্তোঁরা খুলেছে যাতে প্রাইভেট রুম্‌স আছে। কে এক মাদাম মল্‌ব্রান্স নাকি প্যারিস থেকে নতুন হ্যাটের মডেল আনিয়েছেন। জুডারম্যানের প্রহসন, আর্ট থিয়েটারের উদ্বোধন (এখানেই প্রথম সাধারণ লোকের জন্য সস্তা টিকেটের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল), ইত্যাদি বিষয়েও এঁরা আলোচনা করতেন।

ড্রয়িং-রুমের থেকে ব্রুয়ারি ইয়ার্ডই আমাকে বেশী আকর্ষণ করতো। আমাদের ড্রয়িং রুমের এক এক কোণায় কাঠের টবে বসানো ধুলোমাখা পাম্‌গাছগুলো সাজানো থাকতো। লোমোনসভ্‌ মস্কোতে তাঁর ষ্টাডিতে যাচ্ছেন—এই ছবিটির একটি কপি দেয়ালে টাঙানো ছিল। ড্রয়িংরুমের থেকে আস্তাবলে গিয়ে আমি বেশী আনন্দ পেতাম—ওখানকার গন্ধটাও আমার ভাল লাগতো—প্রত্যেকটি ঘোড়ার বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র আমার নখ-দর্পণে ছিল। চল্লিশ গ্যালনের ব্যারেলগুলোতে যে কেউ অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারতো। একটি দোকানে মেটাল রডের ঘা দিয়ে বোতলগুলো পরীক্ষা করা হোত। এতে যে শব্দঝঙ্কারের সৃষ্টি করতো, আমাদের বাড়ীতে আগত অতিথিদের পিয়ানো সঙ্গীতের থেকে তা শুনতে আমার অনেক বেশী ভাল লাগতো। শ্রমিকেরা অন্ধকার ব্যারাকে তক্তার উপর গাদাগাদি ভাবে শুয়ে ঘুমোতো। তাদের গায়ে থাকতো ভেড়ার চামড়ার পোষাক। এদের পানীয় ছিল সস্তা জাতের টক্‌ বিয়ার—এরা অবসর কাটাতো তাস খেলে, গান গেয়ে এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলে। এদের বেশীর ভাগই ছিল অক্ষরপরিচয়হীন—যারা সামান্য পড়তে পারতো তারা শব্দগুলোকে ভেঙে ভেঙে মস্কোভ্‌স্কি লিস্টক (মস্কো সিট্‌—সস্তাজাতের রোমাঞ্চকর খবরের কাগজ) থেকে পাঁচমিশালি খবর চিৎকার করে পড়তো। শ্রমিকদের পৈশাচিক ধরণের আমোদ-প্রমোদ করবার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটি ইঁদুরের গায়ে পেরাফিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল—ইঁদুরটার সবাঙ্গে আগুনের শিখা, যন্ত্রণায় সেটা চক্রাকারে ঘুরছিল—আর তাই দেখে এদের কি আনন্দ। এই সব শ্রমিকদের অন্ধকারে ভরা ভয়াবহ জীবনযাত্রা দেখে আমি শিউরে উঠতাম—ভাবতাম দুই স্তরের জীবনের ভেতর কত বৈষম্য—একটি স্তর হচ্ছে এই শ্রমিকশ্রেণী অর্থাৎ যারা ব্যারাকবাসী, অন্য স্তরটি বুদ্ধিশালীর দল—যারা ড্রয়িং রুমে কলোরাটুরা কণ্ঠস্বরের আলোচনা করতো।

ব্রুয়ারির অন্যদিকে ছিল পাঁচিল-ঘেরা পাগলা গারোদ। সময় সময় দেয়ালের উপর উঠে বসে আমি ভেতরের দিকে নজর দিয়ে দেখতাম—ড্রেসিং-গাউন পরা জীর্ণশীর্ণ লোকগুলো এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতো। কোন তত্ত্বাবধান-কারী হয়তো একটি রুগীর কাছে গিয়ে হাজির হল—আর অমনি পাগলটি তারস্বরে চিৎকার সুরু করে দিত। একদিন মদ-চোলাইকারী কারার ছেলে কাটারির আঘাতে তার মা এবং দুটি বোনকে মেরে ফেলল। সে তার প্রেমিকা এক মস্কো-সুন্দরীর জন্য একটা দামী নেকলেশ কেনবার ইচ্ছায় বাপ-মায়ের কাছে টাকা চেয়েছিল, তারা টাকা না দেওয়াতেই এই বীভৎস কাণ্ডটা ঘটলো। এ ব্যাপার নিয়ে লোকেদের টুকরো টুকরো মন্তব্য এখনো আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে—"জায়গাটা মা-বোনেদের রক্তে একেবারে

ভেসে যাচ্ছিল···ছেলেটা বাপ-মায়ের কাছে পাঁচশো রুবল চেয়েছিল···ছেলেটা মেয়েটাকে পাবার জন্য একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল।" প্রত্যেকেই অবশ্য খুনে ছেলেটার উদ্দেশ্যে গালমন্দ করতো। আমার কিন্তু প্রায়ই ওর রুগ্ন চেহারার কথা মনে হোত—নিজে নিজেই ভাবতাম, বয়স্ক লোকেরাও মানুষের মনের সম্বন্ধে কতটুকু খোঁজ রাখেন।

ক্রুয়ারির পাশেই ছিল লিও টলষ্টয়ের বাড়ী। প্রায়ই দেখতাম খামোভ্‌নিসেস্কি বঝেনিনভস্কি লেন দিয়ে তিনি হেঁটে চলে যাচ্ছেন। এইসময় এক কপি 'চাইল্ডহুড এণ্ড বয়হুড, আমার হাতে এসেছিল—বইটি আমার একঘেয়ে লাগল। এক সেট পুরানো নিভাস (অর্থাৎ যার ইংরাজী মানে হচ্ছে হারভেষ্ট—জনপ্রিয় পত্রিকা) পেলাম আমাদের কাঠ বোঝাই ঘরটি থেকে—এতে 'রেসারেকসন' উপন্যাসটি ছিল। আমার মা বলেছিলেন—ও উপন্যাস পড়বার মত তোমার বয়স হয়নি।' উপন্যাসটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। এরপর মনে হল 'সামগ্রিক সত্য' বলতে যা কিছু বোঝায় তা সবই টলষ্টয়ের জানা হয়ে গেছে। আমার বাবা 'টলষ্টয়ের আবেদন' আমাকে কপি করতে দিলেন। এই "আবেদনটি" সরকারী আধিকারিকের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছিল। এতে আমি খুব গর্বিত বোধ করেছিলাম এবং পরিচ্ছন্নভাবে ব্লক লেটারে 'আবেদনটি কপি করে দিয়েছিলাম।

একবার টলষ্টয় আমাদের চোলাইখানায় এসেছিলেন। কিভাবে বিয়ার তৈরী হয়, তিনি দেখতে চাইলেন। তাঁর পেছনে পেছনে আমি শপে শপে ঘুরলাম। এই বিখ্যাত সাহিত্যিক আমার বাবার থেকে লম্বায় ছোট দেখে, কেন জানিনা আমার মনে মনে বেশ কষ্ট হয়েছিল। টলষ্টয়কে এক মগ্‌ গরম বিয়ার পান করতে দেওয়া হল—মগে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন বেশ জিনিস!—একথা শুনে আমার খুবই অবাক লাগল। এরপর টলষ্টয় হাতের পাতা দিয়ে দাড়ি মুছে নিলেন। তিনি আমার বাবাকে বোঝালেন যে ভড্‌কার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে 'বিয়ার' আমাদের সাহায্য করতে পারে। টলষ্টয়ের এই মন্তব্য সম্বন্ধে পরে আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলাম—আমার মনে হয়েছিল, টলষ্টয়ও সম্ভবত সর্বজ্ঞ নন। এর আগে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মিথ্যাকে হটিয়ে, সে জায়গায় সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য আর সেই টলষ্টয় কিনা বললেন ভড্‌কাকে সরিয়ে সে জায়গায় বিয়ারের প্রচলন করতে! ভড্‌কা সম্বন্ধে শ্রমিকদের কাছে যা শুনেছি তাছাড়া আমার কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিলনা। এটি ছিল—তাদের অত্যন্ত প্রিয় পানীয়। বিয়ার পানে আমার কোন বাধা নিষেধ ছিলনা —কিন্তু এই পানীয়টি আমার মোটেই ভাল লাগে নি। এক এক সময় আমাদের চোলাইখানাতে অশান্তির আগুন ধূমিয়ে উঠতো। লোকেরা বলাবলি করতো যে ছাত্রের দল কুচ্‌-কাওয়াজ করতে করতে টলষ্টয়ের বাড়ীর দিকে আসছে। চারদিকের দরজায় তালা এঁটে প্রহরী বসিয়ে দেওয়া হোত। আমি লুকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ঐ সব রহস্যজনক ছাত্রদের আসবার জন্যে অপেক্ষা করতাম—কিন্তু কেউ আসতো না। মাঝে মাঝে কিছু ছাত্র আমার বোনেদের সঙ্গে দেখা করতে আসতো। কিন্তু আমার মনে হোত এরা মেকী ছাত্র। এরা খুব শান্ত ভাবে চা পান করতো, ইবসেনের নাটকের আলোচনা চালাতো এবং নাচতো—আমরা জানতাম যারা আসল ছাত্র তাদের ব্রত হচ্ছে কসাক্‌দের ঘোড়া থেকে ফেলে দেওয়া এবং জারকে সিংহাসনচ্যুত করা।

আসল ছাত্রেরা কখনও আসে নি। আমার শৈশবে আমি অনিদ্রারোগে ভুগতাম। নিদ্রাহীন রাতগুলোতে যে-সব মানসিক ছবি দেখতাম তা আমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে রয়েছে: টলষ্টয় হাতের পাতা দিয়ে দাড়ি মুছে নিচ্ছেন, যুবক কারা হাতে তার কাটারী—তার প্রিয়া ল্যাক্‌মে, পাগলা গারদের পাগলগুলো আর সেই জলন্ত ইঁদুরটার চক্রাকারে আবর্তন! ক্রমশঃ

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

আর্থিক মন্দা : (Recession) ইহার গতি ও প্রকৃতি

গত বৎসরাধিক কাল ধরে দেশে যে আর্থিক মন্দা সুরু হয়েছে তার সত্যকার গতি বা প্রকৃতির কোনো সম্যক বিশ্লেষণ আজিও হয় নি। অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই মন্দার প্রধান কারণ খাদ্যশস্যের সরবরাহে প্রভুত পরিমাণ ঘাট্‌তি। গত দুই বৎসর ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদনে অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে যে প্রভুত পরিমাণ ঘাট্‌তি ঘটে এসেছে, সরকারী বিচার অনুযায়ী সেই কারণেই এই আর্থিক মন্দার (recession) সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান বৎসরে আশানুরূপ বৃষ্টি হবার ফলে খুব ভাল ফসলের নির্ভরযোগ্য আশা পাওয়া গেছে, এবং সরকার পক্ষ থেকে আশ্বাস জ্ঞাপন করা হয়েছে যে নূতন ফসল ওঠবার পর এবং খাদ্য শস্য সরবরাহে পুনর্ব্বার চাহিদা পূরক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ধীরে ধীরে এই মন্দার অবস্থা থেকে পুনরায় প্রগতিসূচক আর্থিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তাঁরা আশা করেন। এই বিচার কতটা গ্রাহ্য তা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

অন্যদিকে দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর মুখপাত্র, ফেডারেশন অফ্ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অফ্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজএর তথ্যানুসন্ধান বিভাগ দ্বারা সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে খরা ও তজ্জনিত খাদ্যোৎপাদনে ঘাট্‌তির ফলে বর্ত্তমান আর্থিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছে একথা বিচার সাপেক্ষ নয়। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী মন্দার প্রধান কারণ মুদ্রাস্ফীতি ও সরবরাহের তুলনায় তজ্জনিত চাহিদা বৃদ্ধি।

চাহিদাভিত্তিক (demand induced) আর্থিক প্রয়োগের কারণে, ক্রম বর্দ্ধমান সরকারী ভোগব্যয় মেটাবার জন্য যে অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি ঘটান হয়েছে এবং তার ফলে পণ্যাদির সরবরাহের তুলনায় যে আত্যন্তিক চাহিদা বৃদ্ধি ঘটেছে, তার ফলে উৎপাদন ধারায় যে অনিবার্য্য সঙ্কোচ ঘটেছে, তারই ফলে বর্ত্তমান মন্দার সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে যে এই আত্যন্তিক সরকারী ভোগব্যয় এবং লগ্নীর একটা মোটা অংশ অপচয়সূচক হবার কারণে এই মন্দা আরো কঠিন আকার ধারণ করেছে।

এই অবস্থার প্রতিষেধক হিসাবে পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রকৃতিটিকে সংশোধন করে আর্থিক প্রগতির ধারাটিকে তার বর্ত্তমান চাহিদাভিত্তিক পথ থেকে সরিয়ে এনে বাস্তব উৎপাদন সার্থকতার পথে চালু করতে পারলে বর্ত্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার ব্যবস্থা হবে। বলা হয়েছে যে বর্ত্তমান মন্দার অবস্থাটি একটা সাময়িক এবং আকস্মিক অবস্থা মাত্র এবং কৃষি উৎপাদন সাফল্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এটি কেটে যাবে, একথা নিতান্তই ভুল;

আর্থিক উন্নয়নের ধারাটিকে উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থার ওপরে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে মুদ্রা তথা মূল্যস্ফীতির দুষ্ট-চক্রের পেষণ থেকে মুক্তি পাবার কোনই আশা নেই এবং বর্ত্তমান আর্থিক মন্দার চাপ হাল্কা হবারও আশা নেই।

বর্ত্তমান অবস্থাটির আরো বিশদ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এদেশের বিশিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থার কারণে মোট চাহিদা (aggregate demand) এবং কৃষিজ পণ্যের (farm product) চাহিদার মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে; মোট চাহিদা বৃদ্ধির অনুপাতেই কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং কৃষিজ পণ্যের সরবরাহের ঘাটতির আর্থিক অনুপাতেই কৃষিজ পণ্যের মূল্যস্ফীতিও ঘটে থাকে। এবং কৃষিজ পণ্যের মূল্যমান সাধারণ মূল্যমানটিকে অনিবার্য্য ভাবে প্রভাবিত করে থাকে, কেন না কৃষিজ মূল্যমানের দ্বারা শিল্পের উৎপাদন ব্যয় প্রভাবিত হয়।

এই মন্দার একটি সম্ভাব্য আপাতঃ প্রতিষেধক হিসাবে চাহিদার গতি নিয়মিত করবার প্রয়াস অন্ততঃ সাময়িক ভাবে কার্য্যকরী হবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ মোট চাহিদা বৃদ্ধি (aggregate demand) না ঘটিয়ে যদি যে সকল শিল্পে উৎপাদনে বিশেষ করে মন্দার অবস্থা চলেছে, সেই সব শিল্প পণ্যের চাহিদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় তাহলে মন্দার অবস্থায় খানিকটা নিরসণ ঘটান সম্ভব।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে হলে অনেকগুলি ক্ষেত্রে-বিশেষ করে যে সকল ক্ষেত্রে এর জন্য শিল্প পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়—প্রভূত পরিমাণে পরোক্ষ সরকারী শুল্কভার উপযুক্ত পরিমাণে কমান দরকার হবে। এই প্রসঙ্গে শিল্পের কাঁচা মালের উপর নানা বিধ এবং বর্ত্তমানে প্রযুক্ত আবগারী শুল্কের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল আদায় থেকেই সাধারণতঃ ক্রমবর্দ্ধমান এবং মুদ্রাস্ফীতিকারক সরকারী ভোগব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলি অনিবার্য্যভাবে পণ্যের ও মূল্যস্ফীতি ঘটিয়ে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে মজুরীর খাতে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পায় কেন না জীবিকার ব্যয়ের (cost of living index) হারের উপরে মজুরীর হার নির্দ্ধারিত করা হয়। যদি এসকল পরোক্ষ শুল্কভার কমান হয় তবে সেই অনুপাতে মূল্যমানও কমবে এবং মূল্যমান কমলে তার অনুপাতে প্রায় উদ্বৃত্ত পরিমাণ ভোগচাহিদাও বৃদ্ধি পেয়ে শিল্পে সচলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই অনুপাতে মন্দার প্রকোপও কমবে।

বস্তুতঃ এই প্রকার বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ত্তমান আর্থিক গতি ও প্রকৃতির খানিকটা আভাস পাওয়া গেলেও সত্যকার বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বর্ত্তমান অবস্থার সম্পূর্ণ এবং একটা বাস্তব বিচার করতে হলে ১৯৫০-৫১ সন থেকে আমাদের সরকারী পরিকল্পনা অনুসারক পঞ্চবার্ষিকী আর্থিক প্রয়োগের একটা সম্পূর্ণ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক উন্নয়ন প্রয়োগ যে পথে প্রথম থেকেই অগ্রসর হয়ে এসেছে তার ফলে দেশের আর্থিক কাঠামোতে আশানুরূপ এবং সরকারী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমূল পরিবর্ত্তন (revolutionary change) মোটেই ঘটে নি; যা ঘটেছে তা একটা বিপর্য্যয় মাত্র। আমাদের কৃষি উৎপাদনে প্রথম পাঁচ বৎসরে খানিকটা পরিমাণে এবং আপাতদৃষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দশ বৎসরের মধ্যে কোনো উন্নতি আর ঘটে নি, শিল্পেও লক্ষ্যের তুলনায় উৎপাদন উন্নতি ঘটে নি এবং বিশেষ করে পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে কখনো পৌঁছান সম্ভব হয় নি; কর্ম্মসংস্থানের আয়তন বৃদ্ধির ধারা বেকারসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আগাগোড়া অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে; দেশবাসীর জীবন মানে কোনো উন্নতি ত হয়ই নি; বরং তৃতীয় পরিকল্পনা কালের শেষ ভাগে পর্য্যন্ত তাতে আরো অবনতি ঘটেছে।

এর প্রধান কারণ এই যে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা দেশের বাস্তব সমস্যাগুলির সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন; অন্য পক্ষে তাঁরা প্রায় সকলেই যুরোপীয় ও আমেরিকার উন্নত সমাজের চাকচিক্যের ধাঁধায় মোহগ্রস্ত। তাঁরা এদেশের আর্থিক উন্নয়নের ধারাটিকে এমন পথে চালিয়ে এসেছেন, যাতে আমাদের বাস্তব আর্থিক সমস্যাগুলির কোনটারই কোন সমাধান হয় নি; হওয়া সম্ভবও ছিল না, অথচ তাঁদের প্রচার ও প্রতিশ্রুতি

ইত্যাদির দ্বারা সমস্ত দেশটাকে এমন মোহগ্রস্ত করে তুলেছেন যে আমাদের সমস্যাগুলি আয়তন এবং সংখ্যায় পূর্ব্বের তুলনায় আরো অনেক বেড়ে গেছে।

একটু স্থিরভাবে বিশ্লেষণ করলেই এই সমালোচনার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে বেগ পাবার কথা নয়। আমাদের দেশের মূল আর্থিক সমস্যাগুলি কি কি? প্রথমতঃ আমাদের দেশের আর্থিক কাঠামোটি প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক, অর্থাৎ দেশের মোট লোক সংখ্যার মোটামুটি শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবিকার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এর অর্থটি যে সত্যকার কি সেটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা প্রয়োজন। অর্থাৎ দেশের ৫০ কোটি লোক সংখ্যার মধ্যে ৪০ কোটি লোক তাঁদের জীবিকার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে কৃষি উৎপাদনের উপরে একান্ত নির্ভরশীল। এর ফলে কৃষিজীবিকার উপরে একটা অসম্ভব চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতেই এই চাপ বৎসরের পর বৎসর আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত ১৫ বৎসরে অবশ্য গ্রামাঞ্চলের লোকেদের শহরের দিকে জীবিকার সন্ধানে গতির দ্রুততা বেশ খানিকটা বেড়েছে। কিন্তু তাতে মোট সমস্যার কোনো সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয় নি। বরং শহরগুলির সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এমন একটা জটিলতার অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে তার সমাধানের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত; শিল্পাঞ্চলগুলিতেও অনুরূপ সমস্যার জটিলতা ভয়াবহ পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইয়ুরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের আর্থিক ব্যবস্থার রূপ ছিল আলাদা। সে সময়েও কৃষিজীবিকাতে দেশের অধিকাংশ জনসংখ্যাই সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু কৃষির আনুষঙ্গিক বৃত্তি হিসাবে সকলেরই কোন না কোন বংশানুক্রমিক শিল্পজীবিকাও ছিল; ফলে কৃষির উপরে চাপ কখনোই অসহনীয় পরিমাণে অনুভূত হয় নি। ইয়ুরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃহৎ শিল্পের পণ্যাদির জন্য বাজার সৃষ্টি করবার প্রয়োজনে ভারতীয় কুটির শিল্পব্যবস্থাটিকে সরকারী সযত্ন প্রচেষ্টায় হত্যা করা হয়। ফলে চাষীর কৃষির আনুষঙ্গিক উপজীবিকা নষ্ট হয়ে গিয়ে তাকে কৃষির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তোলে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

পরিকল্পনানুযায়ী আর্থিক প্রয়োগে কৃষির আনুষঙ্গিক শিল্প সৃষ্টির কোন ব্যবস্থার কথা কর্তৃপক্ষ কল্পনা করেন নাই, অন্ততঃ তাঁহাদের চারিটি রচনার কোনটিতেই এই রূপ চিন্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অন্তপক্ষে তাঁহাদের রচনার প্রধান ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজিঘন (capital-intensive) বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার উপরে। একথা অস্বীকার করা চলে না যে কৃষি ও শিল্প প্রসারের পথ সুগম করবার জন্য কতকগুলি উৎপাদক শিল্পের একান্ত প্রয়োজন আর্থিক উন্নয়নের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত করে। যথা কৃষির জন্য প্রয়োজন বন্যানিরোধক ও সেচ ব্যবস্থা; সার উৎপাদক ব্যবস্থা: কৃষি উন্নয়ন বিধায়ক গবেষণার আয়োজন ইত্যাদি। শিল্পের জন্য প্রয়োজন বৈদ্যুতিক শক্তি, যন্ত্রপাতি (machine tools) ইত্যাদি নানাবিধ আয়োজন।

কিন্তু মোটামুটি আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা যাহাই হোক তাহার সঙ্গে দেশের ও জাতির মূল আর্থিক কাঠামো ও সমস্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত না হলে, সেই পরিকল্পনার দ্বারা সার্থকতা লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশের অন্যতম সমস্যা, পুঁজির সমস্যা। সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান বেকারত্বের আয়তন আমাদের আর একটি মূল সমস্যা। অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র পুঁজি সঞ্চয়ের লগ্নীর দ্বারা যাহাতে বৃহত্তম আয়তনের কর্ম্মসংস্থানের সৃষ্টি হতে পারে সেদিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত অর্থাৎ উন্নয়ন বিধায়ক নূতন বা সংশোধিত আর্থিক কাঠামোটি পুঁজি ঘনত্বের দিকে অগ্রসর না হয়ে কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপ্তির (labour intensive) দিকে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এই দিক দিয়া দেশের আরো একটি মূল সমস্যার প্রকোপ এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল; সমস্যাটি বৃহৎ শিল্পের যন্ত্রপাতির জন্য আমাদের বিদেশের উপরে অসহায় নির্ভরশীলতা। অর্থাৎ, মূলতঃ আমাদের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প প্রয়োগ ক্ষুদ্রশিল্পের ব্যাপক প্রসারের পথে অগ্রসর হইলে আমাদের ত্রিবিধ মূল সমস্যার একই সঙ্গে সহজ ও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হইতে পারিত; নূতন লগ্নীর জন্য পুঁজি সংগ্রহের সমস্যা, পুঁজি লগ্নীর পরিমাণের অনুপাতে বৃহত্তম আয়তনের কর্ম্মসংস্থানের

সৃষ্টি এবং মোটামুটি, যন্ত্রশিল্পের জন্য বিদেশীর উপর নির্ভরশীলতা হইতে প্রভূত পরিমাণে মুক্তি।

দুঃখের বিষয় আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্ব তথা তাঁহাদের অত্যাধুনিক উন্নয়ন-পরিকল্পনা বিশারদ গোষ্ঠী প্রথম হইতেই অত্যাধুনিক মার্কিনী স্বয়ংক্রিয় (automation) শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইঁহারা চিন্তা করিলেন না যে স্বয়ংক্রিয় শিল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির প্রধান প্রয়োজন শ্রমিক সংখ্যার স্বল্পতা। ইহা উন্নত দেশ সমূহের সমস্যা, আমাদের সমস্যাটি ঠিক ইহার বিপরীত। অত্যাধুনিক মার্কিনী অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিক চাহিদার তুলনায় শ্রমিক সরবরাহ অত্যন্ত কম হয়ে পড়ায় এবং সেই সঙ্গে পুঁজি সঙ্গতির বিরাট পরিমাণের অবস্থিতির সুযোগে পুঁজি-ঘন (capital intensive আর্থিক কাঠামো উৎপাদন ব্যবস্থায় (শুধু শিল্পে নয় এমন কি আংশিক ভাবে কৃষিজ বা আনুষঙ্গিক প্রয়োগ গুলিতেও) স্বয়ংক্রিয় (automated) যন্ত্রাদির আবিষ্কার ও ব্যবহার সুরু হয়।

ভারত তথা অন্যান্য উন্নতিকামী রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সঙ্গতি এবং সমাজ সমস্যা ঠিক বিপরীত। পুঁজির স্বল্পতা, উত্তরোত্তর দ্রুত বর্দ্ধমান বেকার-সংখ্যা; কৃষির অনুন্নত অবস্থা; যার ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সম্পূর্ণ ভোগচাহিদা মেটাতে পর্য্যন্ত অক্ষম এবং সর্বোপরি কৃষি জীবিকার উপর প্রচণ্ডতম চাপ, এইগুলিই হল এসকল রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যা। হাওলাতি পুঁজির সাহায্যে আর্থিক কাঠামোতে পুঁজিঘনতা সম্পাদন করে, বিরাট বেকার সংখ্যার কর্ম্ম সংস্থানের দাবী উপেক্ষা করে, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার বিফল প্রয়াস এবং এই সকল নানাবিধ সার্থকতাহীন প্রয়াসের ফলে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে একদিকে সরবরাহে বিশেষ করে খাদ্যশস্যাদি অবশ্য ভোগ্যাদির সরবরাহে—সঙ্কট সৃষ্টি এবং অন্যদিকে এবং বিশেষতঃ এই সকল কারণে বাস্তব চাহিদার (effective demand) ক্রমশঃ অবনতি ঘটিয়ে আর্থিক মন্দায় সৃষ্টি ঘটেছে।

অতএব কেবল মাত্র ভাল ফসল হলেই মন্দা কাটবে না একথা বুঝতে খুব কষ্ট হবার কথা নয়। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করতে পারলেই যে আর্থিক অবস্থায় একটা নূতন শক্তি সঞ্চার হবে এমন আশা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনা। প্রথমতঃ মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করা সহজ নয়, স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কারণেই সহজ নয়। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে মুষ্টিমেয় লোকের যে স্বার্থসাধন হয়ে থাকে, গত ১৫ বৎসর ধরে অনবরতঃ বিস্তৃয়মান মুদ্রাস্ফীতির ফলে সে-গুলি প্রচণ্ড শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থের সামিল হয়ে পড়েছে, তাদের নিষ্ক্রিয় করে স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে হলে আমাদের আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা নূতন বিপ্লব ঘটান প্রয়োজন হবে এবং আমাদের সমগ্র আর্থিক কাঠামোটির আমূল সংস্কার অনিবার্য্য হয়ে পড়বে। ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর মুখপাত্র বর্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতি কল্পে যে সকল ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন, সেগুলি আসল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নয়, উপর উপর সাময়িক মেরামতীর ব্যবস্থা। এ সকল প্রয়োগের দ্বারা আপাতঃ এবং নিতান্ত সাময়িক ভাবে বর্তমান সঙ্কটে কিছুটা রেহাই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু রোগ সারবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আসল কথা আমাদের আধুনিক আর্থিক পরিকল্পনা যারা রচনা করেছেন, কিম্বা যাঁদের প্ররোচনায় রচিত এবং প্রযুক্ত হয়ে এসেছে, তারা যতবড় অর্থবিশারদই হউন না কেন, কিম্বা তাঁদের নেতৃত্ব যত বিরাট জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাঁদের পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ-বিধি কেবল মাত্র বাস্তববিবর্জিতই নয় (unrealistic) আর্থিক উন্নয়নের সকল প্রকার পরিকল্পনার মূলে বিশেষ করে আমাদের মতন অনুন্নত, অনগ্রসর, দারিদ্র্যপীড়িত রাষ্ট্রগুলিতে, যে মূল প্রেরণা ক্রিয়া করা উচিত ছিল, অর্থাৎ মানবিক প্রেরণা, তাহারও সম্পূর্ণ অভাব। প্রচারের জন্য অবশ্যই আমাদের নেতৃগোষ্ঠী তথা আর্থিক পরিকল্পনা রচনাকারীরা মানবিক প্রেরণার কথা হামেশাই বলে থাকেন; কিন্তু মূল বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে পরিকল্পনার মূলে যে জিনিষটি আসল ক্রিয়া করছে সেটি আধুনিক উদাসীন, যান্ত্রিক, পুঁজিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। মানুষকে অবশ্যই এ প্রকার পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে অনিবার্য্য ভাবেই ব্যবহার করতেই হয়, কিন্তু তার ভূমিকা যেমন সীমাবদ্ধ, তেমনি এই ব্যবস্থায় তার শরিকী অংশও

অকিঞ্চিৎকর। মানুষকে তার মৌলিক আর্থিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করে এই ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়; আমাদের দেশেও তাই হয়েছে, ফলে পনের বৎসরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োগের অন্তে একদিকে একদা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশক্তি কায়েমী স্বার্থ আজ প্রচণ্ড এবং প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য আজ উপবাসের দরজায় এসে পৌঁছেছে। শিক্ষা বিস্তার, জনস্বাস্থ্য প্রবর্তন ইত্যাদি সমাজ কল্যাণকামী প্রয়োগের অজুহাতে প্রচুর অর্থব্যয়ের অন্তরালে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং এই সকল অভাব থেকে অনিবার্য্য সৃষ্টি সমাজ বিরোধী মনোবৃত্তি আজ প্রচণ্ড বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কিন্তু অনিবার্য্য আর্থিক কারণে এরূপ একটা ব্যবস্থার বিস্তৃতির একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। আজ সেই সীমারেখা অতিক্রান্ত হওয়াতে এই কায়েমী স্বার্থপোষক অর্থ ব্যবস্থাও আজ ক্রমে অচল হয়ে পড়েছে। আমাদের উচ্চতম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীতে তাই এত চাঞ্চল্য এবং মেয়াদতী অবস্থা পত্র। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে অর্থশাস্ত্রের আচার্য্য পদ অধিকার করবার মতন মননশক্তি যাদের আছে, তাঁরাও আজ কায়েমী স্বার্থের দলে ভিড়ে ভাড়াটে গুরুতের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে অশাস্ত্রীয় বিধান দিতে শুরু করেছেন।

বর্তমান ক্রমশঃ অবনতিকারক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের উন্নত দেশসমূহের অনুকরণের মোহ ত্যাগ করতে হবে। একটা মৌলিক সত্য এই প্রসঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে এই সকল উন্নত এবং আপাতঃ মনোমুগ্ধকর সমাজগুলিও সমস্যা মুক্ত নয়। আমাদের সমস্যা ভিন্ন জাতের কিন্তু তাদের সমস্যাগুলিও সহজ সমাধানযোগ্য নয়। আসল যে কারণে আমাদের উন্নয়নধারা আজ গতিবেগ হারিয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, সেটা আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দূর-প্রসারী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ও সত্য উপলব্ধির অভাব। কেবলমাত্র নকলের উপরে কোনো উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না; উন্নয়ন ব্যবস্থা দেশের সাধারণ জীবন-মান এবং জীবন-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না চললে, তার থেকে দেশের জীবনের মূলে পুষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের দেশেও ঠিক তাই হয়েছে এবং বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তথাকথিত আধুনিক অর্থশাস্ত্রের বিধান দিয়ে মুক্তি নাই, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলিকে আমাদের মূলভিত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সংশোধন করে নিতে হবে, কেবল মাত্র চর্ম্ম-চিকিৎসায় (surface treatment) কোনো উপকার হবার সম্ভাবনা নেই। এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও চিন্তার প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন আমাদের আর্থিক ভিত্তিমূলের সঠিক বিশ্লেষণ এবং তার সত্যকার স্বরূপ সম্বন্ধে উপলব্ধি। এ-সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো। তবে শেষ করবার পূর্ব্বে একটি সামান্য কিন্তু অনস্বীকরণীয় সত্যের উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মুক্তির পথ আমাদের জীবন-দর্শন, সমাজ দর্শন ও মানবিক বোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমাদের নিজেদেরই আবিষ্কার এবং প্রস্তুত করে নিতে হবে, নকলে কেবল ধ্বংসের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে, সে পুঁজি-বাদী সমাজের নকলই হউক কিম্বা শ্রেণী দ্বন্দ্বের ছন্দে গ্রন্থিত তথাকথিত সমাজবাদী রাষ্ট্রের আদর্শের নকলই হউক। টার এবং ট্রাইপের নকল যেমন আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, তেমনি কাস্তে হাতুড়ি তারাও (বিকল্পে ধানের শীষ) আমাদের কেবল ভুল পথেই টেনে নিয়ে যাবে।

ব্রহ্মসূত্র : শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০। মূল্য পাঁচ টাকা।

বেদের উপনিষদ্ ভাগ এবং তদনুকূল ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিই বেদান্ত নামে অভিহিত। আর এই ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই আমরা সর্ব্বশাস্ত্রের নির্য্যাস আস্বাদন করিতে পারি। ব্রহ্মসূত্রের চারিটি অধ্যায় এবং অধ্যায়গুলি চারিটি পাদে বিভক্ত।

বেদান্তের প্রথম কথাই হইল, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।" এ জিজ্ঞাসা নূতন নহে, অনন্তকাল ধরিয়া এ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, তাহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা যুক্তিত বিচার করিয়া গ্রহণ করার সুস্পষ্ট পথ নাই। পথের কথা বলাও যায় না। কারণ উহা উপলব্ধির বিষয়। উপলব্ধিও দর্শন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেমন মাকে দেখিয়াছিলেন। তবে কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই? আছে। কারণ ব্যাখ্যার দ্বারাই আমরা পথের নির্দেশ পাই।

গ্রন্থকার তাঁহার 'ব্রহ্মসূত্রে' সেই পথেরই দিক-দর্শন করাইয়াছেন। এবং সেই ব্যাখ্যা এমন সহজ-সুন্দর হইয়াছে যাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সকল গ্রন্থেই ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রসঙ্গ আছে। ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার আছে। বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ নিজ নিজ বিচিত্র-প্রতিভার বলে উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা ও উপব্যাখ্যাদির দ্বারা বৈদান্তিক নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, মাধবাচার্য্যের দ্বৈতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার এসকল কথা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি কোন মতবাদকেই প্রাধান্য দেন নাই, সকলের ভাষ্য মাত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত, তাঁহাদের এই মূল্যবান গ্রন্থখানি অনেক উপকারে আসিবে। তবে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন, দর্শনের ব্যাখ্যা উপলব্ধি সাপেক্ষ। সে উপলব্ধি গ্রন্থকারের আছে। যাহা অন্তর্লোকের প্রেরণা হইতে উদ্ভূত।

তিন বেণী : কল্যাণী দত্ত, ৪২ সি, এস, পি মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। দাম দেড় টাকা।

তিন বেণী কাব্য-গ্রন্থ। বিভিন্ন কবিতার সংকলন। গ্রন্থের তিনটি ভাগ—মিতাক্ষরা, লঘুত্রয়ী ও সিংহাবলোকিতা। এই ত্রিবেণী-সঙ্গম হেতুই গ্রন্থখানির নাম সম্ভবতঃ 'তিন বেণী' হইয়া থাকিবে। সেদিক দিয়া নামকরণ সুসংগতই হইয়াছে। এই তিন বেণীর সুর কোথাও একসুরে বাজে নাই। ইহার কারণ গ্রন্থকর্ত্রী অকপটভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "কৃষ্ণচূড়া ছাড়া মিতাক্ষরার সব কবিতাই ছাত্রজীবনের (১৯৪০-৪৭) লেখা। তিনটিকে বাল্যরচনা বলাই সঙ্গত। তাই এদের সাবেকী পোশাক এবং সেন্টিমেন্টাল প্রত্যয় আজ নিতান্ত অচল হলেও আমি নাচার।"

মনে হয়, লেখিকা এই লেখাগুলি প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইয়াছেন। সাবেকী পোশাকে কি তাহার কাব্য মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়? যাঁহারা সেকথা বলেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নই। রসই কাব্যের প্রধান বস্তু, তাহা যে ভাবেই প্রকাশ করা হোক্ না কেন। নতুবা ঐ যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই বাদ পড়ে। রবীন্দ্রনাথের অনেক বাল্য-রচনা উত্তরকালে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

কবি নবাগতা হইলেও তাঁহার প্রতিভাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা তাঁহাকে জানাই সুস্বাগতম্।

কাব্যে অপরাজিতা : শ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, নব ভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২.৫০।

আলোচ্য গ্রন্থখানি এক কথায় কবির অখণ্ড কাব্যের বিভিন্ন দিগ্‌দর্শন। কবি-প্রতিভা যে সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয় তা গ্রন্থকার নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। "শিশুর মহামেলায় রবীন্দ্রনাথ" নিবন্ধ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কবির যথার্থ চরিত্র-চিত্রণ করিয়াছেন : "রবীন্দ্রনাথ কবি, বিশ্বকবি, কবিগুরু। রবীন্দ্র-প্রতিভা সহস্রমালী সূর্যের ন্যায়, বিস্তৃতি বিরাট, দ্যুতিবিমল। রবীন্দ্রমানস পরিমণ্ডল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, রবি-পরিক্রমা দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ঋষি, দৃষ্টি সুদূর-প্রসারী, বাণী অমৃত, ভাব অন্তর্গর্ভ, উপলব্ধি অমিত।"

সাধারণতঃ দেখা যায়, কেহ প্রকৃতির কবি, কেহ স্বভাবের কবি, কেহ অধ্যাত্ম-সাধক কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও স্থিতিশীল ন'ন। রবীন্দ্র-কাব্যের ক্রম পরিণতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, "চরৈবেতি চরৈবেতি" আগাইয়া চলাই তাঁহার ধর্ম। তাই তাঁহার কাব্য নাটক প্রবন্ধাদির মধ্যে দেখিতে পাই নানা বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের সমীকরণ।

"নৈসর্গিক ক্রমাগত যাত্রার বিরাম নাই, মানুষের শতাব্দী হইতে অন্য শতাব্দীতে সমস্ত আত্মশক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া যেন বলিতে চাহিতেছে—থামিলে চলিবে না, চলো, চলো। স্থিতি অপরিবর্তিত হইলে জড়জীবন হীন হয়" ইহাই কবির মর্মকথা।

তাই আলোচ্য গ্রন্থে শুধু রবীন্দ্র-কাব্যই আলোচিত হয় নাই, কবির অন্তর-লোক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কবিকে এইভাবে চিনাইবার প্রয়াস ইহার পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, গ্রন্থখানি অমূল্য। ছাত্রদেরই পক্ষে ইহা অপরিহার্য শুধু বলিব না, বড় বড় সমালোচকদের পক্ষেও ইহা পথের দিশারী।

গৌতম সেন।

(১৯৪ পৃষ্ঠার পর)

সম্বন্ধের উদ্ভব হইল। শ্রমিক ও নিযোক্তা সম্বন্ধ বিচার নানাভাবে নানাদিক হইতে করা হইতে লাগিল। বহু ক্ষেত্রে কথায় ও কার্য্যে পার্থক্য থাকিলেও মনে হইতে লাগিল যে নিযোক্তার প্রভুত্ব আর থাকিল না। শ্রমিক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া কর্ম্মশক্তির গৌরবে নিজ অধিকার সম্ভোগে অতঃপর সক্ষম হইবে। কিন্তু প্রভুত্ব ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যাইল। একটি ছিদ্র বন্ধ হইলে অপর একটা রন্ধ্রপথে শ্রমজীবীর অধিকার নিযোক্তা বা অপর কাহারও খপ্পরে গিয়া পড়িতে লাগিল। রাজ্য-শাসক অথবা শ্রমজীবীদিগের স্বগঠিত "ইউনিয়ন"গুলিও মানব অধিকার অন্যায়ভাবে গ্রাস করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইল না। কর্ম্মশক্তির সুব্যবহার ব্যবস্থা না করিয়া কর্ম্মীর কঠোর পরিশ্রমের ফল নানাভাবে রাজ্য শাসকের শ্রমিক "ইউনিয়নের" নেতাদিগের ও মালিকবর্গের সুবিধার জন্ত আহরিত হইতে লাগিল। শ্রমিক "ইউনিয়নের" নেতাগণ বহু স্থলেই রাষ্ট্রীয় "পার্টি" বা দলের লোক হইতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া "পার্টির" খরচও শ্রমিক দিতে আরম্ভ করিল। রাজ্য শাসক আরও বহু উপায়ে প্রজা শোষণ কার্য্য চালিত করিলেন। কারখানার শ্রমিকের শ্রমমূল্য রাজকরের ভিতর দিয়া ও কৃষিজীবীর উপার্জ্জনের ফল "লেভি" অথবা গায়ের জোরে নির্দ্ধারিত কম দামে ফসল ক্রয় ব্যবস্থা করিয়া কাড়িয়া লইবার আয়োজন হইতে লাগিল। ইহার সহিত সংযুক্ত ভাবেই মহাজনের নিকট নগদ ধার ও ধারে মাল কেনায় ব্যবস্থা থাকাতে শ্রমিক ও কৃষক নিজ উপার্জ্জনের আরও অনেকাংশ অপর দিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতে থাকিল এবং সকল শোষণের মোট পরিমাণ যোগ দিয়া দেখিলে পূর্ব্বের তুলনায় কর্ম্মীর আর্থিক অবস্থা বিশেষ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইল না। কেহ বলিতে পারেন যে ক্রীতদাস অবস্থা হইতে আত্মসম্মানের দিক দিয়া বেতনভোগী ভৃত্য অথবা শ্রমিকের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই উন্নততর হইয়াছে। সামাজিক সুনীতির দিক দিয়া দেখিলে কথাটা সত্য। কিন্তু অর্থনৈতিক লাভ লোকসান হিসাব করিলে দেখা যায় যে মানুষ ক্রীতদাস, ভৃত্য অথবা শ্রমিক যাহাই হউক না কেন তাহার পরিশ্রমের ফল সে ন্যায়ত প্রাপ্য যতটা তাহা এখন অবধি পায় না। সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেদের তুলনামূলক ভাবে যতটা উন্নতি হইয়াছে, শ্রমিক বা কৃষকদিগের তাহা হইতে কমই হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বে রাজা ক্রোধ হইলে মন্ত্রীর মাথা কাটিয়া ফেলার হুকুম দিতে পারিতেন অথবা রাণীকে হেঁট কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থাও ইচ্ছা হইলে করিতে পারিতেন। যাহাকে খুশী নির্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড দিবার কোন বাধা ছিল না। ইয়োরোপে চোর ধরা পড়িলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত, ডাইন বলিয়া সন্দেহ হইলে পুড়াইয়া মারা চলিত ও বারআনা পয়সা ধরাইয়া দিয়া মানুষকে সৈন্যদলে কয়েক বৎসরের জন্য ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া যাইত। ঐ সকল রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন মানুষ যতটা নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে, সেই হিসাবে কোন কোন শ্রেণীর লোকের উন্নতি হয় নাই।

শ্রমিক কৃষক ও অপরাপর কর্ম্মীদিগের অবস্থা তুলনামূলক ভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উন্নত হয় নাই। আর হয় নাই যাহারা রাজকর দেয় তাহাদিগের। আওরঙ্গজীব চৌথ বা উপার্জ্জনের এক চতুর্থাংশ কর হিসাবে আদায় করিয়া বদনাম কিনিয়াছিলেন। এখনকার স্বাধীনযুগের নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত সম্রাটগণ মানুষের উপার্জ্জনের চারভাগের তিনভাগ রাজকর হিসাবে আদায় করিয়াও কোন বদনামের ভাগী হন না। শুল্কের হার দেখিলে পূর্ব্বযুগের রাজামহারাজাদিগের চক্ষুস্থির হইয়া যাইত। কারণ তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতেন না যে এক টাকার আমদানি মালের উপর কখনও দেড়টাকা মাশুল চাপান যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত আরও কত প্রকার খাজনা মাশুল ও রাজকরের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সহরে গৃহ থাকিলে তাহার মিউনিসিপাল ট্যাক্স প্রায় বাড়ী ভাড়ার সমান সমান হইয়া দাড়াইয়াছে।

নানা প্রকার মাল উৎপাদনের উপর আবগারী ধরণের রাজকর দিতে হয়। গাড়ী চালাইলে তাহার বিশেষ ট্যাক্স। দ্রব্য ক্রয় করিলে সেলট্যাক্স"। টাকা খরচ করিলে ব্যয়কর ও মরিয়া যাইলে প্রোবেট মাশুল। অর্থাৎ পৃথিবীর বাসিন্দা যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র লোকের খাটিবার অধিকার অনন্ত কিন্তু উপভোগের দাবি অপরকে খাওয়াইয়া বিশেষ কিছু থাকে না। যাঁহারা গরীব নহেন তাঁহারা ট্যাক্স, খাজনা, মাশুল, ফিস ও অপরাপর রাজকীয় আদায়ের ধাক্কা সামলাইয়া শেষ পর্য্যন্ত মরিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।

তাহা হইলে উপভোগ করে কে? সুখে থাকে কে? উত্তর দেওয়া সহজ নহে, তবে মনে হয় নেতা নামধেয় যে নূতন এক সম্প্রদায় আজকাল শক্তিতে প্রভুত্ব, রাজত্ব ও আভিজাত্যকে হার মানাইয়া পৃথিবী দখল করিয়াছে, সেই নেতারাই অধিকার ও ভোগে সকলের উপরে স্থান পাইয়াছেন, কারণ তাঁহারা যে কার্য্য করেন, অর্থাৎ নেতৃত্ব, তাহার উপর কোন শোষণ বা ট্যাক্স বসান চলে না।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
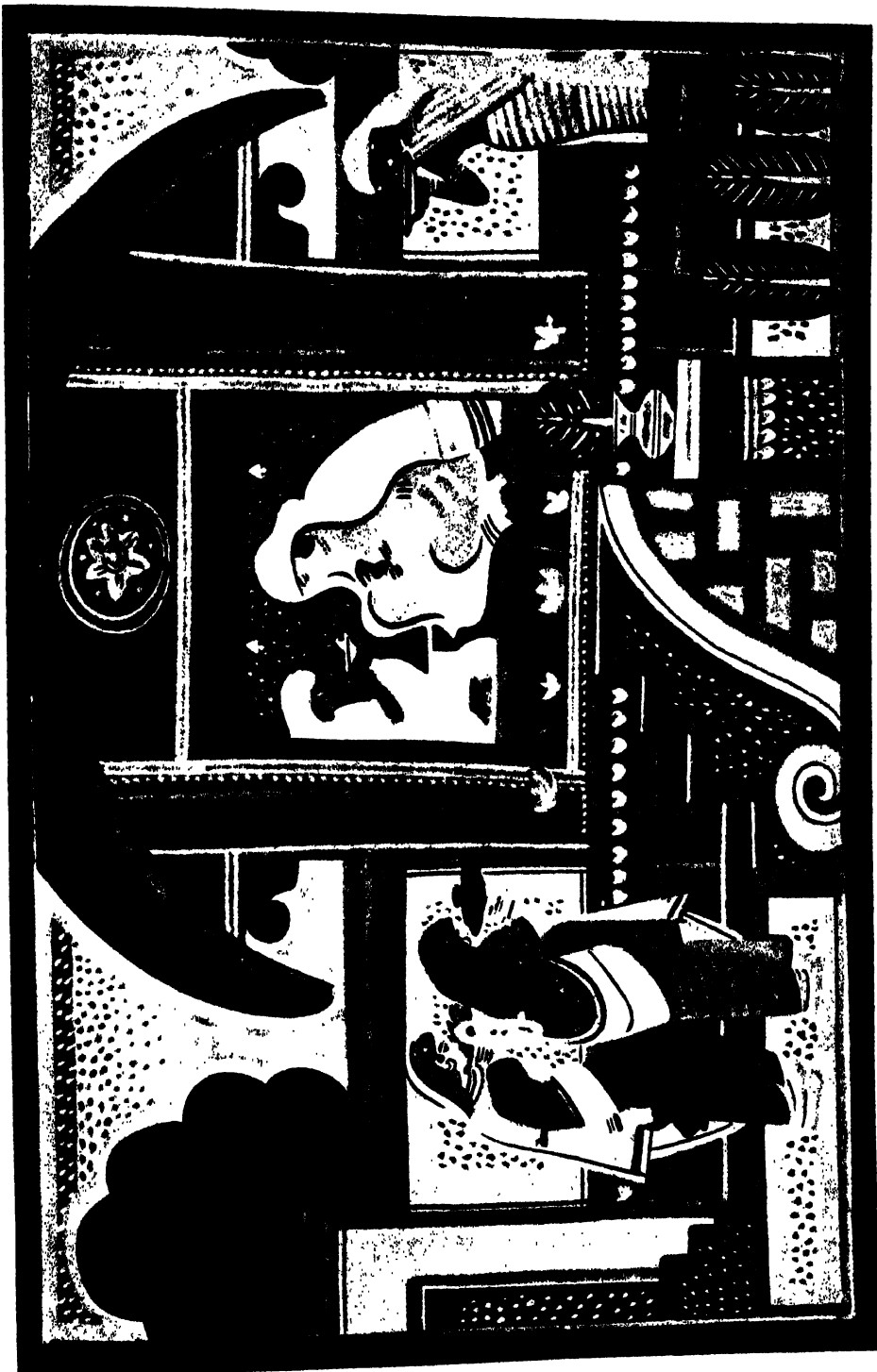
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

চৈতন্যের জন্ম

নন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৭৪

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজ্যশাসনের মূল উদ্দেশ্য কি ?

রাজ্যশাসনের মূলকথা হইল, সমাজের সকল ব্যক্তির প্রত্যেকটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুরক্ষিত রাখা ও সমাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালাইয়া চলা। অপরাধ, অর্থাৎ মানব-সমাজে যে সকল কার্য্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে করা হইবে না বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার বিপরীত কার্য্য দমন করা সুশাসনের আর একটি মূল ও বিশেষ উদ্দেশ্য। বাহিরের শত্রুর ও ভিতরের ষড়যন্ত্রকারী বিপ্লবীদিগের অন্যায় প্রচেষ্টার প্রকোপ হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করা রাজ্যশাসনের আর একটি সাক্ষাৎ ও মূল উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত বিদেশী রাজ্যগুলির সহিত সদ্ভাব ও মিত্রতা সংরক্ষণ এবং দেশের জনসাধারণের মঙ্গলচেষ্টাও রাজ্য-শাসনের অত্যাবশ্যক অবয়ব। এই মঙ্গল চেষ্টার শাখা প্রশাখা অসংখ্য এবং যে রাজ্যে যত অধিক এই মঙ্গল-সাধক কার্য্য করা হয়, সেই রাজ্যের সুনাম ততই চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। রাজ্যশাসন বিষয়ে অবান্তর কথা নানা প্রকার হইতে পারে। প্রধানত কষ্টকল্পিতভাবে যদি কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে জাতীয়ভাবে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলিয়া চালান হয়, তাহা হইলে সেই জাতীয় চেষ্টার সমর্থন না করিয়া চলাই উচিত। যথা, যদি দেশ রক্ষার বিষয়ে প্রচার করা হয় যে, আনবিক অস্ত্র কোন মতেই ব্যবহার না করিলে বিশ্বশান্তির কোন একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে সেই প্রচারের দ্বারা দেশ-রক্ষার মূল উদ্দেশ্যের হানি হয়। যদি অপর কেহ বলেন যে, সকল অস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক টলষ্টয়ের মতে অন্যায়ের বিরুদ্ধতা না করিয়া অন্যায় দমন করিবার ব্যবস্থা করাই দেশরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা, তাহা হইলে সে কথাও অবান্তরের পর্য্যায়েই পড়িবে। আরও কোন কোন ব্যক্তির মতে দেশের শত্রুদিগের সহিতই গোপনে বন্ধুত্ব করিয়া শত্রুকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইলে শত্রুর সহিত মিলন স্থাপিত হইয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। ইহা শুধু অবান্তর নহে, অতি ঘৃণ্য আত্মসম্মানবোধহীন ও স্বাধীনতানাশক কাপুরুষতার কথা। ইহার পশ্চাতে যদি কোন গুপ্ত অভিপ্রায় থাকে, যথা, যদি শত্রুর সাহায্যে দেশবাসীর উপরে কোন রাষ্ট্রীয় দলবিশেষের একাধিপত্য ও স্বৈরাচার জারী করার

মতলবই ঐ অঘন্য প্রচার-কার্য্যের ভিতরের কথা হয়, তাহা হইলে জাতির উচিত হইবে সেই ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া।

আমরা বহুকালাবধি দেখিয়া আসিতেছি যে, রাজ্য-শাসনের মূল উদ্দেশ্য রক্ষার কথা কোন রাষ্ট্রীয় দলই সম্মুখে স্থাপিত রাখিয়া তাহার অনুসরণ করেন না। কংগ্রেসদল পূর্ব্বে বিশ্বসভায় কি করিয়া নিজেদের নাম, যশ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয় শুধু তাহাই দেখিয়া চলিতেন। অর্থাৎ আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া ও চীনের সখ্য অর্জ্জনের জন্য ভারতের জনসাধারণের ইষ্ট বহুক্ষেত্রেই কংগ্রেস জলে ফেলিয়াছেন। যথা পাকিস্থানের কাশ্মীর দখল ও অর্দ্ধেক কাশ্মীর গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকা। কংগ্রেস দুইবার ভারতকে মহা অসম্মানের ভাগী করিয়া বিদেশী শক্তি-যূথকে খুশী করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে যখন চীন তিব্বত দখল করে তখনও ভারত সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস সেই লুণ্ঠনের সমর্থন করিয়া ভারতের ইজ্জতের হানি করিয়াছিলেন। চীন যখন অকারণে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে হানা দেয়, তখনও কংগ্রেস ভারতের সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া চীনকে খুশী করিয়াছিলেন। এবং সেই সময় যে ভারত-সেনাবাহিনী পশ্চাতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হয় তাহার মূলেও ছিল কংগ্রেস দলের নির্ব্বুদ্ধিতা ও সামরিক ব্যবস্থা করিবার অক্ষমতা ও অনিচ্ছা। চীন উত্তর কাশ্মীরের অনেক জমি নিজ সুবিধার জন্য পাকিস্থানের নিকট হইতে লইয়া রাস্তাঘাট বানাইয়াছে এবং ভারত সে বিষয়েও কোন কথা বলেন নাই। অপরদিকে দেখা যায় যে, ভারতের অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার মূলে বিদেশীদিগের প্রভাব বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। অধিক মাত্রায় ঋণ করিয়া ভারতীয় মানবের ভবিষ্যৎ ঋণ শোধের ও সুদ দিবার ভারে প্রায় চির ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাও কংগ্রেসের ভারতীয় অর্থনীতিকে অতিদ্রুত বর্দ্ধনশীল করিয়া জগতকে দেখাইবার আগ্রহের ফল।

কংগ্রেসকে ছাড়িয়া অন্যান্য রাষ্ট্রীয় দলের আশ্রয়ে যদি জনসাধারণ নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেখা যায় যে, প্রায় কোন দলেরই জাতির সকল ব্যক্তির অধিকতম সুবিধা, সম্মান রক্ষা, শক্তি বৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খল আনন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নাই। সকল ব্যক্তির উপার্জ্জনের ব্যবস্থা, খাদ্য-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা প্রভৃতির পূর্ণ আয়োজন, জগৎ জাতিসভায় ভারতের শক্তিশালী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক বিষয়ে আত্মনির্ভরশীলতা, যদি কোন দলই উচ্চতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে সেই সকল দলকে রাষ্ট্রের ভার দেওয়া জাতির পক্ষে মূর্খতা হইবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু দেখা যায় যে "উচ্চাঙ্গের" আজগুবি আদর্শ বর্ণনা, অবান্তর কার্য্যে সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় এবং গোপনে নানা প্রকার অন্যায়ের প্রশ্রয় দান ব্যতীত অন্য কোনভাবে শাসন কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা ভারতের রাষ্ট্রীয় দলগুলি করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং এখনকার পরি-স্থিতিতে ভারতের জনসাধারণ যদি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ সুবিধা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা পূর্ণরূপে করা জাতীয় রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রদল বা রাষ্ট্রনেতৃত্বের ক্ষেত্রে নূতন মানুষ, নূতন আদর্শ ও নূতন কার্য্যপ্রতিভা ও ক্ষমতার সন্ধান করিতে হইবে। যাঁহারা অদ্যাবধি ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির বিষয়ে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতের শুধু বাস্তব ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, অন্যায়, অসম্ভব জাতির ক্ষতিকর ও দেশের অসম্মানকর চিন্তার ধারাকে সত্য দেশাত্মবোধের পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রক্ষেত্রে আদর্শ বলিয়া চালাইয়া সমগ্র জাতির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে কলুষিত করা হইয়াছে। ফলে বহুসংখ্যক ভারতীয় মানব রাষ্ট্রীয় বিষয়ে চিন্তা করিতে অক্ষম হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অনেকেরই মস্তকে এখন শুধু বিকৃত ও নীচ মতলবই উচ্চাঙ্গের চিন্তার স্থান অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছে। নিজ দেশকে অপর জাতির নিকট হেয় করা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অসম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করেন না। নিজেদের ভিতরে ইতর ভাবে কলহ করিয়া সাধারণ মানব ও বিদেশীদিগের

নিকট হাস্যাস্পদ ও হেয় প্রতীয়মান হওয়াতেও অনেকের লজ্জা হয় না। শুনা যায় কোন কোন লোক বিদেশীদিগের নিকট অর্থগ্রহণ করিয়া নিজ দেশে অপরের মতলব হাসিল করিবার জন্ত আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য্য যে কত নীচ ও মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাব্যঞ্জক সে কথা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হইতে পারে না। যাঁহারা নিজদেশবাসীর উপর বিদেশীর সাহায্যে দেশের কোন ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্রকারী গণ্ডি বা গোষ্ঠীর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাও সাধারণের স্বাধীনতা অপহরণকারী বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই গণ্য হইবেন। ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থা বিচার করিলে মনে হয় যে. ভারতীয় মানবের এখন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আরও গভীর চিন্তা করিয়া দল ও নেতা চয়ন করিয়া লইতে হইবে। কারণ যাঁহারা এখন দল গঠন করেন বা নেতৃত্ব আকাঙ্খা করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই নানাভাবে স্বার্থসিদ্ধি করিতেই চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শাসন অধিকার

সাধারণতন্ত্র বা ডিমক্রেসির শাসনশক্তির আরম্ভ জাতির সকল ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্থাৎ আত্মশাসন অধিকারের ভিতর। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে পৃথক পৃথক ভাবে শাসন করিতে পারেন না এবং শাসনের বিভিন্ন কার্য্যও ব্যক্তিগতভাবে করা যায় না। ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিনিধিদিগের অধিক সংখ্যক লোকের মতে রাজ্যশাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া মূলতঃ ব্যক্তির অধিকার ব্যবহারে ঐ শাসন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই কারণে শাসন কার্য্য যাহাদিগের হস্তে রাখা হয়, তাঁহারা সকল সময়েই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের অধিক-সংখ্যক ব্যক্তির সহযোগিতা ও সমর্থন পাইবেন এই নিশ্চয়তার উপরেই শাসনশক্তি ব্যবহার করিতে পারেন। যদি কোন সময় অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি শাসকদিগের সমর্থন না করেন, তাহা হইলে শাসকমণ্ডলী বা গভর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্যে আর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। এই নিয়মেই গভর্ণমেণ্ট চালিত থাকে এবং এই নিয়মের জন্যই সংখ্যাগুরুত্ব হারাইয়া বহু দেশেই বহু গভর্ণমেণ্ট শাসক পদত্যাগ করিয়া অপর গোষ্ঠীর হস্তে শাসনভার তুলিয়া দিয়া থাকেন। সংখ্যাগুরুত্বের পরিবর্ত্তে অপর কোন প্রকার উৎকর্ষ, দক্ষতা, বা শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া শাসন-শক্তি হাতে রাখা সাধারণতন্ত্রে চলে না। অর্থাৎ কংগ্রেস যদি ভোটে হারিয়া যায় তাহা হইলে নিজ আদর্শ বা ঐতিহ্য দেখাইয়া কংগ্রেস শাসনভার হস্তে রাখিতে পারে না। তেমনি ফরোয়ার্ড ব্লক সুভাষচন্দ্রের নামে অথবা কম্যুনিষ্ট দল মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া রাজশক্তি হস্তগত রাখিতে পারে না। আসল কথা হইল, নিজ দলের বা গণ্ডির প্রতিনিধিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ইহা না থাকিলে রাজ্যশাসন অধিকার থাকিতে পারে না। এখন কথা হইল যে, উপরোক্ত ঐ সংখ্যার আধিক্য আছে কি, না আছে এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কি উপায়ে সেই সন্দেহভঞ্জন করা যাইতে পারে? সহজ ও সরল উপায় হইল কোন কোন রাষ্ট্রীয় দলে কত কত প্রতিনিধি প্রশ্নকালে সংযুক্ত আছেন তাহা যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া দেখা ও তাহা সম্ভব না হইলে, শাসন-ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিয়া ভোটের দ্বারা বিচার করা যে শাসকমণ্ডলীর উপর অধিকাংশ প্রতিনিধির সহযোগিতা ও সমর্থন অক্ষুণ্ণ আছে কি না। শাসক-মণ্ডলীর সমর্থনে কতজন প্রতিনিধি আছেন তাহা সকল সময়েই জানা যায়। যখন কোন কোন প্রতিনিধি দল ছাড়িয়া ভিন্ন পক্ষে চলিয়া যান তখন তজ্জাত সংখ্যাধিক্য হ্রাস কতটা হইতেছে তাহাও জানিতে কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং কোন শাসকদলকে যদি বলা যায় যে, সেই দলের সমর্থকদিগের সংখ্যা হ্রাস হইয়া তাহার দলগত বা গণ্ডিগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর বজায় নাই, তাহা হইলে যদি কথাটা সত্য না হয়, ত সে কথা প্রমাণ করা সহজেই যায়। কিন্তু সংখ্যাধিক্য নাই অথচ কোন উপায়ে কর্ম্মে বহাল থাকিয়া সেই হারান সংখ্যা-ধিক্য ফিরিয়া পাইবার আশায় শাসনশক্তি ছাড়িয়া দিতে না চাহিবার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার কোন শাসক-মণ্ডলীর থাকিতে পারে না। যে কোন সময় যদি প্রমাণ হয় যে, প্রতিনিধিদলের মধ্যে এত সংখ্যায় ব্যক্তিগণ আর শাসকদলকে সমর্থন করিতেছেন না, যাহাতে শাসক-

গণ ভোট হইলে হারিয়া যাইবেন; তাহা হইলে শাসকগণকে হয় যথাশীঘ্র সম্ভব ভোটের লড়াই করিয়া জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে হয় নয়ত শাসনকার্য্য ত্যাগ করিয়া কোন অপর দল বা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীকে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে দিতে হয়। যথাশীঘ্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিচার না করিয়া শাসন-ক্ষমতা ত্যাগে অযথা বিলম্ব করিবার অধিকার কোন দল বা গণ্ডির থাকিতে পারে না। কোন কোন মতবাদ গায়ের জোরে রাজ্যশাসন ক্ষমতা নিজেদের কবলে রাখার পক্ষপাতি হইতে পারে, কোন মতবাদ সংখ্যাগুরুত্ব না থাকিলেও, চালাকি করিয়া কিছুকাল রাজশক্তি রাখিয়া নেওয়া অন্যায় না মনে করিতে পারে; কিন্তু সাধারণতন্ত্র যে সকল দেশে বহুকালাবধি চলিয়া আসিয়াছে, সেই সকল দেশে গায়ের জোর বা চালাকি করিয়া রাজত্ব দখল করা প্রচলিত নাই। আমাদের দেশেও রাষ্ট্রীয় চিন্তার ধারা সংখ্যালঘিষ্ঠের হস্তে রাজশক্তি রাখার পক্ষে নহে। সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সসম্মানে রাজতক্তে বসাইয়া রাখাই সাধারণতন্ত্রের মূল মন্ত্র। ইহার কোন অন্যথা হইতে দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলকর নহে। অল্প সংখ্যক লোকের ইচ্ছা যদি শাসনক্ষেত্রে বলবৎ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে, যে কারণেই সেইরূপ ঘটুক না কেন, সাধারণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকিতে পারে না।

এই সম্পর্কে কয়েকটি কথার উত্থাপনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রথমে হইল রাষ্ট্রীয় দলগুলির প্রতিনিধির সংখ্যার জোয়ার ভাঁটার কথা। রাষ্ট্রীয় দলগুলির মতবাদ ও আদর্শ যদি জীবনের গতি ও স্থিতির দিক দিয়া বাস্তবতার মূল্য বিচার করিয়া গঠিত ও ব্যক্ত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় দলের প্রতিনিধিগণ সহজে নিজপথ ছাড়িয়া অপর পথে চলিতে যাইতেন না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় মতবাদ আমাদের জীবনের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্জিত। কোন মতবাদের প্রতি আমাদের কোন গভীর ও ঘনিষ্ঠ আকর্ষণ থাকিতে পারেনা এবং সেই কারণেই আমরা একটা রাষ্ট্রমত ছাড়িয়া আর একটা ধরিলে, মনে কোন বড় লোকসান অনুভব করিনা। রাষ্ট্রমত যতদিন জাতীয় জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ না হইবে ততদিন রাষ্ট্রমত আমাদের অন্তরে বিশেষ স্থিতিবানভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কোন মত ধরা ছাড়া ক্ষণিকের খেয়ালের কথাই থাকিবে। দ্বিতীয় কথা হইল বিশ্বাসের অভিনয়। আমরা যে সকল মত বা আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিবার ভান করি, বস্তুত আমরা সেই সকল মত ও আদর্শে বিশ্বাস করিনা। কোন দলে ভিড়িয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুবিধা অর্জ্জন করাটাই আসল কথা। সেইজন্য দল-বিশেষের মত মানিয়া চলিবার একটা লোক-দেখান অভিনয় করা প্রয়োজন হয়। প্রাণের কিম্বা সত্য বিশ্বাসের টান না থাকিলে সম্বন্ধ একান্তভাবে অন্তরের হয় না। এই জন্যই আজ রাষ্ট্রমতের ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্ত্তনের এত প্রাদুর্ভাব। দল বদলাইয়া অন্য দলে যোগদান করিতে কাহারও বিশেষ অসুবিধা হয় না। অতএব রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সত্যকার অনুরাগ ও আনুগত্য লক্ষিত হয় না। কপট ভক্তের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং অধিক লোকের মধ্যে মত ও আদর্শ স্থায়ীভাবে বাধ্যতা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে না। এবং রাষ্ট্রদলের ভক্তগণ ক্রমাগতই গুরু ও মন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন গোষ্ঠীতে নাম লিখাইতে উদ্যোগী।

যেখানে সত্যভক্তি, বিশ্বাস ও বাধ্যতার এত অভাব সেখানে প্রায়ই শাসকমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব। এই জন্য জনসাধারণের কর্ত্তব্য যাহাতে নিজেদের কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সেই ব্যবস্থা করা। ইহার উপায় রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের দমন করিয়া রাখা। সাধারণের সুবিধা জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও স্থির উদ্দেশ্য। সাধারণের অসুবিধা করা একটা বড় সামাজিক অপরাধ। এই কথাটা প্রচার করা বিশেষ আবশ্যক।

আমলাতন্ত্র অমর হউক!

ভারতবর্ষে সাধারণতন্ত্র হাস্যকর রূপ ধারণ করিয়া থাকিলেও আমলাতন্ত্র নির্ব্বিবাদে ও সবলে নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। কারণ রাজ্যশাসন কার্য্য বস্তুত আমলাগণই করিয়া থাকেন, মন্ত্রীগণ শুধু তক্তে শোভমান হইয়া উল্টোপাল্টা হুকুম দিয়া আমলাদিগকে যথেচ্ছাচারে আরও অধিক অভ্যস্ত করিয়া তুলেন।

আমলাগণ মানসক্ষেত্রে উভচর ও সব্যসাচী। তাঁহারা আজ জলে নামিয়া সাঁতার দিয়া লক্ষ্যস্থলে গমন চেষ্টা করেন এবং কল্য মন্ত্রী বদল হইলে আবার জল পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কবস্ত্রে শুধু ডাঙ্গায় ভ্রমণ করেন। অর্থাৎ মন্ত্রীগুলীর আদেশ রাষ্ট্রীয়দল অনুসারে সম্পূর্ণভাবে ভিন্নভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে ও আমলাগণ আজ যে আদেশ অনুসরণ করিবার অভিনয় করিতে বাধ্য হ'ন, কাল আবার তাহার বিপরীত পথে চলিবার আদেশ পাইয়া উল্টাদিকে গমনের হাবভাব রপ্ত করিয়া থাকেন। সত্য সত্যই যে আমলাগণ মন্ত্রীদিগের নির্দ্দেশে কোন বিশেষ পথে প্রাণে মনে হুকুম তামিল করিয়া চলেন তাহা মনে হয় না। কারণ বৃটিশ আমল হইতে অদ্যাবধি আমলাদিগের গতিবিধি একটা নিজস্ব ধারাতেই চলিয়া থাকে। "হাঁজি, হাঁজি" বলিয়া কার্য্যত ঠিক নিজ ইচ্ছাও পুরান রীতি অনুসারে চলাই আমলাতন্ত্রের অভ্যাস ও বিশেষত্ব; কারণ আমলাগণ শুধু কার্য্য করেন, "পলিসি" ও "ইডিয়লজি" বলিয়া যে সকল বড় বড় কথা মন্ত্রীমণ্ডলীর আখড়ায় আলোচিত হয়, সেই সকল কথার বিশেষ কোন মূল্য আমলামহলে দেখা যায় না। তাঁহারা চলেন রীতি অনুসারে। নীতির কথা লইয়া আমলাগণ মাথা ঘামান না। যদি এক মন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদিগকে না দিয়া দাবাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য এবং অপরদল শাসনশক্তি লাভ করিলে অপর এক মন্ত্রী আদেশ দেন শ্রমিকদিগকে যথেচ্ছাচার করিতে দিতে; তাহা হইলে আমলা মহলে ঐ সকল পরস্পরবিরোধী আদেশে কোন অসুবিধা হয় না। আমলাগণ প্রাতে কাহাকেও আসকারা দিলে সন্ধ্যায় যে তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করাইবেন না, এরূপ কোন নিশ্চয়তা কদাপি লক্ষিত হয় না। আমলাদিগের শক্তি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই রীতি। যদি কেহ মিছিল বাহির করিয়া আইন ভঙ্গ করে, তাহা হইলে আমলাগণ রীতি অনুযায়ী কিছু দিতেও পারেন এবং নাও বলিতে পারেন; কারণ আইন ভঙ্গ করিলেই যে কাহারও শাস্তি হইবেই এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি আমলাগণ মানেন না। নিজেদের সুবিধা হইলে অপরাধীকে ধরা হইবে, সুবিধা না হইলে ধরা হইবে না। কোন লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়াও হইতে পারে। অর্থাৎ আমলাদিগের সুবিধাই হইল আসল কথা, আইন রক্ষা বা অপরাধ যাহাই ঘটুক না কেন। আজ যিনি মন্ত্রী ও যাঁহার আদেশ নত মস্তকে মানিয়া চলিবার ভঙ্গীতে আমলাগণ অভিনয় করিতেছেন; কল্য আবার সেই মন্ত্রীই পদচ্যুত হইলে তাঁহাকে ধরপাকড় বা প্রহারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যদি আমলাগণ সেইরূপ ব্যবহারই সুবিধাজনক মনে করেন। মন্ত্রীরা আসিতে পারেন, যাইতেও পারেন; আমলাগণ কিন্তু স্থির নিশ্চয়ভাবে নিজনিজ পদে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। ইহাই হইল আমলাতন্ত্রের মূল রীতি।

আমলাতন্ত্রের জনসাধারণের স্বাধীনতা ও সুবিধার বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি নাই। ইহার কারণ আমলাগণ নিজের সুবিধা ও স্বৈরাচার সম্ভোগ করিতেই উৎসাহী, সাধারণের অধিকার সুরক্ষিত করা তাঁহারা সময়ের অপব্যবহার ও নিজেদের শক্তির অপচয় ও ক্ষমতা লাঘবকর বলিয়া বোধ করেন। মন্ত্রীমণ্ডলী যদি কাহাকেও অপরাধ করিয়া শাস্তি হইতে বাঁচিয়া যাইতে দিতে চাহেন, আমলাগণ সে প্রকার আইনকে পাশ কাটানর বিষয় বিচক্ষণতা দেখাইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা আবহমানকাল হইতেই নিজেদের লাভ ও সুবিধার জন্য চোর, ডাকাত, খুনী প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিতে অভ্যস্ত। অপরাধীগণ ভারতবর্ষে বহুকাল হইতেই সাজা না পাইয়া অপরাধ করিয়া চলে। মন্ত্রী ও আমলার মিলিত চেষ্টায় যদি কিছু কিছু সামান্য আইনভঙ্গের অপরাধীগণ অবাধে দুষ্কর্ম্ম করিতে পায়, তাহাতে নূতন কিছু ঘটিল বলিয়া মনে করা উচিত নহে। ঘেরাও প্রভৃতি অপরাধ হিসাবে কোন উচ্চ স্থান পায় না। ঘেরাও বা হাল্লা করিয়া যদি শ্রমিকগণ অবাধে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে। রাহাজানি করিয়া বাঁচিয়া যাওয়ার তুলনায় উহা অতি সামান্য কথা। মন্ত্রীমণ্ডলী ভাবিয়া থাকিতে পারেন যে, তাঁহারা আইন ভাঙ্গায় একটা নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু বস্তুত তাঁহারা আমলাতন্ত্রের অতি পুরাতন রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। আজ আবার যদি নূতন মন্ত্রীগণ বলেন, অপরাধীদিগকে ধরপাকড় করিতে আমলাগণ তাহা

হইলে নিরপরাধ লোকদিগকে ধরিয়া ও সাজা দিয়া সেই নূতন আদেশ পালন করিবার ব্যবস্থা করিবেন, অতি অবশ্যই।

জন বিক্ষোভের স্বরূপ

অপর দেশে জনবিক্ষোভ হইলে, বিক্ষোভের কারণ যাহারা জনসাধারণের আক্রোশ গিয়া পড়ে তাহাদের উপরেই। বিদেশী জনসাধারণ নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গের চেষ্টা করেন না। আমাদিগের দেশের রীতি অপর প্রকার। প্রথমতঃ জনবিক্ষোভ সর্ব্বজনের স্বকীয় ও স্বয়ংকৃত নহে। যে কোন দলের লোক বিক্ষুব্ধ হইলেই তাহা জনবিক্ষোভ বলিয়া চালান হয় এবং সেই দল বিশেষের লোকজন তখন "বিক্ষুব্ধ" ভাবে যে সকল কার্য্যকলাপ করেন তাহাতে সাধারণেরই অসুবিধা ও ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণ যদি ঐ দলের জোরাল ব্যক্তিদিগের কথায় কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া ও নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া বিক্ষোভে সহানুভূতি প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে সেই জনসাধারণের উপরই দলের জোরাল হস্ত সবলে পতিত হয়। বিক্ষোভের মূল কারণ যে বা যাহারা জোরাল হস্তের জোর সেই অবধি পৌঁছায় না। তাই দেখি যে "জনবিক্ষোভ" হইলে কোন রাষ্ট্রীয় দলেরই শক্তি দেখানর কার্য্য সাধিত হয়, জনসাধারণের শুধু অসুবিধা ও ক্ষতিই হয়। কেহ বাজারে গিয়া খাদ্য ক্রয় করিতে পারে না, কেহ চিকিৎসার ঔষধ আনিতে সক্ষম হয় না এবং সকলেই দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া চলিতে বাধ্য হয় ও কোন কোন অসাবধান ব্যক্তির মাথায় ইট পড়ে অথবা গাড়ী ভাঙ্গিয়া ও জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল উৎপীড়ন সর্ব্বত্রই দেখা যায় জনসাধারণের উপরেই হয় ও ক্ষতিও হয় জনসাধারণেরই। দোকান লুঠ ও অন্যান্য অনাচার যখন হয় তখন "বিক্ষুব্ধ" লুঠেড়া ও চোর ডাকাত জাতীয় ব্যক্তিগণ নিজেদের লাভ ও সুবিধা বুঝিয়াই লুঠতরাজ করিয়া থাকে। যে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের উপর ক্রোধ তাহাদিগের উপর কোন জুলুম করিবার ক্ষমতা আইনভঙ্গকারী জনতার মধ্যে দেখা যায় না অতএব এই জাতীয় বিক্ষোভের কোন শাসন-সংস্কারক শক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। স্কুল কলেজ অফিস প্রভৃতি বন্ধ করিয়া ছুটি উপভোগ করার জন্য কোন কোন অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তির এই জাতীয় বিক্ষোভ প্রদর্শনে সহানুভূতি থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু শিক্ষালয় ও দফতর বন্ধ রাখিলেও উপরওয়ালাদিগের কোন বিশেষ ক্ষতি বা অসুবিধা হয় না। এই কারণে জনসাধারণকে মারপিঠ লুঠ ও আগুন লাগাইবার ভয় দেখাইয়া হরতাল করার আমরা কোন সার্থকতা দেখিনা। যদি শাসকমণ্ডলী কোন অন্যায় বা অত্যাচার করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে বহু কিছু করা যায় যাহাতে শাসকগণকে উত্তমরূপে বোঝান যায় যে, তাঁহাদের স্বৈরাচার দেশবাসী সহ্য করিবেন না। কিন্তু হরতাল করিয়া গাড়ীতে আগুন লাগাইয়া বা দোকান লুঠ করিয়া সে কার্য্য হইতে পারে না। শাসকমণ্ডলী যদি আইন না মানিয়া যথেচ্ছাচার করেন, জনসাধারণ তাহা হইলে সেই শাসকদিগকে বিভিন্ন উপায়ে বুঝাইতে পারেন যে, যথেচ্ছাচার করা বরদাস্ত করা হইবে না। কিন্তু স্কুল কলেজ ও অফিস বন্ধ করিয়া সে কার্য্য হইবে না। কারখানা বন্ধ করিলে, ট্রেন থামাইলে বা স্টেশনে আগুন লাগাইলেও তাহা সাধিত হইবে না। কি উপায়ে হইবে? বহু উপায় চিন্তা করিয়া বাহির করা যাইতে পারে, যদি জনসাধারণ সেই বিষয়ে নজর দেন। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্রীয়দল নিজেরাই স্বৈরাচারী ও আইন অমান্যকারী তাঁহাদিগের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রথমে প্রয়োজন। তাঁহাদিগের আদর্শ, মতলব ও গুপ্ত অভিসন্ধিগুলি সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলকর কিনা তাহাও বিচার করা কর্ত্তব্য। নতুবা তাঁহাদিগের ইচ্ছায় ও সুবিধার জন্য জনসাধারণ কেন সংগ্রাম করিবেন? মনে প্রাণে রাষ্ট্রীয় দলগুলির সহিত জনসাধারণ একমত নহেন বলিয়াই ভারতে কোন রাষ্ট্রীয় কার্য্য যথাযথভাবে সুসিদ্ধ হয় না।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি

ইউনাইটেড ফ্রন্ট নামে যে কয়েকটি রাষ্ট্রীয় দল মিলিত ভাবে বাংলার রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়া শাসনকার্য্য চালাইতেছিলেন; কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার মধ্যে কয়েকজন বিধান সভার প্রতিনিধি ইউনাইটেড ফ্রন্ট ত্যাগ

করিয়া যাওয়ায় উক্ত ফ্রন্টের বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা চলিয়া যায়। এইরূপ ঘটিলে সাধারণতন্ত্রের রীতি অনুসারে বিধান সভায় ভোটের দ্বারা দেখা হয় যে, সত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হইয়াছে কি না। বাংলার গভর্ণর শ্রী ধর্ম্মবীর মুখ্য মন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জ্জিকে বিধানসভা আহ্বান করিতে বলিলে তিনি বলেন যে, ঐ কার্য্য ১৮ই ডিসেম্বর করা হইবে। এই কথাটা হয় নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। গভর্ণর বলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইলে যথাশীঘ্র সম্ভব বিধানসভা আহ্বান করা উচিত, কেন না সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে রাজ্য-শাসন অধিকার থাকে না। শ্রী অজয় মুখার্জ্জি নিজ সহকর্ম্মীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে বিধানসভা ডাকিতে রাজী হইলেন না। রাজ্যপাল তখন রাজ্য শাসন কার্য্য যথাযথ ভাবে না চালান, ক্রমাগত শান্তিভঙ্গ করা, বলপ্রয়োগ করিবার ভয় প্রদর্শন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানর জন্য ইউনাইটেড ফ্রন্টকে রাজ্যশাসন ভার হইতে অপসৃত করিয়া কংগ্রেস দল সমর্থিত শ্রী প্রফুল্ল ঘোষের ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টকে রাজ্য ভার অর্পণ করিলেন। শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ হইলেন এই শাসকমণ্ডলীর মুখ্যমন্ত্রী।

ইহার পরে ইউনাইটেড ফ্রন্টের সমর্থকগণ হরতাল, আইনভঙ্গ করা দাঙ্গা মারপিট, বাস ট্রাম প্রভৃতি জ্বালান ও ট্রেন থামান ইত্যাদি আরম্ভ করেন ও পুলিশ সেই অরাজকতা দমন করিবার জন্য গুলি চালাইয়া কিছু লোককে প্রাণে মারে ও আহত করে। ইউনাইটেড ফ্রন্টকে এই ভাবে বিতাড়ন করাতে ভারতের সর্ব্বত্র ইহা আইনসঙ্গত হয় নাই বলিয়া আন্দোলন হয়। বহু আইনজ্ঞের মতে এই ভাবে কোন গভর্ণমেণ্টকে বরখাস্ত করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার বলেন যে, বাংলার ইউনাইটেড ফ্রন্টের কোন কোন দলের লোকদের চীনের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধ থাকায় ও হিংস্র নীতি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা থাকায় উক্ত দলকে রাজকার্য্যে রাখা নিরাপদ ছিলনা। দেশের মঙ্গলের জন্য ও উক্ত দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় ঐ দলকে বরখাস্ত করা একান্ত আবশ্যক হয়। এই সকল কথার মূল্য যাহাই হউক, বিষয়টা আইনসঙ্গত হয় নাই বলিয়া বহু লোকের বিশ্বাস। ইউনাইটেড ফ্রন্টের কোন একটি দলের কার্য্যকলাপ অবশ্য দেশদ্রোহিতার গা ঘেঁষিয়া চলিয়া থাকে বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস।

ধরা যাউক যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় জ্ঞান অথবা সাধারণতন্ত্রের মূল আদর্শের প্রতি কোন ভক্তি নাই। তাঁহারা অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতাগণ শুধু নিজেদের সুবিধাই দেখেন এবং তাঁহারা অন্তরে অন্তরে একাধিপত্য ও স্বেচ্ছাচারেই বিশ্বাস করেন। জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস একটা শুধু লোক-দেখান ভঙ্গী মাত্র। অতএব অপরপক্ষ, অর্থাৎ কংগ্রেসের বিরুদ্ধ দলগুলির নেতাগণ সাধারণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা একটি উচ্চস্থানে রক্ষা করিয়া দেশে ন্যায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টাশীল। কিন্তু জনসাধারণকে পরামর্শে না ডাকিয়া শুধু নিজ নিজ দলের তরফ হইতে হরতাল ডাকা কি উচ্চ আদর্শ অনুগত? এবং যদি কেহ হরতালের ডাক না মানিয়া দোকান খোলে অথবা গাড়ী চড়িয়া পথে বাহির হয় তাহা হইলে সেই হরতালে অনিচ্ছুক লোকেদের দোকান লুঠ করা বা গাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া কি ন্যায় প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক? অর্থাৎ কংগ্রেসের নেতাগণ যেরূপ তাঁহাদিগের ইচ্ছায় লোকে কাজ না করিলে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করেন; কম্যুনিষ্ট বা অন্যদলগুলির ঠিক সেই ভাবেই সর্ব্বসাধারণের ইচ্ছাকে অসম্মান প্রদর্শন করিয়া চলেন। দেখা যাইতেছে যে, সাধারণের কোন অধিকার বা দাবী থাকা রাষ্ট্রীয় দলের মতে সঙ্গত নহে। শুধু কোন না কোন রাষ্ট্রীয় দলের তাঁবেদারি করাই জনসাধারণের জীবনযাত্রার একমাত্র কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছাচারের প্রতিযোগিতায় দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস ও ইউনাইটেড ফ্রন্ট উভয় পক্ষই স্বৈরাচারের চূড়ান্ত করিয়াছেন। কেহ বেআইনী ভাবে শাসকমণ্ডলী বরখাস্ত ও কোন গোলযোগ হইবার পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রামের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছেন, কেহ বা যাহার ইচ্ছা তাহার দোকানের কাচ ভাঙ্গিয়া, গাড়ী পুড়াইয়া, কাজকর্ম্মে ও পাঠে বাধা দিয়া এবং জোরাল হস্তে সর্ব্বসাধারণকে গৃহে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিয়া "জনবিক্ষোভ" দেখাইতেছেন। সাধারণতন্ত্র ও সর্ব্বজনের স্বাধীনতা ক্রমশঃ হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। এখন কংগ্রেসের অথবা কংগ্রেস-বিরুদ্ধ দলের

যাহারই হউক, একটা বলপূর্ব্বক একাধিপত্য স্থাপন ব্যবস্থার সূচনা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। পেশাদার রাষ্ট্রনেতাদিগকে রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে বহিষ্কার না করিলে জন-স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

দেশের সুশাসন ও সুশৃঙ্খলভাবে দেশের লোকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির ও অভাব নিবারণের চেষ্টা না করিয়া যদি শাসকমণ্ডলী, যে দলেরই হউক না কেন, শুধু দলের শক্তিবৃদ্ধি ও দলের মতলব সিদ্ধির চেষ্টা করিয়াই সময় কাটান, তাহা হইলে রাজ্যভার যে দলের উপরেই অর্পিত হোক না কেন, সাধারণের মঙ্গল তাঁহাদিগের দ্বারা সাধিত হইতে পারিবেনা। কংগ্রেসের মতলব ছিল সকল জাতির নিকট ও স্বদেশে ক্রমাগত কর্জ্জা করিয়া সেই অর্থ অপব্যয় করা। অপরাপর দলের লোকেরাও বিশেষ কোন কর্ম্মশক্তি দেখাইতে সক্ষম হ'ন না; উপরন্তু কোন কোন দল দেশের শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়া দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় কোন শাসকমণ্ডলীই দেশবাসীর বিশেষ কোন উপকারে লাগেন নাই। বাংলাদেশের ইউ, এফ সরকারকে সংখ্যালঘিষ্ঠতা অনুমান করিয়া শাসনশক্তি হইতে অপসারণ করা ন্যায় ও আইনসঙ্গত হইয়াছে কি না তাহা উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বিচার্য্য বিষয়। গায়েরজোরে সকল লোককে হরতাল করিতে বাধ্য করা ও কথা না শুনিলে তাহাদিগের নিগ্রহের ব্যবস্থাও আইনসঙ্গত কার্য্য নহে। সুতরাং কংগ্রেস সরকার যদি বেআইনী ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দলকে রাজ্য-ভার হইতে সরাইয়া থাকেন, তাহাতে ঐ দলের জন-সাধারণের জীবনযাত্রা দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিবার অধিকার জন্মাইতে পারে না। হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট প্রভৃতি আদালতের সাহায্যে যে যাহার ন্যায্য পাওনা পাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু নির্দ্দলীয় ব্যক্তিদিগের কাজকর্ম্মের, শিক্ষার ও জীবনযাত্রার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিবার অধিকার কাহারও পক্ষে এইভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না।

এই সকল গোলমালের সহিত ব্যক্তিগতভাবে প্রতিনিধি-গণের রাষ্ট্রীয় দল পরিবর্ত্তন করাও বিশেষ করিয়া জড়িত রহিয়াছে। কোন দেশে যদি কোন কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি দল পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে পুনঃ নির্ব্বাচনে যাইতে বাধ্য করা হয়। কোন রাষ্ট্রীয় বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইলেও দেশবাসীর মতগ্রহণ করা হইয়া থাকে "রেফারেণ্ডাম" ব্যবস্থা করিয়া। বর্ত্তমানে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রায়ই প্রতিনিধিগণ দল পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং এই অভ্যাসের সুযোগ লইয়া নূতন নূতন মিলিত দলের সৃষ্টিও হইতেছে। এইরূপ ঘটনা জাতীয়ভাবে বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে।

বাংলার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা উত্তরোত্তর অরাজকতার চরমে পৌছাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার নানাভাবে বিপ্লববাদকে দেশে নূতন শক্তি দান করিবার জন্য সাধারণ মানুষের অবস্থা বিশেষভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কংগ্রেসের স্বৈরাচার দূর হইয়াছে জানিয়া জনসাধারণ সকল অভাব অভিযোগ সহ্য করিয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ এত খারাপের দিকে যাইতে থাকে যে, মনে হইতেছিল, দেশের রাজশক্তি উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থাতে কংগ্রেসদল সহজেই ভাবিতে আরম্ভ করিলেন যে, অতঃপর ইউ এফকে তাড়াইয়া অপর দলের হস্তে রাজ্যভার দেওয়া অসম্ভব হইবে না। সুতরাং যেসকল ব্যক্তি ইউএফ-ত্যাগ করিয়া অপর দল গঠনে প্রস্তুত ছিলেন তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালান আরম্ভ হয়। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ পূর্ব্ব হইতেই ইউ এফ-এর ব্যবহার পছন্দ করিতেছিলেন না। তিনি চীনবন্ধু বাম কম্যুনিষ্টদিগকে বিশেষ করিয়া শত্রুবোধ করিতে আরম্ভ করেন। এই জন্য তিনি ও তাঁহার সঙ্গে আরও অনেক এসেম্ব্লীর সভ্যগণ ভিতরে ভিতরে কংগ্রেস-দলের সহিত মিতালী করিয়া ইউএফকে উল্টাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। যখন দেখা যাইল যে, এই সকল ব্যক্তি ইউ এফ ত্যাগ করিয়া পৃথক দল গঠন করিলে ইউ এফের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর থাকিবে না, তখন তাঁহারা বাংলার

শেষাংশ ৪২৩ পাতায়

হিন্দু কলেজে ডিরোজিও প্রসঙ্গ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ধূমায়িত বহ্নি:

হিন্দু কলেজের কথা বলিতে হইলেই স্বতঃই ডিরোজিও প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যে অধ্যায়টির কথা এখন বলিব, তখন হিন্দু কলেজ হইতে যুব-ছাত্রগণ ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে 'পার্থেনন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিতেছিলেন, কিন্তু প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার পরই ডাঃ উইলসন উহা বন্ধ করিয়া দেন। নানাকারণে হিন্দু সমাজপতিগণ খুবই বিচলিত হন। অবশ্য বিচলিত হইবার অন্য কারণও বিদ্যমান ছিল।

রামমোহন রায় তখন কলিকাতা সমাজে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি পূর্ব হইতেই তোড়জোড় করিতেছিলেন। সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর তাঁহারা বড়লাট বেন্টিঙ্ককে লাট ভবনে গিয়া প্রকাশ্যে মানপত্রও প্রদান করেন। এইসব কারণেই রক্ষণশীল হিন্দুদের ভিতর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সহজেই অনুমেয়। সতী আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষকালের মধ্যেই রামমোহন কোন কোন অনুগামীসহ টাউন হলে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়দের একটি সাধারণ সভায় মিলিত হন এবং এদেশে ইউরোপীয়রা যাহাতে আইন সম্মত ভাবে স্থায়ী বাসিন্দা হইতে পারে তাহার সপক্ষে নানা যুক্তি প্রমাণ সহ বক্তৃতা করেন। অপর পক্ষে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এই প্রস্তাবের বিশেষ বিরোধিতা করিতে থাকেন। ১৮৩০ সনের জানুয়ারি মাসে রামমোহন ব্রহ্ম সভা বা ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। ইহাতেও হিন্দুরা চটিয়া যান। তাহারা রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যতঃ সতী আইনের বিপক্ষতা করার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপন করিলেন। একদিকে রামমোহন ও তাঁহার অনুগামীরা, অপরদিকে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিরা—উভয়ের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল।

আবার রামমোহনের ব্যক্তিগত আচার আচরণ দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দুদের মনে এক বিতৃষ্ণার ভাব জাগায়। তিনি আহারে বিহারে জাত বিচার করেন না। সুরাপানে তিনি অভ্যস্ত। তিনি আহারে বসিয়া পরিমিত সুরা পান করিতেন। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যাহা রামমোহনের পক্ষে 'পরিমিত' ছিল, তিনি হয়ত খেয়াল করেন নাই—অপরের পক্ষে তাহা পরিমিত নাও হইতে পারে। অথবা তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিলে অপরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তথাকথিত প্রগতিশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সুরাপানের রেওয়াজ রামমোহন হইতেই বেশি করিয়া প্রচলিত হয়। তাহার অনুগামী শিষ্য রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয়ের সুরাপানের একটি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রী মহাশয় ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দকিশোর মিতপায়ী ছিলেন। পুত্র রাজনারায়ণের অমিত-পানাহার দেখিয়া তাহা সংযত করিবার সার্থক চেষ্টা করেন। ডিরোজিও শিষ্যরা প্রগতিপন্থী। রামমোহনের দরুণই যে তাঁহারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন এমন কথা বলি না। কিন্তু তৎকালে প্রচলিত রেওয়াজ যাহা প্রগতিশীল বলিয়া পরিচিত মানুষের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে কসুর করেন নাই। ডিরোজিও শিষ্যগণ সুরাপায়ী ছিলেন কিন্তু তাহারা 'মদ্যপ' ছিলেন না। এমন কি ঋষিপ্রতিম রামতনু লাহিড়ীও মদ্যপান করিতেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ বিশেষতঃ ইহার নেতৃস্থানীয় সংযত আচার সম্পন্ন নিষ্ঠাবান রামকমল সেন ও রাধাকান্ত দেব ইহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। হিন্দু কলেজের

যুব-ছাত্রদের সংযত করাইবার জন্য তাঁহারা যেসব বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন তাহার মূলেও এই কারণটি বিদ্যমান ছিল বলিয়া বিশ্বাস।

কলেজের শিক্ষায় যুব ও কিশোর-ছাত্রগণ যে বরাবর উন্নতি করিতে ছিল সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ খুবই সচেতন ছিলেন। এমন কি তাঁহাদের কাহার কাহার উক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা পত্রাংশ হইতে ইহা স্পষ্টতঃই জানা গিয়াছে। ১৮৩০ সনের প্রথমেই তাঁহারা ছেলেদের আচরণের উপর এতটা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন কেন ? বলাবাহুল্য শিক্ষক ডিরোজিওর উপরেও তাঁহারা খুবই চটিয়া গেলেন। ১৮৩০ সনের প্রথমেই 'পার্থেনন' প্রকাশ বন্ধ করাইবার মধ্যে ইহা পরিষ্কার বুঝা গেল। ডিরোজিও প্রগতিপন্থী, হিউমের যুক্তিভিত্তিক মতামত দ্বারা সবিশেষ অনুপ্রানিত। কিন্তু কার্যে যখন তাহার প্রতিফলন ঘটিল তখনই কলেজ-কর্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সতী আইনের সপক্ষে কবিতা লিখিয়াছেন। রামমোহনের যেসব কার্যকলাপের কর্তৃপক্ষ বিরোধী ডিরোজিওর শিষ্যরা পার্থেনন মারফত প্রকাশ্যে তাহারই সপক্ষতা করিলেন। তদুপরি প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির উপর বিষোদ্গার করিতেও তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। কাগজখানি বন্ধ করা হইল বটে, কিন্তু ছাত্রদের কার্যকলাপ সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় কি ? কার্য-বিবরণ পাঠে জানা যায় ইহা লইয়া পূর্বাহ্নে ডাঃ উইলসন এবং রাধাকান্ত দেব প্রমুখ অধ্যক্ষগণের মধ্যে পত্রালাপ হইয়াছিল। শুধু কাগজখানি বন্ধ করিয়াই তো কর্তব্য শেষ হইল না। ছাত্রদের আচার আচরণ সংশোধন করাও তো প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই তাহাদের নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণ, বিজাতীয়দের সঙ্গে পঙক্তি ভোজন, প্রভৃতি বিষয় কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছিয়াছিল। সরকার এবং অধ্যক্ষগণের বিশ্বাসভাজন ডাঃ উইলসন এই উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ইস্তাহার শিক্ষকগণের মধ্যে জারি করিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৮৩০)।

The teachers are particularly enjoined to abstain from any communication on the subject of the Hindu Religion with the boys or to suffer any practices inconsistent with the Hindu notions of propriety such as eating or drinking in the School or Class Rooms. Any deviation from this injunction will be reported by Mr. D, Anselme to the Visitor immediately and should it appear that the Teacher is at all culpable he will forthwith be dismised. (হিন্দু কলেজের হাতে লেখা কার্যবিবরণী হইতে উদ্ধৃত।)

ইহাতে এই মর্মে বলা হইল যে, শিক্ষকগণ কোনক্রমেই হিন্দুধর্ম বা হিন্দু রীতিনীতি লইয়া আলাপ আলোচনায় রত হইবেন না। যদি দেখা যায় কোন শিক্ষক ইহাতে লিপ্ত হইয়াছেন তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম হইতে বরখাস্ত করা হইবে। বুঝা যায় একাডেমিক এসোশিয়েশনে প্রচলিত হিন্দুধর্ম সংপৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের বিরুদ্ধে আলোচনাদির কথাও কর্তৃপক্ষের কানে গিয়াছিল। পঙক্তিভোজন, সুরাপান প্রভৃতি হিন্দু-রীতিবিরুদ্ধ। এই সব কার্যের বিরুদ্ধেও উক্ত আজ্ঞাপত্রে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

নবীনে প্রবীণে

পূর্বোক্ত আজ্ঞাপত্রে এইরূপ ইঙ্গিত মেলে যে, ডিরোজিওই ছিলেন উহার লক্ষ্য। বস্তুতঃ কলেজে এবং কলেজের বাহিরে ডিরোজিও প্রদত্ত শিক্ষা, আলাপ, আলাপন, আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির দরুণই বয়স্ক ছাত্রদের একাংশ হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্পর্কীয় প্রচলিত রীতিনীতির সক্রিয়ভাবে বিরোধী হইয়া ওঠে। ইহা যে ডিরোজিওর শিক্ষারই ফল সে সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকুও অবকাশ নাই। সত্য বটে, পূর্বেকার পনর বৎসর যাবৎ রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের সার একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার আচরণের ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠেন। তিনি পৌত্তলিকতা তথা হিন্দু সমাজের পূজা পদ্ধতি ও তদন্তর্গত আচার নিয়মাদির অসারতা প্রতিপন্ন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিয়াছেন যে নিম্ন অধিকারীর পক্ষে

পুত্তলি পূজা প্রয়োজন। হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা ও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বৈষম্য এবং একের দ্বারা অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার প্রভৃতিরও বিরুদ্ধে 'রামমোহন' লেখনী ধারণ করেন। সহজেই বুঝিতে পারেন রামমোহনের আন্দোলন তত্ত্বধর্মী। কার্যতঃ নিজে যাহা করিয়াছেন তাহা অনুবর্তীরা সব ক্ষেত্রে যে অনুসরণ করিবেন ইহা তিনি কোনক্রমেই আশা করেন নাই।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুধর্মে প্রচলিত রীতি-নীতি আচার আচরণের বিরুদ্ধে একরকমের বলিষ্ঠ মানসিকতা গড়িয়া ওঠে। পৌত্তলিকতা এবং পৌরোহিত্য প্রথার বিষম শত্রু হইয়া উঠিল তাহারা। কোনমতেই যাহা যুক্তিসিদ্ধ নয় এমন কিছু মানিয়া লইতে এই সকল যুব-ছাত্র একান্ত অনিচ্ছুক। তত্ত্ব বা ইচ্ছার দিক হইতেই নয়, কার্যতঃও তাহারা ইহার বিরোধিতা করিত। পাঠক লক্ষ্য করিবেন একটু আগে 'সক্রিয়ভাবে' কথাটি প্রয়োগ করিয়াছি। তাহারা তাই শুধু সোচ্চার নয়, এই সকলের বিরুদ্ধে সক্রিয়ও হইয়া উঠিল। ডিরোজিওর যুক্তিভিত্তিক আলাপ আলোচনা তাহারা দিনের পর দিন শুনিতে থাকে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্বদেশ ও সমাজ-হিতকর বিস্তর বিষয়ও ছিল—। স্বীয় সমাজের গলদ ও কলুষ তাহাদের চোখে বেশি করিয়া ধরা দিল। কৃষ্ণমোহনের উক্তি হইতে জানিতে পারি, এই সকল যুবক খ্রীষ্টান পাদ্রি তথা প্রচলিত খ্রীষ্টীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধেও আন্দোলন উপস্থিত করে। কিন্তু তাহা তেমন প্রচারিত হয় নাই। যুবকগণ হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কাজেই স্বকীয় পৈত্রিক ধর্ম ও সমাজের উপর তাহাদের যেসব বিরোধী ক্রিয়া-কলাপ তৎসমুদয়ই বেশী করিয়া সমসাময়িক লোকেদের চোখে ধরা পড়ে। আর এই জন্যই তাহারা ইহাদের উপর এতটা খড়্গহস্ত হয়। যুবকদের কার্য এবং সামাজিক-গণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয় একটু পরে বলিতেছি।

ইতিমধ্যে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আলেকজেণ্ডার ডাফ ছিলেন একজন কৃতবিদ্য পাদ্রি। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ১৮৩০ সনের মাঝামাঝি রামমোহন রায়ের সহায়ে হিন্দু বালকগণের ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। রামমোহন প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তৃতায় এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু বালকদের বাইবেল পাঠ করা কর্তব্য। বিভিন্ন ধর্মের সার জানার আপত্তিকর কিছুই হইতে পারে না, বরং ইহাতে চিত্তের উদারতাই বৃদ্ধি পায়। দেখিতেছি রাম-মোহনের এই ধারণা অপরাপর শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যেও অনুক্রামিত হয়। এমন কি ডেভিড হেয়ার যিনি খ্রীষ্ট-ধর্মে আদৌ আস্থাশীল ছিলেন না তিনিও এই মতবাদের সমর্থক হইয়া ওঠেন। ডিরোজিও যুক্তিবাদী সত্য-সন্ধানী। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁহার যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছিল এরূপ প্রমাণাভাব। তথাপি তিনিও খ্রীষ্টধর্মান্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় যুবছাত্রদের যোগদান আপত্তি করেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ইহার দরুণ তাহাদের চিত্তের ঔদার্য ও মনের বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। তাই যখন এই বৎসরের আগষ্ট মাসে ডাফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ হিন্দু কলেজের সন্নিকটে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে সুরু করেন তখন তিনি হেয়ারের সম্মতিক্রমেই ছাত্রদের যোগদান সমর্থন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণ কিন্তু ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা বক্তৃতারম্ভের পর কয়েকদিনের মধ্যেই ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৩০ তারিখে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত অনুজ্ঞাপত্র প্রচার করেন :

The Management of the Anglo Indian College having heard that several of the students are in the habit of attending societis at which political and religious discussions are held, think it necessary to announce their strong disapprobation of the practice and to prohibit its continuance. Any student being present at such a society after the promulgation of this order will incur their serious displeasure. (ঐ হইতে)

ইহাতে বলা হইল, কতকগুলি ছাত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সভা সমিতিতে যোগদান করিতেছে। এরূপ যোগদানে অধ্যক্ষগণের ঘোরতর আপত্তি রহিয়াছে। এবং তাহারা যাহাতে যোগ না দেয় সেরূপ অনুজ্ঞাও তাহারা দিতেছেন। যেসব ছাত্র এই আদেশ লঙ্ঘন করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। এই অনুজ্ঞাপত্র লইয়া তখন সংবাদপত্রেও বেশ আলোচনা চলে। ইণ্ডিয়া গেজেট লেখেন যে, যুব-ছাত্রদের বিবেকবুদ্ধিকে এই রকমভাবে ব্যাহত করার প্রয়াস খুবই নিন্দনীয়। কলেজ পরিচালনার ব্যয়ের এক মোটা অংশ সরকার দিয়া থাকেন; কাজেই কোন এক সম্প্রদায় বিশেষের সংকীর্ণ স্বার্থে ছাত্রদের বিচারবুদ্ধির উপর ব্যাঘাত ঘটানো হইতেছে বলিয়া সরকারের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত। তখন 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' কথাটির চলন ছিল না। নহিলে ইহার দ্বারা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' যে হরণ করা হইতেছে তাহাও হয়ত আমরা শুনিতে পাইতাম। অবশ্য উক্ত সমালোচনার মর্ম ঐ রূপই। কেহ কেহ বলেন গেজেটের এই মন্তব্য ডিরোজিওরই লেখা।

তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফেও কিছু বলিবার আছে। উপরে বলিয়াছি, পাদ্রিদের খ্রীষ্ট-ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতায় ছেলেদের যোগদানে তাহারা প্রমাদ গণেন। পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনা করিলে হিন্দু-প্রধানদের আপত্তির কারণ বুঝা কঠিন হইবে না। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শ্রীরামপুরের পাদরিরা হিন্দুধর্মের উপর এমন বিষোদ্গার করিতে আরম্ভ করেন যে, রামমোহন রায় পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার এতদ্বিষয়ক বাংলা ও ইংরাজি রচনা ইতিহাসের বস্তু হইয়া আছে। খ্রীষ্টান পাদরিদের অপপ্রচার হিন্দুদের মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। তাহারা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যে গৌড়ীয় সমাজ স্থাপন করেন এবং যাহার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন রামমোহন-পন্থী প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রক্ষণশীল-প্রধান রামকমল সেন, তাহারও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাদরিদের এই অপপ্রচার প্রতিরোধ করা। এই হেতু তাঁহারা হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থাদি প্রকাশের সহায়তা করিতে সুরু করেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন দেখি, রামমোহন অনেকটা পশ্চিম-ঘেঁষ হইয়াছেন এবং এই কারণে হিন্দু-প্রধানেরা তাঁহার উপরে বিরাগভাজন হইয়া ওঠেন। সে যাহা হোক কলেজ কর্তৃপক্ষের আতঙ্কের মূলে যে যথেষ্ট কারণ ছিল তাহাও এই প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়া রাখা দরকার। পাদরিদের উক্ত বক্তৃতা ইহার পর কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়।

এই সময়ে কিন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ লইয়া যুব-ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে সংঘাত পাকিয়া উঠিল। ইহাকে বলা যায়, নবীনে প্রবীণে আদর্শ-সংঘাত। ছেলেরা কেহ কেহ ধর্মীয় রীতিনীতি আর মানিতে চাহিল না। পূজা-অর্চনায় তাহারা বিমুখ। মণ্ডপে চণ্ডীপাঠ করিতে বসিয়া হোমারের ইলিয়াড এণ্ড ওডিসি আবৃত্তি করিতে লাগিয়া গেল। একটি কৌতুককর ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করি, যদিও কিছু পরের কথা। জনৈক ভদ্রলোক একদিন পল্লীগ্রাম হইতে আসেন এবং হিন্দুকলেজে পাঠরত পুত্রকে লইয়া কালীঘাটে যান। যথারীতি পিতা যখন পুত্রকে বলিলেন কালীমাতাকে প্রণাম কর। তখন সে বলিয়া উঠিল 'গুডমর্ণিং ম্যাডাম'। এক শ্রেণীর ছাত্রদের মনে দেবদেবীর প্রতি যে-মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল এই উক্তিটি তাহাই সূচিত করে। ভক্ষ্যাভক্ষ লইয়া প্রবীণে নবীনে সংঘর্ষ বাধিল। পঙ্‌ক্তি ভোজন, মুসলমানদের দোকান হইতে রুটি গ্রহণ, যেসব খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ নিয়ম বিরুদ্ধ তাহা খাওয়া, সুরাপান প্রভৃতির রেওয়াজ ছেলেদের মধ্যে খুবই বাড়িয়া যায়। আবার এমনও শুনা যায়, যখন টিকিধারী ব্রাহ্মণকে রাস্তায় দেখিত তখন তাহারা 'আমরা গরু খাই, গরু খাই' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিত। ইহার উপর পাদরিদের ঐ বক্তৃতা হইল বোঝার উপরে শাকের আঁটি। এখন সহজেই বুঝিতে পারেন, হিন্দু-প্রধানেরা কেন তখন ছেলেদের শিক্ষার প্রতি অতখানি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারা ছেলেদের বাগ মানাইবার জন্য কতকগুলি উপায়ও অবলম্বন করেন। অবাধ্য ছেলেদের বশে আনার জন্য তাহাদের উপর নানারূপ নির্যাতন করিতে আরম্ভ করেন। কোন কোন ছাত্র যেমন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। রসিককৃষ্ণ

মল্লিককে একপ্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করা হইয়াছিল, উদ্দেশ্য এই অবস্থায় তাহাকে কাশীতে প্রেরণ করা। কিন্তু শীঘ্রই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ইহা আর সম্ভব হয় নাই। ছেলেদের 'শুদ্ধ' করিবার জন্য গোময় খাওয়াইতেও কেহ কেহ ছাড়েন নাই। আবার বেঙ্গল স্পেক্টেটর পাঠে জানা যায় কেহ কেহ ছেলেদের স্বমতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য 'বিষ' ভক্ষণও করাইয়াছিলেন। সমাজ মধ্যে এইরূপ একটা ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল ১৮৩০ সনে।

আর একটি কথা। ডিরোজিও তখন কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত। ছেলেরা তাঁহার কথায় ওঠে বসে। এ কারণ অভিভাবকবর্গের রোষ তাঁহার উপরেই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। দেখিতেছি এক শ্রেণীর লোক ডিরোজিওর কুৎসা রটনায় তখন খুবই তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য সত্য-মিথ্যা কত কথাই না তাহার নামে প্রচার হইতেছিল। সরলপ্রাণ ডিরোজিও হিন্দুসমাজের বহির্ভূত বলিয়াই মনে হয় এই সকল কুৎসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। যাহা হোক, ইহা হিন্দুদের মনকে খুবই তোলপাড় করিয়া তোলে। তাঁহারা অন্ততঃ ২৫ জন ছাত্রকে কলেজ হইতে নাম কাটাইয়া লইলেন। আরও ১৬৫ জন ছাত্র অভিভাবকদের নির্দেশে কলেজে আসা বন্ধ করিল। ফলে কলেজের অস্তিত্ব রক্ষায়ই দায় হইয়া উঠিল। কলেজ কর্তৃপক্ষ এতদিন বিধিমতে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে সংযত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ফলোদয় না হওয়ায় তাঁহারা একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। বহু আয়াসে ও অর্থে যে কলেজটিকে তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার এইরূপ ভয়ংকর বিপদা-বস্থায় কর্তব্য নির্ধারণের জন্য অধ্যক্ষ-সভা ত্বরায় আহূত হইল।

ঐতিহাসিক অধিবেশন

অধ্যক্ষ-সভার অধিবেশন, ১৮৩১, ২৩শে এপ্রিল শনিবার। সভায় উপস্থিত ছিলেন—চন্দ্রকুমার ঠাকুর (গবর্ণর), হোরেস হেম্যান উইলসন (সহ সভাপতি), রাধা মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্তদেব, রামকমল সেন, ডেভিড হেয়ার, রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), বিচার্য-বিষয় রাম কমল সেনের স্মারকলিপি। স্মারকলিপিখানি এই:

১। যেহেতু সব নষ্টের গোড়া এবং সাধারণ জনগণের আতংকের কারণ ডিরোজিও সেহেতু তাঁহাকে কলেজ হইতে অপসারণ করা হোক এবং তাঁহার ও ছেলেদের মধ্যে যোগা-যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হোক।

২। উচ্চতর শ্রেণীর যে সকল ছাত্রের কদাচার সম্বন্ধে জানা গিয়াছে এবং যাহারা ভোজসভায় যোগ দিয়াছে কলেজ হইতে তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হোক।

৩। যে সকল ছাত্র প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্মের ও দেশের প্রচলিত আচার আচরণের প্রতি বৈরি এবং কার্যতঃ আচরণ দ্বারা যাহারা ইহার প্রমাণ দিয়াছে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হোক।

৪। কলেজের ভর্তির বয়স এবং অধ্যয়ন কাল যথাক্রমে ১০ হইতে ১২ এবং ১৮ হইতে ২০ করা হোক।

৫। ছেলেদের কৃত অপরাধের জন্য সতর্কবাণী বিফল হইলে দৈহিক দণ্ড প্রবর্তন করা হোক। প্রধান শিক্ষকের বিবেচনার উপর ইহা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

৬। স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে পূর্বে অনুসন্ধান না করিয়া ছেলেদের যথেচ্ছ ভর্তি করা চলিবে না।

৭। যখনই ইউরোপীয় শিক্ষক পাওয়া যাইবে তখনই তাহাদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। তবে নিয়োগের পূর্বে তাহাদের স্বভাব চরিত্র ও ধর্মবোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত রূপে জানিয়া লইতে হইবে।

৮। সান্ধ্য বক্তৃতা বন্ধ করা হোক।

৯। ছুটির পরে কলেজে ছাত্রদের থাকিতে দেওয়া হইবে না।

১০। ছাত্রদের কেহ যদি অপ্রকাশ্য (private) বক্তৃতা বা সভায় উপস্থিত হয় বা অংশ গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে বহিস্কৃত করা হোক।

১১। পঠিতব্য বই এবং প্রত্যেক বিষয়ে পড়ানোর সময় নির্দিষ্ট করা হোক।

১২। যে সকল পুস্তকের দ্বারা ছেলেদের নীতিবোধ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে সে সকল পুস্তক কলেজে আনা, পড়ানো অথবা পড়া নিষিদ্ধ করা হোক।

১৩। ছেলেদের ফার্সী এবং বাংলা পড়ার নিমিত্ত অধিকতর সময় দেওয়া হোক।

১৪। উচ্চতর শ্রেণীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের ব্যবস্থা থাকিবে।

১৫। যে সকল ছাত্র ভাল চরিত্রের, ও লেখাপড়ায় ভাল এবং যাহাদের কলেজে অধিকতর সময় থাকা হিতকর বিবেচিত হইবে কেবল তাহাদিগকেই মাসিক বৃত্তি দেওয়া হোক।

১৬। বৃত্তিলাভেচ্ছু ছাত্রদের সংস্কৃত অথবা আরবিতে আশানুরূপ দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন।

১৭। স্কুল সোসাইটি হইতে প্রেরিত ছাত্রদিগকে এ পর্যন্ত যেরূপ করা হইয়াছে তাহার বদলে প্রচলিত পদ্ধতিতে ভর্তি করা হইবে। ছাত্রদের শ্রেণী প্রধান শিক্ষক নির্ধারণ করিবেন।

১৮। দরজা বন্ধ করিয়া ছেলেদের পড়াইবার ধারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক।

১৯। শিক্ষকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আহারের স্থান করিয়া দেওয়া হোক এবং স্কুল (ক্লাসের) টেবিলে খাওয়ার রীতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হোক। (অধ্যক্ষ সভার হাতে-লেখা কার্য বিবরণ। (ইংরেজির তাৎপর্য।)

শুধু ডিরোজিও সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভায় কিরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহাই আমি এখানে বলি। স্মারকলিপির প্রথম আলোচ্য বিষয় লইয়া নিম্নের প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হইল :

Whether the managers had any just grounds to conclude that the moral and religious tenets of Mr. Derozio as far as ascertainable from the effects they have produced upon his scholars are such as to render him an improper person to be intrusted with the education of youth.(ঐ)

ডিরোজিও প্রদত্ত শিক্ষার ফলে তাহার নৈতিক এবং ধর্মীয় মতবাদ তাহার ছাত্রদের মধ্যে যেরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে যুবকদের শিক্ষা-দানের নিমিত্ত তিনি বেঠিক লোক—অধ্যক্ষগণের এইরূপ সিদ্ধান্তের যথার্থ ভিত্তি আছে কি না তাহাই বিবেচনার জন্য এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইলে, চন্দ্রকুমার ঠাকুর বলেন যে, ডিরোজিও প্রদত্ত শিক্ষার কুফল সম্বন্ধে শোনা কথা ব্যতিরেকে তিনি কিছুই জানেন না। এ সম্বন্ধে উইলসন এই মত প্রকাশ করেন যে, তিনি কুফল তো প্রত্যক্ষ করেনই নাই, বরং ডিরোজিওকে তিনি উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষক বলিয়াই মনে করেন। রাধাকান্ত দেবের মতে ডিরোজিও ছেলেদের শিক্ষাদানের ভার দিবার পক্ষে অতীব বেঠিক (improper) ব্যক্তি। রসময় দত্ত বলেন যে, শোনা কথা ছাড়া ডিরোজিওর সংস্কার (prejudice) সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই মত প্রকাশ করেন যে প্রতিকূল প্রমাণাভাবে তিনি ডিরোজিওকে সকল প্রকার দোষারোপ হইতে অব্যাহতি দিতেছেন। ডিরোজিও সম্বন্ধে যেসব কথা শোনা গিয়াছে তাহার দরুণ রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে তিনি একজন অনুপযুক্ত শিক্ষক বলিয়াই ধারণা করেন। রামকমল সেন রাধাকান্ত দেবের মত সমর্থন করিয়া বলেন, যুবজনের শিক্ষক হিসাবে ডিরোজিও একজন খুবই বেঠিক ব্যক্তি। ডিরোজিও যে আদৌ বেঠিক লোক নন সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেন। হেয়ারের মতে ডিরোজিও অতিশয় যোগ্য শিক্ষক এবং তাঁহার শিক্ষা সব সময়ই হিতকর হইয়াছে। (হাতে লেখা কার্য বিবরণী ইংরেজির তাৎপর্য্য)

উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে উপরোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে খুবই মতানৈক্য উপস্থিত হয়।

ডিরোজিও যে শিক্ষক হিসাবে অযোগ্য অধিকাংশ অধ্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবে এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তখন নিম্নরূপ প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল।

"Whether it was expedient in the present state of public feeling amongst the Hindu community of Calcutta to dismiss Mr. Derozio from the College." (ঐ)

তখন হিন্দু সমাজে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। এই কথা ব্যক্ত করিয়াই উপরোক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে, এমতাবস্থায় ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদ হইতে অপসারণ করা সংগত ও সময়োচিত কি না? এই প্রস্তাবের উপরে মতামত গৃহীত হইলে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরোজিওকে অপসারণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ভোট দিলেন। রসময় দত্ত ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুর বলেন যে বর্তমান অবস্থায় ডিরোজিওকে অপসারণ করা সময়োচিত কার্য এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ইহার বিপক্ষতা করেন।

শুধু হিন্দু মনোভাব সংপৃক্ত বলিয়া উইলসন ও হেয়ার এই প্রস্তাবের উপর ভোটদানে বিরত থাকেন। ইহার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়:

"Received that the measure of Mr. Derozio's remoral be carried into effect with due consideration of his merits and services."

অর্থাৎ ডিরোজিওকে কলেজ হইতে অপসারণ করাই স্থির হইল। অবশ্য তাঁহার গুণ ও সেবার কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হয়। (হিন্দু কলেজের অপ্রকাশিত ইংরেজি কার্য বিবরণ হইতে গৃহীত।)

উইলসন ও ডিরোজিওর পত্র বিনিময়: কলেজ হইতে বিদায়

অধ্যক্ষ সভার এই সিদ্ধান্ত উইলসন অবিলম্বে পত্রদ্বারা (২৫শে এপ্রিল ১৮৩১) ডিরোজিওকে জানাইলেন। ডিরোজিও-ও কালবিলম্ব না করিয়া ২৫শে এপ্রিল ১৮৩১ দিবসে উইলসনকে এক পত্রসহ অধ্যক্ষসভার নিকট পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। পদত্যাগ পত্রে তিনি সভাকে এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তাঁহার বক্তব্য বলিবার অবকাশ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ডিরোজিওর পদত্যাগ পত্রখানি এখানে হুবহু দেওয়া হইল।

To

The Managing Committee of the Hindu College

Gentlemen,

Having been informed that the result of your deliberations in close committee on saturday last, was a resolution to dispense with any further services at the college, I am induced to place my resignation in your hands in order to save myself the mortification of receiving formal notice of my dismissal.

It would however be unjust to my reputation, which I value, were I to abstain from recording in this connection certian facts which, I presume, do not apper upon the face of your proceedings. Firstly no charge was brought against me: secondly, if any accusation was brought forward, I was not informed of it, thirdly, I was not called upon to face my accesors if any such appeared, fourthly, no witness were examined on either side, fifthly, my character and conduct underwent scrutiny and no opportunity was afforded me of defending either. Sixthly, while a majority of the committee did not, as I have learned, consider me an unfit person to be connected with the college, it was resolved not with standing, that I should be removed from it. So that you resolved to dismiss me, unaccused, unexamined and unheared, without even the mockery of a trial. These are facts I offer not a word of comment.

I must also avail myself of this opportunity of recording my thanks to Mr. Wilson, Mr, Hare and ;Baboo Sreekissen Singh for

the part which I am informed, they respectively took in your procedings of saturday last.

I am, Gentlemen,

Your odedient servant

Calcutta Sd.—H. L. V. Derozio

25th April 1831.

(পত্রখানি কলেজের হাতে লেখা কার্য বিবরণী হইতে গৃহীত)। পত্রের শেষে অধ্যক্ষগণের নামও দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দিন হইতেই কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন হইল। এই পত্রে ডিরোজিও অধ্যক্ষগণকে কতকগুলি বিষয়ে দায়ী করিয়া কঠোর মন্তব্য করেন। যদিও এই দিন হইতে সম্পর্কচ্ছেদ হয় তথাপি উইলসন এই দিনই কতকগুলি বিষয় খোলসা করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে একখানি পত্র লেখেন। পত্রের প্রথমেই তিনি বলেন যে, ডিরোজিওর অধ্যক্ষগণের প্রতি অতটা কঠোর ('severe') না হইলেও পারিতেন। অধ্যক্ষগণ ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কালে তাঁহার গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করেন নাই। তাঁহারা শুধু 'expediency'-র (অবস্থানুযায়ী সময়োচিত ব্যবস্থা)--খ্যাতিরেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার পর ডিরোজিওর আচার আচরণ ও স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যেসব গুজব রটিয়াছে সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইবার নিমিত্ত উলইসন তাহাকে তিনটি প্রশ্ন করেন। ডিরোজিও ওই প্রশ্ন তিনটির বিস্তারিত জবাব দেন ২৬শে এপ্রিল লিখিত একখানি পত্রে। এই পত্রের অংশবিশেষ তাঁহার শিক্ষাদান ও আলোচনা পদ্ধতির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা না বলিলেও তিনি যে সত্যসন্ধানী এবং আস্তিক্য ও নাস্তিক্য বিষয়ে ছাত্র শিষ্যদের সম্মুখে সমস্ত দার্শনিক যুক্তি তুলিয়া ধরেন তাহার কথাও এই পত্র হইতে জানিতে পারি। তিনি লেখেন যে, যদি কোন কোন ছাত্র নাস্তিক হইয়াই থাকে তাহা হইলে অপর অনেকে আস্তিক রহিয়া গিয়াছে। কাজেই নাস্তিকতা শিক্ষার দোষ দেওয়া নিতান্তই ভুল। কিছু বাদসাদ দিয়া পত্রের এই অংশটি এখানে দিলাম।

"I can indicate my procedure by quoting no less arthodox an authority than Lord Bacon···"If a man" says this philosopher··· "will begin with certainties; he shall end in doubt." This I need scarcely observe is always the case with contended ignorance when it is roused too late to thought, one doubt suggests another and universal sceptism is the consequence, I therefore thought it my duty to acquaint several of the college students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Clenthes and Philo in which the most subtle and refined arguments against theism are adduced, But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume, replies which to this day continue unrefuted. This is the head and front of my offending."

ডিরোজিও শুধু কলেজের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই, পাছে তাঁহার সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজের ভিতর আবার কোনরূপ আলোড়নের সৃষ্টি হয় এ কারণ তিনি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হইতেও দূরে রহিলেন। দেখিতেছি ডেভিড হেয়ার তাঁহার পরে এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইলেও ছাত্র শিষ্যদের সঙ্গে ডিরোজিওর যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তিনি অতঃপর বৃহত্তর সমাজের সেবাকার্যে অগ্রসর হইলেন। সংবাদপত্র সম্পাদনাই তাঁহার জীবন ও জীবিকার প্রধান রসদ যোগাইতে লাগিল। সাংবাদিকতা ও সমাজ-সেবা দুটিই হইল এই সময় হইতে তাঁহার প্রধান কাজ। তিনি নিজ সমাজের উন্নতির চিন্তায়ও আত্মনিয়োগ করিলেন।

মৃত্যু অন্তহীন

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

কাউকেই প্রায় বলার দরকার হয়না, সন্ধ্যা হ'লে পোষা পায়রার মতো যে যার কুঠরিতে চ'লে যায়। তারপর প্রহরী এসে একে একে সব কটি দরজায় তালা লাগায়। সন্ধ্যাতেই সারা ওয়ার্ডে নেমে আসে গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা। আর তার সঙ্গে একটা বিষণ্ণ অবসাদ, একটা নিরানন্দ নিরুপায় একঘেয়ে ভাব। বন্দীরা ঘরের মধ্যে থেকে শোনে বারান্দায় দ্বাররক্ষীর ভারি জুতোর শব্দ, সহকারী কয়েদীর সঙ্গে তার চাপা গলায় অস্পষ্ট কথোপকথন, আর মাঝে মাঝে তর্জন হুঙ্কার। একতলার কুঠরিগুলি বন্ধ ক'রে ওরা দোতলায় চ'লে যায়। দোতলার বারান্দায় পা দিয়েই ওয়াডার হাঁক দিয়ে বলে—মাষ্টারজি, বহুৎ রাত হো গিয়া।

চিন্তায় বেহুঁশ মাষ্টারজিরও সে-ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত কণ্ঠে তিনি উত্তর দেন—হ্যাঁ সেপাইজি, অনেক রাত হয়ে গেছে। আর কথা বলতে বলতেই রেলিঙের কাছ থেকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকে যান।

এ প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। বিকেলবেলায় সহবন্দীরা যখন খেলতে বা বেড়াতে যায়, মাষ্টার মশাই তখন ঘর থেকে চেয়ারখানা টেনে এনে বারান্দায় রেলিঙের ধারে বসেন। তারপর কখন সকলে একে একে ফিরে এসে ঘরে ঢোকে, কখন সূর্য অস্ত গিয়ে অন্ধকার নেমে আসে, আর নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে যায় সারা জেলখানা তা সত্যিই তাঁর খেয়াল থাকেনা।

যত অন্ধকার ঘনায় ততই পরেশবাবুর মন দূর অতীতে চলে যায়। আপন মনে হাসেন, কথা বলেন। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট স্বরে আবৃত্তি করতে করতে উঠে দাঁড়ান, উত্তেজনায় পায়চারি সুরু করেন সারা বারান্দায়। কখনো বা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করেন অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে, আদালতে সওয়াল করার ভঙ্গিতে। অনেক সময় বিশ বছর আগের কোন তুচ্ছ ঘটনাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করার চেষ্টা করেন। যেন স্মৃতির সাগর তোলপাড় ক'রে অতলে তলিয়ে দিতে চান দুবছর আগের সেই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো দিনগুলি।

কিন্তু পারেন কই? শয়নে স্বপনে জাগরণে, শত ঘটনার ফাঁকে, সমগ্র মানুষের ভিড় ঠেলে ওরা এগিয়ে আসে।—বন্ধ ঘরে অবহেলিত অবস্থায় প'ড়ে আছে অণুর প্রাণহীন দেহ। শান্ত করুণ বিবর্ণ মুখ, নিমিলিত চোখের কোলে অশ্রুবিন্দু। কাগজের মতো শাদা হাত দুটি বুকের উপর জড়ো করা।—তারপরেই মনে পড়ে আত্মঘাতিনী বিমলার কথা। মৃত্যুর আগের দিন তাঁর পায়ের উপর আছড়ে প'ড়ে বলেছিল—দাদা বাঁচান আমাকে, আপনি ছাড়া কেউ নেই আমার।

কালো পাড়ের শাদা শাড়ী, কালো চুলের মাঝ দিয়ে দীর্ঘ রিক্ত সাদা সিঁথি, কালো চোখ দুটির কোল বেয়ে নিবারিত অশ্রুধারা। বিপন্না নারীর বুকভাঙা ব্যাকুল আর্তনাদে মুহূর্তের মধ্যে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গিয়েছিল পরেশবাবুর। তখনই কথা দিয়েছিলেন, সকল সামর্থ্য দিয়ে তিনি বিমলাকে রক্ষা করবেন; কিন্তু সেকথা রাখতে পারেন নি।

বিমলার মৃত্যু পরেশবাবু নিজের চোখে দেখেননি, বন্দী অবস্থায় স্ত্রী কল্যাণীর কাছে বর্ণনা শুনেছিলেন তার। সেই ভয়ংকর রাত্রে অণুর মৃত্যু ও তাঁর ধরা পড়ার খবর শুনেই, উন্মাদিনী দিশাহারা বিমলা আত্মহত্যার সঙ্কল্প নেয়।

পরেশবাবু শুনেছিলেন কল্যাণীর কাছে—রাত্রি এগারোটায় অমুর মৃত্যু ও স্বামীর গ্রেপ্তারির সংবাদে যখন তিনি পাগলের প্রায়, কি করবেন কোথায় যাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, দুটি আতঙ্কিত সন্তান আঁকড়ে ধরেছিল তাঁকে, তখন বিমলার কথা সত্যিই তাঁর মনে ছিল না। পাশের অন্ধকার ঘরটায় পাথরের মতো নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে বসে ছিল সে। সেই মুহূর্তে ভগ্নীর ঐ আচরণই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল কল্যাণীর, তাই তাকে কাছে ডাকেননি বা তার সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা করেননি। রান্নাবান্না হয়নি, তাই খেতে ডাকারও প্রশ্ন ছিলনা।

বসে থাকতে থাকতেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ রাত্রি তিনটে নাগাদ চমকে ওঠেন পাশের ঘর থেকে ভেসে আসা একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতেও কিছুক্ষণ কেটে যায়, তারপর ছুটে এসে যখন আলো জ্বালেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। গলায় ফাঁস দিয়ে কড়িকাঠে ঝুলছে বিমলা। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, আর হাত পাগুলো শেষ মুহূর্তের অবলম্বনের ব্যর্থ সন্ধানে কাঠের মতো সোজা।

বিমলার মৃত্যুর বিবরণ শুনে পরেশবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয় এমনিভাবে দল বেঁধেই আসে। কিন্তু তারপর যত ভেবেছেন, ততই মনে হয়েছে তাঁর, অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও হতভাগিনী বিমলার জীবনের এই সঙ্গত পরিণতি। সত্যই তার আর ফিরে যাওয়ার পথ ছিল না। তিনি বাইরে থাকলে হয়ত একটা উপায় করতে পারতেন। ওর শ্বশুরবাড়ী না চাইলেও জোর করে বিমলাকে রেখে দিতেন নিজের কাছে। কিন্তু কি হবে আর সেকথা ভেবে ?

ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বিমলার, বিধবা হয়েছিল বিশ বছর বয়সে, তিন বছরের মেয়ে কোলে নিয়ে। বাপের বাড়ীর জোর ছিল না, তাই শ্বশুরবাড়ীতেই পড়ে ছিল জীবনের শেষ চোদ্দটি বছর। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে দুবেলা বত্রিশজনের রান্না প্রায় একাই রাঁধতে হত তাকে। একটি মাত্র মেয়েকে সারাদিন একবার কাছে পেত না, রাত্রেও তাকে সঙ্গোপনে দুটো কথা বলার সুযোগ ছিল না। কারণ ওদের বিছানায় অনেক জায়গা বলে বহু সন্তানবতী বড় জায়ের দুটি মেয়ে শুতো সেখানে। মেয়ের নামে সারা দিন অভিযোগ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যেত বিমলার, তবু কোন সময় আড়ালে ডেকে তাকে বলতে পারত না অমু মা, তুই দুঃখী মায়ের মেয়ে, ওদের মতো সাজগোজ চালচলন তোর শোভা পায়না।

মৃত্যুর বছর দুই আগে একবার শ্বশুরবাড়ীর লোকেদের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল বিমলা, সেই সময় দিদি ভগ্নীপতির সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ ঘটে তার। তারপর পরেশবাবু নিজেই উদ্যোগী হয়ে ওর শ্বশুরবাড়ীতে লিখে বিমলাদের কলকাতায় আনিয়েছিলেন একবার। প্রায় এক মাস ছিল তারা সেবার।

বিদায় নেওয়ার সময় বিমলার বড় বড় চোখদুটি জলে ভরে গিয়েছিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলেছিল, এমন আনন্দে জীবনের এতগুলি দিন কখনও কাটেনি তার। আর কখনও আসা হবেনা, এই দুঃখই সেদিন বিমলার কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়েছিল।

পরেশবাবু তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, প্রতি বছর অন্ততঃ একমাসের জন্য তিনি ওদের নিয়ে আসবেন। কিন্তু সেদিন তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, বছর ঘোরার আগেই অভিশপ্ত জীবনের শেষ পূর্ণচ্ছেদ টানতে আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই বিমলা আবার তার বাসায় ছুটে আসবে।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও ছাত্র-পড়ানো সাঙ্গ করে রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরেছিলেন পরেশবাবু। ফেরা মাত্র কল্যাণীর আশ্চর্য ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। সারাদিনের জামাটা গা থেকে খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ?

পাথরের মতো স্থির হয়ে বসেছিলেন কল্যাণী। বেশ চেষ্টা করে স্বামীর প্রশ্নের জবাব দিলেন—বিমলা চিঠি লিখেছে।

—কি লিখেছে? কৈ দেখি—পরেশবাবুর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও বিস্ময়।

চশমা চোখে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বিমলার চিঠি পড়া শেষ করলেন। তারপর তিনিও নির্বাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে আবার একবার সারা চিঠিখানার উপর চোখ বুলিয়ে আপন মনে বলে উঠলেন—চার মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর ঘুম ভাঙলো বিমলার!—একটা দারুণ ক্ষোভ, নিরুপায়ের হতাশা সে কণ্ঠস্বরে।

কল্যাণী তখনও কোন কথা বলতে পারলেন না।

কয়েকটি দুঃসহ মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। আহার নিদ্রা ভুললেন পরেশবাবু। বাইরে ঘরে এসে আলো জ্বালিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। কল্যাণীও এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে পরেশবাবু আপন মনে বলে চললেন কাল সকালেই ওরা আসছে। বিমলার বিপদ বুঝি, কিন্তু আমি কি করতে পারি? কাকে গিয়ে বলব এসব কথা, কারই বা সাহায্য চাইব? ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পেলেও বাড়ী শুদ্ধ লোকের হাতে হাত-কড়া পড়বে। গরিব ছাপোষা মাষ্টার বলে ছেড়ে দেবে না।

কল্যাণী নীরব, নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। অনেকক্ষণ বাদে তিনি বললেন—কাল ওরা আসুক ত' তারপর যা হয় করা যাবে। হয়ত কিছুই নয়, শুধু শুধু ভয় পেয়েছে।

পরেশবাবু প্রায় চিৎকার করে কল্যাণীর কথার প্রতিবাদ জানালেন—পাগল হয়েছ তুমি? এসব ব্যাপারে কখনো মেয়েমানুষের ভুল হয়? এতদিন যে বিমলা বুঝতে পারেনি সেইটাই আশ্চর্য।

—তুমি কি জানো না সে বেচারার অবস্থা?—বোনের হয়ে বললেন কল্যাণী। সত্যিই পরেশবাবুর তা অজানা ছিল না, তাই তিনি চুপ রইলেন।

কল্যাণীই কথা বললেন আবার—এখন ওঠো, অনেক রাত হয়েছে। হাত মুখ ধুয়ে খাবে চলো। কাল ওরা এলে ভেবে চিন্তে যা হ'ক কিছু করা যাবে। আসতে বারণ করার ত সময় নেই আর।

সেদিন সারারাত্রি পরেশবাবু ঘুমাতে পারেন নি। বারবার উঠে ঘড়ি দেখেছেন, আর ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছেন। তারপর ভোরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে নিজেই ছুটে গেছেন দরজা খুলতে।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই প্রণাম করতে গিয়ে পায়ের কাছে আছড়ে পড়েছিল বিমলা। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সে, ছিন্নমূল তরুর মতো। পাশে অপরাধিনীর মতো শুষ্ক মুখে দাঁড়িয়েছিল অনু।

যার কেউ নেই তার নাকি ভগবান আছেন। কিন্তু সেদিন বিমলাকে দেখে, পরেশবাবুর মনে হয়েছিল, ভগবানও ত্যাগ করেছেন সে হতভাগিনীকে। তার বুক-ফাটা কান্না ও আকুল-করা আবেদন মুহূর্তের মধ্যে পরেশবাবুর চোখদুটি জলে ভরিয়ে দেয়, তাঁর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব যায় দূর হয়ে। তিনি তখনই শপথ নেন, সারা বিশ্ব প্রতিকূল হ'লেও বিমলাকে ত্যাগ করবেন না।

কিসের আইন? কিসের সমাজ? মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার দাবির কাছে সব তুচ্ছ। নাবালিকার সব অপরাধ যদি মার্জ্জনীয় বা উপেক্ষণীয় হয় তবে শুধু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'বে কেন? তার মুহূর্তের ভুলই একমাত্র সত্য? আর মিথ্যা ঐ চিরবঞ্চিতা মায়ের কান্না? মিথ্যা ঐ বুদ্ধিবিহীনা বালিকার সমূহ ভবিষ্যৎ? দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষার জন্যই আইন, যে আইন তার বিরোধী-আইন নয়, প্রবলের হৃদয়হীন অত্যাচার। একটি অনাগত অবাঞ্ছিত জীবনের আগমন সম্ভাবনাই সবচেয়ে বড় কথা? আর তুচ্ছ তার কাছে তারই পরিচয়হীন, নামগোত্রহীন, নিন্দিত ভর্ৎসিত জীবন? তুচ্ছ তার মায়ের মর্যাদা, পরিবারের সম্মান? এ কখনও হ'তে পারে না। তাছাড়া যা অন্যায় তা সর্ব্বকালে সর্বদেশে অন্যায়। কিন্তু যে অসম্মান ও অবাঞ্ছিত দায়িত্ব থেকে নারীর অব্যাহতি লাভের অধিকার পৃথিবীর দেশে দেশে স্বীকৃত হচ্ছে, ভারতেও তা স্বীকৃত হওয়ার হাজার যুক্তি আছে। আইন যদি যুগের দাবির, মনুষ্যত্বের দাবির

প্রকাশ করতে পারলেন না। ডাক্তার ঘোষ ত তাঁর মতোই সংসারী, আর তাঁর উপকারই তিনি করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া তাতে ত অনু ফিরে আসবেনা, বিমলাও বাঁচবেনা বা তাঁরও মুক্তি হবেনা। সুতরাং দরকার কি আরও কয়েক জনকে বিপদে ফেলার? তাছাড়া তিনি ত কিছুই অস্বীকার করতে চান না। কারণ সেটা শুধু অর্থহীন কাপুরুষতাই হবে না, তাঁর নীতি-বিরোধী আচরণও হবে।

তিনি ত ইচ্ছা করলেই বিমলার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারতেন। সোজা বলে দিতে পারতেন, তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারে কিছুই করা সম্ভব হবেনা। তিনি যে তা করেননি, সেটা অনুচিত ও মনুষ্যত্ববিরোধী আচরণ হবে জেনেই করেননি। দুটি অসহায় নিরবলম্বন নারীকে চরম লজ্জা ও সমাজের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং মামলা যেভাবেই সাজানো হক তাতে তাঁর কিছু যায় আসেনা। তিনি সব কথাই স্বীকার করবেন ও কেন করেছেন তাও জানাবেন মহামান্য আদালতকে।

তাছাড়া মামলা চালানোর সামর্থ্যও তাঁর ছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিমলা ও কল্যাণীর গহনা বেচে হাজার টাকা যোগাড় করে তাঁকে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়। ঘরে একটা পয়সাও ছিলনা সেদিন। তাঁর প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের কয়েক হাজার টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কি করে যে কল্যাণী সংসার চালিয়েছিল তা পরেশবাবু কিছুতেই ভেবে পাননা। স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তার পদত্যাগপত্র সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁরা সব পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেন। তাঁর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ টাকাতেই কল্যাণীকে সংসার চালাতে হবে। তাই পরেশবাবু গোড়াতেই স্থির করে ফেলেন, মামলা চালানোর জন্যে কোন পয়সা খরচ করবেন না।

অভিযোগগুলি শোনানোর পর সে সম্বন্ধে পরেশবাবুর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি অসঙ্কোচে, অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, যে-দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্য তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী। সুতরাং তারপর আদালতের আর বিশেষ কিছু করণীয় ছিলনা। তবু আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটি পালন করতে ও পরেশবাবুর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করতে আরও সময় কেটে যায়।

পরেশবাবু বলেছিলেন, কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে ও সর্বনাশ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি যা করেন তা কর্তব্য জেনেই করেন। তাঁর দুঃখ এই যে, অন্ধ আইনের প্রতিবন্ধকতার জন্য একটি অনভিজ্ঞা বালিকা তার মুহূর্তের ভুল সংশোধনের সুযোগ পেলনা। সারা দেশে এমনি আরও কত শত মেয়ে অভাবের তাড়নায় বিপথগামী হয়, দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে বিপন্ন হয়। কিন্তু তাদের বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন সহজ পথ খোলা নেই বলে অনেককে সমাজচ্যুত হয়ে নিন্দিত ভৎর্সিত জীবন যাপন করতে হয়, নয়ত বিপদ থেকে উদ্ধারের বেপরোয়া প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে অনুর মতো অকালে জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হয়।

বহু যুক্তির অবতারণা করেছিলেন পরেশবাবু। কিন্তু তাঁর আবেগভরা দীর্ঘ ভাষণ বা হৃদয়মথিত ক্ষোভ আদালতের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারেনি। দণ্ডদানকালে বলা হয়, কোন জীবন বাঞ্ছিত কি অবাঞ্ছিত তা বিচারের অবাধ দায়িত্ব রাষ্ট্র কখনও ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিতে পারেনা। তাহলে শুধু যে নৈতিক মান ক্ষুণ্ণ হবে তাই নয়, ভ্রূণহত্যা নারীহত্যায় সমাজ-জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। তাছাড়া আসামী পরেশ মিত্র গোপনে ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে একটি পারিবারিক কলঙ্ক নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর আদালতে যা কিছু বলেছেন তার সঙ্গে বিচার্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। একটি জীবন সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অপরাধ ও সেই অপরাধে তিনি অপরাধী। তবু আসামী বরাবর সৎজীবন যাপন করেছেন ও প্রথমেই নিজ অপরাধ স্বীকার করেছেন এই বিবেচনায় তাঁর দণ্ডাদেশ লঘু করে মাত্র দুইবছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল, এবং তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা বিবেচনা করে দেওয়া হল দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা।

পরেশবাবুর সাজার আর কয়েকমাস মাত্র বাকি, কিন্তু সহকর্মীদের আশঙ্কা, দিনে দিনে তাঁর যে হাল হচ্ছে তাতে তাঁর পক্ষে ঐ কটি মাসও ভালভাবে কাটিয়ে দেওয়া সহজ হবেনা। তিনি যথাসময়ে কাজ করতে যান, নির্দিষ্ট সময়ে আহার করেন, অবকাশকালে বই পড়েন। আর বিকালে বারান্দায় রেলিঙের ধারে বসে সন্ধ্যার অন্ধকার পর্যন্ত চিন্তায়

বিভোর হয়ে থাকেন। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলেন না, এমনকি বাড়ীর লোকেদের পর্যন্ত আসতে বারণ করে দিয়েছেন।

তাঁর একমাত্র কথা বলার সঙ্গী ঐ ওয়ার্ডের কয়েদি ভৃত্য পঞ্চা। সহবন্দীরা তাকে পঞ্চা বা ফালতু বলে ডাকে। কিন্তু সাধারণ কয়েদিরা, এমনকি ওয়ার্ডাররা পর্যন্ত তাকে ডাকে পঞ্চা এগ্‌রালি বলে।

একদিন পরেশবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হ্যাঁরে, তোর পুরো নাম কি রে?

উত্তরে পঞ্চা সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে পঞ্চানন ঘোষ।

—ঘোষ? তবে তোকে সবাই এগরালি না কি একটা বলে কেন?

তখন পঞ্চা অতি সঙ্কোচে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে তার কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করে। গাঁয়ে জমিদার-বাড়ীতে যে ডাকাতি হয় তাতে ভিনগাঁয়ের কটা ডাকাতকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ধরা পড়ে পুলিশের প্রলোভনে ও মারের ভয়ে সে সব কথা ফাঁস করে দেয়। অর্থাৎ রাজসাক্ষী হয় সে, জেলের ভাষায় এগরিল। কিন্তু তাতে তার কলঙ্কই হয় শুধু, খালাস হয় না। অন্যদের মতো কঠিন সাজা হল না বটে কিন্তু কবছরের বয়েদ কমাতে গিয়ে নামের সঙ্গে চিরকালের জন্য জুড়ে গেল ঐ এগরালি কথাটা।

সব শুনে পরেশবাবু হেসে বলেন—ভালই করেছিলি। আমিও তোর মতো এগ্‌রালি। সেই জন্যই বোধহয় তোকে আমার এত পছন্দ।

এই একটি মাত্র মানুষের কাছে পঞ্চা তার আচরণের সমর্থন পেয়েছে, সেজন্য পরেশবাবুর প্রতি তারও সহানুভূতির শেষ নেই। তাছাড়া সে নিরক্ষর গাঁয়ের মানুষ হলেও তার সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝতে পারে যে জেলখানাটা মাষ্টারবাবুর মতো লোকেদের জন্য নয়। মাষ্টারবাবুর দুঃখে তাই মাঝে মাঝে বুকটা যেন তার ফেটে যায়। ফাঁক পেলেই সে তাঁর কাছে এসে বসে গা হাত পা টিপে দেয়। মানা করলেও শোনেনা। আর মাষ্টারবাবু যখন যা বলেন তা প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে। সব সময় সকল কথা বুঝতে পারে এমন নয়, বিশেষ করে উত্তেজিত বা অনুপ্রাণিত হয়ে মাষ্টারবাবু যেসব কথা বলেন, তা পঞ্চার পক্ষে নিতান্তই দুষ্পাচ্য। তবু সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে আর মনে মনে ভাবে, এসব কথা শুনলেও পুণ্যি হয়।

পঞ্চার সংসারের সব কথা পরেশবাবুর জানা। নিজে থেকেই বলেছে পঞ্চা, কারণ এত আগ্রহ নিয়ে কেউ কোনদিন তার কথা শোনেনি।—এক টুকরো জমিতে শুধু বাস্তটুকু ছাড়া আর কিছুই তার নেই। জনমজুরের কাজ করত। বড় ছেলেটা ভরসা ছিল, কিন্তু যাত্রাদলে ঢুকে নেশাভাঙ ক'রে নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ীর সঙ্গে অনেকদিন কোন সম্পর্কই রাখেনি, তারপর ফিরে এল কাশরোগ নিয়ে। এখন একেবারে অকর্মণ্য, বাড়ীতে বসে দিনরাত ঝিমোয় আর খক্ খক্ করে কাশে। বড় ছেলের পর মেয়ে। ঐ মালক্ষ্মী না থাকলে তার সংসার যে কোথায় ভেসে যেত, তা ভাবতেও পঞ্চা ভয় পায়।

—বিয়ে দিস নি মেয়ের?—পরেশবাবু প্রশ্ন করেন একদিন।

—দিয়েছিলাম বাবু—দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দেয় পঞ্চা। কিন্তু দুবছর না যেতেই বিধবা হয়ে তার মেয়ে আবার তার সংসারে ফিরে আসে। তারপর গিন্নী যখন কদিনের জ্বরে মারা গেল, তখনই পঞ্চা বুঝতে পারে ভগবান কেন তার মালক্ষ্মীকে আবার তার সংসারে ফিরিয়ে দেন। পঞ্চার দুটো বাচ্চা এখন তার কাছে মানুষ হচ্ছে। কি করে যে ওদের সংসারে অন্ন জোটে তা পঞ্চা জানেনা। বড় ছেলেটা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে, কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু বলেনা। পঞ্চাও তাকে সাহস করে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেনা।

সব শুনে পরেশবাবু একদিন রাগ করে পঞ্চাকে জিজ্ঞাসা করেন—তা হতভাগা তুই তালপাতার সেপাই, তোর হঠাৎ এই দুর্বুদ্ধি হল কেন? ধরা পড়লে কাচ্চা-বাচ্চাগুলোর কি হবে ভাবলিনা একবার।

পঞ্চা উত্তরে বলে—থেকেই বা ওদের কি কাজে লাগছিলাম বাবু? জন-মজুরের কাজ ত সব সময় মেলেনা। তার ওপর কি অকাল গেল সেবার। ঘরে এক মুঠো চাল ছিল না, অথচ জোয়ান-মর্দ বলে ভিক্ষেও দিত না কেউ।

বাচ্চা দুটো খিদেয় কেঁদে হয়রান হত, আর আমি কোন উপায় না পেয়ে শুধু বুক চাপড়াতাম।

—তাই ভাবলি, যদি ডাকাতি করেই কপালটা ফেরানো যায়!

—এ কথার আর কোন উত্তর দেয়নি পঞ্চা। কিছুক্ষণ বাদে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সবই গ্রহের ফের বাবু। কপালের দুঃখ কেউ খণ্ডাতে পারে না। নইলে আপনার মতো মানুষই বা কয়েদ খাটতে আসেন কেন?

এরপর অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্য পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করেন—তোর ছেলে কবে আসবে?

—কি জানি বাবু—বেশ খানিকটা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে পঞ্চা বলে ওর ত কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই। প্রায় তিন মাস আসেনি, কবে আসবে কে জানে!

পঞ্চা!—একতলার বাবুদের উচ্চকণ্ঠে ডাক ভেসে এল।

শোনামাত্র পঞ্চা স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে বলল—নিচের বাবুরা ডাকছেন, চায়ের সময় হয়ে গেছে।

পঞ্চা চলে যেতে পরেশবাবুও উঠলেন। তারপর মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় পরে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসলেন। একটুবাদে পঞ্চা এসে চা দিয়ে গেল।

সেদিনও তেমনিভাবে বারান্দায় বসে কত কথা ভাবছিলেন পরেশবাবু। বারবার মনে পড়ছিল শুষ্ক শ্বেত পদ্মের মতো অমুর শান্ত সুন্দর ক্লান্ত মুখখানি। মৃত্যুর অসহনীয় যন্ত্রণার কোন চিহ্ন সে-মুখে ছিল না। ঐ নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পরিবেশে হয়ত শুধু অন্তিম মুহূর্তে মায়ের হাতের একটু স্পর্শের আকুলতায় তার চোখদুটি অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। তারই শেষ বিন্দু দুটি তিনি নিজের হাতে মুছে দেন।

পরেশবাবু কতবার ভেবেছেন একথা, আবারও ভাবছিলেন সেদিন—ভগবানের কঠিন শাস্তি অমন শান্তভাবে আশীর্বাদের মতো মাথা পেতে নেওয়ার শক্তি অতটুকু মেয়ে পেল কোথা থেকে!

হঠাৎ চমকে উঠলেন পঞ্চার আর্তনাদে। পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে তাঁরই দিকে এগিয়ে আসছে সে।

—কি হল রে? অমন করে কাঁদছিস কেন? পরেশবাবুর কথায় উদ্বেগ ও বিস্ময়।

পঞ্চা কাছে এসেই আছড়ে পড়ল পায়ের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল বাবুগো, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে আমার। আমি আর বাঁচবো না।

—ছেলে মানুষের মতো কাঁদিস না, কি হয়েছে বল।

—বাবু গো, কদিন থেকেই মন বলছিল, একটা কিছু অমঙ্গল হয়েছে। কিন্তু ছেলে এসে আজ যা বলল তা ত কখনও ভাবিনি বাবু। ভগবান কেন এমন শাস্তি দিলেন আমায়!—কান্নায় ভেঙে পড়ল পঞ্চা।

পরেশবাবু বুঝলেন, একটা কঠিন আঘাত পেয়েছে সে। তাই তাকে সেখানে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই পঞ্চা বলল বাবু গো, মা লক্ষ্মী নেই আমার। নিজের হাতে সে তার জীবন শেষ করেছে।

—কে, তোর মেয়ে? কি হয়েছিল তার?—বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন পরেশবাবু।

—কি জানি বাবু, হতভাগাটা ত সব কথা বলল না। খুব ধরতে শুধু বলল, পরশু সারাদিনরাত মেয়েটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি! তারপর কাল সকালে পাড়ার লোকে তাকে বাবুদের আমবাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

—তারপর?

—তারপর আর কি বাবু, কাল সারাদিন থানা পুলিশ করে ছেলে আজ খবর দিতে এসেছিল।

—তোর অত ভাল মেয়ে, এমন কাজ কেন করল পঞ্চা?

—কি জানি বাবু—মাথা না তুলে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে রুদ্ধ কণ্ঠে পঞ্চা ব'লে গেল—'ক'মাস আগে সন্ধ্যার পর মা লক্ষ্মী যখন বাড়ী ফিরছিল তখন সড়কের মোড়ে কটা গুণ্ডা বদমায়েস ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন ভোর রাতে বাড়ী ফিরেই সে তার দাদাকে সব কথা বলে, কিন্তু ঐ হতভাগা নেশাখোরটা কিছুই করে না। শুধু বলে, আমরা গরিব মানুষ, আমাদের কথা কে শুনবে।—সেই থেকে মেয়ে আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি, বাড়ী থেকে

বেরোয়নিও এ কদিন। তবু এতদিন পরে এমন কাজ সে কেন করল বাবু, আমি ত কিছুতেই ভেবে পাইনা।

—তুই ভেবে না পেলেও আমি জানি, কেন তোর মেয়ে এমন করে নিজের হাতে জীবনটাকে শেষ করল। এ তোর পাপ, আমার পাপ, সারা দেশের পাপ, আর সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে ঐ হতভাগিনীগুলো। অনু মরল, বিমলা মরল, তোর মেয়ে মরল, কল্যাণী মরছে তিল তিল করে। এ ত শুধু তোর আমার ঘরের কথা পক্কা, গোটা দেশটাতে তাহলে কি হচ্ছে ভাব। কিন্তু কার এ জন্ম মাথাব্যথা বল? সবাই চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে, তোর নেশাখোর ছেলেটার মতো। হাজার বছরের জমানো পাপ, এ ধুতে অনেক রক্ত, অনেক চোখের জলের দরকার। তাই এই অন্তহীন মৃত্যু, জীবনের এই নিষ্ঠুর অপচয় তুই আমি বন্ধ করতে পারব না।

অযোধ্যার নবাব

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

(১০)

আর এক বেগম ও তাঁকে লেখা পত্রাবলী

কোর্ট উইলিয়মের বন্দীশালা থেকে অবশেষে নবাব মুক্তি পেলেন। ১৮৫৮ খৃঃ। লক্ষ্ণৌ ও অন্যান্য অঞ্চলে মহাবিদ্রোহের আগুন তখন নিভে গেছে কিংবা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অযোধ্যার নবাব কোর্ট থেকে ফিরে এলেন তাঁর মেটিয়াবুরুজের বাসস্থানে। এবার সেখানে পাকাপোক্তভাবে বাসের আয়োজন আরম্ভ করলেন। লক্ষ্ণৌ চলে যাবার বা রাজ্য পুনরায় লাভ করবার আর কোন আশা নেই।

মেটিয়াবুরুজে কিছু কিছু করে বাড়াবার বন্দোবস্ত হতে লাগল নবাবী এলেকা। আরো কয়েকটি বাড়ি। কিছু বাগ বাগিচা। একটি চিড়িয়াখানা। দফ্তর। ছাপাখানা। লক্ষ্ণৌ থেকে আরো যাঁরা আসছেন ও আসবেন—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব কবি লেখক বাদক গায়ক বাঈজী ওস্তাদ প্রভৃতি—সকলের আস্তানা। আর দরবার সারা হিন্দুস্থানের সঙ্গীতের মহলে যা বিখ্যাত হয়েছিল সেই সঙ্গীত দরবারের পত্তন।

কিন্তু সে নবাব দরবারের কথা পরে।

তার আগে ওয়াজিদ আলীর আর একটি রচনার পরিচয় ও অনুবাদ দেওয়া হবে। তাঁর এক বেগমের উদ্দেশে পত্রধারা।

বেগম বিলাসী নবাব যখন লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হন তখন সেখানে তাঁর বেগমদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০। তাঁদের মধ্যে কলকাতায় যাঁদের সঙ্গিনী করে আনেন তাঁদের সংখ্যা সম্ভবত ছয়। তারপর কোর্ট উইলিয়মে বন্দী হবার আগে পর্যন্ত আর ক'জন বেগম আসতে পারেন। কারণ 'আখতারের বেদনা'য় নাম আছে আরো কজনের। সর্বসমেত দশের অনধিক। সুতরাং বেশীর ভাগ বেগমই লক্ষ্ণৌতে থেকে যান। সেই লক্ষ্ণৌনিবাসিনীদের মধ্যে একজন স্থান লাভ করেন সমসাময়িক বিদ্রোহের ইতিহাসে। তিনি হজরৎ মহল। নাবালক পুত্র বির্জিস কাদেরকে বিদ্রোহের সাফল্যের সময়ে সিংহাসনে স্থাপন করে নেতৃবর্গের অন্যতমা হন। পরে বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে সপুত্র নেপালে আশ্রয় নেন হজরৎ মহল, নানা সাহেব প্রমুখ নেতাদের মতন।

হজ্রৎ মহলের মতন তখন লক্ষ্ণৌতে এক বেগম ছিলেন। তিনি হলেন মুম্তাজ জাঁহা আকলীল্ মহল। তাঁকে নিয়েই এই প্রসঙ্গ। আকলীল্ মহল অবশ্য রাষ্ট্র ব্যাপারে বিজড়িতা হননি।

নবাব যে সকল দয়িতাকে কল্কাতা যাত্রার সঙ্গে নিতে পারেননি তার কারণ তাঁদের প্রতি তাঁর প্রেমের অভাব নয়। এ বিষয়ে তাঁর যে অনেকখানি সমদৃষ্টি ছিল তা তাঁর রচনাদি থেকে ধারণা করা যায়। তাঁদের সকলকে তখন কলকাতায় আনার পথে অন্তরায় ছিল বাস্তব কয়েকটি কারণ। যথা—অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কলকাতায় বাসস্থলের এলাহী ব্যবস্থার অভাব, আর্থিক চিন্তা (নির্বাসিত নবাবের বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হয় বারো লক্ষ অর্থাৎ মাসে এক লক্ষ টাকা, ইত্যাদি।

সর্বনাশ সমুপস্থিত দেখে নবাব অগত্যা অত্যন্ত প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠেন। অর্ধেকেরও বেশী তিনি ত্যাগ করে আসেন রাজধানীতে।

তা ছাড়া, নবাব লক্ষ্মৌ ছেড়ে আসবার সময়ে বা কলকাতায় কিছুকাল বাস করবার পরেও কোন কোন বেগম লক্ষ্মৌ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিতা হতে চাননি। হয়ত নির্বাসিত নবাবের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের আর যুক্ত রাখবার ইচ্ছা হয়নি তাঁদের।

লক্ষ্মৌ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে নবাবের বেগম নির্বাচন কিভাবে হয়েছিল? যে কজনকে চয়ন করে কলকাতায় নিয়ে আসেন তাঁরা যে সকলেই সুয়ো এবং যাঁরা স্বদেশে থেকে যান তাঁরা দুয়ো-বেগম, তা নয়। মেটিয়াবুরুজে নবাব যে বেগমদের সঙ্গে করতেন তাঁদের প্রত্যেকের রূপ গুণ স্বভাব ইত্যাদি তিনি বর্ণনা করেছেন 'আখতারের বেদনা' নামে আত্মকাহিনীতে, তা দেখা গেছে। তার মধ্যে সুরের অনুরণন যেমন আছে, তেমনি বেসুরও।

আবার আকৃলীল মহলের মতন প্রিয়তমাও লক্ষ্মৌতে রয়ে গেছেন। তাঁর উদ্দেশে লেখা এবং লক্ষ্মৌতে প্রেরিত এই পত্রাবলী হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ভরপুর। তার ছত্রে ছত্রে নবাব এই সুদূর-বাসিনী প্রিয়ার প্রতি গভীর প্রেম ও বিরহের যন্ত্রণা প্রকাশ করেছেন। আকলীল মহলের অনিন্দ্য রূপের তীব্র আকর্ষণের কথাও গোপন রাখেননি নবাব। অন্তরের অনুরাগে সিঞ্চিত এই চিঠিগুলি পড়বার সময় আশ্চর্য মনে হয় যে এই বেগমকে তিনি সঙ্গিনী করে এ যাত্রায় নিয়ে আসেননি কেন!

অথবা পত্রাবলীতে প্রকট এই প্রণয় কি আন্তরিক, না লক্ষ্মৌয়ি কাব্য-সাহিত্যের চিরাচরিত বাক্-বাহুল্য প্রীতি? পত্রধারা পাঠ করলে বোধ হয় যে আকলীল মহল যেন নবাবের অদ্বিতীয়া প্রিয়তমা! বোঝাই যায় না যে একই কালে আরো অন্তত পাঁচ ছ জন বেগম কলকাতায় অবস্থান করছেন যাঁদের প্রতি নিজের মুগ্ধ মনের উচ্ছ্বাস সমকালীন রচনা 'আখতারের বেদনা'তেও প্রকাশ করেছেন! এ কি নবাবী প্রেমের এই রীতি প্রকৃতি?......

সে যা-ই হোক, আকলীল মহলকে লেখা নবাবের এই পত্রাবলী অনেকাংশে 'আখতারের বেদনা'র সম-সাময়িক। 'আখতারের বেদনা' ফোর্ট উইলিয়মেই লেখা সম্পূর্ণ হয়, আরম্ভও সেখানে। লক্ষ্মৌ থেকে নির্বাসন ও কলকাতায় আগমন ইত্যাদি প্রসঙ্গসকলও তা প্রধানত ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী জীবনেরই অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

'আখতারের বেদনা'র রচনা কাল প্রায় দু বছর। কিন্তু আকলীল মহলকে লেখা এই পত্রাবলীর কাল তিন বছর দু'মাস। প্রথম চিঠির তারিখ ৯, জুলাই, ১৮৫৬ ও শেষ চিঠির তারিখ ৫, সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ খৃঃ—অর্থাৎ ফোর্ট থেকে মুক্তি পাবার এক বছরেরও বেশী পরে। 'আখতারের বেদনায়' নবাবের ব্যক্তি জীবনের অনেক কথা থাকলেও অন্যান্য বহিঃপ্রসঙ্গ আছে।

কিন্তু লক্ষ্মৌবাসিনী এই বেগমকে লিখিত পত্রধারা নবাবের আরো ব্যক্তিগত ও প্রেমিক সত্তার প্রকাশ। চিঠিগুলি তাঁর কবি মনেরও পরিচয় বহন করছে। —গজল তিনটি রচনার জন্যে শুধু নয়, গভীর অনুভব ও দরদের জন্যেও।

কালানুক্রমিক পত্রাবলীর অনুবাদ দেবার আগে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য জানাবার আছে।

আকলীল মহল নবাবেরই আপন বংশীয়া। তাঁর আর এক নাম জিন্নৎ মহল। নবাবের সঙ্গে বিবাহের ফলে তাঁর একটি পুত্র হয়—কলা হোসেন।

বেগম আকলীল মহলকে নবাব ২০খানি চিঠি লিখেছিলেন। প্রায় সব চিঠিই মেটিয়াবুরুজ থেকে লিখিত ও প্রেরিত, ফোর্ট উইলিয়ম থেকে লেখা চিঠি অতি অল্প। উর্দুতে লেখা এই পত্রাবলী সঙ্কলন করেন মহম্মদ বাকুর। চিঠিগুলির রচনাকাল তিন বছর দু'মাসের মধ্যে প্রায় দু'বছর কোন পত্র পাঠানো হয়নি। এই বিরতির কারণ সম্ভবত ওই সময়ে

নবাবের কোর্ট উইলিয়মের বন্দী জীবন। ১৬ই জুলাই তারিখে লেখা তাঁর ১৯ সংখ্যক পত্রে নবাব আক্লীল মহলকে নিজের মুক্তির কথা লেখেন। মুক্ত হবার তারিখ সম্ভবত ৯ই জুলাই, ১৮৫৯ খৃঃ।

মহম্মদ বাকর সঙ্কলিত এই পত্রাবলী 'তারিখ-এ মুমতাজ' নামে পুস্তকে প্রকাশিত হয়। মূল রচনা রক্ষিত আছে বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে। সে পাণ্ডুলিপি ৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৭টি করে পঙ্‌ক্তি। লেখার চারদিক সোনালি কারুকর্মে অলঙ্কৃত। লিপিকার নবাব নন, অন্য ব্যক্তি।

চিঠিগুলি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কম্প্যানীর প্রতিনিধি মারফৎ পাঠানো হত। পাঠাতে বিশেষ অসুবিধা ছিল এবং সময়ও লাগত অনেক।

লক্ষ্ণৌ থেকে মুমতাজ জ'াহা আকলীল মহলও নবাবকে পত্র দিতেন। সেগুলি মুন্সী আকবর আলী খাঁর সঙ্কলিত। মুন্সী আকবর আলীর বিবৃতিতে প্রকাশ যে, আকলীল মহলের পূর্বপুরুষ ফৈজাবাদের নবাব ছিলেন।

আকলীল মহল লক্ষ্ণৌ থেকে মেটিয়াবুরুজে কখনোই আসেন নি, জানা যায়। বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ রহিত হওয়া বা বিচ্ছেদের ইঙ্গিত আছে নবাবের শেষ পত্রে।

এখন ক্রম অনুসারে চিঠিগুলির বাংলা অনুবাদ দেওয়া হ'ল।

প্রথম পত্র (জবাবী):

আফসরে করকে জলীল্ মুমতাজ জাহাঁ নবাব আকলীল মহল—

তুমি আমার প্রিয়াদের মুকুটমণি। তোমার বিরহের তৃষ্ণায় প্রাণ যখন জ্বল্‌ছে, এমন সময় তোমার চিঠিখানি পাই। আমার স্বস্তিবিহীন মনে সেটি যেন বারি সিঞ্চন করলে।......আমার শরীর ভাল আছে।...... এই দুঃসময়ে তুমি কেমন ভাবে তোমার দিনগুলি কাটাচ্ছ?

সেই সব দিনের কথা আমি ভুলতে পারিনা, যখন তুমি সিকান্দার বাগে থাকতে আর আমি আমার গাড়িতে যেতেম সেখানে। সেই আমরা এখানে-সেখানে কত বিচরণ করেছি। ওরা নাচত, গান গাইত। আমরা রাত্রে বিশ্রাম করতেম বাগিচার মঞ্চে। ঢাক বাজত। শোনা যেত শানাইয়ের সুর—

সে সবই এখন দিনরাত আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এই সমস্ত কথা যখন ভাবি, মনকে তখন দাবিয়ে রাখি আমি। পৃথিবীর মাটি কঠিন আর আকাশ সুদূর। আমি আসমানেও চলে যেতে পারিনা। মাটি থেকেও পাইনা সান্ত্বনা।

এই যে সব ঘটনা ঘটে গেল, আমি তার জন্য দায়ী নই। যারা আমার মহল ধ্বংস করেছে আর এখন আমার রাজ্য শাসন করছে, ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করবেন। তাদের বন্ধু আর পরামর্শদাতাদেরও নিপাত করবেন তিনি।

এ পর্যন্ত ভাগ্য বরাবরই আমার প্রতি বিরূপ। আমার জীবন যেন একটা ঘন জঙ্গল। সামনে কালো কালো পাহাড়—কোন আশ্রয়ের স্থান নেই।

খোদার দয়ায় অবশেষে আমরা কলকাতায় পৌঁছেচি। শত্রুরা সব সময় আমার সঙ্গে ছায়ার মতন রয়েছে। দুষ্কৃতি করবার কোন সুযোগ পেলেই ছাড়েনা তারা।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো তিনি যেন আমার শেষ দিনগুলি শান্তিময় করেন।

তোমার মুখ আর চোখ দুটি কখনোই ভুলিনি। কিন্তু এইসব সংবাদ বাহকদের সব সময় পাওয়া যায় না এখানে। তাই খবর পাঠানো আমার পক্ষে বড় শক্ত হয়। যখনই সেরকম কোন লোক পাই আমি তাকে হাত জোড় করে অনুরোধ জানাই আর এমনিভাবেই আমি দু'একখানি চিঠি পাঠাই।

ভগবান যে আমায় রাজা করেছিলেন সেজন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখানে আমি ক্রীতদাসের তুল্য জীবন কাটাচ্ছি। যখনই আমি তোমাদের মতন কারো চিঠি পাই, বিশেষ তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি—আমি চিঠিখানি বুকে জড়িয়ে

ধরি, চোখের ওপর রাখি, চুম্বন করি। আমার চুম্বনের জন্যে কথাগুলি মুছে যায় কাগজের ওপর থেকে। কিন্তু সে চিঠির জবাব যতক্ষণ না দিতে পারি, আমি তৃপ্তি পাইনা।

এস আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন অচিরে আবার আমাদের মিলিয়ে দেন আর যে দুঃখকষ্ট আমরা ভোগ করছি তার লাঘব করেন।

ও আমার প্রাণ! দুর্ভাবনা কোরোনা। দোহাই তোমার, আর কেঁদো না। আর চোখের জলে তোমার মুখ ভাসিও না। খোদা আমাদের এই দুঃখ দিয়েছেন, তাই তা যে কোন প্রকারে সহ্য করা আমাদের উচিত। আমার দৃষ্টান্ত ধরো। বরাবর আমি আফ্‌শোস করেছি। কিন্তু আফ্‌শোস করে' ত' কিছু লাভ করিনি। ঈশ্বর যদি সহায় হন, আমরা এইসব বিপদের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এই অত্যাচারী লোকেরা—এরা ভগবানকে ভয় করেনা। এরা কি পাচ্ছে আমার ওপর জুলুম করে', আমায় উত্যক্ত করে?

আমরা এই আশা যেন করি যে খোদা আমাদের জন্যে কিছু করবেন। জুলুমবাজদের হাত থেকে অসহায় মানুষদের বাঁচাবার শক্তি তাঁর আছে। আর শুধু তোমার আমার কথাই বা কি? সারা শহরটাই অত্যাচারীদের কবলে পড়েছে।

আর কতদিন এই দুঃখের রাত চল্‌বে, কতদিন দুনিয়া থাকবে আমাদের বিরুদ্ধে? আশার উষা কি দেখা দেবেনা? বিচারের রশ্মি সূর্য হয়ে উঠ্‌বে আর কতকাল পরে? মেঝের ওপর এই দুর্ভাগ্যের জাল কতদিন পাতা থাকবে? আর কতদিন এই নকল জগৎ টিঁকে থাক'ব আর দুনিয়া তার কৃত্রিম প্রদর্শনী দেখাবে?

আমি অন্তরের সঙ্গে অপছন্দ করি এদের—এই বারাঙ্গনা আর দাগাবাজদের। এইসব দুনিয়াদারি আমার মন বরদাস্ত করেনা। একে আলিঙ্গন করতে গেলেই এ জানাবে অনিচ্ছা। আর যেই এর দিকে বিমুখ হবে অমনি এসে পায়ে পড়বে। এমনি এর ছলাকলা। কথায় বলে—দুনিয়া বড় তাজ্জব জিনিষ দেখাচ্ছে, পেট থেকে পা বেরুচ্ছে! কিন্তু কি হবে?...

৯ই জুলাই ১৮৫৬ খৃঃ
৫ জিবদ, ১২৭২ হিজরি } জানে আলম্ লিখিত

(দ্বিতীয় পত্র)

আকলীল বেগমের প্রতি জানে আলম্

রব্বে জলীল নবাব আকলীল মহল সাহেবা—

আমার মনের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে আমি এই কামনা করি যে, ঈশ্বর যেন অবিলম্বে আমাদের পুনর্মিলন ঘটান আর বাগানে প্রেমের খশবু আবার ছড়িয়ে পড়ে।

আমি তোমায় একখানি প্রেম পত্র লিখে'ছি এবং আমি আশা করি তুমি হয়ত তা পেয়েছ। ঈশ্বর প্রাজ্ঞ।

কলকাতার এই মরুভূমিতে আমি প্রিয়জনদের বিচ্ছেদের আগুনে জ্বলে যাচ্ছি। আমার হৃদয়ে বিরহের ক্ষত দির্‌হামের (আরবী স্বর্ণমুদ্রা) মতন বড় হয়ে উঠেছে। ভাগ্যের এ কি বিচিত্র ব্যাপার যে, আমায় সে শেষ করে দিয়েছে আর তবু আমি বেঁচে আছি।

মীর হাসান (প্রসিদ্ধ উর্দু কবি। তাঁর মসনবী উর্দু সাহিত্যের একটি ক্লাসিক, বলেন) 'আশমান আমায় এত সুখ তো দেয়নি যে তার বদলে এত অশ্রু দেবে।'

বরাতের ওপর আমাদের খুব ভরসা ছিল, তার বন্ধুত্বের ওপর আশা ছিল। কিন্তু অকারণেই সে এমন ভোঁতা যে দুটি মানুষের মিলন বা হৃদ্যতা সহ্য করতে পারেনা। যখনই সে দেখে দুজন মিলিত হয়েছে, অমনি বাধা দেয়। দেখা যাক, ভাগ্য কত দূর যায়—আমরা চূর্ণ করব তাকে।

আমি এই অবস্থায় এসে গেছি যে রোদন ও ক্রন্দন ছাড়া আমার আর কাজ নেই আর আমি সবদা তোমায় স্মরণ করি। এ কি দুঃখ, ও দুনিয়ার জান্—কি সুখের

দিনই সেসব ছিল যখন তুমি ছিলে বাতি আর আমি পতঙ্গ।

খোদা এই দিনগুলিও কাটিয়ে দেবেন। জীবনের বেশির ভাগটাই আমাদের কেটে গেছে, কমের ভাগটাও কাটবে। কিন্তু চাঁদকে নিয়ে যে শান্তি তার বিচ্ছেদে আমার বড় অনিচ্ছা। তাই এই (ফার্সী) কবিতার পঙ্‌ক্তি দুটি আমার মুখে মুখে থাকে—

ও বাতাস, তুমি আমার প্রিয়ার কাছে যাচ্ছ, তাকে আমার এই বার্তাটি দিও, তুমি আমাকে দুঃখ বেদনার অসহ্য বোঝা (পাহাড় আর জঙ্গলের চেয়েও বেশি) দিয়েছ।

এখন আমার অবস্থা সেই উর্দু কবিতাটির মতন—

অনেকে রাত কাটায় তাদের প্রিয়দের সঙ্গে। আর কেটে যায় চোখের জলে, কারণ তারা অনেকের রাত থাকে প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে। হায় আল্লাহ্, আমার জন্তে এ কোন্ রাত্রি? আমি না পারি ঘুমোতে, না পারি কাঁদতে।

তোমার নিজের বিষয়ে সবিস্তারে আমায় জানিও, তাহলে আমার তৃষিত মন তৃপ্ত হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমায় তুমি ভুলে যাওনি আর আমিও তোমাকে একইভাবে মনে রেখেছি। যদি আরো দিন এমনি বেদনায় বয়ে যায় তাহলে বিচ্ছেদ আর আমাকে বিশ্রাম করতে দেবে কেন? বিশ্রাম আমি পাবনা।

তারিখ ২২, জুলাই, ১৮৫৬ খৃঃ। জানে আলম্ লিখিত।

(তৃতীয় পত্র)

সুলতান জাহাঁ নবাব আকলীল মহল সাহেবা—

তুমি জেনে রেখো যে, তোমার সঙ্গে আবার সুখময় মিলনের জন্তে আমি বড়ই উৎসুক। আর তোমার সঙ্গ উপভোগ করবার আমার হাজারো সখ্ আছে।

তোমায় জানাই যে, তোমার প্রেমপত্রখানি জানে আলমের উচ্ছাশাভরা মনের মহলে এসে পৌঁছেচে। আর সেই চিঠি একটি তাবু তৈরি করে নিয়েছে আম হৃদয়ে। আমি তোমায় কামনা করেছিলেম, পেয়ে এটি যেন আমার শরীরে এক নতুন জীবনের আর খ স্বচ্ছ, মার্জিত আত্মার হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। তো চিঠিখানি দেখে আমার চোখ ভরে উঠেছে, মন পরি হয়েছে।

তুমি আমায় যে তাবিজটি পাঠিয়েছ সেটি হা পরেছি আমাদের পুরণো প্রথা অনুসারে।

খোদা ও ইমামের দয়ায় আর আমার মনের স বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করি আল্লাহ্ যেন আমায় লক্ষ্ণৌ সিংহাসন ফিরে পাইয়ে দেন। হাতে এই তাবিজ প যেন সফল হয় আমার। যেন প্রত্যেক দিনটি হয় ঈদ আ প্রতিটি রাত হয়ে ওঠে বরাত, সবে বরাত্।

স্বদেশ থেকে দূরে আছে

তারিখ ৮, আগষ্ট, ১৮৫৬ খৃঃ।

জানে আল

তার লিখিত

(চতুর্থ পত্র)

আকলীল মহল হল সূর্যের মহল, যা আলোয় ভরা কেন নয়? তাই হবার কথা। কারণ সে যে বড় মুক্তো— আকলীল মহল।

মিলনের রাত্রিতে সে আমার সঙ্গিনী, প্রিয়তমা। আমার বঁধু, আমার দরদী আকলীল মহল।

স্বর্গের ফুল ঈর্ষা করে তার শরীরের গড়নকে। কারণ সে যে আশ্মানের সূর্য—আকলীল মহল।

সে আমার প্রিয়া, আমার প্রাণ। চাঁদের মতন তার মুখখানি। সুন্দর তার তনুলতা। আর দুনিয়ার সব সুন্দরীদের হিংসা তার ওপর। কারণ সে লক্ষ্ণৌর সেরা সুন্দরী—আকলীল মহল।

সর্বদা সে সুখদায়িনী সঙ্গে জড়িতা রাখে। সে রূপের প্রতিষ্ঠাত্রী, নেত্রী—আকলীল মহল।

তার দীঘল চেহারার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রেমিকদের প্রাণ বার করে দেয় আর সে ঠিক যেন প্রেমিকদের ফাঁসিকাঠ—আকলীল মহল।

সে তার প্রেমিকের মুখ স্মরণ করে যখন চোখের জল ফেলে তখন প্রেমের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। আকলীল মহল।

প্রেম এই জগতে একটা ব্যাধি আর আকলীল মহলের চোখ দুটি নার্গিস (একটি সংস্কার আছে যে নার্গিস ফুল যেন রুগ্ন চোখ) ফুলের মতন। আকলীল মহল।

সে জ্বালিয়ে দেয় শত্রুদের বাসা। কারণ সে বিদ্যুৎ আর আগুন—আকলীল মহল।

সুরার দোকানের দাম দুনিয়ায় বাড়ে না কেন? কারণ তার চোখ দুটি যেন সুরার দোকান—আকলীল মহল।

আমি সব সময় তাতে দেখি আমার মক্কা আর কাবা। আখতার দুর্বল, কিন্তু সে প্রাণপূর্ণা—আকলীল মহল।

তোমার প্রতি আমার প্রেম ও নিষ্ঠার জন্যে এই গজলটি রচনা করেছি আর তোমার আনন্দের জন্যে এটি পাঠাচ্ছি। খোদা যেন শীঘ্র আমাদের আবার মিলিয়ে দেন আর বিচ্ছেদের এইসব কঠোর দিনগুলি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আমার মন দুশ্চিন্তায় ভরে রয়েছে আর আত্মসংযম, আত্মবিশ্বাসের সমস্ত গুণ হারিয়ে ফেলেছি আমি। প্রার্থনা করি, সে যেন তার সেই আগেকার সঙ্গ আর হাসি আর সব জিনিষ ফিরে পায়।

২৭, জিলহজ, ১২৭২। রাজ্য-হারা
জানে আলম্।

(পঞ্চম পত্র)

তোমার ধরণধারণ রূপের নিঃসার, ও মুমতাজ জাহাঁ। আর তোমার কণ্ঠস্বর যেন সুরা-পাত্রের ধ্বনি—মুমতাজ জাহাঁ।

ও পরী, তোমার আঁখি পক্ষের (যেন তীরের মতন অসহ) আক্রমণ কে সহ্য করতে পারে—মুমতাজ জাহাঁ।

তোমার ঠমকে লোক খুন হয়ে গেছে - মুমতাজ জাহাঁ।

যখন থেকে আমার মন তোমার চিঠি আমার কথা জেনেছে, আমার হৃদয় মুমতাজ জাহাঁর কণ্ঠস্বর কান হয়ে শুনেছে—মুমতাজ জাহাঁ!

সে আমার বঁধু, সে আমারই। আর অনেক, অনেক দিন থেকে সে জানে আমার সব কিছু গোপন—মুমতাজ জাহাঁ।

সে দুই জগতেরই গর্ব, বন্ধুর বিশ্বাসের পাত্রী আর পিয়ারীদের মধ্যে নির্বাচিতা—মুমতাজ জাহাঁ।

নারীদের এই সব আলাদা ব্যবহার ইত্যাদির কথা তোমায় বলি। তুমি এসবের শেষ কথা—মুমতাজ জাহাঁ।

আল্লার কিরে এই সব বিচ্ছেদ আর যাত্রায় আমি দুঃখে নিমগ্ন হয়েছি আর তোমার জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারে এমন লোক এখন বিপন্ন—মুমতাজ জাহাঁ।

প্রতি দিন প্রতি রাত আমি তোমার গাল দুটি দেখবার কামনা করি আর মুমতাজ জাহাঁর ধরণধারণ কেমন করে ভুলে থাকা যায়—মুমতাজ জাহাঁ।

আমি সদাই দুয়ারে কান পেতে আছি। প্রেমের স্বরে আমায় ডাকো—ও মুমতাজ জাহাঁ।

তোমার কাছে আমি কিছুই লুকিয়ে রাখতে পারিনা, কারণ তুমি আমার সমস্তই জানো, সব গোপন কথা—মুমতাজ জাহাঁ।

আমার হৃদয় মরে যাচ্ছে তোমার মুখের জন্যে, তোমার সর্বাঙ্গের জন্যে। আর যে প্রেমিক সব কিছু ভুলে গেছে সেও তোমাকে ভালবাসার জন্যে গর্বিত—মুমতাজ জাহাঁ।

আমি তোমার সেই সব রীত্ ভুল্তে পারিনা, লাখ্ বছর কেটে গেলেও—না। কারণ আখ্তারের নিজের একটা ধরণ আছে মুহব্বতের—মুমতাজ জাহাঁ।

আমার মনের অবস্থার আর তোমার প্রতি প্রেমের পরিচয় দিয়ে এই গজলটি রচনা করেছি। কেউ আমার

মানসিক অবস্থা আন্দাজ করতে পারবেনা, যার সব সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, লুঠ হয়ে গেছে।

প্রিয়জনদের থেকে দূরে আছে যে প্রেমিক, তুমি তার বিশ্বাসের স্থল। ঈশ্বর সাক্ষ্য—আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে এক বছরের মতন করে আর কি যন্ত্রণা আর অস্বস্তি ভোগ করছি বিচ্ছেদের জন্যে। তুমি একবার আমার জীবনের সেই সব সুখ আর আরাম আর আড়ম্বরের কথা ভেবে দেখো। আর এখন ভাগ্যের ফেরে আমি বর্ধমান রাজার কোঠিতে আছি যা শত্রুদের পক্ষে গারদখানার চেয়ে কম্‌তি নয়—আর কঠোর দিনগুলি কাটাচ্ছি। মনের কি ঘটবে? আমি আর লিখতে পারিনা।

৫, মহর্‌রম্‌ ১২৭৩। জানে আলম্‌।

(ষষ্ঠ পত্র)

হরিদের সব আচরণ তার মধ্যে আছে আর সে ঝকমক্‌ করছে আয়নার মতন—জয়নাব্‌ বেগম।

আমি তোমায় ভালবাসি, তুমিও আমায় ভালবাসো, ওগো ফুল। এস, আমরা পরস্পর ভালবাসার শপথ নিই—জয়নাব্‌ বেগম।

সুখ, বিলাস আর আরামের হেতু সে। ভাল ব্যবহার তার আয়ত্তে আছে আর সে আমার প্রাণ—জয়নাব্‌ বেগম।

কেন তোমায় আকলীল মহল বল্‌বেনা বৃদ্ধ আর যুবকরা—রাজকীয় মর্যাদা তোমার, তুমি মুকুটধারিণী জয়নাব্‌ বেগম।

তোমার মুখখানি আমি কখনো ভুলতে পারিনা আর আমি সর্বদা তোমাকেই স্মরণ করি—ও জয়নাব্‌ বেগম।

যেদিন থেকে তোমার কুঞ্চিত কেশদাম আমি দেখতে পাইনি, সেদিন থেকে আমার সমগ্র সত্তা বিভ্রান্ত হয়ে আছে—জয়নাব্‌ বেগম।

ঈশ্বর, আমাদের অবিলম্বে মিলিত করুন, বিচ্ছেদের জন্তে আমার হৃদয় কাতর হয়ে আছে—জয়নাব্‌ বেগম।

যখন থেকে তোমার মধুর মুখটি আমার চো আড়াল হয়েছে তখন থেকে তা আয়নার মতন স্থির গেছে—জয়নাব্‌ বেগম।

কাকে আমার সিক্ত চোখ জিজ্ঞাসা করবে?

আমার সাথী শুধু আশ্‌মান। কিন্তু সে আমার নাগালের বাইরে। সুতরাং কেমন করে আ অশ্রু মুছ্‌বো—জয়নাব্‌ বেগম।

এ জগতের গুল্‌চিরা (যারা পুষ্প চয়ন করে) (গুল্‌দারে (বাগান) বন্দী হবেনা—বুল্‌বুল্‌ যে জয় বেগম।

তোমার উরু যেন সূর্যমুখ—চিকণ, সুগো তোমার জঙ্ঘা দুটি দেখে চাঁদেরও তোমার প্র অসূয়া—ও জয়নাব্‌ বেগম।

যখনি কোন শুষ্ক পত্র তোমার চোখে পড়ে, তু বলো, 'এই—আখ্‌তারকে চেনা যাচ্ছে। জয় বেগম।

আকলীল মহল নবাব জয়নাব্‌ বেগম যেন জানে (জানে আলম্‌ তার শরীর আত্মার সঙ্গ কামনা কর আমি এই গজলটি রচনা করেছি তোমার বিরহ ভারে, তোমার পুরণো জয়নাব্‌ নামে ডেকে। তু এটি পড়বে ও গাইবে।

এখানে সব ভাল আর আমি আশা করি তু খবর ও চিঠি পাঠাবে।

২৮, মহর্‌রম, ১২৭৩।

স্বাক্ষর সিকান্দর জা আখ্‌তার।

(সপ্তম পত্র)

কি চমৎকার তার সব ব্যবহার। আমা জালাতন করবার নতুন নতুন উপায় সে সর্বদা বা করে। প্রেমের কর্ত্রী সে—জয়নাব্‌ বেগম।

কি চিকণ তার গাল দুটি। হুরির মতন, পরী মতন, চাঁদের মতন তাকে দেখতে—জয়নাব্‌ বেগম।

ওগো জয়নাব বেগম, তুমি আমার অনেক দিয়েছ তুমি আমার ভুল্‌ ভুলাইয়ায় ঘুরতে বাধ্য করিয়েছ

তোমার কোঁকড়া চুলের রাশি কত ঘুরিয়েছে আমায়। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি তোমার কাছে বিচার চাই—জয়নাব্ বেগম।

অন্যেরা তোমায় ঘিরে ফেলেছে আর আমি নিজে ছিটকে পড়েছি অনেক দূরে। আমাকে স্মরণ করবার কি সময় আছে তোমার? জয়নাব্ বেগম।

আমি সদাই গুণ গাই, তুমি দয়া করে আমায় কষ্ট দিও না। আমার ওপর কৃপা করো। আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে—জয়নাব্ বেগম।

তার গাল যেন রাঙা আগুন আর লাল ফুল ঈর্ষা করে তাকে। সম্‌শাদ (গাছ খুব দীর্ঘ হয়) হিংসা করে সে দীর্ঘাঙ্গিনীকে—জয়নাব্ বেগম।

তোমার মনের মহলে দিন রাত হাজির থাকে অনেক সুন্দর মুখ। তোমার হৃদয় তাদের নিয়ে ভরা—জয়নাব্ বেগম।

আমার প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তোমায় দেখ্‌লে। ওগো এ জগতের আত্মা, তুমি আমার প্রাণ, আমার পরী—জয়নাব্ বেগম।

তুমি সব সময় তোমার চুলের জাল ছুঁড়ে দাও আর তিলের বীজ দিয়ে বন্দী করো প্রেমের বুলবুলিকে। তুমি একটি শিকারী – ওগো জয়নাব্ বেগম।

তোমার চিত্তবিনোদনের জন্যে রচনা করেছি এই নতুন গজলটি আর এইটি আমার প্রেমের চিহ্ন—ওগো জয়নাব্ বেগম।

এ তো তার চুল নয়—ধোঁকা। আসলে এসব তাঁর কাঁধের ওপর জাল। শিকারী যে জয়নাব্ বেগম।

ও আখ্‌তার, তুমি দুর্বল, দরিদ্র হয়ে গেছ। আর বেশী বল্‌তে বাধ্য কোরোনা আমায়। জয়নাব্ বেগম রূপের মহল, যা খোদা তাকে দিয়েছেন—জয়নাব্ বেগম।

মুম্‌তাজ জাহাঁ আক্‌লীল মহলের যেন জানা থাকে যে, জানে আলম্ আগে দুটি কবিতা পাঠিয়েছেন। ঈশ্বর জানেন সে দুটি তোমার কাছে পৌঁছেচে কিনা। আমি তোমার কোন প্রাপ্তি-স্বীকার পাইনি।

তোমার পুরণো খেতাব জয়নাব্ বেগম নামে এই তৃতীয় গজলটি আমি লিখেছি।

আশা করি তিনটিই পাবার খবর তুমি দেবে। যদি তা না পেয়ে থাকো, অনুগ্রহ করে' জানিও।

২৬, মহর্‌রম্, ১২৭৩। স্বাঃ গরীব আখ্‌তার।

(অষ্টম পত্র)

নবাব আক্‌লীল মহল সাহেবা—

ভালো থাকো: আমি তোমার চিঠি চার তারিখে পেয়েছি। কাপ্তান কুদ্‌সুদ্দৌলা বাহাদুর আমার হাতে সেটি দিয়েছেন।

তাতে তুমি লিখেছ যে, তুমি একটি ইমাম জামিন (পুরুষরা বাইরে যাবার সময় ওপর হাতে টাকা বেঁধে রাখে। সংস্কার এই যে, ইমাম তাকে দেখবেন) পাঠিয়েছ। তোমার কথা মতন আমি খামে খুঁজে সেটি পাইনি। ঈশ্বর কৃপায় এখানে সব ভাল। জনাবে আলীয়া (নবাব-জননী) লণ্ডনে পৌঁছেচেন। কিন্তু তাঁদের কোন পত্র পাইনি

আশা করি তুমি এমনি মধুর সব চিঠি পাঠিয়ে আমায় আনন্দ দেবে।

৪ঠা সফর। স্বাঃ সুল্‌তান-এ আলম্।

(নবম পত্র)

আনন্দের ভাণ্ডার, সুখের কারণ, জীবনের পুলক, যৌবন-বাগিচার ফল, দুপুরের সূর্য, প্রেমের চাঁদ, সপ্রতিভ বুদ্ধিমতী, যে নানা হাবভাব দেখায়, রূপালী যার তনু, যে দিল্ আরাম, যার শরীর ফুলের মতন পেলব—নবাব আক্‌লীল মহল সাহেবা—

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রাণকে তা খাদ্য

দিয়েছে, শান্ত করেছে আমার কাতর মনকে। মুজাহেদ্ উদ্‌দৌলা ১৫ই সফরে এই পত্র আমায় দিয়েছেন।

আমার হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে। আমি সুখী হয়েছি তোমার বৃত্তান্ত জেনে।

আমাদের এই বিচ্ছেদে আমার মন খারাপ হয়ে আছে।

তোমার চিঠিতে সর্তের কথা দেখেছি। এখন আমার কথা শোনো। আমার কল্পনা লাল্‌চে মুখের দিকে। আমি কোন কথা বলতে ভুলে গেছি সেই মুখের কথা মনে করে। সব বিলাস আর আরাম এখন গল্প কথা হয়ে গেছে। আমার সদাই দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ঘুমোতে পারিনা রাতে। যারা আমার দিকে দেখে, তারা কাঁদে। চোখের জলে তাদের মুখ ভেসে যায়। তোমার সঙ্গে আমার মিলনের ইচ্ছা প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে আর চুম্বনের কামনার তো প্রশ্নই নেই। তোমাকে চুম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করা আমার ক্ষমতার বাইরে।

যখনই তোমার কোন ঘটনা, কোন কথা, তোমার কোন কিছু মনে পড়ে, আমি কাঁদি আর আমার সব জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আশ্‌মানের দিকে তাকিয়ে আমি বলি —ও নিষ্ঠুর, কখন তুমি তারার (আখতারের) সঙ্গে চাঁদের (বেগমের) মিলন ঘটাবে, কবে তুমি দেখাবে তার দীপ্ত মুখখানি, কখন এই প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে আর কবে শেষ হবে এই বিচ্ছেদ বেদনার দিন ?

তখন আকাশ বলে—তোমার দীন অবস্থা আর হতাশ মনের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে আর তোমার ওপর দয়া।

নিকট ভবিষ্যতে তোমার আর আমার পক্ষে ঘটনা ভালোর দিকে ঘুরবে।

মিলনের জন্যে উন্মুখ,
দুঃখার্ত ও বিপর্যস্ত
জানে আলম্

১৫ই সফর, ১২৭৩।

(প্রায় দু'বছর পরে—দ্বিতীয় পর্য্যায়, প্রথম পত্র)

তুমি কল্যাণী-বাগানের ফুল আর প্রেম-বাগিচার ফল, ওগো তরুণী মুম্‌তাজ জাহাঁ নবাব আক্‌দীল মহল সাহেবা—

যে দুর্ভোগ আর কষ্টের মধ্যে দিয়ে আমার দিন কেটেছে সেসব জানে আলম্ বর্ণনা করবেনা। কলকাতার এই কেল্লায় গত ১৮ মাস যাবৎ আছি আর আমার সঙ্গী আছে ১২ জন। আমি একলা থেকেছি আর কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি। তোমার বিরহে আমার প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে আসত।

আমি নির্দোষ তুমি দুর্ভাবনা কোরো না। আমি শীঘ্রই তোমার খরচের জন্যে টাকা পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি এবং ৫০০ টাকা তুমি এখনি পাবে। অনুগ্রহ করে দেনাটা মিটিয়ে দাও আর বাকিটা সামলে নেব।

দয়া করে প্রেমপত্র পাঠিও আমায় আনন্দ দেবার জন্যে। কারণ, কথায় আছে, চিঠি হল সাক্ষাতের অর্দ্ধেক।

তোমার নিজের শরীরের জন্যে চিকিৎসা করাতে ভুলো না। ১৪ই রবিয়ুস্সান আমি তোমার একটি চিঠি পেয়েছি। তুমি যে আমায় মনে রেখেছ আমি তাতে আনন্দিত।

কথায় আছে, সকালে যে বেরিয়ে চলে যায় আর সন্ধ্যায় ঠিক ফিরে আসে তাকে ভুলো বলা হয়না।

তুমি লিখেছ যে তুমি লক্ষ্ণৌতেও থাকতে চাওনা, কল্‌কাতাতেও না ; কিন্তু তুমি চাও আমি কেল্লায় তোমার সঙ্গে দেখা করি। ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন। তুমি মহৎ। মহিলাদের পক্ষে এই ভালো যে তারা তাদের স্বামীদের বিপদে সাহায্য করবে।

আমি ভারি পাহারার মধ্যে কয়েদখানায় রয়েছি। এমন কি চিড়িয়ারা পর্য্যন্ত ভিতরে আসতে পারেনা। সুতরাং আমি কেমন করে তোমায় এখানে আনব। গোপন রেখো। লাট সাহেব বাহাদুর আমায় ২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন আর প্রতিশ্রুতি করেছেন যে আমার দরকার মতন আরো টাকা দেবেন সরকার।

তুমি এখন ওখানে বসে ইজ্জৎ ও আব্রুর সঙ্গে আমার মুক্তির জন্তে প্রার্থনা করো। খোদার ওপর সর্বদা খেয়াল রেখো। ভয় কোরো না। আমি তোমার প্রেমিক।

তোমার মাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। তাঁকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও।

তোমার আনন্দের জন্তে আমি একটা নতুন গজল লিখেছি। যখন তোমার একঘেয়ে লাগবে এই গজল তুমি পড়ো আর আমাকে মনে কোরো।

এক হজরৎ তুর্ পরৃভি বাহ্‌রে রহ্‌ গ্যেয়ি,

এ্যায়সা কুছ্‌ দেখা কে আঁখো কো তমন্ন রহ্‌ গ্যেয়ি। ইত্যাদি অর্থাৎ—মুসা তুর্ পাহাড়ে গেছেন। সেখানেও তাঁর একটি বাসনা ছিল যা পূর্ণ হয়নি। এমন কিছু দেখলেন যা এখন তাঁর চোখ আবার দেখতে চাইছে।

আয়নার দিকে যখন তুমি চাও তোমার প্রতিমূর্তি সেখানে দেখো। আমি অবাক হয়েছি দুনিয়ার হালচাল্ দেখে।

ওগো ডাক্তার, (উর্দু কবিতায় প্রিয়াকে ডাক্তার সম্বোধনের রীতি আছে) তোমার লাল ঠোঁট দুখানি, আমাকে পরীক্ষা করো আর বলো আমার শক্তি ও ওজন বিচ্ছেদের সময়ে বেড়েছে না কমেছে।

আমার হৃদ্‌পিণ্ড লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল দুনিয়ার বাগিচাকে (প্রিয়া) দেখে আর বুলবুলের ঠোঁটে তার তারিফকে খুলে রইল।

কি সে আলো যা দিল্‌কে উজ্জ্বল করে আর জায়গাটি স্মৃতি হয়ে থাকে সেই তুর্ ঘটনার (মুসার সামনে সেই পাহাড়ে খোদার আবির্ভাব হয়েছিল)

বাগানে মালীই হয়েছে ধ্বংসের কারণ আর প্রতিটি কুঁড়ি শুকিয়ে গেছে আমার হৃদয়ের মতন।

মজনুর মতন আমি হৃদয়কে ফেলে এসেছি আমার প্রিয়ার রাস্তায় আর উট এগিয়ে গেছে আর লায়লা উটের পিঠে।

ও আমার পিয়ারী, যার চাঁদের মতন মুখখানি, সন্ধ্যার সময় তোমায় দেখতে আমার বাসনা। তুমি এস কোঠির ছাদে।

আমি তোমার সামনে নিজেকে খুন করে ফেল্‌ব যদি কোঁকড়ানো চুল থাকে তোমার মুখের ওপর।

তোমার ওই কুঞ্চিত কেশের শিকলে আমি বন্দী। সে মজ্‌লিসের বন্দোবস্ত করেছিলেম, সেখানে আমি যাইনি —সে মজলিস উপভোগ করিনি আমি।

সকালের গরম হাওয়ার মতন আমার নিঃশ্বাস আনা-যাওয়া করছে আর আমার প্রাণ হয়েছে বাতির নীচে রাখা কাপড়ের মতন (সদাই তাপ পাচ্ছে, আমার আত্মা জলছে)।

ও চিড়িয়া, ভ্রূযুগলের তোরণের সামনে তুমি নত হও নি। এই কামনাটি তোমার হৃদয়ে অপূর্ণ রয়েছে।

সেই কণ্ঠস্বর শোন্‌বার জন্তে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে আমার কান এবং আমার চোখের অবস্থা এই যে সে দেখ্‌ছে চেয়ে আছে আর স্থির হয়ে রয়েছে।

আমার চোখ সদাই খোঁজ করছে আমার প্রিয়ার পানে চাইতে আর আমার মুখ চাইছে প্রেমের স্বাদ পেতে।

সংগ্রহ আর জমা করে তুমি কি লাভ করেছ, খোদার দোহাই, বলো। আপ্‌তার, বলো আমাকে, সে রূপ তারা রক্ষা করেছিল সে কোথায় গেল।

১৪ই রবিশানি, ১২৭৫। বেদনাহত জানে আলম্।

পুনশ্চ—লেফাফার ওপর এই ঠিকানা লিখো-

সম্পাদক, বৈদেশিক বিভাগ,
C/o দফ্‌তরখানা এ মীর মুন্সী,
কৌন্সিল হাউস ষ্ট্রীট।

(দ্বিতীয় পত্র)

মুম্‌তাজ জাহাঁ নবাব আকৃলীল মহল সাহেবা—
কর্ণেল কনিয়াটুন্‌কে দিয়ে ইতোমধ্যে তোমার

খরচের জন্যে তোমায় ৫০০ টাকা পাঠিয়েছি। আমাকে তোমার রসিদ পাঠিয়ে দিও আর তোমার নিজের বিষয়ে লিখো যাতে আমি সুখী হই।

১৯, রবিশানি, ১২৭৫। স্বাঃ অজধর রাজা

(তৃতীয় পত্র)

শকীল ও জমিল (মনোরমা ও সুন্দরী) মুমতাজ জাত নবাব আকলীল মঙ্গল সাহেবা, সালামৎ (সুখী হও)।

আমি একটি চিঠি পেয়েছি। এতে ৫০০ টাকার রসিদ আছে। আমি আবার ৫০০ টাকা পাঠিয়েছি অনুগ্রহ করে রসিদ পাঠিও। আরো ১৫০ টাকা তোমার মার জন্যে পাঠাতে অনুমতি দিয়েছি এবং মাসিক ৫০ টাকা হিসাবে। আমি ছ মাসের জন্যে মাহিনা বাবদ ৩০০ টাকা করে দিচ্ছি কিন্তু পরের ছ মাস আমি কিছু দেবনা। হয় তুমি তাঁকে মাসে মাসে কিংবা একসঙ্গে দাও যা তুমি ভাল বোঝো, আর আমাকে রসিদ পাঠিও। তোমার খরচপত্রের দিকে নজর রেখো। বে হিসাবী খরচের বিষয়ে সাবধান থেকো।

২১, জামাদি উস্‌সানি, ১২৭৫। স্বাঃ জুল্‌ফুকারুদৌলা বক্সী বরশদ্‌

জানে আলম্‌।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গলার জাতীয়তাবাদে 'বন্দেমাতরম'

কালীচরণ ঘোষ

আগে "সন্ধ্যা", পরে "যুগান্তর" এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার আবির্ভাব। ইংরেজিতে প্রকাশিত পত্রিকা, সুতরাং শুরুতেই বাংলা পত্রিকাগুলির মত সাধারণের জনপ্রিয় হতে পারে নি। তখন ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম, তার ওপর 'বন্দে মাতরম্" পত্রিকার ভাষা ও ভাব অত্যন্ত উচ্চস্তরের। মাঝে মাঝে দুরূহ শব্দ ও দীর্ঘ বাক্য যে অর্থ বহন করে সেটা বুঝতে কোনো কোনো আগ্রহশীল শিক্ষিত পাঠককেও ক্লেশ পেতে হতো। যাঁরা পাঠ করে রস গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাঁরা পত্রিকা না পেলে অস্বস্তি বোধ করতেন। চিন্তাশীল পাঠকের কাছেও বন্দে মাতরম্ যে জাতীয়তা ভাব প্রচার করেছে, অনেক সময় সেটা বেশ নতুন বলে মনে হয়েছে।

সন্ধ্যা, যুগান্তর সাধারণ লোকের মনের অবসন্নতা দূর করে ইংরেজকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়েছে, তারা যে কোনো অংশেই বড় নয় এবং কেবল সাহেব বলেই উচ্চস্তরের জীব নয়, সে কথা বাঙ্গালীর অন্তরে প্রবিষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে। বন্দে মাতরম্ হৃদয়ের ভাবাবেগকে উপেক্ষা করতে বলে নি। কিন্তু তার যুক্তি বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে স্থান গ্রহণের চেষ্টা করেছে। বিচার-বুদ্ধি দিয়ে একবার গৃহীত হলে সে আবেগ শীঘ্র মন থেকে দূর হবে না। কাজে প্রেরণা যোগাবে এবং নিজের চিন্তাধারায় অপরকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে। ইতিহাসের নজির দিয়ে অপর পক্ষের যুক্তি দ্বিধাগ্রস্ত মনের দ্বন্দ্ব দূর করতে বন্দে মাতরম্ অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। দৈহিক ও চারিত্রিক বল সঞ্চয় মানসিক বলে ইংরেজের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ ঘোষণা করে (hands off) একদিনে তার শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলার মনোভাব গড়ে তোলার মন্ত্র গ্রহণ করেছিল বন্দে মাতরম্। বলা বাহুল্য, এ কাজে পত্রিকা আশাতীত সফলতা লাভ করেছিল কারণ এর প্রারম্ভিক লেখকদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ স্বয়ং, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি দিকপালগণ। এঁদের অনুচরদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র দেবের নাম উল্লেখযোগ্য।

পত্রিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, তখনকার উগ্রপন্থীদের নিজস্ব ভাব প্রকাশ ও মতবাদ প্রচারের জন্য একটি ইংরেজী পত্রিকার প্রয়োজনবোধ হয়। সন্ধ্যা যুগান্তর আর নবশক্তি কতকাংশে বাঙ্গালীর মনে প্রবল ঝঙ্কার সৃষ্টি করছিল, কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে তা পাঠ করা সম্ভব ছিল না। অরবিন্দ পত্রিকার প্রারম্ভ সম্বন্ধে বলেছেন "বিপিন পাল সামান্য পুঁজি নিয়ে বন্দে মাতরম্ আরম্ভ করলেন এবং আমায় তার সঙ্গে যোগ দিতে ডাকলেন, আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম·····বিপ্লবের জন্য যে প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন তার সুবিধা হল।" (নীরদবরণ "স্বপ্ন" প্রবন্ধে)।

বন্দে মাতরম্ দৈনিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হলো ১লা আগষ্ট ১৯০৬ অর্থাৎ যুগান্তরের ঠিক পাঁচ মাস পরে। অফিস ক্রীক রো, ২।১। পত্রিকার নিজ বিশেষত্ব প্রচার করতে বিশেষ সময় লাগেনি, বিপিন চন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি যে পত্রিকায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ নির্দেশ করছেন, পাঠক তার পরিচয় পেতে বেশী সময় লাগবার কথাও নয়।

ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় যেসব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ অরবিন্দের লেখনীমুখে প্রকাশ কালে (১৮৯৩-৯৪) মহামতি রাণাডের পরামর্শ মতে মধ্যপথে বন্ধ হয়েছিল, আজ তারা বাধামুক্ত স্রোতের মত বন্দে মাতরম্-এর পৃষ্ঠায় আবির্ভূত হলো। ইতিপূর্বে নানা পত্রিকা বলা সত্ত্বেও "বন্দে মাতরম্" "উষ্মা, উত্তেজনাহীন ভাবে লিখেছিল (২২ আগষ্ট ১৯০৬) "ভারতবর্ষ যদি কখনও স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হয়, তাহলে তাকে কংগ্রেসের চিরাচরিত পথ ছেড়ে নিজ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করতে হবে।" নরমপন্থী মডারেটদের পথকে বন্দে মাতরম আখ্যা দিয়েছিল The propelition plot "(১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) অর্থাৎ আবেদনপন্থীয় চক্র"। এক কথায় ঐ পদ্ধতিকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করা এবং উদ্যোক্তাদের ওপর একটা অনাস্থার ভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো, যেমন "ফিরিঙ্গি" বলে বলে "সন্ধ্যা" ইংরেজকে জনসমক্ষে হেয় করে তুলেছিল।

উগ্রপন্থীদল গড়ে উঠেছে, আর তাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যাঁরা এতদিন কংগ্রেসের হাল ধরেছিলেন, তাঁরা রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনায় চিন্তিত হলেন এবং যাতে সংহতি রক্ষা হয়, তার জন্য পত্র-পত্রিকায় লেখা এবং আলাপ-আলোচনা সাহায্যে বিরোধের নিরসন হয় তার চেষ্টা করতে থাকেন। তখন "বন্দে মাতরম্" তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে লিখলে (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) ইতিহাস এ ভাবকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে এবং বহু ঘটনার উল্লেখে প্রমাণ করেছে যে ঐ বিরোধিতাই নূতন ইতিহাস সৃষ্টির কারণ। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইটালীর বিপ্লবকে নজিরস্বরূপ উক্ত হয়েছে;

পরেই বলছে যখন নরমপন্থী নেতাদের নিকট যাচ্ঞাই একমাত্র মত ও পথ বলে গৃহীত ছিল তখন বাইরে ঐক্যের একটা খোলসেরও প্রয়োজন ছিল। ভিক্ষুক-গোষ্ঠীর পক্ষে বিরোধ প্রকাশ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বরে কাঁদুনি গাওয়া স্বার্থের হানিকর। কিন্তু আজ যখন জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন সকল প্রশ্নে একতা রক্ষা সম্ভব হতেই পারে না।

বন্দে মাতরম্-এর ভাষায়:

"As long as mendicany was their (leaders') method and their ideal, it was necessary to preserve a show of unity, for it would not do for a 'family of beggars' to disagree and where in different keys, but now that the nation is making for independence it is not possible to be united on every possible question."

ব্রিটিশ-বর্জিত স্বাধীনতা দাবী করায় চক্ষে ইংরেজ মালিকদের পত্রিকাগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে জবরদস্ত শাসনের (?) পরামর্শ দিতে আরম্ভ করেছে। তাই The Sinful Desire "পাপগ্রস্ত দুষ্ট-বাসনা" আখ্যায় বন্দে মাতরম্ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) জানালে;

স্বাধীনতাই মানুষকে প্রকৃতির দান বা এটাই তার স্বাভাবিক অবস্থা, সুতরাং সকল (বিদেশী) শাসন হতে মুক্তির বাসনা দস্তুরমত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। স্বেচ্ছাচারী চিরকাল এই স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা-স্পৃহা দলন করতে চেষ্টা করে এসেছে, কিন্তু ইতিহাস বারে বারে তার উচ্ছেদ বা পতনের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। এ শিক্ষা আবার উপেক্ষিত হয়েছে। আমাদের চক্ষু আছে, দেখি না, কান আছে, শুনিনা; ফলস্বরূপ মানুষের এই ভ্রান্তি এবং বিপরীতবুদ্ধি চিরকাল প্রগতির পথকে রুধির-প্লাবনে ভাসিয়ে আসছে। আমরা যদিই বা দৈহিক শক্তির দ্বারা বিপক্ষকে প্রতিহত করতে চেষ্টা না করি তথাপি আমরা মাত্র একদিন শাসনযন্ত্রের সহিত সহযোগিতা ছিন্ন করার শেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তাকে সম্পূর্ণ বেচাল করে দিতে পারি। যেদিন জনমানস অমলিন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, সেদিন বর্তমান স্বেচ্ছাচারী শাসকশক্তিকে তারা সদর্পে বলতে পারবে যে যতক্ষণ না আমাদের জন্মগত অধিকার অবধি স্ফুরণের সুযোগ পাচ্ছি, দেবতার সন্তান ও স্বাধীন নাগরিকরূপে আমরা ঐ পীড়নযন্ত্র চালনা করতে

আমাদের অসম্মতি জানাচ্ছি : আর সেই দিনই আমাদের অসহযোগিতায় শাসনযন্ত্র ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।"

["······Eyes have we but see not, ears have we but hear not, to the path of progress owing to this human folly and perversity, is ever deluged with blood. ···We, where true patriotism and love of freedom inspire the masses, some day present an ultimatum to the present despotism in the country that unless they make room for the play of our natural rights, as God's children and free citizens cry 'hands off' and bring it at once to an absolute deadlock."]

দৈনিক "বন্দে মাতরম্" যাস সাতেক চলেছে, তখন একে স্থায়িত্ব দান করার কথা ওঠে, আর সেই সঙ্গে একটি সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশ করার বিষয় আলোচিত হয়। অক্টোবর (১৯০৬) মাসে অরবিন্দর পরিচালনায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি যৌথ কোম্পানী সাহায্যে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অক্টোবর ১৩ (১৯০৬) "বন্দে মাতরম্" যৌথ মূলধনের কোম্পানী হিসা'বে রেজেষ্ট্রি হ'য়েছিল। তখন শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, সেটা সাপ্তাহিক সংস্করণে যা প্রচারিত হয়েছিল, তাই থেকে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

BANDE MATARAM

PRINTERS AND PUBLISHERS LTD.

A limited liability company with a capital of Rs. 50,000 divided into 5,000 shares of 10 each, has been registered···(name)···which has taken over the daily journal BANDE MATARAM.

This journal was started as the exponent of a new political ideal and the mouthpiece of a growing school of thought. Established at first by individual and on a small scale it has already in its two months of existence made a great reputation and promise to be a power in the land···

নূতন রাজনৈতিক আদর্শ এবং নূতন ভাবধারার বাহক হিসাবে এই পত্রিকা, (অর্থাৎ সাপ্তাহিক 'বন্দে মাতরম্') দুমাস (যে মাস হ'তে) চলতেই খুব সুনাম অর্জন করেছে এবং একটি প্রবল ভবিষ্যৎ শক্তির আভাস দিচ্ছে।

"The very opposition it has received in many quarters shows that it is the representative of a force which has been waiting for a daily means of self expression and once possessed of that necessary weapon can no longer be ignored."

অর্থাৎ নানা দিক থেকে পত্রিকা যে বাধা পাচ্ছে তা থেকে বোঝা যায় যে-শক্তি আত্মপ্রকাশের জন্ত নিত্য চেষ্টা করছিল, এ পত্রিকা সেই ভাবের প্রতিনিধিত্ব করছে। আর এ যদি একবার উপযুক্ত আয়ুধ সংগ্রহ করতে পারে, তা হ'লে তার শক্তিকে আর উপেক্ষা করা চলবে না।

লক্ষ্য করবার বিষয় নূতন কোম্পানী দৈনিক বন্দে মাতরম্ পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করছে।

প্রথম দিকে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদক আর শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন। সাপ্তাহিক বন্দে মাতরম্ ৭ জুলাই (১৯০৭) সংখ্যায় এ, কে, বসু (অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বসু) মুদ্রাকর ছিলেন। প্রবন্ধ সম্ভারে পত্রিকা অননুকরণীয় ভাষায় আপনার আভিজাত্য প্রকাশ করতে লাগলো।

আইন শৃঙ্খলার অতি চমৎকার অর্থপ্রদান করেছিল 'বন্দে মাতরম্' (৫ জুন ১৯০৭)। ইংরেজের বাক্যই হলো আইন। ভারতে তার অস্তিত্ব ও অবস্থানই বহু দেশপ্রেমমূলক কার্য্যের অপব্যবহার ও দমনের প্রতীক। বিদেশীর অত্যাচারকে মানিয়ে নেওয়াই হলো শৃঙ্খলা রক্ষা। যাচ্ঞা বা ন্যায্য দাবীর প্রার্থনা করা হলো চূড়ান্ত ধৃষ্টতা। আমলাতন্ত্রের কার্যের উৎখাত চেষ্টা প্রচণ্ড অপরাধ। চিরকালের জন্ত

দাসত্বর বাসনা পোষণই দূরদর্শিতা আর শান্তি ও সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত মনে করাই সুমতি ও মিতাচার; নিজেদের জাতি বলে মনে করা বাতুলতা। দেশকে ভালবাসা এক কুসংস্কার, তার মুক্তির প্রচেষ্টাই মহাদ্রোহ। এই রকম কোনো চিন্তা অন্তরে পোষণ করা রাজদ্রোহ। অতএব নবপ্রবর্ত্তিত বয়কট স্বদেশী জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি আইন ও শৃঙ্খলার মূলোচ্ছেদকারী, ধর্ম্ম ও সুনীতি, ন্যায় ও শুভপথ, আজ্ঞা ও শৃঙ্খলানুবর্ত্তিতা।

[বন্দে মাতরম্]-এর দীর্ঘ উদ্ধৃতি নিজস্ব ভাষা পাঠকের নিকট উপস্থিত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না :—

"The Britishers' word is law, his very presence and existence in the land a signal for the suppression and suspension of many patriotic activities. Reconciliation with foreign despotism is perfect order. It is the height of impertinence to be begging and asking. It is criminal to insist on the undoing of bureaucratic actions. To wish for our eternal serfdom is prudence and peacefulness. To think ourselves irremediably unfit is wisdom and moderation. To imagine ourselves a nation is madness. To love our country is superstition. To work for its emancipation is treason. To harbour any such sentiment is sedition. This the new trationalism with its boycott and Swadeshi, national education and Swaraj, is subversive of law and order, religion and morality, justice and fairplay, obedience and discipline."

এই মনোভাব আর কয়েকমাস পরে বন্দে মাতরম্ (৮ জুন ১৯০৭) আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে, তখন প্রবন্ধের শিরোনামা হলো, "চিন্তার শক্তি" (The strength of the Idea)। ভূমিকায় বলা হয়েছে যে সর্ব্বকালের স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বলের ওপর অত্যাচার সাহায্যে নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে এই আশ্বাস নিয়ে কাটিয়েছে এবং সেই পাপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তারপরে লিখছে জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা লাভের প্রবল স্পৃহার প্রারম্ভ অতি ক্ষীণ আর পরিণতি অতি কঠোর। অপর পক্ষে স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচার রুদ্ররূপে প্রকাশ পায়, আর তার শেষ হয় বিপরীত ভাবে। ইতিহাসেই সাক্ষ্য, যথেচ্ছাচারী শাসকের বিয়োগ অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছে। এ শিক্ষা চিরকালই বিফল হয়েছে, (কথায় বলে "আসন্ন বিপত্তিকালে ধীয়ো হি পুংসাং মলিনী ভবন্তি")—প্রতি অনুগামী যথেচ্ছাচারী মনে করেছে, কোনোদিন তার কোন ক্ষতি হবে না। বৃটিশরাজশক্তি বিশ্ব শাসনের প্রতাপ এবং সীমাহীন সম্পদের অধিকারী হয়েও আজ সেই ঐতিহাসিক প্রগলভতার মাঝে ডুবেছে,—মিশর আয়লণ্ড ও ভারতে নব ভাব নব শক্তির প্রবাহ ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে যে উঠছে, সেটা সে উপেক্ষা করে নিজের বিপদ ডেকে আনছে। যতদিন না বিধিনির্দ্দিষ্ট পরিণতি ঘটছে, ভাগ্য তাকে নিজ পথে ঠেলে নিয়ে যাবেই। আজ রুদ্ধনিঃশ্বাসে জগৎ লক্ষ্য করছে ইংরেজ এই সকল ভাবকে দমনমূলক আইন বা খেয়ালজাত আজ্ঞা অথবা ম্যাক্সিম ও অবরোধকারী কামান দিয়ে একে রুদ্ধ বা ধ্বংস করবে নাকি?

(···Nationalism, democracy, the aspiration towards liberty have feeble beginnings but a mighty end while with despotic repressions the beginnings are mighty and the end feeble. History shows that despotic rulers have always ended disastrously but inspite of that each succeeding despot deludes himself with the belief that he will never come to harm···Destiny will take its appointed course until the fated end, and it is left to be seen if England will crush these ideas with ukases and coercion laws, or kill them with maxim and seige guns.)

অপরের (বিশেষতঃ আমাদের শত্রু ইংরেজ) সাহায্যে বিপদ হতে যে উদ্ধার পাওয়া সেটা যে-কোনো আত্ম-মর্য্যাদা সম্পন্ন জাতির নিকট মৃত্যুর নামান্তর। বলতে ইচ্ছা হবে, "বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা" আমরা নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হব, সকল আপদ আমরা নিজ চেষ্টায় কাটিয়ে উঠবো। বন্দে মাতরম্ এই বাণী শোনালো ২০ নভেম্বর ১৯০৬। The gardianship of the British bayonets প্রবন্ধে। এ সকল কঠিন সিদ্ধান্ত একটা জড়প্রায় জাতিকে গ্রহণ করতে হলে বারে বারে ঘা মেরে পেতে হবে, এ কথা বন্দে মাতরম্ ভাল রকমেই জানতো। তাই ১৮ই মার্চ্চ ১৯০৭ তারিখে লিখলো "British protection or self protection" (ইংরেজ কর্তৃক রক্ষা বা আত্মরক্ষা)। প্রবন্ধের মুখবন্ধেই বলা হলো যে, যে ইংরেজ আমাদের জন্মগত শত্রু তার কাছে সাহায্য আশা করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সেই হেতু শাসকদের নিকট দরবার না করে দৈহিক শক্তিচর্চ্চা ও মনে সাহস সঞ্চয় করতে হবে যার সাহায্যে যে কোনো অবস্থায় এমন কি চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে নিমেষমাত্রে সকল শক্তি দিয়ে বিপদ হতে উদ্ধার লাভে সমর্থ হবে। এটা সম্ভব হলে ব্যক্তিগত অপমান নির্য্যাতনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। প্রয়োজনবোধে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হবে।...বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন করে প্রাচীন কালের ক্ষত্রিয়ের মত দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে।"

দেখা যাচ্ছে এসময় ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দে মাতরম্, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকা সমস্বরে এবং এক সুরে উৎসাহ দান করছে। ৬ জুলাই (১৯০৭) বন্দে মাতরম্ মন্তব্য করে যে বর্ত্তমান আন্দোলনের মূল শক্তির আধার হচ্ছে ছাত্রদল, সুতরাং ভীরুতার সংস্পর্শ থেকে তাদের রক্ষা করা বর্ত্তমানের প্রধান কাজ।

একই সংখ্যায় অন্য প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে যারা নিজেদের ভারতের মালিক বলে মনে করে এবং ভারতের জনগণের মন সর্ব্ব প্রকারে দমন করে রাখতে চায়, তারাই দেশের মধ্যে বলবিনিময় ও বিশৃঙ্খলা-মূলক সংগ্রামের মূল। যতদিন না জাতীয় সত্তা বা জাতি-প্রকৃতি আপন শক্তিতে অধিষ্ঠিত হচ্ছে এবং দেশীয় স্বার্থের ন্যায্য দাবী ও প্রাধান্য মেনে নিচ্ছে ততদিন সংঘর্ষ, অশান্তি, নির্য্যাতন, প্রতিহিংসাসম্ভূত বলপ্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। মূল ইংরাজী:

Those who consider themselves the lords of India and are bent upon stamping down the children of the soil, are the true promoters of violence and disorder. Strife, disturbance, repressive cruelty, retaliatory violence are inevitable until nature reasserts itself and restores to the indigenous interests their rights and just predominance."

তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহাবিষ্ট জাতিকে জাগাতে গেলে অতীব নিষ্ঠুর কশাঘাত প্রয়োজন। "নির্য্যাতন, আরও নির্য্যাতনের (১৮ জুলাই) যুগ এখন এসে দেশকে গ্রাস করেছে। এখন দেখতে হবে যাতে এটা সর্ব্বব্যাপী বিধিবদ্ধ ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। নির্য্যাতনের মধ্যে তার মুক্তি, অত্যাচারের পথে সে শক্তি সঞ্চয় করবে। আমলাতন্ত্রের এই রূপ সকলকে এক গোষ্ঠীতে পরিণত করবে, তখন আসবে ঐক্য ও দৃঢ়তা এবং সেই আত্ম-বোধ যার অভাবে দেশপ্রেমিকরা সাহস হারিয়ে বসে। নির্য্যাতন প্রতিনিয়ত বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হ'ক এবং ক্রমেই আকারে এবং প্রয়োগে ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করুক। ধনী দরিদ্র, নারী শিশু নির্ব্বিশেষে সকলের ওপর সমানভাবে নেমে আসুক বিরামহীন অত্যাচার আর তখনই ভারতের জাগরণ পূর্ণতা লাভ করবে। ইতিহাস স্বাধীনতা-সংগ্রামের মাত্র একটি পথই নির্দ্দেশ করে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রের বন্দুক বারুদের সম্ভার অপেক্ষা জাতির মঙ্গলের জন্য নির্য্যাতন সহ্য করা এবং মৃত্যুবরণ করবার জন্য মনকে গড়ে তোলার মূল্য অনেক বেশী। এই দৃঢ়চিত্ততা গড়ে তোলাই

জাতীয় কল্যাণে উদ্বুদ্ধ প্রত্যেক জাতীয় নেতার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।"

ইতিমধ্যে "যুগান্তর" সম্পাদক ভূপেন্দ্র দত্তর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও সহস্র মুদ্রা জরিমানার আদেশ হলো ২৪ জুলাই (১৯০৭)। বন্দে মাতরম্ ২৬ জুলাই (সাপ্তাহিক ২৯'৭) এক প্রবন্ধে লিখলে যে ভূপেন্দ্র দত্ত মামলায় অংশ গ্রহণ না করায় ইংরেজের আদালতের গৌরব ক্ষুণ্ণ ও বিভীষিকা দূর হ'য়ে গেল। দুইয়ের দ্বন্দ্বে ইংরেজ আজ হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। ইংরেজের কাছে নতি স্বীকার না করায় এই মূক প্রতিবাদে স্বরাজ সংগ্রামের মর্য্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ অন্ততঃ একজন লোক পাওয়া গেছে যিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে বলতে পেরেছেন যে তার সমস্ত জাঁকজমক, কামান বন্দুক, আইনকানুন, বিস্তীর্ণ রাজত্ব, বিজয়গর্ব্ব, অত্যাচার করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও অজেয়, অদম্য মনোবলের কাছে সবই তুচ্ছ। তুমি মরীচিকামাত্র; অভ্রান্ত সত্য হলো আমার দেশমাতৃকা এবং আমার স্বাধীনতা।"

For the first time a man has been found who can say to the power of alien imperialism. With all thy somp of empire and splendour and dominion with all thy boast of invincibility and mastery irresistible with all thy wealth of men and money and guns and cannon with all thy strength of law and strength of the sword, with all thy power to confine, to torture or to slay the body. Yet for me, for the spirit the real man in me thou art not. Thou only art only a phase, a phantom, possing illusion and the only lasting realities are my mother and my Freedom."

সাজা শাস্তির বিচারের মধ্যে না গিয়ে একটা প্রশ্ন জোর করে উঠছে, "আমরা (বর্ত্তমানেই) স্বাধীন কি না?" "ভবিষ্যতে স্বাধীন হতে পারবো কি না "সে প্রশ্নও উঠছে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে হয় আমরা নিজেদের ভাগ্য গড়ে তোলবার অধিকার রাখি, না, অপরের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবার জন্য আমরা জন্মগ্রহণ করিছি? অপরের দাক্ষিণ্যে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হবে না, আমরা ক্রমশঃ আঁধারে পড়ে পথ হারিয়ে মরবো।"

দীর্ঘ প্রবন্ধে জাতীয়তার প্রায় সকল দাবী উত্থাপিত হয়েছে, অকাট্য যুক্তি-প্রয়োগে সে দাবীকে শক্তি৹ান করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে "জাতীয়তাবাদী আমরা মনে করি মানুষের জন্ম ও স্বাধীনতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং আমরাও ব্যষ্টি ও সমগ্র জাতি হিসাবে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারও নির্দ্দেশ মানতে আমরা বাধ্য নহি, আমরা প্রাণ খুলে মনের কথা বলবো।

We nationalists declare that man is for ever and inalienably free and that we two are both individually as Indian men and collectively as Indian nation for ever and inalienably free. As free men we will speak the thing that seems right to us without caring what others may do to our bodies to finish us as being free men. etc, etc.

এই পর্য্যন্ত যখন চলেছে তখন বন্দে মাতরম্ সরকারী রোষ-বহ্নিতে পড়ে গেল। যুগান্তর মামলা (The Jugantar case) শিরোনামায় ২৮ জুলাই প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সরকারী আপত্তি উঠলো। এর কিছু অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তার আগের প্রবন্ধ, "ভারতীয়ের রাজনীতি" (The politics for Indians) প্রকাশিত হয় ২৭ জুন (১৯০৭)। এই দুই প্রবন্ধকে মূল করে মামলা আরম্ভ হলো। প্রধান আসামী অরবিন্দকে ১৬ আগষ্ট ধরার সঙ্গে সঙ্গে জামিন দেওয়া হয়। ম্যানেজার হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে ১৭ আগষ্ট ও মুদ্রাকর অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বসুকে ২১ আগষ্ট। ১৯০৭ গ্রেপ্তার করা হয়। ২৬ আগষ্ট তিন জনই আদালতে হাজির হন।

বিপিনচন্দ্র এই সময় (১৭ সেপ্টেম্বর) "বন্দে মাতরম্" এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছিল :

All correspondence intended for the Editor should be addressed to the Editor, Bande Mataram and not to Babu Bepin chandra Pal as his editorial connection with the paper has ceased.

সম্পাদকীয় বিভাগের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় পত্রাদি তাঁর ব্যক্তিগত নামে পাঠাইতে নিষেধ করা হচ্ছে।

২৩ সেপ্টেম্বর অরবিন্দ ও হেমেন্দ্র মুক্তি পান আর অপূর্ব্বর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁর হাইকোর্টে আপীল না-মঞ্জুর হয়েছিল অক্টোবর ৮ (১৯০৭)।

বন্দে মাতরম্ মামলায় আরও দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। বিপিনচন্দ্র পালকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করা হ'লে তিনি ২৬ আগষ্ট (১৯০৭) হাকিমের মুখের ওপর বলেন, তাঁর বিবেকগত আপত্তি থাকায় তিনি এ মামলায় শপথ গ্রহণ করতে অক্ষম সমাজের শৃঙ্খলা ও মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, কিন্তু বর্ত্তমান মামলায় কোনো অংশ গ্রহণ করবেন না। ভূপেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব পথ দেখিয়ে গেছেন, বিপিনচন্দ্র আদালতের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করে সেই মতকে শক্তিমান করলেন। বিচারালয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ। এ অসমসাহসিকতা ক্ষমার্হ নয়। ১৯ সেপ্টেম্বর [১৯০৭] তাঁর ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

দ্বিতীয় ঘটনার জের বাঙলার বৈপ্লবিক ইতিহাসে অনেক দূর গড়িয়েছিল, বর্ত্তমানে তার পূর্ণ বিবরণ অবান্তর বলে মনে হবে। সংক্ষেপে একাংশের উল্লেখ করা যাক্। বিপিনচন্দ্রর মামলা চলবার কালে বহু বাঙালী যুবকের ভিড় হয়েছে কাছারিগৃহ ও প্রাঙ্গণে। বড় হট্টগোল। হাকিম সব ছোকরাদের মেরে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন। বেপরোয়া মেরে চলেছে ফিরিঙ্গি সার্জেন্টরা। সেই ক্ষেত্রে সদ্য-প্রচারিত "মারের বদলে মার" নীতির সাক্ষাৎ এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ হয়ে গেল। সার্জেন্টের নাকের ওপর ঘুষি লাগিয়ে দিল একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক, সুশীলচন্দ্র সেন। মারপিট দাঙ্গা খানিকটা চলবার পর আক্রোশে সার্জ্জেণ্ট সাহেব আদালতে নালিশ করলে। আগষ্ট ২৭ ১৯০৭ তারিখে আসামী হুজুরকে বল্লে সার্জ্জেণ্ট সাহেব বেপরোয়া সবাইকে মারছে এবং তার মধ্যে আমাকেও, দেখে আমি ঘুরিয়ে মেরেছি। যখন বেশ জমে উঠেছে তখন আরও কয়েকটা পুলিশ এসে আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়।"

সঙ্গে সঙ্গে হাকিম রায় দেবার আগেই বলে ফেল্লেন, "আজ কাল বাঙালী ছোঁড়াগুলো মনে করে ইচ্ছে করলেই তারা পুলিশ ঠাঙাতে পারে।" রায়ে বালক সুশীলের প্রতি পনেরো ঘা বেত্রাঘাতের আদেশ হলো। সুশীল এক এক ঘা করে বেত খেয়েছে আর "বন্দে মাতরম্" বলে চেঁচিয়েছে। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করে কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ অমর গান বেঁধেছিলেন :

"যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে—
"বন্দে মাতরম্" বলে।
বেত মেরে কি মা ভোলাবি
আমরা কি মার সেই ছেলে?"
হবে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে"—
ইত্যাদি

এই পুলিশ ঠ্যাঙানোর ব্যাপারে আরও তিনটি যুবক গণ্ডগোলে পড়ে। ১৬ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা; আসর পুলিশ কোর্ট; বাদী ও সাক্ষী পুলিশ সার্জ্জেণ্টরা এবং হাকিম ডি, এচ, কিংসফোর্ড—ঠিক যেন সুশীল সেনের মামলা। ১৭ই তারিখে বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হলো হাইকোর্টের দুই ব্যারিষ্টারের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করে রায় বেরুলো শচীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, মানিকলাল দে এবং প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্দ্দশ দিন সশ্রম কারাবাস।

মুদ্রাকর অপূর্ব্বর কারাবাস ঘটলেও গভর্নমেণ্ট বন্দে মাতরম্ এর সুর নরম করতে পারেনি। সেই তেজস্বী অনবদ্য ভাষায় যুক্তিজাল বিস্তার করে লেখা সমানে চলেছিল। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্, দুর্ব্বলতার মধ্যে শক্তি বা দুর্ব্বলের ক্ষমতা (Strength out out of weakness) প্রবন্ধ ১লা আগষ্ট (১৯০৭) লেখা। চিরকালই সবলের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে না। "যথেচ্ছাচারীর ভ্রূকুটি কোনো জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে নি। অষ্ট্রিয়ানদের আস্ফালন সত্ত্বেও ইটালীয়রা স্বাধীন হয়েছিল; ইংরেজের দম্ভোক্তি সত্ত্বেও আমেরিকা এবং স্পেনীয়দের তর্জ্জন গর্জ্জন সত্ত্বেও কিউবা স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা-স্পৃহার উন্মাদনার প্রকাশ্য দুর্ব্বল জাতির মনে অদম্য শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রবল নির্য্যাতন যদিও সাময়িক দুর্ব্বলতা (মানসিক অবসাদ) সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় তথাপি হৃদয়দৌর্ব্বল্য আমাদের আচ্ছন্ন করতে দেবে না। জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের লক্ষ্য স্থলে উপনীত হবো।"

নানা রকম নিগ্রহ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, দেশের লোকও যে অকুণ্ঠ সমর্থন করছে তা নয়, তবে ক্রমেই সমমতাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ রকম সময় কর্ম্মীর মনোবল ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাদের ত সান্ত্বনা দেবার কথা নেই, আপনার নেশায় আপনি মেতে তারা চলেছে। তাঁদের কেবল বলা যায় (২৪ জানুয়ারী ১৯০৮) অগ্নি-পরীক্ষাই সুবর্ণ সুযোগ আর দুঃখই তাদের কপালের লিখন যাঁরা মৃত্যুকালে দেখে যেতে চান যে, জন্মকালে যেমন দেখেছিলেন তার চেয়ে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে। দুর্দ্দশা থেকে আনন্দে, অন্ধকার থেকে আলোকে, দুর্ব্বলতা হতে শক্তিতে এবং লজ্জা থেকে সম্মানে অধিষ্ঠিত হবার নান্য পন্থাঃ। আমরা যে পথ গ্রহণ করেছি, বিচার ধীঃ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা, তাছাড়া অন্য পথের সন্ধান দেয় না। যা আমাদের শ্রেয়ঃ, পেতে হলে তার উপযুক্ত মূল্য দিতেই হবে।

(Bengal on Trial শিরোনামায় লিখিত প্রবন্ধ: We feel no doubt very strongly for those who are bearing the brunt in the struggle. But we have no other consolatfon to offer to them than that sorrow is at once the lot, the trial and privilege for those who work for leaving the country better than they found it. There is no royal road, no safe path from misery to happiness, from darkness to light, from weakness to strength, from shame to glory. Reason and intellect. wisdom and experience cannot suggest any other course than what we have adopted. We must pay for things worth having.

মায়ের সম্মান রক্ষা করার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ বা ট্রান্সভাল যেখানেই সন্তানরা নিগ্রহ ও অপমান সহ্য করছে, প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতে পারলে একত্ববোধ জন্মাবে (১৮ জানুয়ারী ১৯০৮)।

ময়মনসিংহে অস্ত্রধারী পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্লৈব্য আর অসহায় ভাব আমাদের অভিভূত করতে দেওয়া হবে না, প্রতিবিধানের জন্য অবশ্যই আমাদের একটা পথ আবিষ্কার করতেই হবে। (২৪ জানুয়ারী ১৯০৮) প্রতিরক্ষা প্রতিরোধ কাহিনী গড়ে তুলতে হবে কালবিলম্ব না করে (২৫ জানুয়ারী ১৯০৮)

নিজেদের মহত্ব, অতীত গৌরব কাহিনী স্মরণ করা আমাদের পক্ষে নাকি প্রগল্ভতা বা দুরভিসন্ধিপূর্ণ অপরাধ। উচ্চ আদর্শ পোষণ করা আমাদের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যত জীবনের পক্ষে অবান্তর—এই বাণী শুনতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। কিন্তু একটা মৃতপ্রায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হলে উচ্চ আদর্শ ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না [২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯০৮]।

যতই নির্য্যাতন চলুক, ভারতবাসীকে সর্ব্ব রকম বড় কাজ হতে নিবৃত্ত করার যত চেষ্টা হক, আমাদের দাবী এবং তা পূরণের জন্য যে প্রবল আলোড়নের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে মনে হয় ভারতবর্ষকে বিপ্লব শৃঙ্খলার কবল হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। শান্তিপ্রিয় জড়

জাতি আজ মৃত্যুকল্প নিষ্ক্রিয়তা থেকে জেগে উঠেছে এবং বিশ্বব্যাপী ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে সে নবগঠিত শক্তিমান ও পূত হয়ে বেরিয়ে আসবে। দেশের যুবসম্প্রদায় কি ভাবে নিজেদের গড়ে তুলে, কোন্ বিশেষ গুণ তাদের বিভূষিত করবে, সে নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল ২৮ মার্চ ১৯০৮। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে মনে হচ্ছে, আজ সে উপদেশ পালন করা হয় নি তাই এই লালসার দ্বন্দ্ব। যাঁরা করতে চান তাঁরা হবেন সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নেতৃত্ব বা নাম বাজাবার লোভ থাকবে না, দেশের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ, আজ্ঞাপালনে তৎপর ও কর্ম্মানুরক্তিতে ভরপুর হবে, স্বার্থশূন্য আত্মবিশ্বাসসঞ্জাত আত্মিক শক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সম্ভূত জ্ঞানময় নির্দ্দেশনিয়ন্ত্রিত উচ্চাকাঙ্খা তাহাদের জীবনের সম্বল হবে।

সাধারণের বোধগম্য অনুবাদ আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি, সুতরাং মূল ইংরেজি উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম :

"These workers must be selfless, free from the desire to lead or shine, devoted to the work of country take absolutely obedient and full of energy. They must breathe the spirit of the self-less faith and aspiration derived from the spiritual guidance of the institution."

দেশমাতৃকার চরণে আত্মবলিদান করতে হবে। স্বাধীনতা-সৌধ গঠনের প্রতি প্রস্তরখানি সন্নিবেশের জন্য একটি করে জীবন বলি দিতে হবে। কেবল বাক্যাড়ম্বরে স্বরাজ আসবে না। প্রতি লোকটি যখন অন্তরের স্ব-রাজ্যে বাস করবে, তখন স্বরাজকে বাধ্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিতেই হবে।......দেশমাতৃকা আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন চাইছেন, এর কিছু কম, কিছু বেশী হলে চলবে না। স্বরাজ্য লাভের জন্য স্বদেশী জাতীয়, শিক্ষা, শিল্প সম্পর্কে যাহাই কিছু করা যাক্, সে কেবল সাধনার পথ।......পরিবর্ত্তে মা দেখতে চাইবেন, আমরা নিজেদের কতটা উৎসর্গ করেছি। আমাদের প্রিয় সম্পদ ও আমাদের কায়িক শ্রম, কতটা আরাম, কতটা নিরাপত্তা, জীবনের কতখানি দান করেছি পুনর্গঠন আর পুনর্জন্ম সমার্থক। আর মানুষের পুনর্জ বিচার বুদ্ধি ধীঃ শক্তি দিয়ে নয়। অর্থের প্রাচু নয়, পরিকল্পনায় নয়, শাসন সংস্কারে নয়, পরিবর্ত্তে চ নতুন হৃদয় আর তাকে উদ্ধার করতে হলে আমরা ছিলাম, সবই ত্যাগের আগুনে উৎসর্গ করে মাতৃক্রো জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাঁর প্রশ্ন,—আমার জন্যে তো ক'জন বাঁচবি? ক'জন মরবি?" তার উত্তরে অপেক্ষায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন" [১১ এপ্রি ১৯০৮]।

[কয়েকটি অংশের মূল ইংরেজি দেওয়া গেল :-

"For every stone that is added to th national edifice a life must be given···She ask for our hearts. our lives before nothing le nothing more···She will look to see ho much of ourselves we have given, how much of our substance, how much of our labou how much of our ease, how much of our safet how much of our lives. Regeneration is literall rebirth—rebirth comes not by the intellect not b the fulness of the purse, not by policy, not b change of machinery but by getting of a nev heart, by throwing away all that we wer into the fire of sacrifice and being reborn in th mother···"

দৈহিক ও অস্ত্রশক্তি না হলে যত কূটবুদ্ধিই থাকুক তাকে কার্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। সাধারণত বা স্বেচ্ছাচারীর রাজ্যে জনমত বিফল যদি বিপক্ষে প্রত্যাঘাত করবার শক্তি না থাকে। যদি ক্ষতি করবা শক্তি থাকে তবে সে মতের কিছু মূল্য আছে। বিপক্ষে অন্তরে যদি ভয় সৃষ্টি করা না যায়, তার যথেচ্ছাচারি বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই [২৪ এপ্রিল ১৯০৮]।

রোগের সংক্রামতা আছে, স্পর্শদোষ আছে সে ক অসত্য নয়, কিন্তু মহত্ত্বেরও সেই প্রভাব পরিলক্ষি হয়। বড় আদর্শ বড় কাজ বন্দে মাতরম্ বললে (১ জুলাই ১৯০৮) "Create an epidemic of noble

ness" ক্ষুদিরাম প্রভৃতি দেশপ্রেমিক যা করছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা যাচ্ছে না, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা সব মহৎ কাজ ছোট বড়, লক্ষ্য করে থাকেন; সেখানে ভুলভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। মহান্ ত্যাগের আদর্শ জাতির জীবনে নূতন উন্মাদনা আনবে প্রেরণা যোগাবে, মহত্তের উদাহরণ যথাকালে ব্যাপক মহত্ত্ব সৃষ্টি করবে।

ভারতের আমলাতন্ত্রের উদ্দেশ্য বড়ই সাধু, তারা আমাদের মঙ্গলের জন্য সব কাজই করে থাকেন। আমাদের লেখকরা তাঁদের স্বাধীনতাকে অপশক্তিতে পরিণত করেছে, বক্তারা লোক ক্ষেপিয়ে ঝামেলা করে আর যুবকরা রাজনীতিতে প্রবেশ করে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে; সুতরাং এ সকল দেশের অহিতকর কাজের জন্যই ব্যাপক সাজাশাস্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। (১২ আগষ্ট)।

কোনো পদানত জাতির আত্মসম্মানজ্ঞান কালের প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত হলে বাধাবন্ধহীন পথে সম্মুখে ঠেলে নিয়ে যায়। তখন সে আর কোনো বিরূপতা, বিপক্ষতা মানতে চায় ন। ন্যায্য দাবী আদায় করতে মরিয়া হয়ে ওঠে, যথানির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান মিলায়, আমাদের শাশ্বত সত্তা প্রেরণার উৎসের সন্ধান নিয়ে আসে। তখন আমাদের মধ্যে জাতীয় সত্ত্বা বা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে এবং আমাদের আত্মপরিপূর্ণতা ঘটাতে সক্ষম হয়। মনের অন্তস্থলে যে উন্মাদনা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে এবং তার বহিঃপ্রকাশের কোনো লক্ষণের অসদ্ভাব নেই, প্রেরণা আমাদের যোগ্য পথে ঠেলে নিয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার দ্বারা প্রভাবিত হতে দেবে না (১৫ আগষ্ট ১৯০৮)।

যুক্তির সঙ্গীত গেয়েছে "বন্দে মাতরম্" (২৭ অক্টোবর) আর সরকারের বিষনজরে পড়েছে।...... পত্রিকার দৃঢ় বিশ্বাস জগতের ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে নতুন মানুষ, কালের আবর্ত্তে উত্থিত মানুষ, নির্দ্দিষ্ট কাজের যোগ্য মানুষ, ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মহামানব ছিটকে বেরিয়ে আসে। এদের আত্মিক-শক্তি অপর মানুষকে চুম্বকের মত টানে, বিচ্ছিন্নকে যুক্ত করে, তাদের প্রেরণা জোগায়, সমস্যা সমাধানের উপযোগী শক্তি ধারণ করেন এবং বিস্ফোরণের সম্মুখীন হবার উপযোগী শক্তি ধারণ করেন। প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে, সমুদ্রমন্থনে অমৃতের মত এরাঁ উদ্ভূত হয়"। একেই শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী, আমার সদা নমস্য শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী বলেছেন "যুগধর্ম্ম"।

দেশে দেশে স্বাধীনতা লাভের আরাব উঠেছে, কিন্তু আমাদের দেশে "স্বাধীনতা সামান্য ভিন্নার্থে আমরা ব্যবহার করেছি।" যে স্বাধীনতায় দেশ আত্মহত্যা করে, ভারত সে স্বাধীনতার আকাঙ্খা পোষণ করে না" (২৭ অক্টোবর ১৯০৮)। ভারতের মথিত আত্মা যে স্বাধীনতা চায় সেটা কেবল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা নয়, যদিও এগুলি অত্যাবশ্যকীয় আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার ওপর ভারত যা চায়:

This freedom is essentially a spiritual fact It is not politics. It is not democracy as democracy is understood up till now in Europe. It is a religion,—this noble freedom that we desire to possess."

এর অনুবাদ চেষ্টা আমার পক্ষে বাতুলতা। মোটামুটি দাঁড়াচ্ছে যে ভারতের স্বাধীনতা ততটা জাগতিক নয়, যতটা আধ্যাত্মিক। ইউরোপের গণতন্ত্র আমাদের আকাঙ্খিত বস্তু নয়, তাদের সেটা রাজনীতি, আমাদের কাছে এটা ধর্ম্ম,—আত্মিক বিষয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রেস বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি হয়েছে; হাইকোর্টের রায় বাকী। তখনও (২৮ অক্টোবর) "বন্দে মাতরম্" সগর্ব্বে প্রকাশ করেছে যে পত্রিকা যে দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করে গেছে সে কখনও বিলীন হবে না।

ক্রমে দেখা গেল পুলিশ তার জাল গুটিয়ে আনছে; কোন্ দিন কি হয়। অক্টোবর শেষ (২৯-১০) নাগাদ দেখা গেল সাধারণ নাগরিক পোষাকে পুলিশ বন্দে-

মাতরম্ অফিসের আশেপাশে দিবারাত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাপাখানার মালপত্র, কর্ম্মিদের গতিবিধির ওপর যে বেশ সতর্ক নজর রয়েছে সেটা আর অনুমানসাপেক্ষ রইল না। বেশ বোঝা গেল "বন্দে মাতরম্" এর লোপ পাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

বেশীসময় লাগলো না। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ২৩ অক্টোবর (১৯০৮ "বন্দে মাতরম্" এর ম্যানেজার গিরিজাসুন্দর চক্রবর্ত্তীর ওপর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল 'কেন প্রেস বাজেয়াপ্ত হবে না, তার কারণ দর্শাও।' এক প্রবন্ধ, "ঘরের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বা ঘরের শত্রু বিভীষণ" Trator in the Camp প্রকাশিত হয়েছিল ১২ সেপ্টেম্বর (১৯০৮) শুনানী হলো নভেম্বর ৪ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেস বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারি হলো। আলোচ্য চারটি প্রবন্ধ প্যারাগ্রাফে বিভক্ত ছিল। প্রথম দিকে বিশ্বাসঘাতক সম্বন্ধে মন্তব্য, পরে উমিচাঁদ কাহিনী, তৃতীয় অংশে আত্মত্যাগীদের কথা এবং বলা হলো কানাইলাল দত্ত তার মধ্যমণি। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কানাইয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে এবং বিশ্বাসঘাতকদের মুখল হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। পরিশেষে বলা হচ্ছে যে এই শিক্ষা থেকে ভবিষ্যতে দেশের শত্রুরা সাবধান হবে—জাগ্রত দেশ এ উদাহরণ স্মরণে রাখবে।

প্রেস বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হলো নভেম্বর ৪ ১৯০৮। ফলাফল সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিৎ হয়ে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়েছিল। না বললেও ক্ষতি ছিল না, ৯ ডিসেম্বর শুনানীর পর, ১৪ তারিখে হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখে দিল।

অরবিন্দসংশ্লিষ্ট যুগান্তর, "বন্দে মাতরম" বন্ধ হয়েছিল কিন্তু দেশের মধ্যে তারা স্বাধীনতার যে আশা আকাঙ্খা আবেগ সৃষ্টি করে গিয়েছিল, দেশবাসী সেটা সম্পূর্ণ ভুলতে পারে নি। নিগ্রহ নির্য্যাতন ভোগ করে জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে স্বাধীনতার বন্ধুর-পথে যাঁরা চলেছিলেন, মৃত্যুঞ্জয়ী প্রথম পাঁচটি বীরের নাম, প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উচ্চারণ করে দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করা যাক্।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

মাসকাবারের আগের দিন, অর্থাৎ কাল বিকেল অবধি দেখে সুধাকান্ত নির্ম্মলাকে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল। লিখেছিল,

"নির্ম্মলা, তোমাকে ভালবাসি আমি, তা ত এখন আর তোমার অজানা নেই। আমি যে তোমাকে জগন্নাথের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে চাই, সে তোমাকে ভালবাসি বলে তোমার ভালর জন্যেই। তুমি হয়ত এখন সেটা বুঝতে পারছ না, কিন্তু একদিন নিজে থেকেই বুঝবে। আমি সেই দিনটির জন্যে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করব, আমার তাড়া খুব নেই। আপাততঃ তোমার কাছে কেবল এই একটি অনুরোধ আমার, জগন্নাথের পরামর্শ শুনে এত সুন্দর কারখানাটাকে উঠিয়ে দিও না। কারখানাটার জন্যে আমি কি করেছি সেটা জানি বলেই বলছি, খুব চেষ্টা করলেও এরকম আর একটি গড়ে তুলতে তোমরা পারবে না।"

যে লোকটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিল, সে ফিরে এসে বলেছে, "উত্তর ত দিলে না, বললে, ঠিক আছে, তুমি যাও।" সেই থেকে ক্ষীণ একটু আশার আলো জ্বলছে সুধাকান্তর মনে। হয়ত সারা রাত ভেবেছে নির্ম্মলা, সারা সকালটাও ভেবেছে, এতক্ষণ মন স্থির করতে পারেনি বলে চিঠির উত্তর দেয়নি। এখন হয়ত উত্তর লিখছে। হয়ত তার চিঠি নিয়ে মুদীর দোকানের সেই ছেলেটা একটু পরেই নেংচাতে নেংচাতে এসে হাজির হবে। কিংবা হয়ত সোজাসুজি জগন্নাথকেই সে জানিয়ে দিচ্ছে, কারখানা তুলে দেওয়া হবে না, যেমন চলছিল চলবে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না, কারখানাতেই চলে এল সুধাকান্ত।

জগন্নাথ তখন প্রত্যেকটি লোকের পাওনা হিসাব করে টাকা পয়সা গুণে থাক থাক করে রাখছে। অফিস ঘরের দরজার ঠিক বাইরেই কারখানার শেডের মধ্যে মিস্ত্রি মজুরদের ভিড়।

সুধাকান্তকে তারা পথ ক'রে দিলে স্প্রিং-এর দরজা ঠেলে সে ভিতরে ঢুকল। বলল, "আজকের এই ছুটির দিনটা ক্ষেমা দে না জগন্নাথ? এদের বলে দে না, কাল এসে নিজেদের পাওনা বুঝে নেবে?" সুধাকান্তর তখনো আশা আছে মনে, নির্ম্মলার কাছ থেকে চিঠি একটা তার মধ্যে আসবে।

জগন্নাথ তাকাল না তার দিকে, বলল, "না, আমি আজই সব চুকিয়ে দিয়ে যাব। কাল আর আসব না।"

সুধাকান্ত দেখল, গতিক সুবিধের নয়। বলল, "আচ্ছা, একটু পরে তোকে আমি বুঝিয়ে বলছি কেন একটা দিন দেরি করতে বলছি তোকে। শুনলেই বুঝবি আমি অন্যায় কিছু বলছি না। শোন হে তোমরা—"

মিস্ত্রিদের মধ্যে দু-তিন জন ইতিমধ্যে কৌতূহলী হয়ে স্প্রিং-এর দরজাটার কপাট টেনে ফাঁক করেই দাঁড়িয়েছিল, অন্যেরাও ঝুঁকে এল সেইদিকে। সুধাকান্ত বলল, "শোন! তোমরা আজ বাড়ী যাও সব, কাল সকালে এসে যার যা পাওনা বুঝে নিও।"

জগন্নাথ গর্জ্জে উঠে বলল, "খবর্দ্দার! ওঁর কথা শুনে তোমরা যদি চলে যাও ত কাউকে এক পয়সাও দেব না আমি। আদালতে নালিশ করে টাকা নিতে হবে। সেইটে বুঝে তবে যেয়ো।"

সুধাকান্ত বলল, "তোমরা যাও না, যাও! দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমাদের কারুর একটা পয়সাও মারা যাবে

না। আমি ত এই বাড়ীতেই থাকি, আমি ত পালিয়ে যাচ্ছি না? তোমাদের কথা দিচ্ছি আমি।"

থাক দেওয়া টাকা-পয়সা মিশিয়ে ফেলে ব্যাগে তুলতে তুলতে জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল। বলল, "বেশ, তোমাদের পাওনা টাকা ওঁরই কাছ থেকে নিও তোমরা। উনি কথা দিয়েছেন, তোমাদের দেবেন। আমার দায় দায়িত্ব আর কিছু রইল না। আমি চললুম।"

বুড়ো সতীশ বেয়া ডাইনামো, আর্মেচার, হর্ণ ইত্যাদির কাজে যে কলকাতার সেরা, মিস্ত্রিদের একজন, সে বলল, "কাল ত সকাল থেকেই আমি অন্য জায়গায় কাজে লাগছি বাবু, আর সে জায়গা হচ্ছে পাতি পুকুরে। সেখান থেকে চেতলায় আসা কি চাটিখানি কথা? আমার পাওনাটা আজকেই আমার চাই"

শুনে অন্য মিস্ত্রিদেরও মুখ খুলল। তাদের কারুর মায়ের খুব অসুখ, ওষুধ নিয়ে বাড়ী যেতে হবে; কারুর ঘরে চাল বাড়ন্ত, কিনে নিয়ে না গেলে রাত্রিতে হাঁড়ি চড়বে না; অনেকে কোনো কারণ দেখাবার প্রয়োজন বোধ করল না, আজ টাকা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল, আজই দিতে হবে, ব্যস্।

সুধাকান্ত অফিস ঘবটার থেকে বেরিয়ে এল। বলল, "বেশ, তাই নাও তাহলে। একটা দিনও আর যখন সবুর সইছে না।" তারপর জগন্নাথের দিকে ফিরে বলল, 'কিন্তু শোন্ জগন্নাথ, এদের মাইনে পত্র বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করতে চাইছিস কর, কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি, এই কারখানা থেকে কোনো জিনিষ সরানো চলবে না। আর ঐ সাইন বোর্ডটা আমি রাখব ঠিক করেছি।"

জগন্নাথও বেরিয়ে এল অফিস ঘর ছেড়ে। বলল, "কি?" ব'লে রাগে কাপতে লাগল।

সুধাকান্ত বলল, "কথাটা শুনতে পাসনি হতভাগা, না বুঝিসনি? এইসব যন্ত্রপাতি, যা তুই বেচে দিয়েছিস বলে শুনেছি, তা কাউকে এখান থেকে নিয়ে যেতে আমি দেব না। এমন কি, তুইও পারবি না একটা রেঞ্চ কি একটা ছোট্ট এতটুকু স্ক্রু-ড্রাইভার এখান থেকে নিয়ে যেতে।'

জগন্নাথ এক পা এগিয়ে গেল সুধাকান্তর দিকে। বলল, "আমার জিনিষ আপনি আটকাবেন?"

সুধাকান্ত বলল, "আলবৎ আটকাব।"

জগন্নাথ বলল, "কেন আটকাবেন আমার জিনিষ?"

সুধাকান্ত বলল, "কেন আটকাব জানতে চাইছিস? এতদিন এখানে রয়েছিস, একটা টাকা আমাকে ভাড়া দিস্ নি। সবাইকার সব পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছিস্, আমি কি দোষ করেছি? ভাড়া বলে আমার যা পাওনা হবে সেটা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে তোর জিনিষ তুই নিয়ে যেতে পাবি।"

জগন্নাথ বলল, "আপনি বলেছিলেন না যে, ভাড়া নেবেন না?"

সুধাকান্ত বলল, "বলেছিলাম। কিন্তু তখন তোরাই খুব তেজ দেখিয়ে তাতে রাজী হসনি। তখন আমি বলেছিলাম, চলে ত আয়, ভাড়ার কথা পরে হবে। না কি ভুলে গিয়েছিস? এটা কি মনে পড়ছে যে বলেছিলাম, দেবার ইচ্ছে থাকলে অনেক রকম করে দেওয়া যায়। কোনোদিন জানতে চেয়েছিস, ভাড়া বলে কিছু আমি নেব কি না, বা তার বদলে কি রকম করে কিছু আমাকে তোরা দিতে পারিস?"

জগন্নাথ বলল, "কত টাকা ভাড়া বলে আপনার পাওনা হয়েছে বলুন, এখনই গিয়ে মাসীকে দিয়ে চেক লিখিয়ে এনে আপনাকে দিচ্ছি।"

সুধাকান্ত বলল "কত পাওনা হয়েছে সেটা ভাল করে হিসেব খতিয়ে দেখতে হবে। সে বিষয়ে কথা যখন আমাদের কিছু হয়নি, তখন খোঁজ নিয়ে জানতে হবে, এই পাড়ায় বা এই রকম একটা পাড়ায়, বড় রাস্তার ধারে এতটা জায়গা নিয়ে তৈরি একটা শেডের জন্যে কি রকম ভাড়া অন্যেরা দেয়। আমি তার চাইতে এক পয়সা বেশী নেব না, কিন্তু এ সমস্ত খোঁজ খবর নেবার জন্যে সময় দরকার। তাছাড়া তুই চেক দিবি বলছিস। চেক আমি যদি না নিই, যদি বলি আমি নগদ টাকা চাই।"

ক্রেতাদের মধ্যে একজন এই সময় এসে উপস্থিত হল। রং স্প্রে করার মেশিনটা সে কিনেছে, দু'শ টাকা দিয়েও গিয়েছে আগাম বলে। বাকী টাকা নিয়ে এসেছে।

সুধাকান্ত তাকে নমস্কার করে বলল, "এই কারখানার জিনিষগুলি বিক্রির ব্যাপারে অল্প একটু গোলযোগ দেখা

দিয়েছে। আপনি কাল এই সময় এসে খবর নেবেন। যদি তার মধ্যে গোলযোগ না মেটে, আর মেশিনটা আপনি না পান ত আগাম যে টাকাটা দিয়েছেন তা ফিরে পাবেন।"

জগন্নাথ গর্জ্জে উঠে বলল, "না, এ বন্দোবস্তে আমি রাজী নই। বিজনবাবু, ঐ কোণের জায়গাটাতে আপনার মেশিনটা প্যাক করে রাখা আছে, আপনি নিয়ে যান।"

সুধাকান্ত বলল, "বিজনবাবু, মশায়, দেখতে পাচ্ছি আপনি ভাল মানুষ, ঐ হনুমানটার কথা শুনে বিপদে পড়বেন না। আমি যা বলছি করুন, আজ চলে যান। কাল ঠিক এই সময়ে আসবেন, হয় আপনার জিনিষ পাবেন নয়ত আপনার টাকা।"

বিজন বলল, "আমি ঠেলাগাড়ী সঙ্গে এনেছি, মেশিনটা নিয়ে যাব বলে। হয়ত বলবেন ভাড়াটা আপনারা দিয়ে দেবেন, কিন্তু এধরণের কারবার আমার ভাল লাগে না। আমি আপনাদের ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকব না। আগাম যে দু'শ টাকা কাল দিয়ে গেছি সেটা ফিরিয়ে দিন, মেশিনের আমার দরকার নেই, আমি চলে যাচ্ছি।"

লকের মিস্ত্রি সুবল বলল, "আপনাদের মধ্যে ঝগড়া যা আছে সে আপনারা পরে মিটিয়ে নেবেন, আমাদের যা পাওনা তা আজই আমরা চাই।"

রঙের মিস্ত্রি মদন বলল, "কি হচ্ছে ব্যাপারটা আমায় একটুকুন বুঝিয়ে বলে দিন দেখি। মনে হচ্ছে না কি যে পাগলের কারখানা।"

বুড়ো সতীশ মিস্ত্রি বলল, "পাগল না হলে এমন একটা চালু কারখানা কেউ শুধুশুধু উঠিয়ে দেয়?"

মদন বলল, "কিন্তু ঝগড়াটা কি নিয়ে? এই ছোঁড়ারা, তোরা জানিস কেউ? নারাক্ষণ ত তোদের জগন্নাথদার পিছন পিছন ঘুরিস।"

নিতাই ব'লে ফচকে ধরণের সতেরো আঠারো বছর বয়সের একটা ছেলে হালে কাজে ঢুকেছিল, সে বলল, "শুনেছি ত ঝগড়া জগন্নাথদার মেয়েমানুষটিকে নিয়ে।"

"এই বেয়াদব উল্লুক কোথাকার" ব'লে মুঠি উঁচিয়ে জগন্নাথ ছুটে যাচ্ছিল তার দিকে, সুধাকান্ত তার মুঠি বাঁধা হাতটা চেপে ধরল। বলল, "না, না, এসব এখানে চলবে না। এটা ভদ্রলোকের পাড়া।"

জগন্নাথ বলল, "ভদ্রলোকের পাড়ায় ভদ্রলোকের মেয়েকে এইরকম করে বলবে?"

সুধাকান্ত বলল, "বলবার সুবিধে তুইই ত করে দিয়েছিস। কেন তাকে এনে রেখেছিস একপাল ছোট-লোকের মধ্যে? ভদ্রলোকের ইজ্জত তার রেখেছিস তুই? নিজে গাধামি করে এখন আফসালে হবে কি?"

নিতাইয়ের ধারণা হ'ল তার একজন মুরুব্বি জুটে গিয়েছে। সে খুব সরু গলা করে গাইল,

ওগো আমার মালী গো,
তোমায় কত ভালবাসি গো!

জগন্নাথ এবার চোখে অন্ধকার দেখছে। মাথায় খুন চেপে গিয়েছে তার। জোর করে ডান হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই সুধাকান্ত তার বাঁ হাতটা চেপে ধরল দু'হাতে। সে হাতটাও ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হল তার মধ্যে সুধাকান্তই প্রথমে দু ঘা মেরেছিল তাকে, পরে সেও প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল সুধাকান্তের নাকে। তাল সামলাতে না পেরে সুধাকান্ত উল্টে পড়ে গেল। যেখানে পড়ল সেখানে ছিল একটা লোহার পরদা, লোহা কাটবার বড় কাঁচি দিয়ে তার একটা দিকের খানিকটা কাটা, সেই দিকটা বেঁকে উঁচু হয়ে ছিল একটু, সুধাকান্তর মাথাটা তার উপরে পড়ল বলে কপালের একটা দিকে অনেকখানি কেটে গেল তার।

ওদিকে দিলীপ ও পিন্টু মিলে হাতাহাতি বাধিয়ে দিয়েছে নিতাইয়ের সঙ্গে।

সুধাকান্তকে টেনে তুলবে কি না ভাবছিল জগন্নাথ, কিন্তু সে নিজেই উঠে দাঁড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে আথালি-পাথালি লাথি ছুঁড়তে লাগল জগন্নাথের দিকে। তার কাপড় জামা তখন রক্তে ভাসাভাসি। দু-একটা লাথি দাঁড়িয়েই খেল জগন্নাথ, তারপর সুধাকান্ত যখন আরো কাছে এসে একটা হাঁটু গুটিয়ে পা তুলে তার পেটে মারবার উদ্যোগ করছে তখন আবার সুধাকান্তকে ঠেলে দিল সে। এক পায়ের উপর ভর ছিল বলে এবারেও তাল সামলাতে পারল না সুধাকান্ত পড়ে গেল।

যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল এতক্ষণ, তাদের মধ্যে তিন-চারজন জগন্নাথকে ঘিরে ফেলল। দুজন এসে সুধাকান্তকে ধরে তুলল, তারপর তার দুহাত দুজনের কাঁধে জড়িয়ে নিয়ে হাঁটিয়েই নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। কয়েক জন দিলীপ পিন্টু ও নিতাইয়ের মারামারি থামাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ওপাড়ারই একজন ডাক্তার, সুধাকান্তদের বীমা কোম্পানীর কাজও তিনি করেন ও তার বিশেষ বন্ধু, টেলিফোনে খবর পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়লেন। সুধাকান্তর মাথায় ফেটি বাঁধা হয়ে যাবার পর বীমা কোম্পানীরই একজন উকীলকে টেলিফোন করা হল। তিনিও জগন্নাথের বন্ধুস্থানীয় লোক, বললেন, পুলিস এলে তাদের যেন বলে দেওয়া হয়, সুধাকান্তকে কেনো প্রশ্ন এখন করা চলবে না, কারণ উত্তর দেবার মত অবস্থা তার নয়। ডাক্তার নিজেই যেন সেটা বলেন। সুধাকান্ত পরে রিপোর্ট করবে। একটু পরেই পুলিশ এল। কারখানায় যারা ছিল তখন, অবধি তারা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল বলল, সত্যি যা ঘটেছিল তাই। আর একদল, যারা হয় আসল ব্যাপারটা দেখতে পায়নি নয়ত জগন্নাথের উপর কোনো কারণে রাগ ছিল, নিজেদের মধ্যে খানিকটা বলাবলি করে নিয়ে বলল, একটা স্প্যানার বা ছেনি দিয়ে সুধাকান্তর মাথায় খুব জোরে মেরেছে জগন্নাথ। একেবারে মেরেই ফেলত, ওরা এসে ধরে না ফেললে।

এই নিয়েই খুব ঝগড়া বেধে গেল দুটো দলের মধ্যে, তবে পুলিশ ছিল বলে মারপিট অবধি সেটা গড়াল না।

নির্মলার তখন দুপুরের রান্না শেষ হয়েছে; ভাত ডাল তরকারি জাল-আলমারিটাতে তুলে রেখে দরজায় তালা দিচ্ছে সে, এবার স্নান করতে যাবে, এমন সময় টাকাকড়ি সমেত জগন্নাথের ব্যাগ নিয়ে দিলীপ, রঘু, নারাণ আর পিন্টু বারান্দায় এসে উঠল। নিতাইয়েরই সঙ্গে ঘুষোঘুষি করবার সময় পিন্টুর চোখে লেগেছে, ফুলে উঠেছে চোখটা। দিলীপ সেদিন মাইনে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবে বলে ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি পরে কারখানায় গিয়েছিল, পাঞ্জাবির একটা হাতা দু জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে। পিঠের দিকেও খানিকটা ছিঁড়েছে।

দিলীপ বলল, "এই নাও মাসী, জগন্নাথদার ব্যাগ। অনেক টাকা আছে এতে। সাবধানে রেখো।"

নির্মলা চট করে তাদের প্রত্যেককে দেখে নিয়ে বলল 'কি ব্যাপার? তোমাদের জগন্নাথদা কোথায়?"

দিলীপের ভাঙা গলা যেন আরো একটু বেশী ভেঙে গিয়েছে। বলল, "জগন্নাথদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে মাসী। সে থানায় হাজতে আছে। আমরা সেখান থেকেই আসছি।"

নির্মলার মুখের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল, বলল, "পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে? কেন, কি করেছে জগন্নাথ?"

দিলীপ এতক্ষণ চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল, বলতে গিয়ে আর পারল না। ধপ্ করে বারান্দায় ব'সে প'ড়ে চোখে কোঁচার কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নির্মলা ভয়ে হাঁপাচ্ছে, বলল, "রঘু, পিন্টু, কি হয়েছে রে?"

রঘু বলল, "জগন্নাথদা—"

"তুই থাম্, আমি বলছি," বলে যা যা ঘটেছিল পিন্টু পূর্ব্বাপর সব বিবৃত করল।

নির্মলা বলল, "সুধাকান্ত বাবুর কি খুব বেশী লেগেছে? সুধাকান্ত বাবু কি মরে যাবে?"

পিন্টু বলল, "মরে যাবে কি? উঠে দাঁড়িয়ে জগন্নাথদাকে লাথি ছুঁড়তে লাগল।"

রঘু বলল, "তারপর ত হেঁটে বাড়ী গেল।"

নারাণ বলল, "না, না, লেগেছে খুব। দেখলে না, দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে গেল।"

পিন্টু বলল, "সে ত লাথি ছুঁড়ে হাঁপিয়ে গিয়েছিল বলে। যা হোক, সে মরবে না মাসী, শুনে রাখ তুমি।"

নির্মলা বলল, "জগন্নাথ হাজতে আছে বলছিস। পড়ে গিয়ে সুধাকান্ত বাবুর কপাল কেটে গেছে, তার জন্তে ওকে কেন ধরে রেখেছে পুলিশ?"

দিলীপ চোখ মুছে বসে শুনছিল। বলল, "সুবল মিস্ত্রি, মদন মিস্ত্রি, নিতাই দা এরা সবাই মিথ্যে করে লাগালে যে জগন্নাথদা একটা ছেনি দিয়ে সুধাকান্ত বাবুর

মাথায় মেরেছে। তাই ত পুলিশ ধরে নিয়ে গেল জগন্নাথদাকে।"

নির্ম্মলা বলল, "সত্যি কথাটা তোরা বলিস নি ?"

দিলীপ বলল, "বলেছিলুম মাসী, কিন্তু ওরা শুনলে না, বললে, মোকদ্দমা হবে, আসামী তোদের সাক্ষী মানলে তখন তোদের যা বলবার গিয়ে বলিস।"

"মোকদ্দমা হবে ?"

"তাই ত বললে।"

"সে ত অনেক দিন ধরে চলবে রে। ততদিন কি তোদের জগন্নাথদাকে হাজতে থাকতে হবে ?"

"না মাসী। আমরা সেটা জানতে চেয়েছিলুম। ওরা বললে, কাল জগন্নাথদাকে আদালতে হাজির করবে, তখন আমরা তাকে জামিনে খালাস করে আনতে পারব।"

"কিন্তু কি করে জামিনে খালাস করে আনতে হয়, তা ত আমি জানি না। তোরা জানিস ?"

ওরাও কেউ জানে না। জামিন কথাটার অর্থও কেউ জানে না।

দুখনী এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। বলল, "তোরা এক কাজ কর্ দিকি। ও বাড়ীর নীতুকে চিনিস্ ত ? তাকে গে ধর্। তার বাবা উকীল, কি করতে হবে না হবে, তিনিই বলে দেবেন।"

নীতুকে ওরা বেশ ভালই চেনে। নীতু অনেকবার এসে পাশে দাঁড়িয়ে ওদের গাড়ী সারানো দেখেছে। নীতুর বাবা শীতেশও জগন্নাথকে চেনেন, জগন্নাথ কয়েকবার তাঁর গাড়ী সারিয়েছে। খুব সহজেই যোগাযোগ হয়ে গেল। ছেলেরা নিজে থেকে যা বলল তার পরেও প্রশ্ন করে করে শীতেশ আরও কতকগুলি কথা জেনে নিলেন। সুধাকান্তর কেন যে আরো আগেই মার খাওয়া উচিত ছিল সে বিষয়ে নীতীশের মন্তব্যও তিনি শুনলেন। একটু বিস্ময় নিয়ে একবার তাকালেন নীতুর দিকে, বললেন, "এদের এতসব ভিতরকার কথা তুমি জানলে কি করে ?"

ডিম ফুটে বেরিয়ে বাচ্চাগুলি কত তাড়াতাড়ি যে ডিম পাড়ার ধুগ্যি হয়ে যায় সেটা কোনো বাপমায়েরই মনে থাকে না।

শীতেশ বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যাও। আমি দেখি কি করতে পারি।"

পরদিন বিকেলে জামিনে খালাস হয়ে জগন্নাথ বাড়ী এল।

তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। পনেরো দিন পর শুনানি শুরু হবে।

নির্ম্মলার জীবন থেকে তাকে বেশ কিছুকালের জন্যে সরিয়ে দেবার এমন একটা সুযোগ সুধাকান্ত কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। তারই তোড়জোড় চলছে।

উকীল এবং ডাক্তার দুজনে হাত মিলিয়ে কাজ হচ্ছে সুধাকান্ত বিছানায়। যদিও ঘুরে বেড়াতে তার অসুবিধা কিছু নেই।

এদিকে কারখানার কাছে যার যা পাওনা ছিল সব মিটিয়ে দিয়েছে জগন্নাথ, কেবল সুধাকান্ত ভাড়া বাবদ কি চাইবে সেটা জানে না বলে জিনিষপত্র যেখানকার যা ঠিক তেমনি রেখে দিয়েছে। সুধাকান্তর দেনা না মিটিয়ে সেগুলি সে সরাবে না। কারখানা অবশ্য তালাবন্ধ আছে।

নিজের কি হবে এ ভাবনায় চাইতেও নির্ম্মলার জন্যে ভাবনা বেশী হচ্ছে জগন্নাথের, কারণ, সে দেখতে পাচ্ছে নির্ম্মলা ভয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে। সে হাসে না, কথা বলে না, পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে। দম-দেওয়া পুতুলের মত সংসারের বাঁধা কাজগুলি কেবল করে যায়। জগন্নাথের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকায় না পর্য্যন্ত।

তা নির্ম্মলারই বা দোষ কি ? জগন্নাথ ছাড়া তার আর কে আছে এ সংসারে ? যদি তার জেল হয়, না যে হতে পারে তা ত নয় ? তখন নির্ম্মলা কোথায় যাবে, কে ওকে দেখবে ? সুধাকান্তর মত নরদেহধারী নেকড়ে বাঘের আক্রমণ থেকে কে রক্ষা করবে তাকে ?

এক যদি অল্পদিনের জেল হয়। এই একমাস বা ঐরকম। তাহলে ভাবনার তেমন কিছু নেই। পাড়াটা খুব ভাল, ধোপারা গয়লারা আপনার জনেরই মত। তাছাড়া চাঁপাবৌ আছে, সারাক্ষণ আসছে যাচ্ছে, তিনু আছে

ডাকলেই এসে হাজির হয়; দিলীপকে বলে দিলে তাদের কেউ না কেউ রোজ এসে খবর নেবে।

শীতেশবাবু ভরসা দিচ্ছেন খুব। হয়ত ছাড়িয়ে আনতেই পারবেন।

কিন্তু সাধ্যি কি তাঁর? সব ভণ্ডুল করে দিল জগন্নাথ নিজেই।

নির্ম্মলা একদিন বলল, "দিলীপরা বলছিল, তোমার নামে যা নালিশ তাতে সুধাকান্তবাবু ইচ্ছে করলে নাকি কোর্টের অনুমতি নিয়ে মামলা তুলে নিতেও পারেন।"

জগন্নাথ বলল, "তা ত জানি। ওরা আমাকেও সেটা বলেছে।"

নির্ম্মলা বলল, "আমি ভাবছিলাম, সুধাকান্তবাবুকে একটা চিঠি লিখব কি না।"

জগন্নাথ বারান্দায় বসে জুতো বুরুশ করছিল। জুতো জোড়াটা সরিয়ে রেখে বলল, "সুধাকান্তবাবুকে চিঠি লিখবে তুমি? তুমি কি বলছ মাসী?"

নির্ম্মলা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, "অনেক ত রান্না করে খাইয়েছি, হয়ত আমি বললে মামলাটা উঠিয়ে নিতে রাজী হবেন।"

"না মাসী, আমার মাথার দিব্যি ওকে তুমি চিঠি লিখবে না। কখখনো লিখবে না। লিখতে দেব না তোমাকে, আমি।"

"না হয় উর্মিকে লিখি।"

"না, না, তাও লিখবে না। সে ত একই কথা হল। সুধাকান্ত লোকটাকে কি তুমি চেন না মাসী? ও ধরণের কোনো উপকার যদি ওর কাছ থেকে আমরা নিই ত আর রক্ষে থাকবে? একেবারে তার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যাব। এ জন্মে আর ছাড়ান পাব না।"

নির্ম্মলার কণ্ঠস্বরে, তার কথা বলার ভঙ্গিতে তার মুখ ভাবে আজ আবার এক অদ্ভুত দৃঢ়তা। জগন্নাথের হঠাৎ মনে হল, নির্ম্মলার মনের ত্রিসীমানাতে সে যেন নেই। তার মাসী আজ আর যেন তার মাসী নেই। সে যেন কত দূরের মানুষ। নির্ম্মলা বলল, "কেন বোকামি করছ জগন্নাথ? তুমি বুঝছ না, এ সমস্ত থানা পুলিশের ব্যাপার, কিসের থেকে যে কি হয় তা কেউ বুঝতে পারে না। তোমাকে সত্যি কথাই বলব; আমি কেবল তোমার কথা ভাবছি না, নিজের কথাটাও ভাবছি। হয়ত ওরা আমার কথা নিয়ে তোমাকে বিশ্রী রকমের সব জেরা করবে, খবরের কাগজে বেরুবে সে-সব। হয়ত বা আমাকেই সাক্ষী দিতে ডাকবে। তখন আমার কোনো কথাই ত আর লুকোনো থাকবে না। আমার সৎমা জেনে যাবে আমি কোথায় আছি, আর সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হবে।"

নির্ম্মলার ভয়ের কারণ আরও আছে। জগন্নাথের মামলা হচ্ছে আলিপুরে আর আলিপুরেই প্র্যাকটিস করে তার দাদা বিকাশ। জগন্নাথের মুখটা কালো হয়ে গেল। সে জুতো-জোড়াটা আবার টেনে নিয়ে বুরুশ করতে লেগে গেল। পরে হঠাৎ এক সময় বলল, "তোমার নাম যাতে কোর্টে না ওঠে মাসী, আমি তা দেখব কথা দিচ্ছি।"

কাজে করলও তাই। শীতেশকে এসে বলল, "আমি দোষ স্বীকার করে নেব।"

শীতেশ বললেন, "কি দোষ তুমি করেছ যা স্বীকার করে নেবে?"

জগন্নাথ বলল, "ঐ আমি যা করেছি বলে ওরা বলছে।"

শীতেশ বললেন, "তাই যদি করবে ত এসেছিলে কেন আমার কাছে মরতে? আচ্ছা বেশ, এই ঠিক ত? আবার মত বদলাবে না ত?"

জগন্নাথ বলল, "না।"

রায় যেদিন বেরুবে তার দিন-সাতেক আগে থেকে নির্ম্মলার জ্বর। সামান্য জ্বরভাব নিয়ে শুরু হয়েছিল, রোজ এক ডিগ্রির মত করে বেড়েছে। সেদিন সকালে ১০৫ জ্বর দেখে জগন্নাথ ভীষণ ভড়কে গিয়ে সুজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। নির্ম্মলাকে না বলেই আনল, কারণ, জানত নির্ম্মলাকে জিজ্ঞেস করতে গেলে সে রাজী হত না।

নির্ম্মলা মনেমনে ঠিকই করে রেখেছিল, জগন্নাথ অল্পদিনেরই জন্তে জেলে যাক, বা খুব বেশীদিনেরই জন্তে যাক, বস্তিপাড়ার এই বাড়ীটা ছেড়ে সে নড়বে না। এখন তার টাকার অভাব নেই, আর টাকা থাকলে সব হয়। বেশ আরামেই এখানে সে থাকতে পারবে। চাঁপার সোয়ামী বাইরে চলে গেলে চাঁপা যেমন একলা থাকে, ভয় পায় না, নির্ম্মলাও তেমনি একলা থাকবে, ভয় পাবে না। কিন্তু অসময়ে এই শক্ত অসুখটা হয়েই হল তার মুশকিল।

সুস্থ থাকলে সুজনকে দেখলে হয়ত সে খুশী হত না, হয়ত ভয়ই পেত, কিন্তু জ্বরের ঘোরে চোখে যখন প্রায় কিছু দেখতে পাচ্ছে না তখন সুজনকে দেখে অনেকটা আশ্বস্তই বোধ করতে লাগল সে। বিজিতেন্দ্রের বাড়ীর সিঁড়ি ওঠবার সময় তার দিকে তাকিয়ে যে রকম মিষ্টি করে তিনি একটু হাসতেন, আজও ঠিক সেই রকম করেই হাসলেন।

নির্ম্মলা আর জগন্নাথ যে বিজিতেন্দ্রের বাড়ী থেকে কাউকে কিছু না বলে একসঙ্গে চলে এসেছিল, নির্ম্মলা যে এই একটা বস্তির বাড়ীতে একলা রয়েছে জগন্নাথের সঙ্গে, এসব নিয়ে তিনি যে একটুও কিছু ভাবছেন তা মনে হল না।

নির্ম্মলাকে পরীক্ষা করা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জগন্নাথের কোর্টে যাবার সময় হল। সে যখন ডাক্তারকে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছে, নির্ম্মলা তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, জ্বর গায়ে টলতে টলতে উঠে এসে নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাটির দিকে চেয়ে, ডাক্তার চোখের জল রাখতে পারলেন না।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁপাবৌ ঘনঘন আঁচলে চোখ মুছছে। দিলীপ, রমু, নারাণ, পিণ্টু, গয়লাদের দুজন, ধোপাদের একজন, মুদীখানার তিনু বলে খোঁড়া ছেলেটা সবাই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সকলেরই চোখ ছলছল করছে।

সুজন বললেন, "আশা করছি তুমি ছাড়া পেয়ে ফিরবে। যদি তা না হয়, একটুও ভেবো না তুমি জগন্নাথ। তুমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমার স্ত্রীর সমস্ত ভার আমার উপর রইল।"

বিচারে দুবৎসরের জেল হল জগন্নাথের। সে আর বাড়ী ফিরে এল না।

উনিশ

চিকিৎসাবিদ্যার চর্চ্চা ও তার প্রয়োগ, এই দুটি ক্ষেত্রে ছাড়া সুজন সান্যাল খুব বেশী চিন্তা করে কোনো কাজ করতেন না। বস্তুত: আর কোনো-কিছু নিয়ে খুব বেশী চিন্তা করার সময়ই তাঁর হত না। বিয়ে করে সংসারী হবেন কি হবেন না, এটাও যথাসময়ে ভেবে ঠিক করবার সময় পাননি বলে এত বয়স অবধি অবিবাহিতই থেকে গিয়েছেন। এখন ত অবশ্য সে বিষয় নিয়ে চিন্তা করার কোনো কথাই আর উঠতে পারে না।

সুরবালার চিকিৎসার ভার নিতে যখন রাজী হয়েছিলেন তখনও খুব বেশী তলিয়ে ভেবে দেখেননি, এর থেকে কোনো সমস্যার উদ্ভব হতে পারে কি না। চট করে ভেবে ঠিক করেছিলেন, যে, এটা ভাববার মত একটা কথাই নয়। আমি চিকিৎসক, রোগের নিরাময় করব, রোগীকে রোগমুক্ত করব এই হল আমার কাজ। রোগীটিকে আমি ভালবাসতাম কি না, এখনও ভালবাসি কি না, তার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্পর্ক হয়ে ভেঙে গিয়েছিল কি না, এসব কথা ভাবতে যাওয়া আমার অন্যায়। তারপর যখন বুঝতে আরম্ভ করলেন, যে, সমস্যা জাতীয় ব্যাপার দুটো-একটা সামনে আসছে, তখনও কিছুদিন তা নিয়ে বেশী ভাবলেন না। হঠাৎ একদিন ঠিক করলেন, সুরবালার চিকিৎসার ভার ছেড়ে দেবেন। সেদিনও ভাল করে তলিয়ে ভেবে দেখলেন নি কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না। চকিতের মত মনে হয়েছিল, হয়ত তাঁর

উপস্থিতির জন্যেই বিজিতেন্দ্র ও সুরবালার দাম্পত্য সম্পর্কটা স্বাভাবিক হতে পারছে না। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। ভাবলেন না, অন্য ডাক্তার এসে হয়ত ধরতেই পারবে না যে, সুরবালার রোগটা রোগ নয়। কতরকমের কড়া ওষুধ তাঁকে খাওয়াবে, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবে। নিজেও যে সুরবালাকে ইচ্ছে হলেই আর দেখতে পাবেন না, এ সম্ভাবনার কথাটাও মনে আসেনি তাঁর তখন।

সেদিনকার প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রতিটি মানুষের প্রত্যেকটি কথা এবং কাজ সুজনের স্মৃতিতে শ্বেত পাথরের গায়ে মিনা করা ছবির মত জলজলে হয়ে ফুটে রয়েছে।

একটা কথা বলব?

নিশ্চয় বলবেন।

কিছুদিন গিয়ে থেকে আসব আপনার নার্সিং হোমে?

ওটা করবেন না, ওতে আপনার কষ্ট আরও বাড়বে।

কি দরকার ছিল ওরকম মুরুব্বিয়ানা করে কথাটা বলবার? যে-কোনো অসুস্থ মানুষ, একটা ঠাণ্ডা হাতকে নিজের কপালে চেপে রাখতে চাইতে পারে, যদি কপালের ভিতরে যন্ত্রণাটা সত্যিকারের হয়, আর হাতটা এমন কারুর হয়, যে অপরিচিত বা শত্রুপক্ষীয় কেউ নয়। ডাক্তার হিসাবেও যদি একটু ভাল করে ভাবতেন ত বুঝতে পারতেন, সুরবালার একটা চেঞ্জের খুবই বেশী প্রয়োজন হয়েছিল সেই সময়টায়। আর হয়ত সেই প্রয়োজনের তাগিদেই কিছুদিনের জন্যে নার্সিং হোমে যাওয়ার প্রস্তাবটা, সুরবালা করেছিলেন।

খুব ইচ্ছা হয় জানতে, কেমন আছেন সুরবালা, কে তাঁর চিকিৎসা করছে এখন, কি লাইনে করছে। একদিন বিজিতেন্দ্রকে টেলিফোনও করেছিলেন সুজন, বলেছিলেন

ওঁর চিকিৎসা এতদিন করেছি বলে কর্তব্য হিসেবে বলছি, ওঁকে কিছুদিনের জন্যে কোথাও চেঞ্জে পাঠিয়ে দাও। তবে এমন জায়গায় পাঠিও, যেখানে ভাল ডাক্তার ডাকলে একটা পাওয়া যায়। নয়ত সেবারকার মত পাজিয়ে আসবেন।"

কিছুক্ষণ কোনো শব্দ হল না টেলিফোনে। কি হল ভাবছেন সুজন, এমন সময় বিজিতেন্দ্রের গলার খুব পরিষ্কার কাটা কাটা সুরের কথা শোনা গেল, "এ নিয়ে তুমি আর ভেবো না সুজন। যা ছেড়ে দিয়েছ তা ছেড়ে দিয়েই থাকো।"

এরপর টেলিফোনে খবর নেওয়াও ত আর চলে না। তাঁর জীবন থেকে সুরবালা চিরকালের মত সরেই গেলেন মনে হতে লাগল সুজনের।

সুরবালা যখন তাঁর মনের দিগন্তের অন্তরালে প্রায় অপসৃত, এমন সময় অস্তগত জ্যোতিষ্কের একটি রশ্মির মত জগন্নাথ এল তাঁর কাছে।

হাসিখুশী চটপটে এই ছেলেটাকে বেশ ভাল লাগত তাঁর। হঠাৎ সে কোথায় অন্তর্দ্ধান করল, কি হল তার অতঃপর, এ নিয়ে তিনি উদ্বেগও অনুভব করেছেন, তাই সে যে বাহাল-তবিয়তেই আছে সেটা জানতে পারাও তাঁর খুশী হবার একটা কারণ, যদিও আসল কারণটা এই যে, সুরবালার সংসারে তাঁর অন্তরঙ্গদের মধ্যে জগন্নাথও ছিল একজন। আর সেই জন্যেই সে যেন সুজনেরও একজন আত্মীয় ব্যক্তি। ঠিক একই কারণে নির্ম্মলাকেও তিনি এমন চোখ নিয়ে দেখলেন, যেন সেও তাঁর আত্মীয়গোষ্ঠীরই একজন। তাই অসুস্থ অসহায় এই মেয়েটির সব ভার যে তিনি নেবেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় বা দ্বিধা তাঁর মনে মুহূর্তের জন্যেও স্থান পেল না।

জগন্নাথ সজল চোখে বিদায় নিয়ে কোর্টে হাজিরা দিতে বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এম্বুলেন্স পাঠিয়ে নির্ম্মলাকে তাঁর নার্সিং হোমে আনিয়ে নিলেন সুজন ডাক্তার।

সন্ধ্যার দিকে জ্বরের ঘোরে তখন সে প্রায় অচেতন, তবু সুজন তাকে দেখতে এলে নির্ম্মলা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "জগন্নাথ? "জগন্নাথের কি হল?"

সুজন বললেন, "তুমি একটুও ব্যস্ত হয়ো না, আমি খবর নিয়ে কাল সকালে তোমায় বলব।"

সেদিন জেনারেল ওয়ার্ডে একটিও বেড খালি ছিল না। নার্সিং হোমের সংলগ্ন তারই চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত যে

দুতলা বাড়ীটা নার্সদের কোয়ার্টার্স। তার নীচের তলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর ও বসবার ঘর। উপর তলায় চারটি শোবার ঘর। তার তিনটিতে তখন ছিল একজন ওয়ার্ড সিষ্টার সুরূপা, ও দুজন স্টাফ নার্স সুনন্দা ও অসীমা। তারা তাদের খালি ঘরটায় খুব খুশী মনেই নির্মলার জায়গা করে দিল।

তারপর থেকে পালা করে তিনজনেই দেখছে নির্মলাকে। নির্মলার কপালজোরই এটাকে বলতে হবে, যে সেদিন ওয়ার্ডে স্থানাভাব ঘটেছিল।

জ্বরের ঘোরটা বেশ একটু ঘোরালো হয়েই রইল আরো দুদিন। তিনদিনের দিন; সেটা একটু কমলে সুজনকে বলল নির্মলা, "জগন্নাথের খবর নিয়ে আমায় বলবেন বলেছিলেন, কই, বললেন না ত?"

সুজন বললেন, "জগন্নাথ ঠিক আছে। তুমি নিজে এখন সেরে ওঠ দেখি চটপট।"

নির্মলা একটু ম্লান হাসি মুখে এনে বলল, "আপনার হাতে পড়েছি, সারিয়ে না তুলে কি ছাড়বেন?...জগন্নাথ কি খালাস পেয়েছে?"

থার্মোমিটারটাকে প্রয়োজনের চেয়েও চোখের একটু বেশী কাছে নিয়ে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে সুজন বললেন, না, খালাস ঠিক পায়নি, তবে পাবে। সেজন্যে, এই, একটু সময় লাগবে আর কি।

"কত সময়?"

"সেটা খুব নিশ্চয় ক'রে এখুনি বলা যাচ্ছে না, তবে খুব বেশী সময় নয়।"

যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়েই নির্মলা পাশ ফিরে শুল।

এরপর আরও কয়েকবার জগন্নাথের খবর জানতে চেয়েছে সে, ডাক্তার প্রতিবারেই বলেছেন, "ও ভালই আছে। ওর জন্যে ভেবো না তুমি।"

ও যদি ভালই আছে ত তাকে দেখতে কেন আসছে না? কিন্তু সুজনকে এ নিয়ে ত জেরা করা যায় না? কাজেই নির্মলা ধরে নিল, জগন্নাথের শাস্তি হয়েছে। তবে, সামান্য শাস্তি, হয়ত একমাস বা দুমাস, বড়জোর তিন মাসের জেল। দিলীপরা জগন্নাথের উকীল শীতেশের ছেলে নীতীশের কাছে শুনে এসে তখন বলেছিল, বড় জোর তিন মাসের জেল হতে পারে।

তিন দিন হ'ল নির্মলা ভাত পথ্য পেয়েছে। সেদিন বিকেলে বসে ছিল বারান্দায় একটা বেতের চেয়ার নিয়ে দিলীপ, রঘু, নারাণ এবং আরো দুতিনটি ছেলে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

নির্মলা বলল, "এই দেখ! খবর না দিয়ে সব চলে এলি, এখন তোদের কি খেতে দিই বল্ ত?"

দিলীপ বলল, "তোমার দেওয়া খাবার ঢের খেয়েছি মাসী, এরপর আরো খাব। কিন্তু আজ আমরা খেতে আসিনি। তোমার খবর নিতে এসেছি।"

নির্মলার চেয়ারটার দুদিকে বারান্দার মেজেতে তারা ধপ্ ধপ করে বসে পড়ল।

নির্মলা বলল, "যা ত, তোরা একজন গিয়ে আমার ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে আয়। দরজার ঠিক পাশে সুইচ আছে। বারান্দায় ত আলো নেই, তাই তোদের মুখগুলো ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।"

দিলীপদের কাছ থেকে জগন্নাথের পুরো খবরটা শুনল নির্মলা। সেই সঙ্গে এও শুনল, শীতেশ বলেছেন, নির্মলার নাম যাতে আদালতে না ওঠে সেজন্যে, মোকদ্দমার শুনানি হতে দেয়নি জগন্নাথ;—যে অপরাধ সে করেনি তাই করেছে বলে স্বীকারোক্তি করেছে। যদি তা না করত, তাহলে নাকি তার জেল নাও হতে পারত।

সেই রাত্তিরে টেম্পারেচার আবার উঠল নির্মলার। ডাক্তার মল্লিকের রাউণ্ড ছিল তখন, তিনি বললেন, হয়ত রিল্যাপ্স। নির্মলা জানত টাইফয়েডে সেটা সাংঘাতিক। কিন্তু বাঁচবে না স্থির জেনেও পরের দিন ভোরে দেখল, আপাততঃ তার মরবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। টেম্পারেচারও নেমে গিয়েছে নর্ম্যালের বেশ খানিকটা নীচে। এমনিতেও ভালই বোধ করছে সে।

নির্মলারই জন্যে জেলে গিয়েছে জগন্নাথ। আদালতে নির্মলার নাম ত উঠতই যদি জগন্নাথ গোড়াতেই মেনে না নিত যে সে দোষী।

এরপর তিনচার দিন নির্ম্মলা ফাঁকে ফাঁকে অনেকবার কাঁদল। নিজেকে ধিক্কার দিল অনেক। ইচ্ছে করতে লাগল দেয়ালটায় মাথা খোঁড়ে। একবার সত্যিই সেটা করতে গিয়ে মনে হল, কি এমন অপরাধ আমি করেছি? আমি ত চেয়েছিলাম সুধাকান্তকে বলতে, আর জগন্নাথ জানত আমি বললে সুধাকান্ত মোকদ্দমা তুলে নিত, চালাত না। আদালতের অনুমতি না পেলে সাক্ষীদের দিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলিয়ে ভেস্তে দিত মোকদ্দমা। কেন বলতে দিল না আমাকে? ওরকম জেদের মানে হয় কিছু? বলল, ওর কাছ থেকে উপকার নিলে ওর হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়ব আমরা। উপকার ওর কাছ থেকে আগেও ত আমরা নিয়েছি, ওর হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়িনি ত?

জেনারেল ওয়ার্ডের সিষ্টার সুরূপা সেদিন দুবারই এসে দেখল নির্ম্মলা কাঁদছে। বিকেলে চা খাবার পর নির্ম্মলাকে সে বলল, "আমার এখন ডিউটি নেই। চল, তোমায় নার্সিং হোমটা একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি। যাবে? ডাক্তার বলেছেন, তোমার এখন আস্তে আস্তে হাঁটাচলা করতে কোনো বাধা নেই।"

নির্ম্মলার খুব যে উৎসাহ বোধ হচ্ছিল তা নয়, বলল, "গেলেও হয়।"

সুরূপা বলল, "চল, চল। যখনি বলবে তোমার ভাল লাগছে না বা ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, ফিরে আসব। ডাক্তার কাল বলছিলেন, সেরে উঠবার পরেও তুমি এইখানেই থাকবে। কোথায় কি রকম জায়গায় কাদের মধ্যে থাকবে সেটা একটু দেখে নেওয়া ভাল নয় কি?"

যেতে যেতে নির্ম্মলা বলল, "চেতলার বাড়ীটা আমি কিন্তু ছাড়ব না। ডাক্তার সান্যাল সম্ভবতঃ আমাকে নার্সিং শিখতে বলবেন। পারব কি না জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব। তবে পেশা হিসাবে নার্সের কাজ করব কি না জানি না। হয়ত করব না। ওখানে আমাদের খুব ভাল একটা কারখানা ছিল মোটর সারাবার। জগন্নাথ ফিরলে আবার সেই রকম একটা কারখানা গড়ে তোলারই চেষ্টা করব।"

জগন্নাথের বৃত্তান্ত সুরূপারা শুনেছিল। বলল, "তা কারো, কিন্তু নার্সের কাজটা মন্দ ত কিছু নয়?"

নির্ম্মলা বলল, "না, না, মন্দ কেন হতে যাবে? আর্ত্তের সেবা, সে ত খুব পুণ্য কাজ, আর করতেও আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমি অত্যন্তই কুণো স্বভাবের মানুষ। অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে, বা একই জায়গায় নিত্য নূতন রোগীকে নার্স করার কাজ আমার মত মানুষকে দিয়ে হবে না। আমি তা পারবই না।"

সুরূপা একটু হেসে বলল, "গোড়ায় গোড়ায় আমার ঠিক ঐরকমই মনে হত। কিন্তু বোধহয় পুণ্য কাজ বলেই ভাগবান্ সহায় হলেন, যা অসম্ভব মনে হত তাকে সহজ করে দিলেন।"

দক্ষিণ-দুয়ারী বাড়ীটাতে ঢুকেই প্রথমে ডান দিকে দেয়ালের দিকে পিঠ করে সরু একসার আউট হাউস। বাঁদিকেও ঐরকমেরই আর একসার আউট হাউস। ডানদিকের ঘরগুলির প্রথমটিতে অফিস ঘর, তারপরেরটিতে এক্স রে প্ল্যান্ট, তারপরেরটিতে ই.সি.জি.র সরঞ্জাম। সব শেষের ঘরটি ইংরেজী L-এর আকারে ডানদিকের অর্থাৎ পূর্বদিকের সীমানায় দেয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেছে খানিক দূর। এটা ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরী। তারপর একটু ফাঁকা জায়গা, যার মাঝ-বরাবর পাশের গলিতে বেরুবার একটি দরজা। এরপর সুরূপাদের দুতলা কোয়ার্টার্স। একতলায় প্রথমে ড্রইং রুম, তারপর সিঁড়ি, তারপর খাবার ঘর সবশেষে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর। এর প্রায় লাগোয়া উত্তরদিক্‌কার সীমানায় দেয়াল ঘেঁষে নার্সিং হোমের রান্নাবাড়ী। সুরূপাদের কোয়ার্টার্সের দুতলায় চারটি ঘর ও ছোট ছোট বাথরুম ও ড্রেসিংরুম। সামনে ঝুলনো বারান্দা।

বাঁদিকের ঘরগুলির প্রথম দুটি গারাজ বাহির-মুখী। তারপর চাকরদের থাকবার জায়গা ভিতর মুখী। L-এর আকারে ঘুরে গিয়ে বাঁ দিক্‌কার অর্থাৎ পশ্চিমের সীমানায় দেয়াল ঘেঁষে লম্বালম্বি দুতলা বাড়ী। সেটিও অন্তর্মুখী, দেয়ালের দিকে পিঠ। প্রথমে একতলায় চার বেডের একটা ডর্মিটরি মেয়েদের। দুতলায় তেমনি একটি ডর্মিটরি পুরুষদের। এছাড়া মেন্ বিল্ডিংএর দুতলায় হলের ঠিক পিছনে চারটি কেবিন নিয়ে জেনারেল ওয়ার্ড, সুরূপা যার ওয়ার্ড সিষ্টার। ডর্মিটরি দুটির পাশে একতলায়

রোগীদের আত্মীয়াদের, ও দুতলায় রোগীদের আত্মীয়দের থাকবার জন্মে দুটি ফ্ল্যাট। চারটি করে বিছানা প্রতিটি ফ্ল্যাটে। যদিও মোটা রকমের সিটরেণ্ট ও খাওয়া-খরচ দিয়ে থাকতে হয়, তবু এই বিছানাগুলি সারা বৎসর এক দিনেরও জন্মে খালি থাকে না।

এরপর একই লাইনে মেট্রন মিসেস নোরোনার দুতলা কোয়ার্টার্স। নিঃসন্তান বিধবা মানুষ, সুজন বলেন, তা না হলে তিনি যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না। মিসেস নোরোনা বলেন, "না ডক্টর, আমি আরো অনেক ভাল নার্স হতে পারতাম যদি আমার হাজব্যাণ্ড বেঁচে থাকতেন। আপনি তাঁকে দেখেননি। তিনি মানুষকে কেবলই উৎসাহ দিতেন। কোল্ড ব্ল্যাঙ্কেট কারুকে করতেন না। কেউ খুব পাগলের মত কোনো প্ল্যান নিয়ে এলে বলতেন, তোমরা যেদিক্ থেকে ভাবছ সেদিক্ থেকে দেখলে প্ল্যানটি খুবই ভাল, কিন্তু পৃথিবীর লোক এধরণের জিনিষ এখনই গ্রহণ করতে পারবে কি? উনি বেঁচে থাকতেই আমি নার্সের কাজে ঢুকেছিলাম।"

মিসেস্ নোরোনার সঙ্গে নির্ম্মলার আলাপ করিয়ে দিয়ে সেদিনকার মত তাকে নিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরে এল সুরূপা।

নির্ম্মলাকে নিয়ে উপরে নিজের শোবার ঘরে চলে এল।

নির্ম্মলা এর আগেই লক্ষ্য করেছে, চারটি ঘরের মধ্যে সুরূপার এই ঘরটি বাছাই করা অল্প আসবাবে এবং খুবই সামান্ত গৃহসজ্জায় পরিপাটি করে সাজানো। পিছনের কুচি-দেওয়া সাদা পর্দা-ঝুলানো দুটি জানালা খুলে দিয়ে সুরূপা বলল, "আলো জেলে দেব?"

সন্ধ্যার ম্লান সোনালী আলোয় সুরূপার ঘরটিকে দেখতে নির্ম্মলার খুব ভাল লাগছিল। বলল "না সুরূপাদি। যেটুকু দিনের আলো এখনো আছে তাইতেই বেশ কাজ চলে যাচ্ছে।"

দেয়ালে একটি মাত্র ছবি, আকাশে নিবদ্ধ-দৃষ্টি ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুর। স্বল্প গৃহসজ্জা এবং স্তিমিত আলোর সঙ্গে এই ছবিটিরও যেন একটি সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছে নির্ম্মলা।

নিজের হাতে এম্ব্রয়ডারি করা সুন্দর তিনটি কুশনে আস্তৃত তিনটি মোড়া ঘরে রেখেছে সুরূপা, তার নিজের এবং তার দুটি বন্ধুর জন্মে। তার একটিতে নির্ম্মলাকে বসিয়ে আর একটি নিয়ে নিজে বসল। বলল, "সুনন্দা ও অসীমার ডিউটি এতক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে, তারাও এসে পড়ল বলে। এই সময়ে সোজা আমার ঘরেই চলে আসে তারা।"

দীর্ঘাঙ্গী, সুদর্শনা সুরূপা এদের সকলের চেয়েই বয়সে খানিকটা বড়। অন্তদের কুড়ি বাইশের মধ্যে বয়স, তার বয়স বোধহয় বছর ত্রিশ-বত্রিশের মত। মুখ চোখের ভাব দেখলে মনে হয়, অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। যদিও সুনন্দা ও অসীমা দুজনেই বলে, "সুরূপাদিকে বাড়ীতে যেমনটি দেখ, কাজের জায়গায় তেমনটি সে নয়। সেখানে তার একেবারে অন্ত মূর্ত্তি। আমাদের কাছে বাঘ, ডাক্তার-দের কাছে জল, আর রোগীদের কাছে মধু।" সুরূপা বলে, "তোমাদের কাছে জল, ডাক্তারদের কাছে মধু আর রোগীদের কাছে বাঘ হলে খুব জমত, না?" সুনন্দারা বলে, "তবে ভাই, এটা স্বীকার করব, মিসেস্ নোরোনার চেয়ে তোমার এই ভোলগুলো ভাল। ঐ ভদ্রমহিলার কোনো বাছ-বিচার নেই। নার্স, ডাক্তার, রোগী, রোগীদের আত্মীয়-স্বজন, সকলেরই সঙ্গে তাঁর একই ধরণের ব্যবহার। —সামনেওয়ালা, ভাগো।" সুরূপা বলে, "ঐ মানুষটি সামনেওয়ালাদের না ভাগালে এই নার্সিং হোম এত বড় হয়ে গড়ে উঠত না। অনেকটাই পিছনে পড়ে থাকত।"

নির্ম্মলা স্বভাবতঃ স্বল্পভাষিণী, সুরূপার স্বভাবেও প্রগল্‌ভতার কিঞ্চিৎ অভাব।

কি বলে কথা আরম্ভ করা যায় দুজনেই সেটা ভাবছে, এমন সময় কলহাস্যে চারদিক্ মুখরিত করে সুনন্দা এসে ঘরে ঢুকল, তার পিছন পিছন "না, না, বোলো না; না, বলবে না" বলতে বলতে অসীমা এল। সুনন্দা বলল, "ও আজ কি করেছে জানো?" সুরূপার খাটে বসে পড়ে ছোট বাচ্চাদের ভঙ্গিতে ঠোঁট ভেঙ্গে অসীমা ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ল। ছোট খাট দেখতে মানুষটি শিশুজনোচিত টুলটুলে ছোট্ট মুখটিতে মেকি কান্নাটা বেমানান লাগছিল না

সুরূপা হেসে বলল, "কি করেছে ও বলেই কেন। জুটোতে মিলে লাগিয়েছে দেখ না।"

আর একপালা হেসে নিয়ে সুনন্দা বলল, "ন নম্বরের এপেণ্ডিসাইটিসের রোগী বৌটি আজ বাড়ী গেল। খুব ভুগছিল ত বেচারা? ছাড়া পেয়ে মহা খুশী। তাকে বিদায় দিতে ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে খুব মিষ্টি হেসে অসীমা বলেছে আবার আসবেন। বৌটি ত হাঁ। বলে কি রে? আবার আসব কি?"

এবারে অসীমাও হাসছে। বলল, "কি করব, ভগবান্ আমাকে বুদ্ধিসুদ্ধি দেননি সেটা কি আমার দোষ?"

সুরূপা বলল, "বুদ্ধিসুদ্ধি ভগবান্ তোমাকে প্রচুর দিয়েছেন, তাঁকে দুষছ কেন অকারণ? উল্টোপাল্টা কথা দু-একটা মাঝেমাঝে বল, তার আর হয়েছে কি?"

সুনন্দারই মুখে নির্মলা শুনল, এই ক'দিন আগে পনেরো ষোল দিনের গোলগাল একটি বাচ্চাকে দু হাতের তেলোয় শুইয়ে দোল দিতে দিতে অসীমা বলেছিল, "কি মিষ্টি বাচ্চাটা, ইচ্ছে করে খেয়ে ফেলি।" "ও মা গো," বলে বাচ্চাটার মা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কেড়ে নিয়েছিল অসীমার কাছ থেকে। সকলের সঙ্গে অসীমাও হাসল।

সুরূপা বলল, "আচ্ছা সুনন্দা, এবারে তোমার নিজের কীর্ত্তিকাহিনীই না হয় একটু শোনাও। তিন নম্বরের এডনিসটির সঙ্গে কতটা ভাব জমল তোমার?"

সুনন্দা তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখছিল। নির্মলাকে নিজের মনের কাছে মানতে হ'ল, দেখবার মত রূপ তার বটে। এই কদিনেই নির্মলা লক্ষ্য করেছে, নার্সিং হোমের প্রত্যেকটি ষ্টাফ নার্স ই দেখতে মোটের উপর সুশ্রী। এটা ঘটনাচক্রে হয়েছে, না ডাক্তার সান্যালের ইচ্ছাক্রমে ঘটেছে বলা শক্ত। হয়ত তিনি বিশ্বাস করেন, সেবিকাদের দেখে ভাল না লাগলে রোগীদের সেরে উঠতে দেরি হয়। যদিও নার্সদের এমনই পোশাক যে, সে-পোশাকে তাদের দেখে রূপজ মোহে অভিভূত হওয়া শক্ত, তবু এটা বলা দরকার যে সে-পোশাকে একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে এমন স্তিমিত নম্র রূপ সুনন্দার নয়।

আয়নায় চোখ রেখে অতিকায় খোঁপাটা ডান হাতে চাপতে চাপতে সুনন্দা বলল, "সুবিধে হল না সুরূপাদি। কি করব, বিধি বাম। এসেছিল পলিপাস কাটাতে। ভেবেছিলাম রোগটা ত কিছুই নয়, কিন্তু অপারেশনের কেস যখন, তখন থাকবে কিছুদিন। আজ সকালে ডক্টর মল্লিক হয়ত একটু বেশী খুঁটিয়ে তার নাকটাকে দেখছিলেন, তাতে সুড়সুড়ি লেগেই হোক, বা অন্য যে-কারণেই হোক একটি রাম-হাঁচি হাঁচল রোগীটি। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটি শিকড়-ওয়ালা ছোট একটা মাংসের টুকরো বেরিয়ে এল তার নাক থেকে। ডক্টর মল্লিক বললেন, এটাকেই নাকি বলে পলিপাস। আমি আগে দেখিনি কখনো। অপারেশনের দরকার আর ত রইল না? রক্ত পড়াটাও অনেকক্ষণ বন্ধ হয়েছে। হয়ত এতক্ষণে বাড়ী ফিরে গিয়েছে সে।"

সুরূপা বলল, "পলিপাস শুনেছি বারবার হয়। হয়ত আবার ঘুরে আসবে।"

সুনন্দা বলল, "রোগীটির বয়স কম, আর সে দেখতে ভাল হলেই হল। তাকে পলিপাসেরই রোগী হতে হবে কেন?"

সকলে হাসল আর একবার।

এরপর সুরূপার ঘরের আলো জ্বালতে হল। অন্যেরাও প্রস্থান করল নিজ নিজ ঘরে, হাত-মুখ ধুয়ে রাত্রির খাওয়ার জন্যে তৈরি হতে।

এই মানুষ তিনটিকে ভাল লাগছে নির্মলার। এদের সঙ্গে থাকতে পারবে ভেবে সে খুশী। শক্ত অসুখে পড়েছিল, সেরে উঠেছে, এতেও সে খুশী। বেঁচে থাকতে তার ভাল লাগছে।

কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে কেবলই জগন্নাথের কথা মনে পড়তে লাগল তার, এবং অনেকক্ষণ চোখে ঘুম এল না। তার নিজের জীবনের সঙ্গে ছেলেটা এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গিয়েছিল যে, তারও যে একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে সেটা যেন ভুলেই গিয়েছিল নির্মলা। এবার সে ফিরে এসে নির্মলা নিজের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

করে নিয়েই তার কথা ভাববে। তার ভবিষ্যতের কথা, তার সম্ভাব্য ঘর-সংসারের কথা।

দোষটা অনেকখানি জগন্নাথেরই। কেন সে এমন করে নিজের অস্তিত্বকে অবলিত করে দিয়েছিল তার মাসীর সুখ দুঃখের মধ্যে। মাসী যেজন্যে নিজেকে আলাদা করে দেখেনি কখনো। ভেবেছে, তার বেঁচে থাকা যেন জগন্নাথেরও বেঁচে থাকা। দুটোর মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। হতে পারে সেইজন্যেই জেলে যেতে হয়েছে জগন্নাথকে। এছাড়া, সত্যি যা ঘটেছিল, জগন্নাথ আর তার দলের লোকেরা আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ করে যদি তা বলতও, সুধাকান্ত নিজে এবং তার তরফের লোকরাও ত হলফ করেই উল্টো কথা বলত? জগন্নাথদের কথার উপর নির্ভর করেই যে বিচার হত কে বলতে পারে তা? তার মাসী সম্বন্ধে কে একটা লোক খুব কুৎসিত একটা ইঙ্গিত করেছিল, তাতে ভীষণ রেগে গিয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে, লোকটাকে মারতেই যাচ্ছিল যখন সুধাকান্ত বাধা দেওয়াতে ধস্তাধ্বস্তি বাধে ও সুধাকান্ত পড়ে যায় লোহার পাতের উপরে, এসব কথা সাক্ষী প্রমাণে সাব্যস্ত হলেও জেল তার হয়ত হতই। যতটা হত হয়ত তার চেয়ে কিছু বেশী জেল তার হয়েছে। কিন্তু তার মাসীর নাম আদালতে উঠলে আরো অনেক কথাই উঠত, যার ফলে শেষ পর্য্যন্ত তার মাসীকে ফাঁসী যেতে হত। কথাটা কাউকে বলা যায় না তাই, নয়ত মাসী সম্বন্ধে জগন্নাথের যা মনোভাব তাতে তাকে বাঁচাবার জন্যে একবার ছেড়ে দশ বার খুশী হয়েই সে জেলে যেত।

যাই হোক, জগন্নাথ জেল থেকে ফিরলে সেবাযত্ন করে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে, অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে ত তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবে নির্ম্মলা।

এর দিন-তিনেক পর সকালের দিকে বড় বাড়ীটার তিনতলায় সুজন ডাক্তারের কোয়ার্টার্সে নির্ম্মলার ডাক পড়ল।

নতুন রং ধরানো বহু পুরনো বাড়ী, সেকালের বিত্তশালী লোকদের বাড়ী যেমন হত, তিন মানুষ উঁচু সিলিং, বড় বড় দরজা, আর ঠিক সেই মাপের খড়খড়িওয়ালা জানা[illegible] যেগুলির নীচের দিকটা জোড়া। গাড়ীবারান্দার নী[illegible] চারধাপ সিঁড়ি উঠে 'হল'। হলের ডানদিকে উপরে উঠ[illegible] দু পাক চওড়া কাঠের সিঁড়ি। তার পাশ দিয়ে ওষুধ-বি[illegible] যন্ত্রপাতি, রক্ত ইত্যাদি রাখবার ঘরে যাওয়ার দরজ[illegible] ডানদিকে ডাক্তারদের বসবার ঘর। হলের ঠিক পিছ[illegible] নার্সদের ডিউটি রুম, তার পিছনে অপারেশন থিয়েটা[illegible] ডিউটি রুম ও অপারেশন থিয়েটারের দুপাশে দুটি করিড[illegible] পিছনের বাথরুমগুলির দিকে গিয়েছে। করিডর দুটির [illegible] পাশ দিয়ে তিনটি করে কেবিন, প্রসূতি এবং অপারেশ[illegible] রোগীদের জন্যে।

ডিউটি রুমে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের সিষ্টার, মেটার্নি[illegible] ওয়ার্ডের সিস্টার ও যে কজন নার্স ছিল তখন, তাদের স[illegible] সুরূপা আলাপ করিয়ে দিল নির্ম্মলার। তারপর তাকে নি[illegible] উপরে চলল সুজন ডাক্তারের কাছে।

দুতলায় প্রায় সবটা জুড়েই সার সার ছোট ছো[illegible] কেবিন। হল এবং করিডর ইত্যাদির অবস্থান একতলার[illegible] মত। একতলায় যেটা ডাক্তারদের ঘর, দুতলায় তা[illegible] উপরকার ঘরটায় মেট্রন মিসেস নোরোনার অফিস।

তিনতলাটা পরে তৈরী হয়েছে বলে সেটার ব্যবস্থাগু[illegible] আধুনিক ধরণের। বেশ খানিকটা খোলা ছাত ছেড়ে ছো[illegible] ছোট দুটি ফ্ল্যাট, দুটিতেই একটি করে শোবার ঘর ও একটি করে বসবার ঘর এয়ার কণ্ডিশন করা। এর একটি ফ্ল্যাটে সুজন থাকেন, অন্যটি রাখা আছে সেইরকম রোগীদের জন্যে যাঁদের এয়ার-কণ্ডিশন-করা ঘরের দরকার এবং তার ব্য[illegible] বহন করা যাদের সাধ্যাতীত নয়।

সুজন বললেন, "নির্ম্মলার সিঁড়ি উঠতে কষ্ট হয়নি ত?"

নির্ম্মলা বলল, "না, না, কষ্ট মোটেই হয়নি।"

"আচ্ছা, তোমরা একটু বোস, বলে একটা এক্স্‌ রে প্লেট আলোর উপর ধরে দেখা শেষ করে নির্ম্মলার দিকে ফিরে বললেন, "এখন কতটা ভাল বোধ করছ? একটু একটু করে নার্সিং শেখা শুরু করতে পারবে মনে হয়?"

'নির্ম্মলা বলল, পারব।"

সুজন বললেন, 'বেশ। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

সেদিন থেকেই ট্রেনী নার্স হিসেবে কাজে বাহাল হয়ে গেল নির্ম্মলা। আপাততঃ ট্রেনিং এলাওয়েন্স বলে অন্য নার্সরা শুরুতে যা মাইনে পায় তার অর্দ্ধেক পাবে নির্ম্মলা। থাকবে সুরূপারেরই সঙ্গে, যেমন আছে। সুরূপারই ওয়ার্ডে নার্সিংএ হাতে খড়ি হবে তার। কোনো দ্বিধা বা কোনো সংশয়ের কথা তুলবার ফাঁক পেল না নির্ম্মলা, এমন বিদ্যুৎ গতিতে সমস্ত ব্যবস্থা, মাস রেজিস্টারে তার নাম উঠে যাওয়া পর্য্যন্ত, হয়ে গেল।

ফিরবার পথে সুরূপাকে বলল, "এ ত ভাই চাকরি নেওয়ারই মত হল।"

সুরূপা বলল, "জলে না নামলে সাঁতার শিখবে কি করে? ভাল না লাগে ত পরে ছেড়ে দিও।"

এর পরের রবিবারে সুধাকান্ত এল উর্ম্মিকে সঙ্গে করে। নির্ম্মলা তাদের বসবার ঘরটায় বসালে সুধাকান্ত বলল, "উর্ম্মি আসতে চাইল।"

"কেমন আছ উর্ম্মি?"

"ভাল।"

এরপর কে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

উর্ম্মি উসখুস করছে দেখে সুধাকান্তই নীরবতা ভঙ্গ করল। বলল, "ও যে নিজেই দোষ স্বীকার করে নিল, তারপর আমি আর কি করতে পারতাম?"

নির্ম্মলা যেন শুনতে পেল না এরকম মুখ করে বসে রইল, কিছুই বলল না। একটু পরে সুধাকান্ত আবার বলল, "এরপর তুমি কি করবে?"

নির্ম্মলা বলল, "নার্সিং শিখছি।"

"শেখাটা কি খুব দরকার?"

"আর ত কিছু এখন করবার নেই।"

"বস্তির বাড়ীটাতে ফিরে যাবে না ত?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বাড়ীটা ছাড়ব না। তালা বন্ধ থাকবে, কিন্তু ওটা রেখে দেব।"

সুধাকান্ত সেদিন সকালেই ডেল কার্ণেগীর একটা বইয়ে পড়েছে, 'যদি চাও তোমাকে কারুর ভাল লাগুক আর দেখবামাত্র ভাল লাগুক, তবে তার কিসে ভাল হয় তা নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে ভাববে, এবং ভাবছ যে, সেটা তাকে বুঝতে দেবে।' সুধাকান্ত খুব আন্তরিকতা থেকেই বলল, "আমি এখনো বলছি, কারখানটা তুলে দিও না। হারুফিল জগন্নাথ নিজের হাতে মিস্ত্রির কাজ বেশী কিছু ত করত না? অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। সেই রকম করে কাজ তুলে নিতে পারে, এমন একজন লোক যদি রেখে নাও ত কারখানাটা যেমন চলছিল চলতে পারে। কারখানাটার একটা good will তৈরি হয়েছে, সেটাকে কেন নষ্ট করবে? এ ধরণের কাজে কোন মানুষ indispensable নয়। জগন্নাথ না হয় নেই, আমরা ত রয়েছি, আমরা যতটা পারি সাহায্য করব।"

নির্ম্মলার এত বেশী রাগ হল, যে তার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। কষ্টে উচ্চারণ করল, "আপনার আস্পর্দ্ধা ত খুব।"

উর্ম্মি চকিতে একবার নির্ম্মলার দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। নির্ম্মলা বলল, "তুমি কিছু মনে করো না ভাই। এই কারখানা নিয়ে কি কাণ্ড যে হয়েছে তা ত জান? একটা লোক বিনা দোষে জেল খাটছে।"

উর্ম্মি তখন উঠে দাঁড়িয়েছে, দরজার দিকে ফিরে বলল, "দাদা, চলে এস।"

রবিবার রাতটা বাড়ীতেই থাকে উর্ম্মি। সোমবার খেয়েদেয়ে হস্টেলে যায়। শুতে যাবার আগে বলল, "এরপর কি করবে দাদা?"

"এরকম অবস্থায় কি করা উচিত সে বিষয়ে ডেল কার্ণেগী কি বলেছেন শোন।"

"শুনব না। তোমার বক্তব্যটা বল।"

"আমারও সেই একই বক্তব্য। সময় খুব দামী জিনিষ। যেখানে কিছু হবার নয় বলে প্রায় নিশ্চয় করে জানি, সেখানে সময় নষ্ট করব না।"

বলে খুব হাসতে লাগল।

উর্ম্মি বলল, "এই হাসিটা কি নিয়ে হচ্ছে?"

সুধাকান্ত বলল, "এটাকে হাসির অভিনয় বলতে পার। ডেল কার্ণেগী বলেছেন, এই দেখ, এইখানটায় রয়েছে, Act cheerful. Just acting as if you are cheerful will help to make you cheerful."

এর কিছুদিন পর জেলের কর্মে জেলকর্তাদের একজনের অহি মোহর অঙ্গে ধারণ করে জগন্নাথের প্রথম চিঠিটি এল। লিখেছে :

"মাসী, তোমাকে কি অবস্থায় ফেলে এসেছিলুম তারপর তোমার কোনো খবর পাইনি। কি করেই বা পাব? কেমন আছ তুমি এই চিঠি যেদিন পাবে সেদিনই লিখবে। আমি ভাল আছি। আমার জন্যে ভেবো না তুমি। সুজন ডাক্তারের ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছি, সেইখানেই তুমি আছ ত? আমি ফিরে না আসা অব্দি আর কোথাও যেও না তুমি। তোমাকে এই আমার প্রথম চিঠি লেখা মাসী। যার যেমন কপাল তাই জেলখানা থেকে লিখতে হল। সে যাক তুমি আমার বানানের ভুলগুলো ধরো না। ভুলগুলোর জন্যে লোকে তোমাকেই ত বেশী দোষ দেবে কারণ তোমারই কাছে আমি লিখতে শিখেছি।

আমি ভাল আছি। বেতের চেয়ার বানাচ্ছি।

শুনছি নাকি ভালভাবে চললে দুবছর শেষ হবার বেশ কিছুদিন আগেই ছেড়ে দেবে। তখন ত তোমাকে দেখব মাসী? প্রণাম নিও। জগন্নাথ।"

নির্মলা সেদিনই উত্তর দিল চিঠির। লিখল,

"জগন্নাথ,

তুমি ভাল আছ জেনে খুশী হলাম। বানানের ভুল কি ধরব, বেশ সুন্দর চিঠি লিখেছ তুমি। আমার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে অনেকদিন হল। এখনো দুর্বল আছি একটু, এ ছাড়া আর কোনো উপসর্গ নেই।

ডাক্তারবাবুর কাছেই আছি, তাই থাকব যতদিন তুমি ফিরে না এস, তুমি ভেবো না।

জেলে রয়েছ বলে বেশী মন খারাপ করো না। যদি ভেবে দেখ ত দেখতে পাবে, আমরা যারা জেলের বাইরে রয়েছি, তাদের অনেকেরই অবস্থা জেলের কয়েদী-দেরই মত।

এই দেখনা, এই যে নার্সিং হোম, এও ত একটা জেল-খানারই মত, বিশেষ রোগী যারা আসে তাদের পক্ষে। তুমি যেমন ইচ্ছে-মতন ঘুরে বেড়াতে পার না, এরাও পারে না। বরং তুমি সুস্থ আছ, নাইতে খেতে পারছ, সেদিক্ দিয়ে অনেক ভাল আছ এদের থেকে। ইতি, মাসী

মাস-খানেক পরে জগন্নাথের আর একটি চিঠি এল। লিখেছে :

"মাসী!

জেলে রয়েছি বলে মন খারাপ আমি মোটেই করছি না। চুরি-চামারি করে ত জেলে আসিনি, আর এখানকার সবাই সেটা জানেও। বরং আমার ভালই লাগছে এক-একদিক্ দিয়ে। আরো ভাল লাগত যদি পড়াশো হতেই না বন্ধ করে দিত, আর তোমাকে মাসান্তে একবার দেখতে পেতুম। সবকিছুই নতুন ধরণের ত? মনে মনে সব টুকে রাখছি, ফিরে গিয়ে গল্প করব।

তোমার কি এখনো বেরুনো বারণ? যদি তা না হয়, ত একদিন এস না? তোমাকে দেখতে পাব। কারখানা-টার বিষয়েও কথা বলা যাবে।

এরা আত্মীয়বন্ধুদের মাঝে মাঝে দেখতে আসতে দেয়। তার জন্যে অনুমতি চাইতে হয়। সেটা চাইলেই তুমি পেয়ে যাবে, আমি খবর নিয়ে জেনেছি।

প্রণাম নিও,
জগন্নাথ।"

এ চিঠির উত্তর দিল না নির্মলা। কোন্ মুখে দেবে? এত করে লিখেছে ছেলেটা, কি করে লিখবে, যাব না। অথচ যেতে সে পারবে না, কাজেই চুপ করে যাওয়াই ভাল। ভাবল, সে না গেলেই জগন্নাথ বুঝে নেবে, যাওয়া সম্ভব নয় কোনো কারণে, এবং পরের চিঠিতে লিখবে, আচ্ছা, মাসী, থাক আসবার দরকার নেই। কিন্তু পরের মাসে যে চিঠিটি এল তাতে জগন্নাথ লিখেছে :

"মাসী, তুমি কি আমার গতমাসের চিঠি পাওনি? তবে কেন এলে না? কিছু অসুখ বিসুখ করেনি ত? রোজ আশা করে থাকতুম, তুমি আসবে। তোমাকে একবার দেখতে পেলে আমার খুব ভাল লাগত মাসী। কাজের কথাও ছিল অনেক। কবে আসবে জানিও, সেদিন আশা করে বসে থাকব। না যদি এস ত সেই একদিনই দুখ্খু পাব। রোজ ভরে উঠে প্যারেডে বেরুবার আগে

ভাবি আজ মাসী আসবে, মাসীকে আজ দেখতে পাব। আশায় আশায় দিনটা কেটে যায়। তারপর যখন সারা রাতের জন্যে দরজায় তালা পড়ে, তখন কি কষ্ট যে হয় মাসী, কি করে তা বোঝাব? হয়ত তুমি জান না, দেখা করবার জন্যে অনুমতি কি করে নিতে হয়। সুজন ডাক্তারকে বললে তিনি সব বন্দবস্ত করে দেবেন। আমার জন্যে তুমি ভেবো না মাসী, আমি বেশ আছি। লেখাপড়াও শিখছি জেলের ইস্কুলে। ফিরে গিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেব তোমাকে, দেখো।

প্রণাম নিও,

জগন্নাথ।"

সেদিন চিঠিটি কোলে করে অনেকক্ষণ বিমনা হয়ে বসে রইল নির্মলা। কি লিখবে এর উত্তরে? পুলিশের নাম শুনলে যার বুক টিপ-টিপ করে, তাদের ছায়া দেখলে যার নাড়ী ছেড়ে যায়, সে যাবে পুলিশের রাজত্ব জেলখানাতে জগন্নাথের সঙ্গে দেখা করতে? একেবারে অসম্ভব কথা। কিন্তু জগন্নাথকে কি লিখবে সে? কেন যেতে পারছে না, কি বলে সেটা তাকে বোঝাবে?

নির্বান্ধব এই ছেলেটা, যে বলতে গেলে তারই জন্যে জেলে গিয়েছে, এত করে তাকে দেখতে চাইছে, নির্মলা তার এই সামান্য ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ করতে পারছে না। এর উপর জগন্নাথের এই চিঠিটিরও উত্তর যদি সে না দেয় ত ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে? খুবই বিশ্রী হবে না কি সেটা? খুবই হৃদয়-হীনের মত আচরণ?

দেখা করতে যাওয়ার প্রসঙ্গটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চিঠির উত্তর দেওয়া যায় কি না সেই চেষ্টা অনেকক্ষণ ধরে সে করল। অনেক চিঠি লিখল আর ছিঁড়ল। কোনোটাই মনঃপূত হল না। তখন ভাবতে লাগল, তার চিঠির উত্তর হিসাবে নয়, যেন এমনি তাকে কিছু একটা খবর দেবার জন্যে লিখছি, এইভাবে তাকে চিঠি লিখব। তবে সেটা এখনই ত করা যাচ্ছে না? খবর দেবার মত কিছু একটা আগে ঘটুক।

কিছুদিন কাটবার পর জগন্নাথের মনে হতে লাগল, সে জেল-কয়েদী বলে তার মাসী তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আর রাখতে চায় না, এ ত হতে পারে না? নিশ্চয় নূতন পরিবেশে যাদের মধ্যে তার মাসী রয়েছে, একটা জেল-কয়েদীর সঙ্গে তার পত্র-ব্যবহার তারা পছন্দ করছে না। তারাই তার মাসীকে চিঠি লিখতে দিচ্ছে না, এবং জগন্নাথ তাকে চিঠি লিখুক এও নিশ্চয় তারা চাইছে না। হয়ত তার মাসীকে চিঠি লিখে বিব্রত ত বটেই, বিপন্নও করবে সে। এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে সেও ঠিক করল, তার মাসীর একটি চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত তাকে সেও আর চিঠি লিখবে না।

জেলে থেকেও ঠিক জেল-কয়েদী জগন্নাথ এতদিন ছিল না। এবারে হল।

কুড়ি

এরপর একটা একটা করে মাস পাঁচেক কেটে গেল, জগন্নাথকে চিঠি লেখা কিছুতেই হয়ে উঠছে না নির্মলার।

এমন কিছু কিছু এর মধ্যে ঘটেছে যা সামান্য নয়, কিন্তু সেগুলির খবর বিভিন্ন কারণে জগন্নাথকে দেওয়া চলে না।

যেমন, সে যে এখন আর ট্রেনী-নার্স নয়, পুরো দস্তুর নার্স বনে গিয়েছে। শুরুতে অন্য নার্সরা যা মাইনে পায়, সে তার থেকে ত্রিশ টাকা বেশী পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সুজন তাকে কোনো ওয়ার্ড-সিস্টারের আঁচল ধরা, মানে, এপ্রণ ধরা করেও রাখেন নি। তিনতলায় তাঁর নিজের ফ্ল্যাটের পাশে যে এয়ার-কণ্ডিশন করা ফ্ল্যাটটি বিশিষ্ট রোগীদের জন্যে রাখা আছে সেটির সমস্ত ভার দিয়ে তাকে রেখেছেন। সরাসরি মেট্রনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কিন্তু এটা জগন্নাথকে দেওয়ার মত খবর নয় এই কারণে, যে খবরটা পেয়ে সে খুশী হবে না। গাড়ী সারাবার কাজ শুরু করবার আগে এবং পরে বহুবার সে বলেছে, "মাসী, নার্সিং না কি বলে ওটাকে, তুমি ওটা শিখো যদি তোমার মন চায়, কিন্তু দেহে প্রাণ থাকতে ধাইগিরি তোমাকে আমি করতে দেব না। যার তার পাইখানা তুমি পরিষ্কার করবে, কটা টাকার জন্যে, রামঃ।"

তারপর মলিনা। পূর্ববঙ্গের অল্পবয়সী একটি মেয়ে। নার্সিং হোমের মাইনে করা নার্স নয় কিন্তু অন্য আরও কয়েকটি বাইরের নার্সের মত মাঝে মাঝে ঠিকে কাজ করতে আসে। সে কিছুদিন ধরে উঠে পড়ে লেগেছে, নির্মলাকে বিপ্লবীদের দলে টানতে। নির্মলার ত্রিসংসারে কেউ নেই, বিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছে আছে বলেও মনে হয় না। অকলঙ্ক চরিত্র। দেশে বিপ্লব ঘটাতে যাঁরা চান এই ধরণের মানুষদের উপর তাঁদের নির্ভর স্বভাবতঃ বেশী। মলিনা তাকে প্রথম কিছুদিন নানারকমের বই পড়িয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠ যার থেকে নিজেও কতকটা পড়ে শুনিয়েছে মা যাহা হইবেন। নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, মলিনা আবৃত্তি করেছে, দাঁড়া রে দাঁড়া রে তোরা, 'দাঁড়া রে যবন বিবেকানন্দের রাজযোগ, সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবন বৃত্তান্ত, রুশ নিহিলিস্ট মেয়ে ভেরা ইত্যাদির কাহিনী। মুকুন্দ দাসের ঐ নেমে আসে ন্যায়ের দণ্ড ধরণের অনেক গান ভরা গলায় গেয়ে শুনিয়েছে সে সুরূপা সুনন্দা অসীমা নির্মলাকে, তাদের কোয়ার্টার্সের বারান্দায় বসে। আবৃত্তি করেছে "স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়।" গেয়েছে, "যায় যাবে জীবন চলে বন্দেমাতরম্ বলে।" কঠোপনিষৎএর শ্লোক শুনিয়েছে. "অজো নিত্যঃ শাশ্বতো-ঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

নির্মলাকে যেখানে যখনই একলা পেয়েছে, শুনিয়েছে, বিপ্লবীরা কি চায়, কেন চায়, কোন্ পথ ধরে গেলে তাদের কার্য্যসিদ্ধি সহজ হবে বলে তারা ভাবছে, কেনই বা সেটা ভাবছে।

নির্মলা মন দিয়েই শোনে। দেশের শোচনীয় দুরবস্থা, দেশের মানুষগুলির দুরপনেয় দুঃখ দুর্দশার চিন্তা তার মনের উপর গভীর ছায়াপাত করে, সে চায় নিজেও কিছু করে দেশের জন্যে। কিন্তু কি করতে পারে সে? তার যে ভীষণ ভয়। দেশের জন্যে কিছু করতে যাওয়ার অর্থই ত পুলিশের নজরে আসা? সেটা যে তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

তাছাড়া দেশের জন্যে যাহোক কিছু করা বলবার জন্যে ত মলিনা আসে না তার কাছে? মেয়েটি যাকে বলে পূর্ণভাণ্ডী। তার কথা হল, সব দিতে হবে, এমনকি প্রয়োজন হলে প্রাণও। যে প্রাণ রাখবার জন্যে এত কাণ্ড করে চলেছে নির্মলা, এত দুঃখ নিজেকে দিয়েছে, দিচ্ছে।

পলাতকা মৃত্যুভয় জর্জ্জরিতাকে পাশে বসিয়ে মহা উৎসাহে মরণ-বরণের মন্ত্র শোনায় মলিনা।

এ এক বিচিত্র পরিস্থিতি।

কথায় বলে, খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে। এই নার্সিং হোমে মাইনে করা নার্সই আছে বারোজন, তাছাড়া বাইরের বেশ কয়েকজন নার্স আসে যায়, অল্পবয়সী ডাক্তার দুজন আসেন নিয়মিত, সবাইকে ছেড়ে মলিনার দৃষ্টি পড়ল কিনা নির্মলার উপর!

পুলিশের হেপাজতে বাস করছে যে জগন্নাথ তাকে ত খবরটা দিয়ে লেখা যায় না, একটা বিপ্লবী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, সে খুব চেষ্টা করছে আমাকে তাদের দলে টানতে?

তারপর আর যা ঘটেছে, সেটা সত্যিই যে কাউকে বলবার মত কিছু তা নিজের কাছে নিজেই স্বীকার করে না নির্মলা, ত জগন্নাথকে লিখবে কি? নির্মলা জানে এ, ধরণের কিছু ঘটতে পারে না তার জীবনে, ঘটা উচিত নয়, তাই এই চিন্তাকে একবারও আমল দেয় না নিজের মনে, যে, তার হৃদয়দ্বারে সত্যিই একটি নূতন অতিথির আবির্ভাব হয়েছে সম্প্রতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে।

নার্সিং হোমের সবগুলি করিডর সিঁড়ি ও কেবিনের মেজেতে রবারের আস্তরণ। সেদিন সন্ধ্যায় নির্মলা ডিউটি রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল, তার পিছন পিছন যে মানুষটি এল কিছুদূর অবধি, সে তাই কেবল রূপক অর্থে নয়, বস্তুতঃই নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এল।

সিঁড়ির সব নীচের ধাপটায় একটা পা তুলেছে নির্মলা, শুনল, "শুনুন!'

চমকে ফিরে যাকে দেখল, সে কালো না ফরসা, রোগা না মোটা, লম্বা না বেঁটে, যুবা না বৃদ্ধ এসব কিছুই চোখে পড়ল না তার। কেবল মনে হল, মানুষটা যেন তার বহু

কালের চেনা। মন বলল, আরে! এ ছিল কোথায় এতদিন ?

মানুষটির অবশ্য বছর পঁচিশ বয়স, বেশ ফরসা, বেশ লম্বা, হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটু রোগা, আসলে তা নয়, সুদর্শন, সুপুরুষ।

নির্ম্মলা এরপর অনেকবার ভেবেছে, আচ্ছা, দিবাকর দেখতে এত ভাল বলেই কি তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন সে আমার অনেক কালের চেনা? সুন্দরকে দেখব, জানব এই গভীর প্রত্যাশা নিয়েই কি আমরা পৃথিবীতে আসি? যিনি আমাদের পাঠান পৃথিবীতে, তিনি কি তারই পরিচয়পত্র দিয়ে দেন আমাদের অন্তরে?

কিন্তু সেই সুন্দর হয়ত প্রতি মানুষের জন্যে আলাদা একজন। নয়ত এই যে তাদের রেডিওলজিষ্ট্ ডাক্তার ভাসানি তিনি ত দিবাকরের চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর দেখতে, তাঁকে দেখে ত ভাবস্থিরানি জননান্তর সুহৃদানিদের একজন বলে একবারও মনে হয়নি নির্ম্মলার?

চম্‌কে পিছন ফিরে নির্ম্মলা বলল, "উঁ! এঁ্যা? ও" এইরকম কয়েকটা কথা, আদিম মানুষের ভাষায়।

দিবাকর বলল, "ডাক্তার সান্যালের সঙ্গে একটু আগে টেলিফোনে আমার কথা হয়েছে, সেই কথা মত আমার বাবাকে নিয়ে এসেছি।"

"কোথায় আপনার বাবা?"

"তিনি গাড়ীতে বসে আছেন। ডাক্তার সান্যালকে খবরটা কি করে দেওয়া যাবে?"

"আপনি এই চেয়ারটায় বসুন, আমি ইন্টার কমে তাঁকে খবর দিচ্ছি। কি নাম আপনার বাবার?"

"দিনকর মিত্র।"

ইন্টার কমে কথা বলতে ডিউটিরুমে ফিরে গিয়ে নির্ম্মলা শুনল ঘণ্টা বাজছে। রিসিভার কানে নিয়ে শুনতে পেল, সুজনের গলা। বলছেন,

"হ্যালো, কে? নির্ম্মলা আছে ওখানে?"

"আমি নির্ম্মলা কথা বলছি।"

"শোন নির্ম্মলা, আমার একজন মাস্টারমশাই দিনকর মিত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন। তিনি থাকবেন আমার পাশের ফ্ল্যাটটায়, তুমি সব ভার নেবে তাঁর। তিনি এসে পৌছবা মাত্র তাঁকে উপরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। হার্টের রোগী, চেয়ারে বসিয়ে যেন তোলা হয়। যারা তুলবে তাদের বোলো, হৈ হল্লা একেবারেই যেন না করে।"

সুজন যখন সিটি-কলেজে সায়ান্সের ছাত্র, তখন দিনকর তাঁদের কেমিষ্ট্রির প্রোফেসার। বাঙ্গালীর পক্ষে একটু অতিরিক্ত ফরসা, ছোটখাট লাজুক প্রকৃতির মানুষটি, চমৎকার পড়াতেন। তবে তাঁকে সুজনের বিশেষ করে মনে আছে এইজন্যে, যে, ক্লাসে বা ল্যাবরেটরীতে যখনই বাংলায় কথা বলতেন এ ছাত্রদের 'তুমি' বলতেন না 'আপনি' বলতেন

সুজন তখন থার্ড ইয়ারে। হঠাৎ একদিন শুনলেন, প্রোফেসার দিনকর মিত্র কলেজের কাজে ইস্তফা দিচ্ছেন।

সেদিনই বিকেলে ছেলের দল তাঁকে ঘেরাও করেছিল। একজন তাদের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর কাছে গিয়ে বলেছিল, "আমরা জানতে এলাম, আপনি কেন আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন।"

দিনকর বলেছিলেন, "দেখুন, আমাদের বংশে আমার আগে কেউ কোনোদিন চাকরি করেনি। তা সত্ত্বেও এই চাকরি আমি ছাড়তাম না, যদি বুঝতাম কাজের মত কাজ কিছু হচ্ছে এর থেকে। হচ্ছে না যে, সেটা খুব ভাল করে বুঝলাম, যেদিন শুনলাম, আমাদের বীরেন দে, গত বৎসর কেমিষ্ট্রি অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট যে হয়েছিল, সে উকীল হবে বলে ল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে।"

ছেলেটি বলেছিল, "আপনিও ত লাইনটা ছেড়ে দিচ্ছেন। তাই নয় কি? নিজে আপনি কি করবেন এরপর?"

সুজন বলেছিলেন, "রিসার্চ্ করব। একদিন তোমরা আমার বাড়ীতে এসো এসে, দেখে যেয়ো আমার রিসার্চ ল্যাবরেটরী। কিন্তু আমি জানি যে ওতে পেট ভরবে না।'

ছেলেটি বলেছিল, "তাহলে?"

সুজন বলেছিলেন, "ছোটখাট কামারশাল আমার একটি আছে বেলেঘাটায়, ষ্টীল ট্রাঙ্ক তৈরী হয় সেখানে সেটাকে বাড়িয়ে চারিয়ে কিছু একটা গড়ে তুলতে পারি কি না দেখব।"

গড়ে যা তুলেছেন সেটা দেখবার মত জিনিষ, ষ্টীল ট্রাঙ্ক, বালতি, জলের ট্যাঙ্ক, লোহার কোলাপসিব্‌ল্‌ গেট, লোহার গ্রিল ইত্যাদি অনেক কিছু তৈরি হয় তাঁর কারখানায়। প্রায় দুশ লোক খাটে।

দিনকরকে উপরে আনা হলে সুজন গিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে। কলেজে যেরকম দেখেছিলেন প্রায় সেই রকমই দেখতে আছেন দিনকর। তফাতের মধ্যে দুই কানের কাছে কয়েকটি করে চুল পেকেছে তাঁর।

বাপের খবরদারি করতে রাত আটটা অবধি থেকে গেল দিনকর। যখন যাচ্ছে দিনকর বললেন, "কাজের ক্ষতি করে রোজ আমাকে দেখতে আসবার দরকার নেই। মাঝেমাঝে এসো তাহলেই হবে। খুব দরকার হলে আমিই ডাকব এখন। তবে টেলিফোনে রোজই খবর নিও।"

"আচ্ছা বলে চলে গেল দিবাকর।"

কিন্তু দেখা গেল, সে রোজই আসছে এবং কোনো কোনোদিন দুবেলা:আসছে।

একদিন সে চলে গেলে দিনকর বলছেন, ডাক্তার আমার সম্বন্ধে হয়ত ওকে কিছু বলেছেন, খুবই ভড়কেছে মনে হচ্ছে নয়ত দুবেলা আসত না। বাড়ীতে ত এমন কতদিন যায় আমার খোঁজ নিতে আসে না।"

নির্ম্মলা চুপ করে রইল।

দিনকর বললেন, "আচ্ছা, নার্স, আমার অসুখটার সম্বন্ধে ডাক্তার আপনাকে কি কিছু বলেছেন?"

নির্ম্মলা বলল, "না। তবে কাজকর্ম্মের নির্দ্দেশ যে ধরণের পেয়েছি তাতে মনে ত হয় না যে আপনার বিশেষ কিছু হয়েছে।"

এর কয়েকদিন পরের ঘটনা।

সন্ধ্যার মুখে দিবাকর এসেছে।

নির্ম্মলা চা খেতে গিয়েছে, তখনো ফেরেনি।

দিবাকর বলল, "কেমন আছ আজ?"

দিনকর বললেন, "বেশ ভাল। এসে অবধি এতটা ভাল কোনোদিন বোধ করিনি।"

দিবাকর অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ তারপর বেরিয়ে এসে করিডরে-রাখা ইণ্টারকম টেলিফোনে ডিউটি রুম ডেকে বলল, আমি এক নম্বর কেবিন থেকে বলছি। পেশেন্ট একটু অসুস্থ বোধ করছেন। তার নার্সটিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

নির্ম্মলা না এসে এল সুনন্দা। দিবাকর পাইচারি করছিল করিডরে, সুনন্দাকে দেখে বলল, "এঁকে যিনি দেখেন সেই নার্সটি কোথায়?"

সুনন্দা বলল, "তাকে দেখতে পেলাম না কোথাও, তবে সেও হয়ত এসে পড়বে এখনি। কি দরকার আমাকে বলুন। ডাক্তারকে খবর দেব?"

দিবাকর বলল, "না, তার আর দরকার নেই। একটু অসুস্থ বোধ করছিলেন, তবে সেটা খুবই সাময়িক। সামলে উঠেছেন।"

সুনন্দা খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, "বসব একটু ওঁর কাছে?"

দিবাকর বলল, "না, না, উনি বোধহয় এখন একটু ঘুমোচ্ছেন। আর আমি ত রয়েছি? দরকার হলে খবর দেব।"

দিবাকরকে দেখিয়ে টেনে টেনে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চলে গেল সুনন্দা সুডোল দেহটি দুলিয়ে।

নির্ম্মলা এত দেরি করে এল যে দিবাকরের মেজাজ তখন সপ্তমে। চা খাওয়ার পর নির্ম্মলা গিয়েছিল লাইব্রেরী থেকে দিবাকরের জন্যে একটা বই সংগ্রহ করতে। ভিতরে এসে বইটি কোলে করে দিবাকরের বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসল। একটু দূরে আর একটা চেয়ারে দিবাকর বসেছিল। বেশ খানিকটা সময় নীরবে কাটবার পর বলল, "ওটা কি বই?"

নির্ম্মলা বলল, "রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, উনি পড়তে চেয়েছিলেন।"

দিনকর বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে আপনি পড়ে শোনাবেন। অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা হয় ত থাক।"

নির্ম্মলা বলল, "আমিই পড়ে শোনাব। কোনো অসুবিধা হবে না আমার। ভালই লাগবে।"

দিবাকর বলল, তাহলে পড়ে শোনান, আমি চলি।"

দিনকর বললেন, তোমাকে উঠতে হবে কেন? বসতে চাও ত বোস না, বইটা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না?"

দিবাকর উঠে দাঁড়াল, বলল, "বসে কি করব? ঘরের ছাতটা ত কংক্রিটের, কড়িকাঠ যে গুনব তারও উপায় নেই।

নির্ম্মলা একটু অবাক্ হয়েই তাকাল তার দিকে। সে চলে গেলে দিনকর বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না নার্স, ওর কথা বলবার ধরণই ঐ রকম। আর স্বভাবে অভিমানটা একটু বেশী, সে জন্যে কেন যে অভিমান সেটা অন্যেরা সব সময় বুঝতে পারে না। মা না থাকলে যা হয়।"

রাতের খাওয়াটা একটু সকাল সকালই সেরে ফেলে নির্ম্মলারা। সেদিন চার বন্ধুতে খেতে বসেছে, কথা হচ্ছে সুনন্দাকে নিয়ে। সে বলছে, পুরুষ মানুষরা মরতে মরতেও মেয়েদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করে।

সুরূপা বলল, 'তোমার কাছ থেকে একটু উস্কুনি পায়, তাই করে। কই, আমাদের সঙ্গে ত করে না?"

সুনন্দা বলল "কি যে বল। ঐ মরকুট্রে ফেটি বাঁধা রুগীগুলিকে উস্কুনি দিই আমি? কেন দেব? কিসের দুঃখে? শক্ত সমর্থ আধবয়সী কত পুরুষ মানুষ ত হামেশাই যাচ্ছে আসছে। রুগীদের কারও স্বামী কারও ভাই কারও বা ছেলে। ইচ্ছে থাকলে তাদের থেকে দু-তিনটেকে বেছে নিতে কি পারি না?"

সুরূপা বলল, "তা আর পার না? খুব ভাল করেই পার। তোমার অসাধ্য কাজ কি কিছু আছে?"

অসীমা বলল, 'দুতিনটেকে বেছে নেবে কেন সুনন্দাদি? একটার বেশী ত বিয়ে করতে পারবে না?"

সুনন্দা বলল, "সবচেয়ে ভাল যেটাকে মনে হবে সেটাকে নিজে বিয়ে করব, বাকীগুলোকে তোদের দেব। নিজেরা জোগাড় করে নেবার মুরোদ ত তোদের নেই?'

সবাই খানিক হাসল, তারপর সুরূপা বলল, 'কিন্তু ভাই, ঐ ছেলেটার দিকে ওরকম চোখ করে তুমি তাকিও না। দেখলে লজ্জা করে।"

সুরূপার খোঁপায় ছোট একটা চাঁটি মেরে সুনন্দা একটু কান্নার ভঙ্গিতে বলল, কিন্তু কি করব he makes me mad সুরূপাদি।

খোঁপাটা ঠিক করতে করতে সুরূপা বলল, "আহা, কি বা কথার ছিরি।"

অসীমা বলল, "কি ভীষণ বিচ্ছিরি রেঁধেছে মাংসটা। নির্ম্মলাদি এত চেষ্টা করে শেখাতে, কিন্তু শঙ্করটা এমন হাঁদা, কিছুতে শিখবে না।"

সুনন্দা বলল, "ভাল না লাগে খাসনে। আমি খেয়ে নেব। মাংস যেমনই রান্না হোক, খেতে আমার ভালই লাগে।"

সুরূপা বলল, 'কাঁচা মাংস হলে ত কথাই নেই।"

সুনন্দা বলল, "কোথায় পাচ্ছি?"

সুরূপা বলল, "সে তোমার জুটেই যাবে।"

অসীমা বলল, "এ মা, তুমি কাঁচা মাংস খাবে সুনন্দাদি? ওয়াক্ থুঃ!" তারপর ভেবেই পেল না, এমন কি সে বলেছে যেজন্যে লুটোপুটি করে এত হাসছে।

সুরূপা বলল, "তবে এই ছেলেটিকে মনে হয় বড্ডই ভাল, এর দিকে বেশী নজর দিও না তুমি।"

সুনন্দা বলল, যে আজ্ঞে। ভাল ছেলেদের দিকে নজর দেবার অধিকার আমার নেই, সেটা জেনে রাখা গেল।"

অসীমা বলল, "ছেলেটা ভাল না মন্দ সেটা তাকে দেখে তোমরা কি করে বুঝতে পার সুরূপাদি?"

সুরূপা বলল, "কি করে পারি জানি না, কিন্তু মনে হয় যেন পারি।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অসীমা বলল, "আমি পারি না। ভগবান্ কেন যে আমাকে বুদ্ধি কম দিয়েছেন।

অসীমা তার মা-বাবাকে লুকিয়ে শান্তনু নামের একটি ছেলের পড়ার খরচ জুগিয়েছে এত দিন। সম্প্রতি জানতে পেরেছে, কুসঙ্গে পড়ে তারই টাকায় সে রামবাগান সোনাগাছি অঞ্চলে যাওয়া আসা শুরু করেছে, সামনে বি, এ পরীক্ষা, পড়বার বই দু তিনটের বেশী কেনেনি, কলেজে তিনমাসের মাইনে বাকী। কি করবে এর পর ভেবে পাচ্ছে না অসীমা।

দুটো বেতের চেয়ার নিয়ে সুরূপা আর নির্ম্মলা এসে

বসেছে দুতলার বারান্দায়। সুনন্দা ও অনীষা চলে গিয়েছে ডিউটিতে।

নির্ম্মলা খানিক ইতস্ততঃ করে বলল, 'আচ্ছা সুরূপাদি, কোন ছেলেটিকে মনে ক'রে তুমি বলছিলে' যে, তোমার মনে হয়, সে বড্ডই ভাল ?"

সুরূপা বলল, "কে আবার ? তোমারই ত পেশেণ্টের ছেলে।'

বলে নির্ম্মলার একটা হাতকে টেনে নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'ছেলেটা তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে নির্ম্মলা। তোমাকে দেখলে ওর মুখের যা ভাব হয় সে একটা দেখবার মত জিনিষ।'

নির্ম্মলা বলল, "এই নাও। তুমি শেষে আমাকে নিয়ে পড়লে সুরূপাদি ?"

"আচ্ছা থাক বলব না" বলে সুরূপা চুপ করে গেল।

খুব অল্প বয়সে মা মারা যান, তারপর থেকে বাবার কাছে এত বেশী আদর পেয়ে বড় হয়েছে দিবাকর যে তার স্বভাবে অভিমান, অসহিষ্ণুতা এই ধরণের কতগুলি দোষ শিকড় গেড়ে বসে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু যেহেতু বুদ্ধির অভাব নেই তার, তাই অন্যায় কিছু করে ফেলে পরে তার জন্তে যথারীতি অনুতাপ করে সে এবং সাধ্যমত প্রতিবিধান করার চেষ্টা করে। সেদিন মেজাজ খারাপ হওয়াতে ব্যবহারের যে ক্রটি ঘটেছিল তার, পরদিন সন্ধ্যায় তার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই যেন খুব ভাল মেজাজে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে গেল সে নার্সিং হোমে। অনেক গল্প করল নির্ম্মলার সঙ্গে। তার বাবাকে যখন বর্ভিল খাওয়ানো হল, নিজেও একপেয়ালা চেয়ে নিয়ে খেল।

বলল, সব ইস্কুলে মেয়েদের নার্সিং শেখাবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কলেজের মেয়েদের বেলায় নিয়ম হওয়া উচিত, অন্ততঃ তিনমাস ভাল কোনো নার্সিং হোমে ট্রেনী-নার্সের কাজ করে সার্টিফিকেট পেলে তবে তারা গ্র্যাজুয়েট হতে পারবে। ফার্স্ট এড্ ও ধাত্রীবিদ্যা জানে না, এমন কোনো মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত নয়। নির্ম্মলাকে আরও খুশী করে দেবার জন্তে বলল, 'জায়গাটার নাম নার্সিং হোম কেন ? নার্সরাই এখানে মুখ্য বলে। ডাক্তাররা আছে, কালেভদ্রে তারাও কাজে লাগে তাই, যেমন ধরুন এম্বুলেন্সের ড্রাইভারটি কাজে লাগে।

তর্ক করতে অভ্যস্ত নয় নির্ম্মলা, বলল, "তাই কি ?"

দিবাকর বলল, 'তাছাড়া আবার কি ?'

নির্ম্মলা খুব মৃদুস্বরে বলল, "ডাক্তার সান্যাল কিন্তু কেবল ডাক্তার নন, তিনি রোগীদের বন্ধু। তিনি যা করেন, আমরা কি তা পারি ? তিনি বলেন, আমি ত রোগের চিকিৎসা করি না, আমি রোগীর চিকিৎসা করি। রোগের চেয়েও রোগ যার হয়েছে সেই মানুষটাকে আমি বেশী করে দেখি। তিনি চান এই নার্সিং হোমে যারা আসবে তারা কেবল স্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে যাবে না, সুস্থ জীবন কি করে যাপন করতে হয় তাও খানিকটা শিখে যাবে।"

দিনকর বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। সুজন অন্য সাধারণ ডাক্তারদের মতন নন। এই নার্সিং হোমের তিনি বাস্তবিক যে কতখানি তা বোঝা যায় আপনাদের দেখলে। আপনারা ত তাঁরই হাতের তৈরি।"

আজ তর্কে জেতাটা দিবাকরের কাছে বড় কথা নয়। সে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। বলল, "আচ্ছা বাবা তুমি আমাকে আপনি বল না কেন ?"

নির্ম্মলা চোখে হাসি নিয়ে তাকাল তার দিকে। দিনকরও হাসলেন।

দিবাকর আবার বলল, 'কেন আপনি বল না আমাকে ? আমি কি দোষ করেছি ? বল।'

নির্ম্মলা বলল, "প্রথম দিন থেকে কতবার যে বলেছি, আমি আপনার মেয়ের বয়সী, আমাকে তুমি বলুন, আপনি কেন বলছেন ? কিন্তু কিছুতেই শুনবেন না।"

দিনকর বললেন, "বয়সে এতই ছোট আপনারা, তুমি বলাই উচিত। কিন্তু তাহলে সম্পর্কটাকে একটু অন্য ধরণের করে নিতে হয়। নামটা জানতে হয়।'

দিনকর বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন। নির্ম্মলা উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল, বলল 'আমার নাম নির্ম্মলা।"

তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন দিনকর,

বললেন, "এসো এসো মা নির্মলা। এসো, বোস এইখানে। বলে তাকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন।

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দিবাকরের দুটি চোখ।

সে রাতটা কিন্তু নির্মলার ভাল কাটল না। চোখ বুজলেই দিবাকরের মুখটা জলজ্বল করে ওঠে অন্ধকারের পর্দায়, চোখ খুলে তাকিয়ে সেটাকে মুছতে হয়। সে চাইছে না, তবু কে যেন জোর করে তার হাতে সিঁধকাঠি দিয়ে তাকে দিয়ে সিঁধ কাটাবার চেষ্টা করছে। প্রাণপণে নিজের মধ্যে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে সে, আর তাই করতে গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে গলাটা শুকিয়ে উঠছিল তার। কতবার যে উঠে উঠে জল খেল তার ঠিক নেই।

আজ সেই বস্তির বাড়ীটাকে খুব বেশী করে মনে পড়ছে তার, কি নিরুদ্বেগ আর নির্ঝঞ্ঝাট ছিল সেখানকার জীবনযাত্রা। আর কি একান্ত নির্ভর ছিল তার জগন্নাথের উপর। সেখের দিক্‌টায় কোনো কিছু নিয়ে নির্মলাকে আর ভাবতে হত না। সব ভাবনা দুজনের হয়ে জগন্নাথই ভাবত।

যেন একটি সুন্দর খেলাঘরের মত ছিল তাদের ছোট সংসারটি। কার অভিশাপে ভেঙে ছত্রাকার হয়ে গেল কে জানে!

সে জীবনটা যেন ক্রমশঃ তার আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। যেত না, যদি জগন্নাথের সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগটা অন্ততঃ তার থাকত।

কেন লিখল জগন্নাথ, জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে? না যদি লিখত তাহলে ত অবস্থাটা এরকম দাঁড়াত না।

জগন্নাথের উপর আজ একটু যেন রাগও হতে লাগল তার। কেন চলে গেল সে? কেন নির্মলাকে যেতে দিল না সুধাকান্তর কাছে।

আজ নির্মলার মনটাকে নিয়ে একি ভীষণ টানাছেঁড়া। একদিকে দিবাকর আর একদিকে মলিনা। দুই দাবিদার। একজনের দাবিতে মনোহারিতা, অন্যজনের দাবি ভয়াবহ, কিন্তু এর কোনোটিই মেটানোর সাধ্য নির্মলার নেই।

একমাত্র জগন্নাথেরই কোনো দাবী ছিল না।

তার মত করে আর কে পারবে নির্মলাকে সমস্ত কিছুর থেকে আড়াল করে রাখতে? সমস্ত কিছু অর্থে সমস্ত কিছু। যা আপাত-মনোহর এবং যা ভয়াবহ।

মলিনার নাম না করে বিপ্লববাদ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সুরূপার সঙ্গে আলোচনা করেছে নির্মলা। সুরূপার মতবাদের উপর অন্য অনেকের মত তারও খুব শ্রদ্ধা। সুরূপা বলেছে, যার যেটা কাজ। আমরা হলাম সেবাব্রতী। যে আর্ত্ত তার আর্ত্তি দূর করা, যে মুমূর্ষু তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা আমাদের কাজ। আমরা হলাম মা। মা যেমন তার সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে না, আমরাও তেমনি পারি না কোনো মানুষকে মেরে ফেলবার কথা ভাবতে। যুদ্ধের জায়গাতেও আমাদের ডাক পড়ে, যুদ্ধ যারা করে তাদের চেয়ে আমাদের প্রয়োজন সেখানে কম নয়। এটা বলতে পারি, প্রাণ দিতে আমি রাজী আছি যদি সেবার কাজে তার প্রয়োজন হয়, যদি তাতে কারুর প্রাণ রক্ষা হয়।'

এই কথাগুলিকেই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মলিনাকে বলেছিল নির্মলা। বলে বলেছিল, আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। আমার নিজের যেটা কাজ তাই নিয়ে আমাকে থাকতে দিন।

মলিনা বলেছিল একবার ধরছি যেইকালে আর কি ছাড়ুম?" তারা নার্স, সেবা তাদের ব্রত একথায় উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিল খোল ফালাইয়া। আমরা নার্সরা ফিনাইল ঢালি না? লাইসল ঢালি না? আয়োডিন লাগাই না? লিস্টারিন দিয়া ডেটল দিয়া গলা ধোয়াই না? কিসের লাইগা করি? জীবাণুগুলাইনরে মারি না? মারি। হ মারি। তবে?"

সুজনের যেমন স্বভাব, দিনকর যেদিন বাড়ী ফিরে গেলেন কোনো কিছু ভাল করে না ভেবেই তাঁকে কথা দিয়ে দিলেন, নির্মলা নাম্নী নার্সটি কিছুকাল একদিন অন্তর একবার করে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবে এবং সুজনকে কিছু জানাবার থাকলে এসে জানাবে। স্ফিগমোমেনোমিটারে কি করে রক্তের চাপ মাপতে হয় তা এই নার্সিং হোমের অন্য সব কজন নার্সের মত নির্মলাও শিখে নিয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্মলারও যে কিছু বলবার থাকতে পারে তা একবারও তাঁর মনে এল না।

নার্সের কাজ নিয়ে শুরু করবার পর কিছুদিন নির্ম্মলার যে একটা আতঙ্ক নিয়ে কাটত, এই বুঝি তার পূর্ব্বপরিচিত জগৎ থেকে কেউ একজন এল—সেটা এতদিনে অনেকটাই কেটে গিয়েছে। একে ত নিরুপায় মানুষের ভয় বাধ্য হয়েই কাটে খানিকটা, তাছাড়া নির্ম্মলা জানে সতেরো বৎসরের কিশোরী নিরুপমার সঙ্গে একুশ বৎসর বয়সের নব-যৌবনা নির্ম্মলার চেহারার তফাৎ বেশ খানিকটা আছে। আর নার্সের পোশাকে এমনিতেই মানুষকে একটু অন্তরকম দেখায়।

এখন একটানা অনেকদিন সে ভুলেই থাকে যে সে নিরুপমা, যে খুন করে পালিয়েছে। ধরা পড়বার ভয়টাকেও তাই আজকাল একটানা বেশ কিছুদিন ভুলে থাকতে পারছে।

পারে না মানুষে। তার শক্তিতে কুলোয় না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ওলটপালট করে দিয়ে যায় যে মৃত্যুশোক, তাও মানুষ যেমন ভোলে, তেমনি ভাবে মৃত্যু-ভয়কেও সে ভুলে থাকে। না ভুললে চলে না তার। বেঁচে থাকাই তার সম্ভব হয় না।

কিন্তু ভয়টাকে এতটাই ভোলেনি সে যে, কলকাতার রাস্তার ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে বেড়াবে। দিনকরকে দেখবার জন্তে যাওয়া আসা করবে কেমন করে সে?

কিন্তু সুজনের নির্দ্দেশ অমান্ত করার কোনো কথাই উঠতে পারে না। আর এই অযাচিক স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ দিনকর তাঁর ইচ্ছার মূল্যও নির্ম্মলার কাছে সামান্ত নয়। অনেক ভেবে ঠিক করল রিক্স করে যাওয়া আসা করাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হবে। অবশ্য বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে বেলেঘাটা অনেকটা দূরের পথ, তাতে তার মাইনের টাকার একটা মোটা অংশ বেরিয়ে যাবে, তা যাক।

কিন্তু দেখা গেল, রিক্সও নিরাপদ নয়। একটা খবরের কাগজ মুখের সামনে ধরে সে সেটা পড়তে পড়তে চলেছিল প্রথম দিন, কিন্তু সেদিনই ধরা পড়ে গেল সে।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও ধর্ম্মসমন্বয়বাদ

সংগ্রামসিংহ তালুকদার

আজ এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে উনবিংশ শতকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। নির্দিষ্ট ধর্ম্মমার্গকে উপেক্ষা না করে বা চিরাচরিত সাধন-পদ্ধতিকে পরিহার না করে, সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সংসারাশ্রমের নীতি ও সংযম পালন করে সকল ধর্ম্মের সত্য সংগ্রহের যে নিষ্ঠা তিনি প্রচার করে গেছেন তাহা অপূর্ব্ব। এর ভিতরে তাঁর মৌলিকত্ব, সাধনলব্ধ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম নিষ্ঠা ও ভগবৎ প্রেম প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

এ বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে কিছু মুখ-বন্ধের প্রয়োজন মনে করি। এই যে ধর্ম্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা, সেটা তাঁর পূর্ব্বগামী আর কোন মহামানব দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল কিনা।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে ধর্ম্মসমন্বয়ের অদ্ভুত প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ সেকালে ভারতে তথা মহাভারতে আদর্শ মহামানব রূপে গণ্য ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদর্শবাদ তখন ভারতের জনগণের সমাজে, ধর্ম্মে ও রাষ্ট্রনীতিতে গ্রহণীয় হয়েছিল। যদিও সেই যুগে ইসলাম, বৌদ্ধ খ্রীশ্চিয়ান ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম ভারতে ছিল না, তবুও সনাতনধর্ম্মের ভিতরে বহুধা বিভক্ত সাধন-মার্গ তথা সাধন-সম্প্রদায়ের একে অপরের প্রতি বৈরীতা পোষণ করায় যেপ্রকার সামাজিক দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে ভারতে আত্মকলহের সৃষ্টি করেছিল, তাহা নিরাকরণের প্রচেষ্টায় তিনি সমন্বয়বাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। এইটাই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সবচাইতে উজ্জ্বলতম বা শ্রেষ্ঠতম দিক।

একটা কথা বোধহয় এখানে বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, আমাদের সমাজে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা আরাধনা করা হইয়াথাকি। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অপূর্ব্ব গুণাবলির বোধ হয় একটাও আমরা গ্রহণ করি নাই। শ্রদ্ধার আতিশয্যে তাঁকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছি। যে মহান আদর্শবাদে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র মহাসমুজ্জ্বল তার একটিও আমরা আমাদের জীবনে গ্রহণ করেছি কিনা সন্দেহ। এই ভারতে পূর্ব্বে ও পরে বহু মহামনীষীর আবির্ভাব হয়েছে। ধর্ম্মবাদের ভিতর দিয়েই বেশীর ভাগ মহামানবের আবির্ভাব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় সমাজ তাঁদের ঈশ্বরের পর্য্যায়ে সমাসীন করে নিজ নিজ আত্মতৃপ্তির যূপকাষ্ঠে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম আদর্শবাদের সকল সত্যকে বলিদান করেছে। তা যদি না হত তবে আধুনিককালে আমাদের সমাজে নীতিগত আদর্শহীনতার এমন মানসিক দৈন্য বোধহয় দেখতে হত না। যিশুখৃষ্টের আদর্শবাদ নিয়ে প্রায় অর্দ্ধ পৃথিবী নিজ নিজ সমাজকে যেভাবে নৈতিক মানে উন্নত করতে সচেষ্ট হয়েছে বা খৃষ্টানধর্ম্মের যে মূল্যায়ন জাতীয় জীবনে গ্রহণ করেছে, আমরা কিন্তু আমাদের ভারতে বহু মহামানবের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতীয় জীবনকে তেমন নীতিগত আদর্শের রজ্জুতে বন্ধন করতে পারি নাই।

যা হোক যে কথা বলছিলাম সেইখানে ফিরে যাই। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে পরিবেশ না করলে সুধিবৃন্দের অন্তরে ক্ষোভ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভোগ ও রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম-জীবন অতিশয় উন্নত ছিল। তিনি নিজে শৈব ছিলেন না কিন্তু শৈব মতে সাধনা করে কাম ও ক্রোধকে জয় করেছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে তাঁর দৈনন্দিন ধর্ম্মসাধন পদ্ধতির যে সুন্দর বর্ণনা আছে তা থেকে এইটাই প্রমাণিত হয় যে, সংসারে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের ভিতরে থেকেও পবিত্র ধর্ম্ম-জীবন যাপন করা যায় ও ঈশ্বর-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায়।

"ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জলস্পর্শ করতঃ, স্থির চিত্ত হইয়া, প্রকৃতির সেই অতীত পরমাত্মাকে ধ্যান করিলেন, যিনি এক স্বয়ং জ্যোতি, নিরুপাধি ক্ষয়াদিশূন্য আপনাতে অবস্থিতি পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকার কলুষ হইতে নিবৃত্ত ব্রহ্মনামে প্রসিদ্ধ, এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতুস্বরূপ আত্মশক্তি যোগে যাঁহার সত্তা ও আনন্দস্বরূপ লক্ষিত। অনন্তর নির্ম্মল জলে যথাবিধি স্নান পূর্ব্বক সোত্তরীয় বসন পরিধান করতঃ সান্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিলেন এবং অগ্নিতে আহুতিদান পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যোপাসনা সমাধা করিয়া পরমাত্মার কলা, দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বিপ্র ও বয়োবৃদ্ধগণকে অর্চ্চনা করিলেন। পট্টবস্ত্র মৃগচর্ম্ম ও তিলসহ সৎস্বভাবা, সুবর্ণ-মাণ্ডত শৃঙ্গা মৌক্তিক মালায় ভূষিতা বসনাচ্ছাদিতা, রৌপ্য-মাণ্ডত খুরবিশিষ্টা, দুগ্ধবতী প্রথম প্রসূতা নিয়মিত সংখ্যক গো-কুণ্ডলাদিভূষিত বিপ্রগণকে দান করিলেন। আত্ম-বিভূতি, গো, বিপ্র, দেবতা, বৃদ্ধ গুরু ও ভূত সকলকে নমস্কার পূর্ব্বক মঙ্গল দ্রব্য স্পর্শ করিলেন। তদনন্তর সেই নরলোক ভূষণ আপনার বসনভূষণ ও মল্যানুলেপনে আপনাকে ভূষিত করিলেন। ঘৃত, দর্পণ, গো, বৃষ, দ্বিজ, দেবতা সকলকে দর্শনপূর্ব্বক সকল জাতীয় পৌরজন এবং অন্তঃপুরচারিগণের যাহার যাহা অভিলষিত, তাহাদিগকে তাহা দিয়া এবং প্রজাগণকে তাহাদিগের কামনার বিষয়দানে সন্তুষ্ট করিয়া আপনি আনন্দিত হইলেন। স্রক, তাম্বূল এবং অনুলেপন অগ্রে বিপ্রগণকে তদনন্তর সুহৃদ অমাত্য প্রভৃতি এবং পত্নীগণকে ভাগ করিয়া দিয়া পরে আপনি গ্রহণ করিলেন। সেই সময় সারথি সুগ্রীবাদি চারিটি ঘোড়ায়-সংযুক্ত রথ আনয়ন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল, সারথির হাতে হাত দিয়া পর্ব্বতারোহী দিবা-করের ন্যায় সাত্যকি ও উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণ কারলেন। অন্তপুরস্থ নারীগণ সলজ্জ প্রেম-দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, অতি কষ্টে তাঁহাকে যাইতে দিলেন, তিনিও হাসিয়া তাঁহাদিগের মন হরণ করিলেন। সমুদায় বৃষ্ণিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত সুধর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ সভায় প্রবেশ করিলেন, যে সভায় প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের কামক্রোধাদির তরঙ্গ নিবৃত্ত হয়।"

তিনি দুইবার মহাকঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন ও আটটি বিষয়ে তাঁর নিকট হতে বর গ্রহণ করেন—ধর্ম্মে দৃঢ়ত্ব, যুদ্ধে শত্রু নিপাত, যশ, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব পরম বল, যোগ প্রিয়ত্ব, শিব সন্নিকর্ষ, শত শত পুত্র! কেবল এই পর্য্যন্তই নয়, ভগবতীর অনুরোধে আরও আটটি বর গ্রহণ করেন—দ্বিজ গণে অক্রোধ, পিতৃ প্রসন্নতা, শত পুত্র, উৎকৃষ্ট ভোগ, কুলে প্রীতি, মাতৃ প্রসন্নতা, শান্তি প্রাপ্তি ও দক্ষতা।

"ধর্ম্মে দৃঢ়ত্বং যুধি শত্রু ঘাতং যশস্ত আগ্র্যং পরমং বলঞ্চ।
যোগ প্রিয়ত্বং তব সন্নিকর্ষং বৃণে সুতানাঞ্চ শতং শতানি॥
মহাভা—অনু—১৫ অ, ২ শ্লোক
দ্বিজেস্বকোপং পিতৃতঃ প্রসাদং শতং সুতানাং
এবমঞ্চ ভোগম্।
কুলে প্রীতিং মাতৃতশ্চ প্রসাদং কাম প্রাপ্তিং প্রবৃণে
চাপি দাক্ষ্যম্॥
মহাভা—অনু—১৫ অ, ৬ শ্লোক।

বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মহাভারতের অন্তরাত্মা। এ চরিত্র বাদ দিলে মহাভারতের অঙ্গহানি হয়। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের বা জীবনের বিষয় জানতে হলে হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বনীয়। যে মহানত্ব, অতিমানবক শক্তি, অমিত তেজ, দুস্তর সাধনা ও ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য দ্বারা কৃষ্ণ চরিত্র বিভূষিত, তাহাই পরবর্ত্তিকালে গণ-মানসে তাঁকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করেছে। যে বিশ্বমৈত্রীর মহান আদর্শে কৃষ্ণ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কৈশোর থেকে সে-আদর্শ তিনি আমৃত্যু গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বমৈত্রির আদর্শ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের একমাত্র বীজ বা সূত্ররূপে আজিকার অত্যাধুনিককালেও গ্রহণীয়। পক্ষপাত-হীন উদার ধর্ম্মীয় দৃষ্টি যাহা সমাজনীতি রাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতিকে প্রভাবান্বিত করে ভারতে এক অকৃত্রিম জনমানস সৃষ্টির সহায়ক তাহা বিশ্বজনীন মহান্‌ অনুপ্রেরণায় পর্য্যবসিত হয়ে এক ধর্ম্মের অর্থাৎ একই ঈশ্বরের উপাসনায় জগজনকে

উদ্বোধিত করতে মানব-জীবনে কাম ও ক্রোধের মতন বলশালী রিপু আর নাই। এই দুই রিপুজয় সাধারণ মানবের পক্ষে সাধ্যাতীত। সাধারণ মানব কেন বলি, অনেক যোগী ঋষির জীবনে কাম ক্রোধকে জয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণ কাম ও ক্রোধ জয় করবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। এ তপস্যায় যে তিনি সিদ্ধি-লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাই অনেক জায়গায়। তিনি যুবতী ও সুন্দরী গোপী কন্যাগণের সঙ্গে নিরত নানা প্রকার রস-রঙ্গে মত্ত হয়েও কামের প্রভাব হতে মুক্ত ছিলেন। তাঁর ভিতরে যদি বিশুদ্ধ প্রেমের ভাব না থাকত তবে গোপী কন্যাগণের ভিতরে আমরা কি বিশুদ্ধ ভাবের আশা করতে করতে পারতাম? তাঁর প্রেম বৈরাগ্যের দ্বারা অনুরঞ্জিত ছিল। উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় তাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের এক জায়গায় লিখেছেন :—

"যেখানে বৈরাগ্য অর্থাৎ আত্মসুখের প্রতি অনুমাত্র দৃষ্টি নাই সেখানেই প্রেম, সেখানেই যথার্থ প্রেম থাকিতে পারে। যেখানে বৈরাগ্য নাই, আত্মসুখ কামনা আছে, সেখানে প্রেম নাই, প্রেমের আড়ম্বর আছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপ-কন্যাগণের প্রতি বৈরাগ্যবৃত প্রীতি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপ কন্যাগণের আত্মসুখ বাঞ্ছা বিরহিত অনুরাগ এই দুইই অতি বিশুদ্ধ ভাব উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে যে ভাবোন্মেষ হইয়াছিল, তাহা তৎপ্রচারিত নব ধর্ম্মের মূলে ছিল, ইহা যাঁহারা তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বাগ্রে প্রতিভাত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম পৃঃ ৫২-৫৩

তাঁর ক্রোধ জয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহার গৃহে মহামুনি দুর্ব্বাশার অবস্থান, রুক্মিনীকে বেত্রাঘাত ও শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব শরীরে পায়সান্ন অনুলেপন ও নানা প্রকার অত্যাচার। তিনি যদি নিজ জীবনে কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর প্রভাব মুক্ত না হতেন তবে তাঁর পক্ষে অর্জুনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিম্নরূপ উপদেশ দেওয়া সম্ভব হত না—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ!
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গীতা—৬২-৬৩।২

"বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে আসক্তি হয়; আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ জন্মায়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হইয়া থাকে, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগী ছিলেন। যোগপ্রভাব ব্যতীত চরিত্র সংশোধন ও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান সম্ভবপর নয়। কিন্তু তিনি কখনও হঠযোগ ইত্যাদির অভ্যাস নিজেও করেন নাই বা সেইরূপ কাহাকেও উপদেশাদি প্রদান করেন নাই।

"প্রশান্ত মনসং হ্যেনং যোগীনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥"

রজোগুণ নিবৃত্ত হইলে যোগীর মন প্রশান্ত হয়, মন প্রশান্ত হইলে নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত হইয়া তিনি উত্তম সুখ লাভ করেন।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগত কল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শ মত্যন্তং সুখ মশ্নুতে॥"

গীতা ৬।২৮

"যোগী এইরূপে আত্ম সমাধান করত পাপশূন্য হন এবং সহজে ব্রহ্ম স্পর্শ জনিত অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।"

উপরি উক্ত উপদেশে এই প্রমাণ হয় যে তিনি ধ্যান-যোগের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিচিত্র সমাহার করে বিভিন্নমার্গীয় সাধনধারায় অনুরক্ত পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মমণ্ডলগুলিকে এক মহাসমন্বয় সূত্রে আবদ্ধ করবার প্রয়াস করেছিলেন। বৈদিকদিগের কর্ম্মমার্গ, বৈদান্তিকদিগের জ্ঞানমার্গ, শৈবদিগের যোগমার্গ ও পৌরাণিকদিগের ভক্তিমার্গ ও ইহাদের দ্বারা সমাজের ভিতরে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের দ্বারা যে বিভেদ সৃষ্ট হয়েছিল সে সকলকে তিনি এক আদর্শের অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীতির আদর্শবাদে দীক্ষিত করবার জন্য নিজের উন্নত জীবনাদর্শ সকলের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেছিলেন।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ম্॥

গীতা ৪।১৩

"গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃজন করিয়াছি; যদিও আমিই সেই বিভাগের কর্ত্তা তথাপি আমায় অকর্ত্তা ও বিকার রহিত বলিয়া জান।"

অর্থাৎ বিকাররহিত যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বজন পূজ্য। তাঁহার কোনও বর্ণভেদ নাই। তিনি এক ও অভেদ এবং কোনও বর্ণের দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হন না।

এক জায়গায় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় লিখেছেন; সত্ত্ব রজ ও তমো গুণানুসারে লোকের প্রকৃতি ভিন্ন হয় এবং নিগুর্ণ ধর্ম্মে সুদৃঢ় না হইলে, সে প্রকৃতি কখনও জয় করিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ ইহা আপনার মতের একটি প্রধান অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন: তিনি জানিতেন, যতদিন লোক প্রকৃতিকে জয় করিতে পারিবে না ততদিন তাহাকে কোনও প্রকার প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে বলপূর্ব্বক মুক্ত করা যাইতে পারে না। তিনি এ সম্বন্ধে এতদূর দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ দিন দিন অবিনয়ী হইতে চলিল, অথচ তিনি তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক প্রতিরুদ্ধ করিলেন না।"

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম পৃ-২৭৬

যদিও শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বৃন্দাবনে তাহার ভাবী জীবনের মূলতত্ত্ব আপনার অন্তরেই উপলব্ধি করেছিলেন তবুও তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিদের নিকটে উপযুক্ত শাস্ত্র শিক্ষা করে সর্ব্ব শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েছিলেন।

"তদ্বৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়োক্তো বাচা জিগাস স এব বভূব।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩ ।১৭।৬

"আঙ্গিরস বংশোৎপন্ন ঘোর ঋষি দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষজ্ঞ বিষয়ে উপদেশ দান করেন।"

আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে উপদেশ দান করেন তখন তিনি নিজেকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন মনে করেন নাই। এ দৃষ্টান্ত আমরা বৈদান্তিক যুগে বহু ব্রহ্মকল্প ঋষিদিগের জীবনেও দেখতে পাই। তাঁরা যখন ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করতেন তখন নিজেদের ব্রহ্মভূত মনে করতেন। মহর্ষি ঈশার জীবনেও আমরা এর প্রমাণ পাই। তিনি বলতেন "যে আমায় দেখিয়াছে সে আমার পিতাকে দেখিয়াছে।'

যা হোক শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বলতে গেলে একটি বিরাট পর্ব্বের অবতারণা করতে হয়। তাঁর চরিত্রের বিশেষ বিশেষ অংশের অতি সামান্য যা কিছু উল্লেখ করা গেল তাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি এক বিরাট পুরুষ রূপে অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মসংস্কার, ধর্ম্মসমন্বয় ও বিশুদ্ধ ঈশ্বরার্পিত নবধর্ম্ম সংস্থাপনের মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে মহা সমন্বয় সাধনে তিনি ব্রতী ছিলেন সেই চারি মার্গই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ। যত সাধু মহাত্মা এই জগতে ঈশ্বরানুসন্ধান করে সিদ্ধিলাভ করে গেছেন ও অনাগত দিনে যাঁরা সেই পথে অগ্রসর হবেন তাঁদের উক্ত চারি মার্গ ভিন্ন অন্য পথ নাই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যোগেতে ঈশ্বর লাভ হয়, ভক্তিতে হয়, কর্ম্মেতে হয় ও জ্ঞানেতেও হয়। যে কোনও একটা মার্গ অবলম্বন করলেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হবে। অভ্যাসের দ্বারা যে কোনও একটা মার্গ অবলম্বন করলে মনুষ্যের অবিলম্বে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বললেন, যোগ ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান চারিটিই আমার প্রয়োজন। যোগের রজ্জুতে তাঁকে বাঁধতে হবে, ভক্তিতে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে হবে, তা হলে কর্ম্ম বিশুদ্ধ হবে ও কর্ম্ম বিশুদ্ধ হলে জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হবে। আর এই যোগ ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান রূপ চারি মার্গের বিভিন্ন পথে যে সকল সাধু মহাত্মাগণ অগ্রসর হয়ে ঈশ্বরানুভূতি লাভ করে গেছেন তাঁদের জীবনের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতায় নিজেকে অভিষিক্ত করতে হবে তবেই বিভিন্ন মার্গের যে সকল বহিরাঙ্গিক গণ্ডি যা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পথে বাধাস্বরূপ তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে ও সকল ধর্ম্মের বা সকল পথের যে সম্যক সাধনধারা বা সত্য নিজ অন্তরে প্রতিভাত হবে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যেমন আমরা দেখতে পাই, বিষয়-কর্ম্মের ভিতরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ও জটিল রাজকার্য্যের ভিতরেও সুশৃঙ্খল ভগবৎ-সমর্পিত নিষ্ঠা তেমনি ব্রহ্মানন্দের নবসংহিতায় আমরা দেখতে পাই, গৃহীর সকল বিষয়কর্ম্মের ভিতরে ব্রহ্মে নিষ্ঠা। তিনি নবসংহিতায় বলেছেন—

"রাজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশস্থ আমাদের সমাজগুলির এবং স্বর্গীয় বিধানের একনিষ্ঠ ভক্তগণের সকল প্রকার সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে নিজেদের পরিচালনার্থ ও অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়মিত করণার্থ এই বিধি স্বীকার ও গ্রহণ করা উচিত। এই সংহিতাকে নূতন জড় সংহিতা হইতে দিও না। ইহা অভ্রান্ত শাস্ত্র নহে, ইহা আমাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থও নহে। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের নূতন মণ্ডলীর আর্য্যদিগের জাতীয় বিধি যাহাতে নববিধানের বিশেষ ভাব সামাজিক জীবনে প্রয়োগের প্রথা নিবদ্ধ আছে। ইহা ঈশ্বরপ্রদত্ত নৈতিক বিধির সার যাহা নব্য হিন্দুদিগের বিশেষ অভাব ও গঠনের উপযোগী এবং তাহাদের জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের নব ধর্ম্ম মণ্ডলীর প্রতি স্বর্গের এই পবিত্র অনুজ্ঞা গ্রহণীয় আকস্মিক নহে। পবিত্রমণ্ডলীর অনুজ্ঞা পালন করিতে ভারতবর্ষে কতজন প্রস্তুত? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগকে দলে দলে অগ্রসর হইতে দাও এবং শুধু মত ও বিশ্বাসে নহে সুনিয়ন্ত্রিত ভিত্তিতে স্থাপিত বিধিদ্বারা তাঁহাদের দৈনিক জীবনে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দাও। এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক বিধি এক অভিষেক, এক গৃহ—আমাদিগকে ভ্রাতৃত্বের মহামিলনে আবদ্ধ করিবে। তাহার বিরুদ্ধে কোন শত্রু জয়যুক্ত হইতে পারিবে না এবং পাপের সকল শক্তি শেষে পরাভূত হইবে। উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, আমাদের ভ্রাতাদিগকে প্রস্তুত হইতে দাও।'

সামাজিক ও সাংসারিক প্রতিটি অধ্যায়—যথা বাসভবন, দেবালয়ে উপাসনা, প্রাত্যহিক ভোজন, বিষয় কর্ম্ম, আমোদ সম্ভোগ, অধ্যয়ন দাতব্য, স্বজনবর্গ ভ্রাতাভগ্নী স্বামী ও স্ত্রী, দাস দাসী, নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, জাতকর্ম্ম নামকরণ, দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শ্রাদ্ধ ব্রতগ্রহণ রিপুসংহার ব্রত বালক বালিকাদের চিত্রসাধন ব্রত, অধ্যাত্মিক উদ্বাহ ব্রত, চিরকৌমার ব্রত, সাধক ব্রত, গৃহস্থ বৈরাগীর ব্রত ও ধর্ম্ম প্রচারকের ব্রত—অর্থাৎ এক কথায়—

"ব্রহ্মনিষ্ঠা গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোনও কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মতে সমর্পণ করিবেন।

এখানে গীতার সেই অমর উক্তি মনে পড়ছে—

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্যমচ্চিত্তঃ সততংভব—।।
গীতা ১৮।৫৭

চিত্তযোগে সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক নিরন্তর মচ্চিত্ত হও।

ব্রহ্মানন্দের' নববিধানের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নবধর্ম্মের এক মহা আত্মিক বা একাত্মিক যোগ পরিলক্ষিত হয়। যে সমন্বয়ের আদর্শে শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের বিভিন্ন মার্গীয় সম্প্রদায়কে একেশ্বরের সাধনে আহ্বান করেছিলেন ব্রহ্মানন্দের জীবনেও সেই আদর্শের মহাবিস্তার দেখতে পাই।

ব্রহ্মানন্দের সমন্বয়বাদের বৈশিষ্ট্য হল সকল ধর্মের মূলতত্ত্ব ও সত্য উদ্ঘাটন ও সেই উদ্ঘাটিত সত্যসকল একীভূত করে এক ধর্মের গণ্ডিতে বিশ্বমৈত্রী। ব্রহ্মানন্দের synthesis of Religions হচ্ছে একেশ্বর তত্ত্ব। খৃষ্টের 'our Father" মোহম্মদের "আল্লাহো আকবর" ও সনাতন হিন্দু ঋষিদের—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" "কাউকে ছেড়ে নয়—সকলকে গ্রহণ করে। সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সেই এক পরমেশ্বরের পূজায় আত্মনিয়োগ। সত্যের যে ধারা যা মানব সমাজে গ্রহণীয় হয়েছে ও যেসকল সত্য ভবিষ্যতে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে আমাদের নিকট প্রতিভাত হবে সেই সকল সত্যকে গ্রহণ করাই "নববিধানের' আদর্শ। রাজনীতি বল, সমাজনীতি বল, ধর্ম্মনীতি বল, সকল নীতির মূলে এক ব্রহ্ম-নীতি—ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরে প্রীতি উপজাত না হলে মানবজীবনে উদারদৃষ্টি লাভ হয় না ও সেই উদারদৃষ্টি না জাগলে সকল নীতি দুর্নীতির পর্য্যায়ে পরিগণিত হয়। তাতে সামাজিক-জীবন বা জাতীয়-জীবনে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, মানবজীবনাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয় ও সে ইতর জীবের ন্যায় সংসারে বিচরণ করে—।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অবসাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে যে সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করেছিলেন যা "শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা" রূপে সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত তার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের যোগ ও ভক্তিবিষয়ক উপদেশাদি যা তাঁর "ব্রহ্মগীতোপনিষদ্‌ "নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। ব্রহ্মানন্দ সাধু অঘোর নাথকে "যোগ" ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে "ভক্তি"র পথে দীক্ষা ও উপদেশাদি প্রদান করেন।

"মিথ্যাবাদী কামী ক্রোধী লোভী স্বার্থপর, ইহাদের যোগে অধিকার নাই —। পৃথিবীর মধ্যে সার কর্ম্ম, মন দমন করা। হৃদয়কে প্রস্তুতি করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একজন 'যোগ' একজন "ভক্তি" সাধন কর—। প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরা জাননা, আমিও জানিনা।"

ব্রহ্মগীতোপনিষদ পৃ—৩।

"যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে: তাহার যখন ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহে ও কর্ম্মেতে আসক্তি হয় না তখন তাহাকে যোগারূঢ় বলা যায়—। যে ব্যক্তি আপনি আপনাকে জয় করিয়াছে সে আপনি আপনার বন্ধু।"

গীতা অ ষষ্ঠ ৪-৫

"হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ভক্তি—। কোন্ প্রকারের পদার্থ অবলম্বন করিয়া ভক্তি উদিত হয়, সত্যং শিবং সুন্দরং পদার্থ। সেইখানে, যেখানে একজন পুরুষ, যিনি সৎ, মঙ্গল ও সুন্দর তাঁহাতে অর্পিত হইয়াছে। যিনি সৎ মঙ্গলময় ও সুন্দর তিনি হৃদয়কে টানেন।"

ব্রহ্মগীতোপনিষদ্‌ পৃঃ ৯

"যোগী চিত্তযোগে দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। সেই সর্ব্বজ্ঞ অনাদিসিদ্ধ শাস্তা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য বর্ণ এবং অন্ধকারের অতীত দিব্য পুরুষকে—যোগী ভক্তি-যুক্ত হইয়া অনন্যমনে ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হন।"

গীতা অ অষ্টম-৮·৯

"অনন্য ভক্তিতে সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়—যাঁর, অন্তঃস্থ সমুদয় ভূত এবং যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।"

গীতা অ অষ্টম-১৪

"জ্ঞান ভাব ও কার্য্যে আমাদিগের ঈশ্বর হইতে যে দূরতা উহাই এইরূপ সাধনের দ্বারা নিরস্ত হয়। এইরূপে ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে দূরত্ব চলিয়া গিয়া ঈশ্বর ও জীবাত্মার একত্ব উপস্থিত হয়, এই একত্ব বা মিলনই যোগ—।"

ব্রহ্মগীতোপনিষদ্‌ পৃঃ ১১

"প্রশান্তচিত্ত এবং ভয় শূন্য হইয়া ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিতিপূর্ব্বক মন সংযত করতঃ মচ্চিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইবে।"

গীতা অ ষষ্ঠ -১৪

"সংযতমনা যোগী এইরূপে সর্ব্বদা আত্মসমাধান করতঃ আমাতে স্থিতিরূপ নির্ব্বাণপ্রধান শান্তি লাভ করেন।

গীতা অ ষষ্ঠ-১৫

"যোগী যাহা দেখেন, তাহারই মধ্যে ঈশ্বরকে দেখেন। সংসারীর পক্ষে সংসারের নানা প্রকার কাজ নিকৃষ্ট-ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যোগীর পক্ষে সমুদয়ই ব্রহ্মের ব্যাপার, সমুদয়ই ঈশ্বরের হস্তরচিত, সকলস্থান ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ—। "

ব্রহ্মগীতোপনিষদ-পৃ ৫৭

বাহিরে আসিলেও দেখিবে সেই অন্তরস্থ নিরাকার ঈশ্বর সামনে আছেন, সংসার মধ্যে বেড়াচ্ছেন কাজ করছেন। এইরূপে সংসারের সমুদায় ব্যাপারের ভিতর থেকেও যোগী ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করেন।"

ব্রহ্ম গীতোপনিষদ পৃ ৫৮

"নদী সকল সমুদ্রে জল ঢালে, অথচ সমুদ্র যেমন কখনও বেলা উল্লঙ্ঘন করে না, পুনরায় নূতন জল আসিয়া উহাতে প্রবেশ করে সেইরূপ কামনার বিষয় সমূহ যাহাতে প্রবেশ করে (অথচ বিকারগ্রস্ত হয়না) সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করে, ভোগ কামনাশীল নহে। যে ব্যক্তি কামনার বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মম নিস্পৃহ নির-

হকার হইয়া বিচরণ করে, সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করে—। ইহাকেই ব্রহ্মে স্থিতি বলে, ইহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর মোহপ্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুকালেও ইহাতে স্থিতি করিয়া সে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে।"

গীতা-অ দ্বিতীয়-৭০, ৭১, ৭২

ভক্তির হেতু নাই……ষোল আনা না দিলে পাবে না; কিন্তু দিলেই যে পাবে তাহা নহে। দিলে এই হবে, যাহারা পাওয়ার অধিকারী তাহাদের মধ্যে গণ্য হইবে। সেই পথে চলিতে চলিতে অবশেষে সেই পিছল জায়গায় গিয়া পড়িবে, সেখান হইতে সহজে ভক্তির সাগরে ডুবিয়া যাইবে।…

ভক্তিশাস্ত্রে নিরাশা মহাশত্রু। ভক্তি আসিতে দেরী হইলে নিরাশ হইবে না, খুব ব্যাকুল হইবে। এত ব্যাকুল হৃদয় যখন তখন ভক্তি আসিবেই। তবে ভক্তি হওয়াতেও লাভ না হওয়াতেও লাভ। যখন না আসে তার অর্থ এই যে, অত্যন্ত আসিবে। তোমার মন সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিবে। তুমি বলিবে এই যে সাতটা বাজিল, কৈ ঠাকুর দেখা দিলেন না? এই ছয়টা বাজিল ঠাকুর কোথায় রহিলেন? এই দশটা বাজিল কৈ ঠাকুর ত আসিলেন না? তুমি এইরূপে কেবল তাঁকে অন্বেষণ করিবে। তোমার যাহা করিবার তুমি কর, তাঁহার সময়ে তিনি আসিবেন।"

ব্রহ্ম গীতোপনিষদ পৃঃ ৬৮-৬৯

"যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোগ কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দাও যাহা কিছু তপস্যা কর সে সমুদায় আমায় অর্পণ কর।"

গীতা অ নবম-২৭

"মচ্চিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, আমাকেই যজনা কর, আমায় নমস্কার কর। মৎপরায়ণ হইয়া আত্মসমাধান পূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।"

গীতা অ-নবম-৩৪

যেমন ব্রহ্মদর্শন ক্রমাগত উজ্জ্বলতর হয় সেইরূপ ক্রমশঃ সাধন দ্বারা জগতের অসারতা স্পষ্টতর রূপে বুঝিতে পারিবে। সহস্রলোক বলিবে জগৎ অসার; কিন্তু সহস্রের মধ্যে হয়ত একজন লোকে দেখে জগৎ অসার। বুদ্ধিগত বৈরাগ্যের দ্বারা এমনি নিশ্চিতরূপে জগৎকে অসার শ্মশান বলিয়া চলিয়া যাও যে আর যেন এখানে ফিরিয়া আসিতে না হয় এবং হৃদয়গত বৈরাগ্যের দ্বারা সংসারের প্রতি অনুরাগবিহীন হও ও অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব কর।"

ব্রহ্ম গীতোপনিষদ পৃ ৮৭

"মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও অতি অল্প ব্যক্তি ঈশ্বরকে তত্ত্বত জানিয়া থাকেন।"

গীতা অ-সপ্তম-৩

"তুমি যখন তোমার বুদ্ধির দ্বারা মোহদুর্গ অতিক্রম করিবে, তখন তোমার শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ তোমার তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে।"

গীতা অ-দ্বিতীয়-৫২

"সুস্থতা এবং প্রাণ রক্ষা করিয়া তপস্যার দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিবে। যেমন গম্য স্থানে যাইবার জন্য রথারোহণ, সেইরূপ একাগ্রতা, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং উচ্চ যোগবল ইত্যাদি অভীষ্ট লাভ করিবার জন্য তপস্যা অবলম্বন করিবে। যেমন গৃহ নির্ম্মিত হইলে আর বাঁশের ভারার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আর তপস্যার প্রয়োজন থাকে না।" ব্রহ্মগীতোপনিষদ পৃঃ ১০১

"কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে সংযত করতঃ অনাসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মযোগের অর্থাৎ যোগের অনুষ্ঠান করে সেই বিশিষ্ট যোগী।"

গীতা-অ তৃতীয়-৬-৭

"যে মানব আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাহার করিবার কিছুই নাই।"

গীতা অ। তৃতীয়-১৭

"অহঙ্কার এবং ধনগর্ব্ব থাকিলে পরের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যায়…ঈশ্বর আসিলেন, ইহার অর্থ সে ভক্ত বিনয়ী,

দীন এবং দয়াবান্ হইলেন। জ্ঞানেতে মানুষ আপনাকে বড় দেখে, ভক্তিতে আপনাকে ছোট দেখে।"

ব্রহ্ম গীতোপনিষদ পৃঃ ১০৫

"ক্রমে ভক্তি-কাচের গুণ যত বাড়িবে, সেই পরিমাণে আপনাকে, আরও ক্ষুদ্র দেখাইবে। যতই ভক্তি বাড়ে ততই দীনাত্মা হন, এবং ভক্তের হৃদয় সমস্ত জগতের বাসস্থান হয়। যদি বল একটি সর্ষপের ন্যায় মনুষ্য-হৃদয়, কোটি কোটি মনুষ্য পৃথিবীতে বাস করে, তবে একটি ক্ষুদ্র হৃদয় কিরূপে এতবড় জগতের বাসস্থান হইবে? হাঁ, ইহা সম্ভব। ভক্তির উদয়ে যখন সেই সর্ষপবৎ আমিত্ব নির্ব্বাপিত হয় তখন ঈশ্বর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ঈশ্বর আসিলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ আসে। যে আমিত্ব ব্যবধান অথবা প্রাচীর ছিল, তাহা দূর হইল। ভক্তের হৃদয় জগতের মঙ্গলের জন্য, জীবের প্রতি ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রেম ধারণ করিবার জন্য প্রকাণ্ড আধার হইল। ঈশ্বরের প্রেম ভক্তের ভিতর দিয়া জগতের উপকার করিতে লাগিল।"

ব্রহ্মগীতোপনিষদ পৃঃ ১০৬

"যোগেতে যিনি যুক্তাত্মা হইয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইয়াছে। তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। সর্ব্বভূতস্থ আমায় যে একত্ব অবলম্বন করিয়া ভজনা করে সে সর্ব্বদা আমাতেই বর্ত্তমান থাকে।" গীতা অ। ষষ্ঠ ২৯-৩১

"যত পৃথিবীর অসারতা বুঝিবে তত ব্রহ্মের সারতা অনুভব করিবে যত বাহিরের অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইবে তত ভিতরের আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে। এই যে বৈরাগ্য, ইহা অপদার্থ হইতে পদার্থে গমন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য যাহা পদার্থ হইতে অপদার্থে গমন তাহাই শ্রেষ্ঠ। যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ। পদার্থ হইতে অপদার্থে গতি সে কিরূপ? পদার্থ পাইয়াছি বলিয়া অপদার্থ ভাল লাগে না। প্রথম প্রকার বৈরাগ্য হইল, বিষয়-রসে মন তৃপ্ত হয় না বলিয়া, সংসার ভাল লাগেনা বলিয়া যিনি বিষয়ের অতীত তার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া। দ্বিতীয় প্রকার বৈরাগ্য, ঈশ্বরকে পাইয় পূর্ণকাম হইয়াছি বলিয়া আর বিষয়সুখ ভোগের বাঞ্ছ নাই।" ব্রহ্ম গীতোপনিষদ পৃঃ ১১৬

"নিরাহার দেহীর ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু ভিতরে তৎপ্রতি অভিলাষের নিবৃত্তি হয় না; উহা বিষয়ের অতীত আত্মাকে দর্শন করিলে নিবৃত্তি হয়।" গীতা-অ। দ্বিতীয়-৫৯

"যদি জ্ঞান চৈতন্য না থাকে, তবে বিমোহিত হইবে কি? অতএব অচৈতন্য ভক্ত হয় না। চৈতন্য আধারে ভক্তি হয়। অচৈতন্য অবস্থায় ভক্তি অসম্ভব। যেখানে চেতন পুরুষ, সেখানে ভক্তি সম্ভব। পাগরে ভক্তিভাব হয় না। মোহিত হওয়া, মূৰ্চ্ছিত হওয়া এক নহে। নিদ্রা, স্বপ্ন, মূর্চ্ছা কোনও প্রকার অচেতন অবস্থায় ভক্তির মত্ততা হয় না। কেবল হৃদয় ভক্তির আধার নহে, সমস্ত জীবন ভক্তির মত্ততার আধার! প্রকৃত মত্ততায় কেবল হৃদয় নহে, সমস্ত জীবন মধুময় হয়। জল যদি বৃক্ষের শাখায় প্রদান কর, তাহা সমস্ত বৃক্ষকে পরিপোষণ করিতে পারে না; কিন্তু যে জল বৃক্ষের মূলদেশে সিক্ত হয় তাহা শাখা প্রশাখা পল্লবাদিপূর্ণ সমস্ত বৃক্ষকে পরিপুষ্ট এবং সতেজ করে।"

ব্রহ্ম গীতোপনিষদ পৃঃ ১১৯

"ভক্তির দ্বারা আমি যে পরিমাণ, পরম ভক্ত— তত্ত্বতঃ তাহা জানিতে পারে, তৎপর তত্ত্বতঃ জানিয়া, জ্ঞানান্তর আমাতে প্রবেশ করে।"

গীতা অ। অষ্টাদশ-৫৫

"ব্রহ্মসহ অভিন্ন হইয়া যোগী প্রসন্নচিত্ত হয়, শোক আকাঙ্খা করে না, সমুদায় ভূতেতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রতি পরা ভক্তি লাভ করে।"

গীতা অ। অষ্টাদশ-৫৪

ব্রহ্মানন্দের জীবন বেদে একজায়গায় পাই—

"যখন শিখিয়াছি তখনও আমি শিষ্য, যখন শিখাইয়াছি তখনও আমি শিষ্য। পাঁচজনের সঙ্গে সাধন করিয়া তত্ত্ব সঞ্চয় করি; হৃদয়ের মধ্যে সত্য রত্ন পাইলেই

আহ্লাদ হয়। মনে হয় সৌভাগ্যবশতঃ মেদিনীতে আসিয়াছি ; মনুষ্য জীবন সৌভাগ্যের জীবন।"

জীবন-বেদ-শিষ্য প্রভৃতি পৃঃ ১৪৩

"কি ভক্তি সম্বন্ধে, কি ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে শিক্ষার অন্ত হইল না। সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় কিরূপে হয় এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রমুখাৎ কত আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি, তত্রাপি ফুরাইল না। গুরু যার জাগ্রত জগত গুরু, তার শিক্ষার অভাব কি? সামান্য গুরুর নিকট ছাত্র হই নাই। আমার গুরু জগত গুরু।"

জীবন-বেদ-শিষ্য প্রভৃতি-পৃঃ ১৪৬

"শরীর হইতে শ্রোতার শরীরে সত্যলাভের বল ও প্রভাব সঞ্চারিত হয়। আমার আত্মায় সত্য আসিলেই সত্য অন্যের হইবে। আমার নিকট সত্য ঘোষিত হইলে নিশ্চয়ই সেই সত্য শঙ্খ ঘণ্টা সহকারে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে।"

জীবন বেদ শিষ্য প্রভৃতি পৃঃ ১৪৯

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে মনুষ্য-সমাজে সুসভ্য জাতি সকলের মধ্যে প্রচারিত ও আচরিত সকল ধর্ম্মের অন্তর্হিত ভাবধারার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রচারিত ধর্ম্মের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। বহিরাঙ্গিক কষ্টকল্পনাকে বাদ দিয়ে নিগূঢ় সত্যের যে সকল ফল্গুধারা মানব-অন্তরে নিয়ত প্রবাহিত তার গতি ও প্রকৃতি এক। সেই সকল সত্যকে উপলব্ধি ও প্রচারের দ্বারা মহামিলন সাধন সম্ভব। মানব দেহ যেমন প্রকৃতিগত সমউপাদানে গঠিত, দেহ ও মনের ভাব অভাব গতি ও প্রকৃতি আশা আকাঙ্খা যখন সেই একই রূপ তবে আত্মার উন্নতি কল্পে যেসকল পদ্ধতি ও ভাবের অনুশীলন প্রয়োজন, সেগুলি কেন সকলের পক্ষে একরূপতা লাভ করবে না। সমন্বয়বাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে সত্য অন্বেষণের ও অন্বেষিত সত্য সকলকে প্রচারের মাধ্যমে, সকল মানবের কল্যাণকর ও মঙ্গলদায়ক শাশ্বত শান্তি প্রদান।

সত্যং শিবং সুন্দরং

গভরমেণ্ট আর্ট কলেজে গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনী

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

আজকের অনুষ্ঠানে জন্মোৎসবের যোগ থাকিলেও স্মৃতি অভিযোগের কাহিনী টেনে আনছে, তাই গোড়াতেই রসিকের তরফ নিয়ে দুঃখের কথা বলে ফেলি। আজ যে-মহাশিল্পীর অঙ্কিত চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁহার সৃজন-শক্তি চাক্ষুষ করার সুবিধা পেয়েছি, তাঁহার নামও বোধ হয় বহু নবীন শিল্পীর জানা নেই। এইরূপ ধারণা ভিত্তিহীন নয়, কারণ আমাদের বহু সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপীঠে বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী পড়ান হয়, তাঁহাদের নাম ধাম জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ মুখস্থ করান হয়, শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জ্জনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাবার জন্য। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করলে কীর্ত্তিমান পড়ুয়াকে লোকে বলে, পাশ করা ছেলে, জ্ঞান বুদ্ধিতে পাকা বটে। কিন্তু বুদ্ধিমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, দেশের কয়েকজন কলাবিদ্ গুণীর নাম করত। তাহলে বেচারা ফাঁপড়ে পড়ে যাবে। কলা-চর্চ্চা যে শিক্ষার কেন্দ্রে স্বীকৃতির উপযুক্ত গুণ হতে পারে, এমন কথা পাঠ্য-পুস্তকে সে কখন পড়ে নি। পড়ার কথাও নয়, কারণ যাঁহারা শিক্ষক তাঁহারাই এইরূপ অশোভনীয় অভিজ্ঞতা পাশ কাটিয়ে এসেছেন, তথাপি কৃষ্টির আলোচনায় তাঁহারা পিছপাও নন।

যাইহোক পুরাতন পরিবেশের কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছে।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে শিল্পী অবহেলার প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পাবে। তবে ভবিষ্যতের দিকে এগুবার আগেই আকস্মিক রস-চেতনা উত্তেজিত হবার ফলে টাটকা আমদানী ফ্যাসানের আকর্ষণ আমাদের ভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে এনে ফেলেছে, যেখানে ঝড়ো হাওয়ার প্রবল শক্তি নানা প্রভাব টেনে আনছে নবীন শিল্পীর নিরীহ মনকে বশীকরণ মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য। নবাগত বিভিন্ন প্রভাবের মধ্যেও কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে, রূপসৃষ্টির পথ-নির্দেশ সম্বন্ধে কে আগে আদর্শের শেষ কথা বলবে, তারই দাবী নিয়ে।

নতুন প্রভাবের মধ্যে যেসব আদর্শবাদী রুখে উঠেছেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ইজম্ মন্ত্রের প্রচারক। ইজম-আদর্শের আনুগত্যে যাঁহারা প্রগতিশীল চিন্তার দাবী করেন, তাঁহাদের সুচিন্তিত বিচারে, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের মত বিরাট রূপস্রষ্টাদেরও out model-এর ছাপ দিয়ে বাতিলের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল আগে গগনেন্দ্রনাথই তাঁহার রূপসৃষ্টির কারখানায় কিউবিজমকে ডেকে আনেন। বিদেশী জ্যামিতিক ফরমায় ফেলা রূপ-গঠনের কৌশলকে তিনি এমন ভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, জটিলকে শাসন দ্বারা সহজ করার পন্থা এমন ভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশভঙ্গীকে হেঁয়ালীর ঘোর-প্যাচ ধরে রাখতে পারে নি।

তাই কেনর প্রশ্নে কুতূহলীকে বিব্রত হতে হয় নি। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়, অতি আধুনিক ভবিষ্যৎদর্শী শিল্পীদের পথপ্রদর্শক ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। ছবিকে যদি উচ্ছ্বাসের বার্ত্তা-বাহক বলে মানতে পারা যায়, তা হলে রূপপরিকল্পনার বাহ্যিক প্রকাশকে উদ্দেশ্যমূলক বলে স্বীকার করতে হয়। উদ্দেশ্যের প্রধান কাম্য থাকে বক্তব্যকে সহজবোধ্য করে উপযুক্ত রসগ্রাহীর কাছে পৌছিয়ে দেয়া। উদ্দেশ্যমূলক কথাটা চিন্তা করেই বলেছি কারণ উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম বাতুল অথবা নিতান্ত শিশুর পক্ষে সম্ভব। বাতুল আপন মনে কথা বলে, কিন্তু বলার পিছনে সচেতন মনের চিন্তা থাকে না কারণ বক্তা যা বলে তার অর্থ বা উদ্দেশ্য সে নিজেই জানে না এবং সে

প্রত্যাশাও করে না যে, বক্তব্যকে বোঝার জন্ত কেহ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রলাপের বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে, নয় মনস্তত্বের বিশ্লেষণে পারদর্শী হতে হয়, অথবা বোঝার চেষ্টায় সুস্থ মনকে বিকৃতির দিকে এগিয়ে দিতে হয়।

ছবি দেখা ও বোঝার নির্দেশ নিয়ে ইতিমধ্যে পণ্ডিতরা অনেক আলোচনা করে ফেলেছেন। ঘরোয়ানা পদ্ধতির সপিণ্ডকরণ হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রভাব, অনুসরণ বা অনুকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা করতে হলে, ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং পরিবর্ত্তন হলেও চরম সিদ্ধান্তে আসা যাবে কিনা সন্দেহ, কারণ গোড়া থেকেই পক্ষপাতিত্বকে সমর্থনের জন্য কোন না কোন মতবাদ আপন স্বার্থ আগলিয়ে থাকবে।

বাক্যুদ্ধের কথা ছেড়ে রসরাজের কাছে ফিরে আসি। গগনেন্দ্রনাথের কলানিপুণতার বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, রূপসৃষ্টির প্রথায় তিনি কখন আড়ষ্ট রীতির বশ্যতা স্বীকার করেন নি অর্থাৎ academic dead draftsmanship অসাড়ের আকর্ষণ তাঁহাকে কখন মোহমুগ্ধ করতে পারেন নি। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার আঁকা ছবি প্রাণবান হয়ে উঠতে পেরেছিল। সুন্দর, রসিকের কাছে এগিয়ে আসত, শিল্পীর মনের কথা শোনবার জন্য। বক্তব্য বিষয় অনুসারে তিনি নানা পন্থায় রূপ ধরেছেন। ঘটনাচক্রের ফলে কোন কোন সময় জলে আঁকা ছবিতে সাহেবী ঘরোয়ানা চাল যৎসামান্য এসে পড়লেও তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর আধিপত্য জাহির করতে পারে নি। আকাশ, মাটি জল সর্ব্বত্র তিনি সুন্দরের সন্ধানে ঘুরেছেন। দূর গ্রামের দৃশ্যে যেমন তিনি প্রকৃতির রূপ দেখেছেন। বাংলার মাটিতে দাড়িয়ে যেমন ঘরোয়া আবেষ্টনীতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তেমনি বরফে ঢাকা পাহাড়ী আবহাওয়া কুয়াসার আবরু সরিয়ে পর্ব্বতচূড়ার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, এবং নিজের আনন্দ পরকে দেবার জন্য গোটা পাহাড়ের খানিকটা অংশ তুলে এনে ছবির মধ্যে আটক করেছেন। এ ছাড়া ব্যঙ্গ-চিত্রে চিন্তাশীলতা এবং প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতা যেভাবে দেখিয়েছেন তা সাধারণ চিত্রকরের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ সাধারণের পরিচয় শিল্পীর কেবল কারিগরীতে।

অনেকের ধারণা, ব্যঙ্গ-চিত্রের মূলদ্রষ্টব্য হোলো, ছবির তলার কথার। আনুসঙ্গিক ছবির রূপ যেমন তেমন করে দর্শকের সামনে ধরতে পারলেই হোলো, হিজিবিজি হলেও আপত্তি নেই। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ব্যঙ্গচিত্রেও রূপ প্রকাশের কৌশল আছে, যার উপযুক্ত ব্যবহার দক্ষশিল্পীর দ্বারাই সম্ভব। ঠিক যেভাবে সার্কাসে ক্লাউনের খেলায় ওস্তাদ খেলোয়াড়ের দরকার। সে আছাড় খাওয়ার ভান করে কিন্তু আছাড় খায় না।

ব্যঙ্গচিত্রে তিনি মারাত্মক রসের আমদানি করেছিলেন। রূপ ও গুণের এমন যোগাযোগ কমই দেখা যায়। সংক্ষেপে তাহার অঙ্কিত ছবিতে বিষয়বস্তু বহুপ্রকারের হলেও কোন খানে তিনি ভাবের দাপটে ছবির ধর্ম্মকে কলুষিত করেন নি। উচ্ছ্বাসকে তিনি নিমিত্তের স্তরেই রেখেছিলেন। তিনি জানতেন, ছবিতে ভাবের প্রকাশ কতটা শৈল্পিক ভাবে হলো সেইটেই আসল কথা। ভক্তি, মমতা, দেশপ্রীতি ইত্যাদি ছবি-আঁকার প্রেরণায় উপলক্ষ মাত্র। এইখানে অঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে দক্ষতার প্রশ্ন ওঠে। গগনেন্দ্রনাথ ওস্তাদ কারিগরের মত নূতন মাল মসলা দিয়ে ইমারত গড়েছিলেন রসের ভাণ্ডারে সম্পদ গুছিয়ে রাখার জন্য।

ছবির বিচারে পণ্ডিতদের আলোচনা উল্লেখ করছি বলেই বলতে হয়, বিচার তখনই নির্ভরশীল হয় যখন একই প্রথায় আঁকা বিভিন্ন ছবির সহিত তুলনার সুবিধা পাওয়া যায়। কল্পনার খোঁচা খেয়ে অন্তর্নিহিত সত্যের শরণাপন্ন হলে, যে সত্য প্রকাশিত হয় তা বিচারকের আত্মস্তোক। গগনেন্দ্রনাথের অঙ্কিত ছবি, তুলনার বাইরে আছে, কারণ তাঁহার প্রথায় ছবি আঁকার চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত কেহ করেনি। তুলনার আর একটি দিক আছে, যাকে সাহেবরা বলেন total effect অথবা standard এখানেও বিচার তুলনামূলক না হয়ে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করলে পক্ষপাতিত্বকে এগিয়ে দিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রস্ফুটিত বেল ও গোলাপ ফুলের তুলনায় সব দিক ভেবে ভাল মন্দের প্রশ্ন উঠলে কাহাকেও নিকৃষ্ট করার উপায় নেই, কারণ উভয়েরই সুগন্ধ আছে উভয়েরই রূপ আছে

কিন্তু জাতে ওরা আলাদা। মানদণ্ডে ভাল-মন্দের বিচার করতে হলে গন্ধ ও রূপ নিয়েই করতে হয় যা ব্যক্তিগত রুচির দাবী এড়িয়ে যেতে পারে না। এই যুক্তি নিয়ে তর্ককে প্রশ্রয় দেবার উপস্থিত অবসর নেই। প্রথম কারণ, ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। সুতরাং বাকপটুতায় আত্মজাহির করতে গেলে যাঁহাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি তাঁহাকেই ছোট করা হয়।

আমার শেষ বক্তব্য ঋণ স্বীকার। বিরাট শিল্পীর অবদানে আমরা যেটুকু সুন্দরের রূপকে বুঝতে শিখেছি। যতটুকু আনন্দ তাঁহার রূপ সৃষ্টি, রসিককে দিতে পেরেছে, ততটুকুই আমার মত শিল্পীর এগিয়ে চলার পথে পাথেয় হয়ে আছে। তাঁহার দান নিয়ে অথচ তাঁহার জীবিতকালে স্বীকৃতি দিতে পারি নি তাই ঋণস্বীকার করে জানাই, হে মহান, আমরা সকলেই অকৃতজ্ঞ নই।

হীনযান

উপন্যাস

সুবোধ বসু

সতেরো

বাড়ী ফিরিতে শ্রীমন্তর বেলা বারোটা বাজিল। রান্না ঘরের পাশ হইতেই সিমেণ্টহীন সিঁড়ি উপর তলায় উঠিয়া গেছে। সেখান দিয়া নিঃশব্দেই সে উপরে উঠিয়া গেল। বিচিত্র আওয়াজ ও ফোঁড়নের গন্ধ কানে ও নাকে আসিয়া পৌঁছিয়া জানাইয়া দিল, রান্না তখনও সমাপ্ত হয় নাই।

রবিবার দিনটাতে মাত্র স্বাধীনতা আছে। যত বেলায় ইচ্ছা খাও। অফিসে ছুটিবার তাড়া নাই। তবে বেশি দেরি করিলে স্ত্রী কল্যাণী তাড়া দেয়। অনিয়ম করিলে শরীর খারাপ হয়, এই আপত্তি।

উপর তলায় দুটি ঘর। তার বড়োটি একটা বড় তক্তপোষ, কিছু বাক্স-প্যাটেরা ও কাপড় রাখিবার আলনা আঁটিবার পক্ষে যথেষ্ট বড়ো। উপরন্তু পূবের জানালার কাছে বেতের একটা চেয়ার রাখিবার ও কড়িকাঠ হইতে খোকনের বেতের দোলনাটা টাঙাইবার মত যথেষ্ট জায়গাও আছে। অপর ঘরটি একটা কাঠের চেয়ার, একটি বেতের সোফা, ছোট বেতের সেণ্টার-টেবিল ও ফুলদানি এবং দুটো হাতলহীন ষ্টিলের চেয়ারসহ প্লাষ্টিকের কভারে মোড়া এক হাত চওড়া ও দুহাত লম্বা শস্তা কাঠের খাওয়ার টেবিল শোভিত যুক্ত বসা ও খাওয়ার কামরা।

নিঃশব্দে শ্রীমন্ত শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল। স্ত্রী কল্যাণী নিচের রান্নাঘরে আছে আগেই অনুমান করিয়াছিল। দেখিল, বেতের দোলনায় উপর ছ' মাসের বুড়ো খোকন মুখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি পুরিয়া পরম পরিতৃপ্তিসহকারে নিদ্রা যাইতেছে। খুব সাবধানে একবার তার ফুলো ফুলো গাল দুটি টিপিয়া দিয়া সে আসিয়া জানালার পাশের বেতের চেয়ারটায় ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িল।

রান্নার তদারক না করিলে কল্যাণীর চলে না। খোকনের জন্মের আগে সেই রান্না করিত। যত্ন করিয়া রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইত। খোকন হইবার পরও সে রান্নার জেদ করে। বলে, চাকর-বাকরের রান্না কি তুমি খেতে পারবে। শ্রীমন্তই জোর করিয়া চাকর নিযুক্ত করে। বলে, খারাপ খাওয়ায় সে বহু আগে হইতেই অভ্যস্ত এবং চাকরের জন্য বাড়তি খরচ সে বাড়তি আয় করিয়া মিটাইবে।

'বাঃ, কখন ফিরেছ? আমি তো কিছু টের পাইনি।' কল্যাণী ঘরে ঢুকিয়া স্বামীকে আবিষ্কার করিয়া সবিস্ময়ে কহিল।

'ইচ্ছে করলেই সব চুরি করে নিয়ে পালাতে পারতাম। শ্রীমন্ত কহিল। 'তবে চুরি করার মতো বিশেষ কিছু নেই, এই যা!'

'তা বৈকি।' অসন্তুষ্ট স্বরে কল্যাণী কহিল। তারপর কণ্ঠস্বর হাল্কা করিয়া কহিল, 'এই যে আমাদের সাত-রাজার ধন মাণিক শুয়ে আছে এখানে, তার কি সদর-দরজা খোলা ছিল বুঝি? বলিয়া দোলনার কাছে আগাইয়া গিয়া শিশুপুত্রের দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে তাকাইয়া মৃদু ঠেলা দিল দোলনায়।

বছর বাইশ-তেইশের কর্ণা সুন্দরী মেয়ে কল্যাণী। পাতলা ছিপছিপে গড়ন; বড় বড় টানা চোখ, তার উপর সুসম ভ্রূরেখা। টিকলো নাক। ঠোঁট ও চিবুকে কমনীয় আন্তরিকতা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

ছুবছর হয় বিবাহ হইয়াছে তাহাদের। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে শ্রীমন্ত। অবস্থাপন্ন কায়েতের মেয়ে কল্যাণী। শ্রীমন্ত কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। কলেজ-ম্যাগাজিনের পাতা হইতে তার কবিতা মাসিক পত্রিকায়, মাসিক পত্রিকা হইতে বইয়ে এবং বই হইতে সিনেমার গানে পর্যান্ত ছড়াইয়া পড়ে তার ছাত্র-জীবনেই। এই খ্যাতিই তাকে ছাত্র সমাজে বিশেষ করিয়া তুলিয়াছিল। কল্যাণী পড়িত তার তিন ক্লাস নিচে। কিন্তু শ্রীমন্তের খ্যাতিই পরিচয়ের সূত্রপাত করে।

তারপর তো এক নাটক! নায়কের বাড়ী হইতে আপত্তি উঠিল। নৈকুষ্য ব্রাহ্মণ-পরিবারে কায়েতের মেয়ে আমদানি করা চলিবে না। নায়িকার কর্ত্তৃপক্ষ চটিয়া আগুন। গরিব পরিবার, বেকার ছেলে! কি আকর্ষণ আছে যার জন্য এই বেহায়াপনা! অর্থাৎ পাত্রপক্ষ এবং পাত্রীপক্ষের মধ্যে এক স্বয়ং পাত্র এবং স্বয়ং পাত্রী ছাড়া কেউ এই বিবাহে ইচ্ছুক নয়। শেষ অঙ্কে এই দুই জনই পরিবারের অমতে রেজেষ্টারি করিয়া মিলনপর্ব্ব সম্পূর্ণ করিল। এই সঙ্গেই কবিকে কলম ত্যাগ করিয়া কেরাণীর খাতায় নাম লেখাইতে হইয়াছে।

'গিয়েছিলে সেখানে? কি বললে? কল্যাণী খোকনের দোলনার এদিক হইতে কহিল।

'নতুন কিছুই নয়, শ্রীমন্ত ম্লান হাসিয়া কহিল। 'যা এর আগে একাধিক বার বলেছে, তাই। অর্থাৎ "আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। অত অস্থির হলে কি চলে। সুযোগ আসুক। লেখা আপনার ভালই হয়েছে। তবে কি জানেন, ক্যারেক্টরের সংখ্যা বড় কম; আপনার নাটকে বড় জোর দশ বারোটি চরিত্র আছে। আমাদের কোম্পানীতে মশায় পুরুষ আর মেয়ে নিয়ে অন্তত পঞ্চাশ-বাহান্নজন অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেস আছে। আপনার নাটক ষ্টেজ করলে অবশিষ্ট লোক নিয়ে আমরা কি করব? ঐখানেই একটা টেকনিকেল অসুবিধে।"

আমিও এবার ছাড়িনি। বলেছি, দশ বারোটি চরিত্র নিয়েই যদি নাটক দানা বেঁধে থাকে, নাটকীয় রস জমে উঠে থাকে, তবে অবশিষ্টদের ক'দিনের জন্য চেঞ্জে ঘুরে আসতে দিন না। আর যদি ভবিষ্যতে এমন সব নাটক লেখা হয়, যাতে ম্যানথাসের প্রব্লেম নেই অথচ জমাট রস রয়েছে, তবে পাবলিক থিয়েটারের মাইনের বিল অনেকটা কমানো যায় না কি…'

'তখন নিশ্চয়ই বলেছে,' কল্যাণী কৃত্রিম ভীতি মুখে আনিয়া কহিল, 'আপনার ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে সরে' পড়ুন, এমন লেখা ঢের ঢের পাওয়া যাবে—অর্থাৎ যদি ম্যালথাসের অ্যালুশনটা বুঝে থাকেন…

'না, অতটা রূঢ় হন নি'। শ্রীমন্ত আশ্বাস-অভিনয় করিয়া কহিল। 'বল্‌ছেন, "জানেন শ্রীমন্ত-বাবু, আপনি কবি হিসেবে সুপরিচিত, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে কোনও খ্যাতি আপনার গড়ে ওঠে নি। লেখার নিজস্ব মেরিট্ দেখলেই আমাদের চলে না, বাজার দর বিচার করতে হয়।

প্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাটক পেলে আগে সেটাই নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, আপনার নাটকটা ভালো হয়েছে, খুবই ভালো হয়েছে। সুযোগ পেলে ওটাকে একবার ট্রায়াল দেবার ইচ্ছে আছে…'

'এর জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আর দেরি নয়। শীগগির এবার স্নানে যাও। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে বলিয়া তাড়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল কল্যাণী।

বস্তুত আর বাড়াইবার জন্য শ্রীমন্ত যেসব চেষ্টা করিতেছে, ইহা তাহার অন্যতম। কবি শ্রীমন্ত অভিনয়োপযোগী নাটক লিখিয়া বন্ধুদের শুনাইবার পর সকলে একবাক্যে বলিল, উহা প্রথম শ্রেণীর নাটক হইয়াছে! বন্ধু সমরেশের কাকার সং

সহরের অন্যতম প্রধান রঙ্গমঞ্চের মালিকের বন্ধুত্ব আছে। সেই সূত্রেই শ্রীমন্ত তাহার নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য পেশ করিল। পাণ্ডুলিপি পড়িবার পর কর্তৃপক্ষ প্রবল উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, মনে হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মহড়া শুরু হইবে। এইরূপ আশ্বাসও পাইয়াছিল শ্রীমন্ত। কিন্তু তারপর বহু হাঁটাহাঁটি করিতে হইয়াছে। কোনও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যায় নাই রঙ্গমঞ্চের মালিক। তবে সরাসরি নাও করে নাই। আজকের সাক্ষাতের পর শ্রীমন্ত বুঝিল, এখান হইতে আয়ের আশা নাই বললেই চলে।

কিন্তু দু'মাসের বাড়িভাড়া বাকি। গত কয় মাস ধরিয়া খরচ বাড়িয়াছে। খোকনের দুধ, খোকনের 'ফুড্', খোকনের জামা-কাপড়। তা ছাড়া খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে। চালের দাম চড়িতেছে, আলুর দাম চড়িতেছে। দু'বেলা মাছ খাওয়া তো অসম্ভব। দুশো টাকা মাহিনায় কিছুতেই কুলানো যাইতেছে না।

বন্ধু হিমেশের কাছে সে একশো টাকা ধার চাহিয়া আসিয়াছে। কারও কাছে টাকা বাকি রাখিতে শ্রীমন্ত পছন্দ করেনা। বাড়ীওলার কাছে তো নয়ই। মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা ভাড়ায় বাড়ী পাওয়া বর্ত্তমানে দুর্লভ।

হিমেশ তার সবচেয়ে ধনী বন্ধু। নিজস্ব বাড়ী, মোটর গাড়ী, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রচুর টাকা ও ব্যবসা এবং ব্যয় করিবার উদারতা সবই তার আছে। কিন্তু কল্যাণী তাকে পছন্দ করে না। তার কাছ হইতে টাকা চাহিয়াছে জানিলে সে খুব অসন্তুষ্ট হইবে। হিমেশ একটু বেশী ফরোয়ার্ড, একটু বেশি ফুর্ত্তিবাজ, একটু বেশি গায়ে-পড়া এসব অভিযোগ হয়তো অসত্য নয়, তবে তার অন্তঃকরণটা ভালো, এবং বড় রকম কোনও বদ্‌দোষ নাই বলিয়াই শ্রীমন্ত জানে। বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইবার পর অনেক সহায়তা শ্রীমন্ত তার কাছ হইতে পাইয়াছে। এই কৃতজ্ঞতা সে অস্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু রবিবার হইলেও সাড়ে বারোটার মধ্যে স্নানে যাইতে হইবে, কল্যাণীর এই ব্যবস্থা। অগত্যা এসকল জল্পনা মনের মধ্যে চাপা দিয়া শ্রীমন্ত নিচতলার স্নানের ঘরে স্নান করিতে গেল।

'দেখতোরে নিমাই, কে কড়া নাড়ছে?' স্নান-কামরা হইতেই হাঁক দিয়া কহিল শ্রীমন্ত।

তার আগেই নিমাই রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। সদর দরজার কাছ হইতে সে স্নানের কামরার কাছে ফিরিয়া আসিল। দরজার কাছে মুখ রাখিয়া চাপা গলায় কহিল, 'যে বাবু মোটর গাড়ী করে আসেন, তিনিই এসেছেন। উপরে নিয়ে বসাবো?'

'কে, হিমেশ!' ব্যস্ত কণ্ঠ শোনা গেল শ্রীমন্তের। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উপরে নিয়ে বসা। বল, আমার এক্ষুনি হয়ে যাবে। আর শোন, বৌদিকে বরঞ্চ বল—আচ্ছা থাক, তার দরকার নেই। উপরে নিয়ে বসা বাবুকে। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি···ঝুপঝাপ স্নানের আওয়াজ শ্রীমন্তের কথারই সমর্থন জানাইল।

নিমাই সদর দরজায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দরজার পাট খুলিয়া ধরিল। ইতিমধ্যে হিমেশ স্বচালিত প্রকাণ্ড গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছে।

'কি করছে শ্রীমন্ত? স্নানে গেছে! বৌদি কোথায়? বলিতে বলিতে সে কোনও রূপ আমন্ত্রণের অপেক্ষা না রাখিয়া উপরতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইল।

স্বামী-স্ত্রীর খাইতে বসিতে সেদিন দেড়টা বাজিল। তাও একাধিকবার নিমাইকে পাঠাইয়া নানা প্রকার ভদ্র তাড়া দিয়া তবেই হিমেশের আসন টলাইতে পারা গেছে। খাইতে বসিয়া শ্রীমন্ত প্রথমেই এ সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়াছিল। কল্যাণীও পাল্টা অভিযোগ

করিয়া কহিল, দুপুর সাড়ে বারোটায় যে আড্ডা দিতে আসে, তাকে এর চেয়ে কম অভদ্রভাবে কি করে তাড়ানো যায় শুনি ?

'সন্ধ্যার শোতে আমাদের জন্য সিনেমার টিকেট কিনে এনেছে। তাই দিতে এসেছিল। চলো দেখে আসি। শুনেছি ছবিটা ভালো হয়েছে······

'তবে আমার হয়ে নিমন্ত্রণও নিয়ে নিয়েছো! একবার আমাকে জিজ্ঞেসও করলে না···।

'জিজ্ঞেস করলে তুমি কি রাজি হতে! খোকন হওয়ার পর একদিনও ছবি দেখতে যাওনি। অথচ ছবি দেখতে তো খুব পছন্দ করতে···'

বিরক্ত জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল কল্যাণী। নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, 'ছবি দেখতে যাওয়ার পক্ষে খোকন মস্ত বড় সমস্যা নয় কি ?'

'কেন, নিমাই তো ওকে রাখতেই পারে।' শ্রীমন্ত অবিলম্বে জবাব দিল। 'গত মাসে যখন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী পূজা দিতে গিয়েছিলে খোকন তো দিব্যি ওর কাছে ছিল···'

কথাটা সত্য। মা কালীর কাছে খোকন সম্পর্কেই মানত ছিল। কিন্তু খোকনকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার উপায় ছিল না। নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল, সে ফ্যাঁচ্-ফোঁচ করিয়া হাঁচিতেছে। শ্রীমন্তই প্রস্তাব করে যে, উহাকে নিমাইয়ের জিম্মায় বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়া যাক। ষ্টেট্‌বাসে যাইতে আসিতে বড় জোর একঘণ্টা। আর পূজা দিতে কতক্ষণই বা সময় লাগিবে। নিমাই ছেলেটিকে কল্যাণী বেশ পছন্দ করিয়াছে। বেশ ভদ্র, বিনয়ী এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মনে হইয়াছে তাকে। পাঁচ মাসের মধ্যে সে ঘরের লোকের মত হইয়া উঠিয়াছে। তবু বেশ ভয়ে ভয়েই কল্যাণী তার হাতে ছাড়িয়া পূজা দিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, নিমাই অতন্দ্র সতর্কতার সঙ্গে খোকনকে পাহারা দিতেছে। ইহার পর নিমাইয়ের উপর স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই আস্থা আরও বৃদ্ধি পাইল।

'সে তো মাত্র কতক্ষণের জন্য—দেড় ঘণ্টাও নয়।' কল্যাণী শ্রীমন্তের যুক্তি একেবারে খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া কহিল। 'তাছাড়া সেটা দিনের বেলা ছিল। বাংলা সিনেমা—তিন ঘণ্টা ধরে চলবে। খোকনের খাওয়ার টাইম হয়ে যাবে···'

'নিমাই বেশ খাইয়ে দিতে পারবে।' শ্রীমন্ত কহিল, অনেক করে বলে গেছে হিমেশ। তুমি না গেলে দুঃখিত হবে। আমারও সম্মান থাকবে না।···না না, অতটা মাছ আমাকে দিয়ো না। পেট একদম ভরে গেছে। বেশি খেলে হজম হবে না···'

'কেন, বাকি সবটা কি আমাকেই খেতে হবে?' শ্রীমন্তের বারণ না শুনিয়া আরও এক টুকরো মাছ তার পাতে তুলিয়া দিতে দিতে কল্যাণী কহিল, জানোই তো আমি বেশি মাছের ভক্ত নই। নিমাইয়ের জন্য আরেকটা বড় টুকরো তো আছে। ও বাঙাল-দেশের লোক। মাছ খুব পছন্দ করে। বেচারি। পার্টিশানের গণ্ডগোলে আপনার লোক সব খুইয়েচে। একটু আদর করলে কত খুশি হয়ে যায়।···'

'এমন আদর পেলে সবাই খুশি হয়।' শ্রীমন্ত সকৌতুকে কহিল।

'কি আর আদর করি। কিন্তু চাকর বলে তাকে যারা মানুষই মনে করে না, আমি সে জাতের নই। একবার কোন্ এক বড় লোকের বাড়ীতে ছিল। বাঙালী সাহেব আর মেম সাহেব। একগাদা চাকর-বাকর ছিল। তাদের জন্য বরাদ্দ খাওয়ার বর্ণনা শুনলে চমকে উঠতে হয়। ব্রাহ্মণ-শূদ্রে যে তফাৎ ছিল এক সময়, সাহেবের খাওয়া আর চাকরের খাওয়ার তফাৎ তার চেয়েও দশগুণ বেশি। একদিন বলেই ফেললে, 'আপনি যে খাওয়া দেন, তা খেয়ে নিজেকে আবার মানুষ বলে মনে হচ্ছে '···খুব ভাল ছেলে। ওকে যদি রাখতে পারা যেতো খুব ভাল হতো। কিন্তু এ খরচা কি আমরা বইতে পারব? এই যে প্রতিমাসেই টাকা কম পড়ে যাচ্ছে, চাকর

রাখাটাই তার বড় একটা কারণ···নইলে হয়তো দু'-মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি পড়ে যেত না···'

'এ খরচটা আমি তুলে নেব, তুমি দেখো।' শ্রীমন্ত অপরাধীর মত কহিল। 'আগের জানাশোনা লোকদের সঙ্গে দেখা করছি। সিনেমা ডিরেক্টর সৌরেশ চন্দ্র তো আশ্বাসই দিয়েছে পরের ছবির জন্য ক'টা গান সে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে।···ভাবছি, হিমেশের কাছ থেকে শ দেড়েক টাকা ধার নিয়ে বাড়ী ভাড়াটা মিটিয়ে দিই···' বলিয়া সভয়ে সে একবার কল্যাণীর দিকে আড় চোখে তাকাইয়া লইয়া মুখে বড় সাইজের একটা গ্রাস পুরিয়া দিল।

'খবরদার, ওর কাছে ধার চাইবে না।' কল্যাণী খাওয়া বন্ধ রাখিয়া তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাইল স্বামীর দিকে। 'তবে সে আরও পেয়ে বসবে। যেমন করেই হো'ক, বাড়ী ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু ত বলে যার তার কাছে ধার নেওয়া চলবে না···

'কিন্তু immediately তো কোথা থেকেও টাকা আসার সম্ভাবনা ..'

'অন্তত আসছে মাসের মাইনেটা তো আছে। তা থেকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেই মেনে নেবেন। বাড়ীওলাবাবু লোক ভালো।' কল্যাণী কহিল। শ্রীমন্ত কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। নীরবেই আহার সমাপ্ত করিল।

সোমবার খাওয়া-দাওয়ার পরই নিমাই বাহির হইয়া গিয়াছিল। বেলা সাড়ে তিনটা আন্দাজ বাড়ী ফিরিয়া সদর দরজার কড়া নাড়িল। কল্যাণী কান খাড়া করিয়াই ছিল, তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিল, 'হলো?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়িয়া কহিল নিমাই। 'আগের বালাটার দামই দিয়েছে। ১ ভরি সাত আনা তিন রতি ওজন হয়েছে চাঁচ কেলে। ৪ আনা তিন রতি বাদ দিতে চেয়েছিল ময়লার জন্য। বনমালীদা বলে-করে তিন আনা বাদ করেছে। আজকের গিনির বাজারদর ৯৬ টাকা ধরে এই হিসেব কষে দিয়েছে।' বলিয়া নিমাই এক টুকরো কাগজ ও এক তাড়া নোট কল্যাণীর হাতে দিল।

'বাড়ীঅলাবাবুকে টাকা দিয়ে আসতে বললাম যে।' কল্যাণী হিসাব পরীক্ষায় নজর না দিয়া সামান্য বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, বালা বিক্রির প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই বুঝিতে পারে নাই ছেলেটা।

'গিয়েছিলাম তো তারও কাছে।' নিমাই তাড়াতাড়ি কহিল, 'তিনি বললেন, সে কিরে, দু'বার করে বাড়ী ভাড়া দিবি নাকি? দু'একদিন তাড়া দিইয়েছি বটে, তা বলে ডবল রেট্ তো দাবি করিনি। তোদের বাবু তো আজই অফিস যাবার মুখে সব পাওনা মিটিয়ে গেছেন। বৌদিকে বলিস।···

নীরব হইয়া গেল কল্যাণী। বারকয়েক মাত্র ঠোঁট কামড়াইল। কোথা হইতে শ্রীমন্ত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে বুঝিতে কষ্ট হইল না। কষ্ট হইল এই মনে করিয়া যে, অভাবের তাড়নায় শ্রীমন্ত তার কাছে সত্য গোপন করিয়াছে। হিমেশের কাছ হইতে ঋণ চাহিবার পর সে কল্যাণীকে বলে, হিমেশের কাছ হইতে শ'দেড়েক টাকা ধার চাহিবার কথা সে ভাবিতেছে।

আঠারো

ইহার পর মাস তিনেক কাটিয়াছে। এর মধ্যে বাড়ী ভাড়ার অবস্থা আবার আগের অবস্থায় আসিয়াছে অর্থাৎ দু'মাসের ভাড়া বাকি। আয় বাড়ে নাই; খরচ বাড়িতেছে। জিনিষের দাম শীত অবসানের পর হইতে উত্তোরত্তর আক্রা হইতেছে। মাসে একবার খোকনের এবং একবার খোকনের বাবার অসুখ করে এবং ডাক্তার ডাকিতে হয়। ভিজিটের এবং তার চেয়ে বেশি ওষুধের দাম গুনিতে পারিবারিক বাজেট

ওলোট-পালোট হইয়া যায়। এই শ্রেণীর আয়ের অঙ্কে চিকিৎসার ব্যয়ের কোনও হিসাব ধরা হয় নাই।

'আলুর দাম কত লিখেছিস?' সেদিনকার বাজার হিসাবের টুকরো-কাগজটার উপর চোখের ভুরু কুঁচকাইয়া কল্যাণী প্রশ্ন করিল।

'আধ সের এগারো আনা হিসেবে সাড়ে পাঁচ আনা।

'দশ আনার থেকে আবার এগারো আনা হয়েছে। উদ্বেগের কণ্ঠে কহিল কল্যাণী।

'এমন কিছু নেই যার দাম বাড়ছে না। এমন হলে লোকে খাবে কি করে?···এবার থেকে আলু একপো করেই আনিস। অন্য আনাজের সঙ্গে মিশিয়ে দেব।'

নিমাই তপ্ত তেলে ফোঁড়ন ছাড়িয়াছে। তার ঝাঁজ ও আওয়াজ ছাড়া আর কোনও জবাব আসিল না।

'গোবর আর কয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়েছিস কি নিমাই? তবে স্নানে যাওয়ার আগে গুলগুলি আমি দিয়ে ফেলি···

'ওগুলি থাক বৌদি। আমি করে দেব। রান্না তো প্রায় হয়েই গেছে। তরকারি নামিয়ে খোকনের বার্লি জাল দিলেই হয়ে গেল। ও আপনি পারবেন না···

কল্যাণী আজকাল সমস্তই পারে। এক সময় সে রান্না করিতে পারিত না, বাসন মাজিতে জানিত না। কাপড় কাচা, বিছানা পাতা, ঘর ঝাড়া এসব চাকর-শ্রেণীর কর্ত্তব্য বলিয়াই সে জানিত। কিন্তু এ সকলেই আজ সে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। খরচ কমাইয়া কি করিয়া আয়-ব্যয় সঙ্কুলান হয় সেই দিকেই তার প্রধান নজর। শ্রীমন্ত বাড়ী থাকিলে এসব গদ্যময় কাজ তাকে করিতে দেয় না। পুরুষেরা বড় বাস্তবজ্ঞানবর্জ্জিত। কিন্তু মেয়েদের সংসার চালাইতে হয়। শ্রীমন্ত অফিসে যাইবার পর তবেই কল্যাণী খরচ কমাইবার ব্যবস্থা-গুলিতে হাত দেয়। নিমাই বড় ভালো ছেলে। সর্ব্বদাই সে কল্যাণীকে সাগ্রহে এবং সাহ্লাদে সাহায্য করে। কষ্টের কাজগুলি সে নিজে যাচিয়া নেয় পরিবারের খরচ বাঁচাইতে সাহায্য করে।

বৌদি যে কায়িক পরিশ্রমে বিশেষ অভ্যস্ত নয় সেটা সে আগে হইতে লক্ষ্য করিয়াছে। সংসারের টানাটানি প্রতিদিনই লক্ষ্য করিতেছে। তবু বড় সুখে আছে নিমাই। এখানে তাকে মানুষ মনে করা হয়, পরিবারের লোক বলিয়াই গণ্য করা হয়। সেও তাই প্রাণপণে ইহাদের সহায়তা করে। ইহাদের জন্য সহানুভূতি বোধ করে। পরিচিত চাকরেরা তাকে আরও ভালো মাইনের চাকরির সন্ধান দিয়াছে। সে যায় নাই।

চাকরদের দুঃখের কথাই সে এতদিন জানিত। দরিদ্র গৃহস্থের দুঃখের কথা এবার উপলব্ধি করিল। চাকর তো ইচ্ছা করলেই এ দারিদ্র্য থেকে পালাতে পারে, মনে মনে বলে নিমাই, 'ধনীর বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু টাকার অভাবের এই কষ্ট থেকে বৌদি, দাদাবাবু আর খোকন কোথায় পালাবেন? ত'দের তো পালাবার জায়গা নেই।'

শোবার ঘরের দরজার কড়া নাড়ার শব্দে কল্যাণীর দুপুরের ঘুম টুটিল। ধড়মড়িয়া জাগিয়া বিছানা হইতেই সে প্রশ্ন করিল, 'কে নিমাই?

'হ্যাঁ আমি নিমাই। একটু শুনুন।

ঘুমবিজড়িত চোখে উঠিয়া গিয়া কল্যাণী ঘরের দরজা খুলিল।

'বাবুর বন্ধু, সেই যিনি মোটর গাড়ী করে আসেন, তিনি এসেছেন।'

'কে হিমেশবাবু? বলে দে, দাদাবাবু এখনও বাড়ী ফেরেন নি।'

'তিনি বললেন বৌদিকে ডাক। নিজেই উপরে উঠে এসে বসার কামরায় বসেছেন।'

তাকের ছোট টাইমপীসটার দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাইয়া কল্যাণী সময় লক্ষ্য করিল। দুপুর তিনটা। সে বিস্মিত বোধ করিল। এ সময় শ্রীমন্ত বাড়ী থাকিবেনা

তাহা হিমেশ বেশ জানে। তবে কি শ্রীমন্তর কোনও রকম বিপদ হইয়াছে। বুকটা কাঁপিয়া উঠিল কল্যাণীর। নিমাইকে কহিল, 'কি দরকার কিছু বলেছেন কি?

'না তো' নিমাই কহিল।

'যা, একবার জিজ্ঞেস করে আয়। আচ্ছা থাক, আমিই যাচ্ছি।' বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিয়া আয়নার সম্মুখে তাড়াতাড়ি এলোমেলো চুল আঁচড়াইয়া এবং চোখমুখ হইতে নিদ্রার চিহ্নগুলি ঘষিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিয়া সে অবিলম্বে বসার ঘরের দিকে যাত্রা করিল। নিমাইকে কহিল, 'খোকনের কাছে একটু বস। যাচ্ছি এলে একটু পাখাটা নাড়িস।'

'অসময়ে এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি, কেমন তো?

ছেলেরা সারা দুপুর খেটে খেটে মরবে, আর মেয়েরা আরামে নিদ্রা দেবে, এটা কি ঠিক? কিন্তু সময়টা আমি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছি। শ্রীমন্ত বাড়ীতে থাকলে এ হবে না। হিমেশ মিটিমিটি হাসিয়া একবার সকৌতুকে কল্যাণীর ভীত-উদ্বিগ্ন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সপরিহাসে কহিল।

গোলগাল চেহারা, গোল মুখ, ফর্সা গায়ের রং, মোটা ঠোঁট, চটুল চোখ। পরণে করাসডাঙা ধুতি, ঢিলে হাতা পাঞ্জাবির দুহাত গিলে করা, পায়ে রূপার রঙের চামড়ার পাম্পশু। হাতে নানা রকম প্রস্তরের একাধিক আংটি। হাতে সিগারেটের কৌটো।

হিমেশের রকমসকম কল্যাণীর কোনও দিনই ভালো লাগেনা। তবু স্বামীর বন্ধু হিসাবে ভদ্রতা করিতে হয়। যে জবাবটা তার জিবের আগায় আসিয়াছিল তাহা এই: সময়টা আপনি মোটেই ঠিক বাছেন নি। স্বামীর অনুপস্থিতে বেলা তিনটায় কোনও ভদ্রমহিলার কাছে আসা মোটেই ভদ্রজনোচিত কাজ নয়। কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া কল্যাণী নীরবে হিমেশের পরবর্তী বক্তব্যের অপেক্ষা করিল।

'কিছুদিন ধরেই আমি লক্ষ্য করছি, শ্রীমন্ত কেমন যেন মন-মরা হয়ে পড়ছে। হাসিতে সেই স্ফূর্তি নেই, কথায় সেই পালিস নেই, চোখে সেই চাকচিক্য নেই। কারণটা ও স্পষ্ট না বললেও বুঝে নিতে কষ্ট হয় নি। শ্রীমন্ত একটা জিনিয়াস্। কিন্তু ওর বিজনেস ব্রেন নেই। ওর চেয়ে তিনগুন নিচুস্তরের লেখকেরা আজ ফেঁপে উঠেছে। ও এক পয়সাও করতে পারছে না সাহিত্য থেকে। যেখানেই যায়, সেখানেই দেখে, ওর প্রতি-যোগিরা ওর চেয়ে অনেক বেশি চালাক। তারা পয়সা দেনেওলাকে বাগাতে সিদ্ধহস্ত। শ্রীমন্ত তাদের কাছে পাত্তা পাচ্ছে না। কেরানীগিরির আয়ই ওর একমাত্র আয়। অর্থাৎ একদিকে ফ্রাষ্টেশন্ আর অন্যদিকে অভাব। এই দুই শত্রুতে মিলে ওর মানসিক আর শারীরিক স্বাস্থ্য ক্রমেই নষ্ট করছে তা আমার চেয়ে নিশ্চয়ই তুমি বেশি লক্ষ্য করেছ। এ থেকে যেমন করেই হোক ওকে বাঁচাতে হবে। এটা আমাদের সবারই কর্তব্য...'

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল।

'বাড়ীভাড়া বাকি পড়েছে বলে আমার কাছ থেকে মাস দুইয়েক আগে ও একবার দেড়শো টাকা ধার নিয়েছিল।' হিমেশ তার হাতের ক্ষীয়মান সিগারেট হইতে নতুন একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল, 'কিন্তু দুদিনও গেল না। তার আগেই এসে হাজির। টাকা ফেরত। কোথা থেকে এই টাকা পেলো তার কোনও কৈফিয়তই পাওয়া গেল না। তারপর থেকেই ওর আর্থিক অবস্থাটা আমি লক্ষ্য করছি। কি করে ও এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনে সংসার চালাচ্ছে ভেবে অবাক হচ্ছি। প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, কোনও লেখা-টেকা বিক্রি হয়েছে কিনা। প্রায়ই বলি, টাকার দরকার হলে যেন চেয়ে নেয়, লজ্জা না করে। কিন্তু টাকা নেওয়াতে পারছি না। শত হোক পুরুষ মানুষ। এতে পৌরুষে বাধে। কিন্তু তুমি মেয়ে মানুষ; বাড়ী চালাতে হয় তোমাকে। তুমি নিশ্চয়ই বোঝ, টাকা না হলে চলে

না। স্বামী পুত্রের কষ্ট নিশ্চয়ই তোমাকে আনন্দ দেয় না। সেন্টিমেন্টের চেয়ে তাদের উপযুক্ত খাওয়া-পরার জোগাড় করা বেশি দরকারি এই বাস্তববুদ্ধি মেয়েদের থাকে। তাই তোমার কাছেই আসতে হলো। এই খামে দু'হাজার টাকা আছে। ওকে কিছু বলো না। চুপে চুপে তোমার কাছে রেখে দাও। প্রয়োজন মত খরচা করো। ফুরিয়ে গেলে…আরও…'বলিয়া পাঞ্জাবির পকেট হইতে বাদামীরঙের বড় একটা অফিস-খাম বাহির করিয়া সে কল্যাণীর সামনের টেবিলে রাখিল।

কল্যাণী সেদিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করিল না। সংক্ষেপে কহিল; 'এ আপনি তুলে রাখুন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু এ আমরা নিতে পারব না। তা ছাড়া…'

'তা ছাড়া' হিমেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, 'এ-ও তোমাকে নিতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি তোমার বালা দুটো আর তোমার হাতে নেই। গয়না ছাড়া মেয়েদের মানায় না। এ তোমাকে পরতে হবে…

কল্যাণী সরিয়া দাঁড়াইবার অবকাশ পাইল না। তার একটা হাত টানিয়া লইয়া একটা জড়োয়ার বালা হিমেশ তাহাতে গলাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। এক ঝাঁকুনি দিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল কল্যাণী। একবার অলন্ত দৃষ্টি হিমেশের ক্ষুধার্ত মুখের উপর বুলাইয়া লইল। তারপর প্রায় ধীরস্বরে স্পষ্ট উচ্চারণে কহিল, 'এবার যান।'

'আমাকে খুশি রাখলে অনেক সুবিধে হতো।' না দমিয়া কহিল হিমেশ। 'গরিব পরিবারের মেয়েদের অত তেজ দেখালে চলে না…অন্নদের খুশি রেখে চললে সব দিক বজায় থাকে…

কল্যাণী কেমন যেন হঠাৎ ভীত বোধ করিল, অসহায় বোধ করিল। যেন সত্যসত্যই এক বদমাস আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে। তার হাত হইতে এড়াইবার উপায় নেই। প্রায় বিকৃত কণ্ঠে সে হাঁকিল, নিমাই নিমাই…'

'কি বৌদি?'

নিমাই যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। ওদিকের ঘর হইতে এ ঘরে আসার জন্ত যতটা সময় প্রয়োজন তার সিকি সময়ও তার লাগিল না।

'ইনি চলে যাচ্ছেন।' নিজেকে সংযত করিয়া কহিল কল্যাণী। 'সদর-দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।' বলিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উনিশ

'কিরে নিমাই, কি খবর তোর। এ্যাদ্দিন দেখিনি কেন?

বেলা দুটোর কাছাকাছি। বনমালী কেবলমাত্র দুপুরের খাওয়া শেষ করিয়া কলাই-করা থালার উপর এঁটো-কাঁটা তুলিয়াছে, এমন সময় নিমাই 'বনমালীদা' বলিয়া কাছে মেঝেতে বসিয়া পড়িয়াছে।

'বৌদি দুপুরে একা থাকেন। তাই বড় একটা বের হই না। আচ্ছা বনমালীদা, বলতে পার বাংলা খবরের কাগজে দু'তিন লাইনের একটা বিজ্ঞাপন দিতে হলে কত খরচ পড়বে?'

'না, তা তো বলতে পারব না। খবরের কাগজের অফিসে গেলেই তারা বলে দেবে।' বনমালী সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া কহিল। 'কেন, কি বিজ্ঞাপন দিবি? চাকরি চাই?…'

'না না। তা নয়।…মানে, ননীদি, দুলী ওদের খোঁজ করতে হবে তো। বৌদি বললেন, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই নাকি লোকেরা হারানো লোকের খোঁজ করে। তাই ভাবছি, একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখি। ভেবেছিলাম, একটা কোনও অফিসের চাকরি জোগাড় করে', ছোটখাটো একটা বাসা ভাড়া নিয়ে তবে জোর অনুসন্ধান শুরু করব। কিন্তু তার তো আর কোনও ভরসা নেই…'

'তুই বস। আমি আঁচিয়ে আসছি।' বলিয়া বনমালী এঁটো থালা হাতে দাঁড়াইয়া পড়িল। 'একটা বেশি মাইনের চাকরি খালি আছে বেয়ারার কাজ। মস্ত ধনী লোক। তারা অনেক দিন থেকেই বলছে। আমি বলেছি, একটি ছেলে আছে। বেয়ারার কাজ জানে। তবে নেবে কিনা আগে একবার জিগেস করে নিই…'

'না বনমালীদা। আমি এখানেই ভাল আছি। বড় লোকের বাড়িতে আমার পোষাবে না। চাকরকে তারা মানুষই মনে করে না…'

'তবে দাদাবাবুকেই ধর না। তার অফিসে ঢুকিয়ে দিক।'

'দাদাবাবু নিজেই ভয়ে ভয়ে থাকেন, চাকরি থাকে কি থাকে না! আমাকে ঢোকাবার ক্ষমতা কোথায়! কিন্তু যাও। তুমি আঁচিয়ে এসো। আমি বসছি।' বলিয়া নিমাই উঠিয়া গিয়া দোকানের সামনের দিকে এক টুলে আসীন হইল। কোনও অসুবিধায় পড়িলে, কোনও পরামর্শ চাহিতে হইলে বা কোনও কারণে মন খারাপ হইলে সর্ব্বদাই সে বনমালীর কাছে হাজির হয়। সারা শহরে তার এমন শুভানুধ্যায়ী আর দুটি নেই।

নিমাই নির্ভরযোগ্য। নিমাই সৎ। নিমাই কাজের লোক। নিমাই বাড়ীর লোকের মতো। তার গুণের তুলনা নাই। কিন্তু প্রশ্নটা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। কল্যাণী শ্রীমন্তকে কেবলই বলিতেছে জানাশোনা কোনও ভাল বাড়ীতে ওর জন্ত চাকরি সংগ্রহ করিয়া দিতে। শ্রীমন্ত রাজী হয় না। বলে, একা তুমি সব দিক সামলাতে পারবে না। 'সামলাতেই হবে।' কল্যাণী তর্ক করিয়া বলে। 'যাদের চাকর-বাকর নেই, তারা কি সামলায় না। খোকন এখন আটমাসের হলো। চেঁচামেচি নেই। খাবার বা খেলনা দিয়ে গেলে দোলনাতে নিজের মনে খেলা করে। ঠিক সামলাতে পারব, দেখো। কিছু আমার কষ্ট হবে না।' শ্রীমন্ত রাজী হয় না তবু। অথচ আয়বৃদ্ধির কোনও ব্যবস্থাও করিতে পারে না।

'মাস পয়লা দিন', কল্যাণী মাসিক বাজার হিসাবের খাতায় অঙ্কগুলি যোগ দিতে দিতে কহিল, 'আমার হাতে ১৮৭৲ টাকা দিয়েছিলে। বাজার খরচ, দুধ, ধোপা, মুদি, স্টেশনারী, ওষুধ আর খোকনের ফুড মিলে মোট ১৯৩৲ টাকা ৬৩ নয়া পয়সা। মানে ছ'টাকা তেষট্টি নয়া পয়সা ঘাটতি। তা ছাড়া বাড়ী ভাড়া বাকি। কোথা থেকে তা আসবে কিছুই ঠিক নেই। এ রকম করে তো চিরকাল চলে না। আয়ের মধ্যে খরচ রাখতে হবে। যে খরচ না করলে নয় সেটা করতেই হবে। যেটা বাদ দেওয়া চলে, সেটা বাদ দিতে হবে। কাল পয়লা থেকে সে ব্যবস্থা চালু হবে মনে রেখো…'

মাসকাবারের দিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীস্ত্রী আয়ব্যয়ের খতিয়ান করিতে বসে। আজও বসিয়াছিল। বাড়ীর ফিনান্স মিনিস্টারের কাছ হইতে আর্থিক অবস্থা ও আগামী ব্যবস্থার সংবাদ শুনিয়া শ্রীমন্ত চুপ করিয়া রহিল। নীরব না থাকিয়া উপায় কি? অন্ত কোনও সমাধানই তার হাতে নাই। আগামী মাসের মাঝামাঝি হইতে একটা পঁচিশ টাকার প্রাইভেট টুাসানি জোগাড় হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নিশ্চিত না হইয়া এ খবর সে কল্যাণীকে দিতে চাহেনা। তা ছাড়া সারাদিন খাটিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলা সে ছেলে ঠ্যাঙাইতে যাইবে এটা কল্যাণী কোনও দিনই পছন্দ করে না। তাকে রাজী করিবার হাঙ্গামাও আছে।

'একটু ঘুরে আসি কল্যাণী। বিকেল থেকেই মাথাটা কেমন ধরে রয়েছে।'

'হ্যাঁ, যাও না, একটু ঘুরে এসো।' কল্যাণী স্বামীর ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল। 'আমি বেরুতে পারিনা বলে তুমিও সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে বসে থাকবে, এ আমার ভালো লাগে না। আমারও কাজ রয়েছে। একটা জিনিষ খাওয়াবো। কিন্তু আগে বলব না…'

'এই টাকায় এতো সব কি করে' তুমি খাওয়াও ভেবে আশ্চর্য্য হই…'

'এসব বাড়ীভাড়ার টাকার বদলে আসে।'সকৌতুকে কহিল কল্যাণী। 'এখন উঠে পড়ো। কিন্তু ফিরতে বেশি দেরি করো না। আর দয়া করে' সিনেমাঅলাদের কাছে ধর্ণা দিতে যেও না যেন…'

চমকাইয়া উঠিল শ্রীমন্ত। কিন্তু কিছু বলিল না। উঠিয়া দাঁড়াইল।

'শুনছিস নিমাই, তোর জন্ম আমরা একটা খুব ভালো চাকরি জোগাড় করেছি। মাসে পঁচিশ টাকা মাইনে পাবি। মানে, প্রতি মাসে এখানের চেয়ে সাত টাকা করে' বেশী…'

রন্ধনরতা কল্যাণীর কাছে ফাইফরমাশ খাটিবার অপেক্ষায় নিমাই নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, বৌদির কথা শুনিয়া সে না-বুঝার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইল। দেখিল, কল্যাণী নতদৃষ্টি কড়াইয়ের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াছে; কম-জোরের আলোয় তার মুখের ভাব লক্ষ্য করা গেল না।

'কেমন, রাজিতো'?

'না বৌদি'। এইবার নিমাই কল্যাণীর আগের বক্তব্য উপলব্ধি করিয়া কহিল, "আমার বেশি মাইনের দরকার নেই। এখানেই আমি বেশ সুখে আছি। চিরকাল এখানেই …'

দূর বোকা, হাতায় রন্ধনদ্রব্য তুলিয়া সাবধানে তাহা দুএকবার টিপিয়া দেখিয়া কল্যাণী কহিল, 'সব-বারই নিজের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করা উচিত। এমন কি সুযোগ পেলে বাড়ীর চাকরি ছেড়ে অফিসের চাকরি নিতে হবে বা নিজেই কোনও ব্যবস্থা করতে হবে। এ যে চায় না, তার তো প্রাণই নেই, সে জড়-পদার্থের…'

'সেই সুযোগ যখন পাব, তখন এখান থেকেই আপনার আশীর্ব্বাদ নিয়ে চলে যাব। কিন্তু এ-বাড়ী সে-বাড়ী চাকরি করে' বেড়াতে আমার ভালো লাগে না। আমরা গরিব গেরস্ত পরিবার ছিলাম, কিন্তু বাড়ীর চাকরি কেউ কোনও দিন করে নি। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে…' বলিতে বলিতে নিমাইয়ের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল।

'নিমাই, আমি বলছি তুই এই চাকরি নে।' কল্যাণী বিব্রত হইয়া প্রায় সস্নেহে কহিল, 'এরা ভালো লোক। এদের টাকা পয়সা আছে। ভালো খাবি পরবি। বড় ব্যবসা আছে। তাদের খুসি করতে পারলে হয়তো আফিসে ঢুকে পড়তে পারবি। এখানে কোনও আশা নেই, কোনও ভবিষ্যত নাই। না তোর, না আমাদের। আমি বলছি তুই যা। তোর ভালো হবে। আমরা এত কোণঠাসা হয়ে আছি যে, তোর ব্যয় বহন করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে…'

চাকতে নিমাই রান্নাঘরের ক্ষীণ আলোকে কল্যাণীর গালের উপর চোখের জলের দুটো বড় ফোঁটা লক্ষ্য করিল। বৌদিকে সে শক্তিময়ী নারী বলিয়া জানিত। তার এই ভাব-পরিবর্ত্তনে নিমাই বিপন্ন বোধ করিল।

'আমাকে মাইনে নাই দিলেন বৌদি। আমি অমনি খোকনের কাছে থাকব…'

'তা হয় না।' কল্যাণী কহিল। 'কাল তো পয়লা। কাল থেকেই সেখানে কাজে লেগে যা। এখানে তো আমরা রইলামই। যখনই তোর ইচ্ছে হবে, আসিস। খোকনের সঙ্গে খেলা করিস। চিরকাল তোকে আমরা নিজের লোক মনে করব।…ঐ বোধহয় জেগেছে খোকন। যা তো বাবা, তাড়াতাড়ি যা…'

দারিদ্র্যের দুঃখ, আত্মীয়বিয়োগের দুঃখ, নিরপরাধকে আঘাত করিবার দুঃখ পুঞ্জীভূত হইয়া ঠেলিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে নিজের দুই চোখ চাপা দিল কল্যাণী।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ—মরিবে কাহারা ?’

গত ১০।১৫ দিন ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গে একটা পরম অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে। সকলেই ভাবিতেছে—কখন কি হয়! সব দিক হইতেই আমাদের আর একটা সঙ্কট-সংশয়ের সময় আসিয়াছে। এখন ঘরে ফসল তুলিবার মরশুম। নবান্ন আসন্ন। অথচ প্রশাসনে স্থিরতা নাই বলিয়া, নীতি স্থির করিতে টালবাহানা ঘটিতেছে বলিয়া ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে ফসলের দাম হু-হু করিয়া পড়িতেছে। চাষীর ঘরে হাসি ফুটিবে কী করিয়া, সময় বহিয়া গেলে তাহার অভিশাপ কে কুড়াইবে? গ্রামে দাম পড়িয়াছে, কিন্তু শহরের কোন সুরাহা হয় নাই—একটি সুবৎসরের আশীর্বাদকে কী করিয়া গুদামে বন্দী করা যায়, মজুতদারেরা সেই ফন্দী আঁটিতেছে। চব্বিশপরগণা, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে বিরোধ রক্তাক্ত রূপ লইতেছে। “রক্তবন্যা” রাজনীতিকে না হউক, শেষ পর্যন্ত চাষের জমি কি ভিজাইবে?

তারিখ লইয়া ইজ্জতের লড়াইটা দেশের সর্বোচ্চ এজলাসে পাঠানোর চেষ্টা চলিয়াছে, নতুবা রাজ্য সরকারকে আমরা আর একটু নমনীয় হইতে বলিতাম। অনিশ্চয়তা কাহারও পক্ষে শুভ নয়।

যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে হয়ত মারাত্মক। বিধানসভায় স্থানই যখন সর্বোচ্চ তখন সেখানে একটা ফয়শলা হইয়া গেলে তাঁহারাই নৈতিক বল ফিরিয়া পাইতেন। সাংবিধানিক কসরতে না হয় অপরপক্ষকে জব্দ করা গেল (যাইবে কি?)। কিন্তু গরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিজেদেরও ততটা ভরসা নাই বলিয়া মেয়াদ সওয়া হইল কি না, এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটাকে কি নিরস্ত করা যাইবে? “রক্তবন্যা”র ইঙ্গিতটাও সেই কারণেই বেমানান ঠেকে। ‘জনসেবা’ করিবেন বলিয়াই সব সরকারই গদিতে বসেন, কেবল গদির জন্য গদি নয়! “আফটার মি দি ডেলিউজ”—আমার পরেই প্রলয় (বর্ত্তমান প্রসঙ্গে রক্তবন্যা) কথাটা একান্তই মধ্যযুগীয়, গণতান্ত্রিক যুগে সাজে কি?

বিধান সভা দুইদিন পূর্ব্বে ডাকিলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হইত বুঝিতে পারি না। গত কয়েক দিন হইতে দেখা যাইতেছে রাজ্যপালের অধিকার সীমা কি, এবং তাহা কতদূর যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে রাজ্যশাসনে মুখ্যমন্ত্রী বড়, না রাজ্যপাল।

ফ্রণ্ট সরকার বলেন যে, এখন ‘প্রোকিউরমেন্টের’ সময়, এখন বিধান সভা ডাকিলে মন্ত্রীদের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা যায়—কয়জন মন্ত্রী এখন গ্রামে গ্রামে ধান্য সংগহের কাজে কলিকাতার বাহিরে গেলেন? দেখা যাইতেছে সব কয়জন মন্ত্রীই, মায় খাদ্য—মুখ্যমন্ত্রীও গদি লইয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত গদি-বনাম গদাযুদ্ধের প্রস্তুতি-পর্ব্ব চালাইতেছেন। কথায় ও কাজে মিল কোথায় গেল?

কে গদিতে বসিবে আর কে ছেঁড়া মাদুরে, তাহা লইয়া আমাদের বিশেষ মাথা ব্যথা নাই, আমাদের চিন্তা এখন কি করিয়া আমরা গদাঘাত হইতে মাথা বাঁচাইব, কারণ ফ্রন্টার কর্ত্তারা স্পষ্ট এবং সোজা কথায় ঘোষণা করিয়াছেন যে—তাহারা গদিচ্যুত হইলে রাজ্যে ‘রক্তবন্যা বহিবে’!

ভয়ের কথা, কিন্তু কাহাদের রক্ত কাহারা বহাইয়া দেশে রক্তবন্যা আনিবে? কলহটা হইল কেন্দ্রীয় কর্ত্তা এবং কংগ্রেসের সঙ্গে—কিন্তু তাহার চোপটা আমাদের উপর পড়িল কেন? ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে রক্তবন্যা বহাইবার জন্য দিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্লাড্ ব্যাঙ্ক হইতে রক্ত প্রেরণ করা হইবে না। অতএব রক্তটা নিরীহ বঙ্গবাসীদের নিকট হইতেই আদায় করার প্ল্যান করিয়াছেন ফ্রন্টীয় মোড়লগণ।

যুক্তফ্রণ্টের সি, পি, আই (এম) নেতারা যদি ভাবিয়া থাকেন, তাঁহারা অনায়াসে আমাদের দেহ হইতে তাঁহাদের খুসিমত রক্ত গ্রহণ করিবেন, তবে ভুল করিবেন। পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টির কাজে, অবশ্যই সি পি আই এম এবং সমগোষ্ঠির অন্যান্য দু-একটি দল-সমর্থকদের বিশেষ কেরামতী আছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমন অন্য বৃহত্তর জনসংখ্যা নিশ্চয়ই আছে যাহাদের ষ্ট্রীট ফাইটিং এবং গুণ্ডাদমনে বিশেষ পারদর্শিতা যে আছে, প্রয়োজন হইলে তাহার প্রমাণ মিলিবে। তবে ইহারা সরকারি বাস ট্রাম পোড়াইবে না। গরীবদের দোকান লুটও করিবে না, রাস্তার নিরীহ লোকের উপর বীরত্বের অত্যাচার কখনও চালাইবে না।

যুক্তফ্রন্টীয় নেতারা প্রশাসনিক সর্ব্ব কাজে ব্যর্থ হইয়া আজ হুমকি দিয়া মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া (অ) রাজত্ব কায়েম করিবার, পরিকল্পনা করিতেছেন। কিন্তু হুমকীর সঙ্গে রক্তবন্যা বহাইবার আস্ফালন দ্বারা কাজ উদ্ধার হইবে কি? ঐ-দুইটি কার্য্য কাহারো বা কোন পার্টির মনোপলি কারবার নহে। কথাটা মনে রাখা ভাল।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আমরা অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়াছিলাম, এমনও বলিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসকে যদি বিশ বৎসর সময় দেশ দিয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টকে পাঁচ বৎসর সময় দিতে দোষ কি। কিন্তু মাত্র ৮।৯ মাসেই আমাদের সর্ব্ববিষয়ে নিরাশ করিয়া ফ্রন্ট সরকার অযোগ্যতা বা ব্যর্থতার দিক হইতে কংগ্রেসের বিশ বৎসরের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে কয়েকদিন পূর্ব্বে উদ্বাস্তদের এক জনসভায় শ্রীজ্যোতিবসু যে-ঘোষণা করেন, তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীবসু বলেন যে, "দলত্যাগী এম-এল-এ-দের বিধান সভায় ভোট দিবার অধিকার নাই (কবে স্থির হইল?)। তিনি আরো বলেন যে, ডঃ ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী এবং বিশ্বাসঘাতকদের গদিতে বসিতে দেওয়া হইবে না। ডঃ ঘোষের সমাজে (কোন্ সমাজে?) বাস করার অধিকার নাই! ইহাদের দ্বীপান্তরে কোনো কলোনীতে থাকিবার ব্যবস্থা করা উচিত—।" অতি উত্তম প্রস্তাব। বর্ত্তমান সমাজের আবহাওয়া যে প্রকার হইয়াছে, তাহাতে আমরাও ডঃ ঘোষের সঙ্গে দ্বীপান্তরে যাইতে রাজী। ইহাতে আর কিছু না হউক—ভদ্রসঙ্গ পাওয়া যাইবে। কিন্তু 'বিশ্বাসঘাতক' হইলেন ডঃ ঘোষ কেন বুঝিলাম না। কাহার কি বিশ্বাস তিনি ভঙ্গ করিলেন?

বিশ্বাসঘাতক যদি বলিতে হয়, আজ পর্যন্ত (২০-১১-৬৭) গদিয়ান নেতাদেরই বলিতে হয়। দেশ তাঁহাদের উপর যে-বিশ্বাস স্থাপন করে, ফ্রন্টীয় সরকার সেই বিশ্বাস সকল দিক হইতে ভঙ্গ করিয়াছেন। ডঃ ঘোষের প্রতিও (যতদিন তিনি মন্ত্রী ছিলেন) বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী কি বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই? একই মন্ত্রীসভায় বসিয়া অন্য আর একজন সহ-মন্ত্রীকে কাঁচা ভাষায় গালাগালি করা—কোন্ বিশ্বাস কিংবা ভদ্রতার পরিচায়ক, আমাদের জানা নাই। যে-মানুষটিকে দেশের সকলেই প্রচুর শ্রদ্ধা করিত এবং যাঁহার উপর প্রচণ্ড একটা বিশ্বাসও স্থাপন করে, সেই শ্রী অজ(য়) মুখার্জ্জিও আজও ফন্টীয় পাপচক্রে নিজেকে কোথায় নামাইয়াছেন একথা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। কূল রাখিতে তাঁহার দুইকূল গিয়া তিনি এবার বোধ হয় অকূলে ভাসিলেন।

অদ্য ২১এ নভেম্বর ১৯৬৭। শেষ পর্যন্ত যাহা হইবার তাহাই ঘটিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল। 'বিশ্বাসঘাতক' ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ দ্বিতীয় বার হইলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী—। কিন্তু মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইয়া রাজ্যপাল নব গঠিত মাইনরিটি পার্টির নেতাকে কি কারণে এবং কোন্ সাংবিধানিক্ ধারার বলে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন, বুঝা

গেল না। ১৩১ জন সদস্যযুক্ত কংগ্রেসী দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী করিলে হয়ত কথা উঠিত না, কিন্তু যে সংখ্যালঘুতার কারণে যুক্ত-ফ্রন্ট মন্ত্রীদল গদিচ্যুত হইলেন—সেই সংখ্যা-লঘুতা থাকা সত্ত্বেও ডঃ ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারটা অনেকে হয়ত সাংবিধানিক পরিহাস বলিয়া মনে করিবেন।

নব-মুখ্যমন্ত্রীও বোধ হয় এবার তাঁহার বহু নিন্দিত সেই কংগ্রেসী দলের হাতে ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন।

ডঃ ঘোষ এত ঘোল খাইয়াও ঘোলের সাধ মিটিল না!

ইহার পর কি?

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী বদল হইল গত (২১-১১-৬৭) তারিখ রাত্রি ৮।। টার পর। এবার ডঃ ঘোষ মুখ্য-মন্ত্রীর গদীতে আসীন হইলেন কিন্তু প্রশ্ন রহিয়া গেল নেতাদিগের জন্ত। আজ (২৩-১১-৬৭) এই প্রশ্নের জবাব কেহই বোধহয় দিতে পারিবেন না। মাত্র ৯ মাসের মধ্যে দুইবার মন্ত্রী-মণ্ডলীর পালা বদল, রাজনৈতিক পাশা খেলোয়াড়দের পক্ষে হয়ত ভাল, কিন্তু দেশের রাজনৈতিক সুস্থতার লক্ষণ নিশ্চয়ই নহে। এবার এ-রাজ্যে পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে 'আবহাওয়ার' যে-প্রকার পরিবর্তন দেখা দিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় রাজ্যে পলিটিক্যাল টেম্পারেচার নিচের' দিকে না গিয়া হয়ত কিছুকাল ক্রমাগত উপরের দিকেই উঠিতে থাকিবে। ফলে পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্ববিষয়ে-সর্বদিকে-সর্বরকমে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে নিশ্চয়ই।

ফ্রন্ট-মন্ত্রীমণ্ডলী বাতিল করাটা রাজ্যপালের পক্ষে সাংবিধানিক মতে এবং বিচারে ন্যায় কি অন্যায় হইল, সে-বিষয় এখনো কিছুদিন সাংবিধানিক পণ্ডিতমহলে নৈয়ায়িক যুক্তিতর্ক চলিতে থাকিবে কিন্তু পাশার দান যখন পড়িয়াছে তখন এ বিষয় কোন যুক্তিতর্ক আপাতত বেকার।

মনে হয়—মন্ত্রী বাতিল এবং নবমন্ত্রী নিয়োগ ব্যাপারটা একটা অনাবশ্যক এবং অশিষ্ট তাড়াহুড়ার মধ্যেই সংঘটিত হইল। শেষদান ফেলিবার পূর্বে রাজ্যপাল আর কয়েকটা দিন যদি ধৈর্য্য রক্ষা করিতেন আর বেশী কিছু ক্ষতি হইত কি? অন্তপক্ষও অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীমহলও জিদ না করিয়া যদি রাজ্যপালের অনুরোধক্রমে বিধানসভা ডাকিবার তারিখ ১৮।১২।৬৭ আর কয়েকটা দিন আগে অর্থাৎ ৩০।১১।৬৭ তারিখ স্থির করিয়া শক্তি-পরীক্ষার পালাটা শেষ করিতেন, তাঁহাদের মানে হানি হইত বলিয়া মনে হয় না। দুই পক্ষই জিদের বশবর্তী না হইয়া যদি একটু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিতেন, সমস্ত ব্যাপারটা বোধহয় শোভন সুন্দর,—গ্রেস ফুল হইত এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় পক্ষ,' অর্থাৎ সকল-অবস্থায় সকল বলবান পক্ষের নিকট হইতে যাহারা পেটে-ভাত-নাপাইলেও পৃষ্ঠে প্রচুর প্রহার পাইতে চিরকাল অভ্যস্ত, সেই গরীব সাধারণজনও অযথা নিপীড়ন হইতে হয়ত রক্ষা পাইত।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মনে নিজেদের দলীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা সম্পর্কে গভীর না হইলেও বেশ সন্দেহ ছিল এবং তাহা অজয়বাবু এবং জ্যোতিবসুর কথাবার্তায় বুঝা গিয়াছিল। সন্দেহ সত্য কিংবা মিথ্যা, তাহা যাচাই করিবার জন্ত তারিখের জিদ না করিয়া রাজ্যপালের অনুরোধ মত, ৩০শে নভেম্বর কিংবা তাহার দু-তিন দিন পরেই বিধানসভা ডাকিলে রাজ্যপালকে হয়ত মন্ত্রী বাতিল করার মত একটা দুর্ভাগ্যজনক অপ্রীতিকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইত না।

নূতন মুখ্যমন্ত্রী সর্বসাধারণকে শান্তিরক্ষার জন্ত আবেদন করিয়াছেন—কিন্তু ২২।১১'৬৭ তারিখে বৈকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শান্তির আবেদন—বিপরীত ভাবেই পালিত হইয়াছে এবং ইহা দেখিয়া মনে হয়—পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ নাগরিকদের এখন বেশ কিছুকাল, রক্ত-বন্যায় না হউক আগুনে এবং অন্তপ্রকার শান্তি নাশকতার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তায় বাস করিতে হইবে। স্বাভাবিক জীবন এখন কিছুকাল স্থগিত রহিল।

রাগিয়া 'লাল' না 'লাল' হইয়া রাগিলেন?

আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পরম গান্ধীবাদী

অহিংস দেশ এবং জনসেবক শ্রীঅজয় মুখার্জি মন্ত্রিত্ব সমস্যার বিপাকে পড়িয়া কিংবা চৌদ্দ-ঘোড়ার প্রশাসনিযান চালাইতে গিয়া হঠাৎ দেশে রক্তবন্যা বহাইবার হুমকি দিলেন কেন কিছুদিন পূর্ব্বে! কথায় বলে "বিড়াল বনে গেলেই বনবিড়াল" হয়—অজয়বাবুরও কি সেই দশা হইল? কামরাজ কামড়ে যে মন্ত্রিত্ব তিনি অবহেলায় পরিত্যাগ করেন, ভাগ্যের পরিহাসে আবার সেই মন্ত্রিত্ব—একেবারে তাঁহার কল্পনার অতীত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া তিনি কি আজ মোহগ্রস্ত হইয়া তাঁহার এতকালের জীবনাদর্শ এবং জনকল্যাণব্রতের কথা ভুলিয়া গিয়া পশ্চিমবঙ্গের রাইটার্স-ভবনে মুখ্য মন্ত্রীর সিংহাসনকেই তাঁহার শেষ আশ্রয় এবং 'বৈকুণ্ঠধাম' বলিয়া গ্রহণ করিলেন?

কিছুদিন পূর্ব্বে নয়া দিল্লীর কালীবাড়ীতে এক জনসভায় ভাষণদানকালে অজয়বাবু প্রসঙ্গক্রমে পশ্চিমবঙ্গে রক্তবন্যা বহিয়া যাইতে পারে বলিয়া হুমকি দিয়াছেন। সত্যকথা, কাহার রক্ত কে বহাইবে, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও বুঝিতে কষ্ট হয় না। কেন রক্তবন্যা বহিবে তাহাও অতি সহজেই বুঝা যায়। রক্তবন্যা বহিবার কারণ হইবে এই যে, পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন যে-কোন কারণেই ঘটুক না কেন, ইহা ঘটিয়াছে গত (২১-১২-৬৭ তারিখে, রাত্রি ৮টায়), পশ্চিমবঙ্গবাসী তাহা সহ্য করিবে না, এবং সহ্য করিবে না বলিয়াই হঠাৎ সেই বহুকথিত সড়কা-"রিভলিউশন" শুরু করিয়া ভ্রাতৃহত্যার পরম পুণ্যকর্ম্ম তথা দেশ-সেবার সঙ্গে দেশ উদ্ধারের ব্রত পালনে উদ্যোগী হইবে—ইহাতে অজয়বাবুর মনে কোন সন্দেহ নাই এবং তাঁহার মনের গোপন বাসনাও বোধহয় এই প্রকার after me the deluge অর্থাৎ 'আমার পরে বন্যা (বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রক্তবন্যা!) অজয়বাবুর নিকট হইতে কেহ এই প্রকার 'লাল হুমকির' কথা আশা করে নাই।

এবার অজয়বাবুর মুখ দিয়া যে-প্রকার বিচিত্র এবং বিবিধ প্রকার অভূতপূর্ব্ব বাণী নির্গত হইয়াছে, তাহা আমরা এতকাল 'তীব্র লালেদের' নিকট হইতেই শুনিতে অভ্যস্ত ছিলাম। তবে কি শুদ্ধশান্ত নিরীহ, শ্বেতখদ্দরধারী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় নব 'জ্যোতি'পূর্ণ নূতন আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন? এতকাল বিশ্বাস ছিল যে, গান্ধীবাদী অহিংস অজয়বাবুর রক্তাক্ত বিপ্লবে কোন বিশ্বাস নাই। তাহা হইলে কি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তাগীদারদের বিশেষ কয়েকজনের সহিত একই সুরে গীত গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন? সত্য কথা স্বীকার করিতে দোষ নাই, অজয়বাবু গত কিছুকাল হইতে (মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর)—যে ভাবে তড়িৎগতিতে তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া সেলফ্ কন্‌ট্রাডিক্‌শন্ করিতেছিলেন, তাহাতে আমরা অবাক হই! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এ-হেন মতিগতি আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক! আশা করি গদিচ্যুত শ্রীঅজয় তাঁহার মানসিক স্বাস্থ্য পূর্ণ বিশ্রামের ফলে ফিরিয়া পাইবেন।

অজয়বাবুও কি রাজ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির পক্ষে?

অজয়বাবু নিশ্চয় স্বীকার করিবেন যে, গত কিছুদিন ধরিয়া ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার দলীয়দের বিরুদ্ধে অনেক প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন (ইঁহাদের মধ্যে দু-একজন মহামান্য মন্ত্রীও আছেন)—এবং যাঁহারা এই ভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা 'উচ্চতর' মহল হইতে আর সামান্য আস্কারা-উৎসাহ পাইলে কি অঘটন ঘটাইতে পারেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না! আমরা মুখ্যমন্ত্রী তথা অন্যান্য সকল মন্ত্রীর নিকট হইতে এমন ভাষণাদি আশা করি, যাহাতে কোন প্রকার দায়িত্বহীনতা এবং মানুষ ক্ষেপাইবার মত কোন প্রকার মালমশলা না থাকে। দুঃখের বিষয় এ-রাজ্যের বর্ত্তমান, (এখন প্রাক্তন) "বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া" মন্ত্রীদের প্রায় সকলেই এমন প্রকার ভাষণ এবং বাণী দান করেন যাহাতে বিস্ফোরক বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশেষ সুবিধার নহে, সব কিছুই অস্থির সাধারণ মানুষের মন মেজাজও বিবিধ কারণে প্রায় উন্মাদের মত, এমন অবস্থায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি "রক্তবন্যা" বহাইবার ইঙ্গিত দেন প্রাকাশ্য ভাষণে এবং দেশের ও মানুষের অবস্থা বুঝিয়া নিজের

ভাষণে, এমন কি সাধারণ কথাবার্তাতেও, দায়িত্বহীনতার সহিত অর্বাচীনতার পরিচয় দান করেন, তাহা হইলে তিনি এমন একটা সমস্যাকণ্টকিত রাজ্যের প্রধান প্রশাসকের পদ অলঙ্কৃত না কলঙ্কিত করিয়া বিদায় লইলেন, অজয়বাবু নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।

আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, অজয়বাবু পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। গত কিছু কাল হইতে তিনি রাজ্যের শিল্প-ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনের জন্য শুভ প্রয়াস করিতেছিলেন এবং প্রায় উন্মাদ শ্রমমন্ত্রীকে পাশে সরাইয়া সর্ববিধ শিল্প বিরোধ সমাধানের প্রয়াস নিজেই চালাইতেছিলেন এবং যাহার ফলে এ-ক্ষেত্রে কিছু-উন্নতিও দেখা যায়। জানিতাম প্রাক্তন জোড়াতালি মন্ত্রী-মণ্ডলী থাকিবে না···কিন্তু যাহাই ঘটুক না কেন, অজয়বাবু এমন কিছু করিবেন না, যাহাতে তাহার "ইমেজ" যেন লোকের কাছে একেবারে নষ্ট হইয়া না যায় এ-আশা ছিল। এ-আশা তিনি নষ্ট করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের ভূমিকা ?

রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী তথা অন্যান্য কোন কোন মন্ত্রীর প্রকাশ্য ভাষণে সাধারণকে উত্তপ্ত করিবার মত বহু মালমশলাই ছিল। দু-একটি বিশেষ পার্টির নেতা এবং পদাতিকদের নিকট হইতে জনগণকে অযথা ক্ষিপ্ত করিয়া একটা গণ-গণ্ডগোল সৃষ্টি করিবার মত বাতচিত এবং প্রয়াস-প্রচেষ্টা শুনিতে এবং দেখিতে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু চিরকাল যাঁহাদের প্রকৃত দেশভক্ত এবং জনহিতৈষী বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, তাঁহাদের নিকট হইতে হঠাৎমানুষ ক্ষেপাইবার মত কোন কিছু পাইলে কেবল অবাকই হই না, দুঃখবোধও করি। তাহার উপর যখন দেখি 'প্রচার-গৌরবে' গরীয়ান কোন কোন দৈনিক···নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আপত্তিকর আচরণ এবং ভাষণাদির কোন প্রতিবাদ না করিয়া, সেইসব আপত্তিকর উক্তি ইত্যাদিকে উৎকটভাবে 'ফ্ল্যাশ' করে এবং এমনভাবে করে যাহাতে সেই সব, পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেই। অন্য দেশে সংবাদপত্রকে 'ফোর্থ ষ্টেট' বলা হয়, এক কালে এদেশেও হয়ত ইহাই ছিল, কিন্তু বর্তমানে (বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গে (দু-একটি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া) সংবাদপত্র-জগতের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম এবং নীতি দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—সংবাদপত্র আজ আর 'ফোর্থ ষ্টেট্' নহে—সংবাদপত্র আজ এ-দেশে 'ইন্ এ ভেরি ডিপলোরেব্ল্ ষ্টেট্।

যে-সংবাদপত্র একদা জনমত গঠন করিত, জনগণকে আদর্শ পথ দেখাইত সর্ব বিষয়ে, সেই সংবাদপত্রই আজ জনগণের প্রদর্শিত পথে চলিতেছে, জনগণের মতের বন্যায় গা ভাসাইতে বাধ্য হইতেছে! শ্রীঅজয় মুখার্জির বারুদগন্ধী, দিল্লীর কালীবাড়ী ভাষণের নিন্দা, পশ্চিমবঙ্গে একটিমাত্র দৈনিকের সম্পাদকীয়তে করা হইয়াছে—অন্য কোথাও চোখে পড়ে নাই।

এমন কতকগুলি দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রের উদ্ভব এ-রাজ্যে গত কিছুকালের মধ্যে হইয়াছে, যাহাদের ক্রিড্ একমাত্র পার্টির স্বার্থরক্ষা করা এবং জনচিত্তে একটা ক্রণিক্ বিক্ষোভের স্রোত প্রবাহিত রাখা। দেশের কি হিত ইহাতে হইবে জানি না।

বিগত ছয় সাত মাসে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি—

বর্তমান বৎসরে মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম বঙ্গে ৬০ লক্ষ ঘন্টারও বেশী কাজের সময় নষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে রাজ্যের কল-কারখানায় উৎপাদন কম হইয়াছে প্রায় ৩৫ কোটি টাকার। ৬০ লক্ষ ঘণ্টা কাজের সময় নষ্ট হওয়াতে শ্রমিকরাও এই সময়ের জন্য কোন মজুরী পায় নাই। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের এই ক্ষয়-ক্ষতির জন্য প্রধানত দায়ী শ্রমিক মহলে অশান্তি, বহু ক্ষেত্রে অরাজকতা এবং সর্বোপরি রাজ্যের এক তরফা তথা একদেশদর্শী শ্রমনীতি—যাহার প্রধান রচয়িতা আমাদের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী।

মাসে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫০ হাজার শ্রমিকের চাকরি গিয়াছে। ইহা ছাড়া কারখানা বন্ধ, লে-অব্, লক-আউটের ফলে বেকার হইয়াছেন লক্ষাধিক মজদুর। মন্দা এবং কর মালের শ্রমিক অশান্তিই প্রধানত এজন্য দায়ী বলে দায়িত্ব-শীল মহল মনে করেছেন।

আর একটু বিশদ হিসাবে দেখা যায়, ১৯৬৬ সালে সারা

বছরে ১৫৭ ধর্মঘট হয়। এ বছর মার্চ জুলাই—এই পাঁচ মাসেই ধর্মঘটের সংখ্যা ১৫৪।

গত বছরের তুলনায় এ বছর নতুন চাকরির সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯৬৬ সালে এপ্রিল-সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গে ১১০টি নতুন কারখানা রেজেষ্ট্রি হয়। তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল ৭৮৫০ জনের। এবার এই সময়ের নতুন কারখানা রেজেষ্ট্রি হয়েছে মাত্র ৭৮—তাহাতে কাজ হইবে মাত্র ৩৮০০ জনের।

শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে মূলধন সরাইয়া লইতেছেন কি? অন্ততঃ তিনটি বড় কারখানার কর্তৃপক্ষ যে তাঁহাদের সদর অফিস আংশিকভাবে অন্যত্র সরাইয়া লইয়াছেন, এ খবর পাকা।

একটি বড় আমেরিকান কারখানার সম্প্রসারণের কাজ স্থগিত রাখা হইয়াছে। যাঁহাদের টাকা বহুদিন যাবৎ কারখানায় খাটিতেছে, তাঁহাদের পক্ষে মূলধন অন্যত্র লওয়া অবশ্যই সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে গোটা কারখানাটাই সরাইয়া লইতে হয়।

তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, শ্রমিক বিক্ষোভের ফলে পশ্চিমবঙ্গে আর কেহ নতুন করিয়া খাটাতে সাহস পাইতেছে না। জে আর ডি টাটা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, তিনি আর এই রাজ্যে বড় রকম কাজে হাত দিবেন না। স্যার বীরেন মুখারজি সেদিন দুঃখ করিয়া বলেন, তাঁহারই নিজের দেশবাসীর অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁর এত বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইতে বসিয়াছে। শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা বলেন, ইংরেজ ও আমেরিকান শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে অর্থবিনিয়োগে রাজী হইতেছেন না।

গত আট মাসে ৩৬টি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে নূতন কারখানা স্থাপন অথবা পুরাতন কারখানার সম্প্রসারণের জন্য লাইসেন্স পাইয়াছেন। এই সব কোম্পানীর কর্তৃপক্ষরা কি হাত গুটিয়ে বসিয়া আছেন, না শিল্পে শান্তি ফিরে আসার আশায় রহিয়াছেন? মনে হয় তাহাই। তবে প্রশ্ন, যুক্ত ফ্রন্ট সরকার তাঁদের মনে ভরসা ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন কি?

বড় বড় নূতন কারখানা—বিশেষ করিয়া বিদেশী শিল্পপতিদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলি—কাজ চালু করার কিছুকাল পূর্ব্বেই শ্রমিকদের বেতনের হার নির্দ্ধারণের জন্য বণিক-সভাগুলির পরামর্শ লইয়া থাকেন। গত আট মাসে এইরূপ পরামর্শ লইতে কেহই তাঁহাদের কাছে আসেন নাই। কাজেই কোন বড় কারখানা এই কয় মাসে গড়িয়া উঠে নাই বলা যাইতে পারে।

বে-সরকারী শিল্পক্ষেত্রে মোট ৩৪১ কারখানায় ঘেরাও ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটে। তাহার মধ্যে ৫০টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেই বিক্ষোভের আঘাত লাগে সবচেয়ে বেশী। ঘেরাও দুই থেকে ২০০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জিও স্বীকার করেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা বাড়াবাড়ি করেছেন।

শ্রমিক-বিক্ষোভ বর্ত্তমানে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। মনে হয় সরকার শ্রমনীতির পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইতেছেন।

এই সম্পর্কে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সমীক্ষা হইতে জানা যায় যে, গত ছ'মাসে ঘেরাও এবং অন্যান্য শ্রমিক বিক্ষোভ-হাঙ্গামার কারণে ৩২টি প্রতিষ্ঠানে ৩কোটি ৭০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার মূল্যের উৎপাদন নষ্ট হইয়াছে। শ্রমঘণ্টা নষ্ট হইয়াছে ৫৮ লক্ষ। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সমীক্ষাতে আরো প্রকাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যে ১৪টি কারখানা বন্ধ হইয়াছে তাহাতে বেকার গিয়াছে ১০০, ১৯, ৩১৫ শ্রম-ঘণ্টা। চটকলগুলিতে নষ্ট হইয়াছে ৩৫,৭৮,১৬৮ ঘণ্টা।

বেঙ্গল চেম্বারের রিপোর্টে আরো জানা যায় যে, তাহাদের ৩২টি সদস্য-প্রতিষ্ঠানে ঘেরাও-এর ফলে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার উৎপাদন নষ্ট হইয়াছে। ধর্ম-ঘটের ফলে নষ্ট হইয়াছে ৭৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার উৎপাদন। 'গো-স্লো'র কারণে ক্ষতি হইয়াছে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। বিগত ২৪এ আগষ্ট সাধারণ ধর্মঘটের একটি মাত্র দিনে ২৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার উৎপাদন নষ্ট হয়। বেকার যায় ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার শ্রম-ঘণ্টা।

বেঙ্গল চেম্বারের প্রদত্ত তথ্যে আরো প্রকাশ যে, গত মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর এই ৭ মাসে অন্তত ৩৪১টি শিল্প এবং অন্যান্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বিবিধ প্রকার অশান্তির ঘটনা ঘটে। ৭১টি কল-কারখানা এবং ব্যবসায়-সংস্থার ঘেরাও-য়ের সঙ্গে পরিচালনা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং অফিসারদের উপর হামলার সঙ্গে নানাপ্রকার নিপীড়নও চালানো হয়।

সকল নিরাশার মধ্যে এক সামান্য আশার কথা এই যে, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক হইতে ঘেরাও এবং অন্যবিধ দৈহিক হামলার তীব্রতা কিছু পরিমাণে কমিয়াছে।

সরকারী-বেসরকারী সমীক্ষায় মোটামুটি একটা ক্ষয়-ক্ষতির আভাস হয়ত পাওয়া যাইবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে বিগত কয়েকমাসে (প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে) প্রকৃত ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কি এবং কত ব্যাপক তাহার যথার্থ পরিমাপ হইবে—আগামী দুই বৎসরে। শিল্পক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের। শ্রমিক-মালিক বিরোধের মধ্যে তৃতীয় পার্টির আবির্ভাব এবং তাহার উপর প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রীর অত্যধিক শ্রমিক-প্রীতি—(যে পার্টি শ্রমিকও নহে মালিকও নহে এবং এই পার্টির প্রধানতম কাজ দুই বিবদমান দুইটি পক্ষের নিকট হইতেই সুযোগ-সুবিধামত দোহন ও চৌথ আদায়) এই সম্পর্ককে বহু ক্ষেত্রে অযথা দীর্ঘস্থায়ী করার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যক্তিগত আর্থিক ও অন্যবিধ আদায়ের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পরিণত করিতেছে। এই তৃতীয় পার্টির কলাকৌশলই অনেক সময় সামান্য মতবিরোধকে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে অযথা সংঘাত সংঘর্ষে পরিণত করে। শ্রমিক-মালিক যেখানে নিজেদের মধ্যেই আলোচনার দ্বারা যে-সব মামুলী বিরোধের সহজ মীমাংসা করিয়া লইতে পারে, সেইসব ক্ষেত্রেও পেশাদার 'তৃতীয় পার্টি'—বিরোধের বিষবৃক্ষকে জিয়াইয়া রাখিতে চেষ্টার কোন কৃপণতা করে না। কারণ ইহাদের পক্ষে longer the বিরোধ, more the আদায়!'

আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম যে—এক একটি শিল্পসংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানে একটিমাত্র ইউনিয়ন থাকিলেই ভাল। কারণ, ইহাতে মালিকপক্ষের আলোচনার দ্বারা সকল প্রকার শ্রমবিরোধ মিটানো অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। পক্ষান্তরে, একই প্রতিষ্ঠানে দুই বা ততোধিক ইউনিয়ন থাকিলে—মালিকপক্ষকে বাদ দিয়াও ইণ্টার-ইউনিয়ন কলহ বিবাদ লাগিয়াই থাকিবে। বাস্তবেও ইহা দেখা যাইতেছে। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও সেই তৃতীয় পার্টির স্বার্থের সঙ্গে আধিপত্যের সংগ্রাম।

ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছে, এইবার যদি সুস্থ মনে এবং যথোচিত বুদ্ধিবিবেচনার দ্বারা প্রত্যেক সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারী নিজেদের স্বার্থ এবং ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণে 'তৃতীয় পার্টির' বিষাক্ত সংক্রমণ হইতে ইউনিয়নকে রক্ষা করেন শ্রমিক-মালিক এবং শিল্পের ক্ষেত্রে হয়ত একটা দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণময় আবহাওয়া দেখা যাইতে পারে।

ইংরেজী বনাম হিন্দী

লোকসভায় যাহাতে ইংরেজীকে সহকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা না হয়, সেইজন্য উগ্র হিন্দীওয়ালার গুষ্টি আবার দেশের পক্ষে ক্ষতিকর একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়া নেহরুর প্রতিশ্রুতিকে যাহাতে আইনে পরিণত করা না হয় সেই দুষ্ট প্রয়াস কম করিতেছে না। দেশ এবং ছাত্রদের পাঠ্যক্রম হইতে যাহাতে ইংরেজিকে একেবারেই বিদায় দিবার শুভ চেষ্টাও এই হিন্দী গো-পণ্ডিতের দল বিশেষ ভাবেই করিতেছেন। এ-বিষয়ে কোন প্রকার যুক্তিতর্ক কিংবা আলাপ-আলোচনার ধার তাঁহারা ধারেন না। এই গোষ্টির একমাত্র অস্ত্র জিদ্ এবং জবরদস্তি—ইহাই যে মোক্ষম যুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

উত্তর ভারতে একটির পর একটি হিন্দীভাষী রাজ্যে স্কুল কলেজ হইতে ইংরেজী-বিতাড়নের কাজ দ্রুত অগ্রগতি লাভ করিতেছে। ইহার পরিণাম অন্যান্য রাজ্য-গুলিতে বিশেষ করিয়া প্রতিবেশী রাজ্যের পক্ষে হিতকর হইবে না।

কতকগুলি রাজ্যের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্র হইতে ইংরেজী একেবারে বিদায় হইলে তাহার জের হিসাবে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে দাবি আরও জোরাল হইবে। সেই সঙ্গে আবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের প্রায় সমস্ত উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীর

বদলে আঞ্চলিক ভাষায় পঠনপাঠন ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোর তোড়জোড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এক দিকে হিন্দীর আধিপত্যবিস্তার-চেষ্টা আর এক দিকে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করিবার সিদ্ধান্ত, দুইয়ে মিলিয়া এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেছে যে, ইংরেজী হয়তো শেষ পর্য্যন্ত কোথায়ই ঠাঁই পাইবে না—না উচ্চশিক্ষায়, না কেন্দ্রীয় সরকারী কাজকর্ম্মে।

হিন্দীর পক্ষে প্রবল অভিযানের মধ্যে একমাত্র আশার কথা যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকে বহাল এবং বজায় রাখিবার জন্য দেশের প্রকৃত শিক্ষিত মহলে ক্রমশঃ একটি জনমত গঠিত হইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনের আলোচনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। সম্মেলনে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "ভারতের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজীর স্থান। এই সম্মেলনে যোগদান করেন ভারতের বিবিধ অঞ্চল হইতে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি ছাত্র অভিভাবক, শিক্ষাবিদ্ সকলেই এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীসুব্বা রাও বলেন, ইংরেজীকেও একটি ভারতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়া সংবিধানের অষ্টম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। শ্রীসুব্বারাওয়ের প্রস্তাব অযৌক্তিক নয়। ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট অংশের মাতৃভাষা ইংরেজী, তাহা ছাড়া সরকারী মরজি যাহাই হউক, দরকারী ভাষারূপে ইংরেজী, দেশের সমস্ত অঞ্চলে বহু ব্যবহৃত। কাজেই ইংরেজীকে নিতান্ত বিদেশী ভাষা বলিয়া গণ্য করা যায় না, ইংরেজী কেবল ইংলণ্ডের ভাষাও নয়। ইংলণ্ড ছাড়া অন্য আরও কতকগুলি দেশে ইংরেজীই প্রধান ভাষা, সুতরাং ইংরেজীকে একটি ভারতীয় ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইতে আপত্তি হইবে কেন?

এই প্রসঙ্গে আমরা পত্রান্তরের মন্তব্য উল্লেখ করা যথাযথ বলিয়া মনে করি—

নিয়মতান্ত্রিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নটি ছাড়াও উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরেজীর বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করিয়া লওয়াই বিচক্ষণ নীতি। এতকাল তাহা স্বীকার করিয়া লওয়ায় আপত্তি ওঠে নাই; এখন হিন্দী এবং আঞ্চলিক ভাষার রোলার চালাইয়া উচ্চশিক্ষাকে ধূলিসাৎ করিবার চেষ্টা হইতে বিপত্তির সূত্রপাত হইয়াছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বহুভাষী সংগঠনের যোগসূত্র ইংরেজী; এই যোগসূত্র ছিন্ন হইলে জাতীয় সংহতি টিকাইয়া রাখা যাইবে কি না সন্দেহ। কারণ হিন্দীকে যোগসূত্র হিসাবে মানিয়া লইতে অহিন্দী রাজ্যগুলি আপত্তি করিবেই; আবার অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা ইংরেজীর অভাব পূরণ করা যাইবে না। উচ্চশিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম করিলেও সেই একই সমস্যা, বরঞ্চ সমস্যা আরও কঠিন হইবে।

আইন-আদালতে ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষা কতদূর চালাইতে পারা সম্ভব? কেবল আঞ্চলিক ভাষা প্রীতি দিয়া এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়-না। ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই দেশের আইন-আদালত এবং আইনব্যবসায়ীদের মধ্যে সর্ব্বভারতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আঞ্চলিক ভাষা চালু করা হইলে, সে ঐক্য টুকরা টুকরা হইবেই, বিচার-আচার ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা মারফত যোগাযোগ রাখা দুঃসাধ্য হইবে। এত দিনের চালু ভাষা ইংরেজীকে এভাবে বাদচাল করিতে গিয়া সময় এবং অর্থের যে অপব্যয় হইবে, অনর্থ সৃষ্টি করিবে, তাহাও নিশ্চয়ই দেশের কোন কিছু ভাল করিতে পারে না। আইনের যথাযথ পরিভাষা আঞ্চলিক ভাষায় রচনা ও প্রচলনের কাজটিও শুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা-প্রীতির জোরে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। শ্রীসুব্বা রাও এ বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাস্তব যুক্তি। কেবল আইনের ভাষা নয়, বিবিধ বিজ্ঞান কারিগরী বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি চর্চার

ইংরেজীর বদলে আঞ্চলিক ভাষা চালাইলে একই বিভ্রাট ঘটিবে।

উচ্চশিক্ষায় হিন্দী এবং আঞ্চলিক ভাষার দাবিদারেরা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, ইংরেজীকে যাঁহারা উচ্চশিক্ষার বাহন রাখিতে চান তাঁহারা সকলে উন্নাসিক কেতা-দুরস্ত ব্যক্তি। ডঃ রামস্বামী মুদালিয়র এবং শ্রীসুব্বা রাও দুইজনেই ইহার উচিত জবাব দিয়াছেন। বলিয়াছেন আঞ্চলিক ভাষার উৎকট সমর্থকেরা হীনম্মন্যতাগ্রস্ত; ইংরেজীকে একেবারে হটাইতে না পারিলে যেন আঞ্চলিক-ভাষার মানমর্যাদা থাকে না, এই তাঁহাদের ধারণা! শ্রীকোদণ্ড রাও আরও সরস শ্লেষের সঙ্গে বলিয়াছেন, "প্রেমপত্র" লিখিতে হিন্দী চলে চলুক, সরকারী কাজকর্মে ইংরেজীর বিশিষ্ট স্থান রাখিতেই হইবে। উৎকট হিন্দীপ্রেমী এবং আঞ্চলিক ভাষানুরাগীরা ভুলিয়া বসিয়াছেন, ইংরেজী ভাষা ব্রিটিশ-শাসকেরা এ দেশে জোর করিয়া চাপাইয়া যায় নাই, এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রণী উদ্যোগী হইয়াছিলেন রামমোহন রায় প্রমুখ ভারতীয় চিন্তানায়কেরাই। ইংরেজীকে উচ্চ-শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বিদায় দিলে আধুনিক ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের একটা মূল্যবান অতিপ্রয়োজনীয় অংশ ছাঁটিয়া ফেলা হইবে।

কিন্তু বিদ্যাপতি শ্রীযুক্ত মোরারজীর মত হিন্দী-ফেরীওয়ালাদের নিকট ইংরেজীর পক্ষে কোন সুযুক্তিই 'যুক্তি' নহে। এই হিন্দী পণ্ডিতের সুচিন্তিত বিচারে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় 'সকল ভাষার উপরে হিন্দী সত্য তাহার উপর নাই!' "কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনও গোড়ায় দ্বি-ভাষা সূত্র ধরিয়া, শেষ পর্য্যন্ত নাম সার্থক করিতে মোরারজীর অনুপ্রেরণায় ত্রিভাষা সূত্রই গ্রহণ করিলেন! ডঃ সেনের নাম 'দ্বিগুণা' হইলে আমাদের তথা ভারতের পক্ষে হয়ত কল্যাণ হইত।

ভারতে করবৃদ্ধির অবকাশ এখনও আকাশ সমান।

এ যুগের বিদ্যাপতি শ্রীমোরারজী (কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী) আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ভারতে কর বৃদ্ধির এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। এই সঙ্গে তিনি দয়া করিয়া একথাও বলেন যে—ভারতে অবশ্য করের বোঝা ভারী, কিন্তু তাহা 'যথেষ্ট ভারী' এর জনগণের পক্ষে অসহনীয় নহে।

অর্থমন্ত্রী মোরারজীর মতে কোন দেশে করবৃদ্ধির কোন সীমা থাকিতে পারে না, যদিও তাঁহার মতে অন্য উপায় থাকিলে করবৃদ্ধি না করাই শ্রেয়, বিশেষ করিয়া ভারতের মত দেশে যেখানে শতকরা ৯৫ জনই দারিদ্র্য পীড়িত। তাহা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর হিসাবে— দেশের কর বৃদ্ধি পাইলেও চরম নীমায় পৌঁছায় নাই। মোরারজীর মতে—বর্ত্তমানে প্রয়োজন যাঁহারা আয়করের আওতায় (অর্থাৎ বেড়াজালে) পড়েন না, এবং যাঁহারা সাধারণতঃ কিছু সঞ্চয়ও করেন না তাঁহাদের নিকট হইতেই সম্পদ (অর্থাৎ কর) সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। দেশের মানুষের যে অংশকে (অর্থাৎ শতকরা ৯৫ জন) তিনি সঞ্চয় না করার ফলে ফেলিতেছেন, সেই হতভাগ্যদের তিনি কতখানি জানেন এবং তাহাদের অবস্থার খবর কতখানি রাখেন বলিতে পারি না, তবে মোরারজী যদি দিল্লীর বাদশাহী প্রাসাদ হইতে মাটিতে নামিয়া দেশের সাধারণ মানুষের সংবাদ লইতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহাদের অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসন-কল্যাণে মাত্র বিশ বছরে দেশের সাধারণ লোক আজ করের চরম সীমায় না পৌঁছাইলেও দুঃখ-দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে! মানুষের দেহে এখন হাড় এবং চামড়া ছাড়া আর কিছুই নাই, তবে উচ্চ-মার্গস্থিত মহাপুরুষ যাঁহাদের দেহে হাইডাবৃত তাঁহাদের নিকট মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা বলা নিরর্থক, পাষাণ দেবতার নিকট ক্রন্দন করার মতই বৃথা।

অর্থমন্ত্রীর কথায় মনে হইতেছে, আগামী বৎসরে নূতন বাজেটে তিনি আবার "অবশ্য সঞ্চয় বিধি"র (Compulsory Deposit Scheme) মত আর একটা নূতন কিছু করার সঙ্গে সঙ্গে করের নিম্নতম সীমাও আরো নিম্নতর করিতে পারেন! এবার হয়ত দেড়-দুই হাজার টাকা আয়ের উপরেও একটা করের চাপ পড়িতে পারে। প্রথমবার

অর্থমন্ত্রী হইয়া তিনি গোল্ডকনট্রোল আইনের দ্বারা ভারতের কয়েক লক্ষ স্বর্ণকারকে পথে বসান, প্রায় হাজারখানেক দরিদ্র স্বর্ণকার অভাবের জ্বালায় আত্মহত্যা করিয়া মোরারজীর হাত এড়াইয়া সংসার জ্বালার অকাল অবসান ঘটান। এবার আবার সাধারণ লোকের স্বর্ণ এবং রৌপ্য ক্রয়ের প্রতি ঝোঁক দেখিয়া মোরারজী মহারাজ অন্তর-বেদনা অনুভব করিতেছেন সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় মানুষকে কি ভাবে এই নেশা হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা করা যায়, সে-বিষয়েও কার্য্যকর চিন্তাও সুরু করিয়াছেন। সত্যাই গরীবের জন্য মোরারজীর মত এত দরদ অন্যকোন টপ্-নেতা তথা প্রশাসকের নাই! জন-দরদী মোরারজী আরো শত শত বৎসর সুস্থ দেহে, সবল মনে বাঁচিয়া থাকুন এবং ভারতের কল্যাণ করুন, প্রতিবৎসর করবৃদ্ধি করিয়া!

পশ্চিম বঙ্গে নূতন কর

আমাদের প্রাক্তন রাজ্য অর্থ-কাম-উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বাজেটে ঘাটতি সামলাইবার জন্য নূতন কয়েকটি কর বসাইয়া গেলেন, বিধান সভায় বিল পেশ করিয়া নহে, অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া। নূতন ট্যাক্স বসাইবার ভূমিকায় তিনি বলেন, নূতন করে দরিদ্র জনগণ এমন কি সীমিত আয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশেষ কোন অসুবিধা কিংবা ব্যয়বৃদ্ধি হইবে না! জ্যোতিবাবু 'লাক্সারি পণ্যের-কিছু কিছু দ্রব্যের উপর নূতন কর বসাইয়াছেন, ক্ষেত্রবিশেষে করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ইলেকট্রিক একসাইজ ডিউটি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য বহুবিধ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি যেমন, বৈদ্যুতিক পাখা আয়রন, হিটার কেট্‌ল প্রভৃতির সঙ্গে এই সবের স্পেয়ার পার্ট্‌স্‌ও কর হইতে রেহাই পায় নাই। নূতন কর হইতে এই সব বস্তু, এমন কি থার্ম্‌স্‌ ফ্লাস্কও বাদ পড়ে নাই। জ্যোতিবাবু নিশ্চই মনে করেন মধ্যবিত্ত সীমিত-আয় ব্যক্তিরা এইসব দ্রব্যাদি ক্রয় কিংবা ব্যবহার করেন না। করের একমাত্র তাঁহারই সম-অবস্থায় ব্যক্তিরা—অর্থাৎ কথায় কথায় যাঁহারা সাধারণ মানুষকে ধনীর অত্যাচার-অবিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাম্যের ধ্বনি তোলেন!

ইলেকট্রিক্ একসাইজ ডিউটি বৃদ্ধি কমবেশী প্রায় সকলকেই আঘাত করিবে, বিশেষ করে কলকারখানা-গুলিকে। এবং যাহার ফলে ঐসব কলকারখানায় প্রস্তুত সকল প্রকার সামগ্রীর মূল্যও বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। জ্যোতিবাবু কি এ-কথা জানেন না যে, যে-কোন দিক দিয়াই যে-কোন করবৃদ্ধি করা হউক, শেষ পর্য্যায়ে সেই করের চপেটাঘাত ক্রেতার গণ্ডে পড়ে। ব্যবসায়ী এবং কলকারখানার লাভের অঙ্কে ঘাটতি পড়ে না, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে লাভের অঙ্ক কিছু বৃদ্ধিও পায়।

পূর্ব্বকালে সরকারের ন্যায্য-অন্যায্য যে-কোন করের প্রস্তাবকে যাঁহারা চিরকাল সমালোচনা করিয়াছেন—সময় সময় করের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেও দ্বিধা করেন নাই, সেই জন-দরদীরাই আজ ক্ষমতা হাতে পাইয়া জনগণ-কে কর হইতে রেহাই দেওয়ার পরিবর্ত্তে নূতন করাঘাত করিতে লজ্জা-সঙ্কোচ-দ্বিধা কিছুই বোধ করিলেন না! আমাদের, সাধারণ মানুষের পক্ষে কপালে করাঘাত ছাড়া আর কিছু করিবার পাই, প্রতিবাদ করিবারও কিছু নাই তাঁহাদের কাছে, যাঁহারা দরিদ্রজনকে ৪৷৷০.৬ টাকা কেজি চাউল কিনিয়া খাওয়াকে তাঁহাদের সরকারের প্রতি পরম সহযোগিতা, সাপোর্ট, বলিয়া জোর গলায় নির্লজ্জ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লজ্জা পান নাই।

আকা(ঠ)শ বাণীর পাড়ন—

আকা(ঠ)শ বাণীর পীড়ন পশ্চিমবঙ্গ বনাম কেন্দ্রীয় কলোনীর বাঙ্গালী নামে পরিচিত হতভাগ্য করদাতাদের প্রায় সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমেই বলিতে হয়, কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের হিন্দী প্রচারের একটি "সুরেলা" উদ্ভব "বিব্ধ্ ভার্তীর" কথা। বলা বাহুল্য এই অনুষ্ঠানে কেবল মাত্র কিংবা প্রধানত হিন্দী গানই প্রচার করা হয়—প্রত্যহ বেশ কয়েক ঘন্টা এই "বিব্ধ্ ভার্তী"র হিন্দী, বিশেষ করিয়া হিন্দী-ফিল্মী গানের-(বেশীর ভাগই অতি খেলো সুরের, গানের কথার বিষয় কিছু না বলাই ভাল) প্রচার করা হয়, সপ্তাহে অন্তত ৩০ হইতে ৪২ ঘণ্টা। রেডিও-শ্রোতার ইচ্ছা থাক বা নাই থাক, ঐসব কুনির্ব্বাচিত হিন্দী চিত্রের সুর লহরী এবং কথা-সৌন্দর্য্য শ্রবণ এবং

উপভোগ করিতেই হইবে। বলিতে লজ্জা হয়, এই সকল গান এক শ্রেণীর তরলমতি বাঙ্গালী কিশোর কিশোরী এবং যুবক যুবতীদের নিকট হইয়াছে অতি প্রিয়, প্রায় নেশার মতই। আমাদের সামান্ত বুদ্ধিতে ইহা আসে না, কেন্দ্রীয় কর্তারা কোন বিশেষ অধিকারের বলে আমাদের তথা অহিন্দী ভাষীদের জোর করিয়া এই ভাবে তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দী গান শ্রবণ করাইয়া, মাস্ স্কেলে কর্ণ মর্দন করিতে থাকিবেন বছরের পর বছর। আকা(ঠে)শ বাণীতে হিন্দীর আধিপত্য এবং প্রবল প্রতাপ দেখিয়া মনে হয়, ভারত একমাত্র হিন্দী ভাষীদেরই দেশ, এখানে বাঙ্গালী, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া বা অন্ত ভাষা ভাষী কোন জাতি বা মানুষ বাস করে না। কিংবা করিলেও, তাহাদের ভাষা রেডিওতে প্রচার এবং অন্য কাহারও শ্রবণের যোগ্যতা রাখে না।

দিল্লী 'মহাকাশবাণীর কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কিন্তু কলিকাতা আকাশবাণীর ডিপোতে যাহা চলিতেছে, অন্য দেশ হইলে বিরক্ত শ্রোতার দল একদিনেই এই কুরূপ কু-গঠিত বেতারভবনটিকে—মাটির উপর থাকিতে দিত কিনা সন্দেহ! ঐ স্থানে আজ গঞ্জিকা চাষ হইত!

কলিকাতা আকাশবাণীতে—কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির, অর্থাৎ রেডিও কর্ত্তাদের বিচারে মহাগুণীর প্রায় এক-চেটিয়া কারবার চলিতেছে। দশ-বিশ বছরেরও বেশী—এক একজন এই রেডিওর এক একটি ঘাঁটিতে, অর্থাৎ আসরের,শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, কোন বিশেষগুণে বা অধিকারে তাহা রেডিওর লম্বকর্ণগণ ছাড়া অন্য কাহারো পক্ষে বলা সম্ভব নহে। আমরা বিশেষ করিয়া কলিকাতা বেতারের কৃষিকথার আসর এবং মজদুর মণ্ডলীর সর্দ্দারদের কথাই বলিতে চাই। 'পল্লীর' সর্ব্বমঙ্গল সাধন করিয়া সুবিখ্যাত এবং সর্ব্বজনপ্রিয় সেই মোড়ল এবার বাঙ্গলাদেশের যে কৃষি-উন্নয়নের প্রতি তাঁহার সতর্ক-সতেজ দৃষ্টি দিয়াছেন এবং কলিকাতায় বসিয়া ইডেন গার্ডেনএর মনোরম পরিবেশে সেই সুপরিচিত মোড়ল স-চেলা গত দুই তিন বৎসর হইতে পশ্চিমবঙ্গে, প্রকৃত মাঠে না হউক, আকাশে-বাতাসে যে-প্রকার কথার চাষ চালাইয়া যাইতেছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি ঐ মোড়ল নামধারী (উপাধি ? কে দিল ?) ব্যক্তিটি একাধারে সর্ব্ববিদ্যাধর। 'কৃষি কথার' মধ্যে এই চাষা-পণ্ডিত এমন সর্ব্ব বিষয়ের অপূর্ব্ব অবতারণা করেন, যাহার সহিত মাঠে ফসল চাষের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, থাকিতে পারে না। এই মহাশয় ব্যক্তি আবার অতি-ভক্ত এবং প্রায়ই কৃষি কথার আসর সূচনা করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী-বিবেকানন্দের বাণী বর্ষণ করিয়া এবং সেই সময় ইঁহার কণ্ঠস্বর ভক্তি-বারিতে একেবারে তরল কাদা-কাদা হইয়া যায়। ইনি কেবল চাষা পণ্ডিতই নহেন, একাধারে নাট্যকার এবং নটবর। এই মহাশয়ের রচিত বিশেষ কয়েকটি নাটক গত কয়েক বৎসর যাবত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার ইজারাধীন আসরে প্রায়ই অভিনীত হয়—এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের তাহা শুনিতেই হইবে। কেন ? বাঙ্গলাদেশে কি নাট্যকারের মড়ক লাগিয়াছে যে, এই সব 'অশ্রাব্য'-'অখাদ্য' নাট্যসুধা বাঙ্গালী রেডিও-শ্রোতাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করাইয়া কানের পোকা বাহির করিতেই হইবে !

মজদুর মণ্ডলীর আসরও প্রায় সমপর্যায়ের তবে ইহা একটি কারণে বহুগুণে শ্রেয়ও। কারণ ইহার সময় মাত্র বিশ মিনিট ! এই আসরের পরিচালক মহাশয়ের কণ্ঠস্বর-সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, ইহা কর্ণসুখকর নহে। আসরে মামুলী কথার আলোচনা যাহা হয়, তাহাতে হয়ত সখের শ্রমিকদের বহু জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু যাহাদের জন্য এই আসর সেই হতভাগ্য তাহারা ইহাতে কোনদিক দিয়া কি লাভ করে, তাহা জানিতে পারিলে বাধিত হইব। এবার আর বেশী কিছু না বলিয়া এইটুকু মাত্র বলিব যে, রেডিওর বাঁধা আসরগুলিকে ইজারা না দিয়া, বিশেষ অনুগ্রহভাজন কয়েকজনের 'গোচারণ' ক্ষেতে পরিণত না করিলে শ্রোতারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। বারান্তরে আরো কিছু বলিবার বাসনা রহিল।

নিমেষের আলোয়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

তোমার চিঠি-পত্রের বাক্সে একখানি খাতা।
পাতায় পাতায় নিঃসঙ্গ অন্তরের অনুভূতির ছাপ!
"দুখের রাতে নিখিল ধরা সেদিন করে বঞ্চনা তোমারে যেন না
করি সংশয়।"
একটি পাতায় কোন্ এক সঙ্গীহীন দিবসের দীর্ঘশ্বাসে ভরা
এই একটী মাত্র লাইন!

জীবনের গাঢ়তম অন্ধকারে মৃত্যুভরা মুহূর্ত্তগুলিতে কোথা
হ'তে তুমি সঞ্চয় করতে শক্তি, সান্ত্বনা, সাহস?
সেদিন তোমাকে আমি বুঝিনি, কিন্তু আজ আমি চিনেছি
তোমাকে তোমারই রোজনামচার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে!
মুখে তুমি ঈশ্বর ঈশ্বর করতে না, কিন্তু ঈশ্বরে তোমার
বিশ্বাস ছিল অটল, অম্লান, অনির্ব্বাণ!
আমি জানি তুমি ছিলে মর্ত্ত্যের মানবী। মানব-স্বভাবের
দুর্ব্বলতার নিগড়ে বন্দী নয়, এমন মানুষ কে আছে এই পৃথিবীতে?
তবু ভয়ে কখনও অভিভূত দেখিনি তোমাকে। ক্রোধেও নয়।
ভ্রাতৃবিরোধের দাবানলের মধ্যে তোমাকে দেখেছি ধীর, স্থির,
পর্ব্বতের মতো অবিচলিত,
জনবিরল প্রান্তরে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে পর্ণকুটিরবাসিনী
তুমি বিরাজিত ছিলে যেন স্বর্গের মুকুটিতা ইন্দ্রানী!

একটি অকুণ্ঠ অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের প্রশান্ত গরিমা সর্ব্বদা
তোমাকে ঘিরে থাকতো মেরুজ্যোতির মতো।
নিষ্ঠুর কটূক্তির শাণিত শরজাল নিক্ষিপ্ত হয়েছে তোমাকে
লক্ষ্য ক'রে,
তোমার নীরব উপেক্ষার বর্ম্মে প্রতিহত হ'য়ে নিষ্ফল হয়েছে
অপমানের সেই শরবর্ষণ,।
ব্যর্থ মনোরথ ব্যাধেরা নতশির হয়েছে লজ্জায়।
তোমার জীবন ছিল বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ,
কারও মনে দাওনি আঘাত, কারও মনে করোনি উদ্বেগের
সঞ্চার।

আমি আজ নিঃসংশয়ে জানি, আপনাকে জয় করবার
এই বিপুলা শক্তি কোথা হতে আহরণ করতে তুমি!
আমি আজ নিঃসংশয়ে জানি, সংসারের সহস্র আঘাত-
প্রতিঘাতের মধ্যে তোমার সমস্ত মন পড়ে থাকতো কোথায়
সেই চিরন্তনের পদপ্রান্তে ছিলো তোমার আত্মার সান্ত্বনা,
হৃদয়ের আনন্দ, শক্তির উৎস,
তোমার একটি দিনের অশ্রুজলসিক্ত রোজনামচার পাতায়
রেখে গেছ
তোমার গভীরতম সত্বার পরিচয়ঃ
"দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা তোমারে
যেন না করি সংশয়।"

স্মৃতির টুক্‌রো

সাতকড়িপতি রায়

কিন্তু শ্বশুরমশায় শুনলেন না। মেয়ে দেখা হয়নি। আশীর্বাদ কার্য্যাদি হয়নি। ছুটীর মধ্যে যে মাসে বিয়ে হ'য়ে গেল। তখন আমার স্ত্রীর বয়স এগারো বৎসর মাত্র।

বিয়ের কথাই যখন লিখছি তখন আর একটা বিয়ের কথা লিখি। বীরেন দে State Scholarship পেয়েছে, বিলেত যাবে 'Tripos' পড়তে। ঠিক হোল বিয়ে করে বিলেতে যাবে। বীরেন সুবর্ণ বণিক। সুতরাং সুবর্ণ বণিকের মেয়ে চাই। আমরা দুই বন্ধু, বরেন দেব ও আমি,—মেয়ের খোঁজে লেগে গেলাম। আমাদের সঙ্গে কমলবাবু বলে আর একজন ছিলেন। সেটা ১৯০২ সাল। আমরা M, A, পড়ি। যাঁর কাছেই যাই, তিনিই পেছিয়ে যান ছেলে বিলেত যাবে শুনে। কলকাতা, চন্দননগর, শ্রীরামপুর-শেষ হুগলী,—যেখানে যেখানে সুবর্ণ বণিকের বেশী বসতি সেখানেই মেয়ের সন্ধানে গেছি। তখন ঐ শ্রেণী এমন গোঁড়া যে বিলেত যাবে শুনেই পেছিয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষ শ্রীব্রজমোহন মল্লিক (Divisional Inspector of School, Burdwan division) মহাশয় তাঁর দশ বৎসর বয়সের এক কন্যার সঙ্গে বীরেনের বিবাহ দেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত মানুষ। বীরেনের মত ছেলে,— যে B,A, তে গণিত ও বিজ্ঞানে honours-এ প্রথম হ'য়েছে। তাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। এখন কত প্রভেদ! ভাল ছেলে পেলে আজকাল কি কেউ শ্রেণী বিভাগ মানে? কত ব্রাহ্মণ কায়স্থ মেয়ের বাপ আগিয়ে আসবেন মেয়ে দিতে।

এখন এই বৃদ্ধ বয়সে বুঝতে পারি, হিন্দুর বিবাহ একটা জীবনের কত বড় সংস্কার। এই সংস্কারের সঙ্গে ভবিষ্যত জীবনের প্রতিটি কার্য্য নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। অগ্নিসাক্ষী করে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে হিন্দুর বিবাহ সম্পূর্ণ হয় তার, যে কি নিগূঢ় তাৎপর্য্য তা এখন বুঝতে পারি। তাতেই একটি সতের-আঠারো বৎসরের যুবক একটি দশ-এগারো বৎসরের কিশোরীর পাণিগ্রহণ করে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাকে জীবনের প্রকৃত সঙ্গিনী করে জীবন যাপন কর্ত্তে পেরেছেন। আমার নিজের জীবনের কথাই বলতে পারি। আজ আমার স্ত্রী জীবিত নাই। কিন্তু, ১৯০১ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্য্যন্ত ৬৩ বৎসর, যদি ঐরূপ সহধর্ম্মিণী না পেতাম তা হলে জীবনের যেসকল দিনে ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে পড়েছি, সেসকল পরীক্ষায় কিছুতেই উত্তীর্ণ হতে পারতাম না। যখন পাঁচটা মেয়ে আর তিনটে ছেলে নিয়ে হাইকোর্টের ভাল প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে কংগ্রেস-গঠনে নিযুক্ত হই তখন আমার স্ত্রী রাঁধবার ব্রাহ্মণ, দুটি চাকর ও একটি ঝি,—সব ছাড়িয়ে দিয়ে নিজে বাসনমাজা থেকে সংসারের যাবতীয় কাজ ও রান্না একহাতে প্রসন্নমনে করেছিলেন বলেই না আমার কাজে বিঘ্ন হয়নি। এমন কি ধোপার খরচ শুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন। জেলে গেলে আমার দু-বেলার খাবার জেলে পাঠিয়েছেন। হিন্দুর এই বিবাহ ত' কেবল দৈহিক বন্ধন নয়, ইহা যাবা আধ্যাত্মিক বন্ধনও করিয়া দেয়। এই আমার বিশ্বাস। আজকালও যে অগ্নিসাক্ষ্যে মন্ত্রপাঠ করে বিবাহ হয় না, তা নয়। কিন্তু সবই একটা দর্শনভাদিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্য্যবসিত

হয়েছে। তাতে আর প্রাণ নেই। আক্ষেপ করে লাভ নেই। ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হচ্ছে,—সুতরাং প্রসন্ন-মনে দেখে যাওয়াই ভাল।

(১২)

সেদিন লিখেছিলাম যে, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অলৌকিক শক্তির কথা আর একদিন বলব। আজ সেটা বলি। আমি থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সিতে এম, এ, এবং রিপনে বি, এল, পড়ি। প্রত্যেক শনিবার ঐ সোসাইটিতে এসে একটানা একটা আলোচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনি। আমার বিয়ের পর জানলুম, শ্বশুর মহাশয়ও ঐ সোসাইটির সভ্য এবং আমার এক পিসতুত সম্বন্ধীও সভ্য। এক শনিবার আলোচনা সমাপ্ত হলে,—ডাঃ হেমেন্দ্র সেন রাজেনবাবুকে দাঁড়াতে বল্লেন। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। আর সবাই চলে গেলে, হেমেন্দ্রবাবু রাজেনবাবুর সামনে একটি আঠার-উনিশ বছরের যুবককে দেখিয়ে বল্লেন—"এই যুবকের সম্বন্ধে একটা প্রহেলিকা হয়েছে। তুমি যদি ভাই সেটার হদিস কত্তে পার ত' হয়। আমার ত' বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না।" তারপর বল্লেন—এটি আমাদের ক্যাম্বেলের ছাত্র। ওদের বোর্ডিংএর ছেলেরা আমায় সকালে ডেকে নিয়ে গেল। যুবকটি হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে যায় ওর হাতে সুতা দিয়ে একটা মাদুলী বাঁধা আছে। ও বলে ওরা সেই মাদুলী চুরি গেলেই ওর মূর্চ্ছা হয়। আবার মাদুলী পাওয়া গেলে ওর হাতে পরিয়ে দিলেই ওর মূর্চ্ছা ভাঙে।" রাজেনবাবু বল্লেন—"তুমি নিজে দেখেছ, ডাক্তার ?" তিনি বললেন—"আমি যখন গেলাম তখন ওর মূর্চ্ছা ভেঙেছে। অন্য ছাত্ররা বললে, ঘরের মধ্যে মাদুলীটা পড়ে আছে দেখে তারা হাতে পরিয়ে দেয় এবং ও জেগে ওঠে। আমি যেতে ও বললে, আবার আমার মাদুলী এখনি চুরি যাবে আমি বুঝতে পাচ্ছি। আমি মাদুলীর ওপর একটা চাদর আঁট করে বেঁধে দিলাম এবং ছাত্রদের বললাম, তোমরা সকলে মনে মনে জোর দাও যে মাদুলী চুরি যাবে না। আমি সাত-আট মিনিট বসে থাকতেই হঠাৎ ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেল। চাদরটা খুলে দেখি, সুতাশুদ্ধ মাদুলী নেই। তারপর প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে আবার হঠাৎ মাদুলী যেন কড়িকাঠ থেকে ঠক্ করে পড়ে গেল। হাতে পরিয়ে দিতেই ওর জ্ঞান এলো। আমি ত' অবাক্। এ অলৌকিকতার কোনও হদিস কত্তে পারলাম না। ও বললে,—আর চুরি যাবে না। আমি চলে আসবার সময় বলে এসেছিলাম, এখানে সন্ধ্যায় আসবার জন্য। ও এসেছে। তুমি যদি কোনও কিছু কত্তে পার ত' ছাখ।" রাজেনবাবু সেই ছাত্রটিকে সঙ্গে করে কাছেই তাঁর বাসায় এলেন। আমাকেও আসতে বললেন। তাঁর বাইরের ঘরে তক্তপোষ পাতা, মাথায় একটা টানা-পাখা টাঙানো। সেইখানে বসে সেই ছাত্রের পূর্ব্ব-ইতিহাস জানতে চাইলেন। ছাত্রটি বললে—মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গাতীরে পল্লীগ্রামে তাদের বাড়ী। জমিদারের ছেলে। বাবা নেই,—মা আছেন। তার দুটি ভাই ছিল। তার ছোট ভাই বার-তের বৎসর বয়সে দু-বৎসর হ'ল মারা গেছে। সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ কত্তেই মা বীরভূম-জেলার পল্লীবাসী এক জমিদারের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দেন। "গত পূজার সময় প্রথম শ্বশুরবাড়ী গেলাম। পল্লীগ্রামে পায়খানা ছিল না। ষষ্ঠীর দিন বৈকালে মাঠে শৌচকার্য্য করে জলশৌচের জন্যে পুষ্করিণীতে নামছি, এমন সময় দেখলাম, পুষ্করিণীর পাড়ে মাথায় পাগড়ী বাঁধা একজন লোক আমার দিকে কট্মট্ করে চেয়ে আছে। জলশৌচ করে উঠে বাড়ির দিকে আসছি, সে এসে ঘাড় ধরলে। জোরে তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে এসে পূজার দালানে যেখানে বোধন হচ্ছিল সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। তারপর জ্ঞান হলে ঘাড়ে খুব ব্যথা বোধ করি। সকলে দেখে বললে, চারটে-আঙুলের দাগ বসে গেছে ঘাড়ে। ডাক্তার এসে মালিস্ দিলে। রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে খাটে শুয়ে আছি,—কে যেন খাটশুদ্ধ তুলছে। ধপ করে খাট পড়ে গেল। আলো জাললাম। স্ত্রী ছেলেমানুষ,'ভয় পেল'।

আর ঘুম হলো না। তারপর পূজার কদিন আর কিছুই হয়নি। বাড়ী চলে এলাম। মাকে সব বললাম। সকলেই বললে—কি তো কি? কলেজ খুলতে বহরমপুরে এলাম। হোষ্টেলে থাকি। বড় রাস্তা ধরে সহরের বাইরে বেড়াতে যাই। একদিন মনে হল রাস্তার ধারে, সহরের বাইরে, গাছের পাশে আমার ছোট ভাই দাঁড়িয়ে আছে। কাছে ছুটে গেলাম। মুখে আঙুল দিয়ে কথা কইতে বারণ করে সে বললে—"দাদা, তোমার খুব বিপদ আসছে। ভয় পেও না, রক্ষা পাবে। ব্যস, অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আশ্চর্য হলুম। হোষ্টেলে এসে রুমমেটকে বললাম। বিশ্বাস করলে না। বললে—মনের ভ্রম। তারপর দিন দিন গুম্ হয়ে গেলাম। কথা বলি না, ক্লাশে যাই না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লোক দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ীতে ঐরকম গুম হয়ে থাকি। ক্রমে মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। মাসখানেক বাদে একদিন নৌকা করে গঙ্গাপার হয়ে অপর পারে আমাদের কাছারি বাড়ীতে গেছি। হঠাৎ সেখানে অজ্ঞান হয়ে Convulsion সুরু হল। আমলারা আমাকে চেপে ধরে রাখে এবং মাকে খবর পাঠায়। মা গিয়ে উপস্থিত হন। হঠাৎ আমার জ্ঞান ফিরে এল। শুধু তাই নয়, আমি সহজভাবেই বললুম, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কোথায় আছি। মা বললেন—কাছারিতে। আমি বেশ সহজ স্বাভাবিক মানুষের মত কথা কইতে লাগলুম। মা ত' খুব খুসী। বললেন—তোর কি হয়েছিল, এতদিন কথা বলিসনি। বললাম, বাড়ী চল মা। সবাই এসে নৌকায় উঠলাম। আমার ডান হাতটা মুঠো করা ছিল। নৌকায় মাকে বললাম—তোমরা সবাই গঙ্গার উপরে আছো। সত্যি করে বল আমার হাতে তোমরা কেউ কিছু দিয়েছ কি? সকলেই বললে—কেউ কিছু দেয়নি। তখন মাকে বললাম—আমার ছোট ভাই এসে আমার হাতে কি দিয়েছে ভাখ।—হাত খুললাম। হাতে শিকড়ের মত একটি কি রয়েছে। বললাম,—ছোট ভাই বলে গেছে এইটাকে দু-টুকরো করে দুটো মাদুলীতে পুরে, একটা আমার এবং একটা আমার স্ত্রীকে পরতে হবে। বাড়ীতে এসে মা একটা মাদুলী আমার হাতে বেঁধে দিলেন। আর একটা মাদুলী আমার স্ত্রীর জন্যে বাক্সে রেখে দিলেন।"—এই পর্য্যন্ত বলেই ছেলেটি উপর দিকে চাইতে লাগল। রাজেনবাবু বললেন—"সাতকড়ি, দ্যাখতো মাদুলীটা আছে কিনা।" হাতের জামা তুলতে দেখি মাদুলী নেই। বললেন—"শুইয়ে দাও।" শুইয়ে দিলাম। তখনই Convulsion সুরু হোল। তারপর কথা বলতে আরম্ভ করলে। রাজেন্দ্রবাবুর হুকুমে— তাড়াতাড়ি লিখতে লাগলাম সেইসব কথা। কখনও যেন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে, কখনও যেন জোড়হাতে কাকে কি চাইছে। প্রায় পনের-কুড়ি মিনিট বাদে আবার Convulsion হল,—আর মাদুলীটা টানা পাখা থেকে যেন টক্ করে পড়ে গেল। হাতে পরিয়ে দিতে উঠে বসল'। রাজেনবাবু গরম দুধ খাইয়ে দিলেন। বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রস্রাব করিয়ে আনলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—"অজ্ঞান হয়ে কি বলছিলে মনে আছে কি?" বললে—না'। আর ভয় কচ্ছে কিনা রাজেনবাবু জিজ্ঞাসা করাতে বললে—না সুস্থ হোয়েছি এখন। তখন আবার তাকে তার ইতিহাস বলতে বললেন রাজেনবাবু। ছাত্রটি বললে—"ঐভাবে বেশ ভাল ভাবে প্রায় মাসখানেক কাটল। একদিন নদীর ধার থেকে বেড়িয়ে এসে দেখি হাতে মাদুলী নেই,—আর তখুনি অজ্ঞান হয়ে যাই। প্রায় ঘণ্টাখানেক ঐভাবে থাকবার পর মা বুদ্ধি করে আমার স্ত্রীর জন্যে যে-মাদুলীটা ছিল, সেটা এনে পরিয়ে দিতেই জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর নদীর ধারে খুঁজতেই আমার মাদুলীটা পাই। সেইটা এরপরে মা আমার স্ত্রীর হাতে বেঁধে দেন। বাড়ীতে আর কোনও গোলমাল হয় নি। বেশ ভাল থাকাতে—first arts না পড়ে ক্যাম্বেলে ভর্ত্তি হোয়েছি যে মাসে। তারপর আজ এই বিপদ। ইতিহাস শেষ হল। রাজেনবাবু বললেন-"সাতকড়ি তোমাকে ছাত্রটিকে হষ্টেলে দিয়ে আসতে হবে।" সেদিন তাকে পটলডাঙায় হোষ্টেলে দিয়ে এলাম। দুঃখের বিষয় আমি সে ছেলেটির নাম স্মরণ করতে পাচ্ছি না। তার কয়েকদিনের উক্তি

আমি লিখেছিলাম এবং সে ছাত্রটি মুক্তি পাওয়ার পর সেটি পুস্তকাকারে ছাপা হয় এবং এখনও ঐ থিওসফিক্যাল সোসাইটির পুস্তকাগারে আছে।

এরপর দু-একদিন হষ্টেলে অজ্ঞান হয়ে যাবার পর রাজেনবাবুর কাছে খবর এলে তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখি ছেলেটার জ্ঞান হয়েছে। কড়িকাঠ থেকেই মাদুলীটি পড়েছে। আর একদিন চার-পাঁচ মিনিট অজ্ঞান থাকার সময়ে যেসব কথা বলে তা লিখে রাখি। তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় আমি রাজেনবাবুর বাড়ীতেই ছিলাম, সে সময় সংবাদ এলো। আমরা তাড়াতাড়ি গেলাম। রাজেনবাবু ছেলেটির কপালে নিজের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আঙ্গুল তুলে নিয়েই প্রশ্ন করলেন—"কে তুমি এই দেহে প্রবেশ করেছ?" প্রশ্ন শুনে আমরা অবাক হলুম। আমায় ইঙ্গিত করলেন লিখতে। জবাব হল আপনার জেনে লাভ কি?" রাজেনবাবু বল্লেন—'আমার সঙ্গে তর্ক কোর না। বল।" তখন যা সেই ছাত্রের মুখ দিয়ে বেরুল তার মর্ম্মার্থ:—পূর্ব্বজন্মে ঐ ছাত্র ও তার স্ত্রী কাশীর কাছে এক পল্লীতে থাকত। জাতিতে কলু। আর যিনি এখন তার শরীরে প্রবেশ করেছেন তিনিও কাশীবাসী,—জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। উহারা সবাই হিন্দীভাষী ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ সেই কলুর সুন্দরী স্ত্রীকে উপভোগ কত্তে চেয়েছিলেন। সক্ষম হননি। কারণ, সে ওর প্রস্তাবে রাজী হয়নি। এইভাবেই সে-জন্ম চলে গেল। এ-জন্মে তিনজনেরই কায়স্থ-কুলে জন্ম হয়। ছাত্রটির সম্বন্ধী ঐ বিদেহী আত্মার ভগ্নীপতি। ভগ্নীর বাড়ীতে বেড়াতে এসে ভগ্নীর ননদকে দেখেই বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার বিয়ে হল ঐ মেডিকেল ছাত্রটির সঙ্গে। ঐ বিদেহী-আত্মা (তখন জীবিত) কলকাতায় First Arts পড়তে আসে। একটা নালা পেরুতে গিয়ে পড়ে গিয়ে বুকে লাগে সেই ব্যথা নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায় ও মারা যায়। তখন বিদেহী হয়েই সেই কামস্পৃহা জেগে ওঠে। কিন্তু কোনও মহাপুরুষ সেই মেয়েকে রক্ষা করছেন। তার কাছে ঘেঁস্‌তে পারেনি, তাই আক্রোশে ঐ ছাত্রটিকেই যন্ত্রণা দেয়।" এই কথাগুলি শুনে—ছাত্রটী যে মাথায় পাগড়ী-বাঁধা লোক দেখেছিল সেটা খানিকটা পরিষ্কার হল। আর ছোট ভায়ের বেশে যে মহাপুরুষ দেখা দিয়েছিলেন সেটাও স্পষ্ট হল। রাজেনবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"এর হাতের মাদুলী তুমি নিয়ে যাও?" উত্তর হোল, হ্যাঁ। কি করে নাও?—একটু থেমে উত্তর দিলে—"আপনি কি বুঝতে পারবেন? ঐ যে গণিতের ছাত্রটি আছেন, উনি হয়ত কিছুটা বুঝতে পারবেন।" আমাকেই গণিতের ছাত্র বলা হল। রাজেনবাবু বললেন—"তুমি বল"। তখন সেই ছাত্রটির মুখ দিয়ে বেরুল—"আপনারা creature of three dimentions, এবং থাকেন three dimention space-এ। যদি কল্পনা করেন, একটা two dimention-এর space যার length and breadth আছে কিন্তু thickness নেই, তাহলে সেই space এ three dimention-এর creatureকে কি আটকাতে পারবে? আমি বললাম, না পারে না। একটা টেবিলের উপর একটা পিঁপড়েকে ছেড়ে দিলে সে উপর কিম্বা নিচের দিকে চলে যাবে। তখন আবার বিদেহী বললেন "আমরা creature of four dimentions কাজেই three dimention-এর space আমাদের আটকাতে পারে না"। এটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার বিলম্ব হল না। কারণ গণিতের সাহায্যে four dimention-এর একটা ধারণা করা যায়। তখন রাজেনবাবু প্রশ্ন করলেন "এই ছাত্রের বাক্সে কাপড় আছে। তুমি বার করতে পার?" বিদেহী বললে—"পারি।" রাজেনবাবু একটা কাপড় বার কত্তে বলায়—আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, আমাদের সামনে একটা ধুতি পড়ে। আবার রাজেনবাবুর প্রশ্নের জবাবে বললে, "আমরা থাকি বহু দূরে। সেই

মহাপুরুষ যতক্ষণ না টের পান এবং এই ছাত্রকে রক্ষা করতে আসেন, ততক্ষণ আমি একে যন্ত্রণা দিতে পারি।" এই সময় হঠাৎ ছাত্রটির convulsion হল, মাদুলিটা কড়িকাঠ থেকে পড়ে গেল। হাতে পরাতেই জ্ঞান হল তার। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে যে, ঐ কাপড়টি তার এবং তার বাক্সেই ছিল। বাক্স খুলে দেখা গেল সেখানে কাপড়টি নেই। এরপর রাজেনবাবু ঐ ছাত্রটিকে দীক্ষা দিলেন। সেই মন্ত্র জপ করতে করতে সে সমাধিস্থ হত। রাজেনবাবু তার জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অবশেষে একদিন ঐ ছাত্রের সেই মহাপুরুষ দর্শন হয়েছিল। তিনিও বিদেহী। আর তার সাধনার দ্বারা সে ঐ প্রেতের আক্রমণ থেকে উদ্ধার পেয়েছিল। সেই প্রেতের বাড়ীর সমস্ত সংবাদ রাজেনবাবু ঐ ছাত্রের অজ্ঞান অবস্থায় তার মুখ দিয়ে বের করেছিলেন। তাদের বাড়ীতে সংবাদ দিতে তাঁরাও এসেছিলেন। রাজেনবাবুর নির্দ্দেশমত গয়ায় পিণ্ড-দান করতেও হয় তাঁদের। সবকথা স্মৃতিতে নাই, যতটা ছিল বললাম।

বাল্যকালে কৈশোরে এবং যৌবনেও এই ঘটনার পূর্ব্বপর্য্যন্ত প্রেতাত্মা কারুকে দেখা দেয় বা কারুর অপকার বা উপকার করে—এ বিশ্বাস ছিল না। বাল্যকালে কি কৈশোরে, মেদিনীপুরে কি ঝাড়গ্রামে, লোকে যেখানে ঐরূপ বিদেহী প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথা বলত, সেইসব স্থানে একা গভীর রাত্রে অন্ধকারে গেছি। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়। কেবল ঐ অশরীরীর সাক্ষাৎ মানসে। কিন্তু কখনও সফল হইনি। এই ছয় মাস উহার পশ্চাতে ঘুরিয়াছি, উহার অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়াছি। আমাদের অন্নময় কোষ কেন, সমস্ত দৃশ্য-জগৎ যে three dimention-এর তাহা জানিতাম। কিন্তু four dimention-এর যে একটা জগৎ আছে সেখানেও যে জীবাত্মা তদ্রূপ শরীরে বাস করে এ ধারণা ছিল না। এখন প্রত্যক্ষ দেখলাম। রাজেনবাবু বললেন—"এই যে বিভিন্ন dimention-এর জগতের কথা জানলে এরা সব interwoven, অর্থাৎ একই space-এর বিভিন্ন সত্তা। পৃথক পৃথক ভাবে নেই। Three to seven dimention পর্য্যন্ত বিভাগ আছে। আত্মাকে সেইসব শরীর ধারণ করতে হয়। মৃত্যুর পর এক এক কোষ আত্মা হইতে খসিয়া পড়ে। থিয়সফির inner section এ আমাকে ভর্তি করার জন্যে রাজেনবাবু চেষ্টা করেন। আমি ভর্তি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, যোগমার্গ আমার জন্যে নয়, কর্ম্মমার্গ আমার জন্যে। যাতে কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম্মমার্গে অগ্রসর হতে পারি তার চেষ্টা করব।

পরবর্ত্তীকালে রাজেনবাবু, ভবানীপুরে গিরিশমুখার্জী রোডে বাড়ী করেছিলেন। কলকাতায় প্র্যাকটিস করতে এসে আমি সেই বাড়ীতে বহুবার দেখা করেছি। তিনি পরমহংস দেবের মত বলতেন—"মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়।" বহুদিন হল তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের গুরু 'লেলেকে' তিনি জানতেন। কারণ 'লেলে' থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন।—

(১৩)

লর্ড কার্জন সাহেব বঙ্গ ভঙ্গ করলেন। বাংলাকে দুভাগে ভেঙে পূর্ব্বভাগ আসামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন. আর পশ্চিমভাগ বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে রইল। ঢাকা পূর্ব্ব ভাগের রাজধানী হল। পশ্চিম ভাগের রাজধানী কলকাতাই রইল। দেশে তুমুল আন্দোলন সুরু হ'ল ১৯০৫ সালে। একদিকে কংগ্রেসের নেতৃবর্গদ্বারা পরিচালিত, আর একদিকে বিপ্লবীদল কর্ত্তৃক আন্দোলন। কংগ্রেসের পুরোভাগে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল প্রভৃতি বহু নেতা,—প্রায় সবই হিন্দু। মুসলমানদের বর্দ্ধমানের লিয়াকৎ হোসেন এবং ব্যারিষ্টার রসুল সাহেব। মেদিনীপুরের উকিল প্যারীলাল ঘোষ (ফাঁসির সত্যেনের ভগ্নীপতি) কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ। মেদিনীপুরে প্রতিবাদ-সভা ও শোভাযাত্রা

হবে। কলেজ ময়দানে বহু ছাত্র ও যুবক সম্মিলিত হয়েছেন। প্যারীবাবু পুলিশ-সুপারের কাছে গেছলেন প্রশেসনের অনুমতির জন্যে। অনুমতি মিলল না। প্যারীবাবু যুবকদের জানিয়ে দিয়ে বাড়ী পালিয়ে গেলেন।

আমি আইন পরীক্ষা পাশ ক'রে মেদিনীপুরের কোর্টে এনরোল হ'য়েছি। প্র্যাকটিস করতে যাইনি। ম্যালেরিয়া জ্বরে শুয়ে আছি। সত্যেনবাবু কয়েকটি যুবক সঙ্গে করে এসে বল্লেন—"সাতকড়ি, প্যারীবাবুতো পালিয়ে গেলেন, এখন কি হবে?" সব শুনে বললাম—তোমারা কি করতে চাও? প্রশেসন? সত্যেন বললে, হ্যাঁ। আমি বললাম—চ'ল। একটা র‍্যাপার গায়ে দিলাম। সামান্য সামান্য বৃষ্টি হচ্ছে। মাঠে গিয়ে সকলকে ডেকে বললাম, "আমরা প্রতিবাদ-প্রশেসন করব। কংগ্রেসের কর্তা প্যারীবাবু পুলিশের অনুমতি আনতে গেছলেন, পুলিশ অনুমতি দেয়নি। বিনা অনুমতিতে প্রশেসন করলে যে বিপদ আছে সেটা যারা বরণ করতে রাজী, তারা চারজন ক'রে সারি দিয়ে দাঁড়াও।" যুবকরা উৎসাহ পেল। দু-হাজার যুবক সারি দিয়ে দাঁড়াল।" তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বললাম—কেউ লাইন ভাঙবে না। যত বিপদ আসুক লাইনে চলবে। আর তোমাদের স্লোগান হবে—বাংলা জোড়া দিতে হবে এবং বন্দে মাতরম্।

এইভাবে সমস্ত সহর ঘুরে কোতয়ালির পাশ দিয়ে কলেজ-মাঠে ফিরে এসে বললাম—"বাংলার যুবক! যদি অন্যায়ের প্রতিকার চাও তবে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে, সব সময় আইন মানলে চলবে না। এই কথা মনে রেখে আজ বাড়ী যাও।" পরদিন সত্যেন বললে, "বারীন ঘোষ (তার ভাগ্নে হয়) এসেছিল। বললে, বিলাতী কাপড় ধ্বংস কর।" আমি বললাম—"পারত' কর। আমি ত' এখন অত্যন্ত অসুস্থ, ম্যালেরিয়ায় ভুগছি। change-এ যাচ্ছি। সুতরাং আমার আশা এখন ছাড়। আমি আগষ্ট মাসে এলাহাবাদে আমার ভগ্নীপতি, এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকিল শ্রীসত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর কাছে চলে গিয়ে দু-মাস সেখানে কাটিয়ে ৺পূজার সময় বাড়ী আসি। সেই বৎসর, ১৩১২ সালে ফাল্গুন মাসে দোলের সময় যুবকদের বলেছিলাম "আবির এবং রং নিয়ে দোল না খেলে, রক্ত নিয়ে দোল খেলতে শেখো।"

ছোটকাকা ও বিশেষ করে দাদার অনুরোধে চাকরি নিতে হল। curr সাহেব পেরে, Sir Jhon card যিনি পরে আসামের গভর্ণর হয়েছিলেন, তখন মেদিনীপুরের collector। জাড়ায় tour-এ গেছলেন। দাদা তাঁকে আমাদের বংশের পক্ষ থেকে একটা অভিনন্দন-পত্র দিয়েছিলেন। আমাদের বংশ দেখে খুব impressed হ'য়ে ডেপুটির চাকরীর জন্যে বিশেষ recommend ক'রে ত' চাকরি করে দিলেন। কিন্তু চাকরিতে মন বসাতে পারছিলাম না। কারণ তখন পূর্ব্ববঙ্গে ইংরাজের ইঙ্গিতে ঢাকার নবাবের প্ররোচনায় মুসলমানরা জায়গায় জায়গায় হিন্দু স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করছে বলে সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হতে লাগল। আমি মেদিনী-পুরেই রয়েছি। সব বিভাগের কাজ শিখছি। আমার স্ত্রী তখন জাড়ায় মায়ের কাছে। ঢাকার অত্যাচারের সংবাদে মনের কি অবস্থা হয়েছিল তার খানিকটা আভাস পত্রে স্ত্রীকে লিখেছিলাম। সে সেই পত্রের দু-একটা রেখে দিয়েছিল যত্ন করে। কিছুদিন আগে তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁর বাক্স থেকে দু-একটি পেলাম। তার থেকে একটু উদ্ধৃত করে দিলে সকলে বুঝতে পারবে—"সোনা, তোমায় চিরকাল দুঃখ দিবার জন্যই বোধহয় ভগবান আমার সহিত বিবাহ দিয়াছেন। আমার জীবন আশাহীন, উদ্দেশ্যবিহীন। ভবিষ্যত ঘোর অন্ধকারময়। আমি বাঁচিয়া আছি কেবল একমাত্র আশা, যদি কখনও দেশের কাজে প্রাণ দিতে পারি।...তোমার নিকট আর কতদিন লুকাইয়া রাখিব! তুমি মাঝে মাঝে আমায় কাঁদিতে দেখিয়াছ। জিজ্ঞাসা করিয়াছ—'আমি কেন কাঁদিতেছি। আমি তোমায় পাঁচ কথায় ভুলাইয়াছি, কিন্তু যথার্থই আমি কতক পাগল হইয়াছি।...কেবলমাত্র আশা দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া।

ঐ আশাই আমায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।…”আর একটি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—“মোনা, মরিবার দিন আসিতেছে। যে ইংরাজের রাজ্যে বাস করিতেছি সে পিশাচগণ পূর্ববঙ্গে স্ত্রীলোকদের উপর মুসলমানদের দ্বারা বিষম অত্যাচার করিতেছে। ওদেশের সে ঢেউ কলিকাতায় আসিয়াছে। শীঘ্রই আমাদের দেশেও আসিবে। তখন আপন আপন মান রক্ষার্থে সকলকে মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।…আমি দেশ রক্ষার্থে প্রস্তুত হইতেছি। এই উদ্যমে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইব বড় আশা আছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যেন দেশের কার্য্যে তোমার ও আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। ইহা অপেক্ষা সুখ নাই। গোপালকে (আমার তিন বৎসরের পুত্র) এখন হইতে এই কথা শিখাইও। যেন দেশ হইতে পিশাচ ইংরাজদের তাড়াইয়া দেওয়া তার জীবনের মূলমন্ত্র হয়।…এস, স্বামী-স্ত্রীতে এক হইয়া কার্য্যে ব্রতী হই।…মোনা, মাকে বিশেষ যত্ন করিও,…মা আমাদের দেবী। মার নিকট মাতৃমন্ত্র পাইয়াছি বলিয়াই জন্মভূমির কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এবার মা আমার এই কার্য্য করিতে অনুমতি দিয়াছেন।”

ইংরাজ সরকারের চাকরীতে বহাল হইয়া দেশের সেই অবস্থায় মনের অবস্থা আমার কি ছিল তাহাই বুঝাইবার জন্য আমার স্ত্রীর যত্নে-রক্ষিত পত্রগুলি হইতে উদ্ধৃতি দিলাম।

যখন মেদিনীপুরের ঢাকা থেকে মৌলবী এমিসারিস এসে মেদিনীপুর সহরে মুসলমানদের নিয়ে মসজিদে সভা করতে আরম্ভ করে তখন নকল দাড়ি গোঁফ পরে, মাথায় ফেজ দিয়ে সে সভায় উপস্থিত থেকেছি। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই মেদিনীপুরের মুসলমানগণ তাদের কথায় উত্তেজিত হয়নি। মৌলবীদের ফিরাইয়া দিয়াছিল।

যদি মুসলমানরা হিন্দুদের উপর চড়াও হয় তাই তাদের রক্ষার্থে আমরা স্থির করিয়াছিলাম, হিন্দু-স্ত্রীলোক ও বালকদের পুরাতন মহারাষ্ট্র কেল্লায়,—যেটাকে ইংরাজরা পূর্ব্বে জেল হিসাবে কিছুদিন ব্যবহার করেছিল, তার ভিতর এনে পুরুষরা তার উভয় দ্বার রক্ষা কোরবে। তার জন্যে আমরা একদিনের নোটীশে দশ হাজার সাঁওতাল যাতে তীর ধনুক নিয়ে হাজির হতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলাম। সেই গল্পটাই বলি। যখন First Arts মেদিনীপুর কলেজে পড়ি তখন আমার একটি সহপাঠী ছিল তার নাম রাধানাথ কুণ্ডু। গড়বেতা থানায় তাদের বাড়ী। গ্রামের নাম ভুলে গেছি। সে first arts পাশ করে, ওকালতি পড়ে। P. L. পাশ করে তখন গড়বেতায় ওকালতি করে। তার দাদা শ্রীফকির কুণ্ডু ঐ অঞ্চলে নামকরা লোক ছিলেন। ওয়াটসন কোম্পানী যেটা পরে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী হয়, সেই সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে জঙ্গলে শালপাতা কাটা ও গরু চরাবার স্বত্ব নিয়ে ধুম-মকর্দ্দমা দেশের পক্ষে তিনি করেছিলেন। কোঁচার খুটে মুড়ি বেঁধে নিয়ে ৩২ মাইল মেদিনীপুরে পায়ে হেঁটে আসতেন। সাঁওতালরা তাঁর খুব বাধ্য ছিল। যখন দেখলাম, মেদিনীপুরে ঢাকার মৌলবীরা মসজিদে সভা করছে তখন এক শনিবার রাধানাথ কুণ্ডুর বাড়ী গেলাম। ফকিরদাকে সব বললাম। বললাম—সামান্য সময়ের নোটিশে কত সাঁওতাল তীর ধনুক নিয়ে আমাদের সাহায্য দিতে পারেন। তিনি বললেন—আজ রাত্রেই ‘গিরা’ চালিয়ে দিই, কাল সকালে ৮৷৯টার মধ্যে কত জড় হয় দ্যাখ।” সাঁওতালদের সংবাদ ঐভাবেই প্রচার হয় তা কংগ্রেসের গঠনকার্য্য করতে গিয়ে পরে খুব ভালভাবে দেখেছিলাম—সে কথা আর একদিন বলব। ফকিরদা ৪০০ বিঘা জমি নিজে চাষ করতেন। ঘরে মহিষ-গরুতে ভর্ত্তি। মহিষের দুধ থেকে ঘি আর দইপাতা হত। চাষের গম চাকিতে ভেঙ্গে আটা-ময়দা। তরকারি—ক্ষেতের আলু, কুমড়া, আর চাষের আখের গুড়। রাত্রে সেই ঘিয়ে ভেজে আটার লুচি আর আলু-কুমড়ার তরকারি, মহিষের

দুধের ক্ষীর খেতে দিলেন আমাকে। তাঁর চাষে সব জিনিষটিই উৎপন্ন হত। তিনি কিনতেন শুধু—লবণ, কেরসিন আর সুপারী। ভোরে উঠে দেখি, চার ভাই-এর চার বৌয়ের মধ্যে দুই বৌ মুড়ি ভাজচে। তখনও সকাল হয়নি। জিজ্ঞাসা করতে ফকিরদা বললেন—"মাঠে ২০.২৫ জন মজুর ধান কাটছে,—তাদের জল-খাবার।" তারপর ৮।৯ টার সময় আর দু-বৌ ভাত-রান্নায় লাগলেন। বাড়ীর লোকেরা আর ঐ ২০।২৫ জন মজুর খাবে। আমাকে, সকালে মহিষের দুধ দোওয়া হতে ছানা কাটিয়ে ছানা আর গুড় দিলেন জল খেতে। বেলা ৮ টার সময় থেকে সাঁওতাল আসতে সুরু হল। ন'টার মধ্যে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল তীর ধনুক (কাঁড়বাঁশ) নিয়ে উপস্থিত। ফকিরদা তাদের দেখিয়ে বললেন—"যেদিন খবর পাঠাবি তার পরদিন এই দশ হাজার সাঁওতাল পাবি।" তাদের হাতের তেজ দেখেছি। একটা আমগাছের গুঁড়, যার ব্যাস হবে প্রায় দু-ফুট—পঞ্চাশ হাত দুর থেকে সেটা ফুঁড়ে তীর অপরদিকে বেরিয়েছে। আর হাতের তাগ দেখেছি। ছোট্ট একটা ছেলের মাথায় বেগুন রেখে সেটা পঞ্চাশ হাত দুর থেকে বিঁধেছে। ফকিরদা তাদের কি করতে হবে উপদেশ দিয়ে বিদেয় করে দিলেন। দুপুরে আমাকে চাষের চালের ভাত, বিরি-কলাই এর ডাল আর আলু, কুমড়া, ঝিঙে, উচ্ছে, ট্যাঁড়স্ ইত্যাদির তরকারি এবং মহিষের দুধের দই ও গুড় খেতে দিলেন। দুঃখের কথা, কি সুখের কথা জানি না,—বৌ-এরা ভাত চাপিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আমাকেই নামিয়ে নিতে হয়েছিল। বলেছিল,—ব্রাহ্মণকে আমাদের রান্না-ভাত দিতে পারব না। বৌ-এরা সমস্ত কাজ সেরে দুপুরে চরকা নিয়ে চাষের তুলায় সুতা কাটতে বসলেন। ফকিরদার স্ত্রী বললেন—"বামুন-ঠাকুরপো, চরকা চালাতে পার?" জানতুম না,-কিন্তু তাঁদের দেখে শিখলাম এবং তাঁদেরই তৈরী তুলার পাঁজ নিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা চরকা কাটলাম। মোটের উপর একটি আদর্শ চাষী গৃহস্থ দেখেছিলাম যার চার ভাই-এর মধ্যে একজন উকিল। দেখে মু
হয়েছিলাম। আজকাল কোথাও কি এই গৃহস্থ খুঁ
পাওয়া যাবে? ফকিরদা নেই, রাধানাথ আমারই ম
বুড় হয়ে বেঁচে আছে। শুনেছি তার ছেলেও উকি
হোয়েছে। কিন্তু তাদের আর সে সংসার নেই। আ
কোথাও খুঁজলে কি আর সেই একান্নবর্তী সংসা
মিলবে?

সাঁওতালদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি, কার
মেদিনীপুরের মুসলমানরা ঢাকার মৌলভীদের প্ররোচন
প্রত্যাখ্যান করে। আমি চাকরি নিলেও স্বদেশী-আন্দোল
পুরোপুরি চালিয়েছিলাম। যতদিন না সেট্‌লমেন্টে
কাজে গেছলাম ততদিন চোগা-চাপকান পরতাম
বিলাতী লবণ ও চিনি বর্জ্জন করলে দেবতার কাছে
প্রতিজ্ঞা করে বাজারের খাবার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর
লাম। কারণ, তখন সব খাবারেই বিলাতী লবণ ও
চিনি। সৈন্ধব লবণ ধরলাম ও গুড় ধরলাম। এখন দেশে
লবণ ও চিনি হচ্ছে, কিন্তু সেই ১৯০৫ সাল থেকে এই
বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আর বাজারের খাবার স্পর্শ করিনি
যে কটা দিন আছি এই ভাবেই কেটে যাবে।

চাকরিতে থেকেও ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে গেছলাম ডেলিগেট হয়ে নয়,—ভিজিটার হয়ে। দাদাভাই নরোজী সভাপতি। গম্ভীর ভাবে—'স্বরাজ' কংগ্রেসের উদ্দেশ বলে প্রচার করে গেলেন। তিনি ভারতীয় হয়েও গ্রেট বৃটেনের পার্লিয়ামেন্টের সভ্য ছিলেন। আর একদিন কলকাতায় এসে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের মৃতদেহের প্রশেসনে যোগ দিয়েছিলাম। ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী সেদিন যে ওজস্বিনী ভাষায় শ্মশানঘাটে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা এখনও যেন কানের মধ্যে বাজছে। শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' কাগজের মকর্দ্দমায় সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় বিপিন পাল মহাশয় জেলে গেছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'যুগান্তর' কাগজের এডিটার বলে ভুপেন দত্তর বিরুদ্ধে যে মকর্দ্দমা চলছিল তাতে ভুপেনবাবুকে বরের মত মাথায় টোপর পরিয়ে তিনি নিজে বর-কর্ত্তা সেজে কিংসফোর্ড

(Chief Presidency Magistrate) সাহেবের এজলাসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ব্রিটিশ সরকারের সাধ্য নাই তাঁহাকে জেল দেয়। হাইড্রসিল অপারেশনে ওঁার হাসপাতালে মৃত্যু হয়। নিমতলা শ্মশানঘাটে সুন্দরীবাবুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন—"ব্রহ্মবান্ধব তুমি চলে গেলে? বিপিন যে এখনও জেলে।" যুবকদের উদ্দেশে বলেছিলেন--"ইংরাজ-শাসনের বিলোপ সাধন যেন তোমাদের ব্রত হয়।" সেখানে উপস্থিত সকলের চোখে জল এসেছিল।

অনেকে জানেন না, বিপিন পাল, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস ও হাইকোর্টের উকিল তারাকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় (যিনি পরবর্ত্তী জীবনে কাঠিয়াবাবার শিষ্য হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শান্তবাবা নামে ঐ মঠাধিকারী হয়েছিলেন),—এঁরা তিনজনেই সমসাময়িক, তিনজনই শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী, তিনজনেই এক সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকেই অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। বিপিনবাবুর মত রাজনীতিজ্ঞ ভারতে বিরল ছিল। ডাঃ সুন্দরীমোহন ধাত্রীবিদ্যায় পণ্ডিত ও তেজস্বী দেশপ্রেমিক ছিলেন। আর তারাকিশোরবাবু হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনজনই তিন দিকের দিক্‌পাল ছিলেন।

ক্রমশঃ

ইলিয়া এরেনবুর্গ

অশোক সেন

(আত্মজীবনীর সারাংশ): জীবনে প্রথম থিয়েটারে যাই স্লিপিং বিউটি দেখতে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সব সামনে বসতে দেওয়া হয়েছিল।......

বিংশ শতাব্দীর অভ্যাগম আগতপ্রায়। এর মধ্যেই জার্মানী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। ইংরাজদের সঙ্গে ফরাসীদের সামরিক-চুক্তি সাধিত হল; ফরাসীদের সঙ্গে রুশদের আগেই সখ্যতা-বন্ধন ছিল, ইংরাজরা এবার জাপানীদের সঙ্গে চুক্তি করলেন, জাপানীরা পোর্ট আর্থার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পিটার্সবার্গ এবং রষ্টভ-অন্-ডনে শ্রমিক-ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। ব্রাসেলসে লেনিন মেন্‌সেভিকস্‌-দের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। ভোকৃহস্কার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে আমি সেই সব লেখকের রচনা পড়ছিলাম, গুরুজনরা যাঁদের নাম পর্যন্ত আমার সামনে করতেন না: গর্কি, লিওনিড আন্দ্রেয়েভ এবং কুপরিণের কথা বলছি।

প্রত্যেকদিন লাইব্রেরীতে ছুটে যেতাম বই বদলাবার জন্য। বই পড়াটাকে জীবনের ব্রত হিসাবে নিয়েছিলাম: জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবো এই উদ্দেশ্যেই পড়তাম। ডষ্টয়েভস্কি, ব্রেহম, জুলেভার্ণ, টুর্গেনেভ প্রভৃতির বই পড়তাম। পড়তাম ডিকেন্সের বই এবং জিভোপিসনয়ে-ওবোজরেনিয়ে (জনপ্রিয় সচিত্র সাপ্তাহিক-শিল্প সমালোচনা বিষয়ক)। যতই বই পড়তাম ততই সব বিষয়ে সংশয় দেখা দিত মনে। চারদিক থেকে যেন মিথ্যায় আমাকে ঘিরে ফেলছিল। এক একবার মনে হোত ভারতবর্ষের জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি—পরমুহূর্তে ইচ্ছা হোত ভারস্কায়ার গভর্ণর-জেনারেলের বাড়ী বোমা মেরে উড়িয়ে দিই। আবার সময় সময় ভাবতাম ফাঁসির দড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করি।

এই সময় থিয়েটারে যেতে শুরু করি। আর্ট থিয়েটারে চেখভ, হবসেন এবং হাউপ্টমানের নাটকগুলো দেখানো হোতো, কমস্যচে ভ্যানিভল্‌ইন্‌স চিলড্রেন, ম্যালীতে 'দি পাওয়ার অভ্‌ ডার্কনেস।' বেশ মনে আছে আমাদের বাড়ীতে যাঁরা আসতেন তাঁদের ভেতর একজন বলেছিলেন যে, শীগগীরই একটা বায়োস্কোপ খোলা হবে এবং সেখানে জীবন্ত ছবি দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে।

... ...

ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট বইটি পড়লাম। শোনিয়ার দুর্ভাগ্যে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলাম।

আমার প্রথম উপন্যাস 'দি একস্ট্রাঅরডিনারী এ্যাড্‌-ভেন্‌চারস্‌ অভ্‌ জুলিও জুরিনিটো'তে একটি চরিত্র আছে আমার নিজের নামে। এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র। মিষ্টার কুলের মালিকানায় কোন ব্রথেলে আমি ক্যাশিয়ারের চাকরী করিনি বা ভ্যাটিকেনে মেশিন-গান নিয়ে যাইনি। যে চরিত্রটির নাম দিয়েছি ইলিয়া এলেনবুর্গ—অবশ্য মাঝে মাঝে তার কথাবার্তার ভেতর দিয়ে আমার নিজের চিন্তাধারাকে প্রকাশ করেছি আসলে কাল্পনিক। এই উপন্যাসটি লিখেছিলাম আমার তিরিশ বছর বয়সের সময়। এর আগে যে সময়ের কথা বলছিলাম তখন আমার বয়স তের বছর। অর্থাৎ আ-ার শৈশবকাল শেষ হয়ে এসেছিল—১৯০৫ সাল প্রায় সমাগত।

(২)

একবার সেন্‌সাসের ব্যাপারে এক যুবতী সংগ্রাহক

আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি আমার ঘরের দেয়ালগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলেন—পিকাসোর আঁকা ছবিগুলো দেখে তিনি শকৃড হয়ে গেছিলেন। "আপনি কি বলতে চান ও ছবিগুলো সত্যিই ভালবাসেন ?"

"আপনার কথা বিশ্বাস করিনা। উনি আপনার বন্ধু বলেই ওকথা বলছেন।"

এরপর যুবতীর প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলাম।

"শিক্ষার রেকর্ড ?"

"সেকেণ্ডারি স্কুল—কিন্তু ওখানকার পড়া শেষ করতে পারিনি।"

মহিলা এবার অপমানিত বোধ করলেন।

"আমি আপনাকে সিরিয়াসলি প্রশ্ন করছি।"

"আমি সিরিয়াসলিই উত্তর দিচ্ছি।"

"আপনি আমাকে ঠাট্টা করছেন। আমি আপনার লেখা বই পড়েছি·····সেনসাস্ ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। এ বিষয়ে আপনি সঠিক উত্তর দিতে চাইছেন না কেন ?

মর্মাহত হয়ে যুবতী চলে গেলেন। অথচ আমি তাকে সত্যি কথাই বলেছিলাম। ১৯০৭ সালের শরৎকালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠবার আগেই আমি স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হই। স্কুলে যৎসামান্য শিখেছি—কিছুটা শিক্ষকদের থেকে, কিছুটা সহাধ্যায়ীদের থেকে। কিন্তু সে শিক্ষার পরিমাণ খুব বেশী নয়। বই পড়ে এবং জিমন্যাসিয়ামের দেয়ালের বাইরে যেসব লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তাদের থেকেই আসল শিক্ষা পেয়েছি।

জিমন্যাসিয়ামে উঁচু ক্লাসের কয়েকজন ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাদের কাছেই প্রথম 'হিষ্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম' 'সারপ্লাস ভ্যালু' ইত্যাদি বিষয়ে শুনি আমার মনে হয়েছিল এ সবই খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

বার্ডমানের অন্তেষ্টিক্রিয়ার দিনটা এখনও মনে আছে। গোরখানা থেকে ফেরবার পথে গুলিচালনার শব্দ কানে এল—একজন কসাকৃকে দেখলাম—কানে রিং, হাতে চাবুক। সেই ডিসেম্বর মাসের কথা স্মরণে আছে। সেই প্রথম রাস্তার তুষারের উপর রক্ত পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। কুওরিন স্কোয়ারে ব্যারিকেড তৈরী করার ব্যাপারে আমিও হাত লাগিয়েছিলাম। সেই ক্রিসমাসের কথা কখনও ভুলবোনা—গানের পর চারিদিকের নিস্তব্ধতা, তারপরেই চিৎকার এবং গুলির আওয়াজ।

১৯০৬ সালেই আমার ভাগ্য নির্দ্ধারিত হয়ে গেল—কারণ ঐ বছরই বলশেভিক সংগঠনে যোগ দিলাম—স্কুল থেকেও কিছু পরেই চিরকালের জন্ম বিদায় নিলাম।

(৬)

অতীত চিরদিনই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায় ; কিছু কিছু ঘটনা হয়তো স্মরণে থাকে, তবে বেশীর ভাগই আমরা ভুলে যাই।

১৯০৬ সালে বলশেভিক ইয়েগোরেভার সঙ্গে আলাপ হয় : মহিলার চুলগুলো ছিল ভারি সুন্দর এবং মাথার সামনের দিকটা গোলাকার। প্রথমে আমি পার্টির সাহিত্যপত্র বিলির কাজ করতাম, তারপর জামোটভরেস্কি বিভাগের সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হই। এই সময় আমার সবথেকে বেশী ভয় হোত পাছে কমরেডরা আমার বয়স আঁচ করতে পেরে বলেন, পনের বছরের ছেলের উপর গুরুদায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। এর অনেক পরে আমি জেনেছিলাম যে, মায়াকোভস্কি যখন তাঁর পার্টিওয়ার্ক শুরু করেছিলেন তখন তাঁর বয়স পনের বছরেরও কম ছিল। কয়েকজন কমরেডের কথা বলি—সেনিয়া সেলেনভ বৈদেশিক ক্যাপিটেলের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতেন—এ্যাংলো-জার্মান বৈরিভাব, রাশিয়ান বুর্জোয়াজীর লোভী মনোবৃত্তি এবং অধঃপতিত অবস্থা বিষয়েও বক্তৃতা দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনান্তে অল্পস্বল্প কথাবার্ত্তা বলতেন ডেকেডেন্টস, আর্ট অভ্ দি থিয়েটার এবং

আনাতোল ফ্রাঁসের উপহাসাত্মক উপন্যাসগুলোর ওপর। ভবিষ্যতে অনেক বছর বাদে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল প্যারিসে—তিনি ওখানকার সোভিয়েট এম্‌বেসীর আইন-সংক্রান্ত উপদেষ্টার কাজে নিযুক্ত ছিলেন—বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয় নি তাঁর ১৩ বছর বাদেও। স্পষ্টই বোঝা গেল, প্রথম থেকেই তিনি মানসিক-গঠনের পরিপূর্ণতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৮ বছর বয়সেই চারিত্রিক বিবর্তন তাঁর সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল।

প্যারিসে আমাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়। তিনি বেশ জটিল চরিত্রের লোক ছিলেন। ভোগবিলাসের প্রতি একটা স্বাভাবিক স্পৃহা ছিল, অথচ আবার এদিকে ছিলেন বিপ্লবী। আমার বেশ মনে আছে একবার মস্কো থেকে প্যারিসে যাচ্ছি ফ্রন্টিয়ার ষ্টেশন নেগোরেলয়েতে বিপরীত-গামী একটি ট্রেন এসে থামল, রেস্তোরাঁ কামরায় বসে তাঁকে আলস্যের মৃদু হাসি হাসতে দেখেছিলাম। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি—১৯৩৫ সালে ঐ শেষ দেখা…

ভ্যালিয়া নিউমার্ক ছিলেন লাজুক ধরণের, চোখে কম দেখতেন, নম্র এবং পার্টির প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। আমার সঙ্গে একই রাত্রে তিনি গ্রেপ্তার হন; তারপরে মুক্তিলাভ করেন, আবার অন্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করে তাঁকে সাইবেরিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি বিদেশে পালিয়ে যান। সুইস সীমান্তে ছোট্ট ফরাসী সহর মর্ত্তোতে আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছিলাম। ভ্যালিয়া এখানে একটি ঘড়ি-তৈরি করবার কারখানায় কাজ করছিলেন। ১৯০৯ সালে আমি কবিতা-লিখিয়ে হিসাবে খানিকটা হাত পাকিয়ে ফেলেছি। এই সময় আমার ভেতরটা নানা বিপরীতভাবে ভরে উঠেছে। কখনও রাশিয়ায় ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখছি, আবার কখনও সম্পূর্ণভাবে লেগে পড়ছি আইন-বিরোধী কাজে। আবার এক এক সময় সারা প্যারিসময় ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং এই সহরের সৌন্দর্যে মোহিত, সম্মোহিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। ভ্যালিয়া আগের মতই আছেন। একটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের তিনি সভ্য হয়েছিলেন এই সময়। পার্টি লিটারেচার পড়েই সে সময় কাটাতো। রাত্রে আবেগ-ভরা কণ্ঠে তিনি আমাকে বোঝাতেন যে, একবছর বা দু'বছরের ভেতরই রাশিয়াতে বিপ্লব শুরু হবে। পরে জানতে পেরেছিলাম, সিভিল-ওয়ারের সময় সাদারা তাঁকে ফাঁসি দিয়েছিল।

লডভ্ ছিলেন পোষ্ট-অফিসের ক্ষুদে অফিসার—মায়া-সনিট্‌স্কায়াতে সরকারী ফ্ল্যাটে তিনি বাস করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ধীরে সুস্থে নিজের মেয়েদের বিয়ে দেবেন—তারা শান্ত জীবন কাটাবে। মেয়েরা কিন্তু বেছে নিল নিচের তলার বৈপ্লবিক আন্দোলনকে এবং সেখানকার কাজে যোগ দিল। নাদিয়ালডভাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তাঁর বয়স ১৭ বছরও হয়নি। আইনমতে বাবা বেইল দিলে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন। কিন্তু পুলিশের কর্ণেলকে তিনি বললেন, "আমাকে বাইরে যেতে দিলে, আবার আগের কাজে লাগব।" নাদিয়া কবিতা ভালবাসতেন। আমাকে ব্লোক, বলমন্ট এবং ব্রিয়াসোভ থেকে পড়ে শোনাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মনঃসংযোগ নষ্ট হবে বলে এসব আমার পছন্দ ছিল না। শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও শিল্পকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করতাম। নাদিয়ার কাব্যপ্রীতিকে উপহাস করতাম—বলতাম, কবিতা জিনিষটাই বাজে জিনিস। কাব্যপ্রীতি থাকা সত্ত্বেও তার রাজনীতিক কর্ত্তব্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেন। নাদিয়া মিষ্টি ধরনের মেয়ে ছিলেন। নম্র, নিষ্পাপ দৃষ্টিভঙ্গি, বাদামী রংএর চুল টান করে পেছন দিকে আঁচড়ানো। তাঁর বড় বোন মারুশিয়াও তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। এলিজাভেটিনস্কয়ো স্কুল থেকে সোনার মেডেল পেয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। আমি সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করতাম। বিদেশে যাবার আগে ১৯০৮ সালে নাদিয়ার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এর দু'বছর বাদে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯১৩ সালের ২৭শে নভেম্বর নাদিয়া আত্মহত্যা করেন। ১৫ বছর বয়সে নাদিয়া

আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্কার হন, ১৬ বছর বয়সের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯ বছর হলে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন, ২২বছর হবার পর উপলব্ধি করেন তাঁর আসল বৃত্তি হচ্ছে কবিতা লেখা এবং নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করা।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড মুভমেণ্টে অন্যদের মত আমাকেও অনেক রকমের কাজ করতে হোত: আমরা লিফ্লেট লিখতাম, ক্রাইং প্যানে জেলেটিন সিদ্ধ করতাম, হেকটোগ্রাফে লিফ্লেট ছাপতাম—উপযুক্ত জায়গায় মেশবার চেষ্টা করতাম, লেনিনের প্রবন্ধগুলো শ্রমিক-সংঘে ব্যাখ্যা করতাম, মেন্‌শেভিকদের সঙ্গে বাকযুদ্ধ করে আমাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতাম।

মাকার বলে একজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হোত। বহু বছর বাদে জানতে পারি, মাকার হচ্ছে ভ, পি, নোগিনের নাম (one of the first Bolshe-viks, 1878 –1924)

১৯০৭ সালের শরৎকালে আমাকে কাজ দেওয়া হল সৈনিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের ব্যারাকসে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। এই কাজের গুরুত্বে এবং দায়িত্বে আমি খুব উত্তেজিত বোধ করলাম। নেজভিজ্স্কি রেজিমেণ্টের একজন আর্মি-ক্লার্কের সঙ্গে পরিচয় জমিয়ে ফেললাম। এই ভদ্রলোকই সিনগান প্লেটুন থেকে আর তিনজনকে যোগাড় করলেন। এদের সঙ্গে আর একজন স্বেচ্ছায় এসে যোগ দিল—এর পর এল একজন সৈনিক। সর্বসমেত হল ছজন।

এই সময় বহু উপন্যাস পড়তাম এবং থিয়েটারে যেতাম। সময় সময় অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হোত যাঁরা রাজনীতির সংশ্রবে ছিল না। উজ্জ্বল ১৯০৫ সালের পর একটা গোলমেলে সময় দেখা দিল: প্রত্যেকেই যেন কিসের অন্বেষণে ব্যস্ত, মুখে মুখে উচ্ছাসভরা তর্ক শোনা যেত, সবাই যেন উত্তেজিত, কিন্তু এসবের পেছনে ছিল একটা গভীর ক্লান্তি, নৈরাশ্য এবং শূণ্যতার ভাব।

আমার নীচের মহলের জগতেও আর্টের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। রাত্রে আমি হ্যাম্‌সুনের বইগুলো—প্যান, ভিক্টোরিয়া, দি মিষ্ট্রিজ পড়তাম। এর জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতাম তবু এর আকর্ষণ এড়াতে পারতাম না।

ওরা সকাল ছটার সময় আমার খোঁজে এসেছিল। আমি তখন গভীর নিদ্রা উপভোগ করছি। পুলিশের এবং তাদের সাক্ষীদের কথাবার্তার শব্দে জেগে উঠলাম। আগে কিছু জানতে না পারাতে কোন কিছু সরিয়ে ফেলতে বা নষ্ট করবার সময় পাইনি। ভোর হওয়া অবধি পুলিশ সার্চ চালালো। মা কান্নাকাটি করছিলেন, একজন আণ্ট কিয়েভ থেকে আমাদের এখানে থাকতে এসেছিলেন—তিনি ভয়ানক রকম ভয় পেয়ে সারা ফ্ল্যাট-ময় ছুটোছুটি করছিলেন। দিন পনের আগে আমার জন্মদিন গেছে অর্থাৎ আমার বয়স হয়েছে সতেরো—এই চিন্তাটাই আমার পক্ষে শান্তিদায়ক হয়েছিল—আমার কাজের জন্য এখন আর অপর কারোকে দায়ী করা চলবে না। আমার সম্বন্ধে এখন থেকে আমারই পূর্ণ দায়িত্ব। ক্রমশঃ—

৩১৪ পাতার পর

গভর্ণরকে লিখিয়া জানান যে, তাঁহারা ইউ এফ ত্যাগ করিয়াছেন, গভর্ণর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে জানান যে, এই অবস্থায় তাঁহাকে অবিলম্বে এসেম্ব্লী ডাকিয়া হয় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে হইবে, নয় রাজ্যভার ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় নিজের সহযোগীদিগের পরামর্শে ১৮ই ডিসেম্বর এসেম্ব্লী ডাকা হইবে বলেন। অর্থাৎ যে সময় কথাটা উঠে সেই সময় হইতে মাসাধিককাল তাঁহারা এসেম্ব্লী ডাকিবেন না। গভর্ণর তাঁহাদিগকে আরও শীঘ্র এসেম্ব্লী ডাকাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারা তাহাতে রাজী ত হইবেনই না, বরং ১৮ই ডিসেম্বর এসেম্ব্লী ডাকাও তাঁহারা হয়ত বন্ধও করিতে পারেন। গভর্ণর তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, ইউএফের সমর্থকগণ সংখ্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়া রাজ্যপরিচালনার অধিকার আর দাবী করিতে পারেন না, তিনি ইউএফকে বরখাস্ত করিয়া ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। এই সময় কংগ্রেসদল গভর্ণরকে জানাইলেন, তাঁহারা ডাঃ ঘোষকে সমর্থন করিবেন।

গভর্ণর অতঃপর ২৯শে নভেম্বর এসেম্ব্লী ডাকিবার নির্দেশ দিলেন ও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্য মন্ত্রীরূপে এসেম্ব্লীর তাঁহার উপর আস্থা আছে বলিয়া একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া জানাইলেন। ২৯শে নভেম্বর এসেম্ব্লী বসিবার অনতিবিলম্বেই স্পিকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন যে, তাঁহার মতে গভর্ণরের ইউ এফ বরখাস্ত করা, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা ও এসেম্ব্লী ডাকা সকল কিছুই অবৈধ হইয়াছে এবং সেই কারণে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য, তিনি এসেম্ব্লীর কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মুলতুবী রাখিলেন। গভর্ণরও এসেম্ব্লী বন্ধ করিয়া রাখিবার নির্দেশ দিলেন। এই সকল ঘটনা ঘটিলে বিতাড়িত ইউএফ দল মহাআনন্দে প্রচার আরম্ভ করিলেন যে, স্পিকার সত্য সত্যই ভারতীয় জনসাধারণের একটা মহাউপকার করিয়াছেন ও সেই আনন্দ ব্যক্ত করিবার জন্য নানাভাবে আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করিয়া জনসাধারণের বহু অসুবিধার সৃষ্টি করিলেন। বহু অল্পবয়স্ক যুবক ইউএফের সমর্থন করিতে গিয়া পুলিশের সহিত সংঘাতে প্রাণ হারাইলেন ও আহত হইলেন। কিন্তু এই সকলের ফল বিশেষ কিছু হইল বলিয়া মনে হইল না। স্পিকারের কথায় গভর্ণর অথবা ভারতের রাষ্ট্রপতি কেহই বিশেষ বিচলিত হইলেন না এবং ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্য মন্ত্রীত্ব বহাল থাকিয়া গেল। অতঃপর কি হইবে তাহার আলোচনা বহুমুখীভাবে চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, গভর্ণরকে বরখাস্ত করা হউক; কেহ চাহিলেন, স্পিকারকে বিতাড়িত করিতে বস্তুত রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি বিচার করিয়া ঠিক কি করা উচিত সে বিষয়ে কোন নির্দেশ এখনও রাষ্ট্রপতির তরফ হইতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দেওয়া হয় নাই। হইতে পারে কোন সময় রাষ্ট্রপতি সাক্ষাৎভাবে বাংলার রাজ্যভার নিজহস্তে লইয়া পরে আবার নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবেন। হইতে পারে এসেম্ব্লী পুনর্ব্বার ডাকিয়া স্পিকার বর্ত্তমানে অথবা অবর্ত্তমানে ভোটের সাহায্যে স্থির হইবে যে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী থাকিবেন কি না। যাহাই হউক, বর্ত্তমান ব্যবস্থা অধিককাল স্থায়ী থাকিতে পারে না। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা পূর্ব্বকার মন্ত্রীসভাগুলির মতই এমন এমন লোক দিয়া গঠিত হইয়াছে যে বাংলার জনসাধারণ তাহার মধ্যে দুই একজন ব্যতীত কাহাকেও বিশেষ জানেন না। রাজ্যভার কাহাকেও দিতে হইলে, তাঁহাদের গুণাগুণ সকলের জানা আবশ্যক কুলশীল বা আভিজাত্য না হয় শ্রেণীহীন সমাজে উঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন বিশেষ কার্য্যের ভার কাহাকেও দেওয়া উচিত নহে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

পথে বিশ্রাম

শিল্পী : ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৭৪

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দৃষ্টিভঙ্গী

রন্ধন করা যাহার জীবন যাত্রার প্রধান আশ্রয় তাহার নিকট রন্ধনের আগুন জ্বালিবার চুলা, রন্ধনের পাত্র ও সরঞ্জাম, খাদ্য বস্তু ও তাহার জোগাড় এই সকল কথাই প্রাধান্য লাভ করে। তাহাকে হিমালয়ের কোন তুষার-আবৃত শিখর আরোহণ করিতে বলিলে সে তাহা অপেক্ষা আধসের চাল, এক পোয়া ডাল ও তেল নুনকে অধিকতর ভাবে জীবনের কেন্দ্রের সারবস্তু বলিয়াই বিচার করিবে। যাহার কার্য্য ঝাঁটা দিয়া ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা, সে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউগুলির অনন্ত বিস্তৃত বিশালতা দেখিয়া সহজেই ভাবিতে পারে যে উক্ত মহাসাগরের অস্তিত্বের কোন আবশ্যক বা উদ্দেশ্য নাই। এইরূপে মানুষ মাত্রেই ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ভাবে নিজ নিজ জীবনধারার মাপকাঠি দিয়া মাপিয়াই জগতের সকল বস্তুর মূল্য বিচার করিয়া থাকেন। মানব-জীবন ও মানব-সভ্যতা সৃষ্টির পরিস্থিতির বিরাট ও সীমাহীন প্রান্তরে কোথায় এক কোণে বিন্দু-চিহ্নের মতই অপরিমেয় একটু ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া আছে তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে শত সহস্র লক্ষ কোটি সূর্য্যমণ্ডল অবস্থিত। আলোকের গতিবেগ দিয়া এই সকল তারকা-মণ্ডলের দূরত্ব নির্দ্ধারণ করা হয়। যথা আলোকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে :৮৬০০০ মাইল। অর্থাৎ আলোক এক বৎসরে আন্দাজ ৬ ০০০০০০০০০০০ ষাট হাজার কোটি মাইল গমন করে। আমাদের নিকটতম তারকা আমাদিগের পৃথিবী হইতে চার আলোক-বৎসর বা প্রায় ২৫০০০০০০০০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল। সেই হিসাবে ৩০০০০০০,০০০০০০০ তিন লক্ষ কোটি পৃথিবী পাশাপাশি স্থাপিত করিলে আমরা ঐ নিকটতম তারকাতে স্থূল পথে গমন করিতে পারি। অপরাপর তারকা পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ আলোক-বৎসর দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার অর্থ বৎসরে ষাট হাজার কোটি মাইল গমন করিলে সেই সকল তারকায় পৌছাইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর সময় লাগিবে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড যে কত দূর হইতে দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা মানব-

কল্পনার উপলব্ধির বাহিরে। সময়ের ক্ষেত্রেও দেখা যাইবে যে মানব-ইতিহাস ও এই সৌরমণ্ডলের ইতিহাস তুলনা করিলে সূর্য্যের জীবনকাল ও মানবজাতির জীবন-কাল ১:৬০০০০ সম্বন্ধে সংযুক্ত। অর্থাৎ মানব ইতিহাসের তুলনায় সূর্য্যের জীবনকাল ষাট হাজার গুণ দীর্ঘতর। মানব-জাতি শেষ হইয়া যাইবার পরেও হয়ত সূর্য্য বহু শত কোটি বৎসর বর্ত্তমান থাকিবে। সূর্য্যের বয়স অন্তত ৬০০ কোটি বৎসর। এই পৃথিবীর বয়স ৫০০ কোটি বৎসর, কিন্তু স্থুল অংশের বহুভাগের জন্ম হইয়াছে ২৮০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে। ইহার তুলনায় মানব-জাতির উদ্ভব হইয়াছে মাত্র কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে।

সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে শিরায় শিরায় যত জানিবার বিষয় আছে তাহার তুলনায় মানবজাতির ইতিহাসে জ্ঞাতব্য বিষয় আছে অনেক অল্প। বিজ্ঞানের শত সহস্র শাখার মধ্যে মানবজাতির সহিত সম্পর্কিত যেগুলি তাহার সংখ্যা অল্পই। এই কারণে যখন মানুষ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীকে সীমাবদ্ধ করিয়া নিজের আগ্রহ আশা ও প্রয়োজনের সহিত এক ছাঁচে ঢালিয়া লইয়া পাণ্ডিত্যকে সহজ করিয়া লইবার চেষ্টা করে তখন তাহার অনুভূতি ও অবগতির ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া তাহার মানবতাকে ক্রমশঃ খর্ব্ব করিয়া ফেলে। অনেক মানুষ চর্ম্মকারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ক্রমে পৃথিবীর অপর সকল বিষয় ভুলিয়া শুধু পশুচর্ম্মের গুণাগুণের কথাতেই মগ্ন হইয়া থাকেন। পশুচর্ম্মেই সৃষ্টির আরম্ভ ও শেষ বলিয়াই এই চর্ম্মকারগণ বিশ্বাস করিতে থাকেন। মানব-সমাজে বহু অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতব্যক্তি প্রায় সর্ব্বদাই ভুলিয়া থাকেন যে মানবজাতির জন্মের শতশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টির বর্ত্তমান পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে হয়ত সহস্র লক্ষ কোটি বৎসর হইতেই সৃষ্টির অন্যান্য ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। মানুষ তাহার ৫ লক্ষ বৎসরের ইতিহাস লইয়া সময়ের অনন্ত প্রাঙ্গণে কোথায় এক বালু-কণার মত পড়িয়া আছে তাহা স্থিরনিশ্চয় ভাবে কে দেখাইয়া দিতে পারে? কিন্তু মানুষ নিজ প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যে এতই মুগ্ধ যে তাহাকে তাহার নিজত্বের সীমার বাহিরে আরম্ভ, প্রগতি ও পরিণতি লইয়াই জড়িত হইয়া থাকিয়া জ্ঞানের অনন্ত প্রসারের কথা ভাবিতেও চাহে না। মানব-সভ্যতার আরম্ভ কোথায় কেমন করিয়া হইল তাহাও অধিকাংশ লোক বুঝিতে চাহে না। মানুষ যে পথে চলিতেছে তাহার উপযুক্ততা বিচার করিবার মত নীতিজ্ঞানও সাধারণ মানুষের নাই। গড্ডলিকা প্রবাহ যে দিকে বহিয়া যায় তাহাই সত্য পথ বলিয়া সকলে ধরিয়া লয়। কেহ ভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা, কেহ ভাবে সামাজিক ঐশ্বর্য্যের ভাগবাঁটের কথা। কিন্তু প্রকৃত মানবতার আদর্শ কি, মানবসভ্যতা কোন পথে চলিলে সেই আদর্শ পূর্ণতর-ভাবে উপলব্ধ হইবে, সে সকল কথার বিচার কেহ করে না। বাম পথ, দক্ষিণ পথ অথবা নিছক সাময়িক সুবিধাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মোহাক্লিষ্ট ধারণা অবলম্বনে মানুষ যত্রতত্র ছুটিয়া চলে। কোন পথের স্থির নিশ্চয় উপযুক্ততা বিচার সে করে না। সত্যকার সুবিধা কি তাহাও বুঝে না। কারণ মানবজাতি পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়া তাহার ভিতর চারলক্ষ নব্বই হাজার বৎসর শুধু হিংস্র পশু-পক্ষী সরীসৃপদিগের আক্রমণ হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া কাটাইয়াছে ও অবশিষ্ট দশ হাজার বৎসর কাটাইয়াছে রাজা, সম্রাট, পুরোহিত, বিজয়প্রার্থী সেনাদল, ডাকাত ও দোকানদারের সহিত সংঘাতে। এখন প্রায় দেড়শত বৎসর তাহারা পড়িয়াছে জননেতাদিগের ও বিভিন্ন আদর্শবাদী রাষ্ট্রীয়দলের কবলে। উৎপীড়নের অবসান কবে হইবে কে বলিতে পারে?

আমরা জানিতাম মানুষের যে সকল মহাশত্রু আছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইল মহামারী, নৈসর্গিক দুর্ঘটনা, অজ্ঞানতা, অভাব ও পাপ। এই সকল মহা দুঃখের কারণগুলির মধ্যে মানুষের আর্থিক অভাব নিবারণ চেষ্টার বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা অনেকেই করেন। ইহার মধ্যে প্রবলতম প্রচারকার্য্য করেন সেই রাষ্ট্রীয় দলগুলি যাহার নেতাগণ মানুষের সকল দুঃখের অবসান কি করিয়া হইতে পারে তাহা জানেন। কিন্তু যে সকল দেশে ঐ নেতাদিগের গুরুজনগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছেন সেই সকল দেশেও দেখা যাইতেছে যে মানুষ ক্রমাগতই

আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া মানুষ কেন যে এক বিপদের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আর একটি আরো গভীরতর বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িবে তাহার অর্থ বোঝা বড়ই কঠিন। ফ্যাসনের জন্য মানুষ আঁট জুতা ও পাতলুন পরিয়া কষ্ট ভোগ করিতে পারে; কিন্তু সেই অচল ও কষ্টকর পরিবেশ সর্ব্বব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলে মানবজীবন ক্রমশঃ দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে। জীবন সুখকর করাই সভ্যতার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু মানব-মনের সুখের আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে সুখের উৎস মানুষের বাস্তব পরিবেশের ভিতরেই শুধু নিহিত নাই। মানুষের মনের ভিতরেই সুখ অনুভূতির জন্ম ও তাহা বহুক্ষেত্রেই বোধশক্তি ও জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নিজেদের চিন্তা বিশ্লেষণ ও অনুশীলন-জাত জ্ঞান লাভ করিয়াই মনে আনন্দের পূর্ণতা লাভ করেন। ঐতিহাসিক, সঙ্গীতকার, কবি বা সাহিত্যিক নিজ নিজ সাধনা ও সৃষ্টিলব্ধ আনন্দকেই শরীর উপলব্ধ আনন্দের তুলনায় উচ্চতর স্থান দিয়া থাকেন। কারণ খাদ্য খাইয়া অথবা বস্ত্র পরিধান করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, একটি চিত্রাঙ্কন করিয়া মনের ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিতে পারার আনন্দ তাহার তুলনায় অনেক অধিক। ইহা অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর সুখের মধ্যে নাম করা যায় অর্থ আহরণের আনন্দ, নেতৃত্বের আনন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের আনন্দ প্রভৃতির। কিন্তু সেগুলিও সাক্ষাৎভাবে শরীরলব্ধ আনন্দ হইতে পৃথক। অতএব আনন্দের বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে মানুষ সর্ব্বক্ষেত্রে বাস্তব কারণজাত আনন্দের অনুসরণও করে না এবং যেখানে যেখানে করে সেখানে সেই সকল আনন্দের তুলনায় নিছক মানসিকভাবে পাওয়া আনন্দকেই অধিকতর মূল্যদান করিয়া থাকে। সুতরাং শুধু বাস্তবভাবে সুখলাভের উপকরণগুলির প্রাপ্তি চেষ্টা না করিয়া বুদ্ধিমান মানুষ মনের পথে সুখের অনুসরণ করাকেই উচ্চতর স্থান দিয়া থাকেন। যাঁহারা বলেন যে অধিক সংখ্যক মানুষ অধিক ক্ষেত্রে বস্তুকেই মনভাবের উপরে স্থান দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। উচ্চ সভ্যতায় মানুষ বাস্তবকে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃতভাবে অল্প প্রয়োজনীয় চিন্তা করে ও দর্শন, বিজ্ঞান বা সুকৃষ্টিকেই অধিক আকাঙ্খনীয় বিচার করে। মানব সভ্যতা, মানব চরিত্র ও মানব মনের অভিলাষের ধারা কখনও বস্তুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া শান্তি লাভ করে না। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখী ও অনন্ত জ্ঞান, রস ও ভাবের অনুসন্ধানে চির জাগ্রত। এই কারণে বাস্তব অপেক্ষা নিরবয়ব মানসিক ভাবের বৈচিত্র অসামান্য ও ও অপরূপ হইয়া থাকে। আজকালকার বস্তুতান্ত্রিকদিগের চিন্তার ফলপ্রসূত ভাবগুলিও বহুক্ষেত্রেই বাস্তবতার উপরে আকারহীন মাহাত্ম্যে বিরাজ করে। যথা, সমষ্টিগতভাবে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া। ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া রাখা ও সেই মালিকানা লক্ষ কোটি হস্তের মধ্যে ন্যস্ত রহিয়াছে চিন্তা করা একক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় বাস্তব ও অপর ক্ষেত্রে মানসিক ভাবমাত্র। যে ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একাধারে কুষীদজীবী, শ্রমজীবী ও ডাকাত সেই স্থলে শ্রেণী সংগ্রামের মানস চিত্রে সে ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণীতে আবির্ভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব ভাব সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। শ্রেণীর আকার প্রকার ও স্বরূপ কাল্পনিক বলিয়াই এই প্রকার ঘটনা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ বাস্তবের উপর পূর্ণরূপে নির্ভরশীল যে সকল ধারণা সেই সকল ধারণা ক্রমাগতই বাস্তবের সীমা ছাড়াইয়া অবাস্তবের ক্ষেত্রে যাইতে বাধ্য হয়; কেননা যে কোন ধারণাই যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিলে বাস্তবের সীমার মধ্যে আর আবদ্ধ থাকিতে সক্ষম হয় না। একটি বালককে যদি একটি রংএর বাক্স ও তুলি দেওয়া যায়, অথবা ছুতরের কাজ করিবার কয়েকটি যন্ত্র যথা করাত, বাটালি ইত্যাদি, তাহা হইলে সেই বালকটির ঐ উৎপাদনের যন্ত্রগুলি সমাজের সকল ব্যক্তির সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবার কথা, অনেকের মতে। কিন্তু এই কষ্টকল্পিত ধারণার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কোন ব্যক্তির জল তুলিবার বালতি, কাঠ কাটিবার কুড়াল কিম্বা পেরেক ঠুকিবার হাতুড়ি থাকিলে সেগুলি জাতীয় সম্পদ মনে করিলেও বস্তুত সেগুলি যাহার ঘরে আছে তাহারই মনে করিতে হইবে। ভাবের ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিগত সম্পদকে সামাজিক ঐশ্বর্য্য বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির সকল ধনসম্পদই বা,

সামাজিক নহে কেন? ভোগের বা ব্যবহারের অধিকার কাহার তাহা বিচার করিলে অবশ্য কথাটা অপর রূপ ধারণ করে।

কংগ্রেসের নূতন বৎসরের নির্ঘণ্ট

কংগ্রেসের এই বৎসরের কর্ম্মসূচী বা কার্য্য পরিকল্পনার নির্ঘণ্ট অপর সকল বৎসরের তুলনায় কিছু পরিবর্ত্তিতরূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার কারণ কোন কোন প্রদেশে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়। এই পরাজয়কে কংগ্রেসের নেতাগণ ভারতের জাতীয়তা রক্ষা ও সাধারণতন্ত্র চালিত থাকার বিরুদ্ধগতি বলিয়া মনে করিতেছেন, এবং তাঁহারা বলিতেছেন, যদি বহু কংগ্রেস বিরুদ্ধদলের মিলিত চেষ্টায় আরো অনেক প্রদেশে কংগ্রেস শাসন ক্রমশঃ লোপ পায় তাহা হইলে দেশের লোকের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া এক বা অল্পলোকের হস্তে রাজ্যশাসন ক্ষমতা চলিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিবে। এইরূপ কেন হইবে তাহা কংগ্রেস নেতাগণ বলেন নাই। একথা মানিতেই হইবে যে কম্যুনিষ্টদলের প্রভাব বৃদ্ধি পাইলে দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া শাসন ক্ষমতা পার্টির নেতাগণের হস্তেই সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস শক্তিহীন হইলেই যে কম্যুনিষ্ট প্রবল হইয়া উঠিয়া ক্রমে একছত্র অধিকার বিস্তার করিতে পারিবে একথার কোন নিশ্চয়তা নাই। অপরাপর অকম্যুনিষ্ট দল, স্বাধীনপন্থীব্যক্তিগণ কিম্বা কোন নবগঠিত দল ভারতে প্রবল হইয়া উঠিতে পারিবেই না এমনও কোন কথা নাই। কংগ্রেস রাষ্ট্রক্ষেত্রে একাধিকার স্থাপন করিয়া দেশবাসীকে এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে যে কংগ্রেস ব্যতীত আর কোন দল ভারতের জাতীয়তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া উন্নতভাবে শাসন কার্য্য চালাইতে পারে না। এই কথা যদি সত্য হইত এবং কংগ্রেস যদি বস্তুত উন্নতভাবে শাসন কার্য্য চালাইত তাহা হইলে আজ কংগ্রেসের এই দুর্দ্দশা ঘটিত না। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কাল দলের নিষ্কর্ম্মা, দুর্নীতিপরায়ণ ও শঠশ্রেষ্ঠ লোকগুলিকে দেশের বুকের উপর চাপাইয়া রাখিয়া কংগ্রেস দেশবাসীর অবস্থা ক্রমশ এরূপ করিয়া আনিয়াছে যে লোকে শেষ অবধি যেমন করিয়া হউক কংগ্রেস-রাজ অপসারণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যদি দেশের লোকের উপার্জ্জন ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, শান্তিরক্ষা, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতি যথাযথভাবে করা হইত তাহা হইলে কংগ্রেস শক্তি হারাইত না। সহস্র সহস্র কোটি টাকা ঋণের বোঝা দেশের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে কোন সমুচিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত না করিয়া দেশের ভবিষ্যত ভারাক্রান্ত করিয়াও কংগ্রেস বিশেষরূপে অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই সকল কথা ভুলিয়া ও দেশবাসী জনসাধারণের সহিত সম্বন্ধ সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা হারাইয়া কংগ্রেস শুধু নীতিজ্ঞানের ইস্তাহার আওড়াইয়া দলের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কথায় ভুলাইয়া রাখা কিছুদিন চলিতে পারে; কিন্তু তাহার মেয়াদ অনন্তকাল স্থায়ী হইতে পারে না। কংগ্রেসের জাতীয়তা কি প্রকার এবং সাধারণতন্ত্রের আদর্শই বা সাধারণের কতদূর সাহায্যকর তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আমাদিগের স্বাধীনতার আরম্ভ হইতেই কংগ্রেস দেশের বহুভাগ ইহার উহার ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়া জাতীয়তা রক্ষার কার্য্য শেষ করিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান আরম্ভেই হইয়াছে। পরে হইয়াছে আজাদ কাশ্মীর ও উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের কোন কোন অংশ। আরও কোথাও কোথাও দেশের কোন কোন অংশ পর-অধিকৃত হইলে কংগ্রেস মহলে সেইজন্য কোন আলোড়ন লক্ষিত হয় নাই। নাগা, মিজো বা কম্যুনিষ্ট প্ররোচিত দেশাংশ পর-হস্তগত করার চেষ্টার কথা জানিলেও তাহা লইয়া কংগ্রেসের বিশেষ মাথা ব্যথা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ ভাবে বলা যায় ভারতের লোকেদের বিদেশে ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা কংগ্রেস বিশেষ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতের লোকেদের যখন বহিষ্কার করা হয় তখন কংগ্রেসের নেতাগণ ঐ সকল দেশের ভারতীয় বিতাড়ক নেতাদিগের সহিত মিতালি করা ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই। সাধারণতন্ত্র সংরক্ষণ বিষয়ে কংগ্রেস দেশের জনসাধারণকে সর্ব্বসর্ত্তবর্জ্জিত-ভাবে দেশ শাসনের ভার কংগ্রেস দলের হস্তে তুলিয়া দিতে

বলিয়া আসিয়াছে এবং নিজেরা যে সকল বড় বড় প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যভার প্রার্থী হইয়াছে সেইগুলি প্রায় সর্বত্রই রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া নিজদলের মতলব হাসিল করামাত্রতেই আত্মনিয়োগ করিয়া চলিয়াছে। এই সকল কারণে কংগ্রেস বৎসরের পর বৎসর বর্দ্ধিত ভাবে সাধারণের চক্ষে হেয় প্রতীয়মান হইয়া শেষে অপরাপর রাষ্ট্রীয় দলের নিকট নির্ব্বাচনে পরাজিত হইতে আরম্ভ করে। কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তিগণ নানাক্ষেত্রে দুর্নীতিকর কার্য্য করিয়া এই পরাজয়ের হাওয়া আরো প্রবল বেগে বহাইতে আরম্ভ করান এবং কংগ্রেসে সর্ব্বত্র প্রচারিত সমাজ ও সমষ্টিবাদের সহিত এই সকল অর্থলুণ্ঠনকর কার্য্যকলাপ কখনও ছন্দ ও তাল রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হয় নাই।

তাহা হইলে দেখা যায় যে কংগ্রেসের অবনতি শক্তিহীনতার কারণ কংগ্রেসের নিজের লোকেদের কার্য্য ও ব্যবহারের মধ্যেই পাওয়া যায়। একথা কংগ্রেসের নেতাদিগের অজানা ছিল না, কিন্তু ঐ নেতারা কোন আত্মশুদ্ধি চেষ্টা কখনও করেন নাই। নিজেদের "হাঁ জি" বলিবার শিষ্যদিগকে লইয়াই কংগ্রেস চলে এবং জনসাধারণের মধ্যে নূতন প্রেরণা ও প্রতিভা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা কংগ্রেসে দেখা যায় না। যে কোন প্রদেশেই অনুসন্ধান করিলে শতশত ব্যক্তি পাওয়া যাইবে যাহারা কম্যুনিষ্ট বা অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধীদলের লোক নহেন এবং যাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্মশক্তি ও নীতিবোধ জাগ্রতভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ সেই সকল লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার কোন চেষ্টা কখন করেন বলিয়া শুনা যায় না। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের যে অবস্থা তাহাতে যথাযথভাবে নিজেদের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া সেই কার্য্য সততার সহিত করা ব্যতীত অপর কোন ফাঁকা আওয়াজ করিয়া কংগ্রেস হারান শক্তি ফিরাইয়া পাইবে বলিয়া মনে হয় না। দলের মধ্যে যে সকল নেতা অধিক ভোট লাভ করেন তাহাদ্বারা তাঁহাদিগের কোন শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হয় না। প্রমাণ হয় দলের অধিকাংশ লোকের আদর্শহীনতা। এই জন্য পুরাতন নেতাগুলিকে মাথায় তুলিয়া রাখিয়া কংগ্রেস আরই ধ্বংসের পথে আগাইয়া যাইতেছে। ভারতের জনসাধারণের এই অবস্থায় নিজেদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত রাখিবার সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কার্য্য কি ভাবে করা যাইতে পারে তাহা বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত দেখিতে হইবে রাষ্ট্রীয়তার উদ্দেশ্য কি। মানুষ রাষ্ট্র গঠন করে প্রধানত প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে বাঁচাইবার জন্য, বাহিরের শত্রুকে সমবেত ও সংহতভাবে দেশের বাহিরে থাকিতে বাধ্য করিবার জন্য, দেশের সুশাসনের অর্থাৎ জনসাধারণের জীবনযাত্রা নানা প্রকারে সুগম করিবার জন্য এবং দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নতি সাধন সহজ করিবার জন্য। পর-দেশের ও অপর সভ্যতার আদর্শে নিজ দেশে বিপ্লব আনয়ন চেষ্টা জাতীয়তার উদ্দেশ্য বলিয়া কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই কারণে যে সকল রাষ্ট্রীয়দল পর-মুখাপেক্ষীতায় প্রকটভাবে নিযুক্ত আছে, সেইগুলির দ্বারা ভারতীয় মানবের জাতীয়তার বা রাষ্ট্রীয়তার উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। যে সকল রাষ্ট্রীয়দল অতীতের পূর্ণরূপে বিগত ও মৃত প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্জ্জীবন আকাঙ্খায় অনুপ্রাণিত ও বর্ত্তমানের কোন উন্নতির কথাই যেগুলির প্রাণে কোন উৎসাহ জাগ্রত করিতে অক্ষম, সেই সকল রাষ্ট্রীয়দলের দ্বারাও আমাদিগের জাতীয় পুনর্গঠন বা প্রগতি সাধন সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া কোন কোন রাষ্ট্রীয়দল আছে যে-গুলির উদ্দেশ্য দেশবাসী নরনারীর জীবনযাত্রা উন্নত ও সুগম করা অপেক্ষা প্রাচীন সংস্কার সংরক্ষিত করিয়া জীবন-যাত্রার পথ আরও দুর্গম ও দিগভ্রান্ত করিয়া তোলা। ভারতীয় মানব স্বভাবতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অতিরিক্ত মাত্রায় পূজা-পার্ব্বণ-উৎসব প্রভৃতিতে অর্থ ও সময় নষ্ট করিতে আগ্রহশীল। আধুনিকতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভারতে এখনও গভীরভাবে মানবমনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অবস্থায় আমাদের জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয়তার আদর্শ গঠন ক্ষেত্রে আমাদিগকে বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক সফলতার দিকে নজর রাখিতে হইবে। কষ্ট-কল্পিত ও দুর্ব্বোধ্য আদর্শের স্তূপ গঠিত করিয়া সকল লাভজনক বিষয় তাহার ভিতরে চাপা দিয়া হারাইয়া ফেলা আমাদের রাষ্ট্রমত রচনার একটা মহাদোষ। সুতরাং কংগ্রেসের পরবর্ত্তী রাষ্ট্রীয়দলগুলির বিশেষ কর্ত্তব্য অনন্ত শূন্যে সাক্ষাৎ প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য ভুলিয়া ভাসিয়া না বেড়াইয়া পৃথিবীতে

নামিয়া আসিয়া মানুষের জীবনযাত্রা উন্নততর করিবার চেষ্টায় মনোনিবেশ করা।

মধ্যস্বত্ব বিলোপ, নূতন সত্ত্বাধিকারী সৃজন ও অন্যান্য কথা

মানুষের যত প্রকার ধনসম্পত্তি আছে তাহার মধ্যে জমির স্থান বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য কেন না পৃথিবীতে যত মূল্যবান আকাঙ্ক্ষিত ও আহরণীয় বস্তু আছে তাহার মধ্যে পরিমাণে ও স্থায়ীত্বে সর্বাধিক হইল জমি। শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভবত ক্রয় বিক্রয় যোগ্য জমির পরিমাণ ১৮০ কোটি বিঘার অধিক। এই জমির মূল্য যদি বিঘা প্রতি এক হাজার টাকা করিয়া ধরা হয় তাহা হইলে মোট মূল্য ১৮০০০০০০০০০০০ এক লক্ষ আশি হাজার কোটি টাকা দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের সকল সহরের ও গ্রামের ঘর-বাড়ীর মূল্য হিসাব করিলে সম্ভবতঃ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার অধিক হইবে না। মানুষের হস্তে যত সোনা রূপা হীরা জহরত আছে তাহার মূল্য দশ পনের হাজার কোটির অধিক নহে। সঞ্চিত মূলধন ইত্যাদির মোট পরিমাণও ঐরূপ হিসাবে পনের-কুড়ি হাজার কোটির উপরে যাইবে না। মানুষ প্রায়শ ধনসম্পত্তির কথা চিন্তা করিলেই জমিজমা ও ঘরবাড়ীর কথা অগ্রে চিন্তা করে এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য সকলেই জমি ও গৃহ আহরণে ব্যস্ত হয়। সম্পত্তি সংগ্রহ করিলেই মানুষ চেষ্টা করে তাহা হইতে আয় বা লাভ করিতে। জমির প্রজার খাজনা কিম্বা গৃহের ভাড়াটিয়ার নিকট ভাড়া লওয়া একটা অতি পুরাতন রীতি যাহা দ্বারা সম্পত্তির অধিকারীগণ নিজেদের সঞ্চিত সম্পদ ব্যবহার করিতে দিয়া নিজেরা কোন পরিশ্রম না করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান ভারতবর্ষে অপরাপর সম্পত্তি অপরকে ব্যবহার করিতে দিয়া অর্থ উপার্জ্জন বন্ধ করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই; শুধু জমির জন্য খাজনা লাওয়া আইন-বিরুদ্ধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখনকার আইনে কেহ জমি ক্রয় করিয়া তাহা অপরকে ব্যবহার করিতে দিয়া অর্থ বা উৎপাদিত ফসলের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। ঘর ভাড়া দেওয়া, পুকুরের মাছ ধরিবার অনুমতি দিয়া অর্থ গ্রহণ, টাকা ধার দিয়া সুদ লওয়া, কারখানার যন্ত্র পাতির অংশ ক্রয় করিয়া লভ্যাংশ গ্রহণ, বৃক্ষ বিক্রয় ব বৃক্ষের ডাল কাটিয়া কাষ্ঠ বিক্রয়, জন খাটাইয়া কা করিয়া কণ্ট্রাক্টে লাভ করা, নানা প্রকার ব্যবসায় করা চা-বাগান প্রভৃতিতে টাকা খাটাইয়া আয়ের ব্যবস্থা কর গাড়ী ভাড়া দেওয়া, সিনেমা দেখাইবার আয়োজন করিয় অর্থোপার্জ্জন, জাহাজ ক্রয় করিয়া মাল ও যাত্রীবহ করাইয়া লাভ করা, হাওয়াই জাহাজ ক্রয় করিয়া ঐভাে উপায় করা ইত্যাদি অসংখ্য পথ আছে যাহা দ্বারা মানু সম্পত্তি গঠন ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া লাভ করিতে পারে এই সকল ব্যবস্থার কোনটিই বেআইনী করা হয় নাই শুধু জমি ক্রয় করিয়া ভাড়া দেওয়া আইনবিরুদ্ধ। আসে জমি যদি কাহাকেও ভাড়া বা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হ ও প্রমাণ হয় যে জমির প্রকৃত ব্যবহার অর্থাৎ চাষবা খাজনার উপরে চলিতেছে, তাহা হইলে জমির স্বত্বাধিকা বলিয়া সেই ব্যক্তিই দাবী হইবেন যিনি খাজনা দি চাষ করিতেছেন। যিনি খাজনা গ্রহণ করিতেছিলেন তি মধ্যস্বত্বাধিকারী বলিয়া অধিকারচ্যুত হইবেন। যিনি স স্বয়ংই চাষ করিতেছেন তাঁহাকেই জমির মালিক বলি ধরা হইবে এবং তিনি অতঃপর খাজনা রাষ্ট্র দিবেন।

বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই এই আইন প্রণয়ন হইব পূর্ব্বে বাঙ্গালী জমির মালিকগণ অপরকে জমি খাজ বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। এই আইন হইবার পরে তাঁ বহু জমির স্বত্ব হারাইলেন ও তাঁহাদিগের প্রজাগণ জ মালিক দাবী হইলেন। বাংলার জমির মালিকগণ পূ বহু অবাঙ্গালীকে জমি চাষ করিতে দিতেন। এই অ হইবার ফলে কত জমি বাঙ্গালী মালিকের অধি হইতে অবাঙ্গালীর হস্তে গিয়া পড়িয়াছে তাহার হি কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। মনে হয় জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ফলে ৬।৭ লক্ষ একর জ মালিক বদল হইয়া থাকে ও যদি শতকরা দশজন চা অবাঙ্গালী ছিল তাহা হইলে ৬০।৭০ হাজার একর

অবাঙ্গালীর হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাথা পিছু যদি ২।৩ একর জমিও বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইলে ২০।৩০ হাজার অবাঙ্গালী চাষী এই আইনের সাহায্যে বাংলা দেশের জমির মালিক হইয়া বসিতে সক্ষম হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন অনুসন্ধান সম্ভব কি না জানা প্রয়োজন। কলিকাতায় ও অন্যান্য সহরেও বহু অবাঙ্গালী জমি ও ঘরবাড়ীর ভাড়াটিয়া-মালিক হইয়া বসিয়া আছে। তাহারা পূর্ব্বকার অতি অল্প ভাড়ায় বস্তি, খাটাল ও জীর্ণ-পতনশীল গৃহ দখল করিয়া বসিয়া আছে ও সহরের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর ও বীভৎস করিতেছে। বাংলা দেশের গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন উপায়ে এই দেশের লোকেদের নানা প্রকার আর্থিক ক্ষতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ও অবাঙ্গালী আগন্তুকদিগের জমি ও গৃহ দখল করিয়া গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই দেশে চিরস্থায়ীভাবে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। চাকুরীতে বিদেশী ব্যবসাদারগণ বাঙ্গালী নিয়োগ করা বন্ধ করিতেছে। অধিক পরিশ্রমের কার্য্য বাঙ্গালী নিজ হইতেই করিতে চাহে না। জমির মধ্যস্বত্ব পাওয়া বাঙ্গালার বন্ধ করা হইয়াছে এবং বড় বড় সহরের বাসিন্দা অবাঙ্গালীগণ পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বকার হারে গৃহাদির ভাড়া দিয়া এখনও অতিরিক্ত লাভ করিয়া বসবাস করিতেছে।

অনেকের ধারণা জমিদারী উঠাইয়া দিয়া ভারত সরকার সোসিয়ালিজম বা সমষ্টিবাদ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সমষ্টিবাদের অর্থ হইল ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি আহরণ বন্ধ করা। জমির মালিক বদল হইলে ব্যক্তিগত ভাবেই মালিকানা থাকিয়া যায় ও তাহা সমাজের সকল লোকের সম্পত্তি হইয়া যায় না। চাষীর হস্তে জমি থাকলে তাহা চাষীর সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হইবে। চাষী তাহা বিক্রয় করিতে পারিবে ও বন্ধক দিতেও পারিবে। সুতরাং এক ব্যক্তির সম্পত্তি আর এক ব্যক্তিকে দেওয়া ব্যতীত এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যাইবে। যে চাষী আজ চাষ করিতেছে, কাল তাহার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারিণী কন্যা চাষ অপরকে দিয়া করাইতে পারেন ও তখন জমির মালিক কে হইবে? চাষী যদি খাজনা দিয়া চাষ করে তাহাতে সোসিয়লিজম অশুদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু চাষীকে যদি মাহিনা দিয়া চাষ করাইয়া তাহার পরিশ্রমের ফলের অধিকাংশ তাহার নিয়োগকর্ত্তা গ্রহণ করে তাহা হইলে সোসিয়ালিজমের হানি হয় না। এইরূপ বিচার ভারতের সোসিয়ালিষ্টদিগের পক্ষেই সম্ভব। ভারত সরকার অপর যে সকল উপায় অবলম্বনে সমষ্টিবাদ স্থাপন চেষ্টা করিয়াছেন তাহার মধ্যে দেখা যায় জীবন-বীমার ব্যবসা সরকারী আমলাদিগের হস্তে তুলিয়া দিয়া বীমাক্রেতাগণের ক্ষতি করা ও ঐ ব্যবসায়ের খরচ অনর্থক বৃদ্ধি করা। ইহা ব্যতীত বহু ব্যবসায়ে হাত লাগাইয়া শতশত কোটি টাকা বাৎসরিক লোকসান খাওয়া আর একটি সমষ্টিবাদ স্থাপনের উদাহরণ। বহু সহস্র কোটি টাকা কর্জ্জ করিয়া ভারতীয়দিগের পরিশ্রম অর্জ্জিত অর্থে তাহার সুদ দেওয়া অপর এক উদাহরণ। ব্যক্তির অধিকার খর্ব্ব করিলেই সমষ্টিবাদ স্থাপিত হয় না। পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিবার অধিকার যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক মোট উপার্জ্জনের অংশ লাভ সম্ভব হয় না ও বহু সংখ্যক লোক যদি সমাজে বেকার থাকেন তাহা হইলে সেই সমাজের সমষ্টিবাদের কথা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায় যদি না বেকার মাত্রকেই সরকারী ভাবে অর্থ সাহায্য করা হয়। ভারতে বেকারকে সাহায্য করা হয় না এবং তদুপরি সরকারী সাহায্য প্রায় কোন ভাবেই করা হয় না। শিক্ষা ও চিকিৎসায় কিছু কিছু সাহায্যের চেষ্টা আছে কিন্তু তাহার কার্য্যকারীতা নাই বলিলেই চলে। বার্দ্ধক্য, বৈধব্য, আতুর অবস্থা ইত্যাদির জন্য কোন সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা নাই। পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগের আশ্রয় ব্যবস্থাও নাই। অন্ধ, উন্মাদ প্রভৃতির জন্যও সাহায্যের আয়োজন এতই কম যে শতকরা পঁচানব্বই জন প্রার্থী কিছুই পায় না। সোসিয়ালিজমের নামে সমাজের অধিকাংশ লোককে ভারতের মত আর কোন দেশ এতটা নিরাশ্রয় করিয়া রাখে বলিয়া আমরা জানি না। এদেশে যাহা কিছু ঘটে তাহাতে লাভ ও শক্তি বৃদ্ধি হয় শুধু সরকারী আমলাদিগের। কোন উৎপাদনশীল কার্য্য না করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক চাকুরীতে বহাল হয় শুধু ভারতেই, কেন না চাকুরী

সৃষ্টি না করিলে রাষ্ট্রীয়দল রাখা কঠিন হয়। এক এক প্রকার কনট্রোলের আইন সৃষ্টি করিয়া সমাজের কোন লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না; জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথে বাধার সৃষ্টি হয় মাত্র; কিন্তু চাকুরী পায় বহু লোকে। এবং চাকুরী পাইতে হইলে সুপারিশ ব্যতীত কিছু জোটে না। এই সুপারিশের ভিতর দিয়াই রাষ্ট্রীয়দলের জনবল বৃদ্ধি হয়।

ভারত ও প্রদেশ সরকারগুলি নিজেদের মূল কার্য্য যাহা তাহা করিতে বিশেষ সক্ষম নহেন। শান্তি রক্ষা, চোর ডাকাত দমন, পথঘাট ঠিকভাবে গঠন ও সংরক্ষণ, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, সমাজের সকল ব্যক্তির জীবনযাত্রার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা, দেশ রক্ষা, আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে দেশের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদিই সকল রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য। জীবনবীমা বা ব্যাঙ্ক চালান অথবা ইস্পাতের ব্যবসায়ে একাধিপত্য স্থাপন ততটা প্রয়োজনীয় কার্য্য নহে। নানা প্রকার কার্য্যে লাগিয়া পড়িলে ও বিভিন্ন প্রকার নিয়ন্ত্রণ সৃজন করিলে বহুলোকের চাকুরীর ও লাভের ব্যবস্থা করা যায়। রাষ্ট্রীয়দল গঠন ও পরিচালনার কার্য্যে চাকুরী ও লাভের ব্যবস্থা অত্যন্তই আবশ্যকীয় বিষয়। সকল কথা বিচার করিয়া দেখিলে সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কোন পথে প্রবাহমান ও তাহার সিঞ্চনে কোথায় কি ফল প্রসূত হয়।

ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ কর্ম্মজীবনে ভারতের তথা পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে ভারত একজন বিশ্ববিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসককে হারাইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিগত বৎসরাধিককাল বিশেষ অসুস্থ ছিলেন। ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাওলপিণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঐ স্থলে কর্ম্মসূত্রে বাস করিতেন। ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পরে কলিকাতা হইতে উচ্চতম চিকিৎসাবিদ্যার উপাধি লাভ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ করেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শীঘ্রই অস্ত্র-চিকিৎসায় খ্যাতি অর্জ্জন করেন। স্যার নীলরতন সরকার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্ত্র-চিকিৎসায় অনন্যসাধারণ ক্ষমতা সম্বন্ধে সবিশেষ আস্থাবান ছিলেন ও কোন কঠিন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইলে তাঁহারা সর্ব্বদাই অগ্রে ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিতেন। মানুষ হিসাবে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অসাধারণ ছিলেন। কর্ত্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি কঠোর ও কঠিন ভাবে কাহাকেও সামান্য ভাবেও এমন কিছু করিতে দিতেন না, যাহাতে তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। কিন্তু তিনি অপর সকল ভাবেই সদাশয়, বন্ধুবৎসল ও দয়ালু ছিলেন। অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার কোন লালসা ছিল না ও সুনীতিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি উচ্চতম স্তরের মানুষ ছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে শতশত লোক যেভাবে তাঁহার মহাপ্রয়াণে শোকোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করে তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহার সম্বন্ধে ভক্তি ও ভালবাসা সহস্র হৃদয়ে জাগ্রত ছিল। তাঁহার পিতা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন ও তিনি নিজেও খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর সংখ্যা সকল ধর্ম্মের লোকের মধ্যেই অজস্র ছিল। ইহার কারণ সহজবোধ্য। ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান যেখানে শুধু পবিত্র আকাঙ্ক্ষা ও ভাবের আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত মানুষের মনে কোন বিভেদবোধ জাগাইয়া তোলে না। ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য মানবত্বায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যবোধ ছিল অসাধারণ ও নীতিজ্ঞানে তিনি কাহারো সুবিধার জন্য নিজ বিশ্বাস ও অনুভূতিকে খর্ব্ব করিতেন না। নানান ভাবেই তাঁহাকে আদর্শ মানব বলিয়া বহুলোকে মনে করিতেন।

দেওরালিতে বৎসর আরম্ভ

ভারতবর্ষে যে সকল প্রচেষ্টা হইতে জনসাধারণের কোন লাভ হয় তাহা করিবার কোন আকাঙ্খা রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইজন্য স্বাধীনতার পর হইতে শুধু নানা প্রকার অবান্তর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া ভারতীয় নেতাগণ দেশের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকেই ঠেলিয়া দিয়াছেন। লাভ যদি কিছু হইয়া থাকে তাহা হইলে নেতাদিগের সকল

শেষাংশ ৫৪৬ পাতায়

রাজ-রোষে পত্র পত্রিকা

কালীচরণ ঘোষ

রাষ্ট্রশক্তির মনের মত কথা না বললে অপ্রিয় ত হতেই হয়, নানারকম নির্যাতন ভোগ করাও অস্বাভাবিক নয়। সকল রাষ্ট্রে এটা কমবেশ বর্ত্তমান আর ভিন্ন রাজ্যের ওপর জবরদস্তি প্রভুত্ব করতে হলে, এ বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের যতটা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত প্রকাশের যে-পরিমাণ বেশী সুযোগ দেয় সে রাষ্ট্রকে ততটা উন্নত, ততটা 'সভ্য' বলে মেনে নেওয়া হয়। তার প্রধান কারণ, রাষ্ট্রশক্তির নিজ শাসন-সৌকর্য্যে এতটা আস্থা থাকে যে, বিরুদ্ধ আলোচনায় ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা মনের মধ্যে স্থান পায় না। মতামত দলনের কোনো প্রয়োজনই অনুভূত হয় না।

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রায় বিড়ালের ইঁদুর নিয়ে খেলার মত হয়েছিল। মাঝে মাঝে বেশ উদারতা দেখিয়েছে, আর বেশী সময় "দলন-দমন" নীতি প্রযুক্ত হয়েছে। এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পুরাতন কাহিনী এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রিকার প্রবন্ধ নিয়ে ইংরেজ চিরকালই সজাগ দৃষ্টি রেখে এসেছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া যায়, প্রথম দফায় রাজ-রোষে তিনখানি পত্রিকা হয়ত ভস্মীভূতও হয়েছিল, সঠিক কিছু বলা যায় না। মনে হয় সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপার নিয়ে কিছু লেখা হয়ে থাকবে। নামগুলি (১) দূরবীণ, (২) সুলতানউল-আখবার ও (৩) সমাচার সুধাবর্ষণ। হোম (স্বরাষ্ট্র) ডিপারমেণ্টের ১২ জুন ১৮৫৭ তারিখের আদেশে এই সকল পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্যে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের আদেশ জারি হয়। শতবৎসরাধিক কাল পরেও একবার স্মরণ করা যাক, সমাচার সুধাবর্ষণএর প্রচার আরম্ভ হয় ১৮৫৪ সালে, একখানি বাঙ্গলা হিন্দী পত্রিকা রূপে এবং সম্পাদক বলে পরিচিত ছিলেন শ্যামসুন্দর সেন। এই সালেই আর একটি পত্রিকা ১৬ আগষ্ট (১৮৫৪) বেরিয়েছিল নাম "মাসিক পত্রিকা" এবং সম্পাদনার ভার নেন তাৎকালিক প্রসিদ্ধ দুই ব্যক্তি পিয়ারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার। উত্তরকালে বাঙ্গলার নানা ক্ষেত্রে তাঁরা পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

দেশাত্মবোধ ভাব প্রচারে এর অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

মাঝে কয়েক বছরের খবর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃত রাজদ্রোহের মামলা দণ্ডবিধি আইনের ১২৪ এ ধারা অনুসারে মামলা দায়ের হয়, ১৮৯১ সালে। বঙ্গবাসীর মালিক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কর্মাধ্যক্ষ ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণোদয় রায়ের বিপক্ষে। ১৮৯১ সালের ২১ মার্চ, ১৬মে, ১৬জুন তারিখের প্রবন্ধে আপত্তি ওঠে। সহবাস-সম্মতি দান এর বয়স নিয়ে যে আইন প্রবর্ত্তিত হতে চলেছিল, তার বিপক্ষে যুক্তির অবতারণা-কালে রাজদ্রোহের অপরাধ ঘটে। জুরির বিচার চলছে হাইকোর্টে, সাতজন ইংরেজ, একজন বাঙ্গালী আর এক-জন আর্মেনিয়ান নিয়ে। জজ সাহেব জুরির সঙ্গে এক মত না হওয়ায় মামলা শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাহার করা হয়।

ইংরেজি ১৯০২ সাল থেকে বাঙ্গলায় এক নবযুগের সূচনা হয়—বরোদা থেকে কলকাতায় অরবিন্দের বিশ্বাস-ভাজন সহকর্মী যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রাতা বারীনের আগমন, সতীশ বসু ও পি মিত্রর অনুশীলন সমিতি আর

সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা সবই ১৯০২ সালে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছিল। ধীরে ধীরে নানা পত্র পত্রিকায় বেশ ঝাঁঝালো সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। কিছু দিন ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সহ্য করবার পর নিজের 'টাইগার কোয়ালিটি'—শার্দ্দুল প্রকৃতি প্রকাশ করতে থাকে।

যে সকল নামকরা কাগজ যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দে মাতরম্ মামলায় নানা রকম সাজা-শাস্তি পেয়েছিল, জেল জরিমানা ও মুদ্রাযন্ত্র বাজেয়াপ্ত করার ফলে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল, তার কথা নানাভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া ছোটখাটো পত্রিকা পুস্তিকা উগ্রজাতীয়তার বাণী বহন করে চলেছে এবং যখনই ইংরেজের খেয়াল হয়েছে, তখন বকের অনুকরণে ছোট্ট মাছ মুখ-বিবরে ফেলে হজম করে নিয়েছে। তাদের কথা একটু মনে রাখা ভাল। বাঙলার বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস যদি কোনো দিন সত্যিই লেখা হয়, এই সকল লেখক, সম্পাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশকদের নাম কোনো পৃষ্ঠার কোণে স্থান পেলেও পেতে পারে।

এদের মধ্যে গোড়াতেই 'নবশক্তি'র কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৯০৬ সালের ২০মে মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার সম্পাদনায় 'নবশক্তি' প্রকাশ লাভ করে। তখন দেবব্রত বসু, "যুগান্তর" থেকে এখানে এসে যোগ দেন। 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' তখন বাজার গরম করে রেখেছে তাই 'নবশক্তি'র প্রবন্ধ বেশ বাছাই লোক ছাড়া সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু পুলিসের শ্যেন দৃষ্টি থেকে তার রক্ষা ছিল না। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন "যুগান্তর" এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৯০৭ এর শেষ দিকে এবং ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলায় জড়িয়ে পড়ার আগে পর্য্যন্ত তিনি অনেকটা সময় 'নবশক্তি'র পরিচালনায় নিয়োগ করেছিলেন।

লেখা বেশ গরম সুতরাং সরকারী নেকনজর পড়লো ১৪ জুন ১৯০৭ লেখার উপর। সম্পাদক ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গে মামলা এবং তার নিষ্পত্তি হলো ১০ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ মনোমোহনের চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশে। হাইকোর্টে আপীল হয়েছিল, বলা বাহুল্য, সে মামলা ৪আগষ্ট ডিস্‌মিস্ করা হয়।

এলো "সোনার বাংলা"। লেখার বিশেষ দোষ ধরতে না পেরে খুঁত বেরুলো মুদ্রাকর প্রকাশকদের নাম ছাপা নেই। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ দেখালে যে ১৮৬৭ সালের ৩০ সংখ্যক আইনের ১৫ ধারা মতে অবশ্য প্রকাশিতব্য। প্রথম দফায় ২৫ জুন (১৯০৭) বাসুদেব ভট্টাচার্য্যর দুই শত টাকা অর্থদণ্ড হয় (সম্ভবতঃ এই নাম সম্পাদক হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকবে)।

এই সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল, কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীমন্ত রায় চৌধুরী পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং সেটা কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ থেকে ছাপা হয়েছে। পুলিশ প্রমাণ করে, ছাপাখানাটার গুপ্ত দোষ আছে। কারণ, জানা গেল "যুগান্তর" কয়েক সংখ্যা সেখানে ছাপা হয়েছে। সুতরাং ৩রা জুলাই (১৯০৭) ছাপাখানার মালিক বলে কেশবের ৪৫০ টাকা ও সঙ্গদোষ ঘটার জন্য শ্রীমন্তর পনেরো টাকা জরিমানা হয়।

সমকালীন আরও কয়েকটি রাজদ্রোহ সম্পর্কে মামলার উল্লেখ করলে সরকারী মতিগতির একটু আভাস পাওয়া যাবে। রাজধানী থেকে দূরে বসে মফঃস্বলের কাগজ অব্যাহতি পায়নি। অব্যাহতগতিতে শিকারের পশ্চাতে আইন ধাবমান হয়েছে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

বরিশালের কাগজ, নামটিও "বরিশাল হিতৈষী" মালিক দুর্গামোহন সেন এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক আশুতোষ বাগচি একে রাজদ্রোহ তার ওপর অপরাধ গুরু মনে হওয়ায় মামলা বাখরগঞ্জ দায়রা জজের এজলাসে পাঠানো হলো। সাজা হলো ১২ ডিসেম্বর ১৯০৭ ; দুর্গামোহনের এক বৎসর সশ্রম এবং এক হাজার টাকা জরিমানা আর আশুতোষের চার মাস সশ্রম আর দুই শত টাকা জরিমানা।

পূর্ব্ব থেকে এবার উত্তরবঙ্গে রাজদ্রোহ আবিষ্কৃত হলো। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রাজদ্রোহের এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের মামলা। পত্রিকা, "রংপুর

বার্তাবহ" ; সম্পাদক্ মালিক ও প্রকাশক একই লোক— জয়চন্দ্র সরকার। তাঁর এক বছর কঠোর কারাদণ্ড হয়েছিল ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৭। হাইকোর্ট ২৬মে ১৯১০ সেই রায় বহাল রাখে।

এইবার খুলনার "হুঙ্কার" পত্রিকার-পালা। মামলা হচ্ছে কলকাতার মুদ্রাকর কালীচরণ বসু ও প্রচারকর্তা হীরালাল সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে। মুদ্রাকরের অর্থদণ্ড হয় জানুয়ারী ১৯০৯।

"সন্তান শিক্ষা" রচনা করেন ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া (ত্রিপুরা)র রামকানাই দত্ত এবং প্রকাশক হলেন যতীন্দ্রলাল দত্ত। এঁদের সাজার কথা সঠিক জানা যায় নি।

একই সঙ্গে কয়েকজনকে অভিযুক্ত করা হয় বরিশালে। মুকুন্দলাল দাস ওরফে যজ্ঞেশ্বর দে (যাত্রাওয়ালা) ও তাঁর ভাই রমেশের বিরুদ্ধে মামলা হয় "মাতৃ পূজার গান" নামক বইখানি নিয়ে। দ্বিতীয় দফায় ভবরঞ্জন মজুমদার, জড়িত হন "দেশের গান" বই নিয়ে তিনি মুদ্রাকর ও প্রকাশক। আর নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তাঁর আদর্শ প্রেস দুই (নিষিদ্ধ) পুস্তকের মুদ্রণের জন্য অভিযুক্ত করা হয় বাখরগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে।

ভবানীর দেড় বৎসরের কারাবাস ও পাঁচ শত টাকা জরিমানা এবং নিবারণের ছয় মাস কারাদণ্ড হয় ৯ জানুয়ারী ১৯০৯।

মুকুন্দর এক বৎসর ও তাঁর ভ্রাতা রমেশের নয় মাস সশ্রম জেল বাসের হুকুম হয় ২৬ জানুয়ারী ১৯০৯।

একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা "কঃপন্থা" : এই সময় প্রকাশিত হতো, প্রকাশক ছিলেন কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রাজদ্রোহর মামলায়, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯, কিরণচন্দ্রর দেড় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রায় দান কালে কিরণচন্দ্র বগুড়া জেলের কয়েদী। ১৯০৭ সালে ৫, রামধন মিত্র লেন থেকে সুমতি প্রেসে যুগান্তর, ছাপা হতো বলে পুলিশের কড়া নজর ছিল। ১৫ আগষ্ট ১৯০৮ সালে আটকাপাড়ার ডাকাতি হয়। সেই সূত্রে খোঁজ করতে গিয়ে রামধন মিত্র লেনের ঐ বাসা থেকে যে ছয় ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তন্মধ্যে কিরণচন্দ্র ছিলেন একজন। প্রথমে অস্ত্র আইনে অভিযোগ যখন প্রমাণিত হলো না, তখন ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা (সন্দেহজনক গতিবিধি) মতে কিরণচন্দ্রের এক বৎসরের জন্য কারাবাস ঘটে। সেখানে আবদ্ধ হবার পূর্ব্বে "কঃ পন্থাঃ"র প্রকাশ ও প্রচারজনিত অপরাধ সাব্যস্ত হয়।

একখানি ছোট্ট নাটক : পুলিশ ধরপাকড় মামলা মোকদ্দমা না করলে হয়ত কারও নজরে পড়তো না। আর কিঞ্চিন্‌ন্যূন ষাট বৎসর বাদে তার কথা লিখতে হতো না। বইটির নাম "রণজিতের জীবন যজ্ঞ" এবং যথাক্রমে গ্রন্থকার ও প্রকাশক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও অবিনাশ চন্দ্র বসু, প্রমাণিত হলো বইখানি রাজদ্রোহমূলক।

ত্রুটির জন্য দুজনেই ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ১৫ জুন ১৯০৯ প্রতি জনে দশ টাকা করে জরিমানা দিয়ে অব্যাহতি পান। হরিপদর আর দুখানা বই, দুর্গাসুর আর পদ্মিনী গভর্ণমেণ্টের বিষ-নজরে পড়ে।

"মাতৃপূজা" একখানি গানের বই, কবি হলেন কুঞ্জ বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ; প্রকাশক জ্যোতিপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। নবীনচন্দ্র পাল হাওড়ায় "দি ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়ট প্রেস"-এ বইখানি ছাপেন। সকলকে ধরে মামলায় টেনে জড়িয়ে দেওয়া হয় ২মার্চ ১৯০৯। ১২ জুলাই কুঞ্জর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুদ্রাকর নবীনচন্দ্র পালের দুইশত টাকা অর্থদণ্ড হয়।

"হিতবাদী" পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক নীরদ চরণ দাস রাজদ্রোহর অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ এবং একবৎসর কারাদণ্ডর আদেশ হলো ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯১০। হাইকোর্টের আপীলে ৩ জুন সাজা ছয় মাস হ্রাস করা হয়।

এ সময় নানা পত্রিকা দেশাত্মবোধে পূর্ণ হয়েছে। সকলের নাম দেওয়া সম্ভব নয়, সব সংবাদও যে পৌঁচেছে সে অনুমান নিতান্ত ধৃষ্টতা বলে মনে হবে। ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত আর কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাগেরহাটের "পল্লী চিত্র" পত্রিকা সম্পাদক বিধুভূষণ বসু মুদ্রাকর অবনীমোহন দে অপরাধ ১২৪-এ

ও ১৫৩-এ, ২৩ ডিসেম্বর ১৯০৯ তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯১০ বিভূতির চার বৎসর এবং অবনীর চার মাস সশ্রম কারাদণ্ডর আদেশ হয়। সঙ্গে গ্রেপ্তার হন নগেন্দ্রনাথ চন্দ্র। তিনি রাজদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন এক কবিতা লিখে, সেটা ছাপা হয়েছিল "পল্লীচিত্রে।" ঐ একই দিনে তাঁর দুবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে।

"খুলনাবাসী" পত্রিকার সম্পাদক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর মুদ্রাকর পঞ্চানন ঘোষ। মামলা ১২৪-এ অর্থাৎ রাজদ্রোহ। সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করায় একশত টাকা জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০। ঐ দিনই পঞ্চাননের দুই দফায় প্রত্যেকটি দু'বৎসর করে কারাদণ্ডর আদেশ হয় এবং পর পর দুবৎসর অর্থাৎ মোট চার বৎসর সশ্রম দণ্ড। হাইকোর্ট ২১ জুলাই দুই দণ্ড এক সঙ্গে ভোগ করবার নির্দেশ দেন।

পত্রিকাটি ছাপা হয়েছিল যতীন্দ্রনাথ বসুর কমলা প্রেস-এ। ২৮ জানুয়ারী তারিখে সেটি বাজেয়াপ্ত করার হুকুম জারি করা হয়।

"কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকার মুদ্রাকর হিসাবে মনোমোহন ঘোষের ১৮ জুন ১৯১০ সালে ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি হাইকোর্টের বিচারে ৭ নভেম্বর নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় অব্যাহতি পান।

"নব্য ভারত" ছাপাখানার মালিক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী আর মুদ্রাকর ভূতনাথ পালিত। আপত্তিকর বই ছাপার জন্য মার্চ্চ মাসে অভিযুক্ত হন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১০ দেবীপ্রসন্নর ৭৫০ টাকা জরিমানা হয়, আপীলে ২ ফেব্রুয়ারী ১৯১১ পরিমাণ হ্রাস করে তিনশত টাকা করা হয়।

সৈয়দ ইসমাইল সিরাজী "অনল প্রভা"র গ্রন্থকার। তার মধ্যে পুলিশ রাজদ্রোহ আবিষ্কার করে। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০ সিরাজীর দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়।

চট্টগ্রামে মুদ্রিত হয়েছিল "বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত" ১৯০৯ সালের প্রথম দিকে। সেই উপলক্ষ্যে বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী ও রমণীমোহন দাস অভিযুক্ত হন ১৯ মে দু'জনেরই এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। কিন্তু সেসনস্ জজ আপীলের বিচারে ৭ জু[ন] বরদাচরণের সাজা আপীলে বিচারাধীন থাকা[র] কাল জেল বাস ও দুশত টাকা জরিমানা করেন।

এরপরে আরও নানা মামলা হয়েছে কিন্তু সে সকলের তথ্য এখানে প্রকাশের চেষ্টা হতে বিরত হলাম উপরে প্রদত্ত বিবরণ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখ[া] ভাল যে দণ্ডিত ব্যক্তিদের রচিত, মুদ্রিত বা প্রকাশি[ত] পুস্তিকা পত্রিকা প্রভৃতি সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়া[প্ত] হয়েছে। আরো নানা ছোটোখাটো বই ঐ একই পথে বিলুপ্ত হয়েছে। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকখানি যাদের কথা লোকের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে তারা হচ্ছে উদ্বোধন, নব উদ্দীপন, উচ্ছ্বাস, শম্ভু নিশম্ভু বধ, পল্লী বিলাপ প্রভৃতি।

বঙ্গ বিভাগের পর বাঙ্গলা দেশে নানা পুস্তক পুস্তিকা বেরিয়েছে। তন্মধ্যে পুলিশের নজর পড়ে চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ প্রণীত ৪৬টি সংস্কৃত শ্লোক: "বঙ্গচ্ছেদ সন্তাপ" কেদারনাথ দেবশর্ম্মা প্রণীত "বঙ্গের পুনর্জন্ম, ললিতমোহন সরকার রচিত "ছাত্র দমন কাব্য" প্রথম খণ্ড ও ডাঃ ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি?" কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য রচিত "স্বদেশ গাথা", অনন্তকুমার সেনগুপ্তর "স্বরাজ গীতা" ভুবনমোহন দাশগুপ্তর "আমরা কোথায়?" প্রভৃতি গ্রন্থগুলির উপর।

এ সকল ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ এবং শীঘ্রই এরা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু এছাড়া কিছু বড় গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছিল নূতনের মধ্যে সখারাম দেউস্করের "দেশের কথা" অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত "মুক্তি কোন্ পথে?" বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত "বর্ত্তমান রণনীতি" ও অরবিন্দর "ভবানী মন্দির" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ কয়টি এবং আরও নানা

প্রকার প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, কবিতা পূর্ব্বে প্রকাশিত হলেও পরে তাতে স্বাদেশিকতার গন্ধ আবিষ্কার করে বন্ধ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে "গীতা" ও অনাধুনিকদের মধ্যে "আনন্দমঠ" ধীরে ধীরে রাজানুগত্যের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়েছে এবং এদের নিতান্ত শেষকৃত্য সম্পন্ন না হলেও পুলিশী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে এক শ্রেণীর দেশভক্তদের মধ্যে এদের সমাদর প্রচুর বৃদ্ধি করেছিল।

এই "নিষিদ্ধ" পুস্তক পুস্তিকা সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রেই গ্রন্থকার, প্রকাশক, বিক্রেতা, প্রেসের মালিকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছে তা নয়, কেবলমাত্র সরকারী গেজেটে ছাপিয়ে এদের প্রচার বন্ধ করা হয়েছে, তার পর পুলিশ দেখতে পেলেই বাজেয়াপ্ত করেছে। মালিককে ধরে টানাটানি করেছে। আর যাদের ওপর রাজনৈতিক কারণে সরকার সন্দেহ পোষণ করতো বা কোনো ঘটনা সম্পর্কে থানা-তল্লাসী করতে যেত, সেখানে এ সকল সাহিত্য সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির "চরিত্র" সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা গাঢ়তর করেছে এবং তদনুপাতে তাদের অপরাধের গুরুত্ব সপ্র-মাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। কোনো একটা ছেলে পাড়ায় "স্বদেশী করে", সুতরাং হয় ত গুপ্তচরের পরামর্শে পুলিশ তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলো। "খাতায়' নামও উঠে গেল। তার পর একটা অজুহাতে পুলিশ তার বাড়ী তল্লাসী করতে গেল। অস্ত্র কিছু অর্থাৎ বোমা, বন্দুক, রিভলভার, তরোয়াল, রামদাও, ছোরা গুপ্তি, সড়কী এমন কি এক গাছা লাঠি না পেলেও যদি গীতা, আনন্দমঠ, স্বামিজীর ভাববার কথা, গিরীশচন্দ্রের সিরাজ-দ্দৌলা, দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ প্রভৃতি কিছু পেয়ে থাকে, তা হলে অন্ততঃপক্ষে থানায় টেনে নিয়ে গিয়ে, হয় ত দুচারটা গোঁত্তা, রদ্দা, ঘুষিঘাসা, চড়চাপড় এবং কুটুম্বসম্পর্কিত মিষ্ট বচন আউড়ে আটকবন্দী করে রেখেছে; "সদর" থেকে "টিকটিকি" পুলিশ এসে পুঙ্খানু-পুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান এবং প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করে তার পর হয় ত বা ছেড়ে দিয়েছে আর নয় ত বিনা বিচারে আটক-বন্দী করে জীবনের বহু অমূল্য সময় নষ্ট করে দিয়েছে।

এই শ্রেণীর কয়েকখানি পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়।

বটতলার খতিয়ান

(গল্প)

কালীপদ ঘটক

জনৈক প্রতিবেশীর গরুচুরির মামলায় সবৎসা একটি গাভীর জিম্মাদার ও অন্যতম ইসাদী হিসাবে মাঝে মাঝে হাজিরা দিতে হয়, ফৌজদারি আদালতে এসে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ জীবনে খুব কমই পাওয়া যায়। মাস চার পাঁচ হয়ে গেল প্রায়, সাক্ষীর কাঠগড়া আজো দূর থেকেই পরিদৃশ্যমান। শুনানী এখনো শুরু হয়নি।

তবু কিন্তু আসতে হয়, সমনের পিঠে সহির মূল্য প্রমাণ করতে। মামলার ঠিক নির্দিষ্ট তারিখটিতে অসীম ধৈর্য্য সহকারে নিয়মিত এসে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছি, বেলা দশটা থেকে পাঁচটা তক। নিষ্কাম এই প্রেমধর্মের কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভের পথ ক্রমশ চওড়া হয়ে আসছে। বেঁচে থাক এই আদালতের শান-বাঁধানো অক্ষয় বট। এর নীচে এসে কিছুক্ষণ বসলেই কেমন যেন একটা নেশা ধরে যায়। কি বিচিত্র মানুষের সমারোহ। কি বিচিত্র হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ। চারিদিক যেন থমথম্ আর গমগমে ভরতি। আসামী আর ফরিয়াদীর ভিড়, পুলিস পিয়াদা আর্দালীর চমকদারি চটক। অধমতারণ আইনজীবি আর বিপদবারণ সাক্ষীসাবুদ সহযোগীদের সামাল দিতে বশংবদ মক্কেলকুল তটস্থ। আদালতের চৌহদ্দি বরাবর চারিদিকে শুধু পিল্‌পিলায়মান জনমনুষ্য। হরেকতর বেশভূষা হরেক জাত আর হরেক বুলি। এ যেন একটি ছোটখাটো নিখিল মুলুক নরমনিষ্যি সম্মেলন।

দু'চোখ ভরে দেখি আর মাঝে মাঝে হাই তুলি, বটতলার এই শান-বাঁধানো বেদির উপর বসে। ক্লান্তি এলেই ঝিমোই, আর হাই উঠলেই চা খাই। জাড্য রিপুর বিনাশসাধন করে ফিরে পাই আবার নবযৌবন। চাড়া দিয়ে উঠে সজাগ চোখের নতুন দৃষ্টি। তারপর শুধু দেখে যাও, যত পার দুচোখ ভরে দেখ। শামলা আর আমলারা সব মিলে মামলাগুলো চালাক ততক্ষণ। ও নিয়ে আর হামলা-হামলির দরকার নাই। তার চেয়ে বরং এই ফুরসতে বাইরের দিকে একটুখানি নজর দিলে অনেক কিছু মহাজ্ঞানের হদিস মিলতে পারে।

দেখে নাও এক খেলোয়াড়ী চিচিংফাঁক। বটতলার এক প্রান্তে সাপে-কাটার ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। কিনতে চাও ত এগিয়ে যাও। ভিড় ঠেলে একটু জায়গা দখল কর। দেখে নাও এক আজব তামাসা। বেজি আর গোখরো সাপের লড়াই, উদয় নাগের চিকন চাকন বাহার, আর কালনাগিণীর জিভ লকলক্।

এরি নাম হলো কালনাগিণী। এই ত গিয়ে সাঁতালি পর্বতের চুড়োয় লোহার বাসর ভেদ করে বিয়ের রাতে লখিন্দরকে দংশে এসেছে। ওস্তাদজীর কিস্‌সা শোন। কত জাতের সাপ, কোনটার কি লক্ষণ, আর কার কি রকম বিষের তেজ।

বয়ান বুলি চোস্ত আছে ওস্তাদজীর। শোন এবার বিষহরির অপ্রাপ্য মাদুলির কথা। হরেকরকম জড়ি-বুটির গুণাগুণ। ছোট্ট একটি তামার মাদুলি। মূল্য মাত্র পাঁচ সিকে। কিনে একটি ঝুলিয়ে নাও দুনসিতে, ব্যস—আর দেখতে হবে না, সর্পাঘাতের হাত থেকে একেবারে রেহাই। লাইফ-টাইম গ্যারান্টি।

তাই অনেকে কিনছে, গাঁটের কড়ি খরচা করে।

চাহিদা কিছু কম নাই সর্পকুলের দর্পহারী দুষ্প্রাপ্য এই স্বপ্নাদ্য মাদুলির।

অবাক হয়ে ভাবতে হয়। সর্পবিদ্যা-বিশারদ এই সমস্ত মাদারি আর ওস্তাদদের আজ পর্য্যন্ত সরকার থেকে তলব করা হয়নি কেন। ট্রপিক্যাল বা হপকিন্‌সে এদের জন্যে এক একটি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা অবশ্যই উচিত ছিলো।

রামটহলের চার চাকার ঠেলাগাড়ীর দোকান। চা ঘুগনি তেলে ভাজার ঢালাও ব্যবস্থা। কেটলিতে জল ফুটছে তোলা উনুনে। ছাঁকনার মধ্যে চায়ের গুঁড়ো দিয়ে কেটলির মুখে ঢেলে দিচ্ছে খানিকটা করে ফুটন্ত জল। কাচের গ্লাসের এক গলা, অর্থাৎ কি না উপরের দাগটুকু পর্য্যন্ত। এক চামচ চিনি আর দেড় চামচ ফুটন্ত দুধ মিলিয়ে একটুখানি ঘেঁটে দিলেই হলো। রামটহলের তাজা চা, মূল্য মাত্র দশ নয়া। চায়ের গেলাসটি হাতে নিয়ে বসে পড় বটতলার শান-বাঁধানো চাতালে। দরকার হলে ঘুগনি বা তেলে ভাজাটা এগিয়ে দিবে রামটহল নিজে।

ওটা আবার কি হলো। চা খেতে খেতে গালে হাত দিয়ে কষের দাঁতে চাপ দিচ্ছো কেন। দাঁতের ব্যথা? গরম চায়ের ছ্যাঁকা লেগে চেগে উঠেছে! কন্ কন, না শির শির। মাড়ি টাড়ি ফুলেছে? তা হলে আর দেরি করো না। হাতের কাছেই দাঁতবদ্যি। চলে যাও ওই স্বপ্নাদ্য মাদুলির গা ঘেঁসে মুক্তাঞ্জন মার্গারির পাশের ডায়াসে। চিমটে দিয়ে টুক করে তুলে দেবে তোমার নড়বড়ে দাঁতটি তার জন্য কোন ফি লাগবে না। এক কৌটো দন্তরুচি মাজন শুধু কিনতে হবে, আড়াই টাকা দিয়ে।

আশেপাশে আরো কত দ্রষ্টব্য। আরো কত রকমারি বৈচিত্র সম্ভার। হেরো মামলার মক্কেলরা পর্য্যন্ত এদের পাশে ভিড় করে দাঁড়ায় গিয়ে কিছুক্ষণ। কেউ কেউ গিয়ে হাত দেখায় বটতলার গণক ঠাকুরকে। আপিল-টাপিল চলবে কিছু? আছে নাকি তেমন কোন ফাঁক-ফোকর!

হস্তরেখায় ফুটে উঠে ভবিষ্যতের অব্যর্থ হদিস্। আপিলে আর ঠেকায় কে, অবধারিত জিত।

এরা তাও জানে।

গরু চুরির মামলায় এসে এখন দেখছি এমন কিছু ঠকা হয়নি। আবহাওয়াটা ভালই লাগছে। খোলা চোখের ঢালাও রসদ চারিদিকে ছড়ানো। কান দুটিকে সজাগ রাখতে পারলে সেদিক থেকেও ঘাটতির কোন আশঙ্কা নেই। কান পেতে শুধু শুনে যাও, কার কোথায় কি বক্তব্য। হরেক কথার কোলাকুলি, হরেক ভাষার গুঞ্জন। বাঙলা আর হিন্দি, উর্দু আর গুরুমুখী, সিন্ধি কিম্বা ভাটিয়া, উৎকল বা তামিলনাদ, মায় আগা সাহেবদের পস্তু ভাষা পর্য্যন্ত আদালতের চারিদিকে ছড়ানো। সবার উপর ইংরেজি ত আছেই। কান পেতে শুধু একে একে শুনে যাও।

এই সমস্ত বয়ান বুলি বক্তব্যের সারমর্ম সংগ্রহ করে অনায়াসে লেখা যেতে পারে উৎকৃষ্ট একখানি গণগণেশের রথের পাঁচালী। দুঃখের বিষয় অধীনের সে ইলেম নাই। মালকার কথাকোবিদ্‌গণ দেখতে পারেন চেষ্টা করে।

চা ওয়ালা রামটহলের সঙ্গে ফলওয়ালা গোকুল দাসের আলাপটা বেশ জমে উঠেছে। কেরোসিন কাঠের একটা বাক্সের উপর এক টুকরি পেয়ারা সাজিয়ে বটতলায় বসে আছে গোকুল। এর আগে ওকে ভুট্টা বেচতে দেখে গিয়েছিলাম, ঠিক এই জায়গায় বসে। তারও আগে আনারস।

খদ্দেরের আজ ভিড়টা কিছু কম। গোকুলদাসের উৎকৃষ্ট কাশীর পেয়ারা ডালার উপর সাজানোই আছে, নৈবিদ্যের চূড়োর আকারে। বিক্রি হয়েছে গোটা-কয়েক মাত্র। বসে বসে এতক্ষণ হাই তুলছিলো গোকুল। চোখ তেড়ে একটু তাকাল রামটহলের দিকে। বললে,—চা-টা কিছু খাওয়াবি! তোর মতলবটা কি বল্ দেখি, বেলা দুটো বেজে গেল যে।

পিছন দিকটায় বসেছিলাম, বটতলার বেদীর উপর। হাত-ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। ঠিক দুটোই বাজছে। অশিক্ষিত গাঁয়ের মানুষ গোকুলদাস। ঠিকমত ঘড়ি দেখতেও জানেনা হয়ত। ঘড়ির কাঁটা সম্বন্ধে কিছু

টনটনে জ্ঞান রাখে গোকুল। এর আগের দিনেও দেখেছি ওকে ভুট্টাপোড়া দিয়ে চা খেতে। ঠিক তখন ছুটো।

রামটহলের সহকারী ছোকরাটা এক গ্লাস চা এনে ধরিয়ে দিলে গোকুলদাসের হাতে। চাকু হাতে রামটহল বসল এসে গোকুল দাসের পাশটায়, খালি একটা টিন-বাক্সের উপর। গোকুলের ডালা থেকে টুকটুকে নিটোল একটি বাছাই করা পেয়ারা স্বহস্তে তুলে নিলে রামটহল। চাকু দিয়ে খোসা ছাড়াতে লাগলো। মূল্যের কোন প্রশ্ন নাই। এই বাজারে চিনির তৈরি এক পেয়ালা চা যে বিনামূল্যে এগিয়ে দিতে পারে, পবিত্র কাশীধামের পক একটি শোভন সাইজ পেয়ারা অবশ্যই তার প্রাপ্য।

চাকু দিয়ে কেটে কেটে পেয়ারার টুকরোগুলো একে একে বদনস্থ করতে লাগল রামটহল। দন্ত ও জিহ্বার যুগ্ম রসকেলিঘটিত পরিতৃপ্তির উল্লাসটুকু লুটোপুটি খাচ্ছে যেন রামটহলের নাকের ডগায়। খোশ মেজাজে তারিপ করলে রামটহল—ক্যা বঢ়িয়া আমরুদ। চিজ্‌ ঠো খুব ভালো আছে রে গোকুল।

ভাল ছাড়া মন্দ চিজ্‌ ত রাখে না গোকুল। একটু টেড়া সুরে বললে,—একি তোর টকো গুড়ের চা পেয়েছিস, লোকঠকানো গলা-কাটা ব্যবসা। এ হলো গিয়ে গোকুল দাসের কাশীর পেয়ারা। একটিবার খেলে সহজে আর ভুলতে হবেক নাই।

মুখ টিপে একটু হাসলে রামটহল। বললে,—এতো হমরা খাস মুলুককা চিজ আছে। এ্যায়সা মাফিক অমরুদ কাঁহা মিলবো তোর বাংলা মুলুকমে। একঠো কাঁহাই না তো।

কাশীতর পকা রহেনেবালা পশ্চিমবাসী রামটহল মৃদু একটা খোঁচা দিলে গোকুল দাসকে। কি যেন একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলো গোকুল। ভগীরথ সিং সেপাইজী হঠাৎ এসে হানা দিলে গোকুলের ডালায়। চুনাই করে হাতিয়ে ফেললে গোটাআটেক পেয়ারা। বললে,—অমরুদকা ক্যা ভাও রে?

অপ্রসন্ন দৃষ্টি দিলে তাকালো গোকুল। বললে,—ভাও নিয়ে কি করবে সিপাইজী, পয়সা আছে তুমার!

—হাঁ-হাঁ, আলবাৎ আছে। পয়সাভি আছে, রূপেয়াভি আছে।

দেঁতো একটু হাস্যরস পরিবেশন করলে সেপাইজী।

গোকুল কিন্তু ভাবে গদগদ হয়ে উঠল না। বললে,—নগদ পয়সা নিকালো। তুমাকে আর আমি ধার দিতে লারবো কিন্তু।

সেপাইজীর দন্তরুচির জেল্লা নীরব একটি ছিরকুটিতে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠলো। হালকা একটু সুর টেনে বললে,—কাহে রে, এতনা গোসা কাহে রে গোকুল।

গোকুল বললে,—আবার গোসা কাহে বলছো। সেদিন যে আটটা পিয়ারা নিয়ে চলে গেলে, খানিক বাদে আসছি বলে, আজ তক্ তার দাম দিয়েছ?

আর একদফা চুনাই বাছাইয়ের হেরিফেরিতে সেপাইজীর হাত থেকে খসে পড়ল গোটা দুয়েক পেয়ারা। হাতে থাকে ছয়।

লেনদেনটা হঠাৎ যেন ইয়াদ হয়ে গেল সেপাইজীর। বললে,—ও হাঁ—হাঁ,—অব হাম সমঝ লিয়েছে। লেকেন ও তো হম লে গিয়াথা সবজিবটি সাবকে দিয়ে।

গোকুল বললে,—সাবজেবুটি সায়েবরা ধারে কখনো পিয়ারা খায় না। উসব ভাঁওতা ছাড় সিপাইজী, পয়সাটি আজ মানে মানে ফেলে দাও।

দুই দু'গুণে চারটে অমরুদ পড়ে গেল একসঙ্গে। তবু দুটো হাতে থাকে।

ভরসা দিয়ে বলে উঠলো সেপাইজী,-মিলবে রে—মিলবে, প্যায়সা তোর মিলিয়ে যাবে শনিচরকা রোজ।

গোকুল বললে,—দয়া করে তাই মিলিয়ো যেন। আবার যেন বলে বসোনা রবিচরকা রোজ। একবার ত আমার তিন গণ্ডা ভুট্টা পেটে পুরেছ।

সেপাইজী একটু তাজ্জবের সুরে বলে উঠলো,-আরে,

ছুট্টাকা ফিন ক্যা সওয়াল হ্যায়, ওভ হমরা লেড়কা বাচ্চা খা দিয়া।

গোকুল বললে,—আর আমার লড়কা বাচ্ছারা খাব কি! ভুখার বদন দেখে ওদের পেট ভরবেক।

এ সব কালতু কথায় কান দেয়না সেপাইজী। মুচকি একটু হাসলে শুধু। পেয়ারা দুটি পকেটে পুরে ধীরে ধীরে সরে পড়লো।

গোকুল দাসের পাশ থেকে রসিয়ে একটু হেসে উঠলো রামটহল। গোকুল একটু গম্ভীর হয়ে বললে,-হি হি ক'রে হাসছিস যে।

রামটহল বললে,—সিপাইজীসে কেতনা প্যায়সা উধার হইলো রে?

জবাব দিলে গোকুল,—কতনা আবার, আট আর দুই পিয়ারা হলো দশটা। দশ টাকায় আটটা ক'রে। জুড়ে লে এবার কত্‌না হলো।

হাসতে হাসতে বলে উঠলো রামটহল,-লেকেন এক দামড়িভি মিলবেক নাই। সিপাইজীকা আদৎ তেরা মালুম না আছে। নাম উসকা ভগীরথ সিং।

তেরিয়া হয়ে বলে উঠলো গোকুল,—আর আমারও নাম গোকুল দাস। তোর সিপাইজীর পাগড়ি খুলে ছেড়ে দিব আমি।

দূর থেকে একটা হল্লা ভেসে আসছে। ভুখা মিছিল। খাদ্যের দাবিতে খনি মজদুর সংঘ আজ একটা বিক্ষোভ-মিছিলের ব্যবস্থা করেছে। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে ছাত্রের দল। কি একটা ব্যাপার নিয়ে কোথায় যেন কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে ছোটখাটো একটা সংঘর্ষ হয়ে গেছে পুলিস দলের। আজ তার প্রতিবাদ দিবস। দূর থেকে আওয়াজ উঠছে,—পুলিস জুলুম—চলবে না, চলবে না।

গোকুল দাস একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলো যেন। তাকালো একবার রামটহলের দিকে। দূরাগত মিছিলের আওয়াজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চাপা-গলায় বলে উঠলো গোকুল,—চলবে না—চলবে না।

হাসতে হাসতে বললে রামটহল,—কি চোলবে না রে গোকুল?

জবাব দিলে গোকুল দাস,—তোদের এইসব জুলুম-বাজি। গরীবের উপর অত্যাচার। ঠেলাগাড়ীর চায়ের ব্যবসায় ঠাটের ওপর ঘি রুটি গিলছো। তার উপর কিনা সুদিবুদি লেনদেনের কারবার। মাস পোয়ালেই টাকা পেছু দু' আনা ক'রে সুদ। তুকে আজ আমি ধর‌াই দিব রামটহল, আসছে ওই ইনকেলাবের দল।

এ চাপানের উতোর একটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলে রামটহল। বললে,—হমরাভি মজবুত দা'রাই আছে ইনক্লাবকে লিয়ে। বোল্‌ বোল্‌ বোল্‌ বোল্‌—গান্ধীজি মহারাজকি জয়।

বয়ান একটা ছেড়ে দিলে রামটহল।

দূর থেকে আওয়াজ আসছে,—ইনক্লাব—জিন্দাবাদ।

টাইপবাবুর খট খটা খট বন্ধ হয়ে গেল। সাপে-কাটার ওস্তাদজী সাপগুলো সব ঝাঁপির মধ্যে পুরে ফেলেছে। দাঁত-বদ্যির দাঁতের মাজন কিনতে আর কেউ এগোচ্ছে না আপাতত। মিছিলটা এসে আদা-লতের প্রাঙ্গণে যতক্ষণ না একটা চক্কর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, ততক্ষণ আর কাজকর্মের সুরাহা নাই। গরু চুরির মামলাটা হয়ত রয়ে গেল আজ। ফুকার টুকার বন্ধ হয়ে গেল যে।

পিছন ফিরে একটু তাকালাম। প্যানোর‌্যামিক বিউটি হঠাৎ যেন একটা ভল্ট খেয়ে দুলে উঠলো মনটা। জুড়িয়ে গেল আমার চোখ দুটি। কি অপূর্ব মহান এই দৃশ্য। শ' দেড়েক প্রায় বিচারাধীন আসামীকে হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধে লম্বা একগাছা দড়ার সঙ্গে ঘুঙুর গাঁথা ক'রে কোর্ট থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, জেলখানার হাজতে। গোঠ থেকে আবার খাটাল। লাল পাগড়ী রাখালরাজদের হাতে কিন্তু বেণু নাই। আছে শুধ্‌ এভারসে ঢোলাই দেওয়া খানকয়েক বেটন মাত্র। চোর ডাকু আর পকেটমার, চাকুবাজ আর ছিনতাইবালা, নানান জাতের নায়করা সব সমাজ-

বিরোধী। বনেদী আর বে-বনেদী, ঝুনো ঝাহু ভাঁসা পাকা, রাম ঘুঘু থেকে হুগ্গো টুনটুনি পর্য্যন্ত একঘাটে সব জল খাচ্ছে মৌজ সে। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে আজ মিশে গেছে দিগ্দড়ির ওই ঐক্যসূত্রের বন্ধনে।

জাতীয় সংহতির এতবড় একটা জলন্ত নিদর্শন অন্যত্র দুর্লভ।

ভুখা মিছিল এসে পড়লো। ঝাণ্ডা আর ফেষ্টুন হাতে এগিয়ে আসছে হাজারখানেক লোকের একটা জনতা। আদালতের কাছাকাছি এসে সপ্তমে চড়ে গেল দাবীদাওয়ার আওয়াজটা—অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই।

চাই বৈকি, সবই চাই। কিন্তু শুনছে কে সে কথা।

শোনাতেই হবে। আর একটুখানি খোলসা ক'রেই শুনিয়ে দেওয়া দরকার।

আওয়াজ উঠলো আর একদফা, সমবেত কণ্ঠে,—খাদ্য দাও, বস্ত্র দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও।

এ আবার কি অসঙ্গত প্রস্তাব। খাদ্য এবং গদি, একটা ছাড়লে আর একটা যে থাকে না। একসঙ্গে ও দুটোই থাকবে, গদিয়ানদের হাতের মুঠোয়। পার যদি কুস্তি লড়ে চিৎ করে দাও।

খাদ্য চাই—বস্ত্র চাই —

রাস্তার ধারে ডালা সাজিয়ে বসে আছে গোকুলদাস। একটুখানি সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো যেন। রামটহলকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে—শুনছিস! গদি এবার উল্টালো সরকারের।

রামটহল জবাব দিলে,—তুই গিয়ে অব্ বৈঠে যাবি গদিপর। পরধান মন্ত্রীকা উম্মিদ্বার ও লোগ্ তুঁর রহা হ্যায়।

ছাত্রদের মিছিলটা ছিলো পুরোভাগে। ক্রোধটা ওদের পুলিশদলের উপর। আওয়াজ দিয়ে উঠলো সব একসঙ্গে,—পুলিশ জুলুম—চলবে না, চলবে না। ডাণ্ডাশাহী চলবে না, চলবে না।

গোকুল দাসের মনের কথাটি টেনে একেবারে বলে দিয়েছে। পুলিশ জুলুম—চলবে না। সেপাইজীদের কোকটে এবার পেয়ারা খাওয়া উঠলো।

বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো গোকুল, রামটহলকে লক্ষ্য ক'রে,—খোকা বাবুরা এসে পড়েছে। বজ্জাৎদের সব ঠাণ্ডা ক'রে ছেড়ে দিবেক এইবার। দেখে লাও এবার তামাসা।

তামাসাটা দেখবার মতই। সরকার আর জনতার মধ্যে সম্পর্কটা বর্তমানে অহি আর নকুলের। আজ আর সে রাম নাই। রামরাজ্য পাবে কোথায়? পথে ঘাটে হানা দিয়ে ফিরছে দশমুণ্ড দশাননের দল। প্রজাকুল আজ নিঃসুপ্ত কুম্ভকর্ণের ভূমিকায়। এর চেয়ে আর বড় তামাসা কি হতে পারে!

—ইনক্লাব, জিন্দাবাদ।

—পুলিশ জুলুম—চলবে না, চলবে না।

বটতলা থম্ থম্ করছে। সামনের দিকে এগিয়ে আসছে কলমুখর জনতা। ভয়ভীতির কোন বালাই নাই, একেবারে বেপরোয়া। মন মেজাজ সব বাঁধা আছে চড়া সুরে। পুলিশ জুলুম খতম হতে আর হয়ত খুব বেশী দেরি হবে না।

এগিয়ে এলো জন চার পাঁচ দল-ছাড়া কিশোর আর তরুণ। গোকুল দাসের টুকরি থেকে বাছাই করে তুলে নিলে গোটাকয়েক পেয়ারা। বললে,—দাম কত গো?

গোকুল বললে, এক একটি দু'আনা ক'রে খোকাবাবু, ক'টা লিবে?

ক'টাই বা নিতে পারে ওরা, থলে ত কেউ সঙ্গে আনে নি। আপাততঃ দু' একটা ক'রে হলেই চলবে।

—পেয়ারা বেশ মিষ্টি আছে ত?

বললে একটি তরুণ। কামড় দিলে সঙ্গে সঙ্গে। খেতে খেতেই ধাঁ ক'রে সরে পড়লো, গোটা তিনেক পেয়ারা সমেত। ভিড়ে গেল গিয়ে মিছিলের মধ্যে।

হকচকিয়ে উঠলো গোকুল। দু' এক কদম এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালে ভিড়ের মধ্যে,—খোকাবাবু, আমার পয়সা!

এগিয়ে যাচ্ছে বিক্ষোভ-মিছিল। পয়সা দিবার সময় কোথায়। খোকাবাবু এখন শ্লোগান দিচ্ছে,—পুলিশ জুলুম চলবে না, চলবে না।

হতাশ হয়ে থমকে গেল গোকুল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখে বাকি চারজন নাই। পেয়ারা সমেত ফাঁক-তালে কখন সরে পড়েছে। নতুন আরো কয়েকজন এসে লেগে পড়েছে ডালার উপর। যার যটা খুশি ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে একে একে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে পেয়ারার টুকরিটা সামনে থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলে গোকুল। কাতরকণ্ঠে বলে উঠলো,—এ তোমরা কি করছো বাবুরা! গরীব লোক আমি, মারা পড়ে যাব যে।

টুকরিটা বেশ শক্ত করে বুকের মধ্যে চেপে ধরলে গোকুল। টুকরি কিন্তু সরিয়ে ফেলা সম্ভব হলো না। চার দিক থেকে একসঙ্গে অনেকগুলোর টানা-হ্যাঁচড়ায় টুকরি সমেত আছাড় খেয়ে পড়লো গোকুল রামটহলের ঠেলাগাড়ীর চাকার উপর। পেয়ারাগুলো ছিটকে পড়লো চারিদিকে।

রুখে উঠলো এবার রামটহল। কড়া একটা প্রতি-বাদের সুরে হেঁকে উঠলো জোর গলায়,—এ আপলোগ কা কর্ রহা হ্যায়।

পাঁচমিশালী জনতার হাত থেকে একটি পেয়ারাও কিন্তু বাঁচানো গেল না। হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে চার-দিক থেকে লুট হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কে কোন্ ফাঁকে মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

রাহাজানির ধাক্কাটা কোন রকমে একটুখানি সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলো গোকুল। বেশ একটু চোট লেগেছে মাথায়। কেটে গেছে খানিকটা। তালিমারা আধময়লা ফতুয়াটা ভিজে গেছে গোকুল দাসের তাজা রক্তে। করুণভাবে একটা ডাক দিলে গোকুল—রামটহল!

বালতি থেকে এক লোটা জল নিয়ে তাড়াতাড়ি গোকুলের মাথাটা একবার ধুয়ে দিলে রামটহল। কোলের উপর মাথাটা রেখে হাত দিয়ে চেপে ধরলে ক্ষতস্থানটায়।

করুণ একটা দৃষ্টি মেলে আকাশের সীমাহীন শূন্যের দিকে তাকালে একবার গোকুল দাস। ফুঁপিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠলো। ভাঙ্গা গলায় বলে উঠলো গোকুল,—আজ আমার হাঁড়ি চাপবেক কিসে রে, ঘরে যে একটি দানা নাই। ছেলেপিলেদের খাওয়াব কি আমি।

হৈ হৈ করে এগিয়ে গেল বিক্ষোভ-মিছিল। ওদের আকাশ-ফাটা হৈ-হল্লার শব্দে কোথায় যেন চাপা পড়ে গেল গোকুল দাসের অসহায় দুর্বল কণ্ঠ। ওর কথা কেউ শুনতেই পেলে না।

দেওয়ানি কোর্টের ওদিকটায় গিয়ে মোড় ফিরছে বিক্ষোভ-মিছিল। ফেটে পড়ছে কলকণ্ঠের তূর্যনাদ। সকল দাবি তলিয়ে গেছে একটিমাত্র দাবীর কাছে—পুলিস জুলুম—চলবে না, চলবে না।

অবশ্যই চলবে না। কিন্তু কথাটা কি এইখানেই শেষ হয়ে গেল!

কার জুলুমটা চলবে তা হলে?

ঘনায়মান অন্ধকারে চলার পথ ঝাপসা হয়ে আসছে। সামনে দুলছে ভবিষ্যতের করাল ছায়া। মুক্তি কোথায় এর হাত থেকে?

গোকুলদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজছি।

অযোধ্যার নবাব

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(১১)

(চতুর্থ পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ, তুমি আমার প্রেয়সীদের মুকুটমণি।
আকলীল মহল রাজার পিয়ারী॥
তোমার মুখটি যেন এক কোরক, যেন একটি ফুল।
রাজা আখতারের বিবি তুমি।
তুমি লালা ফুল, অনিন্দ্য তোমার আচরণ।
তোমার সুলেল তনু, মনোহারী চন্দন বদন।
এই যৌবন যেন অধিষ্ঠান করে তোমাতে,
যতদিন বয়ে যায় গঙ্গা যমুনার জল॥
তুমি যেন সুখে থাকো।
যতদিন সূর্য থাকে সমুজ্জ্বল।

আগে, তোমার মায়ের জন্যে ৪৫০ টাকা আমি পাঠিয়েছি এই হিসাবে: ১৫০ টাকা দিয়েছি নগদ আর ৬ মাসের জন্যে ৫০ টাকা মাস মাহিনায়, তার মানে ৩০০ টাকা আগাম। আর তোমার ব্যক্তিগত খরচের জন্যে ১৫০০ টাকা। মোট, এ পর্যন্ত, আমি তোমায় ২৭৫০ টাকা পাঠিয়েছি।১ অনুগ্রহ করে রসিদ পাঠিও।

অনেক দিন অন্তর তুমি চিঠি পাঠাও। তোমার রূপের শ্রীবৃদ্ধি হোক।

সপ্তম রজব, ১২৭৫। জানে আলম্।

পুনশ্চ—এই মাসের তিন তারিখে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। নবাব দিলদার বেগম সাহেবার মৃত্যু হয়েছে তিনি আমায় একলা ফেলে চলে গেছেন।

(পঞ্চম পত্র)

মুমতাজ জাহাঁ আকলীল মহল সাহেবা, সালামৎ।

তোমার প্রেমপত্রটি আমি ২২শে রজব তারিখে পেয়েছি। চিঠিখানি আমি আলিঙ্গন করেছি আমার বুকে। তুমি মিথ্যাবাদিনী। তুমি বলো যে চিঠি পাঠাচ্ছ। কিন্তু আমি মোট তিনটি মাত্র পেয়েছি, এইখানি সমেত। আর অন্যরা আমাকে ৩০ থেকে ৪০ খানি চিঠি দিয়েছে। আমি তাদেরও ওই সংখ্যক পত্র পাঠিয়েছি। তুমি আমায় তিনটি চিঠি দিয়েছ আর আমিও তিনখানি পাঠিয়েছি। তোমার চিঠি পেলে আমি প্রাণবন্ত হই।

তোমার মাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

২২শে রজব ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্

(ষষ্ঠ পত্র)

ওগো মুমতাজ জাঁহা আকলীল মহল সাহেবা, সুখী হও। তোমার দুটি চিঠি আমি ৪ঠা শাওন পেয়েছি।

খোদার নামে শপথ করে আমি বলছি যে, এ পর্যন্ত আমি তোমায় তিন হাজার টাকারও বেশি পাঠিয়েছি। যদি তুমি না পেয়ে থাকো, সে দোষ আমার নয়। গতকাল শুনেছি, লাট সাহেব বাহাদুর আমাকে যে ২ লাখ টাকা মঞ্জুর করেছেন তা এখানে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে আর কিছু বাকি নেই। আবার আমি জানিয়েছি। দেখা যাক ওঁরা কি বলেন। খবর যতক্ষণ না আসে, টাকা পাঠানো মুলতুবি থাকবে। আমি এজন্যে বড় লজ্জিত আছি আর সেই লজ্জায় চিঠি লিখতে পারিনা।

৫ই শাওন। স্বাঃ জানে আলম্।

(সপ্তম পত্র)

মুম্তাজ জাঁহা আক্লীল মহল সাহেবা, আখতারের আত্মা—

তুমি আলীর হিফাজতে থাকো।

৬ই শাওন আমি একখানি চিঠি পেয়েছি।

ও আমার প্রাণ, ও আমার জীবন, ইংরেজ সরকারের কাছে যে ২ লাখ টাকা পাই তা তোমাদের সকলের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। শপথ করে বলছি, আর কিছু বাকি নেই। এখন টাকার জন্যে দ্বিতীয় অনুরোধ সরকারের কাছে করা হয়েছে আর হাঁ বা না জবাব পাওয়া যাবে তা তোমায় জানানো হবে। আর এখন আমি লক্ষ্ণৌতে কোন টাকা পাঠাচ্ছি না। তিন হাজার টাকা আমি আগেই পাঠিয়েছি, তুমি যদি না পেয়ে থাকো তা আমার অপরাধ নয় আর এ ব্যাপারে আমি নাচার। এই বন্দী দশায় তোমার প্রার্থনা দিনে রাতে সব সময় আমার জিহ্বায় থাকে। সর্বদা আমি তোমার কথা ভাবি আর মুক্তোর মতন অশ্রু ঝরে পড়ে আমার চোখ থেকে।

তোমার জননীর দরখাস্ত আমি পেয়েছি। আমি লজ্জিত, কি তাঁকে আমি লিখ্‌ব।

৭ই শাওন ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্‌।

(অষ্টম পত্র)

নবাব মুমতাজ জাঁহা আকলীল মহল সাহেবা, সালামৎ।

১৩ই শাওন আমি মীর ইবাদ আলী আর বুড়ো মুন্সীর লেখা দুটি চিঠি পেয়েছি।

ও আমার প্রাণ, আড়াই হাজার টাকা নাও আর ৫০০ টাকা তোমার বাবা, মা, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে তোমার নিজের ইচ্ছা মতন। টাকাটা আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। গতকাল আমি ৫০০ টাকা পাওয়ার রসিদ পেয়েছি। বাকি টাকাটা অবিলম্বে হাচিন্‌সনের কাছারি থেকে সংগ্রহ করবে ওই টাকা থেকে তোমার বাবা ও মায় তলব দিয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশি আমি এখন আর খরচ করতে পারছি না। আমি এর মধ্যে জিলহাইচ্‌ পর্যন্ত দিয়েছি আর এখন জিলহাইচ্‌ পুরো হবার পর তোমার অনুরোধ করা উচিত।

১৩ শাওন ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্‌।

(নবম পত্র)

বনা দে নুর কা পুত্‌লা খুদায়া মেরি মাট্টি কো,
বু ভোঁকে বাস্তে পাথরকা করদে কল্‌ভ্‌ কো জী কো।
......ইত্যাদি

অর্থাৎ—ও খোদা, আমার মাটিকে আলোর খেলনা করে নাও আর আমার প্রাণকে পিয়ারীদের জন্যে পাথর।

অকারণে তুমি তোমার বুক লুকিয়েছ
আর ওই সব বুদ্‌বুদ দেখিয়ে দেয় হীরার শুক্তি॥

ও আমার ভাগ্য, অত্যাচারী লোকেরাও চোখের জল ফেলে, আর যার মুখ মোমে তৈরি সে কেমন করে আলোকিত করে তার মুখ॥

আমি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলে এই আবর্তমান আশ্‌মান মিলিয়ে যায় তৃণের মতন।

আমার নিঃশ্বাস পাথরের কাঠিন্যকে দেয় গলিয়ে॥

আমার প্রিয়ার পথের কুকুরকে ২ কি দেব আমরা, কারণ আমি একেবারে জ্বলে গেছি হাড়ের মতন।

হয় কোন কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটে কিংবা এটি একটি চুম্বনের শব্দ। একটি কোরককে আমি জানি কারণ বাগিচার হৃদয় শুধু আমাকেই জানে॥

কোন মানুষ তার নিজের দোষ দেখতে পায়না এ দুনিয়ায়। ঈশ্বর প্রত্যেক মাছের মধ্যে দিয়েছেন একটি লুকানো কাঁটা॥

প্রেমিক প্রেমিকার যখন মিলন হবে তখন সেই শব্দে বুলবুল্‌ যাবে উড়ে।

আর একবার সশব্দে চুম্বন করো আমার গালে॥

যখন আমি কাঁদি বাতাসের ঢেউ জল হয়ে যায়।

আর আমার ঝরা অশ্রু তৈরি করেছে এই নদীনালা-পাথার ॥

যদি তোমার নিজেকে কিংবা মুখটিকে উপাসনা করতে আরম্ভ করো তাহলেই তুমি হবে বিজয়িনী।

ওগো সবুজ রঙ্ (পিয়ারী), কালী দেবীকে ফুলের অঞ্জলি দিয়ে পূজা করতে যেওনা।

হয় তুমি প্রেমের জন্তে বাজি রাখো কিংবা প্রিয়ার স্বভাব যাক বদলে ৩।

ওগো বিজুরি ৪, কেন এই মেঘ চড়েছে বাতাসের ওপর ॥

আমার প্রিয়া যখন কথা বলে, দেখায় যেন হীরা, মুক্তা আর জড়ি বেরিয়ে আসছে।

কিন্তু এখন আমি দেখি প্রিয়ার মুখে আসে শুধু গালি ॥

ওগো পরীর মেয়ে, রূপের জন্তে কেন এত গরব—সে তো মরে যাবে দু'দিনেই।

(এই) অনিত্য সৌন্দর্যকে নিয়ে তুমি চলছ (লোকদের) শিকার করে ॥

আমার মনের পাখি রাখা ছিল যে পিঞ্জরে,
তার শিকগুলি সূর্য চন্দ্রের রশ্মিতে তৈরি ॥

ও আখ্তার, যে পদ্ধতি অনুসরণে তুমি এই গজলটি রচনা, এই ছন্দে রচনা করে তুমি বেশ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছ।

ও আমার প্রাণ, মুম্তাজ জাঁহা নবাব আকলীল মহল সাহেবা, আখতারের পিয়ারি, সুখী হও।

তুমি সৌজন্যভরা প্রিয়া, তুমি অনন্যা প্রিয়া, বাগানে বসন্ত, অতি স্পর্শকাতরা, খুসির সেরা, রঙ্গিনী, সুখদায়িনী, তুমি প্রেমে দাও উত্তেজনা, সব চেয়ে প্রদীপ্ত সুরয আর চাঁদ, নারীর সব গুণে গুণবতী, প্রিয়ার আকার তোমার, তোমার সর্বস্ব ভাল, তুমি আখতারের বঁধু—

তুমি জেনো যে আমার প্রেমের দশা আরো শোচনীয় হয়েছে আর যখন থেকে আমি তোমার অবস্থার কথা শুনেছি, আমার রক্ত অশ্রু হয়ে গেছে, আমি রক্ত ঝরাব ভাবছি। আমার উদ্দীপনা আর হৃদয় তোমার আলোময়ী শরীরের একটি ছবি (ফটো) নিয়েছে আর এইভাবে আমি তোমার মুখের একটি প্রতিকৃতি পেয়েছি। চিত্রকর কিছু বদ্ রঙ্ দেওয়ায় ছবিটি নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি অনুগ্রহ করে তোমার একটি সত্যিকার প্রতিকৃতি আমায় পাঠিও, আমি তাহলে বাধিত হব আর সেই ছবিখানি প্রত্যেকদিনে রাতে দেখব। আমি তোমাকে সেজন্তে সম্মান ও অর্থ দেব। এই গজলটি আমি উদ্দীপনায় রচনা করেছি, কারণ তুমি গাথা গাইতে ভালবাস। সেজন্তেই আমি এত কষ্ট স্বীকার করেছি।

৮ই রমজান। জয়নাব বেগমের স্বামী।

দশম পত্র

মুম্তাজ জাঁহা নবাব আকলীল মহল সাহেবা,

আমি তোমার চিঠি ১৬ই রমজান পেয়েছি। তোমাকে আর তোমার মাকে যে টাকা আমি পাঠিয়েছি তার সব রসিদ পেয়েছি। এর চেয়ে বেশি আমি পাঠাইনি তোমার মায়ের দরখাস্তও আমার কাছে এসেছে। খুব ব্যস্ত থাকার দরুণ আমি জবাব দিতে পারছি না। তুমি অনুগ্রহ করে তাঁকে মনে করিয়ে দিও আমার কথা। ও আমার প্রাণ, যে মুন্সী তোমার পত্রটি লিখেছেন তিনি অসাধারণ এবং একজন ভাল সুহৃদ হতে পারেন। তুমি তাঁকে তোমার চিঠিগুলি লিখতে বোলো আর যিনি সব সময়ে লেখেন আমি পছন্দ করিনা তাঁকে। তাঁর হাতের লেখা খারাপ আর তিনি রচনা করতে জানেন না।

১৭ই রমজান, ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্।

একাদশ পত্র

মুম্তাজ জাঁহা নবাব আকলীল মহল সাহেবা, যে সব কিছু ভিতরের অর্থ বুঝতে পারে আর যে রূপের মেয়ে—

তোমার কাছ থেকে আমি দুখানি চিঠি ২০শে রমজান পেয়েছি আর আমার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গদের অবস্থার কথা

জানতে পেরেছি। তোমার ২৫০০ টাকার আর তোমার মায়ের ৪৫০ টাকার রসিদও আমার হাতে এসেছে। আমি মাত্র এই শর্তে তোমার মায়ের ভার নিতে পারি যে তিনি ৫০ টাকা মাসমাহিনা ও ১৫০ টাকা নজরানা পাবেন। তোমার অন্য আত্মীয়দের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না আর এ সম্পর্কে আমায় অনুগ্রহ করে ভবিষ্যতে কিছু লিখো না। এই আমার স্পষ্ট জবাব। ওই হিসাবে আমি তোমার মায়ের তলব পাঠিয়ে দেব।

২১শে রমজান, ১২৭৫। স্বাঃ জানে আলম্।

পুনশ্চ : আমি ঈদল্ ফিতরের পোষাকের জন্যে আরো ১০০০ টাকা পাঠাচ্ছি। শেহাৎ উদ্‌দৌলা বাহাদুর ও মীর ওয়াজেদ আলীকে সাক্ষ্য রেখে টাকাটা নিও আর হাচিনসন সাহাবের কাছারি থেকে টাকা নেবে আর আমায় রসিদ পাঠাবে।

দ্বাদশ পত্র

তুমি জুলেখার ৫ তুল্য সুন্দরী পরীর মতন তোমার ব্যবহার, ও আমার মুমতাজ জাঁহা নবাব আকলীল মহল সাহেবা—সর্বদা সুখী হও, আরামে থাকো আর দুনিয়া ও আশমানের কোন কষ্ট যেন তোমার কাছে না আসতে পারে।

১৪ই সেওয়াল তারিখে আমি দুখানি পত্র পেয়েছি। একটি খুবই ছোট, যা পঁচিশে রমজান্ লেখা আর একখানি ২রা সওয়ালের সুদীর্ঘ চিঠি তা থেকে আমি তোমার প্রেমের অবস্থা আর অসুখ আর চিকিৎসার কথা জানতে পেরেছি। এসব নিয়ে আমি খুবই দুর্ভাবনায় আছি। সাবধানে থেকো। টক ও মিষ্টি জিনিষ খেওনা আর যদি তুমি আমায় ভালবাসো, তাহলে তোমার ভাল চিকিৎসা করিও। আমার জন্যে যদি তোমার কোন দুশ্চিন্তা থাকে, খোদা তার সুরাহা করে দেবেন। ঈশ্বর যদি চান শীঘ্রই আমাদের মিলন হবে। এ জন্যে আমরা কেন দুশ্চিন্তা করব বা মাথা ঘামাবো।

ঈশ্বর বিলম্ব করেন না দয়া আর করুণা দেখাতে,
আর যে তাঁর সাহায্য পেতে চায় সে হয়না অসহায়।

আমি তোমাকে ৫০ কম ৩০০০ টাকা পাঠিয়েছি আর সব রসিদও পেয়েছি আর ঈদি বলে আরো ১০০০ টাকাও পাঠিয়েছি। কয়েদখানার অসুবিধা আর কষ্ট সব তেমনি আছে আর আমি সমস্তই খরচ করে ফেলেছি। সেজন্যেই আমি খুব দুর্ভাবনাগ্রস্ত আছি। এখন রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।

১৮ই সেওয়াল ১২৭৫। জানে আলম্।

ত্রয়োদশ পত্র

ওগো মিলন-বাগিচার তরু, সুখের গান-গাওয়া পাখি, মুমতাজ জাঁহা নবাব আকলীল্ মহল সাহেবা, সুখী হও আর আড়ম্বরে থাকো। তোমার সঙ্গে পুনর্মিলন আমি কামনা করি। তোমার বিষণ্ণতার জন্যে আমার পূর্ণ সমবেদনা। আমার পিয়ারী বিবিকে আমার অবস্থা আমি এখানে লিখে জানাচ্ছি—মিলন থেকে আমার বিচ্ছেদের অবস্থা। ওগো বিল্‌কিস্,৬ ওগো চিকণ মুক্তা, ওগো পূর্ণ বিকশিত পুষ্প, আমি এখানে অনেক কাল এসেছি। সিকান্দারবাগের বারদোরি বাগান আমি বিন্যস্ত করেছি সাজিয়েছি তোমার জন্যে। ওঃ কোথায় তুমি! না সেখানে, না এখানে। খোদার দোহাই, আমায় সত্যি বলো। আমাকে তোমার হাতখানি দাও, দেখো আমার হৃদ্‌পিণ্ডের কিরকম স্পন্দন হচ্ছে, ঠিক জবাই-করা মুরগীর মতন। এসো, আমি আমার গাড়িতে চড়ি আর তোমার জন্যেও আর তোমার জন্যেও একটা গাড়ি আনাই। কোচোয়ান আর অল্পবয়সী যারা বাগানে বেড়াচ্ছে আমি তাদের চোখ কাপড়ে ঢেকে দেব। আমি তাদের একটা গল্প বলব আর তারা জায়গাটা ছেড়ে চলে যাবে। শিশির ঝরে ধোয়া হবে গাছগুলো। ওগো জগতের রাণী (মুমতাজ জাঁহা), সুখী হও। এসো আমরা আলিঙ্গন করি পরস্পরকে। সিকান্দারবাগে হামাম্ (৭) প্রস্তুত। তুমি হুকুম দিলেই চৌবাচ্চায়

জল ভরে দেওয়া হবে। যদি তুমি বলো আমি ওপর-কার বড় চৌবাচ্চা খুলে দিই আর আমি কোয়ারাদের বলি নিজে থেকে অশ্রু ঝরাতে; কোকিলেরা আপনাদের পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে; বুলবুলেরা নালিশ আনায় যে তাদের ডানা মিলিয়ে যাচ্ছে আর ওই সব পাতা দুঃখে তাদের নিজেদের হাত ঘষ্‌তে থাকে আর বাগিচা ও তার মালিরও হিংসা প্রকাশ পায় আমাদের মিলন দেখে।

ওগো প্রেমের বাগানের লতা, ওগো মিলন-বাগিচার ফুল, এ কি দুঃখ, এ কি ব্যথা। কি করে সেই সব দিন-রাত জল্‌সায় কেটে গেছে। কেন তুমি আর আমি এই বিচ্ছেদের আর বন্দীদশার যন্ত্রণা ভোগ করলেম। সুখী ছিলেম আমরা আর বাগবাগিচা ছিল পূর্ণ ফলবন্ত। ওঃ, কে আমাদের অভিশাপ দিলে, না কি কোকিলেরা শাপ দিয়েছে শিকারীকে। এ সবই আমাদের ভাগ্যের লিখন আর শিকারীই হল ভাগ্য। এসব জিনিষ দেখানো কান্নার বিষয়। এ শীতকাল (যখন পাতারা ঝরে পড়ে) আমাদের বড় কষ্ট দিয়েছে। আসল কথায় আসা যাক। হৃদয়ে আঘাত পেয়েছি আমি। এ সম্পর্কে আর কিছু আমি লিখব না। ওগো রূপসী পিয়ারীদের মুকুটমনি, ওগো সুন্দরীদের মধ্যে ঝলমলে তারা, আমি ২রা জিল্‌কদ্‌ তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি আমার নিজের কবিতা থেকে ৫টি পদ্য লিখেছ, আমি খুবই উপভোগ করেছি। খোদার নামে বলছি, প্রত্যেকটি পদ সুতোর মুক্তার মতন।

(ফার্সীতে) আমি তোমাকে কবিতা রচনায় সাহায্যের জন্যে একটি পদ পাঠাই। তা হল—'চমন্‌ হ্যায় আবুর হ্যায় খিল্‌বৎ হ্যায় ওঁর আরাম কি শব্‌।'

আমি যখন তোমাকে পদটি পাঠাই, আমি ভেবেছি যে তুমি এর ওপর কোন কবিতা রচনা করতে পারবে না, তাই আমি এ বিষয়ে বড় বিষণ্ণ ছিলেম। ওগো আমার প্রাণ, ওগো রাজার বিবি, আমি তোমাকে বুদ্ধিমত্তা ভাবার আমি আগেই প্রস্তাব করেছি মুন্সীকে কাজ করিয়ে নেবার আর তাঁকে মাহিনা দেবার কথা। আমার মনে হয় তুমি তাঁকে লিখ্‌তে বলেছ 'রোমাই শাদকা' ৭ আর তার পড়বার সময় আমি কেঁদেছি। কিন্তু তুমি সে চিঠিখানির কোন জবাব পাঠাওনি। আবার আমি লিখছি। আমায় সে লিপিকারের নাম দয়া করে পাঠিও, তা'হলে আমি আমার কেতাবে তাঁর নাম লিখে নিতে পারি আর তাঁকে খেতাব দিই রাকিম্‌-ই ইশক-ই আখতার (৮) আমি এ বিষয়ে স্থির করেছি যে, যখন থেকে তুমি সচেতন হয়েছ আর প্রেম ঘটেছে, আমাদের প্রেমের কাহিনী ৫০০০ থেকে ৬০০০ পদে রচনা করা যেতে পারে। তুমি ভাল ছন্দে রচনা করবে আর তোমার প্রতিটি প্রেমপত্রের সঙ্গে তুমি ২ কিংবা ৩টি অংশ আমায় পাঠাবে। তাতে বৃদ্ধি পাবে আমার প্রেম।

আমার ইচ্ছা যে, সেই মসনবীর কেতাবটির নাম হবে কিতাব-ই মসনবী-ই মুমতাজ আর নামটা তাহলে উপযুক্ত হয়। বাঁধাই করে ও সোনায় অলঙ্কৃত করে এটি আমায় পাঠিয়ে দিও, খরচ সব আমি দেব আর যদি তা সম্ভব না হয়, অনুগ্রহ করে কিস্তিবন্দীতে পাঠিও, আমি আমার পছন্দ মতন তৈরি করে নেব। আমি তা ছাপাবার কথাও ভেবে দেখব। ঈশ্বরের নামে তুমি শপথ করো যে, আমার এই বাসনার কথা ভুলে যাবেনা আর আমার ইচ্ছা অনুসারে করবে, কারণ এই কবি দুর্লভ আর মুক্তার মতন ঝকঝকে। আমি তাঁর কণ্ঠে তোমার প্রেম-কথা শুনতে আর উপভোগ করতে কামনা করি। এটা বিরাট ব্যাপার কিছু নয়। আমরা উপভোগ করব আর তিনি তাঁর অংশ পূরণ করে যাবেন আর তোমার রূপ ও আমার প্রেম শেষ দিন পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবে দুনিয়ায়। তাহলে বিচারের দিন তোমার সৌন্দর্য আর আমার প্রেমের একটা নাম থেকে যাবে।

জিল্‌কদ্‌ ১২৭৫। পুঃ আলম্‌ (২)

জানে আলম্‌

চতুর্দশ পত্র

ওগো রূপসী মুমতাজ জাঁহা নবাব আকলীল মহল সাহেবা, সালামৎ।

তোমার সুখদায়িনী পত্র ইহ জিন্‌কৎ পেয়েছি। হ্যাঁ, আমারই দোষ। কি করে তুমি একজন অপরিচিত লোকের সামনে বেরুবে বা বসবে।

ঈশ্বর যখন আমাদের পুনর্মিলন ঘটাবেন তখন তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পাব। ওগো সুখের ভাণ্ডারী, গজলটি চমৎকার আর যে ব্যক্তি এটি রচনা করেছেন তিনি অসাধারণ। আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি, এই ব্যক্তিকে দিয়ে তোমার চিঠিগুলি লিখিয়ে নেবার জন্যে। কিন্তু আমার মনে হয় আমার সেসব পত্র তুমি পাওনি, নচেৎ আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তুমি করতে পারতে। আমি ওই কবির নাম জানিনা। তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর নাম পাঠিয়ে দিও, যাতে আমি তাঁকে নিযুক্ত করতে পারি। তোমাকে দেখতে যে আমার কত বড় বাসনা তা লিখে বোঝাতে পারব না। খোদা যেন শীঘ্র আমাদের আবার মিলন করিয়ে দেন।

১০ই জিন্‌কৎ ১২৭২। স্বঃ জানে আলম্।

পুঃ আজ ফুক্কা (১১) মুজাহেদুদ্দৌলার মৃত্যু হয়েছে মুচিখোলায়।

পঞ্চদশ পত্র

ওগো বিশ্বস্তা প্রেম-পাত্রী নবাব আকলীল মহল সাহেবা, সদা সুখী থাকো। তোমাকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করে জানাই যে, তোমার পত্র আমি ১৬ই জিন্‌কৎ পেয়েছি। তা থেকে চিঠির নকলগুলি আমীর আলী খাঁর হাতে দেবার বিষয়ে আমি জেনেছি। আমি তোমার শিরে শপথ করে বলছি যে, আমি সব সময়েই তোমার চিঠির জবাব সেইদিন কিংবা তারপরের দিনই যদি আমি ভাল মেজাজে না থাকি জুল-ফুকারুদ্দৌলাকে দিয়ে লিখিয়ে সেগুলো পাঠিয়ে দিই। যদি সেসব তোমার কাছে না পৌঁছে থাকে, তাহলে আমি নাচার। যা-ই হোক, তোমাকে আমি ১০০০ টাকা পাঠিয়েছি তোমার ইদুজ্জোহার পোষাকের বাবদ। তা যখন পাবে, রসিদ পাঠিও। আমি আমার লেখা কবিতাবলী সংগ্রহ করছি। সে জন্যে আমি বেশি সময় পাচ্ছিনা আর জুলফুকারুদ্দৌলাকে নির্দেশ দিয়েছি তোমার পত্রের উত্তর দিতে আর আমি তা দেখেছি। যতদিন পর্যন্ত আমি আমার কবিতা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকি, আমি তোমার চিঠির জবাব নিজের হাতে লিখতে পারব না, তুমি সেজন্যে অনুগ্রহ করে কিছু মনে করো না আর ভেব না যে আমার হৃদয় থেকে তোমার প্রতি প্রেম কমে যাচ্ছে। এসব কাজ থেকে যখনই মুক্তি পাব, আমি নিজের হাতে তোমায় কবিতা ও গদ্যে লিখতে আরম্ভ করব।

পুঃ তুমি তোমার চিঠিগুলির দুটি করে অনুলিপি পাঠাবে আর আমার লেখা গদ্য ও কবিতায় পত্রাবলী তোমাকে যেমন পাঠিয়েছি সেই কালানুক্রমে আমায় পাঠিয়ে দেবে। এই বন্দোবস্ত আর ভূমিকা হবে তোমারই নামে। তুমি ভূমিকা লিখবে—"জানে আলমের এই প্রেম-পত্রাবলী আমি প্রেমের আধিক্যে সংগ্রহ করেছি আর আমি নামকরণ করেছি 'তারিখ-ই-মুমতাজ।'" তারপর তুমি তা বাঁধাই করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে আর প্রতি মাসে এমনি করবে। আমি এই কাজে সুখী হব আর এর জন্যে খরচ করব। খেয়াল রেখো, যেন কোন ভুল কোরো না। যদিও আমি কম লিখেছি, কিন্তু তুমি এটি বড় করে ধরবে।

১৭ই জিন্‌কৎ, ১২৭২। জানে আলমের হুকুমে জুলফুকারুদ্দৌলা লিখিত।

ষোড়শ পত্র

সতী প্রিয়া, কুঞ্চিত কালো কেশ, লালা ফুলের মতন, দীর্ঘাঙ্গিনী, রাজার পিয়ারী, বিরহে অধীরা,

নবাব আকলীল মহল—আমাদের শত্রুদের যেন দুর্দিন আসে আর বন্ধুদের শ্রীবৃদ্ধি হয়। দেহে মনে মিলন কামনা করে আমার লেখনী তোমার সুখ প্রার্থনা করে। তোমার বিচ্ছেদের জ্বরে মরে যাচ্ছি আমি।

২০শে জিল্‌কদ্ তোমার দুখানি চিঠি পেয়ে আমি প্রেরণা পেয়েছি। একখানি তুমি লিখেছ ১০ই জিল্‌কদ্ আর দ্বিতীয়টি চল্‌তি মাসের ৫ তারিখে আর তার একটি কবিতার পদ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি তোমার মনে পড়বার জন্যে।

'ওয়া কেয়া ওয়াকৎ পর্ আয়ে যানে জাঁহা ইয়াদ কিয়া' (ওঃ কি চমৎকার সময়টি তুমি বেছে নিয়েছ আমার স্মরণ করবার জন্যে)।

তুমি আমায় লিখেছ যে, জায়েব্ মহল সাহেবা তোমায় ব্যঙ্গ করেছেন আর দ্বিতীয় পত্রে তুমি কোন স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছ। ঈশ্বর ভাল জানেন বৃত্তান্তটা মিথ্যা কিংবা কাব্য, বা সত্যিই তুমি তা দেখেছ কিনা। ওগো আমার প্রাণ, স্বপ্নের বিষয়ে তুমি মিথ্যা কথা বোলোনা, কেননা সেটি একটি বড় অভিশাপ। কবিতা রচনার হাজারো রাস্তা আছে। যাই হোক, বিচ্ছেদের জন্যে আমি উত্যক্ত হয়ে আছি আর কয়েদখানার কষ্ট এখনো রয়েছে তোমার প্রেমিকের ওপর, কিন্তু এই প্রেমিক তোমার প্রেমের জন্যে প্রসিদ্ধ।

মুন্সী আকবর আলীকে ৪০ টাকা মাস মাহিনায় নিযুক্ত করা হয়েছে।

আমি তোমাকে ৫টি রত্নের আঙটি পাঠিয়েছি।

২৭ জিল্‌কদ্, ১২৭৫। জানে আলমের বকলমে লিখিত।

পুঃ আমি একটি নব-রত্নের কণ্ঠহার তোমার জন্যে পাঠাচ্ছি। গ্রহণ কোরো এবং প্রাপ্তির কথা জানিও।

সপ্তদশ পত্র

নবাব আকলীল মহল সাহেবা, আমার বড় তারা—৯ই জিল্‌কদ্ তারিখে তুমি যে চিঠিখানি লিখেছ তল্‌বে দিল্‌কো কির্ হায় তুম্‌হারি নিশানি (তোমার কাছ থেকে আর একটি অভিজ্ঞান পেতে আমার ইচ্ছে করে।)

ওই সমস্ত সুলক্ষণ গন্তব্যস্থলের সম্পর্কে তুমি অভিজ্ঞান বা চিহ্ন বলেছ আর আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি, ওগো আমার প্রাণ, বসন্ত বাড়িটা কি নবাব জায়েব মহলের, না তোমার। আমার মনে পড়ে না যে, তোমায় আমি সেখানে কোন নিশানি দিয়েছি। যাই হোক, আমি নিজেকে শুধরে নিয়েছি আর আমি নিশ্চিত যে তুমি পেয়েছ।

২রা জিল্‌কদ্, ১২৭৫। জানে আলমের বকলমে লিখিত।

পুঃ মহম্মদ সাজ্জাদ তোমাকে তাঁর আনুগত্য জানাচ্ছেন।

অষ্টাদশ পত্র

মুম্‌তাজ জাঁহা নবাব আকলীল মহল সাহেবা, সালামৎ

তোমার চিঠি আমি পেয়েছি আর সেই সঙ্গে ১৯শে জিল্‌কদ্ তারিখে মুন্সী আকবর আলী খাঁ তকীবের লেখা গজলটি। আমার বিষণ্ন হৃদয় সুখী হয়েছে। সব পুরনো ঘটনাই আমার মনে পড়ল আর সেসব স্মৃতিতে আমি বড়ই অবসন্ন বোধ করেছি। আমাকে ছাড়া বি[illegible] করা যাবে। খোদা যদি মঞ্জুর করেন তাহলে সব কিছুই আগেকার দিনের মতন হয়ে যাবে আর তেমনি বাগিচা হবে আমাদের। আমার দুর্ভাগ্যের কথা কি লিখব এসব জিনিষের জন্যে আমি লজ্জিত। আমাদের এত রকম জিনিষ ছিল যে বিষয়ে তুমি কম লিখেছ আর এখন আমার অবস্থা দেখ। আমাকে আমার সব কাজ নিজের হাতে করতে হয়, কারণ আমার খিদ্‌মৎগারেরা আমি ডাকলে গ্রাহ্য করে না। যাই হোক, খোদার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন আর এসব তাঁরই ইচ্ছা। আশ্চর্যের নয়, যদি আমরা

দিন যায় উল্টে। ঈশ্বর শীঘ্রই তাঁর কৃপা দেখাবেন, কারণ এসবের সম্মুখীন হবার শক্তি আর আমার নেই।

জানে আলমের হুকুমে জুদ্‌-ফুকারুদ্দৌলা লিখিত।

উনবিংশ পত্র

বিখ্যাত পিয়ারীদের মুকুট আর বিখ্যাত অনুগামিনীদের মুকুট নবাব আকলীল মহল সাহেবা, শ্রীবৃদ্ধিশালিনী ও সুখী হও।

তোমার প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করবার মতন ক্ষমতা আমার কণ্ঠে নাই আর এই বিচ্ছেদ বিবৃত করবারও শক্তি আর মুখে নেই আর যদি আমার লেখনী এসব লিখতে শুরু করে ত হলে আমার বুক ভেঙে যাবে। ঈশ্বরের দয়ায় তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে আর অমর সুখ লাভ করেছি আমি। শনিবার, ৭ই জিল্‌হজ আমি মুক্তি পেয়েছি আর আমার পুরনো বাড়িতে এসে পৌঁছেছি। ওইদিন আমি সুখের ফুল পেয়েছি আর তা আমাকে দিয়েছে শক্তি আর শান্তি। তাকে 'সবে মেহ্‌রাজ্' (১২) বলাই ঠিক আর সে দিনটা যেন সুখ ভোগ করবার ঈদ। খোদা যেন এই দুনিয়ার সব দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেন।

তুমি ৫তারিখে যে চিঠি লিখেছ তা আমি পেয়েছি. আর আমার দুশ্চিন্তা মুক্ত করেছে। চিনির মতন তা মিষ্টি আর ওর লাইনগুলি ছায়াপথের চেয়েও সুন্দর আর সে লেখার প্রবাহ যেন স্বর্গের কউসরের (১৩) মতন। ঈশ্বর যেন আমাদের সেই সময় দেন যখন আমরা শীঘ্রই পুনরায় মিলিত হতে পারি। খবর সব ভাল আর আমি তোমার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

১৩ই জিল্‌হজ্‌ ১২৭৫। তোমাকে দেখতে বড় উৎসুক

জানে আলম্‌।

মীর আঘার বকলম।

বিংশ পত্র

সমস্ত কার্যকারিণী নবাব আকলীল মহল সাহেবা, তুমি সদাচারিণী, তুমি যেন প্রেমের পবিত্র কেতাব, যা সুন্দরভাবে শুরু ও সুখময় সমাপ্তিতে প্রেমের বর্ণনা করে। আমি তোমার পত্র পেয়েছি আর বিষয় আশ্‌তার সুখী হয়েছে। তার বিষয়বস্তু জেনে আমার হৃদয়ের কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটেছে। তোমায় দেখবার আমার বাসনার কথা আমি কি লিখব। বলো আর কতকাল বিচ্ছেদের যন্ত্রণা সইব। তোমার বিরহের অবস্থা আমায় সত্যি করে বলো। তুমি কি এজন্যে খুবই দুঃখিত? দয়া করে মিথ্যা বোলো না। প্রেমের পথে অবিচল থেকো। আমি আমার মেজাজের বিষয়ে কি বল্‌ব। এত দাগে চিহ্নিত আমার হৃদয়টি কেমন করে দেখাব। ঈশ্বরের নামে বল্‌ছি, আমি অধীর হয়ে আছি। ঈশ্বর যেন আমাদের পুনর্মিলিত করেন আর তিনি যেন সেই সুখের মুহূর্তকে অতি নিকট করে দেন। আমার চিঠির জবাব দিতে দয়া করে দেরি করোনা। আমার কামনার কথা খেয়াল রেখো। তোমার আসবার বিষয়ে আমি আগেই জানিয়েছি। আমার দিক থেকে কোন জবরদস্তি নেই। তুমি মুক্ত। আমার দিক থেকে কোন বাধ্য-বাধকতা আর বোঝাবার চেষ্টা নেই।

৭ই সফর ১২৭৬। মীর মহম্মদ সরদর আলীর বকলম।

বেগম আকলীল মহলকে লিখিত নবাবের পত্রগুচ্ছ এখানেই শেষ হয়েছে। আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত এই সমাপ্তি। এতদিনের উচ্ছ্বসিত প্রেম নিবেদন, অন্তরের এমন কাব্যময় উদ্‌ঘাটনের শেষে মর্মন্তুদ বিচ্ছেদের সুর অকস্মাৎ বেজে উঠেছে। প্রিয়তমা বেগমের সঙ্গে ভাগ্যহীন নবাবের এ কি চির বিচ্ছেদের পুরবী?

১। পত্রাবলীর সম্পাদক এখানে মন্তব্য করেছেন যে, নবাবের ভুল হয়েছে—টাকার হিসাব হয় ১৯৫০ টাকা।

২। মজনু লয়লার কুকুরটিকে ঠিক যেমন ভালবাসত, তার ইঙ্গিত।

৩। উর্দু কবিতায় একটি রীতি প্রচলিত আছে যে প্রেমিকারা প্রেম জানায়না, উদাসীন বা নিরপেক্ষ থাকে।

৪। অর্থাৎ প্রিয়া।

৫। মিশরের রাণী, অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপসী

৬। সলোমনের রূপসী পত্নী

৭। স্নানাগার।

৮। ধর্মীয় কোন রচনা।

৯। যিনি আখ্তারের প্রেম-কাহিনী লেখেন।

১০। দুঃখে ভরা।

১১। পিসেমশায়।

১২। সব চেয়ে পবিত্র রাত্রি। পয়গম্বর মহম্মদ এই রাত্রে স্বর্গে উপস্থিত হয়েছিলেন

১৩। স্বর্গীয় খাল, যা স্বর্গবাসীদের জন্যে জল সরবরাহ করে।

(ক্রমশঃ)

এলাহাবাদের স্মৃতি

সীতা দেবী

পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়

এলাহাবাদে আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। সেই প্রদেশে বাবার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ছিলেন। অনেককেই মনে পড়ে তবে অতি বাল্যকালের স্মৃতি যেগুলি, তা খানিক খানিক ঝাপসা হয়ে এসেছে। এঁদের একজন ছিলেন পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়। ভারি সৌম্য মূর্ত্তি সুশ্রী চেহারা ছিল, শাদা ধবধবে পোষাক আর পাগড়ী পরতেন, অনেক সময় কপাল চন্দনচর্চ্চিত থাকত। যদিও ঘোরতর সনাতনপন্থী ছিলেন, তবু আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। বাবা অনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্ম মানতেন না বলে তাঁদের বন্ধুত্বে কোনো বাধা ছিল না। বাবার কলকাতার কাজ ছেড়ে এলাহাবাদে কাজ নিয়ে যাওয়ার মধ্যে তাঁর কোনো হাত ছিল কিনা জানিনা, তবে হলেও হতে পারে। বাবা ছিলেন কায়স্থ পাঠশালা নামক এক কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে বাবার নানাকারণে প্রায়ই বিরোধ বাধত। তিনি প্রায়ই কাজ ছেড়ে দিতে চাইতেন। পণ্ডিত মালবীয় তখন মাঝে পড়ে বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। বাবাকে এলাহাবাদে ধরে রাখার চেষ্টা তাঁর সব সময়ই ছিল। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু হলেও, তাঁর মন ছিল সমাজ সংস্কারকের। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হোলীর সময় ওখানের সাধারণ মানুষরা বড় অসভ্যতা ও মাতলামি করত। পণ্ডিত মালবীয় তখন 'নির্দ্দোষ হোলী"র জন্য আন্দোলন করেন। এতে বাবার খুব সহানুভূতি ছিল।

রাজনৈতিক মতামত ও তাঁর দৃঢ় ও অনমনীয় ছিল। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের সময় দেখতাম তিনি অ-বাঙালী হয়েও বাঙালীদের সভাসমিতি ও মিছিলে মধ্যে মধ্যে যোগ দিতেন।

আয়ুর্ব্বেদের উপর তাঁর বড় শ্রদ্ধা ছিল। একবার বৃদ্ধ বয়সে শরীর সুস্থ করার আগ্রহে কবিরাজী নির্দ্দেশ-মত "কায়কল্প" পালন করেছিলেন। এতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। দুঃখের বিষয় ফল আশানুরূপ হয়নি। বেনারস হিন্দু বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁর একটি অমর কীর্ত্তি।

শ্রীযুক্ত সি, ওয়াই চিন্তামণি।

এলাহাবাদে আমরা যে বাড়ীতে বাস করতাম তখন, সাউথ রোডের সে বাড়ীটির "হাতা" (compound) ছিল অতি বিস্তৃত। তার ভিতর একটি বিশাল পেয়ারা বাগানও ছিল। ঐ ভূখণ্ডটির মধ্যে গোটা তিনেক বাড়ী। একটি পাকা দুতলা বাড়ী। একটি মাঝারি "বাংলো" ধরণের বাড়ী ও একটি ছোট বাড়ী। মাঝারি বাড়ীটাতে আমরা থাকতাম। বহু বৎসরই ছিলাম। ছোট ও বড় বাড়ী দুটিতে বার দুই তিন বাসিন্দা বদল হতে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে। একবার এলেন এই দক্ষিণ ভারতীয় সংবাদজীবি সি, ওয়াই চিন্তামণি। তাঁর প্রথম নাম দুটি আমাদের বাঙালী রসনায় খুব সহজে উচ্চারিত হত না, কাজেই আমরা ছোটরা তাঁকে "চিন্তামণি" বা মিঃ চিন্তামণিই বলতাম। তাঁর বৃদ্ধা মা, ছোটোছেলে লক্ষীরাম শাস্ত্রী ও তাঁর বিধবা ভ্রাতৃবধূ তাঁর সঙ্গেই এসেছিলেন। প্রথমা স্ত্রী

তখন পরলোক গমন করেছেন বলে শুনলাম। অচেনা মানুষ, আসবামাত্র তাদের ঘাড়ে পড়ে আলাপ করতে নেই এ ধারণা আমাদের কালে এবং আমাদের বয়সে ছিল না। বিশেষ যখন দেখলাম যে বাড়ীর কর্ত্তা এসে বাবার সঙ্গে আলাপ করছেন, তখন আমরা দুতিন ভাই বোন মহোৎসাহে নূতন প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়ে হাজির হলাম। সাদর অভ্যর্থনাই পেলাম, যদিও কেউ কারো ভাষা বুঝিনা। হাত-পা নেড়েই অনেক গল্প হয়ে গেল।

এরপর যাওয়া আসা চলতেই লাগল। চিন্তামণি প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যায় বাবার কাছে আসতেন, এবং অনর্গল কথা বলে যেতেন। তিনি তখন অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, পূজো না করে খেতেন না এবং খাওয়ার সময় কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। পরবর্ত্তীকালে একবার আমাদের বাড়ী অতিথি রূপেও এসেছিলেন তখনও তিনি রক্তপট্টবস্ত্র পরে পূজো করে আহারাদি করতেন। কিন্তু কিছু দিন পরে দেখা গেল তিনি অনেকটাই গোঁড়ামি ছেড়েছেন। তারপর আমাদের বাড়ীতেই বাঙালী হিন্দুস্থানি নানারকম বন্ধুর সঙ্গে একসঙ্গে বসে বাড়ীর মেয়েদের হাতে রাঁধা বাংলা খাদ্য খাচ্ছেন দেখা যেত।

বাবার বন্ধুদের মধ্যে চিন্তামণির মত অত কথা বলতে কেউ পারতেন না। তিনি যেন ছিলেন অফুরন্ত গল্প ও কথার ভাণ্ডার। তাঁর রসবোধও প্রচুর ছিল।

পরে তিনি "লীডার" নামক এক কাগজের সম্পাদক হন। তিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করতেন এবং এ বিষয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করতেন। চিন্তামণির এক ভাগিনেয় তাঁর medium হতেন, এবং সেই মিডিয়ামের সাহায্যে তিনি পরলোকগত আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতেন। গোখলের আত্মা নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে অনেক এমন ভারতীয় আছেন যাঁরা আর দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করবেন না। মিডিয়ামের সাহায্যে প্রাপ্ত গোখলের বাণী বলে তিনি "লীডার"এ কোনো কোনো প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

বহুকাল পরেও বাবার সঙ্গে এঁর পত্র ব্যবহার চলত। আমাকে "লীডারে" লিখতে বলতেন। আমার বড় একটা উপন্যাস নিজের কাগজে আগ্রহ করে ছাপিয়েও ছিলেন।

পণ্ডিত তেজবাহাদুর সাপ্রু।

সাউথ রোডের বড় বাড়ীটায় ভাড়াটে হয়ে এলেন একবার পণ্ডিত তেজবাহাদুর সাপ্রু। তাঁর পিতা এবং পিতামহ তখন জীবিত। মস্তবড় বিরাট পরিবার। তেজবাহাদুর তখন যুবক, কিছুকাল আগে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছেন, পুরো সাহেবী চাল-চলন খুব সেজেগুজে গাড়ী চড়ে কোর্টে বেরোতেন। তারপর ফিরে এসে বাড়ীর টেনিস কোর্টে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে টেনিস খেলতেন অনেকক্ষণ ধরে। তাঁকে বাড়ীতে খুব বেশী সময় আমরা দেখতাম না। কিন্তু বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ের কৌতূহল সদা জাগ্রত রাখবার মত মানুষ ঢের ছিল। এক ত মানুষগুলো সবাই ফরসা ও দেখতে ভাল। তদুপরি তাঁরা ছিলেন বেশ ধনী, তাঁদের চাল-চলনও সেই অনুযায়ী ছিল। আশেপাশে যারা এতকাল ছিল, তাদের সঙ্গে অনেক তফাৎ।

আমরা এঁদের বাড়ীতেও প্রবেশের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। তেজবাহাদুরের পত্নীর আশ্চর্য্য ফরশা রং এবং অলঙ্কারবাহুল্যের কথা এখনও মনে পড়ে। সাপ্রু সাহেবের পিতামহ ও পিতামহীকে দেখে মনে হত যেন হাতীর দাঁতের খোদাই করা পুতুল। সব চেয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন তেজবাহাদুরের পিতামহাশয়। খুব লম্বা চওড়া মোটা মানুষ। সকাল থেকেই বারান্দার একটা চৌকি নিয়ে চেপে বসতেন, সহজে নড়তেন না। গলা ছিল ভারী ও গুরুগম্ভীর, মেজাজ ছিল চড়া। সজোরে চীৎকার করে যখন চাকরদের বাজারের ফর্দ্দ দিতেন, "এক সের করেলা, দুই আনাকে পান, আধসের গাজর" ইত্যাদি তখন প্রতিবেশী শিশুদের কাছে সেটাই একটা তামাশা ছিল। দু-চারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে নকল করত

ভদ্রলোকের একটি ধবধবে সাদা গাভী ছিল, সে এত আদুরে ছিল যে নির্বিচারে সকলের ঘরে গিয়ে ঢুকত। তেজবাহাদুরের পিতামহ শান্ত, সুশ্রী, চুপচাপ মানুষ ছিলেন।

ওঁদের সম্বন্ধে একটা ঘটনা এখনও মনে পড়ে। এলাহাবাদে এই সময় ঐ পাড়ায় একটা ব্যারাক ছিল ইংরেজ সৈন্যদের। চাকররা বলত "গোরা বারিক্"। গোরারা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের গাড়ী ব্যবহার করত কিন্তু পয়সা দিতে চাইত না। এই কারণে গাড়োয়ানরা তাদের উপর চটা ছিল। একদিন রাগারাগি চরমে উঠল। আমরা শুয়েছি খেয়েদেয়ে এমন সময় বাইরে একেবারে দাঙ্গা বেধে গেল। ভীষণ চেঁচামেচি, মারামারি। আমাদের বাড়ীর সামনের বারান্দা অবধি তার ঢেউ এসে পৌঁছল। তখন আর দরজা খুলে কেউ বেরোল না। পরদিন সকালে উঠে দরজা খুলে দেখা গেল বারান্দা রক্তের রেখায় চিহ্নিত, সে দাগ রেল লাইন পর্য্যন্ত গিয়েছে। পাশের বাড়ীতে রাত্রে তেজবাহাদুর সাপ্রু মহাশয়ের বাবার ঘর খোলা ছিল। গাড়োয়ানদের লাঠির ঘায়ে জর্জ্জরিত দুজন গোরা তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর কোলের উপর শুয়ে পড়ে। তিনি নির্ভীক মানুষ ছিলেন, সাদা কালার তফাৎ না করে দুই হাত দিয়ে শরণাগত দুজনকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। ক্রুদ্ধ গাড়োয়ানরা তাঁর হাতের উপর বাড়ি মারে। তবুও তিনি দুজনকে ছাড়েননি। হাত সারতে ঢের দিন লাগে। গাড়োয়ানদের কঠিন শাস্তি হয়। গোরাদের কোনো শাস্তি হয়েছিল কিনা মনে নেই।

লালা লাজপৎ রায়।

লালা লাজপৎ রায়ের কথা আমরা তখন খুবই শুনতাম। অদম্য সাহসের জন্য তখন থেকেই তাঁকে "পাঞ্জাব কেশরী" বলে ডাকা হত। কংগ্রেসের অধিবেশনেই তাঁকে প্রথম দেখি। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা করতে বার দুই আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। তখন বেশ সুস্থ ও সবল চেহারা ছিল। আমরা তাঁকে দেখবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি ভিতর বাড়ীর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করতে যাওয়ায় তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অত্যন্ত নীচু হয়ে বার বার আমাদের নমস্কার করতে লাগলেন, যদিও আমরা তাঁর নাতি-নাতনীর বয়সী। মুখে একটা আশ্চর্য্য বিনীত হাসি ছিল। তারপর বহু বৎসর আর তাঁকে চাক্ষুষ দেখিনি, যদিও তাঁর কথা কাগজে সব সময়েই পড়তাম। তারপর আমার রেঙ্গুন প্রবাসের সময় আবার তাঁর দেখা পাই। আমি যে ফ্ল্যাটে থাকতাম, তার পাশের ফ্ল্যাটে একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি আইনজীবি ছিলেন বোধ হয়। তাঁদের সঙ্গে লালাজীর আলাপ ছিল। লাজপৎরায় রেঙ্গুনে এসেছেন শুনে তাঁরা তাঁকে খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি সেইখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমাদের যে ছোট বেলায় দেখেছেন তা তাঁর মনে আছে দেখলাম। বাবার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন "তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারলে খুব খুশী থাকেন, আমি অত ঘুরতে পারিনা।" এলাহাবাদে তাঁকে যেমন দেখেছিলাম সে চেহারা আর ছিলনা। অনেক রোগা আর ভগ্নস্বাস্থ্য মনে হল। এরপর আর তাঁকে দেখিনি।

গণ্ডোয়ানার ডাক

তুষারকান্তি নিয়োগী

মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনী তথা সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য এক লোভনীয় কল্পরাজ্য, অলকাপুরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন :—

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ,
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি।

শুনে বড় লোভ হয়, রাজ্যে পাড়ি দিতে মন চায়, কিন্তু নেহাত মানুষ! ওই রাজ্যে যাওয়ার জন্য আজও কোন স্পুটনিক পাওয়া গেলনা। গেলে ভালই হত, কেননা ওই রাজ্যে আনন্দ ছাড়া চোখের জল পড়েনা, যৌবন ভিন্ন বয়স নেই, প্রণয় ভিন্ন কলহ নেই—এমন আরও কত কি!

কিন্তু আমাদের শহরে মানুষদের হয়েছে এক জ্বালা—এমন কোন স্থান নেই যেখানে মনটাকে নিয়ে গিয়ে একটু ভারমুক্ত করব, দু'দণ্ড অনন্ত নীলকে দেখব প্রাণভরে, শুধু কাজ আর কাজ—এই কাজের চাপে মনে জেগেছে এক অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা, যে ব্যাকুলতা দিয়ে ইটখোলা বাড়ীর তাল ভেঙে পাহাড়টা উঁকি মারে সুদূর নীলে। ভেবে চিন্তে ঠিক হল এ পরিবেশ থেকে একটু ছুটি নেবার—দিলাম ছুট শহরের ঐ কর্মব্যস্ত ঘর্মক্লান্ত পরিবেশ থেকে দূরে বহুদূরে সুদূর পাহাড়, সবুজবন আর ছোট্ট স্রোতস্বিনীর তীরপ্রান্তে। কুণ্ঠিত মন ঘুড়ীর সুতো গুটিয়ে ফেললাম যুক্তির লাটাইতে। কবির কল্পনা ও নৃতাত্ত্বিকের যুক্তিদৃষ্টি হাত মেলাল।

স্থান মধ্যভারতের কোন এক গণ্ডগ্রাম—এককালের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'গণ্ডোয়ানা'। অধিবাসীরা গোণ্ড, আদিবাসী [illegible]দের পাতায় যাদের কীর্তিকলাপ বীরত্ব আজও তাজা অশিক্ষিত (কুশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নয়) বর্বর আদিবাসী, সভ্যজগতে এত স্থান থাকতে, এত মানুষের জীবন লীলা জীবনমেলার ভীড় থাকতে হঠাৎ গোণ্ডদের বা গণ্ডোয়ানার ডাক কেন এল কানে? এও কি এক প্রকৃতিমুখীন পলায়নী বৃত্তি? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই, তবে কৈফিয়ৎ এইটুকু যে শিক্ষিত শহর-মানস মাঝে মাঝে শান্তি খুঁজতে যায় গণ্ডগ্রামে—আমাদের ক্লান্ত হৃদয় তাই পাড়ি দিল গোণ্ড পল্লীর সীমানায়। গোণ্ডদের ইতিহাস বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কেননা সে সব কাজ সাগ্রহে করবেন ইতিহাস-বেত্তা পণ্ডিতজন—তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনায়নের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার ভারও আছে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীর ওপর। আমরা শুধুমাত্র এই আদিবাসী মানুষগুলির জীবনরসাসক্তির একটি ছোট্ট ছবি তুলে ধরব, উল্লেখ করব কয়েকটি গোণ্ড-গীতির যা তাদের জীবনরসরসিকতারই উপভোগ্য দৃষ্টান্ত।

এককালে এই গোণ্ডদের মানসম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি সবই ছিল। তারা আজও নিজেদের পরিচিত করে রাবণ রাজার সন্তান বলে। কোন সময় কোন এক বিশেষ কারণে তারা দক্ষিণদেশ ছেড়ে উত্তরে রওনা হয় এবং গোদাবরীর তীর ঘেঁসে বাস্তারের পাহাড়গুলোর গায় গায় নিজেদের ছেয়ে ফেলে—তারপর তাদের দেখা যায় চেতুল, ছিন্দওয়ারা, মান্দলা, চান্দা ও উত্তরের নানা জায়গায়—ইতিহাসে যে সব জায়গার নাম পাওয়া গেছে "গোণ্ডয়ানা"। ধনে জনে বলীয়ান গোণ্ডদের কথা মোঘল সম্রাট আকবর বা পরাক্রান্ত মারাঠাদেরও অবিদিত ছিলনা। আকবরের সৈন্যসামন্ত পরাজিত গোণ্ডদের দুর্গে কলসী কলসী সোনা ও মূল্যবান ধাতু এবং হাতীশালে হাজারের ওপর হাতী পেয়েছিল।

সেই প্রতাপ প্রভাব ; শুধু আছে একদল গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের একটা সমাজ। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর কোন একটা ভাষায় ওরা কথা বলে, বাস করে ছিন্দওয়ারার দূরগ্রামে যার হাওয়ায় হাওয়ায় ম্যালেরিয়ার বিষ,—চেতুল নদীর ধারে ধারে, আর বালাঘাটের সবুজ শালবনের ফাঁকে ফাঁকে—দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেনোই পাহাড়ের সার।

কাঁচামাটি দিয়ে ঘর নিকোয় ওরা, বাঁশ দিয়ে দেয় বেড়া আর চাল ছেয়ে দেয় খড়ে ; খাবার জোগাড় করতে হয় মাঠের কাজ করে, আর মাতা বসুমতী যখন অপারক হন তখন ওরা যায় শহরে, সভ্যমানুষের জগতে দিনমজুর খাটতে—যা পায় তাতে একবেলা উপোস না করলে ওদের চলেনা। ওরা খায় খুব খারাপ চালের ভাত, সঙ্গে নেয় বনবাদাড়ে পাওয়া ফল পাতা, আর ভালভাগ্যে বনদেবীর দয়ে কখনো কখনো জোটে মাংস।

দেখতে ওরা বেঁটে, গায়ের রঙ ওদের কালো—ওরা শীর্ণ কিন্তু অসম্ভব সহ্যশক্তি ওদের—কেউ কেউ এরই মধ্যে সুন্দর হয়ে ওঠে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে। কিন্তু এই অভাব অনটনা এই ক্লান্তি ওদের জীবনরসে অরসিক করেনি—জীবনকে ওরা প্রবলভাবেই ভোগ করতে জানে। ওরা সব কাজই ধীরেসুস্থে রয়ে বসে করতে ভালবাসে—কাজপালান স্বভাবীদের ওদের দেখে মন্দ লাগবেনা। কোন একটা ছুতো, ওজোর পেলেই ওরা কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে এদিক ওদিক, কথনো নদীর ধারে বসবে। বড় সরল ওরা কিন্তু নম্র, নির্ভীক—রঙ্গতামাসা বোঝে, বোঝাতে পারে—প্রাণে আছে উল্লাস, অফুরন্ত স্নেহ, আর তাই দিয়েই জীবনের বাহ্যিক দারিদ্র্যকে ভুলতে চায় ওরা, জীবনটাকে দেখতে চায় ছোট্ট একটা লিরিকের মত—অল্পেই শেষ কিন্তু অসীম ব্যঞ্জনা আছে তাতে।

জীবনটা বড় ছোট সেটা ওরা জানে—আর মৃত্যুকে যে মিছে ভয় বৃথা সে জ্ঞান ওদের যে কোন শিক্ষিত মানুষের, সভ্যতাগর্বী মানুষের চেয়ে কম নয়; কিন্তু ছোট্ট হলেও জীবনের শেষবিন্দু পান করতে ওদের নেই কোন দ্বিধা। পূজা ওদের মধ্যে বেশী নেই—বলতে গেলে দেবতাধর্মের প্রতি যেন ওদের স্বভাব-অনীহা। যদিও কখনো পূজা করে তবে তার ভার দেয় "বাইগা" পুরুতের ওপর, অথবা "বাইগা" না পাওয়া গেলে ডাকে "প্রধানকে"—কিন্তু নিজেরা ওসবের বড় একটা ধার ধারেনা। কিন্তু সে সব যাই হোক—শরীরে ওদের রক্ত আছে, আছে রক্তের তেজও। চেতুল নদীর ধারে ঘুরে বেড়ালে হামেসাই বুড়ো "গোণ্ডকে" দেখে যাবে যার ঘাড়ে ভুরিপরিমাণ বোঝা—কিন্তু হাঁপায়না সে। গোণ্ড মেয়ের চলনভঙ্গী শহুরে চোখকে থ' বানিয়ে দেবে—যেন রাজকুমারী চলেছে ; গর্বিত পদক্ষেপ, অঙ্গের দোল দেখে নেশা ধরে যাবে সভ্যতার বোঝা বয়া মানুষের চোখে।

সেনোই পাহাড়ের ধারে ধারে ঘুরে এবার একটু ভেতরে আসা যাক, ছোট ছোট গোণ্ডপল্লী—রাত নেমেছে আঁধারের কালো ঘোমটা পরে; মশাল জ্বালিয়ে জড়ো হয়েছে গোণ্ডমানুষের দল—আছে বুড়োবুড়ি, যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী—এবার ওদের নাচ হবে আর হবে গান। এই নাচগানের মধ্যেই আছে ওদের জীবনরসাসক্তির অপূর্ব ব্যঞ্জনা—নাচে গানে সারাটা রাত কাবার করে ওরা, জীবনকে যেন কুরে কুরে ভোগ করতে চায় ওরা নেচে গেয়ে, উল্লসিত আনন্দে। প্রকৃতপক্ষে নাচগান তাবৎ আদিবাসীদেরই জীবনায়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জীবনমন্ত্রের স্বভাবব্যঞ্জনা ওদের লীলায়িত নৃত্যে, ছন্দিত গীতে। সুরে সুর মিলিয়ে অঙ্গকে বিচিত্র ভঙ্গীতে লীলায়িত করে ওরা নাচে। এই নাচের মধ্যে হয়ত সূক্ষ্মকারুকলার সন্ধান কোন নৃত্যসমালোচক পাবেন না, কেননা এ নাচকে মনিপুরী বা ভারতনাট্যমের কোন শাখাতেই ফেলা যাবেনা। এ নাচ আকাশবাণীর রঙ্গসূচীতে প্রদর্শনী হিসাবে দেখান যাবেনা, কিন্তু সত্য যে এ নাচের প্রাণ আছে। জীবন আনন্দে ভরপুর হয়ে সুখদুঃখ ভুলে ওরা নাচে, গেয়ে ওঠে—কথা সঁপে দেয় সুরে, দেহভঙ্গীর দোল রূপান্তরিত হয় দেহশিল্পে। এই নাচ ওরা নাচে—জগৎ ভুলে ওরা নাচে, প্রাণ খুলে ওরা গায়—অপরিচিত অতিথিকে করে মুগ্ধবিস্মিত,কিন্তু প্রকাশের কোন ভাষা থাকে না। ওরা গায় গান—জীবনের খুঁটিনাটি তথ্যচিত্রের থেকে নেওয়া এইসব গানের ভাষা। এইগান কখনো কথাহারা হয়ে ব্যঞ্জনায় রঞ্জিত হয়—কখনো

শব্দচিত্র বিস্তার করে উচ্চকাব্যের গণ্ডিতেও চলে যায়। এইসব কবিতায় হয়ত তেমন কোন ছন্দ নেই, নেই শব্দ-বিন্যাসের চাকচিক্য—চোখে পড়তেও পারে প্রসঙ্গবিন্যাসের ত্রুটি। নন্দনতাত্ত্বিকের কঠোর সমালোচনার বেড়া পেরোতে হয়ত এগুলি পারবেনা, কিন্তু কাব্যে নিছক ভাবের, লালিত্যের যে একটা প্রধান স্থান আছে, সেই আলোকে দেখলে এগুলির সৌন্দর্য্য সহজদৃষ্ট হবে। ছোট ছোট কবিতা সব—ভাব তাদের নম্রনিবিড়, নরমপেলব, জীবন-বেদনায় স্নিগ্ধআবেদন ওরই মধ্যে ধরা দিয়েছে। জীবনের সবরকম পরিস্থিতি নিয়েই গোণ্ডরা তাদের গান বা কবিতা সৃষ্টি করেছে। এই গানগুলির মধ্যে কাব্যোৎকর্ষে ও জীবনরসিকতায় অপূর্ব গোণ্ডপ্রেমগীতি। প্রেমের গভীরতা এবং সেই প্রেমের আনুসঙ্গিক নানাভাব, যা নিয়ে সাহিত্যিক দার্শনিক শিল্পী এমনকি মনোবিজ্ঞানী সকলেই করেন আলোচনা রচনা ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে, তা ওদের সাদামাটা কবিতায়, ছোটছোট লিরিকে, গানে অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপমা অলংকার চিত্রকল্প অনুসঙ্গের জাল না ফেলে সহজ দৃষ্টি নিয়ে ওদের কাব্য-তটিনীর তীরে বিশ্রাম নিলে ভাবমীনগুলির সচ্ছন্দবিহার অপূর্ব উল্লাস সহজে চোখ এড়াবেনা। গোণ্ডদের গান বা কবিতার সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমরা ওদের "গোটুল" সম্পর্কে দু এক কথা সংক্ষেপে বলে নিতে চাই।

গোণ্ডদের সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ওদের 'গোটুল' সম্বন্ধে আলোচনা অপরিহার্য্য। গোণ্ড জীবনায়নের একটি প্রধান আকর্ষণ ওদের "গোটুল"। "গোটুল হল অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের মিলনস্থান। এই জাতীয় মিলনস্থান ছোটনাগপুরের বিভিন্ন আদিবাসী ও ভারতের নানা স্থানের আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের 'হো' রা এইজাতীয় আবাসস্থলকে বলে "গীতিওরা" ওরাওঁরা বলে "জোনকেরপা," আসামের নাগারা বলে মোরাঙ। তবে নাগাদের যুবক যুবতীদের জন্য স্বতন্ত্র মিলন স্থান নির্মিত হয়—ছেলেদের স্থানকে বলে 'মোরাঙ, মেয়েদের মিলনস্থানকে বলে "ইও"। গোণ্ডদের এই মিলনস্থানকে বলে গোটুল ঘরী অথবা সংক্ষেপে গোটুল। গোণ্ডদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর শাখা-উপশাখা আছে। সব শ্রেণীর গোণ্ডদের মধ্যে এই গোটুল দেখা যায়না, যেমন মান্দলার গোণ্ডরা কোনরকম গোটুল নির্মাণ করেনা। তবে গৈত্রা, মারিয়া মুরিয়া ইত্যাদি গোণ্ডদের সমাজ-জীবনে "গোটুলে"র প্রচলন ও প্রভাব ব্যাপক। গোটুলে অবিবাহিত যুবক যুবতারা নির্দ্ধিধায় মেলামেশা করতে পারে বলে তাদের ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায় এবং বিবাহের পূর্বসূচনা প্রেম ভালবাসার সঞ্চার পছন্দমত পাত্রপাত্রী নির্বাচন ব্যাপার ইত্যাদি এখান থেকেই হয়ে থাকে। সামাজিক প্রয়োজনে, বিবাহযোগ্য বা যোগ্যা পাত্রপাত্রী নির্বাচনের স্থান হওয়া ছাড়া, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে ও নানা ব্যাপারে গোটুলের অবদান অনস্বীকার্য। "মুরিয়া" এবং 'মারিয়া' গোণ্ডদের গোটুল ব্যবহারের ওপর দৃষ্টি দিলে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্য অর্থবহ হবে। মুরিয়াদের গোটুলগুলি বিশেষ ভাবে যুবক যুবতীদের মিলনস্থান হওয়ায় বিবাহ ও যৌনস্বভাবের প্রয়োজন ও চর্চামূলক দিকের পটভূমি হিসেবে বিরাজ করে। অপরপক্ষে মারিয়াদের গোটুল বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়জীবনের সমস্যা-সমাধানের প্রয়োজনে লাগে। নির্দিষ্ট বাসস্থানে স্থান-সংকুলান না হলে যে কোন মারিয়া গোণ্ড গোটুলে শোয়া থাকার প্রয়োজন মেটাতে পারে। এছাড়া মারিয়ারা গোটুলে নানাবিধ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করে, নানাবিধ নিষেধাচার পালনের সময়ও গোটুলে অবস্থান করে। বিবাহ-উপলক্ষে গোটুলে যুবক যুবতীরা সমবেত হয়—নৃত্যগীত আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়, কিশোর যুবকদের সমাজজীবনে প্রবেশের ও প্রতিষ্ঠার নানাবিধ দায়িত্ব কর্তব্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা এই গোটুলেই হয়—এইভাবে গোণ্ডসমাজজীবনের সঙ্গে গোটুল ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকে।

এককথায় গোটুল আদিবাসী গোণ্ডদের শিক্ষা, সমাজ-জীবনের নানা আচারপালন, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ আচারপালনের রঙ্গভূমি—গোণ্ডদের যৌবনলীলাকুঞ্জ এই গোটুল।

বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী ভেরিয়ার এলউইন সাহেব তাঁর Songs of the forest গ্রন্থে ওদের অর্থাৎ গোণ্ডদের গান-

গুলির একটি সুন্দর সংকলন করেছেন ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে। এখানে তার থেকে কয়েকটা প্রেমগীতির মাতৃভাষায় রূপান্তরিত রূপ উপস্থিত করে আমাদের স্বল্পাবকাশের শেষ প্রহর ঘোষণা করব।

গোণ্ডপ্রেমগীতি —

নায়কের উদ্দেশ্যে রচিত গোণ্ডকবির প্রেমগীত,

(১) আসবে যাবে ভিন্নপথে

মনের পাতায় ছবি এঁকে

পরাণ প্রিয়া উঠবে ফুটে আঁখির নজরে।

আদিবাসী গোণ্ডাদের মধ্যে নরনারীর মেলামেশার অবাধগতি। মেয়েরা বিয়ের আগে নানাভাবে নানা পুরুষের সঙ্গ ও সাহচর্য্য লাভ করে, এমনকি প্রাক্‌বিবাহ সহবাসের ফলে সন্তানসন্ততিও হতে পারে। বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার ও বাসকরার সম্পর্কে কোন সামাজিক আপত্তি নেই। পূর্বে উল্লিখিত গোটুলগুলি ত এই মিলনেরই রমণীয় স্থান—সেখানে বিবাহিতদের তেমন স্থান নেই, কোন বিবাহিত কাটাতনা সেখানে রাত। যাই হোক এই অবাধ মেলামেশার পশ্চাতে সবসময়ই গোণ্ড যুবতী বা যুবকের সতর্ক দৃষ্টি থাকে মনের মানুষের খোঁজে। একটি গোণ্ড মেয়ে একই সঙ্গে অনেকগুলি পুরুষের সঙ্গে মিশলে বা কথা বললেও তার মনে আপন জনের জন্য আলাদা একটি বিশেষ "সযত্ন প্রেম" তথা 'স্নিগ্ধ মনোভাব' গোপন করা থাকে—গোণ্ড মেয়ের বিশেষ পুরুষ কেন্দ্রীক মনোভাব ঠারেঠোরে চলন-বলনের মাধ্যমে কেবল উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছেই প্রকাশ পায়, প্রেমের ব্যাপারে তথাকথিত সভ্যদ্বন্দ্বের অবকাশ গোণ্ডদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায়না। যাই হোক একবার যখন গোণ্ডনারী মনের মত পুরুষের সন্ধান পায় তখন সে সেখানে বাস করে শান্তিতে, স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে তার ছোট্ট লতায় ঘেরা পাতায় ছাওয়া শ্যাম বনানীর কুঁড়েতে—তখন তার চাঞ্চল্য দমিত, চাপল্য স্তিমিত—মাতৃত্বের মাধুর্য্যে তার সারা অঙ্গ ওঠে ভরে।

নারীর কণ্ঠে পুরুষ দয়িতকে লক্ষ্য করে তিনটি ভিন্নাবস্থার প্রেমগীতির উদাহরণ—

(২) দুয়ার বাহিরে রয়েছি দাঁড়ায়ে আমি

তবুও বারেক ডাকিলেনা কেন তুমি !

ফিরে যদি যাই তোমাকেও যাব নিয়ে

আমার হিয়ায় গেঁথেছি তোমার হিয়ে।

বহুদিন পরে পুরোনো পথে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল একটি গোণ্ড মেয়ে। সামনে পাথরের পাকা বাড়ী—জানল যে এখানে তার পূর্বদয়িত বাস করে যার সঙ্গে একদিন চেতুল নদীর ধারে কত ঘুরে বেড়িয়েছে, কত কথা কয়েছে গেয়েছে কত গান। স্মৃতি রোমন্থনের অবশ মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল কটি পঙ্‌ক্তি :—

প্রস্তর খচিত গৃহ নির্মিয়াছ তুমি

তোরণেতে শোভা পায় প্রস্তরের সার,

একটি রজনী তরে তব গৃহে ঠাঁই

যদি পাই

দূরান্তে চলিয়া যাব রজনী প্রভাতে।

মানী নায়ককে কাতর অনুনয় করে গোণ্ডমেয়ে—বহুদূর থেকে সে এসেছে, অনেক সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে, এখন দয়িত তাকে যদি গ্রহণ না করে তবে তার জীবনই বৃথা। কণ্ঠে করুণা বরুণা ঢেলে তাই সে গেয়ে ওঠে—

তব প্রেম আনিয়াছে মোরে—

পারায়ে দুরন্ত নদী

অতিক্রান্ত করে বনাকীর্ণ সুউচ্চ পাহাড়।

প্রিয় মোর—

ঠেলোনা আমায় ! শুধু দুটি কথা বলো।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

একুশ

ধরা পড়ল দিবাকরের কাছে।

টকটকে লাল হিল্‌ম্যান মিংক্‌স্ গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল দিবাকর, স্টোর রোডের একটা দেবদারু গাছের নীচে। তারপর নেমে এসে রিক্‌শ থামিয়ে নির্ম্মলাকে বলল, "আপনি এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়বেন ভাবিনি। আমি ত আপনাকে আনতেই যাচ্ছিলাম।"

নির্ম্মলা বলল, "আমাকে আনতে কেন?"

দিবাকর বলল, "কি করব, বাবার হুকুম। বললেন, প্রথম দিনটা ওকে লোক পাঠিয়ে আনাবার ব্যবস্থা কর। এদিক্‌কার পথঘাট হয়ত ওর জানা নেই।"

নির্ম্মলা বলল, "তা অবশ্য নেই, কিন্তু খুঁজে বের ক'রে নিতে নিশ্চয় পারতাম।"

দিবাকর বলল, "আচ্ছা, এখন নামুন ত। এতদূরের পথ রিক্‌শ করে যাচ্ছিলেন, সময় কত লাগত জানেন? আপনি বুঝি ট্রামে বাসে চড়েন না?"

নির্ম্মলা বলল, "ছোটমুখে বড় কথার মত শোনাবে, কিন্তু ট্রামে বাসে চড়তে আমার একেবারেই ভাল লাগে না সেটা ঠিক।"

দিবাকর বলল, "কারুরই লাগে না, এর আর ছোট মুখ বড় মুখ কি।"

শরতের একটি সুন্দর স্বচ্ছ প্রভাত, মেঘহীন নির্ম্মল আকাশ, ঠাণ্ডা নয় গরমও নয় এমন একটি সুখস্পর্শ ফুরফুরে বাতাস বইছে। কলকাতার এদিক্‌কার রাস্তাগুলি নিয়মিত ঝাঁট দেওয়া হয়, ধোওয়া হয়, নরম আলোয় তকতক করছে সেগুলো, ঝকঝক করছে দুপাশের সুবিন্যস্ত সুন্দর বাড়ীগুলির জানালার কাঁচ।

দিবাকরের গাড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে নির্ম্মলা বলল, "এই কাগজটা পড়তে পড়তে যাচ্ছিলাম, তা দিয়ে আমার মুখটা ত ঢাকা ছিল; আমাকে চিনলেন কি ক'রে আপনি?"

লাল ষ্ট্র্যাপ দেওয়া স্যাণ্ডাল-পরা নির্ম্মলার দুটি পায়ের দিকে দেখিয়ে দিবাকর বলল, "ঐ আঙুলগুলি চেনা হয়ে গিয়েছে।"

নির্ম্মলার মুখে কি হিলম্যানের রঙের প্রতিফলন?

সদ্য পাট ভাঙা লালপাড় টাঙ্গাইলের শাড়ী নির্ম্মলার পরণে, গায়ে লাল ব্লাউজ, জুতোর লাল ষ্ট্র্যাপ আর মুখে লালের উচ্ছ্বাস, সব মিলিয়ে যেন অরুণ-আলোর একটি উৎসব।

দিবাকরের কিছু ভাববার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না, যদি থাকত ত ভাবত, একটি তুলনাহীন সার্থক পরিপূর্ণ প্রভাত এসেছে আজ তার জীবনে।

নিজে ড্রাইভ ক'রে এসেছিল, ড্রাইভারের পাশের বাঁ দিক্‌কার দরজাটা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে নির্ম্মলাকে বলল, "উঠুন।"

নির্ম্মলা পিছনের একটা দরজা খুলে উঠে পড়ল গাড়ীতে। বলল, "আমি এইখানে বসছি।"

সব ক'টা আলো একসঙ্গে জ্বলছিল, একসঙ্গে দপ্ করে নিবে গেল।

নিঃশব্দে গাড়ী চালিয়ে চলল দিবাকর সারা পথ।

একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, একটাও কথা বলল না নির্ম্মলার সঙ্গে।

এ নিয়ে দুঃখ করবে কেন নির্ম্মলা? একাধিক দিক্ থেকেই বলা যায়, নিতান্ত প্রাণের দায়েই তার দিবাকরকে একটু দূরে দূরে রেখে চলতে হবে। এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি তার হয়েছে, যে, তা যদি সে না করে ত এমন একটা প্রবল আবর্ত্তের মাঝখানে গিয়ে পড়বে, যার থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বেরিয়ে আসা এ জীবনে আর তার সাধ্যে কুলোবে না। দুরপনেয় দুঃখ ভিন্ন আর কিছু তার অদৃষ্টে জুটবেও না সেখানে। নিজেকে লুকিয়ে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে আর যাই করা যাক, প্রেম করা চলে না। আর এপথে বেশী এগুলে ধরা পড়ে যাওয়া অনিবার্য্য।

প্রেম করা মাথায় থাক, জগন্নাথ জেল থেকে খালাস পেয়ে বেরিয়ে এলে বস্তির বাড়ীটাতে ফিরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে সে।

রাস্তার পশ্চিমদিকে গেট দিয়ে ঢুকে পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত বেশ বড় একটা কারখানা, তার সামনের লাল রাস্তাটা প্রায় একই মাপের বড় একটা দীঘির ধারে ধারে ঘুরে গিয়েছে। দীঘির ওপারে ফলফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা প্রাসাদের মত বাড়ী।

গেট দিয়ে ঢুকবার সময় নির্ম্মলা দেখল, লেমন-ইয়েলোর ওপর নীল রঙের ইংরেজী হরফে লেখা কারখানার নাম "বেলেঘাটা ষ্টীল ফেব্রিকেশন ওয়ার্ক্‌স্"। জগন্নাথকে মনে পড়তে লাগল তার। তার কারখানার সাইন বোর্ডটাও ছিল হলদের ওপর নীল ইংরেজী হরফে লেখা, আর সেটাকে কি ভালই না বাসত সে।

দিনকরের শোবার ঘর থেকে কিছু কিছু জিনিষ সরিয়ে দিয়ে অন্য আসবাবগুলির পারস্পরিক সংস্থানের কিছুটা অদল-বদল ক'রে নির্ম্মলা পাশের চওড়া ঢাকা বারান্দাটায় বেরিয়ে এল। দিনকর সেখানে একটা ঈজি চেয়ারে ব'সে সেদিনকার খবরের কাগজ দেখছিলেন। তাঁর পাশে, তাঁরই আমন্ত্রণে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অনেক গল্প করল নির্ম্মলা। সচরাচর করে না এত গল্প কারও সঙ্গে কিন্তু দিনকরের কাছে এলে সে এমন একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, যে, মনের কিছু কিছু আবরণ তার খুলে যায়। অবশ্য গল্প যা করল তার সবটাই নার্সিং হোম নিয়ে। কি রকম সব মজার রোগীরা আসে সেখানে, কি রকমের সব কঠিন রোগ নিয়ে এসে কত রোগীরা ওখানকার ডাক্তারদের সুচিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বাড়ী ফিরে যায়, যারা রোগমুক্ত হবার পরও নানাকারণে কিছুদিন থেকে যায় নার্সিং হোমে, তাদের যে সুজন শেখাতে চেষ্টা করেন কি রকম ক'রে শুতে হয়, বসতে হয়, দাঁড়াতে হয়, হাঁটতে হয়, খেতে হয়, আঁচাতে হয়, এইসব প্রসঙ্গ।

দিনকরের কাছে বিদায় নিয়ে যাবার জন্যে উঠছে এমন সময় দিবাকর এল। তার রাগ পড়ে গিয়েছে অনেক-ক্ষণ এবং তখন থেকেই সে আসি আসি করছিল। কাজেই ঘুরঘুর করছে দেখে দিনকর ডাকলেন তাকে। সে এলে নির্ম্মলার দিকে ফিরে বললেন, "ব্যবস্থাটা কিন্তু দিবাকরের। আমার ইচ্ছে ছিল না, তুমি এতটা কষ্ট স্বীকার করবে আমার জন্যে। তা সে এত জেদ করতে লাগল যে আমি রাজী না হয়ে পারলাম না। লাভটা অবশ্য আমারই সব দিক্ দিয়ে, কাজেই ইচ্ছে ছিল না বললে লোকে শুনবে কেন? কথাটা বলছি বলে মনে ক'রো না আমি খুশী হইনি। খুব খুশী হয়েছি।"

দিবাকরের কথায় ঘোর প্যাঁচ নেই, বলল, "খুশী আমরা সবাই হয়েছি বাবা। তবে এতটাই যদি বললে তবে এটাও বল যে, তুমি শর্ত্ত করেছিলে, যদি কাউকে আসতে বলা হয় ত এ কেই বলতে হবে।"

দিনকর খুব অপরাধীর মত মুখ ক'রে বললেন, "হ্যাঁ, তা অবশ্য বলেছিলাম।"

নির্ম্মলার মুখে সলজ্জ মধুর হাসি। সেও যে আসতে পেয়ে খুশী হয়েছে সেটা বলা উচিত হবে কি না ভাবল, কিন্তু কিছুই বলল না শেষ অবধি। সে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে বুঝতে পেরে দিবাকর বলল, "বাবা, তুমি ত আজকাল আর বাইরে বেরোও না, পিসীমার কাজে ড্রাইভার কালেভদ্রে তোমার গাড়ীটা নিয়ে বাইরে যায়। আমি বলি কি, আমাদের দুজনের গাড়ীর কোনো একটাতে করে উনি আসবেন যাবেন, ওঁর যাওয়া-আসার কষ্টের খানিকটা লাঘব তাহলে আমরা করতে পারব।"

দিনকর সোজা হয়ে বসলেন ঈজি চেয়ারে, বললেন, "এ ত আমাদের করতেই হবে। ওকে তুমি গাড়ী করে আননি আজ?"

"হ্যাঁ, আজ এনেছি।"

"রোজ পারবে না, সে ত আমি বুঝি। আর সেটা করতে তোমাকে আমি কেনই বা বলব! আমার গাড়ী করে নির্মলা মা আসবেন যাবেন। যেদিন তোমার পিসীমার কাজ থাকবে সে-সময়, তুমি চেষ্টা করবে ওকে নিয়ে আসতে, ফিরে নিয়ে যেতে।"

নির্মলা যে বলেনি আসতে পেয়ে সেও খুশী হয়েছে, তার কারণ, খুশী হতে সে ঠিক পারছিল না, কি করে নিজেকে লুকিয়ে যাওয়া-আসা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে সেটা বুঝছিল না বলে। এবারে সত্যিই খুশী হল। তবে খুশীতে একটু ভয়ের ছোঁওয়া লাগল, যখন শুনল, দিবাকর বলছে, "ওদিকটায় আমার অনেক কাজ থাকে আজকাল, যখনই পারব আনা-নেওয়াটা আমিই করব।"

তাকেও তখনই কাজে বেরুতে হচ্ছে বলে দিবাকর চলল নির্মলার সঙ্গে। এবার দিনকরের গাড়ী, ড্রাইভার চালাচ্ছে। দিবাকর ড্রাইভারেরই পাশে বসল, কিন্তু, মেজাজটা বেশ ভাল ছিল বলে একটু পাশ ফিরে বসে পিছনের দিকে মুখ করে সারাপথ গল্প করতে করতে চলল নির্মলার সঙ্গে। একতরফা গল্প, বেশীর ভাগটাই তার বাবার সম্বন্ধে। বাড়ীতে দিনকরকে দেখবার কেউ নেই। দিবাকরের যখন দু বৎসরের মত বয়স তখন তার বোন পারিজাত হতে গিয়ে তার মা মারা যান। তার কিছুদিন পর থেকেই দিবাকরের বিধবা সন্তানহীনা পিসীমা তাদের সঙ্গে এসে বাস করতে থাকেন, কিন্তু তিনি দিনকরের চেয়ে বছর-দুয়েকের বড়, অর্থাৎ এখন তাঁর ছেষট্টি সাতষট্টির মত বয়স, সবদিকে নজর রেখে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ঝি চাকর কয়েকজন রয়েছে অবশ্য, কিন্তু নিজের স্বভাবের জন্যেই তাদেরও সেবা যত্ন দিনকরের ভাগ্যে বিশেষ জোটে না। নিজের যেটা দাবি, সেটাকেও অনুগ্রহের দানের মত করে নেওয়া দিনকরের স্বভাব। কখনো বলবেন না, ঐ জিনিষটা আমাকে এনে দাও। বলবেন, ওটা কি এনে দেওয়া সম্ভব হবে, কিংবা এনে দিতে কি খুব অসুবিধা হবে? পাছে কেউ কিছু মনে করে, বা কারুর আরামের কিছু ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে নিজে নীরবে নানা অসুবিধা ভোগ করেন। দিবাকরকে তিনি বলেছেন, নার্সিং হোমে নির্মলা কিরকম করে যেন বুঝতে পারত, কখন কি তাঁর চাই। যেরকম বুঝতে পারত পারিজাত।

পারিজাত ছিল আশ্চর্য্য চোখোর মেয়ে। বি-এতে হিস্ট্রি অনার্সে প্রথম হয়ে এম-এ পড়বে বলে ইউনিভার্সিটি-কলেজে ভর্ত্তি হবার দিন-কয়েক পরেই সে জ্বরে পড়ল, তারপর এই মাস-ছয়েক আগে পৃথিবীর বাতাসে শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছে সে। তার মৃত্যুতে দিনকর একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। মাস-দুই আগে একটু হার্ট অ্যাটাকের মত হয়েছিল তাঁর। সেটাকে সামলাবার জন্যেই নার্সিং হোমে গিয়েছিলেন।

গল্পগুলো এমনভাবে করে গেল দিবাকর, যেন নির্মলা তার একজন পরমাত্মীয়, কিংবা বহু পুরাতন বন্ধু, যাকে সব বলা যায় কেবল নয়, সব বলতে হয়।

গাড়ী থেকে নির্মলা যখন নামল, দিবাকর নামল তার সঙ্গে। নমস্কার করে বিদায় নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠবার আগে বলল, "আমার একটা কথা কেবল মনে হচ্ছে যেটা আপনাকে হয়ত আমার বলাই উচিত।"

নির্মলা বলল, "কি কথা, বলুন।"

দিবাকর বলল, "আমার বাবা এক-এক দিকে বেশ নাছোড়বান্দাও আছেন। এই দেখুন না, ছোট একটা কামারশাল ধরেছিলেন, সেটাকে কতবড় একটা ফ্যাক্টরি করে ছেড়েছেন। আমার মনে হয়, আপনাকেও বোধহয় সেইরকম যখন একেবার ধরেছেন, সহজে ছাড়বেন না।"

কোয়ার্টার্সের সিঁড়ি উঠতে উঠতে নির্মলা ভাবছিল এ ত বেশ মজা। একদিকে একজন বলছে, একবার ধরছি যেইকালে, আর কি ছাড়ুম? অন্যদিকে আর একজন বলছে, আমার বাবা যখন একবার আপনাকে ধরেছেন সহজে ছাড়বেন না। আমি এখন যাই কোন্‌দিকে?

সেদিনটা ছিল সোমবার। কথা ছিল বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গাড়ী আসবে নির্মলাকে নিয়ে যেতে। কিন্

বুধবার সাড়ে চারটের একটু আগেই দিবাকর এসে হাজির। একটু পরেই নির্ম্মলা তিনতলা থেকে নেমে এল খবর পেয়ে, বলল, "কি ব্যাপার? খবর ভাল ত?"

"ভাল।"

"তাহলে এত আগে এলেন যে?"

"কি করব, বাড়ীতে টেকা গেল না। চারটে বাজতেই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, নির্ম্মলা সাড়ে চারটের আসবে বলেছিল, ওকে আনতে গাড়ী পাঠানো হয়েছে? আমি যত বলি, না, উনি বলেছিলেন, সাড়ে চারটেতে ওঁর ছুটি, সাড়ে পাঁচটার গাড়ী পাঠাতে। কে শোনে কার কথা? কাজেই আসতে হল।"

নির্ম্মলা কি বলবে? বলল, "আচ্ছা, বসুন। আমি কাপড় বদ্‌লে আসছি।"

আজও দিনকরের গাড়ী নিয়েই এসেছে দিবাকর। তবে আজ ড্রাইভারের পাশের সিটে না বসে নির্ম্মলা গাড়ীতে উঠে বসলে তার পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলল, "বসব ওখানে?"

নির্ম্মলা ঘাড়টিকে কাৎ করল একটু। আর কি করবে? যাদের গাড়ী তারা কোথায় বসবে না-বসবে সেটা ত আর সে বলে দিতে পারে না?

বড় ফোর্ড গাড়ী, স্বাভাবতঃই দুজনের মধ্যে দূরত্ব রইল বেশ খানিকটা, তবু নির্ম্মলা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল, আর সেটা বুঝতে পারল দিবাকর। দু-একবার গল্প করবার চেষ্টা করে থেমে গেল সে, কারণ নির্ম্মলা একবারও তার দিকে চোখ ফেরাল না যাতে করে সে বুঝতে পারে যে গল্পটা নির্ম্মলা শুনছে। তখন মুখটাকে ঘুরিয়ে পাশের লোক-চলাচল ট্রাম-বাস্ ইত্যাদি গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে পথ অতিবাহিত করতে লাগল সে।

দিবাকরের প্রসঙ্গে সুনন্দা যেদিন বলেছিল, কি করব, he makes me mad সুরূপাদি, তারপর এক মাসও অতীত হয়নি, এরই মধ্যে মানুষটাকে মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলেছে সে। সুনন্দা ঐ রকম। দিবাকর মাঝে মাঝে আসে নির্ম্মলাকে নিয়ে যেতে, পৌঁছে দিতে, এটা এখন সে কানে শোনে মাত্র। হয়ত কখনো জিজ্ঞেস করে, "ও কি বলে?" কিংবা "আজ যে খুব সাজের ঘটা দেখলাম, কি ব্যাপার?" কিন্তু উত্তরটা শোনবার জন্যে তার যে ব্যগ্রতা কিছু আছে একেবারেই মনে হয় না।

ছ নম্বরে এক ভদ্রমহিলা এসে রয়েছেন, হেপাটাইটিসের রুগী। তাঁর স্বামীটি বেশ রসিক, দিবাকরের মত হাঁড়িমুখো খেঁকি স্বভাবের নয়। রংটা একটু ময়লা কিন্তু ছিপছিপে সুন্দর গড়ন, পোশাকে আশাকে ছিমছাম, বয়সও কম। এর যে কি দরকার পড়েছিল সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে নেবার তাও ঐ জড়পুঁটলির মত একটি জীবকে। সুনন্দা আপাততঃ এই মানুষটিকে নিয়ে একটু মেতে আছে।

নির্ম্মলা দেখে আর ভাবে, যে যায় তাকে যেতে দাও, সুনন্দার এই যে জীবনদর্শন, অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে একেই অবলম্বন করে সেও ত এগিয়ে চলেছে জীবনের পথে। বিজেতেন্দ্রের বাড়ীর লোকগুলির সঙ্গে খুবই ত ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার, কিন্তু এখন সেই লোকগুলিকে মাসান্তে একবার তার মনে পড়ে না। মনে পড়ে না শৈলবালাকে, চাঁপাবৌকে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, জগন্নাথকেও এখন সব দিন তার মনে পড়ে না।

এটাকে আশ্চর্য্যই বা সে বলে কি করে? তার নিজের বাপ-ভাইদেরই সে কওটা মনে রেখেছে? সে যে আর একটা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ, এই ভাবটা একটা নূতন পরিবেশের মধ্যে এসে দিনকের দিন দানা বাঁধছে।

তার পুরনো আমিটাকে ভুলে থাকতে যারা দেয় না তাদের মধ্যে একজন হল দিবাকর।

সে যে এসে পড়েছে নির্ম্মলার জীবনে, তাতে সন্দেহ কিছু নেই, কিন্তু তার গতি ত নির্ম্মলা পর্য্যন্ত এসে থামে না, তাকে নিয়ে যায় একেবারে নিরুপমার অস্তিত্বের মর্ম্মমূলে, যেখানে একমাত্র নিরুপমাই থাকে, নির্ম্মলা অবলুপ্ত হয়ে যায়। যে-নিরুপমা থেকেও নেই তার কাছ থেকে ত দিবাকর পাবে না কিছু, আর নিরুপমার কাছ থেকে না পেলে কিছুই তার পাওয়া হবে না। এই যে নিরর্থকতা, এই যে অসহায় অবস্থা যার পরিণতি কিছু নেই, এটাকে চলতে দিয়ে সে নিজে দুঃখ পেতে থাকলে ক্ষতি নেই, কারণ

দুঃখ পাবার জন্যেই সে জন্মেছে, কিন্তু যে দুঃখ দিবাকরকে একদিন দিতে হবে, তা সে দেবে কোন্ অধিকারে ?

দিবাকরের সঙ্গে খুব সাবধানে, খুব হিসাব করে মানিয়ে চলে সে। সাধ্যমত দূরে দূরেই তাকে রাখতে চেষ্টা করে, আবার কোথাও তার প্রতি অকারণ নিষ্ঠুরতা কিছু হয় এটাও তার অভিপ্রেত নয়। এই দুদিক্ সামলানোর কাজটা এতই কঠিন যে এই ক'দিনেই একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

ঠিক একই সময়ে অসীমারও জীবনে এমন একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে যার কথা লজ্জায় সে কাউকে বলতেও পারছে না। ছোটখাট সুন্দর একটি পুতুলের মত দেখতে, অত্যন্ত সরল প্রকৃতির নিরহঙ্কার এই মানুষটি নীরবে কি যে সহ্য করে চলেছে তা কারও জানবার উপায় নেই। রোজ যেন নিয়ম করেই দুপুরে খাবে না বলে সে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার পর তার ফেরার সময়ের ঠিক থাকছে না। কোথায় ঘুরছে, কি করছে তা সে-ই জানে। মেট্রন তাকে বকলেন, ওয়ার্ড সিস্টার সুরূপা তাকে অনেক বোঝাল, কিন্তু ফল কিছু হল না। অসীমা চুপ করে থেকেছে আর কেঁদেছে।

তখন সুজন ডাক্তার তাকে ডেকে পাঠালেন। নিজের অফিস-ঘরে তাকে বসিয়ে বললেন, 'টাকাকড়ি বা অন্য কিছুর দরকার যদি তোমার থাকে ত আমাকে বল, একটুও সঙ্কোচ করো না।"

অসীমা বলল, "দরকার হলে আপনাকেই ত বলব, নয়ত আর কাকে বলব ?"

সুজন বললেন, 'দরকার যদি থাকে ত ছুটিও নিতে পার।"

অসীমা বলল, "তাও নেব দরকার হলে।"

সুরূপার কাছে বসে কাঁদল খানিক। বলল, "তোমরা ত আমাকে রাতের ডিউটি দিচ্ছ সুরূপাদি। কাজে কোনো গাফিলি কি আমি করেছি ? কেন তাহলে উনি আমাকে ছুটি নিতে বললেন ?"

সুরূপা বলল, "প্রথমতঃ ছুটি নিতে তিনি বলেননি তোমাকে, দরকার হলে নিতে পার বলেছেন। সারারাত ডিউটি করে সারাদিন টো টো করে বেড়ালে তোমার শরীর না টি'কতে পারে এইটে ভেবে হয়ত বলেছেন।"

অসীমার মনটা তবু ভার হয়ে রইল। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা হয়ত মূলতঃ অস্বাভাবিক, যেজন্যে দু-তরফেরই ভুল বোঝাবুঝির আর অন্ত থাকে না। তার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে চান না সুজন, নয়ত যদি তাকে কাছে বসিয়ে তার পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করতেন, "তোমার কি বিপদ্ হয়েছে আমাকে বল," তাহলে উত্তরে সে হয়ত বলত না কিছু, কিন্তু তার মনটা হালকা হয়ে থাকত।

সুজন যাদের কাজে নিয়োগ করেন তাদের বিগত জীবন সম্বন্ধে যেমন কোনো কৌতূহল দেখান না, কার্য্যক্ষেত্রের বাইরে তাদের পরবর্ত্তী ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও তাই। কাজ করতে যারা আসে এতে তাদের অসুবিধা কিছু হয়, কিন্তু সুবিধাও যে কিছু নেই তা নয়।

তখন রাত অনেক হয়েছে। নির্ম্মলার ঘুম কিছুতেই আসছে না। সন্ধ্যার মুখে মলিনা এসেছিল। তারই কথা ভাবছে সে। দরজাটা বন্ধ করে বসে মরণ-মন্ত্র মারণ-মন্ত্র অনেক রকমের শুনিয়ে গিয়েছে তাকে মলিনা। হঠাৎ একসময় নিজের কাঁধে ঝোলানো শানব্যাগ থেকে একটা রিভল্‌বার বের করে নির্ম্মলার সামনে টেবিলের উপর রেখেও ছিল সে, ব্যাগের মধ্যে অন্য কি একটা জিনিষ খুঁজবার অজুহাতে। তারপর আবার প্রায় তখন তখনই এমন তাচ্ছিল্য ভরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল, ব্যাগে যেন ওটা এক-টুকরো কাপড় কাচা সাবান কিংবা বাজারের হিসাবের খাতা।

নির্ম্মলা যদিও রিভলবার আগে কখনো চোখে দেখেনি, তবু বুঝতে পারল জিনিষটা যে কি। তার বুক ধড়ফড় করতে লাগল, গলা শুকিয়ে উঠতে লাগল। একটু ইতস্ততঃ করে খুব নীচু গলায় বলল, "আপনি এই সব নিয়ে ঘুরে বেড়ান, পুলিশ আপনাকে ধরে যদি ত তখন কি করবেন ?"

মলিনা হেসে বলল, "তখন কি করুম কই কেমতে ? কুকীর্ত্তি একটা করুম-অই।"

"কি করবেন ?"

"দুই-একটারে না লইয়া কি যামু ?"

"পুলিশ আপনার পিছনে ঘোরে না ?"

"টিকটিকির কথা কইতে আছেন ? হ ! একটারে আমি চিনি। চলেন বাইরে, দেখামু।"

দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে নির্ম্মলা বলল, "রক্ষে কর বাবা ! দেখবার জিনিষ পৃথিবীতে ঢের আছে।"

শুয়ে শুয়ে এই কথাগুলিই বারবার করে ভাবছে নির্ম্মলা।

যে মেয়ে রিভলবার নিয়ে ঘোরে তার অসাধ্য কর্ম্ম কিছু নেই। নির্ম্মলাকে কি ঘোরতর বিপদের মধ্যে সে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কে জানে ?

কিন্তু মলিনাকে সে ভয় যেমন পায়, তার কথাবার্ত্তায়, তার ধরণধারণে, তার চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা মোহময়তাও যেন আছে। ভয়ের সঙ্গে মোহময়তা, যা একটা সুন্দর সাপ সম্বন্ধে মানুষ অনুভব করে, যা সে এক পলকের দেখাতে অনুভব করেছিল ঐ রিভলবারটার সম্বন্ধে। ওটাও ত ভয়ানক কিন্তু ওটার দিক্ থেকে চোখ ফেরানোও যায় না।

আর এই মোহময়তার সঙ্গে ছিল শ্রদ্ধা। এই যে রোগা পাৎলা মানুষটি একটা শান ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গুটিগুটি উঠে আসে সিঁড়ি দিয়ে, গুটিগুটি নেমে যায়, এর জীবনে নেই কোনো সুখস্পৃহা, নেই কোনো বিলাস। এ কেবল দেশকেই চিনেছে, তারই ভাবনা নিয়ে মশগুল হয়ে আছে সারাক্ষণ, তার কথা ছাড়া কথা নেই মুখে। নিজের প্রাণটা এর কাছে তুচ্ছ, হাসিমুখে দিয়ে দিতে পারে। এমন যে মানুষ, সে এসেছে মৃত্যুভয়ে পলাতকা নির্ম্মলার কাছে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে। তাকে কিছুই দেবার থাকা উচিত ছিল না নির্ম্মলার, কিন্তু ছোট শীর্ণ হাতটি বাড়িয়ে সে যা চায় তা ত দুপয়সা চার পয়সা নয় ? সে চায় প্রাণের মূল্য, যা দেওয়া নির্ম্মলার সাধ্যে নেই।

শিয়রের কাছে টেবিল ল্যাম্পটা বেড সুইচ টিপে জ্বালল নির্ম্মলা, হাত বাড়িয়ে পাশের কুলুঙ্গি থেকে একটা বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে, এমন সময় পাশের জানলার পর্দাটা সরিয়ে অসীমা ডাকল, "নির্ম্মলাদি !"

নির্ম্মলা বলল, "অসীমা, এত রাত্তিরে ? কি ব্যাপার ?"

অসীমা বলল, "ঘুমিয়ে গিয়েছ ?"

নির্ম্মলা দুচোখ বুজে টান হয়ে শুয়ে বলল, "হুঁ !"

অসীমা বলল, "এই দেখ, কি বলতে কি বলে ফেললাম। বলা উচিত ছিল, ঘুমোচ্ছিলে ?"

নির্ম্মলা বলল, "আমারও বলা উচিত ছিল, না, ঘুমিয়ে যাইনি। শোধবোধ গেছে। এস ভেতরে।"

অসীমা বলল, "তোমাকেই প্রথম বলছি, আমি কালকেই এই কাজটা ছেড়ে দেবার নোটিস দেব ভাই। বলব, নোটিস পিরিয়ডটা আমাকে ধরে না রেখে কালকেই আমার ছুটি করে দিতে।"

নির্ম্মলা বলল, "সে কি ? কেন ?"

"মায়ের অসুখ সারাক্ষণ বড্ড বেশী মন কেমন করে ভাই। তাঁর কাছে গিয়ে থাকব।"

"সে ত খুব ভাল কথা, কিন্তু এসেছিলে কেন তাহলে মাকে ছেড়ে ?"

"সে ত তুমি জানো।"

"ঐ বাঁদরটাকে মানুষ করা যায় কি না দেখবার জন্যে ?

"হ্যাঁ।"

"দেখলে, যে যায় না, এই ত ?"

"শুধু তাই নয়, ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে দেখে বাবা-মা ধরে নিয়ে গিয়ে তার বিয়ে দিয়েছেন।"

"রামঃ কহ। আরও একটা নিরীহ মেয়ের সর্ব্বনাশ হল। তা সে জন্যে তুমি কাজ ছাড়বে কেন অসীমা ?"

"ওর জন্যেই ত করছিলাম, তাছাড়া কোনো কাজই আর ভালো করে যে করতে পারব কোনোদিন, তা মনে হচ্ছে না।"

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে কাটল।

অসীমা বলল, "সোজাসুজি আমাকে এসে যদি বলত, এত বেশী দুঃখ হয়ত আমি পেতাম না। কিন্তু এমন কাণ্ড ভাই, বিয়ে যে করেছে সেটা লুকোবার চেষ্টায় ছিল। কি কষ্ট করে যে সেটা আমায় বের করতে হয়েছে সে আর কি বলব ? একদিন তার পায়ে চকচকে কালো পাম্প শু, আর গায়ে সোনার বোতাম লাগানো মুগার

নতুন পাঞ্জাবি দেখে আমার কিরকম সন্দেহ হল, তারপর অবশ্য আসল ব্যাপারটা জানতে আর বেশী দেরি হয়নি।”

খোলা জানালায় নার্সিং হোমের পিছনের একধার দেবদারু গাছের একটাকে দেখা যাচ্ছে। দুজনেই তাকিয়ে আছে সেদিকে। গাছটার পাতাগুলির মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনা, যেন বাতাস যতটা তার চেয়ে ঢের বেশী। প্রায় নিঃশব্দে একটা গাড়ী এল, নিশ্চয় একজন রোগী নিয়ে ছুটো হেডলাইট জেলে আসছিল, নিবল সে ছুটো।

হাত বাড়িয়ে অসীমার একটা হাত মুঠির মধ্যে নিয়ে নির্মলা বলল, “ইচ্ছে না হয় ত বলো না, খুব কি দুঃখ নিয়ে যাচ্ছ?”

অসীমার গলাটা ধরে এল একটু। বলল, “তোমাদের miss করব খুব নির্মলাদি, তাছাড়া আর দুঃখ কিসের? মায়ের কাছে যাচ্ছি ত?” বলে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

সে রাত্রিতে নির্মলা নিজেরই কাছে রেখে দিল অসীমাকে। স্বল্প-পরিসর বিছানাতে কোনো রকমে দুজনে শুল।

বেড সুইচটাকে আর-একবার টিপে আলোটাকে নিবিয়ে দেবার পর অসীমা বলেছিল, “ওকে যখন চাপাচাপি করে ধরলাম, ও কি বলেছিল জানো নির্মলাদি? বলেছিল, দুত্তোর, এ কি আবার একটা বিয়ে নাকি? মা-বাবাকে খুশী করবার জন্যে মাথায় টোপর পরে একটু-খানি অভিনয় করা গেল। তুমি কিচ্ছু ভেবো না, আমি এই এলাম বলে। এসেই তোমাকে বিয়ে করব। যদি আসে, কি করব নির্মলাদি?”

নির্মলা বলল, “আসবে না। যদিই আসে, তখন এসো আমার কাছে, ব'লে দেব কি করতে হবে।”

অসীমা বলল, “তখন তুমি কোথায় থাকবে, আমি কোথায় থাকব, তার কিছু কি ঠিক আছে? আজকেই বল, শুনে রাখি।”

নির্মলা বলল, “যদি আসে, ঝাঁটা মেরে বিদেয় কোরো।”

একটুক্ষণ কাটবার পর অসীমা বলল, “না, নির্মলাদি, ঝাঁটা মারতে ওকে আমি পারব না। ওর সারা গায়ে কত যে আদরের স্বপ্ন আমার ছড়ানো রয়েছে তা তুমি জানো না।”

নির্মলা বলল, “ঝাঁটা মারা কি আর সত্যিই ঝাঁটা মারা?”

কিন্তু সেটার অর্থ আর যে কি হওয়া সম্ভব, মনে হল না অসীমা সেটা বুঝতে পারল।

এর দিন-কয়েক পরেই কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে নার্সিং হোম ছেড়ে চলে গেল অসীমা।

সেদিন বেলেঘাটা থেকে ফিরতে একটু রাত হয়েছে নির্মলার। খেতে বসে সুনন্দা বলল, “তারপর, তুমি কবে কাজে ইস্তফা দিচ্ছ?”

নির্মলা বলল, “কেন? আমাকে আর সইতে পারছ না?”

সুরূপা বলল, “ওটা বলো না। অসীমা যে চলে গেল সে কি আমরা ওকে সইতে পারলাম না বলে?”

নির্মলা বলল, “অসীমার কাজ করবার আর দরকার ছিল না, কিন্তু আমার আছে।”

সুনন্দা বলল, “তোমারও দরকার থাকবে না বেশীদিন, না সুরূপাদি?”

নির্মলা বলল, “মনে হচ্ছে তোমরা কোথাও একটা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ আর আমাকে তার ভাগ দেবে।”

সুনন্দা বলল, “যদি কখনো পাই, নিশ্চয় ভাগ দেব। কিন্তু এখন প্রকাশ্য যা তারই কথা হচ্ছে। বেলেঘাটায় বিরাট্ কারখানা, পেল্লায় বাড়ী। ও পাড়ায় সেদিন একটু কাজে গিয়েছিলাম, দূর থেকে দেখে এসেছি। দু-দুটো গাড়ী

নির্মলা বলল, “এ সমস্তের একটা অংশ যিনি মালিক তিনি আমার সেবাযত্নে মুগ্ধ হয়ে আমাকে লিখে দিচ্ছেন সে রকম কিছু কি শুনেছ?”

সুনন্দা বলল, “লিখে দিতে হবে কেন? ও সব হাতে হাত মিলালে হাতে হাতেই পেয়ে যাবে।”

নির্মলা বলল, “কি যে বাজে বকো।”

সুনন্দা আর কথা বাড়াল না। তার রাতের ডিউটি ছ'নম্বরে। সেই ভদ্রলোকটি তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছেন, সে গেলে তার হাতে স্ত্রীকে সমর্পণ করে বাড়ি যাবেন।

ভদ্রলোকটির নাম সতীনাথ। তিনি আজকাল বেশ রসিকতা শুরু করেছেন সুনন্দার সঙ্গে। সেগুলি হঠাৎ শুনলে কারও মনে হতে পারে সুনন্দার সঙ্গে তাঁর শালী ভগ্নীপতি সম্পর্ক, তবে তিনি যা বলেন, স্ত্রীটিকে সাক্ষী রেখেই বলেন। সুনন্দাও তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়েই তাঁর রসিকতাগুলির শ্যালিকাজনোচিত উত্তর দেয়। ভদ্রলোকের রুগ্না স্ত্রীটির নাম রমা। সেরে উঠতে তার দেরি হচ্ছে শুয়ে শুয়ে ঝিমোনো ছাড়া ত তার আর কাজ নেই? দুজনের এই হাসি-মস্করা তার বেশ ভালই লাগে শুনতে।

সুনন্দা যে মনে মনে তার প্রতি বেশ একটু অনুরক্ত এটা বুঝতে সতীনাথের খুব বেশী দেরি হয়নি। অবস্থাটার পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে তার যে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, এটাও সুনন্দাকে বারবার সে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে তার দুটি চোখের নির্লজ্জতার ভাষা দিয়ে।

আজ রমা অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে সতীনাথ ঠিক করেছে, আরও একধাপ এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

ছোট কেবিনটার আলো নেবালে রমার শিয়রের ওদিকটা সবচেয়ে বেশী অন্ধকারে পড়ে যায়। সঙ্কীর্ণ জায়গা, দুজন লোক মুখোমুখি দাঁড়ালে এমনিতেই বুকে বুক ঠেকবার মত হয়। সুনন্দা এলে হাতের ইশারায় সতীনাথ তাকে ডেকে নিল সেদিকটায়। সুনন্দা ভেবেছিল রমার শারীরিক অবস্থা বিষয়ে সতীনাথ চুপিচুপি তাকে হয়ত কিছু বলতে বা শুনতে চাইবে। কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা যখন বুঝল তখন আর কিছু করবার উপায় নেই। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে সুনন্দাকে প্রাণপণ শক্তিতে বুকে চেপে ধরল সতীনাথ। ইচ্ছে ছিল বেশ গুছিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটি চুমো খাবে; সুবিধা করে উঠতে পারল না, কিন্তু সুনন্দাকে ছাড়লও না। এদিকে নড়বারও সাহস নেই সুনন্দার, পাছে রমা জেগে যায়।

পরদিন সতীনাথের সঙ্গে কথা বলছে না সুনন্দা। করিডরে একবার তাকে একলা পেয়ে সতীনাথ বলল, "খুব রাগ করেছেন?"

সুনন্দা বলল, "আপনার মাথা খারাপ।"

সতীনাথ বলল, "তা ত জানি। তাই ঠিক করেছি, রমা সেরে উঠে বাড়ী গেলে এখানে এসে বেশ কিছুদিন থাকব, থেকে মাথাটার চিকিৎসা করব।"

সুনন্দা বলল, "এটা রসিকতার কথা নয়। আপনার স্ত্রী যদি তখন জেগে যেতেন, যদি কিছু সন্দেহ করতেন, তাঁর অসুখের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হতে পারত। একজন নার্স, যার হাতে তাঁর সমস্ত শুভাশুভের দায়িত্ব, তার দোষে ওরকম কিছু ঘটলে সে যে কত বড় অন্যায় আর কতবড় কলঙ্কের কথা হ'ত সে আপনাকে বোঝানো যাবে না।"

হাসি-মস্করা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল তারপর। সুনন্দার ছটফটানিও অনেকটাই কমে গেল।

রাত্তিরে দুতলার বারান্দায় বসে সুরূপা নির্মলাকে বলেছিল, "বাজে বকছে বলে সুনন্দাকে ত তখন ধমকে থামিয়ে দিলে, কিন্তু মনে মনে এটা বেশ ভাল করেই জানো, ছেলেটা খুবই বেশী ভালবাসে তোমাকে, আর তুমিও ভালবাস ওকে।"

নির্মলা বলেছিল, "না, না, সুরূপাদি।"

সুরূপা বলেছিল, "কি না, না? ছেলেটা ভালবাসে তোমাকে, বোঝ না সেটা?"

নির্মলা বলেছিল, "বুঝতে চেষ্টা করি না, কারণ আমি চাই না উনি আমাকে ভালবাসুন। আর আমার কথা যদি বল, আমি অত্যন্ত কাঠখোট্টা মানুষ, ভালবাসা-টাসা আমার ধাতে নেই।"

সুরূপা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন নিজের মনেই বলেছিল, "এতটাই কি ভুল বুঝেছি আমি? উঁহু, মনে ত হয় না।"

নির্মলা বলেনি কিছু।

তার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সুরূপা বলেছিল, "যদি তাই হয়, কিংবা নিজের কাছে কথাটা স্বীকার করতে বাধা যদি থাকে তাহলে ছেলেটাকে এত ঘন ঘন আসতে দাও কেন? বারণ করে দিলেই ত পার।"

নির্মলা বলেছিল, "ওঁর বাবার একান্ত ইচ্ছে. ওঁদের গাড়ীতে যাই-আসি। কখনো ওঁদের ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে

আসে, আর যেদিন ওঁর কাজ থাকে এদিকে, উনি নিজে চলে আসেন। তাতে অনেকটা পেট্রল বাঁচে। বারণ করা কি যায়?"

সুরূপা বলল, "তা যদি না যায় বাপু, তাহলে ওঁর বাপের ইচ্ছেটা অমান্য করে ট্রামে বাসে যাওয়া আসা করাই তোমার উচিত। তাও যদি না পার, আর সে যদি ভাবে তুমি তাকে encourage করছ ত সেজন্যে তাকে দোষ দিতে পারবে না।"

অনেক রাত অবধি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করল নির্ম্মলা। আজকাল এটাই তার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুতেই ঘুম আসবে না চোখে, হয় মলিনার কথা ভাববে, নয়ত ভাববে দিবাকরকে! এই দুজনকে নিয়েই নির্ম্মলা যে কি বিষম মুশকিলে পড়েছে! এদের দুজনেরই দাবি অপরিসীম, এবং আসবেন না বললেই আসা বন্ধ করবে এমন নিরীহ প্রাণী এরা কেউ নয়।

দিবাকর কিছু বললে নির্ম্মলা চুপ করে ব'সে শোনে, কিছু জিজ্ঞেস করলে, হাঁ না ব'লে কাজ সারে। কিন্তু নির্ম্মলাকে দিয়ে কথা বলাবার চেষ্টার বিরাম নেই দিবাকরের। এই ত সেদিন গাড়ীতে যেতে যেতে ডান হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দিবাকর বলেছিল, "কেমন যেন জ্বরজ্বর বোধ হচ্ছে। দেখুন ত একটু নাড়ীটা।"

নির্ম্মলা বলেছিল, "নাড়ী দেখতে ত জানি না।" ইচ্ছে হয়েছিল বলে, জ্বরজ্বর বোধ হচ্ছে ত বাড়ী ছেড়ে বেরুলেন কেন? কিন্তু উত্তরে কথাটার মধ্যে কোথায় কি ফাঁক পেয়ে কি না কি বলে বসবে দিবাকর, এই ভয়ে বলেনি।

দিবাকর বলেছিল, "নার্সের কাজ করছেন, নাড়ী দেখতে জানেন না কিরকম? শেখায় না আপনাদের?"

নির্ম্মলা বলেছিল, "দেখতে শেখায়, তার থেকে কিছু বুঝতে শেখায় না। আপনার pulse rate গুনে বলতে পারব, যেটা আপনি নিজেই পারবেন।"

দিবাকর এতেও দমেনি, বলেছিল, "কিন্তু ডাক্তাররা রোগীদের নিজের নাড়ী নিজে দেখতে বারণ করেন, জানেন ত সেটা? কাজেই একটু কষ্ট করে গুনেই বলুন আমার pulse rateটা, তার থেকে আপনি না বুঝতে পারেন, আমি বুঝতে চেষ্টা করব আমার জ্বর হয়েছে কি হয়নি।"

এরপর মিনিট-দুই দিবাকরের হাতে দুতিনটি আঙ্গুল ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছিল নির্ম্মলাকে, তারপর আঙ্গুলগুলিকে সরিয়ে নেবার সময় দিবাকর চেষ্টা করেছিল সেগুলিকে নিজের হাতের মুঠির মধ্যে একটুক্ষণ নিয়ে রাখতে। সে সময় নির্ম্মলার নিজের Pulse rate কত হয়েছিল কে তার হিসাব রেখেছে?

কিন্তু কথাটা নির্ম্মলা ঠিক বলেনি। pulse rate দেখে নার্সদের অনেক কিছু বুঝতে হয়, আর সে-সবই সুজন তাদের শিখিয়েছেন। দরকার হলে কেবল যে ডাক্তারকে খবর দিতে হয় তা নয়, যথেষ্ট সময় নেই মনে হলে ডাক্তারের কাজ নিজেদেরই তাদের অনেকটা করতে হয়।

আর একদিন তার মুখের খুব কাছে মুখ এনে দিবাকর বলেছিল, "আচ্ছা, দেখুন ত আমার চোখদুটো কি একটু লাল হয়েছে?"

নির্ম্মলাকে তার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

এইরকম ত মানুষ। একে নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে?

এই সেদিনের কথা। নির্ম্মলা যথারীতি পিছনের সিটে বসেছে, দিবাকর ড্রাইভ করছে। সন্ধ্যা হয় হয়। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসে দিবাকর গাড়ীটাকে দাঁড় করাল,—বলল, "এক মিনিট একটু বসতে হবে। আজ রাত্রের মধ্যে একটা জরুরী কাজ শেষ করতে হবে, তাই ঠিকে মিস্ত্রি জন তিনেক নিয়ে যাব এ পাড়া থেকে।"

এল তিনজন ঠিকে মিস্ত্রি কালো হাফ প্যাণ্ট আর ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি পরে। তাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে এরপর নির্ম্মলাকে নেমে গিয়ে বসতেই হল দিবাকরের পাশে। বাঁদিকের জানালার বাইরে তাকিয়ে বসে রইল

সে। একবার মনে হল দিবাকর শব্দ করে একটু হাসল যেন।

সেদিন দিবাকর নিজে তাকে পৌঁছেও দিচ্ছে। জানালার গ্রিল কয়েকটা মুদিয়ালির একটা বাড়ীতে রাত্রেই পৌঁছে দেওয়া দরকার, সেখানে আলো জেলে কাজ হচ্ছে। গাড়ীর পিছনের সিট এবং তার সামনের ফাঁকা জায়গাটা গ্রিল-গুলিতেই ভরতি হয়ে গেল, অগত্যা নির্মলাকে দিবাকরের পাশে এসে বসতে হল আবার।

নার্সিং হোমের কাছাকাছি এসে গাড়ীর গতি মন্দা করে দিল দিবাকর। ডান হাত স্টিয়ারিংএ, বাঁহাতটা পকেটে ঢোকাল একবার, তারপর আচমকা বাঁদিকে একটু ঝুঁকে নির্মলার স্যাণ্ডাল পরা পায়ের চাঁপাফুলের মত আঙুল কটির উপর ছড়িয়ে দিল কয়েকটি কনকচাঁপা ফুল। প্রথমটা ভীষণ ভড়কে তার পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শশব্যস্তে পা-দুটি গুটিয়ে নিল নির্মলা, তারপর লালপাড় শাড়ীর প্রান্ত তাদের ওপর ভাল করে টেনে দিয়ে দাঁতে ঠোঁট চেপে বসে রইল মাথা নীচু করে।

দিবাকর যখন বিদায় নিল, নির্মলা তাকাল না তার চোখের দিকে।

না, কাঁদবে না, কিছুতে কাঁদবে না সে। সত্য বটে এ জীবনে দুঃখ ছাড়া কিছুই আর প্রায় জোটেনি তার, তবু এই যে এক আনন্দলোকের পুষ্পপল্লবাবৃত দ্বার আজ খুলে গেল তার চোখের সামনে, একটু দাঁড়িয়ে এর ভিতরটায় কি আছে উঁকি দিয়ে সেটা একটু দেখে যাবার লোভও সে সংবরণ করছে।

শেষ রাত্রির দিকে স্বপ্ন দেখল, কারুকার্য করা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা মস্তবড় উঠোনে পার্টি হচ্ছে, বিজিতেন্দ্র নারায়ণের বাড়ীতে। অনেক আলো, অনেক বাদ্যভাণ্ড। বড়লোকের ভিড়ের মধ্যে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, খোঁপায় চাঁপা ফুল পরে। দূরে এক পাশে দিবাকর দাঁড়িয়ে খুব মিষ্টি করে হাসছে। তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে, এমন সময় পিছন থেকে মামাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "চোর, চোর, ও চুরি করেছে চাঁপাফুল, কে আছ, পুলিশ ডাকো, পুলিশ, পুলিশ।" ঘুমটা ভেঙে গেল।

তারপর সে কি বুকভাঙা কান্না!

যদি চুরি করেও ফুলগুলির একটিকে আনা সম্ভব হত!

বাইশ

এর পরদিনও দিবাকর নিজেই নির্মলাকে নিতে এল, কিন্তু এল খুব ভয়ে ভয়ে। ভয়, কিজানি আজ হয়ত নির্মলা কিছুতেই তার সঙ্গে যেত রাজী হবে না। বলবে, আপনি যান, আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন, পরে এক সময় রিক্সা করে চলে যাব। কিংবা, সবচেয়ে যে ভয়টা বেশী দিবাকরের, বলবে, আপনার বাবা ত ভালই আছেন এখন, আমাকে এবার ছেড়ে দিন আপনারা।

কিন্তু এসে দেখল, ব্লাড প্রেশার মাপবার যন্ত্রটা কোলে করে অন্যদিনেরই মত নির্মলা বসে আছে, যাবার জন্যে তৈরি হয়ে।

রোজ যেমন করে নির্মলা উঠবে না জেনেও সামনের বাঁদিকের দরজাটা দিবাকর প্রথমটা খুলে ধরে, আজও তাই করল। নির্মলা আজ বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে বসল সামনের সিটে।

শুধু তাই নয়, গাড়ীটা স্টার্ট নিতেই বলল, "আজ একটু নদীর ধার দিয়ে বেড়িয়ে যাবেন? অনেকদিন দেখিনি গঙ্গাটাকে।"

দিবাকর বলল, "নিশ্চয়ই যাব।"

প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে যে একফালি ছোট একটা রাস্তা দুদিকের দুটো বড় রাস্তাকে জুড়েছে, সেইখানটা দেখিয়ে নির্মলা বলল, "গাড়ীটা এখানে রাখবেন একটু?"

খুবই নিরালা জায়গা।

নির্মলার তিরস্কার কতটা নির্মম হবে, দিবাকর সেই ভাবনাই কেবল ভাবছে। গাড়ীটাকে ছোট রাস্তাটার এক পাশ ঘেঁসে দাঁড় করিয়ে অসহায় শিশুর মত মুখ করে নির্মলার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

নির্মলা ভেবেছিল তাকাবে না তার দিকে। কিন্তু এতটা কি পারা যায়? চকিতের মত দেখে নিল একবার দিবাকরের মুখের সেই আতঙ্কিত ভাব। দেখে বড় মায়া

হতে লাগল তার। কিন্তু না, এ সব দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না আজ। আজ সে মন স্থির করে এসেছে, বেরিয়েছে কঠিন পণ করে।

দিবাকরের দিক্ থেকে চাঁপাফুলের গন্ধ আসছিল। কিন্তু আজ আর পকেটে হাত দেবার সাহস নেই তার!

নির্ম্মলা বলল, "কয়েকটা কথা বলব, একটু মন দিয়ে শুনতে হবে।"

দিবাকর বলল, "আপনার কোনো কথা মন দিয়ে শুনিনি, এমন কখনো কি হয়েছে?"

হয়নি, নির্ম্মলা সেটা জানে। কিন্তু কঠোর হতে হলে ওরকম একটু-আধটু না বললে চলে না।

বোনা তারের বেড়া-দেওয়া পাশের ছোট পার্কটিতে রাত্রিবাসের জায়গার দখল নিয়ে পাখীদের কোলাহল-মুখর কলহ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। গঙ্গার ওপারে পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অস্ত গিয়েছে, তার রক্তিম ছটা ছড়িয়ে আছে প্রায় সমস্ত আকাশটা জুড়ে। পশ্চিম আকাশে একটি তারা জলজল করছে। নদীর স্নিগ্ধ হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, মনটাও যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে সেইসঙ্গে। কি সুন্দর দেখাচ্ছে দিবাকরকে আজ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে নির্ম্মলাকে। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই, গাড়ীগুলি চলে যাচ্ছে দুদিকের দুটি বড় রাস্তা দিয়ে, এদিকে কেউ যে হঠাৎ এসে পড়বে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। একটি পরিপূর্ণ সন্ধ্যা, মন দেওয়া-নেওয়ার সমস্ত রকম সুযোগে পরিপূর্ণ একটি মধুর পরিবেশ। দুটি উন্মুখ মন, দুটি উদ্ভিন্ন যৌবন। কোনো আয়োজন, কোনো উপকরণের অভাব নেই।

কিন্তু সবই বৃথা হল।

নির্ম্মলা বলল, "চলুন, নেমে গিয়ে নদীর ধারে ঐখানটায় বসি।"

দিবাকর বুঝল, থেমে-থাকা গাড়ীতে এতটা কাছাকাছি বসে থাকতে নির্ম্মলার ভাল লাগছে না। ভাল লাগবার কথাও নয়। বলল, "চলুন।"

গাড়ীর দরজায় তালাবন্ধ করে দুজনে গিয়ে বসল নদীর উঁচু পাড়-ঘেঁসা একটা ঘাসের জমিতে।

নির্ম্মলা বলল, "আচ্ছা, আমি কে, কোথাকার মেয়ে, এসব আপনার জানতে ইচ্ছে করে না?"

দিবাকর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। বলল, "করে। আপনি বলবেন?"

নির্ম্মলা বলল "না!"

দিবাকর বলল, "তাহলে কেন জিজ্ঞেস করলেন, জানতে ইচ্ছে করে কি না?"

"কিছু যে বলতে পারব না নিজের বিষয়ে, সেইটে আপনাকে জানিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করেছি।"

"সে ত আমি জানিই।"

'কি করে জানেন?"

"বা! আপনাকে আমরা এত নিজের লোকের মতন মনে করি, আর আপনাকে নিয়ে কখনো আমাদের কোনো আলোচনা হয় না, তাই কি সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?"

"যে জীবনটাকে আমি পেছনে ফেলে এসেছি, সেটাকে যে ভুলে থাকতে চাই তা আপনারা জানেন?"

"জানি, আর ভুলে থাকতে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হবে এইটেই আমরা স্থিরও করেছি। এবিষয়ে সুজন ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়ে আছে!"

"সুজন ডাক্তার নিজেও তাই বলেছিলেন আমাকে কাজ দেবার সময়, আর সেকথা তিনি রেখেওছেন। আপনাদের সঙ্গেও আমার যদি সেই রকমের সম্পর্ক হত, আপনার বাবা অসুস্থ, আমি তাঁর নার্স, এই যদি শুধু হত, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু—

"কিন্তু কি?"

"আপনার বাবা চান সম্পর্কটাকে একটু অন্যরকম করে নিতে। একদিন বলেওছিলেন সে কথা।"

বাবা চান! দিবাকরের মুখে একটু হাসি খেলে গেল। বলল, "জানি। মনে আছে আমার।"

"কিন্তু সেটাতে বাধা হচ্ছে"।

"কিসের বাধা?"

"আমি হচ্ছি, যাদের জাতজন্মের ঠিক নেই সেইরকম মানুষদের দলে। কাজের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনোরকম সম্পর্ক আমার সঙ্গে রাখবার কথা আপনারা ভাববেন না, তাতে আপনাদের ক্ষতি হতে পারে।"

দিবাকর কথার সুরে খুব জোর দিয়ে বলল, "হোক ক্ষতি।"

নির্ম্মলা বলল, "আমি কথাটা ঠিক করে বলতে পারিনি। আমি হচ্ছি ঐ নদীর জলে ভেসে আসা গাছের শুকনো ডালটার মত। ঐটেরই মত করে ভেসে চলে যাব। নিজেকে নিয়ে একলা ভেসে যাওয়া থাকা ছাড়া আমার উপায় নেই। সাধারণ মানুষের কাছে বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যে যেরকম ব্যবহার পায় মানুষে, আমার কাছে তা প্রত্যাশা করবেন না।"

জীবনে এতগুলি কথা একসঙ্গে এর আগে বলেনি কখনো নির্ম্মলা। দিবাকর কিভাবে নিল তার কথাগুলি দেখবার জন্যে আড়চোখে তার দিকে একবার তাকাল নির্ম্মলা। দেখল সে মাথা নীচু করে বসে আছে।

একটুক্ষণ চুপ করে কাটলে দিবাকর বলল, "আপনার সব কথা আমি যে ঠিক বুঝতে পারছি, তা নয়। কিন্তু একটা কথা আপনি মনে রাখবেন, কোনো-কিছুর প্রত্যাশা না রেখেই আপনাকে আমি ভালবেসেছি। যতটুকু পাওয়া সম্ভব তাই যদি পাই ত মাথায় করে নেব, তার চেয়ে বেশীতে লোভ করব না।"

নির্ম্মলার স্বভাবে ভগবান্ সে প্রগল্‌ভতা দেননি যাতে করে দিবাকরের এই কথাগুলির উত্তরে গুছিয়ে সে কিছু বলতে পারে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "অনেক দেরি হয়ে গেছে, চলুন এবারে।"

ময়দানের পথে যখন ফিরছে গাড়ীটা, তখন আর-একবার শক্তি সঞ্চয় করে নির্ম্মলা বলল, "আমার একটা কথা রাখুন। আমার উপর দয়া করে আমাকে ভুলে যান।"

দিবাকর বলল, "আপনাকে ভুলে যেতে বলে আপনি আমার প্রতি দয়া দেখাচ্ছেন না।"

নির্ম্মলা বলল, "চেষ্টা করলে ভুলে যাওয়া কি যায় না?"

দিবাকর এবারেও খুব জোর দিয়ে বলল, "চেষ্টা করবই না মোটে।"

নীরবতার আড়ালটা যে করেই হোক একবার যখন ধ্বসে গেল, তখন দিবাকরের দিক্ থেকে কথার যেন বান ডেকে এল। কত রকমের কত কথা। কিন্তু তার মধ্যে একটা কথাই ঘুরে ঘুরে আসে বারবার, ভালবাসি।

নির্ম্মলা চুপ ক'রে শোনে, প্রতিবাদ করেও একটা কথা বলে না। বাড়ীতে সুরূপা কি বুঝছে তা সে-ই জানে, দুচোখে গভীর সমবেদনা নিয়ে মাঝে মাঝে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, মুখ ফুটে জানতে চায় না কিছু, নির্ম্মলাও কিছু বলে না তাকে।

এর উপর দিবাকরের এমন সব বলাও আছে যা কথা দিয়ে বলা নয়। সুযোগ পেলেই হাতে হাতটা একটু ঠেকিয়ে নেওয়া, তারপর নিজের হাতের ছোঁওয়া লাগা জায়গাটি ঠোঁটে ঠেকানো। নির্ম্মলার শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্ত কখনো খুব বেশী নাগালের মধ্যে এসে পড়লে চকিতের মত সেটাতে একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া। দিবাকরের মধ্যে পৌরুষের কিছু কি অভাব আছে? নির্ম্মলাকে বুকে টেনে নেয় না কেন সে? নেয় না, নিতে পারা যায় না বলে। নির্ম্মলাকে ভালবাসে সে। তার সে ভালবাসাকে নির্ম্মলা গ্রহণ করেনি, কোথাও দুস্তর বাধা কিছু আছে বলে। নির্ম্মলাকে যতটা শ্রদ্ধা করে, নির্ম্মলার মনের এই বাধাটিকেও ততটাই শ্রদ্ধা করে সে।

এইভাবে চলছিল দিনগুলো। নিজের চারদিকে দুর্ভেদ্য নীরবতার একটা খোলস তৈরি করে নির্ম্মলা ভাবছিল তারই মধ্যে সে আত্মরক্ষা করতে পারবে। দিনকরত একদিন না একদিন তাকে ছুটি দেবেন? তখন এই দুঃসহ বেদনাময় অবস্থাটার অবসান হবে। দিবাকর ভাবছিল, ভাল যে বাসি সেটা প্রাণ ভ'রে ব'লে নিতে পারছি, এতটাই বা ক'জন পায়। তারপর দিন ত পড়েই আছে, দেখা যাক না কি হয়। কথায় বলে সবুরে মেওয়া ফলে।

কিন্তু দেখা গেল, তাদের চারপাশের মানুষগুলি রাজী নয় তাদের এভাবে চলতে দিতে। এদের সবুর সইছে ত তাদের সইছে না। প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে অস্থির হয়ে উঠেছে তারা। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক অবধি হয়ে থেমে গেল, এ কেমন ধারা? একটা কিছু হোক এবারে। হয় উদ্বাহ, নয় উদ্বন্ধন, নয়ত বেশ টকটক মিষ্টিমিষ্টি একটা কেলেঙ্কারি। এবং যেভাবে নানা রকমের গুজব ছড়াচ্ছে তারা, তাতে মনে হয়, এই শেষোক্ত পরিণতিটিই তাদের বেশী কাম্য।

সুরূপা বলল, "তোমাদের নিয়ে কথা যে একদিন উঠবে সে ত আমি জানতামই। তোমরা কেন সেটা ভাবনি জানি না। এখন কি করবে?"

নির্ম্মলা বলল, "তুমিই ব'লে দাও সুরূপাদি।"

সুরূপা বলল, "মেট্রনকে তাহলে বলি, ডাক্তারকে বলে এদের এ কাজটার থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে নিতে।"

নির্ম্মলা বলল, "তাই করাই বোধহয় ভাল হবে; তবে আমি আর দুদিন সময় নিচ্ছি, দেখি নিজে আর একবার চেষ্টা করে।"

দিবাকরকে বলাতে সে বলল, "এ সমস্যার খুব ভাল একটা সমাধান আছে, কিন্তু সেটা আপনার মনে ধরবে না।"

নির্ম্মলা বলল, 'কি সেটা?"

দিবাকর বলল, "গুজব যারা রটাচ্ছে, মিষ্টি মুখ করিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া।"

বড় দুঃখেই নির্ম্মলা হাসল একটু। বলল, "সে মিষ্টির যে অনেক দাম।"

দিবাকর বলল, "দামটা দিতে হবে।"

প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে সেই ছোট রাস্তার ধারে গাড়ীতে-বসে আজ কথা হচ্ছে দুজনে। আজও গঙ্গার ওপারে সূর্য্য অস্ত গেল এইমাত্র। তার উজ্জ্বল সোনালী আভা দুজনেরই মুখের উপর এসে পড়েছে। দিবাকরের মনে হচ্ছে, আলোটা উৎসারিত হচ্ছে নির্ম্মলারই মুখ থেকে, নির্ম্মলা ভাবছে, দিবাকরের মুখটি কি আলো দিয়েই তৈরি?

নির্ম্মলা বলল, "আপনি বলেছিলেন, কোনো প্রত্যাশা রাখেননি।"

দিবাকর বলল, "তা ত রাখিইনি। কতগুলি দুর্জ্জন লোক আমাদের নামে কুৎসা রটাচ্ছে ব'লে আপনি আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে-তাদের মিষ্টিমুখ করাবেন, তাদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে,—এ আশা নিয়ে সত্যিই আমি কথাটা বলিনি।" বলে শব্দ করে হাসল সে।

আবারও একটু করুণ করে হাসল নির্ম্মলা।

দিবাকর বলল, "আমার একটা কথা আপনি রাখবেন?"

নির্ম্মলা বলল, "কি কথা, বলুন।"

দিবাকর বলল, "আমি জানি আমাকে আপনার ভাল লাগে। তা যদি না লাগত ত যেসব উৎপাত আমি করি সারাক্ষণ আপনার উপর, সেগুলি আপনি সহ্য করতেন না। কিন্তু ভাল লাগে বলেই আমাকে বিয়ে করে নিতে হবে তাও আমি মনে করি না। আমি বুঝি, আপনার মধ্যে বাধা একটা কোথাও আছে, আর সেটা খুব বড় রকমের বাধা। সেটা কি, আমাকে বলুন। অন্ততঃ একটু আভাস দিন। আপনাকে আমি ভালবাসি আর আমাকে আপনার ভাল লাগে বলেই এটা জানতে চাইবার অধিকার আমার জন্মেছে।"

দিবাকরের চোখেমুখে কি করুণ কাতর ঔৎসুক্য! নির্ম্মলা তার মুখের দিকে চাইতে গিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। তার গলার কাছটা কে যেন চেপে ধরে আছে, কথা বলতে দিতে চায় না তাকে। মাথা নীচু ক'রে, অত্যন্ত মৃদুস্বরে কাঁপা গলায় সে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, খুব বড় রকমের বাধাই একটা আছে, কিন্তু সেটা যে কি তার আভাস দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস করুন আমাকে।"

দিবাকর বলল, "বিশ্বাস করছি, কিন্তু আমার দুঃখ এই, আপনি আমাকে একটুও বিশ্বাস করছেন না। একবারও ভাবছেন না যে, বাধাটা কি জানলে সেটা দূর করে দিতে হয়ত আমি পারি, পৃথিবীতে সে শক্তি একমাত্র আমারই হয়ত আছে।"

নির্ম্মলা মুখ তুলল। ছলছল করছে তার চোখ। বলল, "সে শক্তি কারও নেই। থাকা সম্ভব যদি ভাবতাম, নিশ্চয় আপনাকে বলতাম।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীতে স্টার্ট দিল দিবাকর।

ময়দানের পথে নির্ম্মলা আজ আবার বলল, "আজও বলছি সেই এক কথাই। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, দিয়ে ভুলে যান। মানুষ মরে ত যায়? মনে করুন আমি মরে গিয়েছি।"

দিবাকর বলল, "তাহলে নিজেকেও আমার সেই সঙ্গে মরতে হয়।"

যেতে ইতস্তত: করার মূলে এই ভাবটাই ছিল বেশী। পুরী মহাতীর্থ, স্বাস্থ্যকর জায়গা, পাশেই সমুদ্র, সেখানে কত লোক যায় বেড়াতে, পথে ঘাটে কার-না-কার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এ ভাবনাও ছিল। এ ছাড়া কলকাতা ছেড়ে যেতে আরো এক কারণে মনটা চাইছিল না নির্মলার। জগন্নাথ সেই গোড়ার দিকে একটা চিঠিতে লিখেছিল, মেয়াদ শেষ হবার কিছুদিন আগেই সে হয়ত ছাড়া পেতে পারে। বছর দেড়েক ত হল। যদি এই সময় ছাড়া পায় সে, বেরিয়ে এসে মাসীকে না দেখতে পেলে অত্যন্তই মর্মাহত হবে। নানা কারণে মাসীকে খুব প্রয়োজনও হবে তার তখন। কিন্তু দিনকর এত আগ্রহ করে চাইছেন, সুজন ডাক্তার বলছেন, কি করে এখন সে?

সেদিন সন্ধ্যায় দিনকরের পুরী যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে। নির্মলা যাবে কি না সঙ্গে ঠিক করে বলেনি এখনো, যদিও টিকিট কেনা হয়ে রয়েছে তার। সে যদি না যায় ত নার্সদের মধ্যে আর কেউ একজন যাবে। দুপুরের একটু আগে মলিনা উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে নির্মলার শোবার ঘরে, কাঁধে শান ব্যাগ, মুখে হাসি। এদিক ওদিক তাকিয়ে কেউ যে নেই কোথাও কাছাকাছি সেটা ভাল করে দেখে নিয়ে ব্যাগ থেকে রিভলবারটা আজও সে বের করল তারপর সেটাকে নির্মলার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, "এইটারে রাখেন। সাবধানে রাখবেন কইলাম।"

নির্মলা হাতদুটো পিছনে নিয়ে বলল, "সে কি? আমি ওটা রাখব কেন?"

মলিনা বলল, "আউজগার দিনটা আর রাইতটা রাখেন, কাউলকা আইসা লইয়া যামু।"

নির্মলা বলল, "না, না, ওটা আপনি এখনই নিয়ে যান। কাল আমি থাকব না কলকাতায়।"

"কই যাইবেন?"

"পুরী। আজকেরই রাত্রির গাড়ীতে।"

মলিনা বলল, "সারছে।"

রিভলবারটাকে আবার ঢুকিয়ে নিল ব্যাগে।

তেইশ

যাত্রার আয়োজন স্বভাবতঃই খুব তাড়া-হুড়ো ক[illegible] হল।

মলিনা এসে চলে যাওয়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে বেশ সুস্থ স্বাভাবিক বোধ করেনি নির্মলা[illegible] গোছগাছ করার সব কাজগুলো করে গেছে কলের পুতুলে[illegible] মত। এতই বেশী বিচলিত হয়েছিল সে, যে স্টেশনে দিবাকর গাড়ীর জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে যখন বল[illegible] "বাবাকে খুব ভাল করে সারিয়ে নিয়ে ফিরে আসু[illegible] আপনার ছুটিও হয়ে যাবে তাহলে," তখন সে কথার উত্ত[illegible] ভালমন্দ কিছু বলতেই পারল না সে।

হুইস্‌ল্‌ দিয়ে গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করবার পর [illegible] একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। যাক্‌, কিছুদিনে[illegible] মত এখন নিশ্চিন্ত। মলিনা নিশ্চয় পুরী অবধি [illegible] পিছনে ধাওয়া করবে না। কিন্তু মনটার স্বাভাবিকতা [illegible] ফিরে আসছে না কিছুতেই। কে জানে কি বিপদে সে ফে[illegible] এল মলিনাকে। হয়ত ঐ রিভলবারটা নিয়ে আজ [illegible] পড়ার সম্ভাবনা ছিল বলেই ওটাকে নির্মলার কাছে সে রে[illegible] যেতে এসেছিল। কি হত একটা রাত ওটাকে নিজের কা[illegible] রাখলে? না হয় একদিন পরে সে পুরী যেত। বল[illegible] গেলে মলিনাকে ফাঁকিই ত দিল সে। এ কি স্বার্থপর[illegible] তার স্বভাবে!

একটা রিজার্ভ করা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে দিনকরে[illegible] সঙ্গেই সে যাচ্ছিল। দিনকর বললেন, "তোমাকে কি [illegible] জোর করে নিয়ে এলাম?"

নির্মলা বলল, "না না, জোর কোথায় করলেন?"

দিনকর বললেন, "শুনেছিলাম তোমার অসুবিধা আ[illegible] তাই তুমি যে আসবে সেটা আশা করিনি।"

নির্মলা বলল, "অসুবিধা যেটা ছিল, সেটা আর এখ[illegible] নেই।"

দিনকর বললেন, "খুব ভাল লাগল শুনে। তা না হ[illegible] নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে থাকতে হত।"

খড়্গপুরে গাড়ী পৌঁছলে সঙ্গের চাকর মাধব এসে দুজনের বিছানা করে দিয়ে গেল। একটা বাস্‌কেট থেকে প্লেট, কাঁটা-চামচ বের করে, টিফিন-কেরিয়ারে করে আনা দিনকরের খাবার তাঁকে খাইয়ে, তারপর তাঁকে শুইয়ে দিয়ে আলো নিবিয়ে নির্ম্মলা জানলার ধারে নিজের বিছানায় এসে বসল।

দিনকর বললেন, "তোমার বুঝি একটু রাত করে খাওয়া অভ্যেস ?"

নির্ম্মলা বলল, "সেটা অবিশ্যি ঠিক, তবে আজ রাত্তিরের মত খাওয়া আমি বাড়ী থেকে খেয়েই এসেছি। আমার পুরী যাওয়া ঠিক হয়েছে শুনেই আমাদের ওয়ার্ড-সিষ্টার সুরূপাদি ভাতে-ভাত রান্না করিয়ে আমাকে ভরপেট খাইয়ে দিয়েছেন।"

দিনকর বললেন, "বড় ত কষ্ট হল তোমার।"

নির্ম্মলা বলল, "কষ্ট কোথায় হল ? পেট ভরেই ত খেয়েছি। মাঝে মাঝে ভাতে-ভাত বেশ ভালই লাগে খেতে।"

হু হু করে ট্রেন চলেছে বাংলা-উড়িষ্যার সীমানার দিকে। দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে ক্লান্ত চোখ দুটিকে একটু বিশ্রাম দেবে ভেবে খোলা জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল নির্ম্মলা, কিন্তু বারবার সেই অন্ধকারের বুকে দিবাকরের মুখটা বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে।

অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, কলকাতায় থাকলেও হয়ত দিবাকরের সঙ্গে তার আর দেখা হত না, কিন্তু এই যে তাকে ছেড়ে কয়েক শ মাইল দূরে নির্ম্মলা চলে যাচ্ছে, যেখানে মাথা খুঁড়ে মরলেও দিবাকরকে সে আর দেখতে পাবে না, এর বেদনা সম্পূর্ণ অন্যরকম, অনেক বেশী অসহনীয়।

জানালা বন্ধ করে শুল। নিজেকে ক্রমাগত বলতে লাগল, সে পুরী চলেছে, সেখানে জীবনে এই প্রথম সে সমুদ্র দেখবে। সমুদ্র দেখবার সাধ তার বহুকালের, সে সাধ পূর্ণ হতে আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র দেরি। সমুদ্রের রূপটা কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সবকিছুকে ঠেলে সরিয়ে দিবাকর এসে দাঁড়াচ্ছে তার মনের দৃষ্টির সামনে।

ষ্টেশন থেকে শহরে যাবার পথের একটা মোড় ঘুরতেই যখন প্রভাত রৌদ্রে ঝকঝকে নীল আকাশের নীচে গভীরতর নীল সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস হঠাৎ তার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তখন কিছুক্ষণের জন্যে আর কোনো কিছু তার মনে রইল না।

সমুদ্র যে এত সুন্দর, বাস্তবিক পৃথিবীতে কোনো কিছুই যে এত সুন্দর হতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

একটা সঙ্কল্প মনে নিয়ে এসেছিল,—পারতপক্ষে বাড়ী ছেড়ে বেরুবে না। কিন্তু সে সঙ্কল্পে অটল থাকা কঠিন হয়ে উঠল তার।

সমুদ্রের ধার দিয়ে যে-রাস্তাটি চক্রতীর্থ থেকে স্বর্গ-দ্বারের দিকে চলে গিয়েছে, তার সমান্তরাল ঠিক পরের রাস্তার একটি চৌমাথার ধারে অনেকখানি কম্পাউণ্ডওয়ালা দেয়াল-ঘেরা ছোট দুতলা একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে এসে উঠেছেন দিনকর। প্রথম দুদিন আর দু রাত সেই চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোল শুনছিল নির্ম্মলা, আর সেইসঙ্গে তার বুকের রক্ত যেন কল্লোলিত হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল সমুদ্র যেন তাকেই ডাকছে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যায়, গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোলে। অন্ততঃ আর-একবার গিয়ে দেখে আসে তার ক্ষণিকের দেখা সেই নয়নমনোহর রূপ।

তিন দিনের দিন দুপুরে দিনকর যখন খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়েছেন, দুপুরের এঁটো বাসনকোসন ধুয়ে, বিকেলের চায়ের বাসন টেবিলে সাজিয়ে রেখে মাধব ঘুরতে বেরিয়েছে একটু, তখন রাস্তায় লোকজন নেই দেখে নির্ম্মলা বাড়ীথেকে বেরিয়ে এসে চৌমাথার কাছে একটা ঢিপি মতন জায়গার উপর দাঁড়াল, যেখান থেকে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা যায় না, কিন্তু তার ঘননীলের বেশ খানিকটা চোখে পড়ে। তাই চোখ ভরে যতটা দেখা যায় দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল সে।

পুরী ছোট শহর, হিন্দুদের মহাতীর্থ, বাঙালীদের হাওয়া বদলের জায়গা। এখানে অত্যন্ত সাবধান হয়ে তাকে চলতে হবে।

ঢেউগুলি যেন ফেনার অর্ঘ্য নিয়ে এসে ধরিত্রীর পায়ে রেখে যাচ্ছিল। সেদিনকার সেই দৃশ্যটি আর একবার তার লোভ হয় দেখতে, প্রতিদিন দু-চার পা করে বেশী এগোয় কিন্তু এতটা এগোতে ভরসা পায় না যেখান থেকে সেটা দেখা যায়।

দিনকর প্রথম কয়েকটা দিন শুয়ে বসেই কাটালেন, সুজন তাই বলে দিয়েছিলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর সুজনের পরিচয়-পত্র নিয়ে নির্ম্মলা সে পাড়ারই ডাক্তার বাসুদেব মহান্তিকে ডেকে নিয়ে এল। অনেক সময় নিয়ে দিনকরকে পরীক্ষা করে ডাক্তার মহান্তি বললেন, "বেশ ভালই ত আছেন দেখছি।"

দিনকর বললেন, "এখন কি তাহলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে মাঝে মাঝে বসতে পারি?"

ডাক্তার মহান্তি বললেন, "বসতে পারেন মানে? বসতে আপনাকে হবে। তা-ই যদি না করবেন ত পুরী এসেছেন কিজন্যে মশাই?"

এমন পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ, বুঝবার উপায়ই নেই যে তিনি অবাঙ্গালী।

যে নির্ম্মলা নিজের ইচ্ছায় দু-পা বেশী এগিয়ে যেতে পারছিল না সমুদ্রের দিকে, তাকে এবার যেতে হল দিনকরের সঙ্গে, গিয়ে সমুদ্রের ধারে বসতে হল।

একবার সেখানে গিয়ে বসে পড়ে সে যে কি আনন্দ। কোথায় গেল সব ভয়-ডর?

বালুবেলার প্রান্তে ফেনোচ্ছল ঢেউগুলি একটা আর-একটাকে তাড়া করে এসে যেখানে ভাঙছে, তার থেকে আর একটু দূরে একটা ডেক চেয়ারে বসে আছেন দিনকর, তাঁর পাশেই বালুর উপর বসে ঢেউগুলির সেই রেস্ দেওয়া দেখছে নির্ম্মলা। তার চোখে কালচে রঙের বড় কাঁচ-ওয়ালা চশমা। মাথায় ঘোমটা। চশমাটাকে মাঝে মাঝে চোখ থেকে নামিয়ে কোলের উপর রাখছে।

দিনকর বললেন, "কতদিন হল আমরা এসেছি?

নির্ম্মলা বলল, "তা প্রায় দেড়মাস।"

দিনকর বললেন, "কাল তাই আমি অবাক্ হলাম শুনে, যে, জগন্নাথ দেবের মন্দিরটা তুমি আজ অবধি দেখনি।...মাধব বলছিল। সে আবার খুব ধার্ম্মিক কিনা? ...আমি মন্দিরের দিকে পা করে শুই বলে খুব ভাবনায় পড়েছে সে। সেকথাই বলছিল আজ।...আমি তাকে বললাম, দেখ, মানুষের তৈরি তোমার মন্দির বড় না, ভাগবানের তৈরি সমুদ্র বড়? যদি বুঝিয়ে দিতে পারো যে, মানুষের তৈরি জিনিষটাই বড় ত পা উল্টে শোব। লোকটার কিন্তু বুদ্ধি আছে। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'পুব-শিয়রে শুলিই ত কর্ত্তা এ দুয়ের কোনো দিকেই পা রাখতি হয় না।' তা মা, তুমি এক কাজ করো। খাটটাকে একটু ঘুরিয়েই দিতে বলো। পুব-শিয়রেই শোব আমি। কেন মিছিমিছি লোকটির অস্বস্তির কারণ হই?"

সেদিন পূর্ণিমা। জলোচ্ছ্বাস অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী উত্তাল। দিনকর বললেন, "আজ চাঁদ ওঠা অবধি বসে থেকে যাই, কি বল মা?"

নির্ম্মলা বলল, "নিশ্চয়।" যদিও দিনের আলোয় সমুদ্রকে দেখতেই তার বেশী ভাল লাগে, তবু জোৎস্না রাত্রির সমুদ্রও ত সত্যিই দেখবার মত, আর রাত্তিরে যতক্ষণ খুশি সে বাইরে থাকতে পারে, কেউ যে তাকে দেখে চিনে ফেলবে হঠাৎ, সে সম্ভাবনা নেই।

দিনকর বললেন, "সমুদ্রে সূর্য্য ওঠার চেয়ে চাঁদ ওঠা দেখতে আমার কেন জানি না, বেশী ভাল লাগে। দিবাকর অবিশ্যি বলে, এর কারণ হল সমুদ্রের সঙ্গে চাঁদের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক। জোয়ার-ভাঁটার কথা ভেবে বলে আর-কি।"

নির্ম্মলা বলল, "বুঝেছি।"

এরপর যতক্ষণ তারা রইল সেখানে, দিনকর নিজের ছেলের কথাই বললেন কেবল।

যখন বাড়ী যাবার জন্যে উঠলেন, বললেন, "পুরীর সমুদ্র দিবাকরের ভারী পছন্দ। যখনই আসে, দিনের বেশী ভাগটা জলে পড়েই কাটায়। এবারে যে তার কি হল, কিছুতেই আসতে রাজী হল না। বললাম, আমাকে অন্ততঃ পৌঁছে দিয়ে এস। তাও এল না।"

নির্মলা চুপ করে রইল। দিবাকরের কথা আজকাল একেবারেই না ভাবতে চেষ্টা করছে সে। তার সুরূপাদিও প্রত্যেক চিঠিতে সেই পরামর্শই দিয়ে চলেছে তাকে। কালকে যে চিঠিটি তার পেয়েছে নির্মলা, তাতে সে লিখেছে, "কথায় বলে, লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়। তা তোমার ভয়টাই এত বড়, যে, লজ্জা-সরম তোমার আছে কি নেই, মান-অভিমান তুমি কর কি কর না, সে-সব প্রশ্ন ওঠেই না একেবারে। ভয়টা যে কিসের, তা তুমি যখন বলবে না কিছুতেই, তখন বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে, এই ভয় যদি কাটিয়ে উঠতে না পার, ত ছেলেটাকে তোমার জীবন থেকে ত বটেই, মন থেকেও দূরে সরিয়ে রাখা তোমার উচিত হবে।"

সেই চেষ্টাই করছে নির্মলা।

কিন্তু তার রোগীটি যে একটি মস্ত প্রতিবন্ধক। যখন সে কঠিন পণ করে মনে মনে নিজেকে বলে, দিবাকরের ভাবনা আর নয়, দিনকর স্নেহ-কম্পিত কণ্ঠে বলেন, "ওর যখন সতেরো-আঠারোর মত বয়স, কি আশ্চর্য্য সুন্দর যে দেখতে ছিল! তোমরা এখন ওকে কি দেখছ।" আর সমুদ্রের ধারে এসে বসলেই কেবল দিবাকরকে মনে পড়তে থাকে তাঁর। দিবাকর যে সমুদ্র কিরকম ভালবাসে সেকথাটা তখন এত বেশী বলেন যে, নির্মলা তারপর সমুদ্রটার দিক তাকাতে পারে না ভাল করে, নিজেকে কিরকম অপরাধী মনে হয়।

তবু নির্মলার মনে হচ্ছে সে পারবে। পারতে যে তাকে হবেই। অতীতের পাতাগুলিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে জীবনের অনাগত অধ্যায়গুলির দিকে তাকে এগিয়ে যেতে হবে, এই তার বিধিলিপি। এটাকে সে মানবে। কোথাও তার কোন ভার জমা হবে না, কোনো মায়াজালে সে জড়াবে না। এই সঙ্কল্প গ্রহণের মধ্যে যে দায়িত্বহীনতার মুক্তি, নিশ্চিন্ততার মুক্তি, তার আরামটিকে উপভোগ করবার চেষ্টা করছে সে। প্রতিদিন একটু একটু করে এই বিশ্বাস তার দৃঢ় হচ্ছে যে, দিবাকরকে ভুলে যেতে সে পারবে।

কিন্তু ক্যাসাদ বাধালেন দিনকর। ক'দিন ধরেই বলছিলেন, "এতদিন পুরীতে রয়েছি, সমুদ্রের সঙ্গে একবারও মোকাবিলা হল না।" সেদিন দুপুরে ডাক্তার মহান্তিকে ডেকে ভাল করে বুক পরীক্ষা করিয়ে, তাঁর অনুমতি নিয়ে এবং নির্মলাকে বলে কয়ে বুঝিয়ে দিনকর একবারটি কেবল সমুদ্রে একটা ডুব দিতে চললেন। বললেন, "সাঁতার আমি বেশ ভালই জানি, কিন্তু এও জানি যে, সেটা এখন চলবে না। দুজন নুলিয়া দুদিকে দাঁড়িয়ে আমাকে ধরে থাকবে, মাথাটা নীচু করে দেব আমি, ঢেউটা চলে যাবে মাথার উপর দিয়ে। সে যে কি আরাম, তুমি জানো না নির্মলা! মনে হবে, শরীরের বাইরেটা, ভিতরটা, এমন কি মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন জুড়িয়ে গেল।"

কিন্তু জলে নেমেই একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে দিনকরের বুকে ব্যথা ধরে গেল। ভিজে সুইম-সুট পরা অবস্থাতেই একটা সাইকেল রিক্‌শতে বসিয়ে নির্মলা তাঁকে নিয়ে এল বাড়ীতে। ডাক্তার মহান্তি এসে দেখে অবাক্ হলেন, এরকম ত হবার কথা ছিল না। পুরীর সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার প্রধানকেও ডেকে দেখানো হল। দুজনেরই মতে নড়াচড়া কিছুদিন একেবারে বারণ। মনে হচ্ছে, সামলে যাবেন, কিন্তু তাঁর ছেলেকে খবর দেওয়া অবশ্যই উচিত।

নির্মলা মাধবকে পাঠিয়ে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিল, দিনকর বললেন, "টেলিগ্রাম কলকাতায় কবে পৌঁছবে তার ঠিক নেই। তুমি বরং পোস্টাফিস বা কোনো-একটা হোটেল থেকে তাকে টেলিফোন করে আসতে বল। সে কবে আসবে, সেটা তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই জানা যাবে, আর সেটা জানতে পেলে খুব ভাল লাগবে আমার।"

সবরকম ভয়-ডর তখনকার মত একেবারে ভুলে গেল নির্মলা। চলে গেল ডাক্তার মহান্তির বাড়ীতে, বড় কালো চশমা চোখে দিয়ে, মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে। সেখান থেকে টেলিফোনে ডাকল দিবাকরকে, বলল, "ভয় পাবেন না, তবে চলে আসুন। আপনি এলে ওঁর তাড়াতাড়ি সেরে উঠবার সুবিধা হবে। ডাক্তার সান্যালকে বলে আসবেন।"

পরদিন সকালেই দিবাকর এসে পৌঁছে গেল।

যাতে সিঁড়ি ভাঙতে না হয় সেজন্তে দিনকরের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল একতলাতে। তাঁর দেখাশোনার কাজের সুবিধা হবে ব'লে নির্মলাও একতলাতেই পাশের একটা ঘর তার জন্তে নিয়েছিল। দুতলার ঘরগুলি খালিই পড়ে থাকত, তার সেগুলির দিকে তাকিয়ে নির্মলার বুকের মধ্যেটাও কেমন যেন ফাঁকা ঠেকত থেকে থেকে। তারই একটা ঘরে দিবাকরের সব জিনিষপত্র তুলিয়ে, কোন্ জিনিষটা কোথায় রাখা হবে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তার তত্ত্বাবধান করল নির্মলা। তারপর দিবাকরের চায়ের জোগাড় করতে নীচে এসে দেখল, সে দিনকরের বিছানার পাশে বসে আছে চুপ করে। নির্মলার দিকে সে অবশ্য ফিরে তাকাল না।

দুটো তপসে মাছ ভাজা, একটা অমলেট, রুটি টোস্ট, মাখন আর চায়ের সরঞ্জাম তার জন্তে দিনকরেরই ঘরে পাঠিয়ে দিল নির্মলা, তারপর তার কাছে রাখা টাকার থেকে মাধবকে বাজার-খরচ দেবার জন্তে যখন নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন বাড়ীর মালী বলরাম একটা চিঠি দিয়ে গেল। জেলের কর্মে নয়, সাধারণ কাগজে লেখা জগন্নাথের চিঠি। উপরে ফরডাইস লেনের হোটেলের ঠিকানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিঠিটি পড়ল নির্মলা। জগন্নাথ লিখেছে:

"মাসী,

ফিরে এসে তোমায় দেখতে না পেয়ে কি দুঃখ যে পেলুম।

অবিশ্যি তোমার কি দোষ বল? তুমি ভেবেছিলে আমি দুবছরের মাথায় ছাড়া পাব, এখনো ত তার অনেক বাকী, তাই চলে গিয়েছ। আমার যে অনেকগুলি দিন মাপ হয়ে গেছে তা তুমি কি করেই বা জানবে?

খুব লক্ষীছেলে হয়ে থাকতুম বলে মাপ হয়েছে দেড়মাস, যে কাজ যখন করতে দিত খুব ভাল করে করতুম বলে আরো দেড়মাস, কিছুদিন রাত্তিরে চৌকি দিয়েছিলুম, কিছুদিন রান্না করেছিলুম, এসবের জন্তেও মাফি আছে, যা পেয়েছি। সব জড়িয়ে বাদ গিয়েছে প্রায় সাড়ে চার মাস। কিন্তু ফিরে এসে যখন জানলুম, তুমি কলকাতায় নেই, তখন মনে হল, ওরা যদি থাকতে দিত ত আরও কিছুদিন থেকে এলেই হত ওখানে।

ওখানকার লোকগুলি কিন্তু খুব ভাল মাসী। তোমরা যেরকম শোন সে রকম নয়।

বস্তির বাড়ীটাতে গিয়েছিলুম একবার। চাঁপাবৌ অনেক করে ধরলে। তার সোয়ামী গিয়েছে হাজারা-বাগ, আরো দিন দশ আছে ফিরতে। বললে, সেই ক'টা দিন থেকে যেতে, নিজে রান্না করে দুবেলাই আমার ভাত পাঠাবে। আমি রাজী হইনি। তবে অবিশ্যি রাত্তিরে না খাইয়ে ছাড়লে না, আর খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে এত রাত হল, যে, শৈলখোঠানের ভয়ে রাতটা ঐ বাড়ীতেই কাটিয়ে আসতে বাধ্য হলুম।

বৌটার স্বভাব ভাল নয় মাসী।

আমি শৈলখোঠানদের ওখানেই এখন কিছুদিন থাকব। তুমি না এলে বস্তি বাড়ীটাতে গিয়ে থাকবার অনেক অসুবিধে আছে।

সব কথা ত চিঠিতে লেখা যায় না?

কবে আসছ লিখো।

আশা করি ভাল আছ।

প্রণাম নিও।

জগন্নাথ।"

মাধবকে বাজারের টাকা বের করে দিয়ে নির্মলা বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে জগন্নাথের চিঠিটা আর একবার পড়ল। মনের ভিতরটা যেন অনেকখানি হাল্কা হয়ে যাচ্ছে তার। বস্তিবাড়ীর সেই কর্মব্যস্ত, বাচ্চা-বিস্ত্রিদের কোলাহলমুখর দিনগুলি। সন্তান-স্নেহের মত স্নেহ পেয়ে কারবারটি বড় হয়ে উঠছে দিনকের দিন। সেখানে কি নিশ্চিন্ততা নিয়েই না দিনগুলি কাটত তার। জগন্নাথ যেন সেই নিশ্চিন্ততার প্রতীক, তার চিঠিতে রয়েছে সেই দিনগুলির আস্বাদ। সেখানে মনটাকে নিয়ে এই নিরন্তর বিড়াসহানা নাড়ানাড়ি, টানাহেঁচড়া ছিল না।

যদি সম্ভব হত, আবার সে ফিরে যেত সেই দিনগুলিতে। কিন্তু তা কি আর সম্ভব?

পাশের ঘর থেকে দিবাকরের গলা পাচ্ছে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে জগন্নাথের চিঠির জবাব লিখল।

"জগন্নাথ,

তোমার চিঠি পেয়ে, তুমি অনেক আগেই ফিরতে পেরেছ জেনে, খুব খুশী হলাম।

তোমার হাতের লেখা আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার আর সুন্দর হয়েছে।

তোমার গাড়ী-মেরামতের সব যন্ত্রপাতি গলির মোড়ের টায়ারের দোকানটায় রাখা আছে। সেগুলি বুঝে নিয়ে গাড়ী-মেরামতের কাজ, কারখানা হবার আগে যে রকম করে করতে, সেই রকম করে আবার শুরু করে দিও। ব'সে থেকো না।

খানিকটা জমি কোথাও লীজ অর্থাৎ বন্দোবস্ত নেওয়া যায় কি না দেখো। শুনেছি তাতে খরচ অনেক কম পড়ে। আমাদের টাকা যা ছিল, তারপর আরও কিছু জমেছে। জমির জন্যে বেশী টাকা দিতে না হলে একটা শেড নিজেরাই এবারে আমরা তৈরি করে নিতে পারব।

আমাদের রান্নার বাসন-কোসন থালা বাটি ঘটি বালতি, এ সবই রেখে এসেছি চাঁপাদোয়ের হেপাজতে। সে কি বলেনি সেকথা তোমাকে?

পোস্টাফিসে তোমার যে টাকা আছে তার পাস-বইটা আমি রেখে এসেছি আমাদের নার্সদের হস্টেলের সুরূপাদির কাছে। আমার এই চিঠি নিয়ে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করো। অবিশ্যি ডাক্তার সান্যাল ত তোমাকে খুব ভাল করেই চেনেন।

আমি কবে যে কলকাতায় ফিরতে পারব তা কিছুই ত বুঝতে পারছি না। যাঁর সেবা-শুশ্রূষার ভার নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তিনি কিছুদিন খুব ভাল থেকে হঠাৎ সেদিন আবার অসুখে পড়েছেন। এমন অসুখ যে, তাঁকে নাড়ানাড়ি করা যায় না, আর ঠিক সেই কারণেই আমিও এখান থেকে নড়তে পারছি না।

আমি নার্সিং হোমের কাজে থাকি বা না থাকি, গাড়ী-মেরামতের কারখানা আমরা করবই।

চিঠি লিখো। কোনো অসুবিধা হলে তক্ষুণি জানিও। আশা করি ভাল আছ।

মাসী।"

চিঠি লেখা শেষ করে, সেটাকে একটা খামে পুরে বলরামের হাতে দিয়ে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকল, সেখান থেকে তার আর বেরুবার নাম নেই। তার ফলে খাওয়া-দাওয়াটা খুবই ভাল হল দুপুরে। বাবুর ছেলে এসেছেন কলকাতা থেকে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা অন্যদিনের তুলনায় ভাল হবে বইকি, এই ভাবে মাধব আর বলরাম বুঝল ব্যাপারটাকে।

দিবাকরও চাইছে দূরেদূরে থাকতে। কিন্তু ছোট একটা বাড়ীতে একসঙ্গে বাস করে, একই রোগীর পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত থেকে, দুটো মানুষের পক্ষে পরস্পরকে এড়িয়ে চলা ত সম্ভব নয়? তার উপর দিনকর চান, যতটা সময় সম্ভব, নির্ম্মলা আর দিবাকর তাঁর ঘরে বসে গল্প করে। তাঁর নিজের বেশী কথা বলা বারণ, অন্যদের গল্প শুনতে পেলেও তাঁর সময়টা ভাল কাটে।

প্রথম প্রথম দিনকরের ঘরে বসে এই দুজনের গল্প তেমন জমত না। ক্রমে গল্প জমছে। তার কারণ আর কিছু নয়, গল্প বলবার ও গল্প শোনবার আগ্রহ জাগছে দুজনেরই মনে। অবশ্য গল্পের বেশীর ভাগটা বলে একজন, শোনে অন্য দুজন।

গল্প জমাবার ক্ষমতা দিবাকরের অসাধারণ, আর বাবা গল্প শুনতে চাইছেন, শুনতে তাঁর ভাল লাগছে বলে তার এই ক্ষমতাটা যেন দশগুণ বেড়ে গিয়েছে।

সঙ্কোচের জড়তাটা কেটে যাবার পর দুজনে মাঝেমাঝে আলাদা বসেও আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাদের। রোগীর সম্বন্ধেই এমন অনেক কথা থাকে, যেগুলি নিয়ে তাঁকে শুনিয়ে কথা বলা যায় না। এ সব আলোচনায় নির্ম্মলাকে ভাগ নিতে হয়, ভাগ সে নেয়।

এদিকে নানারকমের রান্নায় আবার হাত ফিরে আসছে নির্ম্মলার। দিনকর ও দিবাকর দুজনেই খেতে ভালবাসেন আর নির্ম্মলা খাওয়াতে ভালবাসে, সুতরাং দিবাকর হঠাৎ

রান্নাঘরে এসে হানা না দিলে পুরীতে বাকী দিনগুলিও বেশ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগেই কাটতে পারত নির্ম্মলার।

সেদিন ভোর হতেই জালের থলেতে করে কতগুলি চিংড়িমাছ এনে রান্নাঘরের মেজেতে ঢেলে দিয়ে গেছে একটি নুলিয়া। দিবাকর এসে দেখে বলল, "জ্যান্ত চিংড়ি দেখলে যে পুণ্য হয় তার প্রমাণ, সে পুণ্যের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, নিশ্চিন্ত মনে সেগুলিকে আহার করতে পেয়ে। কলকাতাতে ত টোমেনের ভয়ে আমরা কেউ চিংড়ি মাছের দিকে তাকাই না।"

নির্ম্মলা বলল, "চিংড়িমাছের একটা নতুন রান্না আজ খাওয়াব আপনাদের। মাছের সমান ওজনের হলুদবাটা দিয়ে এটা রাঁধতে হয়। খেতেও ভাল হয় আর টোমেনের ভয় একেবারে থাকে না।"

"রান্নাটা শিখে রাখতে হচ্ছে," বলে বেশ খানিকটা সময় নির্ম্মলার সঙ্গে রান্নাঘরে কাটিয়ে গেল সে।

এরকম প্রায়ই হয়। নির্ম্মলা একেবারেই চায় না সেটা, কিন্তু বাধা দেবার সাধ্যও তার নেই। অবস্থাটা সবদিক্ দিয়েই যেন ক্রমশঃ তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই কদিন দিনকয়েব ভাবনা দুজনে একসঙ্গে ভেবে, একসঙ্গে তাঁকে নিয়ে ভয় পেয়ে, তাঁর শরীরে উন্নতির লক্ষণ দেখলে একসঙ্গে খুশী হয়ে, একসঙ্গে তাঁর সেবা করে, একসঙ্গে তাঁর জন্যে রাত জেগে পরস্পরের অনেকটাই কাছে চলে এসেছে তারা। এটা কারও ইচ্ছাকৃত নয়। এ না হয়ে উপায় ছিল না।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'ময়না' তদন্ত

পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের অপঘাত, অপমৃত্যুই ছিল অবধারিত এবং যাহা ছিল অবধারিত তাহাই ঘটিয়াছে। এই সরকারের অপমৃত্যুতে আমাদের দুঃখের বা আনন্দের কিছু নাই বলা ঠিক হইবে না। দুঃখের কারণ এই যে, বিগত বিশ বৎসরের কংগ্রেসী অপশাসনে জর্জ্জরিত হইয়া, সাধারণ লোকে আশা করিয়াছিল বাঙ্গলার অকংগ্রেসী সরকার জনগণের দুঃখ অনুভব করিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা, মোচন না হইলেও, লাঘবের জন্য সর্ব্বপ্রয়াস করিবে এবং এই প্রয়াসে কিছু সার্থকতাও অর্জ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু বাস্তবে লোকে কি দেখিল? যে কয়টি পার্টি মিলিয়া যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন করিল, তাহাদের প্রধানতম কাজই হইল, সরকারী ক্ষমতা হাতে পাইয়া, সেই ক্ষমতা এবং সরকারী সুযোগ-সুবিধা পার্টির স্বার্থে নিয়োগ করিয়া সর্ব্বতো-ভাবে পার্টি স্বার্থ রক্ষা এবং বৃদ্ধি করা। দেশ রহিল পড়িয়া, মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা কাহারো মনে রহিল না, প্রাক্-নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতিও লিডারদের মন হইতে মুছিয়া গেল। গদিতে বসিয়া প্রায় সকল নেতাই পার্টির প্রোপাগাণ্ডা-গদাঘাতে, বিরুদ্ধবাদীদের ঘায়েল করিবার প্রয়াস-প্রচেষ্টায় সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। ইহার ফলে সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্য্যাদি প্রায় অচল অবস্থায় আসিয়া ঠেকিল। এই অবসরে রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করিলেন ফ্রণ্ট সরকারের শ্রম মন্ত্রী! সামান্য একজন শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা হঠাৎ রাজ্যের শ্রম দপ্তরের মালিক হইয়া রাজ্যের শিল্পপতিদের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের উপর শ্রমিক বাহিনীকে লেলাইয়া দিলেন। শিল্পপতিরা কাতর নিবেদন করিয়াও শ্রমিক-অত্যাচার অনাচার প্রতিরোধে পুলিশের কোন সাহায্য পাইলেন না, কারণ শ্রম বিরোধে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার হইতে এবং প্রাথমিক কর্ত্তব্য পালনেও পুলিশকে অক্ষম করা হইল! এমন কি, শ্রমিক মহল যে ক্ষেত্রে মালিকের উপর দৈহিক নির্য্যাতন চালাইতে লাগিল, সেক্ষেত্রেও পুলিশকে তাহাদের আইন অনুমোদিত কর্ত্তব্য পালনেও বেকার করা হইল। পুলিশ তথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখার্জিও সব কিছু প্রশা-সনিক অনাচার অত্যাচার দেখিয়া ফ্রণ্টের বিষম 'ঐক্য' রক্ষার কারণে, নির্ব্বিকার রহিলেন। অন্তরালে রহিয়া সি.পি. আই এম উপ-মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রায় ডিক্‌টেটার হইয়া বসিলেন। অজয় মুখার্জিও তাঁহার হস্তে খেলার পুতুলে পরিণত হইলেন।

রাজ্যের সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজ করিতে লাগিল একটা চরম বিশৃঙ্খলা, কায়েম হইল বিষম বেআইনী রাজত্ব। খাদ্য মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের অবস্থা হইল একেবারেই সঙ্গীন। মন্ত্রী সভায় তাঁহাকে হইতে হইল পদে পদে অপমানিত, অপদস্থ। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাবের বিরোধীতা অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রকাশ্যেই করিতে লাগিলেন। এমনি এক সময় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ডঃ ঘোষ তাঁহার মন্ত্রিত্ব ত্যাগপত্র প্রদান করিলেন, কিন্তু ভক্তিমান ছাত্র মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে তিনি পদত্যাগপত্র ফেরত লইলেন, কিন্তু এই সঙ্গে মন্ত্রীসভায় যোগদান করা হইতেও তিনি বিরত রহিলেন। ডঃ ঘোষের এই ব্যবহার অন্য কয়েকজন মন্ত্রীর পক্ষে অসহ্য এক বেয়াদবী

বলিয়া মনে হইল এবং ইহার প্রধান কারণ ডঃ ঘোষকে সভার মধ্যে বসাইয়া তাঁহাকে সর্বভাবে অপমান করার স্বর্গীয় সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়া ! এ সব বিষয় বিশদ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। (২৭-১১-৬৭)

মহাকরণে 'অজয়-বধ' অভিযান

হঠাৎ প্রকাশ পাইল সরকারী কর্মচারীর দল একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির—ঘরের সামনের বারাণ্ডায় অজয় বাবুকে "আক্রমণ" করিলেন, বিবিধ প্রকার স্লোগান এবং পরম-ভদ্র অনোচিত বাক্যবাণের দ্বারা। পাশের ঘরে উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু এই স্বর্গীয় দৃশ্য এবং মার্কসীয় স্বাধীনতার সোচ্চার প্রকাশ পরমানন্দে উপভোগ করিতে লাগিলেন তাহার পর সময় বুঝিয়া নিজের ঘর হইতে (পিছনের দরজা দিয়া) জরুরি সরকারী কার্য্যের কথা মনে পড়ায় বাহিরে প্রস্থান করিলেন মুখ্য মন্ত্রীকে একলা অসহায় অবস্থায় অভিযাত্রী সরকারী কর্মচারীদের অনারণ্যে পরিত্যাগ করিয়া ! বলা বাহুল্য, সেই দিন সেই সময় মহাকরণে অন্যান্য যেসব ফ্রন্টীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, কেহই অজয় বাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। খুব সম্ভবত কাহারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া।

তাঁহার প্রতি 'ব্রাদার' মন্ত্রীদের ব্যবহার এবং বিষম সহযোগিতার জলন্ত প্রমাণ পরিচয় প্রত্যক্ষ করিয়া অজয় বাবু পদত্যাগ করা, সেইদিনই কেবল উচিত নহে, বুদ্ধিমানের কাজও হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ফ্রন্টের 'ঐক্য' রক্ষার জন্য যদি আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন, ভবিষ্যতের উপর পরম আশা ও নির্ভর করিয়া। কিন্তু ক্রমশ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির অবস্থা এমনই হইল যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত ২রা অক্টোবর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করিলেন এবং এই পদত্যাগের কারণ স্বরূপ তিনি রাজ্যপালকে যে পত্র দিলেন, তাহার একস্থানে লিখিলেন :

"...Something more dangerous is perhaps in the offing, pro Chinese left communist seem to be preparing the ground for a bloody revolution in West Bengal with China's help. If that happens, perhaps for many years the entire area of Assam, Manipur, Tripura and parts of Bihar and Orissa will be formed into a battle ground with deadly modern weapons of foreign powers......"

কিন্তু অনিবার্য্য কারণে অজয় বাবু পদত্যাগ না করিয়া যাহাদের সম্পর্কে উপরে উক্ত মন্তব্য করেন সেই দেশদ্রোহী তাহাদের সঙ্গেই ঘনতর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারই বহুনিন্দিত 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রী সভাকে একটি পরম সুখী পরিবারে রূপান্তরিত করিয়া পরমানন্দে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার বাসনা করিলেন। এই সুখী পরিবারের পথের কাঁটা হইলেন খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ এবং তাঁহার খাদ্যনীতি, যে নীতি কার্য্যকর হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রিসভায় আলোচিত তথা সমর্থিতও হয়। অবস্থা ডঃ ঘোষের পক্ষেও এবার হইল অসহ্য।

(৪-১২-৬৭)

ডঃ ঘোষের পদত্যাগ

ডঃ ঘোষ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং পদত্যাগ করিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি হইলেন—বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী এবং আদর্শহীন একটা অতি নিম্নস্তরের জীব। একদা অতিভক্ত ছাত্র শ্রী অজয় মুখার্জিও ডঃ ঘোষকে বিবিধ প্রকার শ্রুতিমধুর বিশেষণে বিভূষিত করিতে কার্পণ্য করিলেন না। কিন্তু ডঃ ঘোষের পদত্যাগের পরেই পশ্চিমবঙ্গের সভায় যুক্তফ্রন্টের সমর্থক সদস্য সংখ্যায় ধস্ দেখা দিল। ডঃ ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে আরো প্রায় ১৮ জন সদস্য ফ্রন্ট ত্যাগ করিয়া ডঃ ঘোষের প্রবর্ত্তিত পি-ডি এফ নূতন দলে যোগদান করিলেন এবং ইহার ফলে যুক্তফ্রন্ট তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইল। অবস্থা বুঝিয়া রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে বিধান সভা ডাকিয়া তাঁহাকে ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা রাজ্যপালের এই

ন্যায় এবং সুযুক্তি গ্রহণ না করিয়া ১৮ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে বিধান সভার অধিবেশন ডাকিতে অস্বীকার করিলেন। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হাতে দেড় মাস সময় পাইলে ফ্রন্টীয় নেতারা ছলে-বলে-কৌশলে, যেমন করিয়াই হউক—ডঃ ঘোষের দল ভাঙ্গাইয়া ফ্রন্টের সদস্য সংখ্যার পুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। মুখে অবশ্য বলা হইল—১৮ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে বিধান সভা ডাকা হইলে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান ব্যাহত হইবে, কারণ ফ্রন্টীয় মন্ত্রীগণ (কলিকাতায় বসিয়া) গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে বাহির হইবেন! রাজ্যপাল, এই অবস্থায়—মুখ্যমন্ত্রীকে ৩০এ নভেম্বর বিধান সভা আহ্বান করিয়া ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে বারবার অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু অজয়বাবু, এ-অনুরোধ অবজ্ঞা করিলেন কারণ তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, ডঃ ঘোষের দল ভাঙ্গাইতে না পারিলে, তাঁহার পক্ষে ফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ একেবারেই অসম্ভব। রাজ্যপালের অনুরোধ কেবল অগ্রাহ্যই নহে, ফ্রন্টীয় মন্ত্রীসভা বাতিল করিলে পশ্চিমবঙ্গে যে ভীষণ রক্তবন্যা বহিবে, এমন কথাও এই গান্ধীভক্ত অহিংস শান্তশিষ্ট মানুষটির শ্রীমুখ হইতে ক্রমাগত নির্গত হইতে লাগিল! রক্ত বন্যার হুমকি অজয় বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলেও, ইহা তাঁহার অন্তরের কথা নহে বলিয়াই মনে হয়। কথায় কথায় নিরীহ মানুষের রক্ত ক্ষয়ের কথা সি পি আই এম এবং সহধর্মী অন্যান্য দু-একটি অতিবাম তীব্রলাল নেতাদের টেক বুলি মাত্র।

—— —— ——

যুক্ত ফ্রন্টের একগুঁয়েমী—ফলে মন্ত্রী সভা বাতিল!

অবশেষে রাজ্যপাল ২১এ নভেম্বর সংখ্যালঘু মন্ত্রী সভা বাতিল করিয়া ডঃ ঘোষের নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসের সাপোর্টে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিলেন সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্টীয়, বিশেষ করিয়া শ্রীজ্যোতি বসুর দলের সুখ-সূর্য্যও হইল অস্তমিত। শ্রীঅজয় মুখার্জি তথা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট ইহা হইল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন রাজ্যপাল ফ্রন্টীয় নেতাদের 'রক্ত বন্যা' প্রবাহিত করিবার হুমকীতে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া, তাঁহাদের ঘোষিত ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করিবেন বিধান সভার অধিবেশনে এবং তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষার অবসর দানের জন্য!

রাজ্যপালের কার্য্যে বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক দল এবং তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনাহীন, অন্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভক্তের দল ছাড়া—পশ্চিম বঙ্গের সাধারণজন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল।

রাজ্যপালের কার্য্য যথাযথ এবং সংবিধান সম্মত কি না, সে-বিচার করিবেন—সাংবিধানিক পণ্ডিতের দল, আমাদের বক্তব্য শুধুমাত্র ঐটুকুই যে—যে-রাজনৈতিক পার্টির নেতারা ভারতীয় সংবিধান মানে না, কথায় কথায় সংবিধান তাহাদের খেয়ালখুসী এবং সুবিধামত পরিবর্ত্তন করিতে চাহে, তাহাদের মুখে আজ বিপদে পড়িয়া, বেইজ্জত হইয়া, ভারতীয় সংবিধানের গুণকীর্ত্তন শোভা পায় না।

অ-পদস্থ এবং অপদস্থ হইয়া যাহারা আজ গণতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তনে এবং গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রাণপণ চিৎকার করিতেছে, গণতন্ত্রকে তাহারা বাস্তবে মূল্য দেয় এককানা কড়িও নহে। দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যাহারা সাধারণ মানুষকে নির্য্যাতীত করিতে, তাহাদের রক্তে রাজপথ প্লাবিত করিতে দলীয় পদাতিকদের উৎসাহিত করে, নিজেরা নিরাপদ আশ্রয়ের অন্তরালে থাকিয়া, সেই সব তথাকথিত বামপন্থী নেতাদের একদিন জনগণের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে? সে দিন কখন আসিবে কেহ বলিতে পারে না। অদ্যকার গণতন্ত্র ধ্বজাধারী নেতারা যদি সময় পান, একবার ফরাসী বিপ্লবের খ্যাতনামা নেতাদের কথা ভাবিয়া দেখিবেন। সে-দিন যেসব সর্ব্বহারাদের ঐ ফরাসী বিপ্লবী নেতারা প্যারী এবং ফ্রান্সের অন্যান্য শহরের রাজপথে রক্তবন্যা বহাইতে প্ররোচিত করেন, কালের অমোঘ বিধানে অচিরে সেই সব প্ররোচক নেতার রক্তে প্লাবিত হয় ফ্রান্সের রাজপথ! সর্ব্বহারার দলই নেতাদের এই শেষ শাস্তি বিধান করে। কে বলিতে পারে, পশ্চিম বঙ্গেও এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে না। সরকার এবং দেশদ্রোহী নেতাদের ফাঁকা সারহীন বুলিতে, প্ররোচনায়—মানুষ আর কতদিন ভুলিয়া থাকিবে?

(১০-১২-৬৭)

——

অকংগ্রেসী সরকারের ব্যর্থতা?

সিপি আই এর এক সভায় পার্টি চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গে বলেন যে, অকংগ্রেসী সরকারগুলি জনসাধারণের জন্য কিছুই করিতে পারে নাই। এই সব সরকারের অধিকাংশই বিরাট ব্যর্থতা মাত্র! শ্রীডাঙ্গের কথার সত্যতা পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াছে। অ-কম্যুনিষ্ট নেতারা এই কথা বলিলে হয়ত তাহা অগ্রাহ্য করা চলিত কিন্তু শ্রীডাঙ্গের মত ঝানু এবং কট্টর কম্যু নেতার কথা কেহ, বিশেষ করিয়া বামপন্থী দল, বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে, অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন কি?

কিন্তু বাঙ্গলা-কংগ্রেসের শ্রী অজয় মুখার্জির উত্থান-পতন দেখিয়া লোকে অবাক হইয়াছে। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে যে কম্যুদের বিরুদ্ধে তিনি রাজ্যপালের নিকট লিখিত ভাবে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ পেশ করেন আজ সেই কম্যুর দলের সহিত তিনি গাঁটছড়া বাঁধিয়া রাজনৈতিক পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন যে—তাঁহারই দ্বারা মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে ঘোরতর বহু নিন্দিত কম্যুরাই, প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং তাহারাই সরকার গঠন করিয়া দেশ এবং জাতিকে—স্বর্গে লইয়া যাইতে সক্ষম! বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা হইলে যাহা হয়, অজয় বাবুরও আজ সেই অবস্থা। বিখ্যাত কম্যুনেতা তাঁহার নাকে দড়ি বাঁধিয়া জীব বিশেষের মত যেমন ইচ্ছা নাচাইতেছেন। একদা গান্ধী ভক্ত অহিংসবাদী, প্রায়-সংসারত্যাগী, আজীবন ব্রহ্মচারী, অমলিন চরিত্র শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় মাত্র কয়েক মাস স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের গদিতে বসিয়া নিজের জীবনের সব কিছু আদর্শ, নীতি, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য—পরিত্যাগ করিলেন! কামরাজ-নীতির জন্য যে ব্যক্তি একদিন মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে কোন দ্বিধা করেন নাই, আজ সেই ব্যক্তিকেই মন্ত্রিত্ব পুনর্লাভের জন্য এত লালায়িত ব্যাকুল দেখিয়া, গদির জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত দেখিয়া, আমরা সত্য সত্যই অজয় বাবুর জন্য দুঃখ বোধ করিতেছি। দেখা যাইতেছে দেশবাসী পিতলকে খাঁটি সোনা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। আদর্শের বিষম কষ্টিপাথরে নকল সোনা ধরা পড়িয়া গেল। আজ, জুলিয়াস সিজারের হত্যার পর এণ্টনীর মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—'What a fall was there my country men'-বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে আদর্শগত fall অর্থাৎ পতনের কথা মনে করিয়া একথা বলা হইল। কম্যুদের হাতে শ্রী অজয়ের পরম পরাজয় পূর্ণ হইল।

১১-১২-৬৭

অদ্ভুত বিবর্ত্তন—

'স্পীকারের বাড়ীতে বোমা,

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার অধিবেশন বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যেদিন স্পীকার নূতন এক সাংবিধানিক ইতিহাস রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী অজয় মুখার্জির মন্ত্রীসভাকে কিছুক্ষণের জন্য বাঁচাইলেন, সেইদিন রাত্রিতে তাঁহার বাসভবনে দুইটি প্রচণ্ড বোমা পড়িল। ভদ্রজন মাত্রেই এইপ্রকার হিংসাত্মক কার্য্যের নিন্দা এবং প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রী জ্যোতি বসু এই বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে কংগ্রেসীকে দায়ী এবং অভিযুক্ত করিলেন কেন এবং কোন্ প্রমাণের বলে, তাহা কেবল আমরাই নহি, সাধারণ বুদ্ধিযুক্ত কোন মানুষই বুঝিতে পারিবেন না। যে-জ্যোতি বসু স্পীকারের বাস ভবনে বোমা নিক্ষেপের এমন প্রচণ্ড প্রতিবাদ সহ কংগ্রেসকে দায়ী করিলেন, সেই গণতন্ত্র ধ্বজাধারী জ্যোতিবসু কিন্তু বিধান সভা গৃহে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অবসর পাইলেন না! জ্যোতিবসু যে অদৃশ্য প্রমাণের বলে বোমা নিক্ষেপের জন্য দায়ী করিলেন কংগ্রেসকে, আমরাও কি সমপ্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে আঘাতের জন্য সি পি আই এম-এর কোন সদস্যকে দায়ী করিতে পারি না? আমরা আর একটু বেশীও বলিতে পারি, এবং তাহা এই যে—যে কম্যু (বীর) ডঃ ঘোষকে কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করে তাহার পরিচয়ও জ্যোতি বাবুর জানা থাকিতে পারে। জানি না এই কাষ্ঠনিক্ষেপকারী কম্যুবীরকে পার্টির গোপন সভায়

অভিনন্দন সহ মাল্যভূষিত করা হইয়াছে কি না। হইয়া থাকিলে ঠিকই হইয়াছে।

বন্ধুর দল এবং সমনীতিধর পার্টির লোকেদের ধারণা কেবল মাত্র তাহারাই অভিরুচি মত যত্রতত্র হল্লা এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার ছাড়পত্র পাইয়াছে—এবং অন্যান্য সবাই তাহাদের সর্বপ্রকার অনাচার অত্যাচার বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। বামচারীরা যাহাই করুক না কেন, তাহাই হইবে গণতন্ত্রসম্মত। এমন কি, তাহাদের বিষম গণমার গণগণ্ডোগলকেও আমাদের মানিতে হইবে—নিখুঁত গণতন্ত্র বলিয়া। বামচারীর দল ছাড়া দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের দাবীদাওয়া থাকিতে পারে না, থাকিলেও বামচারী নেতারা তাহা স্বীকার করেন না।

কিন্তু হাওয়ার পরিবর্তন হইতেছে—এবার সাধারণ মানুষও নিজেদের ভালমন্দ বুঝিতে পারিতেছে। অচিরে দেশের শতকরা ৯৫ জনই কম্যু এবং সমধর্মী রাজনৈতিক (দুষ্ট-নৈতিক বলাই ঠিক হইবে) দলগুলির বিরুদ্ধে ঐক্য বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। ইতিমধ্যেই, সেই শুভ সূচনার বিকাশ প্রত্যক্ষমান হইয়াছে। দাঁতের বদলে দাঁত এবং নাকের বদলে নাক—কম্যুরা এই নীতি ছাড়া অন্যনীতি বিশ্বাস করে না!— ২৫.১২.৬৭

শ্রেণীহীন সমাজ

পরম দেশভক্ত যে-সব মহাবীর দেশে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাধিক, ন্যায়-অন্যায় প্রচেষ্টা-প্রচারে মুখর, সেই বিষম দেশভক্তের দল কিন্তু কারাগারে সকল বন্দীর জন্য একই শ্রেণীতে বিশ্বাস করেন না। কথাটা শুনিতে ভাল না লাগিলেও অতি সত্য। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন তথাকথিত বামচারী যুক্ত-ফ্রন্টীয় নেতা আইন ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু কারাগারে গিয়াই ইঁহাদের প্রথম দাবী হইল নিজেদের জন্য, বন্দী হিসাবে প্রথম শ্রেণীর আরামবিলাস অর্থাৎ সাধারণ কয়েদীদের জন্য যে ব্যবস্থা কারাগারে চলিত আছে এই 'ভি-আই-পি' বন্দীদের বেলায় তাহা কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না! এই ভি-আই-পি, আইনভঙ্গের অপরাধে ধৃত বন্দীরা দাবী করেন, কারাগারে বসবাস ব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়া এবং অন্যান্য প্রকার সুযোগ-সুবিধা এবং আরামের আয়োজন অবশ্যই 'ফাষ্টো-কেলাস' 'ভি-আই-পি-জনোচিত' না করিলে তাঁহারা কারাগারে অনশন এবং অন্তবিধ আন্দোলন চালাইবেন! এই আন্দোলন এবং দাবীর প্রতি আমরা পূর্ণ সমর্থন জানাই, কারণ মুক্ত অবস্থায় যাঁহাদের অনেকের ভাগ্যে দুইবেলা হয়ত কোন ক্রমে একটু ডালভাত মাত্র জোটে—এবং বাহিরে যাঁহাদের আর বলিতে 'পার্টি-কাণ্ড' ছাড়া আর বাহত কিছুই নাই, যাঁহাদের অনেকের ব্যক্তিগত রুজি-রোজগার বলিতেও প্রায় কিছুই নাই এবং যাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে হৈ-হল্লা ছাড়া আর কোন পেশাই নাই, সেইসব 'রাজনৈতিক' কিন্তু বেকার ভি আই পি'র দল কারাগারে বন্দী অবস্থায় অবশ্যই 'বিশেষ' ব্যবস্থার দাবী করিয়া, কিছু কালের জন্য অন্তত আরাম ভোগ বিলাসের জীবন যাত্রা দাবী করিতে পারেন।

জেলখানাকে সাধারণ লোক 'শ্বশুর-বাড়ী' বলে, পরি-হাসছলে, কিন্তু ভি-আই-পি কয়েদিরা এই জেলখানাতে গিয়া কারাকর্তৃপক্ষের নিকট হইতে 'জামাই-আদর' দাবী করেন। ইঁহাদের পক্ষে জেলখানা প্রকৃত পক্ষে 'শ্বশুর-বাড়ী'!

"সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দশা দূরীকরণ যাঁহাদের "জীবনব্রত" বলিয়া অহরহ প্রচারিত হয়, সেই তাঁহারাই বন্দী অবস্থায় নিজেদের সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা কি হিসাবে উন্নততর জীব বলিয়া মনে করেন—বুঝা শক্ত! এই শ্রেণীর কয়েদীরা যদি সকল কয়েদীর জন্য একই প্রকার উন্নত ব্যবস্থা এবং আরামের দাবীতে অনশন এবং আন্দোলন চালাইতেন, তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর কিছু শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। কিন্তু মূলতঃ যাঁহারা নিম্নমনা, তাঁহাদের নিকট হইতে উচ্চ কিছু আশা করা যায় না! ৩।১।৬৮

হিন্দী বনাম আমরা

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই দেশের 'সংহতি দিবস' সাড়ম্বরে পালিত হয় এবং তাহার পরই আবার নূতন করিয়া ভারতের 'সংহতি-সংহার' পবিত্র ব্রত সুরু করিল হিন্দী ফ্যানাটিক্সের দল। এই আন্দোলনে, যদি দেখিতাম অপরিণত বুদ্ধি হিন্দী-ভাষী ছাত্রেরাই কেবল মাত্র লিপ্ত হইয়াছে, ব্যাপারটাকে বেশী গুরুত্ব দিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু যখন দেখিতেছি 'শিক্ষিত', হিন্দীভাষী রাজ্য বিধানসভা এবং সংসদ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, কবি অর্থাৎ এককথায় শতকরা (শিক্ষিত) প্রায় ৮০ জনই হিন্দীকে ভারতের রাজভাষা করিবার জন্য বিষম হৈ-হল্লার সঙ্গে বিবিধ প্রকার নাশকতা এবং হিংসাত্মক কার্য্যে, প্ররোচক সমর্থক হিসাবে সাক্ষাতভাবে আন্দোলনে জড়িত হইয়াছেন, তখন ভারতের সংহতি যে কি বিষম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না ভারতীয় অহিন্দীভাষীদের পক্ষে।

বালকদের বাঁদরামো ক্ষমার যোগ্য কারণ তাহা খানিকটা কাঁচা বয়সের কারণে ঘটে, কিন্তু ধাড়িদের বাঁদরামোকে সাধারণ মানুষ কি বলিবে, কি চোখে দেখিবে? দাবী যদি প্রকৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ ভদ্র ব্যক্তি মাত্রেই তাহা সমর্থন করে, কিন্তু হিন্দীভাষীদের দাবী জবরদস্তিমূলক—এবং এই জবরদস্তিকে অহিন্দীভাষীদের স্বীকৃতি দিতেই হইবে, অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইংরেজীকে দেশ হইতে তাড়াইয়া তাহার স্থানে অপক্ব অর্দ্ধসিদ্ধ একটা নেহাত কাঁচা দেহাতী ভাষাকেই—(অর্থাৎ হিন্দীকে)—ভারতের, কেন্দ্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের 'লিঙ ল্যাংগুয়েজ' বলিয়া বিভিন্ন ভাষী সকল ভারতীয়কেই অবশ্যই মানিতে হইবে! কেন্দ্রীয় চাকুরীর ক্ষেত্রেও হিন্দী-পণ্ডিত না হইলে চলিবে না, অর্থাৎ যে-কোন প্রকারে হিন্দীকে একবার রাজতক্তে বসাইতে পারিলে, উত্তর ভারতের হিন্দীভাষীরা কেন্দ্রীয় সরকারে সর্ব্বভাবে এবং সর্ব্বপ্রকারে প্রাধান্য লাভ করিয়া সরকারী ক্ষীর-সর-ননী-ছানার চিরভোগদখলের অধিকার অর্জ্জন করিবে এবং রামভক্ত বীরদের এই পরম সৌভাগ্য অহিন্দীভাষীরা দূর হইতে ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে অবলোকন করিবে! দৃশ্যটা কল্পনা করিতেও মনে অপূর্ব্ব আনন্দ শিহরণ জাগে! কিন্তু হায়! হিন্দীভাষীদের ভবিষ্যত সুখ-সম্পদের কল্পনা প্রায় অঙ্কুরেই শুখাইয়া যাইবার মত হইয়াছে এবং ইহা বুঝিতে পারিয়া উত্তর ভারতের রামভক্ত মহাবীরের দল—এলাহাবাদ, দিল্লী বেনারস প্রভৃতি বহু অঞ্চলে লঙ্কাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি প্রচণ্ড ভাবে আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য লঙ্কাকাণ্ড করিবার ইঁহাদের জন্মগত অধিকার আছে স্বীকার করিব:

'বিদ্যাপতি মোরারজী' এবং হিন্দী

এতদিন সকলে জানিতেন ভারতের বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় অর্থ এবং উপপ্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই অর্থনীতি বিষয়ে অতি পণ্ডিত এবং 'নেশাবন্দীর' ঘোর সমর্থক। কিন্তু মোরারজী মহাশয় যে ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে কত গোপন এবং আজ-পর্য্যন্ত-অপ্রকাশিত তথ্যাদির বিষয় কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী—তাহা লোকের জানা ছিল না! মোরারজী মানব-দেহী জীবন্ত পৌরাণিক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া!

শ্রীমোরারজী কহেন: ভারতে একমাত্র হিন্দী ভাষায়ই সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা হইবার সুযোগ্য অধিকারী। বিজয়-ওয়াদাতে গান্ধী হিল সোসাইটির এক অধিবেশনে পণ্ডিত মোরারজী চোস্ত হিন্দীতে তাঁহার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, কোন পুণ্যঅনুষ্ঠানে ইংরেজিতে ভাষণ দান 'পাপ'!

মোরারজী আরো বলেন যে অতীতকালে (রামায়ণী, মহাভারতীয় (এমন কি বৈদিক) যুগেও মুনি ঋষিরা যখন কন্যাকুমারী হইতে কাশমীর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেন, সেই কালে তাঁহারা কেবলমাত্র হিন্দীতেই কথাবার্তা বলিতেন। মোরারজী ইহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে দণ্ডকারণ্যে, শূর্পনখা রাক্ষস, শ্রীরামচন্দ্রকে বিশুদ্ধ হিন্দীতেই প্রথমে প্রেম নিবেদন, পরে হিন্দীতেই গালাগালি করেন এবং সীতা হরণের পর রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতে গিয়া যখন বীর সুগ্রীবের সহিত

মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, সেই কালে রামচন্দ্র এবং বানররাজ সুগ্রীবের সহিত যে আলোচনা হয়, তাহাও ঘটে হিন্দীতে। ইঁহাদের মধ্যে চুক্তিপত্র হিন্দীতে রচিত হয় কি না, মোরারজী তাহা প্রকাশ করেন নাই। মোরারজীর কথায় মনে হয়, দক্ষিণ ভারতে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যেও হিন্দীই প্রচলিত ছিল এবং বানরীয় রাজকার্য্য হিন্দীতেই পরিচালিত হইত। কেবল তাহাই নহে, লঙ্কার অধিবাসীরাও ছিল হিন্দীভাষী এবং সেই কারণেই মহাবীর হনুমানজীর গালাগালি এবং বাক্যে রাবণের শ্রাদ্ধক্রিয়া হিন্দীর মাধ্যমে হয় বলিয়াই রাক্ষসরাজ তাহা বুঝিতে পারেন এবং বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলটিমেটাম হিন্দীতে দেন! ইহাতেই প্রমাণ হয় যে লঙ্কারাজ্যেও রাক্ষসেরা ছিল হিন্দীভাষী!

আমরা অর্থাৎ ভারতীয় অহিন্দীভাষীরা অতি অবোধ, তাই ভারতের প্রাচীনতম ভাষা হিন্দীকে তাহার যোগ্য শ্রদ্ধার আসন দিতে অস্বীকার করিতেছি। আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি নাই, সামান্য পরিমাণ থাকিলেও বুঝিতে পারিতাম যে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি অতি সুপ্রাচীন ভারতীয় পুস্তকাদি আদিতে রচিত হয় হিন্দীতে এবং পরে ঐ সকল গ্রন্থাদি সংস্কৃত, অর্থাৎ হিন্দী হইতে উদ্ভূত কাঁচা ভাষায় অনূদিত হয়!

মোরারজীর এই যুগান্তরকারী মহা-ঘোষণার পর ভারতীয় ইতিহাসে বিশ্বাসী কেহ কি আর হিন্দীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে ভরসা করিবে? কেহ যদি করে, তবে হিন্দীভাষী রামভক্ত মহাবীরদের হাতে তাহার নিস্তার নাই। অতএব সাবধান!

নিরোর বেহালা বাদন-

দেশের বিশেষ যে-কয়জন নেতা আজ ভারতের 'সংহতি' রক্ষার জন্য হিন্দী অত্যাবশ্যক বলিয়া বিষম চিৎকারে মানুষকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন, সেই সকল নেতা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে কোন সংহতি ছিল কি না তাহার কোন সংবাদই বোধহয় রাখেন না, রাখিবার কোন প্রয়োজনও তাঁহারা অনুভব করেন না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ইংরেজ শাসনের কল্যাণে (?) এবং ইংরেজ-অধীনতার চাপেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশগুলির মধ্যে একটা ঐক্যবোধ জাগরিত হয়—যেমন একই প্রভুর অত্যাচার এবং নিপীড়নের কারণে ক্রীতদাসদের (বিভিন্ন জাতীয় হইলেও) একটা ঐক্য দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে ঐক্য প্রাণের টানে সংঘটিত হয় না, হয় প্রাণরক্ষার বিষম তাগিদেই। এখানে আরো বলা প্রয়োজন যে, ভারতের তথাকথিত এবং বর্ত্তমানে হিন্দীওয়ালাদের বিষম ঢক্কা নিনাদিত সংহতি ভারতে সংগঠিত হয় ইংরেজীর কল্যাণেই (?) এবং এই সংহতি সাধনে—হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মহারাটি, গুজরাটি, ওড়িয়া, বাঙলা প্রভৃতির অবদান কিছুই প্রায় ছিল না। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কিছু থাকিলেও হয়ত থাকিতে পারে—সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন আঞ্চলিক ভাষার কোন বিশেষ প্রাধান্য ছিল না এবং হিন্দীর ত কোন প্রকার অবদান ভারতের ঐক্য বা সংহতি সাধনে বিন্দুমাত্র ছিল বলিয়া পণ্ডিতরা মনে করেন না। তাহা ছাড়া ভারতের সব কয়টি হিন্দীভাষী রাজ্যের 'হিন্দী'—'একই'-হিন্দী নহে। বিহার রাজ্যেই বিশেষ কয়েকটি বড় বড় অঞ্চলের ভাষা হিন্দী নহে এবং ঐসব অঞ্চলের লোকেরা প্রায়ই নিজেদের আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ না হইলেও, শিক্ষা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র দাবীও উত্থাপন করে। বিহারের এমন দু-তিনটি অঞ্চলও আছে, যেখানের কথিত এবং চলিত ভাষাকে হিন্দী না বলিয়া বাঙলার নিকট আত্মীয় বলা চলে। পাটনা-বারাণসীর হিন্দী দিল্লীতে অচল। মধ্যভারত এবং রাজস্থানের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কেও একই কথা। কিন্তু হিন্দীওয়ালারা সমগ্র উত্তর এবং মধ্য ভারতকে তখনও একই প্রকার হিন্দীভাষী অঞ্চল বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জা বা দ্বিধাবোধ করে না রাজনৈতিক স্বার্থ এবং হিন্দীভাষীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্যই। এইসব প্রচারকারীদের ভাষা জ্ঞান—ইংরেজী এবং হিন্দীতে কোনটাতেই কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না!

আহাম্মকী অহমিকা বোধ!

দেশের যাবতীয় বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত সমস্যার সমাধান

অন্যকার নেতারাই করিয়া যাইবেন—ইহা এক অদ্ভুত অহমিকাবোধের দৃষ্টান্ত, এবং এই অহমিকার জন্যই আজকের নেতারা বিবিধ প্রকার অনাবশ্যক সমস্যার সৃষ্টি করিয়া দেশকে বিভ্রান্ত করিতেছেন, সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের সর্বনাশও। এ বিষয় একজন প্রখ্যাত বাঙ্গালী সাহিত্যিকের কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"যে-দেশ কুড়ি বছর চেষ্টা করেও গ্রাসাচ্ছাদনের সমাধান করতে পারলো না, আজ পর্য্যন্ত যে পরপিণ্ডভোজী, তার উপরে ক্রমবর্দ্ধমান করভারে পৃষ্ঠ ন্যুব্জ, অন্যদিকে চীন পাকিস্থান উদ্যত থাক, তার পক্ষে ভাষা সমস্যাটাই একটা সৌখীন ব্যাপার। ইংরেজিতে চিঠি লেখা হবে, না, হিন্দীতে? দেশের মন যখন সুস্থ হবে, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা যখন এত দুর্বহ বোধ হবে না তখন দেখা যাবে এটা আদৌ কোন সমস্যা নয়। অসুস্থ মন নিয়ে মহৎ কাজ করতে যাওয়ার অর্থ ব্যর্থতাকে আহ্বান। সেই ব্যর্থতারই প্রকাশ বর্ত্তমান আন্দোলনে।"

কিন্তু বুদ্ধিহীন নেতাদের নিকট হইতে কেহ কখনও যুক্তি কিংবা সুবুদ্ধি আশা করিতে পারে না। এই শ্রেণীর নেতারা বিশেষ করিয়া হিন্দী-ফেরিওয়ালা নেতারা হিন্দী লইয়া যে নূতন লঙ্কাকাণ্ড সুরু করিয়াছেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি কল্পে তাঁহাদের বানর সৈন্যবাহিনীকে যে ভাবে উত্তর ভারতের সর্ব্বত্রই যে বিষম উৎসাহে (হিন্দীর আগুনে) কেবল ইংরেজী সাইন-বোর্ড, নেম-প্লেট এবং মোটরকারের নাম্বার প্লেট আলকাতরা লেপনে নষ্ট বিনষ্ট করিতে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই হিন্দীওয়ালারা অচিরে ভারতের ভবিষ্যতকেও আল-কাতরা দ্বারা লেপিয়া নূতন এক হিন্দী যুগের অবতারণা করিতেও দ্বিধাবোধ করিবে না। হিন্দীভাষীরা নিজেদের নাক কাটিয়া যদি মনে করেন তাঁহাদের জীবনব্রত সার্থক হইবে, তবে তাঁহারা পাইকারী হারে নিজেদের নাক কাটিতে থাকুন, কিন্তু নিজেদের নাসিকা কর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যেন অহিন্দীভাষীদের নাসিকা কর্ত্তন তথা যাত্রাভঙ্গের কোন অপচেষ্টা না করেন। ইতিমধ্যেই হিন্দীওয়ালাদের উৎকট উৎসাহের, প্রতিবাদে ভারতের প্রায় সকল অহিন্দী ভাষা অঞ্চলে হিন্দীর প্রতি একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের সহিত মারমুখী আন্দোলন দেখা যাইতেছে।

হিন্দী বানর-সেনারা দিল্লীতে তিনজন মাদ্রাজী বিধান সভার সদস্য এবং একটি বাঙ্গালী বিদ্যালয়ের উপর হামলা চালাইতে দ্বিধা বোধ করে নাই এবং এই অসভ্য হামলা বন্ধ করার জন্য শেঠ গোবিন্দদাস এবং অন্যান্য কট্টর হিন্দী অভিযান-কারী নেতারা একটিও নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ইহারা মনে রাখিবেন অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে বহু হিন্দীস্কুল এবং হিন্দী ভাষীও বাস করেন, হিন্দী বানর সেনাদের ক্রিয়াকলাপের ভীষণ প্রতিক্রিয়া অহিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে সৃষ্টি করিতে পারে। এই ভাবে উৎকট হিন্দী-প্রচার চলিতে থাকিলে হিন্দীর শ্মশানযাত্রা কেহ রোধ করিতে পারিবে না! পার্লামেণ্টে বহু-সংশোধিত ভাষা বিল গৃহীত হইয়াছে কিন্তু হিন্দীপ্রেমীদের বিকট উগ্র ভাষা প্রেমের আন্দোলন এইখানেই ইতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেখা যাইতেছে হয় নাই—

যুক্তফ্রন্টের 'প্রাসাদ'

ইটের উপর ইট বসাইয়া দিলেই প্রাসাদ নির্মাণ করা যায় না কিন্তু যুক্ত-ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করিয়া বহুতলা প্রাসাদ নির্মাণ প্রয়োগ করে ফেলে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিল। যুক্ত-ফ্রন্টের বহু আশার স্বপ্নভিত্তিক মন্ত্রিত্ব-প্রাসাদ একটি মাত্র ইট খসিয়া যাওয়াতেই ধ্বসিয়া পড়িল! ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যুক্ত-ফ্রন্টের প্রাসাদ গঠন করিবার কালে যে প্রকার ইটের সাহায্য লওয়া হয়, তাহার একটির সহিত আর একটির কোনো মিল না থাকাতে প্রাসাদের দেওয়াল, নড়বড়ে হইয়া ছিল। পাকা রাজমিস্ত্রীর অভাবেই প্রাসাদের গঠন প্রথম হইতেই কোন প্রকার দৃঢ়তা লাভ করে নাই।

ফ্রন্টীয় প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া গেলেও ফ্রন্টীয় নেতারা প্রাসাদে বাস করার দুর্লভ সুখ এবং আরামের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। এখন তাঁহারা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন—তাঁহাদের পুনরায় মন্ত্রিত্বের আবাসে পুনর্বাসন ব্যবস্থা করিয়া দ্বিধার

জন্ত। ফ্রন্টীয় নেতারা রাজত্ব করিবেন এবং তাহার জন্ত 'জনযুদ্ধের সকল দুঃখ এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে জনগণকে। এই জনযুদ্ধের আওতা হইতে ছাত্রসমাজও ছাড় পাইবেন না, তাঁহাদেরকেও নিজেদের ভবিষ্যত বিসর্জন দিয়া ফ্রন্টীয় কয়েকজন নেতার প্রভুত্ব করিবার স্বার্থে আত্মত্যাগ করিতে হইবে ?

আজ গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত ছোটবড় সকল নেতাই আর্তস্বরে চিৎকার করিতেছেন। এই চিৎকার শুনিলে মনে হয় যেন এ-দেশে ঐ ফ্রন্টীয়-নেতারা ছাড়া আর কেহই গণতন্ত্রের পূজারী নাই। তাঁহাদের সহিত পথ ও মতের মিল যাহাদের হইবে না, তাহারাই হইবে বিশ্বাসঘাতক স্বার্থান্বেষীর দল ; অতএব হে আমাদের ভক্ত বৃন্দ! ইহাদের যেমন ভাবেই হউক নিশ্চিহ্ন কর! কিন্তু এ-যুদ্ধ হইবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে—এমন কি পুলিশকে ইট মারা, পুলিশের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করা, ট্রামে বাসে অগ্নি সংযোগ করিয়া জন সম্পদ নষ্ট করার কাজটাও যেন শান্তিপূর্ণ ভাবে সংঘটিত হয়!

'গণতন্ত্র বাঁচাও'

'গণতন্ত্র বাঁচাও' বিক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে যেন কোন প্রকার হিংসা বা অশান্তির ভাব দেখা না যায়!—নেতাদের এই উপদেশ, তথা সতর্কবাণী, ভক্ত এবং অপরিণতবয়স্ক ছাত্রের দল অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছে এবং এই কারণেই গণতন্ত্ররক্ষার কাজে এই গণযুদ্ধ তথা গণআন্দোলনে আজ পশ্চিম বঙ্গে সর্বত্র এমন শ্মশানশান্তি বিরাজ করিতেছে। "পাগলা সাঁকো, নাড়াস না!" কথাটা বারবার মনে হইতেছে।'

হিংসার কাজ যাহা কিছু সবই করিতেছে দুষ্ট পুলিশ। তাহাদের উচিত হইবে গণযোদ্ধাদের হাতে মার খাইয়া তাহার প্রতিবাদ না করা, কলেজ বা অন্তপ্রকার বাড়ীর ছাদ হইতে—তাহাদের উপর ইট এবং ক্র্যাকার বৃষ্টি হইলেও ঐসব ভবনে প্রবেশ না করিয়া অহিংস উপায়ে আত্মরক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত করা!

'জনযুদ্ধে' নেতারা সামনে থাকেন না। যুদ্ধকালে সেনাপতি যেমন বেস্‌ক্যাম্প হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, বেশীর ভাগ ফ্রন্টীয় নেতারাও তেমনি ভাবে বিচক্ষণ সেনা-পতির অনুকরণে কাজ করিতেছেন—যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে নিরাপদে দূরে থাকিয়া। অনেকে কারাগারের অভয় আশ্রয়েও নিশ্চিত আছেন।

ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল এবং পরিবর্তে ঘোষ মন্ত্রীসভার নিয়োগ আইনসঙ্গত কি না তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে—আমাদের বক্তব্য এবং নিবেদন এই যে—মীমাংসাটা পথে ঘাটে না করিয়া, আইন সভাতে করিলেই কি ভাল হয় না? গণতন্ত্রের নামে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী তথা কয়েকটি রাজনৈতিক পার্টি জন-জীবনকে কেন অযথা বিপর্য্যস্ত করিয়া দেশের (ভদ্র) সর্বজনকাম্য শান্তিকে বিপদজনক ভাবে বিঘ্নিত করিবেন বুঝি না। গণতন্ত্রের নামে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে সবদিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে সাধারণ মানুষ, হতাহতও হইতেছে নিরীহ মানুষই। অস্বাভাবিক অবস্থায় পুলিশও সকল ক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পারে না, বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রী যোদ্ধারা যখন তাহাদের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালায় এবং এমন অবস্থায় পুলিশও বেপরোয়া ভাবে প্রতিরোধ চালাইতে বাধ্য হইবে—একথাটা মনে রাখা দরকার। পুলিশও মানুষ কলের পুতুল নহে!

যুদ্ধে নামিয়া প্রতিপক্ষের আক্রমণ যাহারা সহ্য করিতে পারে না, প্রতিপক্ষের আক্রমণ যাহারা অযথা, অন্তায়, অতিরিক্ত মনে করে তাহাদের পক্ষে বোধহয় যুদ্ধের সীমানায় না যাওয়াই শ্রেয় এবং নিরাপদ!

আমরা বেপরোয়া প্রহার চালাইব পুলিশ বাহিনীর উপর কিন্তু পুলিশ তাহা দেহপুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া হজম করিবে, তাহা কি সম্ভব? মার দিতে যাহারা নিজেদের বীর বলিয়া ভাবে প্রতিপক্ষের পাল্টা মারে তাহাদের পক্ষে আর্তনাদ মানায় না।

স্মৃতির টুকরো

সাতকড়িপতি রায়

(১৪)

আজ আমার চাকুরী-জীবনের গল্প বলি। খুব খারাপ লাগবে না হয়ত'। কবে চাকরিতে বহাল হয়েছিলাম এবং কবে আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হ'ল তার কোনটারই সঠিক তারিখ মনে কত্তে পারছি না। তবে ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের পূর্ব্বেই যে বহাল হয়েছিলাম সেটা ঠিক্। পূর্ব্বে বলেছি Sir John Carr সাহেবের জিদে এবং ছোটকাকা ও দাদার কথায় দরখাস্ত করুন। তখন কোনও পরীক্ষা ছিল না। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সুপারিশে চাকরি হত। আমার দরখাস্ত দেওয়ার পরেই Carr সাহেব Revenue Board এর Secretary হয়ে চলে যান। Weston সাহেব এলেন তাঁর জায়গায়। পুলিশের রিপোর্টের জন্যেই হোক্ বা যে কোনও কারণেই হোক্ তিনি আমার দরখাস্ত পাঠালেন না। জানতে পেরে Carr সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি একটু অবাক্ হয়ে বর্দ্ধমান Division এর Commissioner Walsh সাহেবকে পত্র দিলেন। West Walsh মেদিনীপুর থেকে আমার দরখাস্ত চেয়ে পাঠালেন এবং আমাকে নিয়োগ করবার জন্যে সুপারিশ করে পাঠালেন। তাইতেই চাকরির সুরু। তখন Provincial civil service এ প্রথম probationer হতে হত'। আমি শিক্ষানবীশরূপে মেদিনীপুরের কালেক্টরির সব বিভাগের কাজ শিখতে লাগলুম। তারপর departmental পরীক্ষা। অন্য পরীক্ষায় কোনও গোলমাল হল না। হিন্দী ভাষার পরীক্ষক একজন বিহারী ভদ্রলোক। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"আপ্‌কা মুলুকমে কভি' হ্যাজা হোতা?" জানতাম না 'হায়জা' কাকে বলে। ভাবলাম, বন্যায় জমি ভেসে যায় তাই হবে নাকি। ইতস্ততঃ করছি দেখে ভদ্রলোক বললেন, কলেরার হিন্দী 'হায়জা'। আর দু-একটা প্রশ্ন করেই—হিন্দীতে মোটামুটি জ্ঞান হয়েছে দেখে পাশ করে দিলেন। তারপর চাকরী Confirmed হল।

মেদিনীপুরে যে ছ-সাত মাস শিক্ষানবীশীতে ছিলাম, সে সময়ও সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। আমি চাকরী নেবার পরও আমাদের 'মড়া-টানার' দলটি টিকে ছিল, আর তাদের নিয়ে প্রায়ই মড়া বয়েছি। তখন মফঃস্বলে যে-ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল তার শিক্ষকরা ছেলেদের পরীক্ষা দেবার জন্যে মেদিনীপুরে নিয়ে আসতেন। এইরূপ একজন শিক্ষক মেদিনীপুর হাঁসপাতালে কলেরা হয়ে মারা যান। সংবাদ পেয়ে আমাদের দল নিয়ে হাঁসপাতাল থেকে তাঁর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসি। এরূপ আরও মড়া পুড়িয়েছি।

যে সময় আমাকে মেদিনীপুরে কাজ শিখতে হয়, সে সময় আমার এক ভগ্নীপতি (জ্যেঠতুত ভগ্নী দিদিদিদির স্বামী) শ্রীঅনুকূল মুখোপাধ্যায় কালেক্টরীতে সেরেস্তাদার ছিলেন। তিনি প্রত্যেক বিভাগের কাজ আমাকে খুব যত্ন করে শিখিয়েছিলেন। তখনি বুঝেছিলাম ইংরাজের এই শাসন-যন্ত্র জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে অধীন রাখবার পক্ষেই কার্য্যকরী। ইহার দ্বারা দেশের কোনও গঠন-কাজ করা যায় না। হায়, দেশ স্বাধীন হবার পরও এর কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি।

পূর্ব্বেই বলেছি আমি জোব্বা-চাপকান পরতাম।

একদিন একজনের সঙ্গে তর্ক করে ঐ পোষাক পরেই একটা থলেতে আধমণ চাল মাথায় করে বয়ে বাজার থেকে বাড়ী এনেছিলাম। তর্কটা হয়েছিল দৈহিক-শ্রমের মর্য্যাদা নিয়ে।

তমলুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল' আমাকে চাকুরী Confirmed হতেই। সেখানে তিনমাস কাজ করি। তমলুকে তখন S. D. O. এক বাঙালী (এক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়)। তাঁর পুত্র মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—(পরে হাইকোর্টে ইনি বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল হয়েছিলেন)। সে তখন First Arts পড়ে। কাঁসাই-এর বন্যায় পাঁশকুড়া থানায় ফসলের ভয়ানক ক্ষতি হয়েছিল। Relief দিতে হবে কিনা তার জন্যে আমার উপর ভার পড়ল enquiry করবার। লোকের দুর্দ্দশা দেখলাম তিন-দিন ধরে। সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রিপোর্ট দিলাম S. D. O.-র নিকট। তিনি ডেকে পাঠিয়ে বললেন—"একি রিপোর্ট দিয়েছেন? এ যে এখুনি হৈ চৈ পড়ে যাবে। কালেক্টর এ রিপোর্ট দেখলে চটে যাবেন। দুর্দ্দশাত' হয়-ই। সেটা ও রকম করে লিখতে নেই। সামান্য কিছু হয়েছে কিছু Relief চাই, এই কথাই ভাল।" আমি বললাম,—"যা চোখে দেখে এলাম তাই লিখেছি। আমি বদ্‌লাতে পারব না। বদলাতে হয় আপনি বদলান।" বৃটিশ সরকারের যাঁরা মহকুমা বা জেলার কর্ত্তা হতেন তাঁদের কিভাবে কাজ কত্তে হত সেটা এ থেকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন।

যে সকল ফৌজদারী মকর্দ্দমায় শাস্তি দেওয়া যায় না, সেইসব মকর্দ্দমাই প্রায় S. D. O আমাকে বিচার কত্তে দিতেন। সুতরাং তারা খালাস হয়ে যেত। মকর্দ্দমার বিচারের ফলাফল Divisional Commissioner এর কাছে পাঠাতে হত। আমার প্রায় Cent percent খালাস করার প্রমাণ চাইলেন। আমি লিখে দিলুম,—বিচার করেছি প্রমাণের উপর। গভর্ণমেন্ট যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আপীল করলেই পারেন। আমি কেন কৈফিয়ৎ দোব?—তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বিলাতী চুড়ি বাজারে ভেঙে দিয়েছে, একটি ছেলে। তার দাম চার আনা, পাঁচ আনা হবে। পুলিশ ধরে এনেছে বিচারের জন্যে। S D O তাকে তিন মাসের জেল দিয়েছেন,-যদিও কোন সাক্ষী বলেনি যে সেই ভেঙেছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যার সময় তাঁর লিখা Judgement আমাকে দেখাতে এনেছেন। পড়ে দেখলাম প্রমাণ নেই, টেনেটুনে শাস্তি দিয়েছেন। বললাম—"এরকম করে শাস্তি দিলেন কেন? তাও তিনমাসের সশ্রম কারাদণ্ড।" বললেন,—এ না করলে চাকরী করা যায়?" তাঁর ছেলে মৃত্যুঞ্জয় তখন বাড়ীতে। সে শুনে ভয়ানক রেগে গেছল। কিন্তু, চট্টোপাধ্যায় মশায় 'রায়' বদলালেন না। আমার কাঁথিতে বদ্‌লি হয়ে গেল। সেখানে এক I C S সাহেব S D O তখন। সেখানে পাঁচ মাস ছিলাম। ফৌজদারী মামলার বিচার কত্তে হত, treasury-র কাজ কত্তে হত, আবার মফঃস্বলে কাজ পড়লে ছুটতে হত।

আমি চৈত্র মাসে অর্থাৎ এপ্রিল মাসের গোড়ায় কাঁথি গেছলাম। তখন মেদিনীপুরের নিয়ম অনুসারে সকালে কাছারী বসত, গরমের সময় বলে। জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রী-ব্রত আমার মা আমাদের তিন ভাই-এর স্ত্রীকেই সাবিত্রী-ব্রত ধরিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী তখন মেদিনীপুরে। সাবিত্রী-ব্রত-তে স্বামীর উপস্থিতি প্রয়োজন। সাহেব S D O এর নিকট দু-দিনের ছুটী চাইলাম! তিনি বললেন—আমার Agricultural loan দিতে হবে। সেখানকার জমিদার বাড়ীতে গিয়ে loan-এর দরখাস্ত সংগ্রহ করে এনে তবে ছুটী।" ব্রতই হয়ে গেলে ছুটী নিয়ে কি করব? তিনি বললেন এটা করে দিয়ে যান। একদিন পরেই সাবিত্রী-ব্রত। পরদিন ভোরে উঠে সাইকেল করে সেই জমিদারের বাড়ী গেলাম তাঁদের একটা ঘোড়া নিয়ে সকাল থেকে চার পাঁচটা গ্রাম ঘুরে দরখাস্ত সংগ্রহ করলাম। দুপুরে ভাত খেয়ে সেই কাট-কাটা রোদে আর আর একটা ঘোড়া নিয়ে (সকালেরটা হাঁফিয়ে পড়েছিল) আরও বাকী দুটো গ্রাম ঘুরে দরখাস্ত সংগ্রহ করে ফিরবার মুখে খুব খুশী। কাঁচা মেঠো-রাস্তায় ঘোড়ায় পা বসে যেতে লাগল। হঠাৎ ঘোড়া হাঁটু গেড়ে পড়ল। আমি তার মাথার উপর দিয়ে কাদায় পড়লাম। একটা পা রেকাবে আটকে গেছল। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে রইল বলেই বেঁচে গেলাম। উঠে আবার তার পিঠে চড়ে

ফিরে এলাম। রাত্রে জমিদারদের হাতীতে চড়ে ঐ মেঠো-রাস্তায় কাঁথি ফিরলাম। ফিরতে ভোর হয়ে গেল। সেইদিনই সাবিত্রী-ব্রত। অফিসে S D O-কে দরখাস্তগুলো বুঝিয়ে দিয়ে ভাত খেয়ে সাইকেল নিয়ে বেলা ১১ টায় বেরিয়ে বেলা চারটায় চৌষট্টি মাইল মেদিনীপুর পৌঁছুলাম। এখন সেসব কথা মনে হলে ভাবি—কি শক্তিই শরীরে ছিল। পূর্ব্বদিন, সমস্তদিন ঘোড়ার পিঠে, রাত্রে হাতীর পিঠে, আর পরদিন ৬৪ মাইল জ্যৈষ্ঠের জলন্ত রোদে সাইকেল চালান! আজ ৮৩ বছর বয়সে দু-পা হাঁটা কষ্টকর।

বীরেন শাসমল ব্যারিষ্টার হয়ে কাঁথিতে তার বাড়ীতে ফিরে এসে ঐখানেই Practice সুরু করেছে। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ীতে আড্ডা হত। সেই থেকে তার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয়েছিল সেটা তার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল। শুধু বজায় ছিল নয়, বর্দ্ধিত হয়ে প্রাণে প্রাণে মিলে গিয়েছিল।

একদিন ১০।১১ খানা পাল্কী করে ১০।১১ জন বড়লোক আসামী এসে হাজির। চিত্তরঞ্জন রায় যিনি পশ্চিমবাংলার ষ্টেট মন্ত্রী হয়েছিলেন, তাঁরই বাবা, কাকা, জ্যেঠা ইত্যাদিকে পুলিসে ধরে নিয়ে এসেছে। কি ব্যাপার? আবগারী ইনস্পেক্টর বললেন—"ওঁরা লাইসেন্স না নিয়ে পোস্তদানার চাষ করেছেন বাড়ীতে। পোস্তগাছের থেকেই আফিং বার করা হয়। তাঁদের জিজ্ঞাসা কত্তে তাঁরা বললেন—"পুরুষানুক্রমে তাঁরা বাড়ীর কাছে কয়েক কাঠা জমিতে পোস্তর চাষ করে আসছেন। তাঁদের বাড়ীতে কোন একটি পূজাতে পোস্তর ফুল নাকি দরকার হয়। আফিম বা পোস্তদানার জন্যে চাষ করেন না। আবগারী ইনস্পেক্টরকে বললাম—"আইনভঙ্গের ত' একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। এঁরা বরাবর পূজার জন্যেই সামান্য চাষ করেন, সুতরাং লাইসেন্স প্রয়োজন নয়"। সবাইকে ডিস্‌চারজ করে দিলাম।—আমি ব্রাহ্মণ বলে সেই জমিদারগণ আমাকে প্রণাম করে আবার পাল্কী করে চলে গেলেন। চিত্তরঞ্জন এখনও সেই কথা স্মরণ করে দেখা হলেই প্রণাম করে। বলে,—আপনি সেদিন আমাদের বংশের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে ছিলেন।—

শ্রীক্ষীরোদ ভূঞা (পরে হাইকোর্টের উকিল হয়েছিলেন)—হাটে দশ পয়সার বিলাতী লবণ কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে তাঁকে ধরা হয়েছে। S. D. O. তখন Johnson সাহেব,—তাঁর কোর্টে মামলা। কলকাতা থেকে নামজাদা ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জ্জী তাঁকে defend করছেন। Johnson সাহেব এক বৎসরের জেল দিয়ে ছিলেন দশপয়সার লবণ ছড়িয়েছে বলে। কারণটা হ'ল স্বদেশীওয়ালাদের শাস্তি দেওয়া।—আমি শুনে সন্ধ্যার সময় তাঁর কোয়ার্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'দেশে হলে এই শাস্তি দিতে পারতেন?' রেগে আমার কথার উত্তর দেননি। কিন্তু দু-একদিন বাদে শুনলাম ঐ কথা বলার দরুন আমাকে বরখাস্ত কর্‌বার জন্য লিখে পাঠাচ্ছে উপরওলার কাছে। তখন তরুণ I, C, S,—মেজাজ খুব গরম। আমি ছুটি নিয়ে Carr সাহেবের কাছে কলকাতায় এলাম। তাঁকে সব বললাম,—"অন্যায় সহ্য হয়নি বলে আমি ঐ কথা বলেছি। তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন,—'চাকরীও কর্‌বে আবার ঐ সব কথাও বল্‌বে?—তিনি বললেন—জেনারেল বিভাগে না থেকে বরং ছোটনাগপুরে সেট্‌লমেণ্টের কাজে যাও। সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লি করে দিলেন। সেপ্টেম্বর মাস। আমি সাতদিনের মধ্যে রাঁচি চলে গেলাম।

রাঁচিতেই ছোটনাগপুরের সেটেল্‌মেণ্টের প্রধান আফিস। রাঁচিতে শ্রীউদ্ধবচন্দ্র রায় বলে প্রসিদ্ধ গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টরের বাড়ী। তাঁর দেশ আমাদের আড়ার কাছেই। আমাদের সব জানতেন। তাঁকে লিখলাম, আমি সেট্‌লমেণ্টে যোগ দিতে যাচ্ছি। তাঁর বাড়ীতে উঠে বাসা খুঁজে নোব। আমার সঙ্গে যাচ্ছে মেদিনীপুরের শ্রীঅমূল্য দত্ত। তিনিও প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের লোক,—সেটেল্‌মেণ্টে যোগ দিতে যাচ্ছেন। আমরা একসঙ্গে First Arts থেকে M, A, পর্য্যন্ত পড়েছিলাম। তাঁর আর একটা পরিচয়,—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর জামাতা। আমরা এক যায়গায় থাকব' স্থির করে একসঙ্গেই যাচ্ছি। রাঁচিতে পৌঁছে দেখি, উদ্ধববাবুর বড় ছেলে শ্রীআশুতোষ রায় উকিল

মহাশয় আমাদের নিতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, আর কম্পাউণ্ডও প্রকাণ্ড। জামাকাপড় ছাড়বার উদ্যোগ করছি, উদ্ধববাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, গেটের কাছে রাঁচির Deputy Commissioner আমায় ডাকছেন। গিয়ে দেখি, মোটর-গাড়ীতে ডেঃ কমিশনার ও পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল বসে আছেন। যাওয়া মাত্র ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন,—আমি রাঁচিতে কেন এসেছি।—আমি বললাম,—পার্টিতে যোগ দিতে। তিনি বললেন,—'What are you?' আমি তখন একটু আশ্চর্য্যও হয়েছি বিরক্তও হয়েছি। বললাম I am Dy, Magistrate, now Assistant Settlement Officer"। তিনি 'থ'-হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে হো-হো- করে হেসে উঠলেন। বললেন,—"I was wrongly informed. Somebody sent a telegram stating Sri. SatcouriPati Roy an anarchist is going to Ranchi. He should be properly dealt with. The special train carrying Lt. Governor is coming in three hours. I ordered S, P, to arrest you at the railway platform. He went there, but he found Ashubabu was there to receive you, He used his discretion and came back and informed me accordingly. However, I beg your pardon. You will be pleased to join the Darbar to be held tomorrow by His Excellency" হাসতে হাসতে চলে গেলেন। বুঝলুম মেদিনীপুরের পুলিশের কাজ। যাই হোক, আমি তখনি পরিচিত হয়ে গেলাম রাঁচিতে—এই ব্যাপারে।—দু-তিনদিনের মধ্যেই বাড়ী খুঁজে আমরা উঠে গেলাম।

একমাস শিক্ষানবীশির পর ক্যাম্পে যেতে হল। যে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছিলাম, ক্যাম্পে যাবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাতে আমি আর অমূল্য একসঙ্গে ছিলাম। আমি ব্রাহ্মণ ও চাকর নিয়ে গেছলাম। সেপ্টেম্বর মাসে রাঁচিতে প্রায় বৃষ্টি হচ্ছিল। একদিন field work করে সন্ধ্যার কাছাকাছি ফিরে এসে বসেছি। বৃষ্টি সামান্য সামান্য পড়ছে। বাড়ীটার সামনের রাস্তার ওপারে একটা মাঠ। অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল ঐ মাঠ থেকে একটি স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ কানে আসছে। আর, মনে হল বাঙ্গালী স্ত্রীলোক কাতরাচ্ছে। একটা হ্যারিকেন নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেলুম। দেখি একটি বাঙ্গালী যুবতী মাঠে পড়ে কাতরাচ্ছে। আলো নিয়ে কাছে যেতেই গন্ধে বুঝতে পারলাম তার কলেরা হয়েছে। কিছু বলতে পারে না। জলে ভিজে গেছে। আলো রেখে ছুটে এসে অমূল্যকে বল্লাম। কলেরা শুনেই সে অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু তখন উপায় নেই। আমার ব্রাহ্মণ, রাজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমারই মত ছিল। তাকে নিয়ে দুজনে সেই মেয়েটিকে তুলে এনে একটি ঘরে শোয়ালাম। চারখানা ঘর ছিল। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করালাম। তিনদিনে সে চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাঁর মুখে শুনলাম, এক বিহারীবাবু কলকাতা থেকে তাকে বের করে এনে দুজনে রাঁচিতে মাস দুই আছে। তার কলেরা হতে তাকে মাঠে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে। কি করা যাবে? খরচা দিয়ে তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম। অমূল্য যে কি করে সেই তিনটে দিন কাটিয়েছিল তা ভগবানই জানেন। সে ভয়ানক ভীতু ছিল। ঘোড়ায় চাপতে যে কত কষ্টকরে শিখেছিল তা বলবার নয়।

পাঁচমাস ক্যাম্পে থেকে সেটেলমেণ্টের কাজের প্রথম পর্য্যায় শেষ করে আবার রাঁচি সহরে ফিরে এলাম। এই পাঁচ মাসে রাঁচি জেলের যে আদিবাসী আছে তাদের জীবন-চিত্র ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। ওখানে 'ওদের সাধারণ নাম— কোল'-জাতি। ওদের প্রধানতঃ চারটে বিভাগ আছে। মুণ্ডা, উরাঁও, খাড়িয়া এবং হো। দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে সাধারণতঃ মুণ্ডারা বাস করে। তারা মানভূম জেলা পর্য্যন্ত চলে এসেছে। উত্তর-পশ্চিমে উরাঁও-রা বাস করে। খড়িয়া ও হো সিংভূমের সীমানা বরাবর বাস করে এবং সিংভূম জেলাতেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই উরাঁও-রাই বেশীরভাগ খৃষ্টান হয়েছে। মুণ্ডারাও অনেকে খৃষ্টান হয়েছে। কিন্তু হো জাতি খুব গভীর জঙ্গলে আর পর্ব্বতের চূড়ায় বাস করত,—তাই খৃষ্টানও কম। আমি যে সময়ের

কথা বলছি অর্থাৎ ১৯০৭ থেকে ১৯১০ সাল,—তখন হো জাতি প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় থাকত'। খাড়িয়া জাতির সংখ্যা খুব কম ছিল। মুণ্ডারি ও উরাঁও ভাষা আমি শিখবার চেষ্টা করেছিলাম। জার্মান মিশনারিরা রাঁচি জেলার অভ্যন্তরে বড় বড় চার্চ প্রস্তুত করে রাজার হালে বাস করত। তারাই মুণ্ডারী গ্রামার তৈরী করেছিল। যদিও সেটেলমেন্ট রেকর্ড 'কারুভি' ভাষায় প্রস্তুত হয়েছিল, মুণ্ডারী ও উরাঁও ভাষা শেখাতে আমার কাজের খুব সুবিধা হয়েছিল।

প্রতিগ্রামে ধুমকুড়ি নামে একটি সাধারণের গৃহ থাকত। গ্রামের অধিকাংশ যুবক যুবতী যাদের বিবাহ হয়নি, ধুমকুড়িতে নাচ-গান করত, এমন কি রাত্রি যাপন করত। বিবাহের পূর্বে মেয়ে পুরুষে যৌন সম্পর্কে কোনও দোষের ছিল না। কিন্তু, বিবাহের পর কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক নিজ নিজ স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া অপরের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক করলে অত্যন্ত ঘৃণীয় হত' ওদের সমাজে। তার জন্য বিচার হয়ে তার দণ্ডও হত। পুরুষরা জ্যাকেট পরত' এবং শীতের সময় তাদের নিজেদের বোনা একপ্রকার চাদর ব্যবহার করত'। মেয়েরা কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা কাপড় পরত। বুকে কিছু ঢাকা দিত না। শীতের সময় পুরুষদের মত ছোট চাদর ব্যবহার করত। পুরুষরা বাবরী-চুল রাখত এবং প্রায় প্রত্যেকের মাথায় একটা করে কাঠের চিরুণী থাকত। মেয়েরা খোঁপা বেঁধে ফুল পরত। ধানকাটার পর ওদের হেঁড়ে প্রস্তুত করবার সুবিধা হত এবং সেই সময় মেয়ে-পুরুষ মিলে রাত্রে মাদল বাজিয়ে নাচ-গান করত। অনেক সময় আমাকে রাত্রে ঠাণ্ডায় বসে ওদের নাচ-গান দেখতে হয়েছে এবং বক্সিস দিতে হয়েছে।

ওদের দোলের সময় শিকারের একটা বড় পর্ব্ব। প্রত্যেক গ্রাম থেকে দলে দলে গিয়ে পাহাড়ের তলদেশে জমায়েত হত এবং অপর দিক থেকে বাজনা বাজিয়ে শিকার তাড়িয়ে আনত। শিকার মারবার জন্যে এক এক গ্রামের লোক খানিকটা করে লাইন দিত। যার লাইনের কাছে শিকার আসত তারা টাঙ্গি দিয়ে শিকারকে মারত। যদি কোনও গ্রামের লোক শিকার না পেত' তাহলে তাদের পর বৎসর জন্য ভাল যাবে না বলে ওরা ধরে নিত। একে ওরা ফাগুয়া-শিকার বলত। ঠিক রাজপুতদের যেমন পূজার সময় বসন্তের দিন আহেরিয়া-শিকার ছিল, ঠিক সেই রকম।

যারা খৃষ্টান হয়নি তারা খুব সোজা মানুষ ছিল। মিথ্যাকথা বলত না। কিন্তু যারা খৃষ্টান হয়েছিল তারা পাদ্রীদের প্ররোচনায় মিথ্যা বলত, স্বার্থের জন্যে যখন দরকার হত। এটেষ্টেসন করবার সময় যে সব বিরোধ (dispute) হত তার সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসা করতে হত আমাকে। আমার প্রত্যেক পাক্ষিক রিপোর্টের decision করবার বিবরগুলি সেটেলমেন্ট অফিসার John Reed সাহেব পড়ে দেখে Nelson সাহেব I. C. S কে (আমাদের পাঁচ জন ক্যাম্পের Circle officer) আমার কাছে শিখবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন।

রাঁচি জেলার Land system (জমিবন্দোবস্ত) খুব সোজা ছিল। রাঁতু-গড়ের রাজা মাত্র সমস্ত রাঁচী জেলার জমিদার ছিলেন। সুতরাং ঐ জেলার মাত্র একটি তৌজী ছিল। গভর্ণমেন্টের রেভিনিউ ঐ একটি তৌজী থেকে আদায় হত। তারপর তাঁর অধীনে সব জাইগীরদার ছিল। তাঁদের খাজনা যদিও fixed ছিল, কিন্তু সত্ব Permanant বা transferable ছিল না। এই নিয়ে খুব বড় একজন জাইগীরদারের সত্ব সম্বন্ধে বিচার করবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। আমি বহু সাক্ষী ও কাগজ পত্র দেখে ৮৪ পৃষ্ঠার একটি রায় দিই। সেই রায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত বহাল ছিল।

ক্যাম্প-জীবনের পর প্রথম বৎসর যে মাসে রাঁচী সহরে ফিরে এলাম। জুনমাসে বর্ষা আরম্ভ হলে সেটেলমেন্ট থেকে সাময়িকভাবে আমাকে Debt Releiving officer করে Dy Commissioner এর অধীনে পাঠিয়ে দিলে। ওখানে বিহারীরা এবং এমন কি পাদ্রী-রাও ঐ সব জঙ্গলবাসী নিরীহ লোকদের টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে ওদের জমি নিয়ে নিত। গভর্ণমেন্ট থেকে স্থির হয় "মুণ্ডারী লোন" দিয়ে তাদের সব ধার শোধ কোরে দিয়ে সেই টাকা কিস্তি-বন্দীতে ধীরে-সুস্থিরে বিনা সুদে আদায় করা। তাই আমাকে ক্ষমতা দেওয়া হোল—ধারশোধ করে টাকা দেবার এবং সাদা কাগজে মুণ্ডাদের কাছ থেকে বণ্ড-রেজেষ্ট্রী করে

নবার। আমার সঙ্গে খৈরারী, খাজাঞ্চি, রেজেষ্ট্রীর কেরানী, রকীদল ইত্যাদি সঙ্গে দেওয়া হল। আমি এই দলবল নিয়ে াঁচী জেলার প্রত্যেক থানায় থানায় প্রচার করে তাদের রনা শোধ করার ব্যবস্থা করলাম। ওতে ওদেশের বিহারী ও পাদরীদের সম্বন্ধে আমার বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ারের টাকা বাবদ তারা কত রকমে যে অজ্ঞ লোকদের াকিয়ে মিথ্যা করে জমি নিয়ে নিত তা লিখতে হলে একটা াড় বই হয়ে যাবে। আমাকেও তারা কম ঠকাবার চেষ্টা রেনি। শেষে পাদ্রীরা বুঝেছিল আমার কাছে সত্য কথা া বললে সমস্ত টাকাই তাদের জলে যাবে। কারণ দেনা ম্বন্ধে আমার বিচারই final ছিল,—আপীল চল্‌ত না।

এই ট্যুরে (tour) আমার যা অবস্থা হয়েছিল তার একটু বর্ণনা দিই। বর্ষাকাল রাঁচি থেকে বসিয়া থানা াচ্ছি। পাঁচদিন আগেই গরুর গাড়িতে সব জিনিষপত্র ও লোকজন রওনা হয়ে গেছে। আমি সকালে খেয়ে াইকেলে চলেছি। বর্ষাতি গায়ে। যেতে হবে বাহান্ন াইল। আঠাশ মাইলের যায়গায় সাইকেল ফুটো হয়ে গেল। াপ্পি দিয়ে একবার মেরামত করলাম। আবার মাইল দুই যেতেই টিউব কেটে বেরিয়ে গেল। ঠেল্‌তে ঠেলতে আরও -মাইল হেঁটে গিয়ে একটা ছোট ইন্‌সপেক্সন বাংলো পলুম। সেখানে একটা ফাঁড়ি আছে। ফাঁড়ির জমাদারকে াকলুম। প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। তখনও প্রায় কুড়ি মাইলের উপর বাকী আছে গন্তব্যস্থল। জমাদার বললে, কাছেই একজন জায়গীরদার থাকেন তাঁকে ডেকে আনলে সব ব্যবস্থা তে পারে। ডাকতে গেল। তিনি প্রথম ভয়ে আসতে াননা। তারপর এলেন। বিহারী ভদ্রলোক বললেন,— ভনি চাপাটি করে পাঠাচ্ছেন। তাঁর 'পুষ্‌পুষ্‌' আছে,— াটজন কুলী হলে রাত্রে বেরুলে সকালে পৌছে দেবে। মাদারকে বললাম, আটজন কুলীর ব্যবস্থা করতে। সঙ্গে কিছু নেই। রাত্রি দশটার সময় চাপাটি এল। রাত্রি ারটা নাগাদ কুলী যোগাড় হল। প্রায় একটার সময় বৃষ্টি ামল। তখন 'পুষ্‌পুষে' বেরুলাম। 'পুষ্‌পুষ্‌' জিনিষটা কি তা হয়ত অনেকে জানেন না। সে একটা ঘাটহীন াড়ীর মতন। লম্বায় ছ-ফুট, চওড়ায় চার ফুট, আর উঁচুতেও চার ফুট। পিছনদিকে দরজা। নীচে গরুর গাড়ীর মত দুটো চাকা। মানুষে ঠেলে নিয়ে যাবে। জায়গীরদার ভদ্রলোক একটা সতরঞ্চী দিয়েছিলেন। হাফ্‌-প্যান্ট পরা আমি তার উপর বসলাম। মাইল দুই যাওয়ার পরই পাহাড়ী নদী। হুড়হুড় করে নামছে—বান এসেছে। কুলীরা প্রথমে খুব ভয় পেলে, কারণ প্রায় সাঁতার জল। আমি সাহস দিতে আটজনে টেনে পরপারে তুল্‌ল। তলাটা ভিজে গেল,— আমি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলাম। পার্ব্বত্য পথ—জঙ্গল পূর্ণ। বেলা আটটা নাগাদ ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে তারা যে গাঁয়ে গেল সেটা বসিয়া থানা থেকে প্রায় ৬,৭ মাইল দূরে। কুলিরা বললে খিদে পেয়েছে বাবু, না খেলে আর ঠেলতে পাচ্ছি না। টাকা দিলাম,—গাঁয়ে খাবার পাওতো আন। ছোট গ্রাম, খাবার পেলে না। শেষ মাঠে কচি ভুট্টা তুলে খেয়ে, জল খেয়ে বেলা বারটার সময় বসিয়ার বাংলোয় পৌছে দিলে। গরুর গাড়ী, লোকজন তার আগে আটটার সময় পৌছে তারা তাঁবু খাটিয়েছে। আমার চাকর, বামুন ছিল তারা রান্না করে বেলা দুটোর সময় খেতে দিলে। বাংলোর মধ্যে প্রকাণ্ড উইঢিপি। চৌকিদার বললে-দু বছরের মধ্যে কেউ সেখানে আসেনি। চারদিকে হাঁটু সমান ঘাস। পরদিন পরিষ্কার করা যাবে। ঘরে খাট্‌ টেবিল-চেয়ার আছে। আমারও পথক্লান্তি। সন্ধ্যার সময় টেবিলের উপর লুচি তরকারী খেয়ে শুতে যাব। চাকর বেরিয়ে গেছে। দরজাটা খুব বড়, প্রায় আটফুট লম্বা। দরজা বন্ধ করতে যেতেই একটা কোমল পদার্থে যেন দরজাটা আটকে গেছে মনে হল। উপরদিকে চেয়ে দেখি বড় গোখ্‌রো ছোবল মারার জন্যে মাথার ঠিক ওপরেই। দরজা ছেড়ে পিছনে লাফ দিলাম। সাপটা নীচে পড়ে ফণা ধরেছে। চিৎকার করে টেবিলে উঠলাম। চাপরাশীরা ছুটে এল। সাপ বাইরে লাফ দিয়ে ঘাসে ঢুকে গেল। বড় বিপদ। প্রকাণ্ড ঐ উইঢিপিতে সাপ থাকবে তার আর বিচিত্র কি? কি করব ক্লান্তিতে চোখ জুড়ে আসছে। মশারী গুঁজে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। পরের দিন ঘাস ও উইঢিপি পরিষ্কার করাই। ছ-মাইল দূরে এক ডিসপেন্সারি থেকে কার্ব্বলিক এ্যাসিড আনিয়ে ছড়ালাম চারদিকে। সেই থানায় কাজ সারতে প্রায় একমাস।

এরপর বানো থানার ক্যাম্প তুলে নিয়ে যাব। মাঝে পড়ে কইল্ নদী। বর্ষার ভয়ঙ্কর স্ফীতি হয়েছে। পারাপারের কোনও নৌকা নাই। তাদের ডোঙা আছে। দুটো ডোঙাকে জুড়ে তার উপর তক্তা দিয়ে ট্রেজারীর সিন্দুকপত্র পার করলুম। এবং তার সঙ্গে রক্ষী। তারপর পাঁচ সাত বারে সমস্ত দল পার হলে আমি শেষ ক্ষেপে পার হলাম। প্রায় ৪০০ গজ নদী তখন চওড়া ও প্রবল টান। 'বানোতে থানারই একটেরে ইন্‌সপেক্সন বাংলো। সামনেই প্রকাণ্ড পাহাড় জঙ্গলে পূর্ণ। সকালে ৮।৯ টার সময় বাংলোতে বসে কায করছি। হঠাৎ হৈ-চৈ শুনে বেরিয়ে এসে দেখি দু-টো বাঘ (ওখানে সব লেপার্ড) একটা গরুকে ধরে টেনে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলেছে। সবলোক হৈ-হৈ করে ছুটতেই পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট নদীর এপারে মরা গরুটা রেখে নদী ডিঙিয়ে পাহাড়ে উঠে বসে রইল বাঘ দুটো দেখা যাচ্ছে, —সরেও না কোথাও। আমি বললাম,—চারটে বন্দুক আছে। এস সব বাঘ দুটোকে মারা যাক্। ওখানকার লোকেরা বললে—বাবু ঐ পাহাড়ে অন্ততঃ ২৫।৩০টা বাঘ আছে। কখন কোথায় পেছন থেকে ধরবে তার ঠিক নেই। ওখানে এখন যাওয়া যাবে না। শীতকালে জঙ্গলের পাতা ঝরে গেলে ফাঁকা হয় তখন যাওয়া যেতে পারে। গরুটাকে পরের দিন সকালে আর দেখতে পাওয়া গেল না,—রাত্রেই নিয়ে গেছে।

বানো থেকে শুমলা যাব। লটবহর আগে চ'লে গেছে। আমি সাইকেলে পরে যাই। খানিক গিয়ে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে নদী। হুড়হুড় করে জল নামছে। কতটা গভীর জানি না। বাইক্ ঘাড়ে করে পার হতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। দু-জন ওরাও এল। হাতে টাঙি। ওদের দেশের লোক অস্ত্র ছাড়া পথে বার হয় না। আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, ওপারে যাব কি না। হ্যাঁ, বলায়, বললে—এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হয়নি। বাঘ এসে অনায়াসে ধরত'। নদীতে চোরাবালি আছে, তাই দু-জনে আমাকে ধরে ঠিক্ জানাপথ দিয়ে পার করে দিলে। আবার ফিরে গিয়ে বাইকটা এনে দিলে। পয়সা দিতে গেলাম, কিছুতেই নিলে না। ওরা সাহাসিধে—উপকার করে পয়সা নেয় না। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার হয়েছে।

শুমলা থানা থেকে রাঁচীর দিকে ফিরবার পথে 'মাড়া' থানায় এসে এক আম বাগানে তাঁবু ফেলেছি। দু-তিন দিন বাদে একটি লোক সকালে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। চাপরাশীকে দিয়ে তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলাম—কাঁদছে কেন। সে বললে, তার ছেলেকে সাপে কামড়েছে এবং সে মরে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তা এখানে এসে কাঁদছে কেন? কাঁদলে ত ছেলে ফিরবে না। সে বললে—ছেলে মরেছে বলে কাঁদছে না। দারোগা গিয়ে পুড়োবার হুকুম না দিলে ত' পুড়োতে পারবে না। কিন্তু, দারোগাকে যে টাকা দিতে হবে সে টাকা সে কোথা পাবে? তাই হুজুরের কাছে এসে কাঁদছে যদি কোনও প্রকারে টাকা না দিয়ে পোড়াবার হুকুম হয়।

পুলিশের অনেক জুলুম আছে জানতাম। কিন্তু, ওরকম একটা জুলুম আছে তা জানতাম না। ছেলে সাপ-কাটিতে মরেছে। পুলিশ তদন্ত করে পোড়াবার হুকুম দেবে। টাকা না দিলে হুকুম মিলবে না? ছেলে মরার কান্না নয়,—টাকা কি ক'রে যোগাড় করবে তার জন্যে কেঁদে আকুল? তার গ্রাম দূরে নয়। চাপরাশি পাঠিয়ে তাদের লোকদের ডাকিয়ে এনে—সত্যই সাপকাটিতে মরেছে জেনে পোড়াবার হুকুম দিলাম। দেখলাম হুকুম পাওয়া-মাত্র তার মুখে হাসি ফুটে উঠেচে।—ভাবলাম, এই গরীব লোকদের ওপর কি অত্যাচার না হয়। সে লোকটা আমার সামনে থেকে আড়াল হ'য়ে যেতেই আবার তার কান্নার শব্দ পেলাম। চাপরাশিকে পাঠালাম তাকে আনতে। সে এসে বলে, আমার সঙ্গে যে armed পুলিশ ছিল, আড়ালে যেতে দারোগার নামে লাগিয়েছে বলে তাকে মারছে। প্রমাণ নিয়ে সেই পুলিশটাকে সাসপেণ্ড করলাম এবং রাঁচীতে Dy Commissioner এর কাছে রিপোর্ট করলাম।—অত্যাচারের বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

চারমাস ঘুরে আদিবাসীদের ধার শোধ করে সেপ্টেম্বরে রাঁচী ফিরলাম। অক্টোবরে আবার সেটেলমেন্টের কাজে, আবার ক্যাম্পজীবন।—

সেই বৎসর মেদিনীপুরে বোমা-কেসে প্রথম নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ থেকে শুরু করে সহরের যত বড়লোককে ধরে জেলে পুরেছিল পুলিশের ডেপুটি সুপার মজরুল হক, আর মনোমোহন গুহ ইনসপেক্টার, শেষে লর্ড সিংহ, এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল গিয়ে তিনজন রাজে বাকী সবাইকে ছেড়ে দেন।

একদিন জন-রীভ সেটেলমেন্ট অফিসার আমার ক্যাম্পে হঠাৎ ইনসপেক্সনে এল’। ইনস্‌পেকসন হ’য়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠালো। মদ খাচ্চেন। বললেন,—বস’। হঠাৎ বল্লেন,-মিঃ রায়,-রাঁচীতে কে যেন বলছিল মেদিনীপুরের বোমার মামলায় তোমার বিরুদ্ধে কি সব প্রমাণ দিয়েছে সাক্ষীতে। আমি বিস্মিত হয়ে বল্লাম, কি প্রমাণ স্যার। বললেন—I don’t know. I don’t care to know. You better write to the Head office. তারপর বললেন, Do you know I am an Irishman? আমি বললাম, আমি তা জানতাম না। তখন বললেন—তোমাদের মত আমাদের আইয়ারল্যাণ্ডেও ইংরাজীটা first language to be studied and Irish is second language in our schools. কি করব’ চাকরী নিয়ে এখানে এসেছি। যাক্‌ ও কথা।”—বুঝলাম ইংরাজ যে দেশ দখল করে সেখানের সংস্কৃতি ভুলিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি তার উপর চাপিয়েছে। তবু আইয়ারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা পার্লিয়ামেন্টে প্রতিনিধি পাঠায়।

তারপর হেড অফিসে লিখতে তারা সংবাদপত্র কয়েকটি পাঠিয়ে দিয়েছিল। মজরুল হক সাক্ষী দিয়ে বলেছে, সাতকড়িবাবু নিজে টাকা দিয়েছেন এবং টাকা তুলেও দিয়েছেন বোমা তৈরী করবার জন্যে। মেদিনীপুরের বোমা মামলাটা সার্জিন গিয়ারের উপর হয়েছিল। যাক্‌ সে কথা।

সে সালে ক্যাম্প থেকে রাঁচী এলাম। বর্ষায় বাইরে যেতে হলে না। স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে এলাম। তখন একটা ছেলে ও একটী মেয়ে। সেটা জুলাই মাস। হঠাৎ রীভ সাহেব ডেকে পাঠালেন। বললেন—‘রাঁচী আর হাজারিবাগ জেলার সীমানা নির্দ্ধারণ হয়নি। সেটা এই বর্ষার সময় করে ফেলতে হবে। সবই পাহাড় আর জঙ্গল। তুমি যেতে পার’।—আমি বললাম—পূর্বে বলেছি। আমি আমার family নিয়ে এলাম! ”—বললেন;—তাতে কি হ’য়েছে, লেখাপড়ার কাজ ত’ নয়। ক্যাম্পে family নিয়ে যাও। সেটা অনুমতি আমি দিচ্ছি।”—ব্যস্‌ আমায় কৃতার্থ করে দিলেন। ছোট ছোট দুটো ছেলে মেয়ে বর্ষার সময় জঙ্গল পাহাড়ের তলায় ক্যাম্পে নিয়ে যাই! শেষে সাব্যস্ত করলাম, ঠিক আছে,—ওরা কেলা থাকবে। সকালে সাইকেল করে তাঁবুতে যাব’। সমস্ত দিন কাজ করব’। বিকালে সাইকেল করে আবার ফিরে আসব। তিন মাস এই ভাবে রাঁচী-হাজারীবাগ সীমানা চিহ্নিত করেছিলাম। প্রত্যহ গড়ে ৫০ মাইল সাইকেল চালাতে হত’। সেটেলমেন্ট অফিসার খুব খুসী।

অক্টোবরে আবার ত’ ক্যাম্পে যেতে হবে। সেপ্টেম্বরে ছেলে-মেয়েদের বাড়ীতে রেখে এলাম। অক্টোবরে ভুবনদা বললেন,—সাতকড়ি তোমায় রীভ সাহেব ডাকছেন। ভুবনদা (ভুবন চট্টোপাধ্যায়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জামাতা) তখন হেড কোয়ার্টারের চার্জে। রীভ সাহেবের কাছে যেতে তিনি বললেন,-গভর্ণমেন্ট তাঁকে ছোটনাগপুর টেনেন্সী এ্যাক্ট compile করতে বলেছেন। তিনি ভুবনবাবুকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। ভুবনবাবু আপনার সাহায্য চান,—কারণ আপনি বি, এল পাশ করেছেন,-আপনার আইনের জ্ঞান আছে। এতদিন Bengal Tenancy Act বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চলছিল। ছোটনাগপুরে সেটেলমেন্টও ঐ আইন অনুসারে চলছে। গভর্ণমেন্ট ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের প্রাধান্য রেখে তাদের জমি সম্বন্ধে নানারকম restriction করে আইন করতে চায়। রীভ সাহেব বললেন, —তুমি ভুবনবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব ব্যবস্থা কর। ভুবনদাকে বললাম,—এ আবার আমাকে কিসের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন? তিনি বললেন,—তুমি সাহায্য না করলে আমি একাজ পারব’ না। আর, রীভ সাহেবকে দেখেছ ত’, ও কিছুই করবে না। অথচ, শেষ গভর্ণমেন্টের কাছে নাম কিনবে।’ যাই হোক, দুমাস খেটে একটা Draft খাড়া করে দিয়ে জানুয়ারী মাসে আবার ক্যাম্পের কাজে লাগলাম। রীভ সাহেব যদিও নিজের নামই বহাল রেখেছিলেন, কিন্তু

আমার আর ভুবনবাবুর সাহায্য না পেলে ঐ আইন প্রণয়নের কাজ হত না ব'লে রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন। সেই বৎসরেই ক্যাম্পে আমার কাছে Bengal Tenancy Act এর ১০৬ ধারার মকর্দ্দমায় ছোটনাগপুরের জায়গীরদারী স্বত্ব সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রায় দিই। ১০৬ ধারার বিচার শেষ করার পরেই আমাকে হাজারীবাগে সেটেলমেন্ট সুরু করবার জন্যে সমস্ত preliminary enquiry করবার কাজে পাঠানো হল। তিনমাস ধরে সব enquiry করে রিপোর্ট দিলাম। পর বৎসর সেখানে সেটেলমেন্ট সুরু হয়। ঐ enquiry করবার সময় রামগড় বাংলোতে জীতেন সরকার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি তখন কো-অপারেটিভ বিভাগে রয়েছেন। কো-অপারেটিভের রেজিষ্ট্রার এবং জীতেনবাবু তখন রামগড়ের বাংলোতে ছিলেন, আমিও সেখানেই উঠলাম। তিনচার-দিন একসঙ্গে থাকি। আজ মনে পড়ছে রাঁচী-হাজারীবাগ রোডের উপর যেখানে রাঁচীর সীমানা শেষ হয়েছে তারপরই সুবর্ণরেখা নদীর পরপারে রামগড়ের বাংলো। ওঁদের সঙ্গে তর্ক করে সাত মাইল পথ সাইকেল ক'রে ছ-সাত শত ফুট উঁচু বড়কা পর্ব্বত পর্য্যন্ত আমি ঐ খাড়াই ভেঙে উঠেছিলাম। কখনও কেউ সাইকেল চেপে ওখানে ওঠেনি। আমি এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে উপরে উঠে প্রায় চার ঘণ্টা পড়েছিলাম। ঐ জীতেনবাবুই পরে ১৯২২ সালের জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আমার কংগ্রেস আসামী রূপে বিচার করেন।—

সেপ্টেম্বরে ক্যাম্প নিয়ে হাজারীবাগে কাজ সুরু কোরলাম। কিন্তু সেখানে ভীষণ ম্যালেরিয়া। আমার সমস্ত কর্ম্মচারী ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ল। আমি জ্বর অবস্থায় মেদিনীপুরে চলে আসি। সেখানে সুস্থ হয়ে এক দিনের জন্যে আড়া যাই এবং তার পরে আবার ক্যাম্পে যাই। সে বৎসর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। হাজারীবাগে সেটেলমেন্টে আমাকেই সম্পূর্ণ চার্জ্জ নিয়ে থাকতে হয় এবং Bengal Cess Act ammend করতে হয়। সেটেলমেন্ট রেকর্ড প্রস্তুত হলে তার উপর ভিত্তি করে রোড়শেস ধার্য্য করতে হবে তার জন্যে একটা নূতন অধ্যায় Cess Act তে যুক্ত করা হয়। সেটা আমিই compile করে দিই।

হাজারীবাগ ক্যাম্প থেকে ফিরে এলে রিড সাহেব আমাকে হেড কোয়ার্টারের চার্জ্জ দিলেন। বললেন, 'তোমার এখন আর ক্যাম্পে পাঠানো হবে না।' তাই আমি আবার একটা বড় বাড়ী ভাড়া নিয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গেলাম। সেটা ১৯১০ সাল। দাদার বড় জামাতা বি, এল পরীক্ষার্থী, তাই আমার কাছে গিয়ে সেখানেই পড়াশুনা করেছিলেন। সেই বৎসরেই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা গেলে তাকে আমিই পুড়িয়ে আসি,-সে কথা পূর্ব্বে বলেছি।

এই এক বৎসর হেডকোয়ার্টারে থাকাকালীন আমার একটা বদ অভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স বগলে করে চটি পায়ে কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে গিয়ে অসুখের চিকিৎসার বাতিক হয়। এ অভ্যাস আমার পড়াশুনা শেষ হবার পর থেকেই। হোমিওপ্যাথির বই নিয়ে ঐ বিষয়টা শিখবার খুবই অভিলাষ ছিল,—চর্চ্চাও করতাম। গরীব কর্ম্মচারীরা, হেড অফিসে যাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার,—তারা আমায় এসে ধরত'। অফিসের পর ঔষধের বাক্স নিয়ে তাদের বাড়ী যেতাম।

রাঁচীতে আমার কয়েকটি বন্ধু হয়েছিল। উদ্ধববাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র আশুবাবু (যদিও তিনি বয়সে বড় ছিলেন) উকিল,—বসন্ত চাটুয্যে উকিল, কালিদাস ঘোষ প্রভৃতি। অবশ্য সেটেলমেন্ট অফিসের সহকর্ম্মীদের মধ্যে ভুবনদা আমায় খুবই ভালবাসতেন, আর ভালবাসতেন হরিদাস রায়। সকলের সঙ্গেই হৃদ্যতা ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ের বন্ধু সুরেন ঘোষও তখন ডেপুটি হয়ে সেটেলমেন্টে এসেছেন,—তার সঙ্গে খুবই সম্প্রীতি ত' ছিলই। রাঁচীতে বাঙালীদের বেশ বড় একটা ক্লাব ছিল। তাতে বাঙালী উকিল, গভর্ণমেন্ট অফিসার এবং অন্যান্য বাঙালী যাঁরা জীবনে সু-প্রতিষ্ঠিত তাঁরা ঐ ক্লাবে সভ্য হতেন। ছোট নাগপুরের ডিভিস্যানাল কমিশনারের personal assistant সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কান্তি সেন মশায়ও ঐ ক্লাবের সভ্য ছিলেন। আমায় এই ঔষধের বাক্স নিয়ে কর্ম্মচারীদের

বাড়ীতে আমার যাতায়াতটা কান্তিবাবুর মোটেই পছন্দ হত না। তিনি নাকি বলেছিলেন,—সাতকড়িবাবুর কি dignity-র জ্ঞান নেই? নিজের position র মর্য্যাদাও রাখতে জানেন না? কেরানীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান। —কথাগুলো আমাকে জানালেন কালিদাস ঘোষ। বসন্তও সেটা support করলে। আমি হেসে বললাম,—কান্তিবাবুর ত' মর্য্যাদাজ্ঞান খুব টন্‌টনে দেখছি। ডেপুটীর পায়া কি রাজা-রাজড়ার মত যে নীচের দিকে তাকালেই মর্য্যাদাহানি হয়। পরোপকার কি সেটা বোধহয় জীবনে কখনও উপলব্ধি করেননি।' আমার মনে এই ক্লাসের ডেপুটীদের প্রতি ভয়ানক ঘৃণার উদ্রেক হত। দাদাকে আমি লিখি এই সব ডেপুটীরা জুনিয়ার বলে মাতব্বরি করে, কিন্তু এদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতে পর্য্যন্ত ঘৃণা হয়। চাকরি করবো কি? দাদা আমার জীবনের সব কথাই জানতেন। তিনি লিখলেন,—অসহ্য বোধ কর ত' ছেড়ে দাও চাকরি।' বরাবরই এই দাসত্বকে বড়ই কষ্টকর বলেই মনে হত! স্ত্রীকেও লিখেছিলাম চাকরির সুরুতেই,—'আমার জীবন অন্ধকার!—দাদার অনুমতি পেয়েই resignation letter নিয়ে রিড সাহেবের কাছে হাজির হলাম। কি ব্যাপার? তিনি ত একেবারে অবাক। প্রতি বছর তাঁর বাৎসরিক রিপোর্টে আমার কাজের সুখ্যাতি করে special mention করছেন। সব অফিসার, এমন কি I.C.S. অফিসাররা পর্য্যন্ত আমাকে সমীহ করে চলে। আমি চাকরি ছেড়ে দোব কেন? আমি তাঁর কাছে মিথ্যা বলতে পারিনি। বলেছিলাম,—এই দাসত্ব আর ভাল লাগে না। তারপর কান্তিবাবুর মন্তব্যগুলিও বলেছিলাম। তিনি বললেন,— 'দাসত্বের' কথায় অবশ্য তাঁর বলবার কিছুই নেই। কিন্তু, কান্তিবাবুর কথা শুনে হেসেই অস্থির। বললেন,—ঐটিই true Indian Government servantদের প্রকৃত রূপ। তাঁরা I. C. S. দের কাছে গোলাম, আর স্বদেশী কেরানীদের নিজেদের গোলাম মনে করেন। এটাই Inferiority complex। কিন্তু তুমি তার জন্যে চাকরি ছাড়বে কেন? যদি অরুচি হয়ে থাকে, আমি Irishman যতদিন আছে ততদিন তুমি থাক।' বলেই resignation letter টি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। চাকরী ছাড়া আর হল না তখনকার মতন।

সেটেলমেন্টের আমলাদের একটা গল্প বলি। আমি তখন হেডকোয়ার্টারের চার্জ্জে। রাঁচীতে এর পূর্ব্বে একবার সেটেলমেন্ট হয়েছিল। ডিষ্ট্রিক্টসেটেলমেন্ট নয়, টুকরো টুকরো সেটেলমেন্ট করেছিলেন রাখাল হালদার মহাশয়। লোকে বলত'—"রাখাল পরমারোগ (পরমারোগ মানে settlement) সেই সময় রাখালবাবু কিছু জমিজায়গা করে গেছলেন রাঁচী সহরের কাছাকাছি। তাঁর পুত্রও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি ছুটি নিয়ে এসে সেই জমিজমা কিভাবে রেকর্ড হল জানতে এলেন। আমাকে বললেন, যদি একজন কর্ম্মচারীকে দিয়ে তাঁকে সব দেখিয়ে দিই ত তিনি বড়ই উপকৃত হন। তাঁর কাছে সব বিবরণ নিয়ে একজন ইন্‌সপেক্টরকে সব বুঝিয়ে বলে দিলাম তাঁকে সরেজমিনে দেখিয়ে দিয়ে আসে। রাখালবাবুর পুত্র সেই কর্ম্মচারীটির একদিনের মাহিনা ডিপসিট করে তাকে নিয়ে গেলেন। তিনচারদিন পর তিনি খুব খুসী হয়ে ফিরে এসে বললেন যে, তিনি সব দেখে বুঝে নিয়েছেন। যে লোকটিকে দিয়েছিলাম সে তাঁর একটা খুব উপকারও করেছে।' এইকথা বলাতে আমার সন্দেহ হল। আমি বললাম,—সে আবার উপকার করবে কি?"—তিনি কখনও সেটেলমেন্টের কাজ করেননি সুতরাং ম্যাপ বা রেকর্ডের কোনও ধারণা তাঁর নেই। প্রথম কিছু বলতে চান-নি। পরে বললেন, তাঁর একটা পুকুরের আধখানা অপর গ্রামে চলে গেছল, তা সেই ইন্‌সপেক্টরটি সেটা সংশোধন করে দিয়েছেন। আমি বুঝলাম ধাপ্পা দিয়ে নিশ্চয় টাকা নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কত টাকা তাকে দিয়েছেন? প্রথম আম্‌তা আম্‌তা করে তারপর বললেন— কুড়ি টাকা দিয়েছেন। তবে যে উপকার করেছে তার তুলনায় কুড়িটাকা কিছুই নয়। অর্দ্ধেকটা পুকুর ত চলেই গেছল।—আমি আর ঘাঁটালাম না—বললাম, আপনি সব বুঝে সন্তুষ্ট হয়েছেন ত? খুব খুসী হয়ে আমাকে খুব ধন্যবাদ দিলেন ঐ রকম ভাললোক দেওয়ার জন্যে। চলে যেতে সেই ইন্‌সপেক্টরকে ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম—

বাবুকে সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছ ? সে বললে,—হ্যাঁ হুজুর। বললাম, সেই গ্রামের ম্যাপটা আন'। সে যেন কিছু একটা সন্দেহ করে বললে—আমিত সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে ম্যাপটা অফিসে ফেরৎ দিয়ে এসেছি। ম্যাপটা আনতে বললাম অফিস থেকে। তখন বাধ্য হয়ে ম্যাপটা আনলে। ম্যাপ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্‌টা তাঁর পুকুর ? সে গ্রামের ধারে একটা পুকুর দেখালে।

সার্ভে আরম্ভ হবার পূর্ব্বে Theodolite Survey করে প্রত্যেক গ্রামের Skeleton line টানা হয়। সেটা সীমানার ধারে ধারে সোজা লাইন টানা হয়। পরে তার উপর ভিত্তি করে plan table survey করে প্রকৃত সীমানা আঁকা হয়। এখানে সেই theodolite survey-র লাইনটা ঐ পুকুরের মাঝখান দিয়ে আঁকা ছিল। plan table survey করে প্রকৃত সীমানাও আঁকা আছে। আমি বললাম,—বাবুকে এই পুকুরের মাঝখান দিয়ে লাইনটা দেখিয়ে বলেছিলে, তাঁর অর্দ্ধেক পুকুর অন্য গাঁয়ে চলে গেছে ? তখন বুঝল ধরা পড়ে গেছে। একেবারে পায়ের উপরে পড়ে গেল। বললে—অনেক কসুর হয়েছে, মাপ করুন আর কখনও করবো না।' সে ঐ লাইনটা রবার দিয়ে তুলে দিয়ে রাখালবাবুর ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়েছে, এবার সমস্ত পুকুরটা এ গাঁয়ে এসে গেল, গলদটা দূর হল। তিনি খুশী হয়ে কুড়ি টাকা দিয়েছেন। তারপর অফিসে এসে ঐ লাইনটা আবার টেনে দিয়ে ম্যাপ দাখিল করে দিয়েছে। ঐ লাইনগুলো যে কিছুই নয়, কেবল plan table survey র সাহায্য করার জন্যে আঁকা হয় তা তিনি কি করে জানবেন ? এই হচ্ছে রোজগারের পন্থা।

স্মিত সাহেব এক বছরের ছুটি নিয়ে আয়র্ল্যাণ্ড চলে গেলেন। আমায় বলে গেলেন—আমি আবার ফিরে আসছি, তুমি যেন ছেলে-মানুষী করে চাকরী ছেড়ে দিওনা'। তিনি যাবার পর J. D. Sifton ? হলেন officiating সেটেলমেণ্ট অফিসার। তিনি পরে knighthood (sir) পেয়ে বিহারের গভর্ণর হয়েছিলেন। খাঁটী ইংরেজ একেবারে। প্রথম থেকেই আমার মাথায় হ্যাটের বদলে ক্যাপ দেখে আমায় স্বদেশী-ওয়ালা বলে সন্দেহ করতেন। তিনিই স্মিত সাহেবকে মেদিনীপুর বোমার মামলায় আমার বিরুদ্ধে প্রজাদের কথা লাগিয়েছিলেন। আমার মনে আছে—একদিন তাঁর অফিসে আসতে ২৫ মিনিট দেরী হয়েছে। আমার সামনে attendance খাতা। সই করবার সময় আমায় বলছেন 'আমার দেরী হয়ে গেছে, স্মিত সাহেবকে যেন বলে দেবেন না।'—সেই সিফ্‌টন সাহেব এখন আমার উপর-ওয়ালা হল। আমি resignation পত্র দিলাম। জিজ্ঞাসা করলেন—কি হোল ? তাঁকে প্রকৃত কারণটা না বলে, শুধু বললাম 'চাকুরি পোষাচ্ছে না, আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করবো।' জিজ্ঞাসা করলেন আপনাদের জমিদারী আছে ? বললাম—হ্যাঁ। বেশীকিছু আর বললেন না। সেটা উপরে গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দুমাস কেটে গেল'—কোনও উত্তর আসে না। টেলিগ্রাম করলাম। তারপর মঞ্জুর হওয়ার খবর এল।' আমার চাকরির শেষ হল। একটা ভাল ঘোড়া ছিল আমার। সেটা অনেকে ৬০০ টাকা দাম দিতে চেয়েছিল। আমি দিইনি। মেদিনী-পুরে এনেছিলাম। তখন রাঁচীতে আমি একাই ছিলাম।

সমস্ত বাঙালী সহ-কর্ম্মীরা ষ্টেশনে উপস্থিত। ভুবনদা বড়ই ভালবাসতেন,—ঠিক ছোট ভায়ের মতন। ষ্টেশনে এসে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে থামাই। আর সকলের চোখই বাষ্পপূর্ণ।—

মেদিনীপুরে আসতে দাদা বিশেষ কিছুই বললেন না। সেটা ১৯১১ সাল। কিন্তু আমাদের শুভানুধ্যায়ী উকিল-বাবুরা খুবই নিন্দা করলেন। ঐ বাজারে অমন চাকরি ছেড়ে কেউ অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ায় ? মাথা নিচু করে সব সহ্য করলুম। ওকালতির লাইসেন্সটা suspend করে চাকরিতে গেছলাম, সেটা রিনিউ করলুম।

মেদিনীপুরেও তখন ডিষ্ট্রিক্ট সেটেলমেণ্ট আরম্ভ হয়েছে। সেখানে আমার প্র্যাক্‌টিস এত জমে গেল যে যাঁরা আমাকে চাকরি ছাড়ার জন্যে ধিক্কার দিয়েছিলেন তাঁরাই বললেন, ভালই করেছ। মাসে এক হাজার টাকা থেকে আয় দাঁড়িয়ে গেল, তিন চার মাস পরেই।

আবার যখন ঐ আয় ছেড়ে, ১৯১৪ সালে হাইকোর্টে যোগ দিতে আসি তখন সেই উকিলবাবুরা আমায় নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের পিছনে যাওয়ায় নিষেধ করেছিলেন।

মানুষের সাধারণ ধর্মই তাই। নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ান খুবই শক্ত। সাধারণ মানুষ তা পারেও না। আমি কি অসাধারণ? ভগবান জানেন।

(১৫)

আজ আমার একটা কথা মনে পড়ছে। মেদিনীপুরে ভগবানপুর থানায় কেলেঘাই নদীর বাঁধ ভেঙে, শ্রাবণের শেষে বা ভাদ্রের প্রথমে, ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। আমি আরও অনেক বন্যা দেখেছি এবং বন্যায় সাহায্য করতেও গেছি। কিন্তু সেবারে ভগবানপুর থানার বন্যার মত আর বন্যা দেখিনি। সেটা হয় ১৯১২ কিংবা ১৯১৩ সালে। খুব সম্ভব ১৯১৩ সালে। সেই সময় দামোদরের বন্যায় তারকেশ্বরেও ভীষণ অবস্থা হয়। মেদিনীপুরে ওকালতি করি। হঠাৎ কংসাবতী ও কেলেঘাই নদীতে বন্যা নেমেছে বলে সংবাদ এল। তারপরের দিনই শুনলাম ভগবানপুর থানায় বাঁধ ভেঙে গেছে। গ্রামকে গ্রাম ভেসে গেছে সে জলস্রোতে। গভর্ণমেণ্ট ফ্রেজার সাহেবকে (এক যুবক I. C. S. assistant magistrate) সেই অঞ্চলে পাঠিয়ে কর্তব্য শেষ করলে। মেদিনীপুরে আমারই সমবয়সী দেবী তকত এসে আমাকে বললে, "আমি ৪০০ মণ চালের দাম দিচ্ছি। চাল কিনে নিয়ে আমরা ওখানে যাই চলুন।" পূর্ব্বে বলেছি মেদিনীপুরে আমাদের একটা দল ছিল যারা এই সব কাজে অগ্রণী। শালবনীতে ৪০০ মণ চাল পাওয়া গেল। সেখান থেকে রেলের ওয়াগনে চাল আনা হবে। কিন্তু কোন পথে যাওয়া হবে? অনুসন্ধানে জানা গেল পাঁশকুড়া ষ্টেশনে চাল নামিয়ে কাঁসাই নদীতে নৌকা করে যাওয়া যেতে পারে যেখানে কাঁসাই ও কেলেঘাই মিশেছে। এখানে নদীর নাম হয়েছে 'হলদী'। তারপর ঐ কেলেঘাই নদী দিয়ে উজান গেলে ভগবানপুর থানার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ইন্স্পেক্সন বাংলো আছে সেখানে উঠতে পারা যাবে যদি ইতিমধ্যে ডুবে না গিয়ে থাকে। সেটা যদি ডুবে থাকে তবে নদীর বাঁধের উপরেই উঠতে হবে বা নৌকাতে থাকতে হবে। যাই হোক্ সেই প্রোগ্রাম করেই আমরা তের জন আর দেবী তকত এবং একজন রাঁধুনী (আমার বাড়ীর ব্রাহ্মণ, রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,) এই পনের জন বেরিয়ে পড়লাম। শালবনী থেকে আগেই চাল পাঠানো হয়েছে, ম্যাজিষ্ট্রেট সে সুবিধা করে দিয়েছিলেন। আমি হলাম দলপতি। পাঁশকুড়ার টিকিট কেটে রেলে চেপে পড়লাম। সঙ্গী যুবকদের জন্যে পাউরুটী, চা, চিনি ও কণ্ডেন্সড দুধ আর আলু নুন এবং পোস্ত নেওয়া হল। পাঁশকুড়াতে নেমে দেখি চাল এসে গেছে। গরুর গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে একটা ৮০০।১০০০ মণি নৌকাতে সব বোঝাই করা হল। দুদিন নৌকা চালিয়ে কাঁসাই দিয়ে গিয়ে কেলেঘাই এর সঙ্গমস্থলে গিয়ে পৌছালাম। এখান থেকে উজান ঠেলে সেই ইন্স্পেক্সন বাংলোতে ওঠা গেল। বাংলোটা তখন জল থেকে আধহাত জেগে আছে। বাঁধ পার করে ২০০ বস্তা চাল নিজেরাই তুলে আনলাম। বাংলোতে একখানা বড় ঘর, দুপাশে বারাণ্ডা। আউটহাউস একটা ছিল=কাঁচা মাটির, ধুয়ে মুছে গেছে বন্যাতে। বাঁধ নদীর গর্ভ থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট উচু। মাঠের গর্ভ থেকেও প্রায় ২৬-২৭ ফুট। অর্থাৎ মাঠের লেভেল থেকে নদীর গর্ভের লেভেল প্রায় দু-তিন ফুট উচু। ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। বন্যার জলও কমছে না। গরু-বাছুর নিয়ে গ্রামের লোক সবাই বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে। ঘরের বাঁশ খড় টেনে এনে বাঁধে কুঁড়ি বেঁধেছে।

আমরা পুরানো কাপড়-জামাও কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে গেছলাম মেদিনীপুর থেকে। দশ-এগারো দিনের প্রোগ্রাম ছিল আমাদের। তিনখানা শাল্‌তী ডোঙা ভাড়া করে সকালে আটটার মধ্যে ভাতে-ভাত খেয়ে তিনজন করে প্রথম দিন চালের বস্তা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বৈকালে ফিরে এসে যা রিপোর্ট পাওয়া গেল তা অতি ভয়ঙ্কর। যাদের চাল দেওয়া হল তাদের চার-পাঁচদিন কোন খাদ্যই জোটেনি। জল খেয়ে আছে। মেয়েদের এমন অবস্থা যে পরনে এক টুকরো কাপড় নেই যে প'রে সামনে আসবে সাহায্য নিতে। কুঁড়ি ঘরের মধ্যে কাপড় ছুঁড়ে দিলে তবে সেটা কোমরে জড়িয়ে বাইরে আসতে পারে। প্রথমদিন সংবাদ রটে গেল, পরের দিন থেকে দলে দলে সবাই জল ভেঙে বাংলোতেই চাল নিতে এল। প্রত্যহ ৬০ মণ চাল

দেওয়া হবে ঠিক ছিল।' এক এক পরিবারকে ৪ সের করে চাল দেওয়া হতে লাগল। প্রত্যহ ৩০০।৩৫০ পরিবারকে চাল দিতে হত। আমাদের খাদ্য দুবেলাই আলু ভাতে-ভাত আর পোস্ত। মাঠে এত জল যে শালতিতে দাঁড়িয়ে গাছের ডাব হাতে করে পাড়া গেছে। মাঠের বা নদীর ঘোলা জল আমাদেরও পানীয়। পায়খানা যাওয়াও ঐ শালতি থেকে। পাঁচদিন চাল দেওয়ার পর বুঝা গেল যে আরও দু-চারদিন চাল দিতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু চাল কোথায় পাবো? দেবী ভকত বললে, আমি টাকা দোব যদি চাল যোগাড় করতে পারেন। খবর পেলাম, মুগবেড়ে গ্রামে নন্দবাবুদের কাছে চাল পাওয়া যেতে পারে। শালতি করে তাঁদের বাড়ী গেলাম। তাঁরা বললেন, ধান দিতে পারি, চাল নেই। দু-দিনের দিন সালতি করে বন্যাপীড়িতদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে তারা ধান-নিতেই আগ্রহ প্রকাশ করল। ঢেঁকি নেই, শিল নোড়াতেই ধান পিষে খাবে। সুতরাং ২০০ মণ ধান-ই কিনে আনলাম মুগবেড়ে থেকে। এদিকে পাঁউরুটি, চিনি, চা, আলু সবই ফুরিয়ে গেছে। যুবকরা বললে, কুছ্-পরোয়া নেই, শুধু নুন-ভাত খেয়েও আমরা আরও তিনদিন কাজ করব।' এই তেরদিনে নদীর জল কিছুটা সরেছে, মাঠের জলও কমেছে।

একদিন সেই I C S ফ্রেজার সাহেব এল। যুবক, তেইশ চব্বিশ বছর বয়স। খুব উৎসাহ। শাল্তিতে একটা কাপড় দিয়ে পাল তৈরী কোরেছে। খুব বাতাস—তাইতে তর-তর করে শালতি চলেছে। এসে পড়ল। তখন আমাদের শালতিগুলো বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। বললাম, আমাদের কাজ দেখ্‌বে? তিনি প্রস্তুত। বললুম নুন-ভাত খেয়ে নাও। সব প্রস্তুত। আমাদের কর্মীদের সঙ্গে খেয়ে নিলে। চল্‌ল একটা শালতির সঙ্গে। প্রায় তিনটের সময় ফিরে এল। ভয়ানক বিমর্ষ। বললেন—এ রকম দৃশ্য কোথাও কখনও দেখিনি। গভর্ণমেন্ট কিছুই করবেন না। আমাকে কেবল দেখবার জন্যেই পাঠিয়েছে। একটা পয়সাও আমার সঙ্গে নেই। আমি বললাম,—তুমি আমাদের সঙ্গে কাম কর। স্বীকৃত হল। সেই রাত্রে আমাদের সঙ্গেই থাকলেন। তারপরদিন যুবকদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তিনি থাকতেন যে বাংলোতে সেটা বেশ উঁচুতে। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই তাঁর চাপরাশী এসে হাজির। বললে—মেদিনীপুরের ডাক এসেছে,—সেই ডাকের চিঠিপত্র সে এনেছে। সাহেব ফিরলেন বৈকাল চারটেতে। চিঠি পড়ে বললেন,—আমার থাকা হল না। ফিরে যাওয়ার হুকুম এসেছে মেদিনীপুর থেকে। বিষণ্ণমুখে চলে গেলেন।

আমরা তেরদিনের প্রোগ্রাম শেষ করে, তিনদিন কেবল নুনভাত খেয়ে চোদ্দদিনের দিন তিনখানা শাল্‌তি করে জলায় একবারে এগ্‌রা থানাতে এসে কাঁথির রাস্তায় উঠলাম। একখানামাত্র গরুর গাড়ী পাওয়া গেল। তাতে জিনিষপত্র তুলে দিয়ে হেঁটে এলাম 'কণ্টাই রোড' রেল ষ্টেশনে (বেলদা)। তারপর ট্রেনে করে সতেরদিন পরে মেদিনীপুর পৌছুলাম।

আমাদের সঙ্গে বিপ্লবী দলের দু-তিনজন যুবক ছিল। তাদের একটা গান আমাকে মুগ্ধ করেছিল।—"স্বদেশের ধূলি, স্বর্ণরেণু বলি, কবে আমাদের হবে সে জ্ঞান।"—এই যে যুবকের দল এত কষ্ট সহ্য করে দেশের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে ছুটে গেছ্‌ল,—সেটা কিসের বলে? নিজেরা নুন-ভাত খেয়ে কাটিয়েছে কিন্তু হাসিমুখে পরসেবা করেছে। জানিনা আজকের দিনে এরূপ যুবক পাওয়া যাবে কিনা। পূর্ববঙ্গ থেকে জলস্রোতের মত যেসব ছিন্নমূল-সংসার ছুটে আসছে তাদের সাহায্যের জন্যে ঐ যুবকের দল ছুটে যায় না। বুড় বয়সে এইটাই প্রাণে কষ্ট দেয়। তখন আমরা ছিলাম পরাধীন জাতি। সরকার ত তদন্ত করবার জন্যে একজন আনাড়ী যুবককে পাঠিয়ে দিয়েই তাঁদের দায়ীত্ব শেষ করেছিল। এখন এ স্বাধীন দেশ। সরকার নিজে যাহোক কিছু করছে। কিন্তু, আজ যদি বাংলার যুবকরাও ছুটে যেত। যদি বলত, এসো না আমাদের গাঁয়ে। আমরাও প্রতি গাঁয়ে ৩।৪ ঘর সংসারকে রাখতে পারব।" তা হলে আমার এই বয়সে যে আনন্দ হত তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু তার বদলে কি দেখছি? আমাদের প্রতিনিধিরা পরিষদ কক্ষে পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটাচ্ছেন। ওতে কি লাভ?—অপর দেশে ঐ কাদাছিটোনোর খবর কাগজে পড়ছে আর মনে মনে হাসছে। সংবাদপত্রগুলিও যেন ঐসব সংবাদকে মুখরোচক করে প্রকাশ করে আনন্দ পায়

আর পয়সা রোজগার করে। আর, যুবকের দল? কলকাতায় মিছিল করছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ করছে।—বন্ধ না করলে, ল্যাবোরেটরী ভাঙছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে। পুলিশ গুলি করছে মিছিল ভাঙতে। ভূদেব সেনের মত যুবক সেই গুলিতে মরছে। কৈ একটা দলও ত ছুটে যাচ্ছে না সেবা করবার জন্যে? হায় স্বাধীন ভারত, হায় স্বাধীন ভারতের অধিবাসী! হায় স্বাধীন ভারতের যুবকবৃন্দ!

(১৬)

১৯১৪ সালের মার্চ্চ মাসে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে এলাম। আমার এক বন্ধু, জ্যোতিষ হাজরা তখন ৫।৬ বছর হাইকোর্টে ওকালতি করছে। তার দাদা শরৎ হাজরা অলুকের উকিল। জ্যোতিষ আমার সমবয়সী। তারই বাসার কাছে, কালীঘাট রোডে একটা বাড়ী ভাড়া করে প্র্যাকটিস স্থুরু করলাম। কামদেব বাগ মেদিনীপুরে আমার মুহুরী ছিল। তার বাড়ী ছেড়ে থানায়। সেও কলকাতায় এল আমার কাছে ক্লার্ক হিসাবে হাইকোর্টে কাজ করতে। কয়েকটা আপীল নিয়েই মেদিনীপুর থেকে এসেছিলাম। প্র্যাকটিসের কথা লিখছি না। সে ত বহু উকিল ওকালতি করছেন, আমিও তাদের একজন হয়ে গেলাম। তবে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত যে ওকালতি করেছিলাম তাতেই প্র্যাকটিশ জমিয়েও ছিলাম, আর মাসে তখনকার দিনে দু-তিন হাজার টাকা দাঁড়িয়েছিল। জুনিয়ারদের মধ্যে নামও হচ্ছিল।

প্রথম পূজার ছুটি পর্য্যন্ত ছেলেদের আনিনি। পূজার ছুটির পর তাদের নিয়ে এলাম অক্টোবরে। তখন আমার দুটি ছেলে ও মেয়ে তিনটি।

আমাদের জাড়ার বাড়ীতে রমানাথ ডগরা ওরফে ঘোষ নামে একটি কর্মচারী ছিলেন, তাঁর কাজ ছিল বাড়ীর কন্যাদের বিবাহের জন্যে কলিকাতায় পাত্রের অন্বেষণ করা। যখন কলকাতায় লেখাপড়া করতাম তখনও ঐ ডগ্‌রা-মশায় আমাদের বাসায় থেকে মেয়েদের পাত্র-সন্ধান করতেন। এখন দাদার তৃতীয় কন্যার জন্যে পাত্র দরকার। প্রথম মেয়ের বিয়ে দাদা দিয়েছেন,—তখন আমি চাকরী করি রাঁচীতে। ছুটি চেয়ে পাইনি। দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে আমি চাকুরী ছেড়ে এসে মেদিনীপুরে ১৯১২ সালে দিয়েছিলাম। মেদিনীপুরেরই প্রসিদ্ধ উকিল ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র (তৃতীয় ছেলের পুত্র) দুর্গাচরণের। সঙ্গে ডগ্‌রা মশায় এলেন তৃতীয় কন্যার পাত্রের সন্ধানে। কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে হাওড়া পঞ্চাননতলার বিখ্যাত ব্যক্তি ৺প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের খোঁজ নিয়ে এলেন। দাদার তৃতীয় মেয়ে আমার কাছেই ছিল। পাত্রপক্ষ এলেন, কন্যা দেখলেন এবং পছন্দ করে গেলেন। তখন ভদ্রবংশের মেয়ে হলেই হয়। পঞ্চাননতলায় আমার ন-জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সেই ভগ্নীপতিই এ সম্বন্ধ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। পাত্র সচ্চরিত্র কিন্তু লেখাপড়া বেশী শেখেনি। দাদা এলেন, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল। কলকাতায় 'পাকা-দেখা' একটা মহাসমারোহ ব্যাপার। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। যাই হোক, পাকা দেখার খাওয়াটা ভয়ে ভয়ে আয়োজন করেছিলুম। কলকাতার লোক কিন্তু সে আয়োজন দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছল। তাঁরা মেদিনীপুর বা জাড়ায় গিয়ে বিবাহ দিতে রাজী নন। সুতরাং আমার ঐ ছোট বাসাবাড়ী থেকেই বিয়ে হল ফাল্গুন মাসে। বিয়ের দিন হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টি। বরযাত্রই এসেছেন এক শত জনের উপর। বৃষ্টির সময় এক ভদ্রলোকের জুতা হারিয়ে গেল, কিংবা একজোড়া জুতার দরকার ছিল বলেই হয়ত' বলে উঠলেন—আমার নূতন জুতা খুঁজে পাচ্ছি না।—খোঁজাখুঁজি করে ত' জুতা কোথাও পাওয়া গেল না। সে ভদ্রলোক ত তড়পাতে লাগলেন। বরকর্ত্তা (বরের দাদা) নানা কথা শুনাতে লাগলেন। খালি পায়ে ভদ্রলোক যাবে কি করে? আমার দাদা বললেন,—আমি কাঁধে করে গাড়ীতে বসিয়ে দিচ্ছি। শেষে জুতার দাম বাবদ ১০ দশটাকা নিয়ে ভদ্রলোক বিদায় হলেন। হাওড়ার ভদ্রলোকদের আমরা বেশ করে চিনলাম। এই ঘটনা এই বিয়ের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

বিয়ের কথাই যখন বলছি তখন আমি জীবনে কতগুলি ছেলেমেয়ের সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছি তার একটা ফিরিস্তি

দিই। ১৯০১ সালে যখন বি, এ, পড়ি তখন এক ভাগ্নের সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছি। ভগ্নীপতি ও ভগ্নী দিল্লীতে থাকতেন। বিয়ের দিন সকালে এসে নিমন্ত্রণ খেয়ে, বৌভাতের পরদিন চলে গেলেন। সে বিয়েতে তখনকার দিনের কলকাতা সমাজের একটা চিত্র দেখেছিলাম। বৌভাতে বড় বড় লোকের বাড়ীর মেয়েরা নিমন্ত্রিত। আমার দিদি বললেন—সাতু, ভাল ভাল বেনারসী পরে সব মেয়েরা আসবেন। ঘোমটা দিয়ে থাকবেন। কিন্তু সেই বেনারসী কাপড়েই পাত্র থেকে লুচি মিষ্টি তুলবেন বাড়ীর ঝি-চাকরদের জন্যে। আমি ত শুনে অবাক। কি করব? তিনি বললেন—বাজার থেকে সরা কিনে এনে প্রত্যেক বাড়ীর জন্যে সরাতে লুচি ও মিষ্টি দিয়ে সাজিয়ে রেখে দাও। খেতে বসিয়ে পূর্ব্বেই বলে দেবে বেশ চেঁচিয়ে,—যে প্রত্যেকের জন্যেই সরা সাজানো আছে, পাত থেকে তুলবার প্রয়োজন নেই। তখন, পোলাও মাংস খাওয়াবার রীতি কলকাতায় চালু হয়নি। রাত্রে লুচি তরকারী, মাছ মিষ্টি, দই ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। আমি সরা সাজালাম এবং সকলকেই তা দিলামও। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ দামী বেনারসীতে লুচি তুলে রাখছেন দেখেছি। তখন, যাঁদের ঘরের গাড়ী থাকত না তাঁদের যাতায়াতের গাড়ীভাড়াও দিতে হত। সেটা তার পরেও বহুদিন রেওয়াজ ছিল। সেটা গেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

এরপর বিয়ে দিই বিনোদ দিদির (জ্যেষ্ঠ, বড় ভগ্নী) কনিষ্ঠা কন্যা তুলসীর। সেও সম্বন্ধ করা থেকে বিবাহের আয়োজন করা, বাড়ীভাড়া করা ইত্যাদি সবই সম্পন্ন করতে হয় আমাকে। সেটা একেবারে বি, এ, পরীক্ষার ৫।৭ দিন পূর্ব্বে।

লেখাপড়া করতে করতে ১৯০৩ সালে আমার বড় ভগ্নীর (বিধবা তখন) দ্বিতীয়া কন্যার সম্বন্ধ করে বিয়ে দিয়েছিলাম। সেই ভাগ্নীর পুত্র বর্তমান হাইকোর্টের জজ শ্রীমান পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ সালে বড় ভগ্নীর কনিষ্ঠা কন্যারও সম্বন্ধ করে বিয়ে দিই আমি।

তারপর ১৯০৬ সালে বিনোদ দিদির পুত্র রাধিকানন্দর বিয়ে দিই। তার পাঠাবস্থাও আমার কাছেই কাটে। রাধিকানন্দের নাম কলকাতায় অনেকেই জানেন। সেও শিশির ভাদুড়ীর মত ভারত গভর্ণমেন্টের শিক্ষার চাকরী ছেড়ে এসে বাংলার নাট্যমঞ্চে যোগ দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

ক্রমশঃ

মোগল আমলের বিলাস

নিহারময়ী দেবী

নওরোজ

নওরোজ উৎসবটি হল মোগল বাদশাদের বসন্ত উৎসব। সম্রাট আকবর এই উৎসব আরম্ভ করেছিলেন। তিনি এই উৎসবের কল্পনাটি পারসিকদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন।

এই উৎসবের দিনে দেওয়ান-ই-আম প্রাসাদভবনে একটি মূল্যবান মখমলের উপর নানা রকম কারুকার্য্যখচিত চাঁদোয়ার তলায় সম্রাটের সিংহাসনখানি রাখা থাকত। নীচের মেঝেটিও স্বর্ণসূত্রে বোনা কাপড়ের আবরণে ঢাকা থাকত।

আমীর ওমরাহেরাও পরস্পর যেন প্রতিযোগিতা করেই নিজেদের তাঁবুগুলি ঐ ভাবেই জমকালোরকম ঝাঁকজমক-ওয়ালা উপকরণে সাজাতেন।

সম্রাট নওরোজের এই সময়ে তাঁর পছন্দ রাজপুরুষদের এবং প্রিয় কর্ম্মচারী ও অনুচরদের বিশেষ বিশেষ খেতাব দিতেন, এবং নানাবিধ খেলাতও (উপহার) বিতরণ করতেন।

এই নওরোজ বাজার সাধারণতঃ বছরে একবার "দেওয়ান-ই-আম" এর কাছে বসত। তাঁর সভাসদ ও পরিষদদের বড় বড় আমীর ওমারাওদের এবং রাজা মহারাজাদের রাণী ও মহারাণীরা সেখানে দোকান বা বিপনী খুলতেন। কিন্তু শুধু সম্রাট আর তাঁর বেগমরাই সেই বাজারে বা দোকানে বাজার করতে পেতেন।

সেই কেনা-বেচার সময়ে একদিকে ক্রেতা সম্রাট ও বেগম সাহেবারা অন্যদিকে বিক্রেত্রী আমীর-পত্নী ওমরাও-গৃহিণী ও রাজাদের রাণী মহারাণীর দলে নানারকম রঙ্গ-রহস্য, হাস্য-পরিহাসে কৌতুকে বেচা-কেনাও চলত। এমনকি নগণ্য তুচ্ছ জিনিসেরও অভাবনীয় উচ্চ মূল্য চাওয়া হত। শোনা যায় এক সময়ে কৌতুক করে অনেক দরাদরির পর একটি মিছরীর টুকরাকে (ছোটকুঁচো) খাঁটি হীরা বলে বিক্রী করা হয়। এবং সকৌতুকেই সম্রাটও তার দাম দিয়েছিলেন এক লক্ষ টাকা।

এই উৎসবে রাজা ও ওমরাওদের রাণী ও বেগমদের এই জন্য পাঠাতেন যে, মোগল অন্তঃপুরের প্রধান বেগমদের সঙ্গে মহিলারা পরিচিত হবার সুযোগ পেতেন। এই উৎসবটি আকবর এই জন্য আরম্ভ করেছিলেন যাহাতে নাচ, গান, ভোজ, ও নানা আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরাও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেতেন।

সমস্ত উৎসবটি একটি বিরাট আনন্দ ও প্রমোদময় উৎসব ছিল।

যাই হোক্ এই উৎসবটি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে উঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর ইচ্ছায়।

সম্রাট আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বদাউনি বলেন, সম্রাটের আদেশে ঐসব সৌখিন বাজারগুলি ঐ বেগম ও মোগল হারেমবাসিনীদের ও অন্যান্য মহিলাদের জন্য বসত। এবং এই উপলক্ষ্যে সম্রাট প্রভূত খরচ করতেন।

আবার এই উপলক্ষ্যে চেনাশোনার সুযোগে অন্তঃপুর বা হারেমবাসীদের বিবাহ বাগদান আশীর্বাদও হ'ত

এখানে উল্লেখযোগ্য, এই নওরোজের উৎসবেই সেলিম-শার (জাহাঙ্গীর) সঙ্গে মেহের উন্নিসার প্রথম পরিচয় হয়। (নূরজাহান)—কিন্তু বাদশাহ এই মেলামেশা বিশেষ পছন্দ করেননি, তার ইচ্ছায় মেহের উন্নিসার শের আফগান নামে বাদশাহের এক পছন্দ কর্ম্মচারীর সহিত বিবাহ হয়।

আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম মেহেরের স্বামীকে হত্যা

করান। এবং মেহের উন্নিসা মোগলহারেমে আসেন, পরে নূরজাহান বেগম হন।

বাদশা সাজাহানের বেগম মমতাজ—যাঁর নামে তাজমহল তিনিও এই নূরজাহানের ভাই ঝি।

হাতীর লড়াই

মোগল বাদশাহদের হাতীর লড়াই বড়ই প্রিয় ছিল, এই ধরণের খেলাগুলি আগ্রার কেল্লার পূর্ব্বদিকের ময়দানে যমুনারপারে হত।

সাধারণতঃ দরবারের পরেই এসব নানান খেলা দেখানো হত, কুস্তী আদি এবং নিরস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে এই সব হিংস্র-জন্তুদের লড়াইও দেখানো হত। এই প্রমোদ খেলা দেখাবার জন্য এমন জায়গা নির্ব্বাচন করা হত যাহাতে প্রাসাদের জানলা দিয়ে তাঁরা খেলা দেখতে পান।

দু'টি বন্য হাতীকে একটি দু'হাত উঁচু কাদার দেওয়ালের দু'দিকে রাখা হোত। তারা ঐ এলাকার মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে শুঁড়দ্বারা আক্রমণ করত, বিকট চিৎকারের সঙ্গে, মাহুতদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে। হাতীদের তীক্ষ্ণচিৎকার মাইলের পর মাইল শোনা যেত।

এক একটি হাতীর পিঠে দু'জন ক'রে মাহুত থাকত, যদি দৈবাৎ হাতীদের খুনোখুনীর মধ্যে একজন মারা পড়ে সেইজন্য। বেশ খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর একটা যখন জয়ী হত, সে তখন সেই মাটির দেওয়াল ভেঙে প্রায় পাগলের মত অদৃশ্য শত্রুর প্রতি আক্রমণের ভঙ্গীতে দৌড়ত, তখন কোন রকমেই তাকে ভয় দেখানো যেত না, আগুন জেলে বা অন্য কোন রকমে।

মাহুতেরা এই বিপজ্জনক খেলাতে যোগ দেবার সময় তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েই চলে আসত।

এবং যে বেচারা মাহুত মারা যেত তাদের পরিবারবর্গ সম্রাটের ব্যবস্থায় আজীবন সরকার থেকে প্রতিপালিত হত। ঐ বিপজ্জনক সাহসের জন্য সেই মাহুতদের মধ্যে যারা জয়ী হত তারা বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হত।

বাদশার জন্মোৎসব

সেকালে আকবর বাদশার সময়ে আর একটি উৎসবের রীতিও ছিল। এটিও সম্রাট আকবরই আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে ওজন করা হত। মধ্য-যুগের ধরণেরই এটিও বড় জাঁকজমকময় উৎসব ছিল।

স্যার টমাস এই সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তারই সামান্য বিবরণ তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন, জাহাঙ্গীরের সময়ে এই উৎসবটি অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে প্রতিপালিত হত।

একটি বড়, সুন্দর ফুলের বাগান, ফুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, সেখানে একটি প্রকাণ্ড সোনার দাঁড়ি পাল্লা রাখা থাকত, সম্রাটকে ওজন করবার জন্য।

এবং ওমরাহেরা সকলে সেখানে কার্পেটের উপর ব'সে থাকতেন সম্রাটের অপেক্ষায়, সম্রাট আসতেন, নানা মণিমুক্তাখচিত আভরণে ভূষিত হ'য়ে, তাঁর হাতে হীরা, মুক্তা, পান্না, চুনী বসানো আংটী শোভা পেত। সেই চুনী পান্না হীরাগুলি যেন এক-একটি বাদামের মত বড়, উজ্জ্বলে সভাস্থ সকলের চোখে যেন ধাঁধা লেগে যেত।

তারপর সম্রাট সেই দাঁড়িপাল্লায় উঠে মেয়েদের মত পা মুড়ে বসতেন, এবং তাঁর কাছে থলে থলে ভরা টাকা রাখা হত তারপর তাঁকে ওজন করা হত। ওজনটা নয় হাজার টাকার মত। ছয়বার ঐ রকম ওজন করা হত, আবার তাঁকে সোনা দিয়ে ওজন করা হত। তারপরে হীরা, মুক্তা, পান্না, ইত্যাদি দিয়েও ওজন হতেন। কিন্তু সেসব আমি দেখতে পাইনি; সম্ভবতঃ ব্যাগের মধ্যে রাখা হয়েছিল। তারপর আবার সোনার সুতোর বোনা পরিচ্ছদবসনবস্ত্র, সিল্ক, সাটিন, সুতীবস্ত্র ইত্যাদি যত ভাল ভাল জিনিষ হ'তে পারে সব-জিনিষ দিয়ে। সব শেষে আবার মাখন ও শস্য-জাতীয় জিনিষ যত রকম, এবং সব রকম ভাল ভাল ফল, ও মেওয়া, আখরোট, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি সুগন্ধ মশলা লবণ এলাচাদি সব রকম মশলার জিনিষই সোনালী রূপালী তবকে মোড়া থাকত।

তারপর সম্রাট সিংহাসন থেকে নেমে আসতেন। এবং ঐ সমস্ত জিনিষ রূপার বড় বড় পাত্রে করে সভার চারিদিকে ছড়িয়ে দিতেন। সভাস্থ সকলে ও আমীর-ওমরাহেরা সবাই হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিতেন।

আমি নিলাম না দেখে, সম্রাট উঠে এসে একটি বড় পাত্রে ভরা সেই সব জিনিষ আমার কাপড়ে ঢেলে দিলেন।

ঐ যেসব জিনিষ দিয়ে সম্রাট ওজন হতেন, সেসব

জিনিষ দীনদরিদ্রদের দান করা হোত। এবং পরে ওমরা-হেরাও ওজন হতেন।

এই জন্মদিনের উৎসবটি রাজসভা ও সমস্ত শহরে খুবই জাঁকজমকের সঙ্গে নাচ গান, খাওয়া-দাওয়া চ'লত, রাত্রে খুব আলো দেওয়া হত, সমস্ত কেল্লা আলোয় আলোকিত ক'রে সাজানো হ'ত।

আমীর ওমরাহেরা, প্রাসাদবাসীরা, ফুলওয়ালীরা, নর্ত্তকীরা, বাদ্যকরেরা সকলেই যেন আমোদে মত্ত হ'য়ে থাকত। যেদিকে চাওয়া হয় সেদিকই আলোয় আলোময়।

যেমন শহরে, তেমনি প্রাসাদের মধ্যেও আলো দিয়ে সাজানো হত। ধূপ ধুনা ও সুগন্ধি বাতি, চমৎকার গড়নের ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যেও আলো জেলে দেওয়া হত। থামে থামে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হত। গোলাপজলের ফোয়ারা-গুলিও খুলে দেওয়া হ'ত। সেগুলির নীচে মার্ব্বেল পাথরে তৈরী চৌবাচ্চা, বা পাত্রে গোলাপ জল ভরা থাকত।

একটা গোলাপী আতর তৈরী করেছিলেন নূরজাহানের মা, সে আতর সম্রাটরা সকলে এবং বেগমরাও ব্যবহার ক'রতেন। প্রাসাদবাসিনীরা ও সখী-সেবিকারা মহামূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হ'য়ে ব'সে থাকতেন। এই শুভউৎসব উপলক্ষে সম্রাট কারুকেই বিমুখ ক'রতেন না, কাপড়, গহনা, টাকাকড়ি, জায়গীর, ইত্যাদি সকলকেই দিতেন। বেগম-দের পরিচারিকাদের আত্মীয়স্বজনেরাও এই সুযোগ কখনও ছাড়তনা, সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উৎকণ্ঠিত ও সচেষ্ট থাকতো।

সম্রাটও কারুর দিকে চেয়ে হয়ত একটু হাসলেন, কারুর হাত থেকে একটু পানীয় নিলেন। কারুকে একটু কাছে ডাকতেন। আর তাদের আনন্দের সীমা থাকত না।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র সেও তো বড় কম জিনিষ নয় নীচতা ঈর্ষা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভরা প্যালেস—শান্তি কোথায় তাদের।

---

* আগ্রা বলবন্ত রাজপুত কলেজের অধ্যাপক ৺কেশব চন্দ্র মজুমদারের 'ইম্পিরিয়াল আগ্রা অব মোগল' নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

॥ তবু হারায়নি ॥
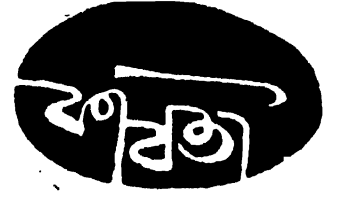
—মনোরমা সিংহরায়

বার বার খুঁজেও পাবো না
সে রোদের সোনা।
সে রোদ হারিয়ে গেছে বহু শাল বনের ওপারে
নারিকেল গাছের পাতায় শান্ত স্নিগ্ধ গঙ্গার কিনারে।
রোদে পিঠ দিয়ে বসা
কমলালেবুর রঙ তারই সঙ্গে মেশা
রসে ভরা কোয়াগুলি খুলে খুলে খাওয়া
তোমার মুখের গল্প শুনে শুনে তোমার মুখের দিকে
চাওয়া।
সৌন্দর্য্যের কারুকার্য্য হয়ে আছে যেন
ভাস্কর্য্যের লালিত্যে বাধানো॥

•   •   •

আমার সে শিশুমুখ কখনো পড়েছে মনে কিনা
অনেক বছর পরে তা আমি জানি না।
যখন তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি শুধু মনে পড়ে
তেমনই অপার স্নেহ তোমার দুচোখে পড়ে ঝরে॥
আমার ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে
দেখি সেই ছবি।
একি স্বপ্ন, একি মায়া, অথবা সে অলীক কল্পনা
এবং যেহেতু আমি কবি॥

বসুমতী

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দুচোখ এই দিগন্তের বাইরে দেখেনা—
দিকসীমায় বসুমতীর কাজল-কালো ভুরু
কিম্বা কালো হরিণ-চোখ মিলিয়ে নিতে পারি,
তার বেশি আর দেখাই যাবে না।

হালকা হাওয়ায় বসুমতীর খুশির নিঃশ্বাস
মর্মরে তার একটু গুঞ্জন—
এর বেশি আর জানাই যাবে না।

দু চোখ এই দিগন্তের বাইরে দেখেনা।
চোখ বুজে দেখ্ দিগন্তের পরিধি বহুদূর—
স্মৃতিরা ইতিহাসের দেশ আঁকে,
যেখানে সেই হরপ্পা ও মহেন-জো-দরো
কিম্বা সেই হিংলাজের রূপালি উদ্যান।

চোখ বুজে দেখ্ দিগন্তের পরিধি বহুদূর—
স্মৃতিরা যায় মানস সরোবর ও কৈলাসে,
যেখান থেকে সিন্ধু আর ব্রহ্মপুত্র
আগমনীর গানের সুরে নামে।

স্মৃতির রেখা পাড়ি দিলেই পাবি
নিটোল এক অটুট বসুমতী,
ইচ্ছে হলে, জগদ্ধাত্রী বল্।

তথাপি তাদের সূর্য এক

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

যে কোনো একটি দিন আর একটি দিনের মতন
একেবারে এক নয়।
কখনো বা দিন বড়, কখনো বা রাত বড়
কখনো বা দিন রাত সমান-সমান।
যে কোন একটি দিন আর একটি দিনের মতন
একেবারে এক নয়।
ভিন্ন ভিন্ন উদয়াস্ত নিয়ে
তথাপি তাদের সূর্য্য এক।

সময় কখনো শান্ত, কখনো বা মেঘের হল্লোড়,
কখনো বা কুয়াশার ভীড়—
রোদের ফুলিঙ্গ ঝরে, বৃষ্টি নামে,
শিশিরেরা গলে—
ভরা চাঁদ ক্ষয়ে যায়, ক্ষীণ চাঁদ পূর্ণ হয়ে ওঠে।
তথাপি তাদের সূর্য এক।

কাক-কোলাহল

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ফেলে দিয়ে গেছে কা'রা ভুক্ত-অবশেষ,
কাকের জটলা দেখা আঁস্তাকুড়-পাশে।
প্রভাতের পুণ্য-লগ্ন আতিথ্য-সম্ভাষে
সমস্বর, সমীরণে বাজে তা'র রেশ।
রবাহুত যত কাক আহার্য্য-উদ্দেশ
কেমন করিয়া জুটে? হিম-সিক্ত ঘাসে
শিশির দুলিতে থাকে কাকের উল্লাসে;
সূর্য্য হাসে—চেয়ে থাকে পুষ্প অনিমেষ।
প্রকৃতির মহাভোজে নষ্ট নাহি হয়
কোন কিছু; অসংখ্য প্রাণের লীলা চলে;—
একে যা-ই ফেলে, সবই অন্যে তুলে লয়;
মহানন্দে মহাভোজে প্রত্যহ ভূতলে
মাতে সবে, গাহে গীত জীবনের জয়;
অপূর্ব আনন্দ বাজে কাক-কোলাহলে।

কলহান্তরিতা

সুনীতি দেবী

তোমার জন্মদিনে
তুমি চেয়েছিলে 'নাইলন' শাড়ী
আমি দিই নাই কিনে।
তাই হলে রাগে অন্ধ,
সাতদিন কথা বন্ধ!
শুধালে না কি কারণ
ও শাড়ী কিনতে করেছি অত বারণ।
'নাইলনে' নাকি নিমেষে আগুন ধরে,
এ জেনে কখনও দিতে পারি ভয় করে?
তোমার যে সব বান্ধবীদল ঐ শাড়ী পরে সাজে,
আমি জানি তারা ভুলেও যায় না রান্নাঘরের কাছে।
তোমার ত সেটা হবার উপায় নাই;
পেটুক স্বামীর খাবার জোগাতে নিজে রোজ রাঁধা চাই।
এবার বুঝেছ প্রিয়ে?
রাগ পুষোনাক' সামান্য কথা নিয়ে।
শাড়ীর বদলে দেখ এই 'নেকলেস',
তোমার সোনার অঙ্গে মানাবে বেশ।
(ভাগ্যে জানো না 'চোদ্দ ক্যারেট' ওটা,
জানলে আবার চলত কথার খোঁটা!)
এই ত হাসিতে ভরেছে আননখানি
অধরে ফুটেছে অমৃত-মধুর বাণী।
কলহের শেষে মিলনের রূপ ফোটে,
মেঘের আড়াল থেকে যেন চাঁদ ওঠে!

রোদ্দুর দেখিনি

হেনা হালদার

কতদিন যেন কতদিন রোদ্দুর দেখিনি।
জিরেনিয়ামের ডালে জিরোয় যে-অলস রোদ্দুর,
দাঁড়াইনি জ্যোৎস্নার ভিতরে ভেসে অগাধ জ্যোৎস্নায়…
পাখীর সংসারে কিংবা গাছের সংসারে কিংবা মাছের
সংসারে
লোভী বেড়ালের মত বাড়াইনি আকাঙ্খার হাত।
বসে আছি বুদ্বুদ্ শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত
শান্তির বিবরে :
ঠায় বসে আছি সব ঝর্ণা-নদী-সমুদ্র কল্লোল থেকে
চোখ কান বুঁজে
বাল্মীকির প্রতিভায় মগ্ন আছি উই-এর প্রণয়ে।
এখানে আসবেনা ঝড় :
মাতাল উল্লাসে দস্যু তাতারের মত…
সর্বোচ্চ শিখর হতে পাতাল-ভৈরবী লাস্যে
ঝাঁপ দিতে ঘূর্ণীর মাতনে।
এখানে সমস্ত ঋতু ঘুমের ওষুধ খেয়ে
কবে যেন নিঃশব্দে মরেছে।
কেননা রোদ্দুর আর ছোঁয়না আমাকে ভুলে
ছোঁবেনা কখনো।
রক্তের জ্যোৎস্নায় ভাসা, স্বপ্নের সমুদ্রে ছোঁয়া
ভালবাসা রোদ্দুরের মত।

হীনযান

উপন্যাস

সুবোধ বসু

ছুটি

গত ছ'মাসে নিমাই তিনটা চাকরি ছাড়িয়াছে। বস্তুতঃ বাড়ীর চাকরের কাজে সে অভ্যস্ত হইতে পারে নাই। কেউ ভালো ব্যবহার করে না, কেউ জাল ওষুধ তৈরি করে, কেউ জুয়া খেলে এইসব কারণে সে-মালিক না-পছন্দ করিয়াছে। সর্ব্বাধুনিক কর্ম্ম ত্যাগের সংবাদ বনমালীকে দিয়া সে অতি প্রভাতেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। একবার কালীঘাটে পূজা দিবে, তারপর ইচ্ছামত শহরটায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। বড় ভালো লা.গ তার এ রাস্তা ও-রাস্তা এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরিয়া বেড়াইতে। কত বড় শহর কলিকাতা। কত তার বৈচিত্র। কত রকম মানুষ, কত রকম ব্যবসা, কত রকম গাড়ীঘোড়া। কখনও কখনও নিমাইয়ের মনে হয়, ফিরি-ওয়ালা হয়। এ গলিতে ও গলিতে হাঁক ছাড়িয়া জিনিষ ফেরি করিয়া বেড়ায়। এ-বাড়ী যায়, ও-বাড়ী যায় বৌ-ঝিয়ের ডাকে। দামাদামির যুদ্ধ নড়ে। তারপর আবার হাঁক দিতে দিতে চলিয়া যায় ভূগোলের অন্ত সীমান্তে।

'কিরে ছোঁড়া! বেলা দুটো বাজিয়ে ফিরছিস। খেতে হবে না…বনমালী ধমক দিয়া কহিল।

'আমি তো খেয়ে এসেছি বনমালীদা।' ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল নিমাই।

'সে কিরে।' অনুযোগের কণ্ঠে কহিল বনমালী। 'তোর জন্য যে আমি সব রেঁধে বসে আছি। নিজে পর্য্যন্ত খাইনি…কোথা খেলি?…

চাকরি না থাকিলে সর্ব্ব প্রথম নিমাই বনমালীর কাছে আসে এবং আপত্তি করিলেও বনমালী তাকে খাওয়ায়। নিজের পয়সা ব্যয় করিয়া সে হোটেলে ভাত খাইয়া আসিয়াছে সে কথা বলিতে ভারি সংকোচ হইল।

'একটা চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো', সে আমতা আমতা করিয়া কহিল। 'কিছুতেই ছাড়লে না, খাইয়ে দিলে ।'

'দুপুরে এসে খেতে বলিনি বুঝি? তাই অন্যত্র খেয়ে এলি। ভারি বাঁদর হয়েছিস। কিন্তু এমন করে অকারণে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলে চলবে কেনরে ছোকরা? বাবু সন্ধ্যা বেলা মদ খেয়ে এসে তার বৌকে পেটায় তাতে তোর কি? তোকে তো পেটায় না… আবার বৌয়ের সঙ্গে ভাবও তো আছে বলছিস…

'তা হোগ গে, নিমাই কহিল 'এমন অসভ্যতা কি চুপ করে দেখা যায়। তা ছাড়া কি জানো বনমালীদা, এই চাকরের কাজ আমার সহ্য হয় না। আমার বাপ-ঠাকুরদা কেউ কখনও এ কাজ করে নি। ভাবছি, ছোটখাটো একটা ব্যবসা…পোষ্টাপিসে শ তিনেক সাড়ে তিনশো টাকা জমেছে…'

'তা তো কি বারই শুনছি।' বনমালী খাওয়ার আসন প্রস্তুত করিতে করিতে বলিল। 'কি উপদেশ দিচ্ছি তোকে। চোখকান বুজে আর কিছু দিন কষ্ট কর।

আরও কিছু টাকা জমুক। সামান্য মূলধনে কি লাভের কারবার ফাঁদা যায়? তোর সুযোগ আছে তাই বলছি। এক নিজের মুখ ছাড়া আর কোনও মুখ খাওয়াতে হয় না। আমাদের তো এক আধলাও জমাবার জো নেই। যা কামাই তার পাই পয়সাটি অবধি দেশে পাঠাতে হয়। দু-একটাকা খরচা করে নিজে যে একটু আমোদ-আয়েস করব, তার জো নেই। ঘরে বউ আর ছেলেপুলে এই টাকার আশায় চেয়ে আছে। তাতেই কুলানো মুস্কিল।···আর কিছুদিন ধৈর্য্য ধর। আর কিছু জমা। চেষ্টা করে আর একটা পথ খুঁজে নে। বাড়ীর কাছে খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায় এটা···

'কাজ তো আছেই,' নিমাই দোকানের বিক্রির টুলটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল। 'আমি রাজি হলেই হয়। ভারি লোক। শুনেছি নামজাদা প্রফেসার। অনেকবার বিলেত গেছেন। আমেরিকা গেছেন। দেশবিদেশে নাম। কাজও হাল্কা। বাবুর স্ত্রী নেই। রান্নার পুরানো লোক আছে। বাসন মাজার ঠিকে ঝি আছে। আমাকে শুধু বাবুর ফাইফরমাস খাটতে হবে, বইখাতা ঝেড়ে মুছে রাখতে হবে, কাগজপত্র গুছোতে হবে। বড় জোর বাবুর একটু সেবাযত্ন করতে হবে। শুনেছি খুবই ভালো মানুষ। ভদ্দর মানুষ। মাইনে পঁচিশ। খুশি হলে বকশিষ দেন। না চাইতে কাপড় চোপড় দেন···

'এক্ষুনি গিয়ে কেন সেটা,' বনমালী আদেশ করিল।

তিন দিন য়ুনিভার্সিটি ছুটি। ক্লাস নাই, ছাত্র নাই, সহকর্মীদের সঙ্গ নাই। কি করিয়া তিন দিন কাটান ডক্টর রুদ্রাংশু ঘটক। বইয়ের আলমারিতে ঠাসা নিঃশব্দ পড়ার ঘরে বার বার পায়চারি করিতেছেন। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলে সদ্য-লেখা কাগজ গড়াগড়ি করিতেছে। বই লিখিতেছেন তিনি। দর্শনের বহু বই লিখিয়া দেশ বিদেশে নাম করিয়াছেন। আরও বই লিখিতেছেন। লিখিতে লিখিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছেন। বড় নিস্তব্ধ বাড়ী; বড় নির্জ্জন দুপুর।

'নিমাই।'

'বাবু!'

'কিছু নয়। শুয়ে থাক। আমি দেখছিলাম, ঠিক আছিস কিনা।' বলিয়া রুদ্রাংশু পূবের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। কাঠা ছয়েক খালি জমির পর ইমারতের ভিড়। একের পর এক যত দূর দৃষ্টি যায় দালান কোঠার তরঙ্গ চলিয়া গেছে। এত লোক এত কাছে, তবু এত নির্জ্জন!

এই নৈঃশব্দ্য, এই নির্জ্জন দুপুরের এই অসাধারণ নৈঃশব্দ্য যেন নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দাঁড়ায়। কেমন অসহায় মনে হয় নিজেকে। প্রায় ভয় করে। তাই নিমাইকে কহিয়াছেন তাঁর দোতলার পড়ার ঘরের পাশের বারান্দায় দুপুরের বিশ্রাম লাভ করিতে। কেউ কাছে থাকুক। যাকে সহ্য করা যায়, অন্তত এমন কেউ কাছে থাকুক।

ডক্টর ঘটক ষাটের দিকে দৌড় লাগাইয়াছেন, পৌঁছিতে আর বড় বেশি নাই। মাঝারি গোছের লম্বা আঁটসাঁট দোহারা চেহারা। পুরু কাচের চশমার তলায় বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি। কপালটা চওড়া কিন্তু গোলাংশ আকৃতি। কোঁকড়ানো কর্কশ মাথার চুলের সামনে ও দুই কানের উপর সাদার প্রলেপ পড়িতেছে। গায়ের রং আরও অনেকটা কালো হইলে অনেকটা নিগ্রোর সঙ্গে সাদৃশ্য আসিত।

ডাকসাইটে পণ্ডিত রুদ্রাংশু। য়ুরোপের তিন তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি আছে তাঁর। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিকে তাঁর লেখা বই এ সব বিষয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে সমাদৃত। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক তিনি। সারা পৃথিবী-ময় ঘুরিয়াছেন, বক্তৃতা দিয়াছেন, মনীষীদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করিয়াছেন।

সবই করিয়াছেন, শুধু গৃহ গড়িতে পারেন নাই। বিবাহ করেন নাই। কোনও নারীর চটুলতা তার পাণ্ডিত্য ভেদ করিয়া নীড় রচনা করিতে পারে নাই

এই বহীজহের তালে। কিন্তু তাতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় নাই; কোনও অভাবই প্রায় বোধ করেন নাই।

কিন্তু হঠাৎ ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাড়ীর এই নির্জনতাকে। পুরাতন বেয়ারা-বাবুর্চি ভূপী। ঠাণ্ডা চুপচাপ মানুষ। নিজের কাজ নিঃশব্দে এবং নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করে। ঠিকা ঝিই বাড়ীতে একমাত্র মুখর ব্যক্তি। গজর গজর হাঁক-ডাক করিয়া দুবেলা নিঃশব্দ বাড়ীটার ঘুম ঠেলা মারিয়া চূর্ণ করে। ইদানীং প্রায় উপভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন রুদ্রাংশু এই শান্তিভঙ্গ পর্ব। বাড়ীর উপরোক্ত পরিচারক ও পরিচারিকা বাড়ীর কাজ নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নিমাই বাড়তি লোক। অতিরিক্ত সংযোজন। রুদ্রাংশুর বইখাতা গুছায়, তাঁর ব্যাগ বা লাইব্রেরি হইতে আনা বই গাড়ীতে তুলিয়া দেয়, জামাকাপড় বাহির করে, তৈরি রাখে, বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে নতুন বোতাম লাগাইয়া রাখে যাতে বাহির হইবার মুহূর্ত্তে সঙ্কটের সৃষ্টি না হয়; ভূপীকে চা বা খাবার দিতে বলিয়া আসে। খাওয়ার সময় টেবিলের কাছাকাছি অপেক্ষা করে। পোষ্টাপিসে চিঠি দিতে যায় এবং সব ফাইফরমাস খাটে, মাঝে মাঝে রুদ্রাংশুর পায়ে তেল মালিশ করিতে হয় বা কোনও কোনও সন্ধ্যায় পা টিপিয়া দিতে হয়। আন্তরিকতার সঙ্গে। সেবা করিয়া গত ক'মাসের মধ্যেই নিমাই মনিবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

'নিমাই। নিমাই। এখনও ঘুমুচ্ছিস নাকি?

"না তো।' বারান্দা হইতে নিমাইয়ের তন্দ্রাজড়িত আওয়াজ আসিল।

'যা তো বাবা। আরেকবার চিঠির বাক্সটা দেখে আয়। কলেজ ছুটি হলে কি হবে, পোষ্টাপিসের তো ছুটি নয়। চার বার ডেলিভারি...বার বার চিঠির বাক্সে চিঠির খোঁজ করা নিমাইয়ের আরেকটা কাজ। এ কাজ রোজই বহুবার করিতে হয়। ছুটির দিন হইলে এই ফরমাস আরও ঘন ঘন আসে। একটুমাত্র আগে দেখিয়া আসিয়াছে, এটা একটা সন্তোষজনক কৈফিয়তই বলে ধরা হয় না। অথচ চিঠি আসিয়া দিলে খামের উপর চোখ বুলাইয়া বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন রুদ্রাংশু। যে গুলির ঠিকানা টাইপ করা সেগুলি তো প্রায়ই খোলেন না টেবিলে বসিয়া কাজ করার সময় ছাড়া।

'আজ্ঞে আজ যে রবিবার। আজ তো চিঠি দেয় না।' নিমাই নিচতলা হইতে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া অপরাধীর কণ্ঠে কহিল।

"আচ্ছা যা, তুই শুয়ে থাক গে। ঘুরে যাস নি। বলিয়া রুদ্রাংশু নিমাইকে বিদায় দিয়া তার লেখার প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে আসিয়া বসিলেন। কাগজ মেলা ও কলম খোলাই ছিল। বার কয়েক কলম ঝাড়িয়া লেখা শুরু হইল। নামিয়া গেলেন চিন্তার অতলে। যেখানে আসিয়া জুটিল প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, হাজির হইল বেকন ও স্পীনোজা, ইম্যানুয়েল কান্ট, হার্ব্বাট স্পেন্সার। বার্গস্, ক্রোচে, সান্তানায়া তর্কে যোগ দিল। এথিক্স, মেটাফিজিক্স, ম্যাটার ও মাইণ্ড ডায়ালেকটিক্স, স্কেপটিসিজম্, প্রাগমাটিসম্ ছুটোছুটি করিতে লাগিল রুদ্রাংশুর যুক্তিধারার মধ্যে...

'কিন্তু কেন। কেন লিখি? হঠাৎ স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে কহিয়া উঠিলেন তিনি। কলম থামিয়া গেল, ফেলিয়া দিলেন কাগজ। রিভলভিং চেয়ারে পিঠ এলাইয়া দিলেন। 'অনেক তো লিখেছি। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও কেন লিখছি? খ্যাতি চালু রাখিবার জন্য, বিলাতী আমেরিকান প্রকাশকদের কাছ থেকে মোটা রয়্যালটি পাওয়ার লোভে, না সময় কাটাবার জন্য? অনেক অনাবশ্যক সময় আছে তাঁর হাতে। ইহা লইয়া কি করিবেন জানেন না। ইহাদের হত্যা করার উপায় বাহির করিতে হয়। এমন সহজে, এমন নির্দোষভাবে সময়হননের অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপায় বই লেখা! 'এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারতাম!' নিজের মনে মনে বলেন রুদ্রাংশু।

চায়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তবে নিমাই তাঁকে খবর দিল। জানাইল, ড্রাইভার আসিয়াছে। ড্রাইভার

বাড়ীতে থাকেনা। সকাল বিকাল আসিয়া ডিউটি দেয়। হুয়.।' বলিয়া রুদ্রাংশু চায়ের জন্ত উঠিলেন।

প্রিন্সেপ ঘাটের কাছাকাছি গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। রুদ্রাংশু গঙ্গার পাড়ের রাস্তা ধরিয়া এতক্ষণ পায়চারি করিয়াছেন। স্বাস্থ্যার্জ্জনের এই একমাত্র অবকাশ। একটা খালি বেঞ্চি পাইয়া একবার বসিলেন। দিনের শেষ রশ্মি মিলাইয়াছে পশ্চিম আকাশে। কটা তারা চোখ মেলিয়া তাকাইয়াছে গঙ্গার ধূসর-রূপালী জলের দিকে। জাহাজ ও লঞ্চের গবাক্ষে বিদ্যুতালোকের ঔজ্জ্বল্য দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড আকাশ ও প্রকাণ্ড পৃথিবী যেন মিশিয়া গিয়াছে গঙ্গার ও-পারে।

বড় ভয় করেন রুদ্রাংশু প্রকৃতির এই ফাঁকা ভাবটা। এতে মানুষজন কোলাহল ব্যস্ততা সব কিছুই অস্পষ্ট হইয়া ওঠে, নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। সংজ্ঞাহীন বিস্তৃতি, সীমানাহীন শূন্যতা প্রকাণ্ড হইয়া ওঠে, রুদ্রাংশুর যেন শ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তাড়াতাড়ি তিনি বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তিন তিনটা দিন ধরিয়া কোনও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় নাই। চাকর-বাকর ছাড়া কারও সঙ্গে একটা বলিবারও সুযোগ হয় নাই। একবার কারও কাছে ঘুরিয়া আসিলে কেমন হয়?

নিজের প্রয়োজনে ছাড়া খুব কম লোকই তাঁর কাছে আসে। কেউ নিরস লোক মনে করে; কেউ তাঁর পাণ্ডিত্যকে গাম্ভীর্য্যকে ভয় করিয়া দূরে থাকে। তিনি যে হাসিতে পারেন, হাল্কা গল্প করিতে পারিলে খুব স্ফূর্ত্তি বোধ করিতে পারেন, প্রায় কেউ তা ভাবিতেই পারেনা। তাঁকে পরিহাস করিয়া তাঁকে সম্মান দেখাইবার রেওয়াজ চালু হইয়া গেছে।

গল্প করিতে হইলে তাঁর নিজেকেই যাইতে হইবে। সোমেশ চৌধুরী গবর্ণমেন্টের হোম সেক্রেটারি। খুব গণ্যমান্য লোক তিনি। পদাধিকার বলে সারা রাজ্যের খবর তাঁর নখদর্পণে। চৌধুরী রুদ্রাংশুর সহপাঠি ও পুরাতন বন্ধু। একবার তার ওখানটায় ঢুঁ মারিয়া গেলে কেমন হয়? 'বাড়ী যাব কি, স্যার?' রুদ্রাংশু তাঁর পুরাতন শেভ্-গাড়ীতে আসীন হইবার পর ড্রাইভার প্রশ্ন করিল।

'হাঁ'। গম্ভীর মুখে কহিলেন রুদ্রাংশু।

কারও কাছে না যাওয়াই ভালো। সবার স্ত্রী পুত্র পরিজন আছে সামাজিকতা আছে; তাঁর মত গদ্যময় লোকের সঙ্গ খুব মধুর হইবার কথা নয়। অতীতে বহু স্থানে আঘাত পাইয়াছেন। ভদ্রতার কোনও অভাব নাই। কিন্তু তাদের সংসার আছে, প্রিয়জন আছে, অবসর যাপনের নিজস্ব পরিকল্পনা আছে। অতিথিকে বিদায় দিতে পারিলেই যেন তারা খুশি। বড় অভিমানী রুদ্রাংশু! বড় সূক্ষ্ম বোধশক্তি তাঁর। ব্যথা পাইয়া নিজের বিবরে ফিরিয়াছেন।

'নিমাই?'

'বাবু।'

'একটু পরে আয়। পা-হাত একটু টিপে দিবি। আমি কাপড় বদলে একটু গিয়ে শুয়ে পড়ছি।' মিনিট দশেকের মধ্যেই নিমাইয়ের ডিউটি শুরু হইয়া গেল।

খাটের নিচেই মোড়া। কিন্তু পা টিপিতে গেলে অধিকাংশ সময়ই তাতে বসিবার সুযোগ হয় না। তবু রুদ্রাংশু নিমাইয়ের বসিবার জন্ত মোড়া রাখার পীড়াপীড়ি করেন।

'আচ্ছা, এ হাতটা এবার দে।...তারপর কি মিঞা যেন নাম বলেছিলি, যারা ছেলে ধরে নিয়ে গিয়ে কানা খোঁড়া করে ভিখিরির ব্যবসা করায় তাদের আড্ডায়...সে আর বৌবাজারের ফুটপাথে নিজের জায়গাটাতে ফিরে আসে নি?...এ পাশ ফিরিয়া ডান হাতটা নিমাইয়ের দিকে প্রসারিত করিয়া রুদ্রাংশু কহিলেন।

'ফিরে এলে বনমালীদা আর ওর রক্ষা রাখত!' নিমাই কহিল। 'বলেছিল, আগে নিজে পেটাবে তারপর পুলিশে ধরিয়ে দেবে। যাতে ওর আড্ডাশুদ্ধ লোক ধরা পড়ে। কিন্তু রমজান মিঞার আর দেখা মেলেনি।'

'খুব বেঁচে গিয়েছিলি।'

'সেই মুসলমান বৌটির দয়াতেই পালাতে পেরেছিলাম, নইলে জন্মের মতো পঙ্গু হয়ে থাকতাম বা আরও কিছু ভয়ঙ্কর হতো। নিজের ওপর মস্ত ঝুঁকি নিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সবার মধ্যেই কত ভাল মানুষ আছে…'

'আছেই তো।' রুদ্রাংশু চোখ মুছিয়া কহিলেন। 'বনমালী তো তোর কত উপকার করেছে। তার কাছেই তো প্রথম সহানুভূতি পেয়েছিলি। তারপর সেই যে বাইজি, কি নাম জানি তার, সে-ও তো তোকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, নিজের ছেলের মত পালন করতে চেয়েছিল। যাদের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখে তাদের মধ্যেও কত উদার মন থাকে! সে কি এখনও সেখানেই থাকে?…

'কে, নয়নতারা? মানে, বাইজি? 'হ্যাঁ সেখানেই।

'লোকজন নিয়ে রাত-বিরেতে খুব হল্লা করে?

'না তো। তবে প্রায়ই জল্‌সা বসে। লোকজন আসে। কিন্তু প্রায় ভদ্রলোকের বাড়ীর মতো। কোনও হৈ-চৈ হল্লোড় নেই। বনমালীদা বলেন। খুব ভাল বংশের মেয়ে ছিলেন…বাইরে কেউ এসেছেন মনে হচ্ছে। একবার দেখে আসি…'

কিন্তু দেখিতে যাইতে হইল না। 'রুদ্রাংশু কোথায় হে? শোবার ঘরে নাকি? কাউকে যে দেখতে পাচ্ছি না' বলিতে বলিতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরের পর্দা সরাইয়া একেবারে শোওয়ার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

'এসো সৌরীন। এসো। একটা চেয়ার এনে দে নিমাই।' সন্ত্রস্তভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন রুদ্রাংশু। নিমাই তাড়াতাড়ি হুকুম পালন করিতে ছুটিল।

'পা টেপাচ্ছিলে নাকি? একবার কাণ্ড দেখ! সারা জীবন বিয়ে করবে না, এখন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছ—চাকর দিয়ে পা টেপাচ্ছ! বেচারা মানুষ তুমি! স্ত্রীলোক কত বড় একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—সেই অভিজ্ঞতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত রইলে…'বলিতে বলিতে সহাস্যে আগন্তুক রুদ্রাংশুর খাটের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন।

সৌরীন সরকার য়ুনিভার্সিটিতে রুদ্রাংশুর সহকর্মী। ইংরেজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। কলিকাতারও কেম্‌ব্রিজে এক সঙ্গে পড়িয়াছেন। একজন ইংরেজি সাহিত্য, একজন দর্শনশাস্ত্র।

'তারপর প্রয়োজনটা কি বলো তো? বিনা প্রয়োজনে কেউ তো আমার কাছে আসে না…' পরিহাস-তরল কণ্ঠে চোখে দুষ্টদ্যুতি আনিয়া কহিলেন রুদ্রাংশু।

'তা যা বলেছ।' সৌরীন কাবু না হইয়া কহিলেন। 'এ কথা তুমি অবশ্যই বলতে পার। তবে জানো তো, সংসারী লোক, সারাক্ষণ সংসারের ধান্ধায় নাকানি-চুবোনি…নাহে, চেয়ারের দরকার নেই, নিয়ে যাও চেয়ার…সংসার করোনি, এক রকম বেঁচে গেছ। এ ঝামেলায় কি আর অন্য দিকে নজর দেবার জো আছে; এর ঠেলা সামলাতে প্রাণ কণ্ঠাগত…'

সৌরীনবাবুর তৃপ্ত মুখ ও সন্তুষ্ট-দৃষ্টি কিন্তু এ বিপদের কোনও সাক্ষ্য দিল না।

'হাঁ যা বলতে এসেছি। পরশু নাতির অন্নপ্রাশন। যাওয়া চাই কিন্তু। রাতের খাওয়া ওখানেই সারতে হবে। এর অন্যথা করা চলবে না…'বেশ পীড়াপীড়ির সুর সৌরীনের।

ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়েছিলেন রুদ্রাংশু। এবার নাতির অন্নপ্রাশন!

'একটু চা হোক। ওরে নিমাই…'

'ওরে সর্বনাশ! আজ দেরি করবার উপায় নেই। অন্তত আরও কুড়ি জায়গায় যেতে হবে।' সত্বরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন সৌরীনবাবু। 'নিচের গাড়ীতে গিন্নী বসে আছেন সদলবলে। দেরি করলে আর কি উপায় আছে!' বলিয়া কৃত্রিম ভয়ের অভিনয় করে তিনি বিদায়সূচক হাত নাড়িলেন।

'আরেক দিন এসে অনেক পুরানো কথা কপচানো

যাবে।' দরজার কাছ হইতে তিনি আশ্বাস দিয়া কহিলেন।

আগাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে চটি খুঁজিতে লাগিলেন রুদ্রাংশু।

একুশ

বাড়ীর একমাত্র বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা ঠিকা ঝি একদিন বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিল। গুপীর সঙ্গে বাসন মাজার গুণাগুণ সম্পর্কে কথাকাটি প্রসঙ্গে সে উহার পিতৃপুরুষকে আক্রমণ করিয়া বসিল। গুপী শান্ত মানুষ হইলে কি হয়, নিজ বংশের উপর এমন কখনও আক্রমণ নীরবে সহ্য করিল না। ফলে কুরুক্ষেত্র বাধিল। গুপীকে তীক্ষ্ণ জিহ্বার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করিবার পর ঝি ঘোষণা করিল, এমন নিকৃষ্ট বাড়ীতে আর সে কাজ করিবে না। গুপীরও তখন জেদ চড়িয়াছে। সেও ঘোষণা করিল, এ সামান্য ক'খানা বাসন সে অতি সহজে নিজেই ধুইয়া লইতে পারিবে, আজেবাজে লোক আর বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষিতে দিবে না।

গুপী কাজের লোক। দু'এক জনের রান্না তার কাছে কিছুই নয়। তা ছাড়া নিমাই আসিবার পর তার সাহেবের কাজ কিছুই করতে হয় না। দিনে দুচারটা ঘর ঝাড়মোছ করা এবং সামান্য বাসন ধোয়া তার কাছে নগণ্য কাজ। নিজেই ঝগড়া করিয়া ঝি তাড়াইয়াছে, কিছু বলিবার নাই। নিমাই ছোকরা ভালো। কিছু কিছু বাড়তি কাজ করিয়া সে-ও সাহায্য করে।

কিন্তু সংকটের সৃষ্টি করিল একটি টেলিগ্রাম। বাড়ীতে তার পুত্র মরণাপন্ন, অবিলম্বে আসা চাই এই সংবাদ পাইয়া গুপী সাহেবের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। রুদ্রাংশু নিজের অসুবিধার কথা ভাবিলেনও না; তৎক্ষণাৎ ছুটি মঞ্জুর হইল। চিকিৎসার জন্য টাকাও কিছু মিলিল।

ইহারই ফলে রুদ্রাংশুর গৃহিণীহীন সংসার আরও অগোছাল হইয়া পড়িয়াছে। নিমাই রাঁধিতে জোটে। রুদ্রাংশুর তদারক করিতে আসে, ঘর ঝাঁট দিতে, মুছিতে, বাসন মাজিতে বাজার করিতে হাজার দিকে দৌড়ায়। তবু সবই যেন অসম্পূর্ণ থাকে; বাড়ীর স্বাভাবিক ভাবটা গুরুতর রকম ব্যাহত হয়।

'রাতের খাওয়াটা আমি বাইরেই খেয়ে আসব,' রুদ্রাংশু রোজই কলেজে যাইবার সময় বলিয়া যান। 'রাতে রান্না করে' কাজ নেই। তুইও রাস্তার হোটেল থেকে ভাত খেয়ে নিস নিমাই। রান্নার কাজ না থাকলে দেখবি বাকি কাজগুলো কত সহজ হয়ে ওঠে...'

নিমাই লজ্জিত হইয়া প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বলিয়াছে, সামান্য রাঁধিতে তার কিছুই কষ্ট হইবে না ইত্যাদি। কিন্তু রুদ্রাংশু রাজি হন নাই। ছোট ছেলেকে এতটা কাজ করাইতে তার সংকোচ হয়। সুতরাং গত ক'দিন ধরিয়া এই ব্যবস্থাই চালু হইয়াছে।

'আজকেও রাতে সেই রকমই ব্যবস্থা।' য়ুনিভার্সিটির জন্য তৈরি হইয়া দোতলার সিঁড়ির মুখে রুদ্রাংশু ব্যাগ-বহনরত নিমাইকে কহিলেন, 'এখন খাওয়া দাওয়ার পর বেরিয়ে পড়। পিস্তলের লাইসেন্সের টাকা জমা দিয়ে আসবি। কালই বোধহয় শেষ দিন। পিস্তল সাবধান।...তারপর বাড়ী ফিরে সময় থাকলে একবার বৌবাজার ঘুরে আসতে পারিস।...অনেক তো সময় হাতে থাকবে।...আগে থেকে বলে রাখাই ভালো।' বলিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া বেশ একটু দ্রুত নামা শুরু করিলেন।

নিমাই নীরবে তার পিছনে পিছনে নামিতে লাগিল।

'টাকাগুলি দিয়ে গিয়েছি তো?' একবার থামিয়া পিছনে না তাকাইয়াই কহিলেন রুদ্রাংশু।

'হাঁ' নিমাই কহিল।

বেলা প্রায় দুটো। এটা বনমালীর খাওয়ার সময় নিমাই জানে। কিন্তু দোকান পর্যন্ত না গিয়া ডাইনে মোড় লইয়া সে গলিতে ঢুকিল। দরজা ভেজানোই

ছিল। ঠেলিয়া নিমাই ভিতরে ঢুকিল এবং দু-চার পা হাঁটিয়া দোতলার সিঁড়ি ধরিল। নিজেরই প্রায় লজ্জা করিতেছে। এমন কাজ সাধারণ অবস্থায় নিন্দনীয় সে জানে। কিন্তু যার জন্য এ কাজ করিতেছে সে দেবতুল্য লোক। তাঁর কৌতূহল মন্দের পর্য্যায়ে পড়ে না বলিয়াই সে ইহাতে রাজি হইয়াছে। তবু সাধারণ লোক যে তফাৎ বুঝিতে পারিবে না এ সম্বন্ধেও সে সচেতন। এই জন্যই তার সংকোচ, এই জন্যই বনমালীদাকেও দেখা না দিয়া কিছুটা চোরের মতই সে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়াছে।

'আরে নিমাই! আয়, আয়। এত দিন ছিলি কোথায়?

দাসী গদাই নিমাইকে আবিষ্কার করিয়া প্রথমে বিস্ময়োক্তি করিয়াছিল। ইহাতে আকৃষ্ট হইয়াই বাইজি নয়নতারা তার শোওয়ার ঘরের দরজার পাট খুলিয়া উঁকি দেয়। নিমাইকে দেখিয়া সে পুলকিত হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে ডাকিয়া লইল।

'তারপর আছিস কোথায়? কি করছিস? বনমালীর কাছে অন্বেষণ করি। সে-ও বলে, কচিৎ কখনও দেখা হয়।...বা...বস্ত ডাগরটি হয়েছিস তো! রীতিমত একজন বাবু হয়ে উঠেছিস।'

প্রশ্ন ও জবাব অনেক হইল। অনেক পুরানো কথার পুনরালোচনা হইল।

অবশেষে হিতৈষী নারীর রীতি অনুসারে নয়নতারা উপদেশ দিলেন, 'এতোই যদি বাবু তোকে পছন্দ করেন, তবে বল না তাঁকে অফিসে কোনও কাজকর্ম জোগাড় করে দিন। বাড়ীর কাজ যতই আরামের হোক, বাড়ীর কাজ বৈ তো নয়...

'বাবু চেষ্টা করছেন। হয়তো হয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পিওনের কাজ...

তবে তো ভালো।' নয়নতারা মাথার চুল জড়াইয়া খোঁপা বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল। কি খাবি বল? বনমালীকে গরম সিঙাড়া ভেজে দিতে বলি আর চা। গদা, শুনছিস গদা...

'না দিদি। এখন কিছু খাবো না।' নিমাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল। এখনও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।...হ্যাঁ, তোমার কাছে একটা কথা ছিল...মানে, আমাদের বাবুর কাছে তোমার সব গল্প করেছি কিনা; আমাকে কত স্নেহ করতে, আমাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলে এই সব গল্প। শুনে তিনি বললেন, বড় ভালো মানুষ তো তিনি। যাদের আমরা সমাজের বাইরে রেখেছি, তাদের মধ্যেও কত উদারতা, কত মহত্ব আছে। ভারি কৌতূহল হচ্ছে। চল, একবার তাকে গিয়ে দেখে আসি...

বাইজি চুপ করিয়া রহিল ক্ষণকাল। ক্রমে তার চোখ ও ঠোঁটের প্রান্তে স্মিত হাস্যের আভাস দেখা দিল। যেন ভারি মজা বোধ করিতেছে।

'কত বয়েস বাবুর?'

'বয়স হয়েছে, তবে মানে, নিমাই থতমত খাইয়া কহিল 'একেবারে বুড়ো হন নি...

'অর্থাৎ, নয়নতারা সকৌতুক কণ্ঠে কহিল, প্রায় আমারই মতো। গিন্নী কত বড়?—

"গিন্নী! না গিন্নী তো নেই। বাবু বিয়ে করেন নি।"

'নেশা করেন?'

'না। কোনও দোষ নেই। দেবতার মত সৎ লোক তিনি।'

বাইজির প্রশ্নে নিমাই যে ইঙ্গিত আবিষ্কার করিল তাহা হইতে প্রভুকে রক্ষা করিবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার বর্ত্তমান প্রস্তাবের সঙ্গে ইহার একটা বড় রকম অসঙ্গতি আছে ইহা সে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। এ রকম অদ্ভুত খেয়াল বাবুর কি করিয়া হইল। ইহা ভাবিয়া সে নিজেও কম অবাক হয় নাই। অথচ তিনি যে দূষণীয় কিছু করিতে পারেন, তাঁর সান্নিধ্যে এত দিন বাস করিবার পর তা সে কল্পনাও করিতে পারে না। একটু পাগলাটে গোছের লোক এই পণ্ডিত অধ্যাপক। তাঁর খেয়ালের সন্ধান না করিয়া উপায় নাই।

'এই একশো টাকা বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।' নিমাই

পকেট হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া খাটের উপর বাইজির কাছে রাখিল। 'সন্ধ্যাবেলা আপনি গান, বাজনার মুজরো নিতে পারবেন না, আপনার ক্ষতি হবে সেদিন, এজন্যই তিনি আগে থাকতে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন, পরে পুরো টাকা দিয়ে দেবেন...'

বাইজি টাকা হাতে তুলিল না, ফিরাইয়াও দিল না। প্রায় সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু হাস্য করিল।

রুদ্রাংশু যে কখনও এমন নির্লজ্জ ও মরিয়া হইতে পারেন, তাহা কোনও দিন ভাবিতে পারেন নাই। স্বাভাবিকভাবে উপযুক্ত সময়ে কোনও নারীকে সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই তিনি। জোর করিবারও লোক কেহ ছিল না; নিজেও অন্য আকর্ষণে বড় ব্যস্ত ছিলেন। যৌবনের অবসানের পর নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা ক্রমেই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে।

নারী একটা প্রকাণ্ড অভিজ্ঞতা! এই অভিজ্ঞতা থেকেই বঞ্চিত রইলে! ট্যাক্সিতে চলিতে চলিতে বন্ধু সৌরীন এবং আরও অনেকের উক্তি তাঁর দুই কানের পাতায় আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল।

কি আছে নারীর মধ্যে? কিসের এই আকর্ষণ? স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, উৎসাহ, সঙ্গ, সখ্য, যৌন-আবেদন? কি চায় লোকে? কিসে পরিতৃপ্ত বোধ করে পুরুষ? কি জন্য আসিয়াছেন রুদ্রাংশু? কি আশা করিতেছেন? কি অভিজ্ঞতা পাইতে পারেন এখান হইতে? রুদ্রাংশু শিহরিয়া উঠিলেন। কোন্ রহস্যের আকর্ষণে এমন মরিয়া হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন সকল ভদ্ররীতি বিসর্জন দিয়া? এমন জোর করিয়া কি নারীকে জানা যায়? এ কি করিতেছেন তিনি?

রুদ্রাংশু একবার ভাবিয়া ট্যাক্সি থামাইতে গেলেন। কিন্তু তারপর নিজেকে নিরস্ত করিলেন। অনেক ভাবিয়া মনস্থির করিয়াছেন। নারীর কাছ হইতে ভয়াবহ শূন্যতা ও অসহায় একাকীত্বের কোনও প্রতিকার মেলা কি সম্ভব? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? এতটা যদি আগাইয়াছেন, তবে পিছাইয়া যাওয়া কাপুরুষতা। স্নায়বিক দৌর্বল্যের বশে পলায়নে সামিল!

'কিরে নিমাই, আজকাল দালালি করছিস নাকি এ খাটের মড়া নিয়ে কার বাড়ী যাচ্ছিস?'

বনমালীর দোকান হইতে বেশ কিছুটা দূরে ট্যাক্সি থামাইয়া রুদ্রাংশুকে সে হাঁটাইয়া আনিয়াছে। সন্ধ্যা মাত্র অতিক্রান্ত। বৌবাজারের দোকানে দোকানে আলোর দেয়ালি। রাস্তায় লোকের ভিড়। ফেরিওলার বাঁশির সঙ্গে ট্রামের ঘড়ঘড় আওয়াজ। চপ চাই, চানাচুর চাই, ফুল চাই। লে লে বাবু ছে আনা, নিলামওয়ালা! অপরিসর ফুটপাথে জনতার ঠাসাঠাসি। নিমাই প্রভুকে যথাসাধ্য আগলাইয়া গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। যে ব্যালকনির তলায় ফুটপাথের উপর রমজান মিঞার কাছাকাছি সে শুইয়া থাকিত সেই জায়গাটা রুদ্রাংশুকে দেখাইবার ইচ্ছা একবার হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুর মুখের ভাব দেখিয়া সে নিরস্ত হইল। তারপর যেই ডান দিকে মোড় নিয়া দু'পা আগাইয়াছে, অমনি একপাশের বাড়ীর উপরতলার আলোকিত এক জানালার কাছ হইতে ভাঙা বাসনের আওয়াজের মত উপরোক্ত নারীকণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এগুলি সস্তা স্ত্রীলোকদের বাসা, নিমাই তা ভালো ভাবেই জানে। নিজ নাম শুনিয়া সে মুখ যথাসম্ভব না তুলিয়া চোখ বাঁকাইয়া একবার আওয়াজের উৎপত্তিস্থল লক্ষ্য করিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আন্দাজ করিয়াছিল। জানালার গরাদ ধরিয়া কিশোরীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কে টিপ্পনী কাটিয়াছে এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল। এই মেয়েটা সম্পর্কেই মরমতারা তাকে একদিন বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়াছিল। কিন্তু এখানে কে আর এর চেয়ে ভালো? এ ধরণের কথাবার্তাই এখানের রেওয়াজ। অথচ রুদ্রাংশু শুনিয়া থাকিলে সে তারি লজ্জার কথা। সভয়ে একবার নিমাই তাঁর দিকে

দৃষ্টিপাত করিল। কেন যে বাবুকে এখানে আনিতে রাজি হইল সে!

'দিদি, বাবু।'

জলসাঘর জোড়া গালিচা পাতা। তার একপ্রান্তে ধবধবে সাদা চাদর বিছানো ফরাস। গোটা চার-পাঁচেক সাদা ওয়াড়-মোড়া তাকিয়া। পাশে গোলাপ পাশ, আতরদান, পিকদান। দু-পাশের দেওয়ালে পূর্ণ-আকৃতি আয়না প্রায় মেঝে পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। এই ফরাসের উপর সুসজ্জিতা নয়নতারা শুধু পায়ে দাঁড়াইয়া আয়নায় নিজের সুন্দর মুখ ও অবয়ব লক্ষ্য করিতেছিল। এমন সময় বাহির হইতে ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

মধুর হাস্য জাগিয়া উঠিল অধরে। দুই চোখে দ্যুতি ও দেহে লাস্যের ভাব অতি সহজেই প্রস্ফুট হইল। সলজ্জিত মুখে বিশেষ খাতিরের ভঙ্গিতে সে দরজার দিকে আগাইয়া গেল।

'এ আমার মস্ত বড় সৌভাগ্য! আসুন, ভেতরে আসুন। ও নিমাই, বাবুর পায়ের জুতো খুলে দে। আলোগুলি সব জেলে দে, গজা···

রুদ্রাংশু তাড়াতাড়ি নিজের জুতো খুলিলেন। তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া চৌকাঠে সামান্য হোঁচট খাইলেন। কিন্তু কোনও অনর্থ হইল না। নিজের সেই গতি-আবেগে নয়নতারা প্রদর্শিত ফরাসের উপর গিয়া প্রায় ছিটকাইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা অভিজ্ঞ দক্ষতার সঙ্গে দুটো তাকিয়া ঠেলিয়া দিল কাছে।

'সরল অসহায় চাউনি বহুদিন চোখে পড়েনি!'

নয়নতারা তাঁর অদূরে আসিয়া বসিয়া কহিল, খুব ভয় পাচ্ছেন কি? এতবড় পণ্ডিত, পৃথিবী জয় করে এসেছেন। এতটুকুতেই ভয় পাচ্ছেন! লোকে তো লোকের সঙ্গে কথা বলতেও আসে। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম করে বসুন···' বলিয়া সহসা নিজে উঠিয়া পড়িয়া আবার দরজার কাছে আগাইয়া গেল। ডাকিয়া কহিল, 'পান-সিগারেট দিয়ে যা গজা, শরবত তৈরি করে আন। এমন অতিথি রোজ আসেনা!···হ্যাঁরে নিমাই! তুই এখনও এখেনেই দাঁড়িয়ে রয়েছিস? যা পালা! বাইরে থেকে ঘুরে আয়। তোর বাবু এখন আমার জিম্মের। তাঁর কোনও অনাদর অসম্মান হবে না। কোনও ভয় নেই তোর···'

কথা এইরূপই ছিল। পৌঁছাইয়া দিয়া নিমাই চলিয়া যাইবে। নিজেই ফিরিবেন রুদ্রাংশু। অতটুকু ছেলে কাছে থাকিলে লজ্জা যেন শতগুণ বাড়িয়া যায়! অমনি নিজেকে এদের চোখে কম খেলো করেন নাই তিনি! কিন্তু নিমাইয়ের প্রতি নয়নতারার আদেশ শুনিয়া তাঁর প্রায় ইচ্ছা হইল, নিমাইকে ডাকিয়া যাইতে বারণ করেন। কিন্তু নয়নতারা ফিরিয়া আসিয়াছে। তার লজ্জায় মনের ইচ্ছা বাহিরে প্রকাশ করা গেল না। স্নিগ্ধ মধুর হাস্যে মুখ ও চোখ ভরিয়া তুলিয়া এবার বাইজি রুদ্রাংশুর খুব কাছে আসিয়া বসিল।

ক্রমশঃ

৩৬৬ ধারা

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

(১)

বিপত্নীক সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার নকুলেশ্বর ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বিব্রত। দিনের বেলায় কষ্টে চেষ্টায় কোন রকমে চলে। রাত্রে ডিউটি থাকলে—প্রায়ই থাকে—চারিদিক অন্ধকার। শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে শ্যালিকাকেই বিয়ে করতে হল। সমস্ত আশা—সহোদরার কন্যা মায়া মমতা থেকে বঞ্চিত হবেনা এবং মাসীর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ ভালই হবে। প্রথম প্রথম হলোও তাই।

নিজের কৃতিত্বে অথবা নবপরিণীতার ভাগ্যে নকুলেশ্বরের দ্রুত পদোন্নতি। প্রধান ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে বড় জায়গাতে বদলি হলেন। সদরে ও মফঃস্বলে ঢালাও আমদানি। ফলে ক্রমবর্দ্ধমান মেদ ও অলঙ্কারের ভারে ষ্টেশন-গিন্নী নীলিমা আর পাকঘরের তাপ সইতে পারেন না। কন্যা সাবিত্রীকেই প্রায় সব কাজ করতে হয়। স্কুলের পাঠ বন্ধ হল। বিকেলে টি সির শ্যালক—শিক্ষানবীশ সিগন্যালার—বাড়ীতেই পড়িয়ে যায়। নিরঞ্জন ছেলেটি ভাল।

(২)

সাবিত্রী ও নিরঞ্জন দেবমন্দিরের বাইরের প্রাঙ্গণে পুলিশের হেফাজতে। সদরালার এজলাসে নিরঞ্জন আসামীর কাঠগড়ায়—সাবিত্রীর প্রাথমিক উক্তি লিপিবদ্ধ হল। সে বলে সে প্রাপ্তবয়স্কা—দুজনে সমস্ত প্রণয় হয়েছে। পরস্পর ইচ্ছায় ও সম্মতিতে তারা উদ্বাহে আবদ্ধ। হাকিম প্রবীণপন্থী—এ অবস্থা চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। হুকুম হল, পুনরাদেশ সাপেক্ষ নিরঞ্জনের হাজতবাস ও সাবিত্রীর পিতৃগৃহে আটক।

(৩)

প্রকাশ্য বিচার। অভিযোক্তা সাবিত্রী। সেই প্রথম ও প্রধান সাক্ষী। চোখের জলে জজ ও জুরিকে হলপান জবানবন্দীতে বুঝাল, আসামী তার অপরিণত বয়স ও অনভিজ্ঞ চরিত্রের অবৈধ সুযোগ নিয়ে তাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তার নিজের কোন স্বাধীন বিচারশক্তি ছিল না। সে যন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চালিত হয়েছে। পূর্ব্বেকার উক্তি সম্বন্ধে তার কৈফিয়ৎ সে আসামীর শিক্ষায় ও চাপে ঐ সব বলেছে: জেরাতে অবশ্য পরিষ্কার হল যে সে এখন বলছে তা অভিভাবকদের ইচ্ছাতেই। আসামী পক্ষের সওয়াল সাবিত্রী প্রাপ্ত-বয়স্কা এবং তার জন্ম-রেজেষ্টারী—ফরিয়াদী পক্ষ জেনে-শুনেই আদালতের অগোচরে রেখেছে এবং তার প্রাথমিক উক্তিই সত্য।

এখন মা বাপের ইজ্জৎ নষ্ট হওয়ার ভয়ে এই সব বলছে। জুরিরা সমাজের নেতা। সামাজিক ব্যাকরণে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন—নচেৎ সমাজ যে ভেসে যায়। জজ তাঁদের মতে মত দিয়ে—দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬ ধারায় নিরঞ্জনকে পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাগারে পাঠালেন। নিরঞ্জন আপীল করে নি।

(৪)

সাবিত্রী হাসপাতালের নার্স। পূর্ব্বেই তার শিশু-পুত্রকে অনাথাশ্রমে দেওয়া হয়েছে। রেজেষ্টারীতে পিতার স্থানে ফাঁকা। প্রায় সাড়ে তিন বৎসর মেয়াদ খাটার পর নিরঞ্জনের হঠাৎ কঠিন পীড়া হয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে। ঐ যোগ

বিকার—শুধুই না-দেখা ছেলেটির কথা বলে। সাবিত্রী অন্ত ওয়ার্ডে কাজ করে, মাঝে মাঝে অভুহাত খুঁজে ঐ ওয়ার্ডে এসে দূর থেকে দেখে ও কর্মরত নার্সদের কাছে অবস্থা ব্যবহার খোঁজ নেয়। পূর্ণিমার রাতে শবসংকার সমিতি বল হরি হরিবোল দিয়ে নিরঞ্জনের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। সাবিত্রীর মনে পড়ল এমনই এক রাতে সুধমা-সিক্ত মন্দির অঙ্গনে দেবতা সাক্ষী করে তারা হৃদয় আদান প্রদান করেছিল। নার্স-কোয়ার্টারের পিছন দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে নদীতীরে মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী। শ্মশানবন্ধুদের কৌতূহল মিটিয়ে জানাল, সে তার ধর্মপত্নী এবং তার মুখাগ্নি করবে। আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত সর্ব্বদা আছে—এই মন্ত্র মুখাগ্নির সময় কেউ উচ্চারণ না করলেও কয়েদীর বিদেহী আত্মা বোধ হয় স্বস্তিতে জেনে গেল তার অগতি হয় নি।

(৫)

কয়দিন পরেই নীলিমা নিজে অনাথাশ্রমে উপস্থিত—হাতে সংবাদ পত্র। হাইকোর্ট তত্ত্বাবধারক হিসাবে যে সকল বাছাই নথি পরীক্ষা করেছেন তার মধ্যেই নিরঞ্জনের বিষয় পর্য্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন নিম্ন আদালতের রায় ভুল। মহামান্য জজদের বিচারে সাবিত্রী ও নিরঞ্জন সমান প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরস্পরের বৈধ সম্মতিতে আইনানুগ স্বামী-স্ত্রী। নিরঞ্জন নির্দোষ ও বিনা বিলম্বে মুক্তি পাবার অধিকারী। অনাথাশ্রমের রেজেষ্টারীতে পিতার কলমে নিরঞ্জনের নাম লিখিয়ে নীলিমা শিশুপুত্রের হাত ধরে নার্স-কোয়ার্টারে উপস্থিত।

অনাড়ম্বর আদ্যকৃত্যের সামনে বিধবা সাবিত্রী প্রস্তরবৎ বসে। তার পাশে এসে ছেলেটি দাঁড়াল, পুরোহিত মন্ত্র পড়ে চলেছেন—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
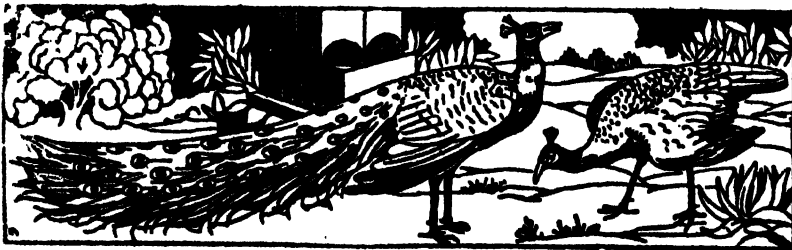
ইলিয়া এরেনবুর্গ

অশোক সেন

পাঁচ মাস এরেনবুর্গকে জেলে কাটাতে হয়েছিল। এই অরদিনের কারাবরণেই তাঁর বহুরকমের অভিজ্ঞতা হয়েছিল—কিন্তু এখানে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা না করে সোভিয়েট রাশিয়ার মহান নেতা লেনিনের সঙ্গে এরেনবুর্গের প্রথম সাক্ষাৎ এবং আলাপ ও কথাবার্তার বিষয় বিবৃত করবো।

এরেনবুর্গ এই সময়টায় ছিলেন প্যারিসে। ল্যাটিন কোয়ার্টারে গিয়ে উদ্বাস্তু রাশিয়ানদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন - তাঁর বন্ধু সাভসেকো এবং লুডমিলার ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে মুস্কিল হলনা। সাভসেকোর বয়স হয়েছিল তিরিশ—কিন্তু তিনি এরেনবুর্গের সঙ্গে বেশ সাতৃত্বের ভাব নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। হোটেলে থাকাটা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, সুতরাং পরের দিন তাঁকে নিয়ে যাবেন একটি ফারনিশ্‌ড রুমের খোঁজে—এ ধরণের ঘর পাওয়া শক্ত হবে না—কিন্তু সেদিন রাত্রে তাঁকে নিয়ে যাবেন একটি বলশেভিক গোষ্ঠির সভায়—লেনিন সেখানে উপস্থিত থাকবেন—বললেন সাভসেকো।

এরপর এরেনবুর্গ লিখছেন : আমরা একসঙ্গে খাবার খেলাম। কিন্তু আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম—বারবার ঘড়ির উপর নজর পড়ছিল : কিছুতেই দেরী করা চলবে না অবশ্য সাভসেকো এবং লুডমিলা প্যারিসের বহু বিস্ময়কর কাহিনী আমাকে বলছিলেন, কিন্তু আমার প্যারিসে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লেনিনের সঙ্গে দেখা করা।

বলশেভিক দলটির সাক্ষাৎকারের জায়গা ছিল এ্যাভিন্যু অর লিয়েনের একটি ক্যাফেতে—এ জায়গাটা বেলফোর্ট জায়নের থেকে বেশী দূরে নয়। উপরে একটি ছোট ঘর ছিল। প্যারিসের রীতি অনুসারে এ ঘরটির ব্যবহারের জন্ত ভাড়া লাগতো না—সভ্যেরা—যাঁরা আসতেন—তাঁরা তাঁদের কফি এবং চেয়ারের জন্ত দাম দিলেই হোতো। আমরাই প্রথম এসে হাজির হয়েছিলাম। সাভসেকোকে জিজ্ঞেস করলাম কোন্ পানীয়ের অর্ডার দেব। তিনি বললেন—'গ্রেনেডিন - এখানে আমরা সবাই গ্রেনেডিন পান করি।' কথাটা সত্যি—প্রত্যেকের হাতে দেখলাম লালরঙের সিরাপের গ্লাস—একসঙ্গে জল মিশিয়ে পান করে। ফরাসীরা কড়া এবং বেশী তেতো মদের সঙ্গে এই সিরাপ মেশায়—আর রবিবারে যখন পরিবারের সবাই মিলে ক্যাফেতে আসে, শিশুদের বিনাপয়সায় গ্রেনেডিন পান করতে দেওয়া হয়।

মিটিং-এ প্রায় তিরিশজন লোক উপস্থিত ছিলেন। আমি শুধু লেনিনের দিকেই চেয়ে ছিলাম। লেনিন পরেছিলেন কাল রঙের স্যুট—তাঁর সার্টের সঙ্গে ছিল সাদা স্টিফ কলার—অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল লেনিনকে। কি বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন আজ আর তা মনে নেই —কিন্তু আমি ছিলাম উদ্ধত প্রকৃতির যুবক—প্রশ্ন করবার অনুমতি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লেনিনের বক্তব্যের একটি বিষয় সম্পর্কে আমার আপত্তি জানালাম। অতি শান্ত এবং ভদ্রভাবে লেনিন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন—আমাকে বোকা বানিয়ে আমার ঔদ্ধত্যের উচিতশাস্তি দেবার চেষ্টা না করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন কোথায় কোথায় আমি তাঁর বক্তব্যের অর্থ বুঝতে পারিনি। লুডমিলা তখনি আমাকে বললেন, আমি খুব বোকার মত ব্যবহার করেছি। সভা ভাঙবার পর লেনিন আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে

জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি মস্কো থেকে আসছ? আমি উত্তরে জানালাম যে বিগত জানুয়ারী মাস অবধি আমি মস্কোর সংগঠনে কাজ করতাম, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পোলটাভাতে থাকবার চেষ্টা করেছি এবং সেখানেও কয়েকজন কমরেডের দেখা পেয়েছিলাম। লেনিন আমাকে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করতে বললেন।

পেরার সংস্কুরীতে লেনিনের বাড়ী খুঁজে বের করলাম। অনেকক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঘণ্টাধ্বনি করতে ভয় হচ্ছিল—আমার আগেকার ঔদ্ধত্য সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়েছিল। ক্রুপস্কায়া এসে দরজা খুলে দিলেন। লেনিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন: দেখলাম বসে আছেন, গভীর চিন্তামগ্নভাবে—সামনে বড় কাগজের সিট—আমাকে দেখে তার চোখদুটি সামান্য কুঞ্চিত হল। আমি তাঁকে স্কুল-সংগঠন ভেঙে যাওয়ার কথা, যুবদলের দুবছর বিষয়ক প্রবন্ধটি এবং পোলটাভার অবস্থার কথা বললাম। মনোযোগের সঙ্গে তিনি আমার কথা শুনলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখে একটা অস্পষ্ট হাসির ভাব ফুটে উঠছিল। তাই দেখে আমি ভাবছিলাম তিনি বোধহয় বুঝতে পারছেন আমি অপরিণত বয়স্ক যুবক—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সব চিন্তা কিরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম কতগুলো ঠিকানা আমার স্মরণে আছে যেখানে আমাদের খবর-কাগজ পাঠানো যেতে পারে। ক্রুপস্কায়া ঠিকানাগুলো টুকে নিলেন। উঠতে চেষ্টা করলাম—লেনিন বাধা দিলেন—এবার তিনি আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—"সাধারণ যুবকদের মনোভাবটা এখন কিরকম? কোন্ লেখকদের লেখা তারা বেশী পড়ে। জ্নানী (শব্দটির অর্থ হচ্ছে জ্ঞান, একটি প্রগতিশীল প্রকাশক ভবন, ১৮৯৮—১৯১৯) প্রকাশিত বইগুলো জনপ্রিয় কিনা; মস্কোতে আমি কি কি নাটক দেখেছি—কর্শ-এ এবং আর্ট-এ?" লেনিন বরাবর পায়চারি করছিলেন—আমি একটি টুলে বসে ছিলাম। ক্রুপস্কায়া বললেন যে, ভাতের সময় হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আমাকে অনেক বেশী

—আমার জন্যও খাবার আনলেন। ফ্ল্যাটটির সব কিছুই সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো—সেলফ্‌গুলোতে সারিবদ্ধভাবে বইগুলো সাজানো আছে। লেনিনের লেখার ডেস্কটিও খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার মস্কোর বন্ধুদের ঘর বা সাভলেকো সুভমিলায় ফ্ল্যাটের সঙ্গে লেনিনের ঘরের কোন তুলনাই করা চলে না। কয়েক-বারই তিনি ক্রুপস্কায়াকে বললেন: "এ সেখান থেকে সোজা এসেছে......যুবকের দল কি বিষয়ে আগ্রহী তা ওর জানা আছে......"

লেনিনের মাথাটি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। অনেকক্ষণ তাঁর বিস্ময়-বিহ্বলকারী মাথার খুলিটির দিকে চেয়ে রইলাম—এ সময় আমার মনে অ্যানাটমির কথা মনে হচ্ছিল না—আর্কিটেক্‌চারের বিষয়েই ভাবছিলাম।

লেনিনের মৃত্যুর বেশ কয়েকবছর বাদে আমি ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিচারণ পড়েছিলাম। তাতে তিনি লিখেছেন, লেনিন আমার লেখা প্রথম উপন্যাস পড়ে তাকে বলে-ছিলেন—'জান, এটি আমাদের শ্যাগী ইলিয়ার রচনা' (এরেনবুর্গের ডাক্‌নাম)। তাছাড়া লেনিন নাকি বেশ গর্বের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—'ইলিয়া একটা কাজের মত কাজ করেছে।'

১৯০৯ সালের প্রথমদিকে আমি লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ক্রুপস্কায়ার স্মৃতিচারণ পড়বার আগে আমার একথা জানা ছিলনা যে ছাপা লেখার মারফতে আবার আমার বক্তব্য তাঁকে শুনিয়েছি, ১৯২২ বা ১৯২৩ সালে, তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে, যখন তিনি আমার রচিত জুলিয়ো জুরেনিটো পড়ছিলেন।

লেনিনকে বহুবার আমি সভাতে বক্তৃতা দিতে শুনেছি—অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা বা আবেগপূর্ণ আবেদন তিনি করতেন না—অত্যন্ত শান্তভাবে নিজের বক্তব্য বলতেন। মাঝে মাঝে তাঁর কথায় 'আর্' অক্ষরটি একটু অস্পষ্ট শোনাতো—কথা বলবার সময়, সময় সময় মৃদুভাবে হাসতেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল সর্পিল (স্পাইরেল) আকারের। পাছে লোকে তাঁর বক্তব্য ঠিকমত না বোঝে,

এইভাবে আগের চিন্তাধারায় আবার ফিরে আসতেন, ঠিক একইভাবে এক কথা বলতেন না, আগের কথাকে ফিরে বলবার সময় নতুন কিছু তার সঙ্গে যোগ করে দিতেন। লেনিনের বলবার ভঙ্গীর অনুকরণ করে অন্ত যাঁরা বক্তৃতা দিতেন তাঁরা লেনিনের এইদিকটা কিন্তু আয়ত্ত করতে পারতেন না। তাঁরা বোধহয় সচেতন থাকতেন না যে সর্পিল আকৃতি গোলাকার হলেও তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অগ্রগতির দিকটা।

লেনিন ফরাসীদের রাজনীতিক জীবন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন—তাদের ইতিহাস, অর্থনীতি ভালভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন, প্যারিসের শ্রমিকদের জীবনের বিভিন্ন দিক তাঁর বেশ ভালভাবে জানা ছিল। শুধু যে ফরাসী মৌখিক ভাষাই তাঁর আয়ত্তে ছিল তা নয়, ঐ ভাষাতে তিনি প্রবন্ধও লিখতেন।

লেনিনের জীবনটা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল, মনটা পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক—সহযাত্রীদের বক্তব্য সব সময় মন দিয়ে শুনে বিচার করতেন। উদ্ধত স্কুলের ছাত্রের অনুচিত মন্তব্য করে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন না—তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন কোথায় তার ভুল। এই স্বচ্ছ সরলতা শুধু মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্রেই দেখা যায়। লেনিনের বিষয় চিন্তা করতে গিয়ে অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে সত্যিকার মহত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে ব্যক্তিত্ববাদ বস্তুটি অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার।

এরপর মায়াকোভ্‌স্কির কথায় আসা যাক্। কে এরেনবুর্গের সঙ্গে এই বিখ্যাত রাশিয়ান কবির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তা এরেনবুর্গ স্মরণ করতে পারেন নি। তাঁর শুধু এইটুকু মনে আছে যে প্রথম আলাপের দিন দুজনে একটি ক্যাফেতে বসেছিলেন এবং ছায়াচিত্র সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিলেন। মায়াকোভস্কি তাঁকে তাঁর বাড়ীতে অর্থাৎ স্যান রেমো লজিং হাউস এর একটি ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন—এই লজিং হাউসটি ছিল সল্‌টিকোভস্কায়া লেনে—স্রেটেন্স্কার কাছে। এরেনবুর্গ লিখেছেন—"সবেমাত্র তখন তাঁর Simple as Moving বইটি পড়েছি। তাঁর আসল চেহারা আমার তাঁর সম্বন্ধে যা কল্পনা ছিল তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। বিরাটাকৃতি, চোয়ালের হাড় ভারি দৃষ্টিভঙ্গী কখনও কঠিন, আবার কখনও বিষন্ন। আ ঘরে ঢোকবামাত্রই বললেন, একটা কবিতা পড়ে শোনাই আমি চেয়ারে বসলাম—তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সদ্যর রচিত 'ম্যান' নামে দীর্ঘ কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। ছো ঘর এবং আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না, কি তাঁর গলা শুনে মনে হচ্ছিল যেন টেট্রালিনী স্কোয়ারে এ জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি কাব্যপাঠ করছেন।

মায়াকোভ্‌স্কি ছিলেন এক রহস্যে ভরা মানুষ—কাব্য এবং বিপ্লবের এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ কারো ভেতর আ দেখিনি। একসময় ভাবতাম তিনিই আমাকে চলা পথের নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করবেন। কাজে কিন্তু হয়নি। তিনি ছিলেন কাব্য এবং সেযুগের জীবনের এ বিরাট ব্যক্তিত্ব—কিন্তু আমার উপর তাঁর কোন প্রত্য প্রভাব পড়েনি তাঁকে কাছে পেলেও মনে হোত তি একই সঙ্গে আবার অনেক দূরে সরে গেছেন।

হয়তো এ ব্যাপারটা প্রতিভাসম্পন্ন চরিত্রের লোকেদে বৈশিষ্ট্য—আবার এমনও হতে পারে এই বিশেষত্ব মায়াকোভস্কির ভেতরই ছিল। তিনি বলতেন, অন্যান্ত আ পাঁচজন লোকের থেকে কবিদের প্রকৃতি তফাৎ হয়ে থাকে তিনি শিল্পীসংঘ গড়তে চেয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর আশেপা যারা থাকতো, সবাই তাঁর ভক্তে পরিণত হোত—কেউ কে তাঁর লেখার ভঙ্গীর অনুকরণও করতো। মানুষ হিসা মায়াকোভস্কি ছিলেন বেশ জটিল চরিত্রের—ইচ্ছাশক্তি ছি প্রবল—মনের ভেতর সাধারণের বিরুদ্ধভাবের সংঘর্ষে স জট পাকিয়ে ফেলতেন। সমালোচকেরা তাঁর ফিউচারি পিরিয়াড্‌ নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাসেন না। আ আমার নিজের ফিউচারিজমকে অতীতের গ্রীসের থেকে পুরানো বলে মনে হয়। কিন্তু মায়াকোভস্কি অপেক্ষাকৃত অ বয়সে মারা যান—ফিউচারিজম সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধা স্তিমিত হয়ে আসলেও, একেবারে তাকে মন থেকে ঝে ফেলতে পারেন নি তিনি।

কেউ কেউ মনে করতো মায়াকোভস্কির ভেতর মত্ততা

আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় নিজের কবিজীবনের দ্বাদশ বার্ষিকীর উদ্‌যাপন উৎসবের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়েছিলেন। নিজেকে তিনি 'সবচেয়ে বড় কবি' এই আখ্যা দিতেন। জীবিতকালেই সবাই তাঁর বিরাট প্রতিভার স্বীকৃতি দিক—এই ছিল তাঁর একমাত্র দাবী।

তাঁর কবিতার একটি লাইন হচ্ছে—I love to watch children dying—অথচ চোখের সামনে ঘোড়াকে বেত মারতে দেখলে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। একবার এক কাফেতে তাঁর সামনে বসে থাকা অবস্থায় আমার এক বন্ধুর হাতের আঙুল কেটে যায়। মায়াকোভস্কি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

রচনার সমালোচনা করলে তীক্ষ্ণভাবে সে আঘাত ফিরিয়ে দিতেন মায়াকোভস্কি—একজন সমালোচককে এই ভাবে তার আঘাতের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন Comment: 'Your Poems do not warm, do not surge, do not infect' Reply: 'I am not a stove, not the sea, not the plague.

শরীর সম্বন্ধে ভয়ানক খুঁৎখুঁতে ছিলেন মায়াকোভ্‌স্কি। পকেটে সাবানের টুকরো থাকতো। এমন কারোর সঙ্গে যদি হস্তমর্দন করতে হোত যাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে অসুস্থ, অমনি তিনি ভেতরে গিয়ে সাবান দিয়ে হাতধুয়ে আসতেন। প্যারিসে কাফেতে বসে তিনি কফি পান করতেন স্ট্রর সাহায্যে—কারণ এইভাবেই গ্লাসের সঙ্গে ঠোঁটের স্পর্শ এড়াতে পারবেন।

মায়াকোভ্‌স্কি সম্বন্ধে বিদেশীদের লেখা অনেক প্রবন্ধ দেশভ্রমণের সময় আমার চোখে পড়েছে। লেখকরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে বিপ্লবই কবির ধ্বংস সাধনের জন্য দায়ী। এর থেকে উদ্ভট এবং অসম্ভব কথা কল্পনা করা যায় না। বিপ্লব না আসলে মায়াকোভ্‌স্কির কবিত্ব-শক্তির প্রস্ফুটন হোত না।"

এইখানেই এ রচনা শেষ করলাম।

জীবিকা

গল্প

সুধীরচন্দ্র রাহা

পোষ্টকার্ডের লেখা চিঠিখানা হাতে করে নিখিল আকাশ পানে তাকাল। শূন্য চোখ শূন্য মন। আকাশে, কি আছে তা নজরে পড়ল না। আর নজরে পড়ার কথাও নয়। নিখিলের মাথায় এখন আকাশ ভেঙে পড়েছে। তার মেসে বাস করবার মেয়াদ আর মাত্র পাঁচদিন। এই পাঁচদিনের মধ্যে দু-মাসের সিট-রেণ্ট আর ফুডিং চার্জ্জ কড়ায় গণ্ডায় না মেটালে তাকে আর মেসে থাকতে দেওয়া হবে না। তার সামান্য বিছানা বালিশ আর রং-চটা অতি পুরাতন ট্রাঙ্ক দুটি অস্থাবর সম্পত্তি এখন থাকবে ম্যানেজারের হেফাজতে। টাকা মেটালে তবে জিনিষ ফেরৎ দেওয়া হবে। নিখিল হাসল। ঐ বিছানা আর পুরোণো বাক্স বিক্রী করলেও মেসের পাওনা টাকা উঠবেনা।

চিঠিখানা এসেছে দেশ থেকে। বর্দ্ধমান জেলার এক অতিনগণ্য গাঁয়ে তার বাড়ী। রেল স্টেসন্ থেকে অনেক দূরে অনেক বন জঙ্গল অনেক চষা মাঠ আর মাঠের আলের রাস্তা পেরিয়ে সেই রামকেষ্টপুর গাঁ। সেই গাঁয়ে থাকে তার বৌ আর ছেলেমেয়েরা। এ যাবৎ মাসে মাসে, তিরিশটে করে টাকা মণিঅর্ডার করত নিখিল তার বৌয়ের নামে। তার বৌ বড় বড় অক্ষরে কোনমতে, মণি-অর্ডার ফর্মে নিজের নাম শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী সই করে, হাঁসি হাঁসি মুখে আঁচলের খুঁটে সেই টাকা বাঁধত। কিন্তু এবার থেকে তাও বন্ধ হয়ে গেল। তার আর চাকরী নেই। তার সহকর্মীরা তার জন্যে হা হুতাশ করেছিল। কেউ কেউ অতি দুঃখে রুমাল দিয়ে দুটি চোখ মুছেছিল। তারপর তারা চা, বিস্কুট খাইয়ে, নিখিলের দুঃখে সত্য সত্যই অভিভূত হয়েছিল। সেদিন নিখিল ওদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে হাতে টিফিনের কৌটা আর কাঁধে ছাই রংয়ের কাপড়ের ব্যাগটা ঝুলিয়ে কোনমতে, ঠিক মাতালের মত টলতে টলতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। আর ঠিক তখনই পশ্চিমের বিষণ্ণ সূর্য্য নিখিলের সামনেই অস্ত যাচ্ছেন। নিখিল অনেকক্ষণ হাঁ করে, সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে তাকাল। এই অস্তগামী সূর্য্যের সঙ্গে কি তার কিছু সাদৃশ্য আছে? না—নেই। এই সূর্য্য কাল আবার উঠবে নূতন তেজে, নূতন দীপ্তিতে। কিন্তু সে? হতভাগ্য নিখিলের সৌভাগ্য-সূর্য্য যে একেবারে অস্ত গেল। তার কোথাও আলো নেই। সম্মুখে পিছনে উপরে নীচে চার পাশে শুধু গাঢ় অন্ধকার আর হতাশাময়, অতি বিষণ্ণতাময় দীর্ঘশ্বাস ভরা জীবনের বৃহৎ অস্তিত্ব। নিখিল ভাবে, কিন্তু এরপর? জীবন যে এতো নির্মম—আর পৃথিবী যে এতো কঠিন, একি সে জানত? কিন্তু তবুও তাকে বাঁচতে হবে। তার বৌ ছেলে মেয়ে, তাদের জীবন রক্ষা করতে হবে। কিন্তু তার জন্যে চাই চাকরী। কিন্তু কে দেবে তাকে চাকরী। তার যোগ্যতা যৎসামান্য। ম্যাট্রিক পাশের সার্টি-ফিকেটখানা বুক পকেটেই আছে। এর জোরে কি আর হাতী ঘোড়া জুটতে পারে? তবুও এটাই এখন সম্বল। এটা হাতে করে অফিসের দুয়োরে দুয়োরে তাকে ঘুরতে

হবে। তাকে বাঁচতে হবে—তার বৌ তার ছেলে মেয়েদের বাঁচাতে হবে। সেই জন্ত পাড়াগাঁ, রামকেষ্টপুরে তার বৌ ছেলে মেয়ে শুধু তার মুখ চেয়েই বেঁচে আছে। কিন্তু কি ভাবে যে তারা বেঁচে আছে, তা কলকাতা থেকে না দেখতে পেলেও নিখিল এমনিই সব বুঝতে পারছে। তাকে আর বাঁচা বলে না। কোন রকমে এই ভয়ংকর দিনে প্রাণটুকু শুধু ওদের ধুক ধুক করছে। চার টাকা কেজী চাল, খড় প্রায় চার টাকা, মুড়ি সাড়ে চার টাকা কেজী। মিছরির চেয়ে মুড়ির দর বেশী। উপরি উপরি দু-তিন বছর ধান হয়নি। খেত-খামার খাঁ খাঁ করছে। এ সবই জানে নিখিল। রাতে অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে, একটুও কেরোসিন তেল নেই। নিখিল অবাক হয়ে যায়। হল কি দেশটার। নিখিল ভাবে এর মধ্যেই তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচাও আমাকে বললে, কে বাঁচাবে? আমি অভাবে পড়েছি, আমি দুর্বল—এ কথা বললে কেউ কি তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে? না না কেউ আসবেনা। মনে পড়ে গেল সেই কথাটা। প্রকৃতি হল সোজাসুজি। এর ভেতর ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। সারভাইভেল অব দি ফিটেষ্ট। অনেক দিন আগেকার কথা। তাদের স্কুলের অক্ষয় মাষ্টারের কথা মনে পড়ে গেল। অক্ষয় মাষ্টার একদিন বলেছিলেন, প্রকৃতি বড় নির্দয় আর নির্মম। এখানে টিকে থাকতে হলে চাই সংগ্রাম। অনবরত সংগ্রাম আর যুদ্ধ করেই বাঁচতে হবে। শুধু মাত্র গায়ের জোর নয়। এখানে চাই বুদ্ধির জোর। চাই মগজের জোর। নূতন নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে তবেই টিকে থাকা আর নতুবা মুছে যাওয়া। এমনি অনেক অনেক জাতি কোথায় হারিয়ে গেছে। নিখিল ভাবতে থাকে। তার মেসে থাকার মেয়াদ আর মাত্র পাঁচদিন। এর পর কোথায় সে যাবে। মাথার ওপর আর কোনও আচ্ছাদনও থাকবেনা।

ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেটখানার ওপর সযত্নে হাত বুলিয়ে হাঁটতে থাকে নিখিল। সার্টিফিকেটখানা নিয়ে অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করল নিখিল। তারা প্রচুর সহানুভূতি দেখালেন। নিখিলের এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের জন্য তাদের প্রত্যেকের প্রাণে ভীষণ আঘাত লেগেছে সে কথাও বললেন। কিন্তু চাকরীর কথাতেই তাঁরা আঁতকে উঠে বললেন, চাকরী? মাই গড্—! যে বিশ্রী দিনকাল পড়েছে দেখছ না? চার দিকে কী দারুণ অবস্থা। সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য অচল, কলকারখানা বন্ধ। এখন এই অবস্থায় কোনো আশা নেই ভাই। তবে মনে থাকল, চেষ্টা করে দেখব। কোম্পানীগুলোর ফাইনান্সিয়াল অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আচ্ছা, যদি ভেকান্সি হয়, তবে অবশ্যই খবর পাঠাবো।

সমস্তদিন টো টো করে ঘুরে অবশেষে শ্রান্ত দেহে ফিরে এল নিখিল। তিনকাপ চা আর দুটো বিস্কুট ছাড়া সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। একটা পার্কে এসে, ঘাসের শয্যার ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল নিখিল।

রাতে আস্তে আস্তে মেসে ফিরল নিখিল। কিন্তু জানে সেখানে তার খাওয়া বন্ধ। নিখিল ভাবতে থাকে সস্তায় কি খাওয়া যায়, অথচ পেট ভরে। কিন্তু না—কোন খাদ্যবস্তুই আর সস্তায় পাওয়া যাবে না। এক কালে ছিল মুড়ি মুড়কী। কিন্তু এখন ঢের আক্রা। মুড়ি মুড়কী এখন বহুমূল্য খাদ্য—কুলীন পর্য্যায়ে পড়েছে। তাই মুদীর দোকান থেকে একগ্রাম সাবু আর পঞ্চাশ গ্রাম গুড় কিনল নিখিল। ঠোঙ্গা পকেটে রেখে ধুকতে ধুকতে ফিরল মেসে। তখন মেসে খাওয়ার আয়োজন চলছে। নীচে লম্বা দালানে সার সার আসন—। থালাগেলাস হাতে নিয়ে মেস মেম্বাররা হুড়মুড় করে নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। একপাশে সরে দাঁড়াল নিখিল। ওরা সব একবার মাত্র তাকাল—চোখে চোখে কি যেন ইঙ্গিত হয়ে গেল। নিখিল তা দেখেও দেখল না—তবে বুঝলে সব। আস্তে আস্তে চোরের মত নিঃশব্দে উপরে এসে ঘরে ঢুকল।

ঘরে আলো জ্বলছে। আর দুজন মেম্বার যারা খাওয়ার জন্য নীচে নামবার জন্য তৈরী হয়েছিলেন, তাঁরা

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখে চোখে কি যেন কথা হয়ে গেল। ধীরেনবাবু থালা গেলাস হাতে করে নীচে নেমে গেলেন, কিন্তু রয়ে গেলেন বিশ্ববন্ধু বাবু। নিখিল বলল—কি খেতে গেলেন না?

মুখ ঘুরিয়ে কি যেন অস্ফুট কণ্ঠে বললেন বিশ্ববন্ধু বাবু। কথাটা বললেন নেহাৎ অবজ্ঞাভরে অতি অনিচ্ছাতে। বিশ্ববন্ধুবাবু গভীর মনোযোগ দিয়ে পুরোণো খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলেন। নিখিল অবাক হয়ে গেল। এই বিশ্ববন্ধু বাবুর সঙ্গেই তার বেশী ভাব ছিল। কতদিন যে ওকে থিয়েটার সিনেমা দেখিয়েছে। গাঁটের পয়সা খরচ করে চা কফি চপ্ খাইয়েছে। কিন্তু আজ সেই বিশেষ বন্ধু তার অসময়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিখিল আরও অবাক হল যখন দেখল তার আম কাঠের তক্তাপোষের ওপর তার বিছানা নেই আর রং-চটা বাক্সটাও নেই। বুঝল, অস্থাবর সম্পত্তি এখন ম্যানেজারের হেফাজতে। টাকা মেটালে তবে ফেরৎ পাওয়া যাবে। নতুবা নয়। বিশ্ববন্ধু বাবুকে আর জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হল না। কিন্তু তবুও নিখিলের মনে হল, এদের এই কাজটা, বে-আইনী, সভ্যতা ও ভদ্রতাবর্জ্জিত কাজ। একেবারে অভদ্র আর অশ্লীল মনোবৃত্তি…কিন্তু এ নিয়ে উচ্চবাক্য করা বৃথা। কারণ —সে গরীব উপায়হীন এবং তদুপরি দু মাসের টাকা দিতে পারেনি। অতএব সভ্য মানুষদের সব রকম অত্যাচার নির্য্যাতন ব্যঙ্গ কটূক্তি, অপমান তাকে মাথায় পেতে নিতে হবেই। কারণ সে গরীব অসহায় দুর্ব্বল—পথের ভিখিরী। কারণ সে আর মনুষ্য পদ-বাচ্য নয়।

নিখিল দেখল সৌভাগ্যক্রমে মেসের ভদ্রলোকরা তার তোবড়ান এলুমিনিয়মের গেলাস বাটি নেয় নি—ফেলে রেখে গেছে। নিখিল বুঝল, এরা আর তাকে বিশ্বাস করে না। তাই একজন খেতে গেছে—অন্যজন সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। পাছে সে :চুরিচামারি করে, বাক্স ভাঙে বা কিছু সরিয়ে নেয়। এতে নিখিল কোন দুঃখ বা অপমান বোধ করল না। ভাবল—এখন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিখিল এ্যাদ্দিন যে ভেবেছিল, এখন দেখল সেই সব বিশ্বাস মিথ্যে। এই পৃথিবী একদিন তার চেয়ে সুন্দর মনে হয়েছিল। এখানকার এই জীবন ও পৃথিবীর লোকগুলোকে ভালবাসত। কিন্তু একি হল আজ? তার সমস্ত জীবনের সব বিশ্বাস কি ভুল? পৃথিবী নির্ম্মম, এই পৃথিবীর মানুষরাও নির্ম্মম আর হৃদয়হীন।

নীচে খাবারের ঘর থেকে হাসির শব্দ উঠেছে। অথচ ওদেরই একজন পরিচিত বন্ধু, সমস্ত দিন অভুক্ত অবস্থায় ক্ষুধায় ধুঁকছে। কী আশ্চর্য্য—এই মানুষগুলো। এরা এত হিসেবী আর কঠিন প্রাণ। তক্তাপোষের ওপর বসে, বিশ্ববন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল নিখিল। লোকটার মুখ গম্ভীর ভাবলেশহীন। নিখিল যে ঘরে রয়েছে, তার এই উপস্থিতিটা পর্য্যন্ত আজ বিশ্ববন্ধু ভুলে গেছে। হঠাৎ নিখিল শব্দ করে হেঁসে উঠল। বিশ্ববন্ধুবাবু চমকে উঠে ওর দিকে তাকাল।

নিখিল কোনদিকে দৃকপাত না করে জলের কুঁজো থেকে জল ঢেলে গেলাস বাটি ধুয়ে, সেই বাটিতে একশ গ্রাম সাবু আর গুড় ঢেলে দিল। তক্তাপোষের ওপর বসে সেই সাবু দলা দলা করে খেতে লাগল। তার-পর শব্দ করে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল—আর বিড়ি খেতে লাগল—

এ যেন পৃথিবীশুদ্ধ পেটভরা খাইয়ে লোকদের প্রতি নিখিলের উপবাসী দেহ-আত্মা—ও পোড়া পেটের বিদ্রোহী চ্যালেঞ্জ। যেন নিখিল বলতে চাচ্ছে—হে ভরা-পেট মানুষ, তোমরা ধ্বংস হও। জয় খালি পেটের জয়। জয় ক্ষুধিত নিরন্ন মানুষদের—সেই খালি তক্তা-পোষের ওপর নিখিল শুয়ে পড়ল।

নিখিল ভাবল, এই স্বার্থান্ধ পৃথিবীতে তার কেউ নেই। সে একা। শুধু নিজের বুদ্ধি আর চালাকী করেই তাকে বাঁচতে হবে। মনে হল, হয়তো তার ছেলে-মেয়েরা রামকেষ্টপুরের কোন এক লঙ্গরখানায় দীন ভিখিরীর মতন, থালা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। আশা

একটুখানি জলবৎ খিচুড়ী পাবে বলে। কিন্তু আর মাঝে সামান্য দিন। এর পর মাথার ওপর এই ছাদও থাকবে না। একেবারে দিগম্বর ভোলানাথ হতে হবে। গৃহহীন অন্নহীন হয়ে, এই বিরাট সহরের রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে কাটাতে হবে। কিন্তু রাতে কোথায় যাবে? দুই চোখ বন্ধ করে, নিখিল ভাবতে থাকে। সেকি ফিরে যাবে সেই রামকেষ্টপুর গাঁয়ে? কিন্তু তাই তো তার পরাজয়। না—না—সে ফিরবেনা।

আবার এল একটা চিঠি। টাকা পাঠাও। উপোস যাচ্ছে। না পাঠালে আর আমাদের দেখতে পাবে না। পত্রখানার দিকে তাকিয়ে রইল নিখিল। টাকা? কোথায় সে টাকা পাবে?

যে মাসের কলকাতা। রাস্তার পীচ পর্য্যন্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। দুপুরের রাজপথ জনযানবহীন। শুধু তার মত হতভাগ্যরা হাঁটছে। জামা কাপড়ের অবস্থা শোচনীয়। মাথার চুল বড় বড় হয়ে চোখে কপালে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সারা মুখ গোঁফ দাড়িতে বিশ্রী হয়ে উঠেছে। নিখিলের বিশ্রাম নেই। সে হাঁটছে—আর হাঁটছে। বুকে সেই সার্টিফিকেটখানা। এ অফিস্ থেকে অন্য অফিস। কিন্তু না না কোথাও চাকরী নেই। রামকেষ্টপুরে সে চিঠি দেয় নি। যদি কোন দিন সুদিন আসে আর ওরা বেঁচে থাকে, তবেই সে খোঁজ নেবে। সেই তীব্র রোদ আর গরমের মধ্যে নিখিল বড় বড় অফিস বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এখানে শুধু নেই নেই চারদিকে। চাল নেই—আটা চিনি গুড় চিঁড়ে কিছুই নেই। যেন সব কিছু উড়ে পুড়ে—গোল্লায় চুলোর দুয়োরে গেছে। নিখিল ভাবে, হে ভগবান্, একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাস কিংবা প্রবল ঝড় ভূমিকম্প পাঠাও। দয়া কর তুমি। দগ্ধে না মেরে একেবার মেরে ফেল—নির্ম্মূল করে দাও এ জাতকে। যাদের আছে—আর যাদের নেই, তুমি কাউকে ক্ষমা করবেনা। জাতকে জাত—সবকে পিষে মেরে গুঁড়িয়ে দাও—সবকে ধুলোয় মিশিয়ে দাও। আমার আজ কোথাও ঠাঁই নেই—আমি বেকার ভিখিরী। কিন্তু হে ভগবান, তবে কেন খিদে দিয়েছ—কেন তৃষ্ণা দিয়েছ—কেন কামনা দিয়েছ? আমি আজ পৃথিবীতে একঘরে—অপাংক্তেয়। কিন্তু কেন? কেন—

অবশেষে নিখিল ঠাঁই পেল। ঠাঁই পেল বলা ভুল। সে এক তৃণখণ্ড দুর্ব্বল হাতে ধরল।

সেদিন দুপুরে যখন পার্কের মধ্যে ঘাসের শয্যায় শুয়েছিল তখনই এল সেই সুযোগ। সেই দুপুরের রোদে এক পুরোণো কাগজের ফেরিওয়ালা এসে তার পাশে, তার আধমণি কাগজের থলে নামিয়ে হাঁপ ছাড়তে লাগল। তার পরণে তালি দেওয়া লুঙ্গি, গায়ে অতি জীর্ণ একটা হাত-কাটা জামা, মাথায় ততোধিক ময়লা একটা গামছা বাঁধা। আলাপ হয়ে গেল, সেই ফেরি-ওয়ালার সাথে। ওরা থাকে গোপাল নগরে। সেখানে তার মত আরও পাঁচ ছয়শো ফেরিওয়ালা বাস করছে—। যাদের ব্যবসাই—এই পুরোণো কাগজ কেনা-বেচা। বিড়ি টানতে টানতে অনেক খবর নিখিল জেনে নিল।

মহম্মদই বলল, ঘর ভাড়া দিই দু টাকা, নিজের খেতে লাগে মাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা, আর হপ্তা হপ্তা বাড়ী পাঠাতে হয় দশ টাকা। সেখানে মা, ভাই আছে, না দিলে খাবে কি? সকাল থেকে বেলা দুটো ' ' নটে পর্য্যন্ত এই কাজ করে, বিকেলে বিক্রী করে পুরোণো বই, ভাঙা সাইকেল পার্টস, আর আর টুকিটাকি জিনিষ। মহম্মদ বলল, তাদের ডেরা একজায়গায় নয়। সহরের অনেক জায়গায় ওরা ছড়িয়ে আছে। ওদের ডেরা টালিগঞ্জ বাগবাজার মেটিয়াবুরুজ, কলেজ ষ্ট্রীট, মোমিনপুর এই সব জায়গায়। কৌলিন্যহীন এই উপজীবিকা। এই উপজীবিকায়, তাদের রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে দাবি জানাতে হয়না। নিখিল উঠে বসে। মহম্মদের হাত হতে বিড়ি নিয়ে টানতে থাকে।

কলকাতা থেকে রামকেষ্টপুর অনেক দূর। বহু বন জঙ্গল পার হয়ে—মাঠ, মাঠের আল-পথ পার হয়ে তবে রামকেষ্টপুর। সেই গাঁয়ে নিখিলের ছেলে বৌ ভাঙা থালা বাটি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে লঙ্গরখানায়। লঙ্গরখানার বাবুদের দয়া হলে তবে পাবে মাইলো ভুট্টার খিচুড়ী। এদিকে নিখিল, কলকাতার রাস্তায়

রাস্তায় ঘুরছে পুরোণো কাগজ বোঝাই আধমণি থলে নিয়ে—

—চাই শিশি বোতল—পুরোণো কাগজ—। পিঠে আধমণি থলে, পরণে ছেঁড়া লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি, মাথায় গামছা বাঁধা—: একটা হাত দুলিয়ে দুলিয়ে আর একটা হাত কাঁধের বস্তা সামাল দিতে দিতে, কলকাতা সহরের তপ্ত রাস্তার ওপর দিয়ে নিখিল হেঁকে হেঁকে চলছে! সেই বিচিত্র সুর কাঁধের বোঝার ভারে পিঠ নুয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর বেঁকে গিয়েছে। জীবনের বোঝা বয়ে বয়ে চলছে নিখিল—আর নিখিলের মত লোকরা। গলার বিচিত্র সুর তপ্ত বাতাসে ভেসে যাচ্ছে—পুরোণো কাগজ আছে—। পুরোণো কাগজ—

রোদ নেই—বৃষ্টি নেই—সারা রাস্তায় রাস্তায়, হেঁকে হেঁকে চলছে নিখিল। বোঝার ভারে পিঠের চামড়া শক্ত হবে, হাতের দুদিকে ধরবে শক্ত কাল কড়া, পিঠ যাবে বেঁকে—আর দুপায়ে পড়বে ঘাঁটা—। নিখিল সেই তপ্ত কড়া রোদে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে হেঁকে হেঁকে চলছে রাস্তায় রাস্তায় অলি গলিতে—পুরোণো কাগজ—পুরোণো কাগজ—।

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন

রণজিৎকুমার সেন

বাংলা সাহিত্যে সাবিত্রীপ্রসন্ন এমন একটি নাম—যাঁর প্রতি লেখক এবং পাঠক প্রত্যেকেই সমান শ্রদ্ধাবান। এই জাতীয় চরিত্রের দেখা আমরা সচরাচর পাই না, কিন্তু উনিশ শতকের চরিত-ইতিহাসে এ জাতীয় মানুষ দুর্লভ ন'ন। সাবিত্রীপ্রসন্নও উনিশ শতকেরই শেষ দশকের মানুষ ছিলেন। তাই সেকালের সামাজিক ও মানবিক যা কিছু মূল্যবান—তা সমধিক পরিমাণে তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতো।

মূলতঃ কবি হ'য়েও তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, জীবনীকার, সমালোচক, সাংবাদিক ও দার্শনিক। কোনো ইজ্‌মের মধ্যে না গিয়েও ডায়ালেক্‌টিক্‌স-এ তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী। তাঁর কাব্য যত না দেহবাদী ও শিল্পবাদী, ততোধিক ছিল জাতীয়তাবাদী। নিজের দেশ এই ভারতবর্ষকে তিনি সকলের উপর স্থান দিয়েছিলেন ; তাই ভারতবর্ষের যেখানে দুঃখ-বেদনা ও হাহাকার—সেখানে তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে পারেননি, কখনও তিনি অগ্নিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন, কখনও আবার মাতৃক্রোড়ে অসহায় শিশুর মতো দুঃখে কেঁদেছেন। সেই কান্না কাব্য হ'য়ে উঠেছে। বলেছেন—

সারা রাত্রি সারা দিনমান
পরবশ্যতার গ্লানি,
নিরুপায় নিষ্ফল ক্রন্দন
আনিয়াছে জীবনে ধিক্কার
দুঃস্বপ্নের ক্লান্তি অবসাদ,
সে ইন্ধনে একদিন দেখিলাম অবাক বিস্ময়ে
লণ্ডভণ্ড রাজ্যপাট,
জ্বলিয়াছি যে অগ্নিজ্বালায়,
স্বাধিকার-প্রবঞ্চিত জীবনের
যৌবনে দিয়েছে লজ্জা,
ভুলি নাই সে যন্ত্রণা,
ভুলি নাই মর্মদাহে পীড়নের অরণ্য ইন্ধন,
জ্বলিতেছে রাজসিংহাসন।

সর্বত্রই আমরা সাবিত্রীপ্রসন্নের এই উদ্দীপ্ত অথচ মরমী হৃদয়টিকেই বার বার করে দেখেছি—যেখানে মমতার সব কিছু একাকার হয়ে গেছে, যেখানে ইংরেজ ভারতের মাটি থেকে গুটিয়ে নিয়েছে তার রাজসিংহাসন। যে সৌন্দর্যবাদের তিনি উপাসক ছিলেন, সেখানে সেই সৌন্দর্যবাদের শুচিতা ও সতীত্ব রক্ষায় তাঁর মতো অতন্দ্র সৈনিকও আমরা কমই দেখেছি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, উত্তর-স্বাধীনতা যুগে, গঠনমূলক সমাজকর্মে কিম্বা সাহিত্যের নানা বৈপরীত্য ও বিরোধের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রামের ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন সমালোচনা-সাহিত্যে। এক্ষেত্রে কবি মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর অনেকাংশে মিল ছিল। যেমন স্বনামে, তেমনি 'পঞ্চানন্দ' 'মুচিরাম গুড়', 'পদ্মপাদ', 'শ্রীগুরু' প্রভৃতি ছদ্মনামে—নানাভাবে এ পথে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ ক'রে গিয়েছেন। অপরদিকে বহু ব্যক্তিকে তিনি যেমন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন, তেমনি বহু সাহিত্যিকের সুপ্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন। এতবড় স্বজন বন্ধু-সংখ্যায় বোধ করি এদেশে একেবারেই বিরল। এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে

অন্যতম কথাশিল্পী তারাশঙ্করের উক্তিটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তারাশঙ্কর বলেছেন—

—"১৯৩০ সনের আন্দোলনে জেলে চলে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রের যোগাযোগে ছেদ পড়লো। কিন্তু সাবিত্রীপ্রসন্ন ছেদ টানলেন না, তিনি তার মধ্যে যোগসূত্রটি বজায় রাখলেন। তার আগে 'উপাসনা'য় আমার 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রথম উপন্যাস বের হয়েছে দু' তিনটি সংখ্যায়। ১৯৩০ সনের প্রথমেই সাবিত্রীপ্রসন্ন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন—কি নাম ছিল ঠিক মনে নেই। তবে কাগজখানির সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের যোগ ছিল; সম্ভবতঃ তিরিশের আন্দোলনকে সাহায্য করতেই কাগজখানির সৃষ্টি হয়েছিল। আমি জেলে গেছি সংবাদ শুনে সাবিত্রীপ্রসন্ন আমার ছবি সংগ্রহ ক'রে তাঁর এই কাগজে আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী-সহ প্রকাশ করেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই কাগজখানি দেখেছিলাম। দেখে যেমন উৎসাহ অনুভব করেছিলাম (কারণ সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে এই আমার প্রথম ছবি প্রকাশিত হলো), সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী প্রসন্নের প্রীতি অনুভব ক'রে কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম। এদিকে 'কল্লোল' তখন উঠে গেছে। 'উপাসনা'ই আমার একমাত্র অবলম্বন হয়ে রইল।—এবার কলকাতায় এসে সাবিত্রীপ্রসন্নের বাড়িতেই উঠেছিলাম। বেশ কিছুদিন—বোধ হয় পনেরো কুড়িদিন ছিলাম। একসঙ্গে বাস, একসঙ্গে আহার এবং রাত্রিতে দীর্ঘক্ষণ গল্পগুজব আলাপ আলোচনার মধ্যে কাটিয়েছি; অন্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়েছিল। সে অন্তরঙ্গতা আরও ঘন হলো আরও একটি ঘটনায়। সাবিত্রীপ্রসন্ন একদিন 'চলুন এক যায়গায় বেড়িয়ে আসি' বলে আমাকে এনে সরাসরি তুলে-ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে। এখানে তিনি আমাকে এনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সামনে উপস্থিত করলেন। সেদিন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম এবং আজও পর্যন্ত জীবনের যে ক'টি দিনকে আমি শ্রেষ্ঠ দিন ব'লে গণনা করি, তার মধ্যে সেই দিনটি অন্যতম একটি দিন, তাতে সন্দেহ নেই এবং এমন দিন বোধ করি জীবনে আর আসবে না।"

সাবিত্রীপ্রসন্নের এই বন্ধুবৎসলতার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। কবি নরেন্দ্র দেব বলেছেন: 'আমার পরিচিত কবিবন্ধুগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সেদিন বয়ঃকনিষ্ঠ।...আমার সঙ্গে মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দীর পরিচয় ছিল না, তাই আমি বন্ধুবর সাবিত্রীপ্রসন্নকে সকল কথা জানিয়ে মহারাজকুমারের কাছে আমাকে নিয়ে যাবার অনুরোধ করাতে বন্ধুবর তৎক্ষণাৎ আমাকে নিয়ে গিয়ে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।'

সাবিত্রীপ্রসন্নের মাধ্যমে এ রকম বহু বহু মানুষের পরিচিতির জগৎ সম্প্রসারিত হয়েছিল। তেমনি পরো-পকার প্রবৃত্তিও ছিল তাঁর প্রবল। কোনো-না-কোনো ভাবে মানুষের সাহায্যে ও উপকারে আসতে পারলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। এই প্রসাদগুণটি আজকের জগতে একান্ত বিরল।

তাঁর কাব্যের মধ্যেও ছিল তাই প্রাণেরই ধারা—যা ছিল তাঁর আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন: তোমার কবিতায় বিশিষ্টতা আছে, পড়ে খুসি হয়েছি।'

তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনের মূলে ছিল পল্লী-প্রাণতা। গ্রামের মানুষ সাবিত্রীপ্রসন্ন গ্রাম-বাংলার প্রসাদ নিয়ে এলেন মহানগরে। অথচ মানুষটি কোনোদিন বদলালেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের বিশেষতম দিকগুলি আলোচনা করার সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

১৩০১ সালের ২রা পৌষ নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। এই অঞ্চলটি বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত। পিতা কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তদানীন্তন বাংলার একজন শক্তিমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সহসম্পাদক হিসেবেও তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। পিতৃদেবের এই সাহিত্যিক উত্তরাধিকার

নিয়েই সাবিত্রীপ্রসন্ন সাহিত্যজীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর যৌবনের ভরা দিনগুলি অতিবাহিত হয় মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর এবং কলকাতায়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই ১৯১৯ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে যখন তিনি এম এ ক্লাসের ছাত্র, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তখন দেশ মেতে উঠেছে। দেশবন্ধুর আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের ছায়া অতিক্রম করে সাবিত্রীপ্রসন্নই প্রথম ছাত্র—যিনি এসে যোগ দিলেন ইংরেজবিরোধী অসহযোগে। সেদিন 'স্টার থিয়েটার' হলে বাংলার প্রথম ছাত্রসম্মেলনের মনোনীত সভাপতি ছিলেন সাবিত্রীপ্রসন্ন।

এর পরের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন কর্মের ইতিহাস। 'কলিকাতা বিদ্যাপীঠ'এ যোগদান করলেন তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে। এটি কেবল বিদ্যাপীঠই ছিলনা, তৎকালীন সর্ববিধ কর্মপ্রেরণার অন্যতম পীঠভূমিও ছিল এটি। সুভাষচন্দ্র তখন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ এবং কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি অধ্যাপনায় নিযুক্ত। এক পরিবারভুক্ত লোকের মতো ছিলেন তাঁরা সেখানে। সকলের অন্তরে একই দেশপ্রেম, একই কর্মধারা। কিছুকাল পরে ফরোয়ার্ড প্রেসের উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সাবিত্রীপ্রসন্নকে স্থানান্তরিত করা হয়। 'স্বরাজ্যপার্টির'ও প্রথম দশজন সভ্যের অন্যতম ছিলেন তিনি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছেন তিনি। ইংরেজ সরকারের রোষকষায়িত দৃষ্টিবহ্নি বহুবার বহুভাবে তাঁকে দহন করেছে। কখনও লালবাজারের পুলিশ-হেড-কোয়ার্টার্সে সাবিত্রীপ্রসন্নের ডাক পড়েছে, কখনও হুকুমনামা এসেছে তাঁর কাব্যগ্রন্থের উপর। ১৯২৪ সালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরেখা' ইংরেজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে 'কল্যাণী কংগ্রেসের' সময় যে স্মারকপত্র প্রকাশিত হয়, তার সম্পাদনার ভার ছিল সাবিত্রীপ্রসন্নের উপর। এ ছাড়া পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও গোবিন্দবল্লভ পন্থের উপর রচিত স্মারকগ্রন্থও তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বিচক্ষণ সাংবাদিক হিসেবে তিনি যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেন, তার মধ্যে 'উপাসনা', 'অভ্যুদয়', 'বিজলী' ও 'স্বায়ত্ত শাসন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রচারবিদ হিসেবেও তাঁর স্থান বাংলা দেশে সর্বাগ্রগণ্য ছিল। জীবনের সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর সাবিত্রীপ্রসন্ন বাংলার অন্যতম বীমা-সংস্থা হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স সোসাইটির প্রচারসচিবরূপে কাজ করেন। এ সময়ে রচিত তাঁর 'Life Insurance Advertising and Selling' একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে যেমন পাওয়া যায় তাঁর অনন্যসাধারণ অনুসন্ধিৎসার পরিচয়, তেমনি পাওয়া যায় কবি-মানসের মনোরম অভিব্যক্তি। কানাডা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বহু স্থান থেকে এই গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা আসে। তেমনি নামকরণ ও অনুবাদ কর্মেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। বীমাসংস্থা থেকে অবসর গ্রহণের পর সাবিত্রীপ্রসন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন-বিভাগে দুটি সম্মানিত পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, একটি Senior Editor Publication (department of Tourism) এবং দ্বিতীয়টি Member : Board of Review of Publications (department of : Home Press). এতদ্ব্যতীত শেষ জীবনে তিনি যে সমস্ত সংস্থার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা হচ্ছে—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরি সমিতির সভ্য, দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সহঃসভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির প্রচার কমিটির সভাপতি। State Re-organisation Commitee-র বিশিষ্ট সভ্য হিসেবে 'পানিকর কমিশন'-এর নিকট যে Memorandum পেশ করা হয়, তা রচনার দায়িত্বও অংশতঃ তাঁরই উপর বর্তায়। ঐ কমিশনের নিকট যাঁরা বক্তব্য পেশ করেন সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তা হচ্ছে পল্লীব্যথা

(১৯২০), মধুমালতী (১৯২৪), রক্তরেখা(১৯২৪), শ্রীষ্টানুসরণ (১৯৩১), মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র (১৯৩২), আহিতাগ্নি (১৯৩২), মনোমুকুর (১৯৩৬), মডার্ণ কবিতা (১৯৪১), অনুরাধা (১৯৪৪), অতসী (১৯৪৫), সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র (১৯৪৬), বন্দনা (১৯৪৭), জলন্ত তলোয়ার (১৯৫০), কাব্য সঞ্চয় (১৯৫৪), কাব্য সাহিত্যের ধারা (১৯৬০), উৎসর্গ (১৯৬১), বেঁটে বক্কেশ্বর, কুঁড়ের বাদশা, মায়া কান্না এবং সম্পাদিত গ্রন্থ : Rashbehari Basu : His struggle for India's Independence (১৯৬৩) এবং আমার দেশ (১৯৬৩)।

১৩৭১ সালের ৯ই চৈত্র সাবিত্রীপ্রসন্নের জীবনাবসান ঘটে। তিনি ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও অকুতোভয় পুরুষ। তাঁর জিহ্বা কখনও পরনিন্দা-আশ্রিত ছিল না, বরং মমতাপ্রকাশে সিক্ত ছিল। তাঁর প্রতি যদি কেউ অবিচার করতো, তিনি তা আপন দৃঢ়চরিত্র, মহত্ত্ব ও প্রসন্ন ক্ষমাগুণে নির্বিকার বনস্পতির মতো নীরবে সহ্য করে নিতেন। এখানেও সাবিত্রীপ্রসন্ন ছিলেন সত্যবানের মতই মহীরুহ। তাঁর 'আরতি' কবিতা দিয়েই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বলা যায়—

> আকাশের চন্দ্র সূর্য অসংখ্য তারকা
> দীপ্তিমন্ত্রে বিশ্বদেবে করিছে আরতি,
> রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে পৃথিবীর বিনম্র প্রণতি
> আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত, বিরামবিহীন
> ধ্বনি হ'তে প্রতিধ্বনি
> ঝঙ্কারের অনন্ত মূর্ছনা
> একই লক্ষ্যে উৎসারিত অনাহত বাণী
> স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝে
> বাঁধে সেতু অবক্ষয়হীন
> তারই মাঝে উদ্ভাসিত
> একটি প্রাণের দীপশিখা
> একটি জীবন হ'তে গন্ধধূপে সন্ধ্যার আরতি
> অনন্তের মাঝে তার নবজন্মের সঞ্চারিত প্রাণ—
> —অকম্প্র সে প্রাণশিখা
> অক্ষয় সে স্পর্শ আলোকের
> জেগে থাকে দিবা রাত্র
> এ বিশ্বের আরতি-উৎসবে॥

তর্পণ : রামপদ মুখোপাধ্যায়

কানাইলাল দত্ত

যে কয়েকজন অগ্রসরবুদ্ধি সাহিত্যসেবীর সচেতনতা বাঙলা সাহিত্যকে সর্বাংশে বিবরাশ্রিত করে তুলবার অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, সহ্য লোকগত ঔপন্যাসিক রামপদ মুখোপাধ্যায়কে তাদের অন্যতম বলে আমি মনে করি। তাঁর এই শুচিস্মিত শোভন প্রকাশ আমাকে মুগ্ধ করে। আমি তাঁকে চিনি অনেক দিন থেকে। কিন্তু পরিচয় কোন দিন নিবিড় হয়নি। একটা কঠিন নীরবতা ও নৈঃশব্দ দিয়ে তিনি নিজেকে ঘিরে রাখতেন বলেই তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া সহজ ছিল না। সে চেষ্টাও তাই কোন দিন করি নি। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রামপদবাবুর চল্লিশ বৎসরের বন্ধু শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেন, পর যে এত আপনার হয় তা আগে কখন দেখি নি। গম্ভীর স্বল্পবাক কঠিন মানুষটির হৃদয়টি এত স্নেহাপ্রীতিময়!

রামপদবাবু শান্তিপুরের মানুষ। আর যোগেশচন্দ্রের জন্মভূমি বরিশাল জেলায়। বঙ্গের এই দুই প্রান্তের বাঙালি চরিত্রে, আচার আচরণে, লোক ব্যবহারে কথাবার্তা প্রভৃতিতে বিস্তর ব্যবধান। নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে এটা ঘটে। এর জন্য কোন সমাজ বা ব্যক্তি দায়ী নন। এই স্বাভাবিক গরমিল থাকা সত্ত্বেও কোন আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়াই বরিশালের যোগেশচন্দ্রকে শান্তিপুরের রামপদ এমন নিবিড়ভাবে আপন ও আত্মীয় করে নিয়েছিলেন যে যোগেশচন্দ্র মুক্ত কণ্ঠে বলছেন—"পর যে এমন আপনার হয় তা আগে কখন দেখি নি।" এই গুণের অধিকারী ছিলেন বলে মানুষ রামপদবাবু আমাদের চাইতে বড় এবং সেই বৃহৎকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এই প্রবন্ধ।

বারো তেরো বছর আগে শিবপুরের বাড়ীতে রামপদ বাবুকে প্রথম দেখি। 'বোধন' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার জন্য লেখার প্রার্থনা নিয়ে গিয়েছিলাম। তখন তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের সঙ্গেই গিয়েছিলাম। কি কথাবার্তা হয়েছিল ঠিক তা মনে নেই। সুন্দর মানুষটিকে দেখে, তাঁর কথা শুনে পরিবেশের স্পর্শ পেয়ে বিদুর আমার স্মরণে এসেছিলেন। তারপর থেকে অনেকবারই দেখেছি রামপদ বাবুকে। যতবারই দেখেছি প্রায় ততবারই বিদুরের কথাটা মনে পড়েছে। রামপদবাবুর পরলোক গমনের সংবাদ শুনবার পরও আকস্মিকভাবে বিদুরের একটি শ্লোক মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল :

প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহবান প্রতিভাবান।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে।

'বলবার সময় যার বাক্য বিরত হয় না, যার বক্তব্য ছবির মত ফুটে ওঠে, যিনি সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলেন, যার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে এবং যিনি অনায়াসে গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত। গল্প উপন্যাস রচনাকারদের সাধারণত আমরা পণ্ডিত বলে ভাবতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু রামপদবাবু, বিদুরের এই সূত্রানুসারে পণ্ডিতজনের সকল গুণে তো বিভূষিত ছিলেনই, অধিকন্তু তিনি ছিলেন সুললিত বাচনভঙ্গীর অধিকারী।

সাহিত্য সাধনাকেই জীবন ও জীবিকার মুখ্য উপায়রূপে গ্রহণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা এখনও আমাদের দেশে সহজ হয়নি। রামপদবাবু যখন কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন তখন তা কল্পনাও করা যেত না। তাই জীবনধারণের নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজনে তাঁকে

রেল দপ্তরের চাকুরি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ত্রিশ বৎসর-কালব্যাপী প্রত্যহ সাতঘণ্টা করে জীবনের এই বিপুল অপচয় সত্বেও রামপদ বাবু যে বঙ্গ সাহিত্যের আঙিনায় ঠাঁই করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ তিনি সাহিত্যপ্রাণ মানুষ ছিলেন। অনুকূল পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেলে তিনি নিশ্চয়ই আরও বড় হতে পারতেন। তিনি সযত্নে নিজেকে খ্যাতি পুরস্কার ও প্রতিপত্তির লালসা থেকে দূরে রেখেছিলেন বলেই তাঁর সাধনার কঠোরতা, তাঁর সংগ্রামের তীব্রতা অপরিজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত ছিল। সাধারণ্যে এই ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল যে, রামপদবাবু আড্ডা জমাতে অক্ষম এবং অন্তর্মুখীন মানুষ। দশটা পাঁচটা 'নীরস' কর্মের আবর্তে আবর্তিত হবার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেও রামপদবাবু যে প্রচুরসংখ্যক গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন—তাকে এক কথায় বিস্ময়কর বলা চলে। সাধারণ্যে তিনি ঔপন্যাসিক রামপদ মুখোপাধ্যায় বলে সমধিক পরিচিত হলেও আমি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর অনুরাগী পাঠক। তাঁর শেষ বই 'হিমাচলের আঙিনা'র বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যে ক্লাসিক গ্রন্থের মর্যাদা পাবে। বইখানি তিনি অনাড়ম্বরে তাঁর এক সাহিত্যপ্রাণ বন্ধু শ্রীযুক্ত গৌতম সেনকে উৎসর্গ করেছেন। এবং এটিই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ বই।

নগাধিরাজ হিমালয় বাঙলার ভ্রমণ সাহিত্যে এখনও রাজচক্রবর্তী। হিমালয় নানাভাবে আমাদের যুগযুগান্ত ধরে বিস্ময়াবিষ্ট করে রেখেছে, মুগ্ধ করে রেখেছে। আমাদের ভ্রমণ-সাহিত্যে সেই জন্যই হিমালয়ের অত প্রতিপত্তি। ভ্রমণরসিক রামপদবাবুও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন। ভারতীয় হিন্দুর মন হিমালয়কে দেবভূমি ভাবতে অভ্যস্ত—। রামপদবাবুর চিত্তে সে ভাবনাও পূর্ণরূপে উপস্থিত। কিন্তু এহ বাহ্য। হিমগিরির যেসব শিখর ও নগর বহুখ্যাত এবং বন্দিত তা ছেড়ে রামপদবাবু চলেছেন নবীনতর নূতনতর সৌন্দর্যের সন্ধানে। খুঁজে পেয়েছেন তিনি কাংড়া কুলু মানালি। সচরাচর ভ্রমণবিলাসী শহুরে মানুষ এখানে আসেন না। অথচ অনেকদিন হল রুশ সৌন্দর্যরসিক চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক এখানকার সুন্দরের হাতছানিতে মুগ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য রয়ে গেলেন এখানে। মানালির যেমন পরিবারের ইতিহাসও ঐ একই সুরে বাঁধা। কোন ইতিহাস পড়ে এসব জানি নি। এ তথ্য লেখা আছে, রামপদবাবুর হিমালয়ের আঙিনায়।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন কাব্যের উপেক্ষিতার প্রতি তাঁর করুণ নেত্রপাতে ও সহৃদয় সহানুভূতির দ্বারা উপেক্ষিতা অবগুণ্ঠিতা ঊর্মিলা, তপস্বিনী প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, অনাদৃতা পত্রলেখাকে নেপথ্য থেকে উদ্ধার করে পাদপ্রদীপের আলোয় এনে আমাদের চিত্তের করুণাই শুধু উদ্রেক করে নি—শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে তাঁদের নবরূপে সৃষ্টি করেছেন। রামপদবাবুও তেমনি হিমালয়ের উপেক্ষিতা অথচ পরম রমনীয় কুলু কাংড়া মানালির কথা লিখেছেন অন্তরের সৌন্দর্য-চেতনার সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। নব অনুরাগ ভরে লেখা তাঁর এই কাহিনী—হিমালয়ের আঙিনায় বস্তুত আর এক উপেক্ষিতার কাব্য।

হিমালয়ের আঙিনা গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "হিমালয়ের আর দুটি পরম রমনীয় উপত্যকা কাংড়া-কুলুর (স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নিকেতন হিসাবে যা কাশ্মীরের সমতুল্য) ভাগ্যে প্রশস্তিকা উচ্চারিত হয়েছে সামান্যই। ভ্রমণ-সাহিত্যে এই দুটি উপত্যকার কথা অল্পজনেই বলেছেন। বলেছেন সংক্ষেপে। সকলে এখানে আসেন না। রামপদবাবু বলেছেন "ভ্রমণ যাদের জীবনের ধর্ম তারাই আসেন এখানে।" এই কথা বলে তিনি বাঙলার হিমালয়প্রেমীদের চিত্তে কাংড়া কুলুকে উপেক্ষার অন্ধকার থেকে তুলে এনে আনন্দ নিকেতনের আলোক-তীর্থ করে দিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতেই যে কত চিত্রকল্প বর্ণনা আছে, অনাড়ম্বরে গল্প বলার ছলে নিপুণ পটশিল্পীর মত রামপদবাবু যে কত অপূর্ব সুন্দর সব কথায় ছবি

এঁকেছেন তার ইয়ত্তা নেই, তুলনাও তার বিরল। একটা উদাহরণ দেই :

"বাঁকের মুখ থেকে বার হয়ে এল একদল লোক। এল অতর্কিতে হৈ হৈ করে, যেন বাসখানাকে হঠাৎ ঘেরাও করে ফেলবে। ওদের হাতে লাঠি ছিল না—চেহারা ছিল না বিকট বীভৎস। সুবেশ সুন্দর ভব্য চেহারার মানুষগুলি—পরনে পায়জামা পাঞ্জাবী চাদর, মাথায় লাল পাগড়ি আর টুপি, কানে বীরবৌলি আর গলায় ফুলের মালা। ওরা ডাকাত নয়—বরযাত্রী। পিছনে একটা পাল্কীতে বর আর একটা বন্ধী পাল্কীতে কনে। লাঠি হাতে ক'জন লোক বরকন্দাজের মত চলছে পাল্কীর আগে পিছে। বাজনা বাজছিল ঝম ঝম—যুদ্ধ জয়ের বাজনা। পাল্কীর চলন তুলকী নয়—রীতিমত ঝড়ের বেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওরা। কি সুন্দর সম্পূর্ণ নিটোল একটা নিখুঁৎ ছবি। এ রকম ছবির পর ছবি এঁকেছেন অনায়াস-নৈপুণ্যে। বাসের মধ্যে গড়গড়া সাজিয়ে তামাক খেতে দেখেছেন? দিনের বেলায় বিয়ের ব্যাপারে আমরা অনভ্যস্ত। কিন্তু পাঞ্জাবে সেটাই প্রশস্ত। গোধূলিতে বিয়ে হয় বটে, কিন্তু একেবারে রাতকাবার করে ব্রাহ্মমুহূর্তে বিয়ে—সেও পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবী বিয়ে দেখবার জন্ত আপনার পাঞ্জাবে যাবার দরকার নেই। হিমালয় আঙিনায় পড়লেই বিয়ে দেখার কাজ হবে। পড়তে পড়তে মনে সবই হবে যেন ছায়াছবির মত; দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এসে পড়বেন একের পর এক, অথচ কোথায়ও একটু বেতালা বেসুরা ঠেকবে না। এ বড় কম কথা নয়!

শুধু বর্ণাঢ্য ছবিই নয়। মানবমনের নানা বৃত্তির সমালোচনা করেছেন—সেই সঙ্গে নিজের মন্তব্যটুকু নিবেদন করেছেন এমন বিনীত ভঙ্গীতে অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যে তা আপনার চিত্ত স্পর্শ করবেই।

উত্তর প্রদেশের যে নববধূটি কুলুতে এসে পাথর ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না, লেখকের প্রশ্নের জবাবে যিনি বলতে সামান্ত ইতস্তত করেন না "পাথর দেখে তো মানুষের পেট ভরে না।" লেখক তাঁকেও অবজ্ঞা করেন নি। তার হৃদয়ের ব্যথাটি অনুভব করেছেন—সে ব্যথার বেদনা পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন—এর চাইতে বড় কোন প্রত্যাশা লেখকের থাকে না। তাইতো রামপদ সার্থক স্রষ্টা। বাঙলা-সাহিত্যে বিশেষ করে, আমার ব্যক্তিগত মতে ভ্রমণ-সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট আসন চিরকাল থাকবে।

এগ মার্কা দেওয়া জিনিস কেন কিনবেন?

যে সব জিনিসের ওপর এগ মার্কার মোহর থাকে, সেগুলি যে ভালো সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। ঘি, মাখন, ডিম, মধু ইত্যাদি কৃষিজাত ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রে তারপর এই সরকারি মোহর দেওয়া হয়। আপনি যখন এগমার্কা দেওয়া কোন জিনিস কেনেন তখন আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন যে সুকঠোর বৈজ্ঞানিক মান অনুযায়ী সেগুলির শ্রেণীবিভাগ ক'রে প্যাক করে, বাজারজাত করা হয়েছে।

জনশিক্ষা ও সংস্কৃত : অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলি-৬। মূল্য ৫'৫০। এই গ্রন্থে লেখক সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচীন ভারতে ভারতীয় ভাষারূপে স্বীকৃত ছিল, শুধু ভারতে কেন, সারা পৃথিবীর লোকই সংস্কৃতকে ভারতীয় ভাষা বলিয়া জানিত। এবং তাহারা ঐ ভাষাতেই ভারতের সহিত যোগাযোগ রাখিত। ভারতবর্ষেও এই লইয়া কোনো মতবিরোধ ছিল না, ঐক্যও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সকল প্রদেশেই সংস্কৃত চালু ছিল। শঙ্করাচার্য্যও সারা ভারতে ঐ ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। রাশিয়াও সংস্কৃতকে ভারতীয় ভাষা বলিয়াই জানে। এইজন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে যে-মানপত্রখানি দিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত ভাষায়। তাহারা একথাও বলে, এরূপ সম্পদশালী ভাষা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

প্রাচীনকালে ভারতীয় মনীষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইয়াছিল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন: "জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর ভারতের এক বিরাট সমস্যা।...একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই এই বহুধাবিভক্ত জনগণের স্বদেশীয় ঐক্যসূত্র।" আজ যে প্রাদেশিক ঐক্যসূত্র ছিন্ন হইয়াছে, তাহার মূল কারণই রহিয়াছে সংস্কৃতকে বর্জন করার মধ্যে। ডঃ কৈলাসনাথ কাটুজু বলিয়াছেন"...The adoption of Sanskrit will not raise any Provincial jeoulousies" গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, "...এক সংস্কৃত ভাষার সূত্রেই ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণকে বাঁধা যেতে পারে।"

একথা মিথ্যা নয়, আন্তর্জাতিক-বিশ্ব সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতবর্ষকে জানে এবং সেইজন্যই মর্য্যাদা দান করে। সংস্কৃতবর্জিত ভারত এবং সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ভারতবাসী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু অপাংক্তেয় নয়, ধিকৃতও বটে।"

Mons Dubois বলিয়াছেন: "At one time Sanskirt was the one language spoken all over the World."

আজ ভাষা লইয়া যে-বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, যে সংহতি নষ্ট হইয়াছে, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিলে, সহজেই সমাধান হইবে বলিয়া বিশ্বাস। ইস্রায়েল ঠিক এইভাবেই তাহাদের প্রাচীনভাষা হিব্রুকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া তাহাদের প্রচণ্ড ঝগড়ার অবসান ঘটাইয়াছে।

গ্রন্থকার এই ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতদের বহু মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্থানাভাবে সব কথা বলা গেল না। তবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যুক্তির প্রাবল্যে কূট রাজনীতিকে কোনদিনই হঠানো যাইবে না। তাঁহারা যাহা করিবার তাহা করিবেনই।

অথচ এই সংস্কৃত ভাষা উত্তর পূর্ব-পশ্চিম ভারতের প্রায় সব প্রধান ভাষার মূল—এমন কি দক্ষিণ ভারতের তামিল তেলেগু মালয়ালাম ভাষার অর্দ্ধেকের উপর শব্দ এই সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। তৎসম শব্দ আজও প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অবিকৃতভাবে রহিয়া গিয়াছে। এই সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা

করার অর্থই হইল, আঞ্চলিক ভাষারও পুষ্টিসাধনে বাধার সৃষ্টি করা। সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধিশালী ভাষা-গুলির অন্যতম, ইহা অনস্বীকার্য। সেই সমৃদ্ধির অংশ নিজ নিজ মাতৃভাষায় লাভ করিতে হইলে, সংস্কৃতকে যথার্থ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। সংস্কৃতকে অব-হেলা করিলে প্রাচীন সাহিত্য কাব্য দর্শন প্রভৃতির ভাবসমৃদ্ধ বিষয়সমূহ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। সে বঞ্চনার মত ক্ষতি আর নাই। তাহা ছাড়া, আচারে ব্যবহারে পোশাকে পরিচ্ছদে মিল না থাকিলেও, ভারতবর্ষের বিপুল জনসমাজ আত্মিক বন্ধনে পরস্পরের সহিত যে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার মূলেও এই সংস্কৃত ভাষা—যে শাস্ত্রের অনুশাসনে সমগ্র ভারত পরিচালিত, যে-মন্ত্রে আসমুদ্র-হিমাচল আমরা দেবতার স্তবগান করি, সবই এই সংস্কৃত ভাষায়। সুতরাং শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, দেশের ভাবগত সংহতি রক্ষার জন্যও সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।

ভাষা লইয়া যে রাজনৈতিক খেলা চলিতেছে, ঠিক এই সময় এরূপ একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। আমরা এজন্য গ্রন্থকারকে সাধুবাদ জানাই।

শ্রীগৌতম সেন

এতটুকু ভুল: দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য তিন টাকা। কয়েকটি গল্পের সমষ্টি, সব গল্পগুলিই 'ক্রাইম স্টোরি।' অভিনব সন্দেহ নাই। ছোটবেলায় অল্পবিস্তর প্রায় সবাই চুরি করে। কিন্তু সেই অভ্যাস ক্রমে সুযোগ পাইলে, বৃহৎ আকার ধারণ করে। বেশীর ভাগই দেখা গিয়াছে অভিভাবকের দোষে ছেলে বিগড়াইয়াছে। অবশ্য পরিবেশও কতকটা কাজ করে, কিন্তু সবটা নয়। গ্রন্থকার একস্থানে বলিয়াছেন, "মানুষ অপরাধী হয়েই জন্মগ্রহণ করে না। অপরাধ-প্রবণতার কোন বীজাণু নেই, যা একবার রক্তে মিশে গেলে বংশানুক্রমে তার সর্বনাশকর প্রক্রিয়া চলতে

থাকবে। তাই তুই আর তুয়ে চারের মত চোরের ছেলে চোর হবেই, এ থিওরি চিন্তাবিদ্‌গণ অভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন না। প্রায় প্রত্যেক অপরাধের পেছনেই কারণ একটা কিছু থাকেই। স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষ কখনো অপরাধ করে না।” এতটুকু ভুলের ফল যে কি বিষময় তা গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের নামকরণ এই কারণেই সুন্দর হইয়াছে।

চোরকে শাস্তি দিলে, সে আরও বড় চোর হয়। এ জন্য প্রয়োজন, তাকে জেলে না রেখে কোনো প্রতিষ্ঠানে আটক রেখে শিক্ষা-দান। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহাতে ফল ভালই হইয়াছে। গ্রন্থকার গল্পে কয়েকটি ‘ক্রাইম’ লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। গল্পগুলি তাই অভিনব হইলেও, ইহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ সমাজ-সংরক্ষণে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

শ্রী হরিদাস পরিক্রমা : পথিক, মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

হরিদাস মুসলমান হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করেন, এজন্য তাঁহাকে কাজীর বিচারে কম নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মুখের হরিনাম কেহ থামাইতে পারে নাই। এই ভাবোন্মাদনা ভক্তি ছাড়া হয় না। গ্রন্থখানিতে হরিদাসেরই লীলা ব্যক্ত হইয়াছে। পড়িতে ভাল লাগে। এ তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন যাঁহারা ঐ রসে রসিক। চৈতন্যলীলার মতই ইহা মধুর। সুন্দর আখ্যানভাগ ও লীলা-মাধুর্য।

শ্রী গৌতম সেন

৪৩৪ পাতার পর

চেষ্টা উল্টাপথে চলিয়া থাকিলেও কপালগুণে অথবা অজানা ব্যক্তিদের কর্মশক্তির দ্বারা তাহা হইয়াছে। প্রথমতঃ ভারত বিভাগ ও পরে দেশকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ লোকেদের সুবিধার সৃজন। ইহার পরে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য অর্থ, সময় ও কর্মশক্তি নষ্ট করা। মেট্রিক সিস্টেমের নামে নয়া পয়সা ও সেন্টিগ্রেড স্কেল ব্যবহার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আশ্রয়ে সহস্র সহস্র কোটি টাকা ঋণ করা ও সোশিয়ালিজমের ওজুহাতে আমলাতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের লোকেদের আর্থিক পরিস্থিতি জোরাল করা ইত্যাদি বহু জনসাধারণের ক্ষতিকর কার্য্য নেতাগণ করিয়াছেন। শ্রীমোরারজির সোস্তাল কন্ট্রোলের দ্বারা ব্যাঙ্কগুলি আমলাতন্ত্রের কবলে আনয়ন আর একটি নূতন জনমঙ্গল বিরুদ্ধ প্রচেষ্টা। এখন আর একটা নূতন কিছু করার কল্পনা রাষ্ট্রনেতা-দিগের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা হইল আর্থিক হিসাবের বৎসর নভেম্বরে আরম্ভ করা। কারণ দেওয়ালিতে সকলে নাকি নূতন বৎসর আরম্ভ করে। দেওয়ালিতে কোন কোন জাতি খাতা বদল করে। কিন্তু সোসিয়ালিজমে ব্যক্তিগত ব্যবসার খাতা বদলের সুবিধার জন্য বৎসর আরম্ভকাল বদল করিবার ব্যবস্থা কিছুটা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে বৎসরারম্ভ বৈশাখ মাসেই হইয়া থাকে। বাংলাদেশে নূতন খাতাও বৈশাখে হয়। দেওয়ালিতে খাতা বদল যাহারা করে তাহারা আমাদিগের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে খুব উচ্চে স্থান পায় না। আমাদের ও বহুলোকের মতে অনর্থক বৎসরারম্ভ লইয়া খেলা না করিয়া লাভজনক কোন কিছু করিলে সাধারণের অধিক মঙ্গলের সম্ভাবনা।

কার্য্যে কম্যুনিজম

আমাদের দেশে কম্যুনিজম অন্যান্য ইজম এর মতই শুধু কথায় আবদ্ধ থাকে, কার্য্যে প্রকাশ হইলে তাহার স্বরূপ কম্যুনিজম ব্যক্ত না করিয়া ভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতাদিগের মনের গভীরতম স্থলের গুপ্ত অবচেতনার আবেগগুলিই প্রকটভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলে কম্যুনিষ্ট নেতাগণ রাষ্ট্রীয় কার্য্যে বিশেষ সফলতা দেখাইতে পারেন না। যদি এই দেশে রুশ দেশের কিম্বা চীনের কম্যুনিজমের কা পদ্ধতি অনুকরণ করা যাইত তাহা হইলে অন্ততঃ এ দে কম্যুনিষ্ট নেতাগণ কার্য্যক্ষেত্রে কিছু খ্যাতি ও যশ আহ করিতে পারিতেন। সম্প্রতি যেমন অপ্রিয় সত্য লে দোষে কয়েকজন রুশদেশীয় লেখকের কারাবাসের ব্যব করা হইয়াছে। কেহ সাত বৎসর, কেহ পাঁচ বৎসর জে খানায় বাস করিয়া কম্যুনিজমের সাহায্যে বিশ্বমানব মুক্তির কথা চিন্তা করিবার সুযোগ পাইবেন। এদে বহু লেখক আছেন যাহারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই দেশের মঙ্গলই হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কোন কে কাব্য ও সঙ্গীত রচয়িতারও ঐ সঙ্গে কারাগমন করি জনসাধারণের উপকার হয়। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য কম্যুনিষ্ট নেতাগণ ঐ সকল জনমঙ্গলকর কার্য্যে আত্মনিয়ো না করিয়া, সুবিধা পাইলেই শুধু অবান্তর কার্য্যে সময় করিয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলে চীনের কম্যুনিজম আরও প্রবলভাবে কার্য্যকর। সে কম্যুনিজম মাতৃমন্ত্রের অপ ধারণ করিয়া সকলেই অসম্ভব সম্ভব করিতে সাহায্য করে। যথা, সেদিন এক চীনা চিকিৎসক এক ব্যক্তির মস্তিষ্কে অস্ত্র চালাইতে আ করিয়া হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া ছুরি হাতে হতভম্ব করি আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহা চিৎকার করিয়া মাওৎসে তুঙের বাণী আবৃত্তি ক শুনাইতে লাগিলেন ও ফলে অস্ত্রচিকিৎসকের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল ও তিনি অস্ত্র চালনা যথাযথভাবে স করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ চীন দেশে কম্যুনিজম জাগ্রত যে মাওৎসে তুঙের বাণী আওড়াইলে হারান গ ফিরিয়া আসে। আমাদের দেশে অবশ্য সেইরূপ জো নেতা কেহ নাই যাহার বাণীতে কোন কাজ হয়। কংগ্রে এখন কেহ ছিলেন যাহারা বাণী বিতরণ করিয়া কা সিদ্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু আজ তাঁহারাও না আমাদিগের এক্ষেত্রে শুধু নিজ নিজ শক্তি ও কা উপরেই নির্ভর করিতে হয় ও সেই জন্য আমরা এখন নেতাদিগের প্রয়োজনীয়তায় ততটা বিশ্বাস করি না। নেতাগণ সেই গল্পের কম্বলের মতই আমরা ছাড়িতে আমাদের ছাড়িতে কিছুতেই চাহেন না। এই অত্য ভালবাসা আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমশঃ দুঃসহ করি তুলিতেছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাসুদেব রায়

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৭৪

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেস রাজত্বের অবসান

বাংলায় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের শাসন পরিচালনা নামে যাহাই হউক, বস্তুত কংগ্রেসদলের শাসনই ছিল। কারণ ডাঃ ঘোষের নিজ দলের লোকের সংখ্যা বিধানসভায় অত্যন্তই অল্প ছিল। কংগ্রেসের লোকেদের উপরেই ডাঃ ঘোষের আসলে নির্ভর ছিল। ডাঃ ঘোষ জনসাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন কিনা তাহা কেহ ঐ কারণে বিচার করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই; কারণ বাংলার জনসাধারণ কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস হারাইয়াই অপরাপর দলের লোকেদের প্রার্থী হিসাবে চয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই কংগ্রেস দল শাসন ক্ষমতা হারাইয়া ইউনাইটেড ফ্রন্ট সংগঠনকে সেই ক্ষমতা হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। এই ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রতিই যে জনসাধারণের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল তাহা নহে। শুধু কংগ্রেসরাজ অপসারণ করিবার আগ্রহই সকলের মনে অন্যান্য দলগুলিকে ডাকিয়া আনিবার কথা জাগ্রত করিয়াছিল। পরে যখন ইউনাইটেড ফ্রন্টের অনেক সভ্যদিগের বিপ্লব সৃষ্টি প্রচেষ্টার ফলে বাংলার সাধারণের জীবনযাত্রা দুঃসহ হইয়া উঠিল; কাজ কারবার ছারখার হইয়া ঘরে ঘরে অভাব প্রকট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল; এমন কি সেই দলের কোন কোন লোকের সহিত দেশশত্রু চীনের গোপন সম্বন্ধ আছে এই রূপ সন্দেহ প্রবল আকার ধারণ করিল; তখন বাংলার লোকেদের মনে হইতে লাগিল যে ইউনাইটেড ফ্রন্টের শাসন ক্ষমতা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই জনমতের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সুযোগেই কংগ্রেস ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের ক্ষুদ্রদলের আড়ালে থাকিয়া শাসনশক্তি আবার নিজ করায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করিল এবং সেই শক্তি কিছুদিনের জন্য ফিরাইয়াও পাইল। কিন্তু কংগ্রেসের সভ্যদিগের চরিত্রবলের অভাব শীঘ্রই ফুটিয়া উঠিয়া নিজ অসারতা ও হীনতা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। যে চরিত্রবলের অভাবের ফলেই কংগ্রেস সর্ব্বদা জনসাধারণের মঙ্গলের কথা আবৃত্তি করিয়া গোপনে জনগণের শোষণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশবাসীর নিকট ক্রমশঃ হেয় প্রমাণ হইয়া শাসন শক্তি হারাইয়াছিল, সেই দোষেই আবার কংগ্রেসের কোন কোন ব্যক্তি নিজ দল ত্যাগ করিয়া অপর দল গঠন চেষ্টা আরম্ভ করিলেন ও ফলে ডাঃ ঘোষের সমর্থকদিগের সংখ্যা।

লাধব হইতে আরম্ভ করিল। এই সকল, সাধারণ ভাষায় যাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে সেই জাতীয় কার্য্যে যাঁহারা নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদিগের মধ্যে কংগ্রেসের নেতাদিগেরও কেহ কেহ ছিলেন এবং দেশের লোকে ভাল করিয়াই দেখিতে পাইল যে কি ধরনের চরিত্রের লোক আমাদিগের শাসন কার্য্য চালাইবার ভার পাইয়া থাকেন। যাঁহারা নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আদর্শের ক্ষেত্রে সহযোগীদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের উপর দেশবাসী কেমন করিয়া কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন? একদিকে নিজ দেশের ভিতরে বসিয়া দেশবাসীদের মঙ্গল সাধনের অভিনয়ের আড়ালে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করা ও অপর দিকে বাহিরের শত্রু চীনের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া চীন হইতে হীনতম চরিত্র দোষের অভিব্যক্তি। বাংলার জনসাধারণ এই অবস্থায় হতভম্ব হইয়া ভাবিতেছেন যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অবতরণ করিলেই কি মানুষ অমানুষ হইয়া যায়?

কংগ্রেস দলের নেতাগণই যে বাহিরের শত্রুদিগের সহিত সকল সম্বন্ধবর্জ্জন করিয়া চলেন এমন বিশ্বাসেরও কোন কারণ দেখা যায় না। যথা প্রায়ই কথা উঠে যে পাকিস্থানের গুপ্তচরের কার্য্য যাহারা করে তাহারা নানাভাবে রাষ্ট্রীয় দফতরের ভিতরের কথা জানিয়া সেই সকল কথা পাকিস্থানকে জানাইবার ব্যবস্থা করে। এই সকল গুপ্তচরগণ যদি কংগ্রেসী নেতা ও তাঁহাদিগের অনুচর রাজকর্ম্মচারীদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে না পারিত তাহা হইলে তাহারা নিজেদের ঘৃণ্য অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইত না। এই কারণে ধরা যাইতে পারে যে কোন কোন কংগ্রেসীদলের লোক জানিয়া অথবা না জানিয়া পাকিস্থানের সহায়তা করিয়া থাকেন। অপরাপর দেশের অমঙ্গল সূচক কার্য্য যে কংগ্রেসীগণ করিয়া থাকেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমাদিগের যে বিদেশীর উপর নির্ভরশীলতা তাহা সম্পূর্ণরূপেই কংগ্রেসের নেতাদিগের কার্য্য দোষে হইয়াছে এবং ইহার আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের ভারত বিভাগের সময় হইতেই। বাহিরের লোকেরা আমাদিগের পরম উপকারী বন্ধু, এই অতি ঘোর মিথ্যা কথাটি দেশবাসীর মনে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা প্রথমে কংগ্রেসের নেতাগণই আরম্ভ করেন। কম্যুনিষ্টদিগের বিদেশী ভজন তাঁহাদিগের আদর্শবাদের অঙ্গ, এবং কম্যুনিজমের সহিত দেশভক্তি বা মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা কখন একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে না। এই কারণে যখন কম্যুনিষ্টের সহিত কংগ্রেসের নেতাদিগের অন্তরের মিলন ঘটিতে দেখা যায়, তখন যাঁহারা দেশভক্ত ও দেশবাসীর পূর্ণ সমষ্টি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়াসী, তাঁহারা কম্যুনিষ্টের সহিত কংগ্রেসের লোকেদেরও দেশের মঙ্গল ও উন্নতির হিসাবের বাহিরে রাখিতে বাধ্য হ'ন। তাঁহারা এই কথাও প্রকটভাবে ব্যক্ত হইতে দেখেন যে সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায় ও সুবিচারের বিষয়ে আলোচনা ও আলোড়ন শুধু লোক দেখাইয়া দেশভক্তির অভিনয়ের জন্যই হইয়া থাকে। কার্য্যতঃ রাষ্ট্রীয় দলের নেতাগণ নিজনিজ ব্যক্তিগত ও দলের লাভ ও সুবিধার জন্যই তৎপর হইয়া থাকেন। ইংরেজীতে একটা কথার প্রচলন আছে, তাহার অর্থ হইল এই— "অল্প সংখ্যক লোককে চিরকাল ভুল বুঝাইয়া রাখা যায় সকল লোককেও অল্প সময়ের জন্য বোকা বানাইয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু সকল লোককে সর্ব্বকালের মত ধাপ্পা দিয়া ও ঠকাইয়া চলা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।" সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রীয় দলগুলির যে আশা যে তাহারা সকল ভারতবাসীকে বরাবরের মত ঠকাইয়া চলিবে সে আশা কখনও বহু দীর্ঘকাল ফলপ্রসূ থাকিতে পারে না। আজ ভারতের অধিকাংশ লোকই পরিষ্কার বুঝিয়াছেন যে রাষ্ট্রীয় দলগুলি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য গঠিত ও চালিত নহে। জনসাধারণের নিকট মিথ্যার আশ্রয়ে ভোট আদায় করিয়া রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় দলের দলপতিগণ নিজনিজ মতলব ও সুবিধা লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন; ইহাই নির্ব্বাচন কার্য্যের মূল সত্য। এই কারণে জনসাধারণের এখন কর্ত্তব্য দল দেখিয়া ভোট না দিয়া মানুষ দেখিয়া ভোট দেওয়া। চীন বা আমেরিকা কিম্বা অন্য কোন দেশের প্রভুত্বের জন্য ভারতীয় জনসাধারণ ব্যগ্র নহেন। তাঁহাদিগের নিজেদের মঙ্গল স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় শক্তিই রাষ্ট্রনীতির উচ্চতম আগ্রহের বস্তু।

কচ্ছের কথা

পাকিস্থান যখন বলপূর্ব্বক কচ্ছ অঞ্চল দখল করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহাদিগের মূল আগ্রহ ছিল জোর যার মুলুক তার নীতির প্রতিষ্ঠা। কাশ্মীর আক্রমণের মূলেও ঐ একই কথা ছিল ও এখনও রহিয়াছে। ভারত বিভাগের পূর্ব্বে পাকিস্থান বলিয়া কোন দেশ ছিল না। সকল অঞ্চলই ভারতবর্ষের অংশ ছিল। ঐ বিভাগের ফলে কোন কোন স্থানকে পাকিস্থান বলিয়া ঘোষণা করা হইল ও সেই স্থানগুলিই পাকিস্থান নাম প্রাপ্ত হইল। পাকিস্থানের এই ঘোষণার পূর্ব্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং সেই জন্য নির্দ্ধারিত দেশ ব্যতীত কোনও স্থান পাকিস্থান বলিয়া গণ্য হইবার কোন কারণও থাকিতে পারে না। ভারত বিভাগের সময় এরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই যে কখনও কোন নূতন অবস্থা বা কারণ উপস্থিত হইলে অন্য সকল স্থান দখল করিয়া পাকিস্থানের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। সেইরূপ কেহ বলিলেও তাহার কোন মূল্য থাকিত না, কারণ, ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত ইংরেজের দখলে ছিল এবং সেই অধিকারের ইংরেজ ভারত বিভাগ করিয়া পাকিস্থান ও ভারত গঠন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঐ নূতন দেশ গঠন যে মুহূর্ত্তে শেষ হইল সেই মুহূর্ত্তেই ইংরেজের রাজশক্তির অবসান হইল এবং ভারতের ও পাকিস্থানের রাজ অধিকার জন্মলাভ করিল। এই নূতন অবস্থায় আর কোন দেশের বা ব্যক্তির ভারত বা পাকিস্থানের উপর কোন অধিকার রহিল না। সুতরাং ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭এর পরে উভয় দেশেরই নিজনিজ এলাকায় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিল ও সেই শক্তির কোন অদলবদল কোথাও কেহ আর করিতে পারিবে না, ইহাই আন্তর্জাতিক আইনের কথা। কিন্তু দেখা যায় যে পাকিস্থান যে ভারতশত্রুদিগের সাহায্যে ভারত বিভাগ করিয়া জন্ম লাভ করিল সেই ভারতশত্রুদিগের আশ্রয়েই থাকিয়া বারে বারে ভারত আক্রমণ করিয়া নিজ রাজত্ব আরও বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে ও বিস্তার করিতেছেও। দুইবার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া পাকিস্থান পরাজিত হইয়াও অন্যায় ভাবে কাশ্মীরের কোন কোন স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে ও এই থাকার মূলে আছে সেই সকল বিদেশী শক্তিগণ যাহাদিগের আকাঙ্খা ভারতের শক্তি কমাইয়া পাকিস্থানকে শক্তিশালী করা। ইহার কারণ পাকিস্থানের গোলামী করিতে অনিচ্ছার অভাব। পাকিস্থান যে কোন দেশের গোলামী করিতেই প্রস্তুত। পূর্ব্বে শুধু ইংরেজের গোলামী অঙ্গীকার করিয়া ভারত বিভাগ করিয়া নিজ রাজ্য সৃষ্টি করা ও পরে অপরাপর দেশের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের শত্রুতা আরও ব্যাপক ভাবে করা; এই সকল বিষয় হইতেই পাকিস্থানের স্বভাব বিচার সহজ হয়।

ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণও উপরোক্ত দেশের ক্ষতিকর বিলিব্যবস্থার সহিত বরাবরই সংযুক্ত থাকিয়াছেন। ভারত-বিভাগ কখনও হইত না যদি পণ্ডিত নেহেরু কঠিন হস্তে সেই ব্যবস্থায় বাধা দিতেন। কিন্তু তিনি দলের সুবিধার জন্য দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরেজের সহিত সায় দিয়াছিলেন। পরে কাশ্মীর হইতে পাকিস্থানের সৈন্যদের বিতাড়িত করিয়াও আবার তাহাদিগের "আজাদ" কাশ্মীর গঠন করিয়া বসিয়া থাকিতেও দিয়াছিলেন প্রথমবার পণ্ডিত নেহেরু ও দ্বিতীয়বার লাল বাহাদুর। কচ্ছ দখল চেষ্টার সময়েও কংগ্রেসী নেতাগণ বাহিরের মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া সাধারণ লুঠের বিষয়কে আইনগ্রাহ্য মোকদ্দমার আভিজাত্য দান করেন। এই সকল নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই আজ ভারতের অবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমশঃ আরো নিচে নামিতেছে। কচ্ছের বিচার যাহা করা হইয়াছে তাহাতে যে সকল কথার উত্থান করা হইয়াছে সেগুলি রাষ্ট্রনৈতিক কথা, আইনের কথা নহে, ইহা এখন সর্ব্বজন বিদিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পাকিস্থান একটা লুঠেড়ার কাজ করিয়া দেওয়ানী মীমাংসা দাবী করিয়া তাহা পাইয়াছে এবং লাভবান হইয়াছে। লুঠেড়ার যাহা ফৌজদারী হিসাবে প্রাপ্য অর্থাৎ দণ্ড; তাহা ত পাকিস্থান পাইলই না, উপরন্তু পাকিস্থানের লুণ্ঠন ন্যায়শাস্ত্র অন্তর্গত হইয়া তাহার অন্যায়কে অকলঙ্ক করিয়া জগত সভায় প্রদর্শিত করিল। যে সকল ভারতীয় নেতাগণ কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন তাহাদিগকে ভারতের জনসাধারণ কেন বহিষ্কৃত

করিবার চেষ্টা করেন না, ইহা আমরা বুঝি না। শুধু বুঝি যে ভারতে এমন এমন বহু লোক আছে যাহাদিগের অপমান বা সম্মানবোধ বলিয়া কোন কিছু নাই। কারণ আমরা দেখি যে পতাকা লইয়া জলুস করিয়া ভারতের অনেক লোক বিদেশী শত্রুর সমর্থনেও নির্গত হইতে লজ্জা বোধ করে না। কিন্তু যে বিরাট জনশক্তি ভারতের মেরুদণ্ড; তাহা ত এখনও ভিতরে ঠিক সবলই আছে। সে শক্তি কেন যথাযথ ভাবে নিজেকে ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করে না?

গৌহাটিতে দাঙ্গা ও লুঠতরাজ

আসামের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আসামী ভাষা-ভাষী তাহাদিগের বিশ্বাস আসাম প্রদেশের তাহারাই অধীশ্বর এবং অন্যান্য আসামবাসী ভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিরা আসামী জাতীয় লোকেদের ক্রীতদাস। এই বিশ্বাসের জন্যই আসামী জাতীয় লোকেরা প্রায়ই অপরাপর আসামবাসী জনসাধারণের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসাধারণের উপর উৎপাত ভারতের অপরাপর প্রদেশেও কোথাও কোথায় হইয়া থাকে। তাহারও কারণ সংখ্যা গরিষ্ঠদিগের অহংকার ও প্রভুত্ব পিপাসা। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে যে সকল জাতীয় লোকেদের সংখ্যা অধিক সেই সকল লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যা বুদ্ধি বা উন্নত আদর্শের জন্য প্রখ্যাত নহে। সারা ভারতে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্বুদ্ধিতা ও বর্বরতারই আর একটি নাম। হিন্দী লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে তাহাও ঐ সংখ্যাধিক্যের দাবী হইতেই উদ্ভূত। আসামী ভাষাভাষীগণ সংখ্যায় বিশেষ অধিক না হইলেও সভ্যতার রীতিনীতি উচ্ছেদ করিবার আগ্রহের জন্য একটা বিশেষ বদনাম অর্জন করিতে পারিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসামী ভাষাভাষী লোকেরা আসামের বাঙ্গালীদিগের উপর হামলা করিয়া বহু লোকের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। তখন পণ্ডিত নেহরুর রাজত্ব চলিতেছিল। তিনি তাঁহার স্বভাব সুলভ বিপরীত পথগামী ঔদার্য্যের জন্য আসামী-দিগের কোন শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে একপ্রকারে দুষ্কর্ম করিয়া বাঁচিয়া যাইতে দেন। আসামী দিগের ঔদ্ধত্য ইহাতে আরই বৃদ্ধিলাভ করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আসামী ভাষাভাষী কিছু লুঠতরাজে অভ্যস্ত লোকে আসামের ব্যবসাদারদিগের উপর হামলা করে। ই দোকানপাট লুঠ করিয়া, জ্বালাইয়া দিয়া গৌহাটিতে এ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে আসামে আর আসা ভাষাভাষী ব্যতীত অন্য কাহারও বাস করা সম্ভব হই বলিয়া মনে হইতেছিল না।

এদিকে আসামে পার্ব্বত্যজাতীয় লোকেরাও আস দিগের প্রভুত্ব বরদাস্ত করিতে পারে না। ইহার কার সম্ভবত ঐ আসামীদিগের জুলুমে বিশ্বাস ও গা জোরে নিজেদের মতলব হাসিল প্রবৃত্তি। কারণ যাহ হউক পার্ব্বত্য জাতিগুলি ও অন্যান্য জাতি সক যদি আসামীদিগের সহিত থাকিতে না চায়, তাহা হই আসাম প্রদেশ হয় খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় নয়ত ঐ প্রদে শাসন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে তুলিয়া দিতে হয়। ভাবে এই সমস্যার সমাধান হইবে তাহা আমরা বলি পারি না; কিন্তু আসামের আসামী ভাষাভাষীদিগের ম যাঁহারা শিক্ষিত ও সুসভ্য তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য হ নিজ জাতির দুর্দান্ত ব্যক্তিদিগকে সংযত রাখিবার করা। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতি যে পার্থক্যের করে তাহার পশ্চাতে যে একটা বিরাট সভ্যতা ও কৃ একতা চির বিরাজিত তাহার উপরেই ভারতীয় মান জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত। যাহারা সেই জাতীয়তাকে করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সন্ধানে ধাবমান তাহারা দে শত্রু।

পাকিস্থানে আবার যুদ্ধের আয়োজন

১৯৬৫ খৃঃ অব্দের ২২ দিনের যুদ্ধে পাকিস্থানের সকল যুদ্ধের সরঞ্জাম নষ্ট হইয়া যায়, বর্ত্তমানে পাকি নানান উপায়ে সেইগুলির পরিবর্ত্তে নূতন অস্ত্রশস্ত্র সং করিয়া নিজের সমরশক্তি আবার পূর্ব্বের সমতুল্য অ তাহা হইতেও অধিক করিয়া তুলিয়াছে। এই কা জন্য পাকিস্থানকে গুপ্তভাবে সাহায্য করিয়াছে যা অনেকে আমেরিকা, পশ্চিম জার্ম্মানী, তুর্কী ও ইরা

সন্দেহ করেন। এই সন্দেহের কারণ এই যে পাকিস্থান খোলাখুলিভাবে যতটা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে তাহার হারান অস্ত্রবল পুনর্গঠিত হয় না। সুতরাং গোপনেও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্থান সংগ্রহ করিয়াছে নিঃসন্দেহ; এবং অস্ত্রগুলি আমেরিকান বলিয়া আমেরিকার সহায়তা ব্যতীত সেগুলি পাকিস্থান পাইতে পারে না। আমদানীর পথ যদি পশ্চিম জার্মানী, তুর্কী ও ইরান হইয়া পাকিস্থানে পৌঁছায় তাহা হইলে ঐ দেশগুলির সহায়তাও প্রমাণ হয়। শুধু চীন খোলাখুলিভাবে পাকিস্থানকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছে। পাকিস্থানের তুলনায় ভারতের অস্ত্রবল কতটা আছে তাহা আমরা জানিনা। তবে ভারতের মন্ত্রীগণ বলেন যে আমরা যুদ্ধের জন্য মোটামুটি প্রস্তুতই আছি। একথা পূর্ণরূপে সত্য নহে; কারণ পাকিস্থানই শুধু আমাদিগের শত্রু নহে; চীনও আমাদিগের শত্রু এবং চীন ভারতের অনেক জমি দখল করিয়া বসিয়া আছে। চীনের আণবিক অস্ত্র আছে ও ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে। ভারতের আণবিক অস্ত্র নাই এবং চীনের সহিত সংগ্রাম হইলে তাহা থাকা একান্ত প্রয়োজন। রুশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ড ভারতকে আণবিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা স্বপ্নবিলাসী। আণবিক আক্রমণ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইল আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ। ভারত যদি তাহা না করে তাহা হইলে ভারতের ঘোর বিপদের সম্ভাবনা। পাকিস্থানের অস্ত্রশস্ত্র বিষয়েও ভারতের বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত পাকিস্থান আমেরিকার নিকট হইতে যে সকল হাওয়াই জাহাজ, যান্ত্রিক বন্দুক, তোপ ও ট্যাঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছে সেগুলি ১৯৬৫ খৃঃ অব্দের তুলনায় অধিক মারাত্মক। ভারতের আবশ্যক এইগুলির সহিত সংঘাতে জয়লাভ করিবার উপযুক্ত হাওয়াই জাহাজ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করা। তৎপরে দেখিতে হইবে পাকিস্থান গোপনে চীনের নিকট আণবিক রকেট প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছে কি না। যদি তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় তাহা হইলে ভারতকে অবিলম্বে নিজের সৈন্যদিগের রক্ষার জন্য আণবিক অস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা না করিলে ভবিষ্যতে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইতে পারে। এই আশঙ্কা থাকিলেও যে সকল রাষ্ট্রনেতা ভারতের রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে নারাজ ও অপারগ সেই সকল নেতাগণের অপসারণ অবিলম্বে আবশ্যক। সকল অভাবের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক অভাব হইল দেশরক্ষার সুব্যবস্থার অভাব। এই কারণে অপর সকল প্রয়োজন ও আয়োজন ভুলিয়া ভারতের প্রধান কর্ত্তব্য হইল দেশরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করা। ইহার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই করিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য মূল আয়োজন হইল মানুষের। স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, মূর্খ ও ভীরু লোক দিয়া কোন কাজই যথাযথভাবে হয় না। দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে ঐ জাতীয় মানুষগুলিকে সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জন করিতে হইবে।

বঙ্গদেশের সভ্যতার ধারা

সভ্যতা, সুকৃষ্টি, সুনীতি, বৈশিষ্ট, নির্ভরশীলতা, আত্মসম্মানবোধ, উচ্চাকাঙ্খা, মার্জ্জিতব্যবহার, চরিত্রবল, মনুষ্যত্ব, আদর্শবাদ, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশক্তি, দেশভক্তি, পরহিতচেষ্টা, জনকল্যাণ প্রভৃতি মানুষের সৎগুণাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল কথা আমরা উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের বর্ণনায় ব্যবহার করিয়া থাকি; আজকাল সেই সকল কথা ব্যবহার করিবার প্রায় কোন প্রয়োজন কখনও হয় না। মূর্খ, ধূর্ত, বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, অমানুষ ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করিবার প্রয়োজনই অধিক সময় হইয়া থাকে। এই অবস্থা যে শুধুমাত্র বাংলার রাষ্ট্রনীতির প্রগতির ফলেই হইয়াছে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার আবেষ্টনে, সভায়, সমাজে, সাহিত্যেও এই অবনতির কারণ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। ইহা কেন হইতেছে তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বাংলা দেশের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তথাকথিত নেতাদিগের অনুকরণেই বাংলার সাধারণ মানুষ বহুকাল হইতে জীবনপথে চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যে সকল যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ মানবদিগের মধ্যে উচ্চ আদর্শ, সুনীতি ও চরিত্রবল দেখা যাইত সেই সময়ে বাংলার সাধারণ মানুষও দেশভক্তি, আত্মত্যাগ, সমাজ সংস্কার চেষ্টা, সত্যনিষ্ঠা ও পরস্পরের ভিতর বিশ্বস্ততা

দেখাইয়াছে। যখন আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে ভেজাল, প্রবঞ্চনা, গরীবের সর্ব্বনাশ করা প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধতাই অর্থোপার্জ্জনের মূল মন্ত্র হইয়া দেখা দিল তখন সাধারণ মানুষও চুরী, মিথ্যা ও অপরাপর অন্যায়ে মনোনিবেশ করিল। যখন রাষ্ট্রীয় নেতাগণ বিদেশীর নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দেশের অপকারে আত্মনিয়োগ করিলেন তখন সাধারণ মানুষও বাহিরের শত্রুর সহায়তায় ছুটিয়া গিয়া লাফালাফি করিয়া দু পয়সা আহরণ চেষ্টা আরম্ভ করিল। পণ্ডিতজন পূর্ব্বকালে সামাজিক আদর্শ ও বিশ্বমানবতার নীতি রক্ষা করিয়া শিক্ষা, তর্ক ও বিচারে নামিতেন। পরে যখন কূট তর্কের সাহায্যে জনসাধারণকে সত্যমিথ্যা ও ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য ভুলাইয়া ভ্রান্তির অতলে ঠেলিয়া নামানই জনশিক্ষা ও আদর্শবাদের স্থান অধিকার করিল; তখন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জন প্রবঞ্চকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল ও দিগভ্রান্ত বিশ্ববাসী যত্রতত্র ধাবমান হইয়া নব নব ভুল ধারণাকে চিরসত্যের আসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রাচীনকালে লোক ঠকাইয়া গরীবকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিবার ব্যবস্থা করিত কুলির আড়কাটি নামক একপ্রকার সমাজদ্রোহী লোক। আজ উচ্চস্থানে বসিয়া বহু "আড়কাটি" নানান উপায়ে সরলচিত্ত যুবজনকে ভুল বিশ্বাসের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দল পাকাইয়া দেশবাসীর খরচে নিজেদের লাভের ব্যবস্থাই বর্ত্তমান "আদর্শকেন্দ্রীক" দল গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য। নয়ত আমেরিকার নিকট অর্থ বা গোধুম ভিক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি হইবে একথাও যতবড় মিথ্যা চীনের মাওবাদ অনুসরণ করিলে ভারতের লোকেদের কোন লাভ হইবে সে কথাও তত বড়ই মিথ্যা। ভারতের সভ্যতা কোন পথে কোন রীতি, নীতি ও পদ্ধতির অনুসরণে পাঁচ হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়াছে তাহা না বুঝিয়া, না জানিয়া যাঁহারা নূতন পথের সন্ধানে ঘোরেন, তাঁহারা মহা বুদ্ধিমান একথা বলা চলে না। প্রাচীনের সহিত সম্বন্ধ অটুট রাখা প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীনকে সংস্কার করিয়া জোরাল করিয়া রাখা দরকার। একটা সহর গড়িয়া তুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের শত শত বৎসরের পরিশ্রম ও উপার্জ্জিত অর্থ নিযুক্ত হয়। সহরের জল সরবরাহ, শিক্ষার ব্যবস্থা বা চিকিৎসার উন্নততর আয়োজন করিতে হইলে সারা সহরটিকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার প্রয়োজন হয় না; কারণ ভাঙ্গিয়া দিলে গড়িতে যে পরিশ্রম ও মালমশলা লাগিবে সহরবাসীব তাহার ব্যবস্থা করিতে একশত বৎসর লাগিয়া যাইতে পারে। সুতরাং মানব সমাজের উন্নতি সংস্কৃতির ভিতর দিয়া সহজে ক্রমবিকশিত হয়; সকল কিছু ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া ততটা সহজসাধ্য নহে। প্রলয় না হইলে সৃষ্টি হয় না কথাটা মানব ইতিহাস গ্রাহ্য নহে। সংরক্ষণের সহিত সংস্কারের সমন্বয় স্থাপনই মানব ইতিহাসে উন্নতির শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। সকল দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া কোথায় কি ভাবে কতটা উন্নতি হইয়াছে ওজন করিয়া দেখিলেই এ কথার অকাট্য নিশ্চয়তা প্রমাণ হইয়া যায়।

আমাদিগের দেশে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে নিজেদের কর্ম্মশক্তি, শিক্ষা ও সুসংযত-সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার অভাবে অসংযমের পথে চলিতে ও অপরকে চালাইতে দেখা যায়। এই সকল লোক সুচিন্তার পথে কোন সমস্যার সমাধানে বিশ্বাস করেন না; কারণ সুচিন্তার পথ তাঁহাদিগের অজানা। তাঁহারা সর্ব্বদাই আন্দোলন, আলোড়ন, বিক্ষোভ ও হাল্লা হাঙ্গামার উপর নির্ভরশীল। এই মনোভাব পূর্ব্বে শুধু শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ নির্ণয়েই ব্যক্ত হইত; এখন দেখা যাইতেছে যে শিক্ষা, সংবিধান, ভাষার মূল্যবিচার, প্রদেশের এলাকা নির্ণয় বা যে কোন উচ্চাঙ্গের মীমাংসার প্রসঙ্গেও এই সকল ব্যক্তি দল জুটাইয়া লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিতেছেন। যে অধিক লাফাইতে পারে তাহার কথাই যদি সকলকে মানিতে হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ দেশের অবস্থা যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না, এ কথা কষ্ট করিয়া কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন না হওয়াই উচিত। সমাজের সকল ক্ষেত্রে যে সকল লোক কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগের প্রতি দেশবাসী

বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া দেখা যায় না। উন্নয়ন পন্থায় যাঁহারা অধিক লোক সংগ্রহ করিয়া দাপাদাপি করিয়া জনসাধারণকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারেন; এখন তাঁহাদেরই সমাজে প্রতিষ্ঠা। ফলে দেশবাসীর জীবনযাত্রা ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন দেশবাসীই করিতে পারেন। তাঁহারা যদি সর্ব্বত্র নৃত্য বিশারদদিগকে বর্জ্জন করিয়া উপযুক্ত লোকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে দেশের অবস্থা শীঘ্রই অন্যরূপ ধারণ করিবে।

খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতের জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং সেই বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যোৎপাদন তাল রাখিয়া পরিমাণে বাড়িতেছে না। এই কারণে ভারতের রাষ্ট্র ও অর্থনীতিবিদগণ ভয় পাইতেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মানুষ খাদ্যাভাবে মরিতে আরম্ভ করিবে। ভারতে পূর্ব্বে ৩০,০০০০০০ একর জমিতে চাষ হইত এবং এখন হয় ৫০-৬০ কোটি একরে। খাদ্যবস্তুর পরিমাণ ১০ কোটি টনের কম, অর্থাৎ ৫।৬ একর বা ১৫।১৮ বিঘায় ২৭ মণ মাত্র। ঐ সঙ্গে বহু অন্যান্য ক্ষেত্রজাত দ্রব্যও যদি উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ যদি সব জমির শতকরা কিছু অংশে খাদ্যবস্তু ব্যতীত অপর বস্তুও উৎপাদিত হয় তা হইলেও বিঘা পিছু খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় ২ মণ ৩ মণের অধিক নহে। ভারতে কিন্তু কোথাও কোথাও বিঘাতে দশ মণ বিশ মণ বা ততোধিক খাদ্যবস্তু উৎপাদিত হইতে দেখা যায়। যদি ১০০ কোটি বিঘাতে দশ মণ করিয়া খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহার মোট পরিমাণ হয় ১০০০ কোটি মণ বা ৩৭ কোটি টন। অর্থাৎ ভারতে চাষের ব্যবস্থা যথাযথভাবে হইলে শুধু ১০০ কোটি বিঘাতেই ৭৪ কোটি লোকের জন্য মাথাপিছু বৎসরে আধ টন বা ১৪ মণ খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাতে প্রত্যেক জনের মাসে ১ মণের অধিক বা দিনে পাঁচ পোয়া খাদ্য হয়। র‍্যাশনে আমরা দৈনিক পাঁচ ছটাক মাত্র পাই বলিয়া শুনিয়াছি। এক কথায় বলা যায় যে ভারতের মানুষের খাদ্যাভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য হয় না; আসল কারণ খাদ্য উৎপাদনের সুব্যবস্থার অভাব। খাদ্য কেন ঠিকমত উৎপন্ন হয় না তাহা আলোচনা করিলে নানা প্রকার মতামত শুনা যায়। কেহ বলেন বীজ ঠিক নাই, কেহ বা বলেন কৃষক জমির মালিক নহে সেই জন্য ভাল করিয়া চাষ হয় না। সারের অভাব, মূলধনের অভাব প্রভৃতি অভিযোগও শুনা যায়। কিন্তু আসল কথা সেচের ব্যবস্থার অভাব। ভারতে বার আনা জমিতে সেচের ব্যবস্থা নাই। বীজ, সার ও মালিকানা যতই নির্দ্দোষ হউক না কেন, জল না থাকিলে চাষ হইতে পারে না ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। সেচের ব্যবস্থা না করিয়া বীজ, সার ও মালিকানা লইয়া মাথা ঘামাইলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে না।

কিছুদিন পূর্ব্বে বেতারে একটা দীর্ঘ আলোচনা হয় খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে। তাহাতে সমাজ সংস্কারকগণ বলেন কৃষকের মালিকানা ঠিক করিয়া দিলেই ফসল উৎপাদন হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে। মৃত্তিকা রসায়নজ্ঞগণ সার সরবরাহের কথা বলিলেন। সেচনের কথাটাও কিছু কিছু ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারিত হইল। জন্ম নিয়ন্ত্রণ লইয়া চেঁচামেচি যতটা করা হয় তাহার শতকরা ২৫ ভাগ প্রচারও যদি সেচন লইয়া করা হইত তাহা হইলে এতদিনে ভারতে বহুস্থলে সুগভীর সরোবরের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া যাইত এবং খাদ্য উৎপাদনও জনসংখ্যার সহিত সমানে বাড়িয়া চলিতে সক্ষম হইত। কূপ খনন প্রভৃতিতে মনোযোগ দেওয়া এখন অত্যাবশ্যক। জলাশয়ের নৈকট্য জমির উর্ব্বরতা বাড়ায় একথাও মনে রাখা প্রয়োজন। গভীর ও বৃহৎ জলাশয় থাকিলে তাহার নিকটে চাষ সহজ হয়, কারণ জমি রসাল হইয়া থাকে বলিয়া। এই রূপ ব্যবস্থায় মৎস্যের চাষ ও হংস পালনও সহজ হয়।

ভারতের বিশ্ব-অলিম্পিকে যোগদানের কথা

এই বৎসর বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মেক্সিকোতে হইবে। এইবার বিশ্ব-অলিম্পিক সভা দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়ায় জগতের অনেক দেশে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার আপার্টহাইড বা শ্বেতকায়দিগের

কৃষ্ণকায় বিরুদ্ধতা ও বিভেদ নীতি। আফ্রিকার অনেকগুলি দেশ বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। ভারত সরকার ও ভারত অলিম্পিক সভাও বলিয়াছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে যোগদান করিতে দিলে ভারত অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগদান করিতে পারিবেন না। দক্ষিণ আফ্রিকা যে ক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সাম্যে বিশ্বাস করে না ও অঙ্গের বর্ণ দিয়া মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করে, সে ক্ষেত্রে ঐ দেশের সহিত মিলিতভাবে কোন কার্য্য করা অন্তত আফ্রিকা ও এশিয়ার লোকেদের পক্ষে আত্মসম্মান হানিকর। আমরা মনে করি বিশ্ব-অলিম্পিকের উচিত হইবে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ায় যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা।

কলিকাতার টেলিফোনের অত্যাচার

কলিকাতায় যাঁহারা টেলিফোন রাখেন তাঁহাদিগের উপর আজকাল এক নূতন জুলুম ও আর্থিক দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের সর্ব্বত্রই টেলিফোন ব্যবস্থা একটা নিম্নতম অবস্থায় পৌছিয়াছে। ইহার কারণ যন্ত্রপাতির যথাযথ সংরক্ষণ না করা। হেতু, বিদেশী অর্থের অভাব, যন্ত্রাদি আমদানী করায় অক্ষমতা ও টেলিফোনের কর্ম্মীদিগের কার্য্যে অবহেলা ও আলস্য। টেলিফোন করিয়া কাহাকেও পাইতে হইলে আজকাল প্রতিবার দুইতিনটি ভুল নম্বর পাওয়া যায়। এই ভুল সংযোগ যতবার হয় ততবার তাহা যিনি ডাকেন তাঁহার হিসাবে যোগ দেওয়া হইয়া যায়। ফলে যাঁহার ডাকের সংখ্যা ত্রৈমাসিক হিসাবে ৪০০।৫০০ হইত, তাহা এখন ৯০০।১০০০ এ দাঁড়াইতেছে। ইহার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ দিতে হইতেছে তাহা এক প্রকার অন্যায় ও জুলুম করিয়া টাকা আদায়ের ব্যাপার। ইহার কোন প্রতিকার করিতে হইলে টেলিফোনের কর্ত্তাদিগের উচিত হইবে বরাবর যে রূপ সংখ্যায় ডাক হইত সেই তুলনায় বিগত ছয় মাসে ডাকের সংখ্যা কতটা বাড়িয়াছে তাহা হিসাব করিয়া দেখা ও তদ্দরে সকল টেলিফোন ব্যবহারকারীকে ঐ হিসাবে বিলের অতিরিক্ত আদায়ের টাকা ফিরত দেওয়া। টেলিফোন সরকারী কারবার। টাকা পাইয়া সরকার বাহাদুর তাহা ফিরত দিবার চেষ্টা করিবেন এই আশা করা কতটা অসম্ভব কল্পনার কথা তাহা সকলের বিবেচ্য।

কিনিয়ার ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ

কিনিয়ার স্বাধীনতার পরে কিনিয়া সরকার সেই দেশের সকল বাসিন্দাকে নিজেদের ঐ দেশের লোক বলিয়া স্বীকৃতি পেশ করিতে বলেন। অনেক লোকে সেই ভাবে কিনিয়ার নাগরিকতা মানিয়া লইয়া ঐ দেশে থাকিয়া যাইলেন; কিন্তু কিছু লোক নিজেদের বৃটিশ জাতীয়তা দাবী করিয়া কিনিয়ার নাগরিকতা গ্রহণ করিলেন না। এই সকল লোকের মধ্যে অনেক ভারতবাসী আছেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে বহু সহস্র লোক বৃটেনে চলিয়া গিয়াছেন। বৃটেনের সরকার এই বিরাট অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আইন করিয়া বহু লোককে বৃটেনে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ফলে এই সকল ব্যক্তি এখন দেশহারা হইয়া কোথায় যাইবেন তাহা চিন্তা করিতেছেন। ভারত সরকারও এই সকল লোককে ভারতে আসিয়া ভারতীয় জাতীয়তা অবলম্বন করিতে দিতে বিশেষ ইচ্ছুক নহেন। ভারত সরকার মনে করেন এই সকল লোকের যখন বৃটিশ পাসপোর্ট আছে ইহারা তখন বৃটিশ জাতীয় এবং ইহাদিগের বৃটেনে প্রবেশ করিয়া বাস করিবার অধিকার থাকা উচিত। এই সকল লোক কি কারণে কিনিয়ার নাগরিকতা গ্রহণ করেন নাই তাহা আমরা জানি না। ১৯৪৭ এর পরে ভারতীয় নাগরিকতাই বা ইঁহারা কেন গ্রহণ করেন নাই তাহাও বোঝা যায় না। ইঁহারা যদি কিনিয়াবাসী বৃটিশ জাতির লোক বলিয়াই পরিচয় দিতে চাহেন, তাহা হইলে ইঁহাদিগের কি লাভ হয় তাহাও আমাদের বোধগম্য নহে। ভারতে আসিলে শেষ অবধি ইঁহাদিগকে অপর দেশে তাড়াইয়া পাঠান খুব সহজ হইবে না। মূলতঃ বিষয়টা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসূত এবং সেইজন্য বৃটেনেরই দায়িত্ব এই সকল লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করার। বৃটেনে যদি স্থানাভাব হয়

এরপর ৬৬৫ পাতায়

বাংলা সাহিত্য ও শ্রীচৈতন্য

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁর ধর্মমত কোমলপ্রাণ আবেগপ্রবণ বাঙালির চিত্ত দ্রুত জয় করে নেয়। ফলে, তাঁর মৃত্যুর পরও প্রায় দুই শতাব্দীকাল বাংলা সাহিত্যের ওপর তাঁর চরিত্রের বিপুল প্রভাব দেখা যায়। এই প্রভাব একদিকে যেমন জীবনীকাব্য নামে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যশাখার সৃষ্টি করেছিল, আর একদিকে তেমনি সমস্ত বৈষ্ণবসাহিত্যকে অভিনবভাবে রূপান্তরিত করে প্রায় সমস্ত পদকর্তাকে গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরবিষয়ক সাধারণ পদ লিখতে এবং শ্রীরাধা চরিত্রের কাব্যরূপ রচনাকালে চৈতন্যপ্রদর্শিত রাধাভাব অনুসরণ করতে প্রণোদিত ক'রে।

মঙ্গলকাব্যরচয়িতারাও চৈতন্যদেবের দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হন যে, প্রায় প্রত্যেক চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের প্রথমে এবং কদাচিৎ কাব্যের মধ্যে মধ্যেও তাঁর বন্দনা ও নামোল্লেখ দেখা যায়। একটিমাত্র রক্তমাংসের মানুষের এমন অসামান্য লোকোত্তর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে এর আগে বা পরে কখনও দেখা যায় নি। ইদানীং রামকৃষ্ণ বা অরবিন্দও বাঙালিকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারেন নি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নানা দিক দিয়ে বিশেষ সমৃদ্ধির ইতিহাস। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য তার নিজ এলাকার চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে কামরূপ, উৎকল, কনৌজ, বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত কম-বেশি প্রসার লাভ করে। এই যুগে গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে বাঙালি এক সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয় সাধন করে। ব্রজবুলি নামক কৃত্রিম লেখ্যভাষার দৌলতে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের গৌরব বৃহত্তর বঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৃহত্তর বঙ্গ গঠনে চৈতন্য বা গৌরাঙ্গদেবের দান অসামান্য। ব্রজবুলি সাহিত্য রচনায় তাঁর প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। এই সময়ে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পশ্চিমে বৃন্দাবন, উত্তরে নেপাল, পূর্বে কামরূপ এবং দক্ষিণে গোদাবরীতীর পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে।

রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে, বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাঙালি এই সময়ে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ও ঘরকুনো হয়ে পড়ে। কিন্তু তার সাহিত্যের প্রভা পূর্বযুগ অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দীপ্তি বিকিরণ করতে থাকে।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদবৃন্দের কীর্তিকলাপ ও দেবমহিমা বর্ণন ও প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য কাব্য চৈতন্যপরবর্তী যুগে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিরচিত হয়। এই সব কাব্যে ভক্ত কবির ধর্মানুরাগ চূড়ান্তভাবে অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জীবনীকাব্যের কবিরা নিজেদের গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার লোভে মিথ্যাভাষণ ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণে কুণ্ঠিত হন নি।

চৈতন্যদেবকে অবলম্বন ক'রে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের যে-পর্ববিভাগ, সেটি মুখ্যত বৈষ্ণব কাব্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মাত্র চৈতন্যদেবকে অবলম্বন ক'রে মধ্যযুগের সমস্ত বাংলা সাহিত্য যখন বোঝা যায় না, তখন তাঁর নামে মধ্যযুগের সাহিত্যিক পর্ববিভাগ না হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য চৈতন্য-প্রভাবে অতি-লালিত। এই যুগের আলঙ্কারিকগণ প্রায়ই বৈষ্ণব এবং তাঁদের মধ্যে রূপ গোস্বামীর প্রাধান্য ও দিশারির ভূমিকাগ্রহণ এই সময়ের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত। এই সাহিত্য সাধারণত চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্য

নামে পরিচিত। এ সাহিত্যে মানবতাবোধ ও প্রাণশক্তির আধিক্য ছাপিয়ে উঠেছে ভক্তিধর্মের উচ্ছ্বাস ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের প্রবলতা।

দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর ভাব', ধর্ম ও ভক্তি-প্রাণ সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশের ওপর প্রবলভাবে পড়ে। বিশেষত গৌড় বা রাঢ়ের ওপর দ্রাবিড়দের প্রভাব খুব বেশী ছিল। সেই জন্যে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংস্কৃতি ও ভক্তিধর্মের সঙ্গে বাংলা-দেশের সংস্কৃতি ও ভক্তিধর্মের একটা প্রবল পার্থক্য আছে যদিও দুই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে যে-সাদৃশ্য আছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

লক্ষণসেনের রাজত্বের শেষ দিকে নবদ্বীপ ও গৌড়-প্রদেশ তথা সমগ্র বাংলাদেশ বিলাসব্যসন ও দুর্নীতির স্রোতে প্রবমান ছিল। যে-মনোবৃত্তি গীতগোবিন্দের মতো "মদন-মহোৎসব" রচনা করতে পারে, সেই মনোবৃত্তি তখন জাতীয়-জীবনকে কাম-কলুষিত তাম-সিকতার ক্লেদলিপ্ত ক'রে তুলেছিল। এর পরে প্রায় দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হলে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। তাঁর প্রভাবে বাঙালির সাহিত্যে ও সমগ্র জাতীয়-জীবনে কেমন একটা ভাববিহ্বল কোমলতার ভঙ্গি এসে যায়। সে কোমলতা কতকগুলি সদাচার ও পরিচ্ছন্ন রুচি প্রবর্তন ক'রে পূর্বযুগসঞ্চিত তান্ত্রিক বিকৃতিজাত আবর্জনা ও ক্লেদ দূর ক'রে দিয়ে বাঙালির চেতনায় স্বাস্থ্য ও শুদ্ধি ফিরিয়ে আনল—হয় তো বা প্রথম প্রবর্তিত করল।

কিন্তু রূপ গোস্বামী ও অন্যান্য আলঙ্কারিক প্রবর্তিত পথে নিষ্ঠার সঙ্গে ধাবিত হয়ে বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা প্রাণহীন গতানুগতিকতার সৃষ্টি করলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক উৎকট এক-ঘেয়েমি বাংলা সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে। তার অনিবার্য পরিণামে অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব প্রভাব হ্রাস পায়। লোকে মুখ বদলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সহজিয়া বৈষ্ণবদের অশ্লীল বীভৎসতায় লোকের ঘৃণা প্রবল হয়। চৈতন্য-প্রভাবে অভিজাতিত্যবোধচ্যুত বাঙালি আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে পথ খুঁজে পাচ্ছিল না।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৃহত্তর বঙ্গ গঠিত হয়। কীর্তন সঙ্গীতের অসামান্য উন্নতির জন্যেও তাঁর প্রেরণা সক্রিয়। সাহিত্য ছাড়াও সঙ্গীত ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য প্রভাব কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ-কথাও স্থির সত্য যে, তাঁর প্রভাবে বাঙালি অতিরিক্ত ললিতস্বভাব হয়ে পড়েছিল।

চৈতন্যদেব উচ্চ সংস্কৃতিমান্ সমাজের লোকদের মানসের সঙ্গে গূঢ় রহস্যময় সাধনার সাধকদের একটা ভাবসংযোগ সাধন করে দিয়েছিলেন নিজের জীবনের দ্বারা। যাকে ধরা যায় না, দেখা যায় না, স্পর্শ করা অসম্ভব—সেই ভাবলোকের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের কৃষ্ণের জন্যে তিনি কেঁদে মরে সেই বাউলদের সঙ্গে নিজের সমধর্মিতা প্রমাণ করে গেলেন যারা মনের মানুষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁকে খুঁজে না পেলে চৈতন্যদেবের মতো আকুলতা প্রকাশ করে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগে ধর্ম, পূজা ও সাধনার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে আবার তাদের আতিশয্য চরমে উঠেছে। "কানু ছাড়া গীত নাই" চৈতন্য ছাড়া পালাগান ছিল না, প্রতি সাঙ্গীতিক জলসায় প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা গাইতে হত, মঙ্গলকাব্যগুলির প্রথমেও চৈতন্যবন্দনার পদ থাকত।

বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে চৈতন্য-দেবকে দিগ্‌দর্শনরূপে স্মরণ করা প্রয়োজন। তাঁর আবির্ভাবের আগের বৈষ্ণব সাহিত্য আর তাঁর তিরো-ভাবের পরের বৈষ্ণব সাহিত্য—এ-দুটির মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে যা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সম্ভবপর হয়েছে। তিনি নিজে ছিলেন রাধাভাববিগ্রহ। তাঁকে দেখার পর কবিদের কাছে রাধা চরিত্রের ভাবদ্যোতনা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। তাঁর আবির্ভাবের আগের কবিরা রাধাভাবের আলোচনা ও স্ফুরণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাধিত করেছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝতে হলে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে জ্ঞানার্জন আবশ্যক। তাঁর চরিত্রটি এবং তাঁর জীবনের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি ভালো করে বুঝে নিতে হবে।

প্রথমে চৈতন্যজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যাক।

চৈতন্যের প্রভাব বাংলাদেশে সাহিত্যিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক—তিন ক্ষেত্রেই অভিব্যক্ত হয়। তিনি স্বয়ং রচনা না করলেও তাঁর আনীত ভক্তিপ্লাবনে বৈষ্ণবকাব্যপ্রবাহিনী পরিস্ফীতি অর্জন করে। রূপ-সনাতনের মতো কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহচরের সঙ্গে ভাব-আস্বাদন এবং সাধারণ লোকদের সঙ্গে কেবল নাম-সঙ্কীর্তনের নীতি চৈতন্যদেব গ্রহণ করেছিলেন। উচ্চ ও গভীর ভাবসমূহ প্রিয় বিদগ্ধজনের কাছে ছাড়া অপর কারো কাছে না বলায় প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা তাঁর দ্বারা তেমন প্রচার লাভ করতে পারে নি। সাধারণ নরনারী একটা সরল ভক্তিভাবের আভাস-পরিচয়মাত্র পেয়েছিল। অবশ্য সে-যুগে তার অসাধারণ মূল্য কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

চৈতন্যদেবের কৃতিত্ব মোটামুটি এইগুলি :—

১। নগর-সঙ্কীর্তনের দ্বারা সংঘবদ্ধ প্রয়াসে অত্যাচার প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন। সে-সময়ের কাব্যে বাঙালি হিন্দুর দাস-মনোবৃত্তি বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। ধর্মমঙ্গল কাব্যে তুর্কি শাসনকে পরোক্ষভাবে আশীর্বাদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে রকম হীনতার সঙ্গে চৈতন্য ও কাজির মধ্যে গ্রাম-সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন, তাতে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। বরং বৃন্দাবনদাস তুর্কি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনায় নবদ্বীপের "যবনভয়"-এর উল্লেখ দেখা যায়। চৈতন্যদেব সে-ভয় কতকটা দূর করেন।

২। নীরস বিষয়-বাসনা-পঙ্কিল জন-চেতনায় সরস ভগবদ্‌ভক্তির ভাব সঞ্চার। সেই ভক্তি যতই সঙ্কীর্ণ দ্বৈতবাদী চেতনা প্রসূত হোক, জনচিত্তে একটা কোমল সরলতা যে এনে দিয়েছিল, তাতে কোন ভুল নেই।

৩। সকল বর্ণের এমন-কি ধর্মের লোকদের মধ্যে বৈষ্ণব হিসাবে এমন একটা ঐক্য ও মহত্ত্ববোধের প্রতিষ্ঠা আনা যে, উচ্চ-নীচ সকল বর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান একটা সামাজিক সাম্যবোধে একত্র হবার সুযোগ পেল। বৈষ্ণব হিসেবে সর্ব শ্রেণীর হিন্দুর এবং হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের সমান সামাজিক মর্যাদা হল। সমাজচেতনায় বর্ণভেদ অস্বীকার না করেও এমন একটা বিপ্লব আনা হল যে, বৈষ্ণবতার মারফতে সব মানুষ সমান সামাজিক মর্যাদা লাভের সুযোগ পায়।

৪। তান্ত্রিক আচার ও উপচারের মধ্যে বাঙালির রুচি যে-ক্লেদ ও মালিন্যে লিপ্ত হয়েছিল, তার বদলে বৈষ্ণব আচার ও উপচারের প্রবর্তন ক'রে সে-ক্লেদ ও মালিন্য দূর ক'রে শোভন রুচি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতিষ্ঠা। তান্ত্রিক ভোগবাদের মূল নীতি অস্বীকার না ক'রে, "ভোগো মোক্ষায়তে"র তত্ত্ব অগ্রাহ্য না ব'লে, সেই নীতি বা তত্ত্বকে উপচারবিশুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে জনরুচির উৎকর্ষ-সাধন চৈতন্যদেবের মহৎ কৃতিত্ব।

৫। ব্যক্তিগতভাবে বহু পতিত ও নীচ শ্রেণীর ব্যক্তিকে আলিঙ্গন ও কোল দানের দ্বারা নীচ ও পতিত ব্যক্তির মনে সাহস ও আত্মপ্রত্যয় সঞ্চার করা এবং সাধারণ অব্রাহ্মণ লোকসমূহের ব্রাহ্মণভীতি ও ব্রাহ্মণের আত্মাভিমান দূর করা। তাঁর "কণ্ড়রসা" লোকের প্রতি করুণা সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য।

৬। সঙ্কীর্তনের দ্বারা সংঘবদ্ধ আরাধনা প্রবর্তন।

৭। মাত্র নামগানের দ্বারা আরাধনাই সাধারণ লোকের পক্ষে যথেষ্ট, এই মত প্রচার ক'রে অনাড়ম্বর ভগবদারাধনার দৃষ্টান্ত স্থাপন।

৮। হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্ব সবই অক্ষুণ্ণ রেখেও সামাজিক ঔদার্য, পতিতোদ্ধার, সংঘবদ্ধ আরাধনা, সহজ আরাধনা প্রভৃতি যুগোপযোগী ব্যবস্থার প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দু ধর্মের ক্ষয় রোধ।

৯। বাঙালির সংস্কৃতি বিস্তৃতভাবে প্রচারের দ্বারা বৃহত্তর বঙ্গ গঠন। এ-ব্যাপারে ব্রজবুলি ভাষায় কাব্য রচনায় উৎসাহদান তাঁর একটি প্রধান কাজ।

১০। কীর্তন সঙ্গীতের উৎকর্ষসাধনে প্রেরণাদান।

১১। বিভিন্নভাষী এলাকার মধ্যে ঐক্যসংস্থাপন। বাংলা-উৎকল-বৃন্দাবনমৈত্রী প্রতিষ্ঠা তিনি সুসম্পন্ন করেন।

মাত্র চব্বিশ বছরের সন্ন্যাসজীবনের মধ্যে এতগুলি কাজ করতে পারা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর।

যেহেতু আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠের শিষ্য বা সাধু নই, সেহেতু এত বড় এক সম্প্রদায়ের স্রষ্টা কৃতিত্বশালী মহাপুরুষের দোষত্রুটিও আমরা আলোচনা করব। তাঁর চরিত্রে মনুষ্যসুলভ দোষত্রুটি ছিল। চিরদিনই মনোময় জীবমাত্রের অল্পাধিক দোষত্রুটি থাকবে। এ ব্যাপারে জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য স্মরণীয় :—

"যাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরকীয়াবাদ আর তার আনুষঙ্গিক রসশাস্ত্র আর বৈষ্ণব পদকে বাঙালির সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে মনে করেন, আধ্যাত্মিক সাধনায় এই মতকে আর বৈষ্ণব রস-কীর্তনকে জনসাধারণের উপযোগী সাধনপথ বলে মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। বাংলা কীর্তনসঙ্গীত বাংলাদেশের সংস্কৃতির একটি লক্ষণীয় প্রকাশ মাত্র; যে জাতির মধ্যে এই জিনিসের উদ্ভব, সেই জাতির একটা অংশকে এই জিনিস মাতাতে পারে; কিন্তু আমার মতে এর বিশ্বজনীনতা নেই। শব্দের অর্থের উপরে নির্ভর যার এতটা বেশি, সেই সঙ্গীত যথার্থ উচ্চ দরের সঙ্গীত আখ্যার কতটা যোগ্য, তাও বিচার করে দেখবার বিষয়! বৈষ্ণব পরকীয়াবাদ আর রস-কীর্তনকে আশ্রয় করে কতকগুলি মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চ স্তরে উঠতে পেরেছেন, একথা অস্বীকার করি না; কিন্তু সংসারে থেকে যাদের লড়তে হবে, যাদের মনে সাহস, দেহে শক্তি, কার্যে তাৎপরতা, নীতিতে সংঘবদ্ধতা দরকার, তাদের পক্ষে পরকীয়া মতের রসচর্চা দুর্বলতার আকর ছাড়া আর কিছুই হয় না। খাঁটি বাংলাদেশের জিনিস হলেও আমার মনে হয় এই জিনিস অন্তত এই উপস্থিত আপৎকালে বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী।

"পরকীয়াবাদ প্রতিনৈতিক অসামাজিক আদর্শের আধারে প্রতিষ্ঠিত। আর মধুর রসের সাধনাময় রসকীর্তন জনসাধারণের পক্ষে ভাববিলাসময় আধ্যাত্মিকতাভাস মাত্র। অন্য সব জাতির চরিত্রে যেমন, বাঙালির চরিত্রেও তেমনি দুটো দিক আছে—জ্ঞানের দিক আর ভাবের দিক, শক্তি বা দৃঢ়তার দিক আর কোমলতার দিক। বাঙালির বৈষ্ণব সাধনায় ভাব আর কোমলতার উপরই অত্যন্ত অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে, ভাবের সাধনে কোমলতার সাধনে এইমত তার চরম অবস্থায় বাঙালিকে পৌঁছিয়েছে। আমাদের দরকার দুইএর সামঞ্জস্য। আর সামাজিক সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি রেখে পরকীয়াবাদের মতন জিনিসকে, স্ত্রী-পুরুষের (তাও আবার সমাজবিরুদ্ধ সম্পর্কের স্ত্রী-পুরুষের) প্রেম আর মিলনকে প্রতীক করে যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনা, তাকে, মাটি ছুঁয়ে যাদের চলতে হয় আর জীবনসংগ্রামের জন্য সর্বদা যাদের তৈরি থাকতে হয়, এমন মানব-সাধারণের কাছ থেকে দূরে রাখতে হয়।

"শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ আর শিক্ষা যাই থাক, সকলেই স্বীকার করবেন যে, পরবর্তী কালে তা থেকে বাঙালি অনেকটা বিচ্যুত হয়ে নিছক ভাব সাধনার পথেই চলেছিল।" (ইউরোপ ১৯৩৮, ১ম খণ্ড)

বলা বাহুল্য সুনীতিবাবুর সঙ্গে সব ক্ষেত্রে একমত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভবপর হবে না। বিশেষত কীর্তনের সঙ্গীতমূল্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা গুরুতর বিতর্কের বিষয় তবু তাঁর অভিযোগ যে পরকীয়াবাদের ক্ষেত্রে সর্বাংশে সত্য এ-কথা অপ্রতিবাদ্য।

চৈতন্যদেবের প্রধান ত্রুটিগুলি এই :—

১। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার লোভে অযৌক্তিকভাবে দ্বৈতবাদ প্রচার করতেন। তাঁ[র] জীবনীকারেরা দেখাতে পারেন নি যে, তাঁর মত যুক্তি[সহ]। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধুরাও তা পারেন নি।

২। ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিশেষত মায়াবাদে[র] বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার। এই দোষ তাঁর চেয়ে তাঁর শিষ্য বৃন্দের ঢের বেশি পরিমাণে ছিল। পরে এরই জ[ন্য] বাংলাদেশে প্রবল শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

৩। গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনার সৃষ্টি বা সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর বৈষ্ণবরা সব ধর্মের লোকদের নিজেদের সম্প্রদায়ে গ্রহ[ণ] করতেন বটে, কিন্তু নিজসম্প্রদায়বহির্ভূত লোকদে[র] "পাষণ্ডী" আখ্যায় অভিহিত করতেন। প্রিয়দর্শী অশোকে[র]

মতো তাঁরা পাষণ্ডদের পূজা করতে পারেন নি। বৈষ্ণবরা এই দোষে ক্রমে সঙ্কীর্ণচিত্ত হয়ে পড়েন।

৪। অহেতুক প্রকৃতি বা নারীবিদ্বেষ। চৈতন্যের মতো উদারচরিত্র মানুষও স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে নিষ্প্রয়োজন কাঠিন্য অবলম্বন করেছিলেন। স্ত্রীকে তিনি যেভাবে বিনা দোষে ত্যাগ করেছিলেন, তা অসঙ্গত। বিশেষত তিনি যখন বৈরাগ্যযোগ উপদেশ করতেন না। ছোট হরিদাসকে তিনি যেভাবে দণ্ডিত করেছিলেন, তাতে হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত হয়েছিল।

৫। উন্মত্ত প্রলাপাদি ভাবাতিরেকের প্রশ্রয়দান। এই দোষে এদেশে অসহ্য ভাবপ্রবণতা ও মার্দবের প্রসার হয়।

৬। অলস ও কর্মহীন ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ। চৈতন্যদেব নিজে যা করে গেছেন তা অসাধারণ বলে তাঁর নিজের জীবিকার জন্যে কর্ম না করা সমর্থনীয় হলেও হতে পারে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত শিষ্যবৃন্দও যে তাঁরই মতো আজ এখানে কাল সেখানে ভিক্ষা "লাগাতেন" সেটা সমর্থনযোগ্য নয়।

দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য অনুধাবন করলেই উল্লিখিত ত্রুটিগুলির অভ্যন্তরীণ রহস্য সহজবোধ্য হবে :—

"পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদীই স্বভাবতই এমন একজন সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র। আর যেমন মানুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে, আবার কতকগুলি অপ্রিয় থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তাহা আছে। তিনি বিনা হেতুতেই কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত। আপনারা দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। এই জন্যই এই সকল ধর্ম চিরকালই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, করিতেছেও। আবার এই দ্বৈতবাদের ধর্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়। তাহার কারণ, গাঢ় চিন্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে।" (জ্ঞানযোগ)

বিবেকানন্দ-বর্ণিত সব ত্রুটিই চৈতন্যদেবের ছিল। তা হলেও সব দিক দিয়ে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে, চৈতন্যদেব তাঁর যুগের পক্ষে অসাধারণ ভালো কাজ করে গেছেন। সেই কৃতিত্বের তুলনায় তাঁর ত্রুটি যৎসামান্য। জাতীয় জীবনে তাঁর যে-প্রভাব, তার মর্ম বুঝলেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের গুরুত্ব বোঝা যাবে। নিজের জীবনে যে-রাধাভাব স্ফুরণ তিনি ক'রে গেছেন, তাই তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে।

প্রামাণিক চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ সম্বন্ধে এমন সব কথা আছে যা নিন্দকের উৎসাহ বর্ধন করতে পারে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে সে-সব কথা কতকটা অবান্তর। তবে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বই থেকে সহজেই দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, বৈষ্ণবরা পরমত-অসহিষ্ণু তো বটেই, তাঁরা ঠিক গণতন্ত্রসম্মত মনোভাব নিয়েও চলেন না। আর যুক্তির কোন বালাই থাকলে এ-কথা তাঁরা লিখতে পারতেন না :—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥

এর চেয়ে মারাত্মক কথা :—

স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি—তথাপি সংহারে॥

এর পরে আর কিছু বলার থাকে না।

অজাত

জ্যোতির্ময়ী দেবী

গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘেমে যেন শরীরটা নেয়ে উঠেছে।

উঃ কি দুঃস্বপ্ন। সতী উঠে বসল।

না। খোকা তো পাশে ঘুমোচ্ছে। মেয়েও ঘুমচ্ছে তার এপাশে।

স্বামীও পাশের বিছানায় ঘুমচ্ছেন। সবাই ভালোই তো আছে।

কিন্তু ভোরের স্বপন। কেন এমন স্বপন দেখল। খুব গরমের দিন তো নয় তবে এত ঘামই বা কি করে হল।

সে আস্তে আস্তে উঠে বসল। জানলার ধারে। আকাশটা নীল হয়ে আসছে। তারাগুলোও মিলিয়ে আসছে। শুকতারাটা ঝকঝক্ করছে আকাশের গায়ে।

কিন্তু ভোরের স্বপন যে ফলে যায় লোকে বলে। কি হবে? কি করবে? এও লোকে বলে আবার ঘুমোলে ফলে না।

তাহলে আবার গিয়ে শোবে কি? কিন্তু আর কি ঘুম আসবে। বিছানাটা দেখতে ভয় করছে। যদি আবার ঐ স্বপ্নটাই দেখে! তাহলে কি হবে?

সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

ঐরকম অন্যায় কাজ করেছে বলেই কি এই বিশ্রী ভয়ঙ্কর স্বপন দেখল।

কিন্তু ডাক্তার যে বললে ওতে দোষ হয় না।

ভয়ে ভয়ে ও বলেছিল 'কিন্তু…ওর তো প্রাণ আছে। প্রাণ জন্মেছে। একি করতে আছে!'

উনি বললেন 'ওতে দোষ হয় না। আমাদের তো আর ছেলেমেয়ে দরকার নেই।…'

ওর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। দরকার নেই তো—হল কেন। এলো কেন?…নাই হ'ত।

শক্ত করে চোখ বুজল ঘুমের জন্য। এখুনি ভোর হয়ে যাচ্ছে। তার আগে ঘুমতে হবে। নইলে স্বপনটা ফলে যাবে।

বন্ধ করা চোখের সামনে ভেসে এলো সেই স্বপ্নটা…। সেই ছেলেটা। তার মুখ নেই।

কিন্তু যেন সেই ছেলেটা তার এই খোকাই। যে তার প্রথম সন্তান। তার অনিরুদ্ধ। বড় আদরের। যাকে জন্মের সম্ভাবনাতেই না দেখেই সে ভালবেসেছিল। কোলের মধ্যে পেয়েছিল কি যেন অমূল্য জিনিষ। রক্ত-মাংসের মধ্য দিয়ে অনুভব করা এক না জানা প্রাণ-বিন্দুকে দশ মাস ধরে যাকে না দেখেই ভালবেসে লালন করেছিল চুপি চুপি। মনে মনে তার আকার তার রূপ তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছিল। প্রথম মা'রা যেমন না দেখেই ভালবাসে তেমনি করে। ক্রমে ক্রমে সে প্রাণবিন্দু তার দেহের মধ্যে নড়াচড়া করেছে, আকার নিয়েছে, কেমন করে তার কিছুই জানা ছিলনা। জানেনা কোনদিন। অথচ কি রকম এক মায়া-মমতাতে তার বুক ভরে উঠেছিল…। ভালবেসেছিল। কত সাবধানে থাকত। পাছে তার ক্ষতি হয়, কষ্ট হয়। পাছে সে নষ্ট হয়ে যায়। গুরুজনরা কত সাবধান করতেন। একে সে দেখেনি। কিন্তু কেন খোকার মুখটা দেখা গেল না? যে গেছে এর তো চেহারা জানা নেই। এর শরীরে খোকার মত দেখতে হয়ে সে এলো কেন। শরীরটা দেখা গেল। মুখটা ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর শরীরটাও ঝাপসা হয়ে গেল। কিন্তু ওরা একে কেন নষ্ট করল। ও করতে চায়নি। খোকা কি খুকু তাও সে জানত না। আর একটা হলে কি ক্ষতি হ'ত। কিম্বা একেবারেই যদি না জন্মাত। তাবে, এ কাকে সে—

তারা সবাই নষ্ট করে ফেলল। যে হয়নি তাকে? মা এই সন্তানকে?

সে বন্ধ চোখে আকুল হয়ে কেঁদে ফেলল। তাহলে কি এই পাপের জন্ম এই খোকার ক্ষতি হবে? তাই খোকার মুখ দেখতে পেল না।

কেন সেই ঝাপসা খোকার শরীরে এ খোকার মুখ এলো। ঝাপসা হয়ে দেখা দিল।

ভোর হয়ে গেল। চোখ টিপে ভাবতে লাগল ঘুম আসছে। ভোর হয়নি এখনো। না ঘুমলে ভোরের স্বপন যদি সত্যি হয়ে যায়। মন অবিশ্বাস করতে পারে না। ভয়ে ভাবনায় সব সংস্কার সত্যি মনে হয়।

পাশে ছেলেমেয়ে জেগে উঠল। স্বামীও উঠলেন। ভোর হয়ে গেছে। পথে জল দিচ্ছে জমাদাররা। কাক আর কি যেন অন্য পাখীও ডাকছে।

ম্লান বিবর্ণ বিহ্বল মুখে সে উঠে বসল। ছেলের মাথায় হাত রাখল—। ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিল। মেয়ে এলো। চকিতের মত মনে হল যাকে বাঁচতে দেওয়া হ'ল না, সেও কি এই খোকার মত হ'ত? এমনি সুন্দর এমনি উজ্জ্বল চোখ এমনি করে মা বলে জড়িয়ে ধরত! তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তাড়াতাড়ি চোখ মুছল।

স্বামী বললেন 'সকাল বেলা চোখে কি হল? কাঁদছ নাকি?'

সে ম্লান ভাবে হেসে বললে, 'না কি জানি চোখটা কর কর করছে কেন।'

[২]

কিন্তু আবার কয়েক দিন না কিছু দিন পরে ঐ রকমের কি এক স্বপ্ন দেখল। কে আসে কাছে। আকার আছে মনে হয় তারপরই মিলিয়ে যায়। কখনো মনে হয় খুকুর মত দেখতে।

কোঁকড়া চুল হাসি-দুষ্টুমীভরা মুখ। কিন্তু মুখটা মিলিয়ে যায়। দেখতে পায় না কার মত খোকার মত, না খুকুর মত? না শুধু একটা পাখীর ছায়ার মত কি যেন।

নাঃ ওর রাত্রের ঘুম গেল একেবারে। দিনে ঘুমোয় পড়ে পড়ে।

রাত্রে ঘুমতে ভয় করে। বিছানাটা বদল করে নেয়—অন্য জায়গায়।

স্বামী বলেন তোমার হল কি? আজ এখানে কাল ও পাশে শুচ্ছ। মুখ-চোখ বসে গেছে। রাত্রে অর্দ্ধেক রাত জেগে সেলাই কর। চোখ নষ্ট হয়ে যাবে যে।

সে বলে, 'সেলাই জমেছে অনেক। শেষ করতে হবে তো।' মনে মনে ভাবে, স্বপ্নটা স্বামীকে বলবে কি। কিন্তু লোকে যে বলে বলতে নেই।

তার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। তাহলে কি খোকারই ক্ষতি হবে। যাকে বাঁচতে দেওয়া হল না, সেকি তার দাদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বপ্নের মাঝ দিয়ে।

এখন যেন তার মনে উৎকট ভয় বাসা বেঁধেছে।

ক্রমে দিনেও স্বপ্ন দেখল। কি দেখল মনে পড়েনা। কিন্তু এলোমেলো স্বপ্ন।

দেখল যেন কেউ নেই বাড়ীতে। বাড়ী খালি। কোথায় গেল ছেলে মেয়েরা? আর স্বামী?

ঘুম ভাঙল পড়ন্ত বেলায় রোদ্দুরে ঘর ভরে গেছে। ঘেমে গা ভিজে গেছে।

ছেলেমেয়েরা বারান্দায় খেলা করছে একমনে। উনি আপিসে। মনে হয় কাকে যেন বলে সব কথা। মনে হয় ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে খানিকটা।

বুড়ো ঝি কলতলায় বাসন মাজছে। তাকে বলবে। বললে যদি সত্যি হয়ে যায়।

এখনকার সংসার, ঠাকুরঘর-টর নেই কিছু।

কিন্তু ক্যালেণ্ডারে তো ছবি আছে রামকৃষ্ণদেবের মা দুর্গার। সেখানে লুটিয়ে পড়ে সে কেঁদে ফেলল।

[৩]

একদিন স্বামী বললেন, তোমার হয়েছে কি? অসুখ করল নাকি? ডাক্তার দেখাবে? রাত্তিরে মোটে ঘুমতে পার না। জানালায় বসে থাক। কি হল কি?

সে বললে, ডাক্তার কি হবে। তবে ঘুমটা একেবারে হয় না। কেবলি স্বপ্ন দেখি খারাপ।

'তা ওষুধ খাও কিছু ঘুমের---তাই ব্যবস্থা করি।

সে ভাবে 'তা খেলে হয়।'

ওষুধ এলো। ডাক্তারও এলেন।

ডাক্তার বললেন, একটা করেই খাবেন। বেশী খাবেন না, অভ্যেস হয়ে গেলে কাজ হবে না। শরীর কিছু খারাপ তো নয় দেখলাম। তবে চেহারা খারাপ হচ্ছে দেখছি। তা হোক এতেই কাজ হবে।

সে ওষুধ খায়। আর আকুল হয়ে ভাবে এবারে খুব ঘুমবে। একেবারে গভীর ঘুম। যেমন প্রথম সন্তান হবার পর ঘুমতো। বড়রা বলতেন, বাপরে সতীর কি ঘুম। যেন কুম্ভকর্ণ। হাসতেন। হয়ত আর স্বপ্ন দেখবে না তাহলে।

ওষুধ খেয়ে ঘুমলো। খুবই ঘুম হল। বেশ মাস দুই গেল। শরীর ভাল হচ্ছে বেশ। স্বামী খুব খুশী। হঠাৎ ভয় হল। এবারে শরীর ভাল হচ্ছে যদি আবার আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায় শরীর।

৪

ঘুম আসে। ঘুম ভাঙে। আবার স্বপ্ন দেখল। এবার দেখল সেই অজাত শিশু ওর বিছানার পাশে বড় ছেলের পাশে মূর্তিহীন ছায়াতনু নিয়ে খোকার গায়ে মিলিয়ে গেল।

ওষুধ খেয়ে গভীর ঘুম। চোখ খুলতে চায় না। কিন্তু স্বপ্ন দেখে কেন।

চুপ করে উঠে বসে ভাবে। ছেলেমেয়েকে আদর করতে পারে না। ইচ্ছা হয় না। মন যেন অসাড় অবশ হয়ে গেছে। যেন মনে হয় ওরা থাকবে না। সে মা হয়ে জীবহত্যা প্রাণহত্যা করতে দিয়েছে শরীরের মধ্যের। ওরা বেঁচে থাকবে না। সেই জন্যেই থাকবে না।

স্বামীর কাছে যেতে ভয় হয়। সোহাগ আদরকে ভয় করে। যদি উৎকট ভয় জাগে। কি করবে সে বেঁচে থেকে ...।

আর ওষুধে কিন্তু কাজ হয় না। ঘুম ভেঙে যায় খালি। স্বপ্ন না দেখলেও ভয় হয়।

কিন্তু এমন করে কতদিন ভয় করে না ঘুমিয়ে থাকবে। তবে কি ঐ ওষুধটা আরো বেশী করে খেয়ে দেখবে? যাতে সমস্ত রাত মড়ার মত ঘুমতে পারে। সেই প্রথম সন্তানের জন্মের পরের মত। আর ঘুম!...সে মনে মনে ম্লান ভাবে হাসে।

এবারে সে ঘুমলে।

সারারাত্রি। সারা সকাল। অনেক বেলা অবধি। স্বামী ডাকলেন, সতী, বেলা হল। সতী ওঠো। গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। গা হিম।

ছেলেমেয়েরা মা জাগো বলে কাছে এসে জাগাতে লাগল। কিন্তু সে খুব ঘুমিয়েছে। অনেক দিন অনেক বিনিদ্র রাত্রির পর। এবারে কোনোদিন আর স্বপ্ন দেখবে না।

সাহিত্যভীতি

কালীচরণ ঘোষ

দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে। কে এই উন্মাদনা এনে দিল? তখন আমরা কয়েকজন মহাপুরুষকে চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু তাঁরা হঠাৎ এ চিন্তা কোথায় পেলেন? সিপাহী-সংগ্রাম অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে; ইংরেজ পাকাপোক্তভাবে ভারতের মসনদে দৃঢ় সমাসীন। স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী (শ্রীপ্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়) বলেছেন এটা "যুগধর্ম"; কালের প্রভাবে ও ঘটনার যোগাযোগে এই রকম হতে বাধ্য। সারা বিশ্বে নানা দেশে তখন স্বাধীনতার বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়েছে।

যাই হ'ক ভাবের তরঙ্গ দেশকে মাতিয়ে তুলেছে; সাহিত্য-জগৎ তাতে শক্তি সংযোজন করছে। সেই সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ হ'লো অপর কোন্ সূত্রে এর উৎসমুখ আরও বীর্য্যসম্পন্ন করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ভারতের প্রাচীন সভ্যতা দৃঢ়ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত। উপরের কাঠামোয় কিছু দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সে কারণে সমস্তটাকে পরিত্যাগ করা অবাঞ্ছনীয়। জগতের নূতন জ্ঞান দ্বারা তার সংস্কারসাধন বিধেয়। মূল ভিত্ত উৎখাত করে নূতন চাকচিক্যময় ভঙ্গুর ইমারত গড়তে গেলে "ইতো নষ্টস্ততঃ ভ্রষ্টঃ" হতে হবে।

চিন্তাশীল দেশনায়কদের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পর্ব্বতকন্দর হতে স্বতঃনিঃসৃত ক্ষীণ স্রোত ক্রমে অপরাপর জলধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে বেগ ও বিস্তার লাভ করে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। তাৎকালিক উত্তেজিত যুবচিত্ত মেতেছিল প্রত্যক্ষসংগ্রামে নিজের রক্তের সঙ্গে শত্রুর রক্ত এক ধারায় মিশিয়ে দেশে একটি রুধির বন্যা সৃষ্টি করবে; আর সে স্রোতে ভেসে যাবে ইংরেজ প্রভাব। শক্তিলাভের সন্ধানে প্রাচীনের দিকে তখন উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল। দেখা গেল এক প্রাচীন গ্রন্থ; বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ যার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, "যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিঃসৃতা" সেই "শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা" একাই স্বাধীনতাকামীর মনের সকল স্তরই প্রভাবিত করতে সক্ষম। দেশভক্তের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সর্ব্বোপরি আত্মিক-শক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ অনুশীলন করে যে সকল আখড়া, ক্লাব, সমিতি আশ্রম প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছিল, যে শিক্ষাদানই হক্, গীতার একটি উচ্চস্থান ছিল সেখানে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে ১৮৫৭ সালে। তারপর আর নিবৃত্তি নেই। রণদামামা বেজে চলেছে ধীর বা দ্রুত তালে, প্রচণ্ড আরাবে বা মৃদু রোলে। অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ভারতের নানা অংশ থেকে ভেসে আসছে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরেজকে বরপুত্ররূপে বরণ করে নিয়েছেন; "খোদা ছপ্পড় ফোঁড়কে" তার জয়ের ঝুলি ভরে দিচ্ছেন। নতুন অস্ত্রশক্তির সঙ্গে ছল চাতুরি, কূটনীতি, সাম দান ভেদ দণ্ডবিধির দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যথোপযুক্ত প্রয়োগ-কৌশল ইংরেজকে তখন ধাপে ধাপে শক্তি ও গৌরবের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসন পেতে দিয়েছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর সাম্রাজ্যে এখন সূর্য্য অস্ত যান না; তাঁর মুকুটে সকল মণিমাণিক্যের মধ্যে ভারতরূপ শ্রেষ্ঠ রত্ন সন্নিবেশিত হয়ে শোভাবর্দ্ধন করছে।

মুসলমান শাসনের পর তখন দেড়শ' বছর ইংরেজ-শাসন ভারতবর্ষে অমিতবিক্রমে চলেছে। এ সময় যদি কোনো অপরিণামদর্শী অবিমৃষ্যকারী লোকের মগজে-আত্মহত্যার বাতিক ভর করে থাকে, তার জন্য সমস্ত জাতি নির্য্যাতনের জন্য প্রস্তুত হ'তে চাইবে এরূপ আশা করা

বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। জরাগ্রস্ত, ভয়ত্রস্ত, লুপ্তবুদ্ধি এক বিরাট জাতি কতটা আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হলে তেজের তুঙ্গশিখরে অবস্থিত ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সম্মত হবে? কিন্তু যুগ-দেবতা ভারতের নিকট সেই অসম অভাবনীয় রণের জন্য উদাত্ত আহ্বানে এক বিরাট রহস্য সৃষ্টি করলেন।

ভারতের ইতিহাসে এর নজির আছে। রণসজ্জায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সন্নিবেশ। সব যখন প্রস্তুত "কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ" মহা শঙ্খধ্বনি নিনাদে যুদ্ধারম্ভ ঘোষণা করলেন। কিন্তু শ্রীমান্ গাণ্ডীবী সব লক্ষ্য করে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এত সব আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব হনন করে তিনি পাতক সঞ্চয় করতে পারবেন না।

ইংরেজের সঙ্গে গোপন বা প্রকাশ্য সমর বেধে উঠলে কত নিরীহ লোকের নানা দুর্দশা হবে, প্রাণ যাবে,—এ যুক্তি তখন বড় করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। "অন্যে পরে কা কথা" তৃতীয় পাণ্ডব এ সব দেখে বল্লেন, "সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥"
তাঁর শরীর কম্পান্বিত হচ্ছে এবং গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠছে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, গাণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়ছে; আর দেহের চর্ম্ম যেন জ্বলে যাচ্ছে।... "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ, ন চ রাজ্যং সুখানি চ"—জয়, রাজ্য, সুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মিটে গেছে।

পার্থের এই করুণ অবস্থা দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"—এরূপ কাতরতা তোমার শোভা পায় না; তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার কর। যুদ্ধ করতে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কেউ প্রাণের পরোয়া করেন না; তাঁদের জন্য শোক করার কোনো হেতু নেই। আত্মা কখনও হত্যা করেন না বা নিজে হত হন না। ইনি জন্ম, হ্রাস, বৃদ্ধি, অবক্ষয় ও পরিণামরহিত। সুতরাং নরহত্যার পাতক বর্ত্তমানে কাকেও স্পর্শ করছে না। এটা রূপান্তর মাত্র—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।"
জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে নতুন পরিচ্ছদ গ্রহণ করার মত আত্মা ক্ষয়িষ্ণু শরীর পরিত্যাগ করে নব কলেবর আশ্রয় করে মাত্র।

অযথা চিন্তায় কালক্ষেপ অবিধেয়। "জাতস্য হি ধ্রুবোমৃত্যুঃ"—'জন্মিলে মরিতে হবে', স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টায় পরাধীন জাতিকে একথা সহজ ভাবেই মেনে নিতে হবে। বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম হ'চ্ছে প্রতি ভারত-বাসীর ধর্ম্ম; কারণ "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ অন্য কিছু নেই। যুদ্ধ সমাগত—এই "বিষমে", মহাসঙ্কটকালে এতাদৃশ "অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরম্ কশ্মলং" অনার্য্য-সেবিত, অধর্ম্ম্য ও অকীর্ত্তিকর মোহকে মনের কোণেও স্থান দেওয়া যে যেতে পারে তা সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

'তুমি যদি যুদ্ধ হ'তে বিরত হও', "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি"—'স্বধর্ম ও কীর্ত্তি পরিহার করায় পাপগ্রস্ত হবে।' তার ওপর স্মরণ রাখা ভাল, মানী ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও নিন্দার্হ। মনের এরূপ অবস্থা শীঘ্র পরিহার বাঞ্ছনীয়, তা না হ'লে অপর যোদ্ধৃবর্গ মনে করবেন যে সব্যসাচী ধনঞ্জয় রণ পরিত্যাগ করতে উদ্যত। ফলে হবে, "যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্"—"যাঁদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে তাঁদের কাছে তুমি হেয় বলে পরিগণিত হবে।'

সংক্ষেপে এখানে বলে রাখা যায়, বিপদসঙ্কুল কাজ সামনে এসে গেলে তখন সহকর্ম্মিদের কাছে 'থেলো' হবার লজ্জায় আর পশ্চাদপসরণ সম্ভব হয় নি বৈপ্লবিক ঘটনায় বহুক্ষেত্রে। দোদুল্যমান অব্যবস্থিত মনের অতি নিখুঁত বিশ্লেষণ।

এই ধর্ম্মযুদ্ধে জয় পরাজয় মৃত্যু নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া কোনো বীরের পক্ষে শোভা পায় না। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"—যদি মরণই ঘটে, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, জয়ী হলে পৃথিবী ভোগ করবার পথে বাধা নেই। মনের সকল বাধা দূর হলেই "সুখে দুঃখে সমে

কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ”,—সুখ, দুঃখ লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয় তুল্যরূপ জ্ঞান হবে,—তা'হ'লে অবান্তর প্রশ্ন এসে মনকে অভিভূত করবে না। সকল বাধাবিঘ্ন দূর হবে, যখন ভাবা যাবে “কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন”—কেবল কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নেই। কেবল অনাসক্ত হয়ে কাজ করে যাবার নির্দেশ।

ইংরেজ শাসন শোষণ অত্যাচার উৎপীড়ন, স্বাধীনতা-স্পৃহাদলন নির্ব্বাসন প্রভৃতি অবিরাম চলেছে, রাজশক্তির বিরুদ্ধে কোনো অপ্রিয় কথা বল্লেই রাজদ্রোহ, তখন বাঙলার রাজনীতির কর্ণধাররা মনে করলেন, ইংরেজের “পাপের ভরা” পূর্ণ হয়েছে এবং শ্রীভগবানের আবির্ভাব আসন্ন। 'যুগান্তর' পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভের শিরোভাগে সে বাণী জনসাধারণের নিকট গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোক দুটিকে উদ্ধৃত করে প্রচার করতো “যদা যদাহি ধর্ম্মস্য···সম্ভবামি যুগে যুগে।” ইংরেজের নিপীড়নে নিষ্পেষণে ধর্ম্ম আজ পর্য্যুদস্ত, অধর্ম্ম মাথা তুলে আপন প্রভাব বিস্তার করছে, সাধুরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছেন, এ দুরবস্থা দুর্দ্দশার নিরাকরণে, সাধুর উদ্ধার, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্ম্মকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁর আগমনের কাল উত্তীর্ণ প্রায়। শঙ্কা নাই, “সুদর্শনধারী মুরারী” আর শোণিতে মেদিনী প্লাবিত করে আবির্ভূত হবেন।

মুক্তিকামী সন্তানের সামনে বিপ্লবের মূর্ত্তি উপস্থাপিত করা হয়েছে—

“নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশালনেত্রং”

কি ভীষণ আকার! অন্তরীক্ষব্যাপী তেজোময়, বহু বর্ণধারী বিকৃতমুখ ও প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র! সে বদন-মণ্ডল করাল দংষ্ট্রাযোগে ভীষণতর হয়েছে। কত নরপতির চূর্ণিত মস্তক দাঁতের ফাঁকে সংলগ্ন থেকে তার বীভৎসতা বৃদ্ধি করেছে—

“যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি”

যেমন নানা নদীর বহুতর স্রোতধারা সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হয়—

“যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ”

যেমন পতঙ্গদল মৃত্যুর জন্য প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ মহাবলশালী শ্রেষ্ঠবীরগণ তোমার মুখবিবরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে;

“লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।”

প্রজ্বলিত বদন মহাআনন্দে দুরন্তরূপে লোকসমূহকে গ্রাস করছে। তোমার উগ্ররূপের প্রভা জগৎকে মুগ্ধ করছে। বিপ্লবীর নয়ন ঝল্‌সে যাবার উপক্রম হয়ে উঠছে। মন প্রব্যথিত, ধৈর্য্য ও শান্তি পরিত্যাগ করছে। সকল অবস্থা প্রণিধান করে অর্জ্জুন বলেছিলেন “অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রূপ দেখে প্রাণ যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর সহ্য হয় না; তুমি তোমার স্বাভাবিক রূপ ধারণ কর, আমি যেন প্রকৃতিস্থ হতে পারি।”

এই দংষ্ট্রাকরাল বিপ্লবের সূচনা যাঁরা আবাহন জানাচ্ছিলেন বাক্যে ও লেখনী সাহায্যে, তার মধ্যে অনেক চরমপন্থী ইংরেজের কাজের মাত্র সমালোচনাতে প্রবেশ করে বিপ্লবপর্ব্ব সমাপন করেছিলেন।

যুবকদিগের মধ্যে গীতাশিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত শান্তিসমাহিত এক যুবককে বেদনাতুর কোনো বড় রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “ছোকরা, মরতে তোমার ভয় করছে না?” সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর পেয়ে-ছিলেন তিনি, “আমি গীতা পড়েছি।” আর একটি কথাও বলবার প্রয়োজন হয়নি; না প্রশ্নকর্ত্তার, না, উত্তরদাতার। আধার বিচার করে গীতার অংশ বেছে শিক্ষাদান করা হতো। এমন বিপ্লবী সে যুগে খুব কমই ছিল, যারা গীতার শিক্ষায় কমবেশ প্রভাবিত হয় নি।

সে কারণে গীতা পুলিশের "আপত্তিকর" পুস্তকের তালিকায় স্থান লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র গীতার আলোচনা করেছেন। কিন্তু সে যুগে তাঁর আনন্দমঠ বিপ্লবের গীতারূপে পরিগণিত হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন বিস্ময়কর রাজনৈতিক ফলপ্রসূ ("astonishing political consequences") বলে আনন্দ মঠ অনন্যসাধারণ পরিস্থিতি লাভ করে 'শনির দৃষ্টি' পড়ে একে বহু দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে।

বইখানি লেখা হয় ১৮৮২ সালে, "বন্দে মাতরম্" রচিত হয়েছিল আরও দু'তিন বছর আগে। বিশ বৎসর বাদে যখন দেশ ও বিদেশের ঘটনাসংঘাতে লোকের মনে দেশাত্মবোধ দানা বেঁধে উঠেছে, তখন গীতসম্বলিত আনন্দ মঠ জাতির চক্ষে নূতন আলোকপাত করেছিল। দেশ-প্রেমের সমুদ্রমন্থনে ভাবতরঙ্গে উত্থিত অমৃত "বন্দে মাতরম্" মৃত-প্রায় জড় জাতির দেহে সে যুগে নবজীবন সঞ্চার করেছিল।

এই মায়ের কোলে যুগযুগান্ত ধরে বংশের ধারায় অজস্র বাঙালী জন্মেছে ও মরেছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টি নিয়ে মায়ের রূপ অবলোকন করার শক্তি কারো ছিল না। অপার্থিব তুলিতে এ মহামহিমান্বিত শ্রীমণ্ডিত মায়ের চিত্রের রেখাপাত অপর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে রূপে কোনো অস্পষ্টতা, আবিলতা, অসঙ্গতি নেই। দেশপ্রীতি নবপ্রেরণায় উৎসারিত হচ্ছে, দেশের মাটির 'পরে মাথা ঠেকাবার জন্য প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছে; অন্তরের রুদ্ধভাব ভাষায় রূপপরিগ্রহ করে বেরিয়ে এল,—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাম্ মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।'

বাঙালী তখন বুঝলে দেশ কেবল এক মৃৎপিণ্ডমাত্র নয়; ইনি ঐশীশক্তিধারিণী মাতার অপরূপ সৌন্দর্য্যের প্রতীক। তাঁকে আমরা দেখছি "বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং" আর প্রাণ খুলে বলছি,—

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলাদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী..."

আনন্দমঠে আমরা দেখলাম মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন, মা যা হবেন—ত্রিকালের মূর্ত্তির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হ'লো। যা হবেন সন্তানরা হৃদয়শোণিত তর্পণে তার আবাহন জানাবে, আগমনের পথ নিরঙ্কুশ করবে। তখন তাঁকে আমরা দেখবো, কমলাকান্তের ভাষায়,—"দিগভুজা নানাপ্রহরণধারিণী, শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিনী, বামে বাণী বিদ্যা[illegible] মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।" দেশপ্রেমে বিক্ষুব্ধ চিত্তে[illegible] উদ্বেলিত মনোভাব "বন্দে মাতরম্" রূপে ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছিল। স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমানে ভরপু[illegible] আত্মভোলা বাঙালীকে সন্তানদল গঠন করবার প্রের[illegible] যুগিয়েছে আনন্দমঠ। মনস্কাম সিদ্ধি করতে গেলে জীব[illegible] সর্ব্বস্ব পণ করতে হবে, সঙ্গে থাকবে মাতৃসেবার অচলাভক্তি সমন্বিত একচিত্ত।

ঘরছাড়া বাঙালী সন্তান ভবানন্দর সঙ্গে কণ্ঠ মিলি[illegible] বলেছে, "আমরা অন্য মা মানিনা—"জননী জন্মভূমি[illegible] স্বর্গাদপি গরীয়সী'। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—[illegible] নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের কা[illegible] কেবল সুজলা সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যাম[illegible] মা,—

সন্তানের শপথ গ্রহণ ছিল অবশ্য করণীয় রীতি। ই[illegible] মধ্যে আছে ত্যাগের মন্ত্র, যত দিন না মাতার উদ্ধার[illegible] ততদিন গৃহধর্ম্ম, মাতাপিতা, ভ্রাতাভগিনী দারা[illegible] আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী সবই পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মের হিসাবে সন্তানকে ইন্দ্রিয় জয় করতেই হবে, আপনার

বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন হবে ঘৃণিত আচার। সকল উপার্জ্জন বৈষ্ণব ধনাগারে জমা দিতে হবে। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করতে হবে; রণে ভঙ্গ দেওয়া মহাপাতক। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলে জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে হবে, বিষপানে জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

যে রাজা স্বীয় প্রজার কাছে অর্থ সংগ্রহ করে অথচ তাদের মঙ্গলে ব্যয় করে না, সে রাজার ধন লুণ্ঠন করা অপরাধ নয়। ইংরেজ ভারতের অর্থ নিয়ে যায়, তাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, আর ভারতবাসী অনাহারে মরে। "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ্যে সরকারী ধন লুণ্ঠনের জন্য প্রকাশ্য ভাবেই যুবকদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে।

ইংরেজের সাহসকে অনুকরণ করবার নির্দেশ দিয়েছে আনন্দমঠ। "সিপাহীর তোপের মুখে উড়িয়া যাইবে" বলে যে ভীতি প্রদর্শন করা হ'লো, তদুত্তরে সন্তান বলছে, "একবার বই ত আর দুবার মরবো না।" সিপাহীর অস্ত্র লুঠ ব্যতীত নিজেদের অস্ত্র নির্মাণের পন্থা নির্দেশ করা আছে। পদচিহ্নে মহেন্দ্রর প্রাসাদে নির্মিত সপ্তদশ কামান মুসলমান ও ইংরেজের সম্মিলিত শক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব করেছিল।

সন্তানদের নিকট কোনো কাজই কঠিন নয়। "সন্তানের নিকট কঠিন কাজ আছে কি?" এ প্রশ্নের এক উত্তর জীবনপণে—লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে।

সমস্ত আনন্দ মঠই নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা। ত্যাগ, শৌর্য্য, সেবাধর্ম, ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং ধর্মে রতি জাতির যুব চরিত্রের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হবে এবং শেষ জয় যে অবধারিত সে অটুট বিশ্বাস মনকে ভরে রেখে দেবে। একখানি গ্রন্থে যে শিক্ষা নিহিত ছিল, তাতে আনন্দ মঠকে স্বরাজগীতা বলে অত্যুক্তি করা হয়নি। জাতীয় জাগরণের মন্ত্র "বন্দে মাতরম" ফাঁসীর রজ্জুতে শ্বাস রোধ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশভক্ত অকুতোভয়ে উচ্চারণ করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কিছু আগেই "বন্দে মাতরম্‌" সংগ্রামী-চিত্তের ভাষা হয়ে উঠেছিল, প্রথমে ১৯০৪ সালে মৈমনসিংহে এই ধ্বনি বহুর কণ্ঠে একত্র উচ্চারিত হয়ে পরে আসমুদ্রহিমাচল মাতিয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেস কর্তৃক ভারত শাসন লাভের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলে যা পরিচিত ছিল, তাকে নির্ব্বাসন দিয়ে সঙ্গীতের নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, বাঙ্গালীর নয়, সমগ্র জাতির অবমাননা করা হয়েছে। যে মাতৃরূপ যে মাতৃমন্ত্র সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করে স্বাধীনতা লাভের তূর্য্যধ্বনি ছিল তার প্রতি চরম অকৃতজ্ঞতা করা হয়েছে এবং তার অভিসম্পাত কয়েক বৎসরেই দেশকে ক্লীব করে ফেলেছে।

২

আনন্দ মঠের আদর্শে এবং বারীনের পরামর্শে অরবিন্দ লিখলেন "ভবানী মন্দির"। ১৯০৪ সালে বরোদা থেকে বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল। মূল ইংরেজি ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও বাঙলা ভাষায়। সহর থেকে দূরে, লোকের পদচিহ্নহীন স্থান, পরিবেশ শান্ত ও নির্জ্জন, সকল শক্তি পুঞ্জীভূত বলে মনে হবে—এমন এক স্থানে সর্ব্বশক্তিময়ী ভবানীর দেউল স্থাপিত হবে। রেওয়া রাজ্যের অমর কণ্টক ছিল বারীন্দ্রের মানসে নির্ব্বাচিত স্থান।

ভবানী, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, প্রেমময়ী রাধা,—সবই অনন্তের শক্তিরূপিণী। আমাদের কর্ম্মের প্রবৃত্তি সবই যোগ্য শক্তির অভাবে নিষ্ফলতায় পর্য্যবসিত হ'চ্ছে। প্রারম্ভেই আমরা কায়িক, মানসিক, নৈতিক ও সর্ব্বোপরি আত্মিক বল অর্জ্জন করবো। শক্তিহীন হওয়ায় আমরা স্বপ্নরাজ্যের জীবে পরিণত হয়েছি। আমরা হস্ত সংযুক্ত, কিন্তু আঘাত করার শক্তিহীন; পদবিশিষ্ট, কিন্তু দ্রুত চলচ্ছক্তিহীন।

জরাগ্রস্ত, চিত্তাকর্ষণশক্তিহীন ভারতকে নবজন্ম গ্রহণ করতে হবে। ক্ষয়প্রাপ্ত, দুর্ব্বল, রক্তলেশহীন, তেজবীর্য্য-বিচ্যুত ভারত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে'—এ কথা অর্ব্বাচীনের উক্তি। কোটি কোটি অধিবাসীর সম্মিলিত শক্তি হ'লো 'নেশন'। আমাদের দেশমাতৃকা কেবল মৃত্তিকাস্তূপ, বাক্যের অলঙ্কার বা কল্পনার আলেখ্য নয়। যেমন শত সহস্র দেবতার সম্মিলিত শক্তি এক দেহে পুঞ্জীভূত হয়ে

মহিষমর্দ্দিনীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তেমনি আমাদের মা কোটি কোটি সন্তানের সকল শক্তির মূর্ত্ত প্রতীক। কিন্তু তাঁর সন্তানদের মানসিক তমসাচ্ছন্নতা, কর্ম্মবিমুখতা এবং অজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ হয়ে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। অন্তরে ব্রহ্মের জাগৃতি সাহায্যে আমাদের মনের তমঃ বিদূরিত করতে হবে।

জাতি হিসাবে আমরা বাঁচবো কি মরবো, সেটা নির্ভর করছে আমাদের ইচ্ছার উপর। ভারতের শত শত সাধু সন্ত সন্ন্যাসী তাঁদের শান্তিপূর্ণ নীরব সাধনার দ্বারা আমাদের জ্ঞানদান করছেন। ভগবান রামকৃষ্ণ আর তাঁর শার্দ্দূলচিত্ত ভক্ত বিবেকানন্দ আমাদের শিক্ষাদান করেছেন যে সিংহাসনারূঢ় নৃপতি হ'তে, সাধারণ শ্রমিক, সন্ধ্যাহ্নিকনিরত সাধু থেকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ সকলের মধ্যে ভগবান অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

আমরা প্রতিজনেই ভগবৎশক্তিসম্পন্ন ও সৃজনের অধিকারী। ভগবানের সর্ব্বতেজ আমাদের অন্তরে রয়েছে এবং আমরা তাঁর সৃষ্টির ক্রোড়ে বাস করছি। কেবল নূতনতর রূপদান নয়, রক্ষণ ও ধ্বংস সবই সৃষ্টির অন্তর্ভূত। কি আমরা সৃজন করবো সবই নির্ভর করছে আমাদের নিজের উপর, কারণ অসহায়ভাবে নিজেরা যদি মেনে না নিই তাহ'লে আমরা ভাগ্য বা মায়ার হাতের ক্রীড়নক মাত্র নয়, আমরা সর্ব্বশক্তিমানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশের অংশ বিশেষ।

সারা বিশ্বের দাবী,—ভারতকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। তার কাছ থেকেই নানা দেশে ধর্ম্ম, দর্শন বিজ্ঞান বিস্তারলাভ করে সকল মানবকে একাত্মতা দান করবে। এই বিরাট কাজের জন্ত ভারতকে আত্মসচেতন হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামিজীর উদাত্ত আহ্বান ভারতের মোহ ভঙ্গ করেছে। এখন দ্বিধা ভয় সঙ্কোচ ও আলস্তকে যদি সব আচ্ছন্ন করতে দেওয়া হয়, সে দোষ ভারতবাসীর। জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান নানা ক্ষেত্র হ'তে এসেছে, কিন্তু শক্তির অভাবে জীবনে তার কোনটাই সুষ্ঠু প্রযুক্ত হয় নি।

ক্ষুদ্র জাপান কি ভাবে জগতে প্রভাব ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে সে বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মের ভিত্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে কারণ ভারতের বিভিন্ন কালের জাগরণ ধর্মভিত্তিক ও তাই থেকে সে জাগরণের উদ্ভব।

ভক্তি ভারতীয় দেউল, কর্ম ও জ্ঞান জাতির জীবনে একান্ত প্রয়োজন। একটি অপর হ'তে বিযুক্ত হলে পূর্ণ ফলপ্রসবে অশক্ত হয়। কর্ম অধ্যায়ে নূতন এক ব্রহ্মচারিদল গঠনের কথা বলা হয়েছে। স্তব স্তুতি, শ্রদ্ধা বিফল হবে কর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত না হলে। মায়ের সেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ ব্রহ্মচারীদলের এক মঠ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। কেহ কেহ সম্পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও, কর্ম্মান্তে গার্হস্থ্যধর্ম্মে ফিরে যেতে কোনো বাধা থাকবে না।

ভবানী মন্দির খুব বেশী প্রচার লাভ করেনি। আনন্দ মঠ তখন বাঙ্গালী চিত্ত এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে ভবানী মন্দির সংগ্রহ ও পাঠের আগ্রহ প্রচুর থাকলেও মাত্র সঙ্কীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেই উচ্চস্থান অধিকার করেছিল। "ভবি ভোলবার নয়", গভর্ণমেণ্ট বইটির প্রচার বন্ধ করেছিল।

অন্যান্য যে সকল বই "নিষিদ্ধ" হয়েছিল, তার মধ্যে সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ১৯০৪ সালে ১৬ জুন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। খুনখারাপি, হাঁক ডাক উদ্দাম উত্তেজনার বাণী কিছুই ছিল না বইখানিতে। কি ভাবে ইংরেজ তার শাসন-শোষণ নীতি সাহায্যে ভারতকে নিঃস্ব করেছে, দেশে দারিদ্র্য বাড়ছে, অর্থসম্বলহীন হ'য়ে লোক মরণের পথে চলেছে, এটা ছিল পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিদেশীর কূট বুদ্ধিতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবনতি হেতু ইংরেজের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উদ্রেক হয়ে দেশ যাতে নিজ শক্তির ওপর নির্ভর করতে শেখে তারই কথা ছিল প্রচুর।

'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা'তে ২৪শে এপ্রিল ১৯০৬ এক পত্রপ্রেরক লেখেন যে বইখানি পড়লে ইংরেজদের স্বার্থ-

পরতা নীচতা ও কাপুরুষতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে তার একটা ধারণা করা যায়।

Sri Aurobindo on himself···পুস্তকের (পৃঃ ৩০) মতে "a book compiling all the details of India's economic servitude which had an enormous influence on the young men of Bengal and helped them to turn into revolutionaries···(p '46). It had an immense repercussion in Bengal and assisted more than anything else in the preparation of the Swadeshi movement."

দেশের কথা পরপর তিনটি সংস্করণ পার হয়ে চতুর্থ সংস্করণ হঠাৎ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯১০ সরকারী "নিষিদ্ধ" পুস্তক তালিকায় স্থান লাভ করে। তার পরই অক্টোবর ১ দেউস্কর লিখিত তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন রচিত "একই গোত্রে চড়ানো হয়। তাঁর "বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ" সরকারী মতে একই শ্রেণীভুক্ত হয়।

তাঁর শিবাজী চরিত গ্রন্থ-প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা চলে এই পুস্তকে সর্ব্ব প্রথম "স্বরাজ" শব্দটি ব্যবহৃত হয় (Sri Aurobindo···P.31); পরে দাদাভাই নওরোজী ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেস ভাষণকালে স্বরাজ শব্দের প্রয়োগ করেন এবং তখন থেকে জাতীয়তাবাদী বাঙালী মাত্রেই একে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে ব্যবহার করে এসেছে।

"মুক্তি কোন পথে" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক "যুগান্তর"-এর বাছাই প্রবন্ধ সমষ্টি। জানুয়ারি ১৯০৭ (১ মাঘ ১৩১৩) প্রকাশিত হয়। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য মনোবল সৃষ্টি করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিদেশী রাজা আমাদের আনুগত্য দাবী করতে পারে না। ধমনীতে এক বিন্দু আর্য্য শোণিত প্রবাহিত থাকলে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাকে নিষিক্ত করতে হবে। বিপ্লবের প্রচার কার্য্যের জন্য সঙ্গীত, সাহিত্য, যাত্রা কথকতা, গুপ্ত-সমিতি স্থাপন প্রয়োজন। অস্ত্র ও ধন সংগ্রহ যুদ্ধের প্রস্তুতি, বিরুদ্ধ মতবাদের বিরুদ্ধ আলোচনা জাতির জাগরণের জন্য বিদেশীয় হাতে নির্য্যাতনের প্রয়োজনীয়তার কথা লেখা হয়েছে। জীবন উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে বিদেশী সেনাবিভাগ থেকে সৈন্য ভাঙিয়ে নেওয়া খুব কষ্টকর ব্যাপার নয়। যুদ্ধের প্রেরণা, জয়ে কৃতনিশ্চয় বাঙালীকে উন্মাদনাপূর্ণ করার নানা প্রবন্ধে বইখানি পূর্ণ ছিল। ৮ই আগষ্ট ১৯১০ বইখানির প্রচার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

"বর্ত্তমান রণনীতি" লেখেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত J. S. Bloch লিখিত Modern Weapons and Modern Warfare অবলম্বনে রচিত এবং ৭ অক্টোবর ১৯০৭ প্রকাশিত। আধুনিক ছোটবড় মারণাস্ত্র, সেনা বিভাগের নানা অংশের এবং যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতির নাম, সৈন্য সজ্জার বিধি ব্যবস্থা, কায়দাকানুন, আক্রমণ ও প্রতিরোধ বিভাগের কার্য্যপদ্ধতি, গরিলা যুদ্ধের রীতিনীতি প্রভৃতি বহু তথ্যে পরিপূর্ণ বইখানি নানা ছবির সাহায্যে সমৃদ্ধ ছিল। ১৩ অক্টোবর ১৯০৭ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা বইখানির দীর্ঘ সমালোচনা করে। তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:

"The book is a small manual which seeks to describe for the benefit of those···who are entirely unacquainted with the subject, the nature and use of modern weapons, the meaning of military terms, the use and distribution of the various limbs of a modern army, the broad principles of guerilla war fare. These are freely illustrated by detailed references to the latest modern wars, the Boer and the Russo-Japanese, in the first of which many new developments were brought to light or tested and in the second corrected by the experience of a greater field of warfare under modern conditions. The book is a new departure in

Bengali literature and one which shows the new trend of national mind···"

৩০ এপ্রিল ১৯১০ বইখানি সরকারী আইনে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

"বন্দেমাতরম্"-এর শেষ মন্তব্য একটুও অত্যুক্তি নয়। "সন্তান"দের মন তখন সত্যই সংগ্রামের দিকে টেনেছে এবং এতৎসংক্রান্ত পুস্তক পত্রিকাদি সংগ্রহ সুরু হয়েছে। খানাতল্লাসী সূত্রে তখন নানা বই পুলিশের হস্তগত হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি নাম দেওয়া হচ্ছে:

Sanford: NITRO-EXPLOSIVES; Alfred Hutton: SWORDSMAN; Eissler: HAND-BOOK OF MODERN EXPLOSIVES; Field EXERCISES, MANUAL OF MILITARY ENGINEERING, INFANTRY TRANING, CAVALRY TRAINING, MACHINE-GUN TRAINING, QUICK TRAINING FOR WAR প্রভৃতি (Sedition Committee Report p. 102).

এই শ্রেণীর নানা বই সে সময় (ও পরে) বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর অনেকগুলি নিষিদ্ধকরণের তারিখও পাওয়া যায়, কিন্তু অনেকের সম্বন্ধে সে আদেশের পরিচয় আজও সংগ্রহ করা যায় নি। কেবল নিজস্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া সে যুগের বহু কর্মীর সঙ্গে আলোচনা সূত্রে নিশ্চিন্তে বলা যায় যে প্রায় সকলগুলির প্রচার ত বন্ধ হয়েছিলই, তবে সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করার হুকুম ছিল, না অত্যুৎসাহী পুলিশ তাদের বক্তা প্রচার করেছিল সে বিষয় বর্তমানে বলা যাচ্ছে না।

বইগুলি সম্বন্ধে আলোচনাকালে যেগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞার তারিখ সঠিক জানা যাচ্ছে, সেগুলি পরে উল্লেখ করা যাচ্ছে, আদেশের তারিখগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'লো। তৎপূর্ব্বে অতি প্রয়োজনীয় পুলিশের "অবাঞ্ছিত" পুস্তক কয়েকখানির বিষয় উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবন চরিত প্রথমেই স্থান গ্রহণ করতে পারে। বইখানি রচিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত সমাদর লা[ভ] করেছিল। চণ্ডীচরণ সেনের মহারাজা নন্দকুমা[র] ঝান্সীর রাণী, অযোধ্যার বেগম; সত্যচরণ শাস্ত্রীর জালিয়া[ৎ] ক্লাইভ, ছত্রপতি শিবাজী ও প্রতাপাদিত্য; দুর্গাচ[রণ] সাহিড়ীর স্বাধীনতার ইতিহাস; রজনীকান্ত গুপ্তর সিপা[হী] যুদ্ধের ইতিহাস, মুকুন্দলাল চৌধুরীর মণিপুরের ইতিহা[স] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসি[ম] ফিরিঙ্গিবণিক ও জগৎশেঠ।

নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছি[ল] বহু নাটকের প্রচার বন্ধ করা হয়। গিরীশচন্দ্র ঘো[ষের] কথা পরে বলা হচ্ছে। আপাততঃ উল্লেখযো[গ্য] —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়: রাণাপ্রতাপ, মেবার প[তন] দুর্গাদাস; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ: দাদা ও দি[দি] মনোমোহন গোস্বামী: সমাজ, সংসার, বীর-পূ[জা] পৃথ্বীরাজ, হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়: বঙ্গবিক্রম, হরি[পদ] চট্টোপাধ্যায়: পদ্মিনী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদ্দৌলা মীরকাসিম ছত্রপতি শিবাজী (৭ আগষ্ট ১৯১১); হারাধন প্রণীত নাটক মীরা উদ্ধার ও সুরথ উদ্ধার (৭-৮-১[১]) মনোমোহন গোস্বামী: কর্ম্মফল (৭-৮-১১), কুঞ্জবি[হারী] ঘোষাল: মাতৃপূজা (৭-৮-১১); ক্ষীরোদ প্র[সাদ] বিদ্যাবিনোদ: নন্দকুমার ও পলাশীর প্রায়[শ্চিত্ত] (৭-৮-১১); হরিপদ চট্টোপাধ্যায়: দুর্গাসুর (৭-৮-[১১]) ও রণজিতের জীবনযজ্ঞ (৭-৮-১১); অহিভূষণ [চট্টো]পাধ্যায়: সুরথ উদ্ধার (৭-৮-১১); অমরেন্দ্রনাথ [দত্ত] আশা কুহকিনী (১৬-৪-১০) সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু: হ[…] (২১-৬-১০) বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সিপাহী ইতিহাস ১৭ মে ১৯১০ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

অপরাপর বহু পুস্তক পুস্তিকা এই শাসনে কোপ আশ্রয় করতে বাধ্য হয়, তারপর লোপ কয়েকখানি বই সম্বন্ধে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন মনে হয়,—

সোফিয়া বেগম, উপন্যাস, মনীন্দ্রনাথ বসু ২৩

কুমার সিং সংক্ষিপ্ত জীবনী—(১৬-৫-১০); বন্দনা ১ম খণ্ড, পূর্ণচন্দ্র দাস (৮-৮-১০); বন্দনা ২য়, হরিচরণ রায় (৮-৮-১০); রাখী কঙ্কণ (রাজভক্ত আত্মীয় ও বিশ্বাসঘাতকদের হাতে দেশপ্রেমিকের নির্য্যাতন কাহিনী) —গঙ্গাচরণ নাগ (৫-৯-১০); বাঙ্গলায় লিখিত "মায়ো ফিরিঙ্গিকো" (২২-১০-১০), স্বদেশ গাথা—কবিতা—কামিনী ভট্টাচার্য্য, চট্টগ্রাম (৭-৩-১১), অমর কাহিনী—কবিতা—ভুবনমোহন দাশগুপ্ত (৭-৩ ১১); স্বদেশ প্রসঙ্গ (খণ্ড পত্রিকা)—কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ঢাকা (৭-৩-১১), প্রসূন, দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী (৭-৩-১১) প্রভৃতি।

পত্র পত্রিকা, বিশেষ করে 'যুগান্তর', স্বাধীন ভারত, ওঁ বন্দে মাতরম্, মুক্তি মন্ত্র (পণ্ডিচেরী), সোনার বাংলা প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ইংরেজি পুস্তিকা, পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতির প্রচার, আমদানী ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল প্রচুর। এস্থানে সে সকলের উল্লেখ করা অযৌক্তিক বলে মনে হ'লো। এ বিষয় বিশেষভাবে তথ্যানুসন্ধানের বিরাট ক্ষেত্র পড়ে আছে।

দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পণ বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত হলেও এ সময় এর প্রচার নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

পুস্তকের প্রকাশের ওপর বাধা-নিষেধ অর্পণ করে পুলিশ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। ৯ই ডিসেম্বর ১৯০৮ "সন্ধ্যা" পত্রিকায় খবর হ'লো যে পুলিশ গ্রামাফোন রেকর্ড বিক্রেতার ওপর হুকুম জারি করেছে, যে তারা "বন্দে মাতরম্", "আমার দেশ" প্রভৃতি সঙ্গীত ও সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটকের উত্তেজনামূলক অংশের আবৃত্তিসম্বলিত রেকর্ড-বিক্রয় বন্ধ করবে। তা না হ'লে…।

এরই কিছুকাল বাদে নাট্যশালার ওপর হামলা হয়েছিল। ১০জুন ১৯১০ সরকারী আদেশে পুলিশ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সিরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম ও ছত্রপতি শিবাজী, ষ্টারে নন্দকুমার, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও কর্ম্মফল, শ্মশানে বঙ্গ বিক্রম, কোহিনুরে দাদা ও দিদি নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেয়। সখের দলে যখন সমাজ অভিনয় চলছে তখন পুলিশ এসে তাকে বন্ধ করে দিয়েছে, এ বিষয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হ'তে বলা যায়। আর সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় বন্ধ হয়েছে, তার কথা আর উল্লেখ না করলেই চলে।

কাপড়ের পাড়ের ওপরও পুলিশ লক্ষ্য রেখেছিল। ধুতির পাড়েছিল "বিদায় দে মা ঘুরে আসি" আর ১২ই মার্চ্চ ১৯১০ সালে সে ধুতি পরা নিষিদ্ধ করে, সমস্ত ধুতি বাজেয়াপ্ত হয় এবং তাঁতে বোনা বন্ধের আদেশ জারি করে।

বিদেশ থেকে সকল কাগজপত্র আসার ওপর নিষেধ এক কথায় চলতো বৈদেশিক বাণিজ্যের শুল্ক বিভাগ (Sea Customs Act) অনুসারে। নিষিদ্ধ পুস্তক পত্রিকার নাম দিতে গেলে প্রবন্ধর কলেবর আরও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং নিরস্ত রইলাম।

অষ্টবজ্র নয় সহস্র বন্ধনের মাঝে দেশ যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, সে আজ বিলাস, স্বার্থপরতা, অবিবেকিতা, আত্মকলহে সব ভুলে গিয়ে অতীতকে পরিহাস করছে। ফলে ত্যাগী মহাপুরুষদের অভিশাপে নিজেরা মজছে; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশকে মজাতে বসেছে।

———

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

সম্প্রতি দিনকর আবার বাড়ীর বাইরে যাবার অনুমতি পেয়েছেন। সাইকেল রিকশ চ'ড়ে এসে সমুদ্রের ধারে এই দুদিন হ'ল আবার খানিকক্ষণ ক'রে বসে যাচ্ছেন তিনি। নির্মলা ত আসছেই সঙ্গে, দিবাকরও আসছে। সামনের সমুদ্রে নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে পিতার চিত্ত-বিনোদন করছে দিবাকর, দশ বছর আগে যে রকম করত।

সেদিন দিবাকর একপালা সাঁতার কেটে এসে নির্মলাকে বলল, "আজকের জলটা ভারি মিষ্টি, লোনা বলে মনেই হবে না যদি-না দু-এক ঢোঁক খেয়ে ফেলেন। একবারটি নামবেন?"

দিনকর খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বললেন, "কোথাও যাও না, পুরীতে এত দেখবার জিনিষ আছে, কিছু দেখ না; দিনরাত এই বুড়োর কাছে তারই কাজ নিয়ে আছ। এখন ত আমি ভাল আছি, আজ সমুদ্রেও বোটের উপর শান্ত, স্নান ক'রে আরাম পাবে। আর দিবাকর আছে, নুলিয়াদের মতই ভাল সাঁতারু, দেখবে তোমাকে। নেমে পড়।"

ঠিক হ'ল, দিনকরকে বাড়ী পৌছে, তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে নির্মলা ফিরে এসে স্নান করবে সমুদ্রে।

তখন ভাটি বেলা।

একটা ঘন নীল রঙের শাড়ীর আঁচলে গাছকোমর বেঁধে নির্মলা ফিরে এলে একজন নুলিয়া এগিয়ে গেল তার হাত ধ'রে জলে নামাতে। তাকে সরিয়ে দিয়ে দিবাকর তার দিকে হাত বাড়ালে, নির্মলা হেসে বলল, "আপনি আমাকে আনাড়ি ভেবেছেন? আপনার মত এত ভাল সাঁতার কাটতে আমি জানি না কিন্তু জানি। এই দেখুন।" ব'লে ছুটে গিয়ে মাথাটাকে নীচু ক'রে ঢুকে গেল একটা ঢেউয়ের তলায়।

আসলে, এই ক'দিন ব'সে ব'সে দিবাকরের সমুদ্র স্নান খুব মন দিয়ে সে দেখেছে, আর তাই দেখে দেখেই ঢেউয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার কায়দাটা বুঝে নিয়েছে। অবশ্য তার এক পিসীমার বাড়ীর হাওড়েও সে সাঁতার কেটেছে, প্রায় এই জাতের ঢেউ।

নির্মলার পিছন পিছন তৎক্ষণাৎ দিবাকরও ঢুকে গেল সেই একটা ঢেউয়েরই তলায়। ঢেউটার ওপারে গিয়ে ভেসে উঠে জলের দোলার সঙ্গে দুলতে দুলতে দু'জনে হাসছে। পারে দাঁড়িয়ে নুলিয়াও হাসছে।

ঢেউ আর ঢেউ, হাসি আর হাসি। কোথা থেকে যে আসে এত ঢেউ, কোথায় চাপা প'ড়ে ছিল এত হাসি? কতদিন পরে এই রকম ক'রে হাসছে নির্মলা, হাসতে পারছে। বারুণী দীঘিতে সঙ্গিনীদের সঙ্গে সাঁতার কাটা মনে পড়ছে তার, মনে পড়ছে পিসতুত ভাইবোনদের সঙ্গে ঢেউ-ওঠা হাওড়ের জলে সাঁতার কাটা।

আজ বারুণী দীঘি নয়, হাওড়ও নয়, আজ সমুদ্র। আজ সখীরা নয়, পিসতুত ভাই-বোনেরা নয়, আজ...এও এক সমুদ্র।

দুটি সমুদ্রের তরঙ্গ-বিক্ষোভের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত হয়েছে নির্মলা। দিবাকরের পাশে এসে পারের কাছে বসেছে পা মেলে। নুলিয়া দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

নির্মলার নিটোল দুটি পায়ের চাঁপার কলির মত আঙুল-গুলি ছুইয়ে দিয়ে বারবার ফেনার আলপনা এঁকে দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের জল।

ক্লান্তি এবং আবেগে দিবাকরের কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। বলল, "উপরে অসীম আকাশ, সামনে অসীম সমুদ্র, এই দুটি অসীমতাকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাকে যে আমি ভালবাসি, সেই ভালবাসারও সীমা কোথাও নেই।"

চোখের ইশারায় নুলিয়াকে দেখিয়ে নির্মলা বলল, "অন্য কোনো কথা বলুন।"

দিবাকরের মুখে, গলার সুরে একটু বিরক্তির আভাস, বলল, "নুলিয়ারা বাংলা বোঝে, এটা জানা ছিল না।"

নির্মলা বলল, "শুনেছি, দু-ধরণের কথা বুঝতে ভাষা-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না; এক গালাগাল; আর এক, যে-ধরণের কথা হচ্ছিল।"

দিবাকর বলল, "এই বিদেশে সম্পূর্ণ অচেনা একজন নুলিয়া শুনতে পাবে বলে কথাও বলতে পারব না? আচ্ছা থাক, কথার দরকার নেই। চল, তোমাকে সাঁতার শেখাচ্ছি।"

নির্মলা বলল, "না, শিখব না। কি হবে শিখে?"

দিবাকর একমুঠো বালি তুলে জোরে আছড়ে ফেলে বলল, "না, না, না,—তুমি কি আমার কোনো কথাতে হাঁ বলবে না কোনোদিন?"

নির্মলা কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলল, "কি করব? আমি অত্যন্ত নিরুপায় মানুষ, দুঃখী মানুষ।"

দিবাকর বলল, "আর আমার চারপোয়া সুখে একেবারে বান ডেকে যাচ্ছে, না?"

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে নির্মলার দিকে তাকিয়ে থেকে সে আবার বলল, "এই এতক্ষণ ধ'রে তুমি কেবল আমার ছোঁয়া বাঁচাবার চেষ্টা করেছ। আর তা করতে গিয়ে নোনাজল যে কত গিলেছ তা আমি বেশ সহজেই আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু কেন, কি হয় একটু হাতে হাত ঠেকলে?"

খুব খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রে অত্যন্ত নীচু গলায় নির্মলা বলল, "আপনার কিছু হয় না?"

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে দিবাকর? দিতে পারল না ব'লেই রাগ যেন তার বেশী হ'ল। বলল "ঠিক আছে।" তারপর ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল একটা ঢেউয়ের তলায়। তারপর আর-একটা ঢেউয়ের তলায়। তারপর আর একটায়। এই রকম ক'রে তীর থেকে ক্রমশঃ অনেক দূরে চলে যাচ্ছে সে।

কে জানে কি আছে তার মনে? অল্পেতে এত রেগে যায়।

অনেক দূরে, সমুদ্রের জল যেখানে প্রথম কোনোন্মুখ হয়ে উঠবার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে, সেখান থেকে একটা হাত তুলে নাড়ল দিবাকর। কি বলতে চাইল, কে জানে? তারপর আরও এগিয়ে গেল।

যে পূর্ণিমার রাত্রে সমুদ্রে চাঁদ ওঠা দেখে যেতে চান বলেছিলেন দিনকর, সেই দিনই বিকেলের দিকে একুশ বাইশ বৎসর বয়সের একটি ছেলে স্রোতের টানে কোথায় যে ভেসে গিয়েছিল, তার দেহটারও কোনো খোঁজ তারপর আর পাওয়া যায় নি। পোস্টাফিসে সামান্য কাজ করত, বাঙালী ছেলে। সংসারে সে আর তার বছর ষোল সতেরো বয়সের ছোট একটি বোন। অনেক কষ্টে কিছু টাকা জমিয়ে বোনটিকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিল পুরীতে। বোনটির নিষ্পলক চোখদুটিতে নাকি জল ছিল না সে'দিন মাধব দেখে এসে বলছিল।

নির্মলার মনে পড়ছে এইসব আর ভয়ে তার শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসছে। সে জানে, দিবাকর ইচ্ছে ক'রে খুব বড় রকম পাগলামি কিছু করবে না। কিন্তু সমুদ্রের নীচু টান আছে, হাতে-পায়ে খিল ধরে যেতে পারে তার, খুব বেশী স্রোত ঠেলতে হলে বেদম হয়ে যেতে পারে সে, তাছাড়া পুরীর সমুদ্রে দু-একটা হাঙরও ত মাঝে মাঝে এসে হাজির হয়?

কি করবে সে? নুলিয়াদের বলবে কি? কিন্তু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দিবাকরের সাঁতার কাটা দেখে ওরা ত বেশ হাসতে হাসতে চলে গেল। দিবাকরের যে কোনো বিপদ্ হয়েছে বা হতে পারে, সেকথা ত মনে হয় এরা কানেই তুলবে না।

অসহায়তায় কান্না পাচ্ছে নির্মলার। কোলে মুখ গুঁজে বালির ওপর ব'সে পড়ল সে।

একবার মুখ তুলে দেখল, অনেক দূরে জলের উপরে দিবাকরের মাথাটাকে ছোট একটি কালো বিন্দুর মত মনে হচ্ছে। থেকে থেকে জলের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে বিন্দুটা, আবার কিছুক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

সূর্য্য পাটে নাবছেন পশ্চিম আকাশে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে চারদিক্ আবৃত হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ সেই কালো বিন্দুটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। অপেক্ষা ক'রে ক'রে একসময় একটু শব্দ করেই নির্মলা কেঁদে উঠল।

দিবাকরের খুব যে রাগ হয়েছিল সেটা ঠিকই, কিন্তু খানিকক্ষণ সাঁতার কেটেই রাগটা পড়ে গেল তার। মনে হতে লাগল, আহা বেচারি, নিশ্চয় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ ভীষণ ভয় পেল সে নিজে। পিছনে তাকিয়ে তার স্পষ্ট মনে হ'ল, আরো কে একজন সাঁতার কেটে তার দিকে আসছে। যদি নির্মলা হয়? যদি কেন, নিশ্চয়ই নির্মলা। বালু বেলার উপর তাকে ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? দীঘি-পুকুরে সাঁতার কাটা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটা এক জিনিষ নয়। ওর বিপদ্ হওয়া অনিবার্য্য। দিবাকর ফিরল। সাঁতারের বেগ বাড়িয়ে দিল যতটা তার শক্তিতে কুলোয়।

যখন আর প্রায় এগোতে পারছে না, হাত পা অবশ হয়ে আসছে, তখন আবছা অন্ধকারে ভাল করে নজর করে দেখল, নির্মলাকে যেখানে সে রেখে গিয়েছিল, সেইখানেই বসে আছে। আর একজন কেউ যে সাঁতার কেটে আসছে ভেবেছিল, সেটা তার ভুল। আধ অন্ধকারে বালুবেলা বেশ সাদাই দেখাচ্ছে আর সেই জন্যেই তার উপর মানুষের কালো কালো মূর্ত্তিগুলি স্পষ্ট হয়েই চোখে পড়ছে।

ক্লান্ত শরীরটাকে বিশ্রাম দেবার জন্যে চিৎ সাঁতারে ভাসতে ভাসতে চক্রতীর্থের দিকে চলে গেল সে।

তখন অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। সমুদ্রের ধারে জনপ্রাণী নেই। নির্মলার পরনের ভিজে শাড়ীটা শুকিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, তারই আঁচল মুখে চাপা দিয়ে কাঁদছে। বালুর উপর দিয়ে নিঃশব্দে দিবাকর কখন যে পিছন দিক্ দিয়ে এসে তার পাশে বসেছে, তা বুঝতে পারেনি নির্মলা। যখন বুঝল, তার মাথায় পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দিবাকর। কান্না যেন এরপর আরোই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দিবাকর বলল, "এমন করে যে ধরা পড়ে গেলে, এখন কি হবে?" তখন আত্মসংবরণের চেষ্টা করতে লাগল সে।

দিবাকর বলল, "আমার যা জানবার ছিল তা যদিও আমার জানাই হয়ে গিয়েছে, তবু জিজ্ঞেস করছি, বল, আমায় ভালবাস তুমি? আজ আমাকে 'তুমি' বলে একথার জবাব দিতে হবে, 'আপনি' বলতে পাবে না।"

হাসি ও কান্না গঙ্গাযমুনার মত একসঙ্গে বয়ে এসে মিলছে নির্মলার মুখেচোখে। মাথা নীচু করে খুব নীচু গলায় বলল, "তুমি ত জানো।"

গভীর করুণা দেখানো সমাদরে তার একটি হাতকে নিজের হাতে টেনে নিল দিবাকর, তারপর অন্য হাতে তার চিবুকটি যখন তুলে ধরতে গেল তখন মুখটা সরিয়ে নিল নির্মলা, মাথা নেড়ে জানাল, 'না'।

দিবাকর বলল, "ঠিক আছে। একসঙ্গে বেশী লোভ করব না। সবচেয়ে বেশী যা পাওয়ার মত জিনিষ, তা যখন আমার পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তখন ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা শক্ত হবে না।"

চব্বিশ

জগন্নাথ এসে দাঁড়িয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে। যতটা আগে দেখতে পাওয়া যায় যাত্রীকে দেখতে যখন পেল, কামরাটার পাশে পাশে ছুটতে লাগল সে। ছুটল যতক্ষণ না থামল গাড়ীটা।

দিবাকর কিছুদিন আগেই ফিরে এসেছিল কলকাতায়, সেও এসেছে ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে।

নির্মলা সাবধানে গাড়ী থেকে নামছে দিনকরের হাত ধরে। দিবাকরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল জগন্নাথ। বলল, "মাসী!"

অল্প একটু হাঁপাচ্ছে সে, আর সেইসঙ্গে তার সেই ঝকঝকে হাসিটি হাসছে।

দিনকরের হাত ধরে এগিয়ে যেতে যেতে নির্মলাও হেসে বলল, "কেমন আছ জগন্নাথ?"

জগন্নাথ তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "খুব ভাল আছি মাসী। তুমি?"

নির্মলা বলল, "ভাল।"

তারপর তাদের আর কোনো কথা হ'ল না।

দিনকরকে গাড়ীতে তোলা, বসানো, এসব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নির্মলা। দিবাকর ব্রেক-ভ্যান থেকে মালপত্র নামিয়ে আনার পর ঠিক হল, দিনকরকে বাড়ী পৌঁছে নির্মলাকে সে নার্সিং-হোমে রেখে আসবে। জগন্নাথ হাত লাগাল ব'লে মালপত্র খুব সহজে গাড়ীর লগেজ বক্সে উঠে গেল। কিন্তু তাকে কি ক'রে, কি ব'লে সঙ্গে নিতে পারা যায় কিছুতেই ভেবে পেল না নির্মলা।

সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন মানুষের সঙ্গে তার মাসী চলে গেল গাড়ী চ'ড়ে, সে পড়ে রইল পিছনে।

কিরকম হ'ল ব্যাপারটা কিছুই যেন বুঝতে পারছে না জগন্নাথ।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, অনেকক্ষণ সেইখানটাতেই সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলে গেল শেয়ালদার বাসের সন্ধানে।

জগন্নাথের থালায় ডালের সঙ্গে মুড়মুড়ে করে ভাজা ছোট ছোট কয়েকটি ডালের বড়া দিয়ে শৈল বৌঠান বললেন, "দেখা হল?"

জগন্নাথ একটা বড়া মুখে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, "হ্যাঁ।"

"কিরকম দেখতে হয়েছে?"

"একই রকম ত দেখলুম।"

"একটু বড়-সড় দেখতে হয়েছে, না সেই আগের মত খুকীটিই আছে।"

"তা মাথায় একটু বড় হয়েছে হয়ত।"

"একদিন নিয়ে আসবে, দেখব?"

জগন্নাথ অত্যন্ত করুণ করে হাসল একটু। অবশ্য মাসীকে তারক নিরঞ্জনদের পরিবেশে নিয়ে আসতে সে নিজেও খুব আগ্রহী নয়। শৈল বৌঠান মনে মনে বললেন, তুমি ঐ মেয়েকে পারবে কোথা থেকে? আমার অমন ছেলে যে নিরঞ্জন সে-ই বলে পারল না। তারপর তাঁর বহু প্রশংসিত মাছের ঝোলের বাটিটি এনে রাখলেন জগন্নাথের থালার পাশে।

নির্মলা জগন্নাথকে আসতে বলতে ভুলে গিয়েছিল। তার কারণ আর কিছুই নয় কিরকম যেন তখন সব গুলিয়ে গিয়েছিল তার। সেই কথা মনে করে নিজের ত্রুটির জন্যে নিজেকে তিরস্কার করতে করতে দুতলার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিল সে, এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল জগন্নাথ, আর তার পিছন পিছন এল শান-ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে মলিনা।

নির্মলা উঠে গিয়ে মলিনার হাতদুটি ধরল। বলল, "কিছু মনে করবেন না ভাই, কিন্তু আমার এই বোনপোটি অনেকদিন পরে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে, অনেক কিছু কাজের কথা বলবার আছে তার সঙ্গে। আপনি আর কোনো এক সময় আসবেন?"

জগন্নাথের মনে একটু অভিমানের কুয়াশা যা জমা হয়েছিল, যেন ফুৎকারে উড়ে গেল এরপর।

বারান্দায় দুরূপার ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এসে জগন্নাথকে বসিয়ে নির্মলা নীচে গিয়ে তার জন্যে টোস্ট-মাখন, ডিমভাজা, দুটি রসগোল্লা আর কফি নিয়ে এল।

নির্মলাদের দুতলার বারান্দার পর্দাটানা কপিকলটা একটু খারাপ হয়ে গিয়ে পর্দাটা বাঁকা হয়ে ঝুলছিল। জগন্নাথ দেখতে পেয়ে তৎক্ষণে সেটাকে ঠিক করে ফেলেছে।

জগন্নাথ খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মাসীকে দেখছে।

নির্মলা বলল, "ওখানে খেতে পেতে পেট ভ'রে?"

জগন্নাথ বলল, "কোথায়? জেলে? সে-সব বাঁধা

মরাদের খাবার, খেয়ে শেষ করা যায় না। বরং কম খেলেই রিপোর্ট করে।" বলে সে হেসে উঠল।

তার হাসির শব্দ শুনে সুনন্দা বেরিয়ে এল তার ঘর থেকে। বলল, "এ কে ভাই?"

নির্ম্মলা বলল, "এর কথা তোমরা শুনেছ। এর নাম জগন্নাথ।"

টানাটানা দুটি চোখে জগন্নাথকে ভাল করে দেখে নিয়ে সুনন্দা চ'লে গেল। ভাবতে ভাবতে গেল, ছেলেটা বেশ ত দেখতে।

তার যাওয়ার পথের দিকে একবার দেখে নিয়ে নির্ম্মলা বলল, "ওখানে খুব কষ্ট হ'ত, না জগন্নাথ?"

জগন্নাথ হাসিমুখেই বলল, "কষ্ট মনে করলেই কষ্ট। তোমাদের দেখতে পেতুম না, এই এক, আর সন্ধ্যে হতেই তালা বন্ধ ক'রে রেখে দিত, এইটে ভাল লাগত না। তা-না হলে কি আর এমন? অবিশ্যি খুব কষ্ট হ'ত যখন দেখতুম স্বদেশী বাবুরা দলে দলে আসছে, তাদের কত হাসি গান, হৈ-হল্লা, দিলে বটগাছটার মাথায় চরকা আঁকা নিশান উড়িয়ে। ভাবতুম, সেই জেলেই এলুম, এদের মত দেশের জন্যে কিছু ক'রে কেন এলুম না। তারপর ভাবলুম, ছাড়া ত পাই, তারপর মাসী যদি স্বদেশী করে ত আমিও স্বদেশী করব, ক'রে আবার জেলে আসব।"

নির্ম্মলা বলল, "আমাকে দিয়ে ওসব হবে না জগন্নাথ।"

জগন্নাথ বলল, "তা'লে আমাকে দিয়েও হবে না মাসী। আমরা একসঙ্গে পথে বেরিয়েছিলুম না, যাব যেদিকে দু-চোখ যায় ব'লে?"

নির্ম্মলা গম্ভীর হয়ে গেল।

নির্ম্মলার ঘরটার দিকে চোখের ইশারা ক'রে জগন্নাথ বলল, "তোমার ঘর মাসী?"

নির্ম্মলা বলল, "হ্যাঁ।"

"দেখব?"

"দেখ।"

ঘরের ভিতরে গেল না জগন্নাথ। উঠে গিয়ে বাইরে থেকে খোলা দরজায় দেখল, ছোট ঘরটিতে সুন্দর করে সাজানো ছোট ছোট আসবাব-পত্র, জানলায় লেসের পর্দা, ঝালর ঝুলান কমলা রঙের শেড দেওয়া আলো, ধবধবে সাদা ছোট্ট পাখা, ছোট খাটের বিছানাটি কমলা রঙের বেড-কভারে ঢাকা। তারপর ফিরে এসে বসল আবার মোড়ায়। বলল, "তুমি আর চেতলার বাড়ীটাতে ফিরে যাবে না, না মাসী?"

নির্ম্মলার দুই চোখে অপরিসীম করুণা। বলল, "গেলেই সুধাকান্ত আবার আসবে ত?"

জগন্নাথ বলল, "তা—'লে আবার জেলে যাব মাসী। আরো-কিছু বেশীদিনের জন্যে।"

নির্ম্মলা বলল, "সেইটে চাইনে বলেই ত ভাবছি কি করা যায়।"

জগন্নাথের বুকটা একটা দীর্ঘশ্বাসে ভার হয়ে উঠল, বলল, "মাসী, তুমি এইখানে রয়েছ,—আমার যেন তেমন ভাল লাগছে না।"

"কেন জগন্নাথ?"

"এই একটা ব্যাধোর আড্ড, কতরকমের কত রোগ নিয়ে লোকরা আসে এখানে, তাদের কত রকমের কাজ তোমাকে করতে হয়।"

নির্ম্মলা বলল, "রোগ হলে মানুষ কত দুঃখ পায়, অসহায় শিশুর মত হয়ে যায়; তখন তাদের কেউ যদি না দেখে, সেবা করে, তাদের কি দশা হয় বল ত? কি দশা হয় ছোট ছোট বাচ্চাগুলির, যদি তাদের মায়েরা তাদের না দেখে?"

জগন্নাথ বলল, "আমি কিন্তু জমির খোঁজ করছি মাসী।"

নির্ম্মলা বলল, "তা ত করবেই। গাড়ী মেরামতের কাজ আরম্ভ করেছ ত?"

জগন্নাথ বলল, "না মাসী। জমির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি সারাক্ষণ, আর কিছু করবার সময় কোথা? এখন থেকে একটা বাড়ীরও খোঁজ করব।"

নির্ম্মলা বলল, "কর, কিন্তু আমাকে না বলে আগে-ভাগেই যেন ভাড়া নিয়ে ব'সো না। অনেক কিছু দেখতে হবে, ভাবতে হবে।"

এই সময় সুনন্দা এসে বলল, "তোমার সুচ-সুতোটা

একটু বেধে তাই? না হয় আমি বলছি, এই জামাটার গলার কাছটা তুমিই একটু টেঁকে দাও।"

কথা বলতে বলতে টানাটানা চোখে জগন্নাথের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে সে।

জগন্নাথ বলল, "আমি তাহলে এখন উঠি।"

সুনন্দা বলল, "না, না। সে কি? তোমাকে উঠতে হবে কেন? তুমি বোস না?"

কিন্তু জগন্নাথ বসল না। মাসীর কাছে একলা বসতেই সে অভ্যস্ত, তা না হলে ভাল লাগে না তার।

সে নেমে যাবার ছুমিনিটের মধ্যে মলিনা উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে।

নির্মলা বলল, "কোথায় ছিলেন?"

মলিনা জগন্নাথের ছেড়ে যাওয়া মোড়াটায় বসল। বলল, "ডুগা খাইয়া আইলাম আপনাগো কেন্টিনে বইলা।"

সুনন্দার সঙ্গে মলিনার বনে না ভাল। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ দুজনে। জামাটা টাঁকা হয়ে যেতেই উঠল সুনন্দা। নির্মলার ইচ্ছে তাকে বসিয়ে রাখে, বলল, "তোমার ত ডিউটির সময় এখনো হয়নি ভাই, খানিকক্ষণ ব'সে যাও না?"

সুনন্দা বলল, "সে কি? এমন একটি রুগীর ভার নিয়েছি, যে পণ ক'রে ব'সে আছে, খাবে না কিছু। কি, না, খেলেই তার আবার মেয়ে হবে। তিন-তিনবার তাই হয়েছে, বাপের বাড়ী গিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি গিলে। এবারে তার ছেলে চাই। দেখি চায়ের সঙ্গে গ্লুকোজ কতটা তাকে খাওয়ানো যায়।"

ব'লে সে চ'লে গেলে, মলিনা তার এক ডাক্তারদার গল্প করল ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে। ফেরারী হয়ে ইনি দুবৎসর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাংলা, বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব চষে বেড়াচ্ছেন। কোথায় এক দলের সঙ্গে ডাকাতি করতে গিয়ে দুহাতে দুটো রিভলবার নিয়ে গুলি চালাতে চালাতে পালিয়েছিলেন।

বলল, "ডাক্তার কইলাম তিনি না। কইতে আছি ডাক্তারদা, ঐ নামেই তিনিরে ডাকি আমরা।"

অনেকেরই ঠিক নামটা এরা জানে না, জানে না প্রায় কোনোই পরিচয়। এইরকম করেই চলে এদের। একজন মানুষের নাম জানে কেবল আর একজন মানুষ, যে তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে ব'লে বুঝিয়ে এনেছে এই পথে, নয়ত দুজন, বা বড়জোর তিনজন মানুষ। যাতে একজন ধরা পড়লে দলসুদ্ধকে নিয়ে টান না পড়ে।

এই আলোচনার সূত্রে জেনে নিল নির্মলা, তার সঙ্গে মলিনার যে কথাবার্তা চলছে সেটা মলিনা আর তার ডাক্তারদা ছাড়া আর কেউ জানে না।

জানতে এরা দেয় না। হয়ত দশজন লোক এক সঙ্গে কোথাও এসে জোটে কোনো একটা কাজের জন্যে, কাজ হাঁসিল ক'রে ফিরে যায় যে-যার জায়গায়, কেউ জানতে পারে না, জানবার দরকারও হয় না, সঙ্গীদের কে কোথা থেকে এসেছিল।

অন্ধকার হয়ে আসছে, নির্মলা উঠে গিয়ে আলো জ্বালতে পারত তার ঘরে, কিন্তু উঠল না।

মলিনা বলল, "এইবার একটা কুকীর্তি করুন।"

যে-কারণে নির্মলা উঠে আলো জ্বালেনি, সেই কারণেই কথাটা শুনেও চুপ করে রইল। আলোচনাটাকে আর অগ্রসর হতে দিতে ভয় হচ্ছে তার।

মলিনা বলল, "আজ কত তারিখ?"

"চব্বিশে নভেম্বর।"

"আর ঠিক একমাস। বড়দিনের সময়। করুন একটা বড় কুকীর্তি।"

"কি সেটা?"

"দেখবেন-অনে। আপনেরে ত লগে লইয়াই যামু।"

"আমাকে কেন?"

"এখন কমু না। আপনে বা ডরক। শুনলে ঘাবড়াইয়া যাইবেন গিয়া।"

"আমাকে নিয়ে যাবেন না। আমি কোনো কাজেই লাগব না আপনাদের। দয়া ক'রে ছেড়ে দিন।"

মলিনা মোড়া ছেড়ে উঠল। মুখের হাসিটি খুবই মলিন তার তখন; অন্ধকারে দেখতে পেল না নির্মলা।

খুবই নীচু গলায় বলল, "আমরা হইলাম গিয়া যারে কয় যমদূত। একবার ধরছি যেইকালে—"

এরপর মলিনাকে উঠতেই হল। চাকর এসে খবর দিল, দিবাকর এসেছে।

মলিনার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নেমে এল নির্মলা। ভয় পাবার ক্ষমতাও যেন তার ক্রমশঃ কমে আসছে। ভাবতেও আর ভাল লাগছে না। অবশ্য সে যদি না যায়, মলিনা কিছু পাঁজাকোলা করে তাকে নিয়ে যাবে না।

পুরীতে খুব জাঁক ক'রে ব'লে এসেছিল দিবাকর, ধৈর্য্য ধ'রে অপেক্ষা করা তার পক্ষে শক্ত হবে না। ধৈর্য্যের পরীক্ষা সে দিয়ে চলেছে, কিন্তু সেটা খুব সহজ হচ্ছে না।

দিনকর পুরী থেকে বেশ অনেকটাই সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। মুখ্যতঃ সেই কারণে, এবং হয়ত আরও কোনো কোনো কারণে সুজন বলেছেন, নির্মলা এখন আর প্রত্যহ দিনকরকে দেখতে যাবে না। নিজের সুবিধা সুযোগ মত মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবে। তবে অবশ্য যখনই দিনকর তাকে ডেকে পাঠাবেন, যাবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? দিন-পনেরো কাটল। দুবার তার মধ্যে নির্মলা গিয়ে দেখে এসেছে দিনকরকে। প্রেশার ভাল, সব-কিছু ভাল। কিন্তু তার পরেই দিবাকর নানা ছুতোয় আসছে।

প্রথমেই বলে নিয়েছে, "আচ্ছা, আমার বাবার স্বভাবটা এতদিনে খানিকটা ত আপনি বুঝতে পেরেছেন? আপনাকে ডেকে পাঠানো দরকার মনে হলেও তিনি ডাকবেন, এটা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?"

কাজেই কখন যে নির্মলাকে তাঁর দরকার সেটা ঠিক করবার ভার সে নিজে নিয়েছে। তার ফলে দরকারটা একটু ঘনঘন হচ্ছে।

কোনোদিন এসে বলে, "উনি আর আপনাদের ওষুধ খেতে চাইছেন না। বলছেন, হোমিওপ্যাথি করাবেন। আপনি এসে ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?"

কোনোদিন বলে, "এতদিন আপনি ছিলেন কাছে, পারি-জাতের কথা একবারও বলেননি। কাল থেকে কি হয়েছে তাঁর, কেবল তারই কথা বলছেন। আপনি চলুন।"

দিবাকরের পাশে বসেই সে যায় আসে। কিন্তু দুজনের মধ্যে এখন মন-জানাজানি হয়ে যাওয়ার আড়াল। জানাজানি না-হওয়ার আড়ালের চেয়ে যেটা অনেক সময় অনেক বেশী দুর্ভেদ্য।

দিবাকর বলে না কিছু, ভেবে পায় না কি বলবে। নির্মলাও ভেবে পায় না কি বলবে। নীরবেই আসা-যাওয়া চলে ওদের।

কেবল, রোজ রাত্তিরে একটা দেড়টা অবধি দিবাকর অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের দীঘির ধারের বাগানে। আর এদিকে নির্মলা রোজই খানিকটা কান্নাকাটি ক'রে তারপর শুতে যায়।

সুনন্দার একদিন ডিউটি প'ড়ে গেল বলে বলতে পারল না, যাবার সময় বলে গেল, "ভুল ক'রে যাচ্ছ। কান্না দেখতে ওরা চায় না। ওরা হাসি দেখতে চায়।"

সুরূপা বলল, "ভাল যে বাস ছেলেটাকে, সে ত বুঝতেই পারছি। আর সে খুব বেশী ভালই বাসে তোমাকে তাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এ জিনিষটা আনন্দের না হয়ে এত দুঃখের কেন যে হচ্ছে, একটু যদি তা বুঝতে পারি। অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তোমার জন্যে একটু যে প্রার্থনা করব তারও প্রায় জো নেই। কি বলব ভগবানকে ডেকে?"

নির্মলা বলল, "আমার জন্যে ভগবান্‌কে ডেকে কিছু বললেই তিনি শুনবেন তুমি ভাবো?"

সুরূপা বলল, "তুমি ভাবো শুনবেন না?"

"না।"

"কেন?"

"কোনোদিন শোনেননি ব'লে।"

পরদিন ভোরে নির্মলাকে যখন একলা পেল, সুরূপা বলল, "ভগবান্‌কে বলবার কথা খুঁজে পেয়েছি।"

নির্মলা বলল, "তাই বুঝি?"

সুরূপা বলল, "হ্যাঁ। বলেছি, হে ভগবান্, ওর যে কি দুঃখ তা জানি না, কি যে ও চায় তা জানি না, কিন্তু আমি চাইছি, তোমার উপর ওর নির্ভর ফিরে আসুক।"

খানিকক্ষণ নীরবে কাটল। কখন এক সময় দুটি জলের ধারা নেমে এল নির্মলার দু গাল বেয়ে।

সেদিন সন্ধ্যায় জগন্নাথ যখন এল, তার উস্কোখুস্কো চুল, চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা। তার কপালে হাত দিয়ে দেখল নির্মলা, বেশ গুছিয়েই জ্বর এসেছে। বলল, "কি করছ তুমি নিজেকে নিয়ে বল দেখি? জ্বরটি কি ক'রে বাধিয়েছ?"

জগন্নাথ হাসল, বলল, "তা ত জানি না মাসী।"

"লোকের হাড় জালানো ছাড়া আর কি জানো তুমি। শৈল বোঠানদের ওখানে কোথায় শোও? ছাতে?"

"হ্যাঁ মাসী।"

"বুঝেছি। আর বলতে হবে না। শীত পড়েছে বেশ, সে খেয়াল আছে?"

একথায় জবাবে জগন্নাথ আবার হাসল একটু।

নির্মলা বলল, "আবার হাসি হচ্ছে, লজ্জাও নেই।"

সুনন্দা ঠিক সেই সময়ে ফিরল ডিউটি থেকে। বলল, "কি হয়েছে নির্মলা? বকছ কেন ওকে?"

নির্মলা বলল, "দেখ না, ১০৪-এর কম জ্বর নয়, তাই নিয়ে বেড়াতে এসেছেন ছেলে।"

সুনন্দা বলল, "অসুখ নিয়ে নার্সিং-হোমে এসেছে, ভালই ত করেছে। বেড়াতে এসেছে ভাবছ কেন? ওকে কোথাও নিয়ে শুইয়ে দাও।"

নির্মলা বলল, "কোথায় নিয়ে যাব?"

সুনন্দা একটু ভেবে নিয়ে বলল, "আমাদের ছাতের সিঁড়ির ঘরটায় থাকতে দিতে পার।"

নির্মলা বলল, "সুরূপাদির আপত্তি হয় যদি?"

সুরূপা শুনে বলল, "সিঁড়ির ঘরটা ত আমাদের কোনো কাজেই লাগে না। সেখানে ওকে রাখবে, এতে আমার আপত্তির কি থাকতে পারে? তবে ডাক্তার সান্যালকে একটু ব'লে রাখা বোধহয় ভাল।"

সুজনকে বলাতে তিনি বললেন, "জগন্নাথ ত আমাদের নিজের লোক। ওকে ঐ এক চিলতে চিলে কোঠায় কেন রাখবে? আমি ওর জন্যে একটা ফ্রি বেড-এর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি দাঁড়াও।"

কিন্তু দেখা গেল, চিলে কোঠাটাই বেশী পছন্দ জগন্নাথের।

সিঁড়ির ঘরটা নামেই ঘর, তবে একটা লোক হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে পারে সে-পরিমাণ জায়গা তাতে আছে। সেইখানে রয়ে গেল জগন্নাথ। নার্সিং-হোম থেকে বিছানা বালিশ এল তার জন্যে। তার শুশ্রূষার ভার নির্মলা, সুরূপা ও সুনন্দা ভাগাভাগি ক'রে নিল। তবে শুরুতে বেশ বড় একটা ভাগ নিতে হ'ল সুনন্দাকে, কারণ অবস্থা গতিকে অন্য-দুজনের এ সময়টা অবসর খুব অল্প।

জগন্নাথ যখন আশা ক'রে থাকে, তার মাসী আসবে, তখন উদ্ধত যৌবনকে সারা দেহে আন্দোলিত ক'রে চলে আসে সুনন্দা। জগন্নাথের মুখটা যে একটু কালো হয়ে যায়, যৌবন-গর্ব্বিতা সুনন্দার সেটা খুব বেশী করেই চোখে পড়ে। সে বলে, "কি? কি হ'ল? মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন?"

জগন্নাথ লজ্জা পেয়ে মুখে একটু হাসি এনে বলে, "না, কিছু না।"

সুনন্দা বলে, "এমন মাসী-অন্ত প্রাণ ছেলে যদি কোথাও দেখেছি। মাসী আসবে, আসবে, একটু পরেই আসবে। এখন এই ওষুধটুকু খেয়ে নাও দেখি?"

ওষুধ খাইয়ে, জল খাইয়ে, তোয়ালেতে যত্ন ক'রে তার ঠোঁটদুটি মুছিয়ে দিয়ে তার বিছানার পাশে বসল সুনন্দা। কপালের একটা দিক্ বারবার হাত দিয়ে চাপছিল জগন্নাথ। সুনন্দা বলল, "একটু হাত বুলিয়ে দেব?"

জগন্নাথ সঙ্কুচিত হয়ে বলল, "না, না, থাক," সঙ্গে সঙ্গেই ভাবল, যদি কেউ দিত মাথাটা টিপে ত মন্দ হত না।

সুনন্দা বলল, "থাকবে কেন? দিচ্ছি হাত বুলিয়ে। আমাদের এই ত কাজ।"

খানিকক্ষণ পর জগন্নাথ ভাবছে, না, এ দেখছি নিজের কাজটা বেশ ভালই শিখেছে। কি রকম মিষ্টি করে হাত

বুলোচ্ছে দেখ না। যন্ত্রণাটা যেন মুছে নিচ্ছে হাত দিয়ে। মাথাটা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে আমার।

কিন্তু সুনন্দার ঠিক সুবিধা হচ্ছে না। জায়গা কম। উবু হয়ে ব'সে ছিল কিন্তু তাই করতে গিয়ে দু-পায়ের গোড়ালির কাছে ব্যথা ধরে গিয়েছে তার। অগত্যা জগন্নাথের বুকের পাশ ঘেঁষেই বসতে হ'ল তাকে।

একটু পরে সুনন্দা বলল, "সিঁড়ির আলোটা তোমার চোখে লাগছে, দরজাটা ভেজিয়ে দিই দাঁড়াও।"

আলোটা সত্যিই জগন্নাথের চোখে লাগছিল।

ফিরে এসে সুনন্দা আগেরই মত তার বুকের কাছে ঘেঁষে বসল। তারপর তার মাথায়, কপালে, গালে, ঘাড়ে, কাঁধের কাছটায়, পিঠের শিরদাঁড়ার উপরে কি সুন্দর করেই না হাত বুলোচ্ছে। কখনো হাতটাকে কাঁপাচ্ছে, কখনো টিপুনিতে একটু লাগিয়ে দিচ্ছে। এরা জানে কখন কি করতে হবে, এদের ত এই কাজ। যখন পিঠের দিকে হাত বুলোচ্ছে তখন সুনন্দার সুগন্ধি শীতল নিঃশ্বাস মাঝে মাঝে এসে পড়ছে জগন্নাথের জরতপ্ত কপালে। ঘুম জড়িয়ে আসছে জগন্নাথের চোখে।

আর একটা মানুষের এতখানি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সচকিত হয়ে একবার উঠে বসতে চাইল জগন্নাথ, কিন্তু সুনন্দা উঠতে দিল না তাকে। দুর্ব্বল শরীরে উঠে বসা তার বারণ।

অবস্থাটা ক্রমশঃ সয়ে গিয়ে সহজ হয়ে আসতে থাকে।

পঁচিশ

সুজন ডাক্তারের ফ্ল্যাটের পাশের যে ফ্ল্যাটটিতে নির্ম্মলার ডিউটি, সেটিতে একটি মাঝবয়সী মাড়োয়ারী মহিলা বুকের ক্যানসার অপারেশন করাতে এসে ছিলেন কিছুদিন। অপারেশনের পর তিনি এত ভুগছিলেন যে তাঁকে নিয়ে আহার নিদ্রা লোপ পেয়ে গিয়েছিল নির্ম্মলার। জগন্নাথ যেদিন জর নিয়ে এল, তার দিন-তিনেক পরেই তিনি খানিকটা সুস্থ হয়ে বাড়ী চলে গেলেন। ফ্ল্যাটটিতে অন্য রোগী যতদিন কেউ না আসছে ততদিনের জন্যে সুজনকে বলে নিজের কাজ অনেকটা হাল্‌কা ক'রে নিল নির্ম্মলা। নিয়ে সারা দিন রাত জগন্নাথের পরিচর্য্যায় নিজেকে নিয়োজিত ক'রে রাখল। জগন্নাথের জেলে যাওয়া নিয়ে তার মনে যে অপরাধ-বোধ ছিল খানিকটা, ঐ করে সেটা অনেকখানি প্রশমিত হ'ল।

জগন্নাথ একদিন শুকনো মুখে হেসে বলল, "জেলে থাকতে এত ক'রে আসতে বললাম, একদিনও এলে না। তার শাস্তিটা কেমন পাচ্ছ এখন দেখছ ত মাসী? দিনে দশবার এসে দেখতে হচ্ছে।"

তা হোক, নির্ম্মলা যা করছে খুব খুশী হয়েই করছে। তার একমাত্র দুঃখ এই যে দিবাকর কয়েকবারই এসে ফিরে ফিরে গেছে। নির্ম্মলা বলেছে, "বাড়ীতে একটা অসুস্থ মানুষের ভার নিয়ে রয়েছি, তার অসুখের খুব বাড়াবাড়ি চলছে। এ সময়টা ওর কাছ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। যাক আর কয়েকটা দিন, ও একটু সেরে উঠুক।"

অসুস্থ মানুষটিকে সেদিন দুমিনিটের জন্যে হাওড়া স্টেশনে দেখেছিল দিবাকর। সেই থেকে তাকে নির্ম্মলার পেয়ারের ভৃত্য জাতীয় একটি জীব বলে মনে মনে ধরে রেখেছে। যে কারণেই হোক, দিবাকরের সঙ্গে সেদিন জগন্নাথের পরিচয় করিয়ে দেয়নি নির্ম্মলা। হয়ত ভেবেই পায়নি কি বলে পরিচয় দেবে।

দিবাকর ভাবছিল, হ'লই বা মানুষটা ভৃত্য জাতীয়, রোগী ত বটে? এরা সেবিকা, সেবাই এদের ব্রত। কার সেবা করছে সেটা বড় কথা নয়, সেবাতে সে-মানুষটার প্রয়োজন আছে কি না সেইটেই বড় কথা। ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু মনে কোনো অভিযোগ নিয়ে যাচ্ছিল না।

ফিরে যে যাচ্ছিল না, সে হ'ল মলিনা। সেও সেবিকা, যখনই আসছিল সেবার কাজে দক্ষতার সঙ্গে নির্ম্মলাকে সাহায্য করছিল সে। তাই তাকে চলে যেতে বলা সম্ভব ছিল না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তার কাজের মধ্যে মধ্যে তার অজস্র কথা, তার ডাক্তারদার নানারকম দুঃসাহসিকতার গল্প, তার নিজের গান, আবৃত্তি ইত্যাদি নির্ম্মলাকে শুনতে হচ্ছিল।

তর্ক করতে সে পারে না। মলিনা যা বলে তার মধ্যে তর্ক করবার মত কিছু সে পায়ও না। এক জায়গায় মানুষটা সে অত্যন্ত খাঁটি বলে এটা তাকে মানতেই হয় যে, দেশের কাজে প্রাণ দেবার মত সাহস যাদের আছে, প্রাণ তাদের দেওয়াই উচিত।

কিন্তু সে সাহস তার নেই যে!

এটা ঠিক যে শিকারীতে তাড়া করা জন্তুর মত নিরন্তর একটা আতঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকতেও আর তার ভাল লাগ'ছিল না। এই দিনের পর দিন একটানা ভয় পাওয়াতেও এক-একবার তার ক্লান্তি ধরে যাচ্ছিল, ইচ্ছে করছিল, মৃত্যুর সঙ্গে আপোষ করে নিয়ে মলিনার মত নিরাসক্ত, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হয়ে যেতে। কিন্তু মনের এই ভাবটাকে বেশীক্ষণ ধরে থাকতে সে পারে না, তার কারণ তার ছোট মনটি জুড়ে রয়েছে বেঁচে থাকবার দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ। মৃত্যু সারাক্ষণ তার পথে ছায়া ফেলছে বলে হয়ত সে আগ্রহটা আরও বেশী জোরদার হয়েছে তার স্বভাবে। যেন বেঁচে থাকবার জেদ চেপেছে তার মনে। যে জন্তে এমন চিন্তাও তার থেকে থেকে মাথায় আসে, প্রাণটা যদি দিয়েই দিলাম ত তারপর দেশের কি হ'ল না হ'ল তাতে আমার এসে যাবে কি? আমি ত আর তা দেখতে আসব না?

জগন্নাথের জ্বর যেদিন ছেড়ে গেল সেদিন বিকেলে দিবাকরকে বসিয়ে গরম গরম কুচো নিমকি সহযোগে চা খাওয়াল নির্ম্মলা, গল্প করল অনেকক্ষণ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের হিংসাত্মক কাজও চারদিকে হয়ে চলেছে সে-সময়, তাই সে-সব কথাও স্বভাবতঃই ঘুরে ঘুরে এল। সন্ত্রাসবাদ না গান্ধীবাদ, কোন্ পথ ধরে যাবে এ দেশের মানুষ।

দিবাকর বলল, "পরমহংস দেবের ভাষায় এখানেও যত মত তত পথ। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ভগবৎপ্রেমের মত, দেশের মানুষগুলির জন্তে মনে সত্যিকারের দরদ থাকাটাই আসল কথা। তবে কিনা আপাততঃ আমাকে যে পথটা সবচেয়ে বেশী টানছে সেটা আমাদের জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে গঙ্গার ধারে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে। চল না, ঘুরে আসবে?"

নির্ম্মলা বলল, "প্রিন্সেপ ঘাট আজ থাক। ওটা হবে এখন আর-একদিন। আজ গিয়ে তোমার বাবাকে আগে দেখব, তারপর অন্য কথা।"

শক্ত একটা রোগ ভোগের পর জগন্নাথ সেরে উঠেছে, মনটা খুব হালকা লাগছে সেদিন নির্ম্মলার। ফিরবার সময় দিবাকর একটু ধরাধরি করতেই সে চ'লে গেল তার সঙ্গে চীনে পাড়ায়। যে চীনে হোটেলটাতে দিবাকর তাকে নিয়ে গেল সেখানে ঘর পাওয়া যায় আলাদা। সেইরকম একটা পর্দা টানা ঘরে বসে কি যে খাচ্ছে সে বোধ হারিয়ে ফেলেও অনেক কিছু খেল তারা।

নার্সিং হোমে আসবার পর প্রথম যেদিন ভাত পথ্য পেয়েছিল নির্ম্মলা, সেদিন সুজন ডাক্তার তার জন্তে গলা ভাতের সঙ্গে শিঙি মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেছিলেন। উচ্চবাচ্য না ক'রে খেয়ে নিয়েছিল নির্ম্মলা। এত দুর্ব্বল তখন তার শরীর, মনে হচ্ছিল, একটু নড়ে বসতে গেলেই মরে যাবে। বেঁচে থাকবার জন্তে যেটুকু করা দরকার, একটু পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, তা না করলে চলবে কেন?

সেই থেকে মাছ মাংস খেয়ে চলেছে সে। এও সে এখন বুঝেছে, লোকচক্ষুর অগোচরে যে থাকতে চায়, 'বাংলা দেশের মানুষ, অথচ আমি নিরামিষাশী,' এ ধরণের কোনো বিশিষ্ট আচরণ তার না থাকাই ভাল।

তাছাড়া, দিদিভাই ব'লে যে কেউ একজন ছিল তাদের, শ্বশুর-শ্বশুরা এতদিনে তাই হয়ত ভুলে গিয়েছে, একটা মৃগেল মাছ না খেতে পাওয়ার দুঃখ নিশ্চয় তারা মনে রেখে বসে নেই।

দুজনে মুখোমুখি বসে চীনেমাটির বাটিতে ঝিনুকের আকারে তৈরী চীনেমাটির চামচে ক'রে খেল কাঁকড়া এ্যাস্পারাগাসের গরম স্যুপ, তারপর খেল চিংড়িমাছের সোনালী রঙের ফ্রাই, আনারস সহযোগে স-চর্ম্ম হাঁসের রোস্ট, বাদাম সহযোগে মুরগী, কুচো-চিংড়ি ও হ্যামের কুচি দেওয়া চাউ মিন, অবিকৃত রঙের সিদ্ধ তরকারির সঙ্গে মুরগীর সিদ্ধ মাংস ও ফ্রাইড রাইস বা চীনে পোলাও। সব কিছুর সঙ্গে ঝাল চীনে সস্। এসব জিনিষ নির্ম্মলা এর আগে

খায়নি কোনোদিন। যদিও কি যে খাচ্ছে তা খুব যে বুঝতে পারল তাও নয়।

সেদিন কালো পোশাক প'রে বেরিয়েছিল দিবাকর। তাতে তার গায়ের রঙ এবং সেই সঙ্গে তার রূপ মিলে যেন চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। নির্ম্মলা পরেছিল একটি লালপাড় কোরা ডুরে শাড়ী, গেরুয়া রঙের জামা। গলায় লাল পলার ধরণের কাঁচের মালা, হাতে রূপোর উপর লাল মিনে-করা দুগাছা করে চুড়ি. কপালে সিঁদুরের টিপ। এই সামান্য সাজেই কি আশ্চর্য সুন্দর যে তাকে দেখাচ্ছিল তা এক দিবাকরই জানে।

টেবিলের পাশ দিয়ে একটু ঝুঁকে দিবাকর দেখে নিল, নির্ম্মলার পা-দুটিতে লাল মখমল মোড়া চামড়ার ষ্ট্র্যাপ দেওয়া বর্ম্মী কানা বা স্যাণ্ডাল।

শাড়ীর প্রান্ত টেনে পা-দুটিকে ঢাকতে যাচ্ছিল নির্ম্মলা, দিবাকর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "না, দেখব। কোনো উপদ্রব করব না, ভয় নেই।"

কপালে হাত দিয়ে মাথা নীচু ক'রে রইল নির্ম্মলা, পা-দুটি যেমন ভাবে ছিল তাই রইল, কেবল তার মনে হতে লাগল, পায়ের আঙুলগুলির থেকে শুরু ক'রে উপরের দিকে শরীরটা ক্রমশঃ তার অবশ হয়ে আসছে।

দিবাকর দেখল, নির্ম্মলা আলতা পরেনি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন পরেছে। অস্ফুট স্বরে বলল, "কি সুন্দর। কি মিষ্টি!"

এবারে পা-দুটিকে গুটিয়ে প্রায় চেয়ারের পিছনটায় নিয়ে গেল নির্ম্মলা।

সেপ্টে ট্রিট ছবিটা, যাতে এমিল জেনিংসের সঙ্গে ছিলেন লুইস স্টোন ও ফ্লোরেন্স ভিডর, কলকাতায় দেখানো হচ্ছে তখন। দিবাকরের সাহস বেড়েছে, সে প্রস্তাব করল, সেইটে দেখে তারা বাড়ী ফিরবে। দিবাকরের সঙ্গে এতক্ষণ কাটাবার ফলে নির্ম্মলার মনটা তখন আয়ত্তের মধ্যে নেই, তাই 'না' বলতে পারল না। বলল, "কিন্তু সুরূপাদিকে ত বলে আসা হয়নি?"

এইটুকু বয়স থেকেই বায়োস্কোপ দেখতে খুব ভাল লাগে নির্ম্মলার। প্রথম যেদিন দেখেছিল, ছবিতে জলে ঢেউ উঠেছে দেখে কিরকম উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়েছিল তা এখনো মনে আছে তার। কতকাল যে দেখেনি। ইচ্ছে হতে পারে না কি দেখতে?

দিবাকর বলল, "তার আর হয়েছে কি? চল, এদের অফিস থেকে টেলিফোন করে তোমার সুরূপাদিকে বলবে।"

নির্ম্মলা বলল, "তুমি বল।"

কিন্তু ছবিঘরটার সামনে লোকের ভিড় দেখে হকচকিয়ে গেল নির্ম্মলা। বলল, "আজ থাক, কেমন? আর-একদিন হবে। আমি একটু হিসেবী মানুষ, হিসেব করে দেখছিলাম, তোমার আজ যা খরচ করিয়েছি একটা দিনের পক্ষে তাই যথেষ্ট হওয়া উচিত।"

দিবাকর বলল, "ঠিক হ্যায়। একটা দিনের পক্ষে যতটা পেয়েছি আমার কাছে তা যথেষ্টর চেয়েও বেশী।"

বাড়ী ফিরতেই সুরূপা বলল, "কি ব্যাপার? সিনেমায় যাওনি দেখছি যে। কেন যাওনি? কি হল?"

নির্ম্মলা বলল, "আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে সুরূপাদি।"

সুরূপা বলল, "সে ত দিনে কম করেও চোদ্দবার আমারও করে। কিন্তু কি হয়েছে? ঝগড়া করেছ?"

নির্ম্মলা বলল, "না।"

"তবে?"

"কি হবে বেঁচে থেকে?"

সুরূপা বলল, "কি আবার হবে? খাবে দাবে কল-কলাবে, আমরা সবাই যা করছি। চল, চল, খাবে চল। তারপর আমার ঘরে এসে বসে কলকলিও। অবশ্য, তুমি কলকলাবে না জানি, কারণ সেটা তোমার স্বভাবে নেই।"

এদের ঘড়ি ধরে খাওয়া। খেয়ে এসেছে সেটা বলল নির্ম্মলা, তারপর, নিজে যদিও খাবে না, তবু সুরূপার সঙ্গে নেমে এসে খাবার টেবিলে বসল। একটু পরেই রঙীন আঁচলের সুগন্ধ ছড়িয়ে সুনন্দাও এসে বসল টেবিলে।

জগন্নাথ সম্বন্ধে হয়ত একটু দুর্ব্বলতা এসেছিল সুনন্দার মনে, কিন্তু সেটা এতই সাময়িক একটা ব্যাপার যে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। জগন্নাথের পরিচর্য্যায় তার নির্ম্মলা সেবার

পর সিঁড়ির ঘরে সে আর উঁকি দিয়েও দেখেনি। খাওয়ার শেষ পর্বে সুরূপা বলল, "আবার ত দেখি শুরু করেছ। কি যে ক'র আমি তোমাকে নিয়ে!"

সুনন্দার টানাটানা চোখদুটিতে হাসির আভাস, ঠোঁটদুটিতে অভিযোগের অভিনয়, বলল, "কি শুরু করেছি?"

সুরূপা বলল, "থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। এমন করছ ছেলেটাকে নিয়ে, যে, দেখলে গায়ের মধ্যে কি একরকম করতে থাকে।"

ছেলেটা মানে, একটি ছোকরা ডাক্তার। নৃপতি দাশ তার নাম, এডিনবরা থেকে ফিরে এসে এই ক'দিন হ'ল নার্সিং হোমে কাজ নিয়ে ঢুকেছে। শরীরের গড়ন, মুখশ্রী দুইই খুব সুন্দর, যদিও গায়ের রঙ মিশ কালো।

একটা কমলা লেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সুনন্দা অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখের ভাব ক'রে বলল, "কি করব সুরূপাদি? He makes me mad। এমন সুন্দর কালো রঙ আমি এর আগে আর দেখিনি।"

সুরূপা ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর। পেশেণ্টদের বা তাদের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে কর সে একরকম বুঝি। তারা দুদিনের জন্যে আসে, দুদিন পরে চলে গেলে সব চুকে বুকে যায়। কিন্তু permanent staff-এর একজন ডাক্তার, তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি যদি কর ত একটা মহা কেলেঙ্কারি হবে।"

একটা চিপেওেল চেয়ারে যতটা সম্ভব গা এলিয়ে ব'সে কমলালেবুর একটা কোয়াকে চুষো খাবার ধরণে চুষবার ফাঁকে ফাঁকে সুনন্দা বলল, "বাড়াবাড়ি করতে পেলে ত বর্তে যাই সুরূপাদি। সে তুমি যাই বল। কিন্তু কথা হল, বাড়াবাড়ি কি ও করবে? যা ভীষণ লাজুক। স্ত্রীলোকের দেহ নিয়ে কোনো কথা হলেই ওর মুখের কালো রঙটা বেগুনী হয়ে যায়। ডাক্তার সান্যালের উচিত ছিল, ওকে General Ward-এ না দিয়ে, গোড়ায় কিছুদিন Maternity-তে কাজ করানো।"

সুনন্দাকে মারবার জন্যে হাত ওঠাল সুরূপা।

এদের এই ধরণের সব কথায় থাকে না নির্মলা। ভালও লাগে না তার, তাছাড়া বুঝতেও পারে না ভাল করে। কিন্তু রাত্তিরে ছাতে বেড়াতে বেড়াতে সুরূপাকে সে যা বলল, তা শুনে সুরূপা স্তম্ভিত হয়ে গেল একেবারে।

আজ দিবাকরের সঙ্গে রোমাঞ্চিত একটি সন্ধ্যা কাটিয়ে বাড়ী ফিরবার পথে তার পাশে বসে নির্মলা ভাবতে ভাবতে এসেছে, জীবনে সবচেয়ে বেশী যে জিনিষটা পাবার মত, অতি বড় দীনদুঃখী, মুটে মজুর ভিখারীরাও যা অবলীলায় পেয়ে যায়, আমার তাতে লোভ করবার অধিকার নেই। কিন্তু আমার ত বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই, তবু বেঁচে ত রয়েছি? যেরকম ক'রে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছি, সেইরকম করে জীবনটার কাছ থেকে ফাঁকি দিয়েই যতটা পাওয়া সম্ভব পাবার চেষ্টা করব আমি। শূন্যহাতে এই পৃথিবী থেকে ফিরে যাব না।

বলল, "সুরূপাদি, ভালবাসলেই বিয়ে করতে হবে, এটা কেন ভাবে মানুষে?"

ঘন কালো চুলের রাশ কাঁধের একটা পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে বুকের উপর এনে বেড়াতে বেড়াতেই বিনুনি করছিল সুরূপা। খুব গম্ভীর মুখেই বলল, "কি তাহলে করবে? ভালবাসাটা জানাজানি হতেই দুহাত জুড়ে নমস্কার ক'রে 'আচ্ছা, চললুম' বলে দুজন দুটো আলাদা দেশের দিকে যাত্রা করবে?"

নির্মলা বলল, "আহা, তা কেন? একই দেশে, একই শহরে, এমন কি দরকার হলে একই পাড়ায় খুব কাছের মানুষ হয়ে আলাদা কি তারা থাকতে পারে না?"

"কতটা কাছের মানুষ?"

"এই ধর, দিনান্তে দুজন দুজনকে দেখতে পাবে; হয় এর বাড়ীতে, নয় তার বাড়ীতে, নয়ত চায়ের দোকানে এক সঙ্গে ব'সে চা খাবে; এক সঙ্গে বেড়াতে যাবে; সিনেমা দেখবে; হোটেলে খাবে; খেলবে; কাজ করবে—"

সুরূপা বিনুনি-করা চুলে খোঁপা বাঁধছে। বলল, "আর কিছু না? যেটুকুন বাকী রইল তাও বল। এক সঙ্গে শোবে না মাঝে মাঝে?"

খুব মৃদুস্বরে নির্মলা বলল, "ধর, যদি তাও করে তারা; অবিশ্যি সবদিক বাঁচিয়ে।"

সুরূপা থমকে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "শুনেছ কথা? দিনেদিনে তুমি কি হচ্ছ বল ত? একদিন বেশ ক'রে কান মলে দেব তোমার আমি।"

বড় বাড়ীটার তিনতলার ছাতের একদিক্‌টাতে একটা বাতি জ্বলে সারারাত। সুরূপাদের ছাতের একটা দিকে সেই বাতির আলো খানিকটা এসে পড়ে। সেই আলোতে নির্মলার মুখের দিকে আড় চোখে একবার তাকিয়ে সুরূপা একটু পরে আবার বলল, "সবদিক্‌ বাঁচানো যায় না ভাই। তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ আছ এখনো, তাই ভাবছ সেটা সম্ভব।"

নির্মলা বলল না কিছু।

দুজনে আরও খানিকক্ষণ পায়চারি করবার পর সুরূপা ছাতের আলসের ভর দিয়ে দাঁড়াল এক জায়গায়। নির্মলাও দাঁড়াল তার পাশে। নির্মলার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে সুরূপা বলল, "ওটা কেউ পারে না ভাই। তবে যদি দূর থেকে দেখে খুশী থাকতে পার, সে ভাল আছে জেনে যদি নিজে ভাল থাকতে পার, আর যদি কপালে থাকে, তার যেটা কাজ কোনোরকমে তার একটু ভাগ নিতে পার তাহলে—"

কথাটা শেষ করল না সুরূপা। তার গলাটা কি ধ'রে গেল শেষের দিকে? ঠিক বুঝতে পারল না নির্মলা।

দিবাকর আর মলিনাকে নিয়ে ত এই। এদিকে জগন্নাথকে নিয়েও তার শান্তি নেই।

আজ কয়েকদিন হ'ল সে উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে। যদি নার্সিং হোমের খাতায় নাম লেখানো রোগী হত ত একটা বিল লিখে এনে তার সামনে ধরলে সে বুঝতে পারত, তাকে চলে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু তা ত সে নয়? সে আছে তার মাসীর কাছে। মাসী কোন্‌ প্রাণে বলে তাকে, তুমি চলে যাও?

দু বছর জেল খেটে এসেছে ছেলেটা। তার জ[illegible] নির্মলা কতটা দায়ী, আর সে নিজে কতটা দায়ী, সে ভাববার মত একটা কথাই এখন নয়। কত দুঃখই না জা[illegible] ছেলেটা পেয়েছে সেখানে। এখানে এতদিন পরে [illegible] যে একটু আরামে সে আছে, এর থেকে তাকে বঞ্চি[illegible] করতে যাওয়া হৃদয়বত্তার কাজ হবে কি?

মনে হয়, জগন্নাথ বুঝতে পারছে, তার এবার চ[illegible] যাওয়া উচিত, আর তাই এমন কাঁচুমাচু মুখ ক[illegible] বেড়াচ্ছে যে তাই দেখে নির্মলার আরোই মায়া হ[illegible] তার জন্যে।

ছাতের এক কোণে আলসের ভর দিয়ে দাঁড়ি[illegible] একটা সিগারেট ধরাচ্ছিল জগন্নাথ। যেই দেখতে পে[illegible] নির্মলাকে, সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে।

নির্মলা বলল, "ঢং!"

জগন্নাথ মাথাটাকে নীচু করে অপ্রস্তুতির হাসি হাসল।

নির্মলা বলল, "ফেলে দেওয়া হ'ল কেন? পয়সা লাগেনি কিনতে?"

জগন্নাথ তার নীচু করা মাথাটা চুলকোচ্ছে।

ছাতের আলসের পিঠের ভর রেখে দাঁড়িয়ে নির্মলা বলল, "এ অভ্যেসটি ত আগে ছিল না? কবে কোথায় হ'ল?"

জগন্নাথ মুখ তুলল, বলল, "জেলে থাকতে মাসী। রেতের বেলা সময় যেন কাটতে চাইত না। ওরা বললে,—"

নির্মলা বলল, "বুঝেছি। জিনিষগুলোও কি ওরাই জোগাত?"

জগন্নাথ বলল, "কাজ যা করতুম, তার থেকে রোজগার হ'ত ত মাসী। তার অর্দ্ধেক নিজের এইরকম সব দরকারে খরচ করতে পেতুম।"

নির্মলা বলল, "আর বাকী অর্দ্ধেকটা?"

দুপাটি ঝকঝকে দাঁত বের করে হেসে জগন্নাথ বলল, "নিয়ে এসেছি মাসী।"

আকাশে মেঘ নেই, ঝক্‌ঝক্‌ করছে রোদ পড়ে চার-

ঝিকুটা, আর বেশ একটু শীত পড়েছে বলে ভাল লাগছে রোদটাকে।

নির্মলা বলল, "এখন ত কাজে-কর্মে সময় খুব সহজেই কাটতে পারে, এখন তাহলে আর ওটার দরকার কেন হচ্ছে?"

জগন্নাথ বলল, "ফেলে যে দিলুম, ঐ ফেলেই দিলুম। ও ছাই আর খাব না। আর কালকেই আবার কাজে লাগছি মাসী।"

নির্মলা বলল, "সে ত খুব ভাল কথা। তবে যা-ই করবে সইয়ে সইয়ে ক'রো। গোড়াতেই খুব বেশী মেহনতের কাজে হাত দিও না। খুব একটা শক্ত অসুখ থেকে উঠেছ, ভুলে যেও না সেটা। বর্ষার ত এখনো অনেক দেরি? আমাদের বাড়ীর পাশের জমিটাতে এখনো বেশ কয়েক মাস দুতিনখানা ক'রে গাড়ী রেখে তুমি কাজ করতে পারবে। আর সেই সঙ্গে একটু চেষ্টা যদি কর ত কারখানা করবার মত একটু জমির খোঁজও তুমি হয়ত পেয়ে যাবে। তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিরকম হবে সেটা অবিশ্যি একটা ভাববার কথা। মলিনা বলে যে নার্সটি ঠিকে কাজ করতে আসে মাঝেমাঝে, সে বলে, তার একটা ইকমিক কুকার না কি বলে, তাই আছে, আর ভাজাভুজি ছাড়া অন্য সব রকম রান্না তার জন্যে নিজে থেকেই নাকি তাতে হয়ে যায়। তুমি তাই একটা কিনে নিও।"

জগন্নাথ বলল, "মাসী!"

"কি?"

"বল, রাগ করবে না?"

"কি এমন তুমি বলবে বা করবে যে রাগ করব?"

"যদি বলি? বা করি?"

"আচ্ছা, রাগ করব না।"

"আর কথা দাও, আমায় তাড়িয়ে দেবে না?"

"তোমায় তাড়িয়ে দেব মানে?"

"আমি দেবে না, তবু কথা দাও।"

"কথা দিচ্ছি।"

"তোমাদের এই নার্সিং হোমেই আমি একটা কাজ নিয়েছি মাসী।"

নির্মলার চোখের তারা প্রায় কপালে উঠবার জোগাড়। বলল, "সত্যি? কি কাজ? কবে নিয়েছ?"

জগন্নাথ বলল, "বলেছি না কাল থেকেই কাজে লাগছি? ডাক্তার বললেন, কেয়ার-টেকারের কাজ। এই বাড়ীঘর দেখাশোনার কাজ আর কি? ছাতে কোথাও জল জমছে কি না, আগাছা গজাচ্ছে কি না, দেয়ালে কোথায় নোনা ধরল, ইলেক্‌ট্রিক লাইনে লিক আছে কি না কোথাও, এইসব দেখা; রেফ্রিজেটারগুলিকে ডিফ্রস্ট করা, পাখা অয়েল করা, জল যথেষ্ট আসছে না দেখলে কর্পোরেশনে হাঁটাহাঁটি ক'রে ফেরুল বদ্‌লানোর ব্যবস্থা করা,— এই সব।"

নির্মলা বলল, "কত মাইনে?"

জগন্নাথ হাসিতে মুখ ভরে তুলে বলল, "বেশ মোটা মাইনে মাসী।"

নির্মলা বলল, "তবু শুনি কত।"

জগন্নাথ বলল, "থাকা, খাওয়া আর একশ টাকা ক'রে মাসে।"

নির্মলা মনে মনে একটু হিসেব ক'রে নিল তাড়াতাড়ি, তারপর বলল, "মন্দ কিছু নয়, তবে মিস্ত্রিখানা থেকে এর চেয়ে ঢের বেশী রোজগার তোমার হ'ত। ওটা তোমার লাইন, তুমি ওটা ছাড়বে কেন?"

জগন্নাথ একটু ভেবে নিয়ে বলল, "জেল খেটে এসেছি ত? কেউ আর আগের মত বিশ্বাস ক'রে কাজ দেবে কি আমাকে? সুধাকান্তবাবুর লোকরা ত দেবেই না। কত কথা যে রটেছে আমার নামে।"

নির্মলা বলল, "অন্য কোনো পাড়ায় গিয়ে যদি কাজ কর?"

জগন্নাথ বলল, "এরা খোঁজ পাবেই মাসী। মিস্ত্রিরা সবাই সবাইকে চেনে। মুখেমুখেই কথা ছড়িয়ে যাবে।"

গারাজের উপরকার ছোট একটা ঘরে থাকবে জগন্নাথ, নার্সিং হোমের রান্নাবাড়ীতে খাবে।

নির্মলাদের কোয়ার্টার্স ছেড়ে চলে যাবার সময় সে বলল, "রাগ করলে মাসী ?"

নির্মলা বলল, "না, না, রাগ কেন করব ? বেশ ত আগের মত আবার একই সঙ্গে থাকা হবে। সেদিক্ দিয়ে ত ভালই হ'ল।"

জগন্নাথ খুব করুণ ক'রে হাসল এবার। এ ধরণের হাসি তার মুখে নির্মলা এর আগে কোনোদিন আর দেখেনি। বলল, "আগের মত আর হবে না মাসী।"

নির্মলা একটু গম্ভীর হয়ে গেল দে'খে তার স্বভাব-সুলভ ঝকঝকে হাসিটি হেসে বলল, "আগের মত তুই-তোকারিও আর এরপর কেউ করবে না আমায়, তুমি দেখে নিও।"

নির্মলাও হেসেই বলল, "হ্যাঁ, এখন চাকুরে বাবু হতে যাচ্ছ, ইংরেজী বুকনিও তোমার মুখে শুনেছি দুচারটে।"

বলল বটে কথাগুলো, কিন্তু তার বড় ভয়, জগন্নাথকে পাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কোনো কিছু নিয়ে কেউ করে। হয়ত এই কারণেই দিবাকরের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো চেষ্টাই সে করছে না। তার ভয়, যদি দিবাকরের কোনো কথায় বা ব্যবহারে জগন্নাথ সম্বন্ধে কোনো অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।

কিন্তু জগন্নাথের মত প্রাণবন্ত একটা মানুষকে আড়াল ক'রে রাখা কি নির্মলার মত একটি নিরীহ মানুষের কাজ ? সেদিন নির্মলাকে পৌছে দিয়ে ফিরে যাবার সময় দিবাকরের গাড়ী কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছিল না। দিবাকর ক্রমাগত সেল্ফ্ দিচ্ছে আর সেই সঙ্গে মেজাজটা এক ডিগ্রী দুডিগ্রী ক'রে বেশী গরম হচ্ছে তার। নেমে হ্যাণ্ডেল ঘুরোতে যখন গেল তখন রাগে সে এমন অন্ধকার দেখছে যে ঠিক জায়গায় হ্যাণ্ডেলটাকে লাগাতেই পারল না কয়েকবার চেষ্টা ক'রেও। জগন্নাথ কোথায় ছিল, ছুটে এসে বনেট খুলে দেখল, তারপর গাড়ীতে রাখা যন্ত্রপাতির দু-তিনটে নিয়ে সটান গাড়ীর তলায় শুয়ে প'ড়ে সারাবার যা তা সারিয়ে দিল।

ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি পরা সুশ্রী চেহারার একটা মানুষকে রাস্তার ধুলোয় শুয়ে পড়তে দেখে হাঁ হাঁ ক'রে উঠেছিল দিবাকর। কিন্তু গাড়ীর নীচে ততক্ষণে খুটখাট শুরু হয়ে গিয়েছে।

জগন্নাথ গাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে উঠে দাঁড়ালে চো[খে] একটা প্রশ্ন নিয়ে নির্মলার দিকে তাকাল দিবাকর। নির্ম[লা] বলল, "এই হ'ল জগন্নাথ, যে অসুস্থ হয়ে এই ক'দিন ছি[ল] আমাদের কাছে। সম্প্রতি নার্সিং হোমের কেয়ার টেকারে[র] কাজ নিয়ে ঢুকেছে। ডাক্তার সান্ন্যাল আর আমি ওকে অনেকদিন থেকেই চিনি। এক সঙ্গে ও আর আমি কাজও করেছি অনেকদিন। ও আমাকে মাসী বলে ডাকে।"

শেষের কথাটা বলবার সময় অকারণেই শব্দ ক'রে হাসল একটু, তারপর ভেবে পেল না, তখন তখনই কথাট[া] দিবাকরকে শোনাবার দরকার কি ছিল। দিবাকর হয় শুনেছে নয়ত নিশ্চয় একদিন শুনবে যে, নির্মলা জগন্নাথের সঙ্গে একলা এক বাড়ীতে বাস করেছে কিছুকাল। এটা কি তারই সাফাই ? না, এটা জগন্নাথকে জাতে তোলবার চেষ্টা ?

জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে দিবাকর অমায়িকতার হাসি হাসল, জগন্নাথ ফিরিয়ে দিল সেই হাসি। সেল্ফ্ স্টার্টারের সামান্য কি-একটা দোষের জন্যে দিবাকরের গাড়ী মাঝে মাঝে এইরকম গোলমাল করে, তাই নিয়ে দিবাকরের সঙ্গে জগন্নাথের আলোচনা হল কিছুক্ষণ, তারপর জগন্নাথকে নমস্কার ক'রে এবং নির্মলাকে আর একবার দেখে নিয়ে দিবাকর চলে গেল।

জগন্নাথ বলল, "দেখলে ত মাসী ?"

নির্মলা বলল, "কি আবার দেখলাম ?"

জগন্নাথ বলল, "বা ! আমাকে আগে নমস্কার করলেন ভদ্রলোক, দেখলে না ?"

নির্মলা বলল, "ভদ্রলোক, তাই করলেন।"

"ঠিক বলেছ মাসী", বলে জগন্নাথ চলে গেল নিজের কাজে।

জগন্নাথকে মনে মনেও পাছে কেউ অশ্রদ্ধা করে, এই ভাবনাটা নির্মলার আজকাল খুব বেশী হচ্ছে। একটা ফাঁড়া আজ কাটল।

নিজেই খোঁজখবর নিয়ে কাছেরই এক পাড়ার একটা নাইট স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছে সে জগন্নাথকে।

মার্সিং হোমের রান্না-বাড়ীতে নানারকম রান্না হয়, নানারকম রোগীদের জন্তে। অধিকন্তু যারা নার্সিং হোমে কাজ করে, তাদের জন্তে হয় আর এক রকমের রান্না। মন্দ কিছু নয় কিন্তু স্বভাবতঃই একটু একঘেয়ে। একটু টক খাদের বালাম চালের ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝাল, আর ঝোল, রান্নাতে ঠিক একই ধরণের মশলাপাতি আর পটল ভাজা, নয়ত বেগুন ভাজা।

জগন্নাথ এমনিতেই একটু ভোজনবিলাসী, তার উপর নির্মলার সঙ্গে অনেকদিন কাটিয়ে আহার জিনিষটাকে সে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে।

সেদিন নির্মলার সঙ্গে বড় বাড়ীটার সিঁড়ির কাছে দেখা হতে জগন্নাথ বলল, "মাসী, বলেছিলুম না, যে আগের মত আর হবে না? ফুলকপির ফুলগুলোকে ভেজে চিমসে করে নিয়ে তরকারী রেঁধেছে, অমলেট ভেজেছে ঢাকা না দিয়ে, কালো হয়ে গেছে দুটো দিক্।"

নিজেদের যেদিন ভাল মন্দ বিশেষ রকমের রান্না কিছু হয়, জগন্নাথকে তাই সে ডেকে খাওয়ায়। কিন্তু নিজেদের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ায় না। খাবার টেবিলে হয় তাকে আগে বসায়, নয়ত পরে।

কিজানি, সুনন্দা, সুরূপাদি, এরা যদি কিছু মনে করে? সুরূপা ক্রীশ্চান, জাতিভেদ মানে না। কিন্তু নীচু জাত উঁচু জাত বিচারের কথা এটা নয়। ধনী দরিদ্রদের প্রভেদের প্রশ্নও এতে নেই। এমন কি জগন্নাথ যে মনে করে, ইংরেজী জানলেই লোকে সমীহ ক'রে কথা বলে, এটাও আংশিক ভাবে সত্য। আসলে এ দেশে যারা বংশ-পরম্পরায় গতর খাটিয়ে খায়, সমাজের চোখে যে-কোনো কারণেই হোক তারা খাটো হ'য়ে আছে। আবার ও হতে পারে, যে-কোনো কারণেই হোক সমাজে যারা খাটো হয়ে আছে, গতর খাটাবার কাজগুলি বেশীর ভাগ তারাই করে।

নির্মলা জগন্নাথকেই অনেকদিন আগে জিজ্ঞেস করেছিল, কালী-ভদ্রদের লেখাপড়া জানা ছেলেরা পঞ্চাশ টাকায় রাঁধিগিরি খুঁজে জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলে, কিন্তু হুমাস ইঞ্জিং শিখে এক শ টাকার ড্রাইভারি করতে রাজী হয় না, কেন? তখন জগন্নাথই বলেছিল, "তাহলেই যে কেউ আর আপনি বলবে না?"

এর মধ্যে একদিন দিবাকর এসে তিনটি টিকিট দিয়ে গেল নির্মলাকে। ঠিক টিকিট নয়, তিনটি নিমন্ত্রণের কার্ড, তবে গেটে সেগুলো দেখা হবে। তিন দিন পরে দিবাকরদের ক্লাবের বার্ষিক উৎসব, নৌকো বাচ, সাঁতারের প্রতিযোগিতা, ওয়াটার পোলো, আরো কয়েক রকমের জলক্রীড়া, তার সঙ্গে আনন্দমেলা, নানা-রকমের ক্রীড়া-কৌতুক, খাবারের ষ্টল ইত্যাদি। দিবাকর বলল, "যেও তোমার দুই বন্ধুকে নিয়ে। যাবে ত?"

নির্মলা দিবাকরকে দেখলেই কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে, কিছুক্ষণের মত চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে যায় তার। বলল, "যাব।"

কিন্তু গেল না। সেই রাত্তিরে নিজেকে নানারকম বুঝিয়ে খানিকটা সাহস সঞ্চয় সে করেছিল, কিন্তু পরদিন সকাল থেকে সেই সাহস কর্পূরের মত একটু একটু ক'রে উবে যেত লাগল, এবং রবিবার দুপুরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল একেবারে। বেলা দুটো থেকে দিবাকরদের ক্লাবের অনুষ্ঠান শুরু হবে, তার অনেক আগেই নির্মলা স্থির করে ফেলেছে, সে যাবে না।

কি ক'রে যে রাজী হয়েছিল, ভেবে সে অবাক্ হচ্ছে এখন। তার মনে পড়া উচিত ছিল, তার দাদা বিকাশও নৌকো বাচ, সাঁতার ইত্যাদিতে খুব উৎসাহী। কে জানে এই অনুষ্ঠানে সে আসবে না?

সুরূপা বলল, "তুমি যাবে না কেন?"

নির্মলা বলতে পারত, শরীর ভাল নেই, কিন্তু নার্সিং হোমের একজন ওয়ার্ড সিস্টারের কাছে ঐ অজুহাত দেখানোটা মোটেই নিরাপদ্ নয়। বলল, "কারণটা যদি না-ই বলি।"

সুরূপা বলল, "বেশ, ব'লো না। কিন্তু আমি যে কেন যাব না তার কারণটা বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি যাব না, তুমি যাবে না ব'লে। কারণ, তুমি যাবে আশা ক'রেই তোমার সঙ্গী হবার জন্তে আমাদেরও ডেকেছেন দিবাকরবাবু।"

সুনন্দা অত শত ভাবে না। সুরূপা যাবে না শুনেই তার টিকিটটা নৃপতিকে গছিয়েছে সে। নিজে ত অবশ্য যাবেই।

একটা টিকিট বাকী রইল।

নির্মলা চলে গেল গ্যারাজের উপরে জগন্নাথের ছোট ঘরটায়, গিয়ে তাকে ধরল। বলল, "আমি যেতে পারছি না, তুমি যাও। তোমার ভাল লাগবে। জেল খেটে এসে অসুখে পড়লে, তারপর থেকে কেবল কাজ নিয়ে আছ। মাঝে মাঝে একটু আনন্দ করাও ত দরকার হয় মানুষের ?"

জগন্নাথ বলল, "সে দরকারটা কেবল তোমারই বুঝি থাকতে নেই মাসী ?"

নির্মলা বলল, "আমি যেতে পারছি না, একটা খুব বড় অসুবিধা আছে বলে। তোমার ত যেতে অসুবিধা কিছু নেই ? আমি চাই যে তুমি যাও।"

জগন্নাথ বলল, "তুমি যখন বলছ মাসী, তার উপর আর কথা নেই। আমি যাব।"

বিকেলে নির্মলার ডিউটি ছিল না সেদিন। ফিরে এসে বিছানায় শুল, আর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল, নৌকো বাচ হচ্ছে। যে-ধরণের নৌকো বাচ তার খুব ছেলেবেলায় নন্দরাণীদের দেশে তার এক পিসীমার বাড়ী বেড়াতে গিয়ে সে দেখেছে। লম্বা লম্বা গোটা-তিনচার নৌকোয় জনা-কুড়ি করে লোক দুসার হ'য়ে ব'সে গানের তালে তালে বৈঠা মারছে। পিছনের জল-ছোঁওয়া চ্যাপ্টা লম্বা গলুইয়ে লম্বা এক-একটা বৈঠা হাতে ক'রে এক-একজন মাঝি সেই গানের তালে তালে লাছা দিচ্ছে। লাছা মানে নাচা নয়। হাঁটু-দুটো মুড়ে শরীরের সমস্ত ভর দিয়ে গলুইটাকে দাবিয়ে পাছটিকে না তুলে লাফাবার ধরণে হঠাৎ হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

স্বপ্নে শুনতে পেল, যেন নন্দরাণী হাততালি দিতে দিতে গাইছে—

> যাইতাম না গো দৌড়ের নায়,
>
> পানি পড়ব গায়।
>
> বাড়ীত গেলে বকা দিব
>
> সোনামুখীর মায়।

ঘুমটা ভাঙল যখন, স্বপ্নের রেশটা রয়েছে, একটা অব্যক্ত ব্যথার মত মনটাকে আচ্ছন্ন করে।

ছেলেবেলাটাকে খুব বেশী আর তার মনে পড়ে না এখন। কিন্তু সেটা মনেরই মধ্যে কোনো এক জায়গা রয়েছে ত ? যাবে আর কোথায় ? বুকের ভিতরে এই রকম একটা ব্যথা ধরিয়ে জানান দেয় মধ্যে মধ্যে।

এদিকে জগন্নাথ ক্লাবের অনুষ্ঠানে গিয়ে এদিক্ ওদিক্ ঘোরাঘুরি করে দেখল তার ভাল লাগছে না। অত্যন্ত মনমরা হয়ে এক জায়গায় বসে দু আনার চানাচুর কিনে খাচ্ছিল। এমন সময় দিবাকর এসে দাঁড়াল তার সামনে। সে উঠে দাঁড়ালে একটু হাসি মুখে নিয়ে দিবাকর বলল, "কেমন লাগছে ?"

জগন্নাথ তার সুন্দর মুখটি হাসিতে ভরে তুলে বলল, "ভাল।"

দিবাকর বলল, "নির্মলাকে দেখলাম না। সে এসেছে ত ?"

জগন্নাথ মুখ ফুটে বলতে পারল না কথাটা, মাথা নেড়ে জানাল, না।

এর পর অনধিকারের অপরাধে এত বেশী অপরাধী তার মনে হতে লাগল নিজেকে, যে, আর তিষ্ঠোতে পারল না সেখানে। বেরিয়ে এসে লেকের এপারে ওপারে ঘুরে বেড়াল সারা বিকেল ও সন্ধ্যাটা।

নির্মলাদের সেদিন খেতে বেশ রাত হ'ল, কারণ, সুনন্দা এল রাত ন'টা পার করে।

তার খোঁপায় জুঁই ফুলের মালা, টানা টানা চোখ দুটি ঢুলুঢুলু, মনে হ'ল তার বেশবাসও যেন অল্প একটু বিপর্যস্ত।

সুরূপা বলল, "দেখলাম ত নৃপতির সঙ্গে গেটের বাইরে ট্যাক্সি থেকে নামলে। দিবাকর বাবুদের আনন্দ মেলাতেই কি ছিলে এতক্ষণ ?"

সুনন্দা বলল, "না সুরূপাদি। মিথ্যে কথা কেন বলব ? সিনেমায় গিয়েছিলাম।"

সুরূপা বলল, "বেশ। নিশ্চয় নৃপতির সঙ্গেই গিয়েছিলে। কিন্তু ডাক্তারের কানে কথাটা উঠলে তিনি কি ভাববেন, সেটা একবারও মনে হয়েছে কি ?"

সুনন্দা বলল, "আচ্ছা সুরূপাদি, ধর আমি জানতাম না সে-ও ঐ সিনেমায় যাচ্ছে, সেও জানত না যে আমি যাচ্ছি। নিজের সিটটা নামিয়ে নিয়ে বসতে গিয়ে দেখলাম, সে রয়েছে পাশের সিটে। তখন কি করা উচিত ছিল? বেরিয়ে আসা?"

"আহা, তাই যেন হয়েছে।"

"হতে ত পারত?"

"ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে আসাটাও কি ঐ রকম করে হয়েছে? জানতে না আর কেউ আছে ট্যাক্সিতে, উঠে দেখলে, ও বসে রয়েছে?"

"না, তা কেন? ও বললে, দুজনে একই জায়গায় যাচ্ছি যখন, তখন দুটো আলাদা ট্যাক্সি করে পয়সা কেন নষ্ট করব, আসুন একসঙ্গে যাওয়া যাক। আমি তখন আর কি করতে পারতাম বল?"

"ও বললে! এই যে বল, খুব লাজুক মুখচোরা মানুষ?"

"আহা, অন্ধকারে সিনেমায় পাশাপাশি এতক্ষণ বসে ছিলাম, ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে কি আর থেকেছি? একটু সাহস দেবার চেষ্টা করেছি বই কি?"

সুরূপা বলল, "এগুলো একটু কম ক'রে করো। তোমার ভালর জন্তেই বলছি।"

একথার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুনন্দা কলকণ্ঠে হাসতে লাগল।

সুনন্দাকে আজ নূতন করে দেখছে নির্মলা। সে যেন একলা সুনন্দাই কেবল নয়, আর-একটা মানুষের ব্যক্তিত্বগুলকে নিজের দেহটি দিয়ে আজ বহন করে এনেছে। যে খুশি উপচে পড়ছে তার চোখে মুখে, সেটা দুটো মানুষের খুশি; যে স্বপ্নলোকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা দুজন মানুষের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। এদের সেই স্বপ্নলোকে ঢুকে যেতে খুব ইচ্ছে করছে নির্মলার।

সুরূপা নীরবে খাচ্ছিল। খাওয়া শেষ হতেই খুব তাড়া আছে বলে উঠে গেল। একটা আপেল চার ফালি করে মানুষগুলির ভয় একবার ভাঙলে এরা না করতে পারে এমন কাজ নেই।"

নির্মলা একটু হাসল। বলল না কিছু। প্রখর হয়ে উঠেছে তার কল্পনা। দিবাকরের মানস-মূর্তিকে ঘিরে তার সমস্ত দেহমনের উন্মুখতা লতায়িত হয়ে উঠছে ফুল-ফল-পল্লবে একটি উদ্ধত দুঃসাহসিকতায়।

সিঁড়ি উঠবার সময় তার মনে হচ্ছিল, কে যেন তার কোমরের পিছনে একটা গুরুভার পাথর বেঁধে দিয়েছে। কষ্ট হচ্ছিল সিঁড়ি উঠতে। এ এক নূতন উপসর্গ।

শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদ আকাশে, কুয়াশাতে যেন জ্যোৎস্না শরীরী অবলম্বন পেয়েছে। যেমন আর-একটা সুন্দর অশরীরী আলো অবলম্বন পেয়েছে সুনন্দার দেহে।

নিজের শরীরটাকেও আজ ভুলতে পারছে না নির্মলা। তার শরীরে এখন সুসংযত কিন্তু ভরপুর যৌবন। তাতেও আজ জেগেছে এক আলোর তৃষ্ণা। ছাতে বেড়াতে বেড়াতে নিজের মধ্যে নিজেকে সে আজ অত্যন্ত নিবিড় ক'রে অনুভব করছে।

একটু পরে সুনন্দাও এসে জুটল ছাতে আর ঘণ্টাখানেক পরে তার রাতের ডিউটি।

নিঃশব্দে দুজনে পাশাপাশি বেড়াল কিছুক্ষণ. তারপর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে সুনন্দা বলল, "জানো ভাই, ও বড় দুঃখী মানুষ। ওকে দেখলে কিন্তু একেবারেই মনে হয় না তা।"

নির্মলা বলল, "তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ। যেমন ওকে দেখলে এও, মনে হয় না যে ওরা তপশিলী জাত। নীচু জাত বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সইতে হয়েছে অনেক, এখনো হয়। সে সব ব'লে যখন বললে, আমাকে বিয়ে করতে চায়, 'না' বলতে পারলাম না।"

"বিয়ে করবে?"

"এক্ষুণি নয়। যাক কিছুদিন। কেমন যেন মায়া পড়ে যাচ্ছে লোকটার উপর। হয়ত বিয়ে করবই শেষ পর্যন্ত।"

"দেরি ক'রে কি লাভ?"

কিছুদিন খেলে নিই, পরে ত আর পারব না? তুমি ভাই কথাটা কাউকে ব'লো না এখুনি, সুরূপাদিকেও না।"

নির্ম্মলা বলল, "আচ্ছা, বলব না।"

একটু পরে সুনন্দা বলল, "তোমারও ত ভাই মৎলবখানা মনে হচ্ছে আসলে তাই।"

নির্ম্মলা বলল, "না, ঠিক তা নয়। লুকোচুরি খেলতে আমারও ভাল লাগে, সম্ভব হলে আমিও খেলতে চাই, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। ধরবার বা ধরা দেবার ইচ্ছে একেবারে নেই।"

"কথাটার মানে কি হ'ল? বিয়ে করবে না?"

"না।"

"কেন?"

"সংসার করবার অনেক ঝেপা, আমাকে দিয়ে পোষাবে না।"

"শুধু খেলতে তোমায় কেউ দেবে?"

"যদি দেয়।"

সুনন্দার ইচ্ছে ছিল, এই নিয়ে রসিকতা করে একটু, কিন্তু নির্ম্মলার গম্ভীর মুখ দেখে সাহস হ'ল না। বলল, "দেখ চেষ্টা ক'রে। আমি আপাততঃ ডিউটিতে চললাম। সেখানে দূর থেকে দু-একবার দেখতে পাব তাকে। ফিরে এসে যখন ঘুমোব, আশা করছি এমন স্বপ্ন একটা কিছু দেখব যেটার কথা সকালে উঠে তোমাদের বলা যাবে না।"

ছাব্বিশ

বেঁচে থাকবার ঐকান্তিক আগ্রহ, আর জীবনটার কাছ থেকে কিছু পেয়ে যাবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা ক্রমশঃ বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে নির্ম্মলার মনে। পরদিন সকালেই নিজের এই নূতন চেহারাটার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তার।

সুনন্দা সে-রাত্রিতে স্বপ্নে কি দেখেছিল জানে না নির্ম্মলা, কিন্তু নিজে সে প্রায় সারারাতই দিবাকরকে স্বপ্নে দেখল। যদিও শেষের দিক্‌টায় কি যে দেখেছে কিছুতেই তা মনে আনতে পারছিল না, তবু যখন ঘুমটা ভাঙল, অনুভব করল, তার দেহমন মধুময় হয়ে আছে। চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে সেই মাধুর্য্য সে আস্বাদন করছে, এমন সময় বারান্দার দিকের খোলা জানালার ছুটো গরাদের ফাঁকে মুখ রেখে মলিনা ডাকল, "নির্ম্মলাদি!"

ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে মলিনাকে ভিতরে আসতে বলে নির্ম্মলা প্রায় চোখ বোজা অবস্থাতেই এক ছুটে পাশের ছোট বাথরুমটাতে ঢুকে গেল। যে সুন্দর সুখানুভূতি নিয়ে তার আজ ঘুম ভেঙেছিল, সকালবেলার আকাশে ঝিনুকের বুকের রংটির মত তা মিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই মলিনাকে তার ভাল লাগে। বেশ বেশী-ই ভাল লাগে। মলিনার সঙ্গে গল্প করতে, তার মুখে তার নিজের ছেলেবেলাকার গল্প, তার ডাক্তারদার গল্প, তার আবৃত্তি, তার গান, এ সবই শুনতে তার ভাল লাগে। কেবল মলিনা এমন ক'রে তার পিছনে যদি না লাগত। আজ কি মৎলব নিয়ে সে এসেছে কে জানে?

তোয়ালেতে মুখটাকে রগড়ে প্রায় লাল ক'রে তুলে মুহূর্তে মুহূর্তে বেরিয়ে এসে বলল, "কি ব্যাপার? আজ যে এত সকাল সকাল? ডিউটি আছে বুঝি?"

মলিনা বলল, "ডিউটি আছিল। শেষ হইয়া গেছে রাইত তিনটার একটু পরে। মইরা গেল রুগীটা।"

আসতে যেতে রুগীটিকে নির্ম্মলাও দেখেছে কয়েক-বার। মরে যাবে ভাবেনি একবারও। কিছুই এমন রোগও নয়। বলল, "বেচারা।"

মলিনা বলল, "চা খামু কইলাম।"

"নিশ্চয় খাবেন," বলে সিঁড়ির মুখে গিয়ে শঙ্করকে ডাকল নির্ম্মলা। চা তৈরিই ছিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজোড়া পেয়ালা পিরীচ ও টোষ্ট মাখন সমেত এসে হাজির হল।

একটা টোষ্টে মাখন মাখাতে মাখাতে মলিনা বলল "চা খাইয়া সাইরা লন যাই ডাক্তারদার লগে আলাপ করবেন।"

নির্ম্মলা চা ঢালছিল, ছোট্ট করে বলল, "না।"

মলিনা বলল, "চলেন চলেন।"

মলিনার পেয়ালাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে বসে নির্ম্মলা বলল, "ইচ্ছে করছে না, দেখুন।"

মলিনা বলল, "ইচ্ছা না করলেও চলেন। ডাক্তার

দ্বারে দেখলে, তিনির কথা শুনলে ছাইড়া আসতে চাইবেন না।"

নির্ম্মলা বলল, "ওরে বাবা। গিয়ে আটকা প'ড়ে যাব? তাহলে ত আরোই যাব না।"

মলিনা বলল, "না, মা, চলেন। আইজ ছাড়াছাড়ি নাই। আইজ আপনেরে লইয়া যামু-অই।"

নির্ম্মলা বলল, "কেন জেদ করছেন? আমি যাব না।"

মলিনার মুখটা একটু কালো হ'ল। সে বলল না কিছু। আর-একটা টোষ্টে মাখন মাখাচ্ছে।

এই আত্মভোলা সর্ব্বত্যাগী মানুষটির ক্ষোভের কারণ হয়ে একটু অনুতপ্ত হ'ল নির্ম্মলা। বলল, "কি হবে গিয়ে?"

মলিনা বলল, "তিনির মুখেই শুনবেন অনে।"

নির্ম্মলা বলল, "আপনি বলুন। আপনার মুখেই শুনতে চাই।"

মলিনা বলল, "আমি ত আপনেরে কইছিঅই যে কুকীর্ত্তি একটা করুম।"

নির্ম্মলা বলল, "কুকীর্ত্তিই যদি বলছেন ত—"

মলিনা বলল, "কুকীর্ত্তি কইতে আছি, নিজের ছাওয়াল-টারে মাইনষে বান্দর কয় না? কয়। তবে? কুকীর্ত্তিটা করুম এই বড়দিনের সময়। বেশী তরাতরি নাই তবু জোগাড় আগাড় ত কইরা লইতে হইব?"

নির্ম্মলা একটু হেসে বলল, "তা করুন, কিন্তু আমাকে কোথায় কিসের জন্যে দরকার হচ্ছে?"

মলিনা বলল, "আপনেরে কিছু করতে হইব না, খালি আমার লগে থাকবেন! ডাক্তারদা কয়, দুইজন থাকলে পলানের সুবিধা। একজন ত চাইরটা দিক্ সামলাইতে পারে না?" এইখানটায় মুঠি বাঁধা হাতের একটি আঙুলে ট্রিগার টানবার ভঙ্গি ক'রে বলল, "ধরেন গিয়া একজন দেখল সামনাটা আর ডাইন দিক্, আর-একজন দেখল পিছনটা আর বাঁও দিক্। ডাক্তারদা কাছেই থাকব গাড়ী লইয়া।"

নির্ম্মলা উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার চা ঢালতে যাচ্ছিল, ঢালল না। টেবিলে কনুই ও হাতের মুঠির উপর চিবুকের ভর রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে। দেবদারু গাছটা আজ শান্ত। থমথমে হয়ে আছে সকাল বেলাটা।

মলিনা বলল, "ডাক্তারদা সব বুঝাইয়া কইতে পারব। রিভলভারটা কি রকম কইরা ধরবেন, কোথায় রাইখা ধরবেন, কোন্‌দিক্ দিয়া কিরকম কইরা আমরা পলামু, এই সব তিনির কাছে শুনবেন।"

মলিনা এবারে আড় চোখে দেখছে নির্ম্মলাকে। নির্ম্মলা দ্বিতীয়বারের চা ঢালল।

দিবাকরের মুখটা, চোখের সামনে ভাসছে তার। সে বাঁচতে চায়। ঐ মানুষটা পৃথিবীতে আছে ব'লে সেও পৃথিবীতে থাকতে চায়। পৃথিবীর যে বাতাসে দিবাকর নিঃশ্বাস নিচ্ছে, সেই বাতাসে সেও নিঃশ্বাস নিতে চায়। বড়দিনের আর ক'টা দিন বাকী? মলিনার হাতে ফাঁসির দড়ি। রুদ্ধ ক'রে দিতে চায় সে নির্ম্মলার এই নিঃশ্বাস আর ক'টা দিন পরেই। পৃথিবী থাকবে পড়ে, থাকবে পড়ে দিবাকর।

মলিনাকে নির্ম্মলার যেমন ভাল লাগে, নির্ম্মলাকেও মলিনার ভাল লাগে খুব। আর এত বেশী ভাল লাগে ব'লেই সে অত্যন্ত ব্যথিত হয় যখন দেখে, দেশকে সে নিজে যে চোখে দেখে, নির্ম্মলা ঠিক সেই চোখে দেখে না। কেন দেখে না? নির্ম্মলার মত মেয়ের দেশকে ততটাই ত ভালবাসা উচিত, যতটা সে নিজে বাসে।

নির্ম্মলার মুখে একটু যে হাসি খেলে গেল সেটা ঠিক হাসির মত নয়। বলল, "আমি যাব না। আমাকে কি জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন?"

মলিনাও চেষ্টা ক'রে হাসল একটু। বলল, "না। ধইরা লইয়া যাওন কি যায়? যাইতে না চান, যাইবেন না। ডাক্তারদারে আইতে কমু।"

নির্ম্মলার কণ্ঠস্বরে এবার দৃঢ়তা। বলল, "খবর্দার। ওঁকে এখানে আনবেন না।"

দুজনের চা রয়েছে সামনে। জুড়িয়ে সরবৎ হয়ে যাচ্ছে চা।

নির্ম্মলার মুখে এইরকম সুরে এ ধরণের কথা শুনবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি মলিনা। রাগ করতে পারত সে, কিন্তু

করল না। একটু একটু ক'রে সে বুঝতে পারছে, যে কোনো কারণেই হোক, নির্মলার উপর রাগ করা তার পক্ষে সহজ নয়। খুব কাতর মুখ ক'রে জুড়িয়ে-যাওয়া চা-টা খেল চুচুমুক।

নির্মলা বলল, "আপনি কি ভেবেছেন বলুন ত? নার্সিং হোমের উপর পুলিশের নজর পড়লে, তাদের উৎপাত এখানে শুরু হলে খুব ভাল হবে সেটা? কত এমন রোগী আছে, ভয়েই আধমরা হয়ে যাবে। তারপর আপনি আর ঢুকতে পাবেন এখানে, না আমাকেই এরা রাখবে?"

মলিনা বলল, "ডাক্তারদাদারে আপনি চিনেন না। তিনি যদি আসে আমিই তিনিরে চিনতে পারুম না, পুলিশে চিনব কেম্‌তে? রুগী হইয়া আসব, দেখবেন।"

নির্মলা বলল, "উনি রুগী হয়ে নার্সিং হোমে এলে আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।"

মলিনা বলল, "রাগ কইরেন না।"

নির্মলা বলল, "কেন করব না রাগ? এতবার করে বলছি আমায় ছেড়ে দিন, তবু ক্রমাগত পিছনে লাগছেন, এতে মানুষের রাগ না হয়ে পারে?"

মলিনা বলল, "ছাইড়া দেওন কি আর এখন যায়?"

নির্মলা বলল, "কেন যায় না?"

মলিনা বলল, "এখন আপনে হগ্‌গল কথা জাইনা ফালাইছেন।"

নির্মলার গলার সুরে এবারে খুব উত্তাপ। বলল, "এ ত ভারি মজা দেখছি। জোর করে কতগুলি কথা শুনিয়ে তারপর সব জেনে গিয়েছি বলে দলে টানবার চেষ্টা করছেন। এরকম ক'রে লোক জুটিয়ে দল গড়লে সে দল আপনাদের টিকবে?"

চেয়ারের পিঠের দিকে ঝুলানো শান ব্যাগটা কোলের উপর এনে রাখল মলিনা। বলল, "নিজের ইচ্ছায় এই পথে কয়জন মানুষ আসে? বুঝাইয়া সুঝাইয়া আনতে হয়।"

নির্মলা বলল, "আমাকে বুঝাবার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ত আপনি করেননি? দেখতেই ত পাচ্ছেন যে আমি কিছুতেই বুঝব না। অতএব দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান, আর আমাকে দলে টানবার মৎলব নিয়ে আমার কাছে আসবেন না।"

থেকে থেকে চোখে কি একরকমের অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে নির্মলাকে দেখছিল মলিনা। কি সে ভাবছিল কে জানে? উঠে যাবার সময় শান ব্যাগটা, কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে নিতে বলল, "আইচ্ছা, আমি কমু অনে ডাক্তার-দাদারে। তিনি ছাইড়া দিতে কইলে ছাইড়া দিমু।"

ক্রমশঃ

যোহান গুটেনবার্গ

(১৩৯৮-১৪৬৮)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্তমান ফেব্রুয়ারি (১৯৬৮) মাসের প্রথম সপ্তাহে বিভিন্ন দেশে যোহান গুটেনবার্গের পঞ্চশত মৃত্যু বার্ষিকী প্রতিপালিত হইয়াছে, কোথায়ও সাড়ম্বরে, কোথায়ও বা সামান্যভাবে। গুটেনবার্গ কে ছিলেন, কেনই বা তাঁহার প্রতি মনুষ্যসমাজ এতটা শ্রদ্ধান্বিত তাহা এদেশে হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। গুটেনবার্গ প্রসঙ্গে একজন সাহিত্য-সমালোচকের কথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। তিনি একখানি প্রসিদ্ধ সংকলন গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছিলেন, হাওড়া সেতুর উপর দিয়া প্রত্যহ হাজার হাজার লোক যাতায়াত করে। কিন্তু কে এই সেতুর নির্মাতা তাহা কি আমরা কখন জানিতে চাই? তাঁহার উক্তির মানে এই যে, ইহা এতই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে—ইহা কে নির্মাণ করিলেন, না করিলেন সে কথা আমাদের মনে আসেই না। গুটেনবার্গ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। ছাপা বই পুঁথি তো আমরা কতকাল ধরিয়া পড়িয়া আসিতেছি। কিন্তু কাহার দৌলতে এটি সম্ভব হইয়াছে সে সম্বন্ধে কৌতুহল কোথায়? বই পত্র কেমন করিয়া মুদ্রিত আকারে আমাদের সম্মুখে হাজির হয় তাহার ক্রম শতকরা ৭১ জনই হয়তো আমরা জানি না। একখানি বই ছাপিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন টাইপ বা হরপ। এই হরপের আবিষ্কর্তা কে? বহু শতাব্দী পূর্বে কাঠের উপরে অক্ষর খোদাই করিয়া চীন জাপান প্রভৃতি দেশে বই পুঁথি ছাপা হইত। কাপড় ও তাসের উপর ঐ একই পদ্ধতিতে ছাপ লইবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই উপায়ে বিশাল মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ছাপা বইয়ের প্রসার আশা করা ছিল দুরাশা মাত্র। গুটেনবার্গ, যতদূর জানা যায়, একটি বিষয় উদ্ভাবন করিয়া মুদ্রণক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করেন। পূর্বে কোরিয়া এবং জাপানে ধাতুর টাইপের প্রয়োগ চালু হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু মধ্য ইউরোপের জার্মানিতে যে ধরণের ধাতুর টাইপ প্রয়োগ সুরু হইল তাহাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এমন কি এশিয়া ও অন্যান্য মহাদেশেও ক্রমে বিস্তারলাভ করে। এই ধাতুর টাইপ আবিষ্কারের গৌরব যোহান গুটেনবার্গের প্রাপ্য।

পাঁচশত বৎসর পূর্বের কথা। গুটেনবার্গ বড়লোক ছিলেন না। সামান্য অবস্থার মধ্যেই তাঁহার জীবন কাটাইতে হয়। ধাতু-টাইপ সর্বত্র চালু হইলেও ইহার আবিষ্কর্তার কথা লইয়া সে যুগে কেহ বড় একটা মাথা ঘামাইতেন না। গুটেনবার্গ সম্বন্ধে তাই লেখকবর্গকে অধিকাংশ সময় গল্প-গুজব-কাহিনী অনুমান ও সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করিয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এই সব গল্প-গুজব-কাহিনী ঝাড় পোচ্ করিয়া সাম্প্রতিক কালে তাঁহার জীবন-কথা কিছু কিছু উদ্ধার করা হইয়াছে। কোন একখানি বইয়ের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সব কিছু বলা চলে না। আবার কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন বইয়ে ভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হোক, আমরা এখানে তাঁহার জীবন-কথা সম্বন্ধে খানিকটা আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব।

গুটেনবার্গ দক্ষিণ জার্মানির মাইন্‌য্ শহরে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন তাঁহার জন্ম হয় স্বর্ণকার পরিবারে। আবার এ সম্বন্ধে ভিন্নমতও পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার প্রথম যৌবনের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও বিভিন্নলোকে বিভিন্ন কথা বলিয়াছেন। তবে এ কথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জীবিকার্জনের নিমিত্ত তিনি স্বর্ণকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। অলঙ্কার প্রস্তুতকালে এই ধাতু-টাইপ নির্মাণের কথা তাঁহার মনে জাগে। সোনার গহনা—আংটি, চুড়ি, বালা প্রভৃতির উপর গ্রাহকেরা কেহ কেহ নিজের নামের অংশ বিশেষ বা নামের আদ্যক্ষর খোদাই করাইয়া লইতে

চাহিতেন। গুটেনবার্গকে এ কাজটি হামেশা করিতে হইত। তখন তিনি ভাবিলেন, অলঙ্কারের উপরে যেমন নাম খোদাই করা যায় তেমনি ধাতুর উপরে আলাদা হরপও তো কাটা যাইতে পারে। এইরূপে স্বর্ণকারের বৃত্তি হইতে ধাতু টাইপ নির্মাণের কার্যে তাঁহার মতি জন্মিল।

কিন্তু একটি কথা। গুটেনবার্গ যৌবনেই দেনার দায়ে জড়িত হইয়া পড়িলেন। কাহার কাহার মতে বিচারে তিনি স্ট্রাচবুর্গে নির্বাসিত হন। এই নির্বাসন কালেই তাঁহার ধাতু টাইপ নির্মাণ পদ্ধতি পরিষ্কার রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি ১৪৩৪ খৃঃ হইতে ৪২ সন পর্যন্ত আট বৎসর স্ট্রাচবুর্গে ছিলেন। এই সময়ে তিনি ধাতু টাইপ নির্মাণ ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। যখন তিনি টাইপ নির্মাণে সক্ষম হইলেন তখন ইহাকে কাজে লাগাইবার জন্যও স্বতঃই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হাতে লেখা পুঁথি আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। যেমন আমাদের দেশে তেমনি অপরাপর দেশেও হাতে লেখা পুঁথির খুবই প্রাচুর্য ছিল। বহুজনে নানা লিপিকর লাগাইয়া বিবিধ বিদ্যার গ্রন্থাদি নকল করাইয়া লইতেন। দেখা যায় মধ্য যুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এইরূপ পুঁথি সযত্নে সংগ্রহের আয়োজন ছিল। পোপের তখন প্রাধান্য। ধর্মীয় পুস্তক, নির্দেশনামা, বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রভৃতিও লিপিকর দ্বারা নকল করাইয়া বিভিন্ন স্থলে পাঠান হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সীমিত। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার এই উপায়ে সম্ভব হইবার কথা নয়। গুটেনবার্গের ধাতু-টাইপ আবিষ্কার জগতে এক নূতন যুগের সন্ধান দিল।

গুটেনবার্গ স্ট্রাচবুর্গে আট বৎসর কাটাইয়া ১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দে নিজ বাসস্থান মাইনস্ শহরে ফিরিয়া গেলেন। এইখানেই অতঃপর তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৪৪২-১৪৫০, এই আট বৎসরের মধ্যে তিনি নবাবিষ্কৃত ধাতু-টাইপকে একটি শিল্পরূপে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পান। শুধু টাইপ হইলেই তো চলিবে না। এই সময়কার খুঁটিনাটি তথ্য বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে এ ক'বৎসর তিনি টাইপ প্রভৃতি মুদ্রণোপযোগী জিনিসপত্র প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ ব্যাপারেও যে অভিনিবিষ্ট হন তাহা পরবর্তী কার্যকলাপ হইতে বেশ বুঝা যায়। হয়ত এই সময়ে চার্চের নির্দেশনামা, বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রভৃতি ছোট-খাটো ছাপার কাজে তিনি হাত দিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার মুদ্রণ কার্য রীতিমত সুরু হয় ১৪৫০ খ্রীঃ হইতে। এই সনে দেখি গুটেনবার্গ মুদ্রণ সংক্রান্ত টাইপ আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি বন্ধক রাখিয়া 'ফুষ্ট' (Fust) একজন স্থানীয় উকিলের নিকট হইতে আটশত গিলডার (স্বর্ণমুদ্রা) ধার করেন। অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল মুদ্রণ কার্য সুষ্ঠুরূপে চালু করা। খুচরা ছাপার কাজ বাদে ছত্রিশ পঙ্ক্তি পাতা বিশিষ্ট বাইবেল মুদ্রণেও তখন লাগিয়া যান। কিন্তু গুটেনবার্গের বিয়াল্লিশ পঙ্ক্তি পাতা বিশিষ্ট বাইবেলেরই সমধিক প্রসিদ্ধি। এই কথাই একটু বিশদ করিয়া বলি। গুটেনবার্গ যে অর্থ ধার করিয়াছিলেন তাহা বৎসর দু'য়েকের মধ্যে ফুরাইয়া যায়। তিনি এবারে ফুষ্টের নিকট হইতে পুনরায় আট-শত গিলডার গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে ছাপাখানার অংশীদার করিয়া লন। 'ফুষ্টে'র পক্ষে স্কফার নামক এক ব্যক্তি ইহার পরিচালনায় গুটেনবার্গকে সাহায্য করিতে থাকেন। এই স্কফার অল্পকালের মধ্যে ফুষ্ট কন্যাকে বিবাহ করেন। এবং তিনিই পরে মূল অংশীদার হন।

নূতন ব্যবস্থাপনায় গুটেনবার্গ পূর্ণোদ্যমে কার্য আরম্ভ করিলেন। খুচরা কাজ বাদে একটি বড় ব্যাপারে তিনি হাত দেন। একটু আগেই বিয়াল্লিশ পঙ্ক্তি বাইবেলের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই বাইবেলখানির প্রতি-পাতায় দুই স্তম্ভ, প্রতি-স্তম্ভে বিয়াল্লিশটি করিয়া পঙ্ক্তি ছিল। এই কারণেই ইহাকে বিয়াল্লিশ পঙ্ক্তি বাইবেল বলা হইত। ছাপা শেষ হইতে চারি বৎসর লাগে। তখনকার দিনে অভিজাত শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য করিবার নিমিত্ত বই-পুঁথি ভেড়ার চামড়ার উপরে দক্ষ নকল নবিশ দিয়া লেখা হইত। গুটেনবার্গ ভেড়ার চামড়ার উপরে এই প্রথম বাইবেল ছাপিতে আরম্ভ করেন। শেষ হইলে দেখা গেল, পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১২৮২। এক

শত কুড়িখানি এইরূপ বই ছাপা হইল। এক একখানি বইয়ের জন্য প্রয়োজন হয় তিনশতটি ভেড়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাইবেল ছাপার কাজ শেষ হইবার পূর্বেই ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গুটেনবার্গ অংশীদারের সঙ্গে মামলায় জড়াইয়া পড়েন। দেনার দায়ে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে এই বড় সাধের ছাপাখানাটি ছাড়িয়া একেবারেই চলিয়া আসিতে হয়। ইহার এক বৎসর পরে, ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিয়াল্লিশ পঙক্তি বাইবেল ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হইল। এই সুবিখ্যাত বাইবেলখানির কিছু কিছু অংশ জার্মাণির বিখ্যাত লাইব্রেরি সমূহে সুরক্ষিত হইয়া আছে।

গুটেনবার্গ ইহার পর ছোট আকারে পুনরায় ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং সামান্য সামান্য কাজ লইয়া উহা ছাপিতে থাকেন। তাঁহার যে খুবই কষ্টে দিন গুজরান হইতেছিল তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ইহার মধ্যেও সাহসে ভর করিয়া তিনি একটি খুব বড় কাজে হাত দিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি ক্যাথলিকন নামে একখানি সাইক্লোপিডিয়া বা কোষগ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি এতদিন পাণ্ডুলিপির আকারেই পড়িয়া ছিল। গুটেনবার্গ এখানি উদ্ধার করিয়া ছাপিবার মনস্থ করেন। বিয়াল্লিশ পঙক্তি বাইবেলে তিনি যে টাইপ ব্যবহার করেন এবারে তাহা পরিত্যক্ত হইল। তিনি ক্যাথলিকনের জন্য ক্ষুদ্রতর হরপ প্রস্তুত করিলেন। তথাপি এই কোষগ্রন্থ প্রায় আটশত পৃষ্ঠা পরিমিত হয়। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইহার ছাপা শেষ হইল। বলা বাহুল্য সাধারণের পক্ষে সুলভ করিবার জন্য ইহা কাগজেই ছাপা হয়।

কিন্তু বিপদের উপর বিপদ। যদি বা পূর্বের ধাক্কা কোন রকমে কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, এবারে যে বিপদ আসিল তাহাতে একেবারে বিপর্যস্ত হইলেন। মাইনৎস্ শহর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইল। ছাপাখানা সমেত গুটেনবার্গের ঘরবাড়ি সবই শত্রুর আক্রমণে বিনষ্ট হয়। পরের উপর বোঝা স্বরূপ হইয়া থাকা ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না।

প্রথম দিককার ছাপাখানার কাজে যে ধরণের পরিশ্রম করিতে হইত, আজিকার দিনে তাহা বুঝি কল্পনারও অতীত। গুটেনবার্গ স্বয়ং ধাতু গলাইয়া, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হরপ তৈরি করিতেন, কেস সাজাইতেন, কম্পোজ করিতেন, আবার তাহা হইতে ছাপ লইয়া প্রুফ সংশোধন করিতেন। আজিকার দিনে যেমন, সংশোধনান্তর কেস সমেত তিনি যন্ত্রে চড়াইতেন এবং নিজেই সব কিছু ছাপিতেন। এই সকল কাজ খুবই শ্রমসাধ্য সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা চোখের উপরেও খুব ধকল লাগিত। ফলে গুটেনবার্গ সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া অন্ধ হইলেন। জীবনে বাকি ক'বৎসর স্থানীয় চার্চের নিকট হইতে মাসোহারা পাইয়া কোন রকমে দিনগুলি অতিক্রান্ত করেন। অবশেষে ১৪৬৮, ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা গেলেন। নিজেকে আহুতি দিয়া গুটেনবার্গ যে বিরাট শিল্পের সূচনা করিয়া যান পরবর্তীকালে বিশ্ববাসী তাহার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হন।

গুটেনবার্গের মৃত্যুর পর এই শতাব্দীর মধ্যেই দেখিতে দেখিতে এই শিল্পটি জার্মাণির সীমানা ছাড়াইয়া মধ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিকড় গাড়িতে শুরু করিল। শীঘ্রই মুদ্রণ-শিল্প একটি লাভজনক ব্যাপারে পরিণত হয়। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ক্লাসিক্সগুলির পাণ্ডুলিপি হইতে গ্রন্থরাজি মুদ্রণে শিল্পানুরাগীরা লাগিয়া গেলেন। ইটালি জার্মাণি হল্যাণ্ড বেলজিয়াম ফ্রান্স স্পেন ব্রিটেন বিভিন্ন দেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং ঐ ঐ দেশের বিখ্যাত লেখকবর্গের গ্রন্থ সমূহ যাহা এত দিন মাত্র পুঁথির মধ্যে লুক্কাইত ছিল, এবং অল্প কয়েকজনেরই আয়ত্তে আসে, এই শিল্পের দৌলতে তাহা সাধারণ মনুষ্যসমাজের নিকট সহজলভ্য হইল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্ট্যানটিনোপোলের পতনের পর তথাকার পণ্ডিত মনীষীবর্গ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়া আশ্রয় লন। তাঁহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যান গ্রীক-সাহিত্য ভাণ্ডার। ইউরোপের রিনায়াসান্স বা নবযুগ আনয়নে যেমন এই সাহিত্য ভাণ্ডার বিশেষ কার্যকরী হইয়া উঠে তেমনি তাহাকে স্থায়িত্ব দানের মূলে ছিল গুটেনবার্গ কর্তৃক নবাবিষ্কৃত ধাতুর টাইপ ও মুদ্রাযন্ত্র।

নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

দেশ ও সমাজের কাছে যিনি বরেণ্য, মানুষের হৃদয়ে যিনি মহামানবরূপে পূজিত, দেখা যায়, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিঃসঙ্গ ও একক। এ'র একটি কারণ এই যে, তিনি সর্ববিষয়ে সময়ের অগ্রগামী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর প্রগামী চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা সহগামীদের পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না। বন্ধুবান্ধব এমন কি আত্মীয়স্বজনও সেই মহৎ আদর্শের সামনে বাধার মত এসে দাঁড়ায়। ফলে, দেশ ও কালের নিয়মকে যিনি নতুন করে গড়তে এসেছেন, তিনি ব্যক্তিগতজীবনে হন একক ও সঙ্গীহীন। বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে এ' কথা বিশেষ ভাবে বলা যায়। তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ'কথা অনুভব করেছেন [বিদ্যাসাগর জীবনচরিত] যে ব্যক্তিগতজীবনে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। আপন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে দেশ কাল ও সমাজের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন যুদ্ধ করেছেন। তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসজনিত অসহিষ্ণুতাও তাঁকে পারিবারিক জীবনেও দুঃখের পথেই টেনে নিয়ে গেছে।

বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে তিনি আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছেন, এ'র দায়িত্ব হয়ত সবটুকু বন্ধুবান্ধবদের নয়। অর্থাৎ বাইরের জগতে যিনি অবিচল বিপ্লবী, বন্ধু ও স্বজনের জগতেও তিনি অসহিষ্ণু ব্যক্তিত্ববাদী। অসহিষ্ণুতা এমন একটি বস্তু যা' প্রখর আত্মবিশ্বাস, মর্যাদাবোধ ও স্পর্শসচেতন মনোভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। বহু বিশিষ্ট জননায়কের চরিত্রেই এই অসহিষ্ণুতার ভাব প্রত্যক্ষ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনে এ'র ফলে যে ঝড় নেমে এসেছে, তাতে তাঁর নিজের জীবনই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেছে।

বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর নাম করা যেতে পারে। তাঁদের অন্যতম হ'লেন শ্রীমদনমোহন তর্কালঙ্কার। মদনমোহন তাঁর বাল্যবন্ধু এবং সমমতাবলম্বী ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করার জন্য তাঁকেও অনেক কৃচ্ছ্রতা ও ক্লেশ সহ্য করতে হ'য়েছে। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর অগ্রণী হ'লে মদনমোহন তাঁর মেয়েদুটিকেই আগে পাঠিয়েছেন। সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারির ব্যাপারেও তাঁর সহায়তা বিদ্যাসাগর স্বীকার করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদনমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে বিরোধ জেগেছে, তার ফলে দুজনেই দুজনের মুখ দর্শন করা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মদনমোহনের জামাতা যোগেন্দ্রনাথও এ বিরোধের সূত্র নিয়ে বিদ্যাসাগরকে গালি দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরও কম বেদনা পান নি। মদনমোহনের মৃত্যুর পরে তাঁর মাতা ও কন্যাকে তিনি মাসোহারা দিয়েছেন। কিন্তু বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনাও ভোগ করেছেন।

বিচ্ছেদ ঘটেছে তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গেও। বহুবিবাহ নিরোধের চেষ্টায় বিদ্যাসাগর যখন দাঁড়ালেন, তখন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বহুবিবাহের কুফলগুলিকে একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করে দেখালেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। তৃতীয়তঃ বহুবিবাহ 'শাস্ত্রবিরুদ্ধ' ঘোষণা করে বহুবিবাহরোধের অনুকূলে আইন সৃষ্টির চেষ্টা করলেন।

তারানাথ 'বহুবিবাহ' যে কুপ্রথা একথা স্বীকার করে

বললেন—বহুবিবাহ রোধ হওয়া উচিত। কিন্তু এই কাজকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলতে তিনি অস্বীকার করলেন এবং প্রকাশ্যে যুক্তি ও উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন—'বহুবিবাহ' শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

এ'র ফলে তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ হ'য়ে গেল।

রাজা রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ বিধবাবিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াতে রাজি হননি। ফলে বিদ্যাসাগর তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করেন। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যে অকুণ্ঠ সমর্থন দেবে না, কিম্বা তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে—এটা অনেক সময়ই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ফলে বিরোধ আসন্ন হয়ে উঠতো।

সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে হ'য়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁকে—শত্রু বলে গণ্য করেছে। প্রকাশ্য রাস্তায় তাঁর ওপর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ বর্ষিত হ'য়েছে। কিন্তু যিনি বিপ্লবী মনোধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তাঁকে সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হ'য়েই আসতে হয়। বিদ্যাসাগরও সেদিন একক যোদ্ধা ছিলেন। কোন ভয়ই তাঁকে শিথিল করতে পারেনি। সরকারী রোষকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। চাকরি ছেড়ে দিয়েও দায়িত্বপালনে পরাঙ্মুখ হন নি। কিন্তু তবুও আঘাত পেয়েছেন, যখন প্রত্যাঘাত এসেছে অন্তরঙ্গদের কাছ থেকে।

তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে বহুলোক তাঁকে ঠকিয়েছে। যারা তাঁর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, তারাও পরবর্তীকালে তাঁকে উপেক্ষা করেছে। জনৈক টোলের পণ্ডিত তাঁর কাছ থেকে মাসিক অর্থসাহায্য নিয়েছে, তার প্রথমা পত্নী ও প্রথমা পত্নীর কন্তাকে পালনের জন্ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেছেন বিদ্যাসাগর যে, কন্তাকে আদৌ আশ্রয় দেননি। কোন দুঃস্থ ছাত্রকে বছরের পর বছর ধরে তাঁর প্রকাশিত বইগুলি সাহায্য হিসাবে দেওয়ার পর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেছেন যে, সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুঃস্থও নয়, ছাত্রও নয়। এক অসাধু পুস্তক-বিক্রেতা। ফলে মানুষের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যেন শিথিল হ'য়ে এসেছে।

চিন্তায় অতি স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকার জন্ত—প্রতিক্ষেত্রেই এই বিরোধ সুস্পষ্ট। একদিকে চাকরির স্থান থেকে সরে আসতে হয়েছে; গভর্ণর ক্যাম্পবেলের সঙ্গে মত-পার্থক্য ঘটায় তাঁর বইগুলি পাঠ্যপুস্তকের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অন্তদিকে বেথুন স্কুল, ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউ-শন, হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্যুয়িটি ফাণ্ড, প্রত্যেকটি থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেরিয়ে যেতে হ'য়েছে। মৃত্যুর পূর্বাহ্নে ভ্রষ্টা বিধবা নারীর উত্তরাধিকারগত প্রশ্নে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তৎকালীন বঙ্গসমাজ তার জন্ত তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিল। এমন কি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সুহৃদ দ্বারকানাথ মিত্রও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত পোষণ করেছেন।

অবশ্য এ'গুলো এমন কিছু নয়। যে বিদ্রোহী প্রচলিত চিন্তাধারায় ভাঙন ধরাতে আসে, তাকে অনেক বেশী বাধা, অনেক বড় আঘাত সহ্য করতে হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর বিদীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিলেন পারিবারিক জীবনের কয়েকটি ঘটনায়।

অনুজ দীনবন্ধু ও ঈশানচন্দ্রের বিরোধ বিদ্যাসাগরের জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা। এর ফলেই বিদ্যাসাগর স্বগ্রাম বীরসিংহ চিরদিনের জন্ত ত্যাগ করে চলে আসেন।

দীনবন্ধু বা তৃতীয়ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র সম্বন্ধে অভিযোগ করার মত খুব বেশী কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় শম্ভুচন্দ্র অগ্রজের প্রভাবে তাঁর আজ্ঞাবর্তী হ'য়েই জীবন কাটিয়েছেন। দীনবন্ধু পণ্ডিত দয়ালু ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন—তা'ও শম্ভুচন্দ্রের লেখা 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' থেকে জানা যায়

দীনবন্ধুর সঙ্গে বিরোধের সূচনা ১৮৬৮ সালে। প্রেসের কাজ কিছুতেই ভালভাবে চলছিল না। বিদ্যাসাগর কতকটা বিরক্ত হয়েই প্রেস ও ডিপোজিটরি ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় নামের এক ভদ্রলোককে দান করেন।

অথচ বিদ্যাসাগর প্রেস ছেড়ে দেবেন শুনে প্রেস কিনবার জন্য কোন ব্যক্তি দশহাজার টাকা দাম দিতে চান। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের মাথার পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মত ঋণ। স্বভাবতঃই প্রেস দান করার সংবাদে তাঁর ভাইয়েরা বিক্ষুব্ধ হন। দীনবন্ধু আপত্তি জানিয়ে বলেন—প্রেসে আমারও অংশ আছে; আমার অংশ তুমি দান করতে পারো না।

কোন কাজে বাধা পেলে বিদ্যাসাগর ক্রুদ্ধ হয়ে পড়তেন। নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে আপত্তি আসায় তিনি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে পড়লেন। তখনই ব্যাপারটির নিষ্পত্তির জন্য দুর্গামোহন দাস নামের এক সম্ভ্রান্ত উকীলকে সালিশী নিযুক্ত করেন। সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয় শম্ভুচন্দ্র ও পিতৃব্যপুত্র পীতাম্বরকে এবং আরও কয়েকজনকে। বিরোধ প্রকাশ্যে গিয়ে পড়ছে দেখে শম্ভুচন্দ্র ও দীনবন্ধু অত্যন্ত লজ্জিত হন। শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে তখন দীনবন্ধু একটি লিখিত পত্রের মারফৎ প্রেসের ওপর তাঁর সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করেন। এই ঘটনার ফলে বিদ্যাসাগর ও দীনবন্ধুর মধ্যে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায়। এমন কি দীনবন্ধুর স্ত্রীকে পাঠানো টাকা বিদ্যাসাগরের কাছে ফেরত আসে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে আর একটি ঘটনা ঘটে। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ দিতে পারাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় সৎকর্ম বলে মনে করতেন। অথচ এই বিধবাবিবাহের সহায়তা করার জন্যই ভাইয়েদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে পৌঁছলো।

ক্ষীরপাই গ্রামের অধিবাসী জনৈক শিক্ষক মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বালবিধবা মনমোহিনী দেবীকে বিয়ে করতে চান। বিদ্যাসাগর খুশী হ'য়ে এই বিয়ে দিতে বীরসিংহ গ্রামে এলেন। এদিকে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদাররা বিদ্যাসাগরের বন্ধু। মুচিরাম হালদারদের ধর্মপুত্র। হালদাররা এসে ধরলেন বিদ্যাসাগরকে এ' বিয়ে তিনি যেন না দেন। বিদ্যাসাগরও কথা দিলেন—এ'বিয়েতে কোন সাহায্য তিনি আর করবেন না।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের এ' এক দুর্বোধ্য রহস্য। যিনি বিধবা বিবাহ দেওয়াকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সৎকর্ম বলে মনে করেন এবং এরজন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, তিনিই হালদারদের অনুরোধে এই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে রাজি হ'লেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতেই তাঁর নিষেধ অমান্য ক'রে বিবাহ দেওয়ালেন দীনবন্ধু ও ঈশানচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের কানে যখন পৌঁছলো, তখন তিনি এতই উত্তেজিত হ'লেন যে, সঙ্গে সঙ্গে বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গেত সম্পর্কচ্ছেদের সংকল্প গ্রহণ করলেন। ভবিষ্যতে আর কখনও তিনি বীরসিংহে আসেন নি। স্বেচ্ছায় নিজের জন্মভূমি থেকে নিজেকে বিচ্যুত ক'রে নিয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর জীবনের এ' এক করুণ ট্র্যাজেডি।

ঋণভারে বিদ্যাসাগর তখন জর্জরিত। অথচ প্রচুর দায়িত্ব মাথায়। পাইকপাড়ার রাজবাড়ী থেকে রাণী স্বর্ণময়ী প্রত্যেকের কাছে তাঁর ঋণ। দুর্গাচরণ বাবুর গচ্ছিত ঋণপত্রও তিনি বন্ধক দিয়েছেন। মাঝে মাঝে ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ভাবেন—আর না, থাক্ বিধবাবিবাহের ঝামেলা। আমি আর খরচ করে বিয়ে দিতে পারবো না। মাঝে মাঝে ভাবেন, আবার ফিরে যাই সরকারী চাকরিতে। মনের এই নিঃসঙ্গতা ও ক্লান্তির মুহূর্তে ছুটে গিয়েছেন নির্জন কার্মাটাঁরের বাংলোতে।

১৮৭২ সালের জুনমাসে দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনী দেবীর বিয়ে দিলেন। পুরুলিয়ার সাব-রেজিষ্ট্রার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। আর ১৮৭৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তাঁর বড় মেয়ে হেমলতা বিধবা হ'য়ে দুটি শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। এই দুই দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র (সমাজপতি) ও জ্যোতিষচন্দ্রকে বড় করে তুলবার দায়িত্বও আবার বিদ্যাসাগরের ওপরেই এসে পড়ল। কিন্তু ইতিমধ্যে

আর একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। সে ঘটনা হলো একমাত্র পুত্র নারায়ণের সঙ্গে।

নারায়ণ বিয়ে করেন ১৮৭০ সালে—বাংলা ২৭শে শ্রাবণ। পাত্রী খানাকুল নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী, বয়স ষোল। তখন নারায়ণের বয়স একুশ। অনুজ শম্ভুচন্দ্রই বিদ্যাসাগরকে জানান যে, নারায়ণ ওই পাত্রীটিকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। বস্তুতঃ এই বিবাহ নারায়ণের সঙ্গে ভবসুন্দরীর পূর্বরাগের ফল। অথচ ভবসুন্দরীর জন্য বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই অন্যত্র পাত্র স্থির করেছিলেন। নারায়ণের মা দীনময়ী দেবীও এই বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদ্যাসাগর শুনলেন যে নারায়ণ এই মেয়েটিকেই বিয়ে করতে চান, কর্তব্য স্থির করতে তিনি একটুও দ্বিধা করেন নি। শম্ভুচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগর—"......কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি।"

বিদ্যাসাগর কোনদিনই নারায়ণের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। পিতা ঠাকুরদাসের কাছে তিনি অনুযোগ করেছেন, যে তাঁর অতি আদরে নারায়ণ বিপথে যাচ্ছে। বিবাহের পরবর্তী জীবনেও নারায়ণ সংযত বা শোভনচরিত্রবিশিষ্ট হন নি বলেই বিদ্যাসাগর মনে করেছেন। তার ব্যবহারে ও আচরণে তিনি এতই বিক্ষুব্ধ হন, যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করলেন বিদ্যাসাগর। নারায়ণের প্রতি তাঁর ক্রোধ এতই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে, পুত্রকে তিনি তাঁহার গৃহে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তাঁর উইলেও বিদ্যাসাগর লেখেন—"আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি।"

নারায়ণজননী দীনময়ী দেবীর কাছে এ ঘটনা মর্মান্তিক। স্বামীর কর্তব্যনিষ্ঠার রূঢ়তায় তিনি আহত হ'লেন। একমাত্র পুত্র বাড়ী থেকে বিতাড়িত হওয়ায় তিনি যে আঘাত পান, তার আর উপশম হয়নি। ফলে বিদ্যাসাগর ও তাঁর স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মধ্যে আর দাম্পত্যজীবনের কোন মাধুর্য্য ছিল না। [Subal chandra Mitra—Iswar Chandra Vidyasagar পৃঃ ৬৪৫] বিদ্যাসাগর ও দীনময়ী দেবী একত্রও থাকতেন না। অবসর সময়েও বিদ্যাসাগর কার্মাটারের নির্জন পল্লী নিবাসে গিয়ে থাকতেন।

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে দীনময়ী যখন মারা যান, তখনও নারায়ণ তাঁর সামনে আসতে পারেন নি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি কপালে করাঘাত করে আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

বিদ্যাসাগর আরও তিন বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু রোগে জীর্ণ, শোকতপ্ত সে আর এক বিদ্যাসাগর। স্ত্রীর সঙ্গে মনান্তর ও একমাত্র পুত্রের বিচ্ছেদকে তিনি যতই নীরবে সহ্য করুন, এ'র ফলে তাঁর হৃদয় যে বিদীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ' বেদনা তিনি আমৃত্যু ভোগ করেছেন।

স্মৃতির টুক্‌রো

সাতকড়িপতি রায়

তার বিয়ে হয় গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুদের এলগিন রোডের বাড়ীতে। তারপর পাঁচ বৎসর রাঁচীতে চাকরী। ফিরে এসে দাদার দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে মেদিনীপুরে এবং তৃতীয় কন্যার বিয়ে কলকাতায়। তারপর আবার জ্যেঠতুত ভাই বিমলদাদার দুই কন্যার ও জানকীদাদার এক কন্যার বিবাহ আমার বাসার থেকে দিই। এরপর আরম্ভ হোল আমার নিজের ছয়টি মেয়ের, দাদার বাকী তিনটি মেয়ে ও ছোট ভায়ের একটি মেয়ের বিয়ে। এটা চলে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত। এর মধ্যে আমার দাদার এবং ছোট ভায়ের পুত্র পাঁচজনের বিবাহ দিই। পরে ১৯৪৩ সালে আমার তৃতীয় পুত্রের এবং ১৯৪৪ সালে দাদার কনিষ্ঠ পুত্রেরও বিবাহ দিলাম। তারপর আবার আরম্ভ হ'ল নাত্‌নীদের বিয়ের পালা এবং আমার সর্ব্ব-কনিষ্ঠা দুই যমজ কন্যার বিবাহ। এখনও বেঁচে আছি ব'লে এখনও বিবাহের ঘটকালি সাঙ্গ হয় নি। সবশুদ্ধ প্রায় ৪৪।৪৫টির বিবাহ দেওয়া হয়ে গেছে। মরবার পূর্ব্বে সাঙ্গ হবে কি?

বিবাহের প্রসঙ্গটা ব'লছি এইজন্যে যে হিন্দুসমাজের যত রকম সংস্কার আছে তার মধ্যে বিবাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার। বিবাহ বিষয়ে জীবনের গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত বহুরকম পরিবর্ত্তন দেখলাম। জীবনের গোড়ায় দেখেছি ভদ্রবংশের পাত্র পাত্রী হ'লেই বিবাহ হ'ত এবং সেটা হ'ত অল্পবয়সে। ক্রমে দেখলাম কন্যার কেবল রূপ হ'লেই হবে না, লেখাপড়া (ইংরাজী) জানা চাই, গান জানা চাই এবং তার সঙ্গে টাকা। পাত্রের লেখাপড়া জ্ঞান ও উপার্জ্জনক্ষম কিনা দেখার ব্যবস্থা হল। বংশ পরিচয়ের বিষয়ে আর বিশেষ প্রয়োজন তত' নয়। ক্রমশঃ দেখছি এখন মেয়ের যত বয়স বাড়বে তত পাত্রেরও দৈহিক রূপলাবণ্যের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। অর্থাৎ, তখন যে সংস্কৃত বচন ছিল—"কন্যা বরয়তে রূপম্, মাতা বিত্তম, পিতা শ্রুতম্। বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি, মিষ্টান্নমিতরে জনা।" তার মধ্যে ঐ "কুলমিচ্ছন্তি" বাদ দিয়ে বাকীগুলি সবই খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখনই ময়লা রং-এর মেয়েদের অন্য সবগুণ থাকলেও, অর্থাৎ লেখাপড়া জানে, গান শিখেছে, গৃহকর্ম্মে-নিপুণা হলেও পাত্র জোটা দায় হয়ে পড়েছে। আবার বেশী লেখাপড়া শেখা কন্যার পক্ষে পাত্র পাওয়া মুস্কিল হয়েছে। তাই ভাবি সমাজের অবস্থা কোন দিকে চলেছে? অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ হ'লে তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের পূর্ব্বেই তারা শ্বশুর গৃহে গিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদ নিয়ে একরকম মানিয়ে নিত। কিন্তু এখন বেশী বয়সে ব্যক্তিত্বটা পাকা হবার পর বিয়ে হয়ে শ্বশুরগৃহে মানিয়ে চলা দায় হ'য়েছে। তাই তার যৌথসংসার থাকছে না। এমন কি শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গেও সংসারে থাকা অসুবিধা হচ্ছে ব'লে পিতৃমাতৃ-ভক্ত পুত্রকেও ভিন্ন সংসার করতে হচ্ছে। এতে সমাজের ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে সেটা বলা শক্ত। আমি প্রাচীন ব্যক্তি। সুতরাং আমি ত' যৌথপরিবারের পক্ষপাতী হবই। কিন্তু এই অনটনের দিনে কোন্‌টা ভাল, অর্থাৎ প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী ও দুটি পুত্রকন্যা নিয়ে পৃথক পৃথক সংসার ভাল কিম্বা, বৃদ্ধ পিতামাতার সঙ্গে সন্তানগণের নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকা ভাল, এর মীমাংসা করা বড়ই শক্ত। কিন্তু এটা খুবই ঠিক এবং এতে দ্বিমত হওয়াও উচিত নয় যে যখন প্রত্যেক মহিলার ব্যক্তিত্ব পাকা হবার পর বিবাহ হচ্ছে তখন পৃথক ব্যবস্থাই যেন সংসারে শান্তির উপযোগী বলেই মনে হয়। যদি আমাদের

শিক্ষার মধ্যে ত্যাগের শিক্ষা থাকত এবং সেটা যুবক-যুবতীর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যেত, যদি সেবার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকত' এবং প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী জীবনে 'সেবা" করা ধর্ম্ম অথবা কর্ত্তব্য বলে মেনে নিত, তবে যৌথসংসারে-ই এই অনটনের দিনে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা বলে মনে হত। কিন্তু যখন সে শিক্ষা নাই, বরং আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী বেশীর ভাগ স্বার্থপরতা-ই শিক্ষা করে, সেখানে যৌথপরিবারের স্থান কোথায়? যৌথপরিবারে যে দেখা যেত, একভাই বেশী রোজগার করে, আর এক ভাই কম রোজগারী কিন্তু সাংসারিক সুখ-দুঃখ, খাওয়া-পরা ইত্যাদি বিষয়ে উভয় ভ্রাতাই তাদের স্ত্রী-পুত্রসহ সমান পর্য্যায়ে রয়েছে। সে ভাব আর আশা করা যায় না।

(১৭)

মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় মহিষাদল রাজ-ষ্টেট্ একটা বেশ বড় জমিদারী। জমিদারগণ কনৌজ ব্রাহ্মণ। তাঁদের জমীদারী চার-পাঁচ পুরুষ ধরে। তমলুকে একটা খুব বড় মাহিষ্য জমিদারী ছিল,—তাদের তমলুকের রাজা বলত'। তাদেরই সমস্ত জমিদারী মহিষাদল জমিদার ষ্টেটে চ'লে যায়। আমি যে সময়ের কথা বলছি, ১৯১৫-১৯১৬ সালে, তখন তমলুকের রাজার কিছু নিষ্কর সম্পত্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। মহিষাদলের তখন titled 'রাজা' হচ্ছেন,—রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ এবং তাঁর ভ্রাতা শ্রীগোপালপ্রসাদ গর্গ। মেদিনীপুর জঙ্গল মহলে কতকগুলি ষ্টেট ছিল যাতে Law of Primogeniture ছিল অর্থাৎ বংশের জ্যেষ্ঠ পুরুষসন্তানই জমিদারীর অধিকারী হতেন,—অন্যান্য সন্তানগণ 'বাবুয়ানা' ও 'খোরপোষ' পেতেন,—যেমন চিল্কিগড়, ঝাড়গ্রাম, রামগড়, লালগড়, নাড়াজোল প্রভৃতি। মহিষাদল কিন্তু নূতন জমিদারী এবং জমিদার বংশ কনৌজ ব্রাহ্মণ। সুতরাং এই ষ্টেটে ঐরূপ কোনও আইন ছিল না। তবে 'মিতাক্ষরা' আইন বলবৎ ছিল। আমি পূর্ব্বে ব'লেছি যে মেদিনীপুর জেলায় ১৯১০ সাল থেকে জেলা সেটেলমেন্ট হয়। ঐ সেটেলমেন্টের final publication হবার পর রাজার সেরেস্তা থেকে প্রজাদের বিরুদ্ধে খাজনাবৃদ্ধির দরখাস্ত করা হয়। সে প্রায় ৭।৮ হাজার দরখাস্তের উপর ৭।৮ হাজার মকর্দ্দমা কায়েম হয়। পূর্ব্বে বলেছি মেদিনীপুরে প্র্যাকটিস্ করবার সময় আমার সেটেলমেন্ট কোর্টে খুব প্রাকটিস জমেছিল এবং নামও হয়েছিল। ১৯১৫ সালের শেষ বা ১৯১৬ সালের প্রথম মহিষাদল রাজার তদানীন্তন ম্যানেজার শচীনবাবু হাইকোর্টে আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে রাজার পক্ষে ঐ সকল মকর্দ্দমা চালাবার ভার লইবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমিও সে ভার গ্রহণ করি। আমার সঙ্গে চুক্তি হয় প্রত্যেকদিন ২০০্ টাকা ফি এবং কলকাতা থেকে যাতায়াতের খরচ ও মহিষাদলে থাকা-কালীন খাওয়া-থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাজ-ষ্টেটের। চারটী ক্যাম্পে চারজন অফিসার বিচার করবেন। সুতরাং আমার অধীনে মেদিনীপুর থেকে দুইজন এবং তমলুক থেকে একজন জুনিয়ার উকিল কাজ করবেন। এঁদের মাসিক মাহিনায় বন্দোবস্ত করা হল। এইভাবে আমি আড়াই বৎসর কাজ করি। কলকাতার হাইকোর্টে সপ্তাহে দুদিন বা তিনদিন এবং মহিষাদলে বাকী ক'দিন থাকতাম। মেদিনীপুর থেকে আমার বন্ধু বরেনদেব ও অতুল বোস (যিনি পরে কংগ্রেসের বড় নেতা হয়েছিলেন,-আজ মৃত) এবং তমলুকের বঙ্কিম ভৌমিক আমার অধীনে নিযুক্ত হন। তাঁরা মেস করে থাকতেন,—আমি রাজার গেষ্ট হাউসে থাকতাম রাজার অতিথি হিসাবে।

মহিষাদল রাজ-ষ্টেটের ব্যবস্থা অনেকটা ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কালেক্টারী ব্যবস্থার মতন ছিল। আমি ঐরূপ ব্যবস্থা ঐখানে এবং বর্দ্ধমান মহারাজার ষ্টেটে দেখেছি। ঐরূপ বন্দোবস্ত থাকায় সুশৃঙ্খলে কাজ হত। বাংলার যে কতপ্রকার এবং কতস্তরের ল্যাণ্ড টেনিওর ছিল তার জ্ঞান আমার সম্পূর্ণ হয়েছিল এই মকর্দ্দমাগুলি করতে গিয়ে। আমি পূর্ব্বে বলেছি ছোটনাগপুরে সেটেলমেন্টে এতরকম টেনিওরের বালাই ছিল না। কেবল জাইগার টেনিওর

ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু বাংলায় টেনিওয়ের স্তর দশ-বারোটাও ছিল কোন কোনও ষ্টেটে। এখন অবশ্য সবই লোপ পেয়েছে,—গভর্ণমেন্টের হাতে গেছে। এখন সরকার রাজা চাষী প্রজা। ঐসব টেনিওরের সৃষ্টি হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যে।—

মহিষাদলের রাজপরিবারের ইতিহাস আমি বিশেষ জানতে পারিনি। মকর্দ্দমা নিয়েই আমাকে বিব্রত থাকতে হত। তবুও শুনেছিলাম তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছিলেন উত্তর প্রদেশ থেকে ঐ অঞ্চলে। ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয়। তখন তমলুকের রাজার পড়তি অবস্থা। সুতরাং জমিদারী হস্তান্তর হ'য়ে যায়। বাংলার অধিকাংশ জমিদারের যা ইতিহাস দেখেছি, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। জমিদারগণ আলস্যে এবং ব্যসনে জীবন অতিবাহিত করতেন। রাজা সতীপ্রসাদ মহাশয় প্রাতে উঠে পূজার্চ্চনা করতেন। বৈকালে টেনিস খেলতেন। কিন্তু, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতিশয় ব্যসনে আসক্ত ছিলেন। রাত্রি ই ব্যসনের সময়। সুতরাং অধিক রাত্রে শুতে যেতেন এবং অনেক বেলাতে ঘুম থেকে উঠতেন। রাজবাটীর কম্পাউণ্ড প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। যে গেট্ দিয়ে প্রবেশ পথ তার উপরেই গেষ্ট হাউস। মহিষাদলের পাশ দিয়েই গেঁওখালি থেকে উড়িষ্যা কোষ্ট কেনাল চলে গেছে। আমি যাতায়াত করতাম কলকাতা থেকে হোরমিলার কোম্পানীর ঘাঁটাল যাওয়ার ষ্টীমারে চেপে গেঁওখালিতে নেমে ঐ ক্যানেলের ভিতর দিয়ে ভাউলে (নৌকা) করে চলে যেতাম। আবার ঐ পথেই কলকাতা ফিরে আসতাম। প্রজাদের পক্ষে তমলুকের যে উকিল-বাবুরা ছিলেন তাঁরা বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের বিধানমতে যতরকমের আপত্তি দেওয়া চলে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনকে, যিনি ঐ আইনের উপর বই লিখেছিলেন,—নিয়ে গিয়ে সওয়াল জবাব করিয়েছিলেন। যাইহোক্, আইনের তর্কে রাজারই জিত্ হয়েছিল এবং তারপর বহু প্রজা মকর্দ্দমার মীমাংসা করে নিয়েছিল। মোটের উপর মহিষাদল ষ্টেটের আয় বৎসরে প্রায় ২৫।৩০ হাজার টাকা বেড়ে গেল।—

এই সময়ে ঐ অঞ্চলের সংস্কৃতি ভাল করে জান[illegible] সুযোগ হয়েছিল আমার। ওখানকার সংস্কৃতি বাংলা ওড়িয়া সংস্কৃতির একটা মিশ্ররূপ ছিল। অধিকা[illegible] অধিবাসী মাহিষ্য সম্প্রদায়ের। মাহিষ্যদের মধ্যে যে[illegible] সম্ভ্রান্ত পরিবারকে দেখেছি তাঁদের আচার-ব্যবহার ব্রাহ্ম[illegible] বৈদ্য ও কায়স্থদের আচার ব্যবহার থেকে কোনও পার্থ[illegible] দেখিনি। তবে তাঁদের মধ্যে তখনও স্ত্রী-শিক্ষার খু[illegible] প্রচলন হয়নি। কিন্তু, ১৯২১ সাল থেকে কংগ্রেসে[illegible] প্রভাব গ্রামের উপর বিস্তীর্ণ হতে আরম্ভ হওয়ার স[illegible] সঙ্গে দেখলুম মেদিনীপুরের পল্লীগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসা[illegible] খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল। ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত হ[illegible] মেয়েরা হিন্দু সমাজের ভাল করেছে কি মন্দ করেছে [illegible] বিচারের ভার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের। আমার বাড়ী ছাড়া পল্লীগ্রাম ঘাটাল মহকুমায়। ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত এ জায়গা হুগলী জেলার মধ্যে ছিল। পশ্চিম বাংলায় বা রাঢ়দেশে হুগলী জেলার হিন্দু সংস্কৃতিই অনুকরণীয় ছিল। আর ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া যে সকল হিন্দু অধিবাসী ছিল তার মধ্যে সদ্গোপ প্রধান। নাড়াজোল রাজবংশ সদ্গোপ বংশ। ঐ সব সদ্গোপ বংশের আচার-ব্যবহারও ব্রাহ্মণ কায়স্থদের মতই ছিল। মহিষাদলে যতদিন মকর্দ্দমা করেছিলেন ততদিনে আমার ওকালতির আয় অনেক বেড়ে গেছল।

(১৮)

আমার জীবনের সব চেয়ে বিপর্য্যয় (calamity) ঘটেছিল ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমে মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায়। পিতার মৃত্যুর সময় (১৮৯২ ফেব্রুয়ারী) অল্প বয়স ছিল এবং মায়ের আঁচল ঢাকা ছিলাম। যদিও ১৫।১৬ বৎসর বয়স থেকেই আমি বিদেশে কাটিয়েছি এবং মা বরাবর জাড়াতে থাকতে। তবুও জীবনে মায়ের আশীর্ব্বাদ ও তাঁর আদর্শই বিশেষ করে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আমি ও

আমার স্ত্রী খুবই পীড়িত হয়ে পড়ি। ঐ সালের ডিসেম্বরে আমরা সুস্থ হই। ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে মা এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ম্যালেরিয়ায় খুবই অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আমার কাছে আসেন। তখন আমি ভবানীপুরে গিরিশ মুখার্জী রোডে থাকি। কিছুদিন আগে একটী প্রবীণ কবিরাজের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর নাম নবীন কবিরাজ। তাঁর চিকিৎসায় এক অদ্ভুত ফল আমি দেখেছিলাম। তিনি খুব বৃদ্ধ হ'য়েছিলেন। তাঁকেই এনে মাকে দেখাই। তিনি মায়ের নাড়ী কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—রায়গিন্নী, বাঁচবার কি খুবই ইচ্ছে?" মা বলেছিলেন,-"না বাবা, যদি আজই মৃত্যু হয় তবে কাল বাঁচতে চাই না।" কবিরাজ মশায় বলেছিলেন, —আপনার পরমায়ু আর বেশী নেই, শীঘ্রই জীবনান্ত হবে।"আমাকে বললেন, একটু একটু মকরধ্বজ সেবন করান যতদিন জীবন আছে। আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে একগ্রেণ মকরধ্বজ নিয়ে একগ্রেণ কুইনাইনের সঙ্গে মিশিয়ে সেবন করাতে লাগলাম। স্থান পরিবর্ত্তন ও ঐ ঔষধের গুণে মা শীঘ্রই সেরে উঠলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তার সংসারের সকলেও সেরে উঠল। আমাকে তখন প্রায়ই মহিষাদলে যেতে হত।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স তখন ১২ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছানুসারে তার উপনয়ন হবে। আমার কনিষ্ঠ ভগ্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপনয়নও ঐ সঙ্গে আমার বাড়ীতেই হবে। দাদা ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদি মেদিনীপুর থেকে এলেন। অন্য আত্মীয় স্বজনরাও এলেন। আমার তখন বেশ রোজগার, একটু ধুমধাম করেই কার্য্য সম্পন্ন হ'ল। পরদিন সকালেই আমি মহিষাদল ও দাদা সপরিবারে মেদিনীপুর চলে গেলেন। সেই উপনয়নের দিন রাত্রেই মায়ের জ্বর হয়। আর সে জ্বর ক্রমশঃ নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়। টেলিগ্রাম পেয়ে দাদা ও আমি কলকাতায় এলাম। আমার বন্ধু শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রথম তিনিই চিকিৎসা করেন। পরে তিনি কলকতার বিখ্যাত ডাক্তার হোমিওপ্যাথ (হোমিওপ্যাথ) শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে নিয়ে এলেন। কিছুতেই কিছু হল না। সেদিন পুষ্যা পূর্ণিমা। ক্রমশঃ ক্রমশঃ জ্বর কমতে কমতে ৯৫ ডিগ্রীতে নেমেছে। বৈকাল চারটে। মা বল্লেন, শুয়ে থেকে দম বন্ধ হচ্ছে। দাদার বুকে ঠেসান দিয়ে বসান হ'ল। আমার ছোট ভাইকে ডাকলেন। সে পাশে বসতে, তার মাথায় হাত দিলেন আর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। আমি ও আমার স্ত্রী পায়ে হাত বুলাচ্ছিলাম। কবিরাজের ভবিষ্যৎ-বাণী—"পরমায়ু আর বেশী নেই" সফল হল দুমাসের মধ্যেই। ১৯১৭ সালের ৮ই জানুয়ারী, ১৩২৩ সালের ২৪শে পৌষ মাতৃহীন হলাম।

কলকাতায় ত' আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না। সুতরাং পূর্ব্বেই মায়ের শবদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে পৌছাল। দেহ দাহ হতে বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু রাত্রে বাড়ী ফিরে যাওয়া নিষেধ সুতরাং শ্মশানেই বসে থাকলাম। দাদা সেখানেই বসে বসে শ্রাদ্ধের একটী ফর্দ করলেন। কারণ সকালেই দাদাকে মেদিনীপুর চলে যেতে হবে। স্থির হ'ল অশৌচের তৃতীয় দিনে আমরা সকালের ট্রেণে জাড়া রওনা হব। দাদা মেদিনীপুর থেকে ট্রেণে উঠবেন এবং চন্দ্রকোণা রোড ষ্টেশনে নেমে একসঙ্গে জাড়া যাবো। মা বিধবা হবার পর বরাবর জাড়াতে ছিলেন, কাজেই শ্রাদ্ধাদি সেখানেই হবে। বাবার শ্রাদ্ধের সময় আমরা তিন ভাইই নাবালক ছিলাম। তখন যৌথসংসার ছিল। তাই বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন ছোটকাকা। এখন আর সে যৌথসংসার নেই। আমরা তিন ভাই অবশ্য একই যৌথ সংসারে থাকি। সুতরাং দাদা কর্ত্তা। মায়ের শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য ভালই হয়েছিল। শ্রাদ্ধের দিন প্রায় একহাজার ব্রাহ্মণ ও আরও প্রায় এক-হাজার অন্যান্য জাতির লোক লুচি, তরকারি, দই-মিষ্টি ইত্যাদি খেয়েছিল। জ্ঞাতি-ভোজনে বা নিয়মভঙ্গের দিনও জ্ঞাতি ছাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ ও শূদ্র মিলিয়ে ায় একহাজার লোক ভাত, তরকারি, মাছ দৈ-মিষ্টি খেয়েছিল। খাওয়ার কথাটাই বিশেষ করে লিখলাম এবং মনেও আছে কারণ বাবা ও মা উভয়েই লোক খাইয়ে বিশেষ আনন্দ পেতেন।

জীবনের শেষের দিকে মা প্রতিবৎসর চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করে লোক খাওয়াতেন। আর জ্ঞাতিদের মধ্যে যাঁদের অবস্থা পড়ে গেছল, মায়ের নজর তাঁদের উপর বিশেষ করেই সজাগ ছিল। তাদের মধ্যে কারুর অভাবের কথা শুনলে তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন।

ধর্ম্মে মায়ের প্রগাঢ় মতি ছিল। কিন্তু কোনও বিষয়ে গোঁড়ামী ছিল না। পূর্ব্বে বলেছি সধবা অবস্থায় মেম-সাহেবদের ও মুসলমান স্ত্রীলোকদের সঙ্গে একত্রে বসে গল্প করতেন কিন্তু পরে স্নান করতেন। বিধবা অবস্থায় আমার জ্যেষ্ঠপুত্রের দু-তিন বৎসর বয়সে টাইফয়েড জ্বরে ডাক্তারের নির্দ্দেশে মুরগীর ব্রথ খাওয়াতে হয়। পাছে রান্না খারাপ হয় তাই মা নিজে সেই ব্রথ প্রস্তুত করতেন, তারপর স্নান করতেন। প্রাতে স্নান করে শিবপূজা করা তাঁর বাল্যকালের অভ্যাস, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তা করে গেছেন।

মায়েরা তিনটী বিধবা 'জা', সেজ জ্যেঠাইমা, ন-জ্যেঠাইমা এবং মা, আর জ্যেঠামশায়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ বাল্য বিধবা, এঁরা চারজন তীর্থ পর্য্যটন একত্রে করেছেন। প্রথমে যান পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে। তখন বি, এন্, আর লাইন হয়নি। পুরী যাবার পথ গাড়ীতে বা হেঁটে হাঁটাপথে, অথবা ষ্টীমারে বঙ্গোপসাগর দিয়ে। মায়েরা ষ্টীমার-পথেই গেছলেন। বৈধব্যের পর যাঁরা অত্যন্ত আচার-বিচার মেনে চলতেন, পুরীধামে কোনও বিচারের প্রয়োজন নেই এই বিশ্বাসে আমাদের বাড়ীর সরকার রামনাথ ডগ্‌রা (সদ্‌গোপ) জগন্নাথের প্রসাদ ন'জ্যেঠাইমাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি অম্লানবদনে খেয়েছিলেন।

তাঁরা একত্রে ঘাটাল থেকে একখানা নৌকা ভাড়া করে সাগর-সঙ্গমে পৌষ সংক্রান্তিতে তীর্থ করতে গেছলেন। শেষ ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁরা যখন পূজার পর পশ্চিমে তীর্থ করতে যান তখন আমিও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলাম। তখন কলকাতার বাসায় থেকে এম্, এ, পড়ি। মায়েরা চারজন আর সেজ-জ্যেঠাইমার বিধবা কন্যা বিনোদদিদিও ছিলেন। আর তাঁদের 'চড়নদার' অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে কমলদাদা, জানকীদাদা, আমার দাদা (কিশোরীপতি) ও পশুপতিদাদা এবং আমাদের পুরোহিত বংশের পূর্ণকাকা (যাকে আমরা 'গড়াকাকা' বলতাম) ছিলেন। এই দলটী জাড়া থেকে এসে আমাদের বাসায় উঠলেন। সিট্ রিজার্ভ করে ওঁদের ট্রেণে তুলতে গেছলাম আমি। এক কাপড়, চাদর ও জামা গায়ে আমার। কমলদাদা ট্রেণে আটকে দিলেন আমাকে, বল্লেন, একমাস পড়া কামাই হয় হবে, তুমি না গেলে এ ট্রেণের ব্যবস্থা আমরা কেউ করতে পারব না। অতএব যেতে হ'ল।

• প্রথম গয়াধাম। পাণ্ডার বাড়ী থাকতে হ'ল তে-রাত্রি (তিন রাত্রি) তারপর "সুফলের" অত্যাচার। সে যে কি জিনিষ, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। আজ ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে সব অত্যাচার দূর করে দিয়েছে। সেখান থেকে কাশী, বিন্ধ্যাচল, তারপর প্রয়াগ। প্রয়াগ থেকে আগ্রা হ'য়ে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন থেকে মথুরা। মথুরায় মায়েরা খাচ্ছেন, পুরুষ মানুষ কেউ কাছে নেই। একটি বীর হনুমান এসে ন-জ্যেঠাইমার ডান হাত তার বাঁ হাত দিয়ে ধরে ডান হাতে সব ভাত খেয়ে চলে গেল। ন-জ্যেঠাইমা কাঠ হয়ে বসে রইলেন আর কেউও কিছু বলতে সাহস করলে না। আজও বোধ হয় বৃন্দাবন-মথুরায় বাঁদরের অত্যাচার আছে। ওখান থেকে আজমীর, পুষ্কর, ও জয়পুর হ'য়ে দিল্লী। দিল্লী থেকে গেলাম কুরুক্ষেত্র। সেখান থেকে হরিদ্বার সেরে সোজা কলকাতা ফিরে আসা হল। আমার বড় ভগ্নী (তখন বিধবা হয়েছেন) কাশীতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সব যায়গায় ট্রেণের রিজার্ভেসন আমাকেই করতে হয়েছিল। দু-এক যায়গায় ছাড়া সব যায়গাতেই রিজার্ভেসন পেয়েওছিলাম। এখনকার মত অবস্থা তখন ছিল না। ফিরে এলাম ডিসেম্বরে। এরপর আর ওঁরা কোথাও তীর্থ করতে যাননি, কারণ একে একে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মায়ের মৃত্যু হল সবার শেষে।

মায়ের অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বৈকালে কলকাতা পৌছুই। সেদিন সমস্ত রাত্রি তাঁর শয্যাপার্শ্বেই ছিলাম। রাত্রে অধিকাংশ সময়েই আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটল। সে সময় তাঁর মুখে মাঝে মাঝে শুনতে পাই--"রাক্ষসদের তাড়া,—রাক্ষসদের তাড়া।" আমার বুঝতে বাকি ছিলনা যে তিনি ইংরাজদের কথা

বলছেন। তখন আমার মনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। তাইত আমি পয়সা রোজগারের ছলনায় জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে গেছি? ১৯০৬।১৯০৭ সালে মা যে আমাকে অনুমতি দিয়েছিলেন দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে। চাকরি ছেড়ে এসে মেদিনীপুরে আমার শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের গঞ্জনায় রোজগার করার কাজে ডুবে আছি। ছিঃ ছিঃ এ আমার কি অবস্থা হল?”—তাই মায়ের শ্রাদ্ধাদি শেষ হ'লে মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হলাম যে রোজগার যদি চুলোয় যায় তবু আর সে সংকল্পচ্যুত হব না। শ্রাদ্ধের পরেই নাড়া থেকে মহিষাদলে যাই এবং রাজার ম্যানেজারকে বলি যে—আমি শীঘ্রই তাঁদের ঐ ভার ত্যাগ করব। ইতিমধ্যে বহু প্রজার সঙ্গে সোলেনামা হবার ব্যবস্থা হয়েছে। আর Contested case নেই বললেই হয়। ম্যানেজারবাবু দুঃখিত হলেন। বললেন, আর ছটা মাস আপনি থাকলে সব ক্যাম্পের কাজ শেষ হয়ে যেত। ক্যাম্পের অফিসাররা আপনার সেটেলমেন্টের অভিজ্ঞতার জন্যে আপনার কথাই বহুক্ষেত্রে মেনে নেন।” তাঁর জেদে আরও ছয় মাস পর্যন্ত কাজ করলাম।

(১৯)

আত্মগ্লানিতে হৃদয় পূর্ণ হয়েছিল। দেখলাম ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের কর্মকর্তারা মুসলিমলীগের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিলেন, তাতে কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান, যার মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্নাও ছিলেন, কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। হোমরুলের জোর আলোচনা চলছে। এ্যানি বেসান্ট কংগ্রেসের মধ্যে এসেছেন। বাংলায় তখন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী কংগ্রেসে Extremist দলের কর্ত্তা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মডারেট হয়ে গেছেন। এদিকে দেখলাম বিপ্লবী দল প্রায় সব ইংরাজদের শ্রীঘরে অথবা অন্তরীণ। আমি কংগ্রেসেই যোগ দিলাম। বিখ্যাত থিওসফিষ্ট নেতা এ্যানি বেসান্টের বক্তৃতা শুনে একদিন ঐ সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলাম। তিনি তখন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। দেখে কিছু আশা হল। বিপ্লবীরা যে অস্ত্রের জাহাজ জার্ম্মানী থেকে আনাচ্ছিল সেটাও বানচাল হয়ে গেছে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার পর জাতীয় আন্দোলন সবই একরকম বন্ধ হয়ে গেছল। এখন যুদ্ধ শেষ হবার মাথায় সবাই মাথা-চাড়া দিচ্ছে। ১৯১৮ সালে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এ্যানি বেসান্ট। কলকাতায় অধিবেশন। জিন্না সাহেব বিয়ে করেছেন একটি লাখোপতি ব্যবসায়ীর পারসীক কন্যাকে। তিনিও সস্ত্রীক এসেছেন। মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী বিহারে কৃষক-আন্দোলনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি এসেছেন। আমরা কংগ্রেসের নূতন সভ্য। এই অধিবেশনে ‘হোমরুল’ ভারতের কাম্য· ঠিক হল, এবং যাতে বৃটিশ সরকার তখন নূতন যে বিল পার্লিয়ামেন্টে উত্থাপন করছেন তারমধ্যে যাতে পুরোপুরি হোমরুলের ব্যবস্থা থাকে তার জন্যে দাবী জানানো হল। তখনও সেই পুরাতন কংগ্রেসী আবেদন। বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ এবং সরকারের কাছে সেগুলি পেশ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না।

আমি ১৯১৭ সালে রোজগারের চিন্তা ছাড়ার সময় থেকে ভাবছিলাম—আন্দামান থেকে মেদিনীপুরের শ্রী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো মশায়কে কি করে ফিরিয়ে আনতে পারি। তিনি পাঠ্যাবস্থায় First Arts ক্লাশে আমার ‘অঙ্কন’ বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। তারপর ফ্রান্স থেকে শক্তিশালী বোমা তৈরী করা শিখে এসে যুগান্তর বিপ্লবী-দলে প্রথম বোমা প্রস্তুত করেন। শ্রীঅরবিন্দ, বারীণ প্রভৃতির সঙ্গে ধরা পড়ে যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়েছিল। আমার তখন ধারণা সেই পুরাতন কর্মী ভারতে তথা বাংলায় ফিরে আসুক, তবেই সত্যিকার কাজ করা যাবে। আমাকে কয়েকবার সিমলা কলকাতা ছুটাছুটী করতে হল এই জন্যে। তাইতে যে সংবাদ সংগ্রহ করলাম তাতে বুঝলাম তাঁর আন্দামান জীবন খুব ধীর ও শান্ত বলে রিপোর্ট হয়েছে। আশা হল দরখাস্ত মঞ্জুর হতে পারে। তাঁর স্ত্রীর পক্ষে আমিই দরখাস্ত করি এবং তারই তদ্বিরে লেগেছিলাম। হেমবাবুর সঙ্গেও আমার পত্রালাপ হচ্ছিল। যখন ইংরেজ সরকার তাঁর স্ত্রীর দরখাস্ত মঞ্জুর করেন

সে সংবাদ আমি আন্দামানে হেমবাবুকে এবং মেদিনীপুরে তাঁর স্ত্রীকে জানিয়ে দিই। পরে হেমবাবু যখন আমাকে লিখলেন যে তাঁরা 'মহারাজ' জাহাজে রওনা হবেন,- তখন সেই খবরও তাঁর স্ত্রীকে জানাই। হেমবাবুর স্ত্রী কলকাতায় আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর পুত্র মানবেন্দ্র এবং একজন সরকারকে পাঠাতে লিখলাম। কারণ, কলকাতা এলেই যে সঙ্গে সঙ্গে জেল থেকে ছেড়ে দেবে তার স্থিরতা কোথায়! ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কথা এটা। জাহাজ এল' ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯২০ সালে। কয়েকদিন আগেই মানবেন্দ্র ও তাদের সরকার এসেছে। সরকার মশায় হেমবাবুকে চেনে, ছেলে চেনেনা তাঁকে। সরকার মশায়কে জাহাজ-ঘাটে পাঠালাম। তিনি বৈকালে ফিরে এসে বললেন,—হেমবাবু তাঁকে দেখে বলেছেন যে তাঁরা তিনজন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যাচ্ছেন। ঐদিন সেখানেই থাকতে হবে তাঁদের।—হয়ত' পরের দিন ছাড়তে পারে। খবর শুনে আমি তাঁকে বললাম যে তিনি যেন পরদিন মানবেন্দ্রকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আলিপুর জেলে গিয়ে অপেক্ষা করেন।

সেই দিন অর্থাৎ ১৯২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আমার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে সন্ধ্যার পরেই। আর তার একটু পরেই রাত্রি ৮টা নাগাদ একটা ট্যাক্সী করে তিন প্রভু আমার গিরিশ মুখার্জ্জী রোডের বাসায় এসে হাজির। হেমবাবু, বারীন ঘোষ ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পেয়ে গেটের কাছে গিয়ে ওদের দেখলাম। দশ বৎসরে চেহারার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। জিজ্ঞাসা করলুম,—'আজই ছেড়ে দিলে যে?' উপেন ও বারীনকে দেখে খুবই খুসী হলুম। কারণ, ওদের আসবার কথা জানতাম না আগে। ওরা গাড়ী থেকে নেমে এসে বললেন, সেণ্ট্রাল জেলে জিজ্ঞাসা করলে এখনই ছেড়ে দিলে কলকাতায় কোথাও থাকবার স্থান আছে কিনা। তাতে হেমবাবু বলেছিলেন আমাদের হাইকোর্টের উকিলবাবুর বাড়ীতে থাকতে পারব। তাই ট্যাক্সী করে ছেড়ে দিলে। বারীন ও উপেন বললে,— হেমদার ছাড়বার কথা হচ্ছে শুনে আমরা সেখান থেকেই দরখাস্ত করেছিলাম। হেমদার সঙ্গে আমাদেরও দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছিল।—

সেদিন আমার বাড়ীর কাছেই গিরিশ মুখুজ্যে মহাশয়দের বাড়ীতে এক মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন বাড়ীর সকলের। তাঁরা আমার আত্মীয়। আমি হেমবাবুদের মুখহাত ধুয়ে জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে সেখানে গিয়ে ওদের আসবার কথা বলতে তাঁরা খুব খুশী হয়ে তাদের তিনজনের খাবার পাঠিয়ে দিলেন। ওদের খেতে রাত সাড়ে নয়টা বাজল'। উপেন এসে বলেছিল ঐ রাত্রেই চন্দননগরে তার নিজের বাড়ীতে যাবে। খাওয়ার পর তাকে ট্রামে তুলে দিলাম। ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম যে এটা হাইকোর্টের গাড়ী। সে যেন ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের মোড়ে নেমে নিমতলার গাড়ী ধরে এবং হাওড়াপুলের কাছে নামে। তখন ত' আর হাওড়ায় গাড়ী যেত না। গঙ্গার উপর কাঠের ভাসা-পুল ছিল। উপেন ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে গাড়ী বদল করে হাওড়াপুলের কাছে না নেমে সোজা নিমতলায় চলে গেছল'। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে শিয়ালদহতে গিয়ে পৌঁছায়। শিয়ালদহে গাড়ীতে উঠে নৈহাটীতে নামে। সেখান থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে চন্দননগরে রাত আড়াইটে-তিনটের সময় পৌঁছায়। উপেন পরে বলেছিল, "সে এক প্রহসন। অনেকদিন বাদে জুতাপায়ে হাঁটতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়ে কেটে গেল। তারপর জুতা হাতে করে যেতে যেতে রাত ১১টার সময় আপার সারকুলার রোডে এক কনেষ্টবল জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলে। আবার বুঝি 'শ্রীঘরে' ঢোকায়। যাই হোক, ছাড়া পেয়ে শিয়ালদহে ট্রেন। নৈহাটীতে বহুকষ্টে পারাপারের নৌকা জুটল'। রাত আড়াইটের পর বাড়ীর পিছনে গিয়ে মা-কে ডাক দিলাম—'মা, মা' বলে। তিনি উপর থেকে বললেন,—কে? আমি বলি,—উপেন গো। তিনি বললেন,—কে উপিন? আমি বলি,—তোমার উপিন, মা। মা ত' কেঁপে কেঁপে পড়ে গেছেন। আমার স্ত্রী গলার স্বর চিনতে পেরে দরজা খুলে দিলে। আমার আসবার খবর আগে দিতে ত' পারিনি।"

হেমবাবু ও বারীন আমার বাড়ীতে রাত্রে থাকলেন। পরেরদিন প্রাতে আর এক দৃশ্য। সকালে গিরিশ মুখুজ্যেদের বাড়ীতে বর-কনে বিদায়ের জন্যে আমি চলে গেছি। ইতিমধ্যে আমার নির্দ্দেশমত হেমবাবুর পুত্র মানবেন্দ্র আমার

বাড়ীতে এসেছে এবং তাদের সরকারমশায় আলিপুর জেলে গিয়েছে। হেমবাবু দু-বছরের ছেলেকে রেখে আন্দামান যান। এখন মানবেন্দ্র ১২ বৎসরের কিশোর। উভয়ে উভয়কে চেনে না এখন। হেমবাবু আমার কাছে শুনেছিলেন যে সকালে মানবেন্দ্র আসবে। হেমবাবু বৈঠকখানায় বসে আছেন। মানবেন্দ্র এসে তাঁরেই জিজ্ঞাসা করেছে—'হেমবাবুর যে আসবার কথা ছিল, তিনি কি এসেছেন?' হেমবাবু জিজ্ঞাসা করেছেন,—তুমি তাঁর কে?-সে বলেছে,—আমি তাঁর ছেলে। হেমবাবু লাফিয়ে উঠে তাকে বুকে টেনে নিয়ে তার মাথায় চোখের জল ফেলছেন—এই দৃশ্য আমি এসে দেখলাম। একটু পরেই তাঁর সরকার এল এবং আহারান্তে সকলে মেদিনীপুর রওনা হলেন। বারীন আমার কাছেই রয়ে গেল। তার ভগ্নী সরোজিনীকে খোঁজ করে আনা হল এবং তারা দুজনেই প্রায় তিনমাস আমার কাছে থাকল'। আর সেই তিনমাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলস্রোতের মত বাংলার যুবকরা বারীন দর্শনে আমার গৃহ পবিত্র করেছিল। খবরের কাগজে বারীনের অবস্থিতির সংবাদ শুনে হাইকোর্ট লাইব্রেরীতে একদিন Bar এর শ্রেষ্ঠপুরুষ স্যার রাসবিহারী ঘোষ আমায় ডেকে বললেন,—"বারীনবাবু কি তোমার বাড়ীতে আছেন সাতকড়ি? আমি বললাম—হ্যাঁ স্যার। "সে কি? ভাল করনি।" বললেন তিনি। আমি বললাম—ইংরাজের যেটুকু অপকার বারীন করেছিল, তার জন্যে ত' সে আন্দামানে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে এসেছে।"—"নানা, এটা ভাল নয়," —বললেন তিনি। আমি আর প্রতিবাদ করলাম না। কারণ আমি জানি,-ডক্টর ঘোষ জানতেন না বারীনের সঙ্গে আমার কি রকম হৃদ্যতা।

একটি চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল বারীণ আন্দামান থেকে ফিরে এসে আমার বাড়ীতে উঠবার পাঁচ-ছ'দিন পরে। বারীণদের ডিফেণ্ড করেছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রায় কোনও পারিশ্রমিক না নিয়ে। এবং হাইকোর্টে আপীল করে বারীণকে ফাঁসি থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তাই যেদিন সে আমার বাড়ীতে আসে সেইদিনই সে আমাকে দাশ-সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করায় আমি জানাই যে, তিনি আরা জেলাকোর্টে ডুমরাও রাজার মকর্দ্দমা করতে গেছেন। পরদিন সে তাঁকে চিঠি লিখে জানায়—যে সে বেঁচে ফিরে এসেছে আন্দামান থেকে। তিনিই তাঁদের প্রকৃত সুহৃদ। তাই এখন তাঁর কাছে জানতে চায় সে কি করবে। তিন দিন কি চারদিন পরেই একদিন সকালবেলা দাশ-সাহেবের ক্লার্ক দেবেনবাবু এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেম—"বারীণবাবু কি এখানে আছেন?" আমি বল্লাম হ্যাঁ, কেন? তিনি বললেন, তাঁর সাহেব আরা থেকে টেলিগ্রাম করেছেন বারীণবাবুকে ৩০০ টাকা দিতে। সেই টাকা এনেছি।" আমি বারীণকে ডেকে দিলাম। বারীণ কিছুতেই টাকা নিতে রাজী নয়। সে বললে, আমি ত' টাকা চাইনি, আর আমার টাকার দরকারই বা কি? সাতকড়ির কাছে আছি। দেবেনবাবু বললেন, "তিনি আরাতে ব্যস্ত আছেন, আপনার পত্র পেয়ে ভেবেছেন আন্দামান থেকে রিক্ত হস্তে এসেছেন, সুতরাং আপনার টাকার খুবই দরকার। আপনি টাকা না নিলে তাঁর অপমান করা হবে।" আমি বললাম, বারীণ টাকাটা নাও। তিনি কত বড় দরদী দেখছ না? সেখান থেকে তোমার প্রথম কি প্রয়োজন হতে পারে তা নিজেই স্থির করে টেলিগ্রাম করছেন। টাকা নিয়ে রেখে দাও, তিনি কলকাতায় এলে তখন তাঁর সঙ্গে কথা ব'লো। বারীণ টাকা নিয়ে রাখলে। প্রায় মাসখানেক বাদে দাশ-সাহেব একদিনের জন্যে কলকাতায় এসে বারীণকে ডেকে পাঠালেন। বারীণ তাঁকে বলেছিল, "আপনি আমাদের ডিফেণ্ড ক'রে বাঁচিয়েছিলেন, তাই ফিরে এসে আপনার কাছেই জানতে চেয়েছিলাম কি করব। টাকা আপনার নিই কি করে? যদি কোনও কাজ পেতাম?" দাশ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কাজ করবে? কি কাজ? বারীণ বললে, যদি কোনও লেখাপড়ার কাজ পেতাম? চিত্তরঞ্জনের তখন "নারায়ণ" বলে একটি মাসিক পত্রিকা ছিল। তিনি বললেন, ঐটা এডিট্ করতে পারবে? বারীণ খুশী হয়ে বললে, ওটা পেলেত খুবই খুশী হব। চিত্তরঞ্জন বললেন,—বেশ তুমি ঐ পত্রিকার সম্পাদক হও। তোমার মাসিক বেতন তিনশো টাকা। চমৎকার ফয়সালা হ'য়ে গেল। চিত্তরঞ্জনেরও বারীণকে তিনশো টাকা দেওয়া হ'ল,

আর বারীণেরও দান গ্রহণ করতে হ'ল না। তারপর অবিনাশ ভট্টাচার্য্য যিনি বারীণদের সঙ্গে সাত বছর দ্বীপান্তরে ছিলেন এবং "যুগান্তরে" কায করতেন, বারীণ তার খোঁজ করে নিয়ে এল। ভবানীপুরেই একটা বাড়ী ভাড়া করে তিনমাস পরে আমার বাড়ী থেকে সেখানে উঠে গেল। বারীণ-পর্ব্ব এখানেই এখানকার মত শেষ হ'ল।

চাকরি করার সময় আমার একটা ফটো ছিল গলায় টাই বাঁধা, গায়ে কোট পরা। হেমবাবু, মেদিনীপুরে আমাদের বাড়ী থেকে সেটা নিয়ে যান। তিনি ত' অঙ্কন বিদ্যায় পটু ছিলেন। কিছুদিন বাদে আমার স্ত্রীকে তাঁর স্ত্রী একটি পত্র লিখে ঐ ফটো থেকে তৈরী একটি বড় তেলরঙা ছবি পাঠিয়ে দেন। সেই পত্রে তিনি লেখেন, আপনার স্বামী আমার স্বামীকে আন্দামান থেকে মুক্ত করে এনে আমার কাছে এনে দিয়েছেন। আমি আপনাকে আর কি দিব? আমার স্বামীর আঁকা আপনার স্বামীর চিত্র পাঠালাম, আপনি গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইব।—আমার স্ত্রী তাঁর মৃত্যু-দিন পর্য্যন্ত আমার সেই তৈল-চিত্রটি তাঁর শোবার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। এখনও সেইখানেই আছে।

(২০)

আমার জীবনের কাঁটা ১৯২০ সালেই ঘুরে যায়। তার পূর্ব্বে জালিনওয়ালাবাগের নিধন-যজ্ঞ হয়ে গেছে। রাউলাট আইন প্রস্তুত হয়েছে এবং সেটা বন্ধ করার জন্য গান্ধীজী সত্যাগ্রহ করার হুমকি দিয়েছেন। ১৯১৯ সালেরConstitution যেটাতে হোমরুল না দিয়ে Diarchy-র প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল, অর্থাৎ কতকগুলি মুখ্য ব্যাপারে গভর্ণরের সর্ব্বময় ক্ষমতা থাকবে এবং অন্য কয়েকটা বিষয়ে মন্ত্রীবর্গের ক্ষমতা থাকবে, তারই প্রথম নির্ব্বাচন পর্ব্ব হবে ১৯২০ সালের শেষে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কংগ্রেসের মডারেটরা সেটা মেনে নিয়েছেন। কংগ্রেসে তখন যে প্রাধান্য বাংলার তার কর্ত্তা ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং তাঁর সহকর্ম্মী বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি। স্পেশাল কংগ্রেস ডাকা হ'য়েছে কলকাতায় সেপ্টেম্বর মাসে। কিনা তারই বিচার হবে। নির্ব্বাচন হবে নভেম্বর মাসে, দু মাস পরেই। গান্ধীজী তাঁর একটা কার্য্যক্রম নিয়ে উপস্থিত। লালা লাজপৎ রায় সভাপতি ঐ কংগ্রেস অধিবেশনে। আমরা অভ্যর্থনা সমিতিতে আছি। বীরেণ শাসমল সম্পাদক হয়েছে ডেলিগেটদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থাপনা কমিটির, আর আমি তার সহকারী। লোক খাওয়ানো ত' আমার জীবনে একটা নেশার মত ছিল। সুতরাং ও কাজটা সুচারুরূপে উদ্ধার করেছিলাম। কংগ্রেসে স্থির হলো কংগ্রেসের হোমরুল যখন ইংরেজ দিলে না তখন কংগ্রেস এই শাসনব্যবস্থায় নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না। ঐ কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী যে কার্য্যক্রম দিলেন তার নাম হল non violent non-co-operation "অহিংস-অসহযোগ"। সেটাতে বাংলার প্রায় সকল নেতারই আপত্তি। কিন্তু মহাত্মার আফ্রিকা ও বিহারের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রচারে এতই প্রভাব বেড়েছে যে তাঁর ঐ কার্য্যক্রমে বাধা দিয়ে আটক রাখা শক্ত। তাঁর ঐ কার্য্যক্রমে যোগ দিলে চাকুরি ও ওকালতি ছাড়তে হবে। স্থির হল যে ঐ বৎসরের শেষে নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজীর কার্য্যসূচী পুনর্ব্বিবেচনা করা হবে।

আমি গান্ধীজীর ঐ কার্য্যক্রম খুব ভালভাবে বিবেচনা করেছিলাম। যাকে mass movement (গণ-আন্দোলন) বলে তারই ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিলাম ওর মধ্যে। আমি দেখলাম দেশকে স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রস্তুত করবার এটা একটা খুব কার্য্যকরী কৌশল। তাই স্থির করলাম হাইকোর্টের ওকালতি ছেড়ে এই কাজে আত্মনিয়োগ করে এতদিন জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যে অন্যায় করেছি তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করি। চিত্তস্থির করে স্ত্রীকে বললাম আমার সঙ্কল্পের কথা। তাঁর এক কথা—"তুমি যা করবে আমি তারই অনুগামী হব।"

হাইকোর্টে পূজার লম্বা ছুটি হয়েছে। সবাইকে নিয়ে দেশে গেলাম। পূজার পর ঐ অঞ্চলে দু-তিন যায়গায় বিষয়টা প্রচার করবার, আলোচনা করবার চেষ্টা করলাম। বিশেষ কোন সাড়া পেলাম না। কারণ গান্ধীজীর কার্য্য-

হতে হলে সর্ব্বস্ব পণ করতে হবে। অন্ততঃ যাঁরা নায়কত্ব করবেন তাঁদের সেই আদর্শ গ্রহণ করতেই হবে।

পূর্ব্বে কংগ্রেস থেকে স্থির হয়েছিল মেদিনীপুরের সদর ও ঘাটাল মহকুমা নিয়ে যে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র সেখানে নাড়াজোলের রাজার বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড়াতে হবে। এখন ঐ নির্ব্বাচন বয়কট করা হবে স্থির হওয়ায় আমি পরিত্রাণ পেলাম। নাড়াজোলের রাজা শ্রীনরেন্দ্রলাল খাঁ সেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচিত হয়ে তিন বৎসর লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে বসেছিলেন। তখন ইংরাজের ভয়ে সমস্ত সভ্যগণই সাহেবী পোষাক পরে কাউন্সিলে যেতেন। তেজী নরেন্দ্রলালই ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি ধুতি পরে মাথায় পাগড়ী বেঁধে পুরাপুরী ভারতীয় পোষাকে কাউন্সিলে গেছেন। তাঁর পোষাক দেখে সাহেবদের কপাল কোঁচকানো তিনি গ্রাহ্যও করেননি। তিনি এম, এল, সি থাকতে থাকতেই দেহত্যাগ করেন।

ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ,—এঁরা সকলেই গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের বিরোধী। বাংলা থেকে চিত্তরঞ্জনের পয়সায় অনেক ডেলিগেট গিয়েছেন। সাধারণতঃ বার-লাইব্রেরী থেকেই ডেলিগেট নির্ব্বাচন হত'। কিন্তু কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। দশটাকা ডেলিগেট ফি দিলেই ডেলিগেটের টিকিট পাওয়া যেত'। সেইজন্যে গান্ধীজীর সমর্থকরা নাগপুরেই টাকা খরচ ক'রে অনেক ডেলিগেট জুটিয়েছিল। যাঁরা এই কাজ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যমুনালাল বাজাজ, বিখ্যাত তুলা ও কাপড় ব্যবসায়ীর অর্থই অধিক ব্যয়িত হ'য়েছিল।

নাগপুরে যাওয়ার সময় আমি ও বীরেন শাসমল রেলের যে কামরায় ছিলাম তাতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সকলেরই মনে দ্বিধাভাব। গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হবে কি? বৃদ্ধ রাঘবাচারিয়া কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর বক্তৃতায় বিশেষ কিছুই আভাষ পাওয়া গেল' না। তারপর সাবজেক্ট কমিটি (বিষয় নির্ব্বাচনী সভা) বসল'। গান্ধীজীর যুক্তিপূর্ণ আবেদন,—ইংরাজের অস্ত্রবল ও লোকবল প্রচুর। তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান কি করে সম্ভব? আর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি প্রকাশ্যে অসম্ভব। মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর লুকিয়ে লুকিয়ে রিভলভার নিয়ে কি এ অভ্যুত্থান করা সম্ভব? অথচ, অহিংস-অসহযোগের কার্য্যক্রম গ্রহণ ক'রে আমরা প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারব',—যে ইংরাজ-রাজত্ব আমাদের সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে আছে,—কিন্তু যদি সকলে সহযোগীতা বর্জ্জন করে তবে একদিনে ইংরাজ-রাজত্বের পতন অবশ্যম্ভাবী। আর অহিংস থাকলে আমরা জনসাধারণের কাছে এ আবেদন করতে সক্ষম হব'। দেশের মানুষ ঘুমিয়ে আছে,—আমরা অনায়াসেই তাদের জাগ্রত করতে পারব'! দেশের অধিকাংশ মানুষ যদি জেগে ওঠে তখন আমরা একে একে আমাদের অসহযোগের কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে পারব'। যেমন সরকারী চাকুরী ত্যাগ, কোর্টে মকদ্দমা না করা, স্কুল-কলেজ বয়কট এবং শেষে প্রয়োজন হলে খাজনা বন্ধ করে দিতে পারব। অপর পক্ষের যুক্তি,—জনসাধারণকে জাগরিত করা শক্ত। তারপর ঐ সব কার্য্যক্রমের যে-কোনও একটা গ্রহণ করলেই ইংরাজ পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে সেইখানেই তার "ইতি" করে দেবে। গান্ধীজী বললেন,—আপনাদের ত' আমার এই কার্য্যক্রমের পরিবর্ত্তন হিসাবে কোনই কার্য্যসূচী নেই। শুধু প্রস্তাব পাশ করলেই ত' ইংরাজ কিছু দেবে না। আর কেবলমাত্র গুপ্তহত্যা দ্বারা দেশ কখনও স্বাধীন করা যায় না। যদ আমাদের প্রচারে দেশের জাগরণ হয় তাহলে কংগ্রেসের পিছনে গণশক্তি এসে পড়বে।" গান্ধীজীর নিষ্ঠা, তাঁর সততা, বিহারে তাঁর আশ্চর্য্য কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি তাঁকে এতই জনপ্রিয় করেছিল যে বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় অধিকাংশ সভ্যই তাঁর কর্ম্মপন্থা অনুমোদন করলেন। বাংলার চিত্তরঞ্জন বিশেষ করে এইমত গ্রহণ করলেন। বিপিন পাল ও ব্যোমকেশবাবু এটা গ্রহণ করলেন না। আর গ্রহণ করেননি মহারাষ্ট্রের কেলকার মহাশয়। যাহোক্, কংগ্রেসে অহিংস-অসহযোগ কার্য্যক্রম গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রও বদলে গেল। প্রথমতঃ গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হবে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য

ও কার্য্যপ্রণালী অহিংস-অসহযোগের মতবাদ যে কোনও সাবালক ব্যক্তি গ্রহণ করে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করবে এবং বাৎসরিক চারআনা চাঁদা দেবে সেই-ই কংগ্রেসের সভ্য হবে। তারপর গ্রামের কমিটি মহকুমা কমিটি নির্বাচন করবে, মহকুমা কমিটি করবে জেলা কমিটি, জেলা কমিটি প্রাদেশিক কমিটি তৈরী করবে এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলি মিলে সর্ব্ব-ভারতীয় কমিটি নির্বাচন করবে।

নাগপুর থেকে ফিরে এসে অর্থকরী ওকালতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে কংগ্রেসের গঠনকার্য্যে চিত্তরঞ্জনের কর্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত হ'লাম। মাতৃআজ্ঞা ভুলে অর্থোপার্জ্জনে মেতেছিলাম বলে, মায়ের মৃত্যুর সময় মনে যে আত্মগ্লানির উদ্ভব হয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে দূর হল। সর্ব্বস্বপণ ক'রে দেশ উদ্ধারকল্পে আত্মনিয়োগ করলাম।

(২১)

আমি ত' আমার জীবনের কর্মপন্থা স্থির করলাম। স্ত্রীও আমার সহগামিনী। কিন্তু ছেলেদের কি হবে? বড় ছেলে গোপাল ভবানীপুরে মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক দেবে বলে ইউনিভার্সিটিতে 'ফি' দাখিল ক'রেছে। সে কি ঐ পরীক্ষা দেবে?—তা যদি দেয় তবে আমার পক্ষে পুরাপুরি কংগ্রেস কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয় না। আমি বললাম,—আমাদের কংগ্রেস থেকে যে জাতীয়-পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে গোপাল সেইখানে পরীক্ষা দিক।' গোপালের মা বললেন,—নিজের জীবন ত' উৎসর্গ করলে,—কিন্তু ছেলেটার ভবিষ্যৎও নষ্ট করবে?' আমি বললাম,—যদি করতে হয় সবই করতে হবে।" শুধু গোপাল ত' নয়:—মেজছেলে নেপাল তখন ৯ বছরের। মিত্র স্কুলেই পড়ে। তাকে স্কুল ছাড়তে হবে। ছোট ছেলে তখন মাত্র চার বছরের। আমি বিচলিত হইনি। নেপালেরও স্কুল ছাড়ানো হল। গোপাল জাতীয় পরীক্ষা দিলে। আমি তখন সংসারের বাইরে। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস গঠন করছি। আমার স্ত্রী, চাকর, বামুন, ঝি সব ছাড়িয়ে দিয়ে নিজে রান্না, বাসনমাজা প্রভৃতি ঘরের সমস্ত কাজ নিজের উপর তুলে নিয়েছেন। কিছু পুঁজি ছিল এবং বড়বাজারে ছোট্ট একটা হরিতকীর ব্যবসা ছিল। শশী চক্রবর্ত্তী বলে একজন কর্মচারী সেটা চালাতেন। তারই উপর নির্ভর করে সংসার ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছ-সাত বছর সংসারের কথা ভাবিনি। সর্ব্বস্ব পণ করেই কংগ্রেস গঠন করেছিলাম। ঐ কয় বৎসরে যে কত বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এতটুকু বিচলিত হইনি।

বাংলায় যে প্রাদেশিক এ্যাড্‌-হক কমিটি হ'য়েছিল কংগ্রেস গঠন করবার জন্যে তার সভাপতি চিত্তরঞ্জন, সেক্রেটারী বীরেন শাসমল, কোষাধ্যক্ষ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। তিনজন সহকারী সেক্রেটারীর মধ্যে আমি একজন। চিত্তরঞ্জন বললেন,—প্রত্যেক জেলায় একজন করে প্রধানকে ভার দিয়ে দাও। তাই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, মেদিনীপুর খুব বড় জেলা বলে তার ভার বীরেন শাসমল ও আমাকে নিতে হল'। বীরেন কাঁথি ও তমলুক এবং আমি সদর ও ঘাটালের ভার নিলাম। তখন ঝাড়গ্রাম পৃথক মহকুমা হয়নি। (ক্রমশঃ)

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিদেশী পর্যটকদের ভারত ভ্রমণ-তালিকায় কলিকাতা নাই!

কলিকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে বিদেশী পর্যটকদের ভারত ভ্রমণের তালিকা হইতে কলিকাতাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মেয়র আরো বলেন যে, "বাসস্থান, পানীয় জল, ড্রেনেজ, পথঘাট সংরক্ষণ, আলো, জনশিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত দিকেই আমরা প্রয়োজনের তুলনায় পিছনে পড়িয়া আছি, এবং আশঙ্কা করা যাইতেছে যে ক্রমে আমরা আরো বহু পশ্চাতে চলিয়া যাইব। কলিকাতা উন্নয়নের জন্য করিবার রহিয়াছে বহু কিছু, কলিকাতার সমস্যা সমাধানের বিষয়ের অন্ত নাই, কিন্তু যথোপযুক্ত সঙ্গতির অভাবে আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না।"

মেয়র মহাশয়ের এই দুঃখ ভাষণে আমরাও দুঃখ বোধ করিতেছি, কিন্তু মেয়র মহাশয় কেবল মাত্র 'সঙ্গতির' অভাবের কথাই বলিলেন কেন বুঝিলাম না। কলিকাতা শহরের পৌরসুখ-সুবিধা দেখা এবং তাহার জন্য পথঘাট, সিউয়েজ, রাস্তার আলো এবং শহর সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপার ঠিক মত রাখা এবং সেই ব্যবস্থা করার পূর্ণ দায়িত্ব কলিকাতা পৌর সংস্থার। কর্পোরেশনের ট্যাক্স বাবদ আয়ের অঙ্কও নেহাত কম নহে, এবং এই ট্যাক্স বাবদ যে অর্থ আদায় হয়, তাহা যদি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের কাজে খরচ না হইয়া করদাতাদের এবং শহরের কল্যাণে ব্যয় হইত তাহা হইলে, কলকাতার আজ আর এই বিষম

কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে পৌরপিতাদের যে মিটিং হইয়া থাকে, তাহাতে কাজের কাজ কি হয়, তাহার কথা না বলাই ভাল! এই সব মিটিং-এ করদাতাদের স্বার্থ এবং কলিকাতার উন্নয়ন সম্পর্কীয় বিষয়াদি বাদ দিয়া, বিশ্বের আর সকল ব্যাপার এবং সমস্যার কথাই আলোচিত হয়, এবং অতিপণ্ডিত পৌরপিতারা এই সকল আলোচনায় তাঁহাদের পরম পাণ্ডিত্যপূর্ণ মৌলিক মতামত প্রকাশ করিয়া করদাতাদের পরম কৃতার্থ করেন। রাজ্যের পলিটিক্যাল ব্যাপার লইয়াও, প্রতিষ্ঠানের যাহার সহিত পৌর কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে, পৌরপণ্ডিতের দল, দলগত কোন্দল করিয়া পৌরসভা সরগরম করিয়া রাখেন।

দুঃখ এবং লজ্জার সহিত করদাতারা লক্ষ্য করিয়াছেন, বিধানসভার মত পৌর সভাতেও পার্টি পলিটিক্সের নির্লজ্জ কলহ অহরহ ঘটিতেছে, যাহার ফলে কর্পোরেশনের কর বাবদ যে কয়েক কোটি টাকা আমদানী হয়, তাহার শতকরা বোধহয় ৭০ ভাগই হয় বরবাদ! কি ভাবে বহুমূল্য অর্থের অপচয় এবং অপব্যয় করিতে হয়, তাহা যদি কেহ যথোচিত শিক্ষা করিতে চাহেন, তবে তাঁহার পক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনই প্রকৃষ্ট শিক্ষালয়।

কলিকাতার বর্তমান বিষন্নমলিন এবং অনাথিনী দুঃখিনীরূপ এক দুই বছরে ঘটে নাই। বিগত প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া 'স্বাধীন' পৌরপিতারা কর্পোরেশনকে সর্ব্বভাবে রিক্ত করিবার পুণ্যকর্ম্মে পরম নিষ্ঠার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই একটিমাত্র পুণ্যকর্ম্মেই তাঁহাদের কাহারো আলস্য নাই, বিরক্তিও নাই।

কলিকাতাকে যদি বিদেশীদের ভ্রমণ তালিকা হইতে ছাটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে তবে ইহা অতীব উত্তম কর্ম্মই হইয়াছে এবং যাঁহারা এই কর্ম করিয়াছেন, তাঁহারা কলিকাতাবাসী তথা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে বিদেশী পর্যটকদের ঘৃণা এবং পরিহাস হইতে কিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন। এই কার্য্যটি আরো পূর্ব্বে হইলে, আরো ভাল হইত!

মেয়র মহাশয় অযথা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতায় বিদেশীদের দেখিবার মত বস্তু এবং তাহা দেখাইয়া আমাদের গৌরব বোধ করিবার মত কি আছে? মেয়র মহাশয় যদি প্রয়োজন বোধ করেন এখন আর একবার শহর পরিভ্রমণ করিয়া নিজের চোখে সবকিছু আরো ভালো করিয়া যাচাই করিতে পারেন।

কলিকাতাকে সর্ব্বভাবে রিক্ত কলঙ্কমণ্ডিত করিয়া কর্পোরেশন কোন মুখে আবার করবৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছে জানি না। অবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহাতে এখন কলিকাতার করদাতাদের একমাত্র এবং প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্পোরেশনকে সকল প্রকার করদান (অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত) বন্ধ করা। পরের পয়সায় নবাবি করা বন্ধ হইলেই পৌরপিতাদের কিছু আক্কেল হয়ত হইতে পারে। কলকাতা শহর এবং শহরবাসীদের মরণ বাঁচনের ব্যাপার লইয়া একদল চক্ষুহীন দীর্ঘকর্ণ এইভাবে আর কতকাল নৈরাজ্য চালাইবে জানি না। রাজ্যসরকারই বা কলিকাতা-কর্পোরেশন সম্পর্কে এত স্নেহ, মোলায়েম ভাব পোষণ কেন করিতেছেন, তাহা রাজ্য সরকারই বলিতে পারেন।

———

ভারত-তথা বাঙ্গলা সম্পর্কে বিদেশী-মতামত

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে Pacific Area Travel Association আমাদের দেশ সম্পর্কে এমন সকল বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার ফলে ভারত সরকার বিশেষ চিন্তান্বিত! এই ট্র্যাভেল অ্যাসোসিয়েসনের রিপোর্টে—বিদেশীদের পক্ষে ভারতভ্রমণের আকর্ষণ কি ভাবে ক্রমশ নিচের দিকে চলিয়া গিয়াছে এবং ক্রমশ আরো যাইতেছে তাহা অতি স্পষ্ট ভাষায়, সোজা কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারত সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকদের যে-আকর্ষণ এবং উৎসাহ দশ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল, বর্ত্তমানে তাহার শতকরা এক অংশও আছে কি না সন্দেহ!

এই সংস্থা প্যাসিফিক্ অঞ্চলের দেশসমূহ লইয়া যে সমীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে পর্য্যটকদের আকর্ষণীয় দেশগুলির তালিকায় ভারতের স্থান সর্ব্বনিম্নে! এই রিপোর্টের ফলে ভারতের বিদেশী পর্য্যটকদের নিকট হইতে যে বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন হইত এবং হইতে পারিত, তাহা বিশেষভাবে ব্যাহত হইবে। বিদেশী পর্য্যটকদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৮০ জনই মার্কিণ, এবং এই সদ্য প্রকাশিত ট্র্যাভেল অ্যাসোসিয়েসনের রিপোর্টের ফলে ভারতে মার্কিণ পর্য্যটক সংখ্যা খুব বেশী হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয়।

ভারত সরকারের সঙ্গে, রাজ্যসরকারগুলিও পর্য্যটক আকর্ষণ করিবার জন্য বিবিধ প্রয়াস প্রচেষ্টা চালাইতেছেন সত্য কথা, কিন্তু পর্য্যটকদের মতে এ-দেশে বিদেশীদের পক্ষে যে সকল অসুবিধা বহুবিধ বিষয়ে রহিয়াছে—তাহা দূর করিতে না পারিলে—পর্য্যটক আকর্ষণ প্রয়াস বিশেষ কোন প্রকার সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ এবং প্রয়োজন নাই। আমরা কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা প্রত্যহ দেখিতেছি। এখানে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনই হইয়াছে অতিষ্ঠ, বিশেষ করিয়া গণতন্ত্র রক্ষার কারণে রাজ্যব্যাপী বিষম সড়কী-সংগ্রামে। কলিকাতায় ত পথ চলাই দায়, একদিকে লোক সংখ্যার বিষম চাপ তাহার উপর যানবাহনের অসম্ভব সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি প্রায় প্রত্যহ বৈকালের দিকে গণমিছিলের বিচিত্র আঁকাবাঁকা অভিযান পথচারী এবং যানবাহনের গতি-পথ অবরুদ্ধ করিয়া। ১০০৷১৫০ জনের গণমিছিল কলিকাতায় অবলীলাক্রমে চৌরঙ্গী, ধর্ম্মতলা, ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সর্ব্ববিধ ট্র্যাফিক বন্ধ করিয়া দিতে পারে, দিতেছেও। ...

গুলিতে হকারদের দোকান। কোন কোন অঞ্চলে, যেমন ধর্ম্মতলা, ফুটপাথগুলি হইয়াছে মোটর মেরামতের ওয়ার্কসপের সামিল। এ দিকে দৃষ্টি দিবার কেহ নাই—না কর্পোরেশন, না পুলিস। ভোর ৫।৬টা হইতে কলিকাতার পথে ঘাটে জন এবং যান-স্রোত বহিতে আরম্ভ করে, রাত্রি বারোটাতেও তাহা শেষ হয় না। শহর-বাসীদের প্রায় ২৪ ঘণ্টাই প্রাণঘাতী কোলাহল এবং সর্ব্ববিধ কষ্ট-অসুবিধার মধ্যে কাল কাটাইতে হয়। এখানে শান্তি নামক জিনিষটি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থানে রাজত্ব করিতেছে আয়ুক্ষয়কারী এক ভীষণ অশান্তি!

কলিকাতা আজ কেবল জঞ্জালনগরীই নহে, কলিকাতাকে বিক্ষোভ-নগরীও বলা অসঙ্গত হইবে না! বিশেষ কয়েকজন বিদেশী ভারত পর্য্যটক তিন চারিমাস পূর্ব্বে কলিকাতার এই বিচিত্ররূপ দর্শন করিয়া, অযথা কালক্ষেপ না করিয়া কলিকাতা হইতে পলায়ন করেন! পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য দ্রষ্টব্যস্থানগুলির প্রতি কোন দৃষ্টি দিবার কোন প্রয়োজন তাঁহারা বোধ করেন নাই ভরসাও হয় নাই। কলিকাতার নাড়ীর বেগ দেখিয়া তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের তথা বাঙ্গালীর রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের পূর্ণ পরিচয় লইয়া গিয়াছেন!

এই শহরের কালিমা-কলঙ্ক কাহিনীর আর বিষদ বর্ণনা দিবার প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা, তথা কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী এবং অন্যান্য আবহাওয়ার রাজ্যবাসীরাও বর্ত্তমান কলিকাতা-বাসের বিষম-কাঁপুনী প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টাই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি! এবং ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে বিদেশী পর্য্যটক-দের ভ্রমণ তালিকা হইতে কেন ছাটিয়া দেওয়া হইল!

কলিকাতার বর্ত্তমান 'চরিত্র' দেশকেও সংক্রামিত করিয়াছে

কলিকাতা এবং এ-রাজ্যের অন্যান্য বড় বড় শহর-গুলির বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষভাবে বাঙ্গালী জাতির চরিত্রকেও নানাভাবে বিষাক্ত করিয়াছে। শহরগুলির পাহাড় প্রমাণ আবর্জ্জনা, সর্ব্ববিষয়ে অব্যবস্থা এবং চারিদিকের নোংরা আবহাওয়া বাঙ্গালী জাতির চরিত্রেও আজ প্রকট দেখা যাইতেছে। সভ্য-শহরের মানুষকে আজ দেখাইতেছে অসভ্যরূপে, ইহার মধ্যে তথাকথিত শিক্ষিত অসভ্যরাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। জঙ্গলে বসবাসকারী জঙ্গলীদের বুঝা যায়, সহ্য করাও যায়, কিন্তু ভদ্রবেশধারী ঐতিহ্য-গর্ব্বী জঙ্গলী শহুরে মানুষদের কি বলিবেন?

আজ কথায় কথায় গণতন্ত্রের রব উঠিতেছে। পুস্তকে পড়া গণতন্ত্র বুঝিতে পারি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া কলিকাতা শহরে— ১৩।২।৬৮

'জনমারি-গণতন্ত্রকে কি ভাবে লইব?'

কিছুসংখ্যক গুণ্ডা এবং বিক্ষোভকারীর দল যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে ক্র্যাকার, বোমা, সোডার বোতল এবং ইটপাটকেল মারিয়া—তাহাদের ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া নিজেদের জয়ধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পার্টির গৌরব প্রচার করিতে থাকে, সেই অবস্থায় নিরীহ অস্ত্রহীন জনগণের এই প্রকার নব-গণতন্ত্রের নিকট আপাতত মস্তক নিচু করা ছাড়া উপায় নাই। এই নবগণতন্ত্রীরা ভুলিয়া যাইবেন না যে, একান্ত ভীরু মানুষও বেশীদিন পড়িয়া পড়িয়া মার খায় না, হঠাৎ এমন একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন ভীরুর দলও উঠিয়া দাঁড়ায় এবং অত্যাচারী নব-গণতন্ত্রেদের বেপরোয়া জনতন্ত্রের কঠিন পেষণ শুরু করিয়া দেয়। পশ্চিমবঙ্গের 'পড়িয়া মার-খাওয়া' নিরীহ মানুষদের মধ্যে একটা নবচেতনার আভাস স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। মাত্র ৬০ বা ৮০ হাজার 'গণতন্ত্রী' স্বেচ্ছাসেবক (না, সৈন্য?) হুমকী দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে পারিবে কি? ষাট এবং আশী হাজারের উল্টা দিকে চার-পাঁচ দশ লক্ষ জনরক্ষাকারী হয়ত প্রস্তুত হইয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গের নব 'গণপতি' জ্যোতিবসু হুমকী দিতেছেন তিনি বিধানসভার অধিবেশন হইতে দিবেন না। পশ্চিম-বঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষা করিবার মহৎ এবং পূর্ণ দায়িত্ব তাঁহাকে কে দিল জানি না। পরোপকারী মহাশয় ব্যক্তি বলিয়াই কি তিনি স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব লইলেন? একথা অবশ্য স্বীকার করি যে, যে-কোন লোক যে-কোন স্থানে একটা

সাময়িক গোলমাল সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু এই প্রকার গোলমালটাই শেষ কথা নহে। ইহার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং প্রয়োজন হইলে অবশ্যই তাহা করা হইবে।

সব কিছু দেখিয়া মনে হইতেছে যে সকল মহাবীর গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া লাল কম্যু এবং সমধর্মী পার্টির গণমহারাজগণ, তাঁহাদের কাহারো ভারতীয় সংবিধানের প্রতি কোন আনুগত্য বা কোন শ্রদ্ধা নাই। দায়ে পড়িয়া ইহারা হঠাৎ এমন সংবিধান প্রেমিক এবং সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এত বিষম চিৎকার সহ অন্যবিধ অনাচার সৃষ্টি করিয়া জনজীবন এবং সমাজকে সর্ব্বভাবে বিপর্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন! 'গণপতি' এবং গণমহারাজদের আসল লক্ষ্য হইল রাজ্যের শাসন ক্ষমতা আর একবার দখল করা এবং তাহার পর—তাঁহাদের নয়-মাসের শাসনকালে—রাজ্যের যে শেষ সর্ব্বনাশটুকু সমাধা করিতে পারেন নাই, আবার গদিতে বসিতে পারিলে, মনের সেই অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করিয়া দেশ এবং জাতিকে কাহার বা কাহাদের হাতে তুলিয়া দিবেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

কিন্তু গণপতি জ্যোতিবসু প্রমুখ উগ্রপন্থীদের মনোবাসনা দেশবাসী এত সহজে পূর্ণ হইতে দিবে কি? দেশের লোক চাহে, জ্যোতিবাবুর যদি সংবিধানের অনাচার (তাঁহার মতে) দূর করিয়া বিশুদ্ধ সংবিধানিক প্রশাসন পুনঃস্থাপন করিবার প্রবল বাসনা জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে—নিরীহ জনগণকে অযথা না জ্বালাইয়া না ক্ষেপাইয়া, এই সাংবিধানিক সঙ্কট মিটাইবার একমাত্র স্থান—বিধানসভাতেই তাহা করুন না কেন?

"জনগণ আমাদের পক্ষে, আমরা জনগণের বিচার মানিয়া লইব"—"জনগণই আমাদের কর্ত্তা এবং মালিক!"—এই সব ফাঁকা অসার এবং স্টকস্লোগানে যাহা বলা হয়, আসলে তাহা ডাহা মিথ্যা এবং লোক ঠকাইবার উপায় মাত্র। বিধানসভার মাত্র এক ঘণ্টার অধিবেশনে যে সমস্যার নিষ্পত্তি হইতে পারে, সেই সমস্যা কিংবা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কম্যুনেতা "বিটিং অ্যাবাউট্ দি বুস্" করিয়া বেড়াইতেছেন কেন? মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে জোর গলায় প্রচার করা হয় যে, ইউ এফ্-এর প্রাক্তন মন্ত্রীসভার সমর্থক, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সম্পর্কে কোন চিন্তা নাই। বিধানসভার অধিকাংশ সদস্যই বিতাড়িত মন্ত্রীসভার সমর্থক! একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেশে "রক্তবন্যা" না বহাইয়া, ছাত্রদের পথে বাহির না করিয়া, কাজের লোকদের বেকার না করিয়া এবং দেশের চারিদিকে বিষম অশান্তি সৃষ্টি না করিয়া, বিধানসভাতে গিয়া পুনঃ মন্ত্রিত্বলোভী এবং প্রয়াসী ইউ এফ' এক ঘণ্টার মধ্যেই পি ডি এফ মন্ত্রী মণ্ডলীকে আসন হইতে অপসারিত করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিলে ভাল হইত না কি? বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়—গণপতি শ্রীজ্যোতিবসুর নিকট দেশবাসীর এইমাত্র কাতর নিবেদন" (২০-১-৬৮)

পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গলা কোথায়?

মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ-বিরোধী মনোভাবের জন্য সরকারী চাকুরি পাওয়া বন্ধ হইলে আয়ার ও আয়েঙ্গার সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের উদ্যোগেই কলকারখানা স্থাপন আরম্ভ করিয়া দেন। পাঞ্জাবীরা নিজেদের চেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই কৃষিপ্রধান পাঞ্জাবকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। বোম্বাই ও থানা এলাকায় নূতন নূতন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন রাজ্যে তো দূরের কথা, নিজ রাজ্যে বাঙালীরা শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে আদৌ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই!

পশ্চিমবঙ্গ আগেই শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। কাজেই অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ব্যাপারে কাঁচামাল পাওয়ার যে সুবিধা ছিল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে

তাহা ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এখানে শিল্প-স্থাপন করিয়া মারোয়াড়ী ও পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীদের পক্ষে যদি কাঁচামাল সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়া থাকে, বাঙ্গালীদের পক্ষেও তাহা না হওয়ার কোন কারণ নাই। অবশ্য মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা নূতন শিল্প স্থাপন অপেক্ষা বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পুরাতন কল-কারখানা ও চা-বাগান কিনিবার ব্যাপারেই বেশী টাকা লগ্নী করিয়াছেন। কল-কারখানার আধুনিকী-করণ ও সম্প্রসারণের জন্যও মোটা টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। ফলে ডঃ হাজারি পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে ছয় বৎসর যে এক শত বত্রিশ কোটি টাকা লগ্নীর কথা বলিয়াছেন, এক হিসাবে তাহা হিসাবেরই কারচুপি এবং পশ্চিমবঙ্গে নূতন কল-কারখানা যে বেশী স্থাপিত হয় নাই, ডাঃ হাজারির রিপোর্টেও তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। নূতন শিল্পোদ্যোগ ছাড়া কখনও কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বাড়িতে পারে না।

আলোচ্য রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকার—মহারাষ্ট্র, বিহার, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশে যে পরিমাণ টাকা ঐ রাজ্যের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে লগ্নী করিবার অনুমোদন দিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের বেলায় তাহা অনেক কম। কিন্তু ইহার জন্য আসলে দায়ী বাঙ্গালী, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী শিল্প-পতি এবং ব্যবসায়ীরা।

পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীরা যদি নূতন শিল্প-স্থাপনে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে ভারত সরকারের লাইসেন্স প্রদানের নীতিরও কিছুটা রদ-বদল হইত। পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার আলুচাষের এলাকায় অনেকগুলি হিমঘর স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু বেশীরভাগ হিমঘরের মালিকানা ভিন্ন রাজ্যের লোকদের হাতে। দুর্গাপুর আসানসোল এলাকায় সহশিল্প স্থাপনের যে সুযোগ ছিল এবং এখনও আছে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা সে-সব সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা যদি ওই এলাকায় সহশিল্প স্থাপন করিতে পারেন, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের তাহা না পারার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গে নূতন নূতন শিল্পস্থাপন ও রাজ্যের যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বাড়াইতে হইলে বাঙালী ব্যবসায়ীদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে। ভিন্ন রাজ্যের লোক এ রাজ্যের কল-কারখানার মালিক হইলে সাধারণত ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীরাই বেশী কাজ পাইয়া থাকে এবং পাইবেই। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এ-রাজ্যে নূতন নূতন কলকারখানা এবং অন্যান্য প্রকার ব্যবসায় স্থাপনে উৎসাহী এবং উদ্যোগী না হইলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার কোন সহজ সমাধান হইবে না।—

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অর্থ নিয়োগে ব্যবসায়ীরা এত নিরুৎসাহ কেন সে-বিষয়ে আরো কিছু বলার অবকাশ আছে। ইউ-এফ সরকার তাহাদের নয় মাসের রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড অরাজকতা এবং বিষম বৈষম্যমূলক ক্রিয়াকর্ম্মে লিপ্ত হয়েন তাহার ফল আরো কয়েকবছর হয়ত এ-রাজ্যকে ভুগিতে হইবে। রাজ্যের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী আর কিছু সার্থকতা অর্জ্জন না করিলেও—শিল্প-সংহার ব্রত অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গের শিল্পে বাঙ্গালীর স্থান—

কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতের বেসরকারী শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগের সম্পর্কে রিপোর্টে বাঙ্গালীর শিল্পোদ্যমের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পরম নৈরাশ্যজনক বলিলেও কম বলা হয়।

১৯৫৯ সাল হইতে ১৯৬৬র জুন মাস পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মোট ২°৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় কিন্তু টাকার মধ্যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অংশ মাত্র ১৪ কোটি টাকা। উদ্ধৃত কালে মাড়োয়ারী শিল্প-পতিরা সমগ্র ভারতে মোট ২৭৫ টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন—কিন্তু এই অর্থের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গেই তাঁহারা ১৩২ কোটি টাকা ঢালিয়াছেন। দেশের আর কোন রাজ্যেই মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা এত বৃহৎ পরিমাণ অর্থ লগ্নী করেন নাই।

মহারাষ্ট্রে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে ১৯৬৩ হইতে ৬৬' (জুন পর্য্যন্ত) ৪১৭ কোটি টাকা নিয়োজিত হইয়াছে

কিন্তু এই অর্থের অধিকাংশই আসে গুজরাটী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে। এই অর্থলগ্নীর দৃষ্টান্তে স্পষ্টই দেখা যায় যে মাড়োয়ারী, গুজরাটী এবং পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীরা আপন আপন রাজ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থ বিনিয়োগ করিয়া অন্যান্য রাজ্যেও তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ঢালিতে কোন দ্বিধা বা অনিচ্ছা দেখা যায় না। এ বিষয় একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা অতি প্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি। শিল্পোদ্যোগের ব্যাপারে প্রায়ই বাঙালী ঐতিহ্যের (ব্যবসা বাণিজ্যে) ওজুহাত উঠিয়া থাকে, অথচ অন্যদিকে দেখা যায় পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজবাসীরা নূতন এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। এইবার দেখুন মন্তব্যে কি প্রকাশ পাইতেছে—

'ব্রেন্ ড্রেন্'?

সংবাদে প্রকাশ ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ টেক্‌নলজির কৃতি এঞ্জিনিয়াররা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতেছেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর দেশে ফিরিতেছেন না। কথাটা সত্যই দুঃখের কিন্তু এই সব কৃতি এঞ্জিনিয়ার বিদেশ হইতে আর দেশে প্রত্যাবর্তন কেন করেন না, তাহার বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে। কেবল এঞ্জিনিয়ার নহে, ডাক্তার, অধ্যাপক এবং অন্যান্য আরো বহু ভারতীয় ছাত্র-হিসাবে বিদেশে গিয়া, ঐসব দেশেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন। অনেকে বিবাহাদি করিয়া, সোজা কথায় একেবারে পাকা—বিদেশী বনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেন, কি কারণে এমন ঘটিতেছে তাহা দেখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, কারণ এটা সত্য-যে কেহ অকারণে নিজের দেশ এবং স্বজন পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে সহজে স্থায়ী বসবাস করিতে চাহে না। নিজের দেশ এবং জাতির প্রতি সকল মানুষেরই স্বাভাবিক একটা টান এবং মায়ার-বন্ধন থাকে বলিয়া জানি।

আসল কথা—লেখাপড়া এবং শিক্ষা শেষ করিয়া কৃতি ছাত্র এবং এঞ্জিনিয়ার এ-দেশে উপযুক্ত মর্যাদালাভ করেন না। এখানে এমন বহু এঞ্জিনিয়ার আছেন, যাঁহারা শেষ পর্যন্ত পেটের দায় মিটাইতে সামান্য বেতনের মাষ্টারি কিংবা ঐ প্রকার অন্য কাজ লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের চাকরী লাভ করা সকল সময় প্রার্থীর যোগ্যতা এবং গুণের উপরেই নির্ভর করে না, এই দুইটি বস্তু ছাড়াও আরো কিছু থাকা প্রয়োজন; কপালের জোর। কেন্দ্র সরকারের চাকুরীর ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহাশয়দের সুপারিশ এবং ব্যাকিং সর্ববিষয়ে সর্বগুণযুক্ত প্রার্থীর পক্ষেও 'মাষ্ট' এবং ইহার অভাবে প্রার্থীর সকল প্রচেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কথাটা সাধারণ ভাবে বলা হইল।

এঞ্জিনিয়ারদের সম্পর্কে একটি বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন ছোট বড় প্রায় সকল এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার জেনারেল ম্যানেজার কিংবা সমপর্য্যায়ের পদগুলি আই-সি-এস, আই-এ-এস ক্যাড্‌র-ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত এবং ইহাদের নিয়োগ বিভাগীয় মন্ত্রীদের উপরেই সর্বোতোভাবে নির্ভর করে। বলা বাহুল্য এই আই-সি এস, অই-এ-এস অফিসার-দের কোন প্রকার টেকনিক্যাল শিক্ষা অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান না থাকিলেও—ইঁহাদেরই অধীনে পাকা এঞ্জিনিয়ার-দের কাজ করিতে হয় বাধ্য হইয়া। এমন বিচিত্র ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এখানে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে প্রাইভেট্ সেক্‌টারে এঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় এমন বিচিত্র এবং পরিহাসযোগ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঘটে না, সেই কারণেই প্রাইভেট্ সেক্‌টারের কলকারখানাগুলিতে লোকসান বিশেষ হয় না। শেয়ারহোল্ডারগণ নিয়মিত ডিভিডেণ্ডও পাইয়া থাকেন! অন্যদিকে রাষ্ট্রআয়ত্তাধীন—অর্থাৎ পাবলিক সেকটারে কলকারখানাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে—কেবল অপচয়, অপব্যয় এবং ক্রমাগত লোকসানের পালা চলিতেছে। গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধে কাহারও কিছু আসে যায় না।

কিছুদিন পূর্বে এঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা একটি প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল এই যে এঞ্জিনিয়ারিং কলকারখানাতে—অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তিরাই যদি "সর্বাধিনায়কের" পদগুলি দখল করিয়া

থাকেন, তাহা হইলে এঞ্জিনিয়ার এবং বিশিষ্ট টেক্‌নিশীয়ানদের অন্যত্র চাকরী সন্ধান করিতে হইবে বাধ্য হইয়া। এই প্রতিবাদের কোন ফল কিংবা কোন সুষ্ঠু মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া এখনও শুনি নাই। কারণ এখনও দেখা যাইতেছে—সরকারী বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিতে জেনারেল ম্যানেজার কিংবা তাহা অপেক্ষাও উচ্চপদগুলিতে কর্ত্তা হইয়া বসিয়া আছেন বিশেষ কয়েকজন অতি ভাগ্যবান অ-এঞ্জিনিয়ার এবং নন্ টেক্‌নিক্যাল্ কেন্দ্রীয় সরকারী উচ্চপদস্থ অফিসার।

যোগ্যজনের হাতে দায়িত্বভার না থাকিলে যাহা ঘটিয়া থাকে আমাদের এ-পোড়া দেশে তাহাই ঘটিতেছে। দেখা যাইতেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত হইলেই মন্ত্রী নিজ ভারপ্রাপ্ত বিভাগের সকল জ্ঞানের সর্ব্বঅধিকারী প্রায় রাতারাতি হইয়া পড়েন। এমনও দেখা যাইতেছে যে-ব্যক্তি জীবনে হয়ত কখনও কোন কলকারখানা দেখেন নাই এবং কলকারখানা বিষয়ে যাঁহার কোনপ্রকার টেক্‌নিক্যাল এবং নন্ টেক্‌নিক্যাল কোন জ্ঞানই নাই, তিনিই হ'ন '(নির্ব্বাচনে জিতিয়া) প্রধান মন্ত্রীর কৃপাদৃষ্টির কল্যাণে ভারত সরকারের লৌহ-ইস্পাত এবং অন্যান্য প্রকার কলকারখানার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং এই মন্ত্রিত্বপদে বসিয়াই তাঁহার প্রথম এবং প্রধান কাজ হয় বিবিধ কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তাদের তাঁহার ইচ্ছামত স্থানে এবং পদে বসানো, ফলে round screw বসে square hole-এ এবং square screw round hole-এ। ইহার পরিণাম কি হইতেছে—তাহা সকলেরই জানা আছে।

ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারদের দেশে নিযুক্ত রাখিতে হইলে তাহার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা দরকার। কেবল মাত্র দেশপ্রেম এবং জাতির কল্যাণের বুক্‌নীর দ্বারা কোন কাজই হইবে না। সর্ব্বগুণধর আই-সি-এস এবং আই-এ-এসদের এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা কিংবা কোনপ্রকার টেক্‌নিক্যাল ব্যাপারে এক্স্‌পার্টের পদে বসাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের সময়, দায়িত্ব এবং কর্ম্মদক্ষতা প্রশাসনিক কর্ম্মক্ষেত্রে, লোহালক্কড়, ড্যাম্ বাঁধিবার দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁহাদের অযথা কেন নিয়োগ করা হইবে? ইহাও অপচয়।

আরো কথা আছে—ভারত সরকারের কথায় বিশ্বাস করিয়া অনেক এঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার প্রভৃতি বিদেশের ভাল ভাল কাজ ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া বিপদে পড়িয়াছেন এবং এখানে সকল দুয়ারে ঘুরিয়া আবার বিদেশেই পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, প্রয়োজন মত এবং উপযুক্ত কর্ম্মসংস্থানের অভাবে। মাসে ৫০০্ টাকা আহারীর ব্যবস্থা করিয়া কেবল কতকগুলি 'পুল অফিসার' (তাও ১।২ বছরের মেয়াদে) অস্থায়ীপদে বসাইয়া দিলেই সমস্যার কোন সমাধানই হইবে না, গত তিনচার বৎসর যাবত ভারত সরকার যাহা করিতেছেন।

এঞ্জিনিয়ার তথা বিদেশে শিক্ষা প্রাপ্ত কৃতি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক, ডাক্তারদের নিন্দা করিলেই চলিবে না। কর্ত্তৃপক্ষ যদি দেশের সর্ব্বস্তরে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং মরিচাধরা কাঠামোর পরিবর্ত্তন না করেন, কেবল মাত্র গালভরা হিতবাক্য এবং দেশের প্রতি কর্ত্তব্যের ফাঁকা কথায় কোন ফল হইবে না। কর্ত্তব্য দুই পক্ষকেই সমানভাবে করিতে হইবে। সরকার যদি নিজের কর্ত্তব্যে এবং দায়িত্ব সম্পর্কে, কেবল অবহিত নহে, সতর্ক থাকেন, তাহা হইলে অন্য তরফও কখনও তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে দ্বিধা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ-বিষয়ে কিছু হইবে বলিয়া আশা কেহই করে না। গত বিশ বছর কেন্দ্রীয় (এবং রাজ্য) কর্ত্তারা শাসকপদে বসিয়াই জন গণকে তাহাদের কর্ত্তব্য কি এবং কেন তাহা পালন করা প্রয়োজন, এই সকল গালভরা নীতিকথাই শুনাইতেছেন। পুরান এবং নূতন মন্ত্রী প্রায় ও একই কথা, একই গড়ে ও ভাবে দেশবাসীকে অহরহ শুনাইতে কসুর করিতেছেন না। কিন্তু হায়! মহাশয় মন্ত্রীদের বহুমূল্যবান এবং বিচিত্র হিতবাণী শুনিয়া শুনিয়া দেশের অবস্থা আজও যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল! কাজের কাজ কেহই আশা করেন না, এমন কি শতকরা ৯০জন মন্ত্রীও এই নিরাশাবাদীর দলে।

বিষবৃক্ষের ফল বিষময় ছাড়া আর কি হইবে?

উৎকট হিন্দী-উৎসাহী এবং আংরেজী-হঠাওকারীদের বিষম আন্দোলন তথা লঙ্কাকাণ্ডের ফল এবার ফলিতে আরম্ভ

করিয়াছে। গায়ের জোরে একটা কাঁচা ভাষাকে হঠাৎ সমৃদ্ধ করিয়া সেই আঞ্চলিক ভাষাকেই ভারতের রাজভাষার তক্তে বসাইবার প্রয়াস যে বিফল হইতে বাধ্য একথা সাধারণ মানুষ বুঝিতে পারিলেও কেন্দ্রীয় কর্তারা, বিশেষ করিয়া যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী, তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন নাই, কিংবা মনে স্বীকার করিয়াও হিন্দীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করেন নাই, সে-সাহসও তাঁদের হয় নাই।

বহু পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে ভারতে সংহতি-রক্ষা না করিয়া হিন্দী একদিন সংহতি সংহারই করিবে, কিন্তু সে দিন যে এত শীঘ্র আসিবে তাহা আমরাও কল্পনা করি নাই। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন, যে এই হিন্দীই শেষ পর্য্যন্ত ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, উত্তর এবং দক্ষিণে। কিন্তু যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে এখনও যদি কেন্দ্রীয় কর্তারা তাঁহাদের ত্রি-ভাষা সূত্রের অছিলায় হিন্দীকে সকলের আবশ্যিক করার জেদ্ পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে ভারত শেষ পর্য্যন্ত বিভক্ত হইবে তিনটি প্রধান ভাগে: উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব। পূর্ব্ব ভারতে এখনও তেমন প্রবল হিন্দী বিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই সত্য, কিন্তু দক্ষিণের অগ্নিপ্রবাহ পূর্ব্ব ভারতে আসিতে বেশী বিলম্ব হইবে কি?

আসাম এবং ওড়িষ্যার কথা কিছু না পশ্চিম বঙ্গের কথাই বলিব, এ-রাজ্যে আলকাতরা যেমন প্রচুর, তেমনি হিন্দী সাইন বোর্ড, দোকান ছাড়া, সকল সরকারী অফিসগুলিতে হিন্দী নেম্ প্লেট এবং সাইন বোর্ডের অতি-প্রাচুর্য্য, রাজ্যের ডাকঘরগুলিতে হিন্দী নাম সবার-উপর হাজার হাজার আছে। কতকগুলি হিন্দী মিডিয়াম্ স্কুলে কলিকাতায় বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছে, রেল ষ্টেশনগুলিতে সাইনবোর্ডের উপর হিন্দী, তাহার নীচে বাংলা ও ইংরেজী নাম। দেখিলে মনে হয় যে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সাইন বোর্ডে বাংলা ও ইংরেজী নাম বসানো হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে এখন রেল ষ্টেশন বহু বহু আছে, যেখানে হিন্দী ভাষী শতকরা একজনও হয়ত নাই, তেমন ষ্টেশনেও এবং সেখানকার পোষ্ট অফিসে (যদি থাকে) হিন্দী নাম সর্ব্বোপরি। অথচ বিহারে এমন বেশ কিছু বাঙ্গালী প্রধান অঞ্চল আছে (শত করা অন্ততঃ ৮০।৮৫) যেখানে ষ্টেশন এবং পোষ্ট অফিসের সাইন বোর্ড হইতে বাঙ্গলাকে গত ১৫।২০ বছর পূর্ব্বেই বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নাই। আমরা এই কথাই হিন্দী প্রেমিকদের, বিশেষ করিয়া শেঠ গোবিন্দ দাস এবং মোরারজী ভাইকে বলতে চাই যে তাহারা হিন্দী প্রেমের বন্যা যদি এখনও দমিতে না করেন, জোর করিয়া হিন্দীকে ভারতের লিঙ্ক-ভাষা করিবার অপপ্রয়াস ত্যাগ না করেন তাহা হইলে হয়ত অচিরে পূর্ব্ব ভারতেও আলকাতরা লেপন এবং 'হিন্দী' দাহন পর্ব্ব সুরু হইবে, যেমন ঘটিল দক্ষিণ ভারতের, বাঙ্গালোর এবং অন্যান্য শহরে। মান্দ্রাজী ছাত্রসমাজের হিন্দী-বিরোধী উগ্র কার্য্যকলাপ আমরা সমর্থন না করিলেও পূর্ব্ব ভারতের ছাত্র সমাজ যে অনতিবিলম্বে মান্দ্রাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? (২৪।১।৬৮)

বিহার সরকারের অভিনব প্রবর্ত্তন

হিন্দী-ভাষী অঞ্চল ছাড়া ভারতের অন্যত্র যখন হিন্দীর জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রাকাশ্য আন্দোলন এবং অহিন্দীভাষীদের মনেও বিষম চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, ঠিক সেই শুভমুহূর্ত্তেই বিহার সরকার তাঁহাদের অত্যুগ্র হিন্দী-প্রেমের উৎসাহে দুইটি অবোধচিত পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়াছেন। একটি বিহারের জন্য হিন্দীতে টেলিফোন গাইড এবং দ্বিতীয়টি —আরো চমৎকার-মোটর গাড়ীতে ইংরেজীর সঙ্গে হিন্দীতে দ্বিতীয় আর একটি নাম্বার প্লেট! স্কুটার, মোটরসাইকেলেও এই ভাবে দুইটি প্লেট লাগাইতে হইবে কি না প্রকাশ করা হয় নাই তবে নিশ্চয়ই হইবে! সারা ভারতে মোটর এবং অন্যান্য প্রকার সাধারণ যাত্রীবাহী এবং প্রাইভেট যান, যাহা পথে ঘাটে যাতায়াত করে তাহাতে ইংরেজী নাম্বার প্লেটই আবহমান কাল ধরিয়া অর্থাৎ মোটর গাড়ী চলন যখন হইতে হইয়াছে এবং ইহাতে কাহারো কোন প্রকার

অসুবিধা এবং কাহারো মনে বিন্দুমাত্র বেদনার সঞ্চারও হয় নাই। আজ হঠাৎ হিন্দী বানর-সেনার আলকাতরা লেপনের প্রাবল্যে, বিহার সরকারও কি এই বানর-বাহিনীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। বিহার সরকার না হয় চাপে মতি স্বীকার করিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের খাস্ এবং অমিত বিক্রমশালী শাসকমহল এমন একটা অদ্ভুত এবং মূর্খজনোচিত প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন কোন যুক্তির বলে তাহা বুঝিতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত হইলেও অতি মুগ্ধ!

কিন্তু নাম্বার প্লেট সম্পর্কে বিহার সরকারের অভিনব এই প্রবর্তন যদি অন্যান্য রাজ্য সরকারও অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন, অবস্থা কি দাঁড়াইবে? তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, বাঙলা, অসমিয়া এবং অন্যান্য আরো যে শতপ্রকার ভাষা ভারতে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে চালু আছে, ক্রমে এই সব ভাষাতেই যদি গাড়ীর নাম্বার প্লেট লাগানো সুরু হয়, তাহা হইলে অচিরে এমন দিন আসিবে যখন ইংরেজী নাম্বার ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে হইতে প্রায় অদৃশ্য হইবে। পুলিশের পক্ষে গাড়ীর নম্বর সব সময় প্রয়োজন মত নোট করা, বিশেষ করিয়া অ্যাক্সিডেন্টের সময়) অসম্ভব হইবে। এক রাজ্যের গাড়ী অন্যান্য রাজ্যে প্রায়ই যাতায়াত করে, সে সময় গাড়ীর নাম্বার প্লেট কি সেই রাজ্য বিশেষের আঞ্চলিক ভাষাতেই করিতে হইবে, অর্থাৎ একটি মোটরকার যদি কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে চায়, তাহাকে পথে প্রতি রাজ্যের জন্য একটি করিয়া, মোট ৭।৮টি নাম্বার প্লেট সঙ্গে লইতে হইবে এবং এক রাজ্য সীমা পার হইয়া অন্য রাজ্য সীমায় প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাম্বার প্লেটও বদলাইতে হইবে! ব্যাপারটা কল্পনা করিতেও মন অদ্ভুত এক পুলকে ভরিয়া উঠে। (এতদিন পরে আমার নিজের গাড়ী রাখিবার সঙ্গতি নাই বলিয়া আজ প্রচণ্ড স্বস্তি ও নিলীক বোধ করিতেছি!)

হিন্দীতে টেলিফোন গাইড বিহারে যদি সত্যই প্রবর্তিত হয়, তাহা হইলে বিহারে যাঁহাদের ফোন আছে অথচ যাঁহারা হিন্দী পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হইবে? টেলিফোন গাইডেও কি শেষ পর্যন্ত মনি-অর্ডার ফর্মের মত দ্বিভাষা এবং দ্বি-হরফী হইবে? অর্থাৎ ২০০ পাতার ফোন গাইড হইবে ৪০০ পাতার। বাড়তী খরচটা কি বিহার সরকার দিবেন? আর ইহা না হইলে অহিন্দী ভাষীদের টেলিফোন চার্জ কম হইবে কি? ইহা দিতেও যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিহার সরকার আইন করিয়া হিন্দী যাঁহারা জানেন না, দেব নাগরী হরফও যাঁহারা পড়িতে পারেন না, তাঁহাদের ফোন দেওয়া রদ্ করিতে পারেন। ক্রমে ভারতের সকল রাজ্যেই কি আঞ্চলিক ভাষায় ফোন গাইড মুদ্রিত হইবে?

পশ্চিমবঙ্গে নূতন রাজনৈতিক সংগঠন!

সংবাদপত্রে দেখিলাম এ দেশে ভারতীয় মুসলমানদের সকল বিষয়ে যথাযথ রাজনৈতিক তথা নাগরিক অধিকার নাই বলিয়া কয়েকজন "নন্"-কম্যুন্যাল মুসলমান একটি নূতন দল গঠন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই দলে কোন অমুসলমান সদস্য নাই। স্বাধীনতার বিশ বৎসরের পর এই মুসলীম-হিতৈষী 'জনকয়েক' কি দেখিয়া এবং কেন স্বতন্ত্র একটি মুসলীম দল গঠনের প্রেরণা পাইলেন জানিতে পারিলে বাধিত হইব। আমাদের বহু বহু মুসলমান বন্ধু আছেন, যাঁহাদের সহিত প্রায়ই মিলিত হই এবং পলিটিক্যাল নন্-পলিটিকাল নানা বিষয়ে আলোচনাও করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাদের কাহারো মুখে, 'ভারতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে' এমন অভিযোগ শুনি নাই।

১৯০৭ সালের লর্ড মিণ্টোর আমলে, তৎকালীন মহামান্য আগা খাঁ, ইংরেজ ভাইসরয়ের প্ররোচনায় মুসলীম লীগের সূচনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ। কিছুবেশী এবং বিশেষ সুখ-সুবিধা দিয়া, ভারতী মুসলমানদের ভারতীয় অ-মুসলমানগণের নিকট হইতে তফাতে রাখা, যাহাতে মুসলমানদের কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সংযোগ না হয়, বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে! লর্ড মিণ্টো, তথা ব্রিটিশ সরকারের এই উদ্দেশ্য সার্থক হয়, এবং যাহার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ভারত খণ্ডিত করিয়া ইংরেজ এদেশ ত্যাগ করে।

বর্তমান স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন মাননীয় শ্রদ্ধেয় মুসলমান, সুপ্রীম কোর্টের চিফ্ জাস্টিস মুসলমান। কেন্দ্রে

এবং বহু রাজ্য সরকারগুলিতেও মুসলমান মন্ত্রী কম নাই। সরকারী চাক্‌রীর ক্ষেত্রে মুসলমান অবহেলিত—এ কথা যে বলিবে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলা ছাড়া পথ নাই। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এবং অন্যান্য প্রায় সকল রাজনৈতিক পার্টিতেই মুসলমান উচ্চ এবং জনসম্মানের পদে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজের শ্রদ্ধের মুসলমান শিক্ষক এবং অধ্যাপক যথেষ্ট আছেন এবং যাঁহাদের ছাত্রদের মধ্যে অমুসলমানই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

দেশের আইনাদি এবং সুযোগ সুবিধা সকল ভারতীয়ের পক্ষে সমান, কোন তারতম্য নাই। এ বিষয় বরং মুসলমানদের প্রতি কিছু পক্ষপাতিত্বই দেখা যায়। যেমন—

১। ভারতীয় অমুসলমান নাগরীক এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে না, করিলে তাহা হইবে বেআইনী এবং দণ্ডনীয়। অথচ ভারতীয় মুসলমান এক স্ত্রী থাকিতেও আরো তিনটি স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে যে কোন মুসলমান নাগরীক একই সঙ্গে চারিটি স্ত্রী লইয়া পরমানন্দে বসবাস করিতে পাবেন। ইহা তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং সমাজ অনুমোদিত।

২। অমুসলমান ভারতীয়দের পক্ষে উত্তরাধিকার আইন প্রায় এক ছাঁচে ঢালা—কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের এ বিষয় স্বতন্ত্র আইন আছে।

তারপর দেখুন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা হইতে কার্য্যত ভারতীয় মুসলমানদের ছাড় দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয় মুসলমান সাধারণত মোল্লার নির্দ্দেশে চলে, কাজেই পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা প্রচারাদিও মুসলমান সমাজকে (শিক্ষিত ছাড়া) প্রায় বাধ্য হইয়া বঞ্চিত রাখিতে হইয়াছে।

(ইহার ফলে অমুসলমান জনসংখ্যা ক্রমশ সীমিত হইবে, কিন্তু মুসলমান সমাজ বাধাহীন থাকায়, জনসংখ্যা হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইবে এবং পাইতেছে। ৪০।৫০ বছর পরে ইহার ফলে হয়ত আর একটা বিষম রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। সমস্যাটা কি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলার দরকার নাই।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কবীর ভ্রাতাদ্বয় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালী হিন্দু এবং বাঙ্গালী মুসলমানকে—আলাদা করিয়া ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখেন নাই, বিচার করেন নাই। কেন?

হিন্দু মুসলমান সমস্যা লইয়া গত ৫০।৬০ বৎসর বাঙ্গলা দেশ যথেষ্ট কষ্টভোগের সঙ্গে প্রাণঘাতী মূল্যও দিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত এই সমস্যার কল্যাণে, কেবল বাঙ্গলা দেশই নহে, বাঙ্গালী জাতিকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে জোর করিয়া দুইটি আলাদা জাতিতে বিভক্ত হইতে হইয়াছে।

এত মূল্য দিয়াও এবং এত কষ্ট ও ক্ষতি করিয়াও যদি আবার বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের কারণে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব সম্পর্কে গভীর সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না।

যে কয়জন বাঙ্গালী মুসলমান বন্ধু নূতন করিয়া আবার সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলিতে চেষ্টা পাইতেছেন, মুসলীম জনগণের কল্যাণ-সাধনের অছিলায়, তাঁহাদের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করিতেছি। তাঁহারা বাঙ্গালী জাতি এবং দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া অশুভ, অকল্যাণ হইতে পারে, এমন প্রকার যে কোন প্রয়াস প্রচেষ্টা হইতে দয়া করিয়া বিরত থাকুন। শেষে এই কথাই বলিব যে আমরা হিন্দু মুসলমান, কোন প্রকার কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলনই সমর্থন করি না।

আর একটা কথাও আছে—দেশে নূতন করিয়া কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে লইয়া যদি আবার বিশেষ গোষ্ঠি কিংবা পার্টি সংগঠিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেশের অন্য যে সকল সাম্প্রদায়িক অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আছে, তাহারাও নিজ নিজ ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার নামে নূতন করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র পার্টি গঠন করিবে। দেশে এমনিতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা পার্টির কমতি নাই যাহারা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ এবং স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া দলগত স্বার্থ সিদ্ধি প্রয়াসে সদা ব্যাপৃত। এবং এই কারণেই, প্রচণ্ড সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গত নির্ব্বাচনের পর ইউ, এফ, (সংযুক্ত দল) রাজ্য সরকার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। দলগত স্বার্থই প্রধান হওয়াতে ইতি মধ্যেই দুইটি ইউ-এফ সরকার গিয়াছে। একটি বার বার—ক্রমে সব কয়টিই হয়ত একই দশা প্রাপ্ত হইবে।

হীনযান

উপন্যাস

সুবোধ বসু

বাইশ

বৌবাজার হইতে ট্রামে চাপিয়া নিমাই সরাসরি হাই-কোর্টের সামনে আসিয়া থামিল।

গত দুই সপ্তাহ ধরিয়াই ইডেন গার্ডেনে মেলা চলিতেছে। বাড়ীতে আর চাকর কেউ না থাকাতে প্রবল লোভ সত্ত্বেও নিমাই ছুটি চাহিতে পারে না। আজ অবসর প্রচুর। এই সুযোগে মেলা দেখিয়া লইবে।

গ্রামে থাকিতে দুইতিন ক্রোশ দূরে মেলা দেখিতে যাইত দল বাঁধিয়া। শহরের মেলা কখনও দেখে নাই। এখানে মেলার নাম এগজিবিশান। কিন্তু লোকমুখে যতটা শুনিয়াছে, গাঁয়ের মেলার সঙ্গে এর সাদৃশ্য নয়ই ভাগ।

সাবধানে নিমাই যান-বহুল রাস্তা পার হইয়া দক্ষিণ-দিকের ফুটপাতে উঠিল। সামনেই মেলায় প্রবেশের গেট। তার বাঁধারে অনেকগুলি টিকিটের ঘর। তার একটার সামনের 'কিউ'-তে দাঁড়াইয়া দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিমাই তিরিশ নয়া পয়সার বিনিময়ে একটি প্রবেশ-পত্র জোগাড় করিল।

এর আগে বেশ কয়েকবারই নিমাই গঙ্গার ধারের এই প্রকাণ্ড সুন্দর বাগানটিতে আসিয়া বেড়াইয়া গেছে। কখনও মনিবদের সঙ্গে, কখনও বা একা। ইডেন বাগান তার সুপরিচিত। কিন্তু আজ এ কি পরিবর্তন হইয়াছে তাহার! আলোর ইন্দ্রপুরী যেন। যেন সে জায়গাই নয়। রঙিন বাল্বের মালা পরিয়া গাছ হইয়াছে আলোর গাছ। ষ্টলের পর ষ্টল, দোকানের পর দোকান আলোয় আলো ময়। এ সবেরই মাথার উপর দিয়া আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে আলোর চক্রাকার নাগরদোলা—যেন ইন্দ্রের রথের চাকা।

কোন দিকে যাইবে নিমাই? প্রদর্শনীর অসংখ্য ষ্টল, অনেক রাস্তা, অনেক দ্রষ্টব্য। দর্শকের ভিড় চারদিকে। হাসিতে কলগুঞ্জনে মুখর চারদিক। কত সাজ মেয়েদের; কত আনন্দ ছোটদের। যেন আনন্দের রাজ্য এটা।

ভ্যাবাচাকা ভাবটা কাটিবার পর নিমাই একের পর এক রাস্তা দিয়া আগাইয়া চলিল। কোনও ষ্টল দেখিয়া আকৃষ্ট বোধ করিলেই তাহাতে ঢুকিয়া পড়ে। তাঁতের নক্সাপেড়ে কাপড় দেখে, হাতির দাঁতের জিনিষ দেখে, চিনামাটির বাসন দেখে, কৃষ্ণনগরের পুতুল দেখে। শাড়ীর বৈচিত্র্য ও দাম দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যাইবার মতো। 'যদি অনেক টাকাও থাকত,' মনে মনে নিমাই বলে, 'তবু এসব কেনার মানে হতো না! কে পরতো এসব? দুলী থাকলে বা নদিদি থাকলে তবেই তারা পরতে পারত!'

লোভনীয় খাদ্যের প্রদর্শনীই কিন্তু প্রথম নিমাইয়ের গাঁটের পয়সা খসাইল। গরম মুচমুচে ডালমুট—ডাল, বাদাম, সেও মসলায় অপূর্ব। গরম গরম আলুর চপ একাধিক না খাইয়া পারা গেল না। আর এমন জলুস-ওয়ালা দোকানে নরম গদীর চেয়ারে বসিয়া কাচের বাটি হইতে চকচকে চামচ দিয়া আইসক্রীম খাওয়ার

দাম যদি পঁচাত্তর নয়া পয়সা হয়, তবে ইহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। রাতের খাওয়ার জন্ত একটা টাকা বাবুর কাছ হইতে পাইয়াছে। তার উপর কতই আর ব্যয় হইবে।

ম্যাজিকের তাঁবুর সামনের পর্দার বাইরে একটা টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া মুখোশপরা ক'টা লোক ডুগডুগি বাজাইয়া দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। নিমাই তাহার আকর্ষণ চেষ্টা করিয়া এড়াইল। তারপর লটারির ষ্টল! পঁচিশ নয়া পয়সার বিনিময়ে লক্ষ্যবস্তুতে তিনবার তীর ছুঁড়িতে দেওয়া হইবে। নানা নম্বর আছে এখানে। তীরগুলি যে যে নম্বর বিদ্ধ করিবে তাদের মোট যোগফল অনুসারে প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট উপহার পাইবে। কারও উপহারের দাম হয়তো এক কাকর বা দুই টাকা। অর্থাৎ সবাই কিছু না কিছু পাইবেই।

এই আকর্ষণ অনেকেই কাটাইতে পারে না। নিমাইও পারিল না। তিনবার তীর ছুঁড়িল। হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল দর্শকেরা। নিমাই উৎফুল্ল মুখে প্রকাণ্ড রোম-ওয়ালা সাদা একটা খেলার বেড়াল বগলে চাপিয়া ষ্টল ত্যাগ করিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়াই নাগরদোলাটা তাকে হাতছানি দিতেছিল। এই ডাকে সাড়া না দিয়া উপায় কি? ষ্টলের বেষ্টনী অতিক্রম করিয়া সে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছিল।

প্রথমেই হাতি ঘোড়া উট সম্বলিত নাগরদোলা যা গ্রামের মেলায়ও নিমাই দেখিয়াছে। আয়তনে প্রকাণ্ড। একই সঙ্গে বারো চৌদ্দজন ঘুরিতেছে বনবন্ করিয়া। কিন্তু যে আলোর চাকাটা দূর হইতে তার মনোহরণ করিয়াছে সেটা ওদিকে—গঙ্গার আরও কাছে। সেটা মাটি বরাবর ঘোরে না, আড়াআড়ি আকাশের বুকে ঘোরে। তার চেয়ারগুলি একবার উপরে ওঠে, আবার নিচে নামিয়া আসে আকাশে আলোর বৃত্ত রচনা করিয়া। এই দুই প্রকারের নাগরদোলার মাঝে আরও কয়েক প্রকারের খেলার ব্যবস্থা আছে। তার একটা নিমাইয়ের বড় ভালো লাগিল। পাহাড়ী উঁচু নিচু জায়গায় আঁকাবাঁকা রেললাইন; তার উপর বিদ্যুৎ চালিত ছাদখোলা গাড়ী। ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে এদিকে ছিটকাইয়া ওদিকে ছিটকাইয়া, এখানে লাফাইয়া ওখানে গড়াইয়া এই শকটগুলি হাস্যগল্পমুখর নর নারীদের বঙ্কিমপথে ঘুরাইয়া ফিরিতেছে। মাশুল এক টাকা। নিমাই লোভ সংবরণ করিয়া আলোর চক্রের দিকে আগাইয়া গেল।

শুরু হইল আকাশ যাত্রা! এক পলকে সারা প্রদর্শনী-ভূমি নিমাইয়ের চোখের সামনে প্রসারিত হইল। সারাটা মেলাই উপরে উঠিল তার সঙ্গে, নিচে নামিল। গঙ্গার জল, জাহাজ ষ্টিমার সব পাগলা হইয়া লাফালাফি শুরু করিল। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ মাথা তুলিল, মাথা নিচু করিল, আবার মাথা তুলিল। সুদূর চৌরঙ্গী পর্যন্ত আলোর মালা ছোঁড়াছুঁড়ি করিতে লাগিল নাগরদোলার তালে তালে। বুকের রক্ত লাফালাফি করিতে লাগিল সানন্দ উন্মাদনায়!

এরই মধ্যেও কতক্ষণ ধরিয়া নিমাই লোকটিকে লক্ষ্য করিতেছিল। তার সামনের চেয়ারের আগের চেয়ার-টিতে আরেক জন লোকের সঙ্গে নাগরদোলার এই হিন্দোল উপভোগ করিতেছিল লোকটি। প্রতি চেয়ারেই দুজন করিয়া বসে। কোথায় যেন দেখিয়াছে নিমাই লোকটিকে; মনে করিতে পারিতেছে না। মনে করিতে পারিতেছে না বলিয়াই বারবার লক্ষ্য করিতেছে। লেস-বসানো আদ্দির পাঞ্জাবির তলা দিয়া রঙিন গেঞ্জির আভাস দেখা যাইতেছে। হাতে গোলাপি সিল্কের রুমাল; মাঝে মাঝেই সেই রুমাল উড়াইতেছে। মুখে জলন্ত বিড়ি। ফুর্তির সঙ্গে দু একবার সঙ্গীকে কনুই দিয়া গুঁতো মারিতেছে।

'লাষ্ট রাউণ্ড! লাষ্ট রাউণ্ড! শেষ বার!'

চালকের হাঁকে নিমাইয়ের দৃষ্টি মাটির দিকে আসিল। থামিয়া আসিতেছে নাগরদোলা। ঐ তো সামনের দুটো চেয়ারই মাটিতে নামিয়াছে। তার যাত্রীরা অবতরণ করিতেছে—সেই লোকটিও। 'হাবু গুণ্ডা!' সহসা নিমাই অতিকষ্টে বিস্ময়োক্তি জিহ্বাগ্রে চাপিয়া ফেলিল।

তার নিজস্ব চেয়ার হইতে সহযাত্রীর আগেই সে তড়াৎ করিয়া লাফাইয়া নামিল।

দেখা যাক্ কোথায় যায় হাবুগুণ্ডা ও তার সঙ্গী, কি করে? মেলার সকল আকর্ষণীয় দ্রব্যকে উপেক্ষা করিয়া নিমাই হাবুগুণ্ডাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। এই ভিড়ে নিশ্চয়ই তার ব্যবসাসম্পর্কিত কোনও না কোন উদ্দেশ্য আছে। দেখা যাক কি সেটা! সেটা যে মেলার সব কিছুর চেয়ে বেশী চাঞ্চল্যকর হইবে এতে সন্দেহ কি? একবার শিয়ালদহ বাজারে হাবুগুণ্ডার ব্যবসা পণ্ড করিয়াছিল নিমাই। দেখা যাক, এবার কি করা যায়!

কিন্তু চোর ধরিবার কৃতিত্ব দেখাইবার আগে আরও চাঞ্চল্যকর এক ব্যাপার ঘটিল। দুজন হৃষ্টপুষ্ট সাদা পাঞ্জাবি ও ভারি নাগরাজুতো-পরা দর্শক সহসা পিছন হইতে হাবু ও তার সঙ্গীকে জড়াইয়া ধরিল। ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধিয়া গেল। হুঙ্কারে ও ইতরগালি আক্রান্তের গলা হইতে ছুরির মত ছিটকাইয়া পড়িল। মেয়েরা ছুটিয়া পলাইল একদিকে। ভিড় সভয়ে জায়গা ছাড়িয়া দিল। আরও কয় জন লোক আসিয়া যোগ দিল নাগরাজুতো-পরাদের দলে। লোকে ফিসফাস করিতে লাগিল, 'পুলিশ! প্লেইন ক্লোদস্ মেন! সাধারণের মত কাপড়-পরা পুলিশ।'

পরম কৌতুহলে নিমাই ইহাদের হাইকোর্টের দিকের গেট পর্যন্ত অনুসরণ করিল।

গেটের সামনে প্রকাণ্ড কালো রঙের পুলিশ-ভ্যান খাড়া ছিল। নিমাই মেলার ভিতর হইতে দাঁড়াইয়াই পরিতৃপ্তমুখে দেখিল সঙ্গী হাবু এই গাড়ীর সিঁড়িতে অত্যন্ত বিরক্তিসহকারে আরোহণ করিতেছে।

'কে, নিমাই না? কিরে, কেমন আছিস। কখনও তো খোকনকে দেখতে যাস না।'

নিমাই চমকাইয়া পাশে তাকাইল। এক সেকেণ্ড চিনিতে বিলম্ব হইয়াছিল। তারপর সহাস্যমুখে সে কহিল, 'বৌদি!'

শ্রীমন্তের কোলে খোকন। সেও কাছে আগাইয়া আসিল। কহিল, 'কেমন আছিস রে নিমাই? আর তো যাস টাস না...'

খোকন অনেকটা বড় হইয়াছে। নিমাই হাত বাড়াইয়া কহিল, 'কি খোকনবাবু, চিনতে পার? আমার কোলে এসো...'

খোকন আপত্তি করিয়া নিজের দুইহাত নিমাইকে এড়াইবার ভঙ্গিতে একদিকে টানিয়া লইল। তখন নিমাই সহাস্যে বগলজাত সাদা বেরালটা বাহির করিয়া আনিল। একবার তাহা খোকনের মুগ্ধ চোখের সমুখে নাড়িয়া তার হাতে গুঁজিয়া দিল। কহিল, 'বিল্লী নাও।'

খোকন সানন্দেই এই উপহার গ্রহণ করিল। নাড়িয়া নাড়িয়া দেখিল কয়েকবার। তারপর সহসা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ দুইহাত নিমাইয়ের দিকে বাড়াইয়া দিল। কল্যাণী, শ্রীমন্ত ও নিমাই হাসিয়া উঠিল একযোগে।

'ভারি লোভী ছেলে।' কৃত্রিম তিরস্কার করিল কল্যাণী। 'ঘুষ পেয়ে তবে খাতির!...কিন্তু এর দাম তোকে নিতে হবে নিমাই। বেশ দামী জিনিষ মনে হচ্ছে। টাকা দিয়ে তুই আরেকটা কিনে নে...'

'ওটা আমি লটারী জিতে পেয়েছি।' নিমাই তাড়াতাড়ি কহিল। 'ওটা দিয়ে আর আমি কি করতাম। খোকনকে যে দিতে পেরেছি, এটাই তবু আনন্দ। চলুন না, আমি ঘুরিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি দু'দুবার সব ঘুরে' দেখেছি...'

'তা হলে তো ভালোই হয়', শ্রীমন্ত কহিল। এই ভিড়ে একজন সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক পাওয়া কম কথা নয়।

আবার চলিল নিমাই মেলার আলো, ভিড় ও উন্মাদনার মধ্যে। এমন আনন্দ পাওয়ার সুযোগ শীঘ্র হয় নাই। আজ যেন চুপি চুপি সে আলো ও উৎসবের রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে বাহির হইতে ইচ্ছাই হইতেছে না।

নিমাই যখন মেলার বাহিরে আসিল রাত তখন সাড়ে নটারও বেশি। নিমাই সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি পা চালাইল এসপ্ল্যানেডের দিকে। চৌরঙ্গীর হোটেলে খাওয়া সারিয়া বাবুর ইদানীং ফিরিতে রোজই সাড়ে নটার উপর হয়। তা ছাড়া সঙ্গে আজ গাড়ী নাই। ট্যাক্সিতে ফিরিতে হইবে; হয়তো আরও কিছু সময় বেশি লাগিতে পারে। কিন্তু নিমাইয়েরও বাড়ী ফিরিতে কোন না আরও আধঘণ্টা পৌনে এক ঘণ্টা লাগিবে। এসপ্ল্যানেড পৌঁছিয়া কতক্ষণে ট্রাম পাওয়া যাইবে তার ঠিক কি? খুব দেরি হইয়া যাইবে!

অবশ্য বাবুর বিছানা ঝাড়িয়া, বালিশ ফুলাইয়া, খাটের এক প্রান্তে রাত কাপড় গুছাইয়া রাখিয়াছে সে। তবু বাবুর হাজার কাজ থাকে। এটা আন, ওটা আগাইয়া দে, এই কাগজটা ওখানে চাপা দিয়া রাখ, আলমারী হইতে অমুক বই দেখিয়া আন্. এই ধরণের নানান কাজ থাকে। বড় অসহায় লোক। বড় মায়া হয় নিমাইয়ের। স্ত্রী নাই, ছেলেপুলে নেই। লোকের সঙ্গে গল্প করিতে পছন্দ করেন, কিন্তু গল্প করিবার লোক নাই। কতক্ষণ লোকে বই পড়িয়া কাটাইতে পারে, তা তিনি যতই পণ্ডিতই হোন না! আর লোকও কত ভাল। চাকর-বাকরদের ত্রুটি হইলেও কখনও গালা-গালি করেন না; তাদের বেশি খাটাইতে চান না, তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখেন। এমন মনিব পাওয়া দুষ্কর।

অবশ্য নয়নতারাকে দেখিবার এই আগ্রহটা প্রথম হইতেই নিমাইয়ের ভালো লাগে নাই। এটা যেন রুদ্রাংশুর চরিত্রের সঙ্গে নিতান্তই বেমানান। তবু সে তাঁর ইচ্ছা পালন করিয়াছে। তাঁর খেয়ালের মধ্যে অশুচি কিছু নাই ইহা মনে করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও গিয়া অন্যমনস্ক হইতে পারিলে রুদ্রাংশু স্বস্তি বোধ করিবেন, ইহা নিমাই বুঝে। তবু যেখানে সে গিয়াছে যেখানে সে যায় ইহা তার পছন্দ নয়—তা তাঁর উদ্দেশ্য যতই অনিন্দ্যনীয় হোক।

লাটসাহেবের বাড়ীর কোণ হইতে নিমাই ধর্মতলার ট্রাম ধরিল।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছিবার আগেই বহবার দুই বুড়ো আঙ্‌ুল ভর করিয়া ঘাড় উঁচাইয়া বাড়ীর উপর-তলায় আছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এতক্ষণে চেষ্টা সার্থক হইল। শঙ্কিত হইয়া সে দেখিল সত্যই উপরতলায় দক্ষিণধারের ঘর হইতে আলোর আভাস আসিতেছে। অর্থাৎ বাবু ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বাড়ীর গেট খুলিয়া সে সদর দরজার দিকে ছুটিল।

দরজা বন্ধই থাকে। ল্যাচ্ কি দিয়া খুলিতে হয়। ইচ্ছামত সেও খুলিতে পারে, বাবুও খুলিতে পারেন। তাড়াতাড়ি চাবি খুলিয়া দরজা ঠেলিয়া নিমাই ভিতরে ঢুকিল। দেখিল, তার অনুমান সত্য। সিঁড়ির আলো জ্বলিতেছে। এটা কি? হোঁচট খাইবার পর জিনিষটা তুলিল, মণিব্যাগ। বাবুর পকেট হইতে পড়িয়া গেছে, তিনি টের পান নাই!

মণিব্যাগ হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ি ভাঙিতে লাগিল।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে ডান দিকে পড়ার ঘর; বাঁ দিকে বসা-কামরা। এই দুইটি অন্ধকার। আলোকিত প্যাসেজ দিয়া ক'পা আগাইয়া ডান দিকে মোড় নিল নিমাই। সত্যিই বাবু ফিরিয়াছেন; যাইবার সময় ভুল করিয়া নিমাই আলো জ্বালাইয়া রাখিয়া যায় নাই। রুদ্রাংশুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। শোবার ঘরের পর্দার বাইরে নিমাই অপরাধীর মত আসিয়া দাঁড়াইল।

বকুনি খাইবার ভয় ছিল না। নিজের ক্রটির জন্যই নিমাই লজ্জিত। আওয়াজ করিয়া গলা সাফ্ করিয়া সে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ডাক পড়িবে আশা করিয়াছিল, কিন্তু ডাক আসিল না। এত শীঘ্র কি ঘুমাইয়া পড়িবেন!

'বাবু'? নিমাই আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষার পর ডাকিল। কয়েকবারই ডাকিল। কোনও জবাব আসিল না। নিমাই আরও জোরে ডাকিল। তাহার ফলও অনুরূপ হইল।

তবে বাবু ফিরিয়া আসেন নাই। শুধু শুধুই সে ভয় পাইয়াছিল। ওরা নাকি সব মায়াবিনী; এত শীঘ্রই কি ছাড়িবে বাবুকে। নিমাইয়ের বরঞ্চ সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। ওদের জিম্মার ভরসা কি?

নিমাই পর্দা সরাইয়া রুদ্রাংশুর শোবার ঘরে ঢুকিল। মুহূর্ত্তে চমকাইয়া উঠিল। ভীষণ দৃশ্য! রুদ্রাংশুর নিচের অর্দ্ধেক মেজেতে বিলম্বিত; উপরার্দ্ধ খাটে। রক্তে গায়ের জমা লাল; বিছানাতে লাল। কপালের শিরার দিকে রক্ত চুঁইয়া পড়িয়া চোখ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খাটের উপর ডান হাতের কাছে রুদ্রাংশুর পিস্তলটা পড়িয়া আছে!

আঁৎকাইয়া উঠিয়া নিমাই চিৎকার করিতে গেল। আওয়াজ হইল বাহির না। মাথাটা ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। তবু কর্ত্তব্যের খাতিরে সে রুদ্রাংশুর দেহ স্পর্শ করিল। বরফের মত ঠাণ্ডা! নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল। নিঃশ্বাসের কোনও লক্ষণ নাই! ভয়ে নিমাই ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ছুটিয়া পালাইতে পর্য্যন্ত ভয় হইতেছে।

কি ওটা তেপায়ার উপরে? মরিয়ার সাহস লইয়া নিমাই আগাইয়া গেল। এক টুকরো কাগজে ক'টি লাইন লেখা। ঝুঁকিয়া নিমাই লেখা পড়িতে চেষ্টা করিল। তাড়াতাড়ি লেখা হইলেও ইহা যে রুদ্রাংশুর লেখা নিমাই সহজেই তাহা সনাক্ত করিতে পারিল। দৃষ্টির অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তাড়াতাড়ি লাইনগুলি পড়িয়া লইল :

"আমার মনিধন সম্পূর্ণ আমার স্বেচ্ছাকৃত। এরজন্য কেহই দায়ী নয়; এতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কারও কোনও হাত ছিল না। পৃথিবী হইতে আমি নিজের ইচ্ছায় বিদায় লইতেছি। ইতি—রুদ্রাংশু ঘটক"

তারিখও লেখা ছিল কিন্তু নিমাই আর তাহার জন্য সময় ব্যয় করিল না। সর্ব্বনাশ! আত্মহত্যা! পুলিশ! পুলিশকে নিমাই বরাবরই ভয় করে। এবার আর তার রক্ষা নাই। চকিতে সে স্থির করিল, চম্পট দিবে; গা-ঢাকা দিবে। এই ঝামেলার মধ্যে কিছুতেই থাকিবে না।

কিন্তু সে যদি পালায় এ খবরও তবে কেউ জানিবে না। নির্জ্জন বাড়ীতে একা পড়িয়া পচিয়া যাইবে মৃত দেহ; দুর্গন্ধে মাত্র লোক টের পাইবে। এমন শোচনীয় পরিণতি হইবে এমন পণ্ডিত, এমন ঋষিকল্প লোকের! কৃতজ্ঞতা বলিয়া কি কিছু নাই! প্রভুভক্তি বলিয়া কি কিছু নাই। এত ভয় কিসের তার? সে তো কোনও অন্যায় করে নাই। পুলিশ কি করিবে তার?

মৃতদেহের দিকে আরেক বার ভীত দৃষ্টিতে তাকাইয়া নিমাই প্রায় চোখ বুঝিয়া নিচে ছুটিল। তার বিপদের বান্ধব বনমালীদা! তার কাছে যাইয়া সকল সংবাদ জানাইতে হইবে। তিনিই উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

নিমাই উন্মাদের মত ছুটিতে লাগিল।

তেইশ

আয়নার টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া প্রথমে কোমল ভেজা চুল ঝাড়িল, তারপর চিরুণী দিয়া আঁচড়াইতে লাগিল জোরে জোরে। সকালেই সে স্নান সারে। আজও সারিয়াছে। গ্রামের অভ্যাস অনুসারে খুব সকালেই ঘুম হইতে উঠে। তারপর বারান্দার টেবিলের ওপর রাখা ইলেকট্রিক স্টোভে গরম জলের কেৎলি চাপায়। চায়ের পটে পুরো দু-চামচ চা দিয়া তার উপর দু-পেয়ালা আন্দাজ জল ঢালে। চা গরম রাখিবার জন্য কেৎলির উপর নক্সা আঁকা ঢাকনা পরাইয়া দেয়

আগে হইতে ট্রের উপর পেয়ালা-চামচ-সসার এবং বিস্কুট রাখিবার জন্য কোয়ার্টার প্লেট সাজাইয়া রাখে। চা ঢালিয়া, গোটা কয়েক বিস্কুট প্লেটে রাখিয়া হয় যশোর মা যা তার নাতি কেষ্টকে ডাকে এবং উহা তাপসের শোবার ঘরে পাঠাইয়া দেয়। পরে নিজেও এক কাপ চা ঢালিয়া লয়। তারপর স্নান সারিবার জন্য গোসলখানায় ঢোকে।

আজও নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন পালিত হইয়াছে।

প্রায় আড়াই বছর কাটিয়া গেছে এই বাড়ীতে। প্রথম দু-এক মাস সে ভয়ে ভয়ে থাকিত। কিছুতেই সহজ হইতে পারিত না। অপরিচিত ব্যক্তি ও অনভ্যস্ত জীবনযাত্রায় মান তাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিত। তারপর ক্রমে ক্রমে ইহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

তাপসকে মামা বলিয়া ডাকে। যতই দিন যাইতে থাকে ততই এই লোকটির প্রতি সম্ভ্রম ও কৃতজ্ঞতায় মন পূর্ণ হয়। এর কাছ হইতে যে বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই—তাপসের আঁকা বিভিন্ন সমাপ্ত বা অসমাপ্ত ছবির নারীদের কাহারও কাহারও কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও সে যে ভদ্র, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ব্যক্তি তাহা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। তারপর আসিল বড় মনের বহু উদাহরণ। কে বলিবে দোলন তার নিজের বোনের মেয়ে নয়। আপন জনের জন্যেও লোকে এত করে না। কাপড় জামা জুতো, আসবাব, প্রসাধনদ্রব্য, গহনা একের পর এক আসিতে লাগিল। শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইল দোলনের শিক্ষার জন্য। তাপস তাকে স্কুলেও ভর্তি করিতে চাহিয়াছিল। দোলন কিছুতেই রাজি হইল না। বুড়োধাড়ীর নিচু ক্লাসে গিয়া ছোটদের সঙ্গে পড়িতে লজ্জা করে। সুতরাং পড়াটা বাড়ীতেই চলিতেছে। এখনও সপ্তাহে তিন দিন করিয়া শিক্ষয়িত্রী বাড়ীতে পড়াইতে আসেন। তা ছাড়া রান্নার ক্লাস আছে, সেলাইয়ের ক্লাস আছে। এসব ক্লাসের ক্ষেত্রে বয়সের আপত্তি টেকে না। যাইতে হয় দোলনকে। এসব স্থানে নিজের বয়সী সঙ্গিনী পাইবে দোলন, এ জন্যই তাপস জেদ করেন। দু'বছরে দুলী যেন নতুন লোক হইয়া উঠিয়াছে!

লম্বায় আরও যেন দু'চার আঙুল বাড়িয়াছে দোলন প্রসাধন টেবিলের ঢেঙা বেলজিয়ান আয়নার শেষ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। গায়ের রঙ চিরকালই ফর্সা ছিল। ভালো ভাবে লালিত হইয়া তাহা উজ্জ্বল গৌরবর্ণে দাঁড়াইয়াছে। চলনে চাউনিতে নাগরিকার সাবলীল ভাব পরিস্ফুট।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই দোলন ব্লাউজ বদলাইল, শাড়ী পরিবর্তন করিল। মোভ্ রঙের দামী সুতীর শাড়ি, ঐ রঙেরই ব্লাউজ। পাউডারের তুলি মুখের উপর আলতো করিয়া বুলাইল, ঘাড়ের উপর ঠুকিয়া ঠুকিয়া লেপন করিল। তাপস ফিটফাট থাকা পছন্দ করে; ভাল সাজ না করিলে মজা করিয়া প্রশ্ন করে আরও নতুন জামা-কাপড় আনা দরকার কিনা! দোলন সাজ সম্বন্ধে বেশ হুঁশিয়ার হইয়া গিয়াছে।

তৈরি হইয়া ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া দোলন রান্নাঘরের উদ্দেশে বাহির হইল। তাপস সাড়ে আটটার মধ্যে প্রাতরাশে বসে। অধিকাংশ দিনেই দিনের বেলা বাড়ীতে তার এই শেষ খাওয়া—দুপুরের লাঞ্চ্ এবং বিকালের চা প্রায় রোজই বাহিরে হয়। কাজেই সকালের ব্রেকফাষ্ট একটু বিশেষ করিতে হয়। খাওয়া সম্বন্ধে তাপস অবশ্য খুবই উদাসীন। দোলনই জোর করিয়া প্রাতরাশের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়াছে। দুটো ডিম, অন্ততঃ দু পীস টোষ্ট, জ্যাম ও মাখন, সন্দেশ বা অন্যকোনও দেশী মিষ্টি, কিছু ফলমূল এবং পুরো এক গেলাস দুধ। তাপস প্রথম প্রথম আপত্তি করিয়াছে। বলিয়াছে, 'বক রাক্ষসের উপযুক্ত ভোজ কি তাপস মিত্র খেতে পারে? তাও যদি বাঙাল দেশে থাকতাম, বেশি খাওয়ার অভ্যেস হতো। এতো হজম হবে কেন? এদিকের খাওয়ার অন্তত পঞ্চাশ ভাগ তোমার প্লেটে তুলে নিতে হবে। দোলন এই আজ্ঞা পালন করে নাই। তবে তার নিজের খাওয়ারও কম করিবার উপায়

নাই; তবে তাপসকে কিছুতেই খাইতে রাজী করানো যায় না।

ড্রইংরুমেই প্রাতরাশ দেওয়া হয়। প্লেট সাজাইয়া চায়ের পটে গরম জল ঢালিয়া তবেই দোলন তাপসের ঘরের জানালার কাছে আগাইয়া আসিল। মৃদুস্বরে কহিল, 'খাওয়ার দিয়েছি। আপনার কি দেরি আছে?...'

'কোনও দিনই দেরি থাকেনা। আজও নেই, ম্যাডাম। মাত্র আর মিনিট পাঁচেক দেরি হবে।' তাপসের হাল্কা গলা শোনা গেল।

'আমি রুটিতে মাখন লাগাচ্ছি।' দোলন আশ্বস্ত না হইয়া কহিল। ঠাণ্ডা হবার আগেই পৌঁছতে হবে কিন্তু...।

'তথাস্তু।' জবাব আসিল।

কিন্তু এ সম্বন্ধে তাপস নির্ভরযোগ্য নয়, অভিজ্ঞতা দ্বারা দোলন তাহা ভালো ভাবেই জানিয়াছে। যদি বলিয়া যায় সন্ধ্যাবেলাই ফিরিব, সেদিন বাড়ী ফিরিতে হয়তো রাত পৌনে এগারো! যদি বলে, দুপুরে খাইতে আসিব একটার মধ্যে, সেদিন হয়তো মোটেই খাইতে আসে না। এর সব সময়ই পরিহাস-দীপ্ত কোনও কৈফিয়ৎ থাকে। দোলন যদি কোনটি যথেষ্ট সন্তোষজনক মনে না করিয়া জেরা করে তখনও তাপস কাবু হয় না। বলে, আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে কিছুই জানো না দেখছি। সব টেকস্টবুকে লেখা আছে, তারা বোহেমিয়ান, খামখেয়ালি, আধক্ষ্যাপা! সে দিক থেকে আমি তো রীতিমত গুড্ বয়্—সদাচরণের জন্য একেবারে প্রথম পুরস্কার পেতে পারি...'

কথাটা যে কত বড় সত্য দোলন তাহা জানে, যদিও পরিহাসচ্ছলেই তাপস বলে কথাগুলি। কত বিবেচক, কত সহানুভূতিশীল উদারহৃদয় সে ইনি, ভাবিয়া অবাক হয় দোলন। যে মানুষ ইতিপূর্বে সে দেখিয়াছে তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর! এক অপরিচিতার সুবিধার জন্য রাতারাতি সে তার ষ্টুডিও দোতলা হইতে তেতলার সিঁড়ি-কোঠায় স্থানান্তরিত করিয়াছিল একেবারে প্রথম দিনই। ছোট মেয়ে, একা উপরে শুইতে ভয় পাইবে! যশোদার মায়ের সঙ্গে অনায়াসেই তাপস তাকে জুড়ি করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাকে তুলিয়া লইয়াছে নিজের শ্রেণীতে। এবং এই মর্য্যাদার উপযুক্ত করিবার জন্য কত যে পরিশ্রম করিয়াছে, কত যে টাকা ব্যয় করিয়াছে তার হিসাব নাই।

নিজেকে অনেক সময় অপরাধী মনে হয় দোলনের। ফাঁকি দিয়া সে অনেক কিছু আদায় করিতেছে! ভদ্রব্যক্তির ভদ্রতার সুযোগ লইয়া সে যা নয় তাই সাজিয়া বসিয়াছে! এ ধরণের উন্নতমানের জীবন স্বাভাবিক অবস্থায় সে কোনও দিনই আশা করিতে পারিত! এই সাজ, এই আহার-বিহার, এই রকম সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত কথাবার্তা এখনও গা-সহা হয় নাই। মনে হয়, এই পারিপার্শ্বিকে সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। এই আড়ষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছে তাপস। ইহাকে লইয়া হাসি-পরিহাস করিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই।

আজও বার্ণিশোজ্জ্বল চেয়ারে দামি টেবিল-ক্লথে পাতা টেবিলের বিবিধ ধনী সুলভ আহার্য্যের সামনে বসিয়া গরম বাদামী রঙের টোষ্টে মাখনের ছুরি দিয়া মাখন লাগাইতে লাগাইতে দুলী তার অতীতে ফিরিয়া গেল। দেশ বিভাগের পর পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে বিভীষিকাময় যাত্রা, কুপার্স ক্যাম্প ও শিয়ালদহ ষ্টেশনের নোংরা দিনগুলি, ননীদির আপন পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টার শোচনীয় পরিণতি, নিমাইয়ের কথা—সব আবার মনে পড়িল। ননীদির সন্ধান আর জীবনেও হয়তো পাওয়া যাইবে না। যেখানে সে ডুবিয়া গিয়াছে সেখান হইতে কাউকে উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু নিমাইদা? কি হইয়াছে তার? কি অবস্থায় আছে সে? প্রাণে বাঁচিয়া আছে তো? শিহরিয়া উঠিয়া দোলন বার বার ভগবানের নিকট তার মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

সবাই একসময় বলিত নিমাইয়ের সঙ্গেই তার বিয়ে হইবে। কথা শুনিতে শুনিতে নিজেও সে এই রকম বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছিল। আজ দুজনের দূরত্ব কত? ফাঁকি দিয়া সে তার নিজের লোকেদের বেশ

কয়েকটা তলা উপরে চড়িয়া বসিয়াছে। সেখানে উহারা কি করিয়া তুলীর সন্ধান পাইবে? মিনাইদায় আসিয়া পৌঁছিবার উপায় কি? ভালোও লাগিতেছে এই জীবন, আবার যেন অপরাধীও বোধ করিতেছে নিজেকে। নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া সাহেব সাজার মতো।

'এই তো রং চিনতে শিখেছ! ভারি মানিয়েছে তো শাড়ীটা। এটা কবে কিনলে?

চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল দোলন। অতীত দ্রুত পলায়ন করিল।

বাহিরের জন্য তৈরি হইয়া আসিয়াছে তাপস। রোজই তৈরি হইয়া প্রাতরাশে আসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকা তার পছন্দ। নিজে এবং পাশের সব কিছু এই আইন মান্য করিবে এই সে চায়।

দোলন চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাপসের প্রশংসায় আরও কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, 'বাঃ রে আপনিই তো এটা কিনে দিয়েছিলেন বেলা থেকে ...

'তা হতেই পারে না,' সামনের চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া জ্যাম মাখন রুটিতে এক কামড় দিবার পর তাপস কহিল। 'আমি কিনে আনলে নিশ্চয়ই আমার মনে থাকত। কিন্তু তা যাই হোক, আজকে এমন সুন্দর ভোরটার সঙ্গে মিলিয়ে তুমি এমন সুন্দর রঙের শাড়ী পরেছ যে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই। একদিন তোমার একটা ছবি আঁকতেই হবে আমাকে...

ইতিপূর্ব্বেই দু-একবার সে দোলনের পোর্ট্রেট আঁকিবার প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু দোলনের যেন আপত্তিই আছে এতে। সেই যে প্রথম আসিয়া অল্প কাপড়-চোপড় পরা মেয়েদের দেখিয়া শঙ্কিত বোধ করিয়াছিল। সেই ভয়টা অবচেতনভাবে এখনও বাঁচিয়া আছে।

'তারপর ও বাটিটায় কি? একটা খাওয়ার জিনিষ বলেই মনে হচ্ছে!' সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল তাপস।

'ওটা নতুন গুড়ের পায়েস। ওটা খেতে হবে!'

'নতুন গুড়ের পায়েস! বলো কি!, তাপস কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে কহিল। 'এখন পাটালি পাওয়া যাচ্ছে এত সব খবরও রাখো? কিন্তু এগুলি দুপুরের জন্য রেখে দিলে হতো না! সকালের পক্ষে এতটা পরিমাণ...'

'কিন্তু দুপুরে তো আজ খাবেন বলেন নি!' দোলন প্রতিবাদ করিয়া কহিল।

'রাতে তো হতে পারত!'

'আজ রাতে তো বাইরে নেমন্তন্ন বলেছিলেন।' দোলন কহিল।

'ও তাও তো বটে! ডিনার পার্টি! তুমি তো আমার সব প্রোগ্রামই কণ্ঠস্থ করে রেখেছ দেখছি।' তাপস কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরাইয়া কহিল। 'আমিও তোমার প্রোগ্রাম বলে দিতে পারি।...দশটার সময় সেতারের ক্লাশ। কেষ্টর হাতে সেতার দিয়ে পৌনে দশটায় গৃহত্যাগ! সাড়ে তিনটায় মিসেস সরকার। দেড় ঘণ্টা ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল শিক্ষা। সাড়ে চারটেয় আমার জন্য দশানন চায়ের ব্যবস্থা। কিন্তু আমি গর-হাজির। দোলনের খুব রাগ! কালো বদ রঙের শাড়ী পরে সপ্রতিবাদে ছাদে...ঐ বেজে উঠেছে। যাও তাড়াতাড়ি ধরো গিয়ে। আমি দু'চামচ পায়েস তুলে নিচ্ছি...'

টেলিফোন ক্রিংক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই দোলনকে টেলিফোন ধরিতে হয়। তাপস বাড়ী না থাকিলে তো বটেই, আবার সে বাড়ী থাকিলেও দোলনকে দিয়া ধরায়। বলে, কথা বলতে শেখা মস্ত বড় শিক্ষা; ওটা অভ্যেস করে' আরম্ভ করতে হয়।'

ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাডভারটাইসার্সের বর্ত্তমান জেনারেল ম্যানেজার প্যাটার্সনের টেলিফোন করিবার সম্ভাবনা ছিলই। সুতরাং কে টেলিফোন করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য তাপসের কোনও কৌতূহল ছিল না; সে শুধু আড়চোখে তাকাইয়া দোলন কিরূপে সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়া লইতেছে তাহাই সকৌতুকে উপভোগ করিতে লাগিল। সাহেব জরুরী কাজ বলিয়া তাপসকে অবিলম্বে ডাকিয়া দিবার অনুরোধ করিতেছে, দোলনের জবাব না শুনিলেও তাহা সহজেই

অনুমান করা যাইত। কিন্তু দোলন কি করিয়া তাকে আটকাইতেছে, তাহাই লক্ষ্যণীয়। তাপস খাইতেছে, যা বক্তব্য তাকে বলিলেই তাহা তাপসের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে; যদি সরাসরি বলিতে হয় তাকে পাঁচ মিনিট পরে আবার টেলিফোন করিতে হইবে এসব যুক্তিজাল সে ইংরেজি ভাষায় বেশ চাতুর্য্যের সঙ্গেই বিস্তার করিতে সক্ষম হইল দেখিয়া তাপস খুব মজা বোধ করিল। প্যাটার্সন বড় বেশী অস্থির হয়। কি কাজ তাপস তা ভাল ভাবেই জানে। আর আধ-ঘণ্টার মধ্যে সে স্বয়ং সেখানে হাজির হইবে। কাজেই ফোন না করিলেও চলে।

আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি তার নতুন আবেষ্টনের সঙ্গে মানাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে এই গ্রাম্য মেয়েটি! কি অদ্ভুত ইহার শিক্ষাগ্রহণ করিবার ক্ষমতা। আড়াই বছরের চেষ্টায় সে ইংরেজি কথাবার্তা বলিবার এতটা ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে যে খোদ ইংরেজের সঙ্গে চলনসই রকম ভালো ইংরেজিতে কথা চালাইতে পারে। ভদ্র আচরণের আদব, রুচিপূর্ণ সাজ পোশাকের তত্ত্ব, সামাজিকতার রীতিনীতিতে সে আশ্চর্য্য রকম রপ্ত হইয়াছে! নিজের কৃতিত্বে প্রায় গর্ব্ব বোধ করে তাপস! তুলি দিয়া রং দিয়া ক্যানভাসের উপর, কাগজের উপর অনেক সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে সে। কিন্তু দোলন তার বাস্তব রক্তে মাংসে বাস্তব সৃষ্টি!

ছিপছিপে লম্বা গৌরাঙ্গী মেয়েটি। কমনীয় চোখের দৃষ্টি। অঙ্গরাগের সুমিত ব্যবহারে, বিনুনীর ললিত রচনায়, সাড়ি পরিবার মার্জ্জিত ভঙ্গিতে যে-কোন তরুণীর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। দু'এক দিন সভয়ে তাপস ভাবে, তরুণ বয়সে যে মানস সুন্দরীর কল্পনা করিত সে, তার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল আছে ইহার। হয়তো তার পুরানো দিনের রঙিন কল্পনা দিয়াই তাপস গড়িয়া তুলিয়াছে ইহাকে!

কিন্তু তারপর কি? কি করিবে ইহাকে লইয়া? কার সাথে বিবাহ দিবে? কোন ঘরে এর মর্য্যাদা হইবে—কে ইহার সকল অতীতের প্রতি উদাসীন হইয়া মর্য্যাদা দিবে ইহাকে? এই আশ্চর্য্য সৃষ্টির উপযুক্ত আদর দিবে? এ তো শুধু ছবি নয়; এ যে সপ্রাণ ছবি!

'তোমারও শেষ হলো, আমারও শেষ হলো!' বলিয়া তাপস চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া পড়িল। কহিল, 'প্যাটারসন তো? কিছুতেই তাঁকে কথা বলতে দিলে না। এবার সে কাজ দেওয়া না বন্ধ করে দেয়। যাই হোক, তাঁর কাছেই দুঃখপ্রকাশ করতে যাচ্ছি, কাজেই সে কি বলেছে তা বলে কাজ নেই। কি জানি তুমি কাল আনতে বলে দিয়েছিলে, ভুলে গেছি। আনতে এবং দাম দুটোই? চাটনী, আচারসব, না এলুমিনিয়মের ফ্রাইংপ্যান না ডালমুট-চানাচুর...'

'উল আনতে বলেছিলাম।' দোলন গম্ভীর মুখেই কহিল।

'কিন্তু কি রং, কত প্লাই, কতটা পরিমাণ এসব না বলে দিলে কখনও উল আনা চলে?...'

'সব কাগজে লিখে সঙ্গে নমুনা জড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

'তা হলে বুঝতে পারছ তার কোনওটাই আর আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই। বেশ, আবার না হয় সব দিয়ে দাও। যাবার পথেই কিনে নেব।...আর হ্যাঁ, পাঁচটার মধ্যে যদি ফিরতে পারি, তবে আজ সিনেমা। বুঝেছ? কিন্তু ভরসা রেখো না, হয়তো সময় রাখতে পারব না...'

এবার দোলন হাসিয়া ফেলিল। অর্থাৎ, তা খুবই জানি।

দশটায় সেতারের ক্লাশ বসে যারা অনেকটা শিখিয়াছে তাদের জন্য সোমবার আর বৃহস্পতিবার। বিখ্যাত সেতারী নিরঞ্জন মল্লিকের নিজস্ব শিক্ষালয় এটি। দু' বছরের উপর দোলন তাঁর কাছে শিখিতেছে।

পৌনে দশটা আন্দাজ থর্ব্বকায় কেষ্টর হাতে খাপে মোড়া প্রকাণ্ড সেতারটি দিয়া তার আগে আগে দোলন সিঁড়ি নামিয়া আসিল। মিনিট পাঁচ সাতের রাস্তা। একটু আগে হইলেই যথেষ্ট। বাড়ীর বাঁধানো প্যাসেজ

পার হইয়া বড় রাস্তায় পৌঁছিয়া দোলন পূব দিকে মোড় লইল।

দেখিল, তাদের বাড়ীর নিচের ছাপাখানায় ইতিমধ্যে লোকজন আসিয়াছে তবে সারাদিন এবং কখনও সারারাত্রি ব্যাপি সুপরিচিত খটর-খটর এখনও শুরু হয় নাই। ছাপাখানা অতিক্রম করিয়া দোলন রাস্তার ধার ঘেঁষিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল।

'দুলী!'

চমকাইয়া থামিয়া পড়িল দোলন। বাঁ দিকে তাকাইল, ডান দিকে তাকাইল, সামনে তাকাইল এবং সবশেষে আহ্বানকারীকে আবিষ্কার করিতে না পারিয়া পিছনে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'কি দোলন দি, বাড়ীতে কিছু ফেলে এসেছেন?' কেষ্ট তার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল।

'না। চল্।' সমুখে পা বাড়াইয়া কহিল দোলন।

কিন্তু দু পাও নয়। তার আগেই আবার ডাক আসিল, 'দুলী!'

চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল দোলন। পলকে ছাপাখানার চওড়া দরজার একধারে নিমাইকে দেখিতে পাইল!

বিস্ময়ে দু'বার চোখ রগড়াইয়া লইল। ঠিক দেখিতেছে তো চোখে! নিমাইয়ের অপেক্ষা না করিয়া প্রায় যন্ত্রচালিতের মত দোলনই কাছে আগাইয়া আসিল।

'কে! নিমাইদা!' সে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে কহিল। 'কৈ থাক তুমি? আমি তো ভাবতেও পারি নাই জীবনে আর দেখা হইব...'

'কেমুন আছস দুলী?' নিমাইও তাড়াতাড়ি প্রেসের দরজার কাছ হইতে রাস্তায় নামিয়া আসিল। 'কই আছস? কত বড় হইচস্! একেরে মেমসাহেবের মত দেখতে হইচস দেখি। নার্সের কাম করস, কেমুন? কোন্ হাসপাতাল?...'

'ঐ উপরের,' আঙুল দিয়া প্রেস দালানের উপরতলাটা দেখাইয়া সহাস্যমুখে দোলন কহিল। 'চল, দেখাইয়া আনি...'

নিমাইদাও মাথায় লম্বা হইয়াছে। স্বাস্থ্যদীপ্ত চেহারায় শহরের চটপটে ভাবটাও স্পষ্ট। তবে সেই রকমই সরল আছে। নার্সের কাজ! যেন নার্সের কাজ করিয়া এ রকম সাজসজ্জা করা যায়!

'আচ্ছা, একটু দাঁড়া। ভিতরে কইয়া আসি। আইজই ছাপা হওন চাই কিনা, প্রুফটা নিজেই সকালে পৌঁছাইয়া দিছি...'

'কি কর এখন, নিমাই দা?' প্রেস সম্পর্কিত কাজের উল্লেখ শুনিয়া দোলন সকৌতূহলে প্রশ্ন করিল।

'অনেক কষ্ট পেয়েছে দুলী। তা পরে কমু অখন। দুই তিন মাস হইল নিজের বিজনেস দিছি। মিঠাইর দোকান। শিয়ালদহ রোডে। ভাল দোকান। রিফ্রিজেটর আছে। দুলীর সম্ভ্রম উদ্রেক আশায় নিমাই সগর্বে কহিল। আমরা দুইজনে পার্টনার। বনমালীদা আমার পরম উপকারী বন্ধু। সে না থাকলে রাস্তার কুকুর বিড়ালের মত মরতাম। মিঠাইর দোকানে বহুদিন কাম করছে। আমি বইলা কইয়া তারে সঙ্গে নিছি। সে দোকান দেখে, হালুইকর খাটায়। আমি হিসাব দেখি আর বাইরের কাজকম্ম করি। সন্দেশের বাকস ছাপাই এই ছাপাখানায়। কে জানত তুই ঠিক উপরেই থাকস। এক মিনিট! আমি আইলাম বইলা...' বলিয়া শশব্যস্তভাবে নিমাই দরজার চৌকাঠ ডিঙাইয়া প্রেসের অফিসে গিয়া ঢুকিল

ক্রমশঃ

তিনকড়ির মা

(গল্প)

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

(১)

সুকেশ স্নান করিতে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় গৃহিণীর কাতর অনুরোধ—"একটিবার কয়লার দোকানটা হয়ে আসবে ?"

"কেন কয়লা ত তিনকড়ির মা এনেছে !

"হ্যাঁ এনেছে' কি দামে এনেছে, সেইটে একবার চট্ করে জেনে এসো। ও বলছে দুটাকা দশ আনা। কিন্তু শুনছি আসত দাম আড়াই টাকা।"

কয়লার দোকান হইতে ফিরিয়াই সুকেশ রাগে ফুঁসিতে লাগিল। তরুণী ভার্যার দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার কথাই ঠিক, কি আশ্চর্য, কী স্পর্দ্ধা ! কী—"

তরুণী ভার্যা ঝংকারের সহিত কহিল, "থাম, এখন কি, কী বলে চীৎকার খুব করতে পার। পুরুষ মানুষ দু'পা এগিয়ে দেখবে যে কিসের কি দর তা না, আমার বেরুতে হবে পাড়ায় গিয়ে খোঁজ করতে কার ঘরে কোন জিনিষ কত দরে আনছে। তারপর তুমি লাফাতে লাফাতে বলবে—কি আশ্চর্য, কী স্পর্দ্ধা। খুব বীরত্ব !"

সুকেশ যেন দমিয়া গেল। বুদ্ধিমান ছিল সে। বুঝিল একটু বেসুরো চীৎকার নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে। সুরের কোনো স্থান বীরত্বব্যঞ্জক হইয়া গিয়া থাকিবে। তাহাতে হয়ত আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাইয়াছে। এত বড় যে একটা আবিষ্কার, যা শার্লক হোম্‌স্‌এর পক্ষেও শ্লাঘার বিষয় হইতে পারিত, তাহার সবটুকু গৌরব ঐ তরুণীরই প্রাপ্য, এই সাদা সত্য কথাটা নিজের বিজয়-দৃপ্ত বীভৎস চীৎকারে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে। তাই তাহার সুরের পর্দা এখন যথাস্থানে সন্তর্পণে নামাইয়া এবং আঁখির দৃষ্টিও স্নিগ্ধ করিয়া কহিল, "আমি ত বলছি, তোমার কথাই সত্যি, তুমি না হলে—"

তরুণীর প্রাণ এবার গলিল।

(২)

বিবাহের পর কয়েক মাস মসৃণভাবে কাটিয়াছে, যেমন সকলেরই কাটে। এই বিভোর সময়টাতে দৃষ্টি অনেক দিকে তীক্ষ্ণ থাকে না। পয়সাকড়ির সঙ্গে প্রেমের তখন আড়ির সম্পর্ক। চিত্তের উপর তখন চিত্তেরই একাধিপত্য অধিকার। বিত্তের সেখানে স্থান নাই।

কিন্তু তারপর ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে থাকে যে, সেই চিত্তই জীবনধারণের ভিত্তিস্বরূপ। যে জীবনের পুষ্প হলো প্রেম। তন্ময়তার অসতর্ক দিনে সতর্ক তস্কর কতখানি নিজের কাজ গুছাইয়া লইয়াছে সেদিকে ক্রমেই দৃষ্টি পড়ে। প্রাবনের উদ্দামতায় শস্যধ্বংসের আতংক-অবসানে ধীর জলপ্রবাহকে কৌশলে ক্ষেত্রের গায়ে যোগান দিবার সময় আসে।

সুকেশ ও লীমার এখন সেই বিভোর ভাব-অবসানের

অবস্থা। দীর্ঘ মধ্যাদিনে অলস খাটের উপর পড়িয়া লীলা এখন আর কেবলই ভাবে না—সুকেশ অফিসে বসিয়া এখন কি করিতেছে, কি ভাবিতেছে, কখন পাঁচটা বাজিবে ইত্যাদি। এখন ভাঁড়ারের ভাবনা, সংসারে ব্যয়-সংকোচের কল্পনা এবং গৃহস্থালীর যাবতীয় জল্পনা তাহার মনকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে। কখন পাঁচটা বাজিবে তাহা অপেক্ষা, কবে মাস-কাবার হইয়া বেতন পাইবে সুকেশ, সেই ভাবনাটাই এখন প্রবলতর এবং অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সুকেশও এখন আর পাঁচটা বাজিতেই লাফাইয়া প্রথম ট্রামটা ধরিয়া বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া ছুটিয়া আসে না সটান গৃহিণী-সকাশে। রাস্তার পারে চলিয়াই দেখিতে দেখিতে আসা শুরু করিয়াছে—হাঁসার দর কত যাইতেছে আজ? মাছটা আজই কিনিয়া রাখিলে মন্দ হয় না—সন্ধ্যা-বেলায় দরটা থাকে কম ইত্যাদি। অফিসে বসিয়াও এখন মাঝে মাঝে কলম তুলিয়া পাশের চেয়ারে উপ-বিষ্টের প্রতি ঝুঁকিয়া আলোচনা চলে কার ঘরে সুগৃহিণী। পূর্বেকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কার ঘরে বিরাজ করে সুরূপিণী। টিফিনের সময় উৎসুক এবং চতুর নেত্রে অপরের টিফিনের কৌটার দিকে তাকাইয়া খাদ্যের নিপুণতার তারতম্যের পরখ করিয়া লয়। যে হতভাগ্য বাজারের খাবারে মুখ ভর্তি করে তাহার দিকে একবার করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভোলে না।

তৎসত্ত্বেও কয়লার দাম লইয়া হঠাৎ গিন্নির সঙ্গে আজ একটা বচসা হইয়া গেল! আগের দিন মধ্যাহ্নে পাশের বাড়ী হইতে লীলা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে যে, বহুদিন হইতেই সে-বাড়ীতে আড়াই টাকা দরে কয়লা আসিতেছে। অথচ লীলা এ বাড়ীতে গৃহিণীরূপে পদার্পণ করিয়া অবধি দুই টাকা বার আনা দরে যে কয়লা আসিতেছে তাহাদের বৃদ্ধা ঝি, তাহার আর নড়চড় নাই।

বৃদ্ধা পরিচারিকা তিনকড়ির মা সুকেশের কাছে বহুদিনের। সুকেশের সংসার বাঁধিবার পূর্ব হইতেই অনেক যত্ন সে করিয়া আসিতেছে। চারি পাঁচটি বন্ধু মিলিয়া তখন একটা মেসের মতো করিয়া থাকিত। কিন্তু যদি কেহ মেস্ বা হোটেলের আখ্যা দিত তাহাদের সংসারটাকে, তবে সুকেশ বা তিনকড়ির মা তাহা সহ্য করিত না। কারণ সুকেশ ছিল সর্বকালীন ম্যানেজার এবং তিনকড়ির মা ছিল গৃহের কর্ত্রী। মাছের বড় টুকরোটা ম্যানেজারের পাতে হামেসাই আসিয়া পড়িত। তিনকড়ির মায়ের বার্দ্ধক্যও আজিকার নহে। এবং তাহার জন্য সুকেশকে একটু কষ্ট স্বীকারও করিতে হইত। তাহার তখনকার রাজত্বের সময় হইতেই চোখে সে ভাল দেখিতে পাইত না। রান্নাঘরটাও ছিল আধা-আঁধারের। কতদিন মাছের সঙ্গে আরশুলারও ঝোল রাঁধিয়া পাতে আনিয়া দিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের দৃষ্টান্ত স্মরণে সুকেশ তখনকার দিনে সে-সব সহ্য করিয়াছে।

তারপর বিবাহ করিয়া মেস্ ছাড়িয়া সংসার যখন পাতে তখন তিনকড়ির মাকেই সঙ্গে আনিয়া নিজের নূতন সংসারে বাহাল করিয়াছে। এবং তাহার সঙ্গে ব্যবহারও এ যাবৎ ভালই করিয়া আসিয়াছে।

(৫)

কিন্তু আজিকার পরিস্থিতি ভিন্নরূপ। কালভেদ, অবস্থাভেদ, প্রকারভেদ। অভিযোগ এনেছেন স্বয়ং গিন্নি। রীতিমত তদন্তের পর তদন্ত ও বিচার। এবার আর গর্জন নয়, বেশ ওজন করিয়া কথাগুলি বলিল সুকেশ—"আচ্ছা, তিনকড়ির মা! আমি যে কয়লার দাম এখনি জেনে এলাম আড়াই টাকা, আর তুমি এনেছ দু'টাকা বার আনা করে' আর প্রত্যেক-বারই এনেছ তাই, এর মানে কি? বল!"

"ওমা! আড়াই টাকা কোথা পাবে গা!"

গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া ঘাড় কাৎ করিয়া দাঁড়ায় তিনকড়ির মা।

"কয়লার দোকানেই পাব, আবার কোথা।" বলে সুকেশ।

"আপনি কোন্ দোকানে খপর নিয়েছ শুনি।"

"তুমি কোন্ দোকান থেকে দু'টাকা বার আনা দরে এনেছ তাই শুনি আগে।"

"ঐ ত হোথা গা—মুদি দোকানের পাশে টিব্-কলের পুব,বাগে যে কামারের—"

"চল আমি যাব তোমার সঙ্গে তোমার দোকানে।"

"চল না, আমি কি ডরাই? আপনি বললেই আমি শুনবো তোমার কথা, চল।"

বীর দর্পে বাক্য হানিয়া পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া যায়।

মুদি দোকানের পাশে টিউব-ওয়েলের 'পুব-বাগে' কামারের দোকানের বাঁ হাতে যে কয়লার দোকানটা, দুইজনে সেখানে গিয়া হাজির।

"এখান থেকেই আমার এই ঝি কয়লা নিয়ে গেছে কাল?" শুধোয় সুকেশ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!" বিস্মিত দোকানদার জবাব দেয়।

"কত দরে নিয়ে গেছে?"

"আড়াই টাকা দরে বাবু, যা বরাবর দিই।"

এই বার তিনকড়ির মায়ের মুখ হইতে অগ্ন্যুৎপাত—"বললেই হলো? কি, আমি কি চোর? এমন অপবাদ কেউ দিতি পারবে না গা, হঁ, এই সাফ্ কথা বলে দিনু আমি। হাড় পাকালুম এই গতর খাটিয়ে—কেউ বলুক দিকি চুরি করিচি কোনো দিন, একটা মিথ্যি কথা কইচি একদিনের তরে? হ্যাঁ, আমার কাছে পষ্ট কথা বাবা। ঢাক্ ঢাক্ নেই। মিথ্যি মিথ্যি আপদি আমার অপমান করতে নিয়ে এলে বাবু! কেনে কেনে হুঁ হুঁ হুঁ? বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল।

(৫)

তাহার অগ্নি-উদ্গীরণ করিবার আর একটা জায়গা বাকি ছিল। বাড়ী ফিরিয়া উৎক্ষিপ্ত হস্তের সঞ্চালন ও গ্রীবার ভঙ্গিমার সহিত চীৎকার করিয়া লীনাকে কহিল, "কেনে বৌদি মিথ্যিমিথ্যি অমন করে লাগালে গা আমার নামে। আমি কি চুরি করিচি? কই বলুক দিকিনি কে বলবে আমার নামে অপবাদ! হুঁ"।

বিস্মিত লীনা স্তম্ভিত সুকেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "তবে যে তুমি বললে দোকানে দেখে এলে আড়াই টাকা ক'রে? কোন্‌টা সত্য বল।" সুকেশ কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল! জবাব দিল তিনকড়ির মা-ই—"আমায় বানাবে চোর, হঁ?"

লীনা আরও অবাক হইয়া কহিল, "কি তুমি যে বড় কথা কও না!"

কিন্তু সুকেশের কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না।

সত্যই সে স্তম্ভিত। মরিয়া না মরে রাম! মুখের উপর কয়লাওয়ালা ওর মিথ্যা প্রমাণ করিয়া দিল, তবু সে হার ত মানিতে চায়ই না, উল্টিয়া সকলকে সে-ই দোষারোপ করে! তেজের সঙ্গেই লীনার কাছে আসিয়াও আস্ফালন। এত বড় অদ্ভুত তেজের অভ্যন্তরে কোথায় যেন একটা সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহার সন্ধান করিতে পারিতেছে না সুকেশ! তাই লীনা যখন বলিল 'কোন্‌টা সত্য বল' তখন সে সত্যসত্যই সত্যের সন্ধানেই ডুবিয়া গিয়াছে। তল পাইতেছিল না। কহিতে গেলে দুই এক কথার কর্ম ত নয়। ওদিকে আফিসেরও বেলা হইয়া যায়। লীনা পুনরায় তাগিদ দিতেই নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও নির্লিপ্তভাবে বলিয়া উঠিল, "দেখ, আজ আপিসে অনেক কাজ আছে, একটু শীগগিরই যেতে হবে। তাড়াতাড়ি যাক্‌গে, আমি চট্ করে চান সেরে এই এলুম বলে। বিকালে এসে এসব ঝামেলার কথা হবে'খন।"

গামছা কাঁধে স্নানের তরে অপস্রয়মান স্বামীর প্রতি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল লীনা।

(৫)

আপিসে সত্যই সেদিন কাজ বেশী ছিল। বার্ষিক হিসাব-নিকাশের পূর্ব দিন। বড় সাহেব নিজে ১১টার আসিয়া বসিয়া আছেন। সুকেশের দেরীই হইয়া গিয়াছিল বাড়ী হইতে রওনা হইতে ঐ সব ঝামেলায় পড়িয়া। ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে আপিস পৌঁছিয়া। তখনো টিফিনের সময় হয় নাই। কাজেই কেরানীদের নিদ্রার সময় সেটা নয়। কিন্তু সুকেশ মাথাটা টেবিলের উপর গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল একটু। চারিদিকের সহকর্মীদের কাগজের খস্ খস্ শব্দ, গলায় গুঞ্জন সুকেশের তন্দ্রা আনিল যাহা অতর্কিতে কখন তাকে ভুলাইয়া দিল। কিন্তু চলন্ত ঘর্ঘর-শব্দ-মুখরিত রেলগাড়ী যেমন নিস্তব্ধ ষ্টেশনে আসিয়া চুপচাপ দাঁড়াইতেই নিদ্রিত যাত্রীর নিদ্রা হঠাৎ ছুটিয়া যায়, ঠিক সেই রকম হঠাৎ একটা সময়ে বৃহৎ ঘর-খানার সমস্ত শব্দ একসঙ্গে স্তব্ধ হইয়া সুকেশের তন্দ্রা ছুটাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া সুকেশ যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিতে থাকিল। দেখিল বড় সাহেব গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন এবং ঘর ভরা সকলের কেহ সুকেশের দিকে কেহ সাহেবের দিকে চাহিয়া আছে। তার ডানপাশের কেরানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সাহেব সোজা সুকেশের দিকেই আসিতে ছিলেন কিন্তু তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়াছেন। সর্বনাশ! সুকেশ তাঁকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে সে ঘুমায় নাই—টেবিলে মাথা পাতিয়া একটা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল শুধু। সুকেশের কথায় বাবুটি বলিলেন যে সে-কথাটা তাহাকে বুঝাইয়া ত লাভ নাই—সুকেশ যেন সাহেবকে গিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে।

কিছু পরেই চাপরাশী আসিয়া হাজির—সুকেশের তলপ পড়িয়াছে বড় সাহেবের কামরায়! সুকেশ অকূল-পাথারে পড়িয়া এইবার বাম পাশের বাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল যে, সত্যই সে ঘুমায় নাই, ঘুমাইয়া থাকিলে আপনা হইতেই কি ঘুম ভাঙিয়া যায় অমন ভাবে? এবং কথাটা শেষ করিয়াই অনুমোদন লাভের আশায় খাস-কামরার চাপরাশীর মুখের দিকে তাকাইল। বাবুটি বলিলেন "বেশ ত, সাহেবকে বুঝান না গিয়ে।"

চাপরাশী বলিল, "জলদি চলিয়ে বাবুজী।"

যাইতে যাইতে সুকেশ ভাবিতে লাগিল—এমন ত খুব কমই হয় যে বড় সাহেব ছুটিয়া আসেন কেরানীদের ঘরে। তবে হ্যাঁ, আজ কাজ বেশী—সাহেব হট্ কট্ করিয়া ফিরিতেছেন। আর আজই কিনা সে টেবিলে দিল মাথা পাতিয়া। রাগ হইল তিন-কড়ির মায়ের উপর, রাগ হইল লীনার উপর—চার আনার জন্য মরিয়া যাইতেছিল, এখন নেও ফল ভোগ কর, কপালে কি আছে কে জানে। এমন কি রাগ হইল কয়লাওয়ালার উপরও—না হয় মিথ্যা কথাই বলিয়া দিতিস্ তুই! কিন্তু চিন্তাটাকে ঘুরাইল—সাহেবকে যে সত্যই বুঝাইতে হইবে যে, সে হিসাব মিলাইবার ভাবনাতেই মাথাটা টেবিলে পাতিয়াছিল শুধু, ঘুমায় নাই। কোন্ হিসাবটার কথা বলিবে তাহাও মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিল।

কিন্তু আশ্চর্য! সাহেব ত ঘুমের কথা কিছুই বলিলেন না। কয়েকটা কাজের কথা কহিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে আজকের দিনের মধ্যে অনেক কাজ করিতে হইবে ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত ঘুমের কথাটা তুলিলেনই না।

সাহেবের ঘর হইতে খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়া সুকেশ ফিরিল। আজিকার অতিরিক্ত কাজের দিনে ঘুমাইতে দেখিয়াও যে কিছু তিনি বলিলেন না তাহাতে সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া গেল। বুঝিল, যে-ত্রুটি বচক্ষে দেখিয়াও শুধু তাহার সম্মানের

হানি হইবে বলিয়াই সে-কথার উল্লেখ করিলেন না। অথচ প্রকারান্তরে জানাইয়াও দিলেন যে সময় নষ্ট করিবার দিন নয়।

এতক্ষণ সুকেশ তিনকড়ির মায়ের অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝিল। মানুষের প্রকৃতি নামিয়া গেলেও তাহার ইজ্জৎটা নামিতে চাহে না। সেই ইজ্জৎকে যদি কেহ তখন প্রকাশ্যে ম্লান করিতে চায় তখন একটা বিপত্তির সৃষ্টি কিছু আশ্চর্য নয়। সুকেশ ঠিক করিয়া ফেলিল— না, শাস্তি সে দিবে না তিনকড়ির মাকে।

কিন্তু বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই বুঝিল, শাস্তি পাওয়া না-পাওয়ার উর্দ্ধে তিনকড়ির মা চলিয়া গিয়াছে। তল্পীতল্পা বাঁধিয়া প্রস্তুত—আর সে এ বাড়ীতে কাজ করিবে না। লীনা সারা দুপুর বুঝাইয়াছে কিন্তু ফল হয় নাই। এখন সুকেশের অনুনয় বিনয় পর্যন্ত সবই ব্যর্থ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃদ্ধা অদৃশ্য হইয়া গেল।

যে-তিনকড়ির মা ছিল একদিন সুকেশের বিশ্বাসের পাত্রী, সে যদি আজ সুকেশের নূতন কর্ত্রীদ্বারা সর্বসমক্ষে তস্কর বলিয়া প্রমাণিত হইতে বসে—চোর সে হউক আর নাই হউক—তাহার আত্মসম্মান সেখানে বিক্ষুব্ধ হইবেই। এই সম্মানবোধ ভরা পালে মেয়াকের দমকা হাওয়া লাগিয়া নৌকা আঁধারে কোথায় ছুটিয়া চলিল!

দেবী চৌধুরাণী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একজন নাম-করা ইংরেজ মনীষীর লেখায় সেদিন পড়ছিলাম, পরিণত বয়সে যে না পৌঁছেছে সে সেক্স্‌পীয়ার বুঝবে না। কথাটা বঙ্কিমের সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়ে যখন জীবনের অপরাহ্ণে পৌঁছাই আমরা তখনই আমাদের ripest and richest experience-এর আলোয় উপলব্ধি করি তাঁর প্রতিভার বিশালতাকে। যখন বয়সে তরুণ ছিলাম তখনও মর্মে দোলা দিয়েছে তাঁর রোমান্টিক উপন্যাসগুলি পড়ার অনির্বচনীয় আনন্দ। কিন্তু সে ছিলো সৌন্দর্য্য-পিপাসু তরুণচিত্তের কাছে রসস্রষ্টা শিল্পীর দুর্বার আবেদন। আজ পথের প্রান্তে এসে বঙ্কিমের বইগুলি পড়া আবার সুরু করেছি। দেবী চৌধুরাণী দিয়ে আরম্ভ। এই অপূর্ব উপন্যাসের আলোয় বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছেন তাকে লিপিবদ্ধ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

প্রথম যে-কথাটি মনে হোলো: There is a great need for literary artists as the educators of a new type of human being. কথাটি ব্যবহার করেছেন আল্‌ডুস্‌ হাক্‌স্‌লি (Aldous Huxley) নতুন প্যাটার্ণের মানুষ তৈরীর জন্য দরকার সাহিত্যস্রষ্টা শিল্পীদের আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান পৃথিবীর পরিচালনা ভার বিশ্বাস ক'রে যাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি তাদের না আছে প্রজ্ঞা, না আছে করুণা, না আছে কোন কল্পনাশক্তি। মানুষের ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন। এই বিপদ সম্পর্কে বহু লোক যদি সচেতন হয়ে ওঠে তবেই রক্ষা।

নতুন মানুষ তৈরী তো সর্ব্বাগ্রে দরকার। Produce great Persons, the rest follows. মার্কিন কবি হুইটম্যানের অমর উক্তি! নতুন পৃথিবী! পুরাতনের চিতাভস্ম হ'তে জেগে-ওঠা একটা অভিনব নবীনতর জগৎ! অসীম সম্ভাব্যতায় আশায় পরিপূর্ণ এই জগৎ! চোখে তার নতুন প্রভাতের আলো!. বর্ত্তমানের দুর্গতি থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবার ঝুঁকি নিয়ে যারা নেতৃত্বভার গ্রহণ করবে তারা হবে সাহসী, প্রেমধনে ধনী, হৃদয়ে বহন করবে আশার দ্যুতি। সেরা সেরা মানুষ যদি তৈরী করা যায় তবেই রাতের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবে নতুন দিনের তরুণ জ্যোতি।

সেরা মানুষ বল্‌তে ঠিক কি ধরণের মানুষ বুঝায় তা নিয়ে মতভেদ আছে মুনিদের মধ্যে। আলডুস্‌ হাক্স্‌লির সংজ্ঞাই এই লেখকের মনঃপূত আর হাক্স্‌লির মতে The ideal man is the non-attached man. সেরা মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে অনাসক্তি। দেহসুখে, ইন্দ্রিয়ের লালসায় তার কোন আসক্তি নেই। ক্ষমতার এবং বিষয়ের তৃষ্ণা থেকে মুক্ত সে। সে কারও প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণার ভাব পোষণ করে না। ধনে, মানে, পদমর্য্যাদায় সে নিস্পৃহ। যাকে বিজ্ঞান বলি, আর্ট বলি, ধ্যান বলি, পরোপকার বলি—এদেরও একটা সূক্ষ্ম মোহ আছে। এই মোহ থেকেও সেরা মানুষের মন মুক্ত।

সেরা সেরা মানুষ তৈরীই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রথম স্তরের সকল আচার্য্যেরাই সত্যাশ্রয়ী, হৃদয়বান অনাসক্ত মানুষ তৈরীর উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষা-

ব্রতীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকেন। দেবী চৌধুরাণীর ভাগ্যক্রমে তার শিক্ষার ভার এমন একজন গ্রহণ করেছিলেন যিনি ছিলেন একজন জাত-শিক্ষক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুরের উক্তিতে আছে: "গুরু কাঁচা হলে, গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা! শিষ্যের অহংকার আর ঘুচেনা, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।" উপযুক্ত গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য যে মুক্তি পায় একটা দিব্যজীবনের মধ্যে—এর সমস্ত গৌরব কি শুধু গুরুরই প্রাপ্য? ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, "ঢোঁড়া সাপ ঢোঁড়াকে ধরলে কি হবে?" 'পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়'—ঠাকুরের একটি অমূল্য কথা। তিনি পাত্র দেখেই উপদেশ দিতেন। পাথরের দেওয়ালে কখনও পেরেক মারবার চেষ্টা করতেন না। তাতে কি কোন লাভ আছে? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। ঠাকুরের কাছে এসেছিলো যারা তাদের এই জন্মেই জন্মান্তর ঘটালেন তিনি। যারা ছিলো ঘরের তারা চিরদিনের জন্য মুক্ত পথের পরিব্রাজক হ'য়ে গেল। ঠাকুরের চরণমূলে সমস্ত জীবন উজাড় ক'রে সঁপে দিলো তারা।

ভবানী পাঠক গুরু হিসাবে আদৌ কাঁচা ছিলেন না। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতের সময়েই ভবানী পাঠক অনেকক্ষণ ধরে প্রফুল্লকে দেখলেন এবং মনে মনে বললেন, "এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা।" শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে কেশব সেনকে বলেছিলেন, "তুমি লক্ষণ দেখনা কেন, যাকে তাকে চেলা ক'রলে কি হয়?"

বস্তুত প্রফুল্লর আধার ভালোই ছিল। প্রথমতঃ প্রফুল্ল ছিল স্থিরবুদ্ধি। তাই ভবানী পাঠকের শরণাগত হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তাকে বেশীক্ষণ ইতঃস্তত করতে হোলো না। প্রফুল্ল যে অলৌকিক সাহসের অধিকারিণী ছিলো, এতেও সন্দেহ করবার অবকাশ থাকতে পারে না। সেই জনশূন্য নিবিড় বনমধ্যে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় ভগ্ন অট্টালিকার প্রাঙ্গণে একাকিনী প্রফুল্ল বৈষ্ণব কৃষ্ণগোবিন্দদাসের শব কবরে শুইয়ে মাটি চাপা দিচ্ছে, এ দৃশ্য কল্পনা করতেও অনেক পুরুষের মন ভয়ে শিউরে ওঠে। চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়ে নিয়ে প্রফুল্ল গুপ্তধনের সন্ধানে সরু সিঁড়িতে পাতালে নেমে যাচ্ছে, এই ঘটনার মুকুরে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই প্রফুল্লর হৃদয় কত নিঃশঙ্ক। প্রফুল্লর আত্মমর্য্যাদাবোধও কত তীব্র! উপন্যাসের গোড়াতেই দেখি ঘোষেদের বাড়ী থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আসতে প্রফুল্লর বিষম আপত্তি। কারও কাছে কিছুর জন্যে হাত পাততে তার খুবই লজ্জা! সে উপোস ক'রে মরতে প্রস্তুত, তবু ভিক্ষা করতে রাজী নয়। স্বামী ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বললো, যাতে সে খোরপোষের টাকা পায় তার জন্য বাপকে অনুরোধ করবে সে। দুঃখিনী প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো, "তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না।" "যোগাযোগ" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাসের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন: "সর্ব্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করিনে, ভয় করি অসম্মানকে।" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্ল রবিঠাকুরের বিপ্রদাসের মতোই সর্ব্বনাশকে ভয় করে না, ভয় করে অসম্মানকে। প্রফুল্লর হৃদয়টিও কত সুন্দর, কত উদার! প্রাণীমাত্রই সুখী হোক, দুঃখ যেন কেউ না পায়,—এই শুভ সংকল্পের, মৈত্রীভাবনার দীপশিখাটি প্রফুল্লর অন্তরে সর্ব্বদা অম্লানদীপ্তিতে জ্বলছে। তাই যে হৃদয়হীন শ্বশুর বিনাঅপরাধে পুত্র-বধূকে পরিত্যাগ করেছেন, দুঃখিনী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা একবার চিন্তাতেও আনলেন না তাঁকেও অশান্তির মধ্যে রাখতে প্রফুল্ল দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছে। পাছে প্রফুল্লকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে শ্বশুর হরবল্লভ ও স্বামী ব্রজেশ্বরের মধ্যে কোন কথা কাটাকাটি হয় তাই প্রফুল্ল স্বামীকে বলছে: "তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মত দুঃখিনীর

অন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাহ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।"

ভবানী পাঠক রঙ্গরাজকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন: "জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষ কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভালো পাইয়াছি। এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে।" আমাদের ইস্পাত ভালোই মিলেছিলো, এতে কি সংশয় করবার বিন্দুমাত্র হেতু থাকতে পারে? ভবানী পাঠক তো এমনই একটি উপযুক্ত আধারের সন্ধানেই ছিলেন। তাঁর প্রয়োজন ছিলো একজন লীডারের (leader) মতো লীডার যিনি অরাজক দেশে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনকে ধর্মকার্য্য হিসাবে গ্রহণ করবেন। তাঁর চরিত্র এমনই মহিমময় হবে যে সহস্র সহস্র অনুচর শ্রদ্ধায় আনতশিরে তাঁর আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকবে। তাঁর সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে ধ্বনিত হ'তে থাকবে একটি নির্মল বৈরাগ্যের একতারার সুর। দেহ-সুখে থাকবে না তাঁর আসক্তি। বিত্তের মোহ থেকে মুক্ত হবে তাঁর মন। ক্ষমতারও কোন মোহ থাকবে না তাঁর মনে। ক্রোধ এবং ঘৃণা তাঁর অন্তরে কোন ঠাঁই পাবে না। কোন একজন বিশেষ মানুষে সীমিত থাকবে না তাঁর ভালোবাসা। প্রতিষ্ঠার ও পদমর্য্যাদার আকর্ষণকে নিঃশেষে জয় করবেন তিনি। লীডার যদি এই ধরণের অনাসক্ত মানুষ না হন, অরাজকতার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হবে কেমন ক'রে। ছোট মন নিয়ে কি কোন বড়ো জিনিষ গড়া যায়? চালাকির দ্বারা কি কোন মহৎকার্য্য সম্পন্ন হয়?

কিন্তু সেরা মানুষ তো পাওয়া যায় না। অনাসক্ত মানুষ তৈরী ক'রে নিতে হয়। তাইতো ভবানীঠাকুর রঙ্গরাজের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন: "সে সামগ্রী পাইবার নহে, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে।" পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত মানুষ—সে তো প'ড়ে-পাওয়া-চৌদ্দ-আনার মতো সত্যই "পাইবার নয়।" খ্যাতনামা ফরাসী (Mauriac) লেখায় পড়েছিলাম, "বাস্তব জগতে প্রথম থেকেই শুচি-শুভ্র সুন্দর আত্মা কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না। এই রকমের সুন্দর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে নাটক-নভেলে এবং সেই নাটক-নভেলগুলিকেও নিকৃষ্ট বলাই ঠিক। যাকে আমরা সুন্দর চরিত্র বলি, তা সুষমামণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই সংগ্রাম নিজেরই বিরুদ্ধে নিজের সংগ্রাম। চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছানো না পর্য্যন্ত এই সংগ্রামে সমাপ্তির রেখা টানা উচিত নয়।" বাহিরের জগতেই হোক অথবা অন্তরের জগতেই হোক, প্রগতির প্রথম সর্ত্তই হচ্ছে ধ্বংস: "destruction is the first condition of progress." (অরবিন্দ) ভিতরের দিক থেকে যে নিজ-সত্তার নীচের দিকটাকে ধ্বংস না করে সে একটা বৃহত্তর জীবনে উঠ্‌তে পারে না। একটা দিব্য জীবনের স্তরে পৌঁছানোর পথকে উপনিষদে ক্ষুরধার দুর্গম পথ বলা হয়েছে। পশু আর দেবতার মাঝামাঝি যে সীমা-রেখা রয়েছে সেই border-line-এ মানুষ রয়েছে দাঁড়িয়ে। এই জন্যই দিব্য জীবনের অনির্ব্বচনীয় একটি প্রশান্তিতে। (The peace that passes understanding) পৌঁছানো এত কঠিন। শ্রীঅরবিন্দ Essays on the Gita-তে এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"This happiness does not depend on outward things, but on ourselves alone and on the floesering of what is best and most inward within us. But it is not at first our normal possession, it has to be conquered by self-discipline, a labour of the soul, a high and arduous endeavour."

"এই যে প্রশান্তি, এ তো বাহিরের কোন-কিছুর উপরে নির্ভর করে না। এই প্রশান্তি নির্ভর করে একান্তভাবে আমাদেরই উপরে এবং আমাদের মধ্যে

প্রথম থেকেই সহজের রাস্তায় এই শান্তি আমাদের অধিকারে আসে না। ইন্দ্রিয়সংযম, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং কঠিন প্রয়াসের দ্বারা এই প্রশান্তিকে আমাদের জয় ক'রে নিতে হয়।"

ভবানী পাঠক যাকে নিবিড় জঙ্গলে প্রথমে দেখলেন সে তো দেবী চৌধুরাণী নয়, সে দুর্গাপুরের নিরক্ষরা তরুণী প্রফুল্ল। প্রফুল্ল সুলক্ষণা, সাহসী, আত্মমর্য্যাদা-বোধে তেজস্বিনী, প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না, প্রেমধনে ধনী। কিন্তু গীতায় যে-মানুষকে দিব্য জীবনের অধিকারী বলা হয়েছে প্রফুল্ল সেই অনাসক্ত মানুষ নয়। ভাঙা বাড়ীতে সে কুড়ি ঘড়া মোহর পেয়েছিল। ঐ মোহর দেশে নিয়ে যাওয়ার দিকেই মন ছিল তার। ভবানী পাঠকের শিক্ষার গুণে এবং প্রফুল্লর নৈতিক প্রযত্নের ফলে সেই মন পার্থিব ধন থেকে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে একদিন পৌঁছালো। প্রফুল্ল যে-দিন ভবানী পাঠককে অকুণ্ঠ ভাষায় জানালো, শ্রীকৃষ্ণ যে-হেতু সর্ব্বভূতস্থিত "অতএব সর্ব্বভূতে এই ধন বিতরণ করিব" সেদিন এই জন্মেই তার জন্মান্তর সুরু হয়েছে, এ বিষয়ে পাঠকের মনে আর সন্দেহ থাকে না।

ভবানী ঠাকুর পাঁচবৎসরে প্রফুল্লর শিক্ষা সমাপ্ত করলেন। শিক্ষার শেষে প্রফুল্ল কর্ম্মযোগের রাস্তা বেছে নিলো। কর্ম্মযোগের রাস্তাতেও ঈশ্বর পাওয়া যায় যদি অনাসক্ত হয়ে কাজ করা যায় তাঁকে নিয়ত স্মরণে রেখে। "মাম্ অনুস্মরণ্।" "নিমিত্তমাত্রম্ ভবসব্য-সাচিন্।" "এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কাজ করো।" এই তো ছিল রাম-কৃষ্ণের বাণী—ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের সমন্বয়ের বাণী। কর্ম্ম-যোগীর কর্ম্মের মধ্যে 'আমি' ও 'আমার' ব'লে কিছু নেই। সে কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করবে না। তার মন ক্রোধ এবং ঘৃণা থেকে মুক্ত। তার ভালোবাসা কোন পাত্র বিশেষে সীমিত নয়। অর্থ, সম্মান, পদমর্য্যাদা—কিছুতেই তার মোহ নেই। সে যখন পরোপকার করে তখনও অনাসক্ত হয়েই সেই মুখোমুখী দর্শন করবার বিপুল আগ্রহে। শিববুদ্ধিতে জীব-সেবার কথা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা, ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির একেবারে গোড়ার কথা। গান্ধীজীর আগেও ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে বড়ো বড়ো রাষ্ট্রনেতার আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজীর মতো এমন ক'রে কেউ দেশের আপামর-জনসাধারণের ভালোবাসা কুড়াতে পারেন নি। আর তার কারণ কি এই নয় যে গান্ধীজীর কণ্ঠে ভারতবর্ষ শুনলো তার আত্মার শাশ্বতবাণী? ঈশ্বরের কথা, অহিংসার ও সত্যের কথা? "I count no sac-rifice too great for the sake of seeing God face to face. The whole of my activity whether it may be called social, political, humanitarian and ethical is directed to that end." "ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখবার জন্য যে-কোন ত্যাগে আমি প্রস্তুত আছি। আমার সমস্ত কর্ম্মধারা—সে সামাজিক, রাজ-নৈতিক, নৈতিক অথবা মানব-সেবার ভাব থেকে উদ্ভূত, যাই হোক না কেন—ঐ ঈশ্বর দর্শনের জন্য।" বিবেকানন্দের এবং গান্ধীজীর humanism এই আধ্যা-ত্মিকতায় অনুপ্রাণিত, দিব্যচেতনায় অনুস্যূত।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেও ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির জয়ধ্বজা, লেখনী-মুখে বৈরাগ্যের স্তবগান, কণ্ঠে অনাসক্তির আবাহন সঙ্গীত। বঙ্কিম গ্রাম্য নিরক্ষরা তরুণী প্রফুল্লকে অনাসক্তির আদর্শেই গড়লেন। কোন দিন যার অন্ন জুটতো এবং কোন বেলা জুটতো না সেই প্রফুল্ল দৈবক্রমে কুড়ি ঘড়া মোহরের অধিকারিণী হোলো। এত ঐশ্বর্য্যের মোহ ত্যাগ করা প্রফুল্লর পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না। তবুও যে প্রফুল্ল বিত্তের মোহকে জয় ক'রে ভবানী পাঠককে বলতে পারলো: "যখন আমার সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম," সে দিব্যানুভূতির জোরে। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা: "বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে তা হলে আর অন্ধকারে যায় না।" পার্থিব কামনার বিন্দুবিসর্গ থাকতে তো সেই দিব্য উপ-

লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। আর অন্তর থেকে সমস্ত আসক্তি ধুয়ে মুছে ফেলা সাধনাসাপেক্ষ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা: 'বই, শাস্ত্র, এ সব কেবল ঈশ্বরের কাছে পঁহুছিবার পথ বলে দেয়। পথ উপায় জেনে লবার পর আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তখন নিজে কাজ করতে হয়।" গীতায় অনাসক্তির আদর্শকে খুবই উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে এবং প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত করবার জন্ত তাকে অনাসক্ত মানুষ করে গড়বার কি একান্ত প্রয়োজন ছিল না? তাই প্রফুল্লকে রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা এবং তার পরিয়েই ভবানী ঠাকুর ক্ষান্ত থাকলেন না। তাকে "সর্ব্ব-শেষে সর্ব্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধীত করাইলেন।" এখানেও ভবানী ঠাকুরের একজন আদর্শ-নিষ্ঠ আচার্য্য হিসাবে যা বক্তব্য ছিল তা ফুরিয়ে গেল না। প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের শিক্ষাগুণে পথ জেনে নিয়েছে। একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই জীবনের পরিপূর্ণতা, এই সত্যে প্রফুল্লর মনে সংশয় নেই। আর তো শাস্ত্রের দরকার নেই। এইবার প্রফুল্লকে নিজের জোরে চলতে হবে সেই দুর্গম অনাসক্তির পথে ঈশ্বরীয় উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্ত। জানার পালা যখন সারা হোলো তখন সুরু হোলো সাধনের পালা। ভারতবর্ষ যে শিক্ষার আদর্শকে মূল্য দিয়েছে তাতে জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের মিলন ঘটেছে। জ্ঞান কর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বম্" গীতার উপদেশ। তাই প্রফুল্লকে ভক্তিকাব্য পড়ার সঙ্গে গৃহের সকল কাজ করতে হয়। নিশি বড় সাহায্য করে না, গোবরার মাও তাই। সেও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। সে কতকাল আগে বঙ্কিমচন্দ্র বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শ প্রচার করেছিলেন! প্রফুল্ল নিশির কাছে চার বৎসর ধরে মল্লযুদ্ধও শিখেছে। ভবানী ঠাকুরের মতে স্ত্রীলোকের মল্লযুদ্ধ শেখা "ইন্দ্রিয়-জয়ের জন্ত। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় নাই।"

বঙ্কিমের মানসকন্যারা আমাদের কাছে নারীর যে বৈশিষ্ট্য—সেই প্রেমের করুণ-কোমলতা নিয়ে দেখা দিয়েছে ঠিকই। তবুও ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা-যাওয়া স্বপনচারিণী নারী বলতে যা বুঝায় সেই নারী, বোধ হয়, তাঁর পছন্দসই ছিল না। মার্কিণ কবি হুইটম্যানের যারা একান্ত আপনার জন তারা সকলেই প্রচুর দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং ব্যায়ামবীর। Myself and mine gymanastic ever. ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী একজন gymanastic সন্দেহ নেই। ভবানী পাঠকের অনুচরদের মধ্যে যারা বাছা বাছা লাঠিয়াল তাদের সঙ্গে প্রফুল্ল নেড়া মাথায় মল্লযুদ্ধ করছে—বাংলা সাহিত্যে রঘুবংশপড়া এমন একটা মল্লবীর তরুণীর ছবি, বোধ করি, আর একটাও নাই। আনন্দমঠের শান্তি তার লাবণ্যে মুগ্ধ সেই সন্ন্যাসীর কপালে এমন জোরে ঘুসি মারলো যে তার সংজ্ঞা লোপ পেল। আর আনন্দমঠের শেষের দিকে ঘোড়সওয়ার শান্তির সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরো-হণের অপরূপ বর্ণনাটা! লিন্ডলের পায়ের উপর পা দিয়ে এক লাফে ঘোড়ায় চড়া, সাহেবকে বোকা বানিয়ে ঘোড়া থেকে ফেলে দেওয়া, তার পর ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মেরে বায়ুবেগে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া! বঙ্কিমের মানসপুত্রীরা মল্লযুদ্ধ করে, লাঠি খেলে, অশ্বপৃষ্ঠে দিগন্তে উধাও হয়ে যায় মরুর বেদুইনের মতো, বিদ্যাচর্চ্চাতেও উদাসীন নয় এবং গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা। এই সঙ্গে রাজ-সিংহের চঞ্চলকুমারীর দৃপ্তভঙ্গিমায় দাঁড়ানোর সেই ছবিটি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না! চঞ্চল-কুমারীর অলঙ্কারশোভিত বাম চরণতলে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে আর বঙ্কিমচন্দ্র সেই দৃশ্য দেখে মন্তব্য করছেন: 'চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল।' বঙ্কিম ছাড়া এমন দুঃসাহসিক অপূর্ব্ব মন্তব্য আর কে করতে পারতো?

প্রফুল্লর দেহ মজবুত এবং বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠলো। মনের জীবনও মার্জ্জিত এবং আলোকিত হোলো জ্ঞানের আলোয়। কিন্তু দিব্যজীবনের অধিকারী হ'তে হ'লে ঈশ্বরকে জানা চাই আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর

চক্ষু বলে এবং তাঁকে ভালোবাসা চাই সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে। আর অন্তরের মধ্যে আসক্তির কণামাত্র থাকতে এই পরম প্রেমের উদয় কখনোই সম্ভব নয়। তাই প্রফুল্ল যাতে পার্থিব সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হতে পারে তাই ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে শয়ন, বসন, আহার, স্নান, নিদ্রা, কেশবিন্যাস পর্য্যন্ত জীবনের প্রতিটী ব্যাপারে কঠোর সংযম অভ্যাস করালেন। পাঁচ বৎসরের অতন্দ্র সাধনায় প্রফুল্ল জাগতিক সমস্ত বিষয়-বস্তুতে অনাসক্ত হয়ে উঠ্‌লো। মানুষ মনে বদ্ধ, মনে মুক্ত। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে একজন জনক রাজা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে পারেন; আবার গুহাবাসী বৈরাগীর পক্ষে আকাশে সৌধ রচনা করা একটুও বিচিত্র নয়। কাপড় গেরুয়া হ'লে কি হয়? মনে বাসনাগুলি গজ্‌ গজ্‌ করতে থাকলে কাপড় রাঙানোর বা সংসার ত্যাগের কোনই মানে হয় না। প্রফুল্লর মনে গেরুয়ার রং লেগেছিল। আর এর জন্ত পাঁচ বৎসর ধ'রে তাকে অতন্দ্র সাধনায় ব্রতী থাকতে হয়েছে! অভ্যাস এবং বৈরাগ্য ছাড়া তো মন-করীকে বশে আনার আর কোন উপায় নেই!

হায়, বিশ্ব-সাহিত্যে অনাসক্ত নর-নারীর নিখুঁত ছবি এই দুর্লভ! বঙ্কিমচন্দ্রের দৌলতে বঙ্গসাহিত্যে আমরা দেবীচৌধুরাণীকে পেয়েছি! যাকে বলে অনাসক্ত অর্থাৎ বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ নারী। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যত্নের সঙ্গেই পড়িয়েছিলেন এবং প্রফুল্লর বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ এবং শিখবার ইচ্ছা অতি প্রবল ছিল। কিন্তু শাস্ত্র জেনে প্রফুল্ল খুসী থাকতে পারেনি। রামকৃষ্ণ বলতেন, সংসারে যার আসক্তি আছে মিছে তার পড়া। সত্য জানবো যা কর্ত্তব্য তা করবার জন্ত। অনেক শ্লোক অনেক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে। কিন্তু তার মন যদি ক্রোধ, ঘৃণা, ভয় থেকে মুক্তি না পায়, চিত্তে যদি মমতার ঐশ্বর্য্যের, দেহসুখের মোহ থাকে তবে সে তো শকুনির সগোত্র। "শকুনি খুব উঁচুতে উড়ে, নজর ভাগাড়ে।" শ্রীরামকৃষ্ণের উপমাগুলির সত্যিই জুড়ি নেই!

গীতার পরমতত্ত্ব, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "The highest most direct message 'of the' Ishwara" ঘোষিত হয়েছে দুটী সরল পরিষ্কার শ্লোকে যাদের শুরুতে "মন্মনা ভব।" "তোমার সমস্ত মনটা আমার দিকে ফেরাও, সেই মন ভরিয়ে রাখো আমার চিন্তা দিয়ে, আমার অস্তিত্ব দিয়ে। তোমার সমস্ত হৃদয় আমাকে দাও, তোমার প্রত্যেকটী কর্ম আমায় অর্পণ করো। বাস্‌, এই হোলেই তোমার ভূমিকা ফুরিয়ে গেল। তারপর আমার পালা। তোমার জীবন এবং আত্মা এবং কর্মের মধ্যে আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দাও। পরিপূর্ণ জ্ঞানের এবং শক্তির এবং প্রেমের প্রকাশ তোমার সঙ্গে আমার কারবারের মধ্য দিয়ে। তোমার সীমিত মানবীয় বুদ্ধিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের ভালো-মন্দ বিচার করা কখনোই সম্ভব নয়। সীমাবদ্ধ তোমার বুদ্ধি দিয়ে আমাকে যদি নাই বোঝ আমাকে সংশয় কোরো না। সমস্ত দুঃখের এবং পাপের এবং অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাদের পারে তোমাকে নিয়ে যাবো আমার কাছে।" শ্লোক দুইটীর দ্বারা গীতার যে পরমতত্ত্ব ঘোষিত হয়েছে সেই তত্ত্বকে মেধার মধ্যে জানা এক কথা এবং শাস্ত্রের তত্ত্বকে সাধনার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের একটা জীবন্ত পরম উপলব্ধিতে রূপান্তরিত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রফুল্লর একটা বড় গুণ ছিল। কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা ছিল, উৎসাহ ছিল, সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল, খুব একটা রোখ্‌ ছিল। রোখ্‌ ছিলো বলেই প্রফুল্ল 'ভট্টিকাব্য জলের মতো সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। যে উৎসাহ, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা প্রফুল্লকে এত কাব্যগ্রন্থ অতিক্রম করতে সহায়তা করেছে সেই উৎসাহই তাকে ধর্মজীবনেও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে আগিয়ে নিয়ে গেছে এবং সমস্ত কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবার শক্তি দিয়েছে। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো লক্ষ্যবস্তুতে লেগে না থাকলে ঈশ্বরে সকলকর্ম অর্পণ করা সম্ভব নয়। মনে দিবারাত্রি একটী চিন্তার

তরঙ্গই খেলবে—ঈশ্বর-চিন্তার তরঙ্গ। মনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে একটি ধ্যেয় বস্তু দিয়ে চেতনাকে ভরিয়ে রাখার জন্য। এটা করতে হলে একটি সংযমের মধ্য দিয়ে সাধককে যেতেই হবে। অহিংসার সাধনার উপরে আমাদের শাস্ত্রে কেন জোর দেওয়া হয়েছে? কেউ যদি আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, বলা হয়েছে সেই অন্যায়কে উপেক্ষা করতে, ক্রোধের বা ঘৃণার ভাবকে প্রশ্রয় না দিতে। কেন? কারণ ক্রোধ এসে মনকে অধিকার করলে চিত্তে নানা বৃত্তির ঢেউ ওঠে, যে ব্যক্তি আমাদের ক্ষতি করছে তার ক্ষতি করতে ইচ্ছা হয়, আমাদের মন আমাদের বশে থাকে না, মন বাজে খরচ হয়ে যায়, মনের নানা বৃত্তির তরঙ্গমালা এসে চেতনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে ঈশ্বর কোথায় ভেসে যান।

প্রফুল্ল তাই ক্রোধের, ঘৃণার এবং ভয়ের অতীত। প্রফুল্ল জানে ক্রোধকে কেমন ক'রে বশে রাখতে হয়। সহায় সম্পদহীনা নিরপরাধ প্রফুল্লকে শ্বশুর হরবল্লভ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। নিরন্না নিরাশ্রয়া কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে, কি ক'রে খাবে? প্রফুল্লের এই প্রশ্নের জবাবে শ্বশুর উত্তর দিয়েছিল, চুরি ডাকাতি ক'রে খেও।' ব্রজবল্লভ যখন প্রফুল্লের উপর ডাকাতি করার কলঙ্ক আনলো, প্রফুল্ল জবাব দিতে পারতো, তোমরাই তো চুরি ডাকাতি করে খেতে বলেছিলে। প্রফুল্ল সে কথা মুখেও আনলো না। এই আত্মসংযমের জন্য যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন আছে। স্বামী বিবেকানন্দের লেখায় পড়েছিলাম: It is the greatest manifestation of power to be calm ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিয়ে তাকে ছোটানো সহজ। সবাই তা পারে। ধাবমান অশ্বকে থামাতে সকলে পারে না। তেজস্বীনী প্রফুল্ল যখন দেবী চৌধুরাণীতে বিকশিতা হোলো তখন প্রচুর শক্তির অধিকারিণী হয়েছে।

এই শক্তির পরিমাণ গাণিতিক হিসাবে নির্দ্ধারণ করা যায় না। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস আগাগোড়া পড়েছেন যাঁরা তাঁরাই জানেন হরবল্লভ শয়তানের একটি অকৃত্রিম অনুচর অর্থাৎ টাকার জন্য হেন দুষ্কর্ম নেই যা হরবল্লভ না করতে পারে। দেবী চৌধুরাণী সাগরের মুখে শুনেছিল, ব্রজেশ্বরের পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন। ঐ টাকা না হ'লে বাপের জাতিরক্ষা হয় না। খাজনার দায়ে বাপকে কাটকে যেতে হয়। দেবী চৌধুরাণী মোহরের ঘড়া ব্রজেশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে শ্বশুর হরবল্লভের জাত বাঁচালো। প্রতিদানে হরবল্লভ ঋণ শোধের দায় এড়াবার জন্য গোইন্দা হ'য়ে দেবীকে ধরিয়ে দিতে উদ্যত হোলো। এত বড়ো অর্থপিশাচ কৃতঘ্ন শ্বশুর যাতে ইংরেজ শাসকের কোপে না পড়ে তার জন্য দেবী চৌধুরাণী ধরা দিতেও প্রস্তুত ছিল। প্রফুল্ল চরম বিপদের মুখে ব্রজেশ্বরকে বলেছে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় করিব না।[২] দেবী চৌধুরাণীর ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঔপন্যাসিক লিখেছেন: "হরবল্লভ প্রফুল্লর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্ব্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্খিনী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজলায়, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।"

যা মূল্যবান মনে করি তা হারাণোর ভয়ই ভয়। জীবন, সম্পত্তি, সম্মান—এ সব আমাদের কাছে মূল্যবান। এর থেকে কেউ অমাদিগকে বঞ্চিত করতে এলে সে যদি আমাদের চেয়ে প্রবলতর হয় তবে পালাই প্রাণ ভয়ে; দুর্ব্বল হ'লে ক্রোধে আঘাত করি। কিন্তু জীবনে, সম্পত্তিতে, সম্মানে যার কোন আসক্তি নেই, তার মনে এ সব হারানোর কোন ভয়ও নেই। যে জীবনকে সম্পত্তিকে বিপন্ন করে তার উপরে ক্রোধেরই বা উদয় হবে কেন? তাই বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, যে হেতু প্রফুল্ল জীবনে, ধনে নিস্পৃহ সেই হেতু প্রফুল্ল ছিলো ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত। প্রফুল্লর কাছ থেকে শুধু নিজের শ্বশুরের কেন, কারও কোন উদ্বেগের বা ক্ষতির কোন আশঙ্কা ছিল না। যে ভয় পায় না তাকে ভয়ই বা দেখাতে পারে কে? দেবী চৌধুরাণীকে রক্ষা করবার জন্য প্রায় হাজার বরকন্দাজ তৈরী ছিলো। কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে

যুদ্ধ বাধলে চার শ লোক মরতো। দেবী ব্রজরাজকে বললেন, "আমার কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?"

ভূতনাথের ঘাটে দেবীর বজরা ভিড়িয়ে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভবানীঠাকুরের গড়া শাণিত কাটারিখানিকে হরবল্লভের সংসারের একেবারে কেন্দ্রে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সহস্র সহস্র দুর্দ্ধর্ষ বরকন্দাজের নিঃশঙ্ক অধিনায়িকা দেবী চৌধুরাণী স্বেচ্ছায় জীবনের রঙ্গমঞ্চে নূতন ভূমিকা গ্রহণ করলেন। নিষ্কাম দেবীর সংসারের কোন মোহ ছিল না। তবু সংসারী সাজলেন, কারণ ঘর গৃহস্থালী সুচারুরূপে সম্পন্ন করা স্ত্রীলোকের কাজ। সংসারধর্ম কঠিন ধর্মও বটে। "কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন?" এর চেয়ে কোন পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব?" জীবনের বিচিত্র নাট্যলীলায় মেয়েদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণাকে প্রফুল্ল কী সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করেছে।

প্রফুল্ল ভবানীঠাকুরের কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিল এবং প্রফুল্ল শাস্ত্র অধ্যয়ন করতো অন্তরে বিপুল শ্রদ্ধা নিয়ে। যা সে সত্য বলে বিশ্বাস করতো আচরণে তা পালন করবার মতো একটা moral seriousnessও তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। সেই জন্য অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ— যোগশাস্ত্রের এই নির্দেশকে সে জীবনে অনুসরণ করতো। যে আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে আসছে মনে মনেও তার অনিষ্ট কামনা যদি না করি, কর্কশবাক্যে তাকে যদি পীড়া না দিই, কর্মদ্বারাও তাকে দুঃখ দিতে কুণ্ঠিত হই তবে তার মন থেকে হিংসার ভাব চলে যাবে। অহিংসার এমনই শক্তি, এমনই মহিমা! প্রফুল্লর একটা বড়ো গুণ ছিল তার শ্রদ্ধা।

গ্রন্থের উপসংহারে দেখি প্রফুল্ল অহিংসার আদর্শকে অনুসরণ ক'রে শ্বশুরকেও জয় ক'রে ফেলেছে। প্রফুল্ল যে কাজ না করতো সে কাজ তাঁর ভালো লাগতো না। শাশুড়ী প্রফুল্লর ব্যবহারে এত সুখী যে সমস্ত সংসারের ভার প্রফুল্লর হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবল সাগরের ছেলে কোলে ক'রে বেড়াতে লাগলেন। নয়ান বৌ পর্য্যন্ত অবশেষে প্রফুল্লর বশীভূত হয়েছে। প্রফুল্লর চরিত্রে প্রজ্ঞার সঙ্গে করুণার কি অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে! তার জীবনের হালে জ্ঞান, প্রেমে সেই জীবন অনুপ্রাণিত! তাই না প্রফুল্লর জীবন এমন কল্যাণশ্রীতে ভ'রে উঠেছে। প্রফুল্ল-চরিত্রের উজ্জ্বলতম ভূষণ তার অনাসক্তি। তার অন্তরে কারও প্রতি ঘৃণা বা ক্রোধ নেই। প্রেমাস্পদ শুধু আমাকেই ভালোবাসবে অথবা আমার ভালোবাসা কেবলমাত্র প্রেমাস্পদে সীমাবদ্ধ থাকবে, সকলের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে না, হৃদয়ের এই সঙ্কীর্ণতা থেকেও প্রফুল্ল সর্ব্বতোভাবে মুক্ত। ব্রজেশ্বরের হৃদয় শুধু প্রফুল্লময় হয়ে থাকবে, এটা প্রফুল্লর আদৌ কাম্য ছিল না। নয়ান বৌ ও সাগরকে লক্ষ্য ক'রে প্রফুল্ল স্বামীকে বলেছে "ওরাও আমি।" এমনি অনাসক্তি ছাড়া আমাদের নানা সমস্যার সমাধানের আর কোন পথ কি খোলা আছে?

একটি আশ্চর্য বিকেল

—শ্রীকরুণাময় বসু

বিকেলের বাঁকা রোদ ম্লান হয়ে আসে,
এক মুঠো ঝরা ফুল পড়ে থাকে মাঠে আর ঘাসে ;
এক মুঠো ঝরে পড়া যুঁই
হাওয়ায় মেলেছে পাখা, যেন ছোট চঞ্চল চড়ুই।

আকাশের মেঘ হতে ঘনছায়া নদী জলে নামে,
কপোত কূজন করে প্রাসাদের গম্বুজে ও থামে,
কালো জল, বেত ঝোপ, ঘন কেয়াবন :
সেখানে কি দুটি হাঁস মুখোমুখি রয়েছে উন্মন ?

হৃদয়ে বিকেল নামে,
ঘুম ঘুম ঘুঘু ডাকা ছায়া মাখা আশ্চর্য বিকেল !

হাওয়ায় ছড়ায় গন্ধ ক্লান্ত হাতে যুঁই চাঁপা বেল,
চিকন পাতাটি নাড়ে, ছায়া আঁকে ওই দূরে তাল নারিকেল :
ঘুম ঘুম ঘুঘু ডাকা আশ্চর্য বিকেল !
মনে হয় কেউ যদি আসে,
কিছু নয় মিছামিছি শুধু ভালোবাসে,
আমার হাতের কাছে ঘন করি হাতখানি রাখে,
একটু মুখের হাসি, একটু চোখের জলে
দুদিনের বাসা যদি আঁকে ?
তারপর সময়ের যাদুঘরে রেখে যাব
দুজনার মায়া-মণিহার,

সেই সুর জানো না কি
মেঘে আঁকে রামধনু,
শ্রাবণের ভিজে বনে হীরের জোনাকি।
সেই সুর ঠোঁটে নিয়ে হাজার বছর কাল
পার হয়ে চলে গেল সময়ের পাখি।
সেই সুর স্মরণের বকুল-বাগানে
ফুল হয়ে ফিরে আসে, ফিরে আসে মায়া ঝরা গানে।
সেই সুর যদি ফিরে আসে
একটি মুখের মতো, এক ফোঁটা তারা দিয়ে ভরে রাখা
বুকের ঝিনুকে গাঁথা বিকেলের সমস্ত আকাশে।

আড্ডা

—শ্রীসুধীর গুপ্ত

চলন্ত পথের পাশে শ্যাম-শান্ত বাঁকে
অফুরন্ত ফূর্তি-মুগ্ধ আড্ডায় আড্ডায়
তা'রা সব ভিড় করে সবাই যেথায় ;
হাসে—ভাবে, উচ্ছলিত প্রাণ-রস চাখে।
উদ্বেলিয়া অতলান্ত অন্তর-সত্তাকে
আবার পথের স্রোতে কোথায় মিলায়;
সন্তর্পণ স্পর্শ তারা প্রাণে রেখে যায়।
তারা যায়, তবু কত স্মৃতি পিছে থাকে।
সহস্র সে স্মৃতি মূর্তিহারা সহচর
পদে পদে অনির্বাচ্য যোগ-সূত্র গড়ে ;
আনন্দে বিষাদে ভরা গহন অন্তর ;
কত না রহস্য বোনে পথের ভিতরে।
আড্ডার আসক্তি তাই দুর্বার দুর্ধর,
আজীবন জীবনেরে কী সুস্বাদু করে!

শনিবারের সন্ধ্যা

—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

শনিবারের সন্ধ্যাটি এই মধুর চেয়ে আরো মিঠে,
শিশুর মতন আহ্লাদে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে পিঠে!
এ যেন কোন্ খুশীর খবর,
কোন্ দেবতার এ যেন বর,
জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘোর গরমে গোলাপজলের ঠাণ্ডা ছিটে।
খাঁচার-থেকে-পালিয়ে-আসা এখন আমি মুক্তপাখী,
বাঁধন-ছেঁড়ার বিপুল পুলক বলো তো আজ কোথায় রাখি?
অন্তবিহীন মহাশূন্যে
সারাটি দিন কিসের জন্যে
ম'রেছিলাম বৃথাই ঘুরে, ক'রেছিলাম ডাকাডাকি!
বাহিরে আর মন নাহিরে—ছুটেছি তাই কুলার পানে,
কাকলি মোর কণ্ঠতটে স্তব্ধ সে কোন্ অভিমানে!
কে ডাকে আজ কতোই স্নেহে
মল্লী-কোটা পল্লী-গেহে,
সন্ধ্যা-শাঁখের উতল আওয়াজ কল্পনাতে শুনছি কানে।
ধানী রঙের শাড়ি-পরা মাঠের মাঝে একটি বাড়ি,
মর্মরে সে নয়কো গাঁথা—মর্ম তবু লয় যে কাড়ি'।
সেথায় মাটির আঙনখানি
ভুলিয়ে দেবে সকল গ্লানি,—
পরিপাটি শীতলপাটির মায়া কি আর ছাড়তে পারি!
মেদুর হাওয়ায় শুয়ে দাওয়ায় এখন শুধু দেখব চেয়ে—
আধখানি চাঁদ—অলস তরী আকাশগাঙে যায় কে বেয়ে।
নেবুর ফুলের গন্ধে মরি,
কুটীরখানি উঠবে ভরি',
ঝিঁঝির রবে তন্দ্রা তরল নামবে সকল অঙ্গ ছেয়ে?
ভাবনা কী আর—কাল রবিবার—ক'রতে হবে প্রাণ যা' চাহে,
কঠিন-বাঁধা ঘণ্টাতে কি দিল্ খুলে আর কোকিল গাহে?
কালকে শুধু স্বপ্ন দেখা,
গান গাওয়া আর কাব্য লেখা,

'হয়তো বা একটি গোলাপ'

—মনোরমা সিংহরায়

বিজ্ঞানের কারুকার্যে একদিন মাঠ বন নদী
তাদের স্বভাব রূপ মুছে গিয়ে অন্তুতরো দৃশ্যে
প্রতিভাত হবে। আর পুষ্পিত উদ্যান ছেড়ে যদি
ঘাটতলা বাড়ী করা তার মোহ কাটাতে না পারো
তবে রেখো শুধু মাটি একটুকু এ বিশাল বিশ্বে
যেন মৃঢ় ভালোবাসা একান্তই সুগোপন আরো।
বুনো কিছু ফুলগাছ হয়তো বা একটি গোলাপ
কখনো ধরবে আর এ জীবন রাখবে শ্যামল
রুক্ষ দিন মুগ্ধ করে মাঝে মাঝে জানাবে আলাপ
যদিও অজস্র কাজে থাকবেই ব্যস্ত নিরবধি ॥

দুইটী নিমেষ

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমার জীবন-নাট্যে দুইটী নিমেষ!
একটিতে প্রণয়ের প্রথম উন্মেষ!
কর্ণমূলে তরুণীর কম্পিত অধর!
ভাবাবেগে সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে থরোথর!
ভীরুকণ্ঠে বলেছিলো না-বলা ভাষায়;
'লহো মোরে! বসে আছি তোমারই আশায়!

আমার ঘরণী হোলে! ফাল্গুনের প্রাতে,
কখনো বা বৈশাখের উদ্দাম ঝঞ্ঝাতে
চলিলাম একসাথে এক প্রাণ, মন!
একসুরে বাজিতেছে দুইটি জীবন!

আর এক মুহূর্ত্ত এলো! জীবন-মৃত্যুর
মাঝখানে দুলিতেছো! গোধূলির সুর
পূরবীর রাগিনীতে বাজায় শানাই!
পুত্র এসে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, 'মা নাই!'

পূর্ব-বল্‌কানের বিস্মৃত সভ্যতা

জুলফিকার

নব্য-প্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক পিরিয়ডে যে সব দেশে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল, চীনকে বাদ দিলে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,—

মিশর, মেসোপোটেমিয়া ও সিন্ধু-উপত্যকা। প্রাচীন মিশরী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল মেম্ফিস্ ও থিবসে; মেসোপোটেমিয়া বা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী দুইটির অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল সুমেরীয় ও আসুর (Assyrian) সভ্যতা,—ব্যাবিলন ও নিনেভেকে কেন্দ্র করে, আর সিন্ধু উপত্যকায় আর্যেতর সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পায়।

ভূমধ্য সাগরের পূর্বাঞ্চলে যে কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার কথা আমরা অবগত আছি—যেমন, ফিনীসিয়, মিডিয়াম, মাইসিনী ও আইওনীয় বা হেলেনিক সভ্যতা,—প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে ওরা সবাই মিশর, ব্যাবিলন ও সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার অনেক পিছনে।

• • •

সম্প্রতি ভূমধ্য সাগরের পূর্ব প্রান্তবর্তী আরও একটা বিলুপ্ত সভ্যতার কথা জানা গেছে—যেটা মেসোপোটেমিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার সমসাময়িক। বছর কয়েক আগে কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ ও পশ্চিম তীরে, আনাতোলিয়া (এশিয়া মাইনর) ও বল্কান উপদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় এই প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর নাম হামাঞ্জিয়া (Hamangia) সভ্যতা। এর সূচনা নিওলিথিক যুগেই হয়েছিল বলেই ভূতাত্ত্বিকেরা অনুমান করছেন। খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছরেরও আগে অর্থাৎ প্রায় ছ' হাজার বছর হতে চল, এই বিস্মৃত হামাঞ্জিয়া সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল।

• • •

রুমানিয়ার এ্যাকাডেমী অব সায়ান্সের প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার যে শাখা আছে, সেই ইনষ্টিটিউট অব আর্কিওলজীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক বের্ সিউয়ের (Prof. D. Berciu) নেতৃত্বে, ১৯৫৪ সাল থেকে সুরু করে ১৯৬১ সাল তক, পূর্ব রুমানিয়ার দাব্রুজা (Dabruja) ওড্যানিয়ুব নদীর মোহনার সন্নিকট সার্ণাভোদার(Cernavoda) যে খনন কার্য্য চলছিল, তাতে ড্যানিয়ুব উপত্যকায় গড়ে ওঠা বিলুপ্ত হামাঞ্জিয়া সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সার্ণাভোডায় মোট তিনশ পঞ্চাশটা সমাধি খনন করা হয়। এই খনন কার্য্যের ফলে কতকগুলি মৃৎপাত্র ও টুকিটাকি গৃহস্থালীর জিনিষ ও কয়েকটা মাটির পুতুল পাওয়া গেছে। এদের কয়েকটা অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদেরা হামাঞ্জিয়া সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ এখনও সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। এ নিয়ে ওঁরা এখনও গবেষণা চালাচ্ছেন, তবে এই সভ্যতাটা যে সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক ছিল, সে বিষয়ে ওঁরা নিঃসন্দেহ।

হামাঞ্জিয়েরা সমুদ্রোপকূলবাসী হলেও, নৌচালনা ও বাণিজ্য ব্যাপারে তাদৃশ উন্নত হয়ে উঠতে পারে নি। জীবিকার জন্য তারা পশুপালন ও কৃষি-কার্য্যের উপরই নির্ভর করত।

• • •

সাধারণতঃ কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে খুব উন্নত পর্য্যায়ের শিল্পকলার অনুশীলন বা বিকাশ আশা করা যায় না। অথচ, পূর্ব বল্কানে সে যুগের যে কয়েকটা মূর্ত্তি ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের কোনো কোনোটার শিল্পব্যঞ্জনা সত্যিই অনন্যসাধারণ।

সার্ণাভোভার সমাধি থেকে উল্লেখযোগ্য দুটী মাটির পুতুল (Ceramic Statuette) আবিষ্কৃত হয়েছে। উচ্চতায় পাঁচ ইঞ্চির মত, একটা বসা অবস্থায় পুরুষ মূর্ত্তি, অপরটী নারী মূর্ত্তি। বাদামী রঙের মাটী দিয়ে তৈরী এই পুতুল দুটো বোধহয় হামাজিয়াদের কোন ধর্মীয় ভাবের প্রতীক।......

আশ্চর্য্যের কথা এই যে ভূমধ্য সাগরের আশে-পাশের অঞ্চল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে সব পুতুল বা মূর্ত্তি পাওয়া গেছে,- তার মধ্যে পুরুষমূর্ত্তি নেই বল্লেই চলে। দু' একটা যাও বা আছে, তারা নারী পুরুষের যুগল মূর্ত্তি। স্ত্রী বর্জ্জিত একক পুরুষ মূর্ত্তি একটীও নাই। আর যতগুলি মূর্ত্তি উদ্ধার করা হয়েছে, সবগুলিই দাঁড়ানো ভঙ্গীতে।

পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে হয়ত কোনো হামাজিয়া রাখাল যুবক, ড্যানিয়ুবের তীরে ঘাসের জমীতে তার গরুপাল ছেড়ে দিয়ে, কোনো অলস মধ্যাহ্নে, অবসর-যাপনের ফাঁকে, কাদা দিয়ে মূর্ত্তি দুটোর রূপ দান করেছিল। এই শিল্প-সৃজনে সে যুগের অখ্যাত শিল্পী তার অসামান্য প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা আধুনিক কলাবিদদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

The figures are wonderfully modern in the simplicity of their lines and their vigour of expressiveness......The statuettes are unique both by their archeological and artistic value....

সার্ণাভোভার নারী মূর্ত্তিটার যুগল জঙ্ঘা ও স্ফীত জঘন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার সূচনা করে। একখানা পা মোড়া, অন্যখানি সম্মুখে প্রসারিত, হাত দু'খানা গোটানো হাঁটুর ওপর রাখা। বসার ভঙ্গীটা বেশ সাবলীল। মূর্ত্তিটা বোধহয় উর্বরতার প্রতীক।......

পুরুষ মূর্ত্তিটা আরও সুন্দর, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূর্ত্তিটার চিন্তান্বিত ভাব। টুলের মত ছোট্ট উঁচু আসনে বসা। কনুই দুটী দুই হাঁটুর ওপর রাখা, ঝুঁকে পড়া আনত মুখের থুঁতনীটা হাতের তালুর ওপর ন্যস্ত।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী ভাস্কর রেঁদার (Radin) 'Thinker' বলে প্রসিদ্ধ মূর্ত্তিটার (যার ছবি হয়ত অনেকে দেখে থাকবেন, কেউ হয়ত ল্যুভরে আসল মূর্ত্তিটা দেখেছেন) কথাই মনে পড়বে, এই পুতুলটী দেখলে। একজন শিল্পরসজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক এই পুতুলটাকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন—

'A surprising predecessor of Rodin's 'Thinker'.

সত্যিকার শিল্প-প্রতিভা যে দেশকালের শাসন মানে না,—এই পুতুলটী দেখলে কথাটার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।
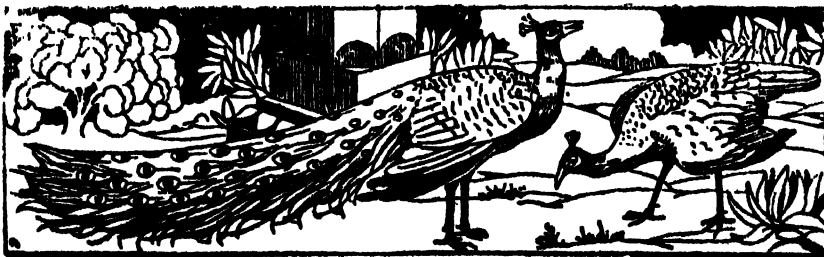
মৃত্যুঞ্জয়ী সক্রেটিস

অনাথবন্ধু দত্ত

প্রবাদ আছে যে সক্রেটিস্ (খৃঃ পূঃ ৪৬৯-৩৯৯) দর্শনশাস্ত্রকে আকাশ হইতে মাটিতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। এই দার্শনিক ছিলেন এক ভাস্করের পুত্র এবং নিজেও কিছুদিন ভাস্করের কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার আয়ের কোন স্থায়ী পেশা ছিল না এবং কোন ব্যবসাও তিনি করিতেন না। এজন্ত তাঁহার আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল। এই সকল কারণে—চারিটী সন্তানের জননী তাঁহার স্ত্রী জানথিপীর (Zanthippe) সহিত সক্রেটিসের ঝগড়া লাগিয়াই থাকিত। গ্রীক সাহিত্যে এজন্ত ঝগড়ার অপর নাম জানথিপীতে দাঁড়াইয়াছে।

সক্রেটিস্ কিছু সময় সৈন্যদলে ছিলেন এবং পোটিডিয়া (Potidoea) ও ডিলিয়ামের (Delium) রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমোক্ত যুদ্ধে তিনি এলসিবিয়াডিস্ (Alcibiades) এবং দ্বিতীয় রণক্ষেত্রে জেনোফোনের (Zenophon) জীবন রক্ষা করেন।

রণক্ষেত্র হইতে তিনি এথেন্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নিজেকে জ্ঞানচর্চ্চায় নিয়োজিত করেন। তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল জনকল্যাণ বা মানব হিতসাধন এবং চারিত্রিক আদর্শ। জ্ঞান বা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। এই কারণেই তাঁহার জীবন ছিল একদিকে দারিদ্র্য এবং অন্যদিকে দাম্পত্য-কলহে পূর্ণ। খৃঃ পূঃ ৪০৬ সনে তিনি এথেন্সের নগর পরিষদ বা সেনেটে ৫০০ সদস্যের অন্যতম নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সক্রেটিস সেনেটের নির্ব্বাচিত সদস্যের কর্ত্তব্যপালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিক্ষাদান বা জ্ঞান বিতরণের কার্য্যও চালাইতেন।

সক্রেটিসের লিখিত কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁহার জানা যায়। এই দুই শিষ্য হইতেছেন গ্রীসের অমর দার্শনিক প্লেটো (খৃঃ পূঃ ৪২৯-৩৪৭) এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এথেন্সের বিখ্যাত সেনাপতি জেনোফোন (খৃঃ পূঃ ৪৪৪-৩৫৯)।

ইহাতেও আসল সক্রেটিসকে জানা যায়না কারণ প্লেটো অনেক নিজের উক্তিও সক্রেটিসের মুখে বলাইয়াছেন। লেখায় সক্রেটিসের শেষ আর প্লেটোর আরম্ভ ধরা কঠিন, এমন কী অসম্ভব। যাহা হউক সক্রেটিসের বিপুল নৈতিকশক্তি ও মহামানবতা এই সকল লেখা হইতে জানা যায়। এই বিরাট মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় যখন সক্রেটিসকে যুবকসমাজ কুপথগামী করার অপরাধে তাঁহার সহ-নাগরিকগণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল। সক্রেটিস বিচারকগণের নিকট মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনার কার্য্যের সমর্থনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা প্লেটোর গ্রন্থ The Dialogue Apology-defence এ বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থখানি কেবল ভাষার মাধুর্য্যে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা তাঁহার সত্যনিষ্ঠা এবং :নির্ভীকতার নিদর্শন। প্লেটোর রচনায় সক্রেটিসের মৃত্যু বর্ণনা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম হৃদয়স্পর্শী ও সুন্দরতম বর্ণনা।

প্রাণরক্ষার জন্য সক্রেটিসের শিষ্যরা তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিয়াছিল এবং সেজন্য ব্যবস্থাও করিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বিচার এবং দণ্ডদানের মধ্যে ত্রিশ দিনের ব্যবধান ছিল। সক্রেটিস ব্যতীত এই দিনগুলি সকলেই চরম উদ্বেগে কাটাইতে লাগিল। অবশেষে মর্ম্মান্তিক শেষের দিনটী আসিল। সক্রেটিস ইহার পূর্ব্বেই স্ত্রী ও সন্তান-

হইয়া কারাধ্যক্ষের জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কারাধ্যক্ষ প্রাণঘাতী হেমলক্ বিষপাত্র লইয়া উপস্থিত হইল। সক্রেটিস তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বন্ধুবর এই বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ, আমার কর্ত্তব্য সম্পর্কে দয়া করিয়া নির্দ্দেশ দিন।" কারাধ্যক্ষ উত্তর দিল—"বিষপানের পর আপনি বলিতে থাকিবেন এবং যখন দেখিবেন পা দুখানি ভারি হইয়াছে শুইয়া পড়িবেন। বিষক্রিয়া চলিতে থাকিবে।" কথা শেষ করিয়াই বিষপাত্র সক্রেটিসের হাতে তুলিয়া দিল। সক্রেটিস সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এবং নির্ব্বিকারভাবে উহা হাতে লইয়া বলিলেন "আমি এই পাত্র হইতে কিছু অংশ এক এক দেবতার নামে উৎসর্গ করিতে চাই ইহাতে আপনার কোন অমত আছে?" কারাধ্যক্ষ বলিল—"আমরা মাত্র একজনের জন্ম যাহা যথেষ্ট সেই পরিমাণ মাত্র প্রস্তুত করিয়াছি।" "হ্যাঁ বুঝিয়াছি" এই বলিয়া সক্রেটিস পাত্রটী ঠোঁটে ঠেকাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে সমস্ত বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। প্লেটো বলেন, আমরা যখন দেখিলাম তিনি পান করিতেছেন এবং বিষপান শেষ করিয়াছেন আর সহ্য করিতে পারিলাম না। আমাদের চোখে অঝোরে অশ্রু নামিয়া আসিল—এই সময় এপোলোডোরাস—সেও খুব কাঁদিতেছিল, দুঃখে ও শোকে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল এবং আমাদের সকলের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। সক্রেটিস্ সমস্ত সময়ই খুব স্থির ছিলেন। তিনি বলিলেন "এ অদ্ভুত ক্রন্দন কেন? স্ত্রীলোকেরা অভব্য ব্যবহার করে বলিয়া আমি তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলাম কারণ—পুরুষের শান্তিতে মৃত্যুবরণ করা উচিত। তোমরা শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর।" যখন আমরা কথা শুনিলাম তখন খুবই লজ্জিত হইলাম। অশ্রু সংবরণ করিলাম।

সক্রেটিস্ হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। যখন আর পা চলিতেছিল না তখন নির্দ্দেশমত চিৎ হইয়া শুইলেন। যে লোকটী তাঁহাকে বিষ দিয়াছিল সে দুটি পায়ের পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং উহাতে আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তাঁহার স্পর্শবোধ হইতেছে কিনা। সক্রেটিস্ বলিলেন—"না"। ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ পা ও উরুর উর্দ্ধভাগ এইভাবে পরীক্ষা করা হইল—ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ও অসাড় হইতেছিল! আমাদিগকেও উহা দেখান হইল। সক্রেটিস নিজেও তাহা অনুভব করিতেছিলেন এবং বলিলেন বিষের ক্রিয়া যখন হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিবে তখনই মৃত্যু। যখন উভয় পায়ের উপরের অংশ অসাড় হইয়া আসিয়াছে—সক্রেটিস মুখের আবরণ খুলিলেন (কারণ এতক্ষণ মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন) এবং শেষ কথা কয়টী বলিলেন—'ক্রিটো (Crito) আমি এসক্লিপিয়াসের (Asclepius) নিকট একটি মুরগী ধার করিয়াছিলাম, "তোমার পরিশোধের কথা মনে আছে" ক্রিটো উত্তর করিল—"এ দেনা শোধ করা হবে, আর কোন আদেশ থাকে বলুন," ইহার কোন জবাব আসিল না। সব শেষ হইয়াছে।

প্লেটো বলিতেছেন—'এইরূপে তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তি......বন্ধুর সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি আমাদের কালে যত লোক দেখিয়াছি এবং জানিয়াছি সক্রেটিস্ ছিলেন তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ এবং মানুষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্র-নাট্যে অভিব্যক্তিবাদ

অশোক সেন

ইউরোপীয় নাটকে অভিব্যক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা দেয় ১৯১০ সালে—এবং ১৯২৪ অবধি এই ধারায় নাট্য-রচনা চলতে থাকে। এরপর পশ্চিমের নাট্যকারেরা বুঝতে পারেন,—পৃথিবীর যে সোনালী ভবিষ্যতের ছবি তাঁরা একদিন কল্পনার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, যথাসময়ে তার রূপায়ন হোলো সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। এই ব্যর্থতার ফলেই তাদের আন্দোলন ভেঙে যায়। এ বিষয়ে ও-দেশী সমালোচকেরা লিখেছেন:

The hatred of war and the hope that after the war a new and better world would be built up became the central idea of Expressionism. The troubled time after the war involved the failure of their ideals and a breakdown of the movement was inevitable. That stabilisation of Europe along lines that did not correspond to their hopes brought the movement to an end about 1924. (Expressionism—By Samuel and Thomas)

রবীন্দ্রনাথের চারটী নাটক—অর্থাৎ মুক্তধারা [বৈশাখ ১৩২৯ (১৯২২) রক্তকরবী [১৩৩৩ (১৯২৬)]। রথের রশি [৩১, ভাদ্র, ১৩৩৯ (১৯৩২), তাসের দেশ [ভাদ্র, ১৩৪০ (১৯৩৩)]—সম্পূর্ণ expressionistic style-এ লেখা।

অবশ্য একথা ঠিক নয় যে, আগে থেকেই প্ল্যান করে নিয়ে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ধারায় নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা গতিতে, একটা নির্ধারিত পথ ধরে চলেছে। সহজ কথায় একে বলতে হয় collective activity displayed by writers and artists of the world.

জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেই আমাদের চোখে পড়বে যে, সাহিত্যে নানা ধরনের শ্রেণীগত এবং আন্দোলনগত বিভেদ সৃষ্টির দ্বারাই পণ্ডিতেরা জার্মান সাহিত্যের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় বিভেদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে storm & stress, Classicism Romoanticism, Young Germany, Natnralism, Impressionism, Neo-Romanticism প্রভৃতি শিল্পাদর্শের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ। বিবর্তনের দিক্ দিয়ে এর পরের যুগটাই হোলো expressionism বা অভিব্যক্তিবাদের যুগ।

১৯১০ সাল থেকে ১৯২৪ সাল, অর্থাৎ প্রায় পনের বছর অবধি এই নতুন আন্দোলনটি পুরোদমে চলছিল। এই কয়েকবছর ইউরোপে দারুণ দুর্যোগের সময় গেছে—মাঝে আবার ঘটে গেল সর্বনাশা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধের আগে থেকেই একজাতীয় চিন্তাশীল লেখক দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা তদানীন্তন মানুষের জীবনধারা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দেশের শাসনপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে একটা বিরাট অনাচার লক্ষ্য করে, এসবের ভেতরে একটা আমূল পরিবর্তন আনবার প্রয়োজনীয়তা মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন। অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের কাছে

'—its cult of the past, its mystic adoration of nature, its worship of the aedhetic personality, its dissection of the soul, its aristocratic approach to art'—R. Hinton Thomas Expressionism.

অভিব্যক্তিবাদীরা চাইলেন জীবনকে এবং সমস্ত জাগতিক সমস্যাকে সত্যের আলোকে ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে পূর্ণভাবে দেখতে। সৌন্দর্য্যকে জীবন থেকে আলাদা করে নিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টাটাই যে একটা অবাস্তবতা এবং এক ধরনের escapism, তাঁদের রচনায় এই সত্যের ওপরেই তাঁরা জোর দিতে লাগলেন। তাই বলে, তাঁরা কিন্তু বাস্তববাদী বা naturalists ছিলেন না। তাঁদের লেখার ভঙ্গিটা ছিল সাংকেতিক।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীর দল যেন আগে থেকেই অনুভব করেছিলেন যে, এক মহাসংকটের সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। সেই হিসাবে তাঁরাই যেন ইঙ্গিত দেন আসন্ন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে। স্বভাবতঃই—যুদ্ধের সময়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জীবনে এই শ্রেণীর লেখকদের প্রভাব খুববেশী ভাবেই পড়তে থাকে। যুদ্ধ নারকীয় ব্যাপার এবং তা সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয়; যুদ্ধের শেষে পৃথিবী আবার নতুনভাবে, সুন্দরতর ভাবে গড়ে উঠবে—এই ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁদের ঘোষণা। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যুদ্ধ যখন শেষ হোলো, তখন দেখা গেল যে অভিব্যক্তিবাদীদের নির্দ্ধারিত আদর্শ পথে পৃথিবী মোটেই এগিয়ে চলছে না। ফলে, তাঁদের আন্দোলনটা আপনা থেকেই ভাঙতে শুরু করে—এবং ১৯২৪ সালে সে-আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে যায়।

কিন্তু পরিসমাপ্তি ঘটলেও যে ভাবধারার মূলে রয়েছে সত্য, তা কখনো সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হতে পারেনা। তাই আজও ইউরোপে 'ওয়েটিং ফর গোডো' এবং লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গার'-এর মতো নাটক দিনের পর দিন মঞ্চস্থ হয়ে লোকের চিন্তার খোরাক যোগাচ্ছে এবং আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' 'মুক্তধারা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি নাটকের জনপ্রিয়তাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

যাক্—আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক্। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে মানুষ যেন যান্ত্রিক সভ্যতার পাকা গাঁথুনী গড়ে তুলতে গিয়ে, ধর্ম, ব্যক্তিসত্তা, হৃদয়, আত্মা সবকিছুকেই বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেকে করে ফেলেছিল কলে-তৈরী পুতুলের মতন। এই সব পুতুল-মানুষদের বর্ণনা দিতে গিয়ে T.S. Eliot লিখেছিলেন:

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaving together
Headpiece filled with straw! alas!
Our dried voices, when
We whisper together
are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In dry cellar… ইত্যাদি

চেক নাট্যকার চাপেক, জার্মান নাট্যকার কাইজার, টোলার ও হাসেন ক্লেভার তাঁদের কয়েকটি বিখ্যাত নাটক লিখেছেন expressionistic style-এ। আমেরিকান নাট্যকারদের মধ্যে ও'নিল তাঁর The Henry ape-এ, সোফি ট্রেডওয়েলএর machinal-এ, জন হাওয়ার্ড লসন্ Roger Bloomer ও processional-এ এবং এল্মার রাইস্ The adding Machiner আর The subway নাটকে অভিব্যক্তিবাদী রচনা-কৌশলেরই আশ্রয় নিয়েছেন।

সাধারণতঃ এ ধরনের নাটকে পাত্র-পাত্রীরা হয় যন্ত্রযুগের মানুষ। নাট্যকার তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে এই সব মানুষের ভেতরকার আসল চেহারাটা সবার

সামনে তুলে ধরেন। আজকের সমাজ ও রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার কথাটাও তাঁরা ইঙ্গিতে ইসারাতে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন পাঠক এবং দর্শকদের কাছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই চাপেকের R.U.R. কাইজারের Gas, রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা, রক্তকরবী, রথের রশি এবং তাসের দেশ নাটকের কথা বিচার করে দেখা দরকার। রক্তকরবীতে ভাবের বাহক হিসেবেই সংকেতের ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে লেখার ধারাটা expressionistic—Symbolistic নয়।

অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী জীবনের প্রতিলিপিকার নন, তিনি হচ্ছেন জীবনের ভাষ্যকার। অর্থাৎ চিরাচরিত নিয়মে কাহিনীর ওপর প্রাধান্ত দিয়ে তিনি নাট্য রচনা করেন না বা ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা দেওয়াটাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। চরিত্র বা ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরাটাই হোল তাঁর আসল উদ্দেশ্য।

মুক্তধারা নাটকে দেখি, যন্ত্ররাজ বিভূতি যন্ত্রের বিকৃত ব্যবহারে শুধু শিবতরাইয়ের সর্বনাশের কারণ ঘটান নি—এই যন্ত্র তৈরী করতে গিয়ে উত্তরকূটের প্রজাদেরও বহু দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছে—এমনকি অনেককে প্রাণ পর্যন্ত বলি দিতে হয়েছে। এই সব অত্যাচারের স্বরূপটিকে দুটি ছোট সংকেতের সাহায্যে কবি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে ধরেছেন—অম্বার বুককাটা ক্রন্দনধ্বনি—'সুমন, আমার সুমন……'এবং বটুকের সাবধান-বাণী 'সাবধান বাবা, যেওনা ওপারে ……বলি দেবে……নরবলি। এই রকম কৌশলপূর্ণ' সংকেতের ব্যবহার দেখেছি—একমাত্র ইউরিপিডিসের The trojan women নাটকে। যুদ্ধে যে নিষ্ঠুর বাস্তবতার দিকটা হোমার তাঁর মহাকাব্যে বিস্তৃতভাবে সংগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন, ইউরিপিডিস তাকেই আশ্চর্য্য কলাকৌশলে ছোট্ট একটি দিবসের ভেতর দিয়ে রূপায়িত করেছেন—'একটি বিষাদময়ী একাকিনী নারীমূর্তি এবং তার বক্ষলগ্ন মৃত শিশুর ছিবে' 'in the lonely figure of a pitiful old woman, sitting on the ground with a dead child in her arms'। মুক্তধারা নাটকটি পড়তে গিয়ে আমার বারবার Shakespeare এর measure for measure-এর নিচের এই লাইনগুলি মনে পড়ে:

> '…drest in a little brief authority,
> most ignorant of what he is most assured,
> His glassy essence—like an angry ape
> Plays such fantastic tricks before high
> heaven
> as make the angles weep.'

অভিব্যক্তিবাদের সংজ্ঞা :দিতে গিয়ে এল্মার রাইস বলেছেন—

'Expressionism attempts to go beyond mere representation and to arrive at interpretation. The author attempts not so much to depict events faithfully as to convey to the spectator what seems to be their inner significance. To achieve this end, the dramatist often finds it expedient to depart entirely from objective reality and to employ symbols, condensations and a dozen devices which to the conservative must seem arbitrarily fantastic.'

সাহিত্য, সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কলাশিল্প প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই অভিব্যক্তিবাদের ব্যবহার হয়েছে। শিল্পের যে কোন বিভাগেই মানুষ যখন সৃষ্টির উদ্দাম প্রেরণায় নিবিড়ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়েছে, তখনই তাকে এই expressionistic style এর সাহায্য নিতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিও এই জাতের। কবি নিজে তাঁর ছবি সম্বন্ধে বলেছেন:

People ask me about the meaning of my pictures. I remain silent, even as my pictures are. It is for them to express and not to explain.'

আগেই বলা হয়েছে—ক্যামেরাতে যেভাবে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিলিপি উৎপাদন করা হয়, তাকে আর্ট বলে না। শিল্পী তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রকৃতিকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলেন, তাকেই বলা হয় শিল্প। এ বিষয় Herbert Read লিখে গেছেন :

But it should always be remembered that the appeal of art is not to conscious perception at all, but to intuitive apprehension. A work of art is not present in thought, but in feeling, it is symbol rather than a direct statement of truth.

প্রথম এই অভিব্যক্তিবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন ফরাসী চিত্রশিল্পী Julienn auguste Hervie। ১৯০১ সালে তিনি প্যারিসে Salon De Independant এ Expressionismes' এই নাম দিয়ে আটটি ছবির প্রদর্শনী করেন। তখন থেকেই এ কথার প্রয়োগ ঘটেছে। তবে সাধারণো এই শব্দটির প্রচলন হয় অবশ্য আরো অনেক পরে।

ললিতকলার ক্ষেত্রে প্রথম এ শব্দটির প্রচলন শুরু করেন Withelm worringer। ইঁ'র পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় তাঁর Young Parisian Synthetists and Ezpressionists, Cezanne, Vangogh, Matisse, নামে এক প্রবন্ধ বের হয়। সাহিত্যে কিন্তু এ শব্দের ব্যবহার শুরু হয় আরো অনেক পরে, —১৯১৪ সালে। Kasimir Edschmid-এর মতে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর কয়েকটি গল্প 'Die Sechs Mundengen' প্রকাশিত হয় এবং সমালোচকেরা সে-সব গল্প expressonistic Style-এ লেখা বলে তাঁকে অভিনন্দন জানান। এ সম্বন্ধে তিনি একথাও বলেছেন যে, তখন পর্যন্ত তাঁর নিজের expressionism সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না।

আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার—কথাশিল্পে এবং চিত্রকলায় অভিব্যক্তিবাদ যে 'expressionism) ভাবাভিব্যক্তিবাদে (Impressionism) বিরুদ্ধ টাইপ—সে হিসেবেও খানিকটা রুক্ত প্রচার পায়।

আগেই বলা হয়েছে যে অভিব্যক্তিবাদীরা ফোটোগ্রাফারের কাজ করেন না, তাঁরা হচ্ছেন সত্যিকার স্রষ্টা। ভাবরাজ্যে যা চিরন্তন, তাই নিয়েই তাঁদের চিরকালের কারবার। ক্ষণিক সম্বন্ধে সময় নষ্ট করবার মতন বাড়তি সময় বা উৎসাহ তাঁদের নেই। আবার দীর্ঘ সময় নিয়ে, অথবা সুদীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা কোনো জিনিসকে বোঝাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টাও তাঁরা করেন না। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের এবং অনুভূতির সাহায্যেই তাঁরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টিকে সার্থক এবং প্রাণবন্ত করে তোলেন। জীবনের অথবা প্রকৃতির প্রতি-লিপিকার তাঁর নন। তাঁরা হচ্ছেন মনেপ্রাণে শিল্পী এবং মনে-প্রাণে স্রষ্টা। এই আলোতে মুক্তধারা এবং রক্তকরবী নাটক দুটি পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সাহিত্য আর সুনাট্য হিসেবে নাটক দুটির স্থান কত উচ্চে। প্রত্যেকটি চরিত্র প্রাণবন্ত এবং সার্থক। সে-হিসেবে 'তাসের দেশ' নাটকটি কিন্তু ততোটা সার্থক নয়। তার কারণ এ নাটকে অভিব্যক্তিবাদকে ছাপিয়ে উঠেছে তত্ত্বের বিরাট বোঝা।

ভাবাভিব্যক্তিবাদীদের প্রধান চেষ্টা হোলো কোন বস্তু বা ঘটনার যে ধারণা বা impression তাঁদের মনের পর্দায় ধরা দিয়েছে। তারই একটা সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদী শিল্পী চেষ্টা করেন ঐ বস্তু বা ঘটনার অন্তর্লীন স্বরূপকে সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করতে। এ বিষয়ে Kasimir Edschmid বলেছেন—

'A house no longer merely a subject for an artist, consisting of stone, ugly or beautiful;

it has to be looked at until its true from has been recognised, until it is liberated form the muffled restraint of a false reality, until everything that is latent in it is expressed.'

মানুষ সম্বন্ধেও তাই—অসংবদ্ধ বাহ্যিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার না করে, তার আসল মনুষ্যত্বের যাচাই করাটাই অভিব্যক্তিবাদীর কাজ।

'Everything else is 'facade', showing a 'bourgeois' attitude that is to be destroyed with its superficial judgements of right or wrong. Once the bourgeois mask is torn away, the link with eternity given to every human being will be revealed.' (Samuel & Thomas

'রক্তকরবী' নাটকে অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, অতিরিক্ত বস্তুতন্ত্রবাদ কীভাবে মানুষকে আলোর জগৎ থেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা সহজ, যা সুন্দর, যা প্রাণময়, যে সবকে ত্যাগ করে মানুষ মৃত এবং জড়বস্তুর সাধনায় মেতে উঠেছে। মিথ্যা মরীচিকার ভুলে সে যেন ক্রমাগত অন্ধকারের ভেতরই চলে যাচ্ছে। 'রক্তকরবীর' রাজা এক জায়গায় বলেছেন, 'আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয়না, শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌছল না।' এখানে অভিব্যক্তিবাদী রীতিতে আধুনিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ধনতন্ত্র পরিচালিত যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ যে শক্তি অর্জ্জন করতে ব্যস্ত, সেই শক্তিই বোঝা হয়ে ক্রমাগত তাকে পিষে ফেলছে।

বিশুর একটি সংলাপে আছে—'যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরেও অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্ব্বনেশে। অর্থাৎ কবি ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন যে, যান্ত্রিক যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মানুষের সৌন্দর্য অনুভূতির ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যায় এবং যান্ত্রিক মানুষ সব কিছুরই মূল্য ঠিক করে বাস্তব উপযোগিতা অনুসারে।

'রক্তকরবী' নাটকে তদানীন্তন রাষ্ট্র-শাসনের বিকৃত রূপটাও অতি সুস্পষ্টভাবে কবি উদ্ঘাটিত করেছেন। বিশেষতঃ পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির পাশবিক শাসনের নারকীয় স্বরূপটি আভাসে-ইঙ্গিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। ব্যুরোক্রেসিতে যেমন হয়ে থাকে, অর্থাৎ শাসকদের নানা পর্যায় আছে। সবার উপরে রাজা—তারপর ক্রমে ক্রমে বড়, মেজ, ছোটো সর্দ্দার! এর তলায় আছে মোড়ল, গুপ্তচর প্রভৃতি—আছে প্রচারের ব্যবস্থা।

রথের রশি নাটকটিও অভিব্যক্তিবাদী ষ্টাইলে লেখা। কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের বিবর্তিত রূপের একটা চমৎকার ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এই নাটকে।

নাটকটির মূল বক্তব্য হোলো—কালের রথ অচল হয়েছে। কারণ কালের সঙ্গে তাল রেখে জীবন আর এগিয়ে যেতে পারছে না। যারা এতকাল এই রথ চালাচ্ছিল, তারা বিকৃতভাবে কালের ব্যবহার করেছে বলেই কালের অগ্রগতিতে বাধা পড়েছে—জীবনের সংগীতে ছন্দপতন ঘটেছে। শূদ্রের দলকে অপাংক্তেয় করে রাখবার ফলেই ঘটেছে এই মহা সর্ব্বনাশ। সেইজন্যেই যেই শূদ্রেরা এসে রথের রশিতে হাত দিল, অমনি ঘটল বিকৃত অবস্থার অবসান এবং মহাকালের রথ পুনরায় সচল হোলো।

কিন্ত এইখানেই কি কালের যাত্রার শেষ সমাধান? এই নাটকের কবি উত্তর দেন—'তারপরে কোন্ এক যুগে কোন এক দিন আসবে উল্টোরথের পালা। তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।'

পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রথের রশির মতন সত্যিকার প্রগতিবাদী নাটক খুব কমই দেখা যায়।

তাসের দেশ নাটকটিও এই একই ধরনে লেখা। জর্জ কাইজারের Gas-এর মতন এ নাটকে চরিত্রগুলিও নামহীন এবং অবাস্তব। নাটকের ঘটনাবলীও অবাস্তব। এই প্রসঙ্গে অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে সমালোচক Richard Samuel এর মন্তব্য পুনরায় প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—

'The expressionist dramatist is not concerned with depicting life as its reveals itself to his senses. He is not 'interested' in veresimilitude. He exaggerates and generalises in order to convey his 'idea'. He defines the stage as a magnifying glass.'

'তাসের দেশ' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে ইসারায় যেন আমাদের সনাতনপন্থী, নির্জীব, অলস, বিশেষত্বহীন, পরিবর্ত্তন-পরাঙ্মুখ ভারতবর্ষেরই ছবি দেখিয়েছেন। আবার এই একই বক্তব্য বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন' প্রভৃতি নাটকে এবং তাঁর নানা কবিতায়—অভিব্যক্তিবাদী ভঙ্গিতে।

কাঁথা

রেবা ভবানী

কেবল মাত্র শিল্পের খাতিরে যে শিল্পের সৃষ্টি তার প্রধান উদ্দেশ্য রূপ-সৃজন কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে যেখানে শিল্পের বিকাশ সেখানে প্রথম কথা উপযোগিতা। সেই আদিমকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যত শিল্পের উৎপত্তি-উৎক্রান্তি ঘটেছে তার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নিছক রূপ-সৃষ্টির প্রয়োজনে খুব স্বল্প সংখ্যক শিল্পের জন্ম হয়েছে। শিল্প-সৃষ্টির মূল প্রেরণা এসেছে প্রয়োজনবোধের উৎস থেকে। সুতরাং শিল্প-সৃষ্টির প্রাথমিক পর্য্যায়ে প্রয়োজন এবং ·উপযোগিতাই যে মৌলিক সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের মন যেহেতু স্বভাবতই সৌন্দর্য্য-অনুরাগী সেহেতু সৃষ্টির প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সৃজনী-প্রতিভা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। প্রয়োজনকে ছাড়িয়া তা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ্বের দিকে ঝুঁকিয়ে এবং তারই পরিণতি স্বরূপ বিকাশ লাভ করেছে অলঙ্করণ-শিল্প—নিছক প্রয়োজনের বৃন্তে বর্ণসুষমাময় পাপড়ি।

বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন শিল্প কাঁথা-শিল্প এই সত্যেরই দ্যোতনা করছে। সাধারণ ভাবে মনে হয় হিমরাত্রির তীব্র শিশির-শীতলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো জুড়ে জুড়ে বড় বড় সেলায়ের ফোঁড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল প্রথম কাঁথা। তাতে রং বা সেলায়ের তেমন জলুস ছিল না। আর সে দিকে কেউ তেমন মাথাও ঘামাতো না। কেন না প্রয়োজন পরিতৃপ্তিই ছিল তখন বড় কথা। তারপরে প্রয়োজনের দিকটা যখন ক্রমশঃ মন্থর জীবনের অলস মুহূর্ত্তগুলির রঙিন কল্পনা রূপ হয়ে ফুটে উঠেছে কাঁথার ছেঁড়া কাপড়ে। স্থূল প্রয়োজন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে শিল্পের স্তরে।

আমাদের সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে যে সমস্ত কাঁথা অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যার ব্যবহার আছে সেগুলির একটি তুলনা-মূলক আলোচনা করলে মনে হয় যে কাঁথাশিল্প বিকাশের ইতিহাসে দুটি স্তর আছে। নক্সা-পূর্ব্ব স্তর এবং নক্সার স্তর। একদা বাংলাদেশে বিশেষ করে পূর্ব্ব-বাংলায় নক্সা-কাঁথা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিল এবং শিল্প-রসিক উচুদরের চারুশিল্প হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু চর্চ্চার অভাবে সাম্প্রতিক কালে এই শিল্পটির তেমন প্রচলন নেই। অবস্থা দৃষ্টে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, কাঁথাশিল্প চারুশিল্পের সম্মান হারিয়ে পুনরায় গোড়াকার পর্য্যায়ে অর্থাৎ উপযোগের স্তরে নেমে গেছে। বস্তুতঃ যে মানসভূমিকে আশ্রয় করে কাঁথা একদিন শিল্পের স্তরে উন্নীত হয়েছিল বর্ত্তমানে দ্রুত চলমান জগতের স্পর্শে তা' বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে ফোঁড়ের পর ফোঁড় তুলে নক্সা-বিন্যাসের জন্যে যে উদ্বেগহীন স্বচ্ছন্দ অবকাশ দরকার তা আজ নিতান্তই দুর্লভ। তাই শিল্প-হিসাবে কাঁথা রচনারও আজ অতীতের বস্তু।

কাঁথা তৈরীর উপকরণ খুবই সামান্য। পরিত্যক্ত ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো আর ফেলে দেওয়া রঙিন পাড়ের সুতো;—একখানা কাঁথা পাতার জন্যে এই-ই যথেষ্ট। বস্তুতঃ এই সামান্য মাত্র উপাদান সম্বল

লাল, সাদা, কালো, নীল, হলুদ, সবুজ এই কটা রঙ ব্যবহার করা হয় কাঁথা সেলায়ের জন্যে। কিন্তু এই কটা রঙই শিল্পীর বিন্যাস-নৈপুণ্যে ঝলমল করতে থাকে কাঁথার কাপড়ে। বস্তুতঃ রঙের যথাযথ বিন্যাস ও নক্সামাফিক বিশেষ সেলাই রীতির ব্যবহার দ্বারা যে শিল্প সৃষ্টি হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই কাশ্মীরি সূচি-শিল্পকেও লজ্জা দেয় এবং চারুতার সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে কোন অভিজাত শ্রেণীর সূচিশিল্পের সমপর্য্যায়ে স্থান লাভের যোগ্যতা রাখে।

কাঁথা-শিল্প একান্ত ভাবেই মেয়েলি শিল্প। পুরুষের সহযোগিতা ছাড়াই এই শিল্প সম্পূর্ণ। নারীজীবনের আশা-আকাঙ্খা কামনা-বাসনায় ঘেরা যে জগৎ তারই বিচিত্র প্রকাশ হয়েছে কাঁথার নক্সায়-নক্সায়। কল্যাণ এবং প্রাচুর্য্য নারীজীবনের প্রথম কামনা। সেই কামনাকে সফল করবার জন্যই ব্রত অনুষ্ঠান। ব্রত অনুষ্ঠানগুলিতে যে সমস্ত আলপনা আঁকা হয় যেমন ধান-ছড়া, গাছ, কড়ি, অলঙ্কার, প্রসাধনের বিভিন্ন উপকরণ ইত্যাদি তারই অনুবৃত্তি দেখা যায় কাঁথার নক্সায়। কাঁথাকে তাই গোপন কামনার সোচ্চার শিল্প বলা যায়। কিন্তু এই শিল্পের অভিব্যক্তিতে কোথাও লোভের স্পর্শ নেই। দূরাগত শঙ্খের মৃদু ধ্বনিটুকুই কেবল শোনা যায় এখানে। তাই নক্সাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ভাবালু তন্ময়তার সৃষ্টি হয়। দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে সেই প্রাচীন মহিলা-গোষ্ঠীর ভাবনা-কামনার জগতের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায়। তবে এ'জাতের নক্সা ছাড়াও আরো অন্যান্য নানা রকমের নক্সা সেলাই করা হয় কাঁথায়। দৃশ্য-জগতের সীমানা ছাড়িয়ে রূপকথা আর উপকথার যে রাজ্য আছে সেই রাজ্যের বিচিত্র সব বাসিন্দাদের মাঝে মাঝে ভীড় করতে দেখা যায় কাঁথার বিস্তৃত ভূমিতে। কত বিচিত্র মুখেরই না সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই সব নক্সার ভীড়ে যাদের অস্তিত্ব

জগতের কোথাও নেই। মানুষের অদ্ভুত, উদ্ভট কল্পনার ছাড়া। সন্ধ্যার স্বপ্নালোকিত ঘরের কোনায় বসে বসে যে অচীনপুরের কাহিনী ঠাকুরমা বলে যান ছোট্ট নাতিটিকে গৃহকর্মের অবকাশে স্তব্ধ দুপুরে তারাই যেন আপনার অজ্ঞাতসারে কখন সজীব হয়ে ওঠে তার মনের মধ্যে তারপর মানসপুরের সব আবরণ-অবরোধ সরিয়ে ফেলে ছড়িয়ে যায় কাঁথায় কাঁথায়।

কোন প্রখিতযশা শিল্পতত্ত্বজ্ঞ কাঁথা রচনা পরিকল্পনায় মধ্যে নারীমনের আরো একটি দিগন্তের সন্ধান পেয়েছেন। সে দিগন্ত দার্শনিক চিন্তার আলোয় উদ্ভাসিত। অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের ধ্যান ভারতীয় দর্শনের একটি বড় কথা। কাঁথা পাতা থেকে কাঁথার অঙ্গ সজ্জা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সেই দার্শনিক মনোভঙ্গীর প্রকাশ। যে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো লোকে সাধারণতঃ অবজ্ঞাভরে ফেলে দেয় বাংলা দেশের মেয়ে তাকেই অনলস অধ্যবসায়ে শিল্পীর দক্ষতায় জুড়ে জুড়ে গড়ে তোলে ছিন্ন খণ্ডের মধ্য থেকে অখণ্ড একটি বস্তু। বস্তুতঃ সর্ব্ব খণ্ডতার মধ্যে থেকেও অখণ্ডতাই যে বিশ্বতত্ত্বের মূল-কথা তারই অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় কাঁথায়। জীর্ণতাই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, একদেহ যখন শেষ হয়ে যায় তখনই নতুন আর একটি দেহের সৃষ্টিসম্ভাবনা দেখা দেয়; জন্মলাভ করে আর একটি প্রাণ, কেবল আধারটা যায় বদলে। প্রাণের তো শেষ নেই, কেবল রূপান্তর আছে মাত্র। বস্তুতঃ এই অনুভব যে বাঙালী মনে কত গভীর এবং নিবিড় তারই নিদর্শন এই কাঁথা। কাঁথা শিল্পীর জীবনরসের চেতনায় পুষ্ট একটি শিল্প কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে এটি একটি প্রায় লুপ্ত শিল্প। ব্যস্ততা আর যান্ত্রিকতার যুগে এর পুনরুজ্জীবন বোধহয় আর কোনদিনই সম্ভব নয়।

মানভূমের ইতিহাস

ভাগবতদাস বরাট

প্রাচীনদের কথা নয়, প্রাচীনকালের কথা। মানভূম ছিল বাংলারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেহের সঙ্গে হাত পায়ের আত্মীয়তার মত বাংলার সঙ্গে মানভূম জড়িত ছিল। গুপ্ত বংশের আমল হতে বৃটিশ আমল পর্য্যন্ত ইতিহাসের পাতা কয়টা যদি কেউ পর্য্যালোচনা করে, তা হলে সে স্পষ্টই জানতে পারবে যে মানভূম বাংলারই অবিচ্ছেদ্য ভূ-ভাগ। যেমন একই পল্লীর দু'টি পাড়া। মুচি পাড়া আর বামুন পাড়া। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পরস্পর পৃথক হয়ে থাকলেও পল্লীর পূজা পার্ব্বণ ও উৎসবাদিতে দু'পাড়ার লোকই যোগ দেয়; সেইরূপ মানভূমও স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় ঐক্যের ধারা বহন করে চলেছে। মানভূমের পূজা পার্ব্বণ ও উৎসবাদির কথা আলোচনা করলে মনে হবে যেন বাংলার কথাই বলছি। মানভূমের ইতিহাস বাংলার ইতিহাসেরই এক অধ্যায়।

দামোদর ও সুবর্ণরেখাবেষ্টিত এবং কংশাবতী-বিধৌত মানভূমের অরণ্য ও পর্ব্বতসঙ্কুল প্রকৃতি। ভূমি রুক্ষ ও কর্কশ। কিন্তু অন্তস্থলে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বাংলার সংস্কৃতি ধারা প্রবাহিত। বাংলার কীর্ত্তন ও বাউল গান মানভূমের গ্রামে গ্রামে। কথ্য ভাষার মধ্যেও বাংলা শব্দের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য। তাই মনে হয় মানভূমের প্রাচীন বাংলা পুঁথির পাঠোদ্ধার ও পুরাতত্ত্বের নিদর্শনাদির অনুসন্ধান এবং বিচার বিশ্লেষণ করলে অনেক লুপ্ত বিষয়ের সন্ধান মিলবে।

গুপ্ত যুগে বাংলা দেশ কয়েকটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। মানভূম ছিল সেই ভুক্তির মধ্যে বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত। সমগ্র দামোদর উপত্যকাকে অন্তর্ভুক্ত করে এই বর্দ্ধমানভুক্তি উত্তরে ময়ূরাক্ষী হতে দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এরপর পালবংশের আমলে বাংলার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রসার দেখা যায়। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিকতায় রূপান্তরিত হয়। বাংলার সমাজ-জীবনে বিপর্য্যয় ঘনিয়ে ওঠে। সমাজে ভাঙ্গন ধরে। দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে সেন-বংশের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান। মানভূমের ইতিহাসেও আমরা ঠিক এই ঘটনাই ঘটতে দেখি। বাংলা দেশের মত মানভূমেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের আড়ালে আত্মগোপন করে। বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তি এবং মন্দিরাদি হিন্দুর দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদিতে রূপান্তরিত হয়।

পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলা দেশ বরেন্দ্রী, বঙ্গ, পুন্ড্র, রাঢ় প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। জৈন শাস্ত্র আচারঙ্গ সূত্রেও আমরা রাঢ় দেশের উল্লেখ দেখি। এই রাঢ় দেশের বজ্রভূমিতে ধর্ম্ম প্রচারার্থে স্বয়ং মহাবীর ও অন্যান্য তীর্থঙ্করেরা এসে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে সে যুগে মানভূম এই বজ্রভূমির অন্তর্গত ছিল। অধুনা কালের ভূমিজগণ ঐ বজ্রভূমরই অধিবাসীদের বংশধর।

পাঠান যুগে অর্থাৎ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গ আক্রমণের সময়েও রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি বাংলার জনপদ সমূহের উল্লেখ দেখা যায়।

আকবরের রাজত্বকালে বাংলা দেশ পুর্ণিয়া, মদারুণ প্রভৃতি উনিশটি সরকার বা সুবায় বিভক্ত ছিল। এই মদারুণ সরকারের অন্তর্ভুক্ত মহলগুলির নাম ছিল ধবলভূম, সিংভূম, শিখরভূম প্রভৃতি। সাঁওতালীতে পঞ্চকোটের অন্যতম নাম শিখরভূম। বাংলার বাগড়ী, পানিহাটী, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি মহলের সঙ্গে এগুলি জড়িত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

পঞ্চকোট দুর্গের কাল নির্ণয় সূত্রে মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে জানা যায় যে উক্ত দুর্গের দুটি তোরণ "দুয়ার বাঁধ" ও "খড়িবাড়ীর" শীলালিপিতে বাংলা হরফে শ্রীবীর হামির ও ১৬৫৭ সম্বৎ অর্থাৎ ১৬০০ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ আছে। বীর হামির অর্থে বিষ্ণুপুর রাজ বীর হাম্বিরকেই যে উদ্দেশ করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৃটিশ আমলেও মানভূম বাংলারই অংশ ছিল। গ্র্যান্টের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, পাচেট বাংলার পশ্চিম প্রান্তের অংশ ছিল। এই অংশ সুবা বিহারের চুটিয়া নাগপুর (রাঁচী জেলা) ও রামগড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

১৮০৫ সালের ১৮ নং রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হয় এবং মানভূমকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৩৩ সালের ১৩নং রেগুলেশন অনুযায়ী উক্ত জঙ্গল মহল জেলাকে ভেঙ্গে সাউথ ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী গঠন করা হয়। ঐ রেগুলেশন অনুসারে মানভূম একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিচিত হয় এবং মানবাজারে জেলার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। এই নূতন মানভূম জেলা বাঁকুড়া জেলার সুপুর, রাইপুর, অম্বিকানগর, সিমলাপাল, বেলডিয়া, ফুলকুশমা, শ্যামসুন্দরপুর প্রভৃতি; মেদিনীপুর জেলার ধলভূম পরগণা; বর্দ্ধমান জেলার শেরগড় পরগণা এবং বর্ত্তমান মানভূমের এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। তারপর ১৮৩৮ সালে মানভূম জেলার প্রধান কার্য্যালয় মানবাজার হতে পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৪৬ সালে ধলভূম পরগণা মানভূম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিংভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। ঐ সালে চৌরাশী, চেলিয়ামা, মালিচন্দ, বনখণ্ডী, বড়পাড়া, পাড়া, বনচাষ প্রভৃতি মানভূমের অঞ্চলগুলির শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য ফৌজদারী বিচারব্যবস্থা বাঁকুড়ার অধীন করা হয়। তা ছাড়াও মানভূমের ছাতনা, গৌরাঙী, চাষ ও পাচেটের শাসনসংক্রান্ত অনেক বিষয় বাঁকুড়ার অধীন ছিল।

১৮৫৪ সালের ২০ নং রেগুলেশন অনুযায়ী ছোটনাগপুর বিভাগের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চল বাংলার লেফটনেন্ট গভর্ণরের অধীনে থাকে। এই রেগুলেশন অনুযায়ী ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী ভেঙ্গে যায়। মানভূম ছোটনাগপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭১ সালে মানভূমের ফৌজদারী আদালত পুরুলিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। সেই সময় শেরগড় ও পাড়রা পরগণার কিয়দংশ বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭৯ সালে, সুপুর, রাইপুর, অম্বিকানগর প্রভৃতি বাঁকুড়ার অংশগুলি মানভূম হতে পুনরায় বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত মানভূমের দেওয়ানী বিচার ও আপীল সম্পর্কের কার্য্যাদি বাঁকুড়ায় দায়রা ও জেলা-জজের অধীন ছিল। ১৯১০ সালে মানভূম, সিংভূম ও সম্বলপুর নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জেলা জজের আদালত পুরুলিয়ায় স্থাপিত হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশকে দু'ভাগে ভাগ করবার কার্জ্জনী পরিকল্পনা বাতিল হয়। কিন্তু তার জের স্বরূপ ১৯১১ সালে বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের সুবিধানুযায়ী এবং বিশেষভাবে প্রতিশোধস্বরূপ পুরাতন বাংলা দেশকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। ফলে আসাম, বাংলা, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা—এই প্রদেশগুলি গঠিত হয়। নামের সংক্ষেপ মানসে শেষোক্ত প্রদেশটিকে বিহার ও উড়িষ্যা বলা হত।

পুরাতন বাংলা দেশকে টুকরো টুকরো করে এই নূতন প্রদেশগুলি গঠন করার ফলে মানভূম, ধলভূম, দুমকা, জামতাড়া, কিষাণগঞ্জ প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ এবং কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল নূতন আসাম প্রদেশে যুক্ত হয়। বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে অন্যায়ভাবে বাংলা দেশ হতে বিচ্ছিন্ন করায় বাংলা দেশে ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিতে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। ফলে ১৯১২ সালে দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ অদূর ভবিষ্যতে বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলায় ফিরিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দেন। মানভূমের জনসাধারণও সেই সময় ইংরাজ রাজত্বের আমলে এ বিষয় নিয়ে বহু আন্দোলন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস সরকারও ভাষাভিত্তিক নীতি অনুযায়ী প্রদেশ বণ্টনের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু দেশের নানাবিধ গোলযোগ ও সমস্যার চাপে কংগ্রেসসরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে দেরী করেন। ফলে গণআন্দোলন দেখা দেয়। কংগ্রেসসরকার তখন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

গ্রন্থ-পরিচয়

চার্লি চ্যাপলিন : অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১৩। মূল্য তিন টাকা। চার্লি চ্যাপলিনের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। অতি দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া যাঁর প্রথম জীবন কাটিয়াছে, তিনি যে একদিন এতবড় যশের অধিকারী হইবেন এবং কুবেরের ঐশ্বর্য লাভ করিবেন ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া ভাগ্যই সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। তবে একথা সত্য, তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া বড় হইতে হইয়াছে। এতবড় জীবনী ইতিহাস-দুর্লভ। লেখক অতিসুন্দর ভাবে গল্পছলে চার্লির জীবন-কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সিনেমার ছবিতে যে-চার্লির ছবি আমরা দেখিতে পাই, সেটাই কিন্তু আসল মানুষ নয়। লোক হাসাইবার জন্য ইহা তাঁহাকে সাজিতে হইয়াছে। ইহারও একটি ইতিহাস আছে—গ্রন্থকার তাহা বলিয়াছেন। এক সাংবাদিকের ভূমিকা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। চিত্র-পরিচালক বলিয়াছেন, তাঁহাকে লোক হাসাইতে হইবে—সেই রকম মেক-আপ নাও। "কি রকম সাজ করবেন তা প্রথমটা ভেবে পেলেন না চার্লি। তারপর তাঁর মাথায় একটা দারুণ পরিকল্পনা এল। পোষাক এবং মেক-আপ-এর মধ্যে সব কিছুতেই একটা বিপরীত ভাব ফুটে উঠুক, সিদ্ধান্ত করলেন তিনি। প্যাণ্টলুনটা হোক ঢলঢলে। জুতো দুটো হোক পায়ের চেয়ে বড়। কোটটা খুব টাইট হোক আর মাথার চেয়ে টুপিটা হোক ছোট। গোঁফটাও হোক বাটার ফ্লাই। তাতে বয়সও বেশী দেখাবে আর ভাব প্রকাশেরও অসুবিধা হবে না।

তাঁর পাশের ঘরেই থাকতেন প্রকাণ্ড জোয়ান স্থূলকায় অভিনেতা ফ্যাটি আর্বাকল। ফ্যাটির কাছ থেকে তাঁর মস্ত বড় ট্রাউজারটা চেয়ে নিলেন চার্লি। একটা আঁটসাঁট জ্যাকেট জোগাড় করলেন। আগে ছিল টপহ্যাট। বদলে সেটাকে করে নিলেন বোলার হ্যাট; গলায় বাঁধলেন লম্বা টাই। এক লম্বা চওড়া অভিনেতার বিরাট জুতো জোড়া চেয়ে নিলেন। বাঁ পাটি উঠলো ডান পায়ে, ডান পাটি বাঁয়ে। মুখে লাগালেন এক জোড়া বেঁটে গোঁফ। হাতে নিলেন ছোট একটি ছড়ি।"

এই বিচিত্র-পোষাক পরিহিত চার্লিকেই আমরা জানি। সেদিনকার তাঁর সেই বিচিত্র মেক-আপ দেখে কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, সেই জুতো, সেই টুপি, সেই গোঁফ, আর সেই ছড়িটি একদিন চার্লি-চরিত্রের প্রতীক হয়ে উঠবে?

আশ্চর্য, তাঁহাকে অন্য পোষাকে আর কেহ দেখিতেই চাহিল না! তাঁর চরিত্রে আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, অর্থের প্রাচুর্য চার্লির জীবনধারায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। অর্থাৎ তিনি যেমন ছিলেন তেমনই রহিয়া গেলেন।

জীবনে তিনি অনেক নারীর সংস্পর্শে আসিয়াছেন, ইহাকে তিনি দোষ বলিতেন না। ও-পথ ধরিয়া মানুষকে বিচার করা চলে না। ইহা গ্রন্থকার বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চার্লি-জীবনের যেটা বড় কথা সেটা তাঁর অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ই তাঁহাকে বড় করিয়াছে।

চার্লির এই জীবন-কাহিনী পড়িবার মতো বই। যাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানিতে চান, তাঁহারা এই বই পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীগৌতম সেন

৫৫৪ পাতার পর

তাহা হইলে কমনওয়েলথে বৃহৎ বৃহৎ অন্য দেশ আছে যেখানে অনায়াসেই দুই চার লক্ষ লোকের বাসের স্থান হইতে পারে। যথা ক্যানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু গাত্রচর্মের বর্ণ বিচারে সম্ভবত এই সকল ভারতীয়ের স্থান হইবে না ঐ শ্বেতকায় প্রধান মুল্লুকে। এই সকল ব্যক্তির বৃটিশ পাসপোর্ট সম্বন্ধে পক্ষপাত উচ্চ জাতীয়তা বোধের পরিচায়ক নহে। বোধ হয় এই কারণেই ভারত সরকার ইঁহাদিগের সাহায্যের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না।

ব্যাঙ্কের সুদের হার

বর্ত্তমান বৎসর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদ দিবার ও লইবার হার শতকরা একটাকা কমাইয়াছেন। শ্রীমোরারজি দেশাই, বক্তৃতা করিয়া জগতকে জানাইয়াছেন যে ভারত সরকারের এই সুদ কমানর উদ্দেশ্য ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া অর্থনৈতিক প্রগতিকে আরও প্রাণবান করিয়া তোলা। ভারতে ব্যবসাদারগণ যত টাকা কর্জ্জ করিয়া কাজ কারবার চালাইয়া থাকেন সেই তুলনায় ভারত সরকার ও বিভিন্ন প্রদেশ সরকার-গুলির কর্জ্জার পরিমাণ অনেক অধিক। এই সকল সরকারী ঋণের মোট পরিমাণ বহু সহস্র কোটি টাকা এবং বৎসরে এই সকল ঋণ শত শত কোটি টাকা বৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সুদের হার শতকরা একটাকা হ্রাস হইলে একহাজার কোটি ঋণের জন্য বৎসরে দশ কোটি টাকা কম দিতে হইবে। ভারত সরকারের মোট কর্জ্জার পরিমাণ যদি দশহাজার কোটি টাকা হয় তাহা হইলে সুদ কমাইলে প্রায় ১০০ কোটি টাকা লাভ হইবে। ব্যবসাদারদিগের মধ্যে অতি বৃহৎ বৃহৎ যাহারা আছে তাহাদিগের সুদ দিয়া ধার করা টাকার মোট পরিমাণ সরকারী ঋণের দশভাগের একভাগ হইবে কিনা সন্দেহ। যে সকল লোক সঞ্চয়ের অর্থের সুদের আয় হইতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এই নূতন ব্যবস্থায় তাঁহাদিগের স্কন্ধেই সরকারী ব্যয় লাঘবের বোঝা অনেকটা ন্যস্ত হইবে। ইনসিওর করিয়া যে লাভ হয় তাহাও কমিয়া যাইবে। অর্থাৎ এই সুদের হার কমানটাও এক প্রকারের রাজকরের মতই হইয়া দাঁড়াইবে ও শেষ পর্য্যন্ত সেই করের ভার বহিবে মধ্যবিত্ত জনসাধারণ। শ্রীমোরারজির একটা মহা দোষ হইয়াছে যে তিনি সরকারী সুবিধাবাদকে জনহিতকর ব্যবস্থা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। জনসাধারণ এইরূপ প্রচারকে প্রবঞ্চনা আখ্যা দিলে বিশেষ অন্যায় করিবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন।

র‍্যাশনিং ও কনট্রোলের স্বরূপ

ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যত প্রকার অন্যায়, অনাচার ও দুষ্কার্য্যের প্রসার লক্ষিত হয় সেইগুলির অধিকাংশের মূলে আছে কনট্রোল, পারমিট, লাইসেন্স ও র‍্যাশনিং। এই সকল নিয়ন্ত্রণের বন্ধন আছে বলিয়াই রাষ্ট্রক্ষেত্রের ও দফতরের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের জনসাধারণকে সুখসুবিধা বিতরণের অধিকার প্রাপ্তি ঘটিয়াছে ও অনেক কর্ম্মকর্ত্তা ইহার দ্বারা লাভবান হইতে সক্ষম হ'ন। লাইসেন্স, পারমিট, কনট্রোল ও র‍্যাশনিং উঠাইয়া দিয়া যদি জন-সাধারণকে স্বাধীনভাবে সকল প্রকার কেনাবেচা ও ব্যবসা করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবসাদারী ও উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ হইয়া যায়। পলিটিকস্ আর তাহা হইলে লাভের ব্যবসা থাকিবে না এবং পলিটিক্যাল বিষয়ে লাভের আশায় আর সমাজদ্রোহী লোকের ভীড় হইবে না। ব্যবসাদারগণ হয়ত এইরূপ অবস্থা হইলে জন-সাধারণকে আরও অধিক ঠকাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহার দমন ততটা কঠিন হইবে না যতটা কঠিন মন্ত্রী, মেম্বার ও অপরাপর মহারথীদিগকে দমন করা। এই সকল কথা বিচার করিয়া অনেকে মনে করেন যে সকল প্রকার কেনাবেচা ও কারবারের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির এরূপ সংস্কার আবশ্যক যাহাতে রাষ্ট্রীয় পালের গোদা ও রাজকর্ম্মচারীগণ আর জনসাধারণের জীবনযাত্রার উপর একটা বিরাট বোঝার সৃষ্টি করিতে না পারেন। এই কার্য্য সহজ হইবে না এবং একদিক বাঁচাইতে গিয়া অপরদিকে জনসাধারণ মার খাইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলেও বর্ত্তমান রীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

বাংলায় রাষ্ট্রপতির রাজত্ব

বাংলায় যে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি দেখা যাইতেছে ও যাহাতে বাংলার রাষ্ট্রীয়দলের নেতাদিগের পরস্পর বিরুদ্ধতার জন্য শেষ অবধি সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদিগকে রাষ্ট্রকার্য্যে অপারগ বিবেচনা করিয়া বসাইয়া দিয়া বাংলায় রাষ্ট্রপতির রাজত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে, ইহার মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত ও দলগত সুবিধাবাদ এবং উচ্ছৃঙ্খলতা। আত্মসংযম, অন্যায় প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খা দমনশক্তি যদি ক্রমে ক্রমে নেতৃস্থানীয় লোকেদের অন্তর হইতে পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ বা রাষ্ট্র কোথাওই জাতির কোন উন্নত অবস্থা আর থাকা সম্ভব হয় না। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া শত শত উন্নতমনা কর্ম্মক্ষম মানুষ বাংলায় জন্মলাভ করিয়া আজ বাংলায় সর্ব্বক্ষেত্রে চরিত্রহীনতা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রভাব এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে বাংলায় আজ কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না ও কোন বিষয়ে বা কোন ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য মানুষ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির রাজত্ব অবসানেও যে নূতন নির্ব্বাচন করিয়া বাংলায় কোন উন্নত ধরণের শাসনব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হইবে এমন কথাও কেহ জোর গলায় বলিতে পারিতেছে না।

চরিত্রবান ও বিশ্বাসযোগ্য মানুষ যে বাংলায় কেহ নাই এমন কথা বলিলে কথাটা সত্য হইবে না। কিন্তু দলাদলি করিয়া যাহারা সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মপ্রচারে সক্ষম হইয়াছে সেই সকল লোকের মধ্যে উচ্চ স্তরের মানুষ অল্পই আছে। এই কারণে নূতন নির্ব্বাচন আসন্ন হইলে বাঙ্গালীকে দেখিতে হইবে যাহাতে সকলে বড়বড় কথায় মুগ্ধ হইয়া আবার সেই পুরাতন পাপকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত না হইতে দেন। মানুষের গুণ বিচার করিয়া ও সকল কার্য্যকলাপ ও বন্ধুবান্ধবের সম্বন্ধ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তবে তাহাকে নির্ব্বাচন করা নিরাপদ হইবে। রাষ্ট্রপতির রাজত্বের অবকাশে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লইতে পারিলে তবেই বাংলার প্রতিনিধিগণ আবার জগতসভায় মুখরক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন।

পাণ্ডব মন্ত্রণা সভায় দ্রৌপদী

চিন্তামণি কর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৭শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড	চৈত্র, ১৩৭৪	৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অর্থক্ষেত্রে উন্নত ও অনুন্নত জাতি

অর্থক্ষেত্রে যে সকল জাতি সবিশেষ উন্নতি করিয়াছে সেই সকল জাতি যাহাতে অর্থক্ষেত্রে অনুন্নত জাতি-গুলিকে সাহায্য করিয়া পৃথিবীর সকল মানবের মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত সাম্যের সৃষ্টি করিতে পারে তাহার জন্য ১৯৬৩ খৃঃ অব্দে একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হয়। এই সংগঠন বর্ত্তমানে বিশ্বজাতি সম্মেলনের বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নতি প্রতিষ্ঠান বলিয়া চালিত আছে। ঐশ্বর্য্য সম্পদে উন্নতি যাহারা করিয়াছে তাহা-দিগের একটা শুধু যে নৈতিক দায়িত্ব আছে অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য করিয়া উন্নতির পথে চালাইয়া লইবার, তাহাই নহে। অনুন্নত দেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি হইলে তদ্দ্বারা উন্নত দেশগুলির লাভের পথ আরও সুদূর-বিস্তৃত হইতে পারিবে বলিয়াই সকল অর্থনীতিবিদগণ বিশ্বাস করেন। পৃথিবীতে দরিদ্র দেশগুলি ক্রমশঃ আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হইতে পারিলে উন্নত দেশ-গুলিরও বিপদের সম্ভাবনা থাকে; কেননা দারিদ্র্য ও যুদ্ধবিগ্রহ পরস্পর সংযুক্ত। অনেক দেশে অনেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি থাকিলে বিপ্লববাদীদিগের প্রচার কার্য্য সহজ হয় এবং সেই জন্যই যে সকল জাতি শান্তির পথে চলিয়াই অর্থনৈতিক আদর্শ উপলব্ধি করিতে আশা করে তাহাদিগের চেষ্টা উন্নত ও অনুন্নত জাতিগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যে পরস্পরের সহযোগিতার ভিতর দিয়াই পৃথিবী হইতে ক্রমে ক্রমে দারিদ্র্য দূর করিয়া দেওয়ার। অতীতে বহু জাতি সাম্রাজ্যবাদ ও পরদেশ লুণ্ঠন চালাইয়া নিজ ঐশ্বর্য্য বাড়াইয়াছিল। সেই সকল দেশের মধ্যে অনেক-গুলি আজ আর্থিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই সকল জাতির বিশ্ব-মানবের নিকট একটা প্রায় ঋণ শোধের মতই দায়িত্ব রহিয়া গিয়াছে। আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ান অথবা অ্যাজটেক, মায়া বা টোলটেক প্রভৃতি জাতিগুলি প্রায় ধরাপৃষ্ঠ হইতে পূর্ণ অপসৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা-দিগের উপর যে অন্যায় এককালে করা হইয়াছে আজ অপর মানুষের প্রতি সহযোগিতার মধ্য দিয়া সেই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে হইবে।

বৃটিশ, ফরাসী, জর্ম্মন, বেলজিয়ান, ওলন্দাজ, রুশ ও চীন যে সকল পরদেশ লুণ্ঠন কার্য্য পূর্ব্বযুগে করিয়াছে; আজ অপরাপর দেশকে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে

নিজ নিজ সমৃদ্ধি সাধন করিতে সাহায্য করিয়া সেই পুরাতন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই কার্য্য শুধু নৈতিকভাবে লাভের কার্য্য নহে। ইহার দ্বারা অর্থক্ষেত্রও প্রসারিত হইয়া আর্থিক লাভ করারও নূতন নূতন পথ খুলিয়া দেয়।

বর্ত্তমানে যে সকল দীর্ঘ আলোচনা হইয়া বিষয়টার যথাযথভাবে কোন মীমাংসা না করিয়াই সকলে আলোচনা স্থগিত রাখিয়াছেন, তাহার কারণ ঐশ্বর্য্যে উন্নত জাতিগুলির বর্ত্তমানে অবস্থা ততটা ভাল নহে। জাতীয় মোট আয়ের শতকরা এক ভাগও সকলে সাহায্য হিসাবে অপরাপর জাতিগুলিকে দিতে সক্ষম নহে বলিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ ব্যক্তিগত, ব্যবসাগত বা জাতিগতভাবে আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া সর্ব্বত্রই দেখা যায় এখন আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক দাঁড়াইতেছে। এই অবস্থায় নিজেদের খরচ মিটানই কঠিন ত অপরকে সাহায্য করার ব্যবস্থা কোথা হইতে করা যাইবে? এই জন্যই "উন্কটাড" বা বিশ্বজাত সম্মেলনের ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি ঘটাইবার সমতি এইবার নিজ প্রচেষ্টায় সফলকাম হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে অবস্থা ভাল হইলে হয়ত কাজ আরও সফল হইতে পারিবে। কিন্তু এ কথাও বলা আবশ্যক যে অনুন্নত দেশগুলির পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকাও আত্মনির্ভরশীলতা ও কর্ম্মক্ষমতার পরিচায়ক নহে। সকল জাতির উচিত যথাসম্ভব নিজ চেষ্টার উপর নিজ নিজ উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া লওয়া। ইহাতে ঋণের বোঝা স্কন্ধে লইতে হয় না, এবং মারাত্মক ভুলচুকও কমই হইতে পারে। পরের টাকা হাতে পাইলে অনেকেই বিবেচনাশক্তি হারাইয়া ফেলে।

জনসনের শাসনশক্তি ত্যাগ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নির্ব্বাচনে উক্ত রাষ্ট্রের সভাপতি লিণ্ডন বি, জনসন আর প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। জনসন শক্তিমান ব্যক্তি এবং লক্ষ লক্ষ বিরুদ্ধ সমালোচক থাকা সত্বেও তিনি নিজ মত পরিবর্ত্তন করিয়া অপরের মতে চলিতে কখন প্রস্তুত হ'ন নাই। তিনি বর্ত্তমানে নিজ হইতেই এইরূপ চিন্তা করিয়াছেন যে তিনি না হইয়া অপর কেহ (শাসন ভার গ্রহণ করিলে যদি আমেরিকার প্রতিষ্ঠা বি দরবারে আরো উচ্চে হইতে পারে তাহা হইলে ি নিজের আকাঙ্খা দমন করিয়াও নিজ জাতির মঙ্গ জন্য শাসনভার ত্যাগ করিতে আপত্তি করিবেন ' কথাটা উচুদরের কথা। শাসনভার ত্যাগ করিতে অক্ষম লোকেও সহজে প্রস্তুত হ'ন না। এই কা অনেক দেশেই অকেজো লোকের হস্তে শাসনভার দীর্ঘ থাকিয়া যায় ও দেশবাসী তাহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হ থাকেন। শক্তি হস্তে লইয়া তাহা নিজ ইচ্ছায় ছা দেওয়ায় একটা মহত্ব আছে বলিতেই হইবে। অ বলেন, জনসনের জন্যই ভিয়েৎনামে যুদ্ধ থামিতেছে আমেরিকার সাদা-কালোর বিবাদ বন্ধ হইতেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্যান্য বহু দেশেও বহু নেতা নিজ পদে অচলভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। পদত্যাগের ক বলেন না। অর্থাৎ যদি বলা যায় যে বিশ্বশান্তির মাওৎ সে তুঙ, হোচিমিন বা অপর কাহারও নিজ নিজ ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করা উচি তাহা হইলে হয়ত ঐ নেতাগণ নিজ স্থান ত্যাগ করি না। প্রেসিডেন্ট আয়ুবখান অথবা জেনারেল ডি, গে নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিতে রাজী হই বলিয়াও বিশ্বাস করা যায় না। এই সকল ব্যক্তির স তুলনা করিয়া মনে হয় যে লিণ্ডন জনসন ভালমন্দ প্রকারের লোকই হ'ন না কেন, আত্ম-দমন ও সংয জন্য তিনি অপর অনেক রাষ্ট্র নেতার তুলনায় উচ্চ পাইবেন বলিতে পারা যায়। দেশের প্রতিষ্ঠার ও দে বাসীর জীবনযাত্রার সুব্যবস্থার কার্য্যে জনসন কোন ক্ষম অভাব দেখান নাই। তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে স কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কমুনিষ্টদিগের মনঃপূত না হইলে আমেরিকানদিগের অধিকাংশের মতানুসারেই হই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ তাহা না হই তিনি শতশত কোটি ডলার ব্যয় করিয়া চলিতে পারি না; এবং প্রায় সাত আট লক্ষ আমেরিকান সৈন্য ভিয়েৎনামের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া যুদ্ধ চালাইতে পারি

না। একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে জনসন না থাকিলে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ হয়ত আরো পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া যাইত। অনেকের মতে জনসনের সহিত হো চি মিনের নামও একসঙ্গে করা কর্ত্তব্য। হো চি মিন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দখল করিবার সংকল্প না করিলেও ঐ যুদ্ধ চলিত না। ইহার পিছনে আছে রুশীয়া ও চীন। অতএব বিশ্বশান্তির দিক দিয়া জনসনের সহিত হো চি মিনেরও রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য হইবে। ইহার পর যদি মাওৎ সে তুঙ্গ এবং আয়ুব, ডি'গল প্রভৃতি আরও কিছু কিছু রাষ্ট্রনেতাগণ আসর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে বিশ্বের সর্ব্বত্রই শীঘ্র শান্তির হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিবে নিঃসন্দেহ। আমরা আশা করি লিণ্ডন জনসন যে পথ দেখাইতেছেন তাহা অন্যান্য জাতির রাষ্ট্রনেতাগণও ক্রমে ক্রমে অনুকরণ করিবেন।

পাকিস্তানে সামরিক পুনর্গঠন

পাকিস্তান সমষ্টিবাদে বিশ্বাসী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নহে। পাকিস্তান একটি ধর্ম্মমতবিশেষপ্রধান ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্যে চালিত রাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের কোন সীমা নাই; ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী বা স্বাধীনতার কোন ব্যবস্থা নাই; এমন কি প্রচলিত ধরণের সাধারণতন্ত্রও নাই। প্রায় ১০ কোটি লোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ভোট দিবার অধিকার আছে মাত্র ৮০,০০০ লোকের, এবং সেই সকল লোক কিভাবে কাহাকে ভোট দিবে তাহাও রাষ্ট্রের একাধিপত্যের অধিপতি আয়ুবখানের নির্দ্দেশেই হইয়া থাকে। এক কথায় পাকিস্তানের লোকেদের মানবতার দাবী বলিয়া কিছু নাই। মুসলমান বলিয়া ঐ দেশের মুসলমানগণ অপর ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপর লুঠপাট অত্যাচার করিলে দণ্ডনীয় হয় না; কিন্তু তাহারা নিজেদের মত আয়ুবখানের সাক্ষাৎ তাঁবেদারদিগের উপর চালাইতে যাইলে তাহাদিগের মুসলমানত্বের অধিকার আর তখন বজায় থাকে না। অর্থাৎ মুসলমানত্বও আয়ুবের একাধিপত্যের নিকট উপরে স্থান লাভ করে না।

পাকিস্তান বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানে ভারতের শক্তি হ্রাসের জন্য বৃটিশের কারসাজিতে সৃষ্ট হইয়াছিল। মুসলমান না হইয়া যদি অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা বৃটিশের সাহায্যের জন্য আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত তাহা হইলে সে সকল লোকই ভারত বিভাগ করাইয়া একটা পৃথক রাষ্ট্র গঠন করাইয়া লইতে পারিত। আসল কথাটা ছিল ভারত বিভাগ করাইয়া ভারতের শক্তি হ্রাস করাইয়া ভারতের ভিতরে আর একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া দেওয়া। পাকিস্তানের বৃটিশের সহিত ভিতরের গোপন সর্ত ছিল সর্ব্বদা ভারতকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ও তাহার রাজ্যাংশ এখানে ওখানে জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়া বরাবরের মত একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়া রাখা। কারণ বৃটিশ পাকিস্তানের সহায় থাকিলে কোন না কোন সময় একটা যুদ্ধ লাগিয়া পাকিস্তান বৃটিশের সাহায্যে ভারতকে পরাস্ত করিয়া লইতে পারিবে; এবং তখন বৃটিশ পুনর্ব্বার এশিয়ায় নিজ প্রভুত্ব প্রবলতর করিয়া লইয়া পূর্ব্ব গৌরব ও লাভের ব্যবস্থা কতকটা ফিরাইয়া পাইতে সক্ষম হইবে, এইরূপ মতলব বৃটিশ মস্তিষ্কে ছিল বলিয়াই মনে হয়। আমরা দেখিতে পাই যে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের স্বাধীনতার আরম্ভের অল্প পরেই পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করিবার চেষ্টা করে ও পরে ক্রমাগতই নানা স্থানে ভারতের উপর হামলা করিতে থাকে। এই কার্য্যে চীন পাকিস্তানের সহিত মিলিতভাবে ভারতের কোথাও কোথাও জোর করিয়া জমি দখল করে ও অপর স্থানে শুধু নিজ সৈন্য ব্যবহার করিয়াও কোন কোন স্থান অধিকার করে। পাকিস্তান প্রথমবার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হয় ও বৃটিশ-আমেরিকান শক্তি সংঘ ভারতকে যে কোন উপায়েই হউক কাশ্মীর পূর্ণভাবে পুনরাধিকার করিতে দেয় নাই। সেই সময় যে "আজাদ কাশ্মীর" নাম দিয়া পাকিস্তান কাশ্মীরের কিছু অংশ দখল করিয়া লয়; এখনও সেই অংশ তাহার দখলে আছে। ১৯৬৫ খৃঃ অব্দে পাকিস্তান দ্বিতীয়বার কাশ্মীর ও ভারত আক্রমণ করে ও ভারতের নিকট ২২ দিনের যুদ্ধে পূর্ণতর ভাবে বিধ্বস্ত হয়। এইবারও বৃটিশ-আমেরিকানগণ ভারতকে যুদ্ধ জয়ের লাভ

উপভোগ করিতে দেয় নাই এবং এই কার্য্যে এইবার রুশীয়াও পাকিস্থানের সহায়তা করে।

বর্ত্তমানে খুবই চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে পাকিস্তান নিজ হারান সামরিক শক্তি ফিরাইয়া পায়। তাহাকে শত শত ট্যাঙ্ক, তোপ ও এরোপ্লেন সরবরাহ করিবার নানান চেষ্টা আমেরিকা প্রভৃতি দেশ করিতেছে ও এই কার্য্যে সাহায্য করিতেছে জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইরাণ, তুর্কী, প্রভৃতি দেশ। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার আদর্শ উপলব্ধির নামে বহুজাতি মিলিত হইয়া একটা মানবতার সকল উচ্চ আদর্শের বিরুদ্ধবাদী দেশকে এইরূপ ভাবে সাহায্য করিবার উদাহরণ আর কোথাও দেখা যায় না। পাকিস্তান তাহার কোন প্রচেষ্টাতেই জয়যুক্ত হইলে সেই জয়ে মানবতার পরাজয় ঘটিবে। ইহা জানিয়াও পাশ্চাত্যের অনেক জাতি পাকিস্তানের সহায়তায় নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতের নির্ভর শুধু নিজের উপর।

সীমান্ত নির্দ্ধারণ

ভারতবর্ষের সীমানা প্রায়ই অপর প্রান্তের রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অধিকৃত হইতে দেখা যায়। যথা বর্ত্তমানে ভারতের কয়েক সহস্র বর্গমাইল জমি অপর রাষ্ট্রের দখলে রহিয়াছে এবং এই বেদখলের কার্য্যে ভারত সরকার কিছুটা সহায়তাও করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, কাশ্মীর অঞ্চলে যে-সকল এলাকাতে পাকিস্তান "আজাদ কাশ্মীর" গঠন করিয়াছে সেই স্থানগুলি ভারত সরকার যুদ্ধ করিয়া কাড়িয়া লইয়া, পরে সম্মিলিত জাতি সংঘের সহিত আলোচনা করিয়া সেগুলি পাকিস্থানকে ফিরাইয়া দে'ন। কচ্ছে যে-সকল স্থান পাকিস্থান দখল করে তাহার কিছু অংশ আন্তর্জাতিক বিচারের ফলে পাকিস্তানকে দেওয়া হইয়াছে এবং এই বিচার ব্যবস্থা ভারত সরকারের মতানুসারেই করা হইয়াছিল বলিয়া ভারত সরকার বিচার মানিয়া লইতে চাহিতেছেন। চীন যে সকল স্থান দখল করিয়া আছে তাহার কিছুটা "আজাদ কাশ্মীরের অন্তর্গত ও কিছুটা জোর করিয়া ভারতের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া। এই স্থান-গুলি চীনের নিকট হইতে পুনর্ব্বার কাড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু ভারত সরকার তাহার কোন চেষ্টা বা ব্যব[স্থা] করিতেছেন না। সুতরাং দেশের কিছু কিছু এলাকা পরহস্তগত হইয়াছে তাহা ভারত সরকারের অক্ষমতা নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই হইয়াছে। ইহার আরম্ভ হইয়াছি[ল] পণ্ডিত নেহেরুর রাজ্যশাসন কালে। তিনি বিদেশী জাতি-দিগের কথায় অনেক কিছু করিতেন যাহাতে তাঁহার ম[তে] ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইব[ার] সম্ভাবনা ছিল। বস্তুত ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ইহাদ্বারা দৃঢ়তর হয়ই নাই, বরঞ্চ তাহা ক্রমশঃ শিথিল অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ ভারতের যে অর্থনৈতি[ক] ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, তাহার মূলে আছে পূর্ব্বকার অবিবেচন[া] কার্য্য সমূচয়। বর্ত্তমানে ভারতের একমাত্র উন্নতির পথ হ[ইল] সবলভাবে নিজরাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তজ্জন্য স[র্ব্ব] প্রকার সামরিক আয়োজন সম্পূর্ণ করা। বস্তুত ভা[রত] যদি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, না করিয়া পূর্ব্বযুগের বিশ্বপ্রীতি অভিনয়েই মত্ত থাকে তাহা হইলে ভারতের সীম[া] অতঃপর আরও ভিতরে সরিয়া আসিবার সম্ভাবনা।

বিদ্যার্থীদিগের বিশেষ অধিকার

যাহারা বিদ্যার আরাধনা করেন সমাজের নিকট তাঁহ[ারা] কোন কোন বিশেষ অধিকার দাবী করিতে পারেন। [বিদ্যা] ও অর্থ উপার্জ্জন একসঙ্গে করা সম্ভব হয় না বলিয়া প্রথম[ত] ছাত্রগণ সমাজের নিকট নিজেদের সকল প্রকার ব্যয় [দাবী] করিতে পারেন। ইহা তাঁহাদিগের নিজ অভিভাবকদিগ[ের] নিকট হইতেই লওয়া হয়; কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্লে[ষণে] তাহা সমাজের তহবিল হইতেই আসিতেছে বলা চ[লে]। এই যে পাওনা তাহা ছাত্রদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় তাঁহ[ারা] ভবিষ্যতের কার্য্য ও উপার্জ্জনের দ্বারা তাহার প্রতি[দান] আরও অধিক করিয়াই দিবেন এই আশায়। ছাত্র[গণ] আরও অনেক বিশেষ অধিকার দাবী করিয়া থা[কেন] তাঁহাদিগের ভবিষ্যতের প্রতিদানের খাতিরে। যথা, বর্ত্ত[মানে] কখন কখন তাঁহারা দাবী করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের অথবা বাসস্থানে শিক্ষকদিগের মতানুসারে ব্যতীত [কোন] পুলিশের লোক প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই স[কল] কথার ও দাবীর মূল্য ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ ছাত্র[গণ]

নিজেদের কর্ত্তব্য কার্য্য যথাযথভাবে করিতে থাকেন। অর্থাৎ পাঠচর্চ্চা ও সংযতভাবে শরীর মনের গঠনের উপর সকল ব্যক্তিগত ও মিলিত শক্তি নিয়োগ করা ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য ধার্য্য হইলে, সেই ভাবে কর্ত্তব্যে নিযুক্ত না থাকিলে ছাত্র-দিগের নিজ কার্য্যে অবহেলা করা হইতেছে বলা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে সমাজ কতদূর অবধি ছাত্রদিগের বিশেষ বিশেষ অধিকার মানিয়া চলিতে থাকিবে তাহা বিচারের বিষয়। যদি বৎসরের পর বৎসর ছাত্রগণ শুধু গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া পাঠের সহিত অসংযুক্ত অবান্তর কার্য্যকলাপে লিপ্ত হইয়া সময় ও অর্থের অপ-ব্যবহার করিতে থাকেন তাহা হইলে সমাজ কতকাল ঐ অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া চলিতে পারে? মনে হয় না যে ছাত্রগণ ক্রমাগত নিজ কর্ত্তব্য না করিতে থাকিলে, তাহাদিগের সুখ সুবিধা বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে। সমাজ কোন না কোন সময় ছাত্রদিগের কর্ত্তব্যে অবহেলার প্রতিকার ব্যবস্থা করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবে এবং তাহার জন্য ছাত্রদিগকেই দায়ী করিতে হইবে।

কিনিয়ার ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎ

কিনিয়া পূর্ব্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধিকৃত দেশ ছিল। উপনিবেশ বলিয়া কিনিয়ার বিশেষত্ব কিছু ছিল না। কিছু শেতাঙ্গের ব্যবসাবাণিজ্য সে দেশে ছিল এবং কিছু রাজকর্ম্মচারীও বৃটেন হইতে ঐ দেশে প্রেরিত হইয়া উচ্চ বেতন প্রভৃতি সম্ভোগ করিত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা অথবা রোডেশিয়া যেরূপ শেতাঙ্গদিগের বাসভূমি হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্য সকল আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিকৃত দেশগুলিতে সেইভাবে বহু সংখ্যায় শ্বেতকায়গণ আজীবন বাস করিবার ব্যবস্থা করে নাই। এই কারণে বর্ত্তমান কালে যখন সাম্রাজ্যবাদ লোপ পাইতে আরম্ভ করিল তখন আফ্রিকার বহু দেশ হইতেই ইয়োরোপীয়গণ ক্রমশঃ চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। শুধু যে সকল দেশে তাহারা পুরুষানুক্রমিক ভাবে বসবাস করিয়া সেই দেশ-গুলিকে নিজেদের দেশ করিয়া লইয়াছিল, যথা দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়া, সেই দেশগুলিই তাহারা নিজেদের দখলে রাখিয়া ও কৃষ্ণকায়দিগকে সেই সকল দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব তথায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করে। কিনিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলে পরে কোন কোন ইয়োরোপীয় হয়ত সে দেশের প্রজা হইয়া সেখানে থাকিয়া গিয়াছে। এশিয়ার লোকও বহু সংখ্যায় সেখানে কার্য্যকলাপ ও ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কিনিয়ার প্রজা হইয়া সেইখানে থাকিয়া যাইল। কেহ কেহ নিজ দেশের নাগরিকতা পুনরায় আহরণ করিয়া কিনিয়ার রাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া সেখানে থাকিয়া যাইবার ব্যবস্থাও করিল। ইহাদিগের মধ্যে কিছু ইয়োরোপীয় নরনারীও হয়ত ছিল। যাহারা কিনিয়া স্বাধীন হইলে পরে সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিল তাহাদিগের মধ্যে অনেক ভারতবাসী ছিল; যাহারা পূর্ব্ব হইতেই বৃটেনের প্রজা বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল, এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ঐ দেশে স্বাধীনতার আগমনের পরে বৃটেনে গিয়া বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বৃটেনের রাজ সরকার আইন করিয়া তাহা-দিগকে বৃটেনে প্রবেশ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিল। এইরূপ করাতে ঐ সকল ভারতবাসী বৃটিশ পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও বৃটেনে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইল। তাহারা কিনিয়ার প্রজাও না হওয়ায় তাহাদিগকে কিনিয়া ছাড়িয়া যাইবার জন্য কিনিয়া সরকার নির্দ্দেশ দিল। তাহারা ভারতীয় হইলেও ভারত সরকার তাহাদিগকে ভারতের প্রজা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ ঐ সকল ভারতবাসীগণ কিনিয়া, বৃটেন বা ভারতবর্ষ কোন দেশেরই প্রজার অধিকার না পাইয়া দেশহারা মানুষ হইয়া দাঁড়াইল। কিনিয়ার রাজসরকারের উচিত ছিল বৃটেনকে ঐ সকল ব্যক্তিকে বৃটেনে লইয়া যাইতে বাধ্য করা। কিন্তু কিনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কিনিয়াট্টা হয়ত অতটা শক্তিশালী নহেন; বা তিনি পরের জন্য ততটা নিজের অসুবিধার সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সকল ঘটনার সূচনার পরে ভারত হইতে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রী কিনিয়ায় গমন করেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি কিনিয়ার রাষ্ট্রপতি জোমো কিনিয়াট্টার সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য ব্যবস্থা

কিনিয়াট্টা তাঁহার সহিত নিজে কথাবার্ত্তা না বলিয়া নিজ রাষ্ট্রের অপর কোন কর্মচারীকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভারতে এই কথা লইয়া খুব গোলযোগ হয়। কেহ বলেন কিনিয়া ভারত সরকারকে যথাযথ সম্মান দেখান নাই কেহ বলেন একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রীর পক্ষে এক দেশের রাষ্ট্রপতির সহিত আলোচনা করিতে চাওয়াটাই একটা আন্তর্জাতিক রীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। সে কথা যাহাই হউক, যে সকল ভারতবাসী দেশহীন অবস্থায় কিনিয়ায় ভাসমান ছিলেন, তাঁহাদিগের অবস্থা কি হইল তাহা ঠিক পরিষ্কার জানা যাইল না। আমাদিগের যে অর্দ্ধ-মন্ত্রী কিনিয়ায় গিয়াছিলেন তিনি শেষপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের লোকেদের সম্মান কতটা উর্দ্ধে উঠাইলেন অথবা নিচে নামাইলেন তাহা আমরা পরিষ্কার জানিতে পারিলে কিছুটা আনন্দলাভ করিতে পারিতাম। আশা করি কোন না কোন সময়ে তাহা জানা যাইবে।

রেলে দুর্ঘটনা

রেলে দুর্ঘটনার কথা প্রায়ই শুনা যায়। গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষণ, আগুন লাগিয়া যাওয়া, লাইন হইতে ট্রেণ সরিয়া লাইনের বাহিরে গিয়া উল্টাইয়া যাওয়া; আরও কত বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনা তাহার শেষ নাই। বহু লোকের প্রাণহাণী হয়, আরও অধিক লোক আহত হয়, এবং সম্পত্তি নষ্ট হয় লক্ষ লক্ষ টাকার। অধিকাংশ দুর্ঘটনার বিষয় ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে সেগুলি ঘটার কোন সম্ভাবনা থাকে না যদি সকল রেল কর্মচারী নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য যথাযথভাবে করিয়া চলেন। ট্রেন থামাইবার শিকল টানিলে ট্রেণ থামে না; লাইন ফাঁকা আছে জানাইবার সাংকেতিক ব্যবস্থা কাজ করে না; গাড়ীর চাকায় তেল না থাকায় চাকা জ্বলিয়া উঠিয়া পরে গাড়ীতে আগুন লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে যদি সকল অবয়ব ও ব্যবস্থা ঠিক ভাবে দেখা হয় ও যান্ত্রিক পরীক্ষা কার্য্যও সময়মত হইতে থাকে তাহা হইলে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে না। ঘটিয়াছে, অর্থাৎ কেহ না কেহ নিজ কর্ত্তব্য করে নাই। ইহার অর্থ উপরওয়ালাগণ কোন কিছুই দেখা শোনা করেন না। জন্য ত কেহ মন্ত্রী ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের রাখে না কার্য্য ঠিকমত চলিবে বলিয়াই রাখে। কার্য্য না হইলে মন্ত্রীদের অবসর গ্রহণ করা উচিত। রেলে দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থে বুঝিতে হইবে রেলের মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটবড় অনেক ব্যক্তিই কার্য্য ঠিকমত করেন না। অতএব রেল মন্ত্রীর পক্ষে পদত্যাগ করা অন্যায় কথা হইবে না। তৎসঙ্গে আরও কিছু লোককেও বিতাড়িত করিলে মন্দ হয় না। চাকুরী যাইলে তবেই লোকের কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।

কলিকাতায় চুরি, ডাকাতি ও খুন

কলিকাতার পথে ঘাটে ও লোকের বাড়ীতে মানুষ খুন হওয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে পাড়ায় পাড়ায় দুর্বৃত্তদিগের প্রাদুর্ভাব এবং তাহাদিগের অসভ্যতা, অপরের অধিকার ও সুখ সুবিধা সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এবং অপরাধ প্রবণতা। কেহ যদি কোন কাজ না পায় অথচ পরিবারের কোন না কোন লোকের স্কন্ধে চাপিয়া বাস ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পায় তাহা হইলে সে জাতীয় ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের নিষ্কর্মতার আবহাওয়ায় মিলিতভাবে সময় নষ্ট ও আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। নানা অবৈধ উপায়ে পয়সা উপার্জ্জন করিয়া তাহা ব্যয় করিয়া নিজেদের বদ অভ্যাস বজায় রাখাও প্রয়োজন হয় এবং বেআইনী কার্য্যকলাপ ক্রমে ক্রমে চুরি, ডাকাতি ও খুনখারাবিতে গিয়া দাঁড়ায়। শুনা যায় অনেক স্থলে সন্ধ্যার অন্ধকারে একেলা কোন মহিলা রাস্তা দিয়া যাইলে তাঁহাদিগের অলঙ্কার ছিনাইয়া লওয়া প্রায়ই ঘটে। একেলা মহিলাগণ গৃহে বাস করিলেও কখন কখন পুরুষদিগের অনুপস্থিতি কালে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণের কথাও শুনা যায়। যে সকল ব্যক্তিগণ গায়ের জোরে চাঁদা আদায় করে, নারী-দিগের অপমানসূচক ব্যবহার করে, অলঙ্কার ছিনাইয়া লয় ও অপরাপর বিভিন্ন আইনবিরুদ্ধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কিছু কিছু ব্যক্তিগত লাভের ব্যবস্থা করে সেই সকল ব্যক্তিরা

যাহাতে নিজের নিজের সময় ও শক্তির যথাযথ ব্যবহারের সুবিধা পায়, তাহার জন্য সমাজের সকল লোকের চেষ্টা করা উচিত। গভর্ণমেণ্ট, কর্পোরেশন ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির উচিত এই সকল ব্যক্তিগণের সমাজবিরুদ্ধতা যাহাতে আরও না বাড়িতে পারে সেই মত চেষ্টা করা।

কলিকাতায় অপরাধীদিগের আর একটি বৃহৎ সংঘ আছে যাহার মধ্যে দেখা যায় অপরাপর প্রদেশের পলাতক চোরছেঁচড় ও খুনেদিগকে এবং তৎসঙ্গে ঐ সকল অবাঙ্গালী জাতীয় বেকার, ভিক্ষুক ও আইনভঙ্গকারী গুণ্ডা ও বদমাইসদিগকে। এই সকল ব্যক্তি কলিকাতার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া বাস করে এবং নানা প্রকার কার্য্য কখন কখন করে ও অবসর সময়ে অপরাধে সংযুক্ত হইয়া উপার্জ্জন বৃদ্ধি চেষ্টা করে। উচ্চভাড়ায় যে সকল অঞ্চলে ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ বাস করে ও নানাপ্রকার ভৃত্যদিগকে নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে "গুদাম ঘরে" থাকিতে দেয়, সেই সকল এলাকায় হাজার হাজার অজ্ঞাতকুলশীল অবাঙ্গালী ভৃত্যজাতীয় ব্যক্তি সমবেত হইয়া বাস করে। ইহাদিগের খোঁজখবর কেহ রাখেনা এবং ইহাদিগের মধ্যে বহু অপরাধী গা ঢাকা দিয়া অবস্থিত থাকে। কলিকাতায় পরিচয়পত্র বা "কার্ড অফ আইডেন্টিটি" লওয়া বাধ্যতামূলক করিলে ভিন্ন প্রদেশের বদ লোকেদের এদেশে আগমন নিবারণ হইতে পারে।

কলিকাতায় বাসস্থানের অভাব

কলিকাতায় যত লোক স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষা করিয়া বাস করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোক যত্রতত্র ভিড় করিয়া কোন রকমে থাকিয়া যায়। ইহার কারণ বাহিরে থাকিলে ভাড়া দিয়া থাকিতে হয় ও প্রত্যহ যাতায়াতের খরচও বিলক্ষণ হয়। এই দুই প্রকার খরচ একত্র করিলে মাসিক চাল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হইতে পারে। সুতরাং যাহারা পঁচাত্তর হইতে দেড়শত টাকা অবধি রোজগার করে তাহাদিগের পক্ষে বাহিরে থাকিয়া কলিকাতায় কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়। যদি বাহিরে থাকিতে ও বাহির হইতে কলিকাতায় আসিতে কুড়ি টাকা খরচ হইত তাহা হইলে কলিকাতার বহু গরীব কর্ম্মী সহরের বাহিরে বাস করিয়া এখানে কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিত। মূলধনের উপর যদি শতকরা দশটাকা লাভে গভর্ণমেণ্ট টাকা লাগাইতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে বার্ষিক একশত কুড়ি টাকা ভাড়ায় বাড়ীভাড়া দিলে ও ঐ টাকার অর্দ্ধেক মেরামত ও মূল্য হ্রাসের হিসাবে রাখিলে ষাট টাকা আমদানী হইলেই গভর্ণমেণ্ট ১০০০৲ টাকা ব্যয় করিতে পারেন। এক হাজার টাকায় যদি লাভ না করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা যায় তাহা হইলে ১০০ শত বর্গ ফুট নির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইবে না। কলিকাতা হইতে দশ মাইল দূরে সস্তায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলে যাতায়াতের ব্যবস্থাও মাসিক দশ টাকায় করা যাইতে পারে। যদি এই সকল ব্যবস্থা করিতে কিছু সাহায্য করিতে হয় তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট তাহা করিতে পারেন অথবা সহরের অবস্থার উন্নতির জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনও সে সাহায্য করিতে পারেন। যে ভাবেই হউক কলিকাতার যদি আধুনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর হইতে হয় তাহা হইলে কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। স্বাস্থ্য, অপরাধ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান অপর কোন উপায়ে সম্ভব হইবে না। এই কারণে নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা না করিয়া শুধু কলিকাতার নিকটে সস্তায় থাকার ব্যবস্থা ও সেই সকল স্থান হইতে অল্প খরচে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিলেই বিষয়টা সহজ হইয়া যাইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় দলের স্থিতির অনিশ্চয়তা

ভারতে যেসকল রাষ্ট্রীয় দলগুলি বর্ত্তমানে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নিজেদের আদর্শ মতবাদ বা মতলব ব্যক্ত করিয়া দলের সভ্যদিগকে নির্ব্বাচনে প্রার্থী হিসাবে খাড়া করিয়া থাকে, সেই সকল দলের গঠন ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে দলগুলি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা মতবাদের উপরেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, আবার অপরাপর ক্ষেত্রে দলগুলির কোন কর্ম্মক্ষেত্রের ঐতিহ্য নাই, শুধু কষ্টকল্পিত নামের অন্তরালে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ মাত্র লইয়া রাজ্য শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেসের ইতিহাস

চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে মহাত্মা গান্ধীর যুগ হইতে তাহার আদর্শ ও কর্ম্মের পথ নূতন দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অহিংসা, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি শুধু আদর্শমাত্র ছিল না, কর্ম্মক্ষেত্রে ও কার্য্যে সে সকল উপায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃতও হইয়াছিল। এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া দেশের স্বাধীনতা উপলব্ধির জন্য সহস্র সহস্র লোক বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া কংগ্রেসদলকে দেশবাসীর নিকটে একটা অতি উচ্চস্থান দান করিয়াছিলেন। পরে কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় শক্তি হস্তে লইবার আগ্রহে ভারত বিভাগ মানিয়া লইয়া ও আরো পরে সেই শক্তির অপব্যবহার করিয়া নিজ অর্জ্জিত উচ্চস্থান হইতে বহু নিচে নামিয়া আসে ও ১৯৬৭ খৃঃ অব্দের নির্ব্বাচনে অনেকক্ষেত্রে অপরাপর দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই পরাজয় যাহাদিগের নিকট হইল, রাষ্ট্রীয় দল হিসাবে তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ কোন খ্যাতি বা সুনাম পূর্ব্বে হয় নাই যেহেতু তাহারা পূর্ব্বে রাষ্ট্রকার্য্যে অবতীর্ণ হইয়া বিস্তৃতভাবে কার্য্য করিবার সময় ও সুযোগ পায় নাই। যেটুকু সুযোগ পাইয়াছিল কোন কোন দল, সে সুযোগ তাহারা শাসকদলগুলির বিরুদ্ধতায় ও অল্পসময়ের জন্য কোন কোন প্রদেশে রাজকার্য্যে ভুল ভ্রান্তি করিয়াই নষ্ট করে। বিগত নির্ব্বাচনে যে সকল দলগুলি আদর্শ ও মতবাদের সকল বৈপরীত্য অগ্রাহ্য করিয়া কৃত্রিম সমন্বয় সৃষ্টি করিয়া একজোট হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করে তাহাদিগের সে মিলন অধিককাল সংরক্ষিত হয় নাই। বিরোধ সহজেই জাগ্রত হয় এবং বহু প্রতিনিধি নিজ নিজ দল ছাড়িয়া অপরদলে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ইহার ফলে বহু প্রদেশেই অল্পদিনের মধ্যে একাধিক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয় ও শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। একটি দল ঐ বিরোধ ও গড়া ভাঙ্গার কার্য্যে বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছিল। সেই দলটি হইল কম্যুনিষ্টদল। ইহারা আবার নিজেদের মধ্যে বিভাগ সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান না পাইতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করে। আমরা অবশ্য কমুনিষ্ট বলিতে বুঝি সেই জাতীয় লোকেদেরই যাহারা স্বদেশ বা বিদেশ বলিয়া কোন পার্থক্যে বিশ্বাস করে না, যাহারা নিজদেশ অথবা পরের দেশ, সকল দেশকেই নিজেদের দলের কবলে আনিয়া বিশ্বের সকল লোককেই কমুনিষ্টদলের অধীনতা মানিতে বাধ্য করিতে চাহে। কমুনিজম্ হইল এক বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য যাহার অধীনে বাস করিলে কাহারও কোন নালিশ থাকিবে না; কারণ নালিশ করিলেই নালিশকারকের অস্তিত্ব লোপ ঘটিবে। চীনের কম্যুনিষ্ট ও অন্য কম্যুনিষ্টের মধ্যে পার্থক্য এই যে চীনের এখন একজন অবতার জাতীয় নেতা জুটিয়াছে যাহার বাণী বেদ, বাইবেল ও কোরাণের উপরে ও যাহার বাণী-পুস্তকের স্লোগান আওড়াইলে বিবেক, বিদ্যা কিম্বা বুদ্ধির কোন প্রয়োজন থাকে না। মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুর অভাব ঐ বাণী শুনিলেই দূর হইয়া যায়। আরও দল আছে; যাহাদের কাহারও মতে মস্তকে টিকি রাখিলেই সকল সমস্যার সমাধান সাধিত হইবে, কাহারও মত গোরক্ষা করিলেই দেশবাসীর আত্মরক্ষা কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে এবং অন্য কাহারও মত ভারতীয়রা সকলে উচ্চকণ্ঠে তামিল কিম্বা হিন্দী ভাষায় বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেই ভাত কাপড় বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসার অভাব আর কাহারও থাকিবে না। অর্থাৎ বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে দল গঠনের শ্রেষ্ঠ পন্থা হইল জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ব্ব পরিচিত সকল পথ ছাড়িয়া অজানা ও অসম্ভবের গভীরে হাবুডুবু খাইতে থাকিলেই কিছু কিছু নির্ব্বোধ বা উন্মাদ চেলাচামুণ্ডা পরম উৎসাহে নেতাদিগের পিছনে পিছনে জলে লাফাইয়া পড়িতে দ্বিধা করিবে না। সুতরাং দল গঠন কার্য্য কঠিন নহে। হিন্দুস্থানী মুল্লুকে একটা প্রবাদ আছে যে চার চৌবে একত্র হইলে সেখানে পাঁচ চৌকা স্থাপিত হয়। অর্থাৎ জন সংখ্যার তুলনায় ঐ শ্রীরাম ও শ্রীহনুমান প্রবল দেশে জাতির সংখ্যা কিছু অধিক। কেহ কাহারও ছোঁয়া খাইতে প্রস্তুত নহে। কিন্তু পরস্পরের পকেটে হস্তক্ষেপ করিতে সকলেই সর্ব্বদা প্রস্তুত।

ধর্ম্ম, কর্ম বা রাষ্ট্র যে ক্ষেত্রেই হউক না কেন; আদর্শ বিশ্বাস, ভক্তি বা শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়া শুধু মতলব ও সস্তার সুবিধা অনুকরণ করিয়া কেহ কোন বৃহৎ বা উন্নতিকর

(শেষাংশ ৭৭৯ পৃষ্ঠায়)

ব্রহ্মসাধনা

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধের নাম শুনেই অধিকাংশ পাঠক নিবৃত্ত হবেন। দু'চারজনের পাঠে প্রবৃত্তি হবে, তাঁরাও হয়তো হতাশ হবেন।

আমি একজন সাধারণ গৃহস্থ ব্যক্তি, ব্রহ্মসাধনার আমি কী জানি! কোনদিন কি সে-সাধনা করেছি? আমার এ ধৃষ্টতা কেন? আমার নিজের মনের মধ্যেই প্রশ্ন জেগেছে। তবু—তবু আমিই ব্রহ্মসাধনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছি।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম১" সবার মধ্যেই ব্রহ্ম রয়েছেন, "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ২"—এই দুই মহান্ শাস্ত্রবাক্যের সুপ্রেরণায়, আমার মধ্যে সাহস জেগেছে।

ব্রহ্ম কি? ঋষিগণও তাঁর বর্ণনা করে' বোঝাতে পারেন নি। শেষে বলে গেছেন—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ৩"! বাক্য যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। মনও যার কূলকিনারা পায় না।"

আশ্চর্য! অলৌকিক শক্তিশালী এই মন। যার সম্বন্ধে বৈদিক ঋষি বলেছেন:

"যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং—"

বাজসনেয়ি সংহিতা, ৩৪।১।

"যে-দিব্য মন জাগ্রত অবস্থায় দূরে দূরান্তরে—মুহূর্তে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে সহজেই যেতে পারে, নিদ্রিত অবস্থাতেও যে-মনের সেই গতি অব্যাহত থাকে, সেই সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ" মনও যাঁর কূল-কিনারা পায় না, এমন আশ্চর্য যে-ব্রহ্ম, তাঁর কথা আমি কী বলবো!

ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিমাত্রই আমি বলতে পারি। "বৃহ"ধাতু হতে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি। ব্রহ্ম অর্থাৎ বিরাট—মহৎ। উপনিষদ্ বলেছেন—ভূমা। যার বিপরীত হচ্ছে অল্প৪।

মানুষ মাত্রেরই বিরাটের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে। আমরা সকলেই বড়ো কিছু চাই। আমরা কেউ অল্পে তুষ্ট নই। তবে এই বড়ো সম্বন্ধে সকলের ধারণা সমান নয়। বড়োর আকৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ে মানুষে মানুষে মতের অনৈক্য!

আমি যাকে বড়ো বলি, আর একজন তাকে বড়ো বলে না। আমি বড়ো বলতে যা বুঝি, আর একজনের কাছে তা মোটেই বড়ো নয়।

তবু বলবো—বড়োকে আমরা কামনা করি এবং বড়োর জন্য আমরা সাধনা করি।

আমি বলি—ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, আস্তিক, নাস্তিক সকলেই ব্রহ্মসাধনা করছেন। সকলেই ব্রহ্মের দিকে এগিয়ে চলেছেন। গতি সকলের সমান নয়। কেউ মন্থর গতি, কেউ দ্রুত গতি। কারো গতি না মন্থর, না দ্রুত। কারো বা গতি এতই মন্থর; যে গতি আছে কিনা সন্দেহ হয়।

লক্ষ লক্ষ মানবযাত্রী সেই তীর্থে চলেছে। কেউ পদব্রজে; কেউ গোযানে, কেউ অশ্বযানে, কেউ মোটরে, কেউ ট্রেণে, কেউ প্লেন এ।

সেখানে কে কবে পৌঁছাবে—জানি না। এ জীবনে নাও পৌঁছাতে পারে। তাতেও আমরা হতাশ হই না। কেননা, আমরা আর্যেরা—বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধেরা জানি—লক্ষ লক্ষ, কোটী, কোটী জন্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই তীর্থযাত্রা। আমাদের এই ভ্রমণ যে কবে শুরু হয়েছে; কবে শেষ হবে জানি না।

আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে' ব্রহ্মের দিকে চলেছি। জন্ম-জন্মান্তর ধরে' আমরা ব্রহ্ম হচ্ছি, ঈশ্বর হচ্ছি, বুদ্ধ হচ্ছি। আমাদের মধ্যে ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ রয়েছে; বুদ্ধবিম্ব রয়েছে। ক্রমে ক্রমে তা বৃহদাকার ধারণ করছে। ক্রমে ক্রমে আমরা ব্রহ্মের দিকে, বুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলেছি। ক্রমে ক্রমে আমরা বুদ্ধ হচ্ছি, ব্রহ্ম হচ্ছি।

গুটি কেটে প্রজাপতি বের . হচ্ছে। ধীরে ধীরে আমার থেকে আমি বেরিয়ে আসছি। ধীরে ধীরে আমিত্ব ত্যাগ করে আমি ব্রহ্মত্ব লাভ করছি।

যে-দিন আমি মাতাপিতার জন্ম আমার স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিলাম, সেদিনই আমি গৃহত্যাগ করে' ব্রহ্মের অভিমুখে রওনা হলাম। যেদিন আমার নিজের গ্রাস আমার শিশুসন্তানের মুখে তুলে দিলাম, সেদিন থেকে আমার ব্রহ্ম হওয়া আরম্ভ হলো।

প্রতিবেশীর জন্ম আমি স্বেচ্ছায় ক্ষতি স্বীকার করলাম। আমি ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হলাম। গ্রামবাসীর কল্যাণের জন্ম আমি চিন্তা করতে লাগলাম, তাঁদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করলাম—ব্রহ্ম আমার দিকে অগ্রসর হলেন। গৃহহীনকে আমি আশ্রয় দিলাম, ক্ষুধার্তকে আমি অন্ন দিলাম—ব্রহ্মসাধনায় আমার অক্ষর পরিচয় হলো।

সর্বজীবের মধ্যে ব্রহ্ম রয়েছেন। তাদের অবহেলা করলে ব্রহ্মকে আমি পাব কেমন করে? মৌমাছি প্রতি পুষ্প থেকে বিন্দু বিন্দু মধু সংগ্রহ করে' বিরাট মধুচক্র নির্মাণ করে। প্রতিপ্রাণীর মধ্যে যে-বুদ্ধবিম্ব রয়েছেন, প্রতি জীবে যে-ব্রহ্ম বিন্দু রয়েছেন, সেই বিন্দু বিন্দু ব্রহ্মকে সংগ্রহ করে' ব্রহ্মের মধুচক্র হৃদয়ে নির্মাণ করবো। "রসো বৈ সঃ৫"—তিনি রসস্বরূপ। তাঁর সেই রস ছড়িয়ে রয়েছে—তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরা:৬"—স্থাবর, অস্থাবর, চেতন, অচেতন প্রতি সৃষ্টিতে তিনি রয়েছেন, এই কথা চিন্তা করে' প্রতি সৃষ্টির মধ্য থেকে তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে—যেমন করে' মধুমক্ষিকা মধুসংগ্রহ করে।

মধু—মধু—মধু! সেই মধুর শেষ নাই! আকাশ বাতাস, ওষধি, বনস্পতি, চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, মানুষ সবার মধ্যে সেই মধু, সেই আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছেন। সমস্ত পরিপূর্ণ করেও সে-মধুর শেষ নাই। পূর্ণ তবু পূর্ণ হয়েই রয়েছেন!

বিন্দু বিন্দু বারি সংগ্রহ করেই সমুদ্র হয়। ব্রহ্মকে বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ করতে করতেই একদিন আমি ব্রহ্মের সাগরে পরিণত হব। অমৃতের বিন্দুও তৃপ্তি দেয়। আনন্দ দেয়, প্রাণ দেয়।

প্রতি বিন্দু আমিত্বের বিনিময়ে প্রতি বিন্দু ব্রহ্ম লাভ করবো। এ কি কম লাভ। কাঁচ দিয়ে মণি লাভ। অবোধের কাছে অবশ্য কাঁচ ও মণির পার্থক্য নাই। বরং কাঁচের জৌলুষ মণির চেয়ে তাকে বেশী আকর্ষণ করে। তাই আমরা কাঁচকে আঁকড়ে ধরে' আছি। আমাদের সে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

কোথায় তিনি? এ কি প্রশ্ন! আলো কোথায়, তাও কি দেখিয়ে দিতে হবে? গন্ধ কোথায়—তাও কি জানিয়ে দিতে হবে? চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করো! ধীর, স্থীর হও! একাগ্র হও। একচিত্ত হও। আলো আপনি তোমার চক্ষে ধরা দেবে, গন্ধ আপনি তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করবে!

কর্ণের শ্রবণশক্তি হয়ে' তিনি কর্ণেই রয়েছেন, মনের মননশক্তি হয়ে মনেই আছেন। চক্ষের দৃষ্টিশক্তি তিনি রয়েছেন চক্ষে! সেই তিনি নয়নের নয়ন, শ্রবণের শ্রবণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ; আমার সর্বঅঙ্গে, সর্ব ইন্দ্রিয়ে, সমস্ত অস্তিত্বে, ওতঃপ্রোত হয়ে বিরাজ করছেন।

আবার সম্মুখে দৃষ্টিপাত করো—দেখো তাঁর আনন্দ রূপ! নিত্য উৎসব চলেছে তাঁর সৃষ্টিতে। নিত্য নব নব সাজে, নব নব রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি।

দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি। অথর্ববেদ, ১০।৮।৩২
"দেখো সেই জ্যোতির্ময়ের সৃষ্টি, তার জরা নাই, মৃত্যু নাই"

কবে কত লক্ষ কোটী বৎসর পূর্বে এই রূপের উদয় হয়েছে—কে জানে! কিন্তু আজও সে চিরনবীন—যেন এইমাত্র এই সৃষ্টি হলো!

জীর্ণ বৃক্ষ উৎপাটিত হচ্ছে—তৎক্ষণাৎ অসংখ্য শিশুবৃক্ষ তার স্থান পূরণ করছে। পত্রপুষ্প ঝরে পড়ছে; অগণ্য

পত্র পল্লবিত, অসংখ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হচ্ছে। নদীর স্রোতের ন্যায় সৃষ্টির স্রোত অবিশ্রাম বয়ে' চলেছে।

"সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্নবঃ ।" অথর্ব, ১০।৮।২৩।

"সে সনাতন, অথচ চিরনবীন।"

অন্তর বাহির সমস্তকে পূর্ণ করে' সেই পূর্ণ বিরাজমান। বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবাত্মা—উভয়কে সরস সজীব করে', সেই রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ উচ্ছ্বসিত! কেবল, তাঁকে দেখবার চোখ চাই; স্বচ্ছ দৃষ্টি চাই! সূক্ষ্ম এক আবরণ চক্ষের দৃষ্টি আবৃত করেছে। তাই সমস্ত পরিপূর্ণ করে বিরাজমান যে-আনন্দরূপ; তা আমি দেখছি না। এই সূক্ষ্ম আবরণটিকেই শাস্ত্র বলেছেন—"অহং"। অহং আমার চক্ষু জুড়ে আছে—আর আমি দেখবো কি!

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া॥" "গীতবিতান,"
রবীন্দ্রনাথ,

তুচ্ছ এক সূক্ষ্ম আবরণের কী শক্তি। বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত করা আলোককে সে ঢেকে ফেলেছে! সামান্য একটি মোমবাতির কী প্রভাব! আকাশছাওয়া, পৃথিবীভরা চন্দ্রালোককে সে ঠেকিয়ে রাখে!

বড়ো যিনি তিনি থাকেন সবার পিছনে। সামনে আসবার জন্য তার ব্যগ্রতা নাই। ছোট যে সেই তাড়াহুড়া করে', সকলকে ঠেলেঠুলে সামনে এসে দাঁড়ায়। বড়োকে দৃষ্টির আড়াল করে' দেয়। বড়ো কিন্তু নির্বিকার। তাঁর অভিমান নাই, অবমান নাই!

তাঁর সৃষ্টিকে তিনি আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরেছেন! তিনি আছেন আড়ালে। প্রদর্শনীতে চিত্র দেখছি চিত্রকরকে দেখছি না। তাঁর চিত্রই চিত্তকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। চিত্রকরকে খোঁজবার মত কৌতূহল আর তার নাই।

অপরূপা এই বসুন্ধরার শ্যামলিমাই চিত্তকে অভিভূত করেছে, কোন্ রস তাকে সরস রেখেছে, কোন্ অমৃত তাকে উজ্জীবিত করছে?—তার সন্ধান কে করে?

হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধাভক্তি, উজাড় করে দিয়েছি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, ভার্যা, পুত্রকন্যাদের! এই স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধার উৎস কোথায়—তার সন্ধান করে কে? সেই "সমস্ত প্রীতিরসের উৎসকে" দেবার মত, হৃদয়ে আর কোনো রস কি অবশিষ্ট আছে?

"গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা"—তাঁর সেই সামান্য জলটুকু ফিরে পেলে গঙ্গার কি আসে যায়! কিন্তু পূজকের মন পবিত্র হয়, প্রাণ পূর্ণ হয়, হৃদয় ভরে যায়! তাঁকে পূজা করি কি, না করি, তাঁর কিছুই এসে যায় না। তিনি তুচ্ছও হন না, রুষ্টও হন না। আমিই লাভবান হই। আমার মনপ্রাণ-হৃদয় ভরে' ওঠে।

তাঁকে স্বীকার করি বা না করি, তাঁর প্রেরিত কল্যাণের জন্য কৃতজ্ঞ হই বা না হই; বর্ষার বারিধারার ন্যায়, আমার মস্তকে তা অনবরত বর্ষিত হবে।

তুমি না দেখলেও সূর্য উঠবে, চন্দ্র আলোকদান করবে, ফুল ফুটবে। তুমি তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে' থাকলেও, বায়ু মধু বহন করবে, আকাশ মধু বর্ষণ করবে, পাখী গাইবে। আমের মুকুল, শালের মঞ্জরী, যূথি, বেলা, কামিনী, কেতকী, কদম্ব, শেফালী গন্ধ বিতরণ করবে।

এ জগতের রূপ রস বর্ণ গন্ধ কোনো কিছুই তোমার স্বীকৃতির অথবা প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে না। এরা যেমন, এদের সৃষ্টিকর্তাও তেমনি। অজস্র যাঁর সম্পদ, ধনের যাঁর শেষ নাই, পূর্ণ করে দিলেও যাঁর পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, তাঁর কি কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে? যার অভাব, তারই আকাঙ্খা! কোনো অংশে যার কমতি আছে, তারই আকাঙ্খা থাকবে। কিন্তু যিনি "রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চ নোনঃ" তাঁর আবার আকাঙ্খা কি?

আমি নাই বা করলাম ভক্তি, নাই বা করলাম পূজা? তাঁর কি আসে যায়? তাঁকে অস্বীকার করলেই বা তাঁর কি?

আমার নিজের জন্যেই ভক্তি, প্রীতি, পূজার প্রয়োজন। আমার নিজের জন্যেই তাঁকে আমার প্রয়োজন।

অগ্নির কাছে অগ্রসর হচ্ছি কিনা—অগ্নির তাপই আমাকে তা জানিয়ে দেবে। ব্রহ্মের দিকে চলেছি

কিনা—ব্রহ্মের আনন্দ আমাকে তা বুঝিয়ে দেবে। তিনি আনন্দময়। যে-পরিমাণে আনন্দ লাভ করবো, সেই-পরিমাণে তাঁকে পাচ্ছি বুঝবো। আমি নিরানন্দ হলে জানাবো—তাঁর থেকে আমি দূরে। আমি আনন্দিত হলে বুঝবো—তিনি আমার নিকটে।

সুখ ও আনন্দের প্রভেদ কি-তাও কি বুঝি না। নিজে আহার করে' আমি সুখ পাই, নিজের মুখের গ্রাস ক্ষুধার্তকে দিয়ে আমি আনন্দ পাই। আমার ক্ষুধার দুঃখকে ছাপিয়ে, যে-ভাব তখন আমার মনে জাগে—তাই আনন্দ। অগ্নিতে দগ্ধ হলে আমি দুঃখ পাই, অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে' একটি শিশুকে উদ্ধার করলে আমি আনন্দ পাই। অগ্নির দাহের জ্বালাকে ছাপিয়ে তখন যে-ভাব আমার প্রাণকে ভরে' দেয়, তাই আনন্দ!

জীবনে ক্ষণেকের জন্যও এই আনন্দের আস্বাদ পায় নাই, এমন দুর্ভাগা কি কেউ আছে? নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়েও তো মানুষ এই আনন্দের আস্বাদ পেয়ে থাকে। পথের ভিক্ষুকও তো কদাচ কখনো এই অনন্দের আভাস পায়। পাবেই—কেননা ব্রহ্মই আনন্দ এবং প্রত্যেকের মধ্যে অবস্থান করছেন সেই ব্রহ্ম।

স্বচ্ছ জলের অভ্যন্তরে কি আছে তা দেখা যায়। সেই জলই ঘোলা হলে তা আর দেখা যায় না। কিন্তু স্বচ্ছ অবস্থায় যা অভ্যন্তরে ছিল, ঘোলা অবস্থাতেও তা সেখানেই আছে। চিত্তে বিরাজ করছেন সেই চিত্তেশ্বর! চিত্ত স্বচ্ছ হ'লে তাঁর দর্শন লাভ হয়। মলিন হলে তিনি ঢাকা পড়ে যান। কিন্তু সততই রয়েছেন কখনো যান না, কখনো আসেন না।

ব্রহ্মকে খুঁজতে যাওয়া কস্তুরিমৃগের বনময় ছুটে বেড়ানর মত। ব্রহ্মকে খুঁজতে বাইরে যেতে হয় না। চিত্তকে কেবল নির্মল করতে হয়। রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, মোহ, মাৎসর্য—এরা চিত্তের মল। চিত্তকে মলিন করে রেখেছে। এদের দূর করো—ব্রহ্ম দর্শন হবে!

বায়ু আছে বলেই আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে আছি। তেমনি ব্রহ্ম রয়েছেন বলেই আমরা জীবন ধারণ করছি। বিশ্ব সৃষ্টি ভরে' ঐ আকাশ ভরে' আনন্দ রয়েছেন, তাই আমরা বেঁচে আছি—বাঁচতে চাইছি। জীবনে আমরা আনন্দ পাচ্ছি:

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ৩। কে নিঃশ্বাস নিতে পারতো, কে জীবনধারণ করতো, যদি আকাশ বাতাস ভরে' আনন্দরূপ ব্রহ্ম না অবস্থান করতেন।

দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, বিরহ আছে, বিচ্ছেদ আছে তবু সর্বোপরি আনন্দ রয়েছে। তা না হলে জগতে সমস্ত প্রাণী স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করতো! কিন্তু মরতে চায় কে? একমাত্র সন্তানকে হারিয়েও মানুষ বেঁচে আছে বেঁচে থাকতে চাইছে!

সবচেয়ে অভাগা সবচেয়ে দুঃখী বলে' আমরা যাকে জানি, সেও বেঁচে আছে, বাঁচতে চাইছে!

সুখীর মধ্যে ব্রহ্ম, দুঃখীর মধ্যে ব্রহ্ম! আনন্দিতের মধ্যে ব্রহ্ম নিরানন্দের মধ্যে ব্রহ্ম। প্রসন্ন, বিষণ্ণ, হতাশ নিরাশ, পাপী, তাপী, সকল প্রাণীর মধ্যেই ব্রহ্ম। সকলের মধ্যে সকল অবস্থাতেই ব্রহ্ম রয়েছেন। তিনি কখনো কাকেও ছেড়ে যান না:

> "সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ,
> তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ;
> নিরাশ্রয়জন, পথ যার গেহ,
> সেও আছে তব ভবনে।"
>
> "গীতবিতান," রবীন্দ্রনা[থ]

"অন্তি সন্তং ন জহাতি অন্তি সন্তং ন পশ্যতি" অথর্ববেদ, ১০।৮।৩২।

"ব্রহ্মের অতি সন্নিকটে তুমি আমি বাস করছি। তি[নি] আমাদের কখনো ত্যাগ করেন না। আমরাও তাঁ[কে] ত্যাগ করতে পারি না। কিন্তু সেই অতি সন্নিকটে বিরাজমান, তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে,
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে,
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥

"গীতবিতান," রবীন্দ্রনাথ।

অবির্বৈ নাম দেবতর্তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ॥ অথর্ব, ১০।৮।৩১।

তিনি কি কখনো কাকেও ত্যাগ করতে পারেন? সেই জ্যোতির্ময়ের নামই যে "অবি" অর্থাৎ "রক্ষক।" সেই সৎস্বরূপের দ্বারাই যে সমস্ত বিশ্ব পরিবৃত। পক্ষীমাতা যেমন তাঁর দুই পক্ষ দিয়ে সন্তানদের আবৃত করে রক্ষা করেন, তিনিও যে সেইরূপ বিশ্বকে রক্ষা করছেন! সেই রসস্বরূপের রসময়রূপে সম্মুখের এই বিটপীশ্রেণী হরিত। হরিতপত্রের মাল্যের দ্বারা তারা বিভূষিত।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ বাজসনেয়ি- ৪০।১৭।

এই অপরূপ হরিতবর্ণ বিটপশ্রেণী, এই তৃণপত্রপুষ্প সমাচ্ছন্না শ্যামলা ধরিত্রী, ঐ চন্দ্রসূর্যগ্রহনক্ষত্র খচিত আকাশ, এই হিরণ্ময় পাত্র সেই সত্যের মুখ ঢেকে রেখেছে। শুধু কি এই?

পিতামাতার স্নেহ, পতিপত্নীর প্রেম, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, সংসারের যাবতীয় সেরা সোনা দিয়ে আমরা ঘর তৈরি করেছি। সেই সোনার ঘরের ভিত্তিপ্রস্তরে তাঁকে ঢেকে ফেলেছি।

সেই ঢাকা খুলবে কে? তিনি ছাড়া আর কার সাধ্য সেই ঢাকা খোলে? তাই তাঁরই কাছে প্রার্থনা—"হে পূষণ, হে পোষক, হে রক্ষক, তুমিই ঐ ঢাকা খুলে ফেল। আমি সত্যকে চাই—আমাকে দর্শন দাও!"

ন মেধয়া ন বহুনাশ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। কঠোপনিষদ্, ১।২।২৩। মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৩।

মেধার দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, তাঁর দর্শন পাব কি? তিনি যদি দয়া করে আমায় বরণ করেন, তিনি যদি নিজে তাঁর আবরণ উন্মোচন করেন, তবেই তাঁর দর্শন পাব।

স্মরণাতীত কাল হতে আমাদের দেশে ব্রহ্ম সাধনা শুরু হয়েছে। কবে কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে—কত সহস্র বৎসর পূর্বে সেই সাধনা শুরু হয়—তার ইয়ত্তা করবে কে?

প্রথম ব্রহ্মোপাসক ঋষি যেমন সরলজীবন যাপন করতেন, তাঁর—ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতিও ছিল তেমনি সরল।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বিশ্বসৃষ্টির মাঝখানে, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং তার উর্দ্ধে জ্যোতিষ্ক খচিত জ্যোতির্ময় লোকের সম্মুখে অবস্থান করে' তিনি সৃষ্টিকর্তার ধ্যান করতেন:

এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন যিনি এবং আজও অনবরত অবিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টির কাজ করে চলেছেন যিনি, সেই বিশ্বলোকেশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হতেন সেই ঋষি। যে ধী দ্বারা, যে বুদ্ধির দ্বারা তিনি সেই সৃষ্টিকর্তার শক্তিকে—স্বরূপকে ধ্যান করবার চেষ্টা করতেন, তিনি জানতেন সেই বুদ্ধিও তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর বহিঃসৃষ্টির ন্যায়, অন্তরের এই ধীশক্তিও তিনি সৃষ্টি করেছেন, আমাদের অন্তরে প্রেরণ করেছেন। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রেরণ করছেন।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো
দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ঋক্, ৩।৬২।১০; সাম, ২।৮১২; বাজসনেয়ি, ৩।৩৫,২২।৯,৩০।২,৩৬।৩।

"ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সৃষ্টিকর্তা যিনি, তাঁর বরণীয় জ্যোতিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের—ধীশক্তির প্রেরয়িতা।"

তাঁরই প্রদত্ত, তাঁরই প্রেরিত ধীশক্তির দ্বারা তাঁরই সৃষ্ট অপরূপ এই বিশ্বলোকের এবং বিশ্বলোকেশ্বরের ধ্যান করতে করতে, গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হতেন ঋষি।

সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট ঋষির কোনো প্রার্থনা নাই। ধন, মান, যশঃ, বিদ্যা, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, এমন কি মুক্তিরও প্রার্থনা করেন নি সেই ঋষি। কেবলমাত্র তাঁর ধ্যান করেছেন।

তবৈকভাবৈকরসং মনঃ—কুমারসম্ভব, ৫।৮২

সেই রসস্বরূপের রসে নিমগ্ন হয়েছেন যিনি, আনন্দময়ের আনন্দপারাবারে ডুব দিয়েছেন যিনি, তিনি আর কি প্রার্থনা করবেন? আর প্রার্থনা করবার আছে কি?

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

ভগবদ্গীতা, ৪।২৪।

ব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে দৃষ্টির আবরণ যাঁর মোচন হয়েছে, সত্যদৃষ্টি যিনি লাভ করেছেন, জগৎ যাঁর কাছে ব্রহ্মময় হয়ে গেছে, ধ্যাতা এবং ধ্যেয় যাঁর কাছে একাকার হয়ে গেছে; যজ্ঞের অগ্নি যাঁর ব্রহ্ম, আহুতিও যাঁর ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, হোতব্য ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মে পরিণত ব্রহ্মোপাসকের আবার প্রার্থনা কি? কার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি? পূর্ণের চেয়ে পূর্ণতর কিছু আছে কি? ব্রহ্মের চেয়ে ব্রহ্মতর নিধি কোথায় পাওয়া যাবে?

উমা তপস্যা করছেন—কঠোর তপস্যা! তপস্যার তেজে সমস্ত কলুষ ভস্মসাৎ হলো। দৃষ্টি ক্রমশঃ স্বচ্ছ হতে লাগলো:

"তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পম্।" পাতঞ্জলদর্শন, ৪।৩১।

সমস্ত আবরণ মোচন হতে হতে, জ্ঞানের পরিধি, দৃষ্টির পরিধি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জগৎকে এক নতুন দৃষ্টিতে তিনি দেখছেন: কী দেখছেন?

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।

কঠোপনিষদ্, ২।৬।২।

জগতে সর্বত্র এক প্রাণের কম্পন। প্রাণের উৎস থেকে প্রাণ উচ্ছ্বসিত। দিকে দিকে প্রাণের লীলা চলেছে। শরীর ধারণের জন্য আহার প্রয়োজন। কিন্তু আহার করবেন কি? আহার করতে গেলে যে প্রাণনাশ করতে হয়।

ফলাহার! ফলের মধ্যেও যে প্রাণ। শেষে ফলাহারও তিনি ত্যাগ করলেন। পর্ণাহারে প্রাণ রক্ষা হতে লাগলো। পরিশেষে পর্ণগ্রহণ করতেও তিনি প্রাণে ব্যথা অনুভব করলেন। দেহ হতে অঙ্গ ছিন্ন করলে যেমন ব্যথার অনুভূতি হয়, তরু শাখা হতে পর্ণ ছিন্ন করতে গিয়ে উমাও সেইরূপ ব্যথা অনুভব করলেন। আহারের জন্য পর্ণও তিনি আর গ্রহণ করলেন না—তাই তিনি হলেন অপর্ণা! জগতের সমস্ত প্রাণকে তিনি যখন নিজের প্রাণের সঙ্গে একীভূত দেখলেন, জগতের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র প্রাণের বেদনা যখন তিনি নিজের প্রাণে সমানভাবে, একই ভাবে অনুভব করলেন—নদী যেমন সমুদ্রে মিশে এক হয়ে যায়, তেমনি তাঁর প্রাণও যখন জগতের সকল প্রাণের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল, তখন তিনি অনন্তজীবন৯ ও শিবপদ লাভ করলেন।

উমার তপস্যা ভারতেরি তপস্যা। ভারতের সকল যুগের সকল তপস্যা রূপকাকারে উমার তপস্যারূপে বর্ণিত হয়েছে।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং১০
বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ। মনুসংহিতা, ৬।৪৬।

সাবধানে পদক্ষেপ করো। অসংখ্য ক্ষুদ্রপ্রাণীর প্রাণনাশ হয় তোমার এক পদক্ষেপে। বস্ত্রের দ্বারা ছেঁকে জলপান করো, অসংখ্য প্রাণনাশ হবে তোমার এক গণ্ডুষ জলপানে!

ভারতেরি তপস্বী সম্প্রদায়ের এক অংশ আজও অতি সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করেন—অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ প্রাণী, চক্ষে যাদের দেখা যায় না, তাদের প্রাণরক্ষার জন্যও তাঁদের প্রযত্নের আর অন্ত নাই। কত ক্লেশ, কত কষ্ট, কত শ্রম, করছেন তাঁরা এই সামান্য প্রাণরক্ষার জন্য।

প্রাণ যে সেই মহাপ্রাণেরই অঙ্গ। আমার প্রিয়তমের অঙ্গে আঘাত করি আমি কি করে?

প্রাণায় নমো যস্য সর্বমিদং বশে।
যো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো যস্মিন সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥

অথর্ব, ১১।৪।১।

"সেই প্রাণ, সেই প্রিয়তম প্রাণকে প্রণাম করি। যে-প্রাণের বশীভূত এই জগৎ। যে-প্রাণ সমস্ত প্রাণের ঈশ্বর। যে-প্রাণে সর্ব বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত।"

প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে পিতা পুত্রমিব প্রিয়ম্। ঐ, ১১।৪।১০।

"পিতা যেমন প্রিয় পুত্রের সঙ্গে, তেমনি যে-প্রাণ সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে বাস করছেন, সেই প্রাণের অংশ, কোনো ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণকেও আঘাত করবো কোন্ প্রাণে। প্রিয়পুত্রকে আঘাত করলে, সে যে পিতার বুকেই বাজবে!

সেই প্রাণের উপাসনা করতে হলে সমস্ত প্রাণরক্ষার ব্রত গ্রহণ করতে হবে।

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।

অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥ ভাগবত, ৩।২৯।২৭।

ভগবান বলছেন:

"যদি তোমরা আমার পূজা করতে চাও, তবে সর্বজীবে সমদর্শী হওয়া। সকল প্রাণীকে মিত্রের চক্ষে দেখ। জীবকে দান করো। জীবকে সম্মান করো। সর্বজীবের দেহ-দেবালয়েই আমার নিবাস।

যেষাং সুখে যান্তি মুদং মুনীন্দ্রা

যেষাং ব্যথায়াং প্রবিশন্তি মন্যুম্।

তত্তোষণাৎ সর্বমুনীন্দ্রতুষ্টি—

স্তত্রাপকারেঽপকৃতং মুনীনাম্॥ শিক্ষাসমুচ্চয়, ৭ম পরিচ্ছেদ।

"যাঁদের সুখে মুনীন্দ্র বুদ্ধগণ সুখী হন, যাঁদের ব্যথায় তাঁরা ব্যথিত হন। সেই প্রাণীগণের সন্তোষেই বুদ্ধগণের সন্তোষ। প্রাণীগণের অপকারই তাঁদের অপকার।"

জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি সর্বপ্রাণীর দুঃখের ভার নিজ মস্তকে গ্রহণ করেন। তা না করে' তিনি থাকতে পারেন না। কেননা, জগৎকে তিনি মাতার ন্যায়, পিতার ন্যায় ভালবাসেন:

অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা। মহাভারত, অনুশাসন, ১১৬।৪১।

তপ্যন্তে লোকতাপেন প্রায়শঃ সাধবো জনাঃ।

পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥ ভাগবত, ৮।৭।৪৪

"সাধুব্যক্তিগণ প্রায়ই সমস্ত প্রাণীর দুঃখ তাপে তপ্ত হন। সকলের দুঃখতাপে এইরূপ তপ্ত হওয়াই সেই বিশ্বেশ্বর পরম পুরুষের পরম পূজা!"

দুঃখমেব পরা পূজা। শোক এব পরাপূজা। দুঃখই হলো তাঁর পূজায় সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। শোকই তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ পুষ্পাঞ্জলি। এই একটি মাত্র নিজস্ব বস্তু আমাদের আছে—যা তাঁকে আমরা দান করতে পারি!

দেবগণ এবং দানবগণ সমুদ্রমন্থনে অবতীর্ণ হলেন। সমুদ্র মন্থন করলে অমৃত উঠবে। সেই অমৃত পান করে তাঁরা অমর হবেন। দেবগণের একক শক্তিতে সমুদ্রমন্থন সম্ভব নয়, তাই চিরশত্রু দানবগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরা কাজে নামলেন।

দীর্ঘকাল অমানুষিক, আসুরিক পরিশ্রমের পর, যখন তাঁরা উভয়েই আশা করছেন—এবার অমৃত উঠবে, তখন কিনা উঠলো—হলাহল। সে এক ভয়ংকর মারাত্মক বিষ! সেই বিষবাষ্পের তেজে সৃষ্টি ধ্বংস হবার উপক্রম হলো।

অমৃতাভিলাষী সুরাসুরের সাধ্য নাই সেই বিষ নষ্ট করেন। তাঁরা বিপদে পড়ে মহাদেবের শরণ নিলেন।

পরম তপস্বী মহাদেব, যিনি একান্তে অবস্থান করছিলেন, তিনি প্রাণীজগতের প্রতি সমবেদনায়, তৎক্ষণাৎ সেই হলাহল স্বয়ং পান্ করতে লাগলেন। বিশ্ব অসীম বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই ভয়ংকর বিষ তাঁর তুষারশুভ্র কণ্ঠকে দগ্ধ করে' নীল করে' দিল। সেই থেকে মহাদেব হলেন—নীলকণ্ঠ!

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবগণ নীলকণ্ঠের সমধর্মী। তাঁরা বলেন:

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্

অষ্টর্দ্ধিযুক্তাম পুনর্ভবং বা।

আর্তিং প্রপদ্যে খিলদেহভাজাম্

অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥ ভাগবত, ৯।২১।১২

'আমি স্বর্গ চাই না, ঋদ্ধি সিদ্ধি চাই না, মুক্তি চাই না। জগতের সকল প্রাণীর সকল দুঃখ আমিই গ্রহণ করতে' চাই। যতদিন পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর দুঃখ দূর না হয়, ততদিন পর্যন্ত আমি এই সংসারে অবস্থান করবো!

ভারতের কিশোর বালক পর্যন্ত বলছেন:

নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ।

ভাগবত, ৭ ৯।৪৪।

"এই দুঃখী প্রাণীদের পরিত্যাগ করে' আমি একা মুক্তি চাই না।"

পরান্তকোটিং স্থাস্যামি সত্ত্বস্যৈকস্য কারণাৎ।

শিক্ষাসমুচ্চয়; ১ম-পরিচ্ছেদ।

"একটি প্রাণীর জন্যও আমি সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত এই সংসারে—অবস্থান করবো!"

এই ব্রহ্মসাধনা! বৌদ্ধেরা একেই "ব্রহ্মবিহার" বলেছেন:

এই সাধনার দ্বারাই ব্রহ্মের স্থায় চিত্তের নির্দোষতা, বিশুদ্ধতা লাভ হয়।

যিনি অপাপবিদ্ধ—বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন হবে কি করে'?

"Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

"Blessed are the pure in heart: for they shall see God." Bible.

এই সাধনা কবে ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে—কে বলবে?

ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন:

"পতিত যে তাকে তুলে নাও। অবনত যে তাকে উন্নত করো। কলুষিত যে তাকে পবিত্র করো। পাপে যে মৃতপ্রায় তাকে পুনর্জীবন দান করো।" ঋক্, ১০।১৩৭।১; অথর্ব, ৪।১৩।১।

"সদ্যোজাত বৎসকে গাভী যে-ভাবে ভালবাসে, তোমরা পরস্পরকে সেইভাবে ভালবাসো।" অথর্ব, ৩।৩০।১।

ব্রহ্মের উপাসনা করতে চাও, তাঁর পূজার পুষ্প সংগ্রহ করো:

"জ্ঞান, সমদর্শন, শান্তিই তাঁর পূজার শ্রেষ্ঠ পুষ্প।"

"সজ্জনের হৃদয়গামী, চন্দ্রের মত শীতল মধুর মৈত্রীর দ্বারা হৃদয়স্থিত পরমাত্মার উপাসনা করো।" যোগবাসিষ্ঠ, নির্বাণ প্রকরণ, পূর্বভাগ, ২৯।১২৭; ৩৯।৩৯।

কোনো প্রাণীর প্রতি মনে যদি কথনো বিদ্বেষ জাগে, তখনি সহস্রকল্প সঞ্চিত, সর্বকুশলকর্ম দান, ভগবৎ-পূজা সমস্তই নষ্ট হয়।" বোধিচর্যাবতার, ৬।১।

প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষ ব্রহ্মসাধনার পথে হিমালয়ের স্থায় দুরতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বশাস্ত্রের ঐ সার কথা।

"সর্বজীবে অবস্থিত নারায়ণ আমাকে পরিত্যাগ করে যে মূঢ়তাবশতঃ কাষ্ঠপাষাণাদি প্রতিমায় পূজা করে—সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়।" ভাগবত, ৩।২৯।২২।

যুগযুগ ধরে' অগণ্য ভারতবাসী আমরা এইরূপে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিচ্ছি।

> "মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
> ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।......
> শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার
> মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার
> তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না কি
> নেমেছে ধূলার পরে হীন পতিতের ভগবান
> অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।"
> —"গীতাঞ্জলি", রবীন্দ্রনাথ।

অবজ্ঞাত ব্যক্তি হলেন হরিজন:

> সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ,
> তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ;"

হরিকে পেতে হলে সেই অবজ্ঞাত ব্যক্তির শরণ নিতে হবে। তাঁর সেবা করতে হবে। তোমার 'অহং' তোমার গর্ব, তোমার দর্প বিসর্জন দিয়ে তোমাকে "মাথা নত করা"র তপস্যা করতে হবে। সেই তপস্যা হচ্ছে:-

"সর্বজীবে ব্রহ্ম রয়েছেন—যতদিন পর্যন্ত এইভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি না হয়, ততদিন পর্যন্ত চণ্ডাল, কুকুর,

গো, গর্দভ প্রভৃতি প্রাণীকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে। তুমি শ্রেষ্ঠ, তারা নিকৃষ্ট, এই অহংকার চূর্ণ করে, আত্মীয় স্বজনের পরিহাস বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে, লজ্জাগ্লানি বিসর্জন দিয়ে, কায়মনোবাক্যে এইভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করবে।" ভাগবত, ১১।২৯।১৬-১৯।১০

ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্মসাধনা সহজ নয়। কিঞ্চিৎ গন্ধপুষ্প সংগ্রহ করে' দিনের মাথায় একবার, দুবার, কি তিনবার ঘণ্টাখানেক বসে' ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। ব্রহ্মসাধনার পথ বড় দুরূহ :

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কঠোপনিষদ্, ১।৩।১৪।

ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের উপর দিয়ে সেই পথ—বড়ই দুর্গম। বড়ই দুরূহ! ঐ পথের যাত্রী যাঁরা, সেই মনীষিগণ এই কথা বলে গেছেন।

ব্রহ্মবাদী ঋষির নিকট গুহ্য ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করতে গেলেন শিষ্য। ঋষি বল্লেন :

"সেই গুহ্য ব্রহ্মের কথা আমি তোমাকে বলছি : মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নাই।" মহাভারত, শান্তি, ৩০০।২০।

অদ্ভুত উত্তর! ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করা হোলো। উত্তর হোলো :

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।" চণ্ডীদাস।

একথার অর্থ কি? ব্রহ্ম বলে' কি কিছু নাই? ঋষি কি ব্রহ্মে অবিশ্বাসী, নাস্তিক? তিনি কেন এমন অদ্ভুত উত্তর দিলেন?

তাঁর সেই উত্তরের অর্থ বুঝিয়েছেন—দু-হাজার বছর পরে এক কবি :

"ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সঙ্গোপনে
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে'
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার 'পরে।—"গীতাঞ্জলি।

ব্রহ্ম কোথায়? স্বর্গে, বৈকুণ্ঠে, ব্রহ্মলোকে? স্বর্গে নয়, বৈকুণ্ঠে নয়, ব্রহ্মলোকে নয়—এই সংসারেই তিনি রয়েছেন :

"কোথাও স্ত্রীরূপে, কোথাও পুরুষরূপে, কোথাও কুমাররূপে, কোথাও কুমারীরূপে, কোথাও দণ্ডধারী জীর্ণ বৃদ্ধরূপে তিনি ভ্রমণ করছেন। সমস্ত বিশ্বে, দিকে দিকে, তিনিই জন্ম নিয়েছেন।

"পিতারূপে, পুত্ররূপে, জ্যেষ্ঠরূপে, কনিষ্ঠরূপে প্রকটিত রয়েছেন সেই একই ব্রহ্ম। অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করেছেন সেই একই ব্রহ্ম। বিশ্বে প্রথম যিনি জন্ম নিয়েছেন, তিনিও সেই ব্রহ্ম! আজ এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই; গর্ভের মধ্যে রয়েছেন যিনি, তিনিও সেই ব্রহ্ম!" অথর্ববেদ, ১০।৮.২৭-২৮।

"দেহ-দেবালয়ে সেই কল্যাণময় ব্রহ্ম বিরাজ করছেন।" মৈত্রেয়োপনিষদ্. ২.১।

এই ব্রহ্ম। যে-ব্রহ্মের বিষয় বাক্যে প্রকাশ করা যায়। এর উর্ধ্বে যে ব্রহ্ম—তা অনির্বাচ্য।১২ বাক্য সেখানে নীরব, ভাষা সেখানে মূক, চিন্তা সেখানে পঙ্গু।

সেই অরূপের রূপকল্পনা, অনির্বাচ্যের স্তুতি এবং সর্বব্যাপীর স্থানবিশেষে অনুসন্ধান—অপরাধ।

ব্রহ্মবাদী ঋষি সেই অপরাধত্রয়ের মার্জনা চেয়েছেন :

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্।
স্তুত্যা নির্বচনীয়তাঽখিলগুরোর্দূরীকৃতং যন্ময়া।
ব্যাপিত্বং চ বিনাশিতং ভগবতো যৎ
তীর্থযাত্রাদিনা

.কস্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥

অরূপ তুমি! ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করেছি।
অনির্বচনীয় তুমি! স্তুতিবাক্যে তোমায় খণ্ডিত করেছি
অসীম তুমি! তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমায় সীমিত করেছি।
হে জগদীশ্বর, আমার ঐ অপূর্ণতা দোষত্রয়ের জন্ম আজ ক্ষমা চাই।

১। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩.১৪।১ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৪।১০; ২।৪।৫; ২।৫।১; ২।৫।১৯ ইত্যাদি।

২। ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যৎ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ মহানির্বাণ তন্ত্র, ৮।২৩

৩। তৈত্তিরীয়, ২।৪।

৪। সর্বধাতুভ্যো মনিন্॥ বৃংহেনোঽচ্চ॥ উণাদি, ৫৭৪-৫॥ যো বৈ ভূমা তৎ সুখম। নাল্পে সুখমস্তি। ছান্দোগ্য, ৭।২৩।

৫। রসো বৈ সঃ। তৈত্তিরীয়, ২।৭।

৬। ইহ চেদ্ অবেদীদ্ অথ সত্যম্ অস্তি ন চেদ্ ইহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি। কেন, ২।৫।

৭। পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে।
উতো তদ্ অদ্য বিদ্যাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে ॥ অথর্ববেদ, ১০।৮।২৯।

৮। অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভু রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চ নোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানং ধীরম্ অজরং যুবানম্॥ অথর্ব, ১০।৮।৪৪।

৯। যৎপ্রাণানাং জগৎপ্রাণের্বীনাম্ ইব সাগরৈঃ।
অনন্তে বো ব্যতিকরস্তদ্ এবানন্তজীবনম্॥

১০। তুলনীয়ঃ—জয়ং চরে জয়ং চিট্‌ঠে জয়ং আসে
জয়ং সএ
জয়ং ভুঞ্জন্তো ভাসন্তো পাবং কম্মং ন বন্ধ ঈ ॥

সাবধানে চলিবে। সাবধানে দাঁড়াইবে। সাবধানে বসিবে। সাবধানে ঘুমাইবে। সাবধানে খাইবে—সাবধানে কথা কহিবে—তাহা হইলে পাপে আবদ্ধ হইবে না।

১১। বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াং চ দৈহিকীম্
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবাশ্বচণ্ডাল গোখরম্।
যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদ্ এবম্ উপাসীত বাঙ্‌মনঃ কায়বৃত্তিভিঃ॥ ভাগবত ১১।২৯।১৬-১৭

সর্বজীবে আমি সর্বদা বিদ্যমান—যতদিন পর্যন্ত এই ভাবে মনে প্রাণে উপলব্ধি না হয়, ততদিন পর্যন্ত কুকুর চণ্ডাল, গো, গর্দভ ইত্যাদি প্রাণীকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তুমি শ্রেষ্ঠ, তাহারা নিকৃষ্ট, এই অহংকার চূর্ণ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের পরিহাস বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া, লজ্জা গ্লানি বিসর্জন দিয়া—এইভাবে কায়মনবাক্যে আমার উপাসনা করিবে।

১২। বাষ্কলি বাহ্বকে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন বাহ্ব নীরবতা বা নিরুত্তরতার দ্বারা সেই জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন। বেদান্তদর্শন—শাংকরভাষ্য, ৩।২।১৭।

মঞ্জুশ্রী অদ্বয়তত্ত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, নানাজনে তাহার নানারূপ বর্ণনা দেন। কিন্তু বিমলকীর্তিকে তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি একেবারে নীরব থাকেন মঞ্জুশ্রী বলেন—"সাধু! সাধু! বিমলকীর্তি! আপনি অদ্বয়তত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন। অদ্বয়তত্ত্বে প্রবেশ করিলে মানুষ বাক্যহারা হয়।"

EASTERN BUDDHIST, Vol. IV No. 2,192
pp. 177-183

মহাভারতের ঐ ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মতত্ত্বের উত্তর আর কীভাবে দিবেন?

"প্রপঞ্চাতীতের বর্ণনা সম্ভব নহে। সর্বপ্রকার জ্ঞানে

অতীত হওয়ায় উহা বর্ণনাতীত। কোনো প্রকারেই উহাকে বুদ্ধির বোধগম্য করা যায় না। কেমন করিয়া উহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিব?

"সর্ব-উপাধিবর্জিত বলিয়া সেই প্রপঞ্চ বিনির্মুক্ত পরমার্থ সত্যতত্ত্বকে কোনপ্রকার কল্পনার দ্বারাও ধারণা করা যায় না। কল্পনার অতীত বলিয়া উহা শব্দেরও বিষয়ীভূত নহে। শব্দ হইতেছে কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক। যাহা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তাহা কেমন করিয়া শব্দের বিষয় হইবে? অতএব সর্বপ্রকার কল্প, বিকল্প, ভাব, ভাষা-ভাবণ-বিহীন হেতু, আরোপ বিরহিত, সংবৃতি বিবর্জিত, অব্যবহার্য, অনভিলাপ্য, অনির্বচনীয় পরমার্থতত্ত্ব কী রূপে প্রতিপাদন করিব?

"পরমার্থ সত্য যদি কায়, বাক, ও মনের বিষয়ীভূত হইত, তাহা হইলে তাহাকে আর পরমার্থ বলা যাইত না। তাহা সংবৃতিসত্যই হইয়া যাইত। অতএব উহা সর্ব বিশেষণের বহির্ভূত। ভাব, অভাব, স্বভাব, পরভাব, সত্য, অসত্য, শাশ্বত, উচ্ছেদ, নিত্য, অনিত্য সুখ, দুঃখ, শুচি, অশুচি, আত্মা, অনাত্মা, শূন্য, অশূন্য, একত্ব, অন্যত্ব, উৎপাদ, নিরোধ ইত্যাদি কোন বিশেষণই, কোনো শব্দই পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না।

"উহা অনভিলাপ্য, অনাজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়, অদেশিত, অপ্রকাশিত। উহা অক্রিয়, অকরণ ইত্যাদি।" বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা, নবম পরিচ্ছেদ।

তুলনীয়: অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদি।"

বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮।

"অসুখ, অদুঃখ।" মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২০৬।১৩।

"অনিরোধ, অনুৎপত্তি, অশাশ্বত, অনুচ্ছেদ।"

মাণ্ডুক্যকারিকা, ২।৩২; ৪ ৫৭।

"অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য॥" মাণ্ডুক্যোপনিষদ, ৭।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্ নাসদ্ উচ্যতে॥ বেদান্ত-দর্শন, ৩।২।১৭; ভগবদ্গীতা, ১৩।১২।

মাসী

(উপন্যাস)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

যাবে কি হ'ল? মলিনার ডাক্তারদার সঙ্গে নির্মলার কি সম্পর্ক যে, তাঁর কথা মত তাকে চলতে হবে? সে একমাত্র মলিনাকেই জানে। আর মলিনাই স্বচ্ছন্দে যেতে পারত, আচ্ছা, ছেড়ে দিলাম আসলে নির্মলাকে ছাড়তে চায় না এরা। এদের লোক কম, তাই যাকে একবার ধরে, সহজে তাকে মুক্তি দেয় না। এই একটু আগেই ত মলিনা বলেছে, ছাড়াছাড়ি নাই। দিন-দুই পরে ঠিক সে ঘুরে আসবে, এসে বলবে, কি করুন, ডাক্তারদা কইল, ছাড়ন কি যায়!

আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে চায় ব'লে ঐ একটু প্রবোধ দিয়ে গেল আর কি।

মলিনা চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ মনের উত্তাপটা একই ভাবে রইল তার। ধিক্কার আসছে তার অদৃষ্টের উপর। ভাবছে, আমার এই অতিশপ্ত জীবনটা ভাল করে শুরু করবার আগেই শেষ ক'রে দেবার জন্যে আমি পৃথিবীতে এসেছি। ভগবান্ যদি বা আমাকে ছাড়েন ত এরা ছাড়বে না। এরা যদি ছাড়ে ত আমার পথে মৃত্যুর করাল ছায়া ফেলে আর কেউ এসে জুটবে। আমাকে কিছুতেই বাঁচতে দেওয়া হবে না, এই রকম একটা ষড়যন্ত্র যেন কোথাও চলছে।

বড় বাড়ীটার পিছনে একটা জায়গায় কিছু বেত আর বাঁশ নিয়ে বসে নিজের ঘরটার জন্যে ছোট এক-সেট চেয়ার ও টেবিল বানাচ্ছে জগন্নাথ। অবসর সময় আজকাল এই সে করে। সেইখানে গিয়ে তার শেষ ক'রে রাখা একটা বেতের চেয়ারে চুপচাপ ব'সে রইল কিছুক্ষণ।

ভাবতে লাগল, এই মানুষটাকে যদি সব বলছে পারতাম, আমার আর কোনো ভাবনাই থাকত না আমার সব ভাবনা আমার হয়ে ও একাই ভাবত। দি ক'রে কি করত জানি না, আমাকে এই বিপদ্ থেকে ঠিকই রক্ষা করত। কিন্তু ওকে বলা ত সত্যিই যায় না বললে, সেটা যে ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ হবে আর মলিনার মুখে কয়েকটা গল্প যা শুনেছে, তাতে মনে হয়, তার পরিণামও হতে পারে ভয়াবহ। অর্থাৎ হয় ফাঁসী যাও, নয় দলের লোকের গুলী খেয়ে মর অবস্থাটা চমৎকার।

মনের ঐ রকম উত্তপ্ত অবস্থা নিয়েই কাজে গেল বিকেল চারটে অবধি ডিউটি ছিল। তারপর কাপড় চোপড় বদলে চা খাওয়ার পর্ব্ব সমাপ্ত ক'রে যখ মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্যে ছাতে বেড়াতে যাবার জন্যে উঠছে তখন দিবাকর এল।

ঘরে ঢুকে কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রেই বলল, "এ আশা করেছিলাম তুমি যাবে, কিন্তু গেলে না। জগন্না যেতে চায় সেটা আমাকে বললেই ত হ'ত, আর একটা কার্ড রেখে যেতাম। নিজেরটা তাকে দিতে হ'ল কেন।"

নির্মলা বলল, "না, না, ও যেতে চাইছিল ব'লে নিজেরটা ওকে আমি দিইনি। নিজে যখন যাব ঠিক করলাম, তখন ভাবলাম, একটা টিকিট কেন ন হয়, তাই ওকে গিয়ে বললাম, আমার টিকিটটা নিয়ে তুমি যাও। ওর খুব ইচ্ছে ছিল না, নিতান্ত আমি বললাম বলেই গেল।"

দিবাকর বলল, "কিন্তু তুমি যাবে ব'লেও গেলে না কেন?"

নির্মলা বলল, "চল বেরুই, পথে যেতে যেতে বলব।"

গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় বেতের একটা টিফিন বাস্কেট হাতে ঝুলিয়ে জগন্নাথ এসে দাঁড়াল এক-মুখ হাসি নিয়ে। দিবাকরকে বলল . "এটা আপনার জন্যে বানিয়েছি।"

খুলে দেখাল বাস্কেটের ভিতরটা। একদিকে গোল-গোল ছোট চারটে খোপ, দু বোতল লেমনেড ও দুটো গেলাস রাখবার জন্যে। অন্যদিকে খাবার-দাবার ও বাসন-কোসন রাখবার আলাদা আলাদা খোপ। ধব-ধবে পরিষ্কার বেতের আঁটসাঁট বুননে সুন্দর-করে তৈরী জিনিষটা।

দিবাকর বলল, "বাঃ ভারী চমৎকার জিনিষটা ত।" তারপর চোখে একটা প্রশ্ন নিয়ে নির্মলার দিকে তাকিয়ে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল, নির্মলা অল্প একটু জিভ কেটে মাথা নাড়ল। জগন্নাথ হাসছে।

পথে বেরিয়ে দিবাকর বলল, "মেহনত যা করতে হয়েছে তার কথা নাহয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু জিনিষগুলি কিনতে পয়সা খরচ হয়েছে ত?"

নির্মলা বলল, "সে-সব ভাববার কিছু দরকার নেই। ও আমাদের ঘরেরই লোকের মত।"

প্রথম যে লাল আলোয় গাড়ী থামাতে হ'ল সেখানে একটা আঙুলের নখ কামড়াল দিবাকর কিছুক্ষণ। তারপর গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "বাস্কেটটা তোমার নাম করে বাবাকে দেব। খুবই খুশী হবেন।"

নির্মলা বলল, "তাই দিও যদি চাও। কিন্তু দেখো, জগন্নাথ যেন না জানতে পায় সেটা।"

দিবাকর বলল, "জানতে পেলে দুঃখ পাবে, বলতে চাইছ ত?"

নির্মলা বলল, "না, এত অল্পেতে দুঃখ পাবার মত স্বভাব তার নয়। কিন্তু জানতে পেলে আর একটা বাস্কেট বানাতে বসে যাবে তোমার জন্যে।"

দিবাকর বলল, "ও কি ক'রে জানবে? জানবে না।" একটু পরে বলল. "কাল কেন যাওনি এখন বলবে সেটা?"

নির্মলা বলল, "তোমাকে ত সেখানে এরকম কাছে পেতাম না, নিজের কাজ নিয়ে থাকতে। কি হ'ত গিয়ে?"

দিবাকর বলল, "ওটা কোনো কথাই নয়। আসল কারণটা কি বল।"

নির্মলা বলল, "যদি বলি ইচ্ছে করল না?"

দিবাকর বলল, "নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে সেটা রক্ষা করাটা ভদ্র রীতি, ইচ্ছে না করলেও সেটা পালন করতে হয়।"

নির্মলা বলল, "তোমার সঙ্গে কি আমার ভদ্রতার সম্পর্ক?"

দিবাকর বলল, "সম্পর্কটা কি তাহলে অভদ্রতার?"

নির্মলা বলল, "কথাগুলি একটু শক্ত শোনাচ্ছে না কি?"

দিবাকর চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, "শোন নির্মলা। আর তোমার কাছে আসব কি আসব না, এই নিয়ে কাল থেকে নিজের সঙ্গে আমার দ্বন্দ্ব চলেছে সারাক্ষণ। শেষে এই শক্ত কথাগুলি তোমাকে শোনানো উচিত মনে ক'রেই চলে এলাম, নাহলে হয়ত আর আসতামই না।"

নির্মলা বলল, "ওরে বাবা। তাহলে বলব, যত ইচ্ছে, যেমন খুশি, শক্ত শক্ত কথা আমাকে তুমি শোনাও। আর আসবে না এমনটি যেন না হয়।"

নির্মলার নিপীড়িত মন যখন অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জীবনটার কাছ থেকে কিছু পেতে চাইছিল, তখন এল দিবাকরকে হারাবার এই ভয়। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে এসেছে তারা তখন। সেই আর-এক দিনের মত আজও নির্মলাই বলল, "নদীর ধারটা ঘুরে আসব একটু?"

দিবাকর গাড়ীটাকে পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "চল।"

আজও সেদিনেরই মত প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে দুটি বড় রাস্তার মাঝখানে ছোট একটি যোজকের মত সিঁড়ি-

বিজি রাস্তাটার একপাশে গাড়ীটা এনে রাখল দিবাকর।

সে ভাবছিল, পথে নির্ম্মলাকে অত্যন্ত কঠিন তিরস্কার সে করেছে, হয়ত তার প্রতিবাদে কিছু বলতে চায় বলেই নির্ম্মলা আজ তাকে এনেছে এখানে। কিন্তু নির্ম্মলা বলল না কিছুই। একটুক্ষণ নীরবে কাটবার পর দিবাকরের হাতটা আস্তে টেনে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল।

যে দুটি উন্মুখ প্রবাহ এক প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় পুরীর সমুদ্রতটে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এক হয়ে মিশে যেতে চেয়েছিল, পারেনি, আজ এখানে আর একটি প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় তাদের মিলিত প্রবাহ এখনই উদ্দাম হয়ে বইত, কিন্তু আজও নির্ম্মলাই বাধা দিল। বলল, "কি করছ? ডানদিকে দেখ একটু।"

একটু দূরে বারো-তেরো বৎসর বয়সের একটি ভিখারিণী মেয়ে, সাত-আট বৎসর বয়সের একটি ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে দেখছিল। ওরা গাড়ী ঘুরিয়ে এক্ষুণি চলে যাবে, না থাকবে কিছুক্ষণ, আঁচ করতে পেলে হয়ত ওদের অভ্যস্ত কাতরোক্তিগুলি করতে করতে এগিয়ে আসবে ভাবছিল।

দিবাকর বলল, "ওরা আমার সঙ্গে পারবে?" তারপর একটু জোর গলায়, "এই রে! এদের দেব বলে যে সিকিটা বের করলাম, সেটা গেল কোথায়? বোধহয় এইখানে পড়েছে," ব'লে বাঁদিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে স্যাণ্ডাল-সহ নির্ম্মলার ডান পাটিকে নিজের বাঁহাতের তেলোর করে তুলে নিয়ে তার চাঁপাফুলের মত পাঁচটি আঙুলে গুনে গুনে পাঁচটি চুমো খেল সে। নির্ম্মলা বাধা দেবে কি? বাধা দিতে গেলে যে বিপদ্ বাধবে। ছেলে-মেয়ে-দুটো এত কাছে রয়েছে যে, পা-টা নিয়ে অল্প একটু টানাটানি করলেও তারা ঠিকই টের পেয়ে যাবে, যে, একটা গোলমেলে ব্যাপার কিছু হচ্ছে।

পায়ের আঙুলে চুমো খাওয়ার পর্ব শেষ করে দিবাকর সোজা হয়ে বসল, বলল, "নাঃ, পেলাম না। যাকগে।" তারপর পকেট থেকে একটা সিকি বের ক'রে বাচ্চাদুটোকে বলল, "এই, এদিকে এস। এই নাও। এবার পালাও দেখি এখান থেকে।"

তারা চ'লে গেলে দিবাকরের ঠোঁটদুটো রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে গেল নির্ম্মলা, পারল না, দিবাকর চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল তার হাত। তারপর দিবাকরের চুমোর গতিতে যখন ক্রমশঃ বিক্ষিপ্ততা আসছে তখন ভয় পেয়ে নির্ম্মলা তার মুখটা দুহাতে ধরে টেনে নিল নিজের মুখের উপর।

অদূরে গঙ্গা-স্রোত ধীরগতিতে বইছে, কিন্তু কি অস্থির তরঙ্গসঙ্কুল এই স্রোত যা তাদের বহুদিন-সঞ্চিত হৃদয়াবেগের বাঁধ ভেঙে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

ভেসে যাবে ব'লেই আজ এসেছিল নির্ম্মলা।

ঘন হয়ে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। এ কি অপার্থিব সৌরভ নির্ম্মলার নিঃশ্বাসে। কোথায় কোন্ আশ্চর্য্য ফুল ফুটেছে আজ তার দেহে, কিংবা হয়ত ফুটেছে তার মনে যেখান থেকে সেই ফুলের সৌরভ তার দেহে এসে পৌঁচচ্ছে, কিন্তু সে এমন একটি সৌরভ যার তুলনা নেই ত্রিভুবনে। এদিকে দিবাকরের পরুষ স্পর্শে এ কি আশ্চর্য্য কোমলতা, আর তার অধরোষ্ঠের কোমলতায় এ কি নিদারুণ কাঠিন্য!

বাড়ী ফিরবার কথা যখন তাদের মনে পড়ল, তখন দিবাকরের কানের কাছে মুখ নিয়ে নির্ম্মলা বলল, "খুশী হয়েছ?"

দিবাকর বলল, "খুব। তবে আরো পেলে আরো খুশী হতাম। তুমি?"

দিবাকরের বাঁহাতের বেষ্টনীর মধ্যে তার গায়ের উপর নিজের গায়ের অল্প একটু ভর রেখে একটুখানি হেলে বসে ছিল নির্ম্মলা। বলল, "মনে হচ্ছিল, জীবনের সব দুঃখভোগ যেন সার্থক হয়েছে আজ। পাব যে কোনোদিন তা আশা করিনি, কিন্তু পেয়ে গেলাম। কোন্ অধিকারে পেলাম জানি না।"

দিবাকর বলল, "আরো পেতে ইচ্ছে করে না তোমার?"

নির্ম্মলা এত মৃদুস্বরে বলল, "করে", যে সেটা প্রা

শোনাই গেল না। তারপর একটু থেমে বলল, "কিন্তু এর চেয়ে বেশী চাইবার সাহস আমার নেই?"

দিবাকর বলল, "সাহস কেন নেই? তোমাকে যে কিছু অদেয় নেই আমার তা ত তুমি জানো। কোন্ অধিকারে পাচ্ছ তা কেন তুমি বুঝতে পারছ না।"

নির্ম্মলা বলল না কিছু। ভেবে পেল না কি রকম ক'রে যা বলতে চায় তা বলবে।

দিবাকর বলল, "নির্ম্মলা, এবার চল, বাবাকে গিয়ে বলি। খুব খুশী হবেন তিনি।"

নির্ম্মলা সোজা হয়ে উঠে বসল। বলল, "না।"

দিবাকর অবাক হ'ল একটু। বলল, "না মানে?"

নির্ম্মলা বলল, "ওঁকে কিছু বলবে না তুমি।"

দিবাকর বলল, "তুমি ভাবছ বাবা খুশী হবেন না?"

"জানি না হবেন কি না, কিন্তু ওঁকে কিছু বলা চলবে না।"

"আজ না হোক কাল বলতে ত হবেই? চিরকাল ত লুকিয়ে রাখা চলবে না? বলে চুকিয়ে ফেলাই ত ভাল।"

"যদি বলি আমি লুকোতেই চাই।"

"কেন? লুকোবে কিসের দুঃখে? লুকোবার আছেই বা কি?"

"আমি চাই আমাদের এই ভালবাসা কেবল আমাদের দুজনের হয়েই থাকবে। আমরা যে দুজন দুজনকে ভালবাসি তা কেবল আমরাই জানব, পৃথিবীতে আর কেউ জানবে না।"

দিবাকর বলল, "আমাদের আশপাশের মানুষগুলির জানতে-কিছু বাকী আছে ব'লে তুমি মনে কর? দেখছ না, আমাদের নিয়ে যারা এত উৎসাহ করে কানাঘুষো শুরু করেছিল, আমরা পুরীতে কিছুদিন থেকে আসার পর তারা সবাই কিরকম চুপ হয়ে গিয়েছে? কেন হয়েছে? আমাদের ভালবাসাটাকে accept করে নিয়ে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

নির্ম্মলা বলল, "পুরী যাবার আগে একদিন তুমি বিয়ে ক'রে নিয়ে এদের মুখ বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলে। আজ যখন নিজে থেকেই এরা চুপ করেছে, তখন বিয়েটা আমরা নাই-বা করলাম।"

দিবাকর বলল, "হয়ত করতাম না, যদি ওদের ভাবনাটাই একমাত্র ভাববার হ'ত। কিন্তু নিজের ভাবনাটাও ভাবছি ত একটু?"

দিবাকরের হাতটা আবার কোলে টেনে নিয়ে তার উপর হাত বুলোতে বুলোতে নির্ম্মলা বলল, "নিজের ভাবনা আমিও কিছু কম ভাবি না, কিন্তু তোমার কিসে ভাল হয় তাও ত আমার ভাবা উচিত? আমাকে বিয়ে করলে সমাজের চোখে তুমি খুব ছোট হয়ে যাবে। পুরীতে তুমি আমায় বলেছিলে, সুজন ডাক্তার তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন, আমি যতদিন সেখানে থাকব তুমি সেখানে যাবে না। আমাদের মেলামেশাটা তিনি ভাল চোখে দেখেননি। যদি আমরা বিয়ে করি তোমার সমাজের কেউই সেটাকে ভাল চোখে দেখবে না।"

নির্ম্মলার হাতের ছোঁওয়ায়, তার কোলের ছোঁওয়ায় দিবাকরের মাথার ভিতর যুক্তিতর্ক সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। "বয়েই গেল। তোমাকে না পেলে সমাজ নিয়ে আমি করব কি?" বলে নির্ম্মলার ছোট মাথাটিকে নিজের বাম বাহুর বেষ্টনীর মধ্যে রেখে ঝুঁকে পড়ে চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত মুখটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে টুলটুলে তার ঠোঁটদুটিতে এসে শান্ত হ'ল।

মুক্তি পাবার পর নির্ম্মলা বলল, "এই যে পাচ্ছি,— বিয়ে ত আমরা করিনি, এটা কি পাওয়া নয়?"

"তুমি ঠিক কি যে বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।"

"বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার করবার যোগ্যতা আমার একেবারেই নেই বলেই বোধহয় কিছুদিন হ'ল এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, ভালবাসলেই বিয়ে করতে হবে কেন? আলাদা থেকেও দুজন মানুষ পরস্পরের বন্ধু হয়ে অনেকখানি দিতে আর অনেকখানি পেতে কি পারে না?"

"যারা পারে তারা পারে, আমি পারব না।"

কোলের উপর কনুই ও তার উপর চিবুকের ভর রেখে মাথা নীচু করে ব'সে রইল নির্ম্মলা।

দিবাকর বলল, "শোন নির্ম্মলা। ওরকম ক'রে পাবার পথে অনেক বাধা। সেসব বাধাকে অগ্রাহ্য করা যদি

থাকছ, আলাদা থেকে বড়জোর দেখা পাওয়া সম্ভব, তাও যে চলে তার পক্ষে সেটা যথেষ্ট হতে পারে না। আমার সমস্ত দেহ-মন-আত্মা বলছে পারে না, এর উপর ত আর তর্ক চলে না?...এই ধর, তুমি ত একটু পরেই নেমে যাবে নার্সিং হোমে, বাড়ী ফিরে গিয়ে নিজের অন্ধকার ঘরটায় ঢুকব, আলো জ্বালব, কিন্তু অন্ধকার তাতে কাটবে না। ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে দেখতে না পাওয়ার বেদনা আমার বুকটাকে মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে ভাঙবে।"

নির্মলা একই ভাবে বসে আছে, বলছে না কিছু।

দিবাকরের গলার সুর এবার একটু অন্যরকম শোনাল। বলল, "কথাটা আসলে কি? আমাকে বিয়ে করতে চাও না, এই ত? সেটা সোজাসুজি বললেই ত হয়?"

নির্মলা এবার মুখ তুলল, বলল, "সোজাসুজি বলবার মত কথা এটা নয়, কারণ তোমাকে ভালবাসি আমি।"

দিবাকর শব্দ ক'রে হাসল একটু। বলল, "একটা মানুষ ভালবাসছে কিন্তু আলাদা থাকতে চায়, এরকমটা যে হওয়া সম্ভব তা ভাবিনি কখনো। আচ্ছা নির্মলা, কিছু মনে ক'রো না কথাটা বলছি ব'লে। তুমি ঠিক জানো, তুমি তোমার মনের যে ভাবটাকে ভালবাসা ভাবছ সেটা সত্যিই ভালবাসা, খুব সস্তা আর vulgar একটা জিনিষ সেটা নয়?"

নির্মলা দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নীচু ক'রে বলল, "ছি, ছি!"

গাড়ীতে স্টার্ট দিল দিবাকর।

নদীর ধার দিয়ে আউটরাম ঘাটের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বলল, "আচ্ছা, তখন ছি ছি ব'লে ত আমার থামিয়ে দিলে। এখন আমার কয়েকটা কথার উত্তর দাও দেখি। দেবে?"

যে সেতুপথ ধ'রে দুটো মানুষ এত কাছে এসেছিল এই একটুক্ষণ আগে, দু'জনের মাঝখানে কোথায় সেটা যেন ভেঙে ধ'সে গেছে একেবারে।

নির্মলা বলল, "সম্ভব হ'লে দেব।"

দিবাকর বলল, "বিয়ে করতে চাও না, এটা কি তুমি seriously ভাবছ আর বলছ?"

নির্মলা বলল, "হ্যাঁ।"

দিবাকর বলল, "তাহলে তার কারণ বলে যেটাকে বলছ সেটা তার সত্যিকারের কারণ হ'তে পারে না। আসল কারণটা তুমি আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছ।"

নির্মলা ভেবে পাচ্ছে না কি বলবে।

দিবাকর বলল, "আসল কারণটা কি?"

"জানতে চেয়ো না লক্ষ্মীটি।"

"নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসব, কিন্তু বিয়ে করতে পাব না, আর কেন পাব না তার কারণটা জানতেও চাইব না, এতটাই লক্ষ্মী ছেলে আমি নয়। কারণটা আসলে কি তা বল।"

আউটরাম ঘাট, ইডেন গার্ডেন বাঁদিকে রেখে কার্জন পার্কের পথ ধরেছে দিবাকরের হিলম্যান মিংক্স্।

নির্মলা বলল, "তুমিই না একদিন বলেছিলে, তোমরা সবাই মিলে ঠিক করেছ, আমার আগেকার যে জীবনটাকে আমি ভুলে থাকতে চাই, তোমরা আমায় সেটা ভুলতে দেবে?"

দিবাকর বলল, "হ্যাঁ, বলেছিলাম। এখনও বলছি। কিন্তু তুমি তোমার সেই জীবনটাকে কেবল যে ভুলছ না তা নয়, ভুলবার কোনো চেষ্টা করতেও রাজী নয়। যদিও জানো, তোমার ও আমার মধ্যে আজকে ঐটেই একমাত্র ব্যবধান।"

চৌরঙ্গী-পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছে আসতেই ট্রাফিক-লাইটটা লাল হ'লো। গাড়ীটার স্টার্ট বন্ধ ক'রে দিল দিবাকর। বলল, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার জীবনে খুব কঠিন সমস্যা একটা কিছু আছে, যেটা তোমাকে আর পাঁচটা মানুষের মত স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। ঠিক কি না বল।"

নির্মলা বলল না কিছু।

দিবাকর বলল, "সে সমস্যাটা কি, তুমি বল আমাকে।

হয়ত তার সমাধান একমাত্র আমাকে দিয়েই হওয়া সম্ভব।"

নির্মলা এবার বলল, "যদি জানতাম, সেটা সম্ভব, নিশ্চয় তোমাকে বলতাম।"

দিবাকর বলল, "সম্ভব নয় জেনেই বল। অসম্ভবকে নিয়ে তোমার যে দুঃখ, তার ভাগ দিতে দাও আমাকে।"

নির্মলা বলল, "আমি পারব না বলতে, আমাকে ক্ষমা কর তুমি।"

দিবাকর বলল, "এখন পারছ না, হয়ত পারবে যদি একটু সময় নিয়ে ভাবো। তুমি সময় নাও নির্মলা; এক মাস, দুমাস, ছ'মাস, আমি অপেক্ষা করব।"

আলোটা সবুজ হতেই গাড়ীতে আবার স্টার্ট দিল দিবাকর।

পার্ক স্ট্রীট দিয়ে গাড়ী চলছে। দিবাকর বলল, "কিছু একটা বলবে ত?"

নির্মলা বলল, "তোমাকে যতটা ভালবাসি যদি তার চেয়ে একটু কম ভালবাসতাম, হয়ত তোমাকে হাতে রাখবার জন্যে বলতাম, আচ্ছা, ভাবব। কিন্তু আমার সমস্যাটা এমনি যে সেটার কথা কাউকে বলাও যায় না, আর তার সমাধান ও কিছু নেই। যা একেবারেই হবার নয়, তা কোনো একদিন হতেও পারে ব'লে মিথ্যে আশা দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে আমি পারব না।"

একটা লোককে প্রায় চাপা দিয়ে দিচ্ছিল দিবাকর। রাস্তার লোকেরা হৈ হৈ ক'রে উঠলে ভয় পেয়ে দিবাকরের গায়ে গা ঠেকিয়ে তার একটা হাতকে চেপে ধরেছিল নির্মলা। তাকে আস্তে একটু ঠেলে দিয়ে তার হাতটাকে সরিয়ে দিল দিবাকর। খুব ভেবেচিন্তে যে করল তা নয়, কি এক রকম ক'রে এটা হয়ে গেল।

বলল, "আচ্ছা, তুমি কোনো একজনদের বাড়ীর বৌ, তাই না?"

প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না নির্মলা। একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, "কি যে বল।"

"বল, হাঁ, কি না।"

"অবিশ্যি, না।"

"তাহলে খুব বিশ্রী আর নোংরা কোনো পরিবেশে তোমার জন্ম। পিতৃপরিচয় দিতে পার না, সেটা আর না ব'লে।"

"না, খুব ভাল পরিবারে, সুন্দর পরিবেশে আমার জন্ম।"

"কাউকে বিয়ে করবে ব'লে কথা দিয়ে রেখেছ?"

"তাও নয়। কেন এরকম ক'রে জেরা করছ আমাকে?"

"করছি প্রাণের দায়ে।"

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বলল, "এর একটাও যখন নয়, তখন এমন কোনো-একটা অপকর্ম কোথাও করে রেখে এসেছ, যারপর আর পরিচিত লোকেদের কাছে মুখ দেখানো চলে না, আর সেইজন্যেই নিজের পরিচয় গোপন ক'রে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ।"

এ কথায় উত্তরে কি বলবে নির্মলা? 'হ্যাঁ' বলবে? না কি, 'না' বলবে? এত ধড়ফড় করছে তার বুক যে তার মনে হচ্ছে এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে সে। কষ্টে উচ্চারণ করল, "ভাবো তোমার যা খুশি। আর কিছু বলবে?"

দিবাকর বলল, "বলব না-ই ভেবেছিলাম, কিন্তু বলেই ফেলি। শোন। তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর মানুষ। কোনো দায়িত্ব নেবে না, ঝাড়া হাত-পা নিয়ে নিজের মনে আলাদা থাকবে; আমি কি খাচ্ছি, কি পরছি, অসুখ হলে আমাকে দেখবার কেউ আছে কি নেই, এসব কিছুই তুমি দেখবে না; যেটুকু হলে তোমার নিজের চলে যায় কেবল সেইটুকুই তুমি নেবে। আর এই করবে ঠিক ক'রে আমার জীবনটাকে একেবারে তছনছ ক'রে দিয়েছ তুমি। কি কুক্ষণেই যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

তখনও পার্ক স্ট্রীট দিয়ে চলছে তারা। নির্মলা বলল, "গাড়ীটা বাঁদিকে রাখবে একটু?"

"কেন? কি হবে?"

"রাখ না, একটু দরকার আছে।"

গাড়ীটা কার্ব ঘেঁষে দাঁড়াতেই দরজা খুলে নেমে গেল নির্মলা।

এ রকমটা যে ঘটতে পারে তা একেবারেই ভাবেনি ব'লে কি করা উচিত সেটা ঠিক করতে দিবাকরের মিনিট খানিক লাগল। সে যখন দরজা খুলে বাইরে পা বাড়াল তখন নির্মলার ট্যাক্সি হর্ণ বাজিয়ে চলতে শুরু করেছে।

পাশের অন্ধকার একটা গলির মধ্যে গাড়ীটাকে নিয়ে রাখল দিবাকর। উদ্বেল অশ্রু বারবার রুমালে মুছতে এখানে অসুবিধা কিছু নেই।

সাতাশ

নির্মলা সারাপথ ভাবতে ভাবতে এসেছে, এই রকমটাই যে ঘটবে তা ত আমার জানাই উচিত ছিল। যতটা পেয়েছি, আমার অদৃষ্ট দেবতাকে ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। ফাঁকিটা ধরা পড়ে গেছে, তার আর কি করা যাবে? ফাঁকি যেটা, সেটা কোনো-না-কোনো একদিন ধরা পড়ে ত যাবেই। আমার যেমন কপাল, ফাঁকি দিয়ে পাওয়া শুরু হতে না হতেই ধরা পড়ে গেলাম।

গেটের বাইরে ট্যাক্সি থেকে নামল নির্মলা।

এ কি হয়েছে তার আজ? তাড়াটা চুকোতে চুকোতে কেন মনে হচ্ছে, আবার ঐ ট্যাক্সিটাতে উঠে মলিনার কাছে চলে যায়; গিয়ে বলে আমি এসেছি। কুকীর্ত্তি যেটাকে বলছ, সেটা আসলে কি তা বল। আমি আছি তোমার সঙ্গে।

"মাসী!"

সের দেড়েক ওজনের একটা ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে জগন্নাথ।

নির্মলার পাশে এসে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে জগন্নাথ বলল, "গঙ্গার ইলিশ মাসী। অসময়ের ইলিশ। তুমি যে সেদিন বললে, অনেকদিন খাওনি গঙ্গার ইলিশ? তাই আজ একেবারে জেলে-নৌকোয় চড়াও হয়ে জুটিয়েছি এটাকে। এক বাবুটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাম হাঁকতে হ'ল ব'লে কিছু বেশী পড়ে গেল দামটা। কিন্তু বেশ ভাল দেখতে নয় মাছটা? মানে, মাছের মুখটা। মুখটা দেখবে মাসী। সেটা দেখতে কালো হলে জানবে ওটা নাদেই ইলিশ। কিন্তু এটার দেখ, কি রকম টকটকে লাল মুখ। না কি এই আলোতে ঠিক বুঝতে পারছ না সেটা?"

নির্মলা বলল, "হ্যাঁ, মনে ত হচ্ছে পারছি। তা তুমি দিনের আলোয় দেখে কিনেছ ত? বাতির আলোয় লাল আর কালো প্রায় একই রকম দেখায়।"

জগন্নাথ বলল, "দেখব আর কি? গঙ্গার ইলিশের মুখ লাল ত হবেই। মাসী, তুমি আজ একটু কষ্ট করবে। তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ইলিশ মাছ ভাতে করাবে, কাঁচা লঙ্কা আর সরষে বাটা দিয়ে। করাবে ত মাসী?"

নির্মলা বলল, "করাব, কিন্তু তোমাকে খেতে ডাকব না।"

জগন্নাথ বলল, "ঠিক আছে মাসী। আমার ভাগটা তুমি যদি খাও ত কোনো দুখ্‌খু নেই।"

জগন্নাথ অবিশ্যি খেয়ে গেল ইলিশ মাছ ভাতে, আর নিজের ভাগটার চেয়ে কিছু বেশীই খেল।

পরদিন ভোর হতেই গারাজের উপরে জগন্নাথের ছোট ঘরটায় গিয়ে হাজির হ'ল নির্মলা।

জগন্নাথ জুতো বুরুশ করছিল, পালিশের সুগন্ধ ঘরের বাতাসে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এস এস মাসী! কি ব্যাপার? আমার এখানে যে হঠাৎ?"

নির্মলা বলল, "এই দেখতে এলাম, কি রকম ঘর তুমি পেয়েছ, আর কি রকম সাজিয়েছ সেটাকে।"

ছোট ঘর। তার একটি দরজা, আর পাশে একটি ও পিছনে একটি ছোট জানালা। পাশের জানালার উল্টো দিক্‌কার দেয়াল ঘেঁষে একটা হাতা-বিহীন সোফা। এর পিছনের পিঠ রাখবার দিকটা নামিয়ে দিয়ে সেটাকে রাত্তিরে কি রকম ক'রে খাটে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়া যায় তা নির্মলাকে দেখাল জগন্নাথ। পিছনের দিকে বেতের তৈরী একটা টেবিলের দুপাশে বেতের দুটি চেয়ার।

তার একটাতে নির্মলাকে বসিয়ে আর একটাতে নিজে বসল জগন্নাথ। বলল, "শুধু আমার ঘর দেখতেই এসেছ?"

হেসে মাথা নেড়ে নির্মলা বলল, "না। কাজের কথাও আছে একটু।"

"কি কথা, বল মাসী।"

"প্রথম কথা হ'ল, বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়েছি।"

"দিবাকর-বাবুর বাবাকে নিয়ে বাইরে কোথাও যাবে বুঝি?"

"না, কলকাতাতেই থাকব।"

"তাহলে আর কি লাভ? এখানে তোমাকে কেউ ব'সে থাকতে দেবে ভেবেছ? তুমি ত কাউকে 'না' বলতে শেখনি? কোনো-না-কোনো ছুতোয় তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়েই নেবে।"

"আমাকে পেলে ত? আমি চলে যাব সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কেউ ভেবেই পাবে না, আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি।"

"কি করবে মাসী?"

"পালাব।"

"পালাবে কেন?

"যাতে কয়েকটা দিন কিছু না করতে হয়।"

"পালিয়ে কোথায় যাবে?"

"সেটা বলে দিলে পালাবার মানে কি থাকবে?"

"তাই ব'লে আমাকেও বলবে না?"

"বলতে পারি যদি কাউকে না বল।"

"বলব না। বল।"

"ভাবছি, কিছুদিন চেতলায় বস্তির বাড়ীটাতে গিয়ে থাকব।"

জগন্নাথ উত্তেজিত হয়ে বলল, "সে ত খুব ভাল হবে মাসী! খুব মজা হবে। খুব মজা হবে। কবে যাবে? চল, আজকেই।"

'তুমি চাকরি করছ, তুমি আমার সঙ্গে পালাবে কি ক'রে?"

"আমিও ছুটি নেব মাসী।"

"না জগন্নাথ। এবার আমি একলা পালাব।"

"তুমি একলা ঐ বস্তিতে গিয়ে থাকবে মাসী? পারবে?"

"পারি কি না সেটা দেখতে চাই। অন্যের হাতধরা হয়েই চিরকালটা কাটাতে হবে, ভাবতে ভাল লাগছে না।"

"মাসী!"

"কি বল।"

"না, কিছু না মাসী। তুমি কতদিনের জন্যে যাচ্ছ?"

"আপাততঃ তিন মাস।"

"তোমাকে দেখতে যাওয়াও কি বারণ?"

"একেবারে।"

সেদিনই দুপুরের পরে নির্মলা চ'লে এল চেতলার বাড়ীতে, একটা সুটকেস ও বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে।

তিনু এল স্যাৎসাতে স্যাৎসাতে। বলল, "কত দিন পর এলে মাসী। কোথায় ছিলে? জগন্নাথ মিস্ত্রি কি জেলেই রয়েছে এখনো?"

ধোপারা-গয়লারা এল। তাদের মধ্যে যারা আগে আসত না, কথা বলত না, তারাও এসে হেসে কথা বলল। মুদী অতি ভারিকি মেজাজের লোক, সেও এল তার মেদ-বহুল দেহটি নিয়ে নির্মলার খবর নিতে। এল দুখ্‌নী।

নির্মলার চোখে জল আসছে। কেন যে, তা সে জানে না।

এল চাঁপা বৌ।

"মিস্তিরি বুঝি জেলেই রয়েছেন এখনো?"

"না, না, তিনি ফিরেছেন।"

"এলেন না যে?"

"চাকরি করছেন এক জায়গায়। তারা ছুটি দিল না।"

"এখানে থেকে বুঝি সেটা করা যায় না?"

"না। দিন-রাতের কাজ কিনা?"

দিবাকর ভেবেছিল, নির্মলার রাগটা প'ড়ে যাবে, তারপর সপ্তাহান্তে অন্ততঃ একবার ক'রে আগের মতই দিনকয়কে সে দেখতে আসবে। কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যে যখন সে একবারও এল না, তখন দিবাকর আশা করতে লাগল, এবারে একদিন দিনকয়ই তাকে ডেকে নির্মলার খবর নিতে বলবেন, সে রকম আগে মাঝে মাঝে

করেছেন। কিন্তু তিন সপ্তাহ কেটে গেল, দিনকর কিছু বললেন না। কাটতে চায় না, চায় না ক'রেও আরও কয়েকদিন যখন কাটল তখন একদিন গুটি গুটি নিজেই চলে এল বাবার কাছে। প্রাণটা তখন তার ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে একেবারে। একথা সে কথার পর বলল, "তোমার প্রেশারটা অনেকদিন দেখা হয়নি, ওটা মাঝে মাঝে দেখা ভাল।"

দিনকর বললেন, "ও হো, তোমাকে বলতে একেবারে ভুলে গেছি। নির্মলা ছুটি নিয়ে যাবার পর সুজন টেলিফোন করেছিলেন, বলেছিলেন, আমি চাইলেই অন্য নার্স একজনকে পাঠিয়ে দেবেন। শরীরটা এই ক'দিনই বেশ ভালই আছে ব'লে কথাটা মনে পড়েনি। তা বেশ ত, তোমার যদি মনে হয় প্রেশারটা এখন একবার দেখা দরকার, তা সুজনকে ফোন ক'রে বললেই তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

দিবাকর বলল, "ফোন আর কি করব? আমি ত বেরুচ্ছি একটু পরেই, দেখা করেই ব'লে আসব।"

দেখা করল সুজনের সঙ্গে। বাপের ব্লাড প্রেশারের চেয়ে নির্মলার ভাবনাই যে তার মাথায় বেশী রয়েছে তখন সেটা বুঝতে সুজনের দেরি হ'ল না। দিনকর ভাল আছেন, কিন্তু তাঁর ছেলের মুখে নিদারুণ দুর্ভাবনার ছাপ।

সুজন ডাক্তারের নার্সিং হোমে কাজ নিয়ে যারা আসে, তাদের অতীতটাকে নিয়ে তিনি যেমন বিশেষ মাথা ঘামান না, তেমনি বর্তমানটাতেও তাদের যতটা স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব, দিয়ে রাখাতেই তিনি বিশ্বাসী। তাই নির্মলা যখন এসে বলল, "আমার মাস তিনেক ছুটি পাওনা হয়েছে, সেইটে কি আমি এখন একসঙ্গে নিতে পারি? মেট্রনকে বলেছি, তিনি বলেছেন, চালিয়ে নেবেন।" তখন সুজন বললেন, "তোমার যে ছুটি পাওনা তা তোমাকে দিতেই হবে। বাইরে কোথাও যাচ্ছ?"

"না। কলকাতাতেই থাকব। তবে, কোথায় থাকব সেটা আপনি ছাড়া কেউ জানবে না। আমি কিছুদিন নিজেকে নিয়ে একেবারে একলা থাকতে চাই।"

"তাই থাকো। তোমার সমস্যাটা যে কি তা আমি জানি নির্মলা। আমার মনে হয়, তুমি ঠিক পথেই চলেছ।"

কর্মীদের সম্বন্ধে সুজনের যেমন খানিকটা ঔদাসীন্য, পেশেন্টদের সম্বন্ধে ঠিক তার উল্টো। তিনি মানুষগুলির চিকিৎসা করেন, শুধু তাদের রোগের নয়। দরকারে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খুঁটিনাটির খবর তাঁকে রাখতে হয়। এদিকে দিনকর তাঁর পেশেন্টই ত কেবল নন? তিনি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মাস্টারমশাই, যাঁকে কলেজে যখন পড়তেন তখন যেমন ভালবাসতেন এখনও ঠিক ততটাই ভালবাসেন তিনি। তাঁর সেই মাস্টারমশায়ের বহুগুণান্বিত ছেলে দিবাকর এক নাম-গোত্রহীন মেয়ের প্রেমে পড়ে হাবু ডুবু খাচ্ছে খাক, কিন্তু সেটা বেশীদূর গড়ালে দিনকরের পক্ষে তার ফলটা কি রকম দাঁড়াবে, সেটা তাঁকে ত ভাবতে হয়? আজকালকার ছেলেদের কথা বলা ত যায় না? হয়ত বা বিয়ে করেই বসবে।

দিবাকর বলল, "একেবারে একলা ওকে ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?"

সুজন বললেন, "একলা গিয়েছে কি না জানি না। যদি গিয়েও থাকে, তার কোন বিপদ হবে না। নির্মলা খুব শক্ত মেয়ে।"

দিবাকর বলল, "কোথায় গিয়েছে?"

সুজন বললেন, "সেটা কাউকে বলব না, ওকে কথা দিয়েছি।"

"বাবা জানতে চাইলেও বলা যাবে না?"

"না।"

দিবাকরের মেজাজ ক্রমশঃ গরম হচ্ছে। বলল "কি বলব জানতে চাইলে?"

সুজন বললেন, "বলবে ছুটি নিয়ে চ'লে গেছে, কোথায় গেছে ব'লে যায়নি।"

"ছুটিতে যারা যায় তাদের leave address রেখে যাবার একটা নিয়ম আছে। আপনাদের সেটা আছে কি না জানতে চাইলে কি বলব?"

"বলবে leave address কেউ যদি দিয়ে যায় ত দিই, তা নিয়ে কড়াকড়ি কিছু নেই।"

দিবাকর বলল, "চমৎকার! আচ্ছা, থাক, অন্য নার্স কাউকে পাঠাবার দরকার নেই। পাড়াতেই ছোকরা ডাক্তার আছে একজন, তাকে দিয়েই প্রেশারটা দেখিয়ে নেব।"

ব'লে উঠে দাঁড়াচ্ছিল, সুজন বললেন, "বস দিবাকর। শোন। ব্যাপারটা সে-জাতীয় একেবারেই নয় যে রাগারাগি করে তার সমাধান তুমি কিছু করতে পারবে। তুমি ত জান ও কেন চ'লে গিয়েছে।"

"কারণটা কি আমি?"

"মনে ত হয় তাই। ওর বোধহয় ইচ্ছে, তুমি ওকে ভুলে যাও।"

"তাতে কার কি লাভ হবে?"

"হয়ত দুজনেরই লাভ হবে। পিতৃ-পরিচয় নেই এরকম একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হতে পারবে না, তাকেও সুখী করতে পারবে না। মানুষের স্বভাব ত জান? হয়ত মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, চোখের ইশারা করে, ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে, যে অত্যাচার ঘরে বাইরে সকলে মিলে ওর ওপর করবে, তা সয়ে ঐ মেয়েটার ত বেঁচে থাকাই শক্ত হবে।"

কথাটা দিবাকর যে ভাবেনি তা নয়, কিন্তু সে জানে নির্মলার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা তাকে সমস্ত উপহাস-পরিহাস, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের অনেক উপরে তুলে রাখতে পারে। আর দিবাকর যখন নিজের অন্তরের ও বাইরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য উজাড় ক'রে তাকে রাজরাণীর মত ক'রে সাজাবে, পূজা আরাধনার বেদীতে তাকে দেবীর মত করে বসাবে, তখন ঈর্ষ্যায় নিজেরা জ্বলে পুড়ে মরতেই সকলে এত ব্যস্ত থাকবে যে, নির্মলাকে জালাবার কথা কারও মনেই পড়বে না।

সুজন বললেন, "আরও একটা কথা আছে। তোমাকে ভুলে যেতে পারা তারও ত দরকার? সেটা যাতে তার পক্ষে সহজ হয়, তা দেখাও তোমার কর্ত্তব্য। তুমি যদি তাকে ভুলে যাও, সেও একটু একটু ক'রে তোমাকে ভুলবে।"

দিবাকর সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ব'সে তার হাতের আঙুলের নখগুলিকে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে দেখছে।

সুজন বললেন, "তোমার বাবার সঙ্গে নির্মলাকে পুরী পাঠাবার সময় কথাগুলি একবার তোমাকে বলেছিলাম, আজ আবার বলছি, যদিও জানি শুনতে তোমার ভাল লাগবে না। নির্মলার যোগ্য সামাজিক পরিবেশের মধ্যে তার যোগ্য ও তার মনের মত ভাল ছেলে খুঁজলে যে পাওয়া যেতে পারে না, তা ত নয়? দিনকাল বদ্‌লেছে, সমাজের সমস্ত স্তরেই শিক্ষার আলোক পৌঁছচ্ছে। এই ত আমাদের এই নার্সিং হোমেই নৃপতি দাস বলে যে নমঃশূদ্র ডাক্তারটি সম্প্রতি কাজ নিয়ে ঢুকেছে, খুবই ভাল ছেলে। আমি বললে হয়ত খুব খুশী হয়েই নির্মলাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। আর ঐরকম একটি ছেলেকে বিয়ে করতে পেলে নির্মলাও তার নিজের জীবনটাকে সার্থক করে তুলতে পারবে। ওর যাতে ভাল হয়, তাই ত তোমার দেখা উচিত?"

দিবাকরের হঠাৎ মনে হ'ল, নির্মলারই মনের কথা তার হয়ে ডাক্তার বলছেন না ত? নির্মলাকে যতটা সে জানে, তাতে তার মনে হয় না এটা সম্ভব; কিন্তু তাকে কতটাই বা সে জানে? এগুলো যে নির্মলারই মনের কথা নয়, তা একেবারে নিঃসংশয়ে সে জানবে কেমন ক'রে?

কিন্তু এ নিয়ে অভিমান করবার মত মনের অবস্থা তখন তার নয়। যতদিন জানা ছিল, গাড়ীটাকে রাস্তায় বের ক'রে মিনিট কয়েক ড্রাইভ ক'রে গেলেই নির্মলাকে দেখতে পাওয়া যাবে, ততদিন অভিমান ক'রে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে, যদিও খুবই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল শেষ দিক্‌টায়। কিন্তু আজ যখন বুঝল, ইচ্ছে করলেও নির্মলাকে দেখতে পাওয়া আর যাবে না, তখন অদর্শনের বেদনা অসহ্য হ'ল তার।

প্রথমটা ভেবেই পেল না, কি সে এখন করবে। ব্যথাতে বুকের ভিতরটা যেমন অবশ হয়ে আসছে, মাথার ভিতরে ভাবনাগুলোও কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে তার। দিনটুই ছটফট ক'রে কাটাবার

পর্য্য তার মনে হতে লাগল, অবিলম্বে একটা কিছু করতে না পেলে পাগল হয়ে যাবে। পাগল সে খানিকটা হয়ে গিয়েছেই, নয়ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা, দিনকর অত্যন্ত অসুস্থ, তিনি তাঁর পুরণো নার্স টিকে দেখতে চাইছেন, এই ধরণের সব উদ্ভট কল্পনাও তার মাথায় আসে! দিনকর ও সুজনের চোখে যদি পড়ে সে বিজ্ঞাপন, কি তাঁরা ভাববেন? একবার ভাবল, যাই তাঁরা ভাবুন গিয়ে, নির্ম্মলাকে ত বের ক'রে আনতে পারব তার অজ্ঞাতবাসের আড়াল থেকে? কিন্তু নির্ম্মলা বেরিয়ে এসে নিজে তার এই মিথ্যাচারকে কি চোখে দেখবে ভেবেই কাজটা সে করতে পারল না শেষ পর্য্যন্ত। তার নিজের বিশেষ কোনো প্রয়োজনে দুমিনিটের জন্যে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত কোনো জায়গায় নির্ম্মলার সঙ্গে সে দেখা করতে চায় বলে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনো লাভ হ'বে বলে মনে হ'ল না।

তখন অগত্যা জগন্নাথকে এসে সে ধরল, যদিও জগন্নাথের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে একটু সঙ্কোচ বোধ তার বরাবরই ছিল। নির্ম্মলার ঠিকানা জগন্নাথ হয়ত জানে মনে করেই তার কাছে এসেছিল সে, কিন্তু যখন শুনল যে জগন্নাথ সত্যিই জানে তখন মনে ঘা খেল একটা। নির্ম্মলা একেও নিজের ঠিকানা দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু দিবাকরকে দেয়নি। সেটা দিয়ে বলতে ত পারত, এই রইল আমার ঠিকানা, কিন্তু সেখানে যাবে না তুমি?

বলল, "শুনেছি, যেখানে সে আছে সেখানে কেউ গিয়ে তাকে বিরক্ত করুক এটা সে চায় না। এ অবস্থায় আমি নিশ্চয়ই যাব না তার কাছে, যদি না সে আমাকে ডাকে। কিন্তু খুব একটা জরুরী খবর তাকে অবিলম্বে দেওয়া দরকার। চিঠিতে সেটা দেব, সেজন্যে তার ঠিকানাটা আমার চাই।"

জগন্নাথ নিঃশব্দে বসে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। দিবাকর বলল, "কি? বিশ্বাস হচ্ছে না?"

জগন্নাথ বলল, "না, না, তা কেন? আমি ভাবছিলাম, চিঠি পাঠানোর জন্যেই ত ঠিকানা চাই আপনার? চিঠিটা লিখে খামে ভ'রে আমায় দিন, আমি ঠিকানা লিখে তাকে দিয়ে দেব।"

এ কথার উপর ত আর কথা চলে না? তাই সেই ব্যবস্থাই হ'ল শেষ পর্য্যন্ত। জগন্নাথের হাতের বড় বড় অক্ষরে ঠিকানা লেখা খামে দিবাকরের চিঠি গেল নির্ম্মলার কাছে। নির্ম্মলা ভেবেছিল, জগন্নাথেরই চিঠি, কিন্তু খুলে দেখল চিঠিটি দিবাকরের।

দিবাকর লিখেছে:

নির্ম্মলা,

আমি কি এমনই ভয়াবহ একটা জীব যে, আমার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে তোমাকে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে? তোমাকে একটা কথা কেবল আমার বলবার আছে, দুমিনিটের বেশী সময় তোমার আমি নেব না, হ্যাঁ কি না শুনেই চলে আসব। তারপর তুমি না ডাকলে তুমি যেখানে আছ তার ত্রিসীমানা মাড়াব না।

আমার কথার উপর নির্ভর করতে পার। আমাকে ত তুমি জান।

ঠিকানাটা জানাতে দ্বিধা ক'রো না।

দিবাকর।

তিন দিন পর নির্ম্মলার পাঠানো একটা খামে বস্তির বাড়ীর ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ পেল দিবাকর। চিঠির উত্তরে নির্ম্মলা লেখেনি কিছু, তাতে দিবাকরের দুঃখ নেই।

সন্ধ্যার মুখে মুখে একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনু পথ দেখিয়ে নিয়ে এল দিবাকরকে। উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকল, "মাসী!"

কয়লার উনুনে আগুন দিয়ে একটা হাতপাখা প্রচণ্ড বেগে নেড়ে সেটাকে তাড়াতাড়ি ধরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল নির্ম্মলা। "কে? তিনু? কি তিনু?" ব'লে ফিরে তাকিয়ে দিবাকরকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল।

দিবাকর বলল, "কি? খুব অবাক্ হচ্ছ?"

নির্মলা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে কতকটা। বলল, "না, না, জানতামই ত যে তুমি আসবে।"

একটা মোড়া নিয়ে এসে বারান্দায় রাখল, বলল, "এস, বস।"

বারান্দায় উঠে মোড়াটা টেনে নিয়ে ব'সে দিবাকর বলল, "আর তুমি?"

"ও হ্যাঁ," ব'লে আর একটা মোড়া এনে নির্মলা নিজেও বসল, দিবাকরের থেকে একটু দূরত্ব রক্ষা ক'রে।

নির্মলাদের বস্তিবাড়ীর বাস উঠে যাবার বেশ কিছুকাল পরে দুখনী একদিন চুপিচুপি চাঁপা বৌকে বলেছিল, "নীতুবাবু যে এবার তোমায় নে পড়েছে গো?"

চাঁপাবৌ বলেছিল, "কেন বলছিস্?"

"আহা, দূরবীণ কষে এখন যে তোমাকেই দেখা হয়।"

"তা ঠিক। আগেও দেখত, তবে এত বেশী নয়।"

চাঁপাবৌ টের পেলে নীতুর দূরবীণ-কষা চোখ দুটোকে খুশী করবার চেষ্টা বিধিমতেই করে। অর্থাৎ চারদিক্ বাঁচিয়ে যতটা করা যায়।

নির্মলাকে যখন দেখত নীতু, তখন তার সেই দেখার মধ্যে ঝাল, নুন ছিল না, যা ছিল তা নিছক মিষ্টি। বয়স ছিল কম, লজেঞ্চুষ চুষতে পেলেই মন খুশী থাকত। এখন বয়স বেড়েছে, রুচি বদ্লাচ্ছে আস্তে আস্তে। চাঁপা-বৌ-এর মধ্যে যা দেখছে, সে ত একটা গেঁজে ওঠা জিনিষ, ঝাঁঝালো তার স্বাদ। ভাবছে, মন্দ নয় ত?

দু-একবার আধ অন্ধকারে হাতছানি দিয়ে চাঁপাবৌ ডেকেওছে তাকে। সাহসে বুক বেঁধে দেশলাই কিনবে ব'লে মুদীর দোকানের দিকে নীতু যেদিন গেল, কলতলায় দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিল চাঁপাবৌ। এরপর আরও কয়েকবার এটা ওটা কিনতে নীতু গিয়েছিল মুদীর দোকানে, প্রতিবারেই এই গলা-খাঁকারি সে শুনেছে। একদিন একটু কৌতূহল হ'ল নীতুর, নিজেও গলা-খাঁকারি দিল। এর ফলে অপর দিকে গলা-খাঁকারি এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল, যে, ধরা পড়ার ভয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ'লে এল নীতু। অবশ্য, এসেই, আবার বাইনোকুলার নিয়ে বসল।

চাঁপা বৌএর পানের বাটা থেকে একটা খিলি পান ও এক চিম্‌টি দোক্তা নিয়ে মুখে দিয়ে দুখনী বলল, "দেখ্‌বে? যদি বল ত একদিন দেখ্‌তে পারি।"

চাঁপাবৌ বলল, "কি বলিস্‌! সবাই দেখবে যে। কি ভাববে?"

"কি আবার ভাববে? বলব, তুমি তোমার বোনঝিকে টাকা পাঠাবে, তার কাগজ লেখাবে ব'লে ওকে ডেকেছ।"

"ওকে কি বলবি?"

"ওকে আবার কি বলতে হবে? বলব, তুমি ডেকেছ।"

"ও আসবে না।"

"আসবে না আবার? তিনটে ডিগবাজি খেয়ে আসবে।"

ডিগবাজি না খেয়েই পরদিন এল নীতু, একটু রাত করে। দুখনী এসেছিল সঙ্গে, নীতুকে কলতলা অবধি পৌঁছে দিয়ে চ'লে গেল নিজের কাজে। বুকটা ঢিপঢিপ করছে নীতুর।

চাঁপাবৌ বেরিয়ে এল কলতলা থেকে। নীতুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল, "আমার ঘরে এস।"

নীতু বলল, "না, না, এইখানেই কথা হোক।"

চাঁপাবৌ বলল, "বল কি কথা?"

নীতু বলল, "সে ত তুমি বলবে। দুখনী যে বলল, তুমি আমাকে ডেকেছ।"

"আমি ডেকেছি শুনে এসেইছ যখন, তখন আমার ঘরে চল। কথা যা বলবার আছে সেইখানে বলব। সব কথা কি বাইরে দাঁড়িয়ে হয়?"

নীতু ইতস্ততঃ করছে দেখে লাল কাঁচের চুড়ি পরা নরম একটি হাতে তার হাত ধরে তাকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে এল চাঁপাবৌ। জোড়াতক্তপোশের বিছানা দেখিয়ে বলল, "বস।"

ঘরের আলো জ্বালা হয়নি, কলতলার দিক্কার জানলা দিয়ে রাস্তার একটা আলোর খানিকটা ঘরে এসে পড়েছে। বিছানার চাদরটা যে খুব পরিচ্ছন্ন নয়, তা সেই অল্প আলোতেই বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বদ্ধ হওয়ার নোংরা কাপড়-চোপড়ের অস্বস্তিকর একটা গন্ধ।

ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না নীতু। বলল, "আমি যাই।"

চাঁপাবৌ বলল, "এসেই যদি চলে যাবে ত এলে কেন কষ্ট ক'রে? এস, এস। বস এইখানে।"

বলে নীতুকে বসিয়ে হঠাৎ এক হাতে তার গলা জড়িয়ে তার পাশে, কিংবা হয়ত বা তার কোলেই বসতে যাচ্ছিল চাঁপাবৌ। এক ঝটকায় তার হাতটা ছাড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নীতু, তারপর ভূত দেখলে ভীতু মানুষরা যেরকম পালায়, সেইরকম উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল সেই এলাকা ছেড়ে।

এর তিনচার দিন পর চাঁপা-বৌএর হাতে সাজা দু-খিলি পান এনে দুখনী খেতে দিয়েছিল নীতুকে। বলেছিল, "চাঁপাবৌ পেইটে দিলে।" সেদিন মানুষটাকে অমন শক্ত হাতে ঠেলে দিয়ে এসেছিল বলে কতকটা অনুশোচনার ভাব থেকেই পান-দুটো নিয়েছিল নীতু, নিয়ে খেয়েছিল।

বাড়ী যাবার সময় দুখনী এসে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, "খুব মিষ্টি লেগেছে ত?"

"পান আবার মিষ্টি কি লাগবে?"

"তা কেন লাগবে না? ও যে জিবে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে থুতু মাখিয়ে দিলে গো পান-দুটোতে, তুমি খেয়ে ভালবাসবে বলে।"

মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে দুখনী ত বেরিয়ে চ'লে গেল, কিন্তু তারপর থেকে নীতুর গা গুলোল অনেকক্ষণ ধরে। এই গা গুলোনোর ভাবটা ক্রমশঃ বেড়েই চলল তার। খিলি পানদুটোর কথা যতবার মনে পড়ে, বেশী ক'রে গা গুলোয়। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে চাঁপা-বৌএর কথা মনে হলেও তার গা গুলোয়।

এ রকমটা হ'ত না, যদি দুখনী এসে ঐ পান-দুটো না খাওয়াত তাকে। সেদিন চাঁপাবৌকে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে না এলে কত কি যে হতে পারত, তা ভেবে নীতুর দেহ মাঝে মাঝে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল ঐ পান মুখে দেবার আগে পর্য্যন্ত।

বাইনোকুলারটা এরপর কাপড়ের দেরাজের একপাশে পড়েই রইল মাসের পর মাস। নির্ম্মলা ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটার খোঁজ পড়েছে আবার।

এই ক'দিন নির্ম্মলাকে দেখছে আর ভাবছে নীতু, ঠাকুরের ভোগে আর-একটু হলেই ত কুকুরের মুখের ছোঁওয়া লাগত।

গলির মোড়ে লাল টকটকে হিলম্যান মিংক্স্ গাড়ীটাকে সন্ধ্যার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি দুতলার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বাইনোকুলারটা নিয়ে জানালার কাছে এসে বসল নীতু।

দিবাকর জানত না, কোথায় যাচ্ছে। যদি জানত, নির্ম্মলা যে ঠিকানা দিয়েছে, সেটা একটা বস্তি বাড়ীর, ত গাড়ীটাকে দূরে কোথাও রেখে আসত। এসে পড়ে বুঝতে পারল, লোকের চোখে তাকে পড়তে হবে।

ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। নীতু ভাবছে নির্ম্মলা কেন আলো জ্বালছে না? রোজই ত এর অনেক আগেই সে আলো জ্বালে?

দিবাকর বলল, "এই ক'দিনেই বেশ একটু রোগা হয়ে গিয়েছ তুমি!"

নির্ম্মলা বলল, "রোগা হয়েছি বুঝি?"

দিবাকর বলল, "বাড়ীতে আয়না নেই, সেটা ত তোমার চুলের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি। থাকলে এই প্রশ্নটা আমাকে করতে না। কি করছ নিজেকে নিয়ে? এ কি তোমার মতন মানুষের থাকবার জায়গা?"

নির্ম্মলা বলল, "বহুকাল ত ছিলাম এইখানেই।"

দিবাকর বলল, "তুমি আর জগন্নাথ এইখানে থেকেই বুঝি গাড়ী সারাবার কারখানা করেছিলে?"

নির্ম্মলা বলল, "হ্যাঁ।"

ছোট ছোট খুপরি মতন দুটো ঘর, মাঝখানে হাফ

পার্টিশন। দেখে দিবাকরের মনটা কেন যে এমন ভার হয়ে উঠল অকারণ।

বলল, "তখন না-হয় জগন্নাথ সঙ্গে ছিল দেখত; এখন যদি হঠাৎ অসুখবিসুখ কিছু করে? জগন্নাথ কি রোজই আসে?"

নির্ম্মলা একটু হেসে বলল, "না, অন্য সকলের মত তারও এখানে আসা বারণ। আর, হঠাৎ অসুখ-বিসুখ যদি কিছু করে ত বস্তির এই লোকগুলিই আমায় দেখবে। এরা প্রায় সবাই ঘরের লোকের মত। আচ্ছা, তোমার বাবা কেমন আছেন?"

দিবাকর বলল, "যদি বলি, ভাল নেই, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে তাঁকে দেখতে?"

"বল না, কেমন আছেন?"

"ভাল। তোমার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয়, বাবা ভাল নেই ব'লে মিথ্যে ক'রে তোমাকে ডেকে পাঠাতাম। তখন যেটুকু নিয়ে খুশী থাকতে পারতাম, এখন আর তা পারছি না, তাই সেই ফাঁকিটা অকেজো হয়ে গেছে।"

"আমার কথা কিছু বলেননি ত?"

"তুমি যে ছুটি নিয়ে ঠিকানা না রেখে কোথাও চ'লে গিয়েছ, সে ত তাঁরই কাছে আমি শুনেছি। সুজন ডাক্তার তাঁকে বলেছেন, তোমার শরীর-সারাবার জন্যে তুমি ছুটি নিয়েছ। তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি ভাল নেই জানলে তুমি আমার সঙ্গে তাকে দেখতে যাবে কি না। তুমি যেতে চাইলেও তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি যেতাম না। কারণ তুমি অসুস্থ হয়েছ শুনেছেন, তারপর তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে তিনি কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করতেন না, নিজের প্রয়োজনটা তাঁর যত বেশীই হোক।"

নির্ম্মলা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছল। বলল, "তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও লিখেছিলে। সেটা কি এখন বলবে?"

দিবাকর বলল, "বলছি।"

নির্ম্মলা উঠছিল, দিবাকর বলল, "কোথায় যাচ্ছ?"

নির্ম্মলা বলল, "ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে আসি।"

দিবাকর বলল, "না। কি দরকার আলো জালবার? বল তুমি।"

"অন্ধকারে দুটো মানুষ ঘাপটি মেরে ব'সে আছে দেখলে লোকে কি ভাববে?"

"লোকে কি ভাববে তার চাইতে আমার নিজের ভাবনা এখন বড় আমার কাছে। আমি যে কথাগুলি আজ বলতে এসেছি তা আগে বলে নিতে চাই। আলোতে তোমার মুখটি দেখতে পেলে কিছুই আমার বলা হবে না।"

এমন কিছু সে বলবে যা একমাত্র অন্ধকারে বলা যায়, অন্ধকারের সঙ্গেই সেটা মানাবে ভাল, এ ভেবে কথাটা দিবাকর বলেনি, কিন্তু নির্ম্মলার গায়ে কাঁটা দিল।

দিবাকর বলল, "শোন নির্ম্মলা! তুমি সেদিন বলেছিলে, তুমি চাও, আমাদের ভালবাসাটা কেবল আমাদের দুজনের হয়েই থাকবে, পৃথিবীর আর কেউ সেটার কথা জানবে না। না জানুক। কে চায় জানতে দিতে? আমি নিজে কাউকে বলিনি। আমার সেরকম স্বভাবও নয় আর আমার এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুও কেউ নেই যার কাছে বসে এ নিয়ে কান্নাকাটি করে মনটাকে হালকা করতে পারি। তুমি ত অবশ্য কাউকে বলইনি। তবু কিছু লোকের কাছে আমরা যে ধরা প'ড়ে গিয়েছি, তা ত তুমি জানো। যারা জানে না, তারা জানবে না, আর যারা জেনে গেছে তারা ভুলে যাবে, এটা হতে যে পারে না তা নয়। পারে, দুই উপায়ে। এক যদি তোমাকে আমি ছেড়ে দিই। ছেড়ে দেওয়া মানে বাইরের দিক্ থেকে একেবারে ছেড়ে দেওয়া, দেখাসাক্ষাতের সম্পর্কও না রাখা, কেউ কারও খবরও না নেওয়া। ওটা যে আমার দ্বারা হবে না তাও ত তুমি জানোই। তাই আর একটা উপায় যা হতে পারে সেইটের কথা ভাবছি। সে হল তোমাকে নিয়ে খুব দূরে অন্য কোনো দেশে চ'লে যাওয়া, যেখানে আমাদের চেনা কেউ নেই, আর যেখানে আমরা যে কে কি বর্ণ, কি কর্ণ, কি গোত্র, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। ওরকম কোথাও গিয়ে আমরা যদি একসঙ্গেও ঘর করি, তাতে এসে যাবে না কিছু। কিন্তু তা আমরা করব না। তুমি যখন আলাদা থাকতে চাও, আলাদাই আমরা থাকব। অচেনা জায়গায় রোজ

তোমাকে আমি visit করব, বা তুমি আসবে আমাকে দেখতে; এতে কেউ কিছু মনে করবে না। দুটি মানুষ, দুজনেই বাঙালী, এত দূর বিদেশে এসেছে, এদের সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্ঠ ত হবেই, নিজেদের মধ্যে একটু বেশী মাখামাখি করাই ত এদের পক্ষে স্বাভাবিক, বলে জিনিষটাকে উড়িয়ে দেবে সবাই। তুমি চল, সেইরকম কোথাও তোমাকে নিয়ে আমি চলে যাই। আমার পরিচিত এক গুজরাটী ভদ্রলোকের এক আত্মীয়ের ফলাও ব্যবসা আছে আফ্রিকার নাইরোবিতে। আমার মত একজন লোক পেলে আমাদের ফ্যাক্টরীটার মত একটা ফ্যাক্টরী তাঁরা সেখানে করবেন, গুজরাটী ভদ্রলোকটি এই দুদিন আগেও সে কথা আমাকে বলেছেন। চল, নাইরোবিতেই আমরা চলে যাই। আমাদের চেনা লোক একজনও সেখানে থাকবে না, স্বচ্ছন্দে সেটা ধরে নিতে পার। ফ্যাক্টরীটাতে আমি নিজেও মোটা টাকা ঢালব, ওটাকে গড়ে তুলবও আমি, কাজেই কারবারের একটা বেশ বড় শেয়ার আমার হবে। বাবার কাছ থেকে কিছু যদি না-ও নিই, আমাদের চলে যাবে একরকম ক'রে। অবশ্য তুমি হয়ত নিজের খরচ নিজেই চালাতে পারবে সেখানে। এ দেশে নার্সের যেমন অভাব, শুনেছি কেনীয়াতেও তাই; বেশ ভাল মাইনের নার্সের কাজ খুব সহজেই তুমি পেয়ে যাবে সেখানে। তবে তুমি যদি ইচ্ছে কর ত কিছুদিন শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শিখিয়ে তোমাকে আমার সেক্রেটারী করে নিতে পারি আমি। ভেবে দেখ নির্ম্মলা, কি সুন্দর হবে আমাদের জীবন! নূতন একটা দেশে, নূতন ধরণের মানুষদের মধ্যে দুজন দুজনকে নূতন ক'রে পাব আমরা। আলাদা থেকেও দুজন মানুষ পরস্পরকে কতখানি দিতে পারে, পরস্পরের কাছ থেকে কতখানি নিতে পারে সেটা জানতে বুঝতে কোনদিকে কোনো বাধা আমাদের থাকবে না। তুমি যাবে। কেমন?"

এমনভাবে বলল, কথাগুলি, এমন সহজ ভাবে কিন্তু গভীর ঐকান্তিকতার সুরে, যেন সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে দুজনে দুটি টিকিট কেনার কেবল অপেক্ষা।

অন্ধকারে আঁচলের খুঁটে যে চোখ মুছল নির্ম্মলা সেটা দিবাকরের চোখ এড়াল না। হাত বাড়িয়ে নির্ম্মলার বাঁ-হাতটা নিয়ে একটু টিপে দিয়ে বলল, "নির্ম্মলা!"

"কি?"

"আমি ঠিক জানি না, কিন্তু এখানে কি একটা দুর্ভাবনা নিয়ে যেন তোমার দিন কাটে। কিসের যেন একটা ভয়। সেখানে তুমি একেবারে নূতন মানুষ হয়ে যেতে পারবে নির্ম্মলা। আজকের দিনের যা-কিছুকে তুমি ভয় পাও, এড়িয়ে যেতে চাও, খুব সহজেই এড়াতে আর ভুলতে পারবে সেখানে। যদি চাও ত তোমার নামটাও আমরা বদলে নেব সেখানে। বলব, তোমার নাম নিরুপমা।"

অন্ধকারে আবার একবার নির্ম্মলার গায়ে কাঁটা দিল।

"নির্ম্মলা!"

"কি?"

"বল, যাবে ত? নিশ্চয় যাবে। আমাকে সত্যিই যদি ভালবাস ত কিছুতেই 'না' বলতে পাবে না। চুপ ক'রে থেকো না। বল, যাবে। বল, বল।"

নির্ম্মলা বলল, "লোভ হচ্ছে। খুব বেশী লোভই হচ্ছে। কিন্তু যা কখনো হবে না, হতে পারে না তা নিয়ে কথা ব'লে কি লাভ?"

"কেন হতে পারে না? মানুষ কি বিদেশে গিয়ে বসবাস করে না? কত লোক ত কত দেশে যাচ্ছে থাকছে। আবার অনেকে ফিরেও আসছে। আমরাও হয়ত অনেক বৎসর পরে ফিরে আসব, যখন আমাদে চুল পাকবে, আমাদের নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাবে না।"

"আচ্ছা, কথাগুলি কি তুমি seriously বলছ?"

"যতটা serious হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব।"

"কিন্তু এ ধরণের কথা তুমি কি ক'রে বলছ, ভাব বা কি ক'রে? তোমার বাবা অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁর এ মাত্র ছেলে তুমি, এখন একমাত্র সন্তান। তাঁকে ফে তুমি কোথায় যাবে?"

অন্ধকারে অবার নির্ম্মলার হাতটি টেনে নি

দিবাকর ভারী গলায় বলল, "তুমিও আমার একমাত্র নির্ম্মলা। কেন ভুলে যাচ্ছ সেটা?"

নির্ম্মলা বলল, "না না, ভুলে যাও ওসব। অমন কাজ তোমাকে আমি কিছুতেই করতে দেব না।"

দিবাকর বলল, "আচ্ছা বেশ। এখানকার বাড়ীঘর ফ্যাক্টরী সব বেচে দেব। দিয়ে বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তাহলে যাবে ত?"

নির্ম্মলা বলল, "এও কি একটা কথা হ'ল? হার্ট এ্যাটাকের বৃদ্ধ এক পেশেণ্টকে নিয়ে তুমি সাতসমুদ্র পাড়ি দেবে? উনি ত মাঝপথেই মরে' যাবেন।"

নির্ম্মলার হাতটা ছেড়ে দিয়ে দিবাকর বলল, "ওঁকে ছেড়ে যাওয়াও চলবে না, নিয়ে যাওয়াও চলবে না, এই কি তুমি বলতে চাইছ?"

"এ ছাড়া অন্যরকম কিছু কি বলা সম্ভব? তুমিই বল।"

"আচ্ছা বেশ, মানছি সম্ভব নয়। এবারে তুমি বল, তোমাকে কি ক'রে তাহলে আমি পাব? তোমাকে আমার চাই, তোমাকে নাহলে আমার চলবে না।"

এবারে নির্ম্মলা টেনে নিল দিবাকরের একটি হাত। বলল, "আমাকে তুমি ত পেয়েই রয়েছ।"

দিবাকর বলল, "বাজে কথা ব'লো না।"

"বাজে কথা কেন?"

"আজ রাত্তিরে আমাকে এখানে থাকতে দেবে তুমি?"

"ছিঃ, কি যে বল!"

"ছিঃ যেটা নয়, অর্থাৎ গাড়ীতে, হোটেলে, রেস্তর াঁর পর্দা দেওয়া ঘরে বসে আমরা যেটুকু পেতে পারি তার উপরে হয়ত খুব ভরসা আছে তোমার। কিন্তু গাড়ীটার কথাই ধর। সেটা আজ আছে, কাল না থাকতে পারে। হোটেল বা রেস্তরাঁর বিল মেটাবার ক্ষমতা আমার আজ আছে, কাল হয়ত থাকবে না। সুজন ডাক্তার আমাদের মেলামেশাটা একেবারেই পছন্দ করছেন না, তাই তিনি যে বাবার জন্যে অন্য নার্সের ব্যবস্থা করবেন না তাই বা কে বলতে পারে? এই রকম যেখানে অবস্থা সেখানে তুমি আমাকে কি করতে বল?"

নির্ম্মলা কি যে বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

দিবাকর বলল, "আর যে এক উপায়ে তোমাকে আমি পেতে পারি, সেটার কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। কারণ, তোমাকে যতটা ভালবাসি আমি, ঠিক ততটাই শ্রদ্ধা করি।"

নির্ম্মলা বলল, "তা ত জানি।"

দিবাকর বলল, "তাও যদি জান, ত আর কোনো উপায় নেই জেনেই আমাকে বিয়ে কর তুমি। বুঝতে পারছি, তোমার অনেকখানিকে আমি কোনদিন জানব না। কিন্তু যতখানিকে তোমার জানা সম্ভব তার মধ্যে তোমাকে পুরোপুরি ক'রে আমি চাই। আমাকে বিয়ে কর তুমি, যাতে তা আমি পেতে পারি।"

"পারব না। বিশ্বাস কর। বিশ্বাস ক'রে ক্ষমা কর।"

দিবাকর বলল, "আচ্ছা বেশ। ক্ষমা করছি। থাকো তুমি কলকাতায়। বাবাকে দেখো। পারিজাতকে বাবা যে চোখে দেখতেন তোমাকেও সেই চোখে দেখেন। আমার অভাবটা তুমি তাঁকে ভুলিয়ে দিতে পারবে। আমি আসছে বুধবার বোম্বাই, যাব সেখান থেকে নাইরোবি। একেবারেই যাব, আর আসব না।"

দিবাকরের হাতটি দুহাতে জড়িয়ে নির্ম্মলা বলল, "কি বলছ তুমি? না, না, তুমি যাবে না। বল যাবে না তুমি।"

দিবাকর বলল, "আমি যাবই। তোমার এত কাছে থেকেও দিনের পর দিন তোমাকে না দেখে কাটাব, ইচ্ছে করলেই তোমাকে বুকে টেনে নিতে পারব না, এ সয়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমিও খুশী হয়েই বিদায় দাও আমাকে।"

"খুশী হয়ে?" বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল নির্ম্মলা। একটুখানি স্থির হয়ে নিয়ে বলল, "আমাকে যে ভালবাস বল, সেটা মিথ্যে কথা তোমার। ভাল যদি বাসতে ত এমন করে আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবার কথা ভাবতে পারতে না।"

দিবাকর বলল, "তুমি জানো, তুমি যা বলছ তা ঠিক

নয়। তুমি জানো, আমি চলে যাচ্ছি তোমাকে ভালবাসি বলেই।"

নির্ম্মলা বলল, "আমাদের আর দেখা না হয় এই যদি তুমি চাও ত সেজন্যে তোমাকে চলে যেতে হবে কেন? আমিই চলে যাব অনেক দূরে কোথাও।"

দিবাকর বলল, "যথেষ্ট দুঃখ ভোগ কি তোমার হয়নি, যে, আরো দুঃখের মধ্যে তোমাকে আমি ফেলব? আমিই যাব। এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি।"

দু হাতে চোখ ঢেকে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নির্ম্মলা আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। মাঝখানে একবার মাথা তুলে বলল, "আমার জন্যে তুমি তোমার অসুস্থ অক্ষম বাবাকে ফেলে, বাড়ীঘর দোর, কাজ-কারবার, আত্মীয়-বন্ধু সব ফেলে এত দূর বিদেশে কেন যাবে? কেন আমাকে দিয়ে তোমার আর তোমার বাবার এত বড় ক্ষতি তুমি করাবে? এতবড় অপরাধে কেন অপরাধী করবে আমাকে?"

দিবাকর বলল, "আমাকে বিয়ে ক'রে নিলেই ত এই অপরাধের দায় এড়াতে পার?"

"তোমার সেই এক কথা," বলে নির্ম্মলা আবার কাঁদতে লাগল, বুকফাটা কান্না। আমার হাতায় নিজের চোখটা মুছল দিবাকর, তারপর নিজের মোড়াটাকে নির্ম্মলার আর একটু কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "যাব না, কথা দিতে পারি এক শর্ত্তে।"

"কি সেটা, কি? বল, বল।"

"তুমি কে, কাদের মেয়ে আমি জানতে চাই। সেইটে জানতে পেলেই হয়ত তার থেকে আর সব কিছু বুঝে নিতে পারব আমি। তবে পরিচয়টা যদি গোপন রাখতেই চাও ত রাখ, কিন্তু তাহলে সত্যি করে আমায় বলতে হবে, আমাকে বিয়ে করতে কোথায় কিসে তোমার বাধছে।"

"পারব না।"

"কি পারবে না?

"তোমার ঐ দুটো প্রশ্নের একটিরও উত্তর দিতে।"

"বেশ, তাহলে আমিও বলছি, না শুনে আমি উঠব না। এই রইলাম ব'সে।"

"কি পাগলামি করছ?"

"পাগলামিই বল, আর যাই বল, আমার যে কথা সেই কাজ। আজ শনিবার। বুধবার বিকেল পর্য্যন্ত তোমার ঘরের বারান্দায় এই মোড়াটাতে যেভাবে এখন বসে আছি সেইভাবে বসে থাকব। তার মধ্যে প্রশ্ন দুটোর কোনো একটার উত্তর পাই যদি ত ভাল। না যদি পাই ত বুধবার সন্ধ্যায় গাড়ীতে বোম্বাইয়ের পথে নাইরোবি যাত্রা।"

নির্ম্মলা দিবাকরের একটা হাত টেনে নিয়ে তাতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "তুমি এমন অবুঝের মত ব্যবহার ক'রো না লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার একটি ঠিকে ঝির আসবার সময় হয়ে এল।"

দিবাকর বলল, "আসুক। কে বারণ করছে? এসে দেখে যাক।"

নির্ম্মলা আবার উঠতে যাচ্ছিল। খপ ক'রে তার একটা হাত ধরে ফেলল দিবাকর, বলল, "কোথা যাও?"

"আলোটা এবার জ্বালি।"

"না, আলো জ্বালতে হবে না। বস এইখানে চুপ ক'রে। ব'সে ভাবো তুমি কি করবে।"

"অনেক ত ভেবেছি, আরও ভেবে লাভ কি হ'বে?"

"দেখ যদি কিছু লাভ হয়। আশা করতে দোষ কি?"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কাটলে নির্ম্মলার মনে হ'ল, উঠোনের ওপাশটায় চাঁপাবৌএর শাড়ীর আঁচলটা যেন চকিতের মত দেখা গেল একবার। "চললাম," বলে ছুটে পালাচ্ছিল, উঠে গিয়ে তাকে ধ'রে ফেলল দিবাকর। দৃঢ়বলে বুকে জড়িয়ে নিল তাকে। নির্ম্মলার পা মাটিতে ঠেকছে না এইরকম অবস্থায় তাকে সে নিয়ে এল অন্ধকার ঘরটায়।

মানুষদুটোর মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বারান্দায় ফিকে অন্ধকারে তাদের শরীরের বহিরাকৃতি

অনেকটাই দেখতে পাচ্ছিল নীতু। এবারে নীতুর হাত কাঁপছে। বাইনোকুলারটাকে ভাল ক'রে ফোকাস করতে পারছে না। গেল, গেল, এই গেল রে, দেখা আর হ'ল না। এক নিদারুণ উত্তেজনার মুহূর্তে বাইনোকুলারটা প'ড়ে গেল তার হাত থেকে। তুলে নিয়ে দেখল, যে প্যাচটা ঘুরিয়ে ফোকাস করতে হয় সেটা ঘুরছে না। চোখে লাগিয়ে দেখল, সব ধোঁয়াটে।

আটাশ

অবশ্য দেখতে সে কিছু পেতও না। ডান হাতে নির্ম্মলাকে শক্ত ক'রে বুকে চেপে ধ'রে থেকে বাঁ হাতে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়েছিল দিবাকর। নির্ম্মলা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যথাশক্তি চেষ্টা করছিল, পারছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এ কি করছ? এর কিছু মানে হয়? খুলে দাও দরজাটা। ছি ছি, কেউ যদি এখন এসে পড়ে, দেখে কি ভাববে বল ত?"

"ভাবুক যা খুশি।"

"আমি কেবল নিজের জন্যে বলছি না। লোকে তোমার নামে কত কি রটাবে। কত ছোট হয়ে যাবে তাদের কাছে তুমি। কেন? কিসের জন্যে এটা করছ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও। আমি গিয়ে খুলে দিচ্ছি দরজাটা।"

"না, খোলা হবে না দরজা। ওটা বন্ধই থাকবে। খুব ভয় হচ্ছে, না? সেইটেই ত আমি চাই। আর একটা বড় রকমের ভয়ের মধ্যে না পড়লে অন্য ভয়টা তোমার কাটবে না।"

"তুমি বুঝতে পারছ না। আমার ঠিকে ঝি দুখনী এখনি এসে পড়বে। ওদিককার ঘরে একটি বৌ থাকে, সে একটু আগে এসে একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেছে আমাদের। বড্ড বেশী ছোঁক ছোঁক করা স্বভাব, নিশ্চয় একটু পরেই আবার আসবে—"

"আসুক। এসে দেখে যাক। খুব নতুন কিছু কি দেখবে?......তুমি সুধাকান্ত হালদার ব'লে একটা লোককে চেন। এদিকেই কোথায় থাকে সে। আমাদের গাড়ী-দুটির ইন্‌সিওরেন্স, ফ্যাক্টরীর ফায়ার ইন্‌সিওরেন্স, আরো কিছু কিছু ইন্‌সিওরেন্সের কাজ এই ক'বছর ধ'রে তার এজেন্সিতে হচ্ছে। ফায়ার পলিসিটা রিনিউ করতে এসে নীচে ব'সে ছিল একদিন, তোমাকে দেখল উপরে যেতে। তার কাছে তোমার অনেক কথাই যে আমি শুনেছি তা জান না তুমি। এই বাড়ীতে জগন্নাথকে নিয়ে তুমি থাকতে, সুধাকান্তও আসত এ বাড়ীতে, তার থেকে ঝগড়া, মারামারি, জগন্নাথের জেলে যাওয়া, এসবই আমি জানি। এগুলোকে কোনো গুরুত্ব তখন দিইনি আমি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, নিজের একটা কোনো অপরাধবোধ আছে তোমার মনে, যা তোমাকে অন্যদের সঙ্গে সমান উঁচুতে উঠে দাঁড়াতে দিচ্ছে না, আর তার সঙ্গে এই ব্যাপারগুলির কোথাও কিছু যোগ আছে একটা—"

"না, নেই। না, নেই! ছি ছি, এসব কি কথা শুনছি তোমার মুখে?"

"আরে শুনবে, কথাটা যে আসলে কি তা যদি না বল।"

"পারব না, পারব না। দয়া কর তুমি, দয়া কর। দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দাও।"

"না, এত কাণ্ড করবার পর এখন আর তোমাকে ছেড়ে দেবার কথাই উঠতে পারে না। আমি এর শেষ দেখতে চাই।"

"তোমার পায়ে পড়ি, দরজাটা অন্ততঃ খুলে দাও।"

"আমার কথার উত্তর দাও, এখনই দরজা খুলে দিচ্ছি। আর তা যদি না দাও, ত আমার নামের সঙ্গে তোমার নাম আজ এমনভাবে জড়িয়ে যাবে, যে, আমার হাত থেকে আর ছাড়ান পাবে না এ জীবনে। ভালই ত হবে। আমাকে নিয়ে খেলতে চেয়েছিলে, খেলাঘরই একটা বাঁধব দুজনে, আর সেটা এখানে হলেই বা দোষ কি?"

"হাতের কাছে বিষ থাকত ত খেয়ে মরতাম। এত

ক'রে বলছি, আমার কথা তুমি রাখতে পারছ না। তালবাস না ছাই। ও তোমার কথার কথা। আচ্ছা, আমাকে ভুলে যেতে বলাতে তুমি একদিন বলেছিলে, সে চেষ্টা করবেই না যেটে। কিন্তু এরপর আমাকে ভুলতে পেলে খুশী হবে তুমি। সব ছেড়েও এই একটা আশাকে শক্ত ক'রে মনে ধরে রেখেছিলাম যে, পরের জীবনে যখনই আমাকে তোমার মনে পড়বে, এই যে মানুষটাকে তুমি জেনেছ, ভালবেসেছ, তার কথাই ভাববে তুমি। কিন্তু তা হতে দিলে না। যাও, দরজাটা খুলে দাও। তুমি যা জানতে চাইছ, বলছি।"

নির্মলাকে ছেড়ে দিয়ে দিবাকর দরজা খুলে দিলে তার পায়ের কাছে মেঝেতে ব'সে প'ড়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ কাঁদল নির্মলা, তারপর আঁচলে চোখ মুছে সোজা হয়ে ব'সে বলল, "তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার সময় তুমি একদিন বলেছিলে, আমার যে-জীবনটাকে আমি পেছনে ফেলে রেখে এসেছি সেটাকে ভুলে থাকতে আমাকে সাহায্য করবে তুমি। পারলে না কথা রাখতে। বরং যাতে কোনোদিন না আর ভুলতে পারি তাই আজ করছ। যা এত ক'রে লুকোতে চাই, জানি না কি লাভের আশায় আমাকে দিয়ে তা বলিয়ে নিচ্ছ। তবে বলব যখন বলেছি তখন বলবই, আর তোমাকে বলবার পর কথাটাকে লুকোবার বা ভুলে যাবার দরকারও আমার কিছু থাকবে না।"

একটুক্ষণ থেমে ডান হাতটা দিবাকরের দিকে বাড়িয়ে বলল, "অন্ধকারে ভাল দেখতে পাচ্ছ না হাতটা, না? খানিকক্ষণ আগে এটাকে ধ'রে ব'সে ছিলে তুমি। এই হাতে একটা লোককে কুপিয়ে কেটে আমি খুন করেছি, আর তারপর বাড়ীঘর সব ছেড়ে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। ধরা পড়লে ফাঁসী যাব।...শুনলে ত? হ'ল ত? এবারে যাও। যাও, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?" বলে উঠে দিবাকরকে আস্তে ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল।

বাইরে থেকে দরজায় আস্তে টোকা দিয়ে দিবাকর মৃদুস্বরে ডাকল, 'নির্মলা, নির্মলা, একটা কথা শোন।"

মনে হ'ল না, নির্মলা শুনতে পেল। এই সময় দুখনী এসে দাঁড়াল নীচের উঠোনে। তারপর সেখানে আর ত থাকা চলে না।

"উনি বোধহয় শুয়ে পড়েছেন। আচ্ছা, আমি কাল আসব।" বলে গলির মোড়ে রাখা গাড়ীটাতে এসে ব'সে আলো জেলে স্টার্ট দিল দিবাকর।

স্টার্ট দেওয়ার শব্দটা শুনল নির্মলা।

আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিজেকে সম্বৃত ক'রে দরজা খুলে আলো জেলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গেই দুখনী এল। বলল, "ঘুমোচ্ছিলে? একজন বাবু যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমায় ডাকছেল। সাড়া না পেয়ে চ'লে গেল। কি সোন্দর দেখতে! ঠিক যেন সায়েব।"

নির্মলা বলল, "আচ্ছা, কে কত সুন্দর সেটা পরে শোনা যাবে। এখন যাও ত, মুদীর দোকানে গিয়ে তিনুকে একবার আসতে বল।"

তিনু এলে তার হাতে একটা চিঠি পাঠাল মলিনাকে তার বকুল বাগানের ঠিকানায়। বেশী কিছু লেখার বিপদ্ আছে। লিখল—"আমি ঠিক করেছি থাকব। আপনার সঙ্গে। আমাকে কবে নিয়ে যাবেন আপনার ডাক্তারদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে?"

যাক, শেষ হয়ে গেল। জীবনের নাটক শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা। এ যে হবে তা ত জানাই ছিল, হয় দুদিন আগে, নয়ত দুদিন পরে। অবশ্য এটা হতে পারত আর একটু রয়ে সয়ে। হ'ল না।

তার এই অভিশপ্ত জীবন, এটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে গিয়ে অনেক সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে, আর সে পারছে না। মনের মধ্যে কোনো জোর আর অবশিষ্ট নেই তার। আশা করবার মত, কামনা করবার মত কিছু কোথাও থাকলে তবেই না মানুষ সংগ্রাম করার মত জোর পায় মনে? সে-সব তার কোথায়? সবই ত চুকে বুকে গেছে। সর্বহারা হয়ে কি লাভ বেঁচে থেকে? লাগুক তার জীবনটা মলিনারই কাজে।

তিনু যখন পথ দেখিয়ে নিয়ে এল মলিনাকে তখন রাত প্রায় আটটা। তাকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল নির্মলা।

গলার সুর যতটা সম্ভব নামিয়ে কথা হচ্ছে দুজনে। দরজাটা ভেজানো।

মলিনা বলল, "আমার লগে থাকেন? পারবেন? দেখেন ভাইবা।"

নির্মলা বলল, "আমার ভাবা হয়ে গিয়েছে। কবে নিয়ে যাবেন আপনার ডাক্তারদার কাছে তাই বলুন।"

"ডাক্তারদা গেছে নোয়াখালী, পরশু আসবে। তিনি ত আপনেরে ছাইড়া দিতেই কইয়া গেল।"

"কেন, কি দোষ করেছি আমি?"

"আপনে যে ডরুক।"

"আর কাউকে পেয়ে গেছেন বুঝি?"

"হ, পাইছি, এউকগা তের বছরের মাইয়া।"

"তাকে দিয়ে কাজ হবে?"

"কাজ হইব না? কন কি? বাচ্চা হইলে কি হয়? জাইত সাপের বাচ্চা।"

নির্মলা বলল, "না, না, ও রকম একটা কাজে এইটুকু একটা কচি বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন না। সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আমি যাব আপনার সঙ্গে। আপনার ডাক্তারদা ত পরশু আসছেন? পরশুই আমাকে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে।"

মলিনা বলল, "আমার লগে থাকবেন কইরা নিজেই যেইকালে কইতে লইছেন, তিনির কাছে যাওনের লাইগা তরাতরি নাই।" কোলে রাখা শান ব্যাগটার একটা দিকে একটু হাত বুলিয়ে বলল, "খালি তরাতরি এইটা একটু শিইখা লইবেন। আমিই আপনেরে শিখামু।"

নির্মলা বলল, "কি হবে শিখে? কাজটা ত বলছেন আপনিই করবেন।"

মলিনা বলল, "হ! কুকর্মটা করুম ত আমি-অই, কিন্তু তার পরে?"

"তার পরে রিভলবার দেখিয়ে পালাতে হবে বলছিলেন না?"

"দেখাইলেন রিভলবার; তবু যদি ধরতে আসে, দুই-তিনটারে লইতে হইব না? তবে?"

নির্মলা চুপ করে রইল।

মলিনা বলল, "তার পরেও যদি দেখেন, পলানের উপায় আর নাই, তখন—" মুঠো করা ডান হাতের বুড়ো আঙুলের দিক্‌টা বুকের দিকে ঘুরিয়ে ট্রিগার টিপবার ভঙ্গি করল মলিনা।

নির্মলা এতটা ভেবে দেখেনি। ভেবেছিল, রিভলবার দেখালেই ভয়ে কেউ আর কাছে এগুবে না, ছুটে গিয়ে কাছাকাছি কোথাও রাখা একটা গাড়ীতে চড়ে বসলেই হবে। কিন্তু মলিনা এসব আবার কি বলছে?

মলিনা বলল, "বড়দিনের দিন কি করুম কইরা ভাবতে লইছি কন দেখি?

"কি?"

"লাট-বেলাট-গো একটারে ফেলাট কইরা ফালামু। বুঝলেন নি কি কইতে লইছি? তার পারে না? ধরতে যদি পারে আমাগো, লইয়া গিয়া নউখের মধ্যে সুই ঢুকাইব, সুই, নউখের মধ্যে। হ।"

এইখানটায় নির্মলার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ধরে কি সব বলল

নির্মলা দুহাতে কান ঢেকে বলল, 'না, না, আর বলবেন না। শুনতে চাই না আমি।"

"শুনতে কি ইচ্ছা করে? আপনেই কন। এই সব অসভ্য কুচুক্কুইয়া কাণ্ড। ডাক্তারদা কয়, এর থানে মইরা যাওন ভাল।"

সেদিন মলিনা যখন রিভলবারটা রেখে যেতে চাইল, ভয় হচ্ছিল খুব তবু নির্মলা 'না' বলতে পারল না। মলিনা বলে গেল, কাল বিকেলে এসে শেখাবার পালা শুরু করবে।

না খেয়ে দেয়েই গিয়ে শুল। বুকের মধ্যেকার ফাঁকাটা টনটন করে জানান দিচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা অস্বস্তি। জোড়া বালিশের নীচে তোশক, তারও নীচে রিভলবারটা মনে হচ্ছে যেন মাথায় লাগছে। বিছানায় কয়েকবার এপাশ-ওপাশ ক'রে উঠে বসে রইল অনেকক্ষণ। কোলে

একটা চিন্তাকে দুটি মুহূর্ত্তও ধ'রে থাকতে পারছে না সে। একবার মনে হ'ল নিজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের জায়গাটাও যেন ফাঁকা বোধ হচ্ছে তার। সেই অবস্থায় একবার একটু তন্দ্রা এসেছিল চোখে। হঠাৎ তার ঘোরটা কেটে গেল। উঠোনে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল মনে পড়ল, মলিনার পিছনে পুলিশ ঘোরে কি না জানতে চাওয়াতে সে বলেছিল, হ্যাঁ। একটাকে সে তখনই দেখাতেও চেয়েছিল। তার অর্থ পুলিশের একটা-না-একটা লোক সারাক্ষণই মলিনাকে চোখে চোখে রাখে। আজও মলিনার সঙ্গে তাদের একজন নিশ্চয়ই এসেছিল বস্তিতে। এসে জেনেছে কার কাছে এসেছিল মলিনা। লোকটার মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ কিছু হয়েছে, যেজন্যে পাহারা দিচ্ছে নির্ম্মলাকে, যাতে নির্ম্মলা পালাতে না পারে। নির্ম্মলা শুনেছে, পুলিশের নিয়ম, ভোর-রাত্তিরে এসে বাড়ী ঘেরাও করা, সার্চ করা, তারপর ধর-পাকড় করা। রাত ভোর হবার আগেই পুলিশ এসে ঘিরে ফেলবে বস্তিটাকে, বেরিয়ে পড়বে নির্ম্মলার বিছানার থেকে রিভলবার, তারপর তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে কথা বের করবার জন্যে তার নখের মধ্যে ছুঁচ ফুটোবে তারা, লোহা গরম ক'রে ছ্যাকা দেবে শরীরের সবচেয়ে স্পর্শ-কাতর জায়গাগুলোতে, আর মলিনা আরো যে অসভ্য অকথ্য অত্যাচারগুলোর কথা কিছু কিছু বলেছে, যেগুলো মেয়ে-মানুষদের নিয়েই তারা করে বেশী বসে নির্ম্মলা এর-আগেও শুনেছে এর তার কাছে, সেইগুলো করবে। যদি করে, তাহলে? তাহলে কি হবে? বাবা! ও বাবা! বাবা গো! দাদা! দাদা! দাদা! অন্তু, অন্তু রে! শন্তু, শন্তু রে!

ষেই মুহূর্ত্তে যেন নির্ম্মলার পরিপূর্ণ ক'রে মৃত্যু হ'ল। যেন তার দেহ মন পরিপূর্ণ ভাবে অধিকার ক'রে ফিরে এল নিরুপমা। ফিরে এল সেইসঙ্গে বারুণী দীঘির সেই ভয়াবহ সন্ধ্যার স্মৃতি, সেই ভুশ্‌ ক'রে ভেসে ওঠা একরাশ চুল নিবারণের, তারপর তার সেই বিকট চীৎকার, "বাপ্‌ পুইস্‌ রে, আমারে মাইরা ফালাইছে, একেকালে মাইরা ফালাইছে, তোমরা দেখ আইসা।" ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে কালো সাপের মত কুচকুচে কালো রক্তের একটা ধারা। তার পর সেই ধারাবর্ষণ, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত। বজ্রপাতের শব্দের চেয়েও বেশী করে কানে বাজছে, "ডাক্তার আইসা করব কি? ও ত শেষ হইয়া গেছে। চক্ষুর তারা উইল্টা গেছে, শোয়াস নাই। ...থানায় যাও...তরাতরি দারোগা বাবুরে গিয়া কও।"

মনে পড়ছে নদীর ধারে ধারে মাঝিদের গুণটানা রাস্তা ধ'রে অন্ধকারে বারবার আছাড় খেতে খেতে সেই পড়ি-কি-মরি ক'রে ছুটে চলা।

আজ তার বুকে সেই রাত্রিরই মত ভয়ের স্পন্দন, তেমনি দ্রুত নিঃশ্বাস, সেই রাত্রিরই মত আজও তার হাত-পা কাঁপছে। বিছানার নীচে থেকে রিভলভারটাকে বের ক'রে যখন উঠে দাঁড়াল সে, তার মনে হতে লাগল, মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। সেই লোকটা কি উঠোনেই আছে এখনো? থাকেই যদি, একটা মেয়েমানুষকে সে পাইখানায় যেতে দেবে না, এ ত হতে পারে না? বাড়ী ছেড়ে না পালায় নির্ম্মলা, কেবল এইটে দেখার জন্যেই ত সে রয়েছে। তবু খুবই ভয় হচ্ছিল নির্ম্মলার, সেটাকে কোনো-রকম ক'রে কাটিয়ে চলে গেল সে কলতলার পাশের যে পাইখানাটা তারা ব্যবহার করে তার পাশের-টাতে। স্নানের জায়গা আর পাইখানা আড়াই হাত উঁচু একটি দেয়াল দিয়ে ভাগ করা। সেই দেয়ালের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোলা জলের সিস্টার্ণটার উপরে, এমনভাবে রিভলবারটাকে এক পাশ ঘেঁষে সন্তর্পণে রাখল সে, যাতে শিকল টানলে ওটার গায়ে কোনোরকমের টান, এমন কি ছোঁওয়াও না লাগে। রেখে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এল নিজের ঘরে। যাক, এরপর পুলিশ এসে ওটাকে যদি পেয়েও যায়, কেউ বলতে পারবে না যে সে-ই ওটাকে ওখানে রেখেছে।

কিন্তু এতেও ত ভয় কাটছে না তার? বরঞ্চ রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ: সেটা বাড়ছে। একবার মনে হ'ল, স্নানের ঘরের দরজার কাছ থেকে সিস্টার্ণের উপরটা নিশ্চয় দেখা যায়, ভোরবেলা ওটাকে কেউ না কেউ দেখবে, নামিয়ে আনবে, তারপর শুরু হয়ে যাবে

বিষম গোলমাল। হয়ত চাপাবৌ বা তার স্বামী বা আর কেউ রাত্তিরে উঠেছিল সে-সময়, এবং দেখেছে নির্ম্মলাকে ঐ স্নানের ঘরটায় ঢুকতে। যদি নাও কেউ দেখে থাকে, এবং নির্ম্মলাকে সন্দেহ কেউ নাও করে, তবু ওরকম কিছু ঘটলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? মজিনা এসে কি বলবে তাকে সে? ওদের নাকি কোর্ট বসে, বিচার হয়, অনেক রকমের কঠিন শাস্তি নিজেদের দলের লোকদের দেয় ওরা। রিভলবারটা নির্ম্মলার দোষে খোয়া গেলে নির্ম্মলার জন্যে কি শাস্তির ব্যবস্থা ওরা করবে কে জানে? আর-একবার বেরিয়ে স্নানের ঘরটায় গিয়ে সে ঢুকল; নীচু দেয়ালটার উপর আবার একবার উঠে দাঁড়িয়ে রিভলবারটা পাড়ল সে, তারপর সেটাকে আঁচল-ঢাকা দিয়ে এনে আবার বিছানার নীচে রাখল। এইটুকু করতেই একেবারে হাঁপিয়ে গেল সে। বেরিয়ে আসবার সময় একবার একটা হোঁচটও খেয়েছিল দরজার চৌকাঠে। পা-দুটো কাঁপছে। অনেকক্ষণ সে কাঁপুনি থামল না তার। পা-দুটো কাঁপছে আর সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, হাত দুটো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, শিরশির করছে সারা গা। মাথায় এবার পর পর ভিড় করে আসছে সব ভয়-কল্পনা। নানা রকমের নিগ্রহ, নির্য্যাতন, স্ত্রী-দেহ নিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব অত্যাচার, মানসিক, পাশবিক, আসুরিক, পৈশাচিক, সেগুলি যেন সিনেমার ছবির মত তার মনের পর্দায় ফুটে ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন সত্যিই সেগুলি ঘটছে এত স্পষ্ট তাদের দেখতে পাচ্ছে সে।

একবার ভাবল, পালায়, যেমন পালিয়েছিল সেই ভয়-ব্যাকুল সন্ধ্যায় বারুণী দীঘির ঘাট থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, কি নিয়ে পালাবে সে, কিসের প্রত্যাশায়? নিরুপমার আশা ছিল অনেক, কিন্তু নির্ম্মলা ত সব কিছু খুইয়ে তাকে আজ সর্ব্বস্বান্ত ক'রে রেখে গেছে। একটু যে চুরি ক'রে কিছু পাবে সে-পথও চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে তার। তাছাড়া পালিয়ে যাবে কোথায় সে? ভয় ত তার নিজেকে, নিজের কাছ থেকে কিরকম ক'রে সে পালাবে? সে ত জানে তার নিজের দুর্বলতা, জানে মজিনা এসে ডাক দিলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য সে তার হবে না। এখন যখন জীবনের প্রতি মমতা তার একেবারেই চলে গেছে, এখন ত মজিনার-প্রভাব কাটানো আরো অনেক বেশী কঠিন হবে তার পক্ষে। তার সমস্ত অন্তরাত্মা এখন সাড়া দেবে মজিনার ডাকে, চলে যাবে সে মজিনার সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত চরমতম দুর্গতি নয়ত সর্ব্বনাশের পথে।

বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে চোখের জলে ভিজতে ভিজতে রাত অতিবাহিত করতে লাগল সে। ক্লান্তিতে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, সেটা কাটিয়ে ভোরের দিকে গায়ের ধুলো ঝেড়ে বিছানায় উঠে বসল সে। না, তবে নিজেকে এমন পাগলের মত হয়ে যেতে সে দেবে না। বারুণী দীঘির ঘাটের সেদিনকার সে নিরুপমা আজ সে আর নেই। জীবনে তার পর অনেক পোড় সে খেয়েছে, বিরূপ অদৃষ্টের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম সে করেছে। সে সমস্ত কি বৃথা হবে? শক্ত হাতে নিজেকে সংবরণ করবে, শাসন করবে সে। সবদিক্ ভাল ক'রে ভেবে বিচার ক'রে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করবে। বেহিসাবী ভুল করবার সময় এটা নয়।

প্রথমেই তক্তপোশের নীচে রাখা সুটকেসটা অন্ধকারে হাতড়ে খুলে রিভলবারটাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিল সে। সকালে দুখনী আসবে ঘর ঝাঁট দিতে, সে-সময় বিছানার নীচে ও জিনিষটাকে থাকতে দেওয়া একেবারেই ঠিক হবে না। অবশ্য তার আগেই পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করতে পারে। যদি করে ত সে কি করবে সেটাও ভাবতে হবে।

আলো জ্বেলে ঘড়ি দেখল। তখনো রাতের ঘণ্টা-খানেক বাকী আছে। আলো নিবিয়ে বিছানায় এসে বসে তালগোল পাকানো চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিতে লাগল। ভোর হবার আগেই ভাববার যা, তা ভেবে শেষ ক'রে নিতে চায় সে।

স্থির মস্তিষ্কের যে একটি চিন্তাকে ঘিরে তার অন্য চিন্তাগুলি দানা বাঁধছে তা হ'ল এই যে, তার বেঁচে থাকার আর মানে হয় না কিছু। বেঁচে থাকতে সে

আর চায় না। যে-দৃষ্টি নিয়ে দিবাকর এতদিন তাকে দেখত, তার মধ্যে এতটুকুও পরিবর্ত্তন এসেছে জানবার আগে সে ম'রে যেতে চায়। আর সেটা ত আসবেই। ঐ দৃষ্টি নিয়ে একটা ফেরারী খুনী মেয়েমানুষের দিকে তাকানো কি কারও পক্ষে সম্ভব? আর এই যে এতদিন ফাঁকি দিয়ে দিবাকরের কাছ থেকে এত কিছু সে নিয়েছে, আরও নিতে চাইছিল, তার সে অপরাধ দিবাকর কোনোদিনই কি ক্ষমা করবে?

মলিনার কাজটাতে তার সঙ্গী হতে গেলে কাজটা সমাধা হবার আগে কিংবা পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ত তার বারো আনা। রিভলবারটা নিজের বুকের দিকে ফেরাবার আগেই হয়ত পুলিশের লোকরা ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ধরবে তাকে। তার পরেকার নিগ্রহ সহ্য করতে সে কিছুতেই পারবে না, সুতরাং সে-পথে সে যাবে না। যাবে না, কিছুতেই যাবে না, শক্তি সঞ্চয় ক'রে মলিনাকে সেটা বলবে সে।

কিন্তু নিজের নিগ্রহের ভাবনাটাই যে কেবল ভাবছে সে, তাও কিন্তু নয়। তার ত কেবল একবারই মরা দরকার? নিবারণকে খুন ক'রে সে পথ ত সে খুলেই রেখেছে। আরও একটা খুনের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে কেন সে?

সুরূপার একদিনকার কয়েকটা কথা তার কানে বাজছে। "আমরা হলাম মা। মা যেমন তার সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে না, আমরাও তেমনি পারি না কোনো মানুষকে মেরে ফেলবার কথা ভাবতে। যার যেটা কাজ। আমরা হলাম সেবাব্রতী।"

শুধু সেবাব্রতী বলেও নয়। একটা মানুষের প্রাণ, যা ফিরিয়ে দেওয়া তার সাধ্য নেই, সেটা সে নিতে যাবে কোন্ অধিকারে?

আর কি সুন্দর, কি যে আশ্চর্য্য সুন্দর এই প্রাণ, তা বোঝা যায়, একটা মৃতদেহের পাশে জীবন্ত মানুষ একজনকে দেখলে।

রঘুনাথ বলত বটে, তার কাছে তার ছেলেটার চেয়ে তার একটা গরুর দাম বেশী, কিন্তু সে আর তার স্ত্রী কি বুকফাটা, পাথর-গলানো কান্নাই না জানি সেদিন কেঁদেছিল তাদের একমাত্র-ছেলে নিবারণকে হারিয়ে।

না, প্রাণের লীলাক্ষেত্র এই পৃথিবীর থেকে বিদায় নেবার আগে আরও কতগুলি মানুষকে এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ সে দিয়ে যাবে না।

প্রাণের চেয়ে বেশী মূল্যবান্ কিছু নেই পৃথিবীতে।

সেই মহামূল্যবান্ একটি প্রাণ-প্রদীপ নিবিয়ে দেবার অপরাধে সে অপরাধী। এই অপরাধের যে শাস্তি তার পাওনা, নিজের প্রাণের বিনিময়ে তা সে দেবে।

সে মূল্য দেবার আগে অন্তু, শন্তু, তার দাদা, বাবা, এদের একবার দেখতে চায় সে। এছাড়া আর কোনো আকাঙ্খা নেই তার মনে।

তার মনে এখন পরিপূর্ণ শান্তি।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। আবার আলোটা জালল। চিঠির কাগজ নিয়ে লিখল:

দাদা, আমার চিঠি পেয়ে তোমরা যে কি পরিমাণ অবাক্ হবে, কল্পনায় সেটা খুব ভাল ক'রেই বুঝতে পারছি। অবাক্ হবে, কারণ, তোমরা ধ'রে নিয়েছ আমি ম'রে গেছি। যদি তা যেতাম, অনেক আপদের শান্তি হ'ত, কিন্তু আমি মরিনি।

দু-আড়াই বছর আগে একবার মহানির্ব্বাণ মঠের পাশ দিয়ে গাড়ী ক'রে যাবার সময় তোমাকে পথে দেখেছিলাম আমি, মনে হয় তুমিও আমাকে দেখেছিলে। কিন্তু যাকে দেখেছিলে সে যে আমি, নিশ্চয় সেটা তুমি বুঝতে পারনি। কি ক'রেই বা পারবে?

এই পাঁচ বৎসর অনেকবার আমার মনে হয়েছে, নিজের ঠিকানা না দিয়ে একটা চিঠি লিখে তোমাদের জানাই যে আমি মরিনি, কিন্তু বেঁচে আছি জানলে আমার জন্মে তোমাদের দুর্ভাবনার আর শেষ থাকবে না ভেবে লিখিনি।

অবশ্য সেই সঙ্গে আমি এও ভেবেছি, যে, তোমরা যদি ধ'রে নাও আমি ম'রে গেছি ত অন্যরাও তাই ধ'রে নেবে, আর তাতে আমার পালিয়ে বেড়ানো সহজ হবে।

আজ যে এই চিঠি লিখছি তার কারণ, পালিয়ে থাকতে আর আমি পারছি না, চাইছিও না। আমার হাঁপ ধ'রে গেছে। আমি এখন ধরা দিতে চাইছি।

তার আগে একবার বাড়ী যেতে চাই, যদি তাতে তোমাদের কোনো বিপদ্ না হয়। গিয়ে তোমাদের সকলকে একটু দেখব। অম্বু শম্বু কত বড় হ'ল, বড় হয়ে কি রকম তারা দেখতে হয়েছে জানতে ইচ্ছা করে। তাদের আদর করব একটু, বাবাকে আর তোমাকে প্রণাম করব। তুমি যদি বিয়ে করে থাক, বৌদিকে দেখব, প্রণাম করব। তোমার ছেলেপুলে হয়ে থাকলে তাদের দেখব, আদর করব।

যদি মনে কর, বাড়ী যাওয়া আমরা উচিত হবে না, ত এই ছেলেটির হাতে একটা চিঠি দিয়ে সেটা আমাকে জানিও। বড় চিঠি লিখতে ত দোষ নেই? তোমাদের সকলের সব খবর দিয়ে খুব বড় ক'রে চিঠি লিখো। পার ত সেইসঙ্গে ছবি পাঠিও তোমাদের।

ধরা দিতে চাইলে পুলিশের যে-কোনো থানায় গিয়ে সেটা বললেই চলবে ত?

নিরুপমা।

ততক্ষণে ভোর হয়েছে। পুলিশ এসে ঘেরাও করেনি বস্তির বাড়ীটা। নির্মলা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। এদিক্ দেখল, ওদিক্ দেখল, কলতলায় ও-পাশটায় দাঁড়িয়ে পাশের গলি আর বড় রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত দেখে মুখ হাত ধুয়ে ফিরে এ'ল।

তারপর তিনুকে আবার তলব ক'রে চিঠিটা দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল বিকাশের কাছে। ব'লে দিল, "মহানির্ব্বাণ মঠের খুব কাছেই বাড়ীটা, খুঁজে বের করতে তোমার অসুবিধে হবে না। চিঠিটা দিয়েই যেন চ'লে এসো না। জবাব যদি কিছু দেয় ত নিয়ে এসো।"

এবারে সত্যিই শেষ হয়ে গেল সব।

নির্মলাকে নিরুপমায় রূপান্তরিত করতে প্রাণপণ করছে সে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে দিবাকরের কথা না ভাবতে, কিন্তু তার উপরে একান্ত নির্ভরশীল স্নেহদুর্ব্বল বৃদ্ধ দিনকরকে সে ভুলতে পারছে না। আর তাঁকে দেখতে পাবে না ভেবে চোখে জল আসছে। চোখে জল আসছে সুজনের কথা ভেবে, যিনি এতকাল ছিলেন তার রক্ষক এবং আশ্রয়দাতা। জগন্নাথের কথা বারবার মনে পড়ছে তার। এত মাসী মাসী করে সারাক্ষণ! তার ঝকঝকে হাসিটি একেবারেই মিলিয়ে যাবে যখন সে শুনবে তার মাসীর সব কীর্ত্তিকাহিনী।

ক্রমশঃ

জ্বলন্ত অক্ষরে

কালীচরণ ঘোষ

রাজা রামমোহন রায় দেশকে যে জাতীয়তাবোধ দিয়ে গিয়েছিলেন সে ভাব ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে এসেছে। গদ্য সাহিত্যে ঐ চিন্তাধারা নানা দিক দিয়ে পুষ্ট করেছে সে কথা খুবই সত্য এবং তার কিছুটা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সংগ্রামী মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে কাব্য কবিতা গানের মধ্য দিয়ে তার অনেক আগে। প্রকৃত পক্ষে যুগান্তর সন্ধ্যা পত্রিকার লেখায় প্রকাশ্য পারস্পরিক হিংসাত্মক প্রচার কার্য্যে প্রকট হয়েছিল, কিন্তু কাব্যে যখন প্রকাশ পেয়েছে তখনও সিপাহী যুদ্ধের অগ্নি নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হয়নি।

বলা বাহুল্য সে যুগে ইংরাজকে 'শত্রু' আখ্যায় অভিহিত করায় বিপদ ছিল অনেক কারণ ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের তখন শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সে নিজ শক্তির কেবল যে স্বাদ পেয়েছে তা নয়, তাকে পাকা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অতি সতর্ক দৃষ্টি মেলে রেখেছে। 'সমাচার সুধাবর্ষণ' প্রভৃতি পত্রিকার দুরবস্থার কথা (মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে) বলা হয়েছে। অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদকরা ঠেকে শেখবার আগেই দেখেই শিখে নিয়েছেন, কি ভাবে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে।

কবিতা কার্য্যে সর্ব্বপ্রথমে দেশপ্রেম বিতরণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (জন্ম১৮১২)। এ বিষয়ে রামমোহনের পরই কবিবরের নাম উল্লেখ করতে হয়। বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে-ধারা প্রবর্ত্তন করেন সেদিনে সেটা এক আকস্মিক ব্যাপার বলা চলে। কিন্তু এ ঘটনার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল—ইংরেজি ভাষায় সেটা (historical necessity", ১৮৩১, ২৮ জানুয়ারী) 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার জন্ম। এ পত্রিকা দেশ-প্রেমের যে-ধারা সৃষ্টি করেছিল তাতে অবগাহন করে সমকালীন বহু বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী ত বটেই, সাধারণ পাঠকও ধন্য হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের বহু বাক্য প্রবাদ বচনে পরিণত হয়েছে এবং আজও স্বাজাত্যবোধ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে তার দু-এক ছত্র উল্লেখ না করলে প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয়। তাঁর

"মিছা মণি মুক্তা হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।"

* * *

"কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

তুলনাহীন দেশপ্রেমের কবিতা।

তাঁর স্বদেশ মাতৃভাষা, প্রভৃতি কবিতাগুলি এ যাত্রার পথিকৃৎ। এ সুরে আরও অনেক কাব্য রচিত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে পাঞ্জা ধরবার মত উপযোগী মন তৈরী করবার কবি খুব বেশী ছিলেন না।

এ কথা বল্লে অত্যুক্তি হবে না যে এ যাত্রায় যিনি প্রথম, তিনিই আবার প্রধানও বটে। যেমন বীরভাব, তেমনি প্রকাশভঙ্গী, সবই বর্ণনাতীত সুন্দর। তিনি গুপ্ত কবির প্রধান শিষ্য অনুগামীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক'জনের অন্যতম। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক রাজপুত কাহিনী (পদ্মিনী উপাখ্যান) বলতে গিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করলেন সেটা স্বাধীনতাকামী জাতির পক্ষে পরম গৌরবের বস্তু।

"স্বাধীনতা হীনতা" অবস্থার তুলনায় মৃত্যু যে অধিক বাঞ্ছনীয় সে বেদনাবোধ তিনি জন-মানসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেছেন এ অবস্থা নরকবাসের তুল্য আর "দিনেকের স্বাধীনতা"ই স্বর্গ সুখের আস্বাদ আনন্দ দান করতে পারে। সুতরাং স্বাধীনতার যন্ত্রণা দূর করবার প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনি। এর উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে রঙ্গলাল যে বাণী উচ্চারণ করলেন, সেটা

বাঙলায় যাকে "অগ্নিযুগ" বলা হয় সে সময়ে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, তার পূর্ব্বে নয়। পথ কি?

"সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার।
* * *
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে
তুল্য তার নাই।"

এই যে উচ্চগ্রাম সুর তিনি বেঁধে দিলেন, তার পর যা এসেছে সে সকল এর তুলনায় মৃদু ঝঙ্কার মাত্র। নবীনচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি দেশের অতীত সম্পদ ও গৌরব এবং বর্ত্তমান (তাৎকালিক) দুরবস্থার কথা চিন্তাকর্ষক কবিতায় বলেছেন। মেঘনাদ বধ ১৮৬১ সালে প্রকাশিত; বিদেশীয়, স্বয়ং রামচন্দ্র হলেও আক্রমণ হতে দেশরক্ষা স্বাধীনতা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টার কাহিনী। মধুসূদনের অন্তরের কথা বুঝতে অবশ্য কোনো কষ্ট হয় না।

নবীনচন্দ্র বলেছেন "আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্ব্বে, স্মরণ হয় স্বদেশ-প্রেমের নাম গন্ধ বাংলার কাব্য কি কবিতায় ছিল না···স্বদেশের কবিতায় (আমি) প্রথম অশ্রুবর্ষণ করি।" (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—নবীনচন্দ্র সেন পৃঃ ১১) তখন তিনি যশোহরে; এটা ১৮৬৮ সাল হবে। এ কথার যৌক্তিকতা নিয়ে বিতণ্ডার স্থান এটা নয়, তবে ভারতের অতীত গৌরব। বীরত্ব, ঐতিহ্য প্রভৃতির উল্লেখ করে অশ্রুপাত তিনি আরম্ভ করেছেন; পরে অনেক প্রথিতযশা কবি সেকাজ করেছেন সে কথা মনে নেওয়াই সমীচীন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ও রঙ্গলালকে একেবারে উপেক্ষা করলে যে তাঁদের প্রতি সুবিচার করা হ'লো না, এ কথা স্বীকার করলে দোষ হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৮ সালে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য যে অমর কবিতা রচনা করেছেন, "মিলে সব ভারত সন্তান" তাতে অতীতে যে সকল রূপবতী সাধ্বী সতী মহীয়সী ললনাবৃন্দ, মহামুনি, ভারত ভূষণ কবিকুলগণ, অমিতবিক্রম বীরগণ ছিলেন, তাঁদের লীলাক্ষেত্র ভারতের জয়গান করতে বলা হয়েছে। ঐক্যেতে দেহে মনে বল পাওয়া যাবে এবং ভারতের মুখ উজ্জ্বল হবে, এ আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, "বন্দে মাতরম্" প্রকাশিত হবার পূর্ব্বে এই গানই ভারতের (বাঙলার) জাতীয় সঙ্গীতরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

শান্ত-রসের গীত অজস্র বাঙালী-মন স্পর্শ করেছিল, দেশপ্রেমের কল্প বয়েছিল প্রতি শ্রোতার অন্তরে। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু দেশের অন্তরাত্মা হয়ত চাইতেছিল, বীর এমন কি রুদ্র রস এবং মাত্র দুই বৎসর পরই ১৮৭০ সালে বাঙালীর সে-বাসনা পূর্ণ হয়েছিল! হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে "ভারত সঙ্গীত" প্রকাশ করলেন, স্বাধীনতা লাভ পর্য্যন্ত সেই উদ্দীপনা জাতির অগ্রগতির সঙ্গে সমানে তাল রক্ষা করে চলেছে।

একেবারে নূতন সুর; প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ! উপায় নেই মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মাদনার আবরণ গ্রহণ করতে হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, 'হেমচন্দ্র রচিত 'ভারত সঙ্গীত' অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তূরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।"

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট-এ ছাপা হবার পর তাঁর ওপর গভর্ণমেণ্টের কোপ-দৃষ্টি পড়ে। প্রকাশকাল ১৮৭০ হেমচন্দ্রের কবিতাবলী গ্রন্থে। পর-বৎসর দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জ্জিত হ'লেও তৃতীয় সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রচলিত গল্প মতে হেমচন্দ্র প্রথমে স্বয়ং মুহ্যমান দেশবাসীকে সম্বোধন করেছিলেন এবং নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। পরে সেই দুর্দ্দান্ত আহ্বানকে একটু মোলায়েম করলে গভর্ণমেণ্টের কোপ প্রশমিত হতে পারে বলে দেশপ্রেমিক যুবার মুখে সে ভাষা তুলে দিয়েছিলেন। কেবল শোনা কথা; কোথাও মুদ্রিত পত্রিকা পুস্তকে আমি সমর্থন পাই নি। তৃতীয় সংস্করণে

সম্পূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এবং আজও তাই চলে আসছে।

এ বিতণ্ডার প্রশ্ন বাদ দিয়েই বলা যায় হেমচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান সুপ্ত অলস বাঙালী-মনকে উচ্চকিত করে তোলে। আয়তলোচন, উন্নত ললাট, সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট,. জনৈক যুবা নামাবলী গায়ে, নয়ন জ্যোতিতে বিজলী হানিয়া (পর্ব্বত) শিখরে দাঁড়ায়ে মুখে শিঙ্গা তুলি যে আরাব সৃষ্টি করেছিলেন সেটা পরাধীন জাতির সমর-প্রস্তুতির আহ্বান ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

স্থানাভাবের আশঙ্কায় সম্পূর্ণ কবিতা এখানে প্রকাশ করা গেল না—বোধ হয়, প্রয়োজনও নেই। বাঙলা ভাষায় যাঁদের জ্ঞান, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বলিষ্ঠ দিনের ইতিহাস জানবার আগ্রহ আছে, তাঁরা অবশ্যম্ভাবী-রূপে এ কবিতার সঙ্গে পরিচিত। "হীনবীর্য্য" জাতিকে তিনি ধিক্'র দিয়েছেন, এ সকল ভারত-বাসীকে "কুলাঙ্গার" অভিধায় পরিচয় দিয়েছেন। কালবিলম্ব না করে, জাতিভেদ ভুলে দৃঢ় পণ গ্রহণে মহীমণ্ডলে আপন মহিমা ধ্বজা তুলে ধরবার আদেশ দিয়েছেন।

পথনির্দ্দেশে হেঁয়ালি ছিল না। একেবারে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা। প্রাচীন যে সকল পন্থা

"জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চ্চনা"

এখন বিফল। পুরাকালে অমরগণ আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে সংগ্রাম করতেন। কিন্তু সে যুগ ত চিরতরে অপগত; তাছাড়া

"এ সব দৈত্য নহে তেমন"

সুতরাং যুদ্ধের প্রণালী, ট্যাক্‌টিক্‌স্" পরিবর্ত্তন করতেই হবে। উপায়?

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

তবেই প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হওয়া সম্ভব। খোলা তরবার সাহায্যে পূর্ব্বের সকল দুর্ব্বলতা ছিন্ন-ভিন্ন করতে হবে:

"অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন্মদ"

তবেই বিপদের অবসান হবে আর "যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও" তাকে "স্বাধীনতারূপ রতন" দ্বারা মণ্ডিত করতে পারা যাবে।

১৮৭০ সালের পক্ষে এ উদ্দীপনা এক নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫ সাল থেকে এই ভাব ও রণ-নীতির সম্যক্ প্রয়োগ দেখতে পাওয়া গেছে।

তখন দেশ কিছুটা সচকিত হয়ে উঠেছে। তাই "ভারত সঙ্গীত"-এর অনুপূরক কবিতা ফুটে উঠেছিল ১৮৭৪ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পুরু বিক্রম" নাটকে। তাতে তিনি তালমানে রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান" পর্য্যায়ে উঠিয়েছিলেন। কবিত্বশক্তির ও বাচনভঙ্গীর পার্থক্য দৃষ্ট হলেও ভাব ধারায় দুটিকে এক পর্য্যায়ে স্থান দিতেই হয়।

"পুরু বিক্রম"-এ পাওয়া যাচ্ছে,—

ওঠ! জাগো বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,-
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ।"

পরেই পাওয়া যাচ্ছে মরণের ডাক—

"স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে
শত ধিক্ তারে।
পচুক সে চিরকাল
দাসত্ব আঁধারে॥
স্বাধীনতা বিনিময়ে কি হবে সে প্রাণ লয়ে'
যে ধরে এমন প্রাণ
ধিক বলি তারে।
যায় যাক্ প্রাণ যাক্ স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল
দেশের গৌরব।

বিলম্ব নাহিক আর খোল সবে তরবার
ঐ শোন ঐ শোন
যবনের রব ॥

কালক্রমে এ সুর একটু খাদে নেমে পড়েছিল। বহু কবি অজস্র গান রচনা করে গেছেন তাতে পাওয়া গেল সর্ব্ব সম্পদের আকর, সকল সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি মায়ের মহনীয় মূর্ত্তি, অতীত গৌরব ও সমৃদ্ধির পাশেই মায়ের বেদনা ভরা সজল আঁখি, অপহৃত সম্পত্তিতে আক্ষেপ, বৈদেশিক শক্তির অত্যাচার, ভবিষ্যতের পথে ঐক্য বদ্ধ হয়ে নির্ভয় পদক্ষেপে চলবার প্রেরণা। কোথাও বা কোনো কবি স্পষ্ট প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নারী জাগরণ ভবিষ্যৎ আন্দোলনের যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সে কথাও বারে বারে বলা হয়েছে। এখানে আমরা পেলাম রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন বসু, সরলা দেবী, প্রমথনাথ দত্ত, প্রমথনাথ রায়চৌধুরি, দেবেন্দ্রনাথ সেন, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল প্রভৃতি বহু কবিকে। এ তালিকা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় বলে সে চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষেরদিকে বহু কবি বাঁশী ছেড়ে (মসীর) অসি ধারণ করেছেন। কেহ কেহ বাঙ্গলায় যে আহ্বান জানিয়েছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন, উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন, অজানার বিপদসঙ্কুল পথে ছুটে যাবার যে ডাক দিয়েছেন, তাতে আত্মীয় স্বজন গৃহ ছেড়ে দলে দলে ছেলেরা বেরিয়ে পড়েছে। কবিরা শক্তির আবাহন জানিয়েছেন, মারবার ও মরবার পূজার বোধন করেছেন আর ঘর-ছাড়ার দল ধীরে ধীরে নির্য্যাতনের দিকে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছে, পিছন দিকে তাকায়নি, মায়ের কাতর আহ্বানে কান দেয় নি, সরাসরি ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছে। আর অবিনাশী জীবনের গান গেয়ে গেছে।

এ যুগে এলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য যতীন্দ্রনাথ বাগচি কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, দেবব্রত বসু, মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ক্ষীরোদপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মুকুন্দচন্দ্র দাস, কামিনী রায়, কুসুমকুমারী দাস, স্বামী চণ্ডিকানন্দ প্রভৃতি অনেকে।

এঁদের সঙ্গীতের মধ্যে প্রধানতঃ ফুটে উঠেছিল প্রবল শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের আজিক হিসাবে শক্তির আবাহন। সাহস সঞ্চয় করে সংগ্রাম ও মরণের প্রস্তুতি, বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করে প্রতিকারের জন্য উদ্দীপনা ও উপায় নির্দ্দেশ, নির্য্যাতনের মধ্য দিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে শত্রু নিধনের নির্দ্দেশ। সর্ব্বোপরি ছিল দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম-বিসর্জ্জনের ডাক।

হেমচন্দ্র আহ্বান জানিয়ে গেলেন। "যুগ ধর্ম্ম" অপেক্ষা করে বসেছিলেন; তাঁর নেপথ্য ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন অলস শয়নে সুখ মুখ চেয়ে, দারাসুত পরিজন নিয়ে আনন্দে উপেক্ষায় কাল কাটাবার দিন অপনীত হয়েছে। তখন বাঙ্গলার দিকে দিকে

"...শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পনবানক গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্য হন্যন্তঃ স শব্দোস্তু মুলোভবৎ ॥

[অর্থাৎ শঙ্খ, ভেরী, পনব (মাদল), আনক (পটহ) গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) সকল সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠলো।]

আর সঙ্গে সঙ্গে হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, বৃকোদর পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয়, নকুল ও সহদেব সুঘোষ আর মণি পুষ্পক এবং অন্যান্য সব মহারথিবৃন্দ নিজ নিজ শঙ্খ বাজিয়ে দিলেন। বিরাট সোরগোল পড়ে গেল।

বাঙ্গলার সমরাভিযান বাণী ফুটেছিল নানা জনের নানা কবিতায়। যদি শঙ্খধ্বনি, ব্যাণ্ড-বাদ্য উন্মাদনা সৃষ্টি করে, মাদকতার প্রভাবে যোদ্ধাকে মরণ আলিঙ্গনে উদ্বুদ্ধ করে, বাঙ্গলার কবিরা সে কাজ করেছিলেন

সম্পূর্ণ হবে। হয়ত সর্বপ্রথম মুখ খুলেছিলেন কালী-প্রসন্ন কাব্য বিশারদ। তিনি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ হিতবাদী পত্রিকায় চণ্ডীর আবাহন জানিয়েছিলেন, দৈত্য-উপদ্রব হতে বাঙলাকে উদ্ধার করবার জন্য। লিখে-ছিলেন "দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে এস চণ্ডী! যুগান্তরে,

* * *

এ যুগে আবার মাগো, দুর্গতি নাশিতে জাগো—
এস নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্তি ধরে।
এস মা ত্রিতাপহরা! স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা,
শুম্ভ নিশুম্ভের দম্ভে সর্বনেত্রে অশ্রুঝরে।
দশদিকে হর-প্রিয়া! দশভুজ প্রসারিয়া,—
ত্বরায় হরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে।

কামিনীকুমার সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করলেন,—

"এস সুদর্শনধারী মুরারী!
অবনত ভারত চাহে তোমারে।
* * *
এস অরি শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নববেশে ভীষণ অসি ধরি॥

বাঙলা সাহিত্যে কবি বলে বিপিনচন্দ্র পালের তত খ্যাতি নেই। কিন্তু তাঁর আবাহক মন্ত্র আজও টাকে আমাদের সামনে তাঁকে জীবন্ত করে রেখেছে। কাতর নিবেদন তাঁর—

"দানবদলনী ত্রিদিবনাশিনী,
করাল কৃপাণী তুমি মা!
* * *
নয়নে অশনি জাগাও জননী!
নহিলে এ ভয় যাবেনা॥
উর মা বাহুতে শকতিরূপিনী
উর মা বাহুতে ও রণ-রঙ্গিণী,
রিপুকুল মাঝে সন্তান লয়ে
দাঁড়া মা হৃদয়-রমা;
প্রলয় হুঙ্কারে হর-বদি হতে,
উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে,
শাণিত তরজে মাতি রণরঙ্গে
মাভৈঃ বাণী শোনা মা!"

সংগ্রামের সাধনাকেই অবলম্বন করে কবিতা স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, এখানে তা'র আংশিক পরিচয় দিতে গেলে প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্ঘর্ষ আসন্ন, মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, "বেঁচে থাকা মিছে" বলে জীবনের পরিচয় দেবার জন্য দেশ যেন প্রলয়ের আহ্বানের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে। নিজেরে অক্ষম দুর্বল ভেবে কেবল মায়ের যাতনাই বৃদ্ধি করা হয়েছে; যার মাতৃকণ্ঠে পরাধীনতার শৃঙ্খল বাজছে তার পক্ষে নিজেকে দুর্বল বা সবল বলে ভাববার সময় নেই। "যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ মাঝে তোমার কাজে 'বন্দেমাতরম্' বলে।"

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ডাক দিচ্ছেন

"কে আছ বিপদে না করি দৃকপাত,
মৃত্যু নির্য্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত,
খণ্ড খণ্ড হয়ে মার মুখ চেয়ে
এস কে সহিতে পারিবে।"

প্রায়-অজানা কবি গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুরে সুর মিলিয়ে দিলেন—

"প্রকৃত সন্তান জেনো সেইজন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান।"

বিজয়চন্দ্র অনবদ্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ডাক দিলেন,

"এ জগতে যদি বাঁচিবি,
ওরে অক্ষম ওরে দুর্ব্বল,
বীর বিক্রম কর সবল,
যদি জীবন ধারণে বাসনা!"

যে সকল মায়া মোহ জড়িয়ে থাকায় মানুষ কর্ম-শক্তিহীন পঙ্গু হয়ে পড়ে, তাকে বিদূরিত করে অগ্রসর হবার মন্ত্র দিচ্ছেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ:

"প্রাণ দিয়ে তোর জেলে আগুন
জ্বালা সকল ঘরে,
স্বার্থ, বন্ধ মৃত্যু-ভীতি
ছাই হয়ে যাক্ পুড়ে।"

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন তোড়জোড় করতে পাঁয়তারা কষ্‌তে বহু সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, 'বিলম্বেনালং' :

"মাতৃ পূজার বসায়ে বোধন !
*   *   *   *
হাসি মুখে তোরা অকাতরে কর
লক্ষটি শির দান ।
থাকুক শিয়রে লক্ষ কৃপাণ
লক্ষ বজ্রাঘাত ।
মরণের ভয়ে শত বিভীষিকা
করিস্‌নে দৃকপাত ।"

কেবল মরণের ভয় ত্যাগ করলেই চলবে না। জীবন বিসর্জ্জন দেবার জন্ত ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যতীন্দ্রনাথ বাগচি ডাকছেন :

"ওরে ক্ষ্যাপা ! যদি প্রাণ দিতে চাস
এই বেলা তুই দিয়ে দে না !
*   *   *
মায়ের দেওয়া এছার জীবন
দে রে মায়ের তরে ।
অমর জীবন পাবিরে ভাই ।
জগৎ মায়ের বরে ॥

কবি বিজয়চন্দ্র জাতিকে দীক্ষা দান করছেন এবং তার যোগ্য দীক্ষা হয়েছে কি না তার জন্ত অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হবে বলেছেন :

"হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা
অগ্নি মন্ত্রে কি না !
তৃণ বলি তোরে গরবে হেলায়,
দলিতেছে অরি চরণ তলায় ।
পোড়াতে অরিকে, পুড়িয়া মরিতে
পারিবি কি না !
দগ্ধ তপে গ্রাসিতে বিশ্ব
পারিবি কি না ॥
*   *   *
ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ,
মহা অরণ্যে করি বিচরণ ।
রুক্ষ হস্তে শাণিত অস্ত্র
ধরিবি কি না ?
খেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্‌
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ,
মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ,
পালিবি কি না ?
সৃজি হলাহল শোণিত তরল
ঢালিবি কি না ॥"

মাতৃজাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার বহু কবিতা রচিত হয়েছিল। মুকুন্দদাস বলেছিলেন—

"শক্তিরূপিনী যাঁরা
এ দুর্দ্দিনে কেন তাঁরা
ভোগবিলাসে মজে মৃতপ্রায় পড়ে রবে ।"

এটা প্রশ্ন, একটা দাবী। অন্ত কবিরা ভারত ললনাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উৎসাহ দিয়েছেন। হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থা দিচ্ছেন—

"আজি মা গো খুলে রাখ মণিময় হার,
গলে পর নরমুণ্ডমালা ।
ভয়ঙ্করী নীল ঘোরা শ্যামাঙ্গিনী কালী,
সাজ তুমি কপালকুণ্ডলা !
করে লহ ক্ষিপ্ত অসি ফেলে হেম বাঁশি,
দৈত্য বধি রক্তপান কর গো মা আসি ।"

দৌলতপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নারী নির্য্যাতনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে (১৯০৭)। তখন কামিনীকুমার লিখেছিলেন :

আপনার মান রাখিতে জননি !
আপনি কৃপাণ ধর গো ।
*   *   *
এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল,
জাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল ।
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল
মরণে বরণ করিয়া লও গো !
*   *   *
শুনিয়া তোমার ভৈরব হুঙ্কার
নিখিল চমকি উঠুক আবার—"

মাতৃজাতি সত্য সত্যই এ তাকে সাড়া দিয়েছিলেন "স্বদেশী" আন্দোলনে ত বটেই, সশস্ত্র বিপ্লবে তাঁদের অনেককেই পাওয়া গিয়েছিল।

এ স্রোতে বিরাম যতি ছিল না যতদিন না বিদেশী-শক্তি আইন সাহায্যে তাকে কেবল রুদ্ধ নয়, লোপ করে দিয়েছিল। এক একটি গান প্রকাশিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহ দোষযুক্ত বলে পরিগণিত হয়েছে, প্রচার বন্ধ এবং গানের অনুলিপি কাছে রাখা দণ্ডনীয় করে দিয়েছে। চূড়ান্ত একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে প্রবন্ধ শেষ করতে হয়। যে অজস্র কবিতা সে যুগে প্রকাশিত হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলেও একটি বিরাট ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বিজয়চন্দ্র মজুমদারের এ কবিতার তুলনা নেই। মৃত দেহকে সঞ্জীবিত করে রণোন্মুখ করে তোলবার শক্তিধারণ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করলে শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত নেচে ওঠে।

"আয়, আজি আয়, মরিবি কে?
পিষিতে অস্থি শোষিতে রুধির,
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর,
থাকিতে তন্ত্র সাধন মন্ত্র,
প্রেত ভয়ে ছি! ছি! ডরিবি কে!
মত্তার মতন না লভি মরণ,
সাধকের মত মরিবি কে?
আয়, আজি আয় মরিবি কে?
অমর বিধানে কিসের তরাস্
শঙ্কর নিনাদে তোরা কি ডরাস্?
না গণি বিজন কানন ভীষণ,
বিষম বিপদ বরিবি কে?
নিঠুর অরি সংহার করি
বীরের মত মরিবি কে
উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান,
ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর,
হাসি মুখে তোরা তরিবি কে?
হউক ভগ্ন জলধি মগ্ন,
তবু তরী বাহি মরিবি কে!
* * *
মাতি সৌরভে যশে গৌরবে
অমর হইয়া মরিবি কে?
আয়, আজি আয়, মরিবি কে?

এ সকল আহ্বানের পর যুবশক্তি যে মরণ তাণ্ডবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কেবল যাঁরা অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন, অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের অবদানকে যারা ক্ষুন্ন করতে চায়, তাদের হীনমন্যতার ওপর অনুকম্পা ছাড়া অন্য কোনো ভাবের উদ্রেক হয় না।

অপহরণ

(গল্প)

অমর বসু

পথ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পারিজাত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা কুৎসিত দৃশ্য দেখতে লাগল।—

নানারকমের আবর্জনায় উপচে-পড়া একটা 'ডাস্ট-বিন্'। উচ্ছিষ্ট গলিত পুতিগন্ধময় ভুক্তাবশেষ, ছাই, কুটনোর খোসা, মাছের আঁশ,—আরও কত কি নোংরা জিনিসপত্তর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। আশে-পাশের গৃহস্থের ঝি-চাকরেরা স্পর্শ বাঁচাবার জন্যেই বোধহয় দূর থেকে গৃহের পরিত্যক্ত আবর্জনাগুলো এমন ভাবে চারদিকে ছুঁড়ে দিয়েছে যে, ডাস্ট্‌বিন্‌টাকে দেখে মনে হচ্ছে ওটা যেন আবর্জনা-বৃত্তের একটা কেন্দ্রবিন্দু।

সেই আবর্জনার স্তূপ ঠেলে 'ডাস্ট্‌বিনের' ওপর হুমড়ি খেয়ে দু'টি প্রাণী কি যেন খুঁজছে! একটি মনুষ্য সন্তান, অপরটি সারমেয় বংশোদ্ভব।

পথচারীরা দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে রুমাল কিংবা হাতচাপা দিয়ে দ্রুতগতিতে স্থানটি অতিক্রম ক'রে চলে যাচ্ছে। ডাস্ট্‌বিনের দিকে কারও লক্ষ্য নেই। কিংবা ইচ্ছা ক'রেই কেউ ওদিকে তাকাচ্ছেনা।

ডাস্ট্‌বিনের মধ্যে কুকুরের সঙ্গে ঝগড়া করে অনেক মানবশিশুকে যে খাদ্য-সংগ্রহ করতে হয়, এ-তথ্য বোধ করি কারও অজানা নয়; সুতরাং কারও কাছেই দৃশ্যটি লক্ষণীয় কিংবা অভাবনীয় নয়, নিতান্তই স্বাভাবিক।

ময়লা চটচটে নেঙটি পরা একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে। চাপ চাপ ধুলো-কাদা মাখা শরীরটা যেমন রুগ্ন, তেমনি কুৎসিত। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জটপাকানো একরাশ তামাটে চুল। মুখের ভেতরটা দগ্‌দগে লাল। তার মধ্যেই হলদে হলদে দাঁতগুলো সব সময়ই কি যেন চিবোচ্ছে।

সঙ্গের সাথী কুকুরটারও ঠিক সেই রকম চেহারা। শরীরের সব জায়গায় লোম নেই। যেখানে নেই, সেখানে ঘা। আর সেই ঘাকে ঘিরে সব সময় ভন্‌ভন্ ক'রে মাছি উড়ছে। একটা ঠ্যাঙ বোধহয় ভাঙা। গলায় 'বক্‌লস্' নেই। সুতরাং ছেলেটির মত তারও কোনও জাতপত্র নেই।

তা না থাকুক! ছেলেটি জানে কুকুরটি তার সবচেয়ে বেশী আপনার। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। আর কুকুরটা জানে, ছেলেটি তার প্রভু, তার মা-বাপ।

আবর্জনার পাহাড় ঠেলে এইরকম অনেক ছেলেকেই খাদ্য-সংগ্রহ করতে হয়। ময়লা কাপড়ের খুঁটে, কিংবা ভাঙা তোবড়ানো টিনের কৌটোর মধ্যে খাদ্য সঞ্চয় ক'রে, পরে একটু দূরে গিয়ে কোনও গাছতলায় বসে সেই সব সংগৃহীত খাদ্য এরা আহার করে। খেতে খেতে দু-এক-টুকরো সঙ্গের সাথী কুকুরটার দিকে ছুঁড়ে দেয়। কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তাই খায়। খেয়ে আবার 'প্রভুর' দিকে লালায়িত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। জিভ দিয়ে টস্‌টস্ করে লালা ঝরে।

শারীরিক পরিচয়ে এই সব ছেলেগুলো নিশ্চয়ই মনুষ্য সন্তান। অন্য পরিচয়ে এরা কি, সে-কথা ভাববার মত অবকাশ কারও নেই। আজকের মানুষ ভারী ব্যস্ত। অতি দ্রুতগতিতে যুগ এগিয়ে চলেছে। থমকে দাঁড়িয়ে সমাজের চেহারাটাকে দেখে ভীত, বিস্মিত কিংবা বেদনাহত হ'বার মত মনের সংবেদনশীলতা বোধহয় কারও নেই।

কিন্তু তবুও পারিজাত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে প'ড়ে অতি স্বাভাবিক, অতি সাধারণ দৃশ্যটি, অতি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করতে লাগল।

পারিজাত ভুলেই গেল যে, সে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আরও অনেকের পথচলার অসুবিধে করছে। এবং তা' করছে বলে অনেকে তাকে ধাক্কা দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে।

পারিজাতের পক্ষে এমনভাবে ঐ কদর্য্য দৃশ্যটি দেখবার এবং দেখে অভিভূত হবার কোনও কারণ নেই। বোধকরি সেই জন্যেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে ওর সহকর্মী বন্ধু সোমেশ ওর ঘাড়টা চেপে ধ'রে জিজ্ঞেস করল,—অমন হাঁ করে কি দেখছিস্? আমি সেই থেকে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি, বাবুর সে-দিকে হুঁসই নেই! 'ডাষ্ট্‌বিন' থেকে ভিখিরীগুলোর খাবার খুঁটে খাওয়া কি এই প্রথম তোর নজরে পড়ল?

পারিজাত কোনও জবাব না দিয়ে সোমেশের সঙ্গে একপা একপা ক'রে এগোতে লাগল। আর মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল, সেই 'ডাষ্ট্‌বিনের' দিকে—অবশ্যই সোমেশের অগোচরে।

—কুকুরটাকে কাছে টেনে এনে ছেলেটা তাকে আদর করছে। আর মুঠোর মধ্যে কি একটা জিনিস নোংরার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরক্ষণেই সেটাকে আবার কুড়িয়ে নিচ্ছে।

সোমেশ জিজ্ঞেস করল,—এত বেলা হয়ে গেল, এখনও ঘুরছিস, অফিস যাবি না?

—না।

—কালও তো যাসনি!

—শরীরটা ভাল নেই।

—বাইরের থেকে তো কিছু বোঝবার জো নেই। অসুখটা বুঝি ভেতরের! তা' এমন সেজে-গুজে কোথায় চলেছ?

—সাজগোজ আবার কোথায় দেখলি! এতো অফিসেরই কাপড়-জামা এই পরেই তো অফিস যাই।

—তা ঠিক! তুই আবার একটু বেশী ফিট্‌ফাট্ কিনা! হবিই বা না কেন! সংসারের ভাবনাটা তো ভাবতে হয়না। তাই মেয়েদের মত সপ্তাহে তিনচারখানা কাপড়জামা না হলে তোমার চলেনা। কি রে, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

—তুই যা'; আমার একটু কাজ আছে।

পারিজাত ফিরল। একটা দোকানের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল—ডাষ্টবিনের ওপর বসেই ছেলেটা কুকুরের সঙ্গে খেলা করছে।

পারিজাত আর অপেক্ষা করল না। যদি অন্য কারও নজরে প'ড়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর নাকে রুমাল চেপে সেখান থেকে সরে, একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াল।

পারিজাত বুঝতে পেরেছিল যে, তার অনুমান যদি সত্যি হয়, তা হলে ছেলেটা ওখানে বেশীক্ষণ থাকবে না। আবর্জনার পাহাড় থেকে নেমে এসে অন্য কোথাও চলে যাবে। এবং সেই জন্যেই পারিজাত অপেক্ষা করতে লাগল।

হাতের মধ্যে চেপে ধরে রাখা জিনিসটা ভাঙা কৌটোর মধ্যে রেখে, ছেলেটা ডাষ্টবিনের চত্বর থেকে বেরিয়ে এল।

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল পারিজাত।

পারিজাতদের অবস্থা ভালই। বাবা অ্যাড্‌ভোকেট্, দাদা সরকারী অফিসর। বি. এ. পাশ করার পরই পারিজাত চাকরি পেয়ে গেল। চাকরি করার ঠিক

প্রয়োজন তখন ছিল না। কিন্তু সুযোগটা হঠাৎ এসে যাওয়ায়,—বাড়ির সকলেই ভাবল,—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা উচিত হবেনা। সুতরাং গোলদীঘির পথে আর না গিয়ে, পারিজাত একদিন সকাল ন'টার সময় খেয়ে-দেয়ে ট্রামে চেপে লালদীঘির দিকে চলতে সুরু করল। এবং তারপর থেকে রোজই।

দেখতে দেখতে প্রায় দশবছর কেটে গেছে। পারিজাতের বিয়ে হয়েছে, একটা মেয়েও হয়েছে। চাকরিটা এখন আর অপ্রয়োজন বলে কেউ মনে করেনা।

মাঝে পারিজাতের ইচ্ছে হ'য়েছিল যে, সে অধ্যাপক হবে। প্রাইভেটে এম্. এ. পরীক্ষা দিয়েও ছিল। কিন্তু 'ফল' ভাল হয়নি। তাই চাকরিটা আর ছাড়া গেলনা। সে-সময় গভীর হতাশায় মনটা তার ভেঙে পড়েছিল, কাজকর্ম কিছুই ভাল লাগতনা। প্রায়ই অফিস কামাই করত। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সিনেমায় যেত। অবস্থা সচ্ছল বলে বন্ধুও জুটেছিল অনেক। এখনও সংখ্যায় তারা নগণ্য নয়।

এই মুহূর্তে কিন্তু সে-সব কথা ভাবছেনা পারিজাত। সিগারেটের মুখে জমে যাওয়া লম্বা ছাইটা আঙুলের টুস্‌কি দিয়ে ফেলে দিয়ে পারিজাত দেখল,—'ডাষ্ট্‌-বিনের' পরিধি পেরিয়ে ছেলেটা ও-পাশের একটা গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল। কুকুরটাও ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তার পায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পারিজাত আর অপেক্ষা করতে পারলনা। তাড়া-তাড়ি ছেলেটির কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে বলল,—দেখি, তোর কৌটোর মধ্যে কী!

—শীগ্‌গীর বার কর!

ছেলেটি ভয়ভয় চোখে এদিক-ওদিক একবার তাকাল। তারপর টিনের ভেতর থেকে জিনিসটা বা'র করে পারিজাতকে দেখাল।

পারিজাত অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ ক'রে ইশারায় ছেলেটিকে বলল পিছু পিছু আসতে। একটু দূরে গিয়ে হাইড্রেণ্টের জলে জিনিসটাকে ভাল করে ধুতে বলল। তারপর সেটাকে হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, পরীক্ষা করল। হাতের তালুতে রেখে হাতটাকে ঈষৎ আন্দোলিত ক'রে মনে মনে বলল,—আধভরি নিশ্চয়ই হবে।

আধভরি ওজনের একটি সোনার আঙটি। কার আঙটি,—কে জানে! কি করে ঐ 'ডাষ্ট্‌বিনে'র মধ্যে এসেছে তাও পারিজাতের জানার কথা নয়। কেননা সে এ-পাড়ার বাসিন্দাই নয়।

ছেলেটির দিকে কট্‌মট্ ক'রে চাইতেই ছেলেটা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। পারিজাত ধমকে বলল,—দাঁড়া!

তারপর পকেট থেকে একটাকার একখানা 'নোট' বার ক'রে আলগোছে ছেলেটির হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বলল,—যা, পালা এখান থেকে!

নোটখানা মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ছেলেটি ছুটতে লাগল।

পারিজাত আর সেদিকে তাকালোনা। বুক পকেট থেকে একটা পুরণো ক্যাশমেমো বার ক'রে আঙটিটা তা'তে মুড়ে নিয়ে পারিজাত আবার একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল ব্যাপার-খানা কেউ লক্ষ্য ক'রেছে কি না!

দ্রুতগতি জনস্রোতের দিকে চেয়ে পারিজাত আশ্বস্ত হল। না কেউ দেখতে পায়নি। ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল পারিজাত। ক্রমশঃ গতির বেগ আপনা থেকে কখন যে বেড়ে গেল পারিজাতের তা খেয়ালই রইল না।

হঠাৎ ও-পাশের একটা দোকানের সাইন্‌বোর্ডের দিকে নজর পড়ল পারিজাতের। সে থমকে দাঁড়াল।

"অলশ্রী"

প্রসিদ্ধ জুয়েলারীর দোকান।

স্বত্বাধিকারী— শ্রীপঞ্চানন দত্ত।

সাবধানে রাস্তা পার হয়ে পারিজাত দোকানের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

আর সেই ছেলেটা মুঠোর মধ্যে টাকাটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা খাবারের দোকানের পাশে গিয়ে মাথা হেঁট করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। খাবার-ওয়ালা তার দিকে ফিরেও তাকালেনা। ভয়ে ভয়ে একটু একটু করে ছেলেটি এগোতে লাগল।

দোকানদার চিৎকার করে উঠল, অ্যায়, ওদিকে যা! ভেতরে ঢুকছিস কেন?

খা-বা-র!—বলেই ছেলেটা মাথা নামিয়ে নিয়ে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। আর কোনও কথা বলতে পারল না।

এঃ, খাবার! খাবার যেন ওর জন্যে তৈরী করে রেখেছি। যাঃ, পালা এখান থেকে!

ছেলেটি টাকার নোট্টা ছুঁড়ে দিল।

নোটটা ঘৃণা ভ'রে কুড়িয়ে নিয়ে ভাল করে দেখে নিল দোকানদার। তারপর সেটা বাক্সর মধ্যে না তুলে বাটখারা দিয়ে চেপে রেখে কর্কশ গলায় বলল, —টাকা কোথায় পেলি! সকাল বেলায় কে-তোর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে গেল?

ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটি কথাও বলল না।

খেতে খেতে ভেতর থেকে একজন খরিদ্দার বলল,—কারও সর্বনাশ করেছে বোধহয়। ব্যাটা পকেটমার নয়তো।

—কে জানে! এই ব্যাটা, এদিকে আয়,—

ছেলেটি এগিয়ে আসতেই দোকানদার একটা শাল-পাতার ঠোঙার চারখানা কচুরি আর কিছু তরকারি দিয়ে বলল,—যা, আর এদিকে আসবিনা। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দবো।

টিনের কৌটোর মধ্যে খাবারটা রেখে, তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ছেলেটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। যেন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। আরও অনেক খাবার অথবা বাকী অনেক পয়সা তার পাওনা আছে, এ-সব কথা একবারও তার মনে এলোনা কিংবা অত হিসেব তার জানা নেই।

ভেতর থেকে অন্য কোনও ক্রেতা মন্তব্য করল,—কই টাকার 'চেঞ্জ' তো ওকে ফেরৎ দিলেন না!

কাষ্ঠ হেসে দোকানদার বলল,—দাঁড়ান; সারাদিন কতবার এসে খাবার চাইবে তার ঠিক আছে। তখন কি আর পয়সা দেবে, না আমি ওর কাছ থেকে চাইতে পারব।

ভেতরের ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন,—ও, তাই বুঝি আগেভাগেই পয়সাটা আটকে রাখলেন।

—হ্যাঁ! সারাদিন এই রকম কত উট্‌কো ঝামেলা যে আমাদের সহ্য করতে হয়, তাতো আপনারা জানেন না!

খাওয়া-দাওয়া সেরে হিসেব মিটিয়ে মশলা চিবোতে চিবোতে ভদ্রলোক বললেন.—যা' পুলিশের ভয় দেখিয়েছেন, ও বোধহয় আর আসবে না। এলেও তখন আপনি কি আর ওকে চিনতে পারবেন?

দোকানদার আপনমনে ঠোঙা তৈরী করতে লাগল। ভদ্রলোকের কথাগুলো কানে গেল কিনা বোঝা গেলনা।

ছেলেটা তখনও ছুটছে। এখনই কেউ দেখতে পেলে হয়তো মারবে, নয়তো খাবারটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দেবে রাস্তায়,—ভাবছে নিশ্চয়ই চুরি করেছে।

এই দুর্ভাবনার আতঙ্কে, কিংবা অনেকদিন পরে কিছু সুস্বাদু খাদ্য হঠাৎ পেয়ে যাওয়ার উচ্ছল আনন্দে, ছেলেটি উদ্দাম বেগে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে কিসে যেন হোঁচট খেয়ে পাথরে-বাঁধানো রাজপথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

বহুদিন ভাল করে খেতে না পেয়ে, এবং অখাদ্য খেয়ে খেয়ে শরীরটা তার কত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, রাস্তার ওপর পড়ামাত্রই ছেলেটি জ্ঞান হারাল। হাতের খাবার ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপর। পথচারীরা হৈ-হৈ করে উঠল। কেউ কেউ আগ্রহাতিশয্যে কাছে

এগিয়ে গেল। তারপর তার নোংরা নেঙটি, ছাই-কাদা মাখা চটচটে শরীরটা দেখে পিছিয়ে এসে যে যার কাজে চলে গেল।

ওর জন্যে কারও কোন কর্তব্য নেই। কাউকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবেনা। রিক্সা কিংবা ট্যাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবেনা। কেননা সে রাস্তার ছেলে। তার কোনও জাতপত্র নেই। যদিচ সে-সময় তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল।

কোথায় ছিল সেই শীর্ণ কুকুরটা। এক পা তুলে ছুটতে ছুটতে এল। তার রাতদিনের একান্ততম সঙ্গীকে ঐ ভাবে রাস্তায় আছড়ে পড়ে যেতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারেনি। ছুটে এসে ছেলেটির মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে শুঁকলো। তারপর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ছড়িয়ে-পড়া কচুরি-তরকারির কাছে গিয়ে পা-মুড়ে বসল। একদৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে পাহারা দিতে লাগল—কাক-চিল যেন ছোঁ দিতে না পারে।

কুকুরটা জানে একসময় তার বন্ধু উঠে পড়বে। খাবারগুলো কুড়িয়ে নিয়ে খেতে বসবে। খাওয়া হবার পর নিশ্চয়ই তাকে প্রসাদ দেবে। প্রসাদটুকুই তার প্রাপ্য। সমগ্র খাবারটাতে তাই তার কোনও লোভ নেই।

কিন্তু পারিজাত লোভ সামলাতে পারলনা।

মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে 'অলঙ্কশ্রীর' স্বত্বাধিকারী শ্রীপঞ্চানন দত্তকে বলল,—এই আঙটিটা রেখে আমায় কিছু টাকা দিতে পারেন?

পঞ্চাননবাবু আঙটিটা ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়ে পারিজাতের দিকে তাকালেন।

দেখলেন,—পারিজাতের গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। গলায় সোনার বোতাম। হাতে রিষ্ট্‌ওয়াচ। আঙুলে পোকরাজ বসানো ভারী আঙটি।

শুধু তাই নয়, পারিজাতের শ্রীমণ্ডিত সমস্ত শরীর থেকে, আভিজাত্য যেন ছিটিয়ে পড়ছে।

পঞ্চাননবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।—মালটা চোরাই নয়। মালিক অবস্থাপন্ন্। হয়তো হঠাৎ কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে, তাই আঙটিটা বাঁধা রাখতে চায়। হয়তো 'রেস্' খেলতে যাবে, নয়তো অন্য কোথাও ফুর্তির আসরে। মোটকথা টাকাটা তার নিতান্ত জরুরী।

তাই মোটা লাভের আশায় ম্লানমুখে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পঞ্চাননবাবু বললেন,—দেখুন আমরা তো তেজারতি কারবার করিনা, আপনি বরং অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন। অবশ্য যদি বেচতে আপত্তি না থাকে—

কথা শেষ না করে আঙটিটা শো-কেসের ওপর রেখে পঞ্চাননবাবু পারিজাতের দিকে এমন ভাবে তাকালেন, যাতে পারিজাতের পক্ষে আঙটিটা ঠিক ফেরৎ নেওয়া সম্ভব হলনা। তাই চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পারিজাত। গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ বলল,—আচ্ছা তাই হোক,—আমি এটা বিক্রীই করব! আপনি রাখবেন তো!

—তা রাখতে পারি,—কিন্তু বেচবেন কেন শুধু শুধু!

-তা হোক্ গে, আপনি ওটা রেখে, যা দাম হয় হিসেব করে দেখুন।

পঞ্চাননবাবু কপট অনিচ্ছা প্রকাশ করে আঙটিটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন, দেখুন, অনেক খাদ রয়েছে, টাকা চল্লিশের বেশী হবেনা।

পারিজাত মনেমনে হিসেব করতে লাগল,—হঠাৎ পেয়ে যাওয়া এই টাকাগুলো নিয়ে সে কি করবে! কি, কি কিনবে,—স্ত্রীর জন্যে একখানা শাড়ী, আর মেয়েটার জন্যে একখানা ফ্রক।—তারপরও যদি কিছু বাঁচে,—তাহলে কিছু মিষ্টি, নয়তো কিছু ফুল।

কিন্তু স্ত্রী যদি জিজ্ঞেস করে,—হঠাৎ টাকা পেলে কোথায়! এ-মাসে তো 'ওভারটাইম' করনি। এখন

তো' 'বনাস' দেয়না। আর তাই যদি দেয়, বাকী টাকাগুলো গেল কোথায়!

এমনভাবে জেরা করবে যে, হঠাৎ বানিয়ে কিছু বলাই যাবেনা। তাহলে কি বলবে পারিজাত!

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে পঞ্চাননবাবুর কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে পকেটে রাখল। তারপর ধীর পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

—বানিয়ে কিছু বলতেই হবে,—পথ চলতে চলতে—আবার ভাবতে লাগল পারিজাত।

কেননা সত্যি কথা বলা যাবেনা। সত্যি কথা শুনলে স্ত্রী রাগ করবেনা, অভিমানও করবেনা। শুধু জ্রভুটো কুঁচকে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে, তারপর চাপা গলায় বলবে,—ছিঃ, ছিঃ—তুমি এই রকম!—বলেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

পারিজাত তা' কিছুতেই সহ্য করতে পারবেনা। সুতরাং মিথ্যে কথা তাকে বলতেই হবে!—তাই পারিজাত মনেমনে ঠিক করতে লাগল যে সে কি বলবে। ভাবতে ভাবতে একসময় মুচকে হাসল। ঠোঁটের কোণে সেই গোপন হাসিটাকে অনেকক্ষণ ধ'রে রাখল। তারপর নিজেই নিজেকে তারিফ করতে করতে একটা সিগারেট ধরাল।

—ভাগ্যিস কথাটা মাথায় এল। নইলে কাপড়-জামা কিছুই কিনতে পারতোনা পারিজাত। টাকা-গুলো লুকিয়ে রাখতে হতো। একটু একটু করে নিজের জন্তেই খরচ করতে হত।

...কথাগুলো মিথ্যে বটে কিন্তু অবিশ্বাস্ত নয়।—রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ স্কুলের বন্ধু নিখিলের সজে দেখা।—মস্তবড় কাপড়-জামার দোকানে নিয়ে গেল। দোকানের মালিক তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। নানা-রকম কথা কইতে কইতে ঝোলানো একটা কাপড়ের দিকে নজর পড়তেই পারিজাতের ভারী পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু পকেটে তো টাকা নেই নিখিলকে সে-কথা জানাতে সে কোনও কথা না বলেই কাপড়খানা প্যাক করে দিয়ে দিল। বলল,—দু-একদিনের মধ্যেই দামটা দিয়ে যাস।

দামটা যখন এখনই দিতে হচ্ছে না, তখন আর ভাবনা কি, এই ভেবে পারিজাত খুকীর জন্তে একখানা ফ্রকও কিনে ফেলল।...পরের মাসে কয়েকদিন দেরি করে বাড়ী ফিরে, O.T. করেছি বললেই সব ল্যাটা চুকে যাবে।......

কথাগুলি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে তার স্ত্রী। তাছাড়া আচমকা একখানা শাড়ি পেলে বাঙালী মেয়ে মাত্রই খুশী হয়। পারিজাতের স্ত্রীও হবে। খুশী হয়ে গেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশেষ কিছু জিজ্ঞেসই করবেনা। বড়জোর বলতে পারে, এখনই না কিনলে পারতে। তার উত্তরে পারিজাত যে কৈফিয়ৎ দেবে, বিনা প্রতিবাদে তাই তার স্ত্রী মেনে নেবে। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়াই তো ওদের কাজ।

বড় বড় পা ফেলে হাঁটতে লাগল পারিজাত। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে খট্‌কা লাগল। মাত্র চল্লিশ টাকা দাম হল। আধভরির ওপর ওজন হবে। কিছু না হয় বাদ যাবে—তাই বলে চল্লিশ টাকা! লোকটা নিশ্চয়ই ঠকিয়েছে।

পারিজাত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল —'অলশ্রী'তে আবার ফিরে যাবে কিনা। হিসেবটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সত্যিই কত দাম হল যাচাই করতে হবে। ভাবতে ভাবতে পারিজাত আবার দোকানের দিকে ফিরে চলল।

কিন্তু দোকান পর্যন্ত আর যাওয়া হলনা। একটু-খানি গিয়েই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।—যাক্‌ গে, যা পাওয়া যায় তাই লাভ, পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা। বেশী দরাদরি করলে লোকটা যদি আঙটিটাই ফেরৎ দেয়, তখন আবার আর একটা দোকানে যেতে হবে। তারা হয়তো কিনতেই চাইবেনা! হয়তো ভাববে

চোরাই মাল। আর পাঁচটা লোকের সামনে কথা কাটাকাটি করতে হবে। বে-ইজ্জত হতে হবে। তার চেয়ে এই ভাল।

সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে, আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পারিজাত আবার পথ চলতে সুরু করল।

আপন মনে নানান রকম ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন যে সে সেই ডাষ্ট্‌বিনের সামনে এসে পড়েছিল তা তার নিজেরও খেয়াল ছিলনা। বিশ্রীগন্ধ নাকে যেতেই অভ্যাসবশেই পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে চেপে তাড়াতাড়ি নোঙরা জায়গাটা পার হয়ে চলে গেল। পাছে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে ওঠে, তাই এদিক-ওদিকে একবার ফিরেও তাকালনা।

তাকালে দেখতে পেত—সেই ছেলেটা তখনও রাস্তার ওপর পড়ে আছে। আর তার সামনে ঘেয়ো কুকুরটা বসে বসে তরকারিমাখা খাবারের ঠোঙাটা পাহারা দিচ্ছে,—কেউ যেন তা চুরি করতে না পারে।—

বাংলার খাদ্য

সাতকড়িপতি রায়

ভারতের খাদ্য সমস্যা ক্রমশ ক্রমশ খুবই কঠিন হইতে কঠিনতর হয়ে উঠেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য বহুদিন শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় আত্মনির্ভরতা কি, তাহা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। সেই জন্য আমাদের সরকারকে সমস্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করে মাপ করে আমাদিগকে খাদ্য দিতে হচ্ছে। এই খাদ্য পর্য্যাপ্ত করতে হলে দুটী বিষয়ে প্রত্যেক অধিবাসীকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম পর্য্যাপ্ত উৎপাদন, দ্বিতীয় অপচয় নিবারণ। সেই কারণ এই উভয় বিষয়েই একটু আলোচনা করছি।

উৎপাদন

উৎপাদনের কথা আলোচনা করতে হলেই জমির কথা এসে পড়ে। কিন্তু ভারতের বাংলা ছাড়া অন্যান্য ষ্টেটের জমির প্রকৃতি আমার কিছু জানা নেই। সুতরাং আমি বাংলা অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার জমির উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

সুন্দরবনে দেবীপুর গুড়গুড়িয়া লাটে ৬০০ বিঘা অর্থাৎ ২০০ একর জঙ্গল জমি বন্দোবস্ত লইয়া নোনা-জল আটকাইবার জন্য বাঁধ দিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করতঃ ট্রাক্‌টারের সাহায্যে লাঙ্গল করিয়া চাষ করিবার অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে। আবার আমার গ্রাম রাঢ়-দেশভুক্ত। সে দেশে দীর্ঘ ৮৭ বৎসর চাষ করিয়া সে দেশের জমির অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট হইয়াছে। সকল চাষের জমির একটি প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি থাকে। সেই শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে যে মুহূর্ত্তে সেই জমিতে কোনও উদ্ভিদের বীজ বপন করা হয় সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেই উদ্ভিদের জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন সেই জমির মাটী হইতে সেই খাদ্য উৎপাদন করা। জমির যে শক্তি সেই জমি হইতে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন (transform the earth in to the food of the plant) করে সেই শক্তিকেই প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি (Natural fartility) বলা হয়। যতদিন জমির এই প্রাকৃতিক উর্ব্বরা-শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে, ততদিন সেই একই মাটী হইতে বিভিন্ন উদ্ভিদের খাদ্য ঐ শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। বাহির হইতে উদ্ভিদের খাদ্য অর্থাৎ সার দিবার প্রয়োজন হয় না। সুন্দরবনে যে জমিতে ২০০ বৎসর চাষ আবাদ হইতেছে তাহাতেও এক ছটাক সারের প্রয়োজন হয় না। তাহার কারণ সুন্দরবনের (অর্থাৎ যাহার চারিদিকে গভীর খাড়ি আছে এবং সেই খাড়ি জলে পরিপূর্ণ) জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। আমি প্রতি একরে ৩৬/. মণ ধান করিয়াছি। যে পাট করিয়াছি তাহা প্রায় ১১ ফুট লম্বা, যে আখ্ করিয়াছি তাহা প্রায় ৭ ফুট লম্বা ও খুব রসাল।

যে আলু করিয়াছি তাহার এক একটির ওজন /৶০ দেড় পোয়া পর্য্যন্ত এবং এক কাঠায় ৪/০ মণ পর্য্যন্ত ফসল হইয়াছে। কোনও সার দিতে হয় নাই। দেশ স্বাধীন হইবার পর এবং প্রফুল্ল সেন মহাশয় খাদ্য মন্ত্রী হওয়ায় এই সব ফসলই তাঁহাকে দেখাইয়াছি। ইহা ছাড়া তিল, কুমড় ইত্যাদি ফসলও করিয়াছি। এক একটা কুমড় ১৫।১৬.সের পর্য্যন্ত হইয়াছে। কোনও ফসল করিতে এক ছটাক্ গোবর সারও দিই নাই, অন্য সারের কথা চিন্তাও করি নাই। একই জমিতে বিনা সারে সকল রকম ফসল হইয়াছে।

অথচ আমার গ্রামে আমার বাল্যকালে যে চাষের জমিতে এক একরে ৩০।৩১ মণ ধান দেখিয়াছিলাম, এখন সেখানে বিঘাতে ১০ ১২ মণ গোবর সার দিয়াও একরে ১৮।২০ মণ ধান ফলান কষ্টকর হইয়াছে।

এই দুই স্থানের জমির উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্য আমাকে চিন্তান্বিত করে। আমি গবেষণা করিতে শুরু করি। যার ফলে আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে সুন্দরবনের জমিতে প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় রহিয়াছে। আমাদের গ্রামের জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি হ্রাস পাইতে পাইতে এখন খুবই কমিয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর হ্রাস পাইতেছে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি বুঝিতে পারি যে জমির তলার দিকের স্তরে যতবেশী জলীয় বাষ্প আছে, সে জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি ততই পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। তাহাকেই আমাদের দেশের চাষীরা সরস জমি বলে। আর যার নিম্নভাগ থেকে জলীয় বাষ্প কমিয়া যায় তাহাকে নীরস জমি (dry land) বলে এবং তার প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি অর্থাৎ মাটীকে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করার শক্তি হ্রাস পাইয়াছে বুঝিতে হইবে।

জমির নীচের স্তরে এ জলীয় বাষ্প (acquons vapour) আসেই বা কি প্রকারে এবং কমিয়াই বা যায় কি প্রকারে এবং কমিয়াই বা যায় কেন—এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবার ফলে জানিলাম, যে জমির নিকট গভীর জলাশয় আছে সেই জলাশয়ের জল খুব নীচের জমির মধ্য দিয়া চুইয়া (percolate) চাষের জমির তলদেশে ১৫।২০ ফুট নীচে আসিলে, সেটা সেখানকার তাপে জলীয় বাষ্পে পরিণত হইয়া উপরের স্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহাতেই সেই জমির অন্তরের আর্দ্রতা রক্ষা করা হয় এবং জমির আর্দ্রতা রক্ষা করিতে পারিলেই তাহার প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে পারা যাইবে এবং ফসল পূর্ণমাত্রায় হইবে। ঐ শক্তি দ্বারা ঐ জমির মাটি গাছের খাদ্যে পরিণত হইবে।

এই সিদ্ধান্তে আসিবার পর আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারি চীন দেশে গভীর পীত নদীর তীরভূমিতে একরে ৬৪/০ মণ ধান ফলে; ইরাবতীর তীরে একরে ৪৬।৪৭ মণ ধান ফলে এবং গঙ্গা যেখানে খুব গভীর তার তীরে একরে ৩৮ মণ ধান ফলে। জাপানে এক একরে ৭০।৭২ মণ ধান ফলে। ইহা জানিয়া ১৯৪১ ৪২ সালে ঠিক তারিখ মনে নাই আমি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধে জানাইয়াছিলাম যে আমাদের রাঢ় দেশের সমস্ত পুষ্করিণী, দীঘি, নদী, খাল মজিয়া যাওয়ায় গভীর জলাশয় না থাকায় জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি কোথাও একেবারে নষ্ট হইয়াছে এবং কোথাও কমিয়া গিয়াছে। সেটা Amrita Bazar Patrika রবিবারে ৭ টা কলমে ছাপিয়ে ছিলেন। তখন ইংরাজের আমল বলিয়া কিছু হয় নাই।

সেদিন বৎসর তিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের জুন মাসে আমি বাংলায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া মাননীয় প্রফুল্ল বাবুকে (মুখ্যমন্ত্রী) দিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"সাতকড়িদা,

আপনার জমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ মন দিয়া পড়িলাম। বিশেষজ্ঞদের মত না লইয়াই বলিতে পারি, আপনি যাহা ধরিয়াছেন তাহা ঠিক। আমরা এ পর্য্যন্ত কয়েক হাজার পুকুর সংস্কার করিয়াছি।——————————
আমাদের দেশের গভীর জলাশয়ের খুবই দরকার জমির আর্দ্রতা ও পুষ্টির জন্য।

ইতি
প্রফুল্ল।"

আমি এ বিষয়ে আমাদের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর নন্দীর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। তিনি আমার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তির জন্য জমির নীচের স্তরে জলীয় বাষ্প প্রয়োজন। সুতরাং গভীর জলাশয়ের

প্রয়োজন। সুন্দরবনের জমির চারিদিকে গভীর খাড়ি থাকায় তার উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হয় না।

এখানে আর একটি কথা বলি। আমাদের রাঢ় দেশে সব পুষ্করিণী ও নদী ও খাল মজিয়া যাওয়ায় উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হওয়ায় তার বিকল্পে প্রচুর সারের ব্যবস্থা হইয়াছে। সার উদ্ভিদের খাদ্য। সেই খাদ্য জমির মাটী থেকে প্রস্তুত না হওয়ায় বাহির থেকে দিলে সেই খাদ্য খেয়ে উদ্ভিদ ফল দেয়। কিন্তু তাতে জমির সেই স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তি যার দ্বারা মাটী উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়, তাহার কোনও উন্নতি হয় না।

কারণ সেটার উন্নতি করিতে হইলে জমির নীচের স্তরে জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন। সুতরাং ফলে ইহার প্রতি বৎসর সার বাড়িয়ে যেতে হবে। কারণ প্রতি বৎসর উর্ব্বরা শক্তি জলীয় বাষ্প বিনা কমিয়া যাইতেছে।

সুতরাং করণীয় কি? সার বাড়ান, না জমির উর্ব্বরা শক্তি ফিরিয়ে আনা। ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন যে, প্রথম কর্ত্তব্য জমির উর্ব্বরতা শক্তি ফিরিয়া আনা। তার জন্য প্রতি গ্রামে গভীর জলাশয় ও গ্রামের পার্শ্বে সমস্ত নদী নালার পুনঃগভীর সংস্কার। তাহা যদি করা হয়, সারের প্রয়োজন খুবই কমে যাবে। যদি উর্ব্বরা শক্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা না করা হয়, তবে সারের পরিমাণ বাড়াইয়া বাড়াইয়া সামান্য ফসল মিলিতে পারে, কিন্তু জমির কোন উন্নতি হইবে না।

আমি প্রফুল্ল বাবুকে লিখিয়াছিলাম পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ হাজার গ্রাম আছে। প্রত্যেক বৎসর ৬ হাজার করিয়া গ্রাম লইয়া প্রগ্রেস করিলে ৫ বৎসরে সমস্ত গ্রামের বর্ত্তমান পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি ও পার্শ্ববর্ত্তী নদী নালা গভীরভাবে খনন হইয়া যাইতে পারে এবং যেখানে পুষ্করিণী নাই বা কম আছে, সেখানে প্রত্যেক একশত একরের মাঝে পাঁচ একরের একটি গভীর জলাশয় করিলে ঐ সমস্ত জমিরও উর্ব্বরা শক্তি ফিরিয়া আসিবে। তাঁর উত্তরে তিনি সেই পত্রেই জানাইয়াছিলেন "আমরা এ পর্য্যন্ত কয়েক হাজার পুকুর সংস্কার করিয়াছি।" আমার নিবেদন গ্রামে গ্রামে পুকুর সংস্কার করিবার জন্য যে Tank Improvement collector বহাল আছেন, তিনি কেবল মাত্র সেচের জন্য পুকুর সংস্কার করেন। তাহা কোনও স্থানে ১০ ফুটের বেশী গভীর করা হয় না, ইহা আমি খুব জোরের সহিত বলিতে পারি। আমার গ্রামে আমাদেরই দিয়ত পুষ্করিণী মাত্র ছয় ফুট গভীর করা হইয়াছে। উহাতে কিছু মাছ হয় এবং খুব টানাটানির সময় কিছু সেচের জল পাওয়া যায়। অত উপরে জল বেশীদূর চুইয়ে (percolate) যেতে পারে না এবং সেই কারণে যায় না। অন্তত ১৫।১৬ ফুট নীচে গেলে এবং জমির নীচে ১৫ ১৬ ফুট স্তর জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকলে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অর্থাৎ মাটিকে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করার শক্তি বজায় থাকা সম্ভব।

যদ্যপি আমাদের সরকার কৃষি উৎপাদন সম্বন্ধে তাঁহাদের বর্ত্তমান পলিসির কোনও পরিবর্ত্তন না করেন অর্থাৎ জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা না করিয়া কেবল সার ও সেচের দ্বারা খাদ্য অধিক ফলাইবার যে পলিসি চলিতেছে তাহাই চালাইয়া যান, তবে আমি বলিব অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য উৎপাদন আরও কমিয়া যাইবে। কমিয়া যাইতে বাধ্য। এখন—মফঃস্বলে গেলেই চাষীরা বলে জমিতে কেমিক্যাল সার দিয়া জমি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এ কথা পশ্চিমবাংলার যে কোনও স্থানে গেলেই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি এখন প্রতি বৎসর খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হইতেছে। কারণ জমির নীচে সব শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চাষীরা মনে করিতেছে ইহা কেমিক্যাল সারের খারাপ গুণ। যদ্যপি সরকার উর্ব্বরা শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা না করিয়া ফসল বাড়াইবার জন্য কেবল সার ও সেচের

উপর নির্ভর করেন, তবে বুঝিব আমাদের দেশের দুর্ভোগ আরও বাড়িবে। সার দিয়া জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তির কোনও উন্নতি করা যায় না এ কথাটা যদি সরকারের বিশেষজ্ঞরা গ্রহণ না করেন, তবে দেশের বড়া বিপদ ঘনাইয়া আসিবে।

যাঁহারা বস্তুতান্ত্রিক অর্থাৎ যাঁহারা জীব ছাড়া আর প্রাণের স্পন্দন পান না তাঁরা জমির‌ও (মৃত্তিকার) যে একটা প্রাণ আছে, তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। উদ্ভিদের যে প্রাণ আছে সেটা এই বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিকদের বুঝাইবার জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। অথচ বীজ থেকে যে উদ্ভিদ বাহির হয় এবং দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয় তাহার জীবনী-শক্তি না থাকিলে ইহা কি সম্ভব হইত? মৃত্তিকারও জীবনীশক্তি আছে অর্থাৎ জগতে জড় বলিয়া কিছু নাই। মৃত্তিকার সেই জীবনী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যখন তাহা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদ সৃষ্ট হয়। সকল উদ্ভিদ একরকম খাদ্য গ্রহণ করে না। মৃত্তিকা প্রতি উদ্ভিদের খাদ্য নিজ শরীর হইতে উৎপন্ন করে যতদিন তার পরিপূর্ণ জীবনীশক্তি অর্থাৎ প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি বজায় থাকে। সুন্দরবনে চাষ করিতে গিয়া একই জমিতে কোন প্রকার সার ব্যবহার না করিয়া ধান্য, পাট, আখ, আলু, কুমড়, তিল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিবার অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছিল। তাহার একমাত্র কারণ ঐ জমির পার্শ্বে গভীর জলাশয় বরাবর বর্ত্তমান থাকায়, উহার নিম্নস্তরে জলীয়বাষ্প যতদূর থাকিলে জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা, (যাহাকে—আমি জমির প্রাণশক্তি বলিতেছি) পরিপূর্ণ ভাবে বজায় আছে এবং সেই শক্তি মৃত্তিকাকে সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করিতে পারে। একটা প্রশ্ন আগে যে মৃত্তিকার সেই শক্তির ক্ষয় হইয়াছে জমির নীচের স্তরে জলীয় বাষ্পের ব্যবস্থা করিলে, তাহা আবার ফিরিয়া আসিবে? অর্থাৎ জমি আবার পূর্ণভাবে সকল উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হইবে? আমার অভিজ্ঞতা বলে নিশ্চয়ই হইবে। জাতীয় সরকার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? না যেমন পশ্চিমীদেশের সরকার বা বিজ্ঞানীগণ কেবল সারের সাহায্যে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তাহারই অনুকরণ করিয়া চলিবেন? কিছুদিন আগে "statesman" পত্রিকা একটি বিলাতি পত্রিকার একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ দিককার বৈজ্ঞানিকেরা এখন স্বীকার করিতেছেন যে জমির উর্ব্বরাশক্তি জমির তলে জলীয়বাষ্পের উপর নির্ভর করে।

উৎপাদনের জন্য আর দুইটি বিষয় প্রয়োজন; জমিতে ভাল করিয়া চাষ দিয়া উহাতে রোদের উত্তাপ সংরক্ষণ করা। ইহার জন্য আমাদের দেশী গরু দ্বারা লাঙ্গল আর কার্য্যকরী নহে। ট্রাকটর দ্বারা কলের লাঙ্গল দিয়া যাতে মাটি দশইঞ্চি গভীর করিয়া ওলটান যায় তাহা করা উচিত।' দ্বিতীয়ত ভাল বীজ প্রত্যেক চাষীর নিজের চাষ হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। চাষী যদি বীজ সম্বন্ধে নিজে হুঁসিয়ার না হয়, তবে কোনও ফল হইবে না।

দুইটি ফসল উৎপাদন করিতে হইলে সেচের খুবই প্রয়োজন। গ্রামে একটা pump ও নল থাকিলে ইহার অভাব হইবে না।

অপচয়

এবার অপচয়ের কথা বলি। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত। যদি সেখানেই অপচয় হয় তবে বাঙালীকে মরিতেই হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রী লোকসভায় বলিয়াছেন, কলিকাতার বাসিন্দা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তাহারা উপবাস করিবে তথাপি বিদেশ থেকে আমদানি, বিশেষ ক'রে আমেরিকার চাউল খাইবে না। যদি সত্যই কলিকাতাবাসীর এরূপ মনের জোর হইত, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাদের মাথায় করিয়া নাচিতাম। কিন্তু হায়! আমিও জানি কলিকাতাবাসী বিশ লক্ষ লোক প্রফুল্ল সেনের নির্ব্বন্ধাতিশয়তা সত্ত্বেও ভাতের মাড় নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিতেছে।

প্রাহও করে নাই। যাহারা খাদ্যের শতকরা ৩০ ভাগ অপচয় করে, তারা বিদেশী খাদ্য না খাইয়া উপবাস করিবে? ইহা শুনিলে 'ইহাকে উপহাস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাই মনে হয় কলিকাতাবাসী কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর সহিত উপহাস করিয়াছে, উপবাস করিবে না।

প্রায় বছর দেড়েক পূর্ব্বে এই হতভাগ্য বৃদ্ধ ভাতের মাড় বা ক্যান্ কিরূপভাবে অপচয় হয় এবং সেটা নিবারিত হইলে আমাদের খাদ্যের কত সুবিধা হইবে সে সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুকে দিয়াছিলেন। তিনি তার একটা ভূমিকা লিখিয়া উহা মুদ্রণ করত: পশ্চিম বাংলার কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বিলি করাইয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। কেহ উহা গ্রহণ করে নাই। আমি জানি কর্ম্মচারীগণই উহা ভাল করিয়া বিলি বা প্রচার করেন নাই। বস্তাবন্দী হইয়া নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীদের দপ্তরে পড়িয়া আছে। ভাবটা এই, ওটা আবার অপচয়? আমি ভুক্তভাবে জানি উহাতে শতকরা ৩০ শতাংশ খাদ্য একেবারে নষ্ট করা হয়। তাহা না করিলে সত্যই পশ্চিম বাংলাকে বিদেশী আমদানী খাদ্য খাইতে হইত না। ক্ষোভ করিয়া কি করিব? আমরা মুখে অত্যন্ত দেশভক্ত। কিন্তু দেশভক্তির যদি এক কণাও আমাদের থাকিত তবে এ অপচয় আমরা করিতাম না। খাদ্য অপচয় করার জন্য আমাদের দেশদ্রোহী বলা উচিত।

যদি অপচয় সত্যই বন্ধ হয় এবং জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার পন্থা গৃহীত হয়, তবে পশ্চিমবাংলাকে খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে দুটি "যদি" রহিয়া গিয়াছে। ভগবান আমাদের দেশবাসীর ও সরকারের সুমতি দিন ইহাই প্রার্থনা।

পশ্চিম বাংলায় সুন্দরবন

সুন্দরবনে দেবীপুর ভড়ভড়িয়া লাটে ২০০ একর জঙ্গল জমি বন্দোবস্ত লইয়া বেরী বাঁধ দিয়া জঙ্গল সাফ্ করত ট্রাকটার ও কলের লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করত ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত আমি চাষ আবাদ করিয়াছি। এই উপলক্ষে সুন্দরবনে বহু লাটে আমি পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি। যে সকল জঙ্গল সরকার কর্ত্তৃক রক্ষা করা হইতেছে সেরূপ গভীর জঙ্গলে বেড়াইতে যাইয়া ভাঙ্গা পাকাবাড়ী, আম কাঁঠালের গাছ প্রভৃতি দেখিয়াছি। সেখানে বহুপূর্ব্বে লোকালয় ছিল। আমার অভিজ্ঞতায় আমি বলিতে পারি, এই সুন্দরবনে আবাদী জমিগুলি যদি ভালভাবে চাষ হয় তবে পশ্চিম বাংলায় খাদ্যের অভাব কোনদিনই হইবে না। তাহার প্রধান কারণ সুন্দরবনের প্রত্যেক আবাদের জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে এবং যতদিন প্রত্যেক আবাদের চারিদিকে গভীর খাড়ি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন শত চাষ করিয়াও ঐ উর্ব্বরা শক্তির হ্রাস হইবে না।

সুন্দরবনে প্রকৃত চাষী খুব কম। কতকগুলি ব্যক্তি সমাজে অন্যায় কার্য্য করিয়া প্রাণে বাঁচিবার জন্য সুন্দর-বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আর পুরুলিয়া বা রাঁচি হইতে যে আদিবাসী জাতি জঙ্গল কাটিবার জন্য আসিয়াছিল এবং রহিয়া গিয়াছে এবং যাহারা "মুদী" বলিয়া পরিচিত ইহাদেরই সংখ্যা বেশী। ইহাদের লাটের মালিক কর্ত্তৃক ভাগ বা খাজনায় চাষে লাগান হইয়াছে। উহারা জমির বিশেষ কোনও পাট করে না। আমি ট্রাকটার দিয়া চাষ দিয়া দেখিয়াছি একরে ৪০% ধান করা খুবই সহজ। আর সব জমিতেই দুইটি ফসল খুবই করা যায়। কিন্তু তাহার জন্য নিম্নলিখিত ৩টি বিষয় করিতেই হইবে যথা:

১। নোনাজল আটকাইবার জন্য যে বাঁধ দিতে হইবে তাহা খুব শক্ত হওয়া দরকার। যেন কোনও প্রকারে প্রবল জোয়ারে ভাঙ্গিয়া না যায়।

২। বাঁধ দিয়া ঘেরা জমি হইতে বৃষ্টির জল বাহির করিয়া খাড়িতে ফেলিবার জন্য ভাল পোক্তা সুইস্ গেট

gate) করিতে হইবে। যেন প্রয়োজন হইলে য়র বৃষ্টির জল নিকাশ করা যায়। সাধারণতঃ টয়া ঐ জল নিকাশ করা হয়। তাহাতে বাঁধ। হইয়া গিয়া প্রবল জোয়ারে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি ঘেরিতে জল নিকাশের Sluice gate থাকে, ধ ভাঙ্গিবে না।

প্রত্যেক আবাদে একটি করিয়া গোচরভূমি ই হইবে। উহাকে শক্ত তারের বেড়া দিয়া হইবে। যে আবাদে দশ হাজার বিঘা চাষের তাহাতে ৫০০ বিঘা গোচর রাখিতে হইবে। বারমাস অফুরন্ত ঘাস থাকিবে। উহার মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি চরিলে, সমস্ত আবাদী জমিতে দুটী ফসল অনায়াসেই হইবে। একটী ধান, অপর যে কোনও ফসল যথা :—পাট, আলু, আখ, গম, কলাই, তিল, কুমড় ও পটল ইত্যাদি। তবে প্রত্যেক জমি ট্রাকটার দিয়া চাষ দিতে হইবে। সুন্দরবনে জমি বিভাগ হইয়া ছোট ছোট হইয়া যায় নাই। ট্রাকটর দিয়া চাষ দেওয়া খুবই সহজ। আদৌ সার লাগিবে না।

আমি বিশেষজ্ঞ নহি। ২৩।২৪ বৎসর চাষ করিয়া চাষ-অভিজ্ঞ হইয়াছি। স্বাভাবিক উর্ব্বরা শক্তি বজায় থাকিলে সেই শক্তি যে মাটী হইতে উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করে, উদ্ভিদের খাদ্য পৃথক ভাবে দিতে হয় না, ইহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে।

জোত্তো (Giotto)

জুলফিকার

সেকালে ফ্লোরেন্সের মত এমন সুন্দর শহর সারা ইটালীতে আর দুটী ছিল না। এখানে জন্মেছিলেন মহাকবি দান্তে। নিজের জন্মস্থান সম্বন্ধে কবি একটী সগর্ব উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, ফ্লোরেন্স রোমের সবচেয়ে রূপসী, যশস্বিনী কন্যা।

আরণো নদীর দুই তীরে এই শহর।
চারপাশে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী।

নদীর উভয় কূলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল ছয় ছয়টা পাষাণ সেতুর মাধ্যমে। এই সেতুগুলির মধ্যে সব চাইতে দর্শনীয় প্রসিদ্ধ পন্তে ভেচ্চিও (Ponte Vechhio) সাঁকো। পুরাণো লণ্ডন ব্রীজের মত এরও দুধারে রকমারি সারি সারি পণ্য-বিপণি। এই রকম একটা সাঁকোর মুখেই সখি-পরিবৃতা মানসী বিয়েত্রিচের (Beatrice) সাথে দেখা হয়ে যায় বর্ষীয়ান কবি দান্তের। নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তাঁর হৃদয়। এই চেতনা তাঁকে প্রেরণা দিল অমর কাব্য Divina Comedia রচনায়। (বর্ত্তমানে ফ্লোরেন্সের পুরাণো সেতুগুলি আর নেই। ১৯৪৪ সালে তারা ধ্বংস হয়েছে।)

রেনেশাঁসের (Renaissance) যুগে ফ্লোরেন্স ছিল সমগ্র ইউরোপ খণ্ডের, তথা বিশ্বের ললিতকলা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র—the artistic and intellectual capital of the world. এই ফ্লোরেন্সেই দান্তে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় কাব্য, পেত্রার্ক [প্রিয়তমা লরার উদ্দেশে লিখে গেছেন প্রণয়-গাঁথা,—অপূর্ব সনেট গুচ্ছ। এখানে পাথর খোদাই করে তরুণ ডেভিডের মূর্তিকে রূপায়িত করেছিলেন শিল্পী মিকেলে-ঞ্জেলো। দা ভিঞ্চির চিত্রাঙ্কনের প্রথম পাঠও সুরু হয়েছিলো এখানে। এখানেই রচিত হয়েছিল ম্যাকিয়া-ভলির বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ The Prince. মধ্যযুগীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এই সহরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে,—গীর্জা, ক্যাথিড্রাল সমাধিস্তম্ভ ও অন্যান্য স্থপত্যে। সে যুগের শিল্পীরা তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন, গির্জার দেওয়াল ও ছাদে আঁকা ফ্রেস্কোতে এবং বিভিন্ন প্রস্তর মূর্ত্তি ও বাস্ রিলিফে। আর্টভক্তদের কাছে ফ্লোরেন্স একটা পীঠস্থান।

এখানে দু'দুটো নামে কলা-আর্ট গ্যালারী আছে—উফিৎসী (Uffizi) ও পিত্তি (Pitti)। অমূল্য তাদের শিল্প সংগ্রহ।

* * *

সহরের মধ্যস্থলে সান্তা মারিয়া দেল্ ফিয়োর বিশাল গম্বুজশীর্ষ ক্যাথিড্রাল। এটা স্থাপিত হয়েছিল সাড়ে ছ'শো বছরেরও আগে, ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে।

ইউরোপের নামকরা গীর্জাগুলির তালিকায় এর স্থান চতুর্থ। সান্তা মারিয়া ভজনালয়ের সংলগ্ন একটা Bell Tower বা ঘণ্টা স্তম্ভ (Campanile) আছে। এই স্তম্ভটীর পরিকল্পনা করেছিলেন শিল্পী জোত্তো (Giotto)। জোত্তোকে বলা হয়ে থাকে ইতালীর রেনেশাঁসের জনক (father of Italian Renaissance)। সান্তা মারিয়া গীর্জার অনেক পরে এই ঘণ্টাস্তম্ভটী

নির্মিত হয়েছিল। লাল, সাদা ও কালো মার্বল পাথরে গঠিত চতুষ্কোণ এই পাঁচতলা স্তম্ভটী—Campanile Giotto di Bondone, উচ্চতায় দুশো পঁচাত্তর ফিট (কুতুব মিনারের উচ্চতা ২৩৮ ফিট, জোত্তোর ঘণ্টাস্তম্ভ তার চেয়েও উঁচু)। এর গায়ে অনেক সুন্দর সুন্দর নক্সা ও ছবি উৎকীর্ণ আছে। সত্যিই একটা অপূর্ব শিল্প-কর্মের অভিজ্ঞান। নিখুঁত কোন ভাল জিনিষের প্রশংসা করতে হলে ফ্লোরেন্সের লোকেরা বলে থাকে: 'বাঃ, ঠিক যেন জোত্তোর কাম্পানাইলের মত।

ভ্রমণকারীদের জন্য লেখা একখানা পুস্তিকায় এই ঘণ্টাস্তম্ভটীর একটি সংক্ষিপ্ত ও মনোজ্ঞ বিবরণ দেওয়া হয়েছে:

An enchanting bell tower of variegated marble, piercing the skies of Florence with restrained ethrial grace its surface adorned with beautifully, pointed windows. slender coloumns. exquisite statues and reliefs—this is the Campainile of Giotto di Bondone, the great Italian artist who stood at the dawn of Renaissance.

* * *

ফ্লোরেন্সের কিছু উত্তরে Vespignano নামক গ্রামে অনুমান ১২৬৭ খৃষ্টাব্দে শিল্পী জোত্তোর জন্ম হয়েছিল। বাল্যকালে জোত্তো মেষ-চারক ছিলেন। তখন তাঁর বার বছর বয়স। একদিন ভেড়ার পালকে ছেড়ে দিয়ে, একখণ্ড ছুঁচলো পাথর দিয়ে মাটিতে একটা ভেড়ার ছবি আঁকছেন, এমন সময় ঘটনাচক্রে শিল্পী Cimabue র দৃষ্টি সেই ছবির দিকে আকৃষ্ট হল। ছেলেটির শিল্প-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে, তিনি ওকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। তাঁরই ষ্টুডিওএ শিক্ষানবীশ হলেন জোত্তো। কালে কালে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হল।

গির্জার দেওয়ালে ফ্রেস্কো আঁকবার জন্য ডাক পড়ল তাঁর। বাইবেলের ঘটনা ও সন্তদের (saints) জীবন-কাহিনীর ছবি একটার পর একটা এঁকে চলেন।...জোত্তোর প্রথম দিকের কাজ সেণ্ট ফ্রান্সিকো এ্যাসেজি গীর্জার গায়ে দেখা যাবে (সেণ্ট ফ্রান্সিকো হচ্ছেন Fransicans বা Grey Friar নামক খৃষ্টীয় সাধন সম্প্রদায়ের গুরু)।

কালে কালে তাঁর খ্যাতি সারা ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ল।

ফ্রেস্কো আঁকবার জন্য রোম থেকে আমন্ত্রণ এল, সেখানে কয়েকটী গির্জায় মোজাইকের নক্সা ও ফ্রেস্কোর ছবি আঁকলেন। শিল্পীমহলে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি মিলল।

ইটালীতে এহেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কেউ ছিলেন না সে সময়, যিনি জোত্তোর বন্ধুত্ব কামনা করতেন না। দান্তে ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টা।

জোত্তো তাঁর প্রতিভার সর্বোত্তম নিদর্শন রেখে গেছেন পাদোয়ার (Padua) এ্যারেণা চ্যাপেলের গায়ে। ওখানে তাঁর অঙ্কিত ৩৮ খানা ছবি আছে, খৃষ্টের জীবন ও বাইবেল বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে। এদের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শেষ বিচারের ছবি (The Last Judgement).

সারাজীবন জোত্তো অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ইটালীর প্রায় সব বড় বড় গির্জায় ওঁর ফ্রেস্কোর কাজ দেখতে পাওয়া যাবে।

শেষ জীবনটা তাঁর ফ্লোরেন্সেই কেটেছে।

১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় চিত্রকলায় যাঁরা Great Masters বলে পরিচিত তাঁদের তালিকায় সর্বপ্রথম নাম হচ্ছে জোত্তো দি বণ্ডোনের।

ওঁর মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক একশো বছর পর লোরেঞ্জো মেডিচি তাঁর সমাধির ওপর একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ

স্থাপন করেন। এর গায়ে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাতে বলা হয়েছে :

LO! I AM GIOTTO—WHAT NEED IS THERE TO TELL OF MY WORK? AS LONG AS VERSE LIVES, MY NAME WILL ENDURE.

জোত্তোর সবচেয়ে নামকরা ছবি হচ্ছে—

Death of St. Francis

এবং Ascension of St. John

দু'খানা ছবিই ফ্লোরেন্সের সান্তা ক্রোচে (Croce) গির্জাকেন্দ্রে আঁকা হয়েছিল। ফ্লোরেন্সে দান্তের একখানা প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন জোত্তো।

পাদোয়ার গির্জায় আঁকা Christ before Giaphas ও Visitation of Mary—

ছবি দুখানিও বেশ নামকরা।

পাদোয়ায় জোত্তোর আঁকা আরও একখানা উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে :

St Joachim with Shepherds. (সেন্ট জোয়াচিম হচ্ছেন যিশুজননী কুমারী মেরীর পিতা)।

জোত্তোর কাজে প্রাচীনপন্থী ঢং কিছু কিছু থাকলেও, রং-এর প্রলেপে তিনি, প্রভু যিশু, মেরী মাতা এবং সন্তদের মুখে চোখে একটা অপার্থিব পবিত্রতা ও মহান ভাব, আশ্চর্য রকমে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

হীনযান

উপন্যাস

সুবোধ বসু

চব্বিশ

যশোদার মা কানে কম শোনে, কিন্তু হৃদয়ের উৎকর্ষের দ্বারা এই ত্রুটি পোষাইয়া লইয়াছে। তাপসের সেবা যত্ন সে চিরকালই নিষ্ঠার সঙ্গে করিত। মজা করিয়া তাপস তার নাম দিয়াছিল বাড়ীর ম্যানেজার। সেই ম্যানেজারির অনেকটাই দোলনের হাতে চলিয়া গিয়াছে, তবু তার স্নেহ প্রকৃতি অবিকৃতই রহিয়া গেছে। তাপসের বাঙাল ভাগিনেয়ীর প্রতিও যত্ন তার কম নয়।

'ও মাছের টুকরোটা খেয়ে নিতে হবে দিদি।' টেবিলের অপর প্রান্তের কাছে দাঁড়াইয়া সে আত্মীয়সুলভ জেদের সুরে কহিল। 'ওটা তুলে রাখলে চলবে না। বাবু যখন শুধোবেন তখন মিথ্যে বলতে পারব না। তিনি মন্দ বলবেন। বলবেন, তুমি জোর ক'রে খাওয়ালে না কেনে, যশোর মা। ওরা বাঙাল দেশের মানুষ, মাছ খেতে ভালোবাসে ...'

শীর্ণ কর্সা চেহারা, হাতের ও কপালের দু' পাশের রগগুলি প্রায় গোণা যায়, মাথার স্বল্প পরিমাণ চুল সাদায় এবং কালোয় সমভাবে মেশানো। কপালের উপর পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া সে দোলনের দ্বিপ্রাহরিক আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছে। তাপস উপস্থিত থাকিলে এই ঘোমটা আরও কোন্ না ইঞ্চি দুয়েক নিচে নামিয়া আসে!

'আর পারছি না, যশোদি।' দোলন প্লেটটা এক দিকে আহার-সমাপ্তিসূচক ভঙ্গিতে ঠেলিয়া দিয়া কহিল। 'মামা আজ পাঁচটায় ফিরবেন! চা খেয়ে আমাদের বের হবার কথা আছে। সিঙাড়াগুলি আমি নিজেই তৈরী করব, তুমি শুধু পুরের তরকারিটা ঠিক ক'রে রেখো। বন্ধু খায়নি এখনো?......'

'হ্যাঁ দিদি, ওকে বসিয়ে দিয়ে এইছি।' যশোদার মা দোলনের এই খোঁজ নেওয়ায় বিশেষ খুশী হইয়া কহিল।

দোলন নিজের শোওয়ার ঘরে গেল। দুপুরে সে প্রায় কোনও দিনই ঘুমায় না। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায় বা বই পড়ে। কখনও বা শোনায়। যেদিন মিসেস সরকার পড়াইতে আসেন, সেদিনও ঘণ্টা দেড়েক সময় হাতে থাকে। জানালার ধারের ছোট কোচটায় বসিয়া কখনও যাজে-তাজে কথা ভাবে! আজ মিসেস সরকার আসিবেন না। অনেক সময় কাটাইতে হইবে আজ। পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না, শোনাইতে ইচ্ছা হইতেছে না, রেডিয়ো খুলিয়া গান শুনিবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

অনেক আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্য দিয়া এখানে পৌঁছিয়াছে দোলন। পরিবর্ত্তন স্বপ্নের মতই অবাস্তব মনে হয় অনেক সময়। কিন্তু তবু ইহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় সহসা নিমাইদার সঙ্গে দেখা! এই সাক্ষাৎ-কার সব কিছুর গোড়া ধরিয়া টান দিয়াছে!

নিমাই দাবি করিয়াছে দোলনকে তার কাছে ফিরিতে হইবে। সে দোলনের নিজের লোক। এমন কি দোলন তার বাগদত্তা! অন্যের কাছে তা তিনিই যতই সৎ, যতই উদার এবং মহৎ হোন—তার থাকা শোভা পায় না। খুব জোরের সঙ্গেই নিমাই এ কথা বলিয়াছে। বলিয়াছে, সে একদিন নিজেই তাপসের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁকে ধন্যবাদ জানাইবে এবং এ কথা বলিবে।

দোলনকে অগত্যা প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছে যে, সে নিজেই তাপসের কাছে একদিন এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে। কিন্তু কথা বলা তো অত সহজ নয়! এ সংবাদে কি প্রতিক্রিয়া হইবে তাপসের? নিমাই গ্রাম্য সুবাদে দাদা বৈ নয়। তাপস যদি বলেন, 'আমি কি তোমার পর?' তাঁর স্নেহের ঋণে জড়াইয়া আছে দোলন। কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়া আছে। দীন-হীনাকে ডাকিয়া তিনি মর্য্যাদার আসনে আসীন করিয়াছেন।

আর শুধু কি দোলনের নিজের দিকটা ভাবিলেই চলিবে! তাপসের আঘাতের কথাটা বিবেচনা করিতে হইবে না কি? দোলনের জন্ম খরচের বেশি বাড়াবাড়ি করিলে সে যখন অনুযোগ করিয়াছে তখন তাপস একাধিকবার তার স্বভাবসুলভ রগড়ের ভঙ্গিতে বলিয়াছে, 'খরচ তোমার জন্ম কোথায়? খরচ তো আমারই জন্ম। এতদিন দেবার কেউ ছিল না। মনের কষ্টে ছিলাম। দেবার যখন একজন পাওয়া গেছে, তখন সে সুখে বাধা দেওয়া কি ভালো মেয়ের লক্ষণ? এ আমার নিজেরই লাক্সারি; নিজের পয়সায় বিলাসিতা! এতে বাধা দেওয়া চলবে না!

হাল্কা সুরে বলা হইলেও এ যে তাপসের মনেরই কথা এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ ছিল না। স্নেহশীল পিতা যেমন মা-মরা একমাত্র মেয়েকে আদরের প্রাচুর্য্য দিয়া নিজের শূন্য ঘরকে মধুর এবং সহনীয় করিতে চেষ্টা করেন, তাপসের বাড়াবাড়িটা সেই জাতের এইরূপ বিবেচনা করিয়া সকৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে দোলন। সেই খেলাঘর চুরমার করিয়া দিলে কতটা লাগিবে তাপসের? অতটা আঘাত দিবার শক্তি কি তার আছে? কিছুতেই সে তাপসের কাছে নিমাইয়ের কথা তুলিতে পারিতেছে না।

'দোলনদি!'

'কিরে কেষ্ট?' নিজের চিন্তার রাজ্য হইতে সহসা স চমকিয়া কাছাকাছি ফিরিয়া আসিল।

'তোমার দাদা এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন...' পর্দার বাহির হইতে কেষ্ট কহিল।

'বসার ঘরে নিয়ে বসা। আমি আসছি।'

বুকের ধুকধুকুনিটা বেশ একটা বাড়িয়া গেল দোলনের। গত একমাসে নিমাই আরও তিন চারবার আসিয়াছে। জবাব চাহিয়াছে। লইয়া যাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিয়াছে। দোলন 'হুঁ' 'না' কোনওটাই জোর করিয়া বলিতে পারে নাই। তাপসের কাছে কথাটা প্রথম তুলিতে হইবে বলিয়াছে। সময় হইয়াছে। আবার সময় লইয়াছে। বিস্ময় ও বেদনার ছায়া দেখিয়াছে নিমাইদার মুখে। তবু তাপসকে বলা হয় নাই। আজ নিমাইকে কি জবাব দিবে দোলন? ইহাকে আপনজনের অনাত্মীয়সুলভ আচরণ মনে করিবে না কি নিমাই? দোলনের সমস্যাটা কিছুতেই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

ছাপাখানার কাম আছিল। ভাবলাম তোর সঙ্গে দেখা কইরা যাই। খাওয়া দাওয়া হইছে।

নিমাই আসিয়া সব সময়েই কৈফিয়ৎ দেয়। এই সঙ্কোচটা দোলন ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছে। দোলনকে আর অতটা নিকট মনে করিতে পারিতেছে না সে! দোলন মনে ব্যথা পায়, কিন্তু সে নিজেই যে এজন্য দায়ি তা অস্বীকার করিতে পারে না।

'হাঁ।' দোলন তার কাছের চেয়ারটায় বসিয়া কহিল। 'তুমি খাইছ নিমাইদা?'

'আমাগো খাইতে দুইটা আড়াইটার আগে না।' নিমাই কহিল। 'এই নেও। নতুন কারিগর সরের নাড়ু বানাইছে। খাইয়া দেখ কি রকম হইছে...'

সম্রান্ত চেহারার বড় একটা সন্দেশের বাকস দোলনের হাতে গুঁজিয়া দিল নিমাই সলজ্জমুখে। প্রায়ই রোজই সে কিছু না কিছু হাতে করিয়া আসে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মিষ্টি এগুলি। কোন্ দোকানের খাবার তাহা না জানিয়াও তাপস এর তারিফ করিয়াছে।

'রোজ রোজ এইসব আন ক্যান্?' অনুযোগ করিল দোলন।

'নিজের লোকের জন্য যদি না আনুম তবে দোকান দিছি ক্যান?' নিমাই কহিল 'এইটাও নে···'

'এইটা আবার কি?' সভয়ে দোলন কহিল। 'শাড়ী! এই দেখ! না না, কিছুতেই এইটা আমি নিমুনা···'

এই মাসের প্রথমেই নিজের লভ্যাংশ পাইয়া ছাপানো মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ী কিনিয়াছিল নিমাই। কল্যাণী বৌদিকে এই শাড়ীতে বড় সুন্দর দেখাইত।

'ক্যান নিবি না? পর পর করস বুঝি? ননীদি থাকলে কিছুতেই এমুন পর মনে করত না।' নিমাই অভিমানে কহিল। 'তোরা হারাইয়া গেছস, তবু আমি প্রাণপণে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চেষ্টা করছি যাতে বাড়ী কইরা তগো লইয়া থাকতে পারি। কত কষ্ট করছি। বাড়ী বাড়ী চাকরের কাজ করছি। এক পয়সা নিজের জন্য টাকা খরচা করি নাই। টাকা জমাইছি ব্যবসা করুম বইলা!' শুধু টাকা খরচ করছি একটা জিনিষের লইগা। বলিয়া নিজের সাদা আদ্দির পাঞ্জাবির বুক পকেট হইতে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের একাধিক কাটিং বাহির করিয়া আনিয়া দোলনের সামনের তেপায়ার উপর বিছাইয়া দিল।

আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, স্বাধীনতা! প্রতি বিজ্ঞাপনের উপর কোন্ কাগজে এবং কোন্ তারিখে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিমাইয়ের হস্তাক্ষরে লেখা। খোঁজ চাই, খোঁজ চাই। মেয়েদের এই রকম চেহারা, এই রকম বয়স, শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে লইয়া যাওয়া হয় হাসপাতালে নার্সের চাকরি দেওয়া হইবে এই আশা দিয়া। তারপর হইতে নিরুদ্দেশ। কেহ যদি সন্ধান পান, তবে যেন দয়া করিয়া বউবাজারের অমুক দোকানে বনমালী দাসের কাছে খবর পৌঁছাইয়া দেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিমাইদা', দোলন অভিভূত হইয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, 'তোমার ধন্ আপনার লোক আমাগো এই শহরে আর কে আছে? কিন্তু টাকা নষ্ট কর ক্যান্। কত কষ্ট করে টাকা কামাইছ। নতুন ব্যবসায় কত টাকার দরকার হয়। অখন শাড়ী কিনা পয়সা না নষ্ট না করলেই পারতা···'

'আরও অনেক কিছু কিনা টাকা খরচ করছি,' নিমাই কহিল। 'খাট কিনছি, আলনা কিনছি, কাপড় রাখনের আলমারি কিনছি। চাইরশো টাকা আমার অংশে পাওনা হইছে এই মাসে। এত টাকা দিয়া আমি কি করুম? খাওয়া খরচা, বাড়ী ভাড়া এই সবই তো দোকানের কণ্ডে যায় মুনাফার শতকরা পঁচিশ টাকা। বনমালীদার সংসার আছে, দেশে টাকা পাঠায়। আমি কি করুম? আসবাবপত্র, কাপড়চোপড় সব তোর জন্য কিনা রাখলাম। তুই বড়লোকের বাড়ীতে থাইকা গেছস, ভাল না থাকতে পারলে কষ্ট হইব।···আর যে কইছিনে কোনও মাইয়ালোক নাই, থাকবি কেমনে? বনমালীদার বড় মাইয়ারে পাঠাইয়া দিছে ক'লকাতার ইস্কুলে পড়তে। থার্ডক্লাশে ভর্তি হইয়া গেছে, আবার সম্বন্ধেরও চেষ্টা চলছে। তবে আর একলা কই? অখন কবে যাবি ক'? কইছস বাবুরে?···'

'না, অখনও কইতে পারি নাই।' দোলন অপরাধীর আড়ষ্টকণ্ঠে কহিল।

প্রকাণ্ড বড়, প্রায় অভিভাবকের মত বড় হইয়া উঠিয়াছে নিমাইদা! দাড়ি কামাইতেছে, নাকের তলায় গোঁফের সরু রেখা, পাট-ভাঙ্গা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরণে, পায়ে বার্নিশোজ্জ্বল পাম্প শু। কে বলিবে গ্রামের সেই ময়লাজামা পরা অসহায় প্রকৃতির ছেলেটা। নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া তার মর্য্যাদা, শক্তি, স্বাস্থ্য এবং প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা যেন খুবই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগে দোলন তাকে 'নিমাইদা, তুই' বলিত। এখন 'তুমি' না বলিলে লজ্জা করে।

'কিছু খাইবা নিমাইদা?' হাতের কাছে আর কোনও সঙ্গত বাক্য না পাইয়া দোলন কহিল। 'নিজের সরের নাড়ু নিজেই আগে খাইয়া দেখ না'

কিন্তু নিমাই অত সহজে ভুলিবার নয়। সেও চোখ অভিযোগে বড় করিয়া কহিল, 'আইচ্ছা, সত্য কইরা ক' দেখি দুলী, এইখানেই কি থাকতে চাস্? বাবুর অনেক টাকা-পয়সা, নাম-কাম, কত সুন্দর বাড়ীঘর, কত সুখে সাচ্ছন্দ্যে আছস। বড়লোকের বাড়ীতে বিয়া হইব; দাসী-ঝি কাম করব। কত আরামে থাকবি। গরিব আত্মীয়স্বজন যতই ভালবাসুক, এত সব কি দিতে পারে?···সত্যই যদি যাইতে না চাস, যাইছ না··· পুরানা সব কিছুই তো আমরা ত্যাগ কইরা আইছি, বাকি এতটুকু ছাড়তে লজ্জা কি ···'

'ছি: কি কও তুমি নিমাইদা। আমার নিজের আরামের কথা আমি ভাবিই না,'··দোলন তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল। দাঁড়াও, টেলিফোনটা শুইনা লই···যাইও না, বস...'

অধৈর্য্য টেলিফোনটার কাছে দ্রুত আগাইয়া গেল দোলন।

প্যাটার্সন সাহেব মাত্র তিন কামরা দূর হইতে তাপসকে টেলিফোন করিয়া কহিল, 'তোমার ড্রাইভার পাওয়া গেছে। চলে এসো আমার ঘরে। গাড়ী এবং ড্রাইভার উভয়কেই দিন সাতেক ট্রায়াল দিয়ে দেখ...'

গাড়ীটা গত দশ বছর কোম্পানার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে। খুব বেশী মাইল চলে নাই। মজবুত অবস্থায়ই আছে। নতুন রং করা হইয়াছে, ওভারহল্ হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে কোম্পানী আর একটি নতুন গাড়ী কেনার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। প্যাটার্সনই তাপসকে জিজ্ঞাসা করেন, পুরানা গাড়ীটা সে কিনিতে ইচ্ছুক কিনা এবং তাপসের জন্য জলের দামেই এটা ছাড়িতে রাজি হইয়াছেন।

'তোমার ড্রাইভার নিচে অপেক্ষা করছে। জোন্স-এর কাছে কিছুদিন কাজ করেছিল। ও তো নির্ভর-যোগ্যই বলছে। মাসে একশো দিতে হবে—কোয়াইট্ চীপ্। এই নাও তোমার গাড়ীর চাবি। আর যদি হাতে দু'চার মিনিট সময় থাকে, তবে বসো। এক-সঙ্গে একটু ধূমপান করা যাক।'

প্যাটার্সন আমুদে লোক। প্রায় তাপসেরই বয়সী। খাঁটি ইংরেজ। লাল মুখ, নীল চোখ। লম্বা এবং বলিষ্ঠ গড়ন। টেবিলে দুটো টেলিফোন, একটা দিকৃটা ফোন, বৈদ্যুতিক সঙ্কেতদিবার বহু সরঞ্জাম এবং বহু কাগজপত্র স্তূপীকৃত করিয়া বসিয়া আছে।

তাপস উঁহার সোনার সিগারেট-কেস্ হইতে প্যাটার্সনের বিশেষ ব্রাণ্ডের সিগারেট তুলিয়া লইল।

'নিজস্ব গাড়ী পেয়ে দ্য লেইডী নিশ্চয়ই খুব প্রসন্ন হবেন!' চোখে দুষ্টুমির ঝলক আনিয়া প্যাটার্সন কহিলেন।

শুধু প্যাটার্সন নয়, অন্তরঙ্গ সহকর্মীরাও দোলনের প্রসঙ্গে এই তরল সুরের আমদানি করে।

'উপহারের সম্ভাবনায় কোন্ লেডী আর উল্লসিত না হন?' তাপস কহিল।

'সব লেইডী ততটা মূল্যবান নয়।'

'নিজের সৃষ্টিকে মূল্যবান মনে করে না এমন কোনও আনাড়ী আর্টিস্টও আছে কি?' তাপসও ওর্কে হারিবার পাত্র নয়

'পিগম্যালিয়ন নিজের সৃষ্ট নারীমূর্ত্তির সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল,' প্যাটার্সন সিগারেটের এক গাদা ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল। 'এ ক্ষেত্রেও তেমন কিছু ঘটেনি তো? লজ্জা করো না, কেশে ফেল বাছাধন...'

'ননসেন্স!' বলিয়া সহাস্যেই তাপস চেয়ার ত্যাগ করিল।

'তুমি নিঃসঙ্গ লোক। বাজে সেন্টিমেন্ট ছেড়ে দাও। যতটা আমি টেলিফোন টক্-এ বুঝেছি, উনি বুদ্ধিমতী মেয়ে। দেখতে তো খুবই সুন্দর। একে বিয়ে করে' নাও না। আমি বলছি তুমি সুখী হবে···' প্যাটার্সনও দাঁড়াইলেন।

'ক্ষেপেছ!' শিহরিয়া উঠিয়া তাপস কহিল। 'ওর বাবা হবার মতো আমার বয়স···'

'ওটা বাজে সেন্টিমেন্ট! কন্যার চেয়ে তোমায় সহ-

চরীর প্রয়োজন বেশী। তোমার মতো স্বামী পেলে সে ধন্য হবে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে তুমি মর্য্যাদার আসনে তুলেছ। তার সত্যিকারের মূল্য তোমার মতো আর কেউ বুঝবে না। অন্যের কাছে ওর কোনও দামই নেই···গুড্ নাইট্! বন্ধুজনের কথা তাচ্ছিল্য করলে পরে পস্তাবে।···নিজের চেম্বারের কাছে দাঁড়াইয়াই হাত নাড়িয়া তাপসকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন প্যাটার্সন মিটিমিটি হাস্যের সঙ্গে।

পঁচিশ

একই সঙ্গে গাড়ীর ট্রায়াল ও সান্ধ্যভ্রমণ চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট-হাউস ডান দিকে রাখিয়া ইডেন গার্ডেনের দক্ষিণের রাস্তা ধরিয়া আগাইয়া চলিয়াছে গাড়ী। সামনেই আউট্রাম ঘাট। এইবার বাঁ দিকে মোড় লইয়াছে গাড়ী।

পিছনের আসনে তাপসের পাশে বসিয়া সকৌতূহলে গঙ্গার জাহাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে দোলন। কলিকাতা গত ক'বছর ধরিয়া থাকিলেও এদিকে খুবই কম আসিয়াছে। প্রকাণ্ড ময়দান, প্রকাণ্ড কেল্লা, গঙ্গার বুকে জাহাজের সমারোহ, প্রকাণ্ড আকাশ ও বিস্তৃত একটা নতুন জগতে আনিয়া হাজির করিয়াছে।

গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইবার পরই তাপস পরিহাসতরল ভঙ্গীতে গাড়ীর সার্থকতা ব্যাখ্যা করিয়াছিল। বলিয়াছিল, 'তুমি বাড়ীতে বন্ধ থাক সেটা বন্ধ করার একমাত্র উপায় এ জিনিষটি. চলো, এটা নিয়ে কলকাতা আবিষ্কারে বের হই। দেখবে, কত দ্রষ্টব্যই তুমি দেখোনি···।

কথাটা আশ্চর্য্য সত্য মনে হইল দোলনের। গাড়ী কোর্ট বাঁয়ে রাখিয়া প্রিন্সেপ ঘাট ছাড়াইয়া আগাইয়া চলিল। সন্ধ্যার আভাস লাগিয়াছে চারদিকে। জলের রং ধূসর; জাহাজের চেহারা বিরাটকায় জলজন্তুর মতো হইয়া উঠিয়াছে। কোর্টের প্রাচীরের উপরে প্রায় ভরাট-দেহ চাঁদ উপকাইয়া উঠিয়াছে। নানা জায়গা হইতে আমের বনের গন্ধ ছুটিয়া আসিয়া নাকে ঢোকে; বসন্তকাল কলিকাতা শহরে আবির্ভূত হইয়াছে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ পোষণ করিবার উপায় রাখে নাই।

'জাহাজে করে' তুমি আর আমি বিলেত চলে গেলে কেমন হয় দোলন?'

দোলন পাশে ফিরিয়া তাকাইল। মৃদু হাসিল, কিছু বলিল না।

'পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করছে। কত প্রকাণ্ড পৃথিবী! কত দেখবার জিনিষ! এক জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে থাকতে কি ভালো লাগে। ধর, তুমিই যদি গাঁয়ে পড়ে থাকতে। এত সব কি দেখতে পেতে। বৈচিত্র্য এই জীবন!'

দোলন নীরবই রহিল।

তাপসও তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা চালাইতে পারিতেছে না। একে তো দোলন গম্ভীর। তার উপর নিজের মনও ভারাক্রান্ত। প্যাটার্সন এক খোঁচায় মনের ভিতরকার নানা অস্পষ্ট জীবজন্তুকে জাগাইয়া তুলিয়াছে! প্যাটার্সনের বুদ্ধিতে অস্পষ্টতা নাই। তাপস নিজেও জানে। তার নিজের সৃষ্ট দোলনের মর্ম সে নিজে ছাড়া অল্প লোকই বুঝিবে। তারা তার আর পাঁচটা দিক বিবেচনা করিবে। কিন্তু প্যাটার্সন কি করিয়া মনে করিল, তাপস তার নিজের এই সৃষ্টির প্রেমে পড়িয়াছে। তার ইঙ্গিতের অর্থ এই ছাড়া আর কি?

গাড়ী হেস্টিংস দিয়া আগাইয়া চলিল রেসকোর্সের দিকে।

তাপস সৌন্দর্য্যরসিক। দোলনের মুখের গড়ন, তার চিবুকের ডৌল, তার ভুরুর ধনুরেখা, তার দীর্ঘ-চোখের গভীর চাউনি, তার চলন-বলনের সাবলীলভাব, তার সুঠাম দেহলতার সৌন্দর্য্য কি শিল্পীর চোখে

ভালো লাগিবে না? এই এস্থেটিক উপভোগের চেয়ে আর কি বেশি কিছু চাহিয়াছে সে?

'সিধা সাহেব?'

'সিধা।'

গাড়ী খিদিরপুর রোড অতিক্রম করিয়া লোয়ার সার্কুলার রোডে পৌঁছিল।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কি চিরকাল চলিতে পারে?—তাপস নিজেকে প্রশ্ন করিল। দোলনের ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে। স্বভাবতই সে বিবাহ করিতে চাহিবে, সংসার করিতে চাহিবে। বিবাহের পর স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া যাইবে সে। শূন্য হইয়া যাইবে সব কিছু। এক সঙ্গে বসিয়া খাইবার, পরিহাস করিবার, উপহার দিবার কেহ থাকিবে না: যে বোঝা বহিতে আনন্দ সেই বোঝা মুক্ত হইয়া জীবনধারণ কঠিন হইয়া উঠিবে। সারা বাড়ী জুড়িয়া রহিয়াছে এই দোলন। সেই যদি সরিয়া যায়, কি থাকিবে তাপসের বাড়ীর? কি করিয়া সেই শূন্য বাড়ীতে একাকী থাকিবে তাপস?

'চল দোলন, গাড়ী থেকে নেমে একটু হেঁটে নিই। দেখ তো কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। ডান দিকে চেয়ে দেখ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সাদা পাথরের গম্বুজটা ধপধব করছে। এ রাস্তাটার নাম জানো?···'

'না।' দোলন কহিল।

'ক্যাজুয়ারিনা অ্যাভেন্যু। দু-দিকে ঝাউগাছের সারি ছিল এক সময়। এখনও কিছু কিছু আছে।··· শিউকিষণ, গাড়ীটা একটু থামাও।···ঠিক আছে, মোড়টা পার হয়ে নাও। আমরা একটু হাঁটব। তুমি গাড়ী নিয়ে খানিকটা এগিয়ে থাক—যাতে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার চড়তে পারি।'

'ঠিক আছে, সাহেব।' গাড়ী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মোড় অতিক্রম করিয়া বাঁদিকে দাঁড়াইল।

প্রথমে নামিল তাপস। দোলনকে নামিতে সাহায্য করিল। রাস্তা অতিক্রম করিয়া পূব দিকের পায়ে-চলা রাস্তায় পৌঁছিল। মস্ত বড় বড় গাছ রাস্তার উপর ছাতা মেলিয়া ধরিয়া আছে। ঝাউ গাছের গা দিয়া পিছলাইয়া ফাল্গুনের জ্যোৎস্না অন্ধকার মাটিতে আল্পনা আঁকিয়াছে বিচিত্র ভঙ্গিতে। প্রকাণ্ড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছে জ্যোৎস্না। শিউকিষণের গাড়ী তাদের পিছু ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেছে আগে!

দোলনকে ছাড়িতে পারা যাইবে না। জীবনে তবে কোনও আনন্দ, কোনও আশা অবশিষ্ট থাকিবে না। প্যাটার্সন তাপসের মন তাপসের নিজের চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছে। মানবচরিত্র অনেক বেশি বুঝে সে। কন্যার চেয়ে তোমার প্রেয়সীর প্রয়োজন বেশী!

টিপটিপ করিতে লাগিল তাপসের বুকের ভিতরটা। দোলনকে এত ভয় করিতে হইবে, কে ভাবিয়াছিল। কিন্তু কি বলিবে? কি করিয়া আরম্ভ করিবে? হাল্কাসুরেই গভীর কথা বলিবে কি? বলিবে কি? তোমাকে বোধহয় চিরকাল আমার কাছেই থেকে যেতে হবে দোলন। তোমাকে ছাড়া আমার চলবেই না। বিয়ে কি করে' করবে তা হ'লে? বিয়ে না করলে কি মেয়েদের চলে? তবে আমাকে বিয়ে করলে কি রকম হয়? সমস্যার সমাধান হয়ে···'

'আপনাকে কিছুদিন ধরেই একটা কথা বলব বলব ভাবছি···যদি কোথাও একটু বসেন···'

চমকাইয়া সজাগ হইল তাপস। তার স্বগতোক্তি দ্রুত বন্ধ হইল। 'চলো না, সামনের বেঞ্চিটায় বসে পড়ি।' সে তাড়াতাড়ি কহিল। 'কি বলবে বলো তো? তুমি তা হলে কথা বলতেও পারো?···'

'দেশের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমাকে নিয়ে যেতে চায়।' দোলন কহিল।

'কে সে? কি হয় তোমার? কোথায় থাকে?' উত্তেজনা চাপা তাপসের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

'আমার প্রতিবেশী এই ছেলেটি। একসঙ্গেই

আমরা বড় হয়েছি। এর সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে দু'বাড়ীতেই. এমন কথাবার্তা হয়েছে। তারপর যখন দেশ-বিভাগের সময় পূব বাংলা ছাড়তে হলো, তখন বাড়ীর লোক সবাইকে হারিয়ে এরই সঙ্গে চলে এসে প্রাণ বাঁচাই। অনেকদিন ছাড়াছাড়ি ছিল। তারও অনেক কষ্ট গেছে। অনেক কষ্টে সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ কিছুকাল আগে রাস্তায় দেখা। সে আত্মীয় বলে, পুরাণো সঙ্গী বলে দাবি জানিয়েছে। বলেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করে সে আমাকে নিয়ে যাবে…'

'কত বয়স?'

'তেইশ চব্বিশ হবে…'

'তুমি যেতে চাও?'

'যেতেই হবে।'

'আচ্ছা, বেঞ্চটায় বসে পড়। সব শুনি।'

ছাব্বিশ

দেওয়ালময় বিজ্ঞাপনের হরির লুট। পাঁচন, সিনেমা, দাদের ওষুধ, বিরাট জলসা, সার্কাসের বিশেষ অনুরোধ সপ্তাহ, প্রতিবাদ সভা, সবাই সভা করিয়া বসিয়া গেছে রাস্তার সামনের প্রায় প্রতিটি বাড়ীর দেওয়ালে। বউবাজারের রাস্তা নিজ নিজ মাল-ঘোষণার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান স্থান। দোকানের সাইনবোর্ডের তো অন্ত নাই। তার উপর খালি দেওয়াল পাইলে কেউ না কেউ একটা পোস্টার সাঁটিয়া দিতেছে।

শিয়ালদর প্রায় মোড়ের কাছাকাছি গির্জ্জার বিপরীত দিকে উত্তর ফুটপাথের উপরকার একটা দোকান-বাড়ীর দেওয়ালে পোস্টারের অভাব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাইনবোর্ডটাও কাঠ বা টিনের উপর লেখা নয়; নিওন সাইনে লেখা। বাইরের দেওয়াল ক্রীম্ রঙের; দোকানের ভিতরের দেওয়াল সী-গ্রীণ রঙে ডিস্টেম্পার করা। বেশ একটা সম্ভ্রান্ত চেহারা; আশে পাশের দোকানগুলি হইতে স্বতন্ত্র। দোকানের নাম—মধুরেণ। হরফগুলি বিশেষ ভঙ্গির কিন্তু সহজেই পড়া যায়। একদিকে কাচের শো-কেসে নানা রকম লোভনীয় মিষ্টান্ন পথিকের দৃষ্টি এবং রসনা প্রলুব্ধ করিতেছে। বলা বাহুল্য, 'মধুরেণ' মিষ্টান্নের দোকান।

দোকানের সামনের ফুটপাথে বনমালী বিশেষ সাজগোজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গায়ে ঢিলে হাতা শাদা লংক্লথের পাট-ভাঙা পাঞ্জাবি; পরণে মিহি ধুতি। ঘাড়ের উপর দিয়া উড়নী চাদর ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গে কিছু বেমানান হইলেও ফিতে বাঁধা ডার্বি জুতো পায়ে চকচক করিতেছে।

সন্ধ্যা ছ'টা। সময়ের কিছু আগেই বাহিরের নিওন সাইন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দোকানের ভিতর ফ্লুরোসেন্ট আলোয় রঙিন দেওয়াল, মিষ্টি রাখিবার বিস্তৃত দীর্ঘ আলমারির গ্লাস-টপ্, পয়সা লইবার কাউন্টারের পিতলের রেলিং, বসিয়া খাইবার শ্বেত-পাথরের একাধিক টেবিল ও পালিশ করা চেয়ার চক চক করিতেছে। ক্রেতার আনাগোনা ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে বনমালী তাহা লক্ষ্য করিয়া পুলকিত বোধ করিল। কিন্তু তার দৃষ্টি রাস্তার উপর। সে সম্মানিত অতিথির অপেক্ষা করিতেছে।

অতিথির চেহারাও সে জানে না বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু অসুবিধা হইবার কথা নয়। নিমাই কাউন্টারে আছে। সে আশ্বাস দিয়াছে, এদিকে সে নজর রাখিবে এবং প্রয়োজন হওয়া মাত্র কাছে হাজির হইবে। সুতরাং বনমালী নির্ভয়ে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে একদিন নিমাইকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়াছিল তাপস। আজ নিজেই আসিতেছে। সব দেখিয়া যাইবে।

ট্যাক্সিটা ঠিক দোকানের সামনেই দাঁড়াইল।

তাপস প্যাটার্সনের গাড়ীটা রাখে নাই। গাড়ীর আর কি দরকার তার। যার জন্ত দরকার ছিল, তার ভাবনা আর তাকে ভাবিতে হইবে না। প্যাটার্সন বিস্মিত হইয়াছিল। জলের দামে পাওয়া গাড়ী কেউ ছাড়ে! তাপস হাসিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বলে: 'চিরকাল হাঁটা অভ্যাস। গাড়ী চড়তে বড় অস্বস্তি লাগছে। যে আমার চেয়ে এর ভাল সদ্‌ব্যবহার করতে পারবে, এমন কাউকে দাও!'

পলকে দোকানের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিল নিমাই। বনমালীও বুঝিয়া লইয়া বরকর্তা অভ্যর্থনারত কন্যাকর্তার মতো ব্যস্তভাবে কাছে আগাইয়া গেল।

'আপনিই বনমালীবাবু? নমস্কার। নিমাইকে আমিই বলেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

দৃষ্টিটা দোকানের বাহিরের রূপের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া বনমালীর উদ্দেশে কহিল তাপস।

'এ আমার পরম সৌভাগ্য!' বাবু-সম্বোধিত বনমালী আন্তরিক খুশির সঙ্গে দন্ত-বিকশিত করিয়া বিনয়ে বিগলিত হইয়া কহিল। 'আপনার মত স্বনামধন্যব্যক্তি যে দয়া করে' আমাদের গরিবের জায়গায় পায়ের ধুলো দিলেন, এটা আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ। আসুন, ভেতরে আসুন, ভেতরে এসে বসতে আজ্ঞা হোক···ওরে নিমাই, সিঁধুকে ওদিককার পাখাটা ছেড়ে দিতে বল···'

রাজকীয় সমাদরের সঙ্গে তাপসকে দোকানের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন কোণায় লইয়া যাওয়া হইল। এ ছোকরাকে হাঁক দেওয়া হইল, ও ছোকরাকে ফরমাস দেওয়া হইল তার খিদমতে।

'তুই সিঁধুকে বলে দে ক্যাশে বসতে। তুই এখন বাবুর কাছেই বস নিমাই...' বনমালী স্বকর্মের প্রশ্বানোদ্যত নিমাইকে আদেশ করিল।

'না না, তার দরকার নেই,' তাপস কহিল। 'নিমাই নিজের কাজে যাক। কাজে অবহেলা ঠিক নয়। আমি আপনার সঙ্গে কথা কইতেই এসেছি···'

দোকানের আসবাবপত্র, মিষ্টান্নের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দোকানের বিক্রেতা ছোকরাদের সংখ্যা হইতে তাপসের দৃষ্টি কেনা-বেচার দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। পাঁচসাত মিনিটের মধ্যেই খদ্দেরের সংখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মাইল। দু' আনার ক্রেতা হইতে পঞ্চাশ টাকার ক্রেতা বিনা অপেক্ষায় মাল লইয়া গেল। বহু গাড়ী আসিয়া থামিল দোকানের সামনে। ভিতর হইতে পরাত পরাত অর্ডারী মাল কুলির মাথায় বাহিরে গেল।

'কত বয়স আপনাদের দোকানের?'

'আজ্ঞে?' চট করিয়া ভাষাটা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল বনমালী।

'কত দিন হলো দোকান খুলেছেন?'

'পঞ্চম মাস চলছে।' বনমালী জবাব দিল। 'পয়লা অঘ্রাণ খোলা হয়, আর এখন চোত্তের মাঝামাঝি···'

'এই অল্প সময়ের পক্ষে', তাপস কহিল, 'বিক্রি বেশ ভালই তো মনে হচ্ছে? কি ক'রে এতটা সম্ভব হলো?'

বনমালী বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। বুঝিবার মতো লোক তবে আছে! সে গর্ব্ব করিতে চায়না, তবে সৌভাগ্য সম্বন্ধে সে সচেতন।

'ভগবানের দয়া আর আপনাদের আশীর্ব্বাদ!' সে সবিনয়ে কহিল। 'নতুন দোকানের পক্ষে ভালোই বলতে হবে। আজ্ঞে আমারা ভেজাল চালাইনা, খাঁটি জিনিষ দিই এ এক কারণ। তা ছাড়া, বরাতে গোটা কয় ভালো কারিগর পেয়েছি। তারা নতুন রকমের কতগুলি মিষ্টি তৈরি করছে। এগুলি লোকে পছন্দ করেছে। আমি নিজে আমার আগের দোকানে খদ্দেরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেছি; তারাও অনেকে আমাকে খাতির করেছেন। আর ঐ ছেলেটা—নিমাই একাই একশো। এখানে দেখছে, ওখানে ছুটছে। ক বয়স, উৎসাহ প্রচুর। আর লোকে পছন্দ করে ওকে বড় বড় নামী দোকানে গেছে বিয়ে বাড়ীর বা উৎস বাড়ীর অর্ডার আনতে। অর্ডার পেয়ে গেছে নিমাই বড় মিষ্টি স্বভাব! কত কষ্ট করেছে, তবে নিজের পা

রাস্তা হয়েছে। এ তো ওরই দোকান। মোট এগারো শো টাকা হাতে নিয়ে শুরু করা হয় দোকান। তার আটশো টাকাই ওর। অথচ জোর ক'রে সমান অংশ দিয়েছে আমাকে। বলেছে মিষ্টির দোকানে আমি কি জানি, বনমালীদা। তোমার অভিজ্ঞতার মূল্য দশ হাজার টাকা।—' তবেই বুঝুন কি দরের ছেলে সে—'

'কথাটা কিছু বাড়িয়ে বলে নি।' তাপস কহিল। কিন্তু এত অল্প টাকায় কি ক'রে শুরু করলেন!...'

'চেনাশোনা আছে এ লাইনে। সুবিধামত একটা দোকান-ঘর জোগাড় হলো। বৈঠকখানা বাজার থেকে সুবিধাদরে পুরাণো আলমারী শো-কেশ পেয়ে ভালো ক'রে বার্ণিশ করিয়ে নিলাম। কিছু কিছু বাসন-পত্তর কড়াই-পরাতও নিলামে জোগাড় হলো। ঘর সাজানো ফ্রেম, ভাড়া নেওয়া আলোর সাইন বোর্ড এসব নিমাইয়ের মাথা থেকে। মিষ্টির দোকানের একটা সুবিধে কি জানেন? যদি দোকানে বিক্রি হয়; তবে আর ভয় নেই। রোজের মাল রোজ বিক্রি হয়; টাকা আটকিয়ে থাকে না আর পাঁচটা ব্যবসার মতো। লাভসহ টাকা নিত্যি হাতে ফিরে আসে। বলব কি বাবুমশায়, আপনি নিজের লোক বলতে বাধা নেই, এ মাসের গোড়ায় আমরা উভয়েই চারশো টাকা ক'রে মাইনে নিতে পেরেছি সব খরচ-খরচা মিটিয়ে, মার বিপদ-ফণ্ডে টাকা রেখে। ব্যবসা যদি চলে আর চুরির ফাঁক না থাকে, তবে এ ব্যবসা লাভের ব্যবসা...'

লোকটির সরলতা, সততা ও আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইল। ইহার আচার-আচরণ কথাবার্তায় ভদ্রতা ও বিনয় প্রতিফলিত। ভাল দোকানদারের লক্ষণ এগুলি।

'ভেতরে গিয়ে একবার কারখানাটা দেখলে হয় না!' প্রস্তাব করিল তাপস।

'অবশ্যই অবশ্যই,' শশব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল বনমালী। 'কারখানায় নিয়ে যাব, উপরতলায় আমাদের বাসস্থানে একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে, তবে তো ছাড়ব। আমার মেয়ে মিনিকে দেশ থেকে এনে এখেনে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিইছি। সে তো সকাল থেকেই টগবগ করছে। বলছে, দোলনদির মামা তো আমারও মামা! তাঁকে বাড়ীতে আনতে হবে কিন্তু...'

কোণার দরজা খুলিতেই ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করা যায়। দরজার সামনে একটা কাঠের পার্টিশন দোকান-ঘরের চোখ হইতে ভিতরের দৃশ্য আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সেটা এড়াইয়া বনমালীর পিছনে পিছনে তাপস ভিতরের এল্-আকারের ঢাকা বারান্দায় প্রবেশ করিল। এর বাঁ দিকে উপরতলায় যাইবার সিঁড়ি। ডান দিকের লম্বা বারান্দা দিয়া আগে প্রথমেই ভিয়ান-ঘর, তারপাশেই ছোট রান্নাঘর, তারপর কর্ম্মচারিদের থাকিবার জন্য আরও গোটাছয়েক ঘর। দুটো বড় বড় উনানের একটা প্রকাণ্ড কড়াইয়ে রসগোল্লা টগবগ করিতেছে; অপরটিতে সন্দেশ পাক হইতেছে। জন-পাঁচেক কারিগর ও সহকারী। আয়োজন প্রচুর রকমের। শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা সুন্দর। দেখিয়া সন্দেহ থাকে না, এরা সত্যই ব্যবসা করিতেছে। তাপস কারিগরদের নানা রকম প্রশ্ন করিয়া নানা কৌতূহল মিটাইল।

'পাশের ঘরে আমাদের সবারই রান্না হয়। এরাই পালা করে কেউ না কেউ রাঁধেন। আমাদের সবার খাওয়াই এখান থেকে যায়। মালিক কর্ম্মচারিতে ভেদ নেই। খরচ সবই দোকানের হিসেবে যায়।' বনমালী ভাতের হাঁড়ির প্রকাণ্ড আকারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাপসকে কহিল।

'ওদিকে সব কর্ম্মচারীরা থাকেন বুঝি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশীর ভাগই এখানে থাকেন।

উপরতলায় দোকানঘরের ঠিক উপরের ঘরটি সত্যই ভালো। দক্ষিণটা খোলা; চওড়া দরজা ও জানালা দিয়া দক্ষিণের বাতাস হু হু করিয়া ঢুকিয়া পাখার অভাব দূর করিতেছে। গাঁয়ের ছেলে নিমাই এখনও নিজের জন্য পাখার বিলাসিতার কথা ভাবিতে পারে নাই, তাপস মনে মনে বলিল, কিন্তু দোলন পাখাতে অভ্যস্ত হইয়াছে, মাথার উপর পাখা না ঘুরিলে তার কষ্ট হইবে। দোকান

ঘরের মত এঘরে ডিস্টেম্পারের জলুস নাই, কিন্তু নতুন চুণকামের দরুণ দেওয়ালগুলি উজ্জ্বল। ঘরের একদিকে একটা সিঙ্গেল খাট পাতা, কিন্তু তাতে কোনও বিছানা নাই। সম্ভবতঃ অতিথি অভ্যর্থনার জন্যই তাহাতে পরিষ্কার বেড-কভার বিছাইয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। বসিবার কোনও স্বতন্ত্র ঘর নাই। নিচের ভিয়ানঘরের উপরের ঘরটিতে বনমালী নিজে এবং তার পরের ছোট কামরাটিতে তার কন্যা মিনি থাকে। এটাতে নিমাই থাকে,' অতিথিকে খাটে বসাইয়া বনমালী কহিল। 'দোলনদিদি এলে এখন নিমাই আমার সঙ্গে একই ঘরে শোবে ঠিক আছে আর মিনি এসে শোবে দোলনদির সঙ্গে—পাছে একা শুতে ভয় পান। এই যে খাট দেখছেন, এ-ও দিদির কাপড় চোপড় রাখার জন্য কেনা হয়েছে…'

আলমারিটা আগেই লক্ষ্য করিয়াছে তাপস। উপরের দুই তাকের দরজা কাচের; অবশিষ্ট অংশ কাঠের। পুরাণা প্যাটার্ণের জিনিষ; সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফার্ণিচারের দোকান হইতে কেনা সন্দেহ নাই। খাটটা শস্তা দামের হইলেও নতুন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না, তবে মাথার দিকের কাঠের আকার বেখাপ্পা মনে হইতেছে তাপসের। দোলন এর চেয়ে অনেক উঁচু শ্রেণীর আসবাবে অভ্যস্ত। কিন্তু আপত্তি করিবার মত কিছু নয়।

'ছাদও আছে বলেছিলেন। চলুন না, ছাতটাও একবার দেখে আসি।…বিয়ে হবার মতো যথেষ্ট জায়গা আছে কি?'

'যথেষ্ট। প্রকাণ্ড বড় ছাত। দুর্গোৎসব হতে পারে!' বনমালী সবিনয়ে কহিল। আপনাকে নিয়ে সবই দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে—ওরে ও মিনি—এই তো এসে গেছে—এই আমার বড় মেয়ে মিনি—পেন্নাম কর মামাবাবুকে পেন্নাম কর…'

কর্ষা গোলগাল মেয়েটি। রসগোল্লা শিল্পীর মেয়ে। প্রায় বছর ষোলো বছর হইবে। সাজ-পোষাকে গ্রামের ছাপ এখনও স্পষ্টই রহিয়া গেছে। হাতে রূপোর একটা থালা বিবিধ ও বিচিত্র মিষ্টান্নে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সলজ্জভাবে আগাইয়া আসিয়া প্রথমে সে হাতের থালা ঘরের কোণার তেপায়া তাপসের কাছে টানিয়া তাহাতে স্থাপন করিল, তারপর মাথা নত করিয়া পায়ে হাত ছোঁয়াইয়া তাপসকে প্রণাম করিল।

'দোলনদি কবে আসবে মামাবাবু?'

'আর দেরি নেই।' তাপস অন্যমনস্কের কণ্ঠে কহিল।

ইন্স্পেকশন সমাপ্ত। আগে তাপস; পিছনে পিছনে বনমালী ও নিমাই দোকানঘর হইতে ফুটপাথে নামিয়া আসিয়াছে। এইবার বিদায়ের ভদ্রতা মাত্র বাকি।

'একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই মামাবাবু?' নিমাই পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

'না। আমি হেঁটেই যাবে।…'

'এদিকে এলে অবশ্যই আবার পদধূলো দেবেন।' করজোড়ে বিনীত নমস্কার করিল বনমালী।

'হ্যাঁ। তাতো বটেই। নমস্কার।' তিন পা আগাইয়া গেল তাপস। তারপর আবার থামিল। সম্পূর্ণ ফিরিয়া না তাকাইয়া বনমালীর উদ্দেশ্যে কহিল, 'পরশু সন্ধ্যার পর একবার আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন নিমাইকে। দিন ঠিক ক'রে আপনাকে বলে পাঠাব…'

'যে আজ্ঞে।' বনমালী বিশেষ কৃতার্থ হইবার সাড়া দিল।

এই তো সেই গয়নার দোকানটা! বৌবাজারের ভিড়ের মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল তাপস। হঠাৎ গয়নার দোকানটার সামনে আপনা হইতেই পা থামিয়া গেল। আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। হয়তো তাহাই অবচেতন ভাবে কাজ করিয়াছে।

'চুড়ি, বালা, নেকলেস, মুক্তোর মাতাশা এই রকম কিছু গয়নার দরকার। তৈরী মালের নমুনা দেখাতে পারেন কি?

'বসুন। দেখাচ্ছি।' কাউন্টারের ওদিক হইতে বিক্রেতা কহিল।

প্রায় এক ঘন্টারও উপর লাগিয়া গেল সেখানে। অর্ডার দিয়া, আগাম দেওয়া টাকার রসিদ লইয়া তাপস

বন্দুকধারী দারোয়ানের পাশ দিয়া আবার ফুটপাতে নামিয়া আসিল। একটু বেশী দেরি লাগিয়াছে। রাত প্রায় ন'টা। কিন্তু উপায় নাই মামুলি ডিজাইন তার পছন্দ হয় না। দোকানীকে বিস্মিত করিয়া নিজের অর্ডারী গহনার জন্য চমকপ্রদ ডিজাইন পর্য্যন্ত আঁকিয়া দিয়া আসিয়াছে তাপস।

চাঁপাতলার মোড়, চোরাবাজার, ছানাপটির মোড় ক্রমে ক্রমে আগাইয়া গেল তাপস। এইবার বাঁ দিকে মোড় লইতে হইবে। একদিকে ফুলের দোকান অপর দিকে মিষ্টির। ভিড় বাঁচাইয়া, কাদা ও পিছল এড়াইয়া অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া চলিল তাপস। লোহার দোকানগুলি বন্ধ হইয়াছে কিন্তু মালপত্র কিছু কিছু এখনও ফুটপাথেই ছড়ানো আছে। এই তো ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়। এবার একটু স্বাভাবিক নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচা যাইবে।

বেশ ছেলে নিমাই! দোলনের চেয়ে খুব বেশী বড় নয়। স্বাস্থ্যদীপ্ত সদাহাস্যমুখ। কম বয়স, উৎসাহ প্রচুর! বনমালীর কথাগুলি কানে বাজিতেছে। সত্যই এর চেয়ে বড় সম্পদ নাই; আর কোনও সম্পদই যৌবনের সমান নয়!

ধর্ম্মতলার মোড় অতিক্রম করিয়া ট্রাম-স্টপের অপেক্ষমান যাত্রীদের পাশ কাটাইয়া তাপস ইণ্ডিয়ান মীরর স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছিল। বাঁ দিকে বাড়ীর দিকে না ঘুরিয়া রাস্তা পার হইয়া মোড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় হাজির হইল।

এখানেই দোলন সংগ্রহ হইয়াছিল। আড়াই বছরেরও আগে। তারপর প্রতিদিন উত্তেজনা ও আনন্দের দিন গেছে! পড়িবার আনন্দ, সাফল্যের আনন্দ, সৌন্দর্য্যের আনন্দ! অনেক খাটিয়াছে তাপস, অনেক লাভ করিয়াছে, কোন আনন্দের আর অবসান নাই? যা আজ আছে, তা কাল নাই, এই তো নিয়ম!

বেশ নামটা কিন্তু নিমাইয়ের দোকানের। 'মধুরেণ!' মধুরেণ সমাপয়েৎ!

সাতাশ

'মিটর সাহাব আয়ে হ্যায় হুজুর। সেলাম দেংগে?'

প্যাটার্সন মনোযোগের সঙ্গে ফাইল দেখিতেছিলেন, বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাঁর বেয়ারা জানাইল।

কয়েক সেকেণ্ড ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন প্যাটার্সন। তারপর চোখ তুলিয়া কহিলেন, 'না, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

এয়ার কণ্ডিশনড্ কামরায় ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বালাইয়া প্রকাণ্ড ইজেলে প্রকাণ্ড বোর্ড-কাগজ মেলিয়া সাদা এপ্রণ-পরা তাপস বেবী-ফুডের পোষ্টারের জন্য ছবি আঁকিতেছিল। নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া ভিতরে উপস্থিত হইয়া প্যাটার্সন কহিলেন, 'ব্যাপার কি বলো তো মিটার? ভোরবেলায় অন্তত তিনবার ফোন করেছি। প্রতিবারই জবাব এসেছে, লাইন ডিস্‌কনেক্‌টেড! তারপর ঘোষচৌধুরী বললে, তুমি বাড়ী তুলে কোন্ হোটেলে চলে গিয়েছ…'

'আমি তো অফিসে ঠিকানা রেখে গিয়েছিলাম। তুমি জানতে না বুঝি?'

তুলি ত্যাগ করিয়া ইজেলের সান্নিধ্য হইতে প্যাটার্সনের কাছে আগাইয়া আসিল তাপস।

'বাড়ী তুলে দিলে মানে? খুব ঝামেলা হচ্ছিল বুঝি। আজকাল যা সব চাকর-বাকর হয়েছে, বাড়ী চালান এক মহামারী ব্যাপার! তোমার দোলনও সঙ্গে আছে নিশ্চয়ই।' মিটমিটি হাসি প্যাটার্সনের মুখে।

'না। দোলন স্বামীর ঘরে। তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।'

'সে কি!' প্রায় চেঁচাইয়া উঠিলেন প্যাটার্সন সবিস্ময়ে। 'বিয়ে দিয়ে দিয়েছ! কবে! কোথায়? কিছু তো জানাওনি। নেমন্তন্ন করোনি…'

'বরের বাড়ীতে নিয়েই বিয়ে হয়েছে। তাই নিজের বন্ধুদের আর ডাকিনি।'

'কি করে ছেলে?'

'বিজনেস করে। মিষ্টির বিজনেস করে। নিজের চেষ্টায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। চমৎকার ছেলে।...এই নাও, জামাই ভেট পাঠিয়েছে। সন্দেশ আছে এতে। অনেকগুলি বাক্স পাঠিয়েছিল। খেয়ে দেখো। বলেছি, ওদের বাক্সের জন্য একটা ভাল ডিজাইন এঁকে দেব...'

'অদ্ভুত লোক তুমি!' প্যাটার্সন সন্দেশের বাক্স হাতে ধরিয়া কহিলেন। 'মিষ্টি ছাড়া আর তোমার কারবার নেই! মিষ্টিতে নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় ভরা...।'

'এটা ঠিক বলেছ।' তাপস সংক্ষেপে কহিল।

সমাপ্ত

বাংলা ও বাঙালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'সংহতি' দিবস প্রতিপালনের পর—

যথোচিত ঘটা এবং ঘণ্টা-ধ্বনির সহিত দেশের সর্ব্বত্র 'সংহতি-দিবস' প্রতিপালিত হইল মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে —কিন্তু তাহার পর হইতেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে প্রকার সংহতির পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে দেশের সংহতি বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় না হইয়া দেশের মানুষ ক্রমশ পরম সন্দেহশীলই হইতে বাধ্য হইতেছে! এই সন্দেহ ক্রমে ক্রমে পরম অনৈক্যে পরিণত হইবে বলিয়াও লোকের ধারণা হইতেছে! ইহা অযথা নহে!

এককালে বাঙ্গালীকে প্রাদেশিকতা দোষে-দুষ্ট বলিয়া ভারতীয় অবাঙ্গালী নেতারা অবসর পাইলেই নিন্দা করিতে দ্বিধা করেন নাই, এখনো মনে মনে অনেকের সেই বাঙ্গালী-বিদ্বেষ যে নাই, তাহা নহে, তবে অনেকে তাহা ভাষায় প্রকাশ না করিয়া কাজে তাহার প্রমাণ- দিতে কোন কসুর করেন না। বাঙ্গালীর মহা অপরাধ তাহারা জাতি হিসাবে, রাজ্য হিসাবে তাহাদের ন্যায্য অধিকার চায়, অন্য কাহাকেও কোন প্রকারে বঞ্চিত না করিয়া, অন্য কাহারো দাবীকে কোন ভাবে সঙ্কুচিত না করিয়া। তাহা যদি হইত, তবে পশ্চিমবঙ্গের সদর এবং খিড়কী দুয়ার এমনভাবে সকলের জন্যই সদা উন্মুক্ত থাকিত না। বিশেষ করিয়া কলিকাতার দিকে দৃষ্টি দিলেই আমাদের কথার সত্যতা কতখানি তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রকাশ পাইবে। কলিকাতার এমন বহু বড় বড় এবং ঘনবসতি অঞ্চল আছে, যেখানে বাঙ্গালীর অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না। এই সব অঞ্চলের কোনটি 'রাজস্থান', কোনটি বা 'দক্ষিণ ভারত', কোনটি 'বিহার', কোনটি প্রায় চীন কিংবা পাকিস্তানে'র অঞ্চল বলিয়া ভ্রম হইবে—এবং এই সব অঞ্চলে, বলিতে গেলে বাঙ্গালীদের প্রায় কোন প্রকার অধিকার বা দাবীদাওয়া নাই! এ-বিষয় যদি কাহারো মনে কোন সন্দেহ থাকে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে ইহা যাচাই করিয়া দেখিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এবং রাজধানী কলিকাতায় বাঙ্গালীর, যাহারা 'সন্স্ অব্ দি সয়েল্', তাহাদের যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময় পাশাপাশি অবাঙ্গালী রাজ্যগুলিতে দীর্ঘ-কাল স্থায়ী এবং বংশানুক্রমে বাঙ্গালী বাসিন্দাদের উপর কি এবং কতভাবে নির্য্যাতন সহ কত অত্যাচার চলিতেছে, তাহার পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় না, এমন কি কলিকাতার যে কয়টি সংবাদপত্র দিল্লী, মাদ্রাজ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যের গোপনতম সংবাদও প্রকাশ করিতে পরম তৎপর, সেইসব সংবাদপত্রগুলিও বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর উপর, অবাঙ্গালী রাজ্যবাসী এবং বহুক্ষেত্রে আঞ্চলিক সরকারও কি প্রকার ব্যবহার করিতেছে, সে-বিষয়ে সব কিছু জানিয়াও নীরব রহিয়াছেন, খুব সম্ভবত এ-রাজ্যে যাহাতে ভারত এবং ভারতীয় সংহতি কোন প্রকারে ক্ষুণ্ন না হয়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই!

সম্প্রতি আসামের গৌহাটি শহরে যে বিষম কাণ্ড হইয়া গেল, তাহাতে রাজস্থানীদের সহিত বাঙ্গালীদের, বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের, যে সর্ব্বনাশ গৌহাটির "আসাম ফর্ আসামীয়া"-ভাবে উদ্বুদ্ধ আসামী ছাত্র তথা যুবক সম্প্রদায় করিল—অন্যান্য শ্রেণীর আসামীদের সক্রিয় না হইলেও নীরব সমর্থনে, তাহার ক্ষতিপূরণ কে এবং কয় বৎসরে করিবে—বলিতে পারি না।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়া গৌহাটির দুঃখজনক ঘটনার পর তথায় গিয়া সরেজমিনে রাজস্থানীদের উপর আসামী অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় তিনি গৌহাটির হাঙ্গামা সম্পর্কে যে ছাপা-বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নির্য্যাতীত এবং সর্ব্বস্বান্ত বাঙ্গালীদের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে কংগ্রেসী কিংবা অকংগ্রেসী কোন নেতা বা উপনেতা এ-বিষয় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন কি? কলিকাতায় গণমারী গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে সকলে এতই ব্যস্ত, যে বাঙ্গালার বাহিরে আসাম, বিহার এবং ওড়িষ্যায় লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী 'গণে'র রক্ষার কথা বোধহয় তাঁহাদের মনে করিবার বা রাখিবার সামান্যতম সময়টুকুও নাই! যে-ফ্রন্টির নেতারা জনগণের উপর সরকারী-বেসরকারী অত্যাচার নিবারণের কারণে গণআন্দোলনের হুমকী দিয়া থাকেন, তাঁহারা বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী জনগণের রক্ষার এবং তাহাদের উপর নির্য্যাতনকল্পে আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন? একটি কথাও বলিয়াছেন কি?

আসামে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাষা লইয়া 'বঙ্গাল-খেদা' যে ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় এবং যাহার ফলে হাজার হাজার বাঙ্গালী বিবিধ প্রকারে নির্য্যাতীত হইয়া প্রায় পথের ভিখারী হয়, খুন জখমের সংখ্যাও খুব কম ছিল না, কিন্তু তাহার জন্য সর্ব্বভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, নির্য্যাতীত বাঙ্গালীরা কি সুবিচার তথা ক্ষতিপূরণ পায়, জানা নাই। সেই সময় দেশে নেহরুরাজ, তাহা সত্ত্বেও আসামের বাঙ্গালী অধিবাসীরা বিশেষ কিছু প্রতিকার পায় নাই, তবে শুনা গিয়াছিল যে আসামে এই প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা যাহাতে অ-অসমীয়াদের প্রতি আর না ঘটে, সে বিষয় একটা পাকা ব্যবস্থা অবশ্যই হইবে! এবং এই 'ব্যবস্থার' কল্যাণেই বোধহয় গৌহাটিতে—কেবল বাঙ্গালী নহে, রাজস্থানী এবং অন্যান্য অ-অসমীয়াদের উপর এই অসভ্য হামলা অহমীয়ারা চালাইল। দাঙ্গা হাঙ্গামা সর্ব্বত্রই হইতে পারে, হয়ও, কিন্তু তাহার দমন-ব্যবস্থা রাজ্যপুলিশ তথা প্রশাসনিক কর্ত্তাদের একটা অতি প্রাথমিক অবশ্য কর্ত্তব্য—একথা না বলিলেও চলে। কিন্তু গৌহাটি হইতে বিবিধ সূত্রে যে-সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে তাহাতে, অনেকের মতে গৌহাটির দাঙ্গা-হাঙ্গামায় পুলিস দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে, প্রশাসনিক কর্ত্তারাও, বলিতে গেলে, অন্যবিধ রাজকার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে—গৌহাটির সামান্য একটা বাঙ্গালী এবং রাজস্থানী ঠেঙ্গান ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি দিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই—হয়ত বা তেমন সময়ও লাভ করেন নাই। সব কিছু দেখিয়া শুনিয়া লোকে যদি বলে যে—"আসামে অসমীয়া ছাড়া অন্য যে-সব ভারতীয় বসবাস করে, তাহাদের একটা চমকপ্রদ অহমীয়া বীরত্ব এবং শৌর্য্য দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে (অহমীয়াদের মতে)। কারণ অ-অসমীয়াদের সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার যে—আসাম কেবল মাত্র অসমীয়া-দের জন্যই"—অসমীয়া কর্তৃপক্ষ বোধহয় এমনই কিছু একটা চাহিতেছিলেন, "বঙ্গাল খেদা" দাঙ্গাহাঙ্গামার পর দিন হইতেই। শিক্ষালাভ যথেষ্ট হইল দ্বিতীয়বার।

— ——

গৌহাটি দাঙ্গার পর—

এই দাঙ্গাহাঙ্গামায় রাজস্থানী এবং অন্যান্য রাজ্যবাসীরা (যথা গুজরাটী, মহারাটী প্রভৃতি) ক্ষতিপূরণ যে যথাযথ পাইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু যে-সব বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং বিবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় ঐ সময় গৌহাটিতে ছিলেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ কতখানি, কি ভাবে, কে স্থির করিবেন জানি না। এ-বিষয় পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং কংগ্রেস কর্ণধারদের কি কিছুই করিবার নাই? ফ্রন্টীয় কর্ত্তাদের নিকট হইতে কেহ কিছু আশা করে না, কারণ তাঁহারা নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ ছাড়া, অন্য কাহারো স্বার্থের প্রতি, এমন কি 'কাজের' সময় ছাড়া সাধারণ জনের প্রতিও ইহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হয় না, ইহার কোন প্রমাণও কেহ এখনো পায় নাই!

যুক্ত-ফ্রন্টের মন্ত্রিত্বকালে গৌহাটিতে বাঙ্গালী এবং রাজস্থানীদের উপর হামলা ঘটে, কিন্তু সেইকালে ফ্রন্ট-মন্ত্রীগণ এবং প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রীও গদির লড়াইয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে বাঙ্গালীদের পিঠে গৌহাটিতে যে-নির্মম

গদাঘাত করিল এক শ্রেণীর উন্মত্ত এবং অসভ্য অসমীয়া, সংবাদ পাইয়াও আসামের অধিবাসী বাঙালীদের রক্ষার জন্য একবার আঙুল নাড়াইবার সময় তাঁহারা পাইলেন না, এমন কি নির্য্যাতিত বাঙালীদের দুঃখ-বিপদে একটা সমবেদনার কথাও কাহারো শ্রীমুখ হইতে বাহির হইল না। অন্যদিকে সুদূর রাজস্থান হইতে রাজস্থানী মুখ্যমন্ত্রী গৌহাটিতে হাজির হইলেন হাতের সব জরুরী কাজ ফেলিয়া রাখিয়া! যতটুকু খবর পাওয়া যায়, তাহাতে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ক্ষতি-পূরণ সুদে আসলে করা হইবে, কারণ এই ন্যায্য দাবীর পশ্চাতে সমগ্র রাজস্থানী বণিকসম্প্রদায় রহিয়াছে। আর একটি সংবাদে জানা যায় (সত্য কি না ঠিক জানি না)—যে কলিকাতার রাজস্থানী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সর্ব্বস্বান্ত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের আসামে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যথোচিত প্রয়াস এবং অর্থের সংস্থান করিবেন। কিন্তু আমরা বাঙালী হইয়া বাঙালী ব্যবসায়ী-দের—যাঁহারা গৌহাটির হামলাতে সব কিছু হারাইয়াছেন তাঁহাদের জন্য কে কতটুকু প্রয়াস প্রচেষ্টা করিয়াছি?

রাজস্থানীদের মত সুপ্রচুর অর্থের মালিক হয়ত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ কেহ নাই বলিলেও চলে, যে সামান্য কয়েকজন বাঙালী বৃহৎ কলকারখানার মালিক পশ্চিমবঙ্গে আছেন, তাঁহারা এই বিপদকালে আসামের বাঙালী ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায় সকলেই যুক্তফ্রন্টের শ্রমনীতির বিষম পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন: আর্থিক প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিতেছি। বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে-অবস্থা তাহাতে এখন আত্মরক্ষার সঙ্গে কলকারখানার স্থায়িত্ব বজায় রাখাই বিষম প্রশ্ন। কিন্তু অন্যান্য ছোটবড় বহু বাঙালী এমন ব্যবসায়ী আছেন, যাঁহারা আসামের পথেবসা বাঙালী ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু সাহায্য অবশ্যই করিতে পারেন, করা উচিত বলিয়া মনে করি। জানিনা এ-আবেদন কাহার কাছে করিলাম। আমরা বাঙালীর উপর অবিচার হইলে ক্রন্দন করিতে পারি, তাহাও বোধহয় লোক দেখানো। বাস্তবে কিছু করিবার প্রয়োজনের কালে আমরা মাঠে-ময়দানে মিটিং এবং পথে ঘাটে গণমিছিল বাহির করিয়া জন-দুঃখের প্রতিবাদ ছাড়া আর কি করিতেছি? সময়মত আমাদের গণপতির দল ধনপতিদের স্বার্থরক্ষা করেন, বাক্যে যাহা বলেন কাজে তাহারই বিপরীত করিয়া।

আসামে 'লাচিত্ সেনা'—

গৌহাটির হাঙ্গামাতে আসামী লাচিত সেনার ক্রিয়াকর্ম্ম বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়, এবং এই 'প্রাইভেট্ আর্ম্মির, প্রধান কাজ অ-অসমীয়াদের আসাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করা। এই বীর সেনা-বাহিনীর কিছুসংখ্যক কাপ্তান, মেজরকে গৌহাটির দাঙ্গা হাঙ্গামার পর গ্রেপ্তার করা হয়—কিন্তু নূতন সংবাদে প্রকাশ যে এই সেনাবাহিনী আবার নূতন করিয়া তাহাদের প্রচারপত্র বিলি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রচারপত্রে—আসাম রাজ্য হইতে 'ভারতীয়দের' মানে মানে এবং সময় থাকিতে বিদায় লইতে হুকুম জারি করা হইতেছে। হুকুম পালিত না হইলে—কি ঘটিবে তাহা বলা বাহুল্য! আসাম সরকার নাকি বহু সন্ধানাদি করিয়াও লাচিত্ সেনাবাহিনীর 'হেড্ কোয়াটার্স' কোথায় তাহা ধরিতে পারিতেছেন না এবং এই অপারগতার কারণ হিসাবে আসাম সরকার বললেন যে ইহাদের কোন পাকা সংগঠন কিংবা ঘাঁটি নাই অর্থাৎ এই সেনাবাহিনীর পল্টন সমস্ত আসাম রাজ্যেই ছড়াইয়া আছে এবং সদর হইতে 'আদেশ' পাইলেই ইহারা হিট্লারের ঝটিকা বাহিনীর মত হঠাৎ 'ভারতীয়দের' ডেরা আক্রমণ করিয়া আবার একটা বিষম আঘাত হানিবে ভারতীয়দের উপর, বিশেষ করিয়া বাঙালী অধিবাসীদের গৃহে, দোকানে, ক্ষেত খামারে! এবার রাজস্থানী ব্যবসায়ীরা আত্মরক্ষার জন্য যে সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে রাজস্থানী 'ক্যাম্পে' হানা দেওয়া আসামী বীর লাচিত্ সেনারা সাহস পাইবে কি না সন্দেহ। রাজস্থানী তথা অবাঙালী ব্যবসায়ী এবং কল-কারখানার মালিকদের কেবল আর্থিক নহে এমন বহু সম্বল আছে যাহাতে ইহারা লাচিত্ লুণ্ঠনকারীদের সায়েস্তা

করিবার জন্য নিজেদের রক্ষার জন্য ঘরোয়া প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করিয়া বিপদকালে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন, খুব বেশী কষ্ট না করিয়াও। এই রকমই একটা পাল্টা প্রতিরোধ 'বাহিনীর' কথা কোন কোন সূত্রে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী অধিবাসী এবং সম্পদে কমজোরী ব্যবসায়ীরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কি করিতে পারেন জানি না।

রাজস্থানীদের মদৎ দিতে রাজস্থান সরকারও পিছুপা হইবেন না, দিল্লী এবং কলিকাতার মাড়োয়ারী কোটিপতি ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরাও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন আসামে তাঁহাদের ভাইব্রাদারিয়াদের, কিন্তু এ দিক দিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরা যে বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। আসামে এমন হাজার হাজার বাঙ্গালী আছেন যাঁহারা বহুপুরুষ যাবত আসামেই বাস করিতেছেন এবং আসলে তাঁহারাও আসামীয়াদের সমঅধিকার দাবী করিতে পারেন, এবং এ-দাবী কোন বিচারেই নাকচ করা যায় না। কিন্তু লাচিত্ সেনা, তথা প্রায় শতকরা ৮০জন অসমীয়ার বিচারে এই বাঙ্গালীরা, সব কিছু সত্ত্বেও, 'ভারতীয়' এবং এই মহাঅপরাধের জন্য তাহাদের আসামে বসবাস আর লাচিত্ সেনা তথা অসমীয়ারা বরদাস্ত করিবে না! জানি না এ-বিষয় ভারত সরকারের বিশেষ কোন দায়িত্ব আছে কিনা। তবে সন্দেহ হয়, ভারত সরকারও চাপে পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত হয়ত আসামের 'আভ্যন্তরীন' ব্যাপারে হস্তক্ষেপ নাও করিতে পারেন 'প্রভিন্সিয়াল্ অটোনমির' দোহাই দিয়া!

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে আসামে 'গৌহাটি' হাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয়, সেই জন্য আসাম-সরকার নাকি সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। খুবই আশার কথা, কিন্তু ১৯৬০ সালে 'বঙ্গাল-খেদা' হিংসাত্মক আন্দোলনের পরেও ঠিক এই কথা শুনা যায়, কিন্তু কাজে কি হয়, এবং তাহার ফল কি দাঁড়ায় তাহা গত ২৬এ জানুয়ারী গৌহাটির লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে সবিশেষে প্রকাশ পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীচৌহান অবশ্য সোজা কথা বলিয়াছেন যে গৌহাটিতে ২৬এ জানুয়ারী 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে! শ্রীচৌহানের এই মন্তব্যে হয়ত উৎপীড়িত, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীরা গভীর আনন্দের সঙ্গে নিরাপত্তা বোধও করিবেন ভবিষ্যতে!

— —

অসমীয়াদের রোষের কারণ কি?

১৯৬০ সালের বঙ্গাল খেদা আন্দোলন প্রায় সমগ্র আসামেই সন্ত্রাস-রাজ্যের সৃষ্টি করে, তবে এই ভাষা আন্দোলনে ধনে প্রাণে মারা যায় কেবল বাঙ্গালীরাই। আসামবাসী অবাঙ্গালীদের কোন ভাবে কোন ক্ষতি হয় নাই। ঐ বাঙ্গালী-বিদ্বেষী হিংসাত্মক দাঙ্গা হাঙ্গামা বেশ কিছু দিন ধরিয়াই চলে, এবং আসাম সরকার বাঙ্গালীদের রক্ষা কিংবা নিরাপত্তার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, কিংবা করিতে পারেন নাই।

গত ২৬এ জানুয়ারী চোট পড়ে আসামে বসবাসকারী অ-অসমীয়া ধনী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের উপর এবং লাচিত্ সেনার এ-আঘাত হইতে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা, ছোটবড় নির্ব্বিশেষে, বাদ পড়েন নাই! আসামের অ-অসমীয়া ধনী সম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং আসাম রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করিয়াছেন যথাসময়ে। বাঙ্গালী ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় শিল্পপতিদের সব দাবী স্বীকার না করিয়াও ইহাদের তুষ্ট করিবার জন্য কেন্দ্র সরকার অবশ্যই এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, যাহাতে ভবিষ্যতে রাজস্থানী, গুজরাটি এবং অন্যান্য শিল্পপতিরা কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েন, কারণ তাহা না হইলে আসামের ব্যবসা বাণিজ্য অন্তত কিছু কালের জন্য—বিশ্রাম লাভ করিবে এবং যাহার ফলে আসামের এমনিতেই-দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে!

আসাম বিষয়ে বিজ্ঞব্যক্তিরা মনে করেন আসামে বিক্ষোভের প্রধানকারণ অর্থনৈতিক। আসামের ব্যবসা বাণিজ্য অ-অসমীয়াদের দখলে এবং সেই কারণে, আসাম প্রাকৃতিক

সম্পদে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ অসমীয়াদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। আসামের চা এবং পাট যথেষ্ট বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে, তাহার সুফল এবং যোগ্য অংশ আসাম, তথা অসমীয়ারা পায় না। আসামে উৎপাদিত চা এবং পাটের বাজার শতকরা ৯৮ ভাগই রাজস্থানী শিল্পপতীদের দখলে; আসাম রাজ্যের অধিবাসীরা এই সম্পদ উৎপাদনে যে-পরিশ্রম করে, তাহার বদলে দিন-মজুরী ছাড়া কিছুই অসমীয়া শ্রমিকদের ভাগ্যে জোটে না। রাজস্থানী এবং দু-চারজন গুজরাটি শিল্পপতির শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভাল ভাল এবং মোটামুটি উচ্চ বেতনের পদগুলির প্রায় শতকরা ৯৫টি রাজস্থানী, পাঞ্জাবী কিংবা গুজরাটিদের ভাগ্যেই জোটে। অসমীয়া এবং বাঙালী এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রায় একই পর্য্যায়ে, তবে বাঙালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা আরো কম।

কেন্দ্রীয় সরকারের অতি করুণার কারণে আসামের প্রায় সব কয়টি চা বাগান বাহিরের লোকের দখলে। তাহার উপরে—আসামে যে সকল নূতন কলকারখানা এবং ব্যবসায় পত্তন হইতেছে, তাহার লাইসেন্সও পাইতেছে বাহিরের লোকে ইহাতে অসমীয়ারা প্রায় নাই বলিলেই চলে। অন্যদিকে শিক্ষিত অসমীয়ার সংখ্যা স্ফীত হইলেও স্থানীয় চাকরীর বাজারে, বিশেষ করিয়া নূতন যে-সব কলকারখানা এবং ব্যবসায় পত্তন হইতেছে তাহাতে রাজ্যবাসীদের কতটুকু স্থান হইতেছে, তাহা না বলাই ভাল। এ-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের শিক্ষিত কর্ম্মপ্রার্থী যুবকদের অবস্থা একই রকম। আর্থিক অসাম্য এবং চাকুরীর বাজারে রাজ্যবাসীর, যোগ্যতা সত্ত্বেও বিফলতার ফলে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী এবং নৈরাশ্য শেষ পর্য্যন্ত বিপর্য্যয় ঘটাইবেই।

দেশের সংহতি এবং ঐক্যের কথা শুনিতে ভাল, বলিতে ভাল এবং কথা দুইটির মূল্যও যে অপরিসীম তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও দেশের সকল মানুষই জীবনে একটা আর্থিক স্থায়িত্ব এবং পরিবারের জন্য নিরাপত্তা চায়—ব্যাঙ্কব্যালেন্স, গাড়ী, বিরাট বাড়ীঘর সকল মানুষ চায় না, পায়ও না, কিন্তু জীবনের নিম্নতম কিছু সুখ-সুবিধা সকলকেই দিতে হইবে। উপর হইতে কেবল দেশের ঐক্য, জাতির সংহতি এবং ইহার কারণে মানুষকে সবকিছু ত্যাগ করিয়া যাবতীয় কষ্ট স্বীকার করিতে 'আহ্বান' জানাইলে তাহা বিফল হইবে, হইতেছেও। আজ অসমীয়াদের মধ্যে এত বিক্ষোভ এবং অসামাজিক হৈ-হল্লার ইহাই বোধহয় প্রধানতম কারণ। বাঙালী, রাজস্থানী, গুজরাটিদের প্রতি বিদ্বেষ হয়ত কোন কোন কিংবা বিশেষ শ্রেণীর অসমীয়াদের থাকিতে পারে অন্যবিধ নানা কারণে, কিন্তু ঐ বিদ্বেষ জাতির মজ্জাগত হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, অসমীয়া-দের অর্থ নৈতিক দিক হইতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ঐ-রাজ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার ব্যাপকতা তীব্রতাও ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হইতে বাধ্য।

আসামের 'লাচিত্ সেনা' দমন করিবার কথা অনেকে বলিতেছেন, কিন্তু লাচিত্ সেনা দমন করিতে হইলে, দমন করা দরকার মহারাষ্ট্রের শিব-সেনা, কেরালার গোপাল-সেনা, শ্রী গোলওয়ালকরের রাষ্ট্রীয় 'স্বয়ং সেবক সংঘ' (এইটি সর্ব্বাপেক্ষা সুগঠিত এবং ইহার শক্তিও ক্রম-বর্দ্ধমান), কংগ্রেসের সেবাদল (বর্ত্তমানে সেবাদলের আয়তন বহু হ্রাস পাইয়াছে, এবং তৎপরতাও বিশেষ দেখা যায় না), এই সকল তথাকথিত সেনা এবং সেবাদল ছাড়া প্রত্যেক রাজ্যেই কোন কোন রাজনৈতিক পার্টির বা পার্টিগুলির নিজস্ব 'ভলান্টিয়ার সঙ্ঘ' আছে, এবং এই তথাকথিত 'ভলান্টিয়ার' দলের পার্টির শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন কাজে ইহাদের তৎপরতা কোন দিকে তাহা সকলেই জানেন বলিয়া শুনি নাই, দেখি নাই।

'লাচিত্ সেনা'কে, রাজস্থানী শিল্পপতিদের চাপে কেন্দ্র সরকার হয়ত বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য তথাকথিত 'সেনা'গুলিকেও তল্পী গুটাইবার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। এই ব্যাপারে বিশেষ কোন কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী নেতা-মহামেতার মনোকষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্যবিধি নির্ণয় করা চলিবে না।

———

পোড়া কপাল বাঙালীর—

বহুবিধ বাধা, আপত্তি এবং কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের টাল-বাহানার পর এইবার হলদিয়া প্রকল্প পুরাপুরি সার্থক এবং কার্য্যকরী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা—প্রচেষ্টার পর পশ্চিম বাংলার হলদিয়ার একটি তৈল-শোধনাগার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইলেও বাঙালীরা তাহার সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে এখনই মনে হয়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার এই প্রকল্পটিতে হাজার দেড়েক কেরাণী-কর্ম্মচারী এবং শ'দুই ইঞ্জিনিয়ার-ওভারসিয়ারের কর্ম্মসংস্থান হইবে। কিন্তু শুরুতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় এই সব কাজের ভার দেওয়া হইবে অবাঙালীদের।

স্বাভাবিকভাবে হলদিয়া তৈল-শোধনাগার প্রকল্পে হেড অফিস কলিকাতায় স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রকল্পটির হেড অফিস হইয়াছে দিল্লীতে। জেনারেল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ বলবন্ত সিং—একজন অবাঙালী। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদটিও একজন অবাঙালীর। এ-সবের অর্থ দিল্লী হইতেই কর্ম্মচারী নিয়োগ হইবে এবং প্রকল্পের জন্য ঠিকা বিলিও হইবে দিল্লীতেই।

এই প্রকল্পটি হইতে বাঙালীদের বাদ দেওয়ার পিছনে কোন সুপরিকল্পিত 'প্রকল্প' আছে কিনা জানি না। তবে এই বিষয়ে যেসব কৌশল অবলম্বন করা হইতেছে তাহা সন্দেহজনক। কোচিন ও মাদ্রাজ তৈল-শোধনাগার প্রকল্পের খবরদারীর ভার দেওয়া হইয়াছে পৃথকভাবে গঠিত ২টি বোর্ডের হাতে। এই বোর্ডে রাজ্যের চীফ সেক্রেটারী পোর্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় একজন এম এল-এ আছেন। প্রকল্পের খবরদারী করা ছাড়াও রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করাও এই বোর্ডের কাজ। হলদিয়া শোধনাগারটির জন্য কোন বোর্ড গঠিত হয় নাই। ইহার ওপর প্রত্যক্ষ খবরদারীর ভার ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের কর্ত্তা শ্রীকশ্যপ এবং তৈল মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীনায়েরের। এক-কথায়, হলদিয়া শোধনাগারটি বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেও পরিচালিত হইবে দিল্লীর জমিদারী হিসাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থাকিবেন দর্শকের ভূমিকায়, আর বাঙালীরা আর এক দফা অনুভব করিবেন 'নিজ বাসভূমে পরবাসীর কারবাস!

———

স্বাধীনতার পর

পশ্চিম বঙ্গের প্রতি এই প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবহার কেন্দ্রের নিকট হইতে পাওয়াটাই আমরা স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিতে এখন অভ্যস্ত হইতেছি।

কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা কলিকাতা হইতে একটির পর একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা যথা কোল কণ্ট্রোল [অফিস, (শিয়ালদহ- হইতে) রেলওয়ে ট্রেনিং স্কুল, ডিভিসি সদর কার্য্যালয়, ডিপার্টমেণ্ট অব্ জিওলজি, অ্যান্থ্রপলজি প্রভৃতি ভারতের অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। নামকরা বিদেশী মালিকানার ব্যবসায় মূল সংস্থার বেশীরভাগই বোম্বাই শহরে চালান হইয়াছে, অন্যান্য বহু দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ের কেন্দ্রীয় দপ্তর কলিকাতায় জন্মলাভ করিয়াও আজ ভারতের মহারাষ্ট্র, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে নব-জন্মলাভ করিয়াছে, এ-বিষয় ভারত সরকার কোন বাধা দেয় নাই, আপত্তিও করে নাই, বোধহয় প্রকারান্তরে প্ররোচনাই দিয়াছে। অবশ্য বেসরকারী কারবারের প্রধান দপ্তর কোথায়, ভারতের কোন বিশেষ রাজ্যে অবস্থিত থাকিবে সে-বিষয়ে ভারত সরকারের বিশেষ কিছু বলিবার থাকিতে পারে না, এ-বিষয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-নির্ব্বাহক কর্ত্তৃপক্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। রাজ্যসরকার নিজ রাজ্যে কলকারখানা স্থাপনের ব্যাপারে লাইসেন্স দান প্রভৃতি বিষয়ে কিছু ক্ষমতা রাখেন এবং প্রয়োজনমত তাহা ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগও করিতে পারেন, করিতেছেনও নিজ নিজ রাজ্য বা এলাকার স্বার্থ রক্ষা এবং রাজ্য-বাসীর কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া। দুঃখের বিষয় ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরলোকগমনের পর পশ্চিম বঙ্গে এমন কোন মুখ্য মন্ত্রী, অথবা মন্ত্রী দেখা দিলেন না যিনি রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে এবং নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপনে—কোন প্রকার নূতন দৃষ্টিদান কিংবা উল্লেখযোগ্য প্রবল প্রচেষ্টা করিয়াছেন। কংগ্রেসী আমলে

আমাদের অবস্থা (ডঃ রায়ের পর) খুবই খারাপ হয় কিন্তু তাহা হইলেও অন্ধকার মত এমন অতিহীন অবস্থা এবং মন্দার মধ্যে পতিত হয় নাই। বিশ বছরে কংগ্রেস যাহা করিতে পারে নাই, ১৯৬৭ সালে ৯ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার সেই অসাধ্য সাধন করিল, বাঙলা বাঙালীর কপালে (শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে) অবশিষ্ট যে-টুকু পড়িয়াছিল, 'উফ্' সরকার তাহা একেবারে পরিষ্কার করিয়া সাফ্ করিয়া দিল! বলা বাহুল্য 'উফী' সরকারের শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক মালিকের প্রতি পরম বৈষম্যমূলক নীতি এবং আচরণই ইহার প্রধানতম কারণ! দলীয়-স্বার্থ রক্ষার কারণে সংযুক্ত দলীয় সরকার—বাঙলা, বাঙালী এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও চরম সর্ব্বনাশ করিয়া গেছে। প্রাক্তন 'উফ্' মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যগণ, নিজ নিজ দলের ক্ষুদ্র স্বার্থের ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই, সে-ক্ষমতা অবশ্য সকল মানুষের কাছে আশা করাও যায় না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথা বলা অন্যায় হইবে না যে—যাহারা নিজেদের দেশের এবং দেশের মানুষের ভাগ্য গঠন করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য পায়, তাহারা যদি সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের সকল সুযোগ সুবিধাকে—দেশের এবং দেশের মানুষের সর্ব্বনাশ সাধনেই নিয়োজিত করে তবে তাহাদের মানুষ নামে অভিহিত করিতেও ভদ্রজনের সংকোচ হয়। অথচ দেশের এত বড় এবং এত ব্যাপক সর্ব্বনাশ করিয়া 'উফী' নেতাদের চরম মনোবাসনা এখনো পূর্ণ হয় নাই। একবার রক্তের স্বাদ লাভ করিয়া আবার সেই 'উফীর' দল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে 'গণতন্ত্র' রক্ষার বাহানায় তাহাদের সর্ব্বনাশা চরম তন্ত্রকে আবার দেশ এবং দেশবাসীকে উত্তপ্ত সন্ত্রস্ত করিতে!

সর্ব্বদিক হইতে বাঙলা এবং বাঙলী আহত হইতেছে, কিন্তু সে-দিকে 'উফী' দলের চক্ষু অন্ধ কিংবা কানা, যে কয়েকটি দল লইয়া বর্ত্তমান বাঙলার 'উফী'—সংগঠিত, উফী সেই দল কয়টির স্বার্থ রক্ষাকেই "গণতন্ত্র" রক্ষার নামে জনগণকে ফাঁকা স্লোগান দ্বারা বুঝাইবার সর্ব্বপ্রয়াস চালাইতেছে! এই 'উফী'দের মধ্যে তীব্র লাল কম্যুরা সর্ব্বাপেক্ষা চতুর! উফী যাত্রার দলের অধিকারী তীব্র লাল কম্যুনেতা, 'উফী'র অন্যান্য সরিক বিবিধ মহাভারতীয়—ভীম, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, শকুনী প্রভৃতির ভূমিকায় অভিনয় এবং নৃত্য করিতেছে! দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় এমন বিচিত্র অভিনব যাত্রাপার্টি ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই! এ সম্পর্কে আর বেশী বলিয়া লাভ নেই।

বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙলা ও বাঙালীকে বাঁচিতে হইলে বাঙালী বুদ্ধিজীবি এবং স্বাধীনচিত্তদের অগ্রসর হইতে হইবে। রাজ্যের এবং রাজ্যবাসীর স্বার্থের কারণে দলীয় স্বার্থ এবং অনিষ্টকারী দলকে সর্ব্বতোভাবে কঠোর হস্তে দমন করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহা জনগণই করিতে সক্ষম।

রাষ্ট্রীয় গদাঘাতে 'উফী' দলের আশাভঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হইবার খবর ঘোষণার পর এই অশান্ত মহানগরীতে এক গভীর স্বস্তি ও শান্তির ভাব সর্বত্র দেখা যাইতেছে। মোটামুটিভাবে সকলেই এই ঘোষণাকে স্বাগত করিয়াছেন, তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যতিক্রম তাহা চিরস্থায়ী নিয়ম নয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়া একটা শাসনকার্য চালনা না হইলে জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিতে পারে না শাসন ব্যবস্থায়। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজ্যের অবস্থা স্বাভাবিক না হয় ততক্ষণ রাষ্ট্রপতি তাঁহারা বিশেষ ক্ষমতাবলে এ রাজ্যের প্রশাসন কার্য চালাইবেন। কিন্তু ইহার মেয়াদ কতদিনের? ছ' মাসের? এক বছরের? না তার চেয়েও কম অথবা বেশি সময়ের জন্য? এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই লোকের মনে দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিকদল ভাঙাভাঙির জন্য এই রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের পর এক বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে দুটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটিল। বাংলাদেশের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা অভিনব। এবারের সাধারণ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক বাঁধা ছক বদলাইয়া যাওয়াতেই গোল দেখা দিয়াছিল। রাষ্ট্রপতির শাসন যদি এই রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে পারে তাহা হইলে সকলেই স্বস্তি বোধ করিবেন।

কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ভারসাম্য

এবং স্বাস্থ্য সহজে এ-রাজ্যে কতদিনে আসিবে বলা শক্ত, বিশেষত চৌদ্দটি বিভিন্ন আদর্শের দলের অস্বাভাবিক জোট ইহাতে কেবল বাধার সৃষ্টি করিতে থাকিবে। 'উফী'র ১৪টি দলের মিলন-রজ্জু কোন দেশহিতকর, আদর্শ নহে, ইহা একমাত্র কংগ্রেস-ঘৃণার বাঁধনে আজ 'এক' হইয়াছে। এই সংযুক্ত দলের একমাত্র ব্রত—'মার কংগ্রেস—যেমনে পার'!

প্রয়োজন শেষ হইলে রাষ্ট্রপতি এই রাজ্যকে জন-প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের অধিকার ফিরাইয়া দিবেন। যাতে যথাসময়ে অন্তবর্তীকালীন নির্ব্বাচনের উপযোগী পরিবেশ তৈয়ারী হয় তাহার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়িত্বশীল মনোভাব লইয়া কাজ করিতে হইবে। সাধারণ মানুষ চায় স্থায়ী সরকার, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতিশ্রুতি। গত এক বৎসর তাহা বিঘ্নিত হইয়াছে নানাকারণে। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে প্রথমেই এই ডামাডোলের রাজনীতির জের কাটাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ধরিতে হইবেই। বকেয়া কাজ জমিয়া আছে প্রচুর। রাইটার্স বিল্ডিং-এর গত ৯ মাস কাজের গতি যে দ্রুত ছিল না তাহা বাহিরের লোকও দেখিয়াছে। বিধানসভা অচল, মন্ত্রিত্ব থাকে কি যায়, এই চিন্তা যদি উপর মহলকে সারাক্ষণ বিব্রত রাখে তাহা হইলে নিয়মমাফিক কাজ কখনই করা যায় না। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা খাদ্য সংকট। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা বিধিবদ্ধ রেশন-এলাকায় চালের বরাদ্দ বাড়াইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাত লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্য অপূর্ণ রাখিয়াই তাহাদের বিদায় লইতে হইয়াছে। এখন প্রশাসন কর্তৃপক্ষকেই এই সংগ্রহ কার্য্য করিতে হইবে।

করিতে হইবে অনেক কিছুই, কিন্তু তাহাতে বাধার সৃষ্টি করিবার লোকও কম নাই। আজ যুক্তফ্রন্ট খাদ্যের দাবী তুলিয়া একটা ডামাডোলের সৃষ্টি করিতে চায়, কিন্তু সময়কালে, ক্ষমতা যখন হাতে ছিল প্রাক্তন সরকার ধান চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে কি করিয়াছিলেন, বাধার সৃষ্টি ছাড়া?

খাদ্যাভাবে জনগণের অসীম কষ্ট আজ যুক্তফ্রন্টের নেতাদের চক্ষে অশ্রু বহাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের আমলে মানুষের খাদ্যকষ্ট আরো বেশী ছিল, সেই সময় যুক্তফ্রন্টের অধিনায়ক গর্ব্ব করিয়া বলেন "সাধারণ লোক ৫ টাকা কেজি চাউল কিনিয়া যুক্তফ্রন্টকে" সমর্থনই করিতেছে! আজ ২।২॥ টাকা কেজি দরে লোকে চাউল কিনিতেছে, ইহা বোধ হয় বর্ত্তমান সরকারকে জব্দ করিবার জন্যই! আমরা যতটা দেখিতেছি এবং বুঝিতেছি—তাহাতে মনে হয় রাষ্ট্রপতির শাসন উফী দল ভাল চোখে দেখিতেছে না। সকলেই বর্ত্তমানে রাজ্যপালের শাসন পরিচালনায় অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছে। বেশীর ভাগ লোকই ডামাডোল চায় না। তাহারা শান্তিতে নিজের নিজের কাজ কর্ম্ম রুজি-রোজগার লইয়া, সহজ জীবনের পক্ষপাতী। ভুয়া-গণতন্ত্রের জ্বালা সাধারণ মানুষ গত নয়-দশ মাস হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে। এমন কথাও বহুজন বলিতে দ্বিধা করিতেছেন না যে, যে-গণতন্ত্র গণজীবনের শান্তি এবং নিরাপত্তা কেবল বিঘ্নিত নহে, বিনষ্ট করে, সে-গণতন্ত্র বিষাক্ত গণতন্ত্র, তাহা মানুষের, সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী করে এবং এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের শতকরা অন্তত ৯০ জনই আজ রাষ্ট্রপতির তথা রাজ্যপালের শাসন কামনা করিতেছে, এখনো অন্তত আরো বছর দুই তিন!

ইউ এফ দলের মেজর শেয়ার-হোল্ডার কম্যু (এম) দলের পক্ষে জনগণের এই মনোভাব শুভ নহে। যাহাদের মূলধন একমাত্র হট্টগোল অর্থাৎ গণ গণ্ডগোল, তাহারা দেশের শান্তি এবং মানুষের মনের স্বস্তির ভাবকে ভয় করে মহামারি প্লেগ, বসন্ত, কলেরা অপেক্ষাও বেশী। অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া যাহারা নিজেদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চায়, তাহারা আর যাহাই হউক, দেশের এবং জনগণের মিত্র নহে, দেশের সব কিছু বিনষ্ট করিয়া সেই কম্যুর দল আজ পশ্চিমবঙ্গকে এক মহাশ্মশানে পরিণত করিতে চাহিতেছে—এবং এই দলের সহিত যোগ দিয়াছে অন্যান্য কয়েকটি মুষ্টিমেয়সংখ্যক ব্যক্তি—রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা দখল করিয়া আবার জনগণকে সর্ব্বভাবে বিব্রত করিতে।

কংগ্রেসের নব উদ্যম—

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস আবার নূতন করিয়া জন-সমাদর তথা জনসমর্থন লাভের প্রয়াস করিতেছে। কিন্তু প্রয়াস-পর্ব্বের সুরুতেই নূতন এবং পুরাতন নেতৃত্বের মধ্যে কলহ বাধিয়াছে। নূতনের দল পুরাতন নেতাদের অন্তত দুইজনকে সহ্য করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা পরিবর্ত্তন চাহেন এই নেতৃত্বের। ইহাতে অন্যায় কিছু আছে বলিয়া মনে করি না। একথা সত্য যে পুরাতন নেতৃত্বের অযোগ্যতা এবং অকর্মণ্যতার কারণেই গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আজ আবার যদি কংগ্রেসকে জনগণের নিকট হইতে প্রীতি এবং শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে জনগণের চক্ষে এবং লোকমানসে কংগ্রেসের ইমেজ পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

গত ১৫।২০ বৎসরে কংগ্রেসী নেতা এবং মহানেতার দল—জনগণের নিকট হইতে ক্রমশ দূরে সরিয়া যান এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ একটি 'প্রিভিলেজড্' ক্লাসে পরিণত হয়েন। কংগ্রেসী মন্ত্রী মহাশয়গণও গদিতে বসিয়া নিজেদের সর্ব্ববিষয়ে পণ্ডিত এবং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করেন। প্রশাসনের উচ্চাসনে বসিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ জনগণকে বাণী-ই-বাণে উৎপীড়িত করা ছাড়া, কাজের কাজ কি করিয়াছেন জানা নাই। অবশ্য কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যে ছিলেন না বা নাই, তাহা কখনই বলিব না। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

দেশের শাসনভার হাতে পাইয়াই অধিকাংশ কংগ্রেসী নেতা এবং উপনেতা তাঁহাদের "কাজ" গুছাইতে আরম্ভ করেন। এবং এই কাজ গুছাইবার টেকনিক্ তাঁহারা এত নিখুঁতভাবে রপ্ত করেন যে, এক এক জন সর্ব্বস্বার্থত্যাগী, ধনসম্বলহীন কংগ্রেসী মন্ত্রী কিংবা নেতা অল্পকালমধ্যে পরম বিত্তসম্পদের অধিকারী হইয়া বাড়ী গাড়ী এবং প্রচুর ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের অধিকারী হয়েন। কংগ্রেসী শতপতি হইলেন হাজারপতি, হাজারপতি হইলেন লাখপতি, এবং লাখপতি কোটিপতি, কোন কোন কংগ্রেসী কোটি-কোটিপতি! এই বিবর্ত্তন ব্যাঙাচির কোলা-ব্যাঙে পরিণতিকেও হার মানায়।

কংগ্রেসী নেতা উপনেতাদের শতকরা প্রায় ৮০ জনই 'পারমিট-বিতরণ' কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজের এবং অনুগ্রহভাজনদের সাংসারিক দুঃখকষ্ট নিবারণ করিয়া একান্ত দুঃখী এবং নিত্য অভাবগ্রস্ত সংসারেও প্রাচুর্য্যের বন্যা বহাইয়া দিতে কসুর করিলেন না। একদিকে কংগ্রেসীদের (অবশ্যই কিঞ্চিৎ উচ্চ মার্গের) এই ভাবে প্রাচুর্য্যলাভ এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অবস্থার ক্রমাবনতি হইতে হইতে একেবারে চরমে ঠেকল কংগ্রেসী রাজত্বের কল্যাণে!

দেশের মানুষের ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইল যে সর্ব্ববিধ অপকর্ম্ম, অন্যায় এবং অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে কংগ্রেসী এবং কংগ্রেসী-চর অনুচরের দল সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। লোকে প্রকাশ্যেই বলিতে থাকে যে, উপযুক্ত দর বা মূল্য পাইলে কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং নেতা কোন খরিদ্দার অর্থাৎ অনুগ্রহপ্রার্থীকে কখনও বঞ্চিত করেন না! কংগ্রেসীদের পাপে মহান কংগ্রেসও জন-চক্ষে হইল কলঙ্কভাগী।

ভেজাল ঘি বা তৈলপূর্ণ সোনা বা রূপার পাত্র মূল্যহীন হয় না, ভেজাল ঘি-তেল নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিবা-মাত্র সোনা বা রূপার পাত্র হয় নির্ম্মল এবং তাহার স্বাভাবিক মূল্যও বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যাহাদের পাপে আজ কংগ্রেস হইয়াছে নিন্দাভাগী, সেই পাপী অর্থাৎ অনাচারী এবং অমিতাচারী কংগ্রেসীদের বিতাড়িত করিলে হয়ত কংগ্রেস তাহার পূর্ব্ব গৌরবে আবার আসীন হইতে পারিবে। এখানে হয়ত কথা উঠিবে, 'ঠক বাছতে গাঁ উজাড়'! তাহাতেই বা ভাবিবার কি আছে? 'উজাড় গাঁয়ে' আবার নূতন করিয়া বসতি স্থাপন করিতে বাধা কোথায়? তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সমগ্র 'কংগ্রেস গাঁ' উজাড় করিবার প্রয়োজন হয়ত হইবে না যদি বিশেষ সতর্কতার সহিত কয়েকজন সর্দ্দারকে গাঁ হইতে, উল্টা-গাধায় চড়াইয়া এবং মাথায় টোকো-ঘোল ঢালিয়া, বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে মিড্-টার্ম নির্ব্বাচন হইবে আজ হোক,

বা, দুদিন পরে হোক। সেই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস অবশ্যই বাজী ধরিবে, কিন্তু বাজী জিতিতে হইলে কংগ্রেসকে এখনই জনসমাজের চক্ষে এবং মানসে তাহার বহু পূর্ব্বের সেই কল্যাণমূর্ত্তিকে স্থাপিত করিতে হইবে—মানুষ অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভোটদাতাকে একথা ভাল এবং স্পষ্টভাবে বুঝাইতে হইবে যে বহু কংগ্রেসী অবসর এবং সুযোগ পাইয়া যে অন্যায় অনাচার এবং পাপানুষ্ঠান করে, তাহাদের কংগ্রেস হইতে বিদায় দিয়া চির-অবসর দান করা হইয়াছে। একথাও মানুষকে স্পষ্ট এবং সোজা কথায় জানাইয়া দিতে হইবে যে, যে সব কংগ্রেসী, তিনি বা তাঁহারা যত বড় নেতাই হউন না কেন, পরে আর কোন অছিলায় কংগ্রেসের সীমানায় আসিতে পারিবেন না। কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেসে এই কংগ্রেসী সিউয়েজ (Sewage) সাফ করবে কে?

সমগ্র দেশ নিদারুণ অপুষ্টির কবলে

সরকারী স্বাস্থ্য ডিরেক্টার জেনারেলের খাদ্য বিষয়ক এক সমীক্ষার রিপোর্টে জানা যায় যে—

> দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই নিম্ন আয়-ভোগী (মাথাপিছু ·০০২৪ টাকা) ইঁহারা নিদারুণ অপুষ্টির কবলে পড়িয়া আছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাগ্-বিদ্যালয় বয়সের শিশু; দেশের জন-সংখ্যার বিশ-শতাংশ।
>
> সমীক্ষায় দেখা যায় স্বল্প আয়ভোগীদের খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন বা মাংস জাতীয় উপাদানের অভাব খুব বেশি। আবার অধিক আয়-ভোগীলোকদের খাদ্যে রয়েছে প্রোটিনের প্রাচুর্য্য। দরিদ্রদের খাদ্যে লৌহ এবং ভিটামিন-এর অভাব আরও তীব্র।

শ্বাস রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী

রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগগুলির সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে ভারতের রেজিষ্ট্রার জেনারেল যে সমীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ দেশে মৃত্যুর বেশীর ভাগই হয় শ্বাস-ঘটিত রোগে। এই রোগে মৃত্যু আবার সবচেয়ে বেশী হয় পাঞ্জাবে (৩৫'১ শতাংশ), তাহার পর রাজস্থানে (৩০'৬ শতাংশ) ও আসামে (২৮'৭ শতাংশ)।

শ্বাস-রোগের পর প্রাণ সংহারকরূপে স্থান উদরাময়ের ও পাকস্থলী-ঘটিত অন্যান্য রোগের। এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা উড়িষ্যায় ২৪ শতাংশ, আসামে ২১ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৭ শতাংশ।

দেশের শতকরা অন্তত ৮০ ভাগ লোকেই পেটভরা আহার সপ্তাহে দুই তিন বেলাও পায় কিনা সন্দেহ, একথা আমরা এবং অন্যান্য লোকে বহুবার বলিয়াছেন। দেশের অধিকাংশ লোকের খাদ্যাভাব চরমে উঠিয়াছে বিগত চার পাঁচ বৎসর—বিশেষ কারণ খরার ফলে অজন্মা, এই কথাই কর্ত্তা-মহল হইতে বলা হয়। খাদ্যে প্রোটিনের অভাবটা সত্য। কিন্তু যে-খাদ্যে প্রোটিন থাকে সেই খাদ্যই যখন সাধারণ লোক মাসে হয়ত একবারও কিনিতে পারে না, কিনিলেও তাহা নামে মাত্র, সেই অবস্থায় মাছ মাংস ডিম এবং দুধের জন্য দুঃখ করিয়া বৃথা মন খারাপ করা ছাড়া আর কিছুই হয় না!

এক কিলো মাছ কম-সে কম ৪৷৫ টাকা, মাংস ৬।৬৷৷০ টাকা, একটি ডিম ২৫ হইতে ৩০।৩২ পয়সা, আর দুধ? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থায় যে দুধ মানুষ কিনিতে পায় (পয়সা থাকিলে) তাহার দামও ধাপে ধাপে প্রায় আকাশ ছোঁয়া হইয়াছে! যে দুধ-মিশ্রিত জল সরকার বোতলে ভরিয়া বিক্রয় করেন, কোন বেসরকারী গোয়ালা তাহা করিলে, মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার জরিমানা কিংবা জেল হইত। পূর্ব্ব কালে সামান্য জল মিশ্রিত দুধ বিক্রয় হইত, আর গত কিছুকাল হইতে সদর বাজারে এবং সরকারী আওতায় বিক্রয় হইতেছে সামান্য দুধ মিশ্রিত জল!

দুধ, কি মাছ মাংসের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ মানুষকে যদি প্রত্যহ একবেলাও পেট-ভর্ত্তি ভাত-ডাইল এবং সামান্য শাকসব্জী দেওয়ার ব্যবস্থা কেহ করিতে পারেন, সাধারণ মানুষ তাঁহাকে বা তাঁহাদের দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। দেশের সরকার যখন খাদ্য যোগাইবার ভার লইয়াছে তখন এ-কর্ত্তব্যটা সরকারের তথা খাদ্য-মন্ত্রীদের। কি

প্রায় দেখা যায় মন্ত্রীদের প্রধান কাজ—টনমণের পরিসংখ্যান দান এবং সেই সঙ্গে সাধারণ জনকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া দেশের জন্য আর মাত্র কিছুকাল (গত ২০ বছর ধরিয়া এই একই পুরানো রেকর্ড বাজিতেছে) দেশের জন্য সর্ব্ব কষ্ট সহ্য করিতে! কষ্ট সহ্য করিবার উপদেশ বিতরণ করিবার সময় যদি কষ্ট মাপিবার একটা মিটার প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থা সরকারী মুখপাত্ররা করিতেন কিংবা এখনো করেন, তাহা হইলে দেশবাসী বুঝিতে পারিবে কষ্ট সহ্য শেষ করিয়া কবে নাগাদ তাহারা শেষ ঘাটে পৌঁছিয়া অন্তিম খেয়া পার হইবে!

দেশের লোক (সাধারণ লোকের কথাই বলিতেছি, স্ফীত-উদর নিরামিশাষী ধার্ম্মিকদের কথা নহে) যে-ভাবে যে রকম এবং যে-পরিমাণ খাদ্য প্রত্যহ পাইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় 'ফ্যামিলী-প্লানিং' প্রচার এবং কার্য্যকর করার প্রয়োজন আর বেশীদিন হইবে না, বিশেষত যখন এই পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য বাস, ট্রাম, ট্যাক্সী এবং ভারতীয় রেলও তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা দান করিতে কোন কার্পণ্য করিতেছে না!

আশঙ্কা হয় যে-কয়েক বৎসর পরে দেশের যাহারা "জয় জোয়ান" নামক গানটি শুনিবে, তখন তাহারা দেশে জোয়ান দেখিতে পাইবে না। দেশের "জোয়ান" তখন অকালে হয়, বৃদ্ধত্ব, আর নয় ত বুদ্ধদেবের মত নির্ব্বাণ লাভ করিবে!

গত এক বছরের ইতিহাস

(যুক্তফ্রন্ট শাসন: ২৬৫ দিন। কংগ্রেস সমর্থনে পি ডি এফ: ৫৬ দিন। কংগ্রেস পি ডি এফ কোয়ালিশন: ৩৬ দিন।

১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭—পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোট গ্রহণ।

২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭—পশ্চিমবঙ্গের ২৮০টি বিধানসভা আসনের ভোটগণনা ও ফল প্রকাশের সমাপ্তি। কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জনে অসমর্থ।

১ মার্চ্চ ১৯৬৭—সংযুক্ত বাম ফ্রন্ট ও সংযুক্ত গণ বাম ফ্রন্টের মিলিত সংস্থা—যুক্তফ্রন্ট গঠন।

২ মার্চ্চ ১৯৬৭—শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

১৯ জুন ১৯৬৭—অধরচন্দ্র হালদার, নরুল নবী ও ব্রহ্মচারী ভোলানাথের যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ ও কংগ্রেসে যোগদান।

২১ জুন ১৯৬৭—শ্রীগিরীন মণ্ডল ও নেপাল বাউড়ির যথাক্রমে জনসঙ্ঘ ও বাংলা কংগ্রেস ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগদান।

২৬ জুলাই '৬৭—যুক্তফ্রন্ট সরকার আমলে শেষ বিধানসভা বৈঠক।

৭ আগষ্ট '৬৭—বিধানসভার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগেই তাহা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি হয়।

২৪ আগষ্ট '৬৭—যুক্তফ্রন্টের ডাকে কেন্দ্রীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে হরতাল।

১৮ সেপটেম্বর '৬৭—খাদ্যের দাবিতে কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযান।

২ অকটোবর '৬৭—যুক্তফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিতে গিয়াও করিলেন না।

২ নবেম্বর '৬৭—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। তাহার সঙ্গে ১৭ জন এম এল এ-রও যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করিয়া পি ডি এফ গঠন।

৬ নবেম্বর '৬৭—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার ডঃ ঘোষের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত।

২১ নবেম্বর '৬৭—রাজ্যপাল কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল। কংগ্রেসের সমর্থনে পি ডি এফ নেতা ডঃ ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ।

২২ নবেম্বর '৬৭—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের প্রতিবাদে হরতাল।

২৩ নবেম্বর '৬৭—যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিলের প্রতিবাদে হরতাল।

২৯ নবেম্বর '৬৭—বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান কিন্তু স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্থায়ী রুলিং-এর ফলে অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি।

৩০ নবেম্বর '৬৭—হরতাল।

৪ ডিসেম্বর '৬৭—ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভার কলেবর বৃদ্ধি।

১৮ ডিসেম্বর '৬৭—যুক্তফ্রন্টের সপ্তাহব্যাপি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু।

৩১ ডিসেমবর '৬৭—শ্রীজাহাঙ্গীর কবির ও অন্য ৫ জন বাংলা কংগ্রেস এম এল এ-র বাংলা জাতীয় পার্টি নামে নতুন দল গঠন।

১৫ জানুয়ারি '৬৮—ডঃ ঘোষের মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের যোগদান ও কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকার গঠন।

২৬ জানুয়ারি '৬৮—যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলন।

১২ ফেব্রুয়ারি '৬৮—শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে নতুন দল গঠন। সহকারি নেতা শ্রীআশুতোষ ঘোষ এম এল সি।

১৪ ফেব্রুয়ারি '৬৮—বিধানসভায় যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের কোনক্রমে ভাষণ। স্পীকারের পূর্ব্বের রুলিং বহাল। বিধানসভা মুলতুবি।

২০ ফেব্রুয়ারি '৬৮—মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগ। রাজ্যের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসানে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন।

ইহার পরের ঘটনাবলী সকলেই জানেন এবং দেখিতেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতি, তথা রাজ্যপালের শাসনে বাঙলার জনগণের বহু কষ্ট লাঘব হইয়াছে। সাধারণ মানুষ (অন্তত কলিকাতায়) শান্তিতে এবং খানিকটা নিশ্চিন্ততার মধ্যে নিশ্বাস লইতে পারিতেছে।

কিন্তু এই শান্তি এবং নিরাপত্তা কতদিন বজায় থাকিবে বলা শক্ত। 'গণতন্ত্র' রক্ষা করার পবিত্র কঠিন দায়িত্ব যে দলগুলি লইয়াছে, তাহারা ইতিমধ্যেই গণমিছিল, গণসভা বাহির করিয়া মহাগণগণ্ডগোল পাকাইবার ব্যবস্থা করিতেছে।

প্রাক্তন বৃদ্ধ যুক্তফ্রন্টী মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠে ঢাক বাঁধা হইয়াছে। কম্যু (এম) নেতাদের ঢাক বাজাইবার কাঠি লইয়া তিনি প্রস্তুত। এবার ঢাকের বাদ্য সুরু হইলেই হয়।

স্মৃতির টুক্‌রো

সাতকড়িপতি রায়

বক্তৃতা দিতে হবে। মেদিনীপুরের একজন প্রধান উকিল শ্রীরাধানাথ পতি মহাশয় সভাপতি হয়েছেন। সহরের বহু উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও সাধারণ লোক সভায় উপস্থিত। সকলেই কৌতুহলী। তখন খদ্দর হয়নি,—আমার পরনে বম্বেমিলের মোটা কাপড়, গায়ে টুইলের মেরজাই, শুধু পা। সমস্ত বিষয় প্রাঞ্জল করে বোঝাতে আমায় তিন ঘণ্টা অনর্গল বলতে হয়েছিল।-আমি বসবার পর রাধানাথবাবু বললেন,—সাতকড়ি যেভাবে জিনিষটা বুঝিয়েছে তাতে অস্পষ্ট কিছুই নেই। তবে বুঝা যাচ্ছে যে একটা মহতী ত্যাগের প্রশ্ন এসেছে। এ কাজে যোগ দিতে হলে নিজেকে প্রস্তুত হয়েই যোগ দিতে হবে। কত বিপদ, কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতে পারে তাও সাতকড়ি খুব ভাল ভাবেই বুঝিয়েছে। এখন আপনাদের কর্ত্তব্য ভাল করে চিন্তা করুন এবং সেই চিন্তার পর যাঁরা অগ্রসর হবেন তাঁরা সাতকড়িকে জানাবেন। সে এখন কয়েকদিন এখানে থাকবে এবং একটা এ্যাড্‌হক্ কমিটি গঠন করবে।" আমি প্র্যাক্‌টিস ছেড়ে এই কাজে অগ্রসর হয়েছি ব'লে তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে, আশীর্ব্বাদ করে সভা শেষ করলেন।

তার পরের দিন সকালে কয়েকটী যুবক ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকের খাতায় নাম লেখাল। বৈকালে বাড়ীর মধ্যে জলখেতে গেছি,—বৌঠাকুরাণী বললেন,—ঠাকুরপো, কাল তুমি কি বক্তৃতা দিয়েছ, তোমার দাদাত' কাল রাত্রে ঘুমননি। আজ কোর্টেও যাননি, খাবার সময় বলছিলেন সাতুর যুক্তি যে অমোঘ, আমাকেও প্রাক্‌টিস ছেড়ে এ কাজে যোগ দিতে হবে।" আমি খুব উৎফুল্ল হয়ে বললাম,—তুমি কি বললে বৌদি? তিনি বললেন,—আমি কি বুঝি বলত'? তোমরা যদি মনে কর' তোমরা খাটলে দেশ স্বাধীন হবে তাহলে আমরা কি নিষেধ করব? মেজবৌ ত' তোমায় ছেড়ে দিয়েছে। আমি কি তোমার দাদাকে আটকে রাখব? তবে ছেলেপুলেগুলর কি হবে? আমি বললাম,—ওটা যদি আমরা ভগবানের কাজ বলে গ্রহণ করি তাহলে ভগবান কি আমাদের ছেলেদের দেখবেন না? বৌদি বললেন,—খুবই ঠিক্ কথা। কিন্তু সে বিশ্বাস থাকলে হয়।

মেদিনীপুরে আমাদের বাড়ীর একটা ঘরে আমি তখন কংগ্রেস অফিস খুলেছি। রাত্রি ১০টার সময় দাদা, আমার দাদা কিশোরীপতি রায়, এসে আমার পাশে বসে বললেন, সাতু আমি ঠিক করলাম আর কোর্টে যাব না, কাল থেকে কংগ্রেস গঠনের কাজে লাগব'। তুই ত' অতুল বোস উকিলকে জানিস্। সে এসেছিল, সেও ওকালতি ছাড়বে। দু-একটী মোক্তারবাবুও কাজ ছাড়বেন।'—আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। দাদাকে বললাম—দাদা, আপনারা তাহলে কালই একটা এ্যাড্‌হক্ মহকুমা সমিতি করে ফেলুন। কাগজপত্র সবই ত' এনেছি। কতক আপনারা নিন, কতক নিয়ে আমি ঘাটালে চলে যাই।' দাদা রাজী হলেন। আমাদের বাড়ীতেই এ্যাড্‌হক্ কংগ্রেস কমিটি গঠিত হল পরের দিনেই। সেইদিন থেকে দাদার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতেই কংগ্রেস অফিস ছিল। মাঝে কয়েক বছর অবশ্য ইংরাজ সরকার আমাদের বাড়ী কেড়ে নেয়। আমাদের বাড়ীর উপর অসংখ্য অত্যাচার চালিয়েছে। কংগ্রেস অফিস থেকে বহুবার সব কাগজপত্র নিয়ে গেছে। পিটুনী পুলিশ ও মিলিটারী দিয়ে বাড়ী দখল করে রেখেছে,—সব আসবাবপত্র, এমনকি জানালা

দরজা ভেঙে উনানে আগুনে দিয়েছে। তবু, দাদা যখনি যে বাড়ীতে থেকেছেন সেই বাড়ীতেই কংগ্রেস অফিস হয়েছে মেদিনীপুরের।

সেদিনের সহধর্ম্মিণীদের দেখেছি। শতকরা ৯৯ জন স্বামীর অনুগামী ছিলেন। দু-এক ক্ষেত্রে হয়ত' স্বামীর কাজে তাকে ব্যঙ্গ করেছে, তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এই অসহযোগ আন্দোলনে ত' বহুব্যক্তি, বিবাহিত সংসারী ব্যক্তি সর্ব্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের সহধর্ম্মিণী-গণও সহধর্ম্মিণীর কাজই করেছেন, এটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর তা দেখে প্রাণে আনন্দ অনুভব করেছি। অবশ্য তাঁরা প্রায় সকলেই অল্প বয়সেই বিবাহিত ছিলেন। ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবার পুর্ব্বেই স্বামীর সহিত মিলিত হয়েছেন। কিন্তু, ব্রাহ্মসংসারও ত' দেখেছি। তাঁদের ত' অল্প বয়সে বিবাহ হয়নি। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ঐ ব্যারিষ্টারী ছেড়ে যে অসীম দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। কৈ, বাসন্তী দেবী-ত' আনন্দের সহিত সে দারিদ্র্য স্বামীর সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। যিনি কন্যার বিবাহে এক লক্ষ টাকা খরচ করেছেন তাঁর বাড়ীতে আসবাবপত্র পর্য্যন্ত ভেঙে শেষ হয়ে গেছল। কৈ তিনি ত' একবার সে কথা মনেও স্থান দেননি। বরং আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি বাসন্তী দেবীর কেবলমাত্র অম্লানবদনে সাহায্য করা নয় তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ না পেলে চিত্তরঞ্জন হয়ত' এতদূর অগ্রসর হতে পারতেন না। সেত' বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র ৪০ বছরের আগের কথা। আর এই অল্প সময়ে কি পরিবর্ত্তন না হয়ে গেছে। আজ স্ত্রীর মনো-মালিন্যের ভয়ে কেউ ত্যাগের কথা, দৈন্য গ্রহণের কথা চিন্তা করতেও ভয় করে। স্ত্রী আর 'সহধর্ম্মিণী' নেই,—বিলাসিতার সঙ্গিনী। "না পোষায় তুমি যা হয় কর, আমি যা ভাল বুঝব' করব'।" ইহাই যেন আজকাল শতকরা অন্ততঃ ৫০।৬০ জনের মনোভাব। ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা! সমাজের পক্ষে কি মঙ্গলকর ?-

যাক্, আমি জাড়া চলে গেলাম। সেখান থেকে আমার দুই জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র,—কৃষ্ণকিশোর ও বিজয়চাঁদকে নিয়ে ঘাটালে গেলাম। উকিল লাইব্রেরিতে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাঁরা একটা সভার ব্যবস্থা করলেন। ঘাটালে ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশী। সভাতে উকিল, মোক্তার ও ব্যবসায়ীরাই বেশী এসেছিলেন। সভাতে কংগ্রেস কার্য্যক্রম বুঝিয়ে দিতে আমাকে প্রায় তিনঘণ্টা বক্তৃতা দিতে হয়। রাত আটটার পর সভা ভঙ্গ হল। ঐখানকার উকিল মোহিনীমোহন দাস ও মনতোষন রায় আমার বাসায় এসে দেখা করলেন। কিছু-ক্ষণ আলোচনার পর তাঁরা ওকালতি ছেড়ে ঘাটালে এ্যাড্ হক্ কমিটি গঠনের ভার নিতে স্বীকৃত হলেন। কয়েকটি যুবকও কাজ করতে রাজী হয়ে গেল। একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, তাঁর পদবী 'বাগ' (নাম মনে নেই) অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ ঘাটালের গ্রামে গ্রামে সভা করে এ্যাড্ হক্ কমিটি গঠন করতে লাগলাম। যুবকগণ প্রাণ দিয়ে খাটতে লাগল'। একটা গ্রামকে কেন্দ্র করে তারা সভার আয়োজন করে এবং তার চারিপাশের গ্রামে প্রচারপত্র বিলি করে। যে গ্রামটিকে কেন্দ্র করা হয়েছে সেখানে হেঁটে আমি যেতাম। সকালে সেই গ্রামের শিক্ষিত-গণের সঙ্গে দু-তিন ঘণ্টা আলোচনা করতাম, তারপর তাঁদের মধ্যে তিন-চার জনকে রাজী করিয়ে এ্যাড্ হক্ কমিটি করলাম। গ্রামের একটা ডাঙ্গায় সভা হত' বিকেলে। পাশাপাশি গ্রামের লোকেরা আসত'। আমি তাদের বলতাম কেমন করে আমাদের দেশের ঐশ্বর্য্য বিদেশের ব্যবসাদারগণ ইংরাজ-রাজের সাহায্যে লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতার দরুন, মনুষ্যত্বহীনতার দরুন তাদের বাধা দেওয়া দূরে থাক, তাদের সহযোগিতা করছি। তাঁরা পাঁচহাজার মাইল দূর থেকে এসে আমাদের ঐশ্বর্য্য নিয়ে গিয়ে তাদের দেশকে বড় করছে,—এটা তাদের কতবড় দেশভক্তি। আর আমরা কতবড় দেশদ্রোহী যে সেই কাজে সহযোগিতা করছি। আমরা যদি মানুষ হই, আমরা যদি এই সহযোগিতা না করি তবে দেশের ঐশ্বর্য্য বিদেশে যাবে না। আমরা পুলিশ, আমরা ডেপুটি আমরা চৌকিদার, আমরা কেরানী হয়ে ইংরাজের রাজত্ব চালাচ্ছি। আমরা যদি সহযোগিতা না করি তাহলে এ রাজত্ব চলবে কি করে? ইংরাজ বলছে, তোমরা সহযোগিতা কর,' তোমরা চিরকাল আমাদের অধীন থাক, আমরা তোমাদের

বিলাসিতার দ্রব্য, পরনের কাপড়, তোমাদের থাকবার বাড়ী সব করে দেব'। আমরা কংগ্রেসের লোক তোমাদের বলছি,—তোমরা ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আর সহযোগিতা করো না। ইংরাজ জুলুম করবে, হয়ত জেলে নিয়ে যাবে, হয়ত মারধর লাঞ্ছনা করবে, কিন্তু সহযোগিতা না পেলে ওরা টিকতে পারবে না। তখন দেশ স্বাধীন হবে। আমরা কষ্ট ভোগ করলে, আমাদের বংশধরগণ মাথা উঁচু করে জগতের সামনে বলতে পারবে, আমরা পরাধীন জাতি নই। আমাদের দেশের মাটি খাদ্য দেয়, বস্ত্র করবার তুলা দেয়। মোহের বশে আমরা বিদেশী কাপড় পরি বলে আমাদের তাঁতিকুল ধ্বংশ হয়ে গেছে। আমরা যদি আবার বিদেশী বস্ত্র ছেড়ে নিজেদের তৈরী কাপড় পরি, তাঁতিরা আবার বাঁচবে। আমাদের অর্থ বিদেশে যাবে না।"—এইভাবে বক্তৃতা করতাম দু তিন ঘণ্টা একটা টুল বা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে। পল্লীগ্রামের চাষীরা সব বুঝত। তিন সপ্তাহে অনেকগুলি সভা করে, ওখানকার উকিলবাবুদের সব কাজ শিখিয়ে দিয়ে কলিকাতায় ফিরে এলাম।

দেখলাম গ্রামের মানুষরা সব জড়ের মত হয়ে গেছে। মনুষ্যত্ব হারিয়ে, মূক হয়ে গেছে। কিন্তু, বাঙ্গালীর যে বিশেষত্ব 'আতিথেয়তা' তা বিস্মরণ হয়নি। যে গ্রামেই গেছি সেখানেই তারা আমাদের খাইয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। চাষীরা রাজনীতি যে খুব বুঝতে পারত তা নয়, কিন্তু exploitationটা বুঝতে পারত'। সব থেকে যাতে বেশী কাজ হয়েছে সেটা ত্যাগের দৃষ্টান্ত। মেদিনীপুর জেলায় জাড়ার জমিদারদের বিশেষ নাম ছিল। সেই বাড়ীর মানুষ আমি। আবার হাইকোর্টের উকিল। কেন আমি সব ছেড়ে পথে পথে, গ্রামে গ্রামে, খালি গায়ে, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি? এতে ত' আমার কোনও স্বার্থ নেই। তবে এ ত্যাগ, এ কষ্ট সহ্য কেন করছি? এইটাই তাদের প্রাণে বেশী করে আবেদন করেছিল, এবং সেই কারণেই আমার উপদেশ, আমার প্রদর্শিত পথে টেনে এনেছিল তাদের।-

কলকাতায় এক সপ্তাহ থেকে ঝাড়গ্রামের দিকে সাঁওতাল মাহাতোদের দিকে গেলাম। গিধনী ষ্টেশনে শৈলজানন্দ সেন থাকত'। যদিও আমার এক ক্লাশ নিচে পড়ত' তবু আমারই সমবয়সী এবং আমার সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তারই বাংলোয় উঠলাম। সংবাদপত্রে তখন অহিংস-অসহযোগের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। শৈলজা নেশা-ভাঙ্ করত'। আমার বেশ দেখে এবং আমার সঙ্গে একদিন বিশেষ আলোচনা করে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। গিধনীতে তিন চারটি যুবক,—তারাপদ দে, দ্বারিক সেন প্রভৃতি কাজ করতে রাজী হল। তারপর আরম্ভ হল সাঁওতালদের গ্রামে অভিযান।—

মেদিনীপুরের ফৌজদারী কোর্টের উকিল মন্মথ দাস তখন ওকালতি ছেড়েছে। সে আমার সঙ্গে এই অভিযানে যোগ দিলে। শিলদা পরগণার একটি গ্রামে সাঁওতাল-মাহাতোদের একটি সভা ডাকা হল। প্রায় চার-পাঁচ হাজার সাঁওতাল-মাহাতো' জড় হয়েছে। আমি যতটা সোজা করে পারি তাদের বুঝাবার চেষ্টা করে প্রায় দু-ঘণ্টা বক্তৃতা দিলাম। একটি খুব বৃদ্ধ কিন্তু খুব বলিষ্ঠ সাঁওতাল উঠে বললে,—"বাবুরা, তোদের কথা ত' শুনলাম। এবার আমাদের কথা শুনবি?"—বললাম—বল, তোমাদের কি কথা।'-শিলদা পরগনা "মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর (watson & co) জমিদারী। সাহেব ম্যানেজার,—তাঁর বাঙ্গালী নায়েব এবং তহসীলদার, পাইক, ফরেষ্ট রেঞ্জার চৌকিদার ইত্যাদি বহু কর্ম্মচারী রয়েছে। সেই বৃদ্ধ সাঁওতালটি তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলাতে যে অত্যাচারের কাহিনী বলেছিল, এই ৪৫ বৎসর পরেও আমার মনে তা জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে। সাহেবদের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নীল চাষ। সমস্ত সাঁওতালদের তাতে 'বেগার' দিতে হয়। চোদ্দমাইল দূরে গিধনী ষ্টেশনে সাহেবদের জন্যে খড়্গপুর থেকে ট্রেনে পাঁউরুটী আসবে সেটা পালা করে বিনা-পারিশ্রমিকে এনে দিতে হবে। প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে মেদিনীপুর সহর থেকে সাহেবদের মাসকাবারী চাল, ডাল, চিনি, ময়দা, মসলা, তেল ইত্যাদি সব কাঁধে ভারে করে এনে দিতে হবে বিনা পারিশ্রমিকে। চার দিনের রাস্তা নিজের খেয়ে বেগার ঐ সব বয়ে আনতে

হবে। যার ঘরে গাই-মহিষ আছে, বিনামূল্যে ঘি দিতে হবে এবং যার ঘরে গরু নেই তাকে যেমন করে হোক্ একটাকায় একসের ঘি যোগাড় করে দিতে হবে। প্রত্যহই ত' মুরগী দিতে হবে বিনা পয়সায়। এই সব হুকুমের কোনটা পালন না করলেই পাইক এসে বেঁধে নিয়ে যাবে। সাহেব খুসীমত জরিমানা ধার্য্য করবে। আর জরিমানা না দিতে পারলে—' চাম্‌চিকা ফাটক"। জানালা-বিহীন একটা ছোট্ট ঘর, চাম্‌চিকা বোঝাই সেই অন্ধকারে, সেই ঘরে উলঙ্গ করে অপরাধীকে পুরে দেওয়া হবে,—এই "চাম্‌চিকা ফাটক।" যতক্ষণ না তার বাড়ীর কেউ এসে জরিমানার টাকা দিচ্ছে ততক্ষণ সেখানে আটক থাকতে হবে, বলা বাহুল্য বিনা জল ও খাদ্যে। সময়ে সময়ে ঘোড়ার জিনের রেকাবের চামড়া দিয়ে মারাও হয়। এ ছাড়া, জমিদারীর মধ্যে তাঁত বুনলে 'তাঁতকর,' কামারশালের 'শালকর,' জঙ্গলের শালপাতা আনলে 'পাতকর' জমিদারীর মধ্যে দিয়ে গরুর গাড়ী চালালে 'পথকর' (যদিও রাস্তাটা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের) এক-আনা হিসাবে প্রতিবারে দিতে হবে। আরও কত রকমের অত্যাচার যে সাহেবরা করে তার শেষ নেই। সেই বৃদ্ধ সাঁওতাল প্রশ্ন করলে,—তোদের কথা শুনলে এসব অত্যাচার কি বন্ধ হবে'।—

ঐ সব কথা বল্‌তে বৃদ্ধ সাঁওতালটার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়তে লাগল। মন্মথ দাস এবং যে-সব যুবকরা ছিল সেখানে, তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ল। মন্মথবাবু বক্তৃতা করতে উঠে রাগে পা-ঠুকে, টেবিলে ঘুসি মেরে যা বললেন তার সারমর্ম্ম Tooth for tooth and eye for an eye." তারপর আমি ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে বললাম, যদি তোমরা একজোট হতে পার তবে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে এসব অত্যাচারের শেষ করতে আমি প্রস্তুত'। সেই বৃদ্ধের মুখে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, তা আজও আমি ভুলিনি।

তারা চারদিকে "গিরা" চালিয়ে দিল'। সাঁওতাল-দের কোনও দুর্ব্বিপাকের সময় সমবেত হতে হলে ঐ "গিরা" চালনাই তাদের সমবেত হবার সংকেত। গাছের ছাল তুলে নিয়ে চারটে ছালের 'গির' (গিঁট) দিয়ে চারদিকে চালিয়ে দেয়। সেই 'গিরা' গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে ছুটে লোকে পৌছে দেয় এবং মুখে মুখে ব'লে দেয় কোথায় কখন সমবেত হতে হবে। আমি ও আমার সঙ্গীরা সেই বুড়া সাঁওতালের ঘরে থেকে গেলাম। তার-পরদিন প্রায় বার-চোদ্দ হাজার সাঁওতাল ও মাহাত সেখানে একত্রিত হল। সকলেই শিলদা পরগণার সাহেব কোম্পানীর প্রজা। আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লাম,—তোমরা শিলদার অধিবাসীগণ আজ যে ভাবে একত্রিত হয়েছ, যদি এটা বজায় রাখতে পার,' যদি সকলের 'এক-রা' হয়, তবে কোনও ভাবনা নেই। কাল এই বৃদ্ধ যে-সব অত্যাচারের কথা বলেছে তা যদি সত্য হয়, তার কোনটাই আর থাকবে না। কাল থেকে কেউ বিনা পারিশ্রমিকে নায়েবের গরুর চর্য্যা করবে না। রুটী আনতে বললে বলবে মেহনতি পয়সা হাতে দিলে রুটী এনে দোব। মেদিনীপুর থেকে মাদকাবারী জিনিষ আনতে বললে বলবে যে চারদিনের মজুরী দিলে সাহেবের খাবার এনে দোব। বিনামূল্যে ঘি, মুরগী ইত্যাদি দিতে পারব না। তাঁতকর, শালকর, পাতকর, পথকর প্রভৃতি সব বে-আইনি,—কোনও কর কেউ দেবে না। যদি ওতে স্থির থাকতে পার',—সকলে একজোট থাকতে পার' কোনও ভয় নেই। যদি জোর করে কিছু করতে যায়,—আমি তোমাদের পাশে রইলাম।

পরেরদিন সাহেবের বাংলোতে ঝাঁট পড়ল' না, নায়েবের গরু-বাছুর বাইরে বেরুল' না। একটী ঝরণার জল ব'য়ে যাচ্ছিল। সাঁওতালরা আমায় দেখালে যে তার মুখে একটি বাঁধ ছিল, তাতে ঐ জল গ্রামের মধ্য দিয়ে যেত' এবং সেই সব গ্রামে বেশ ফসল হত। কিন্তু, নায়েব তাদের জমি কেড়ে নিয়ে নীল চাষের ব্যবস্থা করবে বলে সাহেবকে যুক্তি দিলে যে বাঁধ কেটে দিলে ঐ সকল গ্রামে ফসল হবে না। ফসল না হলে সাঁওতালরা খাজনা দিতে পারবে না। খাজনার নালিশ করে জমি খাস করে নিতে পারা যাবে। সে যুক্তি সেই কাজ। বাঁধ কেটে দেওয়া হয়েছে তিন বৎসর আগে। গত তিন বছর ঐ গ্রামগুলিতে আদৌ ফসল

হয়নি। কতক কতক বাকী খাজনার নালিশও হয়েছে। আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম যে সাঁওতালদের কথা ঠিক। বললাম—কাল দু-হাজার সাঁওতাল ঝোড়া-কোদাল নিয়ে উপস্থিত হও। আমি নিজে দাঁড়িয়ে বাঁধ বেঁধে দোব।' তারপরদিন। মেয়ে-পুরুষ দু-হাজার সাঁওতাল ঝোড়া-কোদাল নিয়ে হাজির। বেলা বারটার মধ্যে প্রায় ১২।১৩ ফুট উঁচু বাঁধ সেই ঝরণার মুখে বাঁধা হয়ে গেল। সাঁওতালদের সে আনন্দ আমি ভুলতে পারব না। শৈলজানন্দ বরাবর আমার সঙ্গে ছিল। মন্মথ দাস চলে গেছল' আগের দিন। সে বৎসর সেই গ্রামগুলিতে যে ফসল হয়েছিল তাতে বকেয়া খাজনা সব শোধ হয়েছিল।

আরও দু-তিনদিন শিলদাতে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা গিধনিতে শৈলজার বাড়ীতে ফিরে এলাম। শৈলজাকে সমস্ত উপদেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে আমি মেদিনীপুরে এসেছি। হঠাৎ সংবাদ এল'—শিলদার জমিদারী কোম্পানী ফরেষ্ট রেঞ্জার নিহত হ'য়েছেন। শৈলজা লিখে পাঠিয়েছে,—সাঁওতাল বস্তীতে নীল চাষের জন্যে 'বেগার' লোক ধরতে গিয়ে তারা যেতে না চাওয়ায় চাবুক মারে। তাইতে কোন একটি সাঁওতাল কুড়াল ছুঁড়ে মারতেই রেঞ্জারের মাথা ফাটে। কোম্পানীর লোক সেই মৃতদেহ তুলে এনে নীলচাষের জমিতে ফেলে রেখে বীনপুর থানায় নালিশ করেছে যে সাঁওতালরা নীলচাষের জমিতে চড়াও হ'য়ে খুন করেছে। কিন্তু, থানার অফিসার প্রকৃত তথ্যই রিপোর্ট করেছেন। তবে, কে কুড়াল ছুঁড়েছিল তা কারুর কাছ থেকেই জানতে পারেননি তিনি।

পরেরদিন সকালে রায়বাহাদুর শীতলপ্রসাদ ঘোষ—পাবলিক প্রসিকিউটার,—এসে বললেন, কালেক্টর সাহেব আমাকে দেখা করতে ডেকেছেন। তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন,—আপনারা না অহিংস? তবে শিলদায় এ সব কি ব্যাপার?" আমি শৈলজার পত্র দেখালাম। বললাম,—আপনি জেলা-শাসক। আপনি দেখুন কি অত্যাচার ঐ নিরীহ সাঁওতালদের উপর করা হয়।' সেইদিনই তিনি পুলিশ-রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়ে দেখলেন এবং বুঝলেন এর নিরাকরণ দরকার। তিনি কোম্পানীর ম্যানেজারকে শিলদা ছেড়ে চলে আসতে হুকুম দিলেন। ঐ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট Andrew Yule কোম্পানীর বড় সাহেবকেও তলব করলেন। আমাদেরও হাজির হবার নোটিশ দিলেন। শিলদার কাছারীতে মিটিং বসল'। আমরা একের পর এক সাক্ষী এনে প্রমাণ করলাম প্রত্যেকটি অত্যাচার ও অন্যায়ের কথা। কলকাতায় কাঠের ব্যবসায়ী D. J. Cohen সাহেবের খাতা নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করলাম যে গরুর গাড়ী ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তায় চললেও পথকর দিতে হয়। এ্যান্ড্রু ইউলের সাহেব দেখলেন যে পথকর, তাঁতকর, শালকর, পাতাকর প্রভৃতি কিছুই তাঁদের কোম্পানীর খাতায় জমা হয় না। বাঁধ কেটে প্রজাদের জমির খাস করার বিষয়টাও কালেক্টরকে দেখিয়ে দিলাম। সমস্ত প্রমাণ হওয়ায় সেখানকার ম্যানেজার ও নায়েব বরখাস্ত হল'। সাব্যস্ত হল যে প্রতিগ্রামের খাজনা একদিনে আদায় হবে। কংগ্রেসের একজন প্রজাদের তরফে সেখানে থাকবেন। তিনি প্রত্যেকটি দাখিল পরীক্ষা করে দেখে দেবেন। অত্যাচারের নিবৃত্তি হ'ল সাময়িক। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমুরারীপ্রসাদ রায়কে (তখন মাত্র ২০ বছর বয়স) শিলদার কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তা করে বসিয়ে দিলাম। সমস্ত পরগণার অধিবাসীদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। নূতন সাহেব ম্যানেজার কংগ্রেস অফিসের সামনে দিয়ে যাবার সময় টুপি খুলে যেতেন,—এমনই একতার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হল'।

তারপর সাঁওতালরা আমার কথায় অধিকাংশই হেঁড়ে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। এটা আমার জীবনের একটা বড় রকম সফলতা। দু-বছর এইভাবেই চলেছিল। শৈলজানন্দও সেই যে নেশা ভাঙ্ ছেড়ে দিলে আর জীবনে কখনও নেশা করলে না।

বর্ষার সময় আবার ঘাটাল মহকুমায় গেলাম। সেখানেও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিলাতী কাপড় ও মদ খাওয়া বর্জ্জন,—এ দুটো কাজ পুরোদমে করেছিলাম। গ্রামে গ্রামে যেসব কংগ্রেস অফিস হয়েছিল সেখানেই বিলাতী কাপড় জমা হতে লাগল'।

অবশেষে অক্টোবর মাসে শ্যামাপূজা বা দেওয়ালীর দিন ঐ মহকুমার কয়েকটি মদের দোকানে চাবি পড়ল'। এবং যেটুকু মদ মজুত ছিল সেটা বিলাতী কাপড়ে মাখিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়ালী উৎসব করা হল'। আবগারী বিভাগ থেকে দোকানদারদের কাছে মদের হিসাব চাইলে তখন তারা মিথ্যা বিক্রয়ের হিসাব দাখিল করে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দোকান তুলে দিলে। এই অবস্থাও দু বছর চ'লেছিল সেখানে।

সাঁওতালদের একতা বজায় রাখবার জন্যে শৈলজানন্দকে উপদেশ দিতাম আর সে সেইভাবে কাজ করে তাদের মনোবল ঠিক রাখতো। সাঁওতাল মাহাতদের ঐ একতা ও মনোবল ভাঙ্গবার জন্যে প্রথমেই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুরারীপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করল। মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে জেলে পুরে দিলে। তাকে যখন ধরে এনে এ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি সাহেবের কাছে হাজির করলে, পেডি তাকে দেখিয়ে সকলকে বলেছিলেন—এই কুড়ি বছরের ছেলেটার এত তেজ যে জমিদারী কোম্পানীর সাহেবকেও টুপী খুলে সেলাম বাজিয়ে কংগ্রেস অফিসের সামনে দিয়ে যেতে হয়। মুরারী হাসি হাসি মুখে জবাব দিয়েছিল,—আমার তেজে নয় সাহেব,-সাঁওতালদের একতার তেজে। আর সে তেজের উৎস সাতকড়িপতি রায়। যখন মুরারীকে সরিয়ে নিয়েও কিছু হল না, তখন শৈলজাকে গিধনী থেকে সরাবার জন্যে তার বিরুদ্ধে একটা ১০৭ ধারার মকর্দ্দমা রুজু করায় পেডি সাহেব। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোশন করাতে যে রুল জারি হয় তাতে পেডি সাহেব যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন,—শিলদা পরগণায় বৃটিশ সরকারের শাসনযন্ত্র চলে না, সেখানে সাতকড়িপতি রায় বলিয়া একজন নেতার আদেশ অনুসারেই কাজ হয়। আর সেই আদেশ তামিল করিবার জন্য শৈলজানন্দই তাঁর এজেন্ট। সুতরাং শৈলজানন্দকে ওখান থেকে না সরাইলে বৃটিশের শাসন স্থাপন করা যাবে না।" সে কৈফিয়ৎ এখনও হাইকোর্টের মহাফেজখানায় পাওয়া যাবে।

এই ঘটনার ১৪।১৫ বছর পরে যখন আমার দাদা শ্রীকিশোরীপতি রায় ১৯৩৭ সালের বাংলা এ্যাসেমব্লির নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে ঝাড়গ্রামের রাজার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং দাদার পক্ষে প্রচারকার্য্যে আমাকে ঝাড়গ্রামে যেতে হয় তখন গিয়ে দেখলাম ঝাড়গ্রাম-রাজার পক্ষে ছ-মাস পূর্ব্ব থেকে ভোট সংগ্রহের অভিযান চলছে। ঐ মহকুমার সমস্ত ভোটই তিনি পাবেন ব'লে স্থির হয়েছে। কিন্তু, আমি যখন সাঁওতালদের গ্রামে উপস্থিত হ'লাম তখন তারা আর তাদের দেশের রাজার পক্ষে থাকল না। আমার কথায় আমার দাদাকেই সব ভোট দিয়েছিল। ঝাড়গ্রামের রাজা যে কয়টি ভোট পেয়েছিলেন তা সবই সাধারণ হিন্দুদের ভোট, সাঁওতালদের ভোট পাননি একটাও। দাদা অসংখ্য ভোটে রাজাকে পরাস্ত ক'রে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশে।

এবার সাঁওতালদের জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখে এপর্ব্বটা শেষ করি। ১৯০৬ সাল থেকে আমি ওদের সঙ্গে অর্থাৎ শুধু সাঁওতাল নয়, ঐরূপ বন্য জাতির সঙ্গে পরিচিত। সাঁওতাল বল, উঁরাও, মুণ্ডা কোল জাতি বল, ওরা বরাবর যাযাবর জীবনটাকেই ভালবেসে এসেছে। ঘর যে বাঁধেনি তা নয়।

জঙ্গলের মধ্যে কতকটা পরিষ্কার করে কিছু কিছু ফসলও করেছে। কিন্তু, লোভী শিক্ষিত জাতি ছলে-বলে-কৌশলে ওদের সেই জমি থেকে ওদের বঞ্চিত করেছে। ওরা আবার অন্যত্র জঙ্গল সাফ করেছে। হেঁড়ে খেয়ে পশু-পক্ষীর মাংস খেয়ে নেচে-গেয়ে জীবন-যাপন করার চেষ্টাই করেছে। ক্রমশঃ তথাকথিত সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে তাদের স্বভাব ক্রমশঃ অনুকরণ ক'রেছে।

কাঁড়-বাঁশ ধনুর্ব্বিদ্যায় ওরা বেশ পটু ছিল। ওদের বিবাহের পূর্ব্বে একনিষ্ঠতার বিশেষ চিহ্ন থাকে না। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের নিকট অবিশ্বাসী হয় না। ওরা কর্ম্মঠ দেহ ধারণ করলেও সাধারণতঃ অলস প্রকৃতির,—বিশেষ করে পুরুষরা। সরল এবং বিশ্বাসঘাতক নয়। যে ওদের একটু স্নেহ করে, ওরা তার গোলাম হয়ে যায়। কিন্তু খৃষ্টান পাদরীরা ওদের "অন্ধকার থেকে আলোকে

এদের সভ্যতার সব রকম অসৎগুণগুলি শিখিয়েছে। মিথ্যাবলা, ঠকানোর চেষ্টা ইত্যাদি ওরা 'আলোকপ্রাপ্ত' হয়েই শিখতে আরম্ভ করেছে। তার পূর্ব্বে ওরা নিজেরা পদে পদে ঠকেছে কিন্তু ঠকায়নি। আজ যে সব সাঁওতাল রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে তারা ত' প্রত্যেকেই খৃষ্টান। আমি ১৯০৬ সালে এবং ১৯২০-১৯২৩ সালে ওদের সরলতা দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

জমিদারী কোম্পানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, ওদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়ায়ে যোগ দিয়ে আমি সেই অত্যাচার নিবারিত করেছিলাম বলে সাঁওতালরা সবাই মিলে ১৯২২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আমাকে যে অভিনন্দনে অভিনন্দিত করেছিল তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।—

শ্রীসাতকড়িপতি রায় মহাশয়—

করকমলেষু—

হে প্রিয়,—

তুমিই সর্ব্বপ্রথম অত্যাচারপীড়িত শিলদা পরগণার দরিদ্র সাঁওতাল মাহাতদের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলে অতএব হে বন্ধু, আমরা তোমাকে অভিনন্দন করি।

আমরা এতদিন বন্যপশু বলিয়া পরিগণিত হইতাম, তুমি আমাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমাদিগকে নিজেকে চিনিবার ও জানিবার পথ বুঝাইয়া দিয়াছ। জগতে আমাদিগকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছ, আমাদিগকে মানুষ বলিয়াছ; অতএব হে সুন্দর, আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

অত্যাচারে যখন আমরা হাহাকার করিতেছিলাম, যখন সকলেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছিল, তখন তুমিই দীন দরিদ্র আমাদিগকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে,— অতএব হে অগ্রজ, তোমাকে অভিনন্দন করি।

তুমি ত্যাগী, তুমি সাধু, তুমি দরিদ্রের বন্ধু,—তুমি চিরজীবি হও, তোমার জয় হউক।-

ইতি-

তোমার দরিদ্র স্বদেশবাসী—

শিলদা পরগণার মাহাত ও সাঁওতাল।

অধিবাসিবৃন্দ

(২২)

ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে যে জাতীয় সংগ্রাম ১৯২১ সাল থেকে সুরু, তাতে আমি যোগ দিয়ে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম তাঁদের কথা কিছু কিছু বলব।

প্রথম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কথাই বলা উচিত। সে কথা আমি একটি পৃথক প্রবন্ধে—"দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বৎসর"—বলে লিখেছি এবং সেই প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের "প্রণব" মাসিক পত্রিকায় বেরুচ্ছে।—সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু লিখব না।

এখানে অমি মহাত্মা গান্ধীর কথা কিছু লিখি। আমি তাঁর সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েই ঐ ১৯২১ সালের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। মহাত্মাজীর সঙ্গে প্রথম মিশবার সৌভাগ্য হয় যখন তিনি ১৯২১ সালে মেদিনীপুরে যান। কারণ তিনি আমাদের বাড়ীতেই অবস্থান করেছিলেন। প্রথমতঃ তাঁর জন্যে ছাগলের দুধ চাই দুবেলাই। গ্রীষ্মকাল। এ-বেলার দুধ ওবেলা থাকবে না। তাই সকালে যে দুধ পাওয়া গেল তার অর্দ্ধেকটা ক্ষীর করে ফেলতাম। বৈকালে দুধ পাওয়া যাবে না। ঐ ক্ষীর জল দিয়ে গরম করলে দুধ হবে। যখন সন্ধ্যায় ঐ ক্ষীরে জল দিয়ে গরম করে গান্ধীজীকে দিলাম, তিনি ক্ষীরের গন্ধ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্যাপার কি? তাঁকে বললাম,—মেদিনীপুরে বৈকালে ছাগলের দুধ পাওয়া যাবে না, তাই সকালের দুধ ক্ষীর করে রেখেছিলাম, নৈলে এই গরমে দুধ নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসচ্ছলে তারিফ করলেন এবং সেই দুধ গ্রহণ করলেন। এইভাবেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। পরদিন সকালে বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের কাছে নিয়ে গেলাম। দাদার স্ত্রী ছিলেন। গান্ধীজী হিন্দিতে বললেন দেশের কাজে গায়ের গহনা দিতে হবে। আমি বাংলায় ওঁদের বুঝিয়ে দিলাম। তাঁরা গহনা খুলে আমার হাতে দিলেন, আমি গান্ধীজীকে দিলাম। আমার জিজ্ঞাসা

করলেন আমি কি করতাম আগে। বললাম হাইকোর্টে ওকালতি করতাম। সেই সময় দেশবন্ধু সেখানে এসে বললেন যে আমার কি রকম প্র্যাক্‌টিস ছিল এবং সে সব ছেড়ে এসেছি এই কাজে, আর মেদিনীপুরে কংগ্রেস গড়ার ভার নিয়েছি। তাছাড়া বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সহ-সম্পাদক। আমি দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন,—এ বাড়ী আপনাদের? দাদা বললেন—হ্যাঁ। অমনি তাঁর রসিকতার ভঙ্গীতে বললেন,—এটাও তবে দিয়ে দিন। দাদা বললেন, এখানেই ত' মেদিনীপুর জেলার কংগ্রেস অফিস,—এটাত' কংগ্রেসেরই। খুব খুসী গান্ধীজী। এই সামান্য কয়েকটা কথাবার্ত্তাতেই আমার মনে হয়েছিল এঁরা Born leader।

এরপর তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন তার মধ্যে বহুসময় খুব ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গভাবে মিশবার, কথা বলার, আলোচনা করবার এবং সর্ব্বোপরি সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দেখেছি তাঁর নেতৃত্বে "খাদ্" ছিল না। যেটা তিনি নিজের জীবনে করেননি সেটা কাউকে করবার জন্যে উপদেশ দেননি কখনও।—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাও"—এর একটি যেন প্রধান দৃষ্টান্ত।

তাঁর সদা হাস্য-রসিক ভাব সর্ব্বসময়েই জীবন্ত, প্রাণবন্ত করে রেখেছিল। কংগ্রেস নেতা বলুন, অথবা দেশের নেতা বলুন,—এতবড় ভগবদ্বিশ্বাসী আর কেউ ছিলেন না। "সত্য"-কে তিনি যে ভাবে জীবনে আঁকড়ে ধরেছিলেন তেমনটি রাজনীতি ক্ষেত্রে আর কোথাও দেখিনি। এই দুটি মহৎগুণের জন্যে ভারতের অধিবাসা-দের অধিনায়কত্ব করা তাঁর পক্ষে খুব সহজ হয়েছিল। একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে বলতে শুনেছি,—"যে সকল মহাপুরুষ ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, যাঁদের আদর্শ ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে তাঁরা বেঁচে থেকে সে প্রসিদ্ধি পাননি। তাঁদের জীবনান্তের পরে তাঁদের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে বেশী। কিন্তু গান্ধীজী বেঁচে থেকেই যে লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়ে গেলেন।"—মহাত্মা সত্যের পূজারী ছিলেন—তাই মানুষ হিসাবে তিনি আদর্শ মানুষ। তাঁর জীবনের আর একটি মহৎগুণ তাঁর ঐকান্তিকী নিষ্ঠা। যে জিনিষ তিনি গ্রহণ করতেন সেটা বহু-বিবেচনার পর গ্রহণ করতেন। আর একবার গ্রহণ করলে সেটা কোনও দিন ত্যাগ করতেন না বা তা থেকে সরে যেতেন না। ইংরাজীতে একে tenacity বলতে পারেন। আমি বাংলায় তাকেই নিষ্ঠা বললাম। এই নিষ্ঠার একটি বড় উদাহরণ খদ্দরের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকী নিষ্ঠা।—

যখন খদ্দরের কথা উঠল' তখন খদ্দর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করি। ১৯০২ সালে আমরা বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করেছিলাম। প্রথম বোম্বাই মিলের মোটা কাপড় পরতাম। তারপর ক্রমশঃ বহু মিল হোল এবং পাত্‌লা কাপড়ও হতে লাগল'। আমরা মিলের ও তাঁতের কাপড় পরে আসছিলাম। গান্ধীজীই প্রথমে বললেন—মিলওয়ালারা বিলাতী সূতা এনে কাপড় তৈরী করছে। যদিও ভারতে দু-চারটে সুতার কল হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ সূতা বিলাত থেকে আসে। আর তাঁতের সূতা সবই বিলাতী। আমাদের হুঁস হল। সত্যই যদি বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করতে হয় তবে বিলাতী সুতাও বর্জ্জন করতে হয়। আমরাও চরকা করে সুতা কাটতে সুরু করলাম। আমার ছোটভাই উৎকৃষ্ট সুতা কাটত' এবং তার হাতে-কাটা-সুতার কাপড় বুনিয়ে দেশবন্ধুকে আমি প্রথম খদ্দর পরিয়ে-ছিলাম। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে আমার মতের অমিল হয় খদ্দরকে বাজারের পণ্য করা নিয়ে। আমি বলে-ছিলাম খদ্দর বাজারের পণ্য হলে মিলের কাপড়ের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। বিদেশী বণিক কাপড় যুগিয়ে আমাদের অর্থ-শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, যদি খদ্দর পরি তবে সেই অর্থ আমাদের দেশে থাকবে এবং আমাদের দেশের দরিদ্র সংসারে সুতা কেটে কাপড় বুনে দুমুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারবে,—অতএব দামে মাগ্‌গি হলেও খদ্দর পরতে হবে,—এই দেশভক্তি ও দরিদ্রের সেবার মনোভাবের উৎকর্ষ সাধন করে সাধারণ দেশবাসীকে খদ্দর পরাতেই হবে,-এই হল মহাত্মার সিদ্ধান্ত। আমি বলেছিলাম এতে মানুষের যে ত্যাগের প্রয়োজন সে মনোভাব দেশে গড়ে' তোলা শক্ত,—আর তা সম্ভব হলেও বেশীদিন থাকবে না। কিন্তু যদি আত্ম-

নির্ভরতার কথা বলা যায় অর্থাৎ বলা হয় যে,—যেমন আমরা আমাদের আহার্য্যদ্রব্য বাড়ীতে প্রস্তুত করি তেমনি যদি বস্ত্রও বাড়ীতে প্রস্তুত করি তাতে যে কেবল আত্ম-নির্ভরতাই হবে তা নয়,—বাড়ীতে অন্ন প্রস্তুত করলে সেটা যেমন বিশুদ্ধ ও রুচিকর হয়—তেমনি বাড়ীতে বস্ত্র প্রস্তুত করলেও তার একটা বিশুদ্ধতা ও মূল্যবোধ থাকবে। অথচ প্রতিযোগিতায় নামতে হবে না কলের কাপড়ের সঙ্গে। এই মনোভাব গড়ে তুলবার চেষ্টা করলে সহরে না হলেও পল্লীগ্রামে হয়ত সফলতা লাভ করা যেতে পারে। গান্ধীজী বল্লেন,—আমরা নিজেরা দৃষ্টান্ত দিয়ে ও বক্তৃতা করে দেশবাসীকে বোঝাতে পারব'। তিনি ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪৮ সালে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত কেবল যে দৃষ্টান্ত দ্বারা ও বক্তৃতা দ্বারা চেষ্টা করেছেন তা নয়, যে সব খাদি উৎপাদন কেন্দ্র গড়েছিলেন তাদের যতদূর সম্ভব অর্থ সাহায্য করেছেন কিন্তু প্রতিযোগিতায় খদ্দর আজও দাঁড়াতে পারেনি। কংগ্রেসের সভ্যদের 'মিটিং-কা কাপড়া' এবং কিছুসংখ্যক দেশসেবক ও নেতার অবশ্য পরিধেয় হয়েছে। আমি যেভাবে প্রচার করতে চেয়েছিলাম তাতে পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা একবার আত্মনির্ভরতার স্বাদ পেলে, তুলা প্রস্তুত থেকে কাপড় বোনা পর্য্যন্ত সবই করতে অভ্যস্ত হোত'। কারণ অর্থনৈতিক ভাবেও তারা লাভবান হত। যা হয়নি তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরাও আবার বিদেশী বস্ত্রে অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করছেন, ভুলে গেছেন যে প্রতিজ্ঞা তাঁরা মহাত্মার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন,—তাঁর দেহান্তের পর সেটা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হতে হতে সম্পূর্ণ উপে গেছে।

সত্যের প্রতি ও খদ্দরের প্রতি মহাত্মা গান্ধী যে-নিষ্ঠা জীবনে দেখিয়ে গেছেন রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহা রক্ষা করতে পারেন নি। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মার যে চরিত্র তাঁর 'ডিস্কভারী অফ্ ইণ্ডিয়া' পুস্তকে এঁকেছেন সেটা ঠিক্ বলে আমার মনে হয়েছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা যে সংকল্প একবার গ্রহণ করতেন তাতে কিছুদিন অটুট থাকতেন কিন্তু যখন দেখতেন বিরুদ্ধমত প্রবল হয়েছে তখন সংকল্প পরিত্যাগ করতেন। ইহাই নেহেরুজীর অঙ্কিত চিত্র এবং আমার মনে হয় সেটা ঠিক।

মেদিনীপুরের পর তাঁর সঙ্গে বিশেষ ভাবে দেখা হয়—'চৌরিচৌরার' ঘটনার পরে। তিনি ডিক্‌টেটার হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেসের সভা আহ্বান করলেন তাঁর ঐ আদেশ অনুমোদন করাবার জন্যে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি সেখানে বাংলার নেতৃত্ব নিয়ে গেলাম। আমরা, পাঞ্জাব এবং মাহারাষ্ট্র ছাড়া আর সকলে মহাত্মার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল এবং ঐ সভায় মহাত্মার প্রস্তাবই গৃহীত হয়েছিল। এখানে আমাকে মহাত্মার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচুর বাদানুবাদ করতে হয়।

এরপর তাঁর সঙ্গে বিশেষভাবে মিশতে হয়েছিল ১৯২৫ সালে যখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বাংলা ভ্রমণে আসেন। জেলায় জেলায় তাঁর সঙ্গে যেতে হয়েছিল আমাকে। তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা দিলে পূর্ব্ববঙ্গের শ্রোতাগণ বুঝতে না-পারায় আমাকে বাংলাতে তর্জ্জমা করতে হত। সেই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জ্জিলিংএ দেহরক্ষা করেন। ঐ অবস্থায় মহাত্মাজীর চিত্তের সমতা রক্ষা করার ক্ষমতা দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে তিনি শাস্ত্রে যাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে তাই ছিলেন। দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা,—সুখে বিগতস্পৃহ।-

১৯২৫শের ডিসেম্বরে কানপুর কংগ্রেসে কানপুরে আমার আত্মীয় স্ত্রীলোকদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলে তিনি তাঁদের মিহি তাঁতের কাপড় দেখে বলেছিলেন—সাতকড়িবাবু এদের খদ্দর পরান'। আমি বলেছিলাম-আপনি পারেন ত' পরান খদ্দর এদের। আমার কৌশল ত' আপনি গ্রহণ করেননি। তিনি তখন তাদের দেশভক্তি ও দরিদ্রের সেবার জন্যে খদ্দর পরবার উপদেশ দিলেন। সেটা মাঠেই মারা গেল।

যখন কলকাতায় ১৯২৮ সালে মতিলালজীকে সভাপতি করে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তখন মহাত্মা সোদপুরে খাদিপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। একদিন রাজেন্দ্রপ্রসাদ-বাবু ও আমি সোদপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে

খাদি প্রতিষ্ঠানের কাটুনীদের দেখিয়ে বলেছিলেন যে তারা সব ত' বিলাতী কাপড় পরে আছে। মহাত্মাজী তাঁর স্বাভাবিক হাস্যরসের সঙ্গে বলেছিলেন—ওরা ওসব কাপড় পরিত্যাগ করবে। জানিনা তারা সে উপদেশ গ্রহণ করেছিল কিনা।

তাঁর বিখ্যাত ডাণ্ডি-মার্চে আমি দুদিন যোগ দিয়েছিলাম। তাঁর ঐ পদচারণাকালে কৃচ্ছ্রসাধন দেখেছি। সে এক অপূর্ব্ব জিনিষ। স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নেতার কোনও বিষয়ে এতটুকু পার্থক্য ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে 'সিডিউল কাষ্ট' বলে যে পৃথক সংজ্ঞার সৃষ্টি করা হল তার জন্যে পুনা জেলে তাঁর অনশনের সময়ও ছুটে পুনায় গিয়েছিলাম। সকল মানুষের হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করবার জন্যে তাঁর যে অকৃত্রিম চেষ্টা তা দেখেছি আমি। তারপরই হরিজন সেবক সঙ্ঘ গড়ে তুললেন। সে সময়ও আমি বলেছিলাম যে অন্য চেষ্টা করে ওদের (হরিজনদের) লিখতে পড়তে শেখান, তাহলে ওরা ক্রমশঃ নিজেদের অধিকার বুঝে নেবে। কিন্তু, তিনি সে কথা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন—লেখাপড়া ত' শেখাতেই হবে কিন্তু এখনি ওদের জাতে তুলতে হবে। অর্থাৎ ওদের সঙ্গে খেতে হবে, বসতে হবে।" তাদের (হরিজনদের) নিজেদের মধ্যেই যে কত বিভাগ ছিল সেটা বিবেচনা করেননি। বাংলায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি ও আমাকে সম্পাদক করে "বাংলা প্রাদেশিক হরিজন সেবক সঙ্ঘ" গঠিত হল। সুতরাং এ-বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি। কালিঘাটে যে মেথর-পল্লী ছিল (হাজরা বস্তীতে) তাদের মধ্যে সর্দ্দার গোছের কয়েকজনকে গঙ্গাস্নান করিয়ে কালীমাতার দর্শন ও অঞ্জলী দিবার জন্য নিয়ে গেলাম। মন্দিরের কাছ পর্য্যন্ত গিয়ে সকলে আমার পায়ে পড়ে গেল এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললে—বাবু, আমরা মন্দিরে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। আমাদের ছেড়ে দিন। সুতরাং ছেড়ে দিতে হল। যশোহর জেলের মুচিদের 'ঋষি' বলত'। তাদের একটা সভা হল। সেখানে তাদের স্পৃষ্ট জল সেখানকার এক উৎসাহী ব্রাহ্মণ গ্রহণ করলেন। পরেরদিন প্রাতে সেই ব্রাহ্মণ তাঁর এক নমশূদ্র প্রজার বাড়ী খাজনা আনতে গেছেন। প্রজাটি বাড়ী ছিল না। তার বাড়ীর চালার নীচে একটি মাদুর পাতা ছিল তার উপর তিনি বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর সেই নমশূদ্র প্রজাটি এসে তাঁকে সেই মাদুরে বসে থাকতে দেখে খুব গরম হয়ে বললেন,—"ঠাকুর, কাল তুমি মুচির হাতে জল খেয়েছ, আজ আমার মাদুর ছুঁলে? আমাকে আবার ওটা কেচে আনতে হবে স্নানের সময়।" পূর্ব্ববঙ্গে একস্থানে হরিজন সেবক সমিতি গঠন করতে গেছি। সেখানে ষ্টীমার ধরে না। নৌকা করে গিয়ে ষ্টীমারে উঠতে হয়। আমি একটি মাহিষ্যের নৌকায় বসে আছি। আর একটি লোক এল। মাঝি এসে তাকে বললে যে তাকে ঐ নৌকায় নিয়ে যেতে পারবে না। সে নেবে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ওকে নামিয়ে দিলে কেন? মাঝি বললে—ওযে নমশূদ্র, ও আমার নৌকায় কি করে যাবে? আমি মাহিষ্য। আমি আবাক হলাম। তারপর বললাম, আমিও যদি নমশূদ্র হই। সে বলল,—আপনার পৈতা আছে তা কি আমি দেখিনি? তখন বললাম, আমি পাঁচ টাকা দোব, ওকে তুলে নাও, নৈলে আমিও যাব না। সে নেবে গিয়ে কি পরামর্শ করে তাকে নৌকাতে তুলে নিলে। পাঁচটা টাকার লোভ সামলাতে পারলে না। তখন আমি হেসে বললাম,—এখন নিলে যে? সে উত্তর দিলে—বাবু, ওর জাত ত' জিজ্ঞাসা করিনি। ধরে নিলাম ও লোকটা সৎ-জাত। পাঁচ টাকা কি ছাড়তে পারি? এই সব অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। দিল্লীতে মহাত্মার সঙ্গে দেখা হতে এসব কথা তাঁকে বলেছিলাম। তিনি বিস্মিতই হয়েছিলেন। সমাজের এইসব জঞ্জাল খুব সহজে যেতে চায় না। বহু আয়াসে একটু একটু চলে যাচ্ছে।

১৯৪৭ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী বেলেঘাটায় মুসলমানের বাড়ীতে উঠে সহীদ সরওয়ার্দ্দিকে আঁচল ঢাকা দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তখন আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। অবিচলিত মানুষের এক প্রতিমূর্ত্তি। তাই ভাবছিলাম,—তাঁকে এক আদর্শ মানুষ বলা যায়। রাজনীতি তাঁর স্থান নয়। সেখানে নির্ম্মম হতে হবে,- সেখানের রূপ অন্য রকম।-

মহাত্মাজীকে জীবন দিতে হয়েছিল কারণ একদল

লোক তাঁর মুসলমান-প্রীতি মাত্রা ছাড়িয়েছে মনে করেছিল, এবং তিনি অহিংস-নীতি চালু করতে গিয়ে মানুষের সাহসিকতা নষ্ট করে দিয়েছেন বলে মনে করেছিল। আমি তাঁকে যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়নি যে তিনি হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানকে বেশী প্রীতির চক্ষে দেখতেন এবং অহিংসনীতি দ্বারা মানুষকে সাহসিকতা শূন্য করছিলেন। তাঁর অহিংসনীতি সবলের অহিংসতা,—দুর্ব্বলের নয়। আর মুসলমান প্রেম নয় মুসলমানের সহযোগিতাই তাঁর কাম্য ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি পরমহংসদেবের ন্যায় বিশ্বাস করতেন সব ধর্ম্মের মধ্যে দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়। নিজে তিনি ধার্ম্মিক হিন্দু ছিলেন। ইহাই আমার বিশ্বাস।

যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ রেডিওতে শুনলাম, আমি মুহ্যমান হয়ে গেছ্‌লাম। তাঁর বহু পত্রে তাঁর বহু মূল্যবান উপদেশ পেয়েছিলাম এবং সে উপদেশ অনুসরণ করে জীবনে বহু উপকার হয়েছে।

বাংলা ছাড়া অন্য প্রদেশের আর যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে সক্ষম হয়েছিলাম তার মধ্যে মতিলাল নেহেরুজী প্রধান। তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম সবল বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অথচ যুক্তিবাদী চরিত্র। প্রথম পরিচিত হলাম চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠা কন্যা বেবীর বিবাহ রাত্রিতে। সে সময় সিভিল ডিস্‌ওবিডিএন্‌স্ কমিটির সভ্যরা বাংলার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে এসেছেন। মতিলাল নেহেরু তারই একজন মেম্বার। সকলেই নিমন্ত্রিত দেশবন্ধুর বাড়ীতে বিবাহের রাত্রে। চারহাজার নিমন্ত্রিতের খাওয়ানোর ভার ছিল আমার উপর। সে কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হল রাত বারটার মধ্যে। শ্রাবণ মাস,-বর্ষাকাল। রাত্রি একটা নাগাদ ঐ কমিটির সভ্যবৃন্দ ও দেশবন্ধুর নিকটবন্ধুরা খেতে বসেছেন। আমার ডাক পড়ল। উপস্থিত হতে দেশবন্ধু পরিচয় করিয়ে দিলেন,—ইনি এখন বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারী, আর আজ রাত্রে যে চারহাজার নিমন্ত্রিত সুশৃঙ্খলায় খেয়ে গেলেন সেই কার্য্য ইনিই করেছেন। মতিলালজী তাঁর কাছে ডাকলেন এবং অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। যেমন দেশবন্ধু তেমনি মতিলালজী। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পূর্ণ সংমিশ্রণ। তারপর দেখা হল গয়া কংগ্রেসে। ইতিমধ্যে তিনি civil disobedience কমিটির রিপোর্টে তাঁর বলিষ্ঠ মতামত দিয়েছেন। সেটা পড়লে বোঝা যায় তিনি কিরূপ চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী।—

ক্রমশঃ

প্রোষিত-ভর্তৃকা

—সুনীতি দেবী

বৌদি ডাকেন—শুনছ ঠাকুরঝি,
আঁধার ঘরে একলা করছ কি ?
ওমা, তুমি পড়েই আছ শুয়ে,
গদিতে নয়, মাদুরে নয়, ভুঁয়ে।
দেখছ না যে পড়ে এল বেলা,
নিজের 'পরে এতই কেন হেলা ?
আমাদেরও স্বামী বিদেশ যায়
আমরা তখন করি কি হায়, হায় ?

ননদিনী ঠোঁট ফুলিয়ে বলে—
দাদা ত আর যায়না সাগর জলে।
দুদিন 'টুরে' গিয়েই আসে ফিরে
ফুটিয়ে তোলে মুখের হাসিটিরে।
আমার চিঠি হপ্তা গুণে আসে,
বলতে গিয়ে চোখের জলে ভাসে।
বৌদি বলেন—কাব্যি বুঝি নাকো,
চা জুড়োবে, বসেই যদি থাকো।
চায়ের নামে একটু সজাগ হলেন বিরহিনী,
চোখের জলই গুলে নিলেন, না মিশিয়ে চিনি !

মহামরণের ছায়ায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ক্রসের ছায়ায় নতজানু আমি নিবেদন করি আমার প্রণাম
তোমার রক্তমাখা দুটী চরণতলে !
শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে আমার মন চলে গেছে।
গেৎসেমানির উদ্যানে !
মহাবেদনায় ভারাক্রান্ত তোমার হৃদয় ! আবেগভরা কণ্ঠে
প্রার্থনা করছো তুমি,
"আমার অধর হ'তে মৃত্যু-ভরা এ পান-পাত্র তুমি
সরিয়ে নিতে পারোনা পিতা ?"
নিজের ভিতরের রক্ত-মাংসের মানুষটা নিজেরই বিরুদ্ধে
ঘোষণা করেছে সংগ্রাম !
মেষশিশু দূর হতে পায় কষাইখানার গন্ধ।
মৃত্যুর মুখে আগিয়ে যেতে তাই সে কি জড়োসড়ো ?
ঈশ্বর, তুমি কোথায় ? জীবনের এই দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তে
তোমরা কেন ঘুমিয়ে রইলে বন্ধুরা ?
মুহূর্ত্তে পতনোন্মুখ নিজেকে ধ'রে ফেললে তুমি !
জীবনকে বাঁচাতে হ'লে হারাতেই হবে জীবনকে !
মানুষ হ'য়ে তুমি এলে পৃথিবীতে মানবতাকে দেবতা হওয়ার
পথ দেখাতে !
যে-মুহূর্ত্তে মাংসের দৌর্ব্বল্যকে জয় করলে তুমি, মৃত্যুকে
তুমি ঠেলে দিলে মৃত্যুর গহ্বরে,
দিগন্তে মিলিয়ে গেল কবরের বিভীষিকা,
কাঁটার মুকুট রূপান্তরিত হোলো অনন্ত প্রাণের পতাকাবাহী
বিজয়ী বীরের জয়-মুকুটে।
মহা প্রেমিকের দুঃখ বরণ রাতের গর্ভ থেকে উন্মেষিত করলো
একটা নবতর তরুণী পৃথিবী। চোখে তার ঊষার দীপ্তি !
যে-পথে তুমি ডাক দিলে আমাদের ঘুমন্ত আত্মাকে সে পথ
সত্বার অণু-পরমাণু দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসার পথ !
ধর্ম্মের সেই পথ জীবন্ত দিব্যানুভূতির শিখরে যাওয়ার
বন্ধুর পিচ্ছিল শৈলপথ !

তুমি আমাদিগকে ডাক দিয়েছিলে এক বিপুল সাধনার
দুর্গম পথে !
সেই সাধনা আত্মকেন্দ্রিক জীবনের মৃত্যুজাল থেকে প্রেমের
রাজ্যে নবজন্মের শবসাধনা !

ভদ্র আচারে অনুষ্ঠানে খচিত একটা আরামের জীবনকে
ধর্ম্মজীবন বলতে রাজী হ'লে না তুমি !
তোমার আগ্নেয় চিন্তাধারায় চোখ-ঝলসানো অরুণ দীপ্তি
সইতে পারলো না বাদুড়-চোখো জড়বাদী পুরুত-পাণ্ডারা ।

মানব-ইতিহাসের সেই এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত্ত !
বিচারক পন্‌টিয়াস পাইলেট্, আসামী যীশু !
দুটি স্বতন্ত্র জগৎ সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে ; প্রাণের বিনি-
ময়েও কেউ কারও প্রাধান্য মানতে প্রস্তুত নয় ।
বাস্তবের পূজারী রোমানের কাছে সত্য কীর্ত্তি আর রাষ্ট্রের
মর্য্যাদা, যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাত, ক্ষমতার অহঙ্কার,
অবিনাশী শাশ্বত সত্যের পূজারী তুমি এই সমস্ত কিছুকেই
ভাবতে ক্ষণিকের জলবুদ্বুদ !

বিশ্বাস তো একটা সংগ্রাম প্রভু । প্রেমের মতো কঠিনতম
সংগ্রাম কি আছে পৃথিবীতে !
প্রেমের সত্য পরিচয় কি চটুল রসনায় আর বাক্যের জৌলুসে ?
দেবোনা ভালবাসার নিত্য পরিচয় আর্ত্তের সেবায় ?
কঠিন ত্যাগে ? আনন্দিত আত্মোৎসর্গের সোনালি সাফল্যে ?
তোমার ক্রস নিয়ে দাঁড়াবো না ঐ বর্ণবৈষম্যের মহাপাপের
সম্মুখে ? খুঁজবো না তোমাকে লাঞ্ছিত নরদেবতার
বেদনার মধ্যে ?
তোমার মধ্যে কি আমরা চেয়েছিলাম সান্ত্বনা, সুখ, আরাম ?
ক্রস্‌কে কি ভেবেছিলাম আমার বিলাসের সামগ্রী ?
ধর্ম্মজীবন দুঃখ থেকে দুঃখের শিখরে একটা ভয়াবহ
অভিযান, এ কথা ভুলতে দিও না প্রভু ।
আজ তোমার ক্রসের ছায়ায় আমাদিগকে মৃত্যুমন্ত্রে দাও দীক্ষা !

ভিক্টোরিয়া

রেবা ভবানী

একবছর ধরে ওকে দেখছি।
ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, বহুবার
মাড়িয়ে গেছি ওর আঙিনা।
দু'হাতের অসীম ভাল লাগায় ওর ঘাস-
মাটি, সিঁড়ি-ঘর স্পর্শ করেছি;
ওর বিস্তীর্ণ জলরাশির আয়নায়
মুখ দেখেছি নিজের। পাশে ভেসে উঠেছে
নিকষ কালো ব্রঞ্জের মূর্ত্তিটার ছবি।
দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে উঠেছি—
অকারণেই মন উঠেছে দুলে।
ওকে ভাল লেগেছে।
ওর ফুটো ছাত দিয়ে জল ঝরে পড়েছে,
লোকে বলেছে—ওর বাইরেই যা ঠাট।
নয়তো ভেতরটা একেবারে ঝরঝরে।
অতবড় নিরালা মাঠের বিস্তীর্ণ
তৃণভূমি না থাকলে কে যেত ওখানে?
মানুষের ব্যাপারী ব্যস্ততা ভাল লাগেনি,
শুনে কষ্ট হয়েছে; দুচোখ ভরে উঠেছে
অজানা ব্যথায়।
আজ বহুদিন পরে প্রয়োজনের
সীমানা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের জানালায়
একা দাঁড়িয়ে দেখছি ওকে। স্পর্শের
মালিন্য গেছে মিলিয়ে, তাকিয়ে থাকার
দায়ও হয়েছে শেষ। আজ মনে হয়
ওকে ভাল—বেসেছি—যে ভালবাসা
প্রয়োজনের অনেক উর্দ্ধে, শেষদিবসের
আলোর মত, সোনা দিয়ে রাঙানো।

বৎসর এলো বসন্তে

Robert Browning The Year's at the Spring. 1812-1889

অনুবাদক— যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বৎসর এলো বসন্তে,
দিনটা হোলো ভোরেতে ;
ভোরটার এখন সাতটা,
পাহাড়ের গায় শিশিরবিন্দু মুক্তার মতো লাগে ;
উড়ছে তরু অনন্তে
উঠছে শামুক তরুতে
ঈশ্বর আছেন স্বর্গে—
পৃথিবীর সব চলছে ঠিকই তাঁহার অনুরাগে !

খণ্ডিতা

—সুনীতি দেবী

'লিপষ্টিক' লাগা 'কলারে'তে
বোতামে জড়ান দীর্ঘ চুল !
এও লেখে ছিল কপালেতে !
নয় ত এ নয়নের ভুল ?
এ রং দিই না আমি ঠোঁটে,
আমার চুল ত ছোট বব,—
ভুল আমি করিনি মোটে,—
নিঠুর করিতে পারে সব।
কি করে তাকাব তার দিকে ?
কি করে বসব কাছাকাছি ?
জীবনের রং হোল ফিকে,—
এখন মরণ হলে বাঁচি।

যাত্রী

প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

শ্মশান থেকে ফিরে এসেই দীনবন্ধু যে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েছিল; সমস্ত দিনের ভিতর সে উঠলও না কোন সাড়া শব্দও দিল না। দীনবন্ধুর এরূপ ভাবান্তর পূর্ব্বে কেউ দেখেনি। মা বাবার দেওয়া নামের মর্য্যাদা তো সে হামেশাই দিয়ে থাকে। কোথাও কার অসুখ হল, কে মারা গেল, কার ঘরে হাঁড়ি চড়ছে না! অফিস থেকে ফিরেই তার এই সব সন্ধান করতে ও ব্যবস্থা করতে বহু সময় কেটে যায়। অবস্থাগতিকে মাঝে মাঝে সমস্ত রাতও কাটে। কাল ও পাড়ার বুড়ো সেন মহাশয়ের শব কাঁধে নিয়ে রাত দশটায় রওনা হয়েছিল, ভোরবেলা ফিরেই বিছানায় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘুমায় নি বোঝা যাচ্ছে, তবু কেউ ডাকতে ভরসা পাচ্ছে না। কিছু একটা ঘটেছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কি তা কেউ বলতে পারছে না। অফিসে যাওয়া সে সহজে বাদ দেয় না। তাও গেল না। বৃদ্ধ বাবা ছেলেকে এরূপ অভিভূত হতে দেখে অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষে সেন মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে ব্যাপারটি জানবার চেষ্টা করলেন, কেউ কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, পাশে আর একটি শবদাহ হচ্ছিল, তাদের খুব সাহায্য করছিলেন, এমনকি মুখাগ্নিও উনি করে দিলেন। তারপর থেকেই হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসে ছিলেন, কাউকে কোন কথাই বলেন নি। শরীরই বোধহয় খারাপ হয়েছে।

বাবা ও-বাড়ী থেকে এটুকু জেনে চিন্তিত মনে আস্তে আস্তে বাড়ীতে এসে ছেলের পাশে বসে মাথায় হাত রাখলেন। দীনবন্ধু বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ফেটে পড়ল। "বাবা, মাকে দাহ করে এলাম" বলে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ভাই, বোন বৌয়েরা সব ছুটে এল কি ব্যাপার! সকলেই এ ওর মুখের দিকে চাইছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। বাবা শান্ত, সংযত পুরুষ। ছেলের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, তাকে কাঁদতে বাধা দিলেন না। কোন কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। চোখে মুখে প্রশ্নোদ্দীপক ভাব ফুটে রইল। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে দীনবন্ধু কিছুটা শান্ত হয়ে উঠে বসে বলতে লাগল। "আজ শ্মশানে গিয়ে আমাদের করণীয় কাজ আরম্ভ করে একটু দূরে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, জন চারেক লোক একটি মৃতদেহ মাদুরে জড়িয়ে বেঁধে নিয়ে এসে নামাল এবং খুব হাঁপাতে লাগল। বেশ দূর থেকে এসেছে বুঝতে পারলাম। সঙ্গীরা মৃতের দরদী কেহ নয়, তাও মনে হল ওদের কথাবার্ত্তায়। তবে প্রভুর আদেশে কর্ত্তব্যের অবহেলাও চলবেনা, বোঝা গেল। একটু কৌতূহল নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। ওদের চারজনের কে মুখাগ্নি করবে এই নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা হচ্ছিল। বুঝলাম ওরা কেহ মৃতের আত্মীয়ও নয়। আমি মনে মনে ভাবছিলাম এই নিয়ে এত চিন্তা কেন? বললে না হয় আমি করে দিতে পারি। আত্মাই যখন দেহ ছেড়ে যায়, তখন নশ্বর দেহের পরিণতির জন্য এত চিন্তা কেন? সমাজের বিধি-বন্ধন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালনের ব্যবস্থা আছে। যেখানে প্রকৃত উত্তরাধিকারী অনুপস্থিত, সেখানে যে কেহই তো কাজ করতে পারে। এইরূপ চিন্তাস্রোত ভেঙে হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম, যখন ওরা মৃতের মুখের ঢাকা খুলে দিল, তাকিয়ে দেখলাম, বাবা, এযে আমার "মা"! ন' বছর ধরে যাকে হারানোর যে আত্মগ্লানি বুকে নিয়ে অহর্নিশি ঘুরে বেড়াচ্ছি! সাগরদ্বীপের কাছাকাছি প্রতিটি নদীর তীরে তীরে দিনরাত খুঁজে খুঁজে যাকে উদ্ধার

করতে পারিনি। এখনো প্রতি রবিবার সাগর আমাকে ঘরে থাকতে দেয় না। কাকদ্বীপে নদীর ধারে ঘুরে বেড়াই; আমি যেন শুনি, নদীস্রোত আমাকে বলে, খোঁজ কর, যাকে পাবে; যা আছে; তাই বুঝি মা আমাকে কাল শেষ দেখা দিলেন। দেখলাম সেই চোখ-মুখ, চোখের পাশের লাল জড়ুলটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একি! বলে আমি বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলাম। ওরা আমাকে লক্ষ্য করেছিল। বলল, এঁকে চেনেন নাকি?" আমি কিছুই বলতে পারলাম না। বলতে পারলাম না 'মা, কেন আমি তোমাকে খুঁজে বার করতে পারিনি? তাই কি তুমি এই অধমকে পরিহাস করতে শেষ দেখা দিলে?' কি ভাবে নিজেকে সামলে নিলাম জানিনা, কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ওদের কাজের সাহায্য করলাম, এবং সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে নীরবে মুখাগ্নি করে, ওদের কাছে এঁর বিশদ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে যা শুনলাম, তাতে আমার অনুমানই সত্য হল।

ওরা বলল, "গত ন' বছর আগে ওদের মনিব ও আত্মীয় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক গঙ্গাসাগর স্নান সেরে নৌকায় ফিরছিলেন। সাগরদ্বীপ থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক এগিয়ে এক যায়গায় নদীর একটি চড়া আছে, রামেশ্বরবাবু নৌকায় বসে দেখতে পেলেন, দূরে ঐ চড়ার পাশে দুটি লোক যেন কিছু একটা জল থেকে পাড়ে টেনে তুলবার চেষ্টা করছে। প্রথমে ভাবলেন মাছ-টাছ ধরবার চেষ্টা করছে বোধহয়। চড়ার কাছে আসতে মনে হল, যেন একজন মানুষের হাত পা ধরে টেনে তুলতে চাইছে। ওঁর মনে হল লোকগুলো কি বোকা, জলমগ্ন লোককে উপর থেকে টানতে গেলে তার আকর্ষণে যে ওরাও পড়ে যাবে। এদের বুদ্ধি দিয়ে বাঁচাবার জন্ত মাঝিদের তাড়াতাড়ি ওদের কাছে নৌকো নিতে বললেন। আশ্চর্য্য মনে হল, নৌকো যত এগিয়ে যেতে লাগল লোকদুটিকে যেন তত সন্ত্রস্ত মনে হল। ওরা একেবারে কাছে আসতেই লোকদুটি তাদের আকর্ষণীয় বস্তু ফেলে ছুটে পালাল। রামেশ্বরবাবু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে লাফ দিয়ে নেমে দেখলেন একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।

বেশ সুন্দরী বয়স্কা মহিলা, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার। দেখেই মনে হয় কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের। তিনি মাঝিদের সাহায্য নিয়ে তাড়াতাড়ি দেহটিকে তীরে তুললেন, জীবিত কি মৃত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেখে মনে হ'লো খুব বেশী-ক্ষণের জলে-ডোবা নয়। সাগরের আহ্বানে নদীদের আকুল আত্মনিবেদনে, সে উচ্ছ্বাস-ক্ষেত্রে পড়লে মানুষের পক্ষে মুহূর্ত্ত মাত্রই যথেষ্ট। জলে ডোবা রুগীকে সুস্থ করবার যত প্রক্রিয়া জানা ছিল মাঝিদের সাহায্য নিয়ে সবই করলেন। কখনো মনে হয় যেন হৃৎস্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে, কখনো আবার নিঃস্পন্দ। ওঁর স্ত্রী বললেন, জীবিতই হোক বা মৃতই হোক নৌকায় নিয়ে চল, বড়-ঘরের মেয়ে, এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। লোকগুলো তো গয়নাগুলোর লোভে টানাটানি করছিল। তাঁরা দেহটিকে নৌকায় তুলে নিলেন এবং বহু যত্নের ফলে হৃৎস্পন্দনের সাড়া পাওয়া গেল। রামেশ্বরবাবু ও তাঁর পত্নী দুরূহ কাজের সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁদের একমাত্র চিন্তা হ'ল তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে একে সুস্থ করে তোলা। এ কে বা কেমন করে এখানে এল, সে সব মনেই এল না। মাঝিদের তাড়া দিয়ে দ্রুত নৌকা চালিয়ে মেদিনীপুরে গড়বেতায় তাঁর বাড়ী পৌঁছে ডাক্তারের সাহায্যে এবং নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রায় দিনসাতেক পরে এঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু দেখা গেল যে ইনি কোন কথা শুনতেও পান না, বলতেও পারেন না। এরূপ মূক বধিরই ছিলেন কিনা কে জানে?

ডাক্তার বললেন, ঐ বেগবতী স্রোতস্বিনীর আঘাতেই কোমল ইন্দ্রিয়গুলি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, সুস্থ হয়ে উঠলে হয়ত আস্তে আস্তে এটা কেটেও যেতে পারে। মহিলাটি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন, কিন্তু চিরতরে মূক বধির হয়ে রইলেন। স্থবির ভাবও কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। তখন ওদের মনে হতে লাগল, হায় ইনি কাদের মা, বোন, কোন্ গৃহের সুগৃহিণী? কিছুই জানবার উপায় নাই। কি করে এঁকে এঁর গৃহে পৌঁছে দেবেন? মহিলাটিও আশ্রয়-

দাতার অনুগ্রহে কৃতজ্ঞ, কিন্তু নিজের অব্যক্ত বেদনায় কান্নায় ফেটে পড়েন। ওঁরা তাঁর পরিচয়, ঠিকানা জানতে চান, তিনি যে কিছুই জানাতে পারেন না। দুপক্ষই ভাবেন, ভগবানের একি পরিহাস!

রামেশ্বরবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বোঝান, আপনি আমারই "মা" আমার কাছেই থাকুন। যদি কখনও কোন সন্ধান পাই, তবে যাদের মা, তাদের বুঝিয়ে দেব। ভদ্রমহিলার চেহারায় এবং ব্যবহারে মাতৃত্বের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। তিনি কখনও আকারে ইঙ্গিতে তার হৃদয়াবেগ বোঝাতে চান। প্রকাশের পথ চিররুদ্ধ। কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তিনি কোথা থেকে কোথায় এসে আশ্রয় পেয়েছেন, সবই অজ্ঞাত। তাঁর মনের গভীরে এ-চিন্তাও উঁকি মেরেছে, এই কি পরপার? জীবনের দৃশ্যপট পালটে তিনি কোন্ সুদূরে চলে এলেন। পুরানো এবং নূতন স্মৃতি তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করে চলেছে।

রামেশ্বরবাবু পরিবারস্থ সকলকেই বলে দিয়েছেন, এঁকে আমার মায়ের আসনে বসিয়েছি, সকলেই যেন সেভাবে ওঁর সেবা করে। ইনি পুজো আহ্নিক, ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাকতেন। ভদ্রলোক বহুজায়গায় লোক পাঠিয়ে খবর নেবার দেবার চেষ্টা করেছেন।

উপযুক্ত সন্ধান পান নি। তাঁর মনে ভীষণ-অশান্তি ছিল। তিনি বলতেন, জান? এর জন্য আমরা দুপক্ষই কাতর। আমার কিছুটা সান্ত্বনা, একটি জীবন রক্ষা করতে পেরেছি, কিন্তু যেখানকার জিনিষ সেখানে পৌঁছে দিতে পারছিনা, এই দুঃখ। আর যাদের "মা" তারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে? মা নেই—তাও ভাবতে বাধছে, আছে বলেও তো মনকে প্রবোধ দিতে পারছে না। কি অসহ্য যাতনা তারা ভোগ করছে। এ যেন সেতুহীন নদীর দুপারে দু'দল আছি।

কিছুদিন হলো রামেশ্বরবাবু সপরিবারে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সঙ্গে এঁকেও নিলেন; উদ্দেশ্য, যদি দৈবক্রমে এঁর কোন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। গয়াতে গিয়ে ভদ্রলোক বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতায় চিকিৎসা করাবেন বলে বেহালায় তাঁর বোনের বাড়ীতে উঠলেন। সেখানে এসে মহিলাও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিন দিনের জ্বরে এঁর দেহাবসান হল।

দীনবন্ধুর মনের উপর থেকে ৯ বৎসরের পর্দা সরে গেল। মকর সংক্রান্তির পূর্ব্বেরদিন দুপুর বেলা প্রতিবেশী প্রসাদের মা এসে বলল,"দিদি যাবে সাগর স্নানে?" শুনেই মা যেন ক্ষেপে উঠলেন, তখনি তল্পি বেঁধে রওনা হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে স্বামী পুত্রদের কাছে বিদায় চাইলেন, "যাই, কেমন?" ছোট ছেলে ও মেয়েটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শিশুর পবিত্র মনে হয়ত তারা নিয়তির ইঙ্গিত পেয়েছিল। মা তাদের বহুবারই বহুজায়গায় গিয়েছেন, এমন অবস্থায় বোধ হয় নাই। বড় ভাই দীনবন্ধু ভাই বোনদের প্রবোধ দিয়ে শান্ত করল। মার মনটাও বোধহয় বিচলিত হয়েছিল, বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি "যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।"

সাগর-স্নান নির্ব্বিঘ্নে সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরার জন্য কয়েকজন মিলে একখানি নৌকো ভাড়া করে সাগরদ্বীপ থেকে রওনা হয়েছিলেন। অপটু মাঝিদ্বয় জোয়ারের বেগ সামলাতে পারল না। জোয়ারের ঢেউ এসে অদৃশ্য চড়ায় ধাক্কা খেয়ে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করল, তারই এক ঘূর্ণীর মাঝে পড়ে নৌকাখানি মুহূর্ত মধ্যে সম্পূর্ণ-উল্টে গেল! সমস্ত যাত্রীর কি নিদারুণ পরিণতি ঘটল! নিয়তির টানে কে যে কোথায় ভেসে গেল, কেউ জানল না। কাছাকাছি যেসব নৌকা যাচ্ছিল, সেই সব মাঝিরা চেঁচামেচি করে এসে পালের কাপড় ভাসতে দেখে টেনে তুলল। তাতে জড়িয়ে ছিল জনচারেক লোক, মাঝিও ছিল তাতে। বহু চেষ্টায় এদের জীবন রক্ষা হল। মাঝিদের কাছথেকে পুলিশ এবং ভলান্টিয়াররা বহু খোঁজাখুঁজি করেও আর যাত্রীদের সন্ধান পায় নাই। ঘটনার তিন দিন পরে জীবিত মাঝিদের মারফতে দীনবন্ধুরা মায়ের মৃত্যুসংবাদ পায়। সেই থেকে এই ৯ বৎসর প্রতি ছুটির দিনে সে মায়ের খোঁজে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়। আজ তার সম্পূর্ণ সন্ধান মিলল।

তর্পণ ঃ কালীচরণ নন্দী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে কালীচরণ নন্দী জন্মগ্রহণ করেন কলিকাতার রামবাগানের নন্দী-পরিবারে। পিতা শিবনারায়ণ নন্দী ছিলেন ব্যবসা-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যবসায়ী পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান কালীচরণ বাল্য বয়সে অসাধারণ মেধা ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। এনট্রান্স ও এফ্. এ পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান অধিকার করিয়া তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ অধ্যক্ষ এফ্. এ পরীক্ষার ফল দেখিয়া কালীচরণকে ডাকিয়া পাঠান। কালীচরণ অধ্যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া বিলাত পাঠাইয়া Indian Civil Service পরীক্ষায় বসিবার জন্য নির্দেশ দেন। কালীচরণ সানন্দে গৃহে ফিরিয়া এই প্রস্তাবটি পিতার সম্মুখে উপস্থাপিত করা মাত্র আত্মীয় পরিজন সকলেই ইহার বিরোধিতা করেন। তখন বিংশ শতাব্দীর আগমনের দেরী আছে আরো ছয় সাত বৎসর। নব্যবাদী আন্দোলন তখনো রক্ষণশীলদের পুরাপুরি পরাভূত করিতে পারে নাই। তাই পিতা শিবনারায়ণের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও কালীচরণ আত্মীয়স্বজনদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিলাত যাইতে পারিলেন না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ট্রিপল অনার্স লইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ পাশ করেন। ইহার পরে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিনি ভর্তি হন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য। তখনো আর্টস এবং সায়ান্স এই দ্বিবিধ শাখায় উচ্চতর পাঠ্যক্রমকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয় নাই। কাজে কাজেই তখন বি. এ পাশ করিয়া বি. ই পড়া চলিত। কালীচরণ সসম্মানে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন (১৯০২ খৃ:)!

ইহার পরে কালীচরণ ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় উচ্চতর গবেষণা করার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার গবেষণা কার্য্যে লিপ্ত হন। সে আজ হইতে বহু পূর্বেকার কথা। ১৯০৩ সালে লণ্ডনের Institute of Mechanical Engineers কালীচরণকে সম্মানিত সদস্য পদে বরণ করেন। তিনি আজীবন এই সংসদের সদস্য ছিলেন।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি নানান দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথমে বগুড়ার জেলা ইঞ্জিনিয়ার (১৯০৭—১৯০৯) এবং পরে ক্রমান্বয়ে কুচবিহার ষ্টেটের চীফ ইঞ্জিনিয়ার, হুগলির ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সবশেষে মোবারলি টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষরূপে তিনি সুনামের সহিত কার্য্য করেন।

দেশের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল! তাঁহার বিয়োগে দেশ একজন অক্লান্ত সমাজসেবীকে হারাইল।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় মৃতের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন :

"এদেশে পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রচলনের প্রায় প্রথম যুগে যাঁরা সেই বিদ্যা আয়ত্ত করতে অগ্রসর হ'য়ে গিয়েছিলেন এবং তার কোন না কোন বিভাগে আশ্চর্য পারদর্শিতা অর্জন ক'রে পরবর্তী জীবনে নানা

কষ্টে সেই পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তিনি ছিলেন সেই যশস্বী বাঙালীদের অন্যতম।...কর্মজীবনে যে জগতে তিনি বিচরণ করতেন, সেটা ছিল কথার জগৎ নয়, কাজের জগৎ। তখনকার দেশীয় রাজ্য কুচবিহারে এবং বৃটিশ-শাসিত বাংলা দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণ ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির নানা প্রধান প্রধান পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত দেখা গিয়েছিল। ঐ সব পদের দায়িত্বপালনে সাফল্য শুধু তাঁকে সুযশেই মণ্ডিত করেনি। বহু তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সৃষ্টি ও দেশের নানাস্থানে নানা নির্মিতিও সেই সাফল্যের শুভফল। তাঁর এবং তাঁর সমকালীন ও সমতুল্য ব্যক্তিদের নিকট আমরা পরবর্তী বংশীয়েরা অশেষ ঋণে ঋণী কারণ তাঁরাই প্রথমে নিজ নিজ কর্মদ্বারা বাঙালী জাতিকে তারাও যে আধুনিক বিদ্যা অধিগত ক'রে সেই বিদ্যা সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করতে পারে, এই আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর কর্মী-মানুষ। আসলে যাদের উপর "ভর করে চলিতেছে সমস্ত সংসার"। শ্রদ্ধেয় নন্দী মহাশয়ের সুগভীর পাণ্ডিত্য ও মনীষার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবির মহাশয় তাঁহার শ্রদ্ধানিবেদন করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা বিষয়ে গবেষণার জন্য গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় শ্রদ্ধেয় নন্দী মহাশয়কে রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পাই অধ্যাপক কবিরের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন যে সেকালে প্রযুক্তি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া যাঁহারা দেশের সেবা করিয়া কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাদে অন্যতম। জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমা চট্টোপাধ্যায় তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে এই একই ভাবে অনুকরণ করিয়া বলেন যে, তিনি যে জ্ঞানী ও কর্ম ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব যে অসাধারণ ছি তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইঁহাদের মত মহাপুরুষ ব্যক্তি সমাজের রক্ষক ও পরিপোষক এবং অলংকার ইঁহাদের তিরোধানে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইয় থাকে। সত্যসত্যই এই ক্ষতির আশংকা করিয় ভারতীয় ললিতকলা এ্যাকাদেমির অধ্যক্ষ ডক্টর মুলক রাজ আনন্দ কালীবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্রকে লেখেন: এই শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য এ যুগের প্রযুক্তি-বিদ্যাশাস্ত্রীদের আবার নূতন করিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন সাধন-পদ্ধতিকে উজ্জীবিত করিতে হইবে। এই প্রযুক্তি-বিদ্যাসাধনা শুধু ব্যক্তিকেই গৌরবদান করিবে না, ইহা তাহার পরিবারকে, গোষ্ঠীকে এবং সমাজকেও মহিমান্বিত করিল। এই মহত্ত্বটুকুর জন্যই শ্রদ্ধেয় নন্দী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকীর হোসেন, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডক্টর বি গোপাল রেড্ডি, বাংলা দেশের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য, শিল্পী যামিনী রায়, কলাবিদ শ্রীও সি গাঙ্গুলী, অধ্যাপক নিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। নন্দী মহাশয়ের জীবন এবং জীবনাদর্শ এ যুগের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করিলে যুগের অন্ধকার বহুলাংশে যে অপনোদিত হইয়া যাইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

(৭৭৪ পৃষ্ঠার পর)

কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। মানব জাতির সমাজ গঠনের ইতিহাস প্রায় ৬০০০।৭০০০ হাজার বৎসর ধরিয়া সপ্রমাণ-ভাবে বিচার করা যায়। তাহার পূর্ব্বেও মানব সমাজ বহু সহস্র বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সকল যুগেই সমাজ গঠন ও সংরক্ষণ কার্য্যে রীতি, নীতি, পদ্ধতি, ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্ম, আদর্শ, পন্থা ইত্যাদি নানাভাবে আসিয়াছে ও গিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির পথ ও ধারা মানুষের ইতিহাসে কোন যুগেই নেতা স্থানীয় লোকেদের অজানা ছিল না। অন্ধ ও বিভ্রান্ত মানুষ যদি কখন অল্প সময়ের জন্য বৃহত্তর নীতিজ্ঞান হারাইয়া ক্ষুদ্রস্বার্থ চালিত হইয়াও থাকে; তাহার সে অবস্থা কখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতে যে সকল ব্যক্তি এখন নেতৃত্ব আকাঙ্খা করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে। এই কারণে জনসাধারণকে নিজেদের মঙ্গলের জন্য যোগ্য ব্যক্তি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে সমাজের কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে হইবে। এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা সকলেরই অবিলম্বে কর্ত্তব্য। নিজ হইতে যাঁহারা নেতৃত্ব আহরণে সচেষ্ট তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই অযোগ্য প্রতীয়মান হইতেছেন।

दोन किंवा तीन मुले पुरेत
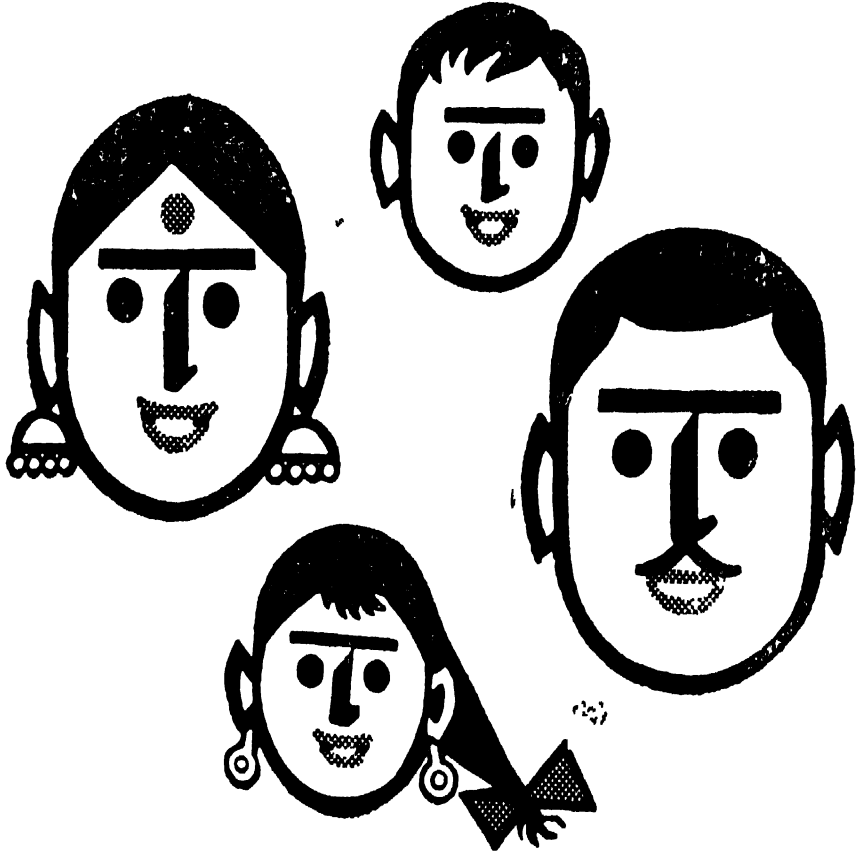
कुटुंब नियोजन केंद्राची खूण लाल त्रिकोण

davp 67/337

বঙ্কিম-সাহিত্য, সমাজ ও সাধনা : শ্রীপ্রশান্ত-বিহারী মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স, কলিকাতা। মূল্য : দশটাকা।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা দেশের নবজাগরণের ত্রিবেণী সঙ্গমের যে পূর্ণ চিত্রটি বিদগ্ধ বঙ্গবাসীর মানস-পটে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার কেন্দ্রস্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ আছে। পঙ্কশৈবালে ব্যাহতগতি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যখন প্রকাশের পথ খুঁজিতেছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নব্য ভগীরথের তন্ময়তায় সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইলেন। কঠোর তপস্যার নূতন সৃষ্টির পথ রচিত হইল; লেখা হইল 'বন্দেমাতরম', লেখা হইল আনন্দমঠ ও দুর্গেশনন্দিনী। কৃষ্ণচরিত্রের উপর বঙ্কিমলেখনী যে আলোকপাত করিল তাহা একদিকে যেমন অগুস্ত কঁত প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তাদার্ঢ্যে মহনীয়, অন্যদিকে আবার তাহা সনাতন হিন্দুর বিশ্বাস ও ভক্তির কেন্দ্রবিন্দুটি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তিনি গল্প বলিলেন; সেই গল্পধারার বহমানতা শতাব্দীর সীমানা পার হইয়া অন্য এক শতাব্দীতে অনুপ্রবেশ করিল। তবুও তাহার সজীবতা, জীবনশক্তি ও মনোহারিতা কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বঙ্কিমের দেশপ্রেম আনন্দমঠের সন্তানদের আশ্রয় করিল, প্রমূর্ত হইল আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সুরে ও স্বরে। তাঁহার অনুপ্রেরণা ও অনুপ্রাণনা এতোই অতলস্পর্শী যে দেশের সহস্র সহস্র নরনারী আত্মবলিদানের মন্ত্ররূপে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রটিকে সাগ্রহে বরণ করিল। বঙ্কিম-সাহিত্য, বঙ্কিমদর্শন শুধুমাত্র জীবনের উপান্তটুকুকে স্পর্শ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; তাহা একটি সমগ্র জাতির জীবনদর্শনকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার অন্তঃস্থলে আঘাত করিয়া তাহাকে নূতন রূপদান করিয়াছে। নব্য বঙ্গ, তাহার ধ্যান ও ধারণা, তাহার কর্ম ও প্রেরণা, তাহার কৃতি ও উচ্চাশা, এ সবের মূলে বঙ্কিম-প্রেরণা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই শক্তি ও ঋদ্ধি জোগাইয়াছে। তাই বঙ্কিম-মানস এক মহাসমুদ্র বিশেষ; তাহার মূল্যায়ন সাহিত্য-যাচাইয়ের কষ্টিপাথরে সম্ভব নহে। কোন দর্শনবেত্তা ন্যায়শাস্ত্রের মাপকাঠিতে বঙ্কিমের সমাজদর্শন বা সৌন্দর্য-দর্শনের বিচারপ্রয়াসী হইলে, তিনিও সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়, জীবনে ও দর্শনে, সাহিত্য ও কৃতিতে, সফলতায় ও উচ্চাশায় যদি সেতুবন্ধন সম্ভব হয়, তবেই বঙ্কিম-মানসের মূল্যায়ন সম্ভব হইতে পারে। এই সামগ্রিক মূল্যায়নটুকুই প্রত্যক্ষ করিয়াছি আলোচ্য গ্রন্থটিতে। বঙ্কিমের মানসের এমন একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন ইতিপূর্বে চোখে পড়ে নাই। গ্রন্থকার এই ধরনের বঙ্কিম-সমালোচনায় পথিকৃৎ।

মানুষ সামাজিক জীব। এ কথা বলিলেন মহা-দার্শনিক হেগেল। সমাজ-জীবনের সঞ্জীবনী ধারা ব্যক্তি মানুষকে পরিপুষ্ট করে, ইহা সর্বজনস্বীকৃত। গ্রন্থকার এই তত্ত্বটিকে গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমের সমাজ ও বঙ্কিমের সমকালের যে রেখাচিত্রটি কথায় কথায় সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা বঙ্কিম-মানসকে, বঙ্কিম-চিন্তাকে ও বঙ্কিম-আদর্শকে অনুধাবন করিবার পথে সহায়ক। বঙ্কিমের ধর্ম-চেতনা কীভাবে অন্ধ তামসিকতার পথ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল জ্ঞানের

পথে সার্থকতার পথ অনুসন্ধান করিল, তাহার ব্যাখ্যা পাই এই গ্রন্থে। সমাজতাত্ত্বিক বঙ্কিম, রাষ্ট্রনীতিবেত্তা বঙ্কিম, দেশপ্রেমিক বঙ্কিম ও দার্শনিক বঙ্কিম—ইহাদের অপূর্ব রেখাচিত্রাবলী বঙ্কিমের যে সামগ্রিক রূপটিকে উদ্ভাসিত করিয়াছে তাহা গুণীজনের প্রশংসাধন্য হইয়াছে। বঙ্কিমের সমকালীন জগতের মূঢ়তা ও অপূর্ণতাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া কি ভাবে বিদূরিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বিদগ্ধ পণ্ডিতদের অজানা নয়। কিন্তু গৌড়জন এই সত্যের সন্ধান পাইল আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে। তাই বিচারের এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতেও গ্রন্থটির মূল্য অপরিমেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের অনুসন্ধিৎসা যথার্থ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-মার্গ আশ্রয় করে নাই, পূর্বে এ অনুযোগ করা হইয়াছে। অংশতঃ এ অভিযোগ সত্য হইলেও, এখন আর ইহাকে পূর্ণ সত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা, সংশ্লেষাত্মক সিদ্ধান্ত ও গবেষকের বিনিদ্র সাধনায় স্বাক্ষর রহিয়াছে আলোচ্য গ্রন্থটির সমগ্র কলেবরে। গ্রন্থকার প্রথিতযশা আইনবিদ। আইনের ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণীশক্তি সত্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া অপরাধীর শাস্তিবিধান করে, ও নিরপরাধকে সসম্মানে মুক্তি দেয়, সেই অনন্যসাধারণ শক্তির বিকাশ ঘটিয়াছে সাহিত্যায়ান ও জীবনায়নের ক্ষেত্রে। গ্রন্থকার সেই দুর্লভ বৃত্তিটিকে প্রযুক্ত করিয়াছেন বঙ্কিম-মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ; তাঁহার সাফল্যও হইয়াছে গগনচুম্বী। গ্রন্থখানি নিগূঢ় গবেষণা-সমৃদ্ধ। বিদ্যাসাগর বক্তৃতা-মালার মধ্যমণি হিসাবে এই গ্রন্থটি সমাদৃত হইবে, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যান্সের কর্তৃপক্ষ রুচিকর প্রচ্ছদপটে, সুন্দর কাগজে ও ছাপায় গ্রন্থটির বহিরঙ্গের

প্রবাসী নূতন বছরে

আগামী বৈশাখে 'প্রবাসী' ৬৮ বৎসরে পদার্পণ করিতেছে।

শুধু পুরাতন কাগজ বলিয়াই নয়, ইহার প্রতিষ্ঠা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। যে 'ট্রাডিসন' প্রবাসীর বৈশিষ্ট্য, আজও সেই 'ট্রাডিসন' প্রবাসী রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কালের প্রভাবে সে জাতিচ্যুত হয় নাই। ইহাও কম গৌরবের কথা নহে।

নূতন বছরের সংখ্যাটি আমরা যথাসাধ্য সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। খ্যাতনামা লেখকদের রচনা-সম্ভারে—কি কবিতায়, কি গল্পে, কি উপন্যাসে, কি প্রবন্ধে ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত।

বিশেষ করিয়া সীতা দেবীর নূতন উপন্যাস "তিন কন্যে", জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর "রাজ্য-সত্য অর্দ্ধ-সত্য", সাতকড়িপতি রায়ের "ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ" প্রভৃতি লেখাগুলি প্রবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আর আছে সে-যুগের বিপ্লব-ইতিহাসের একটি অধ্যায় : "আঘাত, প্রত্যাঘাত ও দণ্ডনীতি"—লিখিয়াছেন শ্রীকালীচরণ ঘোষ।

যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে চান, তাঁহারা সত্বর ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ 'প্রবাসী'

[ন্ধ]তা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদার্হ। পনেরোটি পর্বে বিভক্ত এই সুলিখিত গ্রন্থটির অধ্যায়-বিন্যাস বিষয়মাহাত্ম্যে ও নন্দনতাত্ত্বিক আবেদনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

অনুক্ত সংলাপ: শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। দাম তিন টাকা।

কয়েকটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি আধুনিক ষ্টাইলে লেখা হইলেও, ইহাতে উগ্রতার ঝাঁঝ নাই। আমরা তাঁহার কবিতার সঙ্গে পরিচিত। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী ও ছন্দজ্ঞান উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি কোন্ পন্থী বিচার্য নয়। কবিতাগুলি দেখিলেই পথের কথা মনেও হয় না। যেমন,

"বাদলের নিস্তব্ধ আকাশে,
ধরিত্রীর সন্ধ্যা নেমে আসে।
অবিরাম ঝর ঝর বারি ঝরে
ধীরে ধীরে শুষ্ক বক্ষ পরে।
মনে হয় যেন কত যুগ-যুগান্তর
এমনিই নিরন্তর
ধ্যানমৌন কোন এক বিরহী যক্ষের
অশান্ত বক্ষের,
পুঞ্জীভূত বেদনার রাশি
নিমীলিত দুটি চক্ষে আসি
অবিরাম ধারার ধারায়
ঝরিতেছে ছন্দহীন চির মৌনতায়।"

বইখানি সুখপাঠ্য।

তৃণগুচ্ছ: সুধীন্দ্রকুমার দেব, অশোক প্রকাশন, ৪৮, হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা—১২। মূল্য দু টাকা।

কয়েকটি আধুনিক কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি অধিকাংশই স্যাটায়ার। একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি—

"পিঁপড়েরা দল বেঁধে চলে যায়—
জানতে কি চাও যায় কোথায়?
জিজ্ঞাসা করলে পাবে জানতে
যাচ্ছে ওরা উড়িষ্যায়।
বাংলায় দুর্ভিক্ষের পদশব্দ শোনা যায়,
চালের রেশন, চিনির রেশন,
মৎস্যের ব্ল্যাক মার্কেটের পরিবেশন,
ওদের রেশনকার্ড নেই,
চালচিনি পাবে কোথায়?
তাই দেশ ছেড়ে চলেছে
সব উড়িষ্যায়।"

এইরূপ প্রতিটি কবিতায় তাঁর স্বাক্ষর বিদ্যমান। রসিকজনের উপভোগ্য। শ্রীগৌতম সেন